তলস্তয় গল্পসমগ্র

অনুবাদ

মণীন্দ্র দত্ত

তুলি-কলম ॥ ১এ, কলেজ রো, কলকাতা-৯

ISBN : 81-87917-26-1

প্রকাশক : কল্যাণব্রত দত্ত ।। তুলি-কলম ।। ১এ, কলেজ রো, কলকাতা-৯

লেজার কম্পোজ : এস. টি. লেজার ইউনিট, কলকাতা-৭৩

মুদ্রক : ফ্রেন্ডস্ গ্র্যাফিক, ১১বি, বিডন রো, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ : কুমারঅজিত

প্রাপ্তিস্থান : সাহিত্য তীর্থ ।। ৮/১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

মূল্য : ১২০ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

তলস্তয় সম্পর্কে দু'-চার কথা

সুধিজনেরা বলেন, গত পাঁচশো বছরে পৃথিবীতে এমন চারজন সাহিত্যিক আবির্ভূত হয়েছেন যাঁদের সঙ্গে অন্য কারুব তুলনা চলে না। তাঁরা দেশকালাতীত। সর্বযুগের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা সাফল্য-নৈরাশ্য অসাধারণ ভাষায় তাঁরা প্রকাশ করেছেন। স্ব স্ব দেশকালের গভীরে প্রবেশ করে জগৎ ও জীবনের এক সর্বকালীন সুমহান তাৎপর্য তাঁরা আবিষ্কার করেছেন। তাই তাঁরা শুধু আপন দেশের শ্রেষ্ঠ লেখক নন, তাঁরা বিশ্ব শ্রেষ্ঠ। বলা বাহুল্য, এই চারজন হলেন—ইংল্যান্ডের শেকস্‌পীয়র, জর্মনীর গ্যেটে, বাশিয়ার তলস্তয় এবং ভারতের রবীন্দ্রনাথ। শেক্‌স্‌পীয়র ইংল্যান্ডের বুর্জোয়াযুগের ঐশ্বর্যকালীন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, গ্যেটে বিপুল জনজাগরণের অন্যতম ভাষ্যকার এবং রবীন্দ্রনাথ ভারতের ক্রান্তিকালীন গভীর উপলব্ধির মহৎ দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। এই কারণেই আচার্য সুনীতিকুমার পুনঃ পুনঃ এঁদের রচনাপাঠ সংস্কৃতিমনস্ক পাঠকের পক্ষে আবশ্যিক মনে করেছিলেন।

উনিশ শতকের রাশিয়া মহা ভাগ্যবান। একের পর এক দিকপাল সাহিত্যিক আবির্ভূত হয়ে অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাশিয়াকে এক শতকের মধ্যেই দীপামান করে তুলেছিলেন। সাহিত্যের সকল শাখায় সাফল্য দেখা দিলেও উপন্যাসে ও ছোট গল্পে

যে অভূতপূর্ব সমারোহ দেখা গিয়েছিল তার নজির পৃথিবীর খুব কম দেশেই পাওয়া যাবে। পুশ্‌কিন, গোগোল, তুর্গেনেভ, দস্তয়ভস্কি, গোর্কি এবং কম-বেশি শক্তিসম্পন্ন আরও বহু কথা-সাহিত্যিক আবির্ভূত হয়েছিলেন। এবং এঁদের সকলের শীর্ষে তলস্তয়। তিনি সর্বোত্তম। রুশ সাহিত্যের 'গ্র্যান্ড মাস্টার'।

কাউন্ট লেও নিকোলায়েভিচ্ তলস্তয় ১৮২৮ সালে ২৬ শে অগস্ট ইয়াসিনা পলিয়ানায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জন্মসূত্রে তিনি রাশিয়ার অভিজাতশ্রেণীর অন্যতম একজন ছিলেন। তখনকার রাশিয়া বর্তমানের মতো শিল্পসমৃদ্ধ ছিল না। অভিজাতদের ঐশ্বর্যের জোগান দিত জমি থেকে আয়। কিন্তু তলস্তয় জমিদার হয়েও নিজের শ্রেণী থেকে নিজেকে মুক্ত করার সংগ্রামে আজীবন কাটিয়ে গেছেন। নিজের শ্রেণীকে পরিত্যাগ করা কখনো সহজ হয় না। তলস্তয়ের পক্ষেও বিষয়টি সহজ হয়নি। ফলে সারা জীবন স্বতোবিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন তিনি। বহু লোকের বাধা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। এমন কি, জীবনের একটি পর্বে স্ত্রীর বিরাগভাজনও হয়েছিলেন। কিন্তু নিজের অন্বেষা থেকে কখনো বিরত হননি।

রাশিয়ার কৃষক শ্রেণী তখন জেগে উঠছে। বহু শতাব্দীব্যাপী ভূমিদাসপ্রথার বিলোপ হলো ১৮৬১ সালে। তলস্তয়ের তখন পূর্ণ যৌবনকাল। তিনি দেখেছেন, আইনত ভূমিদাসপ্রথা লুপ্ত হলেও কৃষকদের দাসত্ব ও দুর্দশা বিন্দুমাত্র কমে যায়নি। তিনি সমাজের এই পুঞ্জীভূত অন্যায় ও বেদনাকে দূর করবার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এ চেষ্টা শুধুমাত্র তাঁর লেখনীকে আশ্রয় করে পরিস্ফুট হয়নি। তাঁর জীবনচর্যাও এই মহৎ প্রচেষ্টাকে ব্যক্ত করেছে। নিজের জমিদারী ত্যাগের বাসনা এই জীবনচর্যারই একটি দিক। বিলাসবহুল অভিজাতসুলভ জীবনযাত্রাকে তাই অস্বীকার করে তিনি দরিদ্র 'ম্যুঝিক' (রাশিয়ার চাষী) হতে চেয়েছিলেন। 'আমার জীবনই আমার বাণী'—এ মহৎ বাক্য এ যুগে তাই তলস্তয়ের জীবনেই সর্বাধিক সার্থক হতে পেরেছিল।

লেও তলস্তয় শৈশবেই তাঁর মা-বাবাকে হারান। তাঁর দু'বছর বয়সে মায়ের এবং ন'বছর বয়সে বাবার মৃত্যু হয়। এক নিকট আত্মীয়ের কাছে তিনি লালিত হন। সে-কালীন রাশিয়ার অভিজাতদের উপযুক্ত শিক্ষা তাঁকে দেওয়া হয়। অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে ফরাসী ও জর্মন ভাষাও শিক্ষা করেন। ষোল বছর বয়সে কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষাদান পদ্ধতি তাঁকে খুশি করতে পারেনি। ফলে স্নাতক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়ে কলেজ ছাড়েন। তারপর থেকে জীবনের নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। এমন কি সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে জুয়ার আড্ডাতেও তাঁকে দেখা যেতে থাকে। অবশেষে তখনকার রুশ-প্রথা অনুযায়ী সেনাবাহিনীতে তিনি যোগ দেন। প্রথমে তিনি ককেশাসে প্রেরিত হন। অতঃপর জুনিয়র অফিসার হিসেবে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগ দিয়ে ব্রিটিশ-ফরাসী-তুর্কীর মিলিত

বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেন। এ সময়কার অভিজ্ঞতা থেকেই রচিত হয় 'সেবাস্তপোলের গল্পসমূহ'। বিভিন্ন প্রণয় ব্যাপারেও তিনি কিছুটা জড়িয়ে পড়েছিলেন। আবার ক্রিয়ার গ্রের্ডস্ অঞ্চলে চাষী ছেলেমেয়েদের পড়ানোর জন্য স্কুলও খুলেছিলেন। এখানেই তিনি তাঁর প্রগতিশীল শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। একসঙ্গে বহুমুখী কার্যধারা ও তাদের পরস্পরবিরোধী চরিত্র তলস্তয়ের মনে জটিল দ্বন্দ্বের সূত্রপাত করেছিল। সারা জীবন তিনি এ দ্বন্দ্ব দিয়ে তাড়িত হয়েছিলেন।

সাহিত্য রচনায় সাফল্য তাঁব প্রথম জীবনেই ঘটেছিল। সুধিজনের দৃষ্টি আকর্ষণেও সক্ষম হয়েছিলেন যৌবনকালেই। কিন্তু তাঁর সাহিত্য-জীবনের যথার্থ সূত্রপাত ঘটে ১৮৬২ সাল থেকে। এই বছরেই তিনি সোফিয়া বেহ্রস নামের এক মহিলাকে বিবাহ করেন। বয়সে সোফিয়া তাঁর প্রায় অর্ধেক ছিলেন। তখন থেকে তিনি ইয়াসিয়ানা পলিয়ানায় বসবাস করতে থাকেন। এরপর থেকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলো প্রকাশিত হতে থাকে। 'দ্য কসাক্স্' প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ সালে। এ বছরেই শুরু করেন তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ওয়র অ্যান্ড পীস্'। ১৮৭৩ সালে 'আনা কারেনিনা' লেখা শুরু হয়। এ উপন্যাসটি শেষ হবার আগেই গভীর আত্মিক সংকটের চেহাবা কিছুটা ব্যক্ত হয়েছে ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত 'কন্‌ফেশন্‌স্' নামের বইতে।

তলস্তয় তাঁব অতীতকে অস্বীকার করলেন। অভিজাত জীবনযাত্রা, তাঁর সম্পত্তি, এমন কি তাঁর এযাবৎকালের সমগ্র সাহিত্যকীর্তিকেও তিনি অস্বীকার করতে চাইলেন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল আত্মিক উত্তরণ ও মানবতার সেবা। পরবর্তীকালে যে সকল লেখা লিখেছেন তাঁব মূল কথা হলো তাঁর একান্ত নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসের অভিব্যক্তি এবং যুক্তিতর্কের অতীত এক পরম বোধের প্রকাশ।

তলস্তয়ের মনের এ পরিবর্তনটি এসেছিল এক প্রবহমান নিরন্তর সংগ্রামেব ফলশ্রুতি হিসেবে। একদিকে ফরাসী চিন্তাবিদ রুশোর প্রভাব, অপর দিকে রুশ কৃষকদের সরল জীবনযাত্রার প্রতি গভীর আগ্রহ তলস্তয়কে এ উপলব্ধির সমীপে পৌছে দিয়েছিল। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার যে ব্যাপক যন্ত্রমনস্কতা দেখা দিয়েছিল তলস্তয়ের সজাগ মন তার খবব রাখত। তাঁর বিশেষ ধরনের মানসিক গড়ন এ যান্ত্রিকতাকে বরদাস্ত করবার অনুকূলে ছিল না। এ যান্ত্রিকতা ও কৃত্রিমতার উপর খড়্গহস্ত তিনি, এমন কি, এ-বোধের কাছেও পৌছে গিয়েছিলেন—সভ্যতা মানেই দাসত্বের শৃঙ্খল। সমাজ নিজের প্রয়োজনে এসব শৃঙ্খল সৃষ্টি করে নিয়েছে। কাজেই সভ্য সমাজ থেকেই যাবতীয় গরল উত্থিত হয়ে মনুষ্যত্বকে গ্রাস করছে। এ সমাজ বেশ কিছু মিথ্যা মূল্যবোধ দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছে। তার ফলে মানুষের ভেতরকার খাঁটি ভালো গুণগুলো স্ফূরিত হতে পারছে না। তলস্তয় মনে প্রাণে চাইলেন এই সব প্রাথমিক ভালোর কাছে গভীরভাবে ফিরে যেতে। তাঁব পীড়িত

বিবেক বার বার সরল সত্যকে অবলম্বন করতে চাইল। তাঁর সামাজিক মর্যাদা আর ঐশ্বর্য তাঁকে নিরন্তর যন্ত্রণাদগ্ধ করতে লাগল। তিনি মনে করলেন, গ্রামের গরীব চাষীদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে তাদেরই মধ্যে অভিমানবিহীনভাবে বসবাস করতে পারলে জীবন যথার্থ সার্থক হয়ে উঠতে পারে। সরল গরীব চাষীদের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার মধ্যে নিহিত রয়েছে গভীর প্রজ্ঞা।

এ বোধে উপনীত হবার পর স্বভাবতই তলস্তয় তাকে কাজে পরিণত করতে চাইলেন। অবশ্য প্রথমটায় কোনো আকস্মিক সিদ্ধান্তের বশবর্তী হয়ে প্রতিষ্ঠিত সংসারের কাঠামোটাকে ভাঙতে চাননি তিনি। পারিবারিক জীবনের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রেখে তিনি একজন ভদ্র কৃষক হতে চাইলেন। এ সাধনা নেহাৎ সহজ ছিল না। পরিজন, বিশেষ করে স্ত্রী, এমন জীবনযাত্রা পদ্ধতিকে সহজে মেনে নিতে পারলেন না। পারা সম্ভবও ছিল না। এব ফলে তাঁর মনে যে নিদারুণ মানসিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছিল, তার পরিচয় সমকালীন সাহিত্যকীর্তিতে উজ্জ্বলভাবে ধরা আছে।

মনের এই পর্যায় নিয়ে তলস্তয়ের প্রায় পনেরো বছর কেটেছিল। বলা যায়, ১৮৮০ সালের পর থেকেই এই পর্যায়ের শুরু। এ সময়ে এক অসহ্য অপরাধবোধ তাঁকে অবিরত পীড়ন করত। তিনি প্রাণপণ শক্তিতে চাইতেন এ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে সন্তসুলভ ধৈর্যে এক গভীর উপলব্ধির জগতে পৌছে যেতে। নিজেকে উত্তীর্ণ হবার মহৎ সাধনায় নিজেকে তিনি তখন নিযুক্ত রেখেছিলেন।

কিন্তু এই দু-নৌকোয় পা দিয়ে চলা তাঁর পক্ষে অসহ্য হলো। তিনি বুঝলেন, এভাবে সমন্বয় করে সত্যকে পাওয়া সহজ নয়। তাই এবার, জীবনেব শেষ পর্বে চাইলেন সংসাব সমাজ পরিজন সম্পদ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে মুক্ত সরল জীবনে আশ্রয় নিতে। তখন কিন্তু তাঁর পুত্রকন্যার সংখ্যা তেরো এবং অনেকেই তাঁদের মধ্যে সাবালক। এমন কি নিজস্ব সম্পত্তি সমস্ত বিলিয়ে দিয়ে একেবারে নিঃস্ব হতে চাইলেন তিনি। এই নিয়ে পরিবারেব সকলের সঙ্গে, বিশেষ করে স্ত্রীর সঙ্গে বাধল তাঁর প্রচণ্ড বিরোধ। যে স্ত্রী যৌবনকালে স্বামীর লেখা বৃহত্তম উপন্যাস সংগ্রাম ও শান্তির পাণ্ডুলিপি অসংখ্যবার অনুলিপি কবে দিয়েছিলেন, তিনিই স্বামীর যাবতীয় ধ্যানধারণা ও সাহিত্যকীর্তির বিরোধী হয়ে উঠলেন। মনান্তর এমন পর্যায়ে পৌছোল যাতে সোফিয়া কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টাও করলেন। নিজের সুকঠিন মানসিক সংকট এবং স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব বিরাশি বছর বয়স্ক বৃদ্ধ তলস্তয়কে বাধ্য করল ইয়াসিয়ানা ছেড়ে অজানার পথে পাড়ি জমাতে। কখনও ঘোড়ার পিঠে, কখনও ট্রেনে শুরু হলো তাঁর দীর্ঘ পদযাত্রা। অবশেষে অস্তাপোভো স্টেশনে এসে আর চলতে পারলেন না। নিদারুণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। ইয়াসিয়ানায় খবর পৌছোল। কাউন্টেস সোফিয়া পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে অখ্যাত স্টেশনে এসে পৌছালেন। কিন্তু তলস্তয় আর বেশিদিন পৃথিবীতে রইলেন না। কাউন্টেস ও তাঁর পরিজনেরা এসে পৌছোবার

তিনদিন পর ভোরে ৬-০৫ মিনিটে মৃত্যু হলো সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক লিও তলস্তয়েব। সেদিন নভেম্বরেব ২৩ তারিখ, ১৯১০ সাল। যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁব মরদেহ নিয়ে আসা হলো ইয়াসিয়ানায়। কোনওরকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াই তাঁকে সমাহিত করা হলো। ইয়াসিয়ানায় তলস্তয় স্মৃতি ভবন গড়ে উঠল। ইয়াসিয়ানা পলিযানা আজ সোভিয়েত রাশিয়া তথা পৃথিবীর অন্যতম তীর্থস্থান।

তলস্তয়েব সমগ্র কথাসাহিত্যকে প্রবণতা অনুযায়ী মোট দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একদিকে অভিজাত শ্রেণীর সমারোহপূর্ণ জীবনযাত্রার অন্তরালে তীব্র বাসনা ও নৈতিক সংকট, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের সহজ সরল দৈনন্দিন জীবনে পরম উপলব্ধির বিকাশ। একদিকে 'আনা কারেনিনা' বা 'রেজারেক্‌শন' জাতীয় উপন্যাস এবং 'আফটার দ্য বল' বা 'ক্রুয়েৎসার সোনাটা' জাতীয় গল্প, অন্যদিকে 'ইয়ার্ডস্টিক' বা 'হোয়ার লাভ ইজ' শ্রেণীর রচনা। এবং সর্বোপবি রয়েছে তাঁর মহত্তম কীর্তি 'সংগ্রাম ও শান্তি'—যাকে কোনো বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে আঁটানো যায় না।

'আনা কারেনিনা' উপন্যাসের শুরুর বাক্যটি স্মরণ করা যাক। 'সুখের সাধারণ চেহারা সবখানে এক. দুঃখের অভিব্যক্তি প্রতি পরিবাবে পৃথক।' এই সামান্য সূত্রের বৃহৎ ভাষ্য বচনা করেছে গোটা উপন্যাসটি। বিবাহ, প্রেম, পরিবার প্রভৃতি যে সব প্রতিষ্ঠান সমাজের তথাকথিত কাঠামোটাকে ধরে রাখে তা যে কত অন্তঃসারশূন্য 'আনা কারেনিনা' সেকথা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। একদিকে আনা কারেনিনার ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রবল অভীপ্সা অবৈধ প্রণয়ের মধ্যে আত্মহননের বীজ বুনে চলে, অন্যদিকে লেভিন-এর ক্রমাগত অন্বেষা ও হতাশা শেষ পর্যন্ত মুক্তির আলো দেখতে পায় বুড়ো চাষীদের সহৃদয় সান্নিধ্যে। এই দ্বিধাহীন পক্ষপাত লেখক হিসাবে তলস্তয়কে তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেয় যা একান্তই তলস্তয়ী-বিশ্ব বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। 'রেজারেক্‌শন' উপন্যাসেও লক্ষ করি, অপরাধ ও অনুতাপেব টানাপোড়েনে ব্যক্তিহৃদয় কেমন বিদীর্ণ হতে পারে! নায়ক নেখ্‌লিউদ্‌ফ্ আত্মশোধনের পন্থা বেছে নিতে যে দুরূহ কষ্ট ও শাস্তি বরণ কবেছে তা একান্তভাবে তলস্তয়ের সমকালীন মানসিক প্রবণতার পরিচয় দেয়। তাছাড়া. এ উপন্যাসে রুশ সরকারী মহলের অবক্ষয়ের চিত্র, উচ্চ পর্যায়ে ব্যাপক দুর্নীতি এবং চার্চের অন্যায়ের প্রতি সুগভীর ঘৃণা এ উপন্যাসটিকে বিশ্বসাহিত্যে স্মরণীয় করে রেখেছে। অভিজাত মহলের অন্তঃসাবশূন্যতা, অন্যান্য উপন্যাসের মতো এখানেও বিশ্বাসযোগ্য চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে। এই চেহারার ভিতর দিয়েই তলস্তয়ের মানসিক প্রবণতা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

অভিজাত মহলেব এ চেহারার বিপরীতে তিনি স্থাপন করেছেন সাধারণ মানুষের ছোট ছোট সুখদুঃখ মাখানো তরঙ্গিত জীবন। 'ক্রুয়েতৎসার সোনাটা' থেকে 'হোয়াব লাভ ইজ'-য়ের জগৎ একেবারেই আলাদা। মন্ত্রের মতো উচ্চারণে তলস্তয় এখানে

জীবনসত্যকে উদঘাটিত করেছেন। তলস্তয় 'কনফেশন্‌স্‌' নামের আত্মকাহিনীতে ব্যক্ত করেছেন 'আনা কারেনিনা' লেখার পর তাঁর মনে এক দুরূহ ও হতাশা চেপে বসেছিল এবং তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য প্রায়শই তিনি আত্মহননের চিন্তা করতেন। এমন কি, দুর্বল মুহূর্তে পাছে গলায় দড়ি দিয়ে বসেন অথবা নিজের শরীরে গুলি বিঁধিয়ে দেন সেজন্য গৃহস্থালীর কোনও দড়ির সংস্পর্শে তিনি আসতেন না এবং শিকারে যাওয়াও একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মনের এ অবস্থায় তিনি আশ্রয় নিলেন এমন সব গল্প রচনায় যেগুলো নম্র বেদনায় মনকে স্নিগ্ধ করে তোলে। এসব গল্পের কয়েকটি হয়তো তাঁর মৌলিক উদ্ভাবন নয়। বেশ কিছু আছে বিদেশী গল্পের স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন অনুবাদ (উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এ পর্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'হোয়ার লাভ ইজ'-য়ের উৎস একটি ফরাসী গল্প। এ কারণে, এ সব গল্প প্রকাশিত হবার পর একটি রুশ পত্রিকার সমালোচনায় তলস্তয়ের বিরুদ্ধে নকলের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল), ভাষান্তরেও তাদের মৌল ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চাপা পড়ে থাকেনি। তলস্তয় বুঝেছিলেন সাধারণ মানুষের আড়ম্বরহীন জীবনে এমন ধর্মের মোড়কে মোড়া চিরন্তন সত্য সহজে অনুপ্রবেশ করতে পারে। তাছাড়া, কিছু তুর্কী যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গেও তাঁর ও বিষয়ে কিছু কথা হয়েছিল। এসব যুদ্ধবন্দীদের তুলা ও ইয়াসিয়ানার অন্তর্বর্তী অঞ্চলের এক পরিত্যক্ত চিনিকলে রাখা হয়েছিল। তলস্তয় বিস্মিত হয়ে দেখেছিলেন, প্রত্যেকটি বন্দীর কাছে একটি করে কোরান রয়েছে। তাই বলে তিনি কিন্তু প্রচলিত ধর্ম ও তার অবক্ষয়ী আচারসমূহকে কখনও বড় করে দেখাননি। বরং তাদের দুরন্ত ব্যঙ্গে বিধ্বস্ত করেছেন। প্রসঙ্গত 'থ্রি লিট্‌ল্‌ হার্মিট'য়ের কথা বলা যায়। ধর্ম প্রচারকের অহং তিনটি তথাকথিত 'অধার্মিক' মানুষের অলৌকিক সরলতার কাছে কতটা তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।

এমন দুটি বিপ্রতীপ বিশ্ব পাশাপাশি রেখে তলস্তয় পাঠককে আহ্বান করেন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে। এই উভয় কোটির বাইরে রয়েছে তলস্তয়ের মহত্তম রচনা 'সংগ্রাম ও শান্তি'। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সঞ্চরমান মানুষের সুখদুঃখের আলেখ্য এ উপন্যাসটি। এখানেও তলস্তয় দেখিয়েছেন নেপোলিয়ানের মতো দুর্ধর্ষ ব্যক্তিও ইতিহাসের নিয়ামক নন। ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে চলে পিয়ের, আন্দ্রেই, নাতাশা এবং আরও অসংখ্য সাধারণ মানুষ। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ভালোবাসাগুলোই চিরকাল বেঁচে থাকে।

তলস্তয়ের মধ্যে এক প্রচণ্ড স্ব-বিরোধিতার সন্ধান পেয়েছিলেন লেনিন। তলস্তয়ের দর্শনের মধ্যে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য কম নেই। কিন্তু এটাই তো স্বাভাবিক! যে মানুষ দীর্ঘদিন ধরে চিন্তা করে এসেছেন, দেশের মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে আদ্যন্ত সুগভীরভাবে জড়িয়ে আছেন, তার যাবতীয় উত্থান-পতনের মধ্যে নিজের মতো করে নিজেকে নিক্ষেপ করতে চেয়েছেন, তাঁর মধ্যে কিছু স্ব-বিরোধিতা

আসা স্বাভাবিক। উনিশ শতকে রাশিয়ার সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন যথার্থই বজ্রগর্ভ ছিল। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে যে ঐতিহাসিক বিপ্লব ঘটেছিল, তার প্রস্তুতি হিসেবে পুরো বিগত শতকটি অস্থির থাকতে বাধ্য হয়েছিল। তাই যুযুধান শক্তিসমূহের মধ্যে বিভিন্ন বিন্যাস ঘটছিল। তলস্তয়ের নিপুণ পর্যবেক্ষণ এসব বিন্যাসের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবনে তৎপর ছিল। এ প্রসঙ্গে লেনিনের সিদ্ধান্ত স্মরণীয় : একজন মহান শিল্পী তাঁর রচনাবলীতে 'বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর অন্তত কয়েকটি দিককেও প্রতিফলিত করবেন।' তলস্তয় অবশ্যই প্রতিফলিত করেছেন এবং তা করেছেন সুগভীর প্রত্যয় ও ক্ষমতার সঙ্গে। বিপ্লব সরল পথে আসে না। বহু বিষয়ের জটিল টানাপোড়েনের ভেতর দিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন হলো বিপ্লব। যথার্থ মহৎ শিল্পী না হলে তার সমগ্র আলো-আঁধারি উপযুক্ত ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন না। অভ্রান্ত ক্রান্তদর্শী মনীষীর মতো তলস্তয় বুঝেছিলেন কালের গতি কোন্ দিকে ঘুরছে, রথের রশি কাদের হাতে। তাই তিনি নিজের জীবনে আচরণের মধ্য দিয়ে বার বার সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন কোন্ শিবিরের আশ্রয় নেওয়া উচিত। এই ঔচিত্য কোনও উপদেশের আকারে আসেনি। জীবনের আশ্চর্য প্রতিফলন পাঠককে এ বিষয়ে আপনিই সচেতন করে তুলেছে। ১৮৮৬ সালেই তিনি একটি প্রবন্ধ লিখলেন : 'হোয়াট মাস্ট বি ডান, দেন?'—'তাহলে কি করতে হবে?' সারাদিন একজন মানুষকে কেমন করে কাটাতে হবে, তার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। প্রাতরাশের আগেকার কাজগুলো এমন হবে যাতে মাথার ঘাম পায়ে পড়ে এবং তা আক্ষরিক অর্থে। এই পর্যায়ের কাজ হলো লাঙল চালানো, রাখালি, কুয়ো-খোঁড়া, বাড়ি তৈরি প্রভৃতি। মধ্যাহ্ন ভোজের আগে করতে হবে লাঙল ও কব্জির জোর বাড়ানোর কাজ অর্থাৎ জামাজুতো সেলাই করা, বাসন তৈরি এবং অনুরূপ অন্য কিছু হাতের কাজ। মধ্যাহ্ন থেকে সন্ধ্যার মধ্যে করা উচিত বুদ্ধিবৃত্তির চাষ, কল্পনার যাতে বিকাশ ঘটতে পারে এমন শিল্প ও বিজ্ঞানের অনুশীলন। সন্ধ্যাটি উৎসর্গিত হবে সামাজিক মেলামেশার জন্য।

শুধুমাত্র উপদেশ বা অনুশাসনের মধ্যে তলস্তয় নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। নিজের জীবনে আচরণে তাকে মূর্ত করে তুলতে চেয়েছেন তিনি। প্রাত্যহিক কায়িক শ্রমের সাহায্যে তিনি প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ ও মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটাতে আগ্রহী হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে সমকালীন ঔপন্যাসিক দাদিলিয়েভ্স্কিকে তলস্তয় বলেছিলেন, 'ঋতু অনুযায়ী প্রতিদিন আমি হয় নিজের হাতে চাষ করি ও বীজ বুনি অথবা করাত দিয়ে কাঠ চিরি বা কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটি। কখনো কাস্তে বা নিড়ানির কাজ, আবার কখনো বাসন তৈরির কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখি। তুমি ভাবতে পারবে না কী আনন্দ পাওয়া যায় নিজের হাতে চাষ করলে...কি করে যে ঘণ্টাগুলো কাজের ভেতর দিয়ে কেটে যায় তা টেরই পাওয়া যায় না। ফলে, প্রতিটি শিরায় রক্ত চলাচলের মধ্যে খুশির

স্রোত অনুভব করা যায়। মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়ে আসে। নিজেকে হাল্কা মনে হয়। খিদেও পায় প্রচুর। ঘুমটি হয় জব্বর।'

তলস্তয়ের এ নির্দেশ সকলের পক্ষে মেনে চলা অবশ্যই সহজ নয়। তলস্তয় কিন্তু যথার্থই বিশ্বাস করতেন এ পথেই মানুষের সামাজিক ও আত্মিক মুক্তি ঘটবে। তাছাড়া, তিনি আরও বিশ্বাস করতেন উপনিষদেব সেই মহৎ বাণী—(অবশ্য উপনিষদ তিনি পড়েছিলেন কি না জানি না) 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিতা'---'ত্যাগের দ্বারা ভোগ করো।' ত্যাগের অভীপ্সা তাঁকে এমন তাড়া করে ফিরেছিল যে একসময় তিনি ভেবেছিলেন তাঁর গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব তিনি বিলিয়ে দেবেন। এ নিয়েও তাঁর পরিবারে কম অশান্তি ছিল না। লিখে রোজগার করাকেও তিনি আর পছন্দ করতেন না। এমন কি, 'রেজারেকশন'-য়ের মতো মহৎ উপন্যাসটিকেও তিনি প্রকাশ কবতে চাননি। দুখোরবদের সাহায্য করবার জন্য শেষ পর্যন্ত বইটি ছাপাতে রাজী হয়েছিলেন বাইশ হাজার রুবলের বিনিময়ে। পুরো টাকাটাই তিনি দান করে দিয়েছিলেন।

এই হলেন তলস্তয়। এ যুগের মহত্তম লেখকদের একজন। ত্যাগ ও শ্রমের গুণগানে তিনি অহরহ সোচ্চার। রাশিয়ার পরিবর্তনে এ দুটি গুণেব প্রয়োজন ছিল সবচাইতে বেশি।

এবং বর্তমান বিশ্বের পরিবর্তনের জন্যও বটে।

—বিষ্ণু বসু

দুই হুজার *

Two Hussars

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, যখন কোনও রেলপথ বা রাজপথ ছিল না, গ্যাস বা অনুরূপ কোনও আলো ছিল না, স্প্রিংযের গদি-আঁটা সোফা বা বার্নিশবিহীন আসবাবপত্র ছিল না, যখন চোখে এক চশমা পরা মোহমুক্ত যুবকের দল ছিল না, আজকের মতো দলে দলে 'নিপুণিকা চতুরিকার দল' গজিয়ে ওঠেনি—সেই নির্দোষ যুগে যখন মস্কো থেকে সেন্ট পিতার্সবার্গ যেতে হলে গরুর গাড়ি বা ঘোড়ার গাড়িতে একগাদা রান্না-করা খাবাব বোঝাই করে ভাজা কাটলেট, গরম 'বুব্লিকি' আর ভালদাই গাড়িব ঘণ্টার উপর ভরসা করে আট দিন আট রাত ধুলো-ওড়া বা কাদা-মাখা রাস্তায় গাড়ি চালাতে হত—যখন হেমন্তের দীর্ঘ সন্ধ্যাগুলোতে মোমবাতির ধোঁযাটে আলো একটা পরিবারেব সমবেত বিশ বা ত্রিশজন সদস্যের উপর ছড়িয়ে পড়ত, যখন বল-রুমের সুদৃশ্য দীপাধারগুলো মোম ও চর্বির বাতিতে পূর্ণ থাকত এবং আসবাবপত্র থাকত সুসমঞ্জস্যভাবে সাজানো, আর আমাদের পিতৃপুরুষদের যৌবনের পরিচয বহন করত তাঁদের মুখে বলিরেখা ও মাথায় পাকা চুলের অভাব তো বটেই, আর সেই সঙ্গে মহিলাদের কেন্দ্র করে তাঁদের দ্বৈত-যুদ্ধ এবং আকস্মিকভাবে বা অন্য কারণে পড়ে-যাওয়া রুমাল কুড়িয়ে দেবার জন্য ঘরেব এক কোণ থেকে অন্য কোণে তাঁদের লম্ফ-ঝম্পের তৎপরতা; যখন আমাদের মায়েরা মস্ত বড় আস্তিনওয়ালা উঁচু-কোমর গাউন পরত আর ভাগ্যের দোহাই দিয়েই সব পারিবারিক সমস্যার সমাধান করত; যখন 'মনোহারিণী চতুরিকা'রা দিনের আলো থেকে দূরে সরে থাকত—ইঁটের তৈরি বাড়িঘর, মার্টিনিস্ট, এবং তুগেন্‌বুন্দদের সেই নির্দোষ যুগে, মিলোরাদোভিচ, দেভিদভ ও পুসকিনদেব সেই কালে সরকারী কর্মকেন্দ্র কে-শহরে ধনী ভূস্বামীদের এক জমায়েত হয়েছে, এবং অভিজাতদের চূড়ান্ত প্রতিনিধি-নির্বাচন সবে সমাপ্ত হয়েছে।

১

"কি আছে, দরকার হলে আমি সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট ঘরটাতেই থাকব," যুবক অফিসারটি কথাগুলি বলল। তার পরনে লম্বা কোট, মাথায় সৈনিকের টুপি। এইমাত্র স্লেজ-গাড়ি থেকে নেমে কে-শহরের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য সুন্দর সরাইখানায় সে ঢুকেছে।

* অশ্বারোহী সৈনিক

"মহামান্য প্রভু, বড় বেশি লোক জমায়েত হয়েছে, ব্যাপারটা একটু অসাধারণ," ছোকরা চাকরটা কথাগুলি বলল। অফিসারের চাকরের কাছ থেকে সে ইতিমধ্যেই জেনে নিয়েছে যে এই লোকটিই কাউন্ট তুরবিন, আর সেইজন্যই তাকে "মহামান্য প্রভু" বলে সম্বোধন করেছে। "আফ্রেমোভস্কায়া-জমিদারীর কর্ত্রীঠাকরুণ আজ সন্ধ্যায়ই মেয়েদের নিয়ে চলে যাবেন বলে কথা দিয়েছেন, কাজেই আপনি যদি চান তো আপনাকে এগারো নম্বর ঘরে তুলতে পারি," কাউন্টের আগে আগে দালানের সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নামতে নামতে সারাক্ষণ তাঁর দিকে চোখ রেখে সে বলল।

সর্বসাধারণের ঘরটায় জার আলেকজান্দারের একখানি কাল-জীর্ণ পূর্ণাবয়ব ছবির নিচেকার ছোট টেবিলটায় বসে জনাকয় লোক শ্যাম্পেনে চুমুক দিচ্ছিল। দেখলেই বোঝা যায় তারা স্বাধীন ভদ্রসমাজের লোক; আর তাদের কাছেই ছিল গাঢ় নীল আলখাল্লা পরা একদল ভ্রাম্যমান বণিক।

মস্ত বড় ধূসর রঙের কুকুর ব্লুইশারকে ডেকে নিয়ে কাউন্ট ঘরের মধ্যে ঢুকে কোটের কলারে জমাট হিম-কণা গলবার আগেই সেটাকে ছুঁড়ে দিলো। তারপর ভদ্‌কার অর্ডার দিয়ে নীল সাটিনের জামা পরেই টেবিলে বসে ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিলো; তারাও সঙ্গে সঙ্গে কাউন্টের সুঠাম দেহ ও খোলা মুখ দেখে আকৃষ্ট হয়ে তার কাছে এক গ্লাস শ্যাম্পেন খাবার প্রস্তাব করল। কাউন্ট ভদ্‌কার গ্লাসটা সরিয়ে রেখে নতুন পরিচিত জনদের আপ্যায়নের জন্য আর একটা বোতলের অর্ডার দিলো। ঠিক সেই সময় একপাত্র পানীয়ের জন্য টাকা চাইতে স্লেজ-চালকটি এসে হাজির হলো।

কাউন্ট চেঁচিয়ে বলল, "সাশ্‌কা। এটা ওকে দিয়ে দে!"

চালকটি সাশ্‌কার সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে একটু পরেই তার খোলা মুঠোয় মুদ্রাটা নিয়ে ফিরে এল।

"দেখুন মহামান্য প্রভু, আপনার জন্য আমি এত খাটলাম, আপনিও আধ রুবল দেবেন কথা দিয়েছিলেন, আর ও এখন দিচ্ছে মাত্র সিকি রুবল!"

"সাশ্‌কা, ওকে এক রুবল দিয়ে দে!"

সাশ্‌কা বেজার মুখে চালকের বুটজোড়ার দিকে তাকাল।

খাদে গলা নামিয়ে সে বলল, "ওর পক্ষে এই যথেষ্ট। তাছাড়া, আমার কাছে আর টাকা নেই।"

কাউন্ট থলি থেকে দু'খানা পাঁচ রুবলের নোট (থলির শেষ সম্বল) বের করে একখানা স্লেজ-চালককে দিলো। সেও তার হাত চুম্বন করে চলে গেল।

"আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়েছি!" কাউন্ট বলল। "আমার শেষ পাঁচটি রুবল।"

"আপনি একজন সত্যিকারের 'হুজার'।" ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন সহাস্যে বলে উঠল। তার গোঁফ, তার কণ্ঠস্বর, তার দুই পায়ের একটা বিশেষ চলার ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায় সে একজন অবসরপ্রাপ্ত অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার। "আপনি কি এখানে অনেক দিন থাকবেন কাউন্ট?"

"কিছু টাকার দরকার না হলে মোটেই থাকতাম না। এই বাজে সরাইখানাটায় আবার একটা ঘরও নেই। উচ্ছন্নে যাক!"

অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার বলল, "ইচ্ছা করলে আপনি আমার সঙ্গে আমার ঘরে থাকতে পারেন কাউন্ট। আমি সাত নম্বরে আছি। আমার সঙ্গে থাকতে কোনও আপত্তি না হলে এখানে তিন দিন থাকতে পারেন। আজ রাতে সমাবেশ-অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা মার্শাল একটি বল-নাচের আয়োজন কবেছেন। আপনি তাতে যোগ দিলে তিনি খুশি হবেন।"

দলের অপর একটি সুন্দর যুবক বলে উঠল, "সত্যি কাউন্ট, থেকে যান। আপনার তাড়া কিসের? তাছাড়া, এই সব নির্বাচন তো প্রতি তিন বছরে মাত্র একবারই হয়ে থাকে। অন্তত আমাদের যুবতী মহিলাদের তো একবার চোখের দেখাও দেখতে পাবেন কাউন্ট।"

কাউন্ট উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "সাশা, আমার জামা-কাপড় বের করে দে। আমি স্নানের ঘরে চললাম। তারপর দেখা যাক—হয় তো মার্শালের আসরে একবার ঢুঁ মারব।"

একটি পরিচারককে ডেকে কি যেন বলতেই মুখ টিপে হেসে সে জবাব দিলো, "সব কিছুই সম্ভব মহামান্য প্রভু।" তারপর সে বেরিয়ে গেল।

বাইরের দালান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে কাউন্ট বলল, "তাহলে আমার পোর্টম্যান্টোটা আপনার ঘরেই রাখতে বলছি।"

দরজার কাছে ছুটে গিয়ে অফিসারটি বলল, "এটাকে আমি পরম অনুগ্রহ বলেই মনে করব। সাত নম্বর ঘর, ভুলে যাবেন না।"

কাউন্টের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই অফিসারটি টেবিলে ফিরে গিয়ে নিজের চেয়ারটিকে কেবানির আরও কাছে টেনে নিয়ে সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল :

"ঠিক সেই লোক।"

"বলেন কি!"

"আমি বলছি, ঠিক সে—দ্বৈত-যুদ্ধের জন্য বিখ্যাত সেই হুজার। নাম তুরবিন, সকলেই তাকে চেনে। বাজি ধরে বলছি সে আমাকে চিনতে পেরেছে—নির্ঘাৎ চিনেছে। লেবেদিয়ানে তিন সপ্তাহব্যাপী যে মদ্যপানোৎসব হয়েছিল তাতে সে আর আমি গিয়েছিলাম। নতুন ঘোড়া সংগ্রহের ব্যাপারে আমাকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটেছিল—তার জন্য দায়ী ছিলাম সে আর আমি, সেই জন্যই সে আমাকে না চিনবার ভান করেছে। ভারি ভাল লোক, না?"

সুদর্শন যুবকটি বলল, "সত্যি ভাল লোক। আর কী চমৎকার আদবকায়দা! উনি যে ও রকমটা ছিলেন তা কেউ ভাবতেই পারবে না! আর কত তাড়াতাড়ি আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তাকে তো পঁচিশের বেশি বলে মনে হয় না, তাই নয় কি?"

"দেখে মনে হয় না, কিন্তু আসলে বেশি। কিন্তু তার সমঝদার হতে হলে তাকে ঠিক ঠিক জানা দরকার। মাদাম মিগুনোভাকে নিয়ে কে হাওয়া হয়েছিল? সে। আর সাবলিনকে কে খুন করেছিল? আর মাৎনেভকে দুই পা ধরে জানালা দিয়ে নিচে ফেলে দিয়েছিল কে? ডিউক নেস্তেরভের কাছ থেকে তিন শ' হাজার কে জিতে নিয়েছিল? লোকটা যে কত বড় উড়নচণ্ডী তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। একটা জুয়াড়ি, দ্বন্দ্ব-বিশারদ, নারীহরণকারী। কিন্তু মনে-প্রাণে সে একজন 'হুজার', সাচ্চা 'হুজার'। লোকে আমাদের নিন্দা করতেই ভালবাসে, কিন্তু একজন সাচ্চা হুজার যে কী তা বোঝে না! আহা, কি দিনই ছিল!"

তারপর অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারটি লেবেদিযানে কাউন্টের সঙ্গে তার দুষ্কর্মের এমন এক ফিরিস্তি দিতে লাগল যা কখনও ঘটেনি এবং কোনও দিন ঘটতেও পারে না। ঘটতে পারে না তার প্রথম কারণ, এর আগে সে কখনও কাউন্টকে চোখেই দেখেনি; কাউন্ট সেনাবাহিনীতে ঢুকবার দু' বছর আগেই সে অবসর নিয়েছিল; আর দ্বিতীয় কারণ, অফিসারটি কোনও কালে অশ্বারোহী বাহিনীতেই ছিল না; চার বছর সে ছিল বেলেভ্স্কি রেজিমেন্টের একজন নিচের দিকের শিক্ষানবীশ এবং ধ্বজাধারী সৈনিক হিসাবে কমিশন পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে পদত্যাগ করেছিল। তবে দশ বছর আগে উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি লাভের পর সে সত্যি সত্যি লেবেদিযানে গিয়েছিল এবং সেখানে কয়েকজন অশ্বারোহণ-শিক্ষক অফিসারের দলে ভিড়ে সাত শ' রুবল ফুঁকে দিয়েছিল, আর বর্শাধারী বাহিনীতে যোগ দেবার বাসনায় কমলা রঙের আস্তিনওয়ালা একটা 'উহ্লান' (অশ্বারোহী বাহিনীর বর্শাধারী সৈনিক) ইউনিফর্মের অর্ডার পর্যন্ত দিয়েছিল। অশ্বারোহী বাহিনীতে যোগ দেবার বাসনা তার মনে এতই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে লেবেদিয়ানে যে তিন সপ্তাহ সময় সে অশ্বারোহণ-শিক্ষক অফিসারদের সঙ্গে কাটিয়েছিল সেটাই তার সারা জীবনের সব চাইতে সুখের দিন হয়ে রয়েছে, এবং মনে মনে সেই বাসনাটাকেই প্রথমে বাস্তবে ও তারপর স্মৃতিতে রূপান্তরিত করেছে; ফলে সে নিজেই একান্তভাবে বিশ্বাস করে বসেছে যে সে অশ্বারোহী বাহিনীর একজন অফিসার; অবশ্য তার জন্য সততা ও সহৃদয়তার বিচারে একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক হওয়ায় তার কোনও বাধা হয়নি।

"আহা, সত্যি, অশ্বারোহী বাহিনীতে যারা কাজ করেনি তারা আমাদের ঠিকমতো বুঝতেই পারে না।" চেয়ারটাকে ঠেলে দিয়ে নিচের চোয়ালটাকে বেঁকা করে সে গম্ভীর গলায় বলতে লাগল : "এমন দিন ছিল যখন সৈন্যদলের প্রধান হিসাবে আমি ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছি, আর আমার সে ঘোড়া তো ঘোড়া নয় যেন শয়তান; আমিও তেমনি শয়তান, সেই ঘোড়াতেই সওয়ার হয়েছি, আর ওদিক থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে এলেন স্কোয়াড্রন-কম্যান্ডার আমাদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করতে। তিনি বললেন, 'ধ্বজাধারী, তোমাকে ছাড়া কিছুই চলে না। দয়া করে কুচকাওয়াজ শুরু করে দাও।' 'ঠিক আছে স্যার', আমি বললাম, আর কথার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শুরু হয়ে গেল।

ধুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে আমার গোঁফধারী সাহসী সৈন্যদের নির্দেশ দিলাম, আর শুরু হলো যাত্রা। আহা সে যে কী দিনই ছিল!"

কাউন্ট মুখ লাল করে চুল ভিজিয়ে স্নানের ঘব থেকে বেরিয়ে সোজা সাত নম্বর ঘবে চলে গেল। অফিসাবটি ড্রেসিং গাউন পরে দাঁতের ফাঁকে পাইপটা চেপে ধরে ভয়মিশ্রিত আনন্দের সঙ্গে তার সৌভাগ্যের কথাই ভাবছিল—অর্থাৎ বিখ্যাত তুরবিনের সঙ্গে এক ঘবে থাকবার সৌভাগ্য। "কিন্তু," তার চিন্তা হলো, "তাব মাথায় যদি হঠাৎ খেয়াল চাপে যে আমাকে উলঙ্গ করে শহরের বাইবে নিয়ে বরফের মধ্যে কবর দিয়ে দেবে, অথবা আমার সারা গায়ে আলকাতরা মাখিয়ে দেবে, অথবা শুধু.. কিন্তু না, একজন সহকর্মীর সঙ্গে সে ও রকম ব্যবহার করবে না," এই ভেবে সে নিজেকে সান্ত্বনা দিলো।

"সাশা! ব্লুইশারকে খাইয়ে দে!" কাউন্ট চেঁচিয়ে বলল।

এক গ্লাস ভদ্কা গিলে সাশার পা টলতে শুরু করেছে। সেইভাবেই সে হাজির হলো।

"তোর আর তর সয়নি! এর মধ্যেই মদ গিলেছিস বদমাশ! ব্লুইশারকে খাইয়ে দে!"

"না খেলে ওটা মরবে না: দেখুন না, কেমন চিকন-চাকনটি হয়েছে", কুকুরটাব পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে সাশা বলল।

"দয়া করে বাজে কথা রাখো। ওকে খাইয়ে দাও।"

"আপনার যত মাথা ব্যথা কুকুরটার জন্য, মানুষটা এক পাত্র খেলেই খেঁকিয়ে ওঠেন।"

"এই মারব কিন্তু!" কাউন্ট এমনভাবে চেঁচিয়ে উঠল যে জানালার কাঁচ ঝনঝনিয়ে উঠল, আর অফিসাবটিও ভয় পেয়ে গেল।

সাশা বলল, "আপনার সাশা আজ কিছু খেয়েছে কিনা তাও তো জিজ্ঞেস করতে পারতেন। মানুষ অপেক্ষা কুকুরের জন্যই যদি আপনার বেশি ভাবনা হয়ে থাকে, তাহলে আসুন, আমাকে মারুন।" ঠিক তখনই সাশার নাকের উপর এমন একটা আঘাত এসে পড়ল যে মাটিতে পড়ে গিয়ে তার মাথাটা দেয়ালে ঠুকে গেল; পরক্ষণেই হাত দিয়ে নাকটা চেপে ধরে সে উঠে দাঁড়াল; ছুটে দরজা দিয়ে বাইরে গিয়ে সে দালানে রাখা একটা ট্রাংকের উপর উপুড় হয়ে পড়ল।

কুকুরটা তখন নিজেব গা চাটছিল। এক হাতে সেটার পিঠ আঁচড়াতে আঁচড়াতে আর অন্য হাতে রক্তাক্ত নাকটা মুছতে মুছতে সে বলতে লাগল, "উনি আমার দাঁত উপড়ে ফেলেছেন; জানিস ব্লুইশার, উনি আমার দাঁত উপড়ে ফেলেছেন; তবু তিনি যে কাউন্ট সেই কাউন্ট, আর তার জন্য আমাকে আগুনে পুড়তে হবে, জলে ভিজতে হবে; এটাই বিধান, কারণ, জানিস তো ব্লুইশার, তিনি আমার কাউন্ট। তোর কি ক্ষিধে পেয়েছে ব্লুইশার?"

কয়েক মিনিট সেখানে পড়ে থাকবার পর সে উঠে দাঁড়াল, কুকুরটাকে খাওয়াল, এবং তাবপব প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় কাউন্টের সেবা করতে, তাকে চা দিতে চলে গেল।

কাউন্ট তখন খাটের রানাব উপর পা তুলে দিয়ে অফিসারের বিছানায় শুয়ে ছিল, আব অফিসারটি বিনীতভাবে তাকে বলছিল, "আমি এটাকে অপমানকর বলে মনে করব। বলতে গেলে আমিও একজন প্রাক্তন সৈনিক ও সহকর্মী। অন্য কারও কাছ থেকে আপনাকে টাকা নিতে দেবার আগে আমি নিজেই আপনাকে দু'শ' রুবল আনন্দের সঙ্গে দেব। এখনই অতটা আমার কাছে নেই—শুধু এক শ' আছে—কিন্তু আজকের দিনের মধ্যেই বাকিটা যোগাড় করব। নইলে আমি কিন্তু এটাকে অপমানজনক বলে মনে করব কাউন্ট।"

তাদের মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠতে যাচ্ছে সেটা অনুধাবন করে অফিসারের পিঠ চাপড়ে কাউন্ট বলল, "ধন্যবাদ ভাই, ধন্যবাদ। আচ্ছা, তাই যদি হয় তাহলে তো বল-নাচে যেতেই হবে। কিন্তু আপাতত কি করা যায়? এ শহরের হাল-চাল একটু বলুন তো : এখানে সুন্দরী মেয়ে আছে তো? অথবা লম্পট? বা তাসারু?"

অফিসাবটি জানাল, বলের আসরে এক দঙ্গল সুন্দরী হাজির হবে, শহরের সব চাইতে বড় লম্পট হচ্ছে নব-নির্বাচিত পুলিশ-ক্যাপ্টেন কল্‌ক‌ভ, তবে সে অশ্বারোহী সৈনিকদের মতো উচ্ছৃঙ্খল নয়, লোকটা ভাল; তাছাড়া নির্বাচন শুরু হবার সময় থেকেই ইলিউস্কার বেদের দল এখানে গানের আসর বসিয়েছে, স্টিয়েশাও বাজাচ্ছে; এবং প্রত্যেকেই স্থির করেছে যে বল-নাচের পরে বেদেদের আসরে গিয়ে গান শুনবে।

সে আরও বলল, "তাস-খেলাও এখানে জোর তালেই চলে। ধনী আগন্তুক লুখনভ তো সারাক্ষণই খেলেন, আর আট নম্বব ঘরের উহ্‌লান বেজিমেন্টেব পতাকাবাহী ইল্‌য়িন তো মোটা রকম হেরেছেন। এর মধ্যেই তাঁবা খেলা শুরু করে দিয়েছেন। প্রতি সন্ধ্যায়ই তাঁরা খেলেন। জানেন কাউন্ট, আপনি বিশ্বাস করবেন না এই ইল্‌য়িন কত ভাল ছেলে; নীচতার কোনও বালাই নেই,—এমন কি গা থেকে খুলে শার্টটা পর্যন্ত আপনাকে দিয়ে দিতে পারে।"

কাউন্ট বলল, "তাহলে চলুন, তাকে দেখেই আসি। এখানকার সকলের সঙ্গেই পরিচয় হওয়া দরকার।"

"চলুন, চলুন। আপনাকে দেখলে তারা খুবই খুশি হবে।"

২

উহ্‌লানের পতাকাবাহী ইল্‌য়িনের এইমাত্র ঘুম ভেঙেছে। গত রাতে সে তাসের টেবিলে বসেছিল আটটায় এবং সকাল এগারোটা পর্যন্ত একটানা পনেরো ঘণ্টা খেলেছে। অনেক টাকা সে হেরেছে, কিন্তু ঠিক কত টাকা তা সে নিজেও বলতে

পাববে না, কারণ তার সঙ্গে নিজস্ব টাকা ছিল তিন হাজার আর সেনাবাহিনীর দরুন ছিল পনেরো হাজার। দুটো টাকা সে অনেক আগেই একত্র মিশিয়ে ফেলেছিল, কাজেই ইতিমধ্যেই সে যে সরকারী টাকাও ভেঙে বসেছে এই আশংকা পাছে প্রমাণ হয়ে পড়ে তাই টাকা কড়ি গুণতেও ভয় পাচ্ছে। দুপুর হতে না হতেই সে গভীর স্বপ্নহীন ঘুমে ঢলে পড়েছে, যে ঘুম আসে একমাত্র যুবকদেব চোখে আর তাও তাসের বাজিতে অনেকটা হাববাব পবে। সন্ধ্যা ছ'টায়—ঠিক যে সময়ে কাউন্ট তুরবিন সবাইখানায় হাজিব হয়েছে—ঘুম ভাঙতেই তাব চোখে পড়ল মেঝেয় ছড়িয়ে রয়েছে তাস আব চক, ঘরেব মাঝখানে বয়েছে বিবর্ণ টেবিল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল রাতের খেলার বিভীষিকা, বিশেষ করে তার শেষ তাসটা—একটা গোলাম—যাব ফলে সে হেরেছিল পাঁচশ' রুবল, কিন্তু পরিস্থিতিব বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেবার অনিচ্ছায় সে বালিশের তলা থেকে সব টাকা বেব করে গুণতে বসল। যে সব ব্যাংক-নোট হাতে হাতে ঘুরেছে সেগুলিকে চিনতেই খেলার সম্পূর্ণ ছবিটা তাব মনে পড়ে গেল। তাব নিজেব তিন হাজার তো গেছেই, সরকারী টাকাবও আড়াই হাজাব উধাও।

পর পর চার রাত সে খেলেছে।

সে আসছে মস্কো থেকে। সেখানেই রেজিমেন্টেব টাকাটা তাকে দেওয়া হয়েছিল। স্পোটিং-স্টেশনের ওভারসিয়ার তাকে এই ছুতো ধবে কে-শহরে আটকে দিয়েছিল যে বদলি ঘোড়া পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু আসলে সরাইওয়ালার সঙ্গে একটা গোপন চুক্তিই হয়েছিল যে সব যাত্রীকেই একটা রাত এখানে আটকে বাখতে হবে। হাসিখুশি উহ্লান যুবকটিকে তাব বাবা-মা মস্কোতে তিন হাজার রুবল উপহাব দিয়েছিল পোশাক-পবিচ্ছদ বানাবাব জন্য। আব সেও নির্বাচন-উৎসব উপলক্ষে এখানে প্রচুর আমোদ-আহ্লাদ পাবার আশায় কে-শহরে কয়েক দিন কাটাতে পারায় খুবই খুশি হয়েছিল। তার পবিচিত একজন গ্রাম্য ভদ্রলোক এই অঞ্চলেই সপবিবাবে বাস কবত। তার সঙ্গে ও তার মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে যাবাব জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এমন সময় অশ্বারোহী বাহিনীব অফিসারটি সেখানে হাজির হয়ে তার সঙ্গে আলাপ শুরু করে দিলো। আর সেদিন সন্ধ্যাযই বসবার ঘরে সে তাব বন্ধু লুখনভ ও অপর কয়েকজন তাসাড়ুর সঙ্গে অফিসারটিব পরিচয় করিয়ে দিলো। অবশ্য কোনও খারাপ উদ্দেশ্য তার ছিল না। তখন থেকেই উহ্লান তাসেব টেবিলে বসতে শুরু করল। গ্রাম্য ভদ্রলোকের কথা সে বেমালুম ভুলে গেল; এমন কি ঘোড়ার জন্য তাগাদা দিতেও ভুলে গেল; আসলে পর পর চারদিন সে ঘর থেকে বেরলই না।

সাজগোজ করে প্রাতরাশ সেরে সে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ভাবল, একটু বেড়াতে গেলে হয় তো তাসের দুশ্চিন্তা মন থেকে দূর হয়ে যাবে। তাই সে বড় কোটটা চাপিয়ে বেরিয়ে গেল। লাল ছাদওয়ালা সাদা বাড়িগুলোর পিছনে সূর্য অস্ত গেছে, গোধূলি নেমে এসেছে। বাতাসে গরম ভাব। ময়লা রাস্তার উপরে ভেজা বরফ

ধীরে ধীরে জমছে। সারাটা দিন ঘুমিয়ে কাটিয়েছে— এই চিন্তা তার মনটাকে গভীর বিষাদে ভরে দিলো।

সে ভাবতে লাগল, "এই হারানো দিনটি আর কোনও দিন ফিরে আসবে না। আমার যৌবনকে আমি উড়িয়ে দিয়েছি।" নিজেকেই সে কথাগুলি বলল। সে যে সত্যি ভাবল যে তার যৌবনকে উড়িয়ে দিয়েছে তা কিন্তু নয়, আসলে এ রকম কোনও চিন্তাই তার মনে আসেনি, —শুধু কথাগুলো হঠাৎ তার মনে এল বলেই যেন বলে ফেলল।

সে আবার ভাবতে লাগল, "এখন আমি কি করি? কারও কাছ থেকে টাকাটা ধার করে চলে যাব?" একটি যুবতী তার পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। অকারণেই তার মনে হলো, "কেমন বোকা-বোকা দেখতে মহিলাটি।..টাকা ধার করতে পারি এ রকম কেউ তো নেই। আমার যৌবনকে উড়িয়ে দিয়েছি।" এক সারি দোকানের দিকে সে এগিয়ে গেল। শেয়ালের চামড়ার লাইনিং-দেওয়া কোট গায়ে একজন দোকানী একটি দরজায় দাঁড়িয়ে খদ্দেরদের ডাকাডাকি করছিল। "ওই আট ফোঁটার হাত থেকে যদি রেহাই না পেতাম তাহলে হয় তো হারটা পুষিয়ে নিতে পারতাম।" তার পিছন পিছন আসতে আসতে একটা বুড়ি ভিখারিণী ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগল। "ধার করতে পারি এমন তো কেউ নেই।" ভালুকের চামড়ার কোট-পরা একটা লোক গাড়ি চালিয়ে চলে গেল; একটি পাহারাওলা কর্তব্যরত। "হৈ-চৈ পড়ে যায় এমন কী আমি করতে পারি? লোকগুলোকে গুলি করব? বড়ই একঘেয়ে ব্যাপার। আমার যৌবনকে উড়িয়ে দিয়েছি। কী সুন্দর পোশাক ঝুলিয়ে রেখেছে! আঃ, তিন-কুকুরের স্লেজ-গাড়িতে ছুটে যেতে কী মজা! সরাইখানায় ফিরে যাব। লুখনভ এখনই আসবে আর আমরা খেলা শুরু করে দেব।"

ফিরে গিয়ে সে আবার টাকা-পয়সা গুণল। না, প্রথম বারে তার কোনও ভুল হয়নি; রেজিমেন্টের টাকার দু'হাজার পাঁচশ' রুবলের হদিশ মিলছে না। "প্রথম তাসেই পঁচিশ বাজি ধরব, তারপর দ্বিতীয় তাসে এক 'কর্নার', তারপর বাজির সাতগুণ, তারপর পনেরো, ত্রিশ, ষাট গুণ, তিন হাজার রুবল পর্যন্ত। তারপর ঐ পোশাকগুলো কিনে চলে যাব। কিন্তু ঐ বদমাশটা তো আমাকে জিততে দেবে না। আমার যৌবনকে উড়িয়ে দিয়েছি।"

উহলানের মনের মধ্যে এই সব ভাবনা চলা-ফেরা করছিল, এমন সময় লুখনভ ঘরে ঢুকল।

শক্ত নাকের উপর থেকে সোনার চশমাজোড়া খুলে ফুঁ করে একটা লাল সিল্কের রুমাল দিয়ে সেটাকে পালিশ করতে করতে লুখনভ জিজ্ঞাসা করল, "মিখাইলো ভাসিলিচ, আপনি কি অনেকক্ষণ উঠেছেন?"

"না, এইমাত্র উঠলাম। সুন্দর ঘুমিয়েছি।"

"একজন অশ্বারোহী সৈনিক এইমাত্র এসেছেন। তিনি জাভালশেভ্স্কির সঙ্গে আছেন। শুনেছেন কি?"

"না, আমি শুনিনি। আর সকলে কোথায়?"

"তারা প্রিয়াখিনের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। এখনই এসে পড়বে।"

সত্যি সত্যি, একটু পরেই সকলে হাজির হলো: লুখনভের সর্বক্ষণের সঙ্গী স্থানীয় সেনাবাহিনীর জনৈক অফিসার, মস্ত বড় বাঁকানো নাক, তামাটে চওড়া আর দৃঢ়বদ্ধ কালো চোখওয়ালা এক গ্রীক বণিক; মোটাসোটা একজন ভূস্বামী যে দিনের বেলায় একটা ভাটিখানা চালায় আর রাতের বেলায় আধ-রুবলের বাজি ধরে জুয়া খেলে।

সকলেই খেলা শুরু করতে ব্যগ্র, কিন্তু প্রধান খেলুড়েরা, বিশেষ করে লুখনভ, সে বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করল না: লুখনভ তো শান্তভাবে মস্কোর আইনশৃঙ্খলাহীনতার কথাই বলতে লাগল।

সে বলল, "ভেবে দেখুন! মস্কো আমাদের সবচাইতে বড় শহর, আমাদের রাজধানী, অথচ রাতের বেলায় দুর্বৃত্তরা ভূতের মতো সাজগোজ করে হুক হাতে নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, বোকা-সোকা ছোটলোকদের সন্ত্রস্ত করে তোলে, পথচারীদের সর্বস্ব লুঠ করে, অথচ তার কোনওই প্রতিকার হয় না। পুলিশ কি ভেবেছে?—সেটাই আমি জানতে চাই।"

উহ্লান মনোযোগসহকারে আইনহীনতার বিবরণ শুনছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে উঠে দাঁড়াল এবং শান্তভাবে তাস নিয়ে আসতে বলল। মোটা ভূস্বামীটিই তাদের মনের কথা প্রথম প্রকাশ করল : "আচ্ছা ভদ্রমহোদয়গণ, এই সুবর্ণ সময় আমরা নষ্ট করব কেন? আসুন, কাজ শুরু করা যাক?"

গ্রীক ভদ্রলোক বলল, "কাল রাতে যে টাকা আপনি বাড়ি নিয়ে গেছেন, তারপর আপনার এ ইচ্ছার অর্থ ভালই বুঝতে পারছি।"

স্থানীয় বাহিনীর অফিসারটি বলল, "কিন্তু সময় তো সত্যি হয়েছে।"

ইল্যিন লুখনভের দিকে তাকাল। লুখনভও সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে লম্বা নখরওয়ালা ভূতের মুখোশধারী দুর্বৃত্তদের কথাই বলতে লাগল।

উহ্লান জিজ্ঞাসা করল, "তাস বেঁটে দেব কি?"

"খুবই আগে হয়ে যাচ্ছে নাকি?"

কোনও কারণে মুখ লাল করে উহ্লান ডাকল, "বেলভ! আমাকে কিছু খেতে দাও। ভদ্রমহোদয়গণ, আমার এখনও খাওয়া হয়নি। শ্যাম্পেন নিয়ে এস, আর তাসগুলো দাও।"

ঠিক সেই সময় কাউন্ট ও জাভাল্শেভ্স্কি ঘরে ঢুকল। ক্রমে জানা গেল তুরবিন ও ইল্যিন এক বাহিনীতেই ছিল। খুব তাড়াতাড়ি তার বন্ধু হয়ে উঠল, শ্যাম্পেন দিয়ে পরস্পরের স্বাস্থ্যপান করল এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো কথা বলতে লাগল। ইল্যিনকে দেখে কাউন্টের খুব ভাল লাগল। তার দিকে তাকিয়ে সে হাসতে লাগল এবং সে বয়সে এত ছোট বলে তাকে ঠাট্টা করতে লাগল।

সে বলল, "তুমি যেন একটি উহ্লান! ইয়া গোঁফ! ইয়া ভয়ংকর গোঁফ!"

ইল্‌য়িনের উপরের ঠোঁটের লোমগুলো ছিল একেবারে সাদা।

কাউন্ট বলল, "আপনারা কি তাস খেলবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন? ইল্‌য়িন, আশা করছি তুমি জিতবে। তুমি তো একজন প্রথম সারির খেলুড়ে, নয় কি?" কাউন্ট হেসে বলল।

একজোড়া তাস খুলতে খুলতে লুখনভ জবাব দিলো, "সত্যি আমরা তৈরি হচ্ছি। আপনি কি আমাদের দলে যোগ দেবেন না কাউন্ট?"

"না, আজ নয়। আমি খেললে আপনাদের ন্যাংটো করে ছাড়ব। যখনই আমি খেলি, যে কোনও ব্যাংক ফেটে হাঁ হয়ে যায়। কিন্তু আমার সঙ্গে খেলবার মতো বেস্ত নেই। ভলোচোকের নিকটবর্তী পোস্টিং-স্টেশনে আমি সবকিছু হারিয়েছি। হাতে আংটি-পরা এক শয়তান পদাতিক আমাকে পথে বসিয়েছে। লোকটি নিশ্চয় তাসের ভেল্কি জানে।"

ইল্‌য়িন জিজ্ঞাসা করল, "সে কি? সেখানে কি আপনাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল?"

"বাইশ ঘণ্টা। সেই অভিশপ্ত স্টেশনটার কথা আমি কোনওদিন ভুলব না। আবার পোস্টমাস্টারও কোনওদিন আমাকে ভুলবে না।"

"সে আবার কি?"

"আমি গাড়ি চালিয়ে যেতেই পোস্টমাস্টার তার ধূর্ত কদাকার ছোট মুখ নিয়ে এক লাফে বাইরে এল। বলল, ঘোড়া নেই। আগেই তোমাকে বলে রাখছি, নিজের জন্য আমি নিম্নবর্ণিত নীতি নির্ধারণ করে নিয়েছি: যখনই আমাকে বলা হয় যে ঘোড়া নেই, তৎক্ষণাৎ আমি কোট না খুলেই সোজা চলে যাই ওভারসিয়ারের চেম্বারে—মনে রাখবে বাইরের ঘরে নয়, একেবারে প্রাইভেট চেম্বারে এবং গিয়েই সব দরজা ও জানালা খুলে দেবার হুকুম দেই, যাতে মনে হতে পারে যে জায়গাটা কয়লার ধোঁয়ায় একেবারে আচ্ছন্ন। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই করলাম। সে কী ঠাণ্ডা! গত মাসে কী রকম বরফ পড়েছিল মনে পড়ে? চার ডিগ্রী নিচে। পোস্টমাস্টারটা তর্ক শুরু করতেই দিলাম তার নাকে এক ঘা বসিয়ে। একটি বৃদ্ধ মহিলা, কয়েকটি ছোট মেয়ে ও অন্য স্ত্রীলোকরা চেঁচামেচি শুরু করে দিল ও ঘটিবাটি নিয়ে গ্রামে চলে যেতে উদ্যত হলো। তাদের পথ আটকে দিয়ে আমি চেঁচিয়ে বললাম, "আমাকে কয়েকটা ঘোড়া দাও, তাহলেই আমি চলে যাব; যদি না দাও, তোমরা ঠাণ্ডায় জমে মরবে, কাউকে বাইরে যেতে দেব না!"

ভুঁড়িওলা ভূস্বামীটি হো হো করে হেসে বলল, "এই ওদের উচিত শিক্ষা! ঠিক যেন গুবরে পোকাকে ঠাণ্ডায় জমিয়ে মারা।"

"কিন্তু তাদের উপর আমি ঠিকমতো নজর রাখতে পারিনি—কেমন করে যেন সব ফস্‌কে চলে গেল—পোস্টমাস্টার আর মহিলারাও সরে পড়ল। যে বৃদ্ধা মহিলাটি স্টোভ্‌-বাংকের উপর শুয়ে ছিল সেই শুধু বাড়িতে রয়ে গেল। সে অনবরত

হাঁচতে লাগল আর প্রার্থনা করতে লাগল। তারপর কথাবার্তা শুরু হলো : পোস্টমাস্টার ফিরে এসে দূর থেকে বৃদ্ধাকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ জানাল, আর আমি করলাম কি, ব্লুইশারকে লেলিয়ে দিলাম,—আর ব্লুইশারও পোস্টমাস্টারদের ভালই চেনে। কিন্তু তবু পরদিন সকালের আগে সে আমাকে ঘোড়া দিলো না, শালা বদমাশ! এই ভাবেই সেই শয়তান পদাতিক অফিসারের সঙ্গে পরিচয় হলো। পাশের ঘরে গিয়ে তার সঙ্গে খেলতে শুরু করলাম। আরে, ব্লুইশারকে দেখেছেন? ব্লুইশার! এখানে আয়!"

ব্লুইশার এল। জুয়াড়িরা তার প্রতি সদয় ব্যবহার করলেও বোঝা গেল যে অন্য রকম করতেই তারা ইচ্ছুক।

তুরবিন বলল, "কিন্তু মশাইরা খেলছেন না কেন? আমার জন্য আপনারা খেলা বন্ধ করবেন না। আমি জানি, আমি, একটি বাচাল। তবে আপনাদের ভাল লাগুক আর না লাগুক, কথা আমি ভালই বলতে পারি।"

৩

দুটো মোমবাতির আলোয় উঠে গিয়ে লুখনভ টাকায় ভর্তি একটা মস্তবড় ধূসর রঙের থলি বের করে একটা রহস্যময় আচার-অনুষ্ঠানের ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে তার মুখটা খুলল, দু'শ' রুবলের নোট বের করল এবং সেগুলোকে তাসের নিচে রেখে দিলো।

চশমাটা সোজা করে নাকে লাগিয়ে একজোড়া নতুন তাসের প্যাক খুলে সে বলল, "দু'শ' রুবলের একটি ব্যাংক, ঠিক কালকের মতো।"

তার দিকে না তাকিয়ে তুরবিনের সঙ্গে কথা চালাতে চালাতেই ইল্যিন বলল, "ঠিক আছে।"

খেলা শুরু হলো। যন্ত্রের মতো নির্ভুলভাবে লুখনভ তাস বেঁটে দিলো; মাঝে মাঝে ধীর-স্থিরভাবে একটা পয়েন্ট দেখতে থামল, অথবা চশমার উপর দিয়ে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, "আপনার খেলা।" ভুঁড়িওলা ভূস্বামীটি সরবে নিজের তাসের হিসাব করতে করতে এবং বেঁটে মোটা আঙুল দিয়ে তাসের কোনাগুলো দুমড়ে দিয়ে তাসগুলোকে নোংরা করে অন্য সকলের চাইতে বেশি গোলমাল করতে লাগল। স্থানীয় অফিসারটি সুন্দর হস্তাক্ষরে তার পয়েন্টগুলো লিখতে লাগল এবং টেবিলের নিচে তার তাসের কোনাগুলি সামান্য বেঁকিয়ে দিতে লাগল। গ্রীক ভদ্রলোক বসেছে লুখনভের কাছে। ব্যাংকটা রয়েছে লুখনভের হেফাজতে। দৃঢ়বদ্ধ কালো চোখ দিয়ে এত গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে খেলাটি দেখছে যেন কোনও ঘটনার জন্যই সে অপেক্ষা করে আছে। জাভাল্‌শেভ্‌স্কি টেবিলের পাশে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ সে সচল হয়ে উঠল : পকেট থেকে একটা লাল বা নীল ব্যাংক নোট বের করে তার উপর একখানা তাস চাপা দিলো, আর তার উপর হাতটা চেপে ধরে

চেঁচিয়ে বলল, "চলে আসুন; সাত," গোঁফে কামড় দিলো, এক পা থেকে আরেক পায়ে দাঁড়াল, সমস্ত শরীরটা মোচড়াতে লাগল, এবং যতক্ষণ না একখানা তাস পেল ততক্ষণই মোচড়াতে লাগল। ইল্যিন তার পাশে ঘোড়ার লোমের সোফার উপর রাখা প্লেট থেকে গো-মাংস ও শসা খেল, তাড়াতাড়িতে জ্যাকেটেই আঙুল মুছল এবং একটার পর একটা তাস ফেলতে লাগল : তুরবিন প্রথম থেকে সোফার উপর বসেছিল, কাজেই সবকিছুই সে ঠিকঠিক দেখতে পাচ্ছিল। লুখনভ উহ্‌লানের দিকে ফিরেও তাকায়নি বা তাকে একটা কথাও বলেনি; শুধু মাঝে মাঝে চশমার ভিতর দিয়ে তার হাতটা দেখছিল। উহ্‌লানের প্রায় সব তাসই হারের তাস।

ভুঁড়িওলা ভূস্বামীটি আধ-রুবলের বাজিতে খেলছিল। তার একটা তাস দেখিয়ে লুখনভ বলল, "ওই তাসটা আমি ধরতে চাই।"

ভূস্বামী বলল, "আপনি ইল্যিনের তাস নিন—আমারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?"

সত্যি সত্যি ইল্যিনের মতো দুর্ভাগা তাস আর কারও ছিল না। যতবার হারছে ততবার সে কাঁপা হাতে দুর্ভাগা তাসটাকে টেবিলের তলায় নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে আর একটা তাস বেছে নিচ্ছিল। তুরবিন সোফা থেকে উঠে গ্রীক ভদ্রলোককে অনুরোধ করল, যে খেলুড়ের কাছে ব্যাংক রয়েছে তার পাশে যাতে সে বসতে পারে। গ্রীক ভদ্রলোক স্থান পরিবর্তন করল এবং তুরবিন তার চেয়ারে বসে লুখনভের হাতের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখল।

'ইল্যিন!" হঠাৎ সে এমন গলায় ডাকল যেটা তার স্বাভাবিক গলা হলেও অন্য শব্দকে ছাপিয়ে গেল। "ঐ তাসটা পয়মন্ত এ কথা ভাবছ কেন? তুমি খেলতেই জানো না।"

"আমি যে ভাবেই খেলি, ফলাফল সেই একই হচ্ছে।"

"ও ভাবে চিন্তা করলে তুমি নির্ঘাৎ হারবে। তোমার হাতটা আমাকে দাও।"

"না, ধন্যবাদ; আমি কাউকে আমার হয়ে খেলতে দেই না। ইচ্ছা হলে আপনি নিজে খেলুন।"

"তোমাকে তো বলেছি, আমি খেলতে চাই না; শুধু তোমার জন্যই খেলতে চাইছি। তোমাকে এ ভাবে হারতে দেখে আমি দুঃখ পাচ্ছি।"

"মনে হয় এই আমার ভাগ্য।"

কাউন্ট আর কিছুই বলল না; শুধু টেবিলের উপর কনুইটা রেখে লুখনভের হাতের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ সে লম্বা টানা সুরে জোর গলায় বলে উঠল, "খুব খারাপ।"

লুখনভ তার দিকে তাকাল।

লুখনভের চোখের দিকে সোজা চোখ রেখে সে আরও জোর গলায় আবার বলল, "খুব খারাপ।"

সকলেই খেলতে লাগল।

লুখনভ ইল্‌য়িনের আরও একখানা তাস নিতেই তুরবিন বলল, "জঘন্য কাজ-কারবার।"

বিনীত ঔদাসীন্যে লুখনভ জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি জন্য অসন্তুষ্ট হচ্ছেন কাউন্ট?"

"আপনি যেভাবে ইল্‌য়িনের তাস নিচ্ছেন সেই জন্য সেটাই খুব খারাপ।"

লুখনভ তার কাঁধ ও ভুরু সামান্য একটু কাত করল; যেন সে বলতে চাইল, যার যার ভাগ্য তো মানতেই হবে। তারপর যথাপূর্ব খেলতে লাগল।

উঠে দাঁড়িয়ে কাউন্ট চিৎকার করে ডাকল, "ব্লুইশার! এখানে আয়।" সঙ্গে সঙ্গে আবার বলল, "ওকে ধর তো ব্লুইশার!"

সোফার নিচ থেকে এক লাফে বেরিয়ে আসতে গিয়ে ব্লুইশার স্থানীয় অফিসারটিকে এক ধাক্কায় প্রায় ফেলে দিয়েছিল আর কি। প্রভুর কাছে ছুটে গিয়ে গরর্‌-গরর্‌ করতে করতে লেজ নাড়তে লাগল, আর এমনভাবে সকলের দিকে তাকাতে লাগল যেন বলতে চাইছে, "কোনটি অপরাধী হে?"

হাতের তাস নামিয়ে রেখে লুখনভ চেয়ারটা পিছনে ঠেলে দিলো।

বলল, "এ অবস্থায় খেলা অসম্ভব। আমি কুকুর সইতে পারি না। ঘর-ভর্তি কুকুর নিয়ে কি খেলা হয়?"

স্থানীয় অফিসার ফোড়ন কাটল, "বিশেষ এ রকম কুকুর নিয়ে...যাকে বলে একেবারে বিচ্ছু।"

লুখনভ ঘরের মালিককে বলল, "দেখুন মিখাইলো ভাসিলিচ, আমরা কি খেলা চালিয়ে যাব, না না?"

ইল্‌য়িন তুরবিনকে বলল, "দয়া করে খেলায় বিঘ্ন ঘটাবেন না কাউন্ট।"

ইল্‌য়িনের হাত ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে যেতে তুরবিন বলল, "কিছুক্ষণের জন্য এস তো।"

কাউন্ট যা কিছু বলল স্পষ্টই শোনা গেল, কারণ গলা না নামিয়েই সে কথাগুলো বলল। আর এমনি তার গলার জোর যে তিনটে ঘর দূর থেকেও সব শোনা যায়।

"তুমি কি একেবারেই পাগল হয়েছ? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না ঐ চশমা-পরা ভদ্রলোক একটি পাকা ভেল্কিবাজ..."

"আঃ, আস্তে। আপনি কি বলছেন?"

"বলছি খেলা বন্ধ করো। আমার আর কি? অন্য সময় হলে আমি নিজেও তোমার এভাবে সব টাকা মনের সাধে মেরে দিতাম; কিন্তু যে জন্যই হোক আজ রাতে তোমাকে ঠকতে দেখে আমার দুঃখ হচ্ছে। যে টাকা নিয়ে খেলছ তার সবটাই কি তোমার নিজের?"

"হ্যাঁ!...মানে...কেন? আপনি কি ভাবছেন?"

"দেখো বন্ধু, এ পথে আমি নিজেও অনেক হেঁটেছি, তাই এই সব ভেল্কিবাজদের সব কলা-কৌশলই আমি জানি : আমি বলছি ঐ চশমাধারী লোকটি একজন ভেল্কিবাজ। খেলা বন্ধ করো—বন্ধ করো, বন্ধু হিসাবে তোমাকে এ পরামর্শ দিচ্ছি।"

"আর এক দান মাত্র খেলব।"

"আর এক দানের অর্থ আমি জানি। বেশ, দেখা যাক।"

তারা ফিরে এল। এক দানেই ইল্‌য়িন এত বেশি তাস ফেলল এবং তার মধ্যে এত বেশি তাসে তার হার হলো যে তার প্রচুর লোকসান হলো।

তুরবিন দুই হাত টেবিলের উপর ছড়িয়ে দিলো।

চেঁচিয়ে বলল, "যথেষ্ট হয়েছে! চলে এস!"

তুরবিনের দিকে না তাকিয়ে বাঁকানো তাসগুলো ভাঁজতে ভাঁজতে ইল্‌য়িন বিরক্ত হয়ে বলল, "আমি এখন যেতে পারি না; দয়া করে আমাকে একা থাকতে দিন।"

"শয়তান তোমাকে ভর করুক! হারতে যখন তোমার এত মজা তখন হারতে থাকো। কিন্তু আমি চললাম। জাভাল্‌শেভ্‌স্কি! আমার সঙ্গে মার্শালের কাছে চলুন!"

তারা চলে গেল। কেউ একটা কথাও বলল না। তাদের পায়ের শব্দ এবং ব্লুইশারের নখের আঁচড়ের শব্দ দালানের ওপাশে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত লুখনভ তাস বাঁটল না।

ভূস্বামী হেসে বলল, "কী লোকরে বাবা।"

দ্রুত অথচ নিচু গলায় স্থানীয় অফিসারটি বলল, "যাক, আর সে নাক গলাবে না।"

সকলে খেলতে শুরু করল।

৪

উৎসব উপলক্ষে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তোলা ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে দণ্ডায়মান মার্শালের গৃহ-ভৃত্য বাজনাদারেরা ইতিমধ্যেই কোটের আস্তিন গুটিয়ে নিয়েছিল; এবার সংকেত পাওয়া মাত্রই পুরনো কালের পোলিশ "আলেকজান্দার এলিজাবেথ" নাচের সুর বাজাতে শুরু করে দিলো, এবং মোমবাতির নরম উজ্জ্বল আলোয় জোড়ায় জোড়ায় নারী-পুরুষেরা প্রকাণ্ড হলের কাঠের মেঝেতে তালে তালে পা ফেলতে আরম্ভ করল (প্রথমে ক্যাথারিনের দরবারের সেনাপতি লাটসাহেব বুকের উপর একটা তারকা লাগিয়ে মার্শালের শীর্ণা স্ত্রীর হাত ধরে; তারপরে লাট-পত্নীর হাত ধরে মার্শাল; তারপরে ভিন্ন ভিন্ন দলে ও জোটে শাসক পরিবারসমূহের অন্য সকলে); এমন সময় কাঁধের উপর ফোলানো মস্ত-বড় কলার-ওয়ালা নীল ফ্রক-কোট গায়ে, লম্বা মোজা ও নাচের জুতো পায়ে, গোঁফে, কোটের বুকে ও রুমালে যথেচ্ছভাবে ছিটানো জুঁই ফুলের আতরের গন্ধ ছড়িয়ে সে ঘরে প্রবেশ করল জাভাল্‌শেভ্‌স্কি; তার সঙ্গে একজন সুদর্শন অশ্বারোহী সৈনিক—পরনে নীল রঙের আঁটোসাঁটো

রাইডিং ব্রীচেস আর ভ্লাদিমির ক্রশ ও ১৮১২-র মেডেল শোভিত সোনার কাজ-করা লাল জোব্বা। কাউন্টের উচ্চতা সাধারণের চাইতে বেশি না হলেও তার দেহ খুবই সুগঠিত। তার ঝকঝকে নীল উজ্জ্বল দুটি চোখ ও ঘন বাদামী চুলের দীর্ঘ গুচ্ছ তার সৌন্দর্যে এনেছে একটা বিশেষ আকর্ষণী শক্তি। নাচের ঘরে তার আগমন অপ্রত্যাশিত ছিল না; যে সুদর্শন যুবকটি তাকে হোটেলে দেখেছিল সেই মার্শালকে জানিয়েছে যে এখানে আসবার অভিপ্রায় তার আছে। এ সংবাদের নানা রকম প্রতিক্রিয়া হয়েছে; তবে মোটামুটি খুব একটা উৎসাহের সঞ্চার করেনি। পুরুষরা এবং বয়স্কা মহিলারা বলেছে, "সে আমাদের নিয়ে কৌতুক করতে পারে।" বালিকা এবং তরুণীদের মনে হয়েছে, "সে যদি আমাকে নিয়ে পালিয়েই যায় তাতেই বা কি?"

বাজনা থামল। নাচের জুটিরা পরস্পরকে অভিবাদন জানিয়ে জোড় ভাঙল, নারীরা নারীদের দলে আর পুরুষরা পুরুষদের দলে মিশে গেল। তখন গর্বিত ও আনন্দিত জাভাল্‌শেভ্‌স্কি কাউন্টকে গৃহকর্ত্রীর সামনে হাজির করল। মার্শাল-পত্নীর মনে ভয় ছিল পাছে সকলের সামনে কাউন্ট তাকে বেকায়দায় ফেলে, তাই মুখ ফিরিয়ে গর্বিত সদয় ভঙ্গিতে বলল, "চমৎকার। আশা করি আপনি নাচবেন।" কথার শেষে এমন একটা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তার দিকে সে তাকাল যাতে মনে হলো সে যেন বলছে, "এর পরেও যদি একটি মহিলাকে অসম্মান করো তাহলে বুঝব তুমি একটি বদমাশ।" কিন্তু ভদ্রতা, মনোযোগ, জাঁকজমক ও সুদর্শন চেহারা দিয়ে কাউন্ট অবিলম্বেই মহিলার মন থেকে সে ভয় দূর করে দিলো, ফলে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তার মুখের ভঙ্গি যেন সকলকে বলতে লাগল, "এ ধরনের ভদ্রলোকদের কি ভাবে বশে আনতে হয় তা আমি জানি; মুহূর্তের মধ্যেই লোকটি বুঝতে পেরেছে সে কার সঙ্গে কথা বলছে। দেখো না, সারা সন্ধ্যা সে আমাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে।" কিন্তু ঠিক সেই সময়ে কাউন্টের পিতার পূর্ব-পরিচিত লাটসাহেব এগিয়ে এসে কথাবার্তা বলার জন্য তাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গেল। ফলে স্থানীয় ভদ্রজনের মনে যেটুকু আশংকা ছিল তাও দূর হওয়ায় কাউন্ট সম্পর্কে তাদের ধারণা আরও ভাল হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ পরে জাভাল্‌শেভ্‌স্কি তার বোনের সঙ্গে কাউন্টের পরিচয় করিয়ে দিলো। এই মোটাসোটা তরুণী বিধবাটি কাউন্টের ঘরে ঢোকার পর থেকে একমুহূর্তের জন্যও তার বড় বড় কালো চোখ দুটিকে কাউন্টের উপর থেকে সরায়নি। অর্কেস্ট্রায় তখন ওয়াল্‌জ্‌ বাজছিল। কাউন্ট সেই সুরের তালে মহিলাকে তার সঙ্গে নাচের আমন্ত্রণ জানাল, আর তার নাচের দক্ষতা তার বিরুদ্ধে যেটুকু বিরূপতা অবশিষ্ট ছিল শেষ পর্যন্ত তাও দূর করে দিলো। তার নীল রাইডিং-ব্রীচেস পরা পা দুটি যখন সারা ঘরময় ঘুরতে লাগল, তখন নিজের মনেই "এক, দুই, তিন : এক, দুই, তিন—চমৎকার!" বলে তাল দিতে দিতে এক স্থানীয় ভদ্রলোকের স্থূলাঙ্গী স্ত্রী বলল, "সত্যি লোকটি অপূর্ব নাচে।"

শহরে আগন্তুক আর একটি নারী যাকে স্থানীয় সমাজ উঁচু শ্রেণীর নয় বলে ধরে

নিয়েছিল সে বলল, "কী পায়ের কাজ! কী পায়ের কাজ! নাচের সময় যে কারও শরীরে তার পায়ের আঘাত লাগে না সেটা কি করে হয়! অপূর্ব! পা ফেলবার কী লঘু ভঙ্গিমা।"

নাচ দেখিয়ে কাউন্ট সরকারী মহলের তিনজন শ্রেষ্ঠ নাচিয়েকে ম্লান করে দিলো : একজন হলো লম্বা, মাথামোটা লাটসাহেবের সহকারী যে নাচের ক্ষিপ্রগতি ও নাচের সঙ্গিনীকে বুকের খুব কাছে টেনে নেবার দক্ষতার জন্য বিখ্যাত ছিল; আর একজন হলো অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার যে ওয়াল্‌জ্‌ নাচের সময় সঙ্গিনীকে অতি সুকৌশলে দুলিয়ে দিতে পারত এবং গোড়ালিকে খুব লঘু অথচ দ্রুততালে খেলাতে পারত; আর তৃতীয় ভদ্রলোক একজন অসামরিক অফিসার—সকলেই বলে তার মনটা বড় না হলেও সে অপূর্ব নাচিয়ে এবং যে কোনও বল-নাচের প্রাণস্বরূপ। সত্যি সত্যি ভদ্রলোকটি বল নাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুহূর্তের জন্যও থামেনি, মহিলারা পর পর যে ভাবে বসেছিল সেইভাবেই প্রত্যেককে নাচের আমন্ত্রণ জানিয়েছে, শুধু একখানি ভেজা রুমাল দিয়ে শ্রান্ত অথচ ঝকঝকে মুখখানি মুছবার জন্য কদাচিৎ দু'একবার নাচ বন্ধ রেখেছে। কিন্তু কাউন্ট তাদের সকলকে পাল্লা দিয়ে নাচের আসরের তিনটি জাঁদরেল মহিলার সঙ্গেই নাচল : একজন লম্বা—ধনী ও সুন্দরী, কিন্তু বোকা-বোকা; একজন মাঝারি গড়নের—সুন্দরী নয়, কিন্তু সুসজ্জিতা; আর একজন ছোটখাট—খুব সাদাসিধে, কিন্তু খুব চালাক-চতুর। সে অন্যদের সঙ্গেও নাচল; বস্তুত সব সুন্দরীদের সঙ্গেই নাচল, আর নাচের আসরে সুন্দরীদের সংখ্যা বেশ ভালই ছিল। কিন্তু যার সঙ্গে নেচে সে সবচাইতে বেশি খুশি হলো সে জাভাল্‌শেভ্‌স্কির বিধবা বোন। তার সঙ্গে সে নাচল "কোয়াড্রিল", "একোশাস" ও "মাজুরকা"। "কোয়াড্রিল" নাচের সময় সে নানাভাবে তার গুণগান করল, তাকে ভেনাস, ডায়ানা, গোলাপ ও অন্য ফুলের সঙ্গে তুলনা করল। এই সব ভদ্রতাসূচক কথাবার্তার উত্তরে ছোট বিধবাটি শুধু তার সুন্দর সাদা গ্রীবাটি বাঁকাল এবং নিজের সাদা মসলিন-ফ্রকের দিকে চোখ রেখে ও পাখাটাকে এক হাত থেকে অন্য হাতে নিয়ে চোখ দুটি নামিয়ে নিলো। সে যখন "প্রিন্স কাউন্ট, আপনি তামাশা করছেন" বা ঐ ধরনের কথা বলল তখন তার ফ্যাসফেঁসে গলায় এমন নির্দোষ অকপটতা ও হাস্যকর সরলতা ফুটে উঠল যে কাউন্ট তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকালেই সে ভাবল যে সত্যি সত্যি সে একটি ফুল, স্ত্রীলোকমাত্র নয়; তাও গোলাপ ফুল নয়, এমন একটি প্রস্ফুটিত গোলাপি-সাদায় মেশানো গন্ধবিহীন বুনো ফুল যা বহুদূর দেশের এক আদিম বরফের বুকে আপনি বিকশিত হয়ে উঠেছে।

তার আচরণের সরলতা ও ভণিতার অভাব তার নবীন সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশে কাউন্টের মনে এমন গভীরভাবে দাগ কেটে বসল যে আলাপচারির ফাঁকে ফাঁকে কাউন্ট যখনই নীরবে তার চোখের দিকে অথবা তার বাহু ও গলার রমণীয় রেখার দিকে তাকিয়েছে তখনই তাকে বাহুপাশে জড়িয়ে চুম্বন করবার বাসনা এতই তীব্র হয়ে উঠেছে যে অনেক কষ্টে সে নিজেকে সংযত করেছে। ছোট্ট বিধবাটি নিজের

এই কৃতিত্বে খুশি হলেও কাউন্টের আচরণে এমন কিছু ছিল যা তাকে বিব্রত করেছে, শংকিত করেছে, অবশ্য আচরণের প্রচলিত মান দিয়ে বিচার করলে কেবলমাত্র চাটুকারসুলভ মনোযোগ দেওয়া ছাড়া কাউন্ট ছিল বেশি রকমেই সম্ভ্রমশীল। সে ছুটে গিয়ে তার জন্য খাবার এনে দিলো, রুমালটা তুলে দিলো, গলগণ্ড রোগীর মতো দেখতে এক যুবক প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত থেকে তার চেয়ারটা জোর করে ছিনিয়ে এনে দিলো এবং এই ধরনের অসংখ্য ছোটখাটো কাজ করে দিলো।

কিন্তু কাউন্ট যখন দেখল এই সব কাজে কর্মে মহিলাটির উপর কোনও প্রভাব পড়ল না, তখন নানান হাসির গল্প বলে এবং তার কথায় সে যে মাথার উপরে দাঁড়াতে পারে, কাকের মতো কা কা শব্দ করতে পারে, নিজেকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিতে বা নদীর ধরনের একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে —এমনি সব আশ্বাস দিয়ে নিজেকে রসাল করে তুলতে চেষ্টা করল। এবার কিন্তু সে পুরোপুরি সফল হলো। ছোট বিধবাটি খুব খুশি হয়ে এমনভাবে হো-হো করে হেসে গড়িয়ে পড়ল যে তার সুন্দর সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল। রসিক পুরুষটির প্রতি সে খুবই সদয় হয়ে উঠল। আর কাউন্টও প্রতিটি মুহূর্তে তার প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হতে লাগল এবং তার ফলে "কোয়াড্রিল" নাচের শেষে সে সত্যি মহিলাটির প্রেমে পড়ে গেল।

সে অঞ্চলের সবচাইতে ধনী ভূস্বামীর যে আঠারো বছরের অকর্মণ্য ছেলেটি অনেক দিন ধরেই বিধবাটিকে ভজনা করে আসছিল (এই সেই গলগণ্ড রোগীর মতো দেখতে যুবক যার হাত থেকে তুর্বিন জোর করে চেয়ারটা ছিনিয়ে নিয়েছিল) সে যখন কোয়াড্রিল নাচের শেষে হাজির হলো তখন বিধবাটি অনাসক্তভাবে তাকে অভ্যর্থনা জানাল এবং কাউন্ট তার মনে যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল তার দশ ভাগের এক ভাগও প্রকাশ করল না।

তুর্বিনের পিঠের উপর চোখ রেখে এবং তার কোটটা তৈরি করতে কত গজ সোনালী জরি লেগেছে মনে মনে তার হিসাব করতে করতে বিধবাটি বলে উঠল, "তুমি বেশ লোক তো! আচ্ছা লোক! আসবে বলে কথা দিয়েছিলে, বলেছিলে স্লেজ-গাড়িতে চড়াবে, চকোলেট দেবে।"

"কিন্তু আমি তো এসেছিলাম আন্না ফিয়োদরভ্না। তুমিই বাড়ি ছিলে না, তাই এক বাক্স খুব ভাল চকোলেট তোমার জন্য রেখে এসেছি," যুবকটি বলল, তার চেহারাটা ঢ্যাঙা হলেও নিচু কর্কশ গলায় সে কথা বলে।

"তুমি তো সব সময়ই ছুতো খুঁজে বেড়াও। চাই না তোমার চকোলেট। দয়া করে মনে করো না—"

"বুঝতে পারছি আন্না ফিয়োদরভ্না, তুমি খুব বদলে গেছ। তার কারণও আমি জানি। এটা তোমার খুব অন্যায়," সে আরও বলল। হয়তো সে আরও কিছু বলত, কিন্তু রাগে তার ঠোঁট দুটো এমন তীব্রভাবে কাঁপতে লাগল যে সে আর কথাই বলতে পারল না।

আন্না ফিয়োদরভ্না তার কথায় কান না দিয়ে তুরবিনের খোঁজে চলে গেল।

সে-সন্ধ্যার আমন্ত্রণ-কর্তা মার্শাল একজন শক্তপোক্ত, দন্তহীন, বৃদ্ধ, মহাশয় ব্যক্তি। কাউন্টের কাছে গিয়ে তার হাত ধরে সে তাকে তার স্টাডিতে গিয়ে ধূমপান করতে এবং ইচ্ছা হলে সুরা পান করতে আমন্ত্রণ জানাল। তুরবিন চলে যেতেই নাচের ঘরটা আন্না ফিয়োদরভ্নার কাছে প্রায় ফাঁকা বলে মনে হতে লাগল। সেও তার জনৈকা অবিবাহিতা সখীর হাত ধরে তাকে ড্রেসিংরুমে টেনে নিয়ে গেল।

সখী শুধাল, "কি লা? পছন্দ হয়?"

আয়নার কাছে গিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আন্না ফিয়োদরভ্না বলল, "কিন্তু তার রকম-সকম দেখে ভয় লাগে যে!"

তখন তার মুখখানি চকচক করছে, চোখ দুটো হাসছে, একটু লজ্জা-লজ্জাও করছে। হঠাৎ নির্বাচনের সময় যে ব্যালে নাচ হয়েছিল তার নকল করে সে একটা আঙুলের উপর ঘুরতে লাগল, এবং তারপরে মনোরম ভঙ্গিতে গলা ছেড়ে হেসে উঠে গোড়ালির ধাক্কায় শূন্যে লাফিয়ে উঠল।

সখীকে বলল, "তোমার কি মনে হয়?—সে তো একটা স্মৃতি-চিহ্ন পর্যন্ত চেয়েছে। কিন্তু সে এ-ক-টি-ও-পা-বে-না!" চামড়ার দস্তানায় ঢাকা একটি আঙুল তুলে গানের সুরে সে শেষের কথাগুলি বলল।

মার্শাল তুরবিনকে নিয়ে স্টাডিতে ঢুকল। সেখানে নানা রকমের ভদ্কা লিকার ও শ্যাম্পেন সাজানো ছিল, আর ছিল প্লেটে-প্লেটে সুস্বাদু খাবার। স্থানীয় ভদ্রলোকরা তামাকের ধোঁয়াশার মধ্যে বসে বা হাঁটতে হাঁটতে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করছিল।

নব-নির্বাচিত পুলিশ ক্যাপ্টেন ইতিমধ্যেই টলতে শুরু করেছে। সেই কথা বলছিল, "আমাদের জেলার ভদ্রজনরা যখন তাকে নির্বাচিত করে সম্মান দেখিয়েছে তখন কর্তব্যকে এড়িয়ে যাবার কোনও অধিকার তার নেই, কোনও অধিকার নেই—"

কাউন্টের আগমনে আলোচনা বাধা পেল। সকলকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পরে পুলিশ ক্যাপ্টেন বিশেষ হৃদ্যতার সঙ্গে তার করমর্দন করে বার বার তাকে অনুরোধ জানাল, নতুন হোটেলে সে একটি নৈশ-ভোজের আয়োজন করেছে; কাউন্ট যেন নাচের পরে তাতে যোগদান করে; সেখানে জিপ্সিদের সমবেত সঙ্গীতও শোনানো হবে। আমন্ত্রণ গ্রহণ করে কাউন্ট তার সঙ্গে কয়েক গ্লাস শ্যাম্পেন পান করল।

স্টাডি থেকে চলে যাবার সময় সে প্রশ্ন করল, "মশাইরা, আপনারা নাচছেন না কেন?"

পুলিশ ক্যাপ্টেন হেসে বলল, "নাচের ব্যাপারে আমরা তেমন পোক্ত নই কাউন্ট, আমরা বরং বোতলের খেলই ভাল দেখাতে পারি। কি জানেন কাউন্ট, এই সব তরুণীরা তো আমাদের চোখের সামনেই বেড়ে উঠেছে। তবে হ্যাঁ, "একোশাস"-এ কখনও-সখনও পা ফেলে থাকি কাউন্ট—এটা এখনও চালাতে পারি।"

তুরবিন বলল, ''তাহলে আসুন, পা ফেলি। জিপসিদের গান শুনতে যাবার আগে এখানেই একটু আনন্দ করা যাক।''

যে তিনজন লাল-মুখো সম্ভ্রান্ত লোক বল-নাচের একেবারে শুরু থেকেই স্টাডিতে বসে মদ খাচ্ছিল তারা এবার দস্তানা পরে নিল, একজন পরল কিড-চামড়ার কালো দস্তানা, অপর দু'জন রেশমে-বোনা। তারা নাচের ঘরে যাবার উদ্যোগ করতেই গলগণ্ড রোগীর মতো দেখতে সাদা-ঠোঁট যুবকটি তাদের থামিয়ে দিলো। তার চোখের জল বাধা মানছিল না। তুরবিনের কাছে গিয়ে কষ্ট করে শ্বাস টানতে টানতে বলল, ''আপনি কাউন্ট বলেই ভেবেছেন বাজারের ভিতর দিয়ে চলবার সময় যাকে-তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু এটা খুব খারাপ এবং...এবং.. '' আবারও ঠোঁট দুটো কাঁপতে কাঁপতে তার কথার স্রোতকে বন্ধ করে দিলো।

''কী!'' হঠাৎ চোখ রাঙিয়ে তুরবিন চিৎকার করে বলল। তারপর যুবকটির হাত চেপে ধরে এমনভাবে মুচড়ে দিলো যে অপমানের চাইতে ভয়েই তার মুখে রক্ত উঠে এল। কাউন্ট চিৎকার করে বলল, ''কী বললি? কুকুরের বাচ্চা! তুই কি আমার সঙ্গে লড়াই করতে চাস? তাই যদি হয় তো চলে আয়।''

তুরবিন তার হাত ছেড়ে দিতেই দু'জন ভদ্রলোক হাত ধরে যুবকটিকে পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে নিয়ে গেল।

''তুমি কি পাগল হয়েছ? নিশ্চয় এককাঁড়ি মদ গিলেছ? তোমার বাবাকে বলে দেব। কি হয়েছে তোমার?'' তারা জিজ্ঞাসা করল।

প্রায় কেঁদে ফেলবার উপক্রম করে যুবকটি আর্তনাদ করে উঠল, ''আমি মাতাল নই, কিন্তু উনি সবাইকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিচ্ছেন, অথচ ক্ষমাটি পর্যন্ত চাইছেন না। উনি একটা শুয়োর, ঠিক তাই।''

কিন্তু তার অভিযোগে কান না দিয়ে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

তুরবিনকে শান্ত করবার জন্য পুলিশ ক্যাপ্টেন ও জাভাল্‌শেভ্‌স্কি বলল, ''ওর কথায় কান দেবেন না কাউন্ট, ও তো ছেলেমানুষ: আরে, এখনও তো ওকে চড়-চাপড়ই মারা হয়। মোটে তো ষোল বছর বয়স। না জানি কি ওর মাথায় ঢুকেছে। নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছে। অথচ ওর বাবা একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ভদ্রলোক— আমাদের প্রার্থী।''

''ঠিক আছে, এতেও শায়েস্তা না হলে ওকে শয়তানে পাক।''

বলেই কাউন্ট নাচের ঘরে চলে গেল; সুন্দরী ছোট্ট বিধবাটির সঙ্গে মনের সুখে একচক্কর ''একোশাস'' নাচল; যে দুটি ভদ্রলোক স্টাডি থেকে তার সঙ্গে এসেছিল তাদের নাচের বহর দেখে প্রাণ খুলে হাসল; এবং এমন সোরগোল তুলল যে সারা নাচের ঘর গমগম করে উঠল, আর পুলিশ ক্যাপ্টেন পা পিছলে নাচের জুটিদের মাঝখানে সপাটে মাটিতে পড়ে গেল।

৫

কাউন্ট স্টাডিতে বসে ছিল। ঘরে ঢুকল আন্না ফিয়োদরভ্না। যেন কিছুই হয়নি এ রকম একটা ভাব ভাইকে দেখাতে হবে ভেবে নিয়ে সে শান্তভাবে প্রশ্ন করল, "বলো তো ভাই, আমার সঙ্গে যে অশ্বারোহী সৈনিক নাচল তিনি কে?" তুরবিন যে একজন জাঁদরেল "হুজার" যথাসাধ্য সে কথাটা বুঝিয়ে বলে অফিসার আরও জানাল যে পথে তার টাকা-পয়সা চুরি গেছে বলেই সে শহরে থেকে গেছে এবং বল-নাচে এসেছে। তাছাড়া সে নিজে তাকে একশ' রুবল ধার দিয়েছে, কিন্তু সেটা তো খুবই সামান্য; কাজেই বোনটি কি তাকে আরও দু'শ' রুবল ধার দিতে পারে না? সঙ্গে সঙ্গে সে বোনকে আরও বলে দিলো, সে যেন একথা কাউকে, বিশেষ করে সেই কাউন্টকে না বলে। আন্না ফিয়োদরভ্না কথা দিলো, সেদিন সন্ধ্যায়ই ভাইকে টাকাটা পাঠিয়ে দেবে এবং ব্যাপারটা গোপন রাখবে। কিন্তু "একোশাস" নাচবার সময় তার ভীষণ ইচ্ছা হলো, কাউন্টের যত টাকা দরকার হবে সবটাই দেবার প্রস্তাবটা তার কাছে তোলে। কিন্তু সে প্রস্তাব করবার মতো সাহস মনে আনতে তার বেশ কিছু সময় লাগল; সে লজ্জায় লাল হলো, ইতস্তত করল, তারপর অনেক চেষ্টা করে কথাটা পাড়ল।

"দেখুন কাউন্ট, আমার ভাই বলছিল যে পথের মধ্যে আপনার একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে এবং এখন আপনার কাছে টাকা-কড়ি কিচ্ছু নেই। টাকার দরকার হলে সেটা আপনি আমার কাছ থেকে নেবেন কি? নিলে আমি খুবই খুশি হব।"

কথাগুলো মুখ থেকে বের হওয়া মাত্রই আন্না ফিয়োদরভ্না ভীষণ ভয় পেল, চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল। কাউন্টের মুখের উপর থেকে সব আলো নিভে গেছে।

সে সোজা বলল, "আপনার ভাই একটি মুখ্খু। আপনি তো জানেন, একজন পুরুষ যখন অপর একজন পুরুষকে অপমান করে, তখন তাকে দ্বৈতযুদ্ধে আহ্বান করা হয়। কিন্তু কোনও স্ত্রীলোক একজন পুরুষকে অপমান করলে কি হয় জানেন কি?"

বেচারি আন্না ফিয়োদরভ্নার ঘাড় ও কান লজ্জায় জ্বালা করে উঠল। সে চোখ নামিয়ে নিল; একটা কথাও বলল না।

তার কানের কাছে মুখ এনে কাউন্ট চুপি চুপি বলল, "সকলের সামনে স্ত্রীলোকটিকে চুম্বন করা হয়।" মহিলাটির বিহ্বল অবস্থা দেখে তার করুণা হলো। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে নরম গলায় আবার বলল, "আপনার হাতখানি চুম্বন করবার অনুমতি আমাকে দিন।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আন্না ফিয়োদরভ্না বলল, "ওঃ, কিন্তু এখন নয়।"

"কখন? কাল সকালেই আমি চলে যাব। আর ওটা আমার প্রাপ্য।"

আন্না ফিয়োদরভ্না হেসে বলল, "কিন্তু এ অবস্থায় আপনার প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে পারছি না।"

"আজ রাতে আপনার সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ আমাকে দিন, তাহলেই আপনার হাতখানি চুম্বন করতে পারব। কিন্তু সে সুযোগ আমি নিজেই করে নেব।"

"কেমন করে করবেন?"

"সেটা আমার ব্যাপার। আপনার দেখা পাবার জন্য আমি সবকিছু করতে পারি। আপনার আপত্তি নেই তো?"

"না।"

'একোশাস' শেষ হয়ে গেল। তারা আর একটা 'মাজুরকা' নাচল। সেই নাচের সময় কাউন্ট অবাক কাণ্ড করতে লাগল; রুমাল চেপে ধরে, একটা হাঁটুর উপর ভর রেখে, বিচিত্র ওয়ালস-পদ্ধতিতে একই সঙ্গে দুটো গোড়ালিতে খট্ খট শব্দ তুলে এমন কাণ্ডকারখানা করল যে সে নাচ দেখতে বুড়োরা তাসের টেবিল ছেড়ে উঠে এল, আর যে অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারের শ্রেষ্ঠ নাচিয়ে বলে খ্যাতি ছিল সেও পরাজয় মেনে নিল। খাবার পরিবেশন করা হলো। শেষ পর্বে একটা "ঠাকুর্দা" নাচ হলো, তারপর অতিথিরা একে একে বিদায় নিতে লাগল। সারাক্ষণ কাউন্ট একদৃষ্টিতে ছোট্ট বিধবাটিকে দেখতে লাগল। সে যখন বলছিল যে তার জন্য বরফের ভিতরকার গর্তের মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করতেও সে প্রস্তুত, তখন সে মোটেই বাড়িয়ে বলেনি। কি ভালবাসা, কি খেয়াল, কি নেহাৎই একগুঁয়েমি, যে কারণেই হোক সেই সন্ধ্যায় তার মনের শক্তি একটিমাত্র বাসনায় কেন্দ্রীভূত হয়েছিল—তার সঙ্গে দেখা করা, আর তাকে ভালবাসা জানানো। সে যখন দেখল, আন্না ফিয়োদরভ্না গৃহস্বামিনীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে তখন সে দৌড়ে সহিসের ঘরে গেল এবং কোট না পরেই সেখান থেকে রাস্তায় নেমে গেল। সবগুলো গাড়ি সেখানে অপেক্ষা করছিল।

সে হেঁকে বলল, "আন্না ফিয়োদরভ্না জাইৎসভার গাড়ি।" লণ্ঠন-লাগানো চার আসনের একটা উঁচু গাড়ি বাড়িতে ঢোকবার মুখে এগিয়ে এল।

এক-হাঁটু বরফের ভিতর দিয়ে ছুটে গিয়ে সে কোচয়ানকে বলল, "থামো।"

কোচয়ান উত্তরে বলল, "আপনি কি চান?"

গাড়িতে চাপবার জন্য গাড়ির পাশে ছুটতে ছুটতে দরজাটা খুলে সে বলল, "আমি গাড়িতে ঢুকতে চাই। থামা, হারামজাদা। ব্যাটা মুখ্খু কোথাকার।"

কোচয়ান অপর চালককে বলল "ভাসকা। গাড়ি থামাও।" সে নিজেও ঘোড়ার রাশ টানল। "আপনি কেন অন্যের গাড়িতে চড়তে চাইছেন? মাননীয় মহাশয়, এ গাড়িটা আন্না ফিয়োদরভ্নার, আপনার নয়।"

কাউন্ট বলে উঠল, "চুপ কর্ বুদ্ধু কোথাকার। নে, এই এক রুবল নিয়ে নিচে নেমে দরজাটা বন্ধ করে দে।" কোচয়ান নড়ল না। তখন কাউন্ট নিজেই পাদানিতে উঠে জানালাটা খুলল এবং কোনওরকমে দরজাটাকে সশব্দে বন্ধ করে দিলো। সব পুরনো গাড়ি, বিশেষ করে জরির কাজ করা গদীওলা পুরনো গাড়ির মতো এ গাড়িটার ভিতরেও কেমন একটা ছাতা-পড়া, পোড়া কুচির গন্ধ। কাউন্টের পা দুটো

শুধুমাত্র পাতলা বুট ও রাইডিং-ব্রীচেসে ঢাকা ছিল, তার উপর এতক্ষণ হাঁটু পর্যন্ত বরফে ঢাকা থাকায় তার সমস্ত শরীর কাঁপছিল। কোচয়ান তার বক্সে বসেই গজ-গজ করছিল, এবার সে নামবার উপক্রম করল। কিন্তু কাউন্ট কিছুই জানলও না, বুঝলও না। তখন তার চোখ মুখ জ্বালা করছে, বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করছে। কাঁপা আঙুলে চামড়ার হলদে পোটিটা চেপে ধরে পাশের জানালা দিয়ে মুখটা বের করল, তার সমস্ত সত্তা তখন একটি মুহূর্তের প্রত্যাশায় কেন্দ্রীভূত। সে অবস্থা বেশিক্ষণ রইল না। বাড়ির প্রবেশ পথে কে যেন হেঁকে উঠল, "মাদাম জাইৎসেভার গাড়ি!" কোচয়ানের হাতের চাবুক হিস হিস করে উঠল, উঁচু স্প্রিং এর উপর গাড়িটা দুলে উঠল, আর বাড়ির আলৌকিক জানালাগুলি একের পর এক গাড়ির জানালার পাশ দিয়ে চলে যেতে লাগল।

সামনের জানালা দিয়ে মাথাটা বের করে কাউন্ট কোচয়ানকে বলল, "খবরদার, আমি যে এখানে আছি সে কথা সহিসকে বলবি না, বুঝলি বদমাশ। যদি বলিস, চাবকে লাল করে দেব, আর যদি না বলিস দশ রুবল।"

সশব্দে জানালাটা বন্ধ করবার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িটা একটু কাত হয়ে থেমে গেল। কুঁচকে এক কোণে সরে গিয়ে কাউন্ট নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল, এমন কি চোখও বন্ধ করল, তার তীব্র আশা পাছে ব্যর্থ হয়ে যায় এই তার ভয়। দরজা খুলে গেল, একে একে সিঁড়ি বেয়ে সে নেমে এল, ঝুঁকে পড়ে গাউনের খসখস শব্দ শোনা গেল, স্যাঁতসেঁতে গাড়ির মধ্যে ভেসে এল জুঁই ফুলের গন্ধ, ছোট দু'খানি পায়ের দ্রুত শব্দ হলো, আর আন্না ফিয়োদরভ্না তার পোশাকের আঁচলটা কাউন্টের পায়ের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে নীরবে রুদ্ধশ্বাসে তার পাশেই বসে পড়ল।

আন্না কাউন্টকে দেখতে পেল কি দেখল না তা কেউ বলতে পারে না, এমন কি সে নিজেও না। কিন্তু কাউন্ট যখন তার হাতখানি ধরে ফিসফিস করে উঠল, "এবার আমি তোমার হাতখানি চুম্বন করব," তখন সে কিছুমাত্র ভয় পেল না বা কোনও কথা বলল না। সঙ্গে সঙ্গে হাতখানা বাড়িয়ে দিতেই কাউন্ট দস্তানার অনেকটা উপর পর্যন্ত চুমোয় চুমোয় ভরে দিলো। গাড়ি চলতে লাগল।

কাউন্ট তাকে বলল, "কিছু বলো। তুমি রাগ করোনি তো?"

সে আরও কোণের দিকে সরে গেল। তারপরেই সহসা একেবারেই অকারণে তার চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল, আর মাথাটা আপনা থেকেই কাউন্টের বুকের উপর এলিয়ে পড়ল।

৬

নব-নির্বাচিত পুলিশ ক্যাপ্টেন ও তার দলবল, অশ্বারোহী-বাহিনীর অফিসার ও অন্যান্য ভদ্রজনরা বেশ কিছুক্ষণ হলো নতুন সরাইখানায় বসে মদে চুমুক দিতে দিতে জিপসিদের গান শুনছিল, এমন সময় আন্না ফিয়োদরভ্নার স্বর্গত স্বামীর ভালুক-

চামড়ার লাইনিং দেওয়া মোটা কাপড়ের নীল জোব্বাটা গায়ে চাপিয়ে কাউন্ট এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিলো।

একটি কালো-চুল জোড়া-ভুরু জিপসি ঢুকবার পথের মুখ পর্যন্ত ছুটে গিয়ে কোটটা খুলতে তাকে সাহায্য করতে করতে সাদা দাঁতের পাটি বের করে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বলে উঠল, "ওঃ, মাননীয় প্রভু, আপনার আসার আশা তো আমরা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। লেবেদিয়ানের পরে আর আপনার সঙ্গে দেখাই হয়নি। স্তাইয়োশ্‌কা তো আপনার জন্য শুকিয়ে মরছে।"

তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য স্তাইয়োশ্‌কাও ছুটে এল। সুন্দরী যুবতী জিপসি: ফোলা ফোলা গালে উষ্ণ লাল আভা, দুটি গভীর কালো-চোখের উজ্জ্বলতা দীর্ঘ পল্লবের ছায়ায় ঈষৎ ম্রিয়মাণ।

সানন্দে হেসে উঠে সে গুঞ্জনের সুরে বলল, "আঃ, আমার ছোট্ট কাউন্ট! আমার ছোট্ট প্রিয়! কী আনন্দ!"

এমন কি ইলিউশ্‌কাও খুশি হবার ভান করে তার দিকে ছুটে গেল। বৃদ্ধা, মধ্যবয়সিনী, কুমারী মেয়ে—সকলেই লাফিয়ে উঠে তাকে ঘিরে ধরল। অনেকেই তার সঙ্গে আত্মীয়তার দাবি জানাল,—কেউ বলল কাউন্ট তার ছেলেমেয়েদের ধর্মপিতা হয়েছিল আবার কেউ বলল সে তাদের সঙ্গে ক্রুশ-বিনিময় করেছিল।

তুরবিন সব তরুণী জিপসিদের ঠোঁটে চুম্বন করল; জিপসি বৃদ্ধা ও পুরুষেরা তার ঘাড়ে ও হাতে চুম্বন করল। সম্ভ্রান্ত জনরাও তাকে দেখে খুশি হলো, বিশেষ করে উৎসবের জৌলুস চরমে উঠে এখন পড়তি অবস্থায় বলে যেন তারা আরও খুশি হলো। প্রত্যেকেরই তখন অরুচি ধরে গেছে। মদে আর স্নায়ুতে উত্তেজনার স্রোত বইছে না, শুধু পাকস্থলীর বোঝাই বাড়াচ্ছে। যত রকমে হৈ-হুল্লোড় করা যায় সব শেষ করে অতিথিরা তখন বসে বসে পরস্পরের দিকে হাঁ করে তাকাচ্ছে। সব গান গাওয়া হয়ে গেছে, সেগুলো তাদের মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে গেছে, শুধু জেগে আছে গণ্ডগোল ও অপচয়ের একটা অস্পষ্ট ধারণা। যত মৌলিক ও দুঃসাহসিক খেলাই দেখানো হোক না কেন কেউ আর তাতে মজা পাচ্ছে না। পুলিশ অফিসারটি জনৈকা বৃদ্ধার পায়ের কাছে একটা কদর্য ভঙ্গিতে মেঝেয় পড়েছিল।

পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "শ্যাম্পেন! কাউন্ট এসেছেন! শ্যাম্পেন! তিনি এসেছেন। শ্যাম্পেন নিয়ে এস! স্নানের টবটাকে শ্যাম্পেনে ভর্তি করে আমি তাতে স্নান করব! ভদ্রমহোদয়গণ! এ ধরনের বিশিষ্ট সমাজে মিশতে আমি যে কত ভালবাসি! স্তাইয়োশ্‌কা! আবার 'খোলা পথ'টা গাও!"

অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারটিও তার মতই মাতাল হয়ে পড়েছে। তবে তার প্রকাশটা আলাদা। একটি লম্বা সুন্দরী জিপসি-মেয়ের একেবারে কাছ ঘেঁষে একটা সোফার এক কোণে গুঁড়িশুড়ি মেরে পড়ে আছে। মেয়েটার নাম লাইউবাশা; অফিসার বার বার চোখ পিটপিট করে আর মাথা নেড়ে মদের আচ্ছন্নতা কাটাতে

চেষ্টা করছে, আর বার বার একই ভাষায় মেয়েটাকে তার সঙ্গে পালিয়ে যেতে বলছে। লাইউবাশা হেসে তার কথা শোনার ভান করছে; তার বেশ মজাও লাগছে, আবার দুঃখও হচ্ছে। বার বারই সে তার বিপরীত দিকের চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে-থাকা তার জোড়া-ভুরুওয়ালা স্বামী সাশ্কার দিকে তাকাচ্ছে। অফিসারের প্রেম নিবেদনের জবাবে সে মাথা নিচু করে তার কানে কানে বলছে, কিছু ফিতে আব গন্ধ তেল সে কিনে দিক, কিন্তু খবরদার কেউ যেন জানতে না পারে।

কাউন্ট আসতেই অফিসার চেঁচিয়ে উঠল, "হুর্‌রা।"

সুন্দর যুবকটি চোখে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি নিয়ে অস্বাভাবিক দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে-পিছিয়ে "সেরাগলিওতে বিদ্রোহ" থেকে একটা সুর গুন-গুন করে গাইছিল।

অভিজাত ভদ্রজনের একান্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরে একজন প্রবীণ পরিবার-প্রধান জিপসিদের মজলিসে যোগ দিয়েছে। সকলেই তাকে বুঝিয়েছিল যে তিনি যোগদান না করলে তাদের মজাই নষ্ট হয়ে যাবে এবং কাবও ভাল লাগবে না। ভদ্রলোক সেখানে হাজির হয়েই একটা সোফায় সটান শুয়ে পড়েছে। তার দিকে কারও এতটুকু নজর নেই। জনৈক সরকাবী কর্মচাবী গায়েব ফ্রক-কোটটা খুলে টেবিলের উপরে পা তুলে সে যে কত বড় লম্পট সেটা বোঝাবার জন্য চুলগুলো উস্কোখুস্কো করে বসে আছে। কাউন্ট সেখানে ঢুকতেই সে শার্টের কলারটা খুলে টেবিলের উপবে আবও খানিকটা পিছনে সরে গেল। মোটেব উপর, কাউন্টের আগমনে জমায়েতটা আরও জমাট বেঁধে উঠল। জিপসিরা ঘবেব মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল, এবার তারাও গোল হয়ে বসল। একক গায়িকা স্তাইয়োশ্কাকে হাঁটুর উপব বসিয়ে কাউন্ট আরও শ্যাম্পেনের অর্ডাব দিলো।

ইলিউশ্কা তাদেব ঠিক সামনে বসেছিল গীটার হাতে নিয়ে। এবার সে "যখনই আমি পথে চলি", "এই, তোমবা অশ্বারোহী সৈনিকরা।" এবং "শোন আর বোঝ" প্রভৃতি জিপসি গান পব পব গেয়ে যাবার নির্দেশ হিসাবে "প্লায়াস্কা" শুরু করবার ইঙ্গিত করল। স্তাইয়োশ্কা চমৎকার গাইল। একেবারে বুকেব গভীর থেকে বেরিয়ে-আসা তাব মিষ্টি, নমনীয় মেয়েলি স্বর, তার মুখের বিজয়িনীর হাসি, হাস্যমুখর উচ্ছ্বসিত চাউনি, গানেব তালে তালে ছোট পায়ের স্বতঃস্ফূর্ত তাল ঠোকা, প্রতিটি সমবেত কণ্ঠের শুরুতে তার অনুচ্চ বন্য চিৎকার—সব কিছু মিলে গীটারের তারকে স্পর্শ না করেও যেন তাতে কাঁপন জাগিয়ে তুলল। গানের মধ্যে সে যেন তার সমস্ত আত্মাকে ডুবিয়ে দিলো। গীটারে তার সঙ্গে সহযোগিতা করল ইলিউশ্কা। পিঠ ও পায়েব ছোট ছোট তালে, তার হাসিতে, তার সমগ্র সত্তা দিয়ে সে ঐ গানের সঙ্গে তার একাত্মতা প্রকাশ করতে লাগল। গানের তালে তালে মাথা নাড়তে নাড়তে তার উপর সজাগ দৃষ্টি রেখে এমন আগ্রহ ও মনযোগের সঙ্গে সে গান শুনতে লাগল যেন ও গান আগে সে কখনও শোনেনি। গানের শেষ সুরটি মিলিয়ে যেতেই সহসা সে সোজা হয়ে দাঁড়াল, এবং যেন নিজেকে পৃথিবীর সকলের সেরা মানুষ ভেবে

নিয়ে সগর্বে ও স্বেচ্ছায় হাঁটু দিয়ে গীটারটাকে এমনভাবে ঠুকে দিলো যে সেটা বাতাসে ঘুরপাক খেতে লাগল আর সেই সঙ্গে সে মেঝেতে পা ঠুকতে শুরু করে দিলো, চুলগুলোকে পিছনে সরিয়ে দিলো, আর ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিপসিদের সমবেত সঙ্গীতকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। তারপর শুরু হলো তার নাচ—দেহের প্রতিটি তন্ত্রী দিয়ে সে নাচতে লাগল। আর কুড়িটি জোরালো বলিষ্ঠ কণ্ঠ একযোগে বাজতে লাগল; প্রত্যেকেই প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল সব চাইতে নতুন ও মৌলিক এক সুর সৃষ্টি করতে। বৃদ্ধ মহিলারা আসন না ছেড়েই ছোট ছোট লাফ দিতে লাগল, রুমাল ওড়াতে লাগল, আর মুখ বিকৃত করে গানের তালে তালে এমনভাবে চিৎকার করতে লাগল যেন প্রত্যেকেই চাইছে অপরের কণ্ঠকে ডুবিযে দিতে। আর পুরুষরা চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে তাদের গভীর মোটা গলা ছেড়ে দিলো, মাথা নাড়তে লাগল, তাদের কণ্ঠনলি ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

স্তাইয়োশ্‌কা যখনই চড়া পর্দায় যায় তখনই যেন তাকে সাহায্য করবার জন্য ইলিউশ্‌কা গীটারটাকে আরও কাছে নিয়ে যায়, আর সুন্দর যুবকটিও সোল্লাসে চিৎকার করে ওঠে।

একটা নাচের গান যখন চলছিল তখন দানিয়াশা এগিয়ে গেল। তার কাঁধ ও বুক কাঁপছে। প্রথমে সে কাউন্টের সামনে ঘুবপাক খেল, তারপর মেঝের মাঝখানে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠল তুরবিন, জ্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো, এবং দুই পায়ের কারিকুরিতে এমন সব কাণ্ড দেখাতে লাগল যাতে জিপসিরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে সমর্থনের হাসি হাসতে লাগল।

পুলিশ ক্যাপ্টেন তুর্কীদের মতো জোড়াসন হয়ে বসেছিল। হাতের মুঠি দিয়ে বুক চাপড়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, ''সাবাশ!'' তাবপর কাউন্টেব পা চেপে ধরে বলল যে দু' হাজার রুবল নিয়ে সে এসেছিল, তার মধ্যে মাত্র পাঁচ শ' অবশিষ্ট আছে, এখন কাউন্ট মঞ্জুর করলেই সেটা দিয়ে সে যা খুশি তা করতে পারে। প্রবীণ পরিবার-প্রধানটি ঘুম থেকে উঠে বাড়ি যেতে চাইল, কিন্তু তাকে যেতে দেওয়া হলো না। সুদর্শন যুবকটি জনৈকা জিপসি মেয়েকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রকাশের ব্যগ্রতায় অফিসারটি এক কোণ থেকে এগিয়ে এসে দুই বাহু দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল।

বলল, ''ওগো প্রিয়, আমাদের ফেলে আপনি কোথায় ছিলেন?'' কাউন্ট জবাব দিলো না, তখন তার মন রয়েছে অন্য কোথাও। ''কোথায় ছিলেন আপনি? আপনি বড় চালাক লোক কাউন্ট, আমি জানি কোথায় গিয়েছিলেন!''

যে কারণেই হোক, এই গায়ে-পড়া ভাব দেখে তুরবিন বিরক্ত হলো। সে না হেসে অফিসারের মুখের দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকাল মাত্র, কোনও কথাই বলল না। তারপর হঠাৎ সে এমন হুল-ফোটানো কথার ফুলঝুড়ি ছোটাতে শুরু করল যে অফিসার হতভম্ব হয়ে গেল এবং এটা সত্যি রাগ না ঠাট্টা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। শেষ

পর্যন্ত সে একটুখানি হেসে জিপসি মেয়েটার কাছে ফিরে গিয়ে তাকে বোঝাতে লাগল যে ঈস্টাবেব পরেই সে তাকে বিয়ে করবে।

সকলে মিলে আর একটা গান করল, আরও একটা, আবও নাচল, পরস্পরের প্রতি সম্মানে গান করল এবং ভাবল, কী মজায়ই না সময়টা কাটল। শ্যাম্পেনের স্রোতেব বিরাম নেই। কাউন্ট প্রচুব মদ খেল। তার চোখ আবছা হয়ে এল, কিন্তু পা টলল না। সে খুব ভাল নাচল, অকম্পিত গলায় কথা বলল, জিপসিদেব সমবেত সঙ্গীতে গলা মেলাল, এবং স্তাইয়োশ্‌কা যখন গাইল "ভালবাসার পাখায় লাগে মধুর কাঁপন" তখন সেও তার সঙ্গে সুর মেলাল।

একটা গানের মাঝখানে সরাইখানার মালিক এসে সবাইকে চলে যেতে বলল, কারণ তখন প্রায় তিনটে বাজে। কাউন্ট তাব গর্দান চেপে ধবে তাকে একটা স্কোয়াট নাচতে হুকুম কবল। সে অস্বীকার করল। কাউন্ট একটা শ্যাম্পেনেব বোতল হাতে নিয়ে মালিককে মেঝেতে উল্টে ফেলল, তার কথা মতো সকলে তাকে চেপে ধরল, আব সকলের হৈ-হল্লার মধ্যে সে সমস্ত বোতলটাই তার গায়ে ঢেলে দিলো।

তখন দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে। একমাত্র কাউন্ট ছাড়া আব সকলেই বিবর্ণ ও পরিশ্রান্ত।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, "আমাকে এখনই মস্কো রওনা হতে হবে। মশাইরা, আমাকে বিদায় জানাতে আমার সঙ্গে হোটেলে ফিরে চলুন। একটু চা খাওয়া যাবে।"

একমাত্র ঘুমন্ত পরিবার-প্রধান ছাড়া আব সকলেই সম্মতি দিলো এবং তাকে সেখানে বেখেই সকলে চলে গেল। দরজায় দাঁড়ানো তিনটি স্লেজে সকলে গাদাগাদি হয়ে বসে হোটেলে রওনা হলো।

৭

অতিথিবর্গ ও জিপসিদেব সঙ্গে নিয়ে হোটেলেব বাইরের ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই কাউন্ট চেঁচিয়ে বলল, "ঘোড়াগুলোকে সাজ পরা। সাশ্‌কা!—না, না, জিপসিদের সাশ্‌কা নয়, আমার সাশ্‌কা—পোস্টমাস্টারকে বলে দে, আমাকে খারাপ ঘোড়া দিলে আমি তার চামড়া ধোলাই করে দেব। আর আমাদেব জন্য চা নিয়ে আয়। জাভাল্‌শেভ্‌স্কি, তুমি চায়ের ব্যবস্থাটা দেখো, আমি ততক্ষণ ইল্‌যিনের ঘরে গিয়ে দেখে আসি সে কেমন আছে।" কথা শেষ করে সে দালান পেরিয়ে উহ্‌লানের ঘরের দিকে গেল।

ইল্‌য়িন সবে খেলা শেষ কবেছে। শেষ কোপেক পর্যন্ত হেরে গিয়ে সে ঘোড়াব লোমের ছেঁড়া সোফায় শুয়ে একটা একটা করে লোম টেনে তুলে মুখে দিচ্ছে, আর দাঁতে কামড়ে থু-থু করে ফেলে দিচ্ছে। দুটো মোমবাতি টেবিলে জ্বলছে। একটা একেবারে তলাকার কাগজ পর্যন্ত পুড়ে গেছে। তাসগুলো টেবিলের উপর ইতস্তত ছড়ানো। জানালা দিয়ে ভোরের যে আলো এসে পড়েছে, মোমবাতির ম্লান আলো

যেন বৃথাই তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চ'লেছে। উইলানের মনে চিন্তার লেশমাত্র নেই, জুয়ার নেশার গাঢ় কুয়াশায় তার মনের সব ক্ষমতা চাপা পড়ে গেছে; দুঃখবোধ পর্যন্ত চলে গেছে। একথা ঠিক যে একসময়ে সে ভাবতে চেষ্টা করছিল এরপর কি করবে, কোপেকহীন অবস্থায় এখান থেকে যাবে কেমন করে, রেজিমেন্টের পনেরো হাজারই বা ফেরৎ দেবে কেমন করে, রেজিমেন্ট কম্যান্ডারই বা কি বলবে, তার মা কি বলবে, সহকর্মীরা কি বলবে- এই কথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে এতখানি ভয় ও বিরক্তি তাকে চেপে ধরল যে সব কিছু ভুলে যাবার জন্য সে লাফ দিয়ে উঠে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল, বিশেষ করে মেঝেতে পাতা বোর্ডের ফাঁটা জায়গাগুলোতেই পা ফেলে হাঁটতে লাগল। আবার নতুন করে যতগুলো খেলা সে খেলেছে তার বিস্তারিত বিবরণ মনে করতে লাগল। মনে পড়ল, সে প্রায় জিতে যাচ্ছিল—সে তুলেছিল স্পেডের নওলা আর সাহেব, আর তার উপর বাজি ধরেছিল দু' হাজার রুবল. ডাইনে—বিবি; বাঁয়ে—টেক্কা; ডাইনে—ডায়মন্ডের গোলাম, আর - সে সবটা হেরে গেল। ছক্কাটা যদি থাকত ডাইনে আর ডায়মন্ডের সাহেবটা বাঁয়ে, তাহলেই সে সবটা জিতে নিত এবং আবার সবটা বাজি ধরে আরও পরিষ্কার পনেরো হাজার জিততে পারত। আঃ, তাহলেই সে রেজিমেন্ট কম্যান্ডারের একটা জিনসুদ্ধ ঘোড়া কিনে ফেলত, আর তাছাড়া আরও একজোড়া ঘোড়া ও একখানি ফিটন। আর কি? কেন কেন আঃ কী আশ্চর্য ব্যাপারই না হতো, আশ্চর্য!

পুনরায় সোফায় শুয়ে পড়ে সে লোম চিবুতে লাগল।

মনে মনে ভাবল, "ওরা সাত নম্বর ঘরে গান গাইছে কেন? নিশ্চয় তুরবিন সবাইকে আপ্যায়ন করছে। হয় তো আমারও সেখানে যাওয়া উচিত. পেটে মদ পড়লেই হয় তো ভাল হয়ে যাব।"

ঠিক সেই সময় কাউন্ট ঘরে ঢুকল।

জিজ্ঞাসা করল, "কি হে, একেবারে ছিবড়ে করে দিয়েছে তো?"

ইলয়িন ভাবল, "ঘুমের ভান করে পড়ে থাকি, নইলে কথা বলতে হবে. কিন্তু আমি ভীষণ ক্লান্ত।"

কিন্তু তুরবিন কাছে গিয়ে তার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

"কি হে ভাল মানুষ, ছিবড়ে করে দিয়েছে তো? সব হেরে গেছ? কথা বলো।"

ইলয়িন জবাব দিলো না।

কাউন্ট তার আস্তিন ধরে টানল।

"হ্যাঁ, হেরেছি। তাতে আপনার কি?" ঘুম-ঘুম গলায় এমনভাবে ইলয়িন কথাগুলো বলল যাতে তার বিরক্তি ও উদাসীনতাই প্রকাশ পেল; সে পাশ ফিরল না পর্যন্ত।

"সব?"

"হ্যাঁ। তাতে কি? সব। তাতে আপনার কি?"

কাউন্ট বলল, "শোনো। একজন কমরেড হিসাবে আমাকে সত্য কথা বলো।" সুরার প্রভাবে তার মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি জেগে উঠেছে; সে আস্তে আস্তে যুবকটির মাথার চুলে হাত বুলোতে লাগল। "সত্যি, তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি। ঠিক করে বলো তো, যদি সত্যি তুমি রেজিমেন্টের টাকা হেরে থাক, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব; এখনই আমাকে বলো, এটা কি রেজিমেন্টের টাকা? এর পরে হয় তো অনেক দেরি হয়ে যাবে।"

ইল্‌য়িন সোফা থেকে লাফ দিয়ে নামল।

"আপনি যদি সত্যি জানতে চান, তাহলে এমনভাবে আমার সঙ্গে কথা বলবেন না যেন ..যেন দয়া করে আমাকে কিছু বলবেন না। আমার মাথাব ভিতর দিয়ে একটা বুলেট চালিয়ে দেওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই!" দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে গভীর নৈরাশ্যে সে কথা বলতে লাগল, অথচ মাত্র মুহূর্তেক আগে সে একটা জিন-আঁটা ঘোড়ার স্বপ্ন দেখছিল।

"এই দেখো, তুমি যে মেয়েলি কাণ্ড শুরু করে দিলে। বিপদ সকলের জীবনেই আসে। বিশেষ ক্ষতি তো কিছু হযনি; মনে হচ্ছে যেটুকু হয়েছে তা শুধরে নেওয়া যাবে। আমি ফিরে আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করো।"

কাউন্ট বেরিয়ে গেল।

ছোকরা চাকরটাকে জিজ্ঞাসা কবল, "জমিদার লুখনভ কোন্ ঘরে থাকেন?"

ছোকরা দেখিয়ে দিলো।

খানসামা বাধা দিয়ে জানাল যে তার প্রভু এইমাত্র ঘরে ঢুকে জামা কাপড় ছাড়ছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও কাউন্ট ভিতরে ঢুকে গেল। টেবিলের সামনে বসে ড্রেসিং-গাউন পরিহিত লুখনভ সামনে রাখা একগাদা ব্যাংক-নোট গুনছিল। টেবিলের উপর তার একান্ত প্রিয় রাইন-মদও এক বোতল ছিল। খেলায় জিতেছে বলেই এই দামী মদের ব্যবস্থা সে করেছে। লুখনভ চশমার ভিতব দিয়ে এমন কঠিন নিস্পৃহ দৃষ্টিতে কাউন্টের দিকে তাকাল, যেন তাকে সে চেনেই না।

সদর্পে পা ফেলে টেবিলের কাছে গিয়ে কাউন্ট বলল, "মনে হচ্ছে আপনি আমাকে চেনেনই না।"

কাউন্টকে চিনতে পেরে লুখনভ বলল, "আপনার জন্য কি করতে পারি?"

সোফায় বসে তুরবিন বলল, "আপনার সঙ্গে আমি তাস খেলতে চাই।"

"এখন?"

"হ্যাঁ।"

"দেখুন কাউন্ট, অন্য কোনও সময় আমি আনন্দের সঙ্গেই খেলব, কিন্তু এখন আমি শ্রান্ত, শুতে যাব।"

"আমি এখনই খেলতে চাই।"

"আজ রাতে আর খেলবার ইচ্ছা আমার নেই। হয় তো আর কোনও ভদ্রলোক খেলতে পারেন, কিন্তু আমি পারব না কাউন্ট। আশা করি ক্ষমা করবেন।"

"তাহলে আপনি খেলবেন না?"

লুখনভ দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়েই যেন বুঝিয়ে দিলো যে কাউন্টের মনোবাসনা পূর্ণ করতে না পারায় সে দুঃখিত।"

"কোনও কিছুর জন্যই নয়?"

আবার ছোট একটা ঝাঁকুনি।

"খুব আন্তরিকভাবে জিজ্ঞাসা করছি : খেলবেন কি না?"

নীরবতা।

"আপনি কি খেলবেন?" কাউন্ট আবার বলল। "মনে রাখবেন এখনই!"

লুখনভ তথাপি নিরুত্তর। চশমার উপর দিয়ে সে দ্রুত একবার কাউন্টের মুখের উপর দৃষ্টিপাত করল—সেখানে দ্রুত মেঘ জমছে।

"আপনি খেলবেন কি না," চিৎকার করে কথাগুলি বলেই কাউন্ট এমন জোরে টেবিলের উপর আঘাত করল যে রাইন-মদের বোতলটা পড়ে গিয়ে সব মদ গড়িয়ে পড়ল। "আপনি জানেন যে আপনি ফাঁকিবাজি করে জিতেছেন। আপনি খেলবেন কি না? এই তৃতীয়বার আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।"

চোখ না তুলেই লুখনভ মন্তব্য করল, "আমি তো বলে দিয়েছি, খেলব না। কিন্তু আপনার আচরণ তো অদ্ভুত কাউন্ট। সম্ভ্রান্ত মানুষ কখনও এ ভাবে হামলা করে লোকের গলার উপর ছুরি তুলে ধরে না।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ। কাউন্টের মুখ ক্রমেই ফ্যাকাসে হয়ে উঠতে লাগল। হঠাৎ মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে লুখনভ জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। টাকাগুলোকে হাত দিয়ে চেপে ধরে সে সোফার উপর লুটিয়ে পড়ল; তার মুখ দিয়ে এমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল যা তার মতো একজন ধীর স্থির সম্ভ্রান্ত লোকের কাছ থেকে কেউই আশা করতে পারে না। তুরবিন তাড়াতাড়ি টাকাগুলো হাতিয়ে নিল। প্রভুর আর্তনাদ শুনে খানসামা ছুটে এসেছিল। তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে সে দরজার দিকে পা বাড়াল।

দরজার কাছে পৌঁছে কাউন্ট বলল, "যদি বোঝাপড়া করতে চান, আমি তৈরি আছি। আরও আধঘণ্টা আমি আমার ঘরে থাকব।"

ঘরের ভিতর থেকে চিৎকার ভেসে এল, "চোর! বদমাশ! আমি তোমাকে আদালতে নিয়ে তবে ছাড়ব।"

সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে বলে কাউন্ট যে কথা দিয়েছিল ইল্‌য়িন তাতে মোটেই বিশ্বাস করেনি। নিরাশার কান্নায় তার গলা আটকে আসছিল। সে তখনও সোফায়ই শুয়ে ছিল। কাউন্টের সহানুভূতি তার মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। নিজের অবস্থা সম্পর্কে সে এখন সচেতন হয়েছে। সে বুঝতে পারছে, তার আশাময় যৌবন, তার সম্মান, সহকর্মীদের শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও বন্ধুত্বের স্বপ্ন,—সব চিরতরে মুছে গেছে। চোখের জল শুকিয়ে গেছে, একটা শান্ত নৈরাশ্য ক্রমেই তার মনের উপর

চেপে বসছে, আর আত্মহত্যার চিন্তা মনের মধ্যে ভয় ও বিতৃষ্ণা না জাগিয়ে বরং ক্রমেই বাড়তে শুরু করেছে। ঠিক সেই সময় কাউন্টের দৃঢ় পদশব্দ তার কানে এল।

তুর্বিনের মুখে তখনও ক্রোধের আভাস, হাত দুটি সমানে কাঁপছে, কিন্তু দুটি চোখ আনন্দে ও তৃপ্তিতে জ্বলজ্বল করছে।

একগাদা নোট টেবিলের উপর রেখে বলল, "দেখো, সব আমি জিতে নিয়েছি। গুণে দেখো সব ঠিক আছে কি না। তারপর জল্দি বসবার ঘরে চলে এস। আমি চলে যাচ্ছি।" উহ্লানের মুখে যে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠল তা যেন সে দেখেও দেখল না। একটা জিপসি গানের সুরে শিস্ দিতে দিতে ঘর থেকে চলে গেল।

৮

চারপাশটা শক্ত করে কোমরে জড়িয়ে সাশ্কা জানিয়ে দিলো যে ঘোড়া তৈরি। সে আরও দাবি জানাল, তাদের উচিত এখনই গিয়ে কাউন্টের পুরো তিনশ' রুবল দামের ফারের কলার লাগানো গ্রেটকোটটা উদ্ধার করা, আর যে জোচ্চোররা মার্শালের গ্রেটকোটটা হাতিয়ে নিয়েছে, ঐ বাজে নীল আলখাল্লাটা তাদের ফিরিয়ে দেওয়া। কিন্তু তুর্বিন বলল, গ্রেটকোটটা ফিরে পাবার কোনও দরকার নেই। তারপরই সে পোশাক বদলাবার জন্য তার ঘরে চলে গেল।

অফিসারটি তার মনের মতো জিপসি মেয়েটার পাশে চুপচাপ বসে অনবরত হিক্কা তুলছে। পুলিশ ক্যাপ্টেন ভদকার অর্ডার দিয়ে সমবেত ভদ্রজনকে তার বাড়িতে প্রাতরাশের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের কথা দিলো যে তার স্ত্রীও নিচে নেমে জিপসিদের সঙ্গে নাচবে। সুদর্শন যুবকটি ইলিউশ্কাকে বোঝাতে চেষ্টা করছে যে গীটার অপেক্ষা পিয়ানোফোর্ট অনেক বেশি প্রাণময় বাজনা। সরকারী কর্মচারীটি এক কোণে বসে চা খাচ্ছিল; এখন দিনের আলো ফুটতে দেখে নিজের লাম্পট্যের জন্যই লজ্জা বোধ করতে লাগল। জিপসিরা নিজেদের ভাষায় তর্কাতর্কি করছিল; তারা বলছিল যে ভদ্রলোকদের সম্মানে আর একটা গান হোক, কিন্তু স্টাইয়োশ্কা এই বলে আপত্তি করছিল যে তাতে 'ব্যারোরে'ই (কাউন্ট, প্রিন্স বা সম্ভ্রান্ত লোক) রাগ করবে। এক কথায় বলা যায়, সেখানে জীবনের শেষ স্ফুলিঙ্গটাও যেন নিভু নিভু হয়ে এসেছে।

ভ্রমণের উপযোগী পোশাক পরে ঘরে ঢুকল কাউন্ট। তাকে আরও ঝরঝরে, আরও সুন্দর, আরও উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। সে বলল, "বিদায় বেলায় একটা শেষ গান হোক, তারপরই যে যার বাড়ি।"

জিপসিরা গোল হয়ে বসে শেষ গানের জন্য তৈরি হয়েছে, এমন সময় এক বান্ডিল নোট হাতে নিয়ে ইলিয়িন ঘরে ঢুকে কাউন্টকে একপাশে ডাকল।

বলল, "আমার কাছে শুধু রেজিমেন্টের পনেরো হাজার রুবল ছিল, আর আপনি আমাকে দিয়েছেন ষোল হাজার তিন শ'। বাকিটা তো আপনার প্রাপ্য।"

"চমৎকার! সেগুলো আমাকে দিয়ে দাও!"

টাকাটা দেবার সময় ইল্য়িন সলজ্জভাবে কাউন্টের দিকে তাকাল, কিছু বলবার জন্য মুখও খুলল, কিন্তু পারল না; লজ্জায় লাল হয়ে তার চোখে জল এল; কাউন্টের হাতটা সে সজোরে চেপে ধরল।

"এখন চলে যাও! ইলিউশ্‌কা! শোনো--এই নাও কিছু টাকা; শহরের গেট পর্যন্ত গানে গানে আমাকে বিদায় জানাও।" ইল্য়িনের দেওয়া এক হাজার তিন শ' রুবল সে জিপসিদের গীটারের উপর ছড়িয়ে দিলো। কিন্তু আগের রাতে অফিসারটির কাছ থেকে যে একশ' রুবল ধার করেছিল সেটা শোধ করতে ভুলে গেল।

সকাল দশটা বাজে। সূর্য বাড়ির ছাদের উপর উঠে এসেছে, পথঘাট লোকজনে পূর্ণ, দোকানীরা অনেক আগেই দরজা খুলেছে, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ও সরকারী কর্মচারীরা ঘোড়ায় চড়ে চলেছে, মহিলারা বাজারের এক দোকান থেকে অন্য দোকানে ঘোরাফেরা করছে, এমন সময় জিপসিদের দল, পুলিশ ক্যাপ্টেন, অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার, সুদর্শন যুবক, ইল্য়িন এবং ভালুকের চামড়ার পাড়-বসানো নীল আলখাল্লা পরিহিত কাউন্ট হোটেলের সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল। দিনটি রৌদ্রোজ্জ্বল। বরফ গলতে শুরু করেছে। উঁচু করে লেজ বাঁধা তিন-ঘোড়ায় টানা তিনটে স্লেজ হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল, আর সমস্ত আনন্দমুখর দলটা তাতে চেপে বসল। কাউন্ট, ইল্য়িন স্টাইয়োশ্‌কা, ইলিউশকা আর কাউন্টের চাকর সাশ্‌কা উঠল প্রথম স্লেজটায়। উত্তেজনায় অস্থির হয়ে ব্লুইশার লেজ নাড়তে নাড়তে ঘেউ-ঘেউ করতে লাগল। বাকি তিনজন ও জিপসিরা উঠল অন্য স্লেজে। হোটেলটা পার হবার পরেই তিনটে স্লেজ পাশাপাশি চলতে লাগল, আর জিপসিরা সমবেত কণ্ঠে গান শুরু করে দিলো।

এইভাবে গাইতে গাইতে আর ছোট ছোট ঘণ্টার ঠুন্ ঠুন্ শব্দ করতে করতে তারা সারা শহর পার হয়ে গেট পর্যন্ত এগিয়ে চলল। পথে যত গাড়ি পড়ল সেগুলোকে ঠেলে দিলো ফুটপাথের উপর। এই সব শ্রদ্ধার্হ ভদ্রজনরা প্রকাশ্য দিবালোকে শহরের রাজপথে গাড়ি হাঁকিয়ে যাচ্ছে, আর তাদের সঙ্গে গান গেয়ে চলেছে জিপসি মেয়েরা আর মাতাল জিপসি পুরুষরা, এ দৃশ্য দেখে দোকানী ও পদযাত্রী, বিশেষ করে যারা তাদের চিনত তাদের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

শহরের গেট পেরিয়ে স্লেজগুলো দাঁড়িয়ে পড়ল। সকলেই কাউন্টের কাছ থেকে বিদায় নিল।

যাত্রার আগে ইল্য়িন অনেকটা মদ খেয়েছিল। এতক্ষণ সে নিজেই ঘোড়াগুলোকে চালাচ্ছিল। হঠাৎ তার খুব মন খারাপ হয়ে গেল; কাউন্টকে আরও একটা দিন থেকে যেতে বলল। কিন্তু যখন বুঝল যে সেটা সম্ভব নয় তখন খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে সে সজল চোখে নতুন বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে জানাল যে, রেজিমেন্টে ফিরে গিয়েই যে অশ্বারোহী রেজিমেন্টে তুরবিন কাজ করে সেখানে বদলি হবার জন্য সে একখানা আবেদন-পত্র পেশ করে দেবে। কাউন্ট তখন খুশিতে মশগুল। সারা

সকালটা অফিসারের সঙ্গে কাটানোর ফলে তার সঙ্গে কাউন্টের বেশ কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। কাউন্ট তাকে ধাক্কা মেরে বরফের ভিতর ফেলে দিলো। ব্লুইশারকে লেলিয়ে দিলো/পুলিশ ক্যাপ্টেনের দিকে। দুই হাতে স্তাইয়োশ্‌কাকে তুলে ধরে তাকে মস্কো নিয়ে যাবে বলে ভয় দেখাল। সব শেষে এক লাফে স্লেজে চেপে ব্লুইশারকে নিজের পাশে বসিয়ে দিলো, যদিও কুকুরটা চাইছিল মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে। কাউন্টের গ্রেটকোটটা খুঁজে পেতে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য অফিসারকে আর একবার অনুরোধ জানিয়ে সাশ্‌কাও লাফিয়ে চালকের আসনে উঠে বসল। কাউন্ট চেঁচিয়ে বলল, "চললাম!" টুপিটা খুলে মাথার উপর নাড়তে লাগল, স্লেজ চালকের মতো করে ঘোড়াগুলোকে লক্ষ্য করে শিস দিতে লাগল, আর তিনখানা স্লেজ তিন দিকে এগিয়ে চলল।

সম্মুখে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত একঘেয়ে ববফ-ঢাকা প্রান্তর, আর তার ভিতব দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে ময়লা হলুদ ফিতের মতো রাস্তাটা। গলে-পড়া বরফেব চুড়োয় নৃত্যপর ঝকঝকে উজ্জ্বল সূর্যটা মুখে ও পিঠে একটা আবামদায়ক উষ্ণতার ছোঁযা লাগিয়ে দিচ্ছে। ঘোড়াগুলোর ঘর্মাক্ত দেহ থেকে বাষ্প উঠছে। স্লেজের ঘণ্টাগুলো ঠুনঠুন্ করে বাজছে। একটি চাষী তার বেশি বোঝাই-করা স্লেজের পাশে পাশে দৌড়ে যাচ্ছিল; কাউন্টকে পথ ছেড়ে দেবার জন্য তাড়াতাড়িতে ঘোড়ার দড়িতে টান দিতে গিয়ে পথের পাশের কাদায তার বাকলের জুতো ডুবে গেল। একটি মোটামতো লাল-মুখো চাষী মেয়ে ভেড়ার চামড়াব কোটের ভিতবে বুকের কাছে একটা বাচ্চাকে নিয়ে আর একটা স্লেজে বসে লাগামের গোড়া দিয়ে সাদা টাট্টুঘোড়াটার পিঠে আস্তে আস্তে টোকা মারছিল। সহসা কাউন্টের মনে পড়ল আন্না ফিয়োদরভ্‌নার কথা।

চেঁচিয়ে বলে উঠল, "মুখ ঘোবাও।"

চালক ঠিক বুঝতে পারল না।

"গাড়ি ঘোরাও! শহরে ফিবে চলো! জলদি!"

আবার গেট পেরিয়ে স্লেজটা দ্রুত ছুটতে ছুটতে মাদাম জাইৎসভার বাড়ির কাঠের দরজার সামনে হাজির হলো। কাউন্ট সিঁড়ি দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে প্রবেশপথের হল ও বসবার ঘব পার হযে গেল। ছোট বিধবাটি তখনও বিছানায়ই ছিল। দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে তুলে নিয়ে তার ঘুম-ঘুম দুটি চোখ চুম্বনে ভরে দিয়ে কাউন্ট দৌড়ে বেরিয়ে গেল। আধো-ঘুম অবস্থায় আন্না ফিয়োদরভ্‌না শুধু তাব ঠোঁট দুটি চাটতে চাটতে অস্পষ্ট স্বরে বলে উঠল, "হলো কি?"

লাফ দিয়ে স্লেজে উঠে কাউন্ট চালককে চেঁচিয়ে নির্দেশ দিলো, এবং তারপর আর তিলমাত্র বিলম্ব না করে, লুখনভ, বা ছোট্ট বিধবাটি, বা স্তাইয়োশ্‌কাব কথা একটিবারের জন্যও মনে না এনে শুধু মস্কোব কথা ভাবতে ভাবতেই চিরদিনের মতো কে-শহর ছেড়ে চলে গেল।

৯

কুড়ি বছর পার হয়ে গেছে। সেতুর নিচ দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে, অনেকের মৃত্যু হয়েছে, অনেক মানুষ জন্মেছে, আবার অনেকে এতদিনে বড় হয়েছে বা বার্ধক্যে পৌঁছেছে; এমন কি মানুষের তুলনায় অনেক বেশি নতুন ভাবাদর্শের জন্ম হয়েছে এবং মৃত্যু ঘটেছে। পুরনো দিনের অনেক কিছু ভাল এবং অনেক কিছু মন্দ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে; অনেক নতুন ভাল জিনিসের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে, এমন কি অনেক নতুন খারাপ জিনিসও দেখা দিয়েছে।

অনেক বছর পার হয়ে গেল। কাউন্ট ফিয়োদর তুরবিন মারা গেছে; পথের মাঝখানে জনৈক বিদেশীকে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে মেরেছিল বলে সেই বিদেশীর সঙ্গে তার যে দ্বৈত-যুদ্ধ হয় তাতেই সে মারা যায়। তার ছেলে যেন হুবহু বাবার প্রতিমূর্তি। সে এখন তেইশ বছরের মনোহরণ যুবক, 'ক্যাভেলিয়ার গার্ডেস'-এ অফিসার। কিন্তু প্রকৃতিতে তরুণ কাউন্ট তুরবিনের সঙ্গে তার বাবার একদম মিল নেই। বিগত যুগের উচ্ছৃংখল, আবেগময়, এবং খোলাখুলি বললে, অসংযত চরিত্রহীনতার ছায়ামাত্র তার মধ্যে নেই। বুদ্ধিমত্তা, সুশিক্ষা ও স্বভাবগত প্রতিভা সে তো উত্তরাধিকারসূত্রেই লাভ করেছে; সেগুলি ছাড়াও তার উল্লেখযোগ্য গুণাবলীর মধ্যে মর্যাদা ও আরামের প্রতি আকর্ষণ, মানুষ ও ঘটনাকে বিচার করবার বাস্তবানুগ পদ্ধতি এবং জীবনের প্রতি সতর্ক ও অর্থপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অন্যতম। এই তরুণ কাউন্টটি চাকরির ক্ষেত্রেও বেশ এগিয়ে গেছে; তেইশ বছর বয়সেই সে লেফ্‌টেন্যান্ট পদে উন্নীত হয়েছে।

যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল তখন সে বুঝতে পারল যে যুদ্ধে যোগ দিলে পদোন্নতির সম্ভাবনা অনেক বেশি তাই সে একটি অশ্বারোহী রেজিমেন্টে নিজের বদলির ব্যবস্থা করে ক্যাপ্টেন হয়ে যোগদান করল এবং শীঘ্রই একটি স্কোয়াড্রনের ভারপ্রাপ্ত হলো।

১৮৪৮-এর মে মাসে অশ্বারোহী বাহিনীর এস. রেজিমেন্ট "কে" গুবার্নিয়ার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল এবং তরুণ কাউন্ট তুরবিনের অধীনস্থ স্কোয়াড্রনটিকে একটা রাত কাটাতে হলো আন্না ফিয়োদরভ্‌নাদের গ্রাম মরজভ্‌কাতে। আন্না ফিয়োদরভ্‌না তখনও বেঁচে আছে, কিন্তু তার বয়স তখন এতই বেশি যে নিজেকেও আর তরুণী বলে ভাবে না, আর মেয়েদের দিক থেকে এটা খুবই বাড়াবাড়ি ব্যাপার। সে খুবই বড়সড় হয়ে উঠেছে, কোনও নারী নিজেকে বয়সের তুলনায় ছোট দেখাবার জন্য এই কথাই বলে থাকে। তার নরম সাদা দেহ জুড়ে বলিরেখার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সে এখন আর গাড়ি চেপে শহরে যায় না, আসলে সে আর গাড়িতে চড়তেই পারে না। কিন্তু তার স্বভাব আগের মতোই হাসিখুশি, আর বোকা-বোকাই আছে; কথাটা বলতে পারছি এই জন্য যে তার মধ্যে আর এমন কোনও সৌন্দর্য অবশিষ্ট নেই যা, আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারে। মেয়ে লিজা তার কাছেই থাকে। তার বয়স তেইশ বছর, দেখতে সুন্দরী। আর তার দাদা আমাদের পরিচিত সেই অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারও তার আয়েসী স্বভাবের জন্য বিষয়-সম্পত্তি সব উড়িয়ে দিয়ে

বৃদ্ধ বয়সে এখন বোনের কাছেই থাকে। মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে; উপরের ঠোঁটটা বেঁকে গেছে, কিন্তু ঠোঁটের উপরকার গোঁফ-জোড়াটি সযত্ন কলপের ফলে বেশ কালোই আছে। বলিরেখা শুধু তার গাল আর কপালকেই ছেয়ে ফেলেনি, তার নাক ও গলাকেও ছেয়েছে; পিঠ বেঁকে গেছে, কিন্তু দুর্বল দুটি বাঁকা ঠ্যাঙে এখনও যেন পুরনো দিনের অফিসারের কিছুটা অবশিষ্ট আছে।

ঘটনার দিন সন্ধ্যাবেলা পরিবারের ও গৃহস্থালির সকলকে নিয়ে সে পুরনো বাড়িটার ছোট বসবার ঘরে বসে ছিল। ঘরের বারান্দার দরজা ও জানালাগুলো লেবু গাছের ছায়ায় ঘেরা পুরনো আমলের তারকাকৃতি একটি বাগানের দিকে খোলে। মাথা-ভর্তি পাকা চুল আন্না ফিয়োদরভ্‌না একটা সুগন্ধি আবরণে ঢাকা জ্যাকেট গায়ে দিয়ে গোল মেহগেনি টেবিলটার পিছনে একটা সোফায় বসে 'সলিতেয়ার' (এক রকম একক খেলা) খেলছিল। তার বৃদ্ধ দাদা পরিষ্কার সাদা পাৎলুন ও নীল কোট পরে জানালার পাশে বসে সাদা সুতো দিয়ে কি যেন বুনছিল। যেহেতু সে আর এখন কোনওরকম গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারে না এবং চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত কমে যাওয়ায় তার একান্ত প্রিয় কাজ খবরের কাগজও আর পড়তে পারে না, সেই জন্য বোন-ঝিটি তাকে এই বোনাটা শিখিয়ে দিয়েছে, আর কাজটা তারও খুব ভাল লেগে গেছে। আন্না ফিয়োদরভ্‌নার পালিত কন্যা ছোট্ট পিমচ্‌কা তার পাশে বসে লেখাপড়া করছিল। লিজা তার লেখাপড়ার তদারক করছিল আর মামার জন্য ছাগলের লোমের একজোড়া মোজা বুনছিল। দিনের এই সময়টা যেমন হয়ে থাকে, অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিগুলো লেবু গাছের ফাঁক দিয়ে তির্যকভাবে পড়ে সর্বশেষ জানালাটাকে আলোকিত করে তুলেছে। ঘরের ভিতরটা এবং বাগানটা এতই শান্ত, স্তব্ধ যে জানালার বাইরে চাতক পাখির পাখার ঝাপটানি, ঘরের মধ্যে আন্না ফিয়োদরভ্‌নার শান্ত দীর্ঘশ্বাস আর পা দুটো ভাঙবার সময় বৃদ্ধ লোকটির কাতরোক্তি—সব তারা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল।

খেলা থামিয়ে আন্না ফিয়োদরভ্‌না বলল, "এই তাসটা যে কোথায় গেল! লিজা, খুঁজে দে তো; আমি সব ভুলে যাই।"

বোনা না থামিয়েই লিজা মায়ের কাছে উঠে গিয়ে তাসগুলি দেখতে লাগল।

তাসগুলো ঠিকমতো গুছিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি যে সব গুলিয়ে ফেলেছ মাগো। ঠিক এই ভাবে সাজাতে হবে। তবে এইভাবেই হবে—তুমি ঠিক ধরেছ।' মায়ের চোখ অন্য দিকে থাকায় সেই ফাঁকে সে একখানা তাস সরিয়ে দিলো।

"তুই তো সব সময়ই আমাকে বোকা বানাস, বলিস ঠিক হয়ে যাবে।"

"সত্যি যাবে। দেখছ? হয়ে গেল।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে রে ঝগড়াটি। আরে, চা খাবার সময় কি হয়নি?"

"সামোভারটা গরম করতে বলেছি। যাই, দেখে আসি। চা কি এখানেই আনতে বলব? পিমচ্‌কা তাড়াতাড়ি পড়া শেষ করো, আমরা যে বেড়াতে যাব।"

লিজা দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বোনার উপর চোখ রেখেই মামা ডেকে বলল, "লিজা! লিজচ্‌কা! আবার একটা ঘর বাদ পড়ে গেছে। সেটা তুলে দে, লক্ষ্মী মেয়ে।"

"এক মিনিট, এক মিনিট! এই চিনির ডেলাটা দিয়েই আসব।"

ঠিক তাই, তিন মিনিটের মধ্যেই সে দৌড়ে ঢুকে মামার কাছে গিয়ে তার কান পাকড়ে ধরল।

হেসে বলল, "ঘর ফেলে দেবার এই শাস্তি। আজকের জন্য তোমাকে যতটুকু কাজ দেওয়া হয়েছিল তাও তুমি করনি।"

"আর আর, ঠিক করে দে — মনে হচ্ছে কোথাও একটা গিঁট পড়েছে।"

লিজা ক্রেচেটের কাঁটাটা হাতে নিয়ে মাথার রুমাল থেকে পিনটা খুলে নিল। ফলে জানালা দিয়ে আসা বাতাসে রুমালটা অল্প অল্প উড়তে লাগল। তারপর পিন দিয়ে ঘরটাকে ধরে ধরে দু' তিনটি গিঁট দিয়ে বোনাটা মামাকে ফিরিয়ে দিলো।

পিনটাকে রুমালে যথাস্থানে লাগাতে লাগাতে নিজের গোলাপী গালটা এগিয়ে দিয়ে বলে উঠল, "মজুরি হিসাবে একটা চুমু দাও। আজ তুমি চায়ের সঙ্গে মদ পাবে। তুমি তো জানো আজ শুক্রবার।"

আবার সে চায়ের ঘরে চলে গেল।

"মামা! শিগ্গির এসো, দেখে যাও, 'হুজার'-রা আসছে!" স্পষ্ট জোরালো গলায় সে চিৎকার করে ডাকতে লাগল।

আন্না ফিয়োদরভ্না ও তার দাদা 'হুজার'দের দেখতে চায়ের ঘরে গেল। ঘরের জানালাগুলো গ্রামের দিকে খোলা। জানালা দিয়ে খুব সামান্যই দেখা গেল, শুধু বোঝা গেল ধুলোর মেঘের ভিতর দিয়ে একদল লোক ছুটে যাচ্ছে।

লিজার মামা আন্না ফিয়োদরভ্নাকে বলল, "বড়ই দুঃখের কথা বোন, আমাদের বাড়িটা এত ছোট, আর নতুন অংশটা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। নইলে কয়েকজন অফিসারকে আমাদের বাড়িতে আমন্ত্রণ করতে পারতাম। অশ্বারোহী বাহিনীর যুবক অফিসাররা এত আমুদে যে তাদের দেখতে আমার খুব ইচ্ছা করে।"

"তাদের কাছে পেলে আমিও আনন্দে আটখানা হতাম, কিন্তু তুমি তো জানো দাদা, তাদের রাখবার মতো জায়গা আমাদের নেই। আছে শুধু আমার শোবার ঘর, লিজার ছোট ঘর, বসবার ঘর, আর তোমার ঘর। তাদের এনে রাখব কোথায়? তুমি নিজেই ভেবে দেখো। মিখাইলো মাৎভেয়েভ প্রবীণদের বাড়িটা তাদের জন্য ঠিক করেছে। সে বলেছে, বাড়িটা যথাযোগ্যভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে।"

মামা বলল, "লিজচ্‌কা, ওদের ভিতর থেকে একটি সাহসী অশ্বারোহীকে বেছে তোর বর করে দেব।"

"আমি 'হুজার' চাই না, আমি চাই 'উহ্‌লান'। আচ্ছা মামা, তুমি তো বর্শাধারী বাহিনীতে ছিলে? এই সব অশ্বারোহীদের আমার পছন্দ নয়, শুনেছি তারা খুব উচ্ছৃঙ্খল হয়ে থাকে।"

লিজার গাল দুটিতে ঈষৎ রঙের ছোপ লাগল। আবার সে খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, "ঐ যে উস্তয়ুশ্‌কা দৌড়ে আসছে; ও কি দেখে এল শুনতে হবে।"

আন্না ফিয়োদরভ্‌না উস্তয়ুশ্‌কাকে ডেকে আনল; বলল, "তোমার বুঝি হাতে কোনও কাজ নেই! তাই সৈন্যদের দেখতে ছুটেছ! আচ্ছা, অফিসারদের কোথায় থাকতে দেওয়া হবে?"

"এরেম্‌কিনের বাড়িতে মাদাম। অফিসার দু'জন, আর কী সুন্দর! সকলে বলছে, একজন নাকি কাউন্ট।"

"তার নাম কি?"

"কাজারভ, কি তুরবিন নাকি ঐ রকম একটা কিছু—আমার ঠিক মনে পড়ছে না, সেজন্য ক্ষমা চাইছি।"

"তুমি একটা বোকার ডিম—কিচ্ছু বলতে পারো না। অন্তত তার নামটা তো জেনে আসবে।"

"বলেন তো দৌড়ে গিয়ে জেনে আসি।"

"ওঃ, সে কাজে তুমি খুব পটু, তা কি আর জানি না! না, বরং দানিলো যাক। দাদা, তাকে যেতে বলো; জেনে আসুক, অফিসারদের কিছু লাগবে কিনা; তাদের সঙ্গে সবরকম ভদ্রতা করতে হবে; হ্যাঁ, সে যেন বলে যে তার কর্ত্রী তাকে পাঠিয়েছেন।"

বুড়ো-বুড়ি দু'জনে চায়ের ঘরেই বসে রইল। চিনিটা দেবার জন্য লিজা দাসীদের ঘরে গেল। গিয়ে দেখে, উস্তয়ুশ্‌কা অশ্বারোহীদের কথা বলছে।

সে বলছে, "কাউন্টটি যে কী সুন্দর যদি দেখতেন! ঠিক যেন দেবদূত ঃ কালো ভুরু, কালো চুল! ওরকম একজন স্বামী যদি আপনার হয়, তাহলে একেবারে রাজ-যোটক হবে!"

অন্য চাকর-বাকররাও হেসে সম্মতি জানাল। বুড়ি নার্সটি জানালায় বসে একটা মোজা রিপু করছিল; একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অস্ফুট স্বরে কি যেন প্রার্থনা জানাল।

লিজা বলল, "তাহলে অশ্বারোহীদের দেখে এই তোমার মনে হয়েছে! এই সব কপচানো ছাড়া তোমার বুঝি আর কোনও কাজ নেই! উস্তয়ুশ্‌কা, কিছুটা ফলের রস এনে দাও—একটু যেন টক্‌টক্ হয়, অশ্বারোহীদের দিতে হবে।"

হাসতে হাসতে লিজা চিনির পাত্র নিয়ে চলে গেল।

মনে মনে ভাবল, "অশ্বারোহীটিকে একবার দেখতে হচ্ছে। সে কি ফর্সা না কালো? আমাদের সঙ্গে পরিচয় হলে সে যে খুশিই হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু হয় তো সে এখান দিয়েই চলে যাবে, অথচ কোনওদিন জানতেও পারবে না আমি এখানে বসে তার কথা ভেবেছি। তার মতো কত জনই তো চলে গেল। মামা আর উস্তয়ুশ্‌কা ছাড়া আর কেউ কোনওদিন আমাকে দেখল না। কেমন করে আমি চুল বাঁধলাম, বা কি রকমের জামা পরলাম, তাতে কি এসে গেল? আমাকে প্রশংসা

করবার তো কেউ নেই।" গোলগাল সাদা দু'খানি হাতের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ভাবতে লাগল, "হয়তো সে বেশ লম্বা, বড় বড় চোখ, হয়তো ছোট কালো গোঁফ আছে। ভাবুন তো, তেইশ বছর বয়স হয়ে গেল, অথচ একমাত্র মুখভর্তি বসন্তের দাগ আইভান ইপাতিচ্ ছাড়া আর কেউ আজ পর্যন্ত আমার প্রেমে পড়ল না! আর চার বছর আগে তো আমি এখনকার চাইতেও সুন্দরী ছিলাম। আমার বালিকা-বয়স তো প্রায় শেষ হতে চলল, কিন্তু কেউ তো তা ভোগ করল না। হায়, আমি কী হতভাগিনী? একটা বেচারি গাঁয়ের মেয়ে!"

চা ঢালতে মা ডাকল। সেই ডাক শুনে গাঁয়ের মেয়েটির স্মৃতি-রোমন্থনে ছেদ পড়ল। একটুখানি মাথা ঝাঁকিয়ে সে চায়ের ঘরে গেল।

হঠাৎ যা ঘটে যায় তাই ভাল; চেষ্টা করে যা করা হয় সেটা প্রায়ই খারাপই হয়। গ্রামাঞ্চলে শিশুদের শিক্ষার প্রতি মোটেই নজর দেওয়া হয় না, অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের শিক্ষাটা ভালই হয়ে থাকে। লিজার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আন্না ফিয়োদরভ্না‌র মনও যেমন সীমিত, তার স্বভাবও তেমনি আলস্যপ্রিয়; কাজেই সে লিজাকে লেখাপড়া কিছুই শেখায়নি; গান-বাজনা শেখায়নি, অপরিহার্য ফরাসী ভাষাটুকুও নয়; কিন্তু নেহাৎই ঘটনাচক্রে সে তার স্বর্গত স্বামীকে একটি সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন শিশু উপহার দিয়েছিল—একটি মেয়ে। দাই ও নার্সের কাছেই সে মানুষ হয়েছে। সে তাকে খাইয়েছে, সুতির ফ্রক আর ছাগলের চামড়ার জুতো পরিয়েছে, জাম আব ব্যাঙের ছাতা কুড়োতে পাঠিয়েছে, একটি তরুণ ছাত্রকে দিয়ে তাকে পড়তে, লিখতে ও অঙ্ক কষতে শিখিয়েছে, আর ষোল বছর পরে হঠাৎ আবিষ্কার করেছে যে লিজা একটি ভাল বন্ধু আর আমুদে, দয়ালু ও পরিশ্রমী গৃহকর্ত্রী হয়ে উঠেছে। আন্না ফিয়োদরভ্না নিজে এতই দয়ালু-চিত্ত যে সে মাঝে মাঝেই কোনও ভূমিদাসের সন্তান বা বেওয়ারিশ শিশুকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করেছে। দশ বছর বয়স থেকেই লিজা তার মায়ের এই সব পোষ্যদের ভার নিয়েছে। সে তাদের প্রাথমিক লেখাপড়া শিখিয়েছে, পোশাক পরিয়েছে, গীর্জায় নিয়ে গেছে, আর দুষ্টুমি করলে বকুনিও দিয়েছে। তারপর এল তার দুর্বল, ভাল মানুষ বুড়ো মামাটি; ছোট শিশুর মতোই তারও দেখাশুনা করতে হতো। তার উপরে আছে বাড়ির দাসদাসী ও গ্রামের ভূমিদাসরা; সব জ্বালা-যন্ত্রণার জন্যই তারা এই ছোট্ট কর্ত্রীটির কাছেই ছুটে আসে; আর সেও এল্ডার-ফুলের রস, পিপারমেন্ট ও কর্পূরের নির্যাস দিয়ে তাদের চিকিৎসা করে। আর আছে গোটা বাড়িটার ঝক্কি-ঝামেলা, ঘটনা-চক্রে সে সবই তার ঘাড়েই এসে চেপেছে। তার উপর আছে ভালবাসার তৃষ্ণা,—প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা ও ধর্মের প্রতি আকর্ষণের ভিতর দিয়েই যার প্রকাশ। কাজেই ঘটনা-চক্রেই লিজা হয়ে উঠেছে একটি সদাব্যস্ত, হাসিখুশি, প্রীতিপূর্ণ, স্বাধীন, পবিত্র ও গভীরভাবে ধর্মভীরু নারী। একথা ঠিক যে, গীর্জায় গিয়ে যখন দেখে যে তার প্রতিবেশিনীরা কে-শহর থেকে আনা আধুনিক সব টুপি পরেছে তখন তার মনে ঈর্ষার জ্বালা ধরে; তার

খুঁতখুঁতে বুড়ি মায়ের খামখেয়ালের জন্য তার চোখ জলে ভরে আসে; তার ভালবাসার স্বপ্ন বাঁকা-চোরা, এমনকি স্থূল রূপ নিয়ে থাকে—কিন্তু যে অনিবার্য দরকারী কাজ তার উপর চেপেছে তাতেই সে সব কিছু তার মন থেকে দূরে চলে গেছে; আর বাড়ন্ত মেয়েটির দৈহিক ও নৈতিক সৌন্দর্য এতই বেশি যে তেইশ বছর বয়সেও কোনও দাগ, কোনও অনুতাপ তার উজ্জ্বল শান্ত আত্মাকে বিদ্ধ করতে পারেনি। লিজার উচ্চতা মাঝারি, দেহ-গঠন অনেকটাই গোলগাল, বাদামী চোখ দুটি বড় নয়, নিচের পাতায় কিছুটা ছায়ার আভাস; মাথার চুল দীঘল ও সুন্দর; চলনে একটা সহজ দোলনের ভঙ্গিমা। যখন কাজে ব্যস্ত থাকে এবং কোনও কষ্টের কথা মনে না থাকে তখন তার মুখের ভাব যেন সকলকে ডেকে বলে; যার বিবেক পরিষ্কার, আর যার জীবনে আছে ভালবাসার মানুষ, তার কাছে তো জীবন সুন্দর, জীবন আনন্দময়। এমন কি বিরক্তি, বিক্ষোভ, ত্রাস বা দুঃখের মুহূর্তেও যখন ইচ্ছার বিরুদ্ধেও দুটি চোখ জলে ভরে আসে, ঠোঁট দুটি দৃঢ়বদ্ধ হয়, বাম ভুরু হয়ে ওঠে ভ্রুকুটি-কুটিল,—তখনও গালের ছোট্ট টোলে, ঠোঁটের কোণায় ও উজ্জ্বল দুটি চোখে ফুটে ওঠে এমন একটি দয়ালু সরল হৃদয়ের ছবি যাকে আধুনিকতার স্পর্শও নষ্ট করতে পারেনি।

১০

সূর্য অস্ত গেছে, কিন্তু গরম কমেনি; এমন সময়ে স্কোয়াড্রনটি মরজভ্‌কায পৌঁছল। তাদের আগে আগে গায়ে ফুট-ফুট দাগ একটা দলছাড়া গরু গ্রামের ধুলো-ভর্তি রাস্তা ধরে ছুটতে লাগল; মাঝে মাঝেই সেটা থেমে গিয়ে ডাকতে লাগল, যেন সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না যে ঘোড়াগুলোকে পথ ছেড়ে দেওয়াই তার কর্তব্য। অশ্বারোহী সৈনিকরা ছোট লাগাম-আঁটা হ্রেষাধ্বনিমুখর কালো ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ধুলোর ঘন মেঘের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে, আর বুড়ো চাষীরা, গাঁয়ের বৌরা, ছেলেমেয়েরা ও বাড়ির চাকররা রাস্তার দুই পাশে ভিড় করে হাঁ করে তাদের দেখছে। স্কোয়াড্রনের ডান পাশে জিনের উপর আরাম করে বসে চলেছে দু'জন অফিসার। তাদের মধ্যে একজন কাউন্ট তুরবিন, সে সেনাপতি; অপরজন পলোজভ, যুবকটি সবেমাত্র কমিশন পেয়েছে।

গ্রামের সবচাইতে ভাল কুটির থেকে বেরিয়ে এল সাদা ঢিলে জামা পরা একজন অশ্বারোহী সৈনিক; মাথার টুপি খুলে সে অফিসারদের দিকে এগিয়ে গেল।

কাউন্ট জিজ্ঞাসা করল, "আমাদের থাকবার কি ব্যবস্থা হয়েছে?"

কোয়ার্টার মাস্টারটি সারা শরীর শক্ত করে জবাব দিলো, "ইয়োর এক্সেলেন্সির জন্য? প্রবীণদের এই কুটিরটি আপনার জন্য পরিষ্কার করে রেখেছি। জমিদারবাড়িতে একটা ঘর চেয়েছিলাম, কিন্তু সেটা পাওয়া যায়নি। কর্ত্রীটি নীচ প্রকৃতির মানুষ।"

ঘোড়া থেকে নেমে পা দুটি টান করে প্রবীণদের কুটিরের দিকে যেতে যেতে কাউন্ট বলল, "ঠিক আছে। আমার গাড়িটা পৌঁছেছে কি?"

"এসেছে ইয়োর ইক্সেলেন্সি," টুপিটাকে ফটকে দাঁড়ানো গাড়িটার দিকে বাড়িয়ে জবাব দিলো কোযার্টার মাস্টার, আর তাবপরেই ফটকের দিকে ছুটে গেল। অফিসারদের দেখতে একটা চাষী পরিবার সেখানে ভিড় করেছিল। নতুন ঝাড়পোছ করা কুটিরের দরজাটা হাট করে খুলে দিতে গিয়ে একটি বৃদ্ধাকে সে প্রায় ধাক্কা মেরেই ফেলে দিলো। তারপর কাউন্টকে পথ করে দেবার জন্য এক পাশে সরে দাঁড়াল।

কুটিরটি বেশ বড় ও খোলামেলা, কিন্তু ভাল করে পরিষ্কার করা হয়নি। ভদ্রলোকের মতো পোশাক-পরা একটি জার্মান খানসামা একটা লোহার খাট পেতে ব্যাগের ভিতর থেকে বিছানার চাদর বের করছিল।

"উঃ, কী গরু-ছাগলের মতো কোয়ার্টার!" বিরক্তকণ্ঠে কাউন্ট বলে উঠল। "দিযাদেংকো, জমিদার-বাড়িতে কোথাও আমাদের ঠেলে নিয়ে যাওয়া কি সত্যি অসম্ভব?"

দিয়াদেংকো জবাব দিলো, "ইয়োর এক্সেলেন্সি হুকুম দিলে এখনই কাউকে সেখানে পাঠাতে পারি। কিন্তু জমিদার-বাড়ির অবস্থাও তথৈবচ—এই কুটির থেকে খুব ভাল কিছু নয়।"

"দেবিও হয়ে গেছে। এখন যাও।"

মাথাব নিচে দুই হাত রেখে কাউন্ট শুয়ে পড়ল।

খানসামাকে ডেকে বলল, "জোহান! বিছানার মাঝখানে আবার একটা ঢেলা বের করে রেখেছে! ভাল করে বিছানাটাও কি করতে পার না?"

জোহান বিছানাটা ঠিক কবতে গেল।

কাউন্ট বিরক্ত গলায় বলে উঠল, "থাক, অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমার ড্রেসিং গাউনটা কোথায়?"

খানসামা ড্রেসিং গাউনটা দিলো।

গায়ে চড়াবার আগেই কাউন্ট তাব সেলাইটা পরীক্ষা কবতে লাগল।

"ঠিক এইটেই ভেবেছিলাম; ঐ দাগটা তোলনি। তোমার চাইতে খারাপ কাজ কেউ করতে পারে বলে তো মনে হয় না।" লোকটার হাত থেকে গাউনটা টেনে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে বলল, "এটা কি ইচ্ছা করে করেছ, না কি? চা হয়েছে?"

"সময় পাইনি," জোহান বলল

"হাঁদারাম!"

সঙ্গে আনা একখানি ফরাসী উপন্যাস নিয়ে কাউন্ট নীরবে কয়েক মিনিট সেটা পড়তে লাগল। জোহান সামোভারটা গরম করতে চলে গেল। পরিষ্কাব বোঝা যাচ্ছিল, পথের ক্লান্তি, নোংরা চোখ-মুখ, আঁটো পোশাক আর খালি পেটেব জন্যই কাউন্টের মেজাজ শরিফ নেই।

সে আবার চেঁচিয়ে ডাকল, "জোহান! তোমাকে যে দশ রুবল দিয়েছিলাম তার হিসাব দাও। শহরে কি কি কিনেছ?"

কাউন্ট হিসাবটার উপর চোখ বুলিয়ে জিনিসগুলি খুব বেশি দামে কেনা হয়েছে বলে কয়েকটি বিরূপ মন্তব্য করল।

"চায়ের সঙ্গে রাম খাব।"

"রাম তো কিনিনি," জোহান বলল।

"চমৎকার! কতবার তোমাকে বলেছি না হাতের কাছে রাম রাখতে?"

"আমার কাছে যথেষ্ট টাকা ছিল না।"

"পলোজভ কেন কিনল না? তাহলে তো তার লোকের কাছ থেকে নিতে পারতে?"

"কর্নেট পলোজভ? আমি জানি না। তিনি তো শুধু চা আর চিনি কিনেছেন।"

"হতভাগা! বেরিয়ে যাও! তোমার মতো আর কেউ আমাকে ভোগায় না। তুমি ভাল করেই জানো যে পথে নামলে চায়ের সঙ্গে রাম আমার চাই।"

খানসামা বলল, "স্টাফ হেডকোয়ার্টার থেকে আপনার এই চিঠি দুটো এসেছে।"

বিছানায় শুয়েই কাউন্ট খাম ছিঁড়ে চিঠিগুলি পড়তে লাগল। ঠিক তখনই হাসিমুখে ঘরে ঢুকল কর্নেট। এতক্ষণ সে লোকজনদের থাকবার ব্যবস্থা করছিল।

"এই যে তুরবিন? মনে হচ্ছে জায়গাটা খারাপ নয়। কিন্তু আমি ভীষণ ক্লান্ত। সারাদিন যা গরম।"

"খারাপ নয়! এই নোংরা, স্যাঁতসেঁতে কুঁড়ে, আর চায়ের সঙ্গে রামটুকু পর্যন্ত নেই। তোমাকে বহুৎ ধন্যবাদ। তোমাব বোকাটাও রাম কিনতে ভুলে গেছে, আমারটাও তাই। তোমার লোকটাকে তো বলতে পারতে।"

সে আবার চিঠিতে মন দিলো। প্রথম চিঠিটা পড়া শেষ করেই সেটাকে দলা পাকিয়ে মেঝেতে ছুঁড়ে দিলো।

ওদিকে দরজার বাইরে গিয়ে কর্নেট তার চাকরকে ফিসফিস করে বলল, "কিছুটা রাম কেননি কেন? তোমার কাছে তো টাকা ছিল; ছিল না?"

"সব কেনাকাটা আমরাই বা করব কেন? এমনিতেই তো সব খরচ আমি করি; ওঁর জার্মান লোকটা তো কেবল পাইপ টানে।"

দ্বিতীয় চিঠিটা বোধ হয় খারাপ নয়, কারণ সেটা পড়তে পড়তে কাউন্ট হাসছিল।

পলোজভ ততক্ষণে ঘরে ফিরে এসেছে। স্টোভের পাশের বোর্ডের উপর নিজের জন্য একটা বিছানা করতে করতে সে বলল, "কার চিঠি?"

চিঠিটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে কাউন্ট খুশি মনে জবাব দিলো, "মিন্নার। পড়বে নাকি? কী মনোরমা নারী! আমাদের মেয়েদের চাইতে অনেক ভাল। দেখো না, এই চিঠিতেই কত বুদ্ধি আর ভাব ফুটে উঠেছে; শুধু একটা জিনিস খারাপ—সে বড় টাকা চায়।"

"ঠিক, সেটা খারাপ," কর্নেট মন্তব্য করল।

"সত্যি বলতে কি, তাকে কিছু টাকা দেব কথা দিয়েছিলাম; কিন্তু তারপরই এই

অভিযান শুরু হয়ে গেল, আর...মানে কিন্তু যদি আরও তিন মাস আমি এই স্কোয়াড্রনের নেতৃত্বে থাকি, তাহলে টাকাটা তাকে পাঠাব। টাকা দিতে আমার কোনও আপত্তি নেই; সে খুব মনোহরা, নয় কি?" পলোজভের পাঠরত মুখের ভাব লক্ষ্য করে সে হেসে প্রশ্ন করল।

কর্নেট বলল, "একেবারেই গো-মুখ্‌খু, তবে বেশ মিষ্টি বটে, আর মনে হয় তোমাকে সত্যি ভালবাসে।"

"সত্যি ভালবাসে! ওর মতো মেয়েরা যখন ভালবাসে তখন সত্যি ভালবাসে।"

চিঠি পড়া শেষ করে সেখানা ফিরিয়ে দিয়ে কর্নেট প্রশ্ন করল, "অপর চিঠিটা কে লিখেছে?"

"ওটা? ও একটি বাজে লোক; তার কাছে আমি তাস খেলায় অনেক টাকা হেরেছিলাম। এই তৃতীয়বার সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলো। এখনই তার টাকা ফেরৎ দিতে পারছি না। একটা বাজে চিঠি," কথাটা মনে পড়ায় বিব্রত হয়ে কাউন্ট বলে উঠল।

এরপর অফিসার দু'জন কিছুক্ষণ কোনও কথাই বলল না। কাউন্টের মনের অবস্থার প্রভাবে পড়ে কর্নেট আবার আলাপ শুরু করতে ভয় পেয়ে নিঃশব্দে চা খেতে লাগল, আর মাঝে মাঝেই তুরবিনের সুন্দর মুখের দিকে তাকাতে লাগল; তুরবিন তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে জানালা দিয়ে একদৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে রইল।

মাথাটা সামান্য ঝাঁকি দিয়ে পলোজভের দিকে ঘুরে কাউন্ট হঠাৎ বলে উঠল, "ঠিক আছে, সব ঠিক হয়ে যাবে। এ বছর যদি রেজিমেন্টে সকলের পদোন্নতি ঘটে, তাছাড়া যদি যুদ্ধে চলে যাই, তাহলে আমার যে সব বন্ধু এখন রক্ষীবাহিনীতে ক্যাপ্টেন হয়েছে তাদের সবাইকে আমি ছাড়িয়ে যেতেও পারি।"

দ্বিতীয় গ্লাস চা খেতে খেতে যখন এই ধরনের কথাবার্তা চলছিল তখন বুড়ো দালিনো আন্না ফিয়োদরভ্‌নার বার্তা নিয়ে ঘরে ঢুকল।

অফিসারটির নাম শুনে এবং স্বর্গত কাউন্টের কে-শহর পরিদর্শনের কথা স্মরণ করে দালিনো নিজের থেকেই বলল, "তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে আদেশ দিয়েছেন, আপনি কাউন্ট ফিয়োদর আইভানিচ তুরবিনের ছেলে কি না। আমাদের কর্ত্রী আন্না ফিয়দরভ্‌না তাঁকে খুব ভাল চিনতেন।"

"তিনি আমার বাবা; তোমার কর্ত্রীকে বলো, আমাদের জন্য তিনি এতটা ভেবেছেন বলে আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ এবং কোনও কিছু আমাদের চাইও না। তবে তাঁকে বলো, জমিদার-বাড়িতে বা অন্য কোথাও যদি আমাদের জন্য এর চাইতে পরিচ্ছন্ন একটা ঘর পাওয়া যায় তাহলে আমরা বাধিত হব।"

দালিনো চলে গেলে পলোজভ বলল, "তুমি ও কথা বললে কেন? তফাৎটা কি হবে? আমরা তো এখানে থাকব মাত্র একটা রাত, তার জন্য তাদের এত সব অসুবিধা ঘটাতে যাব কেন?"

"রেখে দাও তোমার ঐ সব নীতি-কথা! মুরগির ঘরে কি অনেক রাত কাটানো হয়নি? বোঝাই যাচ্ছে তোমার কোনও বাস্তব বুদ্ধি নেই। একটা রাতের জন্য হলেও আরামে ঘুম দেবার একটা সুযোগ পেলে ছাড়ব কেন? আর তাতে তারাও কৃতার্থ বোধ করবে। শুধু একটা জিনিস আমার পছন্দ হচ্ছে না: এই যে তিনি আমার বাবাকে চিনতেন," স্মিত হাসিতে ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো দেখিয়ে কাউন্ট বলতে লাগল। "বাপির কথা মনে হলেই আমার লজ্জা হয়—সর্বত্রই হয় কোনও কুৎসা, নয় তো ঋণ। সেইজন্যই তাঁর কোনও পরিচিত জনের সান্নিধ্য আমি সইতে পারি না। অবশ্য তখন দিনকালই ঐ রকম ছিল," সে গম্ভীরভাবে বলল।

পলোজভ বলল, "তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, একদা ইল্যিন নামক উহ্লান বাহিনীর জনৈক সেনাপতির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে খুব উৎসুক, আর তোমার বাবার প্রতি খুব অনুরক্ত।"

"মনে হচ্ছে ঐ ইল্যিন লোকটি খুবই বাজে। আসল কথা হলো, যে সব লোক বাবার সঙ্গে পরিচয়ের দাবি নিয়ে আমার কাছে আসে, তারা চমৎকার ঘটনা হিসাবে তাঁর সম্পর্কে যে সব কাহিনী আমাকে বলে সেগুলো শুনতে আমার লজ্জা করে। অস্বীকার করছি না—আমি সব সময় সব কিছুকেই শান্ত বাস্তব দৃষ্টিতে দেখতে চেষ্টা করি—যে তিনি খুবই বদমেজাজী লোক ছিলেন এবং মাঝে মাঝে এমন কাজ করে বসতেন যেটা তাঁর করা উচিত নয়। কিন্তু সে সবই সময়ের দোষ। আমাদের কালে হয় তো তিনি খুবই সফলতা অর্জন করতে পারতেন, কারণ তাঁর প্রতি ন্যায় বিচার করলে বলতেই হবে যে তিনি প্রতিভাধর ছিলেন।"

পনেরো মিনিট পরে ফিরে এসে দানিলো জানালো, রাতটা তাঁর বাড়িতে কাটাবার জন্য কর্ত্রী তাদের আমন্ত্রণ করেছে।

১১

অশ্বারোহী বাহিনীর তরুণ অফিসারটি কাউন্ট ফিয়োদর তুরবিনের ছেলে, একথা জেনে আন্না ফিয়োদরভ্না উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠল।

"কী ভাগ্যের কথা! বেঁচে থাকো দানিলো। শিগগির সেখানে গিয়ে বলো, কর্ত্রী তাদের এখানে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে," এই কথা বলে লাফ দিয়ে উঠে ছুটতে ছুটতে সে দাসীদের ঘরে চলে গেল। "লিজচ্কা! উস্তয়ুশ্কা! তোমার ঘরটাই ঠিকঠাক করতে হবে লিজা। তুমি তোমার মামার ঘরে যাবে, আর তুমি...দাদা...তুমি...তুমি রাতটা বসবার ঘরেই কাটিয়ে দিও। একটা রাতে তোমার কোনও কষ্ট হবে না।"

"সত্যি কষ্ট হবে না বোন, আমি মেঝেতেই শুতে পারব।"

"বাবার মতো যদি দেখতে হয়ে থাকে তাহলে সে নিশ্চয় খুব সুন্দর হয়েছে। আহা বাপ্ আমার! তাকে দেখতে পাব! চোখ মেলে দেখিস লিজা! ওর বাবা যে দেখতে কী সুন্দর ছিল! ও টেবিলটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? ওটাকে এখানেই রাখো," ঘরময়

ঘুরতে ঘুরতে আন্না ফিয়োদরভ্না কথাগুলি বলতে লাগল। "দুটো বিছানা নিয়ে এস—একটা আন নায়েব মশায়ের ওখান থেকে—আর জন্মদিনে দাদা আমাকে যে কাঁচের মোমবাতি-দানটা উপহার দিয়েছিল সেটা এনে তার মধ্যে একটা চর্বি-বাতি বসিয়ে দাও।"

শেষ পর্যন্ত সব কিছু ঠিকঠাক হলো। মা যত যাই বলুক, লিজা তার নিজের পছন্দমতোই দু'জন অফিসারের জন্য তাব ঘরটাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে দিলো। গন্ধমাখানো ধোয়া বিছানার চাদর এনে নিজের হাতে বিছানা করল; পাশেই টেবিলের উপর রাখল কাঁচের জলপাত্র আর মোমবাতি; দাসীদের ঘরেও কিছু সুগন্ধি কাগজ পোড়াল এবং নিজের বিছানা করল মামার ঘরে। ক্রমে মনটা শান্ত হয়ে এলে আন্না ফিয়োদরভ্না নিজের জায়গাটায় বসে তাস হাতে নিল। কিন্তু তাসগুলো পাতবার আগেই টেবিলের উপর ফুলো-ফুলো কনুইটা রেখে স্বপ্ন দেখতে লাগল। ফিস্ ফিস্ করে নিজেকেই বলতে লাগল, "সময় কত দ্রুত উড়ে যায়! কত দ্রুত! মনে হয় যেন গতকাল...তাকে যেন দেখতে পাচ্ছি...আঃ, কী বিবেচনাহীন লোকই সে ছিল!" তার দুটি চোখ জলে ভবে এল। "এবার লিজচ্‌কার পালা—কিন্তু তার বয়সে আমি যা ছিলাম সে তো তা নয়—সুন্দরী, কিন্তু...আমি যা ছিলাম তা নয়..."

"লিজচ্‌কা, আজ সন্ধ্যায় তোমার মসলিনের পোশাকটা পরলে ভাল হতো।"

"আচ্ছা মাগো, তুমি কি তাদের খাওয়াতে চাইছ? আমার তো মনে হয় সেটা ঠিক হবে না," অফিসার দু'জনের সঙ্গে দেখা হবার উত্তেজনা চাপতে না পেরে লিজা বলল। "সত্যি, আমার মনে হয় সেটা ঠিক হবে না মাগো।"

আসলে ব্যাপার হলো, তাদের দেখতে তার ইচ্ছা যতটা, ভয়টা তার চাইতে বেশি, কারণ সে বুঝতে পারছিল, একটা মহৎ অশান্ত আনন্দ তার জন্য অপেক্ষা করছে।

"হয় তো তারাও আমাদের সঙ্গে পরিচিত হতে চায় লিজচ্‌কা," মেয়ের চুলে হাত বুলোতে বুলোতে আন্না ফিয়োদরভ্না বলল। তারপর আবার নিজের ভাবনায় ডুবে গেল ঃ "এই বয়সে আমার চুল যে রকম ছিল সে রকম নয়।...আহা লিজচ্‌কা, আমার বড় সাধ তোমাব যদি..." মেয়ের জন্য কিছু একটা বাসনা তার মনে জেগেছে, কিন্তু তরুণ কাউন্টের সঙ্গে তার বিয়ে হবে এটা সে আশা করতে পারে না, আবার বড় কাউন্টের সঙ্গে লিজার সেই সম্পর্ক হোক এটাও সে চাইতে পারে না। কিন্তু তার মন একটা কিছু চাইছে, একান্তভাবেই চাইছে। হয় তো স্বর্গত কাউন্টের প্রতি তার যে ভালবাসা ছিল, মেয়ের ভিতর দিয়ে সেটাকেই সে নতুন করে গড়ে তুলতে চাইছে।

কাউন্টের আগমনে বুড়ো অফিসারটিও কিছুটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। নিজেব ঘরে ঢুকে সে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলো। পনেরো মিনিট পরে সামরিক পোশাক ও নীল রঙের রাইডিং-ট্রাউজার পরে সে ঘর থেকে বের হলো। নতুন নাচের গাউনটি পরলে একটি তরুণীর মনে যে ভাব ফুটে ওঠে, সেই আত্ম-সচেতন তৃপ্তির আভাস মুখে নিয়ে সে অতিথিদের ঘরে ঢুকল।

"আমরা দেখতে চাই বোন, নতুন যুগের অশ্বারোহী সৈনিকরা দেখতে কেমন। স্বর্গত কাউন্টের মতো আসল 'হুজার' আর হয় না। তবু দেখাই যাক!"

অফিসাররা পিছনের দরজা দিয়ে তাদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকল।

ধুলোমাখা বুটসুদ্ধ নতুন-পাতা বিছানায় শুয়ে পড়ে কাউন্ট বলল, "তোমাকে বলিনি? ঝিঁঝি-ডাকা ওই কুঁড়েঘর থেকে এটা কি ভাল নয়?"

"নিশ্চয় ভাল, কিন্তু এদের কাছে অনেক বাধ্যবাধকতায় পড়ে গেলাম যে..."

"ধুৎ-ধুৎ! সব কিছুকেই বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হয়। তারা যে এতে ভয়ংকর খুশি হয়েছে এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত হতে পারো। বয়!" সে হাঁক দিলো। "রাতে যাতে বাতাসের ঝাপ্টা না আসে সেজন্য জানালায় কিছু টাঙিয়ে দিতে বলো!"

সেই সময় বৃদ্ধ লোকটি তাদের সঙ্গে পরিচয় করতে এল। লজ্জায় খানিকটা লাল হলেও সে না বলে থাকতে পারল না যে, স্বর্গত কাউন্টের সে বন্ধু ছিল, কাউন্ট তাকে শ্রদ্ধা করত, এমন কি তার জন্য কাউন্ট এমন কিছু করেছিল যার জন্য তার কাছে সে ঋণী হয়ে আছে। 'এমন কিছু' বলতে তার কি মনে পড়েছিল ধার-নেওয়া একশ' রুবল ফেরৎ না দেওয়ার কথা, না কি তাকে বরফের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া, বা তার প্রতি তিরস্কার বর্ষণ করার কথা, সেটা বলা শক্ত—আর বৃদ্ধও তা খুলে বলল না। তরুণ কাউন্ট বৃদ্ধ অফিসারকে একান্ত বিনীতভাবে অভ্যর্থনা জানাল এবং তাদের আশ্রয় দেবার জন্য ধন্যবাদ দিলো।

"ব্যবস্থাটা খুব বিলাসবহুল নয় বলে ক্ষমা করবেন কাউন্ট (ইদানীং পদস্থ লোককে সম্বোধন করবার অভ্যাস না থাকায় সে প্রায় 'ইয়োর এক্সেলেন্সি' বলে ফেলেছিল), আমার বোনের বাড়িটা খুবই ছোট। তবে জানালায় কিছু একটা ঝুলিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে," এই কথা বলে পর্দা আনবার ছুতো করে, কিন্তু আসলে অফিসারদের বিবরণ শোনবার তাগিদে সে দ্রুত চলে গেল।

ছোট্ট মিষ্টি উস্তয়ুশা তার কর্ত্রীর শালটা নিয়ে ঘরে ঢুকল জানালায় টাঙিয়ে দেবার জন্য। কর্ত্রী তাকে আরও বলে দিয়েছে, সে যেন জিজ্ঞাসা করে তাদের চা দরকার কি না।

ভাল থাকার ব্যবস্থা পেয়ে কাউন্টের মেজাজ তখন খুব খুশ্ ঃ সে হেসে হেসে উস্তয়ুশার সঙ্গে এমন হাসি-ঠাট্টা জুড়ে দিলো যে উস্তয়ুশা তাকে এক ধমক লাগিয়ে দিলো। কাউন্ট জানতে চাইল, তার ছোট কর্ত্রীটি সুন্দরী কি না। তারপর মেয়েটি যখন চা আনবে কি না জানতে চাইল তখন সে বলল যে এতক্ষণ নিয়ে এলেই তো হতো, তবে তার চাকরটা যেহেতু এখনও আহার্য প্রস্তুত করে উঠতে পারেনি, সেজন্য চা অপেক্ষাও বেশি জরুরি বাড়িতে বাড়তি থাকলে কিছু ভদ্‌কা ও কিছু খাবার, আর ঘরে মজুত থাকলে কিছু শেরী।

তরুণ কাউন্টের আচার-ব্যবহারে লিজার মামা একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল; নতুন যুগের অফিসারদের প্রশংসায় আকাশে তুলে দিয়ে বলল যে তাদের সঙ্গে তাদের বাবাদের তুলনাই হয় না।

আন্না ফিয়োদরভ্না সে কথা মানল না—কাউন্ট ফিয়োদর আইভানভিচের চাইতে বড় কেউ হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত সে বিরক্ত হয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলে উঠল, "দেখো দাদা, যে লোক সর্বশেষ তোমার প্রতি সদয় হয় তোমার কাছে তো সেই সর্বশ্রেষ্ঠ। অবশ্য সকলেই জানে যে আজকালকার মানুষরা অনেক চালাক-চতুর হয়েছে, কিন্তু কাউন্ট ফিয়োদর আইভানভিচ এত ভদ্র ছিল, আর একোশাস'টা এত সুন্দর নাচত যে, বলতে পারো, সকলের মুণ্ডু ঘুরে যেত; অথচ আমি ছাড়া আর কারও প্রতি সে নজর দেয়নি। কাজেই বুঝতেই পারছ যে সেকালেও ভাল লোক ছিল।"

ঠিক সেই সময় ভদ্‌কা, খাবার, আর শেরীর ফরমাস এসে পৌঁছল।

"এবার বোঝ দাদা! তুমি কখনও ঠিক কাজটি করো না! আগেই খাবারের ব্যবস্থা করা তোমার উচিত ছিল," আন্না ফিয়োদরভ্না বলল। "লিজা! মামণি! তুমি একটু হাত লাগাও।"

লিজা ব্যাঙের ছাতা ও টাটকা মাখন আনতে ভাঁড়ার ঘরে ছুটল, আর রাঁধুনিকে কিছু মাংসের টুকরো সিদ্ধ করতে হুকুম দিলো।

"তোমার কাছে কি শেরী আছে দাদা?"

"না, বোন। আমি তো শেরী রাখি না।"

"সে কি? তুমি তো চায়ের সঙ্গে কি যেন খাও; খাও না?"

"সে তো রাম, আন্না ফিয়োদরভ্না।"

"দুটোর তফাৎ আর কি! ওদের ওই...মানে...রামই দাও; তাতে দোষ হবে না। কিন্তু ওদের এখানে ডেকে আনলে হয় না? তুমি তো সব বোঝ। ওরা কি অসন্তুষ্ট হবে?"

বৃদ্ধ অফিসার জানাল, কাউন্ট এতদূর উদার যে তাদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবে না; সে এখুনি তাদের নিয়ে আসছে। আন্না ফিয়োদরভ্নাও মোটা সিল্কের পোশাক ও নতুন টুপিটা পরতে চলে গেল। কিন্তু লিজা এত ব্যস্ত ছিল যে গায়ের চওড়া-আস্তিন গোলাপি রঙের সুতির জামাটা ছেড়ে ফেলবার সময়টুকুও পায়নি। সে ভিতরে ভিতরে একটা ভয়ংকর অস্থিরতা বোধ করতে লাগল ঃ তার কেবলই মনে হতে লাগল যে একটা প্রচণ্ড কিছু ঘটতে চলেছে। সেই সুদর্শন অশ্বারোহী কাউন্টটি এক নতুন বোধাতীত আশ্চর্য জীব। তার চাল-চলন, কথাবার্তা—সব কিছুই এমন যা সে আগে কখনও দেখেনি। তার সব ভাবনা, সব কথাই চাতুর্য ও সত্যে মণ্ডিত; তার সব কাজ ন্যায়নিষ্ঠ; তার প্রতিটি অঙ্গ সুন্দর। সে বিষয়ে তার কোনও সন্দেহ নেই। খাদ্য ও শেরী ছাড়াও সে যদি একটা সুগন্ধি স্নানের জন্য দাবি জানাত, তাতেও লিজা আশ্চর্য হতো না, বরং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত যে সেটাই সঠিক ও ন্যায্য।

বৃদ্ধ অফিসারের মুখে শোনামাত্রই আন্না ফিয়োদরভ্নার আমন্ত্রণ কাউন্ট গ্রহণ করল। সে চুল আঁচড়াল, কোট পরল, আর সিগার-কেসটা নিল।

কর্নেট জবাব দিলো, "আমার কিন্তু মনে হচ্ছে যাওয়াটা ঠিক হবে না। "Ils feront des frais pour nous recevoir."

"বাজে কথা। এতে তারা খুশি হবে। আমি খোঁজ-খবর নিয়েছি—মনে হচ্ছে মহিলার একটি সুন্দরী কন্যা আছে। চলে এস," কথাগুলি কাউন্ট ফরাসীতে বলল।

"Je vous en pire, messieurs!" সে যে ফরাসী জানে এবং তাদের বক্তব্য বুঝতে পেরেছে সেটা বোঝাবার জন্যই বৃদ্ধ অফিসার কথাগুলি বলল।

১২

মুখ লাল করে চোখ নামিয়ে লিজা এমন ভাব দেখাল যেন সে চা ঢালবার ব্যাপারে খুবই ব্যস্ত; আসলে অফিসার দু'জন ঘরে ঢুকলে তাদের দিকে চাইতেই সে ভয় পাচ্ছিল। অপর দিকে, আন্না ফিয়োদরভ্না লাফ দিয়ে উঠে মাথাটা একটু নোয়ালো এবং কাউন্টের মুখের উপর থেকে চোখ না সরিয়েই অনর্গল কথা বলতে লাগল ঃ সে দেখতে ঠিক বাবার মতো, মেয়েকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো, চা, জ্যাম ও দেশী ফলের আচার খেতে দিলো। কর্নেটের চেহারা এতই সাদাসিধে যে কেউ তার দিকে মনোযোগই দিলো না। অবশ্য সেজন্য সে কৃতজ্ঞ বোধ করল, কারণ লিজার রূপ দেখে সে মুগ্ধ হয়েছে, আর সকলের মনোযোগ অন্যত্র থাকায় সে ভদ্রতাসম্মতভাবে যতটা সম্ভব লিজাকে ভালভাবে দেখবার সুযোগ পেয়ে গেল। বোনের কথা কতক্ষণে শেষ হবে মামাটি তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল, কারণ নিজের অশ্বারোহী সৈনিক জীবনের স্মৃতির কথা কাউন্টকে শোনাবার জন্য সে এতই অধীর হয়ে উঠেছে যে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারছিল না। কাউন্ট এমন কড়া একটা সিগার ধরাল যে লিজা কাশি চাপতে পারল না। কাউন্ট যেমন বাকপটু, তেমনিই ভদ্র। প্রথম দিকে আন্না ফিয়োদরভ্নার বাক্য-স্রোতের মধ্যে একটা-দুটো শব্দ জুড়ে দিতে দিতে ক্রমে সব কথাই নিজের মুখে তুলে নিল। একটা জিনিস তার শ্রোতাদের কাছে বরং বিস্ময়কর লাগছিল ঃ যে সব শব্দ সে ব্যবহার করছিল সেগুলো তার অভ্যস্ত সমাজে দূষণীয় না হলেও এখানে খুবই আপত্তিকর। আন্না ফিয়োদরভ্না একটু ভয়ই পেল, আর লিজার কান লাল হয়ে উঠল। সেটা কিন্তু কাউন্টের নজরে পড়ল না, সে গম্ভীর ভদ্রতার সঙ্গেই কথা বলতে লাগল। লিজা নীরবে গ্লাস ভরে দিয়ে অতিথিদের হাতে না দিয়ে তাদের হাতের কাছে রেখে দিলো। তখনও তার মনে যথেষ্ট উত্তেজনা; কাউন্টের প্রতিটি কথা সে গোগ্রাসে গিলতে লাগল। কিন্তু কাউন্টের গল্পগুলি গতানুগতিক, তার বলবার ধরনেও কেমন একটা থতমত ভাব। ফলে লিজা ধীরে ধীরে মনের স্বাভাবিক ভাব যেন ফিরে পেল। যে সব জ্ঞানগর্ভ বাণী তার কাছ থেকে শুনবে বলে আশা করেছিল তা শুনতে পেল না: তার সব কিছুতেই যে সুরুচির প্রকাশ সে আশা করেছিল, তাও দেখতে পেল না। তৃতীয় গ্লাস চা পরিবেশনের সময় সে যখন সলজ্জ ভঙ্গিতে তার দিকে চোখ তুলে তাকাল, এবং অবিচলিতভাবে কথা বলতে বলতে ও লিজার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে সামান্য একটুখানি হেসে কাউন্টও তার দিকে তাকাল, তখন লিজার ভিতর

থেকে একটা বিরূপ মনোভাব যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল; অনতিবিলম্বেই সে বুঝতে পারল যে কাউন্টের মধ্যে অসাধারণ কিছু তো নেইই, ববং তার পরিচিত লোকদের থেকে তাকে পৃথক করে দেখবারও কিছু নেই; সুতরাং তাকে ভয় পাবারও কোনও কারণ নেই; অবশ্য একথা ঠিক যে তার নখগুলো বড় বড় আর সযত্নে রক্ষিত, কিন্তু তাই বলে কোনও বিশেষ সৌন্দর্যও তার মধ্যে নেই। এবং একান্ত দুঃখের ভিতর দিয়ে লিজা যখন বুঝতে পারল যে তার স্বপ্ন একেবারেই ভিত্তিহীন, হঠাৎ সে শান্ত হয়ে গেল; তখন যে বস্তুটি তাকে বিচলিত করে তুলল তা হলো তার প্রতি নীরব কর্নেটের স্থির দৃষ্টি। সে ভাবল, "হয় তো সে নয়, এই সেই লোক।"

১৩

চা-পানের পবে বৃদ্ধ মহিলা অতিথিদের আমন্ত্রণ করে অপব একটি ঘরে নিয়ে গেল এবং সেখানে তার অভ্যস্ত জায়গায় আসন গ্রহণ কবে বলল, "কাউন্ট, এবার একটু বিশ্রাম করবেন কি?" জবাবে না বলায় সে আবার বলল, "কি ভাবে যে আপনাদের আনন্দ বিধান করব? আচ্ছা কাউন্ট, তাস খেলেন কি? দাদা, এ ব্যাপারে তুমি তো একটু ব্যবস্থা করতে পারো।"

দাদা বলল, "কিন্তু তুমি নিজেই তো 'প্রেফারেন্স' খেল। তাহলে সেই খেলাই হবে কি? আপনি খেলবেন তো কাউন্ট? আর আপনিও?"

অফিসাররা জানিয়ে দিলো, গৃহকর্তারা যা চান তাতেই তারা বাজী।

লিজা একজোড়া পুরনো তাস নিয়ে এল। সেই তাস দিয়ে সে ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে; আন্না ফিয়োদরভ্‌নার দাঁতের ব্যথা শিগগির যাবে কিনা বুঝতে পারে, তার মামা শহর থেকে বেবিয়ে বাড়ি ফিরবে কি না, কোনও প্রতিবেশী তাদেব বাড়ি আসবে কি না, এমনি সব কথা। এই তাসগুলো দু'মাস ধরে ব্যবহার করা হচ্ছে, তবু যে তাস দিয়ে সে আন্না ফিয়োদরভ্‌নাব ভাগ্য গণনা করে থাকে তার থেকে এগুলো অনেক বেশি পরিষ্কার।

মামা প্রশ্ন করল, "কিন্তু অল্প পয়সার বাজি ধরে খেলতে আপনাদের আপত্তি নেই তো? আন্না ফিয়োদরভ্‌না ও আমি পয়েন্ট প্রতি আধ কোপেক বাজি ধরে খেলি! তাতেই সে আমাদের কাৎ করে দেয়।"

কাউন্ট বলল, "যা আপনাদের খুশি, তাতেই আমিও খুশি।"

তার চেয়ারে আরাম করে বসে লেসের শালখানা নিচে রেখে আন্না ফিয়োদরভ্‌না বলল, "তাহলে এক কোপেক হোক—নোট। এ রকম বিরল অতিথিদের জন্য আমি সব কিছুতে রাজি—আমার মতো একটি বৃদ্ধাকে তারা না হয় দরিদ্রাশ্রমে ঠেলে দিক।" তারপর নিজেকে বলল, "হয়তো ওদের কাছ থেকে একটা রুবলই জিতে নেব।" মনে হয় ইদানিং কালে বৃদ্ধ বয়সে তাঁর মনে কিছুটা জুয়ার নেশা লেগেছে।

কাউন্ট বলল, "আপনি যদি চান আমি আপনাকে "সম্মানের সঙ্গে" ও "দুঃখের সঙ্গে" এই দু'রকম খেলা শিখিয়ে দেব। ভারি সুন্দর খেলা।"

নতুন সেন্ট পিতার্সবার্গ ধরনের খেলায় সকলেই খুব আমোদ পেল। মামা বলল, খেলাটা সে আগেই জানত, অনেকটা 'বোস্টন' ধরনের খেলা, তবে এখন প্রায় ভুলে গেছে। আন্না ফিয়োদরভ্না কিছুই বুঝল না, এবং সেই না বোঝাটা এত অধিক সময় চলল যে সে বুঝে নিল, একটু হাসা, একটু মাথা নাড়া, সব কিছু বুঝেছি, সবকিছু জলের মতো পরিষ্কার এ কথা বলাই বুদ্ধিমানের কাজ। খেলতে খেলতে হাতে টেক্কা ও সাহেব পেয়ে আন্না ফিয়োদরভ্না যখন 'দুঃখ' ডাকল, আর তার হাতে রইল ছ'করা, তখন হাসির রোল পড়ে গেল। খুবই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সে একটুখানি হেসে তাড়াতাড়ি বলে উঠল যে নতুন খেলাটা তার ঠিক ধাতস্থ হয়নি। তথাপি সে পয়েন্ট পেল; তার বিশেষ কারণ হলো, বড় বাজি রেখে খেলতে অভ্যস্ত কাউন্ট খুবই সতর্ক এবং সঠিক হিসাবে পটু হলেও টেবিলের তলা দিয়ে কর্নেটের পায়ের ঠোক্করের অর্থ ঠিকমতো ধরতে পারল না, আর কর্নেটও খেলায় অনেক মারাত্মক ভুল করতে লাগল।

লিজা আরও ফলের আচার, তিন রকমের জ্যাম ও একটা বিশেষ ধরনের রসে-ডোবানো আপেল নিয়ে এল। মায়ের চেয়ারের পিছনের আসনে বসে সে খেলা দেখছিল আর মাঝে মাঝে অফিসারদের দেখছিল। বিশেষ করে কাউন্ট যখন তাসগুলো ফেলছিল আর সুকৌশলে সুন্দর ভঙ্গিতে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে পিঠগুলো তুলে নিচ্ছিল তখন তার গোলাপি নখ ও সাদা হাতের দিকেই তার দৃষ্টি ছিল।

অন্য সকলকে হারিয়ে দেবার বেপরোয়া প্রচেষ্টায় সাত পর্যন্ত ডেকে মাত্র চারের খেলা করে এবং দাদার ধমকানিতে পয়েন্টের পাতায় দুর্বোধ্য কতকগুলি হিজিবিজি লিখে আন্না ফিয়োদরভ্না আবারও বিচলিত ও বে-হেড্ হয়ে উঠল।

এই হাস্যকর অবস্থা থেকে মাকে উদ্ধারের চেষ্টায় লিজা হেসে বলল, "চিয়ার আপ মামণি, আবার তুমি সব জিতে নেবে। তুমি মামার তাসগুলো নিয়ে নাও, তাহলে সে গাড্ডায় পড়ে যাবে।"

মেয়ের দিকে সভয়ে তাকিয়ে আন্না ফিয়োদরভ্না বলল, "তুমি তো আমাকে একটু সাহায্য করতে পারো লিজচ্কা। আমি তো জানি না কেমন করে..."

"এই নিয়মে কেমন করে খেলতে হয় তা তো আমিও জানি না," মনে মনে মায়ের হারের একটা হিসাব কষে লিজা বলল। "কিন্তু মামণি, এ ভাবে চললে তো তুমি সব হেরে যাবে।" তারপর ঠাট্টা করে বলল, "এমন কি পিমচ্কার জন্য একটা ফ্রক কেনার টাকাও থাকবে না।"

লিজার সঙ্গে কথা বলবার বাসনায় তার দিকে তাকিয়ে কর্নেট বলল, "সত্যি, এভাবে খেললে আপনি অনায়াসেই দশটি রৌপ্য রুবল হারতে পারেন।"

খেলুড়েদের দিকে তাকিয়ে আন্না ফিয়োদরভ্না জিজ্ঞাসা করল, "কেন? আমরা কি কাগজের টাকা নিয়ে খেলছি না?"

কাউন্ট বলল, "হয় তো তাই, কিন্তু আমি তো কাগজের টাকার হিসাব জানি না। আপনি কি...মানে, এই কাগজের টাকা ব্যাপারটা কি?"

মামা তখন জিতছিল, সে বলল, "আজকাল কেউ কাগজের টাকা নিয়ে খেলে না।"

বৃদ্ধ মহিলাটি কিছু ফলের রস আনালো। নিজে দুই গ্লাস খেল। তার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল, মনে হলো যেন হতাশায় দুটি হাত সে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিলো। এমন কি টুপির নিচ দিয়ে বেরিয়ে আসা পাকা চুলের গুচ্ছটিকে পর্যন্ত ঠিক করে নিতে ভুলে গেল। তার মনে হতে লাগল, সে দশ লাখ হেরেছে, তার যথাসর্বস্ব খোয়া গেছে। বার বার কর্নেট টেবিলের তলা দিয়ে কাউন্টকে পা দিয়ে ঠুকে দিতে লাগল, আর কাউন্টও নিয়মিতভাবে বৃদ্ধ মহিলার হারের হিসাব লিখে গেল।

শেষ পর্যন্ত খেলা সাঙ্গ হলো। বিবেক বর্জন করে নিজের হিসাবে কিছু যোগ করতে আন্না ফিয়োদরভ্‌না অনেক চেষ্টা করল; সে এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন সে হিসাব ভুল করেছে, কিন্তু আসলে সে হিসাব করতেই জানে না। লোকসানের বহর দেখে সে খুব ঘাবড়েও গেল; তা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত হিসাব কষে দেখা গেল সে ন'শ'বিশ পয়েন্ট হেরেছে। সে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "কাগজের টাকায় এটা কি ন' রুবল নয়?" আসলে নিজের লোকসানের পুরো চেহারাটাই সে ধরতে পারছিল না। অবশেষে দাদা যখন বুঝিয়ে দিলো যে, কাগজের টাকায় সে সাড়ে বত্রিশ রুবল হেরেছে এবং সে টাকাটা অবশ্য দিতে হবে, তখন তার আতংকের আর শেষ রইল না।

খেলা শেষ হলে কতটা জেতা গেল তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে কাউন্ট জানালার ধারে চলে গেল। সেখানে লিজা খাবার পরিবেশন করছিল এবং প্লেটে করে ব্যাঙের ছাতা সাজিয়ে রাখছিল। সোজাসুজি এবং অত্যন্ত সহজেই সে সেই কাজটি করে ফেলল সারা সন্ধ্যা কর্নেট যেটা করতে চাইছিল; সে লিজার সঙ্গে আবহাওয়া নিয়ে আলাপ জুড়ে দিলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে কর্নেটের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে উঠল। এতক্ষণ লিজাই আন্না ফিয়োদরভ্‌নার মনোবলকে জিইয়ে রেখেছিল। এবার কাউন্ট ও লিজা যখন উঠে গেল, বৃদ্ধ মহিলাটি একেবারেই ভেঙে পড়ল।

কিছু একটা বলা দরকার বলেই যেন পলোজভ বলল, "আপনার টাকাটা জিতে নেওয়ায় সত্যি আমি খুব দুঃখিত। আমাদের দিক থেকে কাজটা সঙ্গত হয়নি।"

মহিলাটি বলল, "আপনাদের ঐ সব 'সম্মান' আর 'দুঃখ'-এর কথাগুলিই ধরুন না। ও ধরনের খেলা তো আমি জানিই না। ভাল কথা, কাগজের টাকায় কত দাঁড়ায় যেন বললেন?"

খেলায় জিতে বৃদ্ধ অফিসারের মেজাজ বেশ খুশ ছিল। সে বলল, "বত্রিশ রুবল; ঠিক ঠিক সাড়ে বত্রিশ রুবল। টাকাটা দিয়ে দাও বোন; আমার হাতেই দেবে চলো।"

"এই শেষবারের মতো আমার টাকা দেওয়া। দেবার মতো আর কিছুই হাতে থাকবে না। এত টাকা যে আর কখনও জিততে পারব সে আশাও নেই।"

আন্না ফিয়োদরভ্না দুলতে দুলতে চলে গেল এবং ন'খানি কাগজের রুবল নিয়ে ফিরে এল। বৃদ্ধের পীড়াপীড়িতে সে পুরো টাকাটাই মিটিয়ে দিলো।

পলোজভের ভয় হলো যে কিছু বলতে গেলে আন্না ফিয়োদবভ্না তার উপরেই তেড়ে আসবে। তাই সে নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে পড়ল এবং খোলা জানালার ধারে যেখানে কাউন্ট ও লিজা দাঁড়িয়ে কথা বলছিল সেখানে হাজির হলো।

খাবারের টেবিলে দুটো মোমবাতি জ্বলছিল। মে মাসের রাত্রিবেলাকার তাজা গরম হাওয়ায় মোমবাতির শিখাগুলো বারে বারেই কাঁপছিল। বাগানেব দিকে খোলা জানালাটায় বেশ আলো পড়ছে, কিন্তু সে আলো ঘবের ভিতরকার আলোর চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রায় ভরা চাঁদ লেবুগাছের মাথার উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। চাঁদেব সোনালী আভাটা চলে গেছে। আকাশের বুকে ভাসমান মেঘের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে চাঁদ তার কিরণ ছড়িয়ে দিচ্ছে সেই মেঘের উপর। পুকুরে ব্যাঙগুলো এক সুরে ডেকে চলেছে; গাছের ফাঁকে ফাঁকে পুকুরের যেটুকু চোখে পড়ছে তার উপব চাঁদের রূপোলি কিরণ পড়ে ঝিলমিল করছে। জানালার নিচে সুগন্ধি লিলাক ঝোপের ভেজা ফুলের স্তবকগুলি বাতাসে দুলছে; ছোট ছোট কয়েকটি পাখি সেখানে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে আর পালক ঝাড়ছে।

লিজার কাছে গিয়ে নিচু জানালাব তাকে বসে কাউন্ট বলল, "কী স্বর্গীয় আবহাওয়া! মনে হচ্ছে, আপনি প্রায়ই বেড়াতে যান।"

যে কারণেই হোক এখন আর কাউন্টের সঙ্গে কথা বলতে লিজার এতটুকু সংকোচ বোধ হচ্ছে না। সে বলল, "হ্যাঁ, গৃহস্থালির কাজকর্মে সকাল সাতটায় একবার বাইবে বেরুতে হয়। তাছাড়া মায়ের পালিতা কন্যা ছোট্ট পিমচ্‌কাকে নিয়েও বেড়াই।"

এক-চোখ চশমাটাকে চোখে লাগিয়ে কখনও বাগানের দিকে, কখনও লিজাব দিকে চোখ রেখে কাউন্ট বলল, "গ্রামে বাস করার কত সুখ! আপনি কি কখনও চাঁদের আলোয় বেড়াতে বেরোন?"

"এখন আব যাই না। তিন বছর আগে মামা ও আমি প্রত্যেকটি জোছনা রাতে বেড়াতে যেতাম; কিন্তু তারপরেই তার একটা অদ্ভুত অসুখ দেখা দিলো—তিনি ঘুমুতে পারতেন না; পূর্ণিমার রাতে তিনি একটুও ঘুমুতে পারেন না। ও পাশের তাঁর ঘরটা একেবারে বাগানের উপরে; আর জানালাটাও নিচু; চাঁদের আলো তাঁর সারা দেহের উপর এসে পড়ে।"

কাউন্ট মন্তব্য করল, "আশ্চর্য তো! আমি ভেবেছিলাম ঐটেই আপনার ঘর।"

"শুধু আজকের রাতটা আমি ওখানেই ঘুমোব। যেটায় আপনারা ঘুমোবেন সেটাই আমার ঘর।"

"সত্যি! কী আশ্চর্য! আপনার এই অসুবিধা ঘটানোর জন্য আমি কোনও দিন

নিজেকে ক্ষমা করব না!" বুঝি বা তার কথার আন্তরিকতা প্রমাণের জন্যই কাউন্ট তার এক-চোখ চশমাটা খুলে ফেলল। "যদি জানতাম আমরা আসায় আপনাদের এতটা অসুবিধা হবে—"

"না, না, কিচ্ছু অসুবিধা হয়নি। বরং আমি খুবই খুশি হয়েছি; মামার ঘরটা চমৎকার—খুব আলো-হাওয়া, আর জানালাটাও নিচু। ঘুম আসার আগে পর্যন্ত আমি সেখানেই বসে থাকব. হয় তো শুতে যাবার আগে বাগানে একটু পায়চারি করব।"

লিজাকে ভালভাবে দেখবার জন্য কাউন্ট এক-চোখ চশমাটা আবার চোখে লাগাল এবং জানালার তাকে তার পাশে বসতে গিয়ে তার পায়ে আলতো করে ছোঁয়া লাগাবার চেষ্টা করে ভাবল, "কী মিষ্টি মেয়েটি! আর কেমন কায়দা করে আমাকে জানিয়ে দিলো যে ইচ্ছা করলে জানালার কাছে তার সঙ্গে আমি দেখা করতে পারি।" আসলে এত সহজে সে তাকে জয় করে নিল যে তার প্রতি কাউন্টের আকর্ষণের যেন অনেকখানিই হারিয়ে গেল।

অন্যমনস্কভাবে অন্ধকার রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে সে বলল. "একজন মনের মানুষের সঙ্গে আজকের মতো একটা রাত বাগানে কাটানো যে কী আনন্দের ব্যাপার!"

এ কথা শুনে এবং হঠাৎ তার পায়ের সঙ্গে কাউন্টের পা ছুঁয়ে যাওয়ায় লিজা কিছুটা অপ্রস্তুত বোধ করল। সেই ভাবটা কাটিয়ে উঠবার জন্য কোনও কিছু চিন্তা না করেই সে তাড়াতাড়ি বলে ফেলল, "সত্যি, এমন চাঁদের আলোয় বেড়ানো খুবই খুশির ব্যাপার।" অস্বস্তিবোধ করায় লিজা তাড়াতাড়ি ব্যাঙের ছাতার পাত্রটির মুখ এঁটে দিয়ে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই কর্নেট সেখানে হাজির হলো। আর সেই বা লোকটা কেমন এ কথা জানবার একটা বাসনা হঠাৎই লিজার মনে জেগে উঠল।

সে বলল, "কী সুন্দর রাত!"

"এরা দেখছি আবহাওয়ার কথা ছাড়া কিছুই বলে না," লিজা ভাবল।

কর্নেট বলতে লাগল, "আর দৃশ্যটাও কী চমৎকার! তবে মনে হচ্ছে এ সব দেখে দেখে আপনি শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন।" যাকে ভাল লাগে তাকে অপ্রিয় কিছু বলার অদ্ভুত প্রবণতা থেকেই কথাগুলি সে যোগ করল।

"ও সব মনে করছেন কেন? রোজ একই জিনিস খেতে, বা একই ফ্রক পরতে মানুষ ক্লান্তি বোধ করে, কিন্তু একটা সুন্দর বাগান দেখে কেউ কখনও ক্লান্ত হয় না, বিশেষ করে আকাশে যখন চাঁদ ওঠে। মামার ঘর থেকে পুকুরের সবটা চোখে পড়ে। আজ রাতে আমি তাই দেখব!"

ঠিক এই সময়ে পলোজভের আগমনে কাউন্ট খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছে; কারণ দু'জনে আরও কোনও স্ফূর্তির ব্যবস্থা যা করতে পারত তাতে বাধা পড়ল। সে বলে উঠল, "মনে হচ্ছে এখানে নাইটিঙ্গেল পাখি নেই; আছে কি?"

"না। আগে থাকত. কিন্তু গত বছর একজন শিকারী একটাকে ধরে, আর এ বছরও—মানে ঠিক গত সপ্তাহেই—একদিন যখন শুনলাম একটা পাখি সুন্দর গান

গাইছে, তখন একটি কনস্টেবল গাড়ির ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে হাজির হওয়ায় পাখিটা ভয়ে উড়ে গেল। তার আগের বছর মামা আর আমি বাগানের রাস্তায় গাছের নিচে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাখিদের গান শুনতাম।"

এমন সময় মামা এসে হাজির। বলল, "এই ছোট্ট বাক্যবাগীশটি আপনাদের কি বলছে এত? মশাইদের কি কিছু খেতে হবে না?"

খাবার সময় কাউন্ট খাবার-দাবারের খুব প্রশংসা করল, আর খেলোও প্রচুর। ফলে আন্না ফিয়োদরভ্‌নার মেজাজ কিছুটা ভাল হলো। খাওয়া শেষ করে অফিসার দু'জন সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজেদের ঘরে চলে গেল। কাউন্ট মামার সঙ্গে করমর্দন করল, আন্না ফিয়োদরভ্‌না দেখে বিস্মিত হলো যে তার হাতে চুম্বন না করে তার সঙ্গেও সে করমর্দন করল এবং লিজার চোখের উপর চোখ রেখে মৃদু অথচ খুশির হাসি হেসে তার সঙ্গেও করমর্দন করল। তার দৃষ্টি আবার লিজাকে বিব্রত করে তুলল।

সে ভাবল, "লোকটি সুদর্শন, তবে নিজের সম্পর্কে বড় বেশি সচেতন।"

১৪

ঘরে ঢোকার পর পলোজভ বলল, "তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত নয় কি? হেরে যাবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম, টেবিলের নিচ দিয়ে তোমার পায়ে কতবার ঠোক্কর দিলাম। তোমার বিবেক বলে কিচ্ছু নেই। ভদ্রমহিলা খুবই ব্যথা পেয়েছেন।"

কাউন্ট হো-হো করে হেসে উঠল। "তিনি তো খুব মজার মানুষ! এতে তিনি মনে আঘাত পাবেন কেন?"

আবার সে এমন অট্টহাসি হেসে উঠল যে সামনে দাঁড়ানো যোহান পর্যন্ত চোখ নামিয়ে মিটমিট করে হাসতে লাগল।

"পরিবারেব পুরনো বন্ধুর ছেলে যে! হা-হা-হা!" কাউন্ট হাসতে লাগল।

কর্নেট বলল, "কিন্তু কাজটা ভাল হয়নি, তাঁর জন্য আমি দুঃখিত বোধ করছি।"

"ঘোড়ার ডিম! তুমি একেবারে খোকা! আমি হেরে যাই তাই কি তুমি আশা করো? কিন্তু হারব কেন? খেলা রপ্ত করার আগে আমিও অনেক হেরেছি। বন্ধু, ওই দশটি রুবল অনেক কাজে লাগবে। যে বোকাদের দলে ভিড়তে না চায় তাকে বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকেই জীবনটাকে দেখতে হবে।"

পলোজভ চুপ করে গেল। সে লিজার চিন্তায় ডুবে গেল। লিজাকে তার খুবই পবিত্র ও মনোরমা মনে হয়েছে। পোশাক ছেড়ে সে নতুন করে পাতা নরম পরিষ্কার বিছানায় শুয়ে পড়ল।

জানালায় একখানা শাল ঝোলানো হয়েছে। তার ভিতর দিয়ে চাঁদের ম্লান আলো এসে পড়েছে। সেইদিকে তাকিয়ে কর্নেট ভাবতে লাগল, "একটি শান্ত নীড়ে একটি সরল, নিপুণ, মনোরমা স্ত্রীকে নিয়ে ঘর বাঁধা—এই তো সুখ। এই তো প্রকৃত স্থায়ী সুখ।"

যে কারণেই হোক মনের এই গোপন কথা সে বন্ধুকে জানাল না, এমন কি এই পল্লীবালার কথাও তার কাছে উচ্চারণ করল না, যদিও সে জানে যে কাউন্টও তার কথাই ভাবছে।

কাউন্ট মেঝেতে পায়চারি করছিল। কর্নেট বলল, "তুমি পোশাক ছাড়লে না?"

"কেন জানি না ঘুমুতে ইচ্ছা করছে না। ইচ্ছা করলে আলোটা নিভিয়ে দিতে পারো; আমার কোনও দরকার নেই।"

সে আবার পায়চারি শুরু করল।

"ঘুমুতে ইচ্ছা করছে না," পলোজভ কথাগুলি পুনরায় উচ্চারণ করল। গত সন্ধ্যার ঘটনায় তাব উপর কাউন্টের প্রভাবকে সে মেনে নিতে পারেনি; তার মন প্রতিরোধে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। মনে মনে সে তুরবিনকে বলল, "তোমার চতুর মাথার মধ্যে কি চিন্তা যে জমছে সেটা অনুমান করা শক্ত নয়! তার প্রতি তোমার যে কত টান তা তো দেখেছি! কিন্তু তার মতো একটি সরল সৎ মানুষকে বোঝা তোমার কর্ম নয়। তুমি তো চাও শুধু মিন্নাদের মতো মেয়ে আর কর্নেলের ইউনিফর্মটি। কিন্তু এখানে, আমি জানতে চাই, তাকে তুমি কতটা পছন্দ করো।"

পাশ ফিরে কাউন্টকে ডাকতে গিযেও সে মত পরিবর্তন করল। সে বুঝতে পারল, লিজার ব্যাপারে কাউন্টের মনোভাব যদি সে যা অনুমান করছে তাই হয় তাহলে সে তো প্রতিবাদ জানাতে পারবে না, উপরন্তু তার প্রভাবকে স্বীকার করে নিতে সে এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে সে হয়তো কাউন্টকে সমর্থনই করে বসবে, অথচ যতই দিন যাচ্ছে এই অবস্থাটা ততই অসঙ্গত ও অসহ্য হয়ে উঠছে।

কাউন্ট টুপিটা মাথায় দিয়ে দরজার দিকে এগোলে সে প্রশ্ন করল, "কোথায় যাচ্ছ?"

"আস্তাবলে। সব ঠিক আছে কিনা দেখতে যাচ্ছি।"

"আশ্চর্য!" কর্নেট ভাবল, তারপর মোমবাতিটা নিভিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে শুল এবং প্রাক্তন বন্ধুর প্রতি যে অকারণ ঈর্ষা ও বিরূপতা তার মনে বাসা বেঁধেছে সেটাকে তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করতে লাগল।

ওদিকে যথারীতি দাদা, মেয়ে ও পালিতাকে সাদরে চুম্বন কবে তাদের মাথার উপরে ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে দিযে আন্না ফিয়োদরভ্‌নাও তার ঘরে চলে গেল। মাত্র একটি দিনে এত বিচিত্র রকমেব অনুভূতি অনেককাল তার হয়নি। স্বর্গত কাউন্ট এবং এই যে তরুণ যুবকটি লজ্জাজনকভাবে তার সব টাকা জিতে নিয়েছে—তাদের বিষণ্ণ ও সুস্পষ্ট স্মৃতি তার মনকে এমনভাবে নাড়া দিয়েছে যে শান্ত হৃদয়ে সে প্রার্থনা পর্যন্ত করতে পারেনি। তথাপি যথারীতি পোশাক ছেড়ে সে বিছানায় উঠল এবং অন্যান্য দিনের মতোই পাশের টেবিলে রাখা আধ গ্লাস 'ক্‌ভাস' মদ পান করল। প্রিয বিড়ালটি আস্তে আস্তে ঘবে ঢুকল। আন্না ফিয়োদরভ্‌না সেটাকে কাছে ডেকে নিল এবং ঘুম না আসায় ঘরর-ঘরর ডাক শুনতে শুনতে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

"বিড়ালটাই আমাকে জাগিয়ে রেখেছে," এই কথা মনে হতেই সে বিড়ালটাকে ঠেলে সরিয়ে দিলো। বিড়ালটা আস্তে মেঝেতে পড়ে লোমওয়ালা লেজটাকে ফুলিয়ে দিয়ে লাফিয়ে স্টোভ-বাংকের উপর উঠে গেল। এই সময় চাকরাণীটি ঘরে ঢুকল। সে কর্ত্রীর ঘরেই মেঝেতে শোয়। মাদুর বিছিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিয়ে সে যীশুর মূর্তির আলোটা জ্বেলে দিলো। একটু পরেই তার নাক ডাকতে শুরু করল, কিন্তু আন্না ফিয়োদরভ্‌নার ক্ষুব্ধ মনে ঘুম তার শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিলো না। চোখ বুজলেই সামনে ভেসে ওঠে হুজারের মুখ; আর চোখ খুললে ঘরের সব জিনিস—যীশুর মূর্তির আলোয় স্বল্প আলোকিত কমোড, টেবিল, ঝোলানো সাদা ফ্রকটা—সবই যেন বিচিত্র মূর্তিতে তাকেই ফুটিয়ে তুলছে। একবার বিছানার নিচেকার লেপটা যেন তার শ্বাসরোধ করে দিলো, পরমুহূর্তেই ঘড়ির শব্দ বা চাকরাণীর নাক ডাকার শব্দ তার বিরক্তি উৎপাদন করতে লাগল। চাকরাণীকে ডেকে তুলে নাক-ডাকা বন্ধ করতে বলল। মেয়ের কথা, বৃদ্ধ কাউন্ট ও তরুণ কাউন্টের কথা, "প্রেফারেন্স" খেলার কথা---সব তার মনে তালগোল পাকিয়ে গেল। এই দেখল, স্বর্গত কাউন্টের সঙ্গে সে ওয়াল্‌জ্‌ নাচছে, দেখল নিজের ফোলা-ফোলা সাদা গলাটা, মনে হলো কারও ঠোঁট সেখানে চেপে বসেছে; আবার দেখল, তার মেয়ে তরুণ কাউন্টের বাগ্দত্তা হয়েছে। উস্তয়ুশ্‌কার নাক আবার ডাকতে শুরু করল...

"না, না; এখানকার মানুষরা কেউ আগেকার মতো নয়। আমার জন্য সে তো অসাধ্য সাধনেও রাজী ছিল। আর রাজী হবার যথেষ্ট কারণও ছিলো। আর এরা ঠিক জানবে, টাকা জেতার আনন্দেই হাঁদারামের মতো ঘুমুচ্ছে, প্রেম করার জন্য এতটুকু নড়াচড়ার ইচ্ছাও নেই। কিন্তু তার বাবা নতজানু হয়ে আমার কাছে কী মিনতিই না করেছিল: তুমি আমাকে কি করতে বলো? নিজেকে শেষ করে দেব? তোমার জন্য সানন্দে তাও করতে পারি। আর আমি চাইলে তাই সে করত।"

হঠাৎ বাইরের হলে খালি পায়ের শব্দ শোনা গেল: ড্রেসিং জ্যাকেটের উপর একখানি শাল মাত্র জড়িয়ে ম্লান মুখে কাঁপতে কাঁপতে লিজা দৌড়ে ঘরে ঢুকেই মায়ের বিছানায় প্রায় উপুড় হয়ে পড়ে গেল. .

মাকে শুভরাত্রি জানিয়ে লিজা একাকি ঘরে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে সাদা ড্রেসিং জ্যাকেটটা পরে, রুমাল দিয়ে দীর্ঘ চুলগুলি বেঁধে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিলো, জানালাটা খুলে দিলো এবং পা গুটিয়ে একখানা চেয়ারে বসল। বিষণ্ন মুখে তাকিয়ে রইল পুকুরের দিকে; সারা পুকুরটা চাঁদের রূপোলি আলোয় ঝিলমিল করছে!

এতকাল যে সব জিনিস, যে সব কাজকর্ম তার ভাল লাগত সে সব যেন তার কাছে নতুন রূপে ধরা দিলো ঃ তার বৃদ্ধ খেয়ালি মা যার প্রতি নিঃসংশয় ভালবাসা যেন তার অস্তিত্বেরই অঙ্গ, তার দয়ালু ও দুর্বল মামা, দাসদাসী যারা তাদের ছোট কর্ত্রীকে পুজো করে, দুধেলা গাই ও বাছুর ---তারা সবাই, আর যে প্রাকৃতিক পরিবেশ বহু হেমন্তের অবসান ও বহু বসন্তের আবির্ভাবকে প্রত্যক্ষ করেছে, যে পরিবেশে

ভালবেসে ও ভালবাসা পেয়ে সে মানুষ হয়েছে—সে সবই আজ তার কাছে মিথ্যা হয়ে দেখা দিলো; তার মনে হলো, সে সবই ক্লান্তিকব, অবাঞ্ছিত। কেউ যেন তার কানে কানে বলছেঃ "তুমি নির্বোধ! তুমি নির্বোধ! বিশ বছর ধরে অন্যের সেবায় তুমি নিজেকে ক্ষয় করেছ, কখনও বোঝনি প্রকৃত জীবন ও সুখ কি জিনিস!" এখন ঐ উজ্জ্বল স্তব্ধ বাগানের গভীরে চোখ মেলে বসে বসে এই সব চিন্তা সবেগে তার মনে ছড়িয়ে পড়ল; এমনটি ইতিপূর্বে আর কখনও হয়নি। কেন এমন হলো? হয় তো ভাবতে পারেন, কাউন্টের প্রতি আকস্মিক ভালবাসাই এর কারণ, কিন্তু মোটেই তা নয়। সে কাউন্টকে পছন্দই করে না। সে বরং আরও সহজেই কর্নেটের প্রেমে পড়তে পারত, কিন্তু সে খুব সাদাসিধে আর স্বল্পবাক। এর মধ্যেই সে তাকে ভুলে গেছে। কিন্তু মনে রেখেছে কাউন্টকে—ক্রোধে ও প্রতিবাদে। নিজেই নিজেকে বলেছে, "না, সে নয়।" তার আদর্শ প্রেমিক হবে সেই যে পরম সুন্দর, যাকে আজকের মতো রাতে, এই পরিবেশে, চারিদিকের সৌন্দর্যকে বিঘ্নিত না করেও ভালবাসা যায়—এমন এক আদর্শ যাকে কঠোর বাস্তবের সঙ্গে কোনওদিন মেলানো যায়নি।

প্রথম দিকে তার এই নির্জন জীবন, বাঞ্ছিত কোনও মানুষের এই অনুপস্থিতি লিজার অন্তরে ভালবাসার সেই মহাশক্তিকে পবিপূর্ণ ও নির্বিঘ্ন করে রেখেছিল যে মহাশক্তিকে ঈশ্বর আমাদের সকলের অন্তরেই সমভাবে দান করেছেন, কিন্তু এখন সে যেন বুঝতে পেবেছে যে, নিজেব মধ্যে একটা কিছুর উপস্থিতিকে উপলব্ধি করবার বিষণ্ণ আনন্দকে নিয়ে সে জীবনেব অনেকগুলি বছরই কাটিয়ে দিয়েছে (কখনও বা কদাচিৎ দৃষ্টি পড়েছে অন্তবের সেই বহস্যময় মঞ্জুষায় যেখানে বয়েছে এক আনন্দময় রত্নভাণ্ডার)—আরও বুঝতে পেরেছে, যে-কোনও হঠাৎ-আসা প্রথম অতিথিকেই সে সম্পদ নির্বিচারে দান করা চলে না। ঈশ্বর করুন, জীবনের এই ছোট সুখকে সে যেন শেষ দিন পর্যন্ত ভোগ করতে পারে। এটাই যে জীবনেব শ্রেষ্ঠ ও মহত্তব আনন্দ নয় তাই বা কে বলতে পারে? কে বলতে পারে, এইটেই একমাত্র সত্য ও সম্ভাবিত আনন্দ নয়?

সে অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠল, "হায় পিতা! যৌবন ও সুখ কি আমাকে ফাঁকি দিয়েই চলে যাবে, তাদের আমি কোনওদিন জানতেও পারব না? এ কি সত্য হতে পারে?" ঊর্ধ্বে উজ্জ্বল আকাশের দিকে চোখ মেলে তাকাল। ছিন্ন সাদা মেঘের দল চাঁদের দিকে এগিয়ে-আসা তারাগুলিকে মুছে দিচ্ছে। সে নিজেকেই বলল, "ঐ উপরের মেঘটা যদি চাঁদকে ছুঁতে পারে, তাহলে এটাই সত্যি। একটা কুয়াশাচ্ছন্ন ধোঁয়াটে মেঘ-খণ্ড উজ্জ্বল চাঁদটার নিচের অংশটা ঢেকে দিলো, ধীবে ধীরে ঘাসের উপর প্রতিফলিত আলোর রেখা, লেবুগাছের মাথাগুলি, পুকুরটা—সব কিছু আবছা হয়ে এল; গাছের কালো ছায়াগুলি পর্যন্ত অস্পষ্ট হয়ে উঠল। এবং ঠিক যেন একটা বিষাদের ছায়া প্রকৃতিকে অন্ধকারে ঢেকে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা মৃদু হাওয়া গাছের পাতায়

পাতায় নাড়া দিলো, আর শিশির-ভেজা পাতা, ভিজে মাটি ও লিলাক ফুলের গন্ধ সে বাতাসে ভেসে ভেসে জানালার কাছে এসে হাজির হলো।

"না, এটা সত্যি নয়," সে নিজেকে সান্ত্বনা দিলো। "আজ রাতে যদি একটা নাইটিঙ্গেল পাখি গান গায়, তাহলে এই সব বিষণ্ণ চিন্তা নির্বুদ্ধিতামাত্র; নিরাশ হবার কোনও কারণ নেই," সে ভাবতে লাগল। দীর্ঘ সময় সে চুপচাপ সেখানে বসে রইল, যেন কারও প্রতীক্ষা করছে; আর চাঁদটা কখনও মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে চারিদিক উজ্জ্বল করে তুলছে, আবার কখনও মেঘের আড়ালে গিয়ে পৃথিবীকে ছায়ায় ঢেকে দিচ্ছে। সে প্রায় ঘুমিয়ে পড়বে এমন সময় শুনতে পেল পুকুরের ধার থেকে একটা নাইটিঙ্গেল পাখি স্পষ্ট কণ্ঠে গান গেয়ে উঠল। পল্লীবালা তার চোখ দুটি খুলল। আর একবার তার আত্মা যেন নীরব উল্লাসে জেগে উঠে চারিদিকের উজ্জ্বল প্রশান্ত প্রকৃতির সঙ্গে একটা রহস্যময় ঐক্যে উজ্জীবিত হয়ে উঠল। দুটি কনুইতে ভর করে সে ঝুঁকে বসল। একটা সানন্দ দুঃখ তার বুকটাকে চেপে ধরল, আর পূর্ণতার কামনায় উদ্‌গ্রীব এক প্রচণ্ড পবিত্র ভালবাসার অশ্রুধারায়—যে অশ্রু সান্ত্বনার বাণীবহ—তার দুটি চোখ ভরে এল। জানালায় দুটি হাতকে ভাঁজ করে তার উপর সে মাথাটা রাখল। তার প্রিয় প্রার্থনা অন্তরের মধ্যে স্বতঃই উৎসারিত হয়ে উঠল। সেই অবস্থায়ই সে যেন ঘুমিয়ে পড়ল। দুটি চোখ তখনও জলে ভেজা।

একটা হাতের স্পর্শে তার ঘুম ভেঙে গেল। সে জেগে উঠল। নরম, প্রীতিপ্রদ একটা স্পর্শ। সে স্পর্শ তার হাতের উপর দৃঢ়ভাবে চেপে বসল। সহসা পরিস্থিতিটা উপলব্ধি করেই সে অস্পষ্ট আর্তনাদ করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। মনে মনে বলল, এ তো কাউন্ট হতে পারে না, কারণ চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল কাউন্ট জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। পরমুহূর্তেই সে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

১৫

কিন্তু লোকটি কাউন্টই। একদিকে মেয়েটির চিৎকার, অন্যদিকে তা শুনে বেড়ার ওধার থেকে এগিয়ে-আসা রাতের পাহারাওলার কাশির শব্দ,—এই দুইয়ের মাঝখানে পড়ে কাউন্ট তৎক্ষণাৎ ধরা-পড়া চোরের মতো শিশির-ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে ছুটে বাগানের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। মনে মনে বলল, "আমি কী বোকা! ওকে ভয় পাইয়ে দিলাম। আমার আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, উচিত ছিল ওকে ডেকে ঘুম থেকে তোলা। কী অসভ্য জানোয়ার আমি!" খানিকটা দূরে গিয়ে থেমে কান পাতল। পাহারাওলা গেটের ভিতর দিয়ে বাগানে ঢুকে গলির পথ ধরে লাঠি হাতে এগিয়ে আসছে। অতএব লুকিয়ে পড়তে হবে। দৌড়ে পুকুরের কাছে চলে গেল। একেবারে পায়ের নিচ থেকে ব্যাঙগুলো লাফিয়ে জলে পড়তে লাগল। সে চমকে উঠল। ভিজে পা নিয়েই সে বসে পড়ল আর মনে মনে নিজের কথাই ভাবতে লাগল। বেড়া ডিঙিয়ে জানালাটা খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত সে তার ছায়াটা দেখতে পায়;

বারকয়েক তার কাছে এগিয়ে গিয়েও সামান্যমাত্র খস-খস আওয়াজেই ভয় পেয়ে আবার পিছিয়ে যায়; তারপর একসময় সে নিশ্চিন্ত হয় যে মেয়েটি তার জন্যই অপেক্ষা করে আছে; এমন কি এত দীর্ঘ সময় তাকে অপেক্ষায় বসিয়ে রেখেছে বলে সে হয়ত বিরক্তই হয়েছে; আবার পরমুহূর্তেই তার মনে হয় যে এ ধরনের স্ফূর্তির ব্যাপারে সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি দেওয়া তার মতো মেয়ের পক্ষে সম্ভবই নয়; শেষ পর্যন্ত একটি গ্রাম্য বালিকার সহজাত লজ্জাবশতই সে ঘুমের ভান করে আছে এ কথা মনে করে সে মেয়েটির কাছে যায়, এবং স্পষ্টই বুঝতে পারে যে সে সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে আছে; যে কারণেই হোক তৎক্ষণাৎ সে দৌড়ে সেখান থেকে চলে যায়, কিন্তু এই কাপুরুষতার লজ্জা বোধ করে আবার সেখানে ফিরে যায় এবং সাহসের সঙ্গে মেয়েটির হাত চেপে ধরে। রাতের পাহারাওয়ালা আবার কাশল এবং সশব্দে গেটটা বন্ধ করে বাগান থেকে বেরিয়ে গেল। মেয়েটির ঘরের জানালাটাও সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল এবং ভিতর থেকে খড়খড়িও এঁটে দেওয়া হলো। এতে কাউন্ট খুবই বিব্রত বোধ করল। সব কিছু নতুন করে শুরু করবার একটা সুযোগের জন্য সে সব কিছু দিতে প্রস্তুত। হায়, এ রকম বোকামি সে দ্বিতীয়বার কিছুতেই করত না। "কী মিষ্টি মেয়েটি! কী তাজা! ভালবাসার ধনই বটে! আর আমি তাকে আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যেতে দিলাম। আমি কী আহাম্মক!" ততক্ষণে ঘুমোবার আশা একেবারেই ত্যাগ করে সে বিরক্ত মনে দৃঢ় পদক্ষেপে লেবু-গাছতলার পথ ধরে এগিয়ে চলল।

তথাপি এই রাতটা তার মনেও জাগিয়ে তুলল একটা প্রশান্ত বিষণ্ণতা ও ভালবাসার বাসনা। মাটির পথের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে ঘাস ও শুকনো খড়ের ডাঁটা। লেবুগাছের ঘন পত্র-পল্লবের ফাঁক দিয়ে ম্লান জ্যোৎস্না এসে সরাসরি তাদের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। কোথাও বা একটা বাঁকানো ডালের একপাশে চাঁদের আলো পড়ে মনে হচ্ছে যেন ডালের উপর সাদা শেওলা জন্মেছে। মাঝে মাঝেই রূপোলি পাতাগুলি যেন ফিস ফিস করে কথা বলছে। বাড়িটার সব আলো নিভে গেল; সব শব্দ থেমে গেল; এই উজ্জ্বল, স্তব্ধ সীমাহীন দিগন্ত ভরে রইল শুধুমাত্র নাইটিঙ্গেল পাখির গান। "কী রাত!" কী উজ্জ্বল রাত! বাগানের তাজা সুগন্ধি বাতাসে ফুস্‌ফুস্‌টা ভরে নিয়ে কাউন্ট ভাবতে লাগল। "কিন্তু কী যেন হারিয়ে গেছে। নিজের প্রতি, এমন কি জীবনের প্রতিও আমি যেন বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছি। কী মিষ্টি মেয়েটি! হয়তো সে সত্যি অপমান বোধ করেছে...!" এইখানে এসে তার ভাবনার মোড় ঘুরল; সে কল্পনায় দেখতে পেল, বাগানের মধ্যে গ্রাম্য বালিকাটিকে নিয়ে সে নানা বিচিত্র অবস্থায় কাটিয়ে দিচ্ছে; তারপর গ্রাম্য বালিকাটি মিন্নাতে রূপান্তরিত হলো। "আমি কী বোকা! আমার উচিত ছিল সোজা কোমর জড়িয়ে ধরে চুম্বন করা।" এই অনুশোচনা মনের মধ্যে নিয়েই কাউন্ট তার ঘরে ফিরে গেল।

কর্নেট তখনও ঘুমোয়নি। তৎক্ষণাৎ পাশ ফিরে কাউন্টের দিকে তাকাল।

"এখনও ঘুমোওনি?" কাউন্ট জিজ্ঞাসা করল।

"না।"

"কী ঘটেছে বলব কি?"

"মানে?"

"হয় তো বলা উচিত নয়—কিন্তু বলব। এখানে সরে এস।"

হারানো সুযোগের চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে মুখে একটা প্রাণবন্ত হাসি ফুটিয়ে সে বন্ধুর বিছানায় বসে পড়ল।

"তুমি কি বিশ্বাস করবে? ঐ তরুণীটি আমার সঙ্গে স্ফূর্তি করতে রাজী হয়েছিল!"

লাফিয়ে উঠে পলোজভ বলল, "কি বলছ তুমি?"

"ঠিক আছে, তা হলে শোনো।"

"কেমন করে? কখন? আমি যে বিশ্বাস কবতে পারছি না!"

"তোমরা যখন 'প্রেফাবেন্স' খেলায় জেতা টাকার হিসাব করছিলে তখন সে আমাকে জানায় যে জানালার কাছে সে আমার জন্য অপেক্ষা করবে আর জানালা বেয়েই আমি তার ঘবে যেতে পারব। এটাই হলো বাস্তববুদ্ধি থাকার সুবিধা! তুমি যখন বৃদ্ধার সঙ্গে হিসাব-নিকাশ করছিলে, আমি তখন কাজ গুছোচ্ছিলাম। কেন, তুমি নিজেই তো শুনেছ, সে বলল যে আজ রাতে জানালার ধারে বসে সে পুকুরের দিকে চেয়ে থাকবে।"

"কিন্তু সে কথার তো অন্য কোনও মানে হয় না।"

"ঠিক বলেছ; আমিও বুঝতে পারিনি, সে হঠাৎই কথাগুলো বলেছে কি না। হয় তো ও সব ব্যাপাব তার মনেও ছিল না, কিন্তু তাব মুখের চেহারা বলেছিল অন্য কথা। অবশ্য পরিণতিতে সব কিছুই ভেস্তে গেল। একটা বোকার মতো কাজ কবে বসলাম আমি," একটা ঘৃণার হাসি হেসে সে কথাগুলো বলল।

"কিন্তু কি ঘটেছে? তুমিই বা গিয়েছিলে কোথায়?"

জানালার কাছে যাবার আগে নিজের অস্থিরচিত্ততার কথাটুকু ছাড়া আর সব কিছুই কাউন্ট খুলে বলল।

"আমিই সব নষ্ট করেছি। আরও সাহসী হওয়া উচিত ছিল। সে কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে চলে গেল।"

"সে কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে চলে গেল," কর্নেট কথাগুলো আবার উচ্চারণ করল। এতকাল যে কাউন্টের প্রভাব তার উপরে ছিল খুবই বেশি ও দীর্ঘস্থায়ী, আজ তার হাসির জবাবে সেও অদ্ভুতভাবে হাসতে লাগল।

"ঠিক আছে। এখন শোবার সময় হয়ে গেছে।"

কর্নেট দরজার দিকে পিছন ফিরে মিনিট দশেক চুপচাপ রইল। তার মনের মধ্যে তখন কি যে হচ্ছিল তা বলা শক্ত, কিন্তু আবার যখন সে পাশ ফিরল তখন তার মুখে বেদনা ও দৃঢ় সংকল্পের ছায়া পড়েছে।

"কাউন্ট তুরবিন," হঠাৎ সে ফেটে পড়ল।

কাউন্ট গম্ভীরভাবে বলল, "তুমি কি ভুল বকছ? কি হলো কর্নেট পলোজভ?"

বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে পলোজভ চেঁচিয়ে বলল, "কাউন্ট তুরবিন, তুমি একটা বাজে লোক!"

১৬

সেনাবাহিনী পরদিনই চলে গেল। অফিসার দু'জন বাড়ির লোকদের সঙ্গে দেখা করল না, বিদায় নেবার জন্য তাদের খোঁজও করল না। নিজেরাও কোনও কথা বলল না। তারা স্থির করেছিল, যেখানে তারা প্রথম যাত্রা-বিরতি করবে সেখানেই দু'জনে লড়বে। দলে ছিল ক্যাপ্টেন শুল্‌জ্‌ নামে একজন সৎ সহকর্মী। সে খুব দক্ষ অশ্বারোহী, হুজারদের প্রিয়পাত্রদের অন্যতম, আর কাউন্ট তাকেই তার পরবর্তী নেতারূপে মনোনীত করে রেখেছিল। কিন্তু সে এমনভাবে সব ব্যবস্থা করে দিলো যে লড়াই তো হলোই না, বরং রেজিমেন্টের একটা লোকও এ ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গও জানতে পারল না। তুরবিন ও পলোজভের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল তা কখনও ফিরে এল না বটে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তার সময় তারা আগের মতোই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো ডাকাডাকি করত, এমন কি ভোজ-সভায় ও পার্টিতে কখনও কখনও তাদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎও হত।

১৮৫৬

তুষার-ঝঞ্ঝা

The Snow Storm

১

চা খাওয়া শেষ করে সন্ধ্যা ছ'টার পরে আমি গাড়ির আড্ডা থেকে যাত্রা করলাম। জায়গাটার নাম ভুলে গেছি, তবে এটুকু মনে আছে যে সেটা ডন কসাক জেলার নভচেরকাস্ক-এর কাছে। বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে; লোমের জোব্বা ও লোমের কম্বলে মুড়ে-সুড়ে স্লেজের ভিতরে আলিয়োশ্‌কার পাশে বেশ আরাম করে বসেছি। আড্ডা ঘরের ছাউনির তলাটা বেশ গরম ও চুপচাপ মনে হয়েছিল। বাইরে বরফ না পড়লেও মাথার উপরে একটাও তারা দেখা যাচ্ছে না; আমাদের সামনে প্রসারিত বরফ-ঢাকা প্রান্তরের তুলনায় আকাশটাকে অস্বাভাবিক রকমের নিচু ও কালো মনে হচ্ছে।

গাড়িটা গ্রাম ছেড়ে গেল; কালো কালো বায়ু-কলগুলি পিছনে পড়ে রইল; তাদের একটার মাথার উপব একটা বড় পাল বিশ্রীভাবে উড়ছিল। তখন খেয়াল হলো, রাস্তাটা ঘন বরফে ঢাকা; বাঁ দিক থেকে একটা তীব্র বাতাস এসে গায়ে লাগছে, ঘোড়ার লেজ ও ঘাড়ের লোমকে একপাশে দুলিয়ে দিচ্ছে, এবং স্লেজেব চাকায় ও ঘোড়ার ক্ষুরে যে বরফ ছিটকে উঠছে তাকে একপাশে উড়িয়ে দিচ্ছে। ঘণ্টার টুং-টাং শব্দ মিলিয়ে গেল, ঠাণ্ডা হাওয়ার একটা ঝলক আস্তিনের ফাঁক দিয়ে ঢুকে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিলো। তখনই আড্ডার ওভারসিয়ারের পরামর্শটা মনে পড়ে গেল। সে বলেছিল, রাত্রে রওনা না হওয়াই ভাল, কারণ হয় তো সারা রাত গাড়িতেই কাটাতে হতে পারে এবং পথের মধ্যেই বরফ জমেও যেতে পারে!

"তোমাব কি মনে হয় না যে আমাদের পথ ভুল হতে পারে," কোচযানকে জিজ্ঞাসা করলাম। কোনও জবাব না পেয়ে আরও স্পষ্টভাবে প্রশ্ন করলাম, "কি বলো, পরবর্তী আড্ডায় পৌছতে পারব তো? পথ ভুল হবে না তো?"

ঘাড় না ফিরিয়েই সে জবাব দিলো, "ঈশ্বর জানেন! যে ভাবে গাড়ি চালাতে হচ্ছে। রাস্তাই দেখতে পাচ্ছি না। এখন প্রভুর দয়া!"

"আরে, পরের আড্ডায় পৌছবার আশা আছে, না নেই?" আমি আবাব জিজ্ঞাসা করলাম। "সেখানে পৌছতে পারব তো?"

"পৌছতে তো হবেই," কোচয়ান বলল; সে আরও কি যেন বলল, বাতাসেব জন্য বুঝতে পারলাম না।

ফিরে যাবার ইচ্ছা নেই; কিন্তু এই শীতে ববফ-ঝড়েব মধ্যে ডন কসাক জেলার সেই একান্ত নির্জন তৃণ-প্রান্তরে স্লেজ চালিয়ে রাত কাটানো তো ভযংকর কথা। অন্ধকারে কোচযানকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না, তা ছাড়া তার উপর কোনওরকম ভরসাও করতে পারছি না। তার আসনের একপাশে না বসে ঠিক মাঝখানটায় সে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। তার গলার স্বব নির্লিপ্ত; ঢেউ-তোলা কোণওয়ালা একটা বড় টুপি সে মাথায় পরেছে, ঠিক কোচয়ানদের টুপি নয়, গাড়িটাও সে ঠিকভাবে চালাচ্ছে না, উপরের বক্সে কোচয়ানের বদলে কোনও চাকর বসলে সে যেভাবে লাগাম ধরে সেইভাবে দুই হাতে লাগামটা ধরেছে। কিন্তু সে কান দুটো ঢেকে একটা রুমাল বেশ শক্ত কবে বেঁধেছে বলেই তার প্রতি আমার মন বেশি বিরক্ত হয়ে উঠেছে। এক কথায়, আমার চোখের সামনে পিঠ বেঁকিয়ে বসা লোকটিকে আমার মোটেই ভাল লাগছে না, তার কাছ থেকে ভাল কিছু আশাও করতে পারছি না।

আলিয়োশ্‌কা বলল, "দেখো, আমার মনে হচ্ছে ফিরে যাওযাই ভাল; পথ হারানোটা বড়ই বাজে ঠাট্টার ব্যাপার।"

"প্রভু দয়া করুন! কী ভাবে বরফ ছুটছে; রাস্তা চোখেই পড়ছে না; চোখ একেবারে ঢেকে গেছে।...প্রভু দয়া করুন!" কোচযান গমগম করে বলল।

আরও সিকি ঘণ্টা যাবার আগেই কোচয়ান ঘোড়া থামিয়ে লাগাম আলিয়োশ্‌কার

হাতে দিয়ে বক্সের উপর থেকে পা নামিয়ে রাস্তাটা ভাল করে দেখার জন্য নেমে গেল; বরফে তার মস্ত বড় বুটের খচ্-খচ্ শব্দ উঠল।

"কোথায় যাচ্ছ? আমরা কি রাস্তা ভুল করেছি, অ্যাঁ?" আমি প্রশ্ন করলাম কিন্তু কোচয়ান জবাব দিলো না। বাতাস তার মুখে সোজা এসে লাগছিল, তাই মাথাটা ঘুরিয়ে সে স্লেজের কাছ থেকে এগিয়ে গেল।

ফিরে এলে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হে, রাস্তা পেলে?"

"না, কিছু না," হঠাৎ অধৈর্য হয়ে বিরক্তির সঙ্গে সে বলে উঠল, যেন তার রাস্তা হারাবার জন্য আমিই দায়ী। ইচ্ছা করে বক্সের নিচে পা ঠুকে সে বরফ-লাগা দস্তানা-পরা হাতে লাগাম তুলে নিল।

গাড়ি চালাতে শুরু করলে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "এখন কি করা হবে?"

"কি করা হবে? ঈশ্বর যেদিকে নিয়ে যাবেন সেইদিকেই যাব।"

সেই একই দুল্‌কি চালে আমরা চলতে লাগলাম। পায়ের নিচে কোনও পথ নেই; একসময়ে নরম ও গভীর বরফ, আবার কখনও বা চাকার নিচে বরফ ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

বেশ ঠাণ্ডা হলেও কোচের কলাবে বরফ পড়লেই গলে যাচ্ছে; বরফের ঝাপ্টা ক্রমেই ঘন হয়ে মাটিতে পড়ছে; কিছু জমা বরফের টুকরো মাথার উপরেও পড়ছে।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আমরা ভুল পথে চলেছি, কারণ আরও সিকি ঘণ্টা গাড়ি চালিয়েও আমরা কোনও ভার্স্ট (প্রায় ⅔ মাইল) খুঁটি দেখতে পেলাম না।

আবার কোচয়ানকে জিজ্ঞাসা করলাম, "বলো তো, তুমি কি মনে করছ; আড্ডায় পৌঁছনো যাবে তো?"

"কোন্ আড্ডায়?...ফিরে যেতে পাবব ঠিকই; ঘোড়াগুলোকে ইচ্ছামতো চলতে দিলেই তারা ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে, কিন্তু সামনের দিকে কোনও আড্ডায় পৌঁছতে পারব কি না আমাব সন্দেহ আছে; হয় তো আমাদের প্রাণটাই যাবে।"

আমি বললাম, "তাহলে ফিরেই যাওয়া যাক; আর সত্যি সত্যি..."

"তাহলে ফিরে যাব?" কোচয়ান কথাটার পুনরাবৃত্তি করল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফিরে চলো!"

কোচয়ান হাতের লাগাম ছেড়ে দিলো। ঘোড়াগুলি আরও জোরে ছুটতে লাগল। কখন যে ঘুরে গেছি খেয়াল কবিনি, তবে বাতাসের গতি বদলে গেল এবং শীঘ্রই বরফের ভিতর দিয়ে বায়ু-কলগুলি দেখা গেল। কোচয়ানের মনের বল ফিরে এল, সেও কথাবার্তা বলতে শুরু করল। বলল, "এই তো সেদিন তারাও এই রকম বরফ-ঝড়ে পবে পরের আড্ডা থেকেই ফিরে এসেছিল; রাতটা একটা খড়ের গাদায় কাটিয়ে তারা ফিরেছিল পরদিন সকালে। খড়ের গাদায় ঢুকে খুবই ভাল কবেছিল, নইলে যা বরফ পড়ছিল, ঠাণ্ডায় মরে যেত। তাতেই একজনের পায়ে বরফ-ঘা হয়েছিল; আর তিন সপ্তাহ পরে তাতেই সে মারা গেল।"

আমি বললাম, "কিন্তু এখন তো সেরকম ঠাণ্ডা নয়; মনে হচ্ছে বাতাসটাও পড়েছে; চেষ্টা করে দেখবে নাকি?"

"একটু গরম হতে পারে, কিন্তু বরফ সেই রকমই ছুটছে। হাওয়াটা এখন আমাদের পিছনে, তাই একটু শান্ত মনে হচ্ছে, কিন্তু বাতাস খুব জোরে বইছে। ডাক বা অন্য কিছু থাকলে আমাদের হয়তো যেতেই হতো, কিন্তু নিজেদের মতো করে যখন যাচ্ছি তখন ব্যাপারটা আলাদা; যাত্রীদের ঠাণ্ডায় জমিয়ে দেওয়া তো কোনও কাজের কথা নয়। আপনার জন্যই যদি পরে আমাকে জবাবদিহি করতে হয়, তখন কি হবে?"

২

ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা কয়েকটি *স্লেজের* ঘণ্টা শুনতে পেলাম; গাড়িগুলি পিছন দিক থেকে জোর ছুটতে ছুটতে আমাদের ধরে ফেলবার চেষ্টা করছে।

আমাদের কোচয়ান বলল, "ওটা মেল এক্সপ্রেস-এর ঘণ্টা; আড্ডায় এ রকম গাড়ি মাত্র একটাই আছে।"

সত্যি, প্রথম স্লেজটার ঘণ্টার শব্দ বিশেষভাবে শ্রুতিমধুর; ঘণ্টাগুলির স্পষ্ট, সুরেলা এবং কিছুটা জোরালো শব্দ বাতাসে ভেসে এসে আমাদের কানে বেশ ভালভাবেই পৌঁছচ্ছিল। পরে জেনেছিলাম, ক্রীড়াবিদ্‌দের *স্লেজে* যে ধরনের তিনটে ঘণ্টা থাকে—মাঝখানে একটা বড় ঘণ্টা, তাতে বাজে যাকে বলে "র‍্যাস্পবেরি" সুর, এবং দু'দিকে দুটো তৃতীয় ঘণ্টার মাঝখানে দুটো ছোট ঘণ্টা, এই *স্লেজের* ঘণ্টাগুলিও সেইরকম। দুটি তৃতীয় ঘণ্টা এবং শেষের কর্কশ ঘণ্টা মিলে এমন একটা স্বর লহরী সৃষ্টি হয় যা নির্জন, নিঃশব্দ তৃণভূমিতে অত্যন্ত অসাধারণ মনে হয় এবং অদ্ভুত রকমের মিষ্টি শোনায়।

তিনটি *স্লেজের* প্রথমটা আমাদের সামনে এসে পৌঁছলে আমাদের কোচয়ান বলল, "এটা ডাক-গাড়ি।.. রাস্তা কেমন গো? শেষ পর্যন্ত যাওয়া যাবে কি?" সকলের শেষের কোচয়ানকে ডেকে সে শেষের কথাগুলি বলল; কিন্তু কোনও জবাব না দিয়ে সে ঘোড়াগুলিকে লক্ষ্য করে হাঁক ছাড়ল।

ডাক-গাড়িটা আমাদের পার হয়ে যেতেই তার ঘণ্টার ধ্বনিও বাতাসে মিলিয়ে গেল। মনে হলো, আমাদের কোচয়ান একটু লজ্জিত হয়েছে।

আমাকে সে বলল, "আমরা এগিয়ে গেলে কেমন হয় স্যার? ওরা তো এই রাস্তায়ই গাড়ি চালিয়ে এসেছে, তাই ওদের চাকার দাগ এখনও স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাবে।"

আমি সম্মতি দিতেই গাড়িটা ঘুরে গেল; আমরা আবার বাতাসের মুখোমুখি হলাম; পুরু বরফের ভিতর দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলল। যাতে আগেকার *স্লেজের* চাকার দাগ থেকে আমরা সরে না যাই সেজন্য আমি রাস্তার উপর নজর রেখে

চললাম। দুই ভার্স্ট পর্যন্ত তাদের চাকার দাগ বেশ স্পষ্ট দেখা গেল; তারপরই চাকার নিচে শুধু একটু নিচু জায়গা চোখে পড়তে লাগল; সেটা কি পথ, না বাতাসে বরফ উড়ে গিয়ে একটা খাঁজ সৃষ্টি হয়েছে মাত্র, তা আমি কোনও মতেই ঠাহর করতে পারলাম না। আমাদের গাড়ির নিচ থেকে এমনভাবে অবিশ্রান্ত বরফের টুকরো ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছিল যে সেদিকে চেয়ে চেয়ে আমার চোখ ঝলসে যাবার উপক্রম হলো; তাই আমি সোজা সামনের দিকে তাকাতে লাগলাম। তৃতীয় ভার্স্ট খুঁটিটাও দেখলাম, কিন্তু চতুর্থটা দেখতে পেলাম না; আগের মতোই আমরা কখনও বাতাসের বিপক্ষে কখনও স্বপক্ষে, কখনও বাঁয়ে কখনও ডাইনে এগোতে লাগলাম; শেষে এমন একটা অবস্থা দাঁড়াল যে কোচয়ান বলল আমরা অনেকটা বেশি ডাইনে চলে এসেছি, আর আমি বললাম অনেকটা বেশি বাঁয়ে, আর আলিয়োশ্‌কা বলল যে আমরা সোজা পিছন দিকে চলেছি। আবার বারকয়েক গাড়ি থামানো হলো, কোচয়ান তার পা দুটো তুলে গাড়ি থেকে নেমে রাস্তা খুঁজল, কিন্তু সব বৃথা। আমিও একটা কি যেন দেখতে পেয়েছিলাম সেটা সত্যি রাস্তা কিনা জানবার জন্য আমিও একবার গাড়ি থেকে নামলাম। কিন্তু বাতাস ঠেলে সবে ছ' পা এগিয়েছি এবং বেশ বুঝতে পেরেছি যে চারদিকে সাদা বরফ ছাড়া আর কিছুই নেই, রাস্তাটা আমার কল্পনা মাত্র, এমন সময় স্লেজটাও আর দেখতে পেলাম না। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম "কোচয়ান! আলিয়োশকা!" কিন্তু আমার মনে হলো, বাতাস আমার কণ্ঠস্বরকে আমার ঠোঁট থেকেই ধরে নিয়ে এক সেকেন্ডের মধ্যে অনেক দূরে ছড়িয়ে দিলো। যেখানে স্লেজটা দাঁড়িয়ে ছিল সেই দিকে ছুটে গেলাম—স্লেজটা সেখানে নেই। ডাইনে গেলাম, সেখানেও নেই। যে রকম উচ্চ, কর্কশ ও হতাশ কণ্ঠে তখন আমি আর একবার "কোচয়ান!" বলে চিৎকার করেছিলাম সে কথা মনে হলে এখনও আমি লজ্জা বোধ করি, কারণ সে তখন আমার কয়েক পা দূরেই দাঁড়িয়েছিল। তার কালো চেহারা, হাতে চাবুক, মাথার একদিকে নিচু করে পরা মস্ত বড় টুপি, সবই হঠাৎ আমার সামনে এসে দেখা দিলো। সে আমাকে নিয়ে স্লেজের কাছে এগিয়ে গেল।

সে বলল, "এটা যে অন্তত গরম আছে এ জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত; বরফ যদি আরও জোর পড়তে শুরু করে তাহলে অবস্থা কাহিল হবে—ঈশ্বরের দয়া!"

স্লেজে বসে আমি বললাম, "তাহলে ঘোড়া ছেড়ে দাও, আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে চলুক। ওরা আমাদের ঠিক ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, কি বলো?"

"তা পারা উচিত।"

লাগাম রেখে দিয়ে সে চাবুক তুলে প্রথম ঘোড়াটার পিঠে তিন ঠোক্কর মারল; আমরা আবার চলতে শুরু করলাম। আরও আধ ঘণ্টা কাটল। হঠাৎ আমাদের সামনেও ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেলাম; বুঝতে ভুল হলো না যে এও সেই ক্রীড়াবিদ্‌দের গাড়ির মতো ঘণ্টা। কিন্তু এবার ঘণ্টাগুলি সামনের দিক থেকে এগিয়ে আসছে। সেই

তিনখানি স্লেজই তাদের আড্ডায় ফিরে চলেছে; শুধু ঘোড়াগুলি বদলে নিয়েছে। এক্সপ্রেস গাড়ির তিনটে বড় ঘোড়া জোর কদমে ছুটে বেরিয়ে গেল। গাড়িতে মাত্র একজন কোচয়ান। বক্স-সিটে বসে ঘোড়াগুলোকে লক্ষ্য করে সে অবিরাম চেঁচাচ্ছে। তার পিছনে খালি স্লেজে একজোড়া কোচয়ান বসে আছে; তাদের সরল ফুর্তিবাজ কথাবার্তা শুনতে পেলাম। তাদের একজনের মুখে পাইপ; তার আগুনটা বাতাস লেগে জ্বলতে থাকায় তার মুখের খানিক অংশে আলো পড়েছে। তাদের দিকে তাকিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে ভয় পেয়েছিলাম বলে আমাদের লজ্জা করতে লাগল; আমাদের কোচয়ানেরও বোধ হয় লজ্জা করছিল; আমরা একসঙ্গে বলে উঠলাম, "ওদের পিছন পিছনই আমরা যাব।"

৩

সকলের পিছনের স্লেজটা আমাদের পাশ কাটিয়ে যাবার আগেই আমাদের কোচয়ান অদ্ভুতভাবে গাড়িটাকে ঘুরিয়ে তার শকট-দণ্ডটাকে সেই স্লেজটার ঘোড়াগুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো। ফলে তার তিনটে ঘোড়া লাগাম ছিঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

"আঃ, এ রাত-কানাটা কি চোখেও দেখে না; কোথায় ঢুকিয়ে দিলো—একেবারে লোকের শরীরের মধ্যে।...ব্যাটা শয়তান!" বেঁটে কোচয়ানটা চেনা গলায় ফিসফিসিয়ে উঠল—তার চেহারা দেখে ও গলা শুনে বুঝতে পারলাম লোকটা বুড়ো। সর্বশেষ স্লেজটা থেকে অনায়াসে লাফিয়ে নেমে আমাদের কোচয়ানের উদ্দেশে কাঁচা খিস্তি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সে ঘোড়াগুলোর পিছনে ছুটে গেল।

কিন্তু ঘোড়াগুলো সহজে ধরা দেবার পাত্র নয়। বুড়ো লোকটা তাদের পিছনে ছুটতে লাগল। দেখতে দেখতে সেই বরফ-ঝড়ের সাদা অন্ধকারে সকলেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

"ভাসিলি—ই। এদিকে পথ আটকে দাঁড়াও, নইলে এ ভাবে ওদের ধরা যাবে না," আবার তার গলা শুনতে পেলাম।

একজন খুব ঢ্যাঙা কোচয়ান স্লেজ থেকে নেমে ঘোড়া তিনটেকে জোয়াল থেকে খুলে তারই একটায় সওয়ার হয়ে ববফের উপর খচ্‌মচ্‌ শব্দ করতে করতে জোর কদমে সেইদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাকি দুটো স্লেজের সঙ্গে ভিড়ে আমরাও পথ ছাড়াই এগিয়ে চললাম। আমাদের সামনে ঠুন-ঠুন ঘণ্টা বাজিয়ে জোর কদমে পথ দেখিয়ে ছুটে চলল এক্সপ্রেস স্লেজটা।

যে লোকটা ঘোড়া ধরতে গিয়েছে তাকে উদ্দেশ্য করে আমাদের কোচয়ান বলল, "বটে! ও ধরবে ঘোড়া! নিজের থেকে যদি অন্য ঘোড়ার সঙ্গে এসে না জমে, তাহলে ওটা যা বিচ্ছু জানোয়ার, ওকে তুর্কী নাচন নাচিয়ে ছাড়বে; কিছুতেই ও ধরতে পারবে না।"

এতক্ষণে আমাদের কোচয়ানের মেজাজ ভাল হয়েছে, মুখে কথা ফুটেছে। আমারও ঘুম আসছিল না, তাই সে সুযোগটার সদ্ব্যবহার করলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে কোথা থেকে এসেছে, কেমন করে এসেছে, আর করেই বা কি; আর অচিরেই জানতে পারলাম যে, সে আমার জেলারই মানুষ, "তুলা"র লোক, "কিরপিচনি" গাঁয়ের একজন ভূমিদাস, যৎসামান্য জমি আছে, তাতেও গত কলেরার বছর থেকে কোনও ফসলই হয়নি। বাড়িতে থাকে দুই ভাই, আর এক ভাই গেছে সৈন্য হয়ে; বড়দিন পর্যন্ত চলবার মতো খাবারও তাদের ছিল না, তাই সকলে রোজগারের ধান্ধায় বেরিয়েছে। সে জানাল, ছোট ভাইই বাড়ির কর্তা, কারণ সে বিয়ে-থা করেছে, আর সে নিজে মৃতদার। প্রত্যেক বছর তাদের গাঁ থেকে দলে দলে লোক এখানে কোচয়ানি করতে আসে, যদিও সে নিজে এর আগে কখনও আসেনি; কিন্তু এবার সেও এসে নাম লিখিয়েছে যাতে ভাইদের কিছুটা সাহায্য হয়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এখানে সে এক বছরে একশ' ত্রিশ রুবল আয় করেছে, আর তার থেকে একশ' রুবল বাড়িতে পাঠিয়েছে; তাছাড়া, এখানে বেশ ভালই কাটত, কিন্তু এই ডাক-গাড়িব লোকগুলো বড়ই নৃশংস, আর এ অঞ্চলের লোকজনরাও বড় চড়া মেজাজের।

"দেখুন না, ঐ কোচয়ানটা কেন আমাকে গালাগাল দিলো? প্রভু, ওদের দয়া করো! আমি কি ইচ্ছা করে ওর ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিয়েছি? আমি কি অন্যের ক্ষতি করবার মতো লোক? আর ওই বা ঘোড়াগুলোর পিছনে ছুটল কেন? ওরা তো নিজেব থেকেই বাড়ি চলে যেত। অকাবণেই ঘোড়াগুলোকে ছুটিয়ে মারছে, আর নিজেও খেটে মবছে," ঈশ্বর-ভীরু লোকটি বলতে লাগল।

আমাদের সামনে কিছু কালো কালো জিনিস দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "ওই কালো বস্তুটা কি?"

"কেন, এক সার মালগাড়ি। ওভাবে পথ চলা ভারি মজার!" শনের বস্তা বোঝাই বড় বড় মালগাড়ি একের পর এক চলেছে। আমবা তাদেব কাছাকাছি পৌঁছতে সে বলে উঠল, "দেখুন, একটা মানুষও দেখা যাচ্ছে না—সবাই ঘুমিয়ে আছে। চালাক ঘোড়াগুলো ঠিক পথ চিনে চলে যাবে, একটুও ভুল করবে না। আমি মালগাড়িও চালিয়েছি কি না, তাই জানি।"

সত্যি বড় বড় গাড়িগুলো বোঝাই বস্তাব উপর থেকে একেবারে চাকা পর্যন্ত আগাগোড়া বরফে ঢাকা অবস্থায় কেমন আপনা থেকেই এগিযে চলেছে, দেখতে অবাক লাগে। যখন মালগাড়িগুলোর ঠিক পাশাপাশি আমাদের গাড়ির ঘণ্টা বাজতে লাগল তখন একেবারে প্রথম গাড়ির বরফ-ঢাকা বস্তাগুলোর একটা কোণ দুটো আঙুলে তুলে ধরে তার ফাঁকে মুহূর্তেব জন্য একটা টুপি দেখা দিলো। ফুট্‌ফুট্ দাগওয়ালা বড় ঘোড়াটা গলা বাড়িয়ে বরফ-ঢাকা পথ দিয়ে সমান তালে এগিয়ে চলেছে; সাদা জোয়ালের নিচে তার লোমশ মাথাটা তালে তালে দুলছে। আমরা কাছাকাছি পৌঁছে গেলে সে তার একটা বরফ-ঢাকা কান খাড়া করল।

আরও আধ ঘণ্টা পথ চলবার পরে আমাদের কোচয়ান আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি মনে করেন স্যাব, আমরা ঠিক পথে চলেছি তো?"

"আমি জানি না," জবাব দিলাম।

"বাতাসটা স্যার আগে এই দিকে ছিল, কিন্তু এখন বাতাসটা আমাদের পিঠে লাগছে। না, আমরা ঠিক পথে যাচ্ছি না, আবার পথ ভুল হয়েছে।" গম্ভীর মুখে সে বলল।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, যদিও সে খুব ভীরু, তবু কথায় বলে সদলে মরেও সুখ; যেহেতু এখন আমরা দলে বেশ ভারী এবং পথ দেখানোর দায় দায়িত্ব এখন আর তার নেই, তাই এখন সে বেশ শান্ত হয়ে উঠেছে। ঠাণ্ডা মাথায় সে প্রথম স্লেজের কোচয়ানের ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে মন্তব্য করতে লাগল, যেন এ বিষয়ে তার কোনও আগ্রহই নেই। আমি অবশ্য লক্ষ্য করেছি যে, প্রথম স্লেজটাকে কখনও আমার বাঁয়ে, কখনও বা ডাইনে দেখতে পাচ্ছি; তাতেই বুঝতে পারছি যে একটা খুব ছোট জায়গায় আমরা ঘুরে ঘুরে চলেছি। অবশ্য এটা আমার দৃষ্টি-বিভ্রমও হতে পারে; যেমন তৃণভূমিটা সর্বত্র সমতল হলেও আমার মনে হচ্ছিল যে প্রথম স্লেজটা কখনও চড়াই, কখনও উৎরাই ধরে চলেছে।

আরও বেশ কিছুটা পথ পার হবার পরে—আমার মনে হলো, অনেক দূরে, একেবারে দিগন্ত-রেখাব কাছে—একটা দীর্ঘ কালো সচল রেখা দেখতে পেলাম। কিন্তু এক মিনিট পরেই বুঝতে পারলাম, যে মালগাড়িগুলিকে আমরা পিছনে ফেলে এসেছিলাম ওটা সেই শ্রেণীবদ্ধ মালগাড়ির দৃশ্য। ঠিক আগের মতোই বরফ লেগে চাকাগুলি ক্যাঁচব-ক্যাঁচর শব্দ করছে, কোনওটা বা একেবারেই ঘুরছে না। আগের মতোই বস্তা চাপা দিয়ে সবাই ঘুমুচ্ছে, এবং আগের মতোই সামনের ফুট্‌ফুট্ দাগওয়ালা ঘোড়াটা নাক ফুলিয়ে রাস্তাটা শুঁকছে আর কান খাড়া করে রয়েছে।

অসন্তুষ্ট গলায় আমাদের কোচয়ান বলে উঠল, "ঐ যাঃ, আমরা ঘুরছি তো ঘুরছি, আবার সেই মালগাড়িগুলোর সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল। ডাক-গাড়ির ঘোড়াগুলো ভাল, তাই এমন পাগলাটে পথেও তাদের ভালভাবে চালানো যায়, কিন্তু আমরা যদি সারা রাত এই করতে থাকি তাহলে আমাদের ঘোড়ার দফা রফা হয়ে যাবে।"

সে গলা খাঁকারি দিলো।

"অরও বিপদ ঘটবার আগে, বলুন স্যার আমরা ফিরেই যাই।"

"কেন? কোনও না কোনও স্থানে তো আমরা পৌঁছবই।"

"কোনও স্থানে পৌঁছবই! কে জানে, হয় তো সারাটা রাত আমাদের এই তৃণভূমিতেই কাটাতে হবে। কী প্রচণ্ডভাবে বরফ পড়ছে!...প্রভু ক্ষমা করো!"

সামনের কোচয়ান রাস্তা ও নিশানা হারিয়ে ফেললেও রাস্তার হদিস করার চেষ্টা না করে ঘোড়াগুলোকে আদর করতে করতে জোর কদমে গাড়ি চালাতে লাগল। এতে বিস্মিত হলেও আমি অন্য স্লেজগুলিকে ছেড়ে দিয়ে এখানে থেমে যেতে চাইলাম না।

"ওদের পিছনে চলো," আমি বললাম।

কোচয়ান গাড়ি ছেড়ে দিলো; কিন্তু গাড়ি চালাবার সেই আগ্রহ যেন এখন আর তার মধ্যে নেই। আমাকেও সে আর একটি কথাও বলল না।

৪

ঝড় ক্রমেই বাড়তে লাগল। আকাশ থেকে জমাট বরফ পড়ছে। মনে হলো, সব বুঝি জমে যাবে; নাকে ও গালে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগছে; মাঝে মাঝেই ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্টা। আমার লোমের কোটের মধ্যে ঢুকে পড়ায় আমাকে আরও ভালভাবে মুড়িসুড়ি দিতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে বরফের চাঁই ভেঙে যাওয়ায় স্লেজটা তার উপর ধাক্কা খাচ্ছে, এ যাত্রার শেষ কি ভাবে হবে সেটা দেখবার যথেষ্ট আগ্রহ থাকলেও যেহেতু একটি রাতও বিশ্রাম না নিয়ে আমি ছ' শ' ভার্স্ট পথ পার হয়েছি, তাই আমার চোখ দুটি বুজে এল, আর আমিও তন্দ্রায় ঢলে পড়লাম। একবার চোখ খুলতেই সারাটা সাদা প্রান্তর জুড়ে একটা উজ্জ্বল আলোর ছটা দেখতে পেয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। দিগন্ত-রেখা স্পষ্টতই অনেকটা দূরে সরে গেছে। ঝুলে-পড়া কালো আকাশটা হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে; চারদিকেই চোখে পড়ছে পড়ন্ত বরফের সাদা, ফাঁকা রেখাগুলি; সামনের স্লেজের ঘোড়াগুলির দেহ-রেখা আরও স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, মাথার উপরে তাকিয়ে এই প্রথম আমার মনে হলো যে, ঝড়ো মেঘ কেটে গেছে, আর শুধুমাত্র পড়ন্ত বরফেই আকাশটা ঢাকা পড়েছে। আমি যতক্ষণ বসে বসে ঝিমুচ্ছিলাম ততক্ষণে চাঁদ উঠেছে; তার ঠাণ্ডা, উজ্জ্বল আলো হাল্কা মেঘ ও পড়ন্ত বরফের ভিতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি শুধু আমাদের স্লেজ, তার ঘোড়া ও কোচয়ানকে, এবং আমাদের সামনেকার তিনটি স্লেজ ও তার ঘোড়াগুলোকে। প্রথম স্লেজটা ডাক গাড়ি; কোচয়ানটি তখনও বক্সে বসে দুল্‌কি চালে গাড়ি চালাচ্ছে। দ্বিতীয় স্লেজে দুটি লোক লাগাম রেখে দিয়ে জোব্বার মধ্যে ঢুকে বসে আছে; তাদের পাইপের আগুনেই দেখতে পাচ্ছি তারা একটানা ধূমপান করে চলেছে তৃতীয় স্লেজে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না; কোচয়ান সম্ভবত গাড়ির মাঝখানে ঘুমিয়ে আছে। আমি জেগে উঠে দেখলাম, সামনের কোচয়ান ঘোড়া থামিয়ে রাস্তা খুঁজছে। কিন্তু যেই আমরা থেমেছি অমনি বাতাসের হাহাকার আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল এবং পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, আশ্চর্য রকমের বড় বড় চাঁই বাতাসে ছুটে যাচ্ছে। ছুটন্ত বরফে আবৃত চাঁদের আলোয় দেখলাম, কোচয়ানের ছোট মূর্তিটি হাতের বড় চাবুকটা দিয়ে বরফগুলোকে সরাবার চেষ্টা করছে। সেই সাদা অন্ধকারের মধ্যে কখনও পিছিয়ে, কখনও এগিয়ে স্লেজের কাছে পৌঁছে পাশ থেকে লাফিয়ে সে সামনের সিটে উঠে বসল। বাতাসের একটানা শোঁ-শোঁ শব্দের ভিতর দিয়ে আবার আমরা শুনতে পেলাম সে সুর করে ঘোড়াগুলোকে ডাকছে, আর ঘণ্টাগুলি ঠুন্ ঠুন্ করে বাজছে। সামনের কোচয়ান যতবার রাস্তার খোঁজে নিচে নামছে ততবারই দ্বিতীয় স্লেজ থেকে একটি আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠস্বর হাঁক দিয়ে বলছে—

"আমি বলছি ইগ্‌নাশ্‌কা, আমরা অনেকটা বাঁয়ে চলে এসেছি। ঝড়কে বাঁচিয়ে আরও ডাইনে চলো" অথবা "বোকার মতো ঘুবে মরছ কেন? ববফ যেদিকে ছুটছে সেইদিকে যাও, তাহলেই ঠিক পৌঁছে যাব।" অথবা, "ডাইনে, ডাইনে চলো বাপধন। দেখো, ওখানে কালো ওটা কি—হয় তো ভার্স্ট-খুঁটি?" অথবা "এভাবে ঘুবে মরছ কেন? ছিট্-ছিট্ ঘোড়াটাকে জোয়াল থেকে খুলে দাও, তাকে আগে যেতে দাও, সেই তোমাকে ঠিক পথে পৌঁছে দেবে। সেটাই সব চাইতে ভাল ব্যবস্থা।"

যে লোকটি এই পরামর্শ দিচ্ছিল সে নিজে কিন্তু ঘোড়াকেও ছেড়ে দেয়নি, বা রাস্তা খুঁজতে গাড়ি থেকে নামেওনি; এমন কি জোব্বার নিরাপদ আশ্রযেব বাইরে সে একবাবও নাকটি বের করেনি। একবার তার এই সব পরামর্শেব জবাবে ইগ্‌নাশ্‌কা যখন চেঁচিয়ে বলল যে বাজে পরামর্শ না দিযে সে ববং নিজেই সামনে এসে গাড়িটা চালিয়ে পথ দেখিয়ে দিক, তখন এই সৎ পরামর্শদাতা জবাবে জানাল, সে যদি ডাক-গাড়ি চালাত তাহলে সে নিশ্চয় সামনে গিয়ে তাদেব সঠিক রাস্তায় তুলে দিত। চেঁচিয়ে বলল, "আমাদেব ঘোড়া ঝড়েব মধ্যে ঠিক চলতে পাবে না। এগুলো তেমন জাতের নয়!"

নিজের ঘোড়াগুলোকে লক্ষ্য করে শিস দিতে দিতে ইগ্‌নাশ্‌কা বলল, "তাহলে আর কথা বলতে এস না।"

পরামর্শদাতার স্লেজের অপব কোচয়ান ইগনাশ্‌কাকে কিছুই বলেনি, আলোচনায যোগই দেযনি; তাই বলে সে যে ঘুমিয়ে ছিল তাও নয়; তার পাইপেব আগুন তখনও জ্বলছে, তাছাড়া, আমরা যখন থেমেছিলাম তখন তাব কথা আমাব কানে এসেছে। সে একটা গল্প বলছিল। শুধু একবার, যখন ইগ্‌নাশ্‌কা ষষ্ঠ বা সপ্তমবাব গাড়ি থামিযেছিল, তখন পথ চলার আনন্দে বাধা পড়ায বিবক্ত হযে সে চেঁচিযে বলেছিল—

"আবে, আবাবও থামলে কেন? বাস্তা খুঁজতে বুঝি! দেখতে পাচ্ছ না, ববফ ঝড় বইছে। স্বয়ং কানুনগোও এখন পথ চিনতে পারবে না, যতক্ষণ ঘোড়া ছুটবে ততক্ষণ গাড়ি চালিয়ে যাও। আমবা ঠাণ্ডায জমে মবে যাব না। এগিয়ে চলো।"

"বটে! কিন্তু এটা তো ঠিক যে গেল সন ডাক গাড়ির এক কোচয়ান ঠাণ্ডায মাবা গিযেছিল।" আমাব কোচয়ান পাল্টা জবাব দিলো।

তৃতীয স্লেজেব লোকটিব ঘুমই ভাঙল না। শুধু একবার আমবা থামলে পরামর্শদাতা হাঁক দিলো—

"ফিলিপ, হেই ফিলিপ!" কোনও জবাব না পেয়ে বলল, "ও কি জমে গেল নাকি? ইগ্‌নাশ্‌কা, একবাব দেখো তো।"

ইগ্‌নাশ্‌কা সব কাজেই বাজী। স্লেজেব কাছে গিয়ে সে ঘুমন্ত লোকটিকে খোঁচা দিলো।

"মনে হচ্ছে, এক পাত্রেই ওর হয়ে গেছে।" তাকে নাড়া দিয়ে বলল, "যদি জমে গিয়ে থাক তো সে কথা বলো!"

ঘুমন্ত লোকটি গালাগালি দিয়ে উঠল।

"বেঁচে আছে হে!" বলে ইগ্‌নাশ্‌কা ছুট দিলো। আমরা আবার ছুটে চললাম, এত জোরে ছুটতে লাগলাম যে আমাদের স্লেজের যে ছোট ঘোড়াটাকে অনবরত চাবুক কষতে হচ্ছিল সেটাও এবার বেখাপ্পা কদমে ছুটতে লাগল।

৫

যে বুড়ো লোকটি ও ভাসিলি পালিয়ে-যাওয়া ঘোড়ার খোঁজে গিয়েছিল তারা যখন ঘোড়ায় চড়ে ফিরে এল তখন প্রায় মাঝরাত। ঘোড়া দুটোকে ধরে তাতে সওয়ার হয়ে তারা আমাদের ধরে ফেলল। নির্জন তৃণভূমিতে এই অন্ধকার, এই চোখ-ধাঁধানো বরফ-ঝড়ের মধ্যে এটা কি করে তারা সম্ভব করল আজও সেটা আমার কাছে রহস্যময় হয়ে রয়েছে। আমাদের কাছে পৌঁছেই সে আবার আমার কোচয়ানকে চেপে ধরল।

"চেয়ে দেখো, রাতকানা শয়তান, তুমি কি..."

"হেই মিত্রিচ খুড়ো," দ্বিতীয় স্লেজের গল্প-কথক বলে উঠল, "তুমি এখনও বেঁচে আছ?...এস, আমাদের কাছে উঠে এস।"

বুড়ো কিন্তু কোনও জবাব না দিয়ে গালাগালি করেই চলল। তারপর যখন তার মনে হলো যে যথেষ্ট হয়েছে, তখন সে দ্বিতীয় স্লেজের কাছে গেল।

"সব ক'টাকে ধরেছ?" স্লেজের ভিতর থেকে প্রশ্ন হলো।

"তাই তো মনে হচ্ছে!"

ছোট মানুষটি সামনে ঝুঁকে ঘোড়ার পিঠের উপর বুকটা রেখে বরফের মধ্যে নেমে পড়ল। তারপর এক দৌড়ে স্লেজের কাছে গিয়ে এক লাফে ভিতরে ঢুকে গেল। ঢ্যাঙা ভাসিলি আগের মতোই নিঃশব্দে প্রথম স্লেজে ইগ্‌নাশ্‌কার পাশে বসে রাস্তার খোঁজে বাইরে তাকাল।

আমার কোচয়ান বলল, "দেখলে তো, কি রকম খিস্তি করা স্বভাব লোকটার...প্রভু আমাদের দয়া করুন!"

তারপর বেশ কিছু সময় কোথাও না থেমে সেই সাদা প্রান্তরের ভিতর দিয়ে বরফ-ঝড়ের ঠাণ্ডা, মিটমিটে আলোয় আমরা এগিয়ে চললাম।

আমার চোখ দুটি খোলা। বরফে ঢাকা সেই একই বেখাপ্পা টুপি ও পিঠ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে; সেই একই বাঁকানো জোয়ালের নিচে একই দূরত্বে ঘোড়ার মাথাটা উঠছে আর নামছে, আর তার ঘাড়ের কালো লোমগুলি বাতাসের তালে তালে এক পাশে দুলছে। যদি নিচে তাকাই—সেই একইভাবে স্লেজের চাকার নিচে বরফ গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে এবং বাতাসে সেগুলি একই দিকে ছিটকে পড়ছে। সামনের প্রথম স্লেজটা একই দূরত্বে ছুটে চলেছে; ডাইনে, বাঁয়ে, সব কিছু সাদা ও চঞ্চল। বৃথাই নতুন কিছুর খোঁজ করা, খুঁটি নেই, খড়ের গাদা নেই, বেড়া নেই—কিছু চোখে পড়ে

না। সর্বত্র সব কিছুই সাদা, আর চলমান। একসময় মনে হয়ে দিকচক্র-রেখা অনেক—অনেক দূরে; পরমুহূর্তেই সে রেখাটি ঘিরে এসে সব দিকেই মাত্র দু' পা দূরে এসে দাঁড়ায়। হঠাৎ একটা উঁচু সাদা দেয়াল যেন ডান দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে স্লেজেব সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে থাকে, আর হঠাৎই অদৃশ্য হয়ে যায়—লাফ দিয়ে উঠে দূরে সরতে সরতে আবারও অদৃশ্য হয়। উপরের দিকে তাকাও; প্রথমে মনে হয় যেন আলো·—মনে হয় কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে তারারা ঝিকমিক করছে; কিন্তু সেই তারারা চোখের সামনে থেকে দূরে, আরও দূরে পালিয়ে যায়; তারপর শুধু বরফ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। আকাশটা সর্বত্রই সমান আলোকিত, সমান সাদা, বর্ণহীন, চিরচঞ্চল। বাতাসও দিক পাল্টায়; একসময় মুখের উপরে পড়ে বরফে চোখ দুটো ঢেকে দেয়, তারপরই লোমের কলারটাকে উড়িয়ে নিয়ে বিরক্তিকরভাবে মাথার উপর ঠেলে দেয়, মুখের উপর আছড়ে ফেলে যেন তামাশা করে, তারপর আবার পিছন থেকে গুন গুন করতে থাকে।

আমাব একটা পা ঠাণ্ডায় জমে যেতে শুরু করল। উপুড় হয়ে যেই পাটাকে আবও ভালভাবে মুড়ি দিতে চেষ্টা করলাম অমনি আমার কলাব ও টুপিব বরফ গলা বেয়ে নিচে নামতেই শরীরে কাঁপুনি ধরে গেল, কিন্তু লোমের জোব্বাটা শরীরের উত্তাপে মোটামুটি গরম থাকায় তখনও বেশ আরামই লাগছিল, আর তাই ধীবে ধীরে চোখে তন্দ্রা নেমে এল।

৬

নানা স্মৃতি ও ধারণা দ্রুতগতিতে আমার কল্পনায় ভেসে যেতে লাগল।

দ্বিতীয স্লেজ থেকে যে পরামর্শদাতাটি অনবরত উপদেশ বর্ষণ করে চলেছে সে কি বকম চাষী হতে পাবে? নিশ্চয় লাল চুল, শক্ত দেহ ও খাটো পা আছে, অনেকটা আমাদের খানসামা ফিয়োদব ফিলিপ্পিচ্-এর মতো। তারপরই দেখতে পেলাম, আমাদের মস্ত বড় বাড়ির সিঁড়িটাকে আর পাঁচটি ভূমিদাসকে, ভাবী পা ফেলে তারা বাড়ি থেকে একটা পিয়ানোকে টেনে বের করছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, কোটের আস্তিনটা গুটিয়ে হাতে একটি মাত্র পা-দান নিয়ে সে দৌড়ে চলেছে,—মানুষের পায়ের ফাঁকে হামাগুড়ি দিয়ে, সকলকে চলতে বাধা দিয়ে এবং উদ্বিগ্ন কণ্ঠে চেঁচাতে চেঁচাতে।

"এই সামনে কে আছ! ঠিক আছে, লেজের দিকটা তোলো, তোলো, তোলো; দরজা দিয়ে ঢোক। ঠিক আছে।"

যথাশক্তিতে পিয়ানোর একটা কোণ ধরে পরিশ্রমে লাল হয়ে বাগানের মালীটা বলে উঠল, "আমাদের উপর ছেড়ে দাও ফিয়োদর ফিলিপ্পিচ্, আমরা নিজেরাই সব ঠিক করে নেব।"

কিন্তু ফিয়োদর ফিলিপ্পিচ্ কিছুতেই ছাড়বে না।

আমি ভাবতে লাগলাম, "এটা কি? সে কি সত্যি মনে করে যে এ কাজে তাকে দরকার আছে, নাকি ঈশ্বর তাকে বক্ বক্ করার শক্তি দিয়েছে বলেই সেটাকে সে কাজে লাগাচ্ছে? আসলে তাই হবে।"

কেন জানি না আমার মনে পড়ছে কুকুরটাকে, পরিশ্রান্ত চাকরগুলোকে, হাঁটু-জলে দাঁড়িয়ে তারা জাল টানছে, আর ফিয়োদর ফিলিপ্পিচ্ একটা জলের পাত্র নিয়ে তীর বরাবর ছুটে চলেছে, সকলকে হাঁক-ডাক করছে, মাঝে মাঝে সোনালী মাছ ধরতে জলের কাছে যাচ্ছে, কাদাগোলা জল ফেলে নতুন জল ভরে নিচ্ছে।

আবার দেখছি, জুলাই মাসের দুপুর। বাগানের সদ্য-কাটা ঘাসের উপর দিয়ে আমি বেড়াচ্ছি; মাথার উপরে জ্বলন্ত সূর্য। আমি তখন যুবক; মনের মধ্যে একটা শূন্যতা, কিসের জন্য একটা ব্যাকুলতা। পুকুরের কাছে বুনো গোলাপের ঝোপ ও বার্চ-বীথির মাঝখানে একটা মনের মতো জায়গায় চলে যাই; ঘুমোবার জন্য সেখানে শুয়ে পড়ি। আমার চারদিকে সব কিছু সুন্দর : সে সৌন্দর্য আমাকে এতদূর অভিভূত করে যে মনে হয় আমি নিজেও সুন্দর; আমার একমাত্র দুঃখ যে আমাকে প্রশংসা করবার কেউ নেই।

বেশ গরম। নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ঘুমোতে চাই। কিন্তু মাছিরা, অসহ্য মাছিরা এখানে আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না; আমার চারদিকে জড় হয়ে কপাল থেকে হাত পর্যন্ত ছুটোছুটি করে বেড়ায়। বেশ কাছেই সব চাইতে গরম জায়গাটায় একটা মৌমাছি গুনগুন করে; হলুদে প্রজাপতিরা ডালে ডালে উড়ে বেড়ায়। উপরে তাকালে চোখ ব্যথা করে, বার্চ গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ে; আমার ভীষণ গরম বোধ হয়। রুমালে মুখটা ঢাকি; দম বন্ধ হয়ে আসে; মাছিগুলো ভেজা হাতের সঙ্গে লেপ্টে যায়। গোলাপ বাগানে চটক পাখিরা কিচির মিচির করে। পুকুর থেকে পাটার উপর ভিজে কাপড় আছড়ে ধোয়ার শব্দ আসে; সে শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে পুকুরের বুকে ভেসে বেড়ায়। স্নানার্থীদের হাসি, গল্প ও জল ছিটানোর শব্দ আসে। দূরে গাছের মাথায় বাতাসের শন্-শন্ শব্দ ওঠে; সে বাতাস আরও কাছে আসে, ঘাসের উপর দিয়ে সর্-সর্ করে বয়ে যায়; বুনো গোলাপের পাতাগুলো কাঁপতে কাঁপতে বৃন্তের উপর আছড়ে পড়ে; বাতাসে আমার রুমালের একটা কোণ উড়ে যায় আর এক ঝলক তাজা বাতাস আমার ভেজা মুখে সুড়সুড়ি দেয়। রুমালের ফাঁক দিয়ে একটা মাছি ঢুকে পড়ে আমার ভেজা মুখের চারদিকে গুনগুন করতে থাকে। শিরদাঁড়ার নিচে একটা শুকনো ডাল ফোটে। না, শুয়ে থেকে লাভ নেই, উঠে গিয়ে স্নান করতে হবে। সহসা দ্রুত পায়ের শব্দ কানে এল; ভয়ার্ত নারী-কণ্ঠ শুনতে পেলাম।

"দয়া করো! আমরা কি করব! এখানে কি কেউ নেই।"

"ওটা কি, ওটা কি?" ছুটে রোদ্দুরে গিয়ে দাঁড়াতেই একটি দাসীকে আর্তনাদ করে ছুটে যেতে দেখে তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম। সে ফিরে তাকিয়ে হাত দুটি মোচড়াল

তাবপর দৌড়ে চলে গেল। তারপরেই এল সত্তর বছরেব মাত্রোনা, মাথার উপর থেকে খসেপড়া রুমালটা চেপে ধরে পশমের মোজা পরা একটা পা টানতে টানতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে পুকুরের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। হাত-ধরাধরি করে দুটো ছোট মেয়েও দৌড়চ্ছে; আর তাদেব একজনের শনেব ঘাঘরার কোণ চেপে ধরে একটি দশ বছরেব বালক তাব বাবার কোট গায়ে চড়িয়ে তাদেব সঙ্গে যাচ্ছে।

"কি হয়েছে?" তাদের জিজ্ঞাসা কবলাম।

"একটা চাষী ডুবে যাচ্ছে।"

"কোথায?"

"আমাদের পুকুরে।"

"কে? আমাদের কেউ?"

"না; অপবিচিত লোক!"

কোচয়ান আইভান মস্ত বড় বুট পায়ে সদ্য-কাটা ঘাসের উপর দিয়ে ছুটে গেল: নায়েব ইয়াকভ হাঁপাতে হাঁপাতে পুকুরেব দিকে দৌড়ে গেল; আমিও তাদের সঙ্গে দৌড়ে গেলাম।

মনে পড়ে, আমার ভিতর থেকে কে যেন বলল, "এস, ঝাঁপ দাও, লোকটাকে টেনে তোলো, তাকে বাঁচাও, সকলে তোমাব প্রশংসা কববে।" আমারও ঠিক সেই ইচ্ছাই হয়েছিল।

পুকুর-পাড়ে যেসব চাকর-বাকব জমা হয়েছিল তাদেব জিজ্ঞাসা কবলাম, "কোথায? সে কোথায়?"

ভেজা কাপড়েব বাঁক কাঁধে নিয়ে ধোবানি বলল, "এই তো ওপারে, যেখানে সব চাইতে বেশি জল, স্নান-ঘরের একেবারে কাছে। আমি দেখলাম সে ডুব দিলো, আবার উঠল, আবার ডুবল, আবার উঠেই চেঁচিয়ে উঠল "আমি ডুবে যাচ্ছি, আমাকে বাঁচাও!" তাবপব আবাব ডুবে গেল, উঠে এল শুধু বুদবুদ। তখন বুঝলাম, লোকটা ডুবে যাচ্ছে। আর অমনি হাঁক দিলাম, "দয়া কবো, একটি চাষী ডুবে যাচ্ছে।"

বাঁকটা কাঁধে নিয়ে ধোবানি পুকুর পার থেকে এঁকে বেঁকে চলে গেল।

নায়েব ইয়াকভ আইভানভ হতাশ সুরে বলল, "কী লজ্জাব কথা! এখন জেলা-আদালতে কী হাঙ্গামায়ই না পড়তে হবে—তার কি আর শেষ থাকবে!"

স্ত্রীলোক, শিশু ও বৃদ্ধদের ভিড় ঠেলে কাস্তে হাতে একটি চাষী সেখানে হাজির হলো; একটা উইলো গাছের ডালে কাস্তেটা ঝুলিয়ে রেখে সে জুতো খুলতে লাগল।

আমার তখন মনের ইচ্ছা, ঝাঁপ দিযে পড়ি, একটা অসাধাবণ কিছু করি; তাই আবার জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায়? কোথায ডুবেছে?"

তারা পুকুরের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো; জোবালো হাওযায় জলের উপরে ছোট ছোট ঢেউ উঠেছে। পুকুরের জল শান্ত, স্থির, দুপুরের রোদে চিক চিক কবছে; তাহলে এর মধ্যে সে ডুবল কেমন করে তাও ভেবে পেলাম না। তাছাড়া, আমি ভাল

সাঁতার জানি না, কাজেই আমি কিছু করে কাউকে ডাক লাগিয়েও দিতে পারব না। ওদিকে চাষীটা শার্ট খুলে ফেলেছে, এখনই ঝাঁপ দেবে। আশা ও নিরাশা নিয়ে সকলেই তাকে দেখছে; কিন্তু গলা জলে যাবার পরে চাষীটি ফিরে এসে আবার শার্ট গায়ে দিলো—সে সাঁতার জানে না।

লোকজন তখনও দৌড়ে আসছে; ভিড় ক্রমেই বাড়ছে; মেয়েরা গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু কেউ সাহায্য করতে যাচ্ছে না। যারা সবে এসেছে তারা নানা রকম পরামর্শ দিচ্ছে, হায়-হায় করছে, তাদের চোখে-মুখে উদ্বেগ ও হতাশা ফুটে উঠেছে। যারা আগেই এসেছিল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে তাদের কেউ ঘাসের উপর বসে পড়ছে, কেউ বা চলে যাচ্ছে। বুড়ি মাত্রোনা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল, রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করেছে কি না; বাবার কোট-পরা ছেলেটি ঠিক নিশানায় পুকুরে পাথর ছুঁড়তে লাগল।

এবার ফিয়োদর ফিলিপ্পিচ্-এর কুকুর ত্রেজর্কা বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঘেউ-ঘেউ করতে করতে পাহাড় বেয়ে নেমে এল; বুনো গোলাপের ঝোপের ওপাশে দেখা গেল ফিয়োদরও কি যেন বলতে পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে।

দৌড়তে দৌড়তে কোটটা খুলে সে হাঁক দিলো, "তোমরা সব চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছ কেন? একটা লোক ডুবে যাচ্ছে, আর কেউ কিছু করছে না!...একটা দড়ি আনো।"

সকলেই আশায় ও আতংকে ফিয়োদর ফিলিপ্পিচ্কে দেখছে। একজন চাকরের গায়ে ভর দিয়ে সে তখন বাঁ পায়ের এক ঠোক্করে ডান পায়ের বুটটা খুলে ফেলল।

কে একজন বলতে লাগল, "ওখানে, ওই যেখানে ভিড় জমেছে; ওখানে, উইলো গাছটার একটু ডাইনে ফিয়োদর ফিলিপ্পিচ্, হ্যাঁ ওখানে।"

"আমি জানি," ভুরু কুঁচকে সে জবাব দিলো। শার্ট ও ক্রুশটা খুলে বাগানের মালীর ছেলের হাতে দিলো। কাটা ঘাসের উপর দিয়ে দ্রুত পায়ে পুকুরের ধারে গেল।

জলের ধার থেকে কিছু ঘাস খেতে খেতে ত্রেজর্কা এতক্ষণ ভিড়ের মধ্যে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ সোল্লাসে চিৎকার করে সেও তার মনিবের সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মিনিটখানেক শুধু বুদবুদ ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। একটু পরে দেখা গেল ফিয়োদর ফিলিপ্পিচ্ সাঁতার কেটে ওপারের দিকে যাচ্ছে; তার দুটি হাত সুন্দরভাবে জল কাটছে, তার পিঠটা তালে তালে উঠছে আর নামছে। এক মুখ জল খেয়ে ত্রেজর্কা তাড়াতাড়ি ফিরে এসে ভিড়ের মধ্যে গাটা ঝেড়ে পুকুরপাড়ে গড়াতে লাগল। ফিয়োদর ফিলিপ্পিচ্ যখন সাঁতরে ওপারে যাচ্ছে তখন দুটি কোচয়ান লাঠির মাথায় একটা জালকে জড়িয়ে উইলো গাছটার দিকে দৌড়তে লাগল। যে কারণেই হোক মাথার উপর একটা হাত তুলে ফিয়োদর ফিলিপ্পিচ্ জলে ডুব দিলো—একবার, দু'বার, তিনবার; প্রতিবারেই তার মুখ থেকে এক গলা জল বের করে, সুন্দর ভঙ্গিতে চুলগুলি পেছনে ঠেলে দেয়, চারদিকের অজস্র প্রশ্নের কোনও জ..বই দেয়

না। অবশেষে তীরে পৌঁছে সে জাল ফেলবার আদেশ দিলো। জাল ফেলা হলো, কিন্তু তাতে কিছু শ্যাওলা আর কয়েকটা বাটা মাছ ছাড়া আর কিছু উঠল না।

দ্বিতীয়বার জাল ফেলবার সময় আমি ঘুরে সেদিকে গেলাম।

ফিয়োদর ফিলিপ্পিচ্-এর হুকুম, ভেজা দড়ির টানে জলের ছল-ছলাৎ শব্দ আর আতংকিত দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। জালটা যতই জলের ধারে আসছে ততই বেশি করে তাতে শ্যাওলা জমছে।

ফিয়োদব ফিলিপ্পিচ্ চেঁচিয়ে বলল, "এবার টান লাগাও, সকলে একসঙ্গে।"

একজন বলল, "নিশ্চয় কিছু আছে; বেশ ভারী লাগছে।"

জাল টেনে তীরে তোলা হলো। কয়েকটা মাছ তার মধ্যে কিলবিল করছে। কর্দমাক্ত জলের ভিতরে দিয়ে একটা সাদা জিনিস চোখে পড়ল। সেই মৃত্যুর মতো স্তব্ধতার মধ্যে একটা চাপা অথচ স্পষ্ট দীর্ঘশ্বাস ভিড়ের ভিতর ছড়িয়ে পড়ল।

কঠিন গলায় ফিলিপ্পিচ্ বলল, "সকলে একসঙ্গে টানো, শুকনো মাটিতে টেনে আনো।" একটা লোহার হুক লাগিয়ে আগাছা ও লতাপাতার কাটা ডালপালার উপর দিয়ে জলে ডোবা মানুষটাকে উইলো গাছটার কাছে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো।

এইখানে রেশমী গাউন-পরা স্নেহময়ী বুড়ি পিসিকে আমি দেখতে পাচ্ছি। এই মৃত্যুর দৃশ্যের সঙ্গে বেশ বেমানান হলেও তার লিলাক-রঙেব গোটানো ছোট ছাতাটাও দেখতে পাচ্ছি। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়বার উপক্রম হয়েছে। তার মুখের হতাশ ভাব দেখে মনে হলো, এক্ষেত্রে আর্নিকা-তে কোনও কাজ হবে না। মনে পড়ছে, সে যখন একান্ত স্বার্থপর ভালবাসায় আমাকে বলেছিল, "চলে এস সোনা, কী ভয়ংকর ব্যাপার! আর তুমি সর্বদাই একলা স্নান করো, সাঁতার কাটো!" তখন আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলাম।

মনে পড়ছে, সূর্য সেদিন কী উজ্জ্বল ও গরম ছিল; আমাদের পায়ের নিচে শুকনো মাটি গুঁড়িয়ে যাচ্ছে; পুকুরের আরশিতে রোদ ঝিলমিল করছে; বড় বাটা মাছটা পুকুরপাড়ে ছটফট করছে; পুকুরের মাঝখানে এক ঝাঁক মাছ খেলা করছে; জলের মাঝখানে যে পাতিহাঁসগুলি নলবনের মধ্যে জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটছে তাদের মাথার উপরে অনেক উঁচুতে একটা বাজপাখি ভেসে বেড়াচ্ছে; সাদা ঝড়ো-মেঘগুলি দিগন্তে জমা হচ্ছে; জালের টানে যে কাদা তীরে উঠে এসেছিল সেটা ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে; নালাটা পার হবার সময় আমি শুনতে পেলাম ধোবার পাটাটার শব্দ পুকুরের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে।

পাটার একটা শব্দ ক্রমে দুটো হলো, তিনটে হলো; সে শব্দ আমাকে বিরক্ত করে, ব্যথিত করে, বিশেষ করে আমি যখন জানি যে পাটাটা একটা ঘণ্টা, আর ফিয়োদর ফিলিপ্পিচ্ সেটা থামাতে পারে না। আর সেই পাটা একটা যন্ত্রণাদায়ক যন্ত্র হয়ে আমার জমে-যাওয়া পাটাকে মুচড়ে দিচ্ছে। আমার ঘুম ভেঙে গেল।

গাড়িটা জোর কদমে অত্যন্ত দ্রুত চলার দরুন এবং ঠিক পাশেই দু'জন কথা বলতে থাকায়ই আমার ঘুম ভেঙে গেল বলে মনে হলো।

আমার কোচয়ানের গলা শোনা গেল, "আমি বলি কি ইগ্‌নাশ্‌ এই...ইগ্‌নাশ্‌! আমার যাত্রী তোমার গাড়িতে নাও; তোমাকে তো যেতেই হবে; আমি কেন আর মিছিমিছি যাই—তাকে নিয়ে যাও!"

আমার ঠিক পাশ থেকে ইগ্‌নাশ্‌-এর গলা জবাব দিলো—

"একজন যাত্রী নিয়ে আমার কি লাভ...এক পাঁইট ভদ্‌কা দেবে কি?"

"রাখো তোমার পাঁইট বোতল। এক ড্রাম চাও তো কথা পাকা!"

আর একজন চেঁচিয়ে বলল, "এক ড্রাম!...কী যে বলো! এক ড্রামের জন্য ঘোড়ার পিঠে বোঝা চাপানো চলে!"

আমি চোখ খুললাম। চোখের সামনে সেই একই দুঃসহ বরফের ঢেউ বয়ে চলেছে, সেই একই কোচয়ান ও ঘোড়া, কিন্তু আমার পাশেই একটা স্লেজ। আমার কোচয়ান ইগ্‌নাশ্‌কে ধবে ফেলেছে; বেশ কিছুক্ষণ হলো আমরা পাশাপাশি চলেছি। অন্য স্লেজ থেকে এক পাঁইটের কম না নেবার পরামর্শ দিলেও ইগ্‌নাশ্‌ সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থামিয়ে দিলো।

"জিনিসপত্র তুলে দাও। কথা পাকা। তোমার কপাল ভাল। কাল ফিরে এলে এক ড্রাম লাগিযে দিও। জিনিসপত্র কি খুব বেশি আছে?"

আমার কোচয়ান ঝট্‌ করে বরফের মধ্যে লাফিয়ে নামল; আমাকে অভিবাদন জানিয়ে ইগ্‌নাশ্‌-এর স্লেজ-এ উঠতে বলল। আমি তো যেতে খুবই রাজী। কিন্তু ঈশ্বর-ভীরু চাষীটি এতই খুশি হলো যে কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমাকে, এলিয়োশ্‌কাকে ও ইগ্‌নাশ্‌কাকে অভিবাদন জানিয়ে সে অনেক ধন্যবাদ দিলো।

"এই তো, ঈশ্বরকেও ধন্যবাদ! ঈশ্বরের দয়া, অর্ধেক রাত গাড়ি চালিয়েও আমরা জানি না কোথায় চলেছি! ও আপনাদেব ঠিক নিয়ে যাবে স্যার; আমার ঘোড়াগুলো একেবারেই ভেঙে পড়েছে।"

নতুন উৎসাহে সে আমার জিনিসগুলি তুলে নিল। আমিও যেন বাতাসের ধাক্কাতেই এগোতে এগোতে দ্বিতীয় স্লেজটার কাছে গেলাম। স্লেজটার সিকি ভাগেবও বেশি বরফে ডুবে গেছে, বিশেষ করে যে দিকটায় বাতাস আটকাবার জন্য কোচয়ান দু'জনের মাথার উপরে একটা জোব্বা ঝুলিয়ে দেওয়া হযেছে; তার ভিতরটা বেশ ঢাকা-দেওয়া ও আরামদায়ক। বুড়ো লোকটি আগের মতোই পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে; গল্প-কথকটি তখনও তার গল্পই বলে চলেছে : কাজেই সেনাপতি যখন রাজার নাম করে কারাগারে মারিয়ার কাছে এল তখন মারিয়া তাকে বলল, "সেনাপতি! আমি তোমাকে চাই না, আমি তোমাকে ভালবাসি না, তুমি আমার প্রেমিক নও; আমার প্রেমিক সেই রাজপুত্র।"...কাজেই তখন আমাকে দেখে সে থেমে গেল; পাইপটা তুলে নিল।

আমি যাকে পরামর্শদাতা নাম দিয়েছি সেই লোকটি বলল, "আপনি কি গল্প শুনতে এলেন স্যার?"

আমি বললাম, "এখানে তোমরা তো বেশ মজায় আছ দেখছি।"

"তা—এতে বেশ সময়টা কাটে; আজেবাজে চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।"

"তোমরা কি সত্যি জানো না আমরা এখন কোথায় আছি?" বুঝতে পারলাম, এ প্রশ্নটা কোচয়ানদের ভাল লাগেনি।

পরামর্শদাতা জবাব দিলো, "কেন, কে বলবে আমরা কোথায় এসেছি? হয় তো কাল্‌মুখ-এই পৌঁছে গিয়েছি।"

"এখন আমরা কি করব?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"কি করব? কেন, এগিয়ে যাব, এবং কোনও না কোনও জায়গায় তো পৌঁছে যাবই," অসন্তুষ্ট গলায় সে বলল।

"কিন্তু ধরো যদি কোথাও পৌঁছতে পারলাম না, অথচ এই বরফের মধ্যে ঘোড়াও আর যেতে চায় না, তখন কি হবে?"

"তখন? কিছুই হবে না।"

"ঠাণ্ডায় আমরা জমে যেতে পারি।"

"তা তো হতেই পারে, কারণ কোথাও কোনও খড়েব গাদাও চোখে পড়ছে না; আমরা হয় তো বা কাল্‌মুখ-এর দিকেই চলেছি। আসল কথা হলো, বরফের মধ্যে চোখ ঠিক রাখতে হবে।"

বৃদ্ধ লোকটি কাঁপা গলায় বলল, "আচ্ছা স্যার, আপনারা সকলেই কি জমে যাবার ভয়ে ভীত নন?"

যদিও আমাকে ঠাট্টা করেই সে কথাটা বলল, তবু তার যে হাড়ে কাঁপুনি ধরেছে সেটা আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম।

বললাম, "সত্যি, খুব ঠাণ্ডা পড়েছে।"

"হ্যাঁ স্যার! আমি যা করছি আপনারও তাই করা উচিত; মাঝে মাঝেই খানিকটা দৌড়ে নেবেন।"

"আচ্ছা কথা বলেছ; ঠিক তুমি যেমন দৌড়েছিলে স্লেজের পিছনে," পরামর্শদাতা বলল।

৭

সামনের স্লেজ থেকে এলিয়োশ্‌কা আমাকে ডাকল, "দয়া করে ভেতরে এস; সব ঠিক হয়েছে।"

ঝড়ো হাওয়া এমন প্রচণ্ডভাবে বইছে যে উপুড় হয়ে দুই হাতে কোটের কোণটা চেপে ধরে আপ্রাণ চেষ্টায় কোনওক্রমে বরফের ভিতর দিয়ে কয়েক পা অগ্রসর হয়ে স্লেজটার কাছে গেলাম। আমার আগেকার কোচয়ান ফাঁকা গাড়ির মধ্যে হাঁটু ভেঙে বসেছিল। আমাকে দেখে বড় টুপিটা মাথা থেকে নামাতেই বাতাসে তার চুলগুলো

ভীষণভাবে উড়তে লাগল। সে আমার কাছে কিছুটা পানীয় চাইলেও আমি যে তাকে কিছু দেব এটা সে আশা করেনি, কারণ আমি অস্বীকার করায় সে মোটেই হতাশ হলো না। তথাপি আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে টুপিটা পরে সে বলল, "আপনার সৌভাগ্য কামনা করি স্যার"; তারপর হাতে লাগাম নিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে চলে গেল। তারপরে ইগ্‌নাশ্‌কাও সমস্ত শরীরটা সামনের দিকে দুলিয়ে ঘোড়াগুলির উদ্দেশে হাঁক দিলো। পুনরায় বাতাসের হা-হা শব্দের পরিবর্তে কানে বাজতে লাগল ঘোড়ার ক্ষুরের খট্-খট্ শব্দ, চিৎকার ও ঘণ্টার শব্দ, কারণ যতক্ষণ আমরা থেমেছিলাম ততক্ষণ ঝড়ের শব্দটাই বেশি করে কানে বাজছিল।

গাড়ি চলবার পর সিকি ঘণ্টা আমি ঘুমতে গেলাম না; আমার নতুন কোচয়ান ও ঘোড়াগুলিকে দেখতেই মজা লাগছিল। ইগ্‌নাশ্‌কা বসে বসেই অনবরত লাফাচ্ছে, হাতের চাবুকটাকে ঘোড়াগুলোর উপর ঘোবাচ্ছে. একটা পা দিয়ে অপর পাটা ঠুকছে! লোকটা লম্বা না হলেও বেশ মজবুত গড়নের। কোটের উপরে একটা জোব্বা পরেছে, কিন্তু সেটাকে কোমরের কাছে বাঁধেনি; কলারটা খোলা থাকায় গলাটা পুরো খোলা; বুট জোড়া চামড়ার, আর টুপিটা খুবই ছোট; টুপিটাকে সে বার বার খুলছে আর পরছে। চুল ছাড়া কান দুটো ঢাকবার আর কিছু ছিল না।

তার সব কাজের মধ্যে শুধু শক্তি নয়, শক্তিটাকে বাড়িয়ে তুলবার একটা চেষ্টা আমার চোখে পড়ল। সে যত এগোচ্ছে ততই মাঝে মাঝে বক্সের উপর ওঠ-বস করছে, জায়গা বদলে নিচ্ছে। একটা পা দিয়ে অন্য পাটাকে আঘাত করছে, আমাকে ও এলিযোশ্‌কাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছে। মনে হলো তারও ভয় হয়েছে পাছে ভরসা হারিয়ে ফেলে। তার যথেষ্ট কারণও ছিল; আমাদের ঘোড়াগুলো বেশ ভাল হলেও প্রতি পদক্ষেপেই রাস্তা খারাপ থেকে আরও খারাপ হচ্ছে, আর ঘোড়াগুলোও যে একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও চলেছে সে বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই; মাঝে মাঝেই তাকে চাবুক চালাতে হচ্ছে। চোখের সামনে বরফের ঝড় ক্রমেই প্রচণ্ডতর হচ্ছে, ঘোড়াগুলো ক্রমেই কাহিল হয়ে পড়ছে, রাস্তার অবস্থাও ক্রমেই খারাপ হচ্ছে, অথচ আমরা কোথায় আছি, আড্ডায় পৌঁছতে পারব কি না, বা কোনওরকম আশ্রয় মিলবে কি না তার কিছুই জানি না—এ বড় সাংঘাতিক অবস্থা। শুনতে যেমন হাস্যকর তেমনি অদ্ভুত লাগছে যে ঘণ্টাগুলি এমন নির্লিপ্ত আনন্দে বাজছে, ইগ্‌নাশ্‌কা এমনভাবে কথাবার্তা বলছে যেন কোনও রৌদ্রস্নাত বরফ-ঝরা বড়দিনের দুপুরে গ্রামের রাস্তা ধরে আমরা ছুটি কাটাতে চলেছি; আরও বেশি অদ্ভুত লাগছে এই ভেবে যে, সারাক্ষণই যেখানে আমরা রয়েছি তার থেকে দূরে কোথাও যাবার জন্যই যেন আমরা দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছি। এমন বিকৃত সুরে উচ্চকণ্ঠে ইগ্‌নাশ্‌কা একটা গান গেয়ে উঠল, আর গানের মাঝে মাঝে শিস্ দিতে লাগল যে সেটা কানে এলে আপনিতেই ভয় ধরে।

"হেই, হেই, ইগ্‌নাশ্‌কা, কেন গলাটাকে ভাঙছ? অন্তত ঘণ্টাখানেকের জন্য তোমার রাগিণী থামাও।"

"কি?"

"চুপ করো।"

ইগ্‌নাশ্ থামল। আবার সব চুপচাপ। শুধু বাতাসের গর্জন ও শোঁ-শোঁ শব্দ; পড়ন্ত বরফ স্লেজের উপর ভারী হয়ে জমতে লাগল। পরামর্শদাতা আমাদের কাছে এগিয়ে এল।

"আচ্ছা, এ সব কি হচ্ছে?"

"তা বটে; কোন্ দিকে যাচ্ছি?"

"কে জানে?"

"সে কি, তোমার পা দুটো কি জমে গেছে যে অনবরত ঠুকছ?"

"একেবারেই অসার হয়ে গেছে।"

"তাহলে একটু দৌড়ে এস। দেখে এস তো ওটা কি; কাল্‌মুখ-এর ছাউনি নয় তো? যাই হোক, তোমার পা দুটো তো গরম হবে।"

"ঠিক আছে। লাগামটা ধরো...এই যে।"

ইগ্‌নাশ্ সেই দিকেই দৌড় দিলো।

পরামর্শদাতা আমার দিকে চেয়ে বলল, "চারদিকে চোখ রেখে হাঁটলে কিছু না কিছু চোখে পড়বেই; বোকার মতো গাড়ি ছুটিয়ে লাভ কি? দেখুন, ঘোড়াগুলোর গা থেকে কেমন ভাপ বেরুচ্ছে!"

ইগ্‌নাশ্ নেমে যাবার পর অনেকক্ষণ কেটে গেল; সময়টা এত বেশি যে আমার ভয় হতে লাগল সে বুঝি হারিয়েই গেল। এদিকে সারাক্ষণ পরামর্শদাতাটি শান্ত, আত্মবিশ্বাসে ভরা সুরে আমাকে বোঝাতে লাগল, তুষার-ঝড়ে পড়লে কি করা উচিত; সব চাইতে ভাল কাজ হলো ঘোড়াকে খুলে দিয়ে তার ইচ্ছামতো যেতে দেওয়া; ঈশ্বর করুণাময়, কাজেই ঘোড়া ঠিক পথেই চলবে; অথবা কেউ নক্ষত্র দেখে পথ চিনতে পারে, আর সে যদি এই স্লেজের কোচয়ান হতো তাহলে আমরা অনেক আগেই আড্ডায় পৌঁছে যেতাম।

হাঁটু পর্যন্ত গভীর বরফের ভিতর দিয়ে অনেক কষ্টে পা ফেলে ইগ্‌নাশ্ ফিরে এল। পরামর্শদাতা জিজ্ঞাসা করল, "কি দেখলে?"

হাঁপাতে হাঁপাতে ইগ্‌নাশ্ জবাব দিলো, "হ্যাঁ, একটা ছাউনিই বটে, কিন্তু কিসের ছাউনি তা জানি না। নির্ঘাৎ আমরা প্রল্‌গ্‌ভস্কি বস্‌তির দিকে চলে এসেছি স্যাঙাৎ। আরও বাঁয়ে যেতে হবে।"

"বাজে কথা!...গ্রামের পিছনে ওটা আমাদের ছাউনি!" পরামর্শদাতা পাল্টা জবাব দিলো।

"কিন্তু আমি বলছি তা নয়!"

"আরে, আমি দেখে তবে বলছি; আমি চিনি। ওটা তাই হবে, আর যদি নাও হয় তাহলে ওটা তামিশেভ্‌স্কো। আমাদের আরও ডাইনে যেতে হবে, তাহলেই সোজা আট ভার্স্ট পরের সেই বড় সেতুটা পেয়ে যাব।"

"আমি বলছি তা নয়! আরে, আমি যে নিজে দেখে এলাম।" ইগ্‌নাশ্‌ বিরক্ত হয়ে বলল।

"আরে স্যাঙাৎ, এই জ্ঞান নিয়ে তুমি কোচয়ান বলে পরিচয় দাও?"

"হ্যাঁ, দেই।...নিজে গিয়ে দেখে এসো।"

"কিসের জন্য যাব? আমি এমনিতেই জানি।"

ইগ্‌নাশের মেজাজ বিগড়ে গেল; কোনও কথা না বলে বক্সের উপর লাফিয়ে উঠে সে গাড়ি ছেড়ে দিলো।

বারে বারে পায়ে-পায়ে ঠোকাঠুকি করতে করতে এবং বুটের ডগার উপরে জমা বরফ ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে সে এলিয়োশ্‌কাকে বলল, "আমার পা দুটো অসার হয়ে গেছে; কিছুতেই গরম হচ্ছে না।"

আমার ভীষণ ঘুম পেতে লাগল।

৮

"আমি কি সত্যি সত্যি জমে যেতে শুরু করলাম!" ঘুম-ঘুম ভাবের মধ্যেই কথাটা আমার মনে হলো। "লোকে বলে, জমে যাবার আগে ঘুম-ঘুম ভাব হয়। জমে যাওয়ার চাইতে ডুবে যাওয়া ভাল—তারা আমাকে টেনে নিয়ে জলের মধ্যে ফেলে দিক। ডুবে যাওযাই হোক, আর জমে যাওয়াই হোক, তাতে আমার কিছু আসে-যায় না; শুধু ঐ কাঠি না কি ওটা যদি আমার পিঠে না লাগত তাহলেই আমি সব কিছু ভুলে থাকতে পারতাম।"

এক সেকেন্ডের জন্য আমি চৈতন্য হারালাম।

এক মিনিটের জন্য চোখ খুলে চারদিকের সাদা বরফের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, "এ সব কিছুর শেষ কোথায়? ইতিমধ্যে যদি কোনও খড়ের গাদা দেখতে না পাই, আর ঘোড়াগুলো যদি থেমে যায়, আমার তো মনে হয় শীঘ্রই সেরকমটা ঘটবে, তাহলে এ যাত্রার শেষ কি ভাবে হবে? আমরা সকলেই জমে যাব।" আমি কিছুটা ভয় পেয়ে থাকলেও একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, একটা অসাধারণ এবং শোচনীয় কিছু ঘটুক এই ইচ্ছাটাই আমার মনে সামান্য ভয়ের চাইতে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। আমার মনে হলো, সকাল নাগাদ আধা জমাট-বাঁধা অবস্থায় বা কেউ কেউ পুরো জমাট-বাঁধা অবস্থায় আমাদের নিয়ে ঘোড়াগুলি যদি কোনও বহুদূরবর্তী অজ্ঞাত গ্রামে পৌঁছয় তাহলে ব্যাপারটা মন্দ হয় না। অসাধারণ দ্রুততায় ও স্পষ্টভাবে এই ধরনের স্বপ্ন আমার কল্পনায় ভেসে বেড়াতে লাগল। ঘোড়াগুলোর কান আর জোয়াল ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না; হঠাৎ তিনটে ঘোড়া নিয়ে ইগ্‌নাশ্‌কা সেই বরফের উপর দেখা দিয়েই আমাদের পাশ দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল। আমরা কত অনুনয়-বিনয় করলাম, আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য কাতর প্রার্থনা জানালাম; কিন্তু বাতাসে আমাদের কণ্ঠস্বর উড়ে গেল, কিছুই

শোনা গেল না। ইগ্‌নাশ্‌কা হাসল, ঘোড়াগুলোকে ডাকল, শিস দিলো, তারপর বরফে ঢাকা গভীর গর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। বুড়ো লোকটি ঘোড়ার পিঠে বসে আছে, তার কনুই দুটো ওঠা-নামা করছে, সে জোর কদমে ছুটতে চাইছে, কিন্তু নড়তে পারছে না। আমার আগেকার কোচয়ান মাথায় বড় টুপিটা পরে তার দিকে ছুটে গেল, তাকে টেনে নামাল, তারপর তাকে পা দিয়ে বরফের উপর চেপে ধরল। সে চিৎকার করে বলল, "তুই পিশাচ, একটা দুর্মুখ, আমরা সবাই একসঙ্গে মরব।" কিন্তু বুড়ো লোকটি বরফের ভিতর থেকে মাথাটা বের করল; এখন সে আর তত বুড়ো নেই; খরগোসের মতো লাফ দিয়ে সে আমাদের কাছ থেকে চলে গেল। কুকুরগুলো তার পিছনে দৌড়চ্ছে। পরামর্শদাতা এখন ফিয়োদর ফিলিপ্পিচ্ হয়ে গেছে, সে বলল, আমাদের সকলকে গোল হয়ে বসতে হবে; বরফ যদি আমাদের কবরও দেয় তাতে কিছু আসে-যায় না; আমরা গরম তো হতে পারব। সত্যি সত্যি আমরা গরম হলাম, আরাম পেলাম, শুধু তেষ্টা পেয়েছে। আমি এক বাক্স মদ পেয়ে গেলাম; সকলকে চিনি মেশানো "রাম" খেতে দিলাম, নিজেও মজা করে খেলাম। গল্প-কথক আমাদের একটা রামধনুর গল্প বলল—আমাদের মাথার উপরকার ছাদটা বরফ ও রামধনু দিয়ে গড়া। আমি বললাম, "এবার চলো সকলেই বরফের মধ্যে একটা করে ঘর বানিয়ে ঘুমোতে যাই!" বরফটা লোমের মতোই নরম ও গরম; নিজের জন্য একটা ঘর বানিয়ে তার ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু ফিয়োদর ফিলিপ্পিচ্ মদের বাক্সের মধ্যে আমার টাকা দেখতে পেয়ে বলল, "থামো, টাকাটা আমাকে দাও— তোমাকে তো মরতেই হবে!" সে আমার পা টেনে ধরল। আমি টাকাটা নিয়ে আমাকে ছেড়ে দিতে বললাম; কিন্তু এই যে আমার সব টাকা সেকথা বিশ্বাস না করে তারা আমাকে মেরে ফেলতে চাইল। বুড়ো লোকটির হাত চেপে ধরে অবর্ণনীয় আনন্দে আমি তাকে চুমো খেতে লাগলাম; বুড়োর হাতটা কী নরম আর মিষ্টি। প্রথমে সে হাতটা ছিনিয়ে নিলো, কিন্তু তারপর আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো; শুধু তাই নয়, অপর হাতটি দিয়ে আমাকে আদর করতে লাগল। কিন্তু ফিয়োদর ফিলিপ্পিচ্ এগিয়ে এসে আমাকে ভয় দেখাতে লাগল। আমার ঘরে ছুটে গেলাম। সেটা এখন আর ঘর নেই, একটা লম্বা, সাদা করিডর। কে যেন আমার পা জড়িয়ে ধরেছে। আমি নিজেকে ছিনিয়ে নিলাম, কিন্তু আমার বুট, মোজা ও চামড়ার কিছু অংশ লোকটির হাতের মধ্যেই রয়ে গেল। আমার বেশ শীত করছে; লজ্জাও হচ্ছে,—কারণ আমার পিসি তার ছোট ছাতা আর হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্স নিয়ে সেই জলেডোবা লোকটার হাত ধরে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে। তারা হাসছে; আমি যে ইশারা করছি তা বুঝতেও পারছে না। লাফ দিয়ে একটা স্লেজে উঠে পড়লাম; আমার পা দুটো বরফের উপর ঘস্‌টাতে লাগল; কিন্তু বুড়ো লোকটি আমার পিছু নিল, তার কনুই দুটো উঠছে আর নামছে। বুড়ো লোকটি খুব কাছে এসে পড়েছে, কিন্তু আমি শুনতে পেলাম আমার সামনে দুটো ঘণ্টা বাজছে; আমি জানি ওখানে পৌঁছতে পারলেই আমি নিরাপদ। ঘণ্টা দুটো

আরও স্পষ্টভাবে বাজছে: কিন্তু বুড়ো লোকটি আমাকে ধরে ফেলেছে, আমার মুখের উপর চেপে বসেছে, কাজেই ঘণ্টার শব্দ আমি আর শুনতে পাচ্ছি না। আবার তার হাতটা চেপে ধরে চুমো খেতে লাগলাম; কিন্তু এ তো বুড়ো নয়, এ যে সেই ডুবে-যাওয়া লোকটা; সে চেঁচিয়ে বলছে, 'ইগ্‌নাশ্‌কা, থাম, আমার মনে হচ্ছে ঐ তো আহ্‌মেত্‌কিনর-এর খড়ের গাদা। ছুটে যাও, ভাল করে দেখো!'' কী সাংঘাতিক! না, এর চাইতে জেগে ওঠাই ভাল।

চোখ খুললাম। এলিয়োশ্‌কার কোটের কোণটা বাতাসে-উড়ে এসে আমার মুখের উপর পড়েছে; আমার হাঁটুটা খোলা: বরফের মাঠের ভিতর দিয়ে আমাদের গাড়ি চলেছে; ঘণ্টাগুলোর ঠুন্‌ঠুন্ শব্দ বাতাসে আরও স্পষ্ট হয়ে ভেসে আসছে।

খড়ের গাদাটা খুঁজতে লাগলাম; তার বদলে দেখতে পেলাম একটা বাড়ি; তার বারান্দা আর দুর্গের মতো বুরুজাকৃতি দেয়াল। এই দুর্গের মতো বাড়িটা দেখার কোনও আগ্রহ আমার নেই। আমি দেখতে চাই সেই সাদা করিডরটা যেটা ধরে আমি দৌড়ে যাচ্ছি, শুনতে চাই গীর্জার ঘণ্টা-ধ্বনি, আর চাই সেই বুড়ো লোকটার হাতে চুমো খেতে। আবার চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়লাম।

৯

গভীর ঘুম ঘুমোলাম; কিন্তু ঘণ্টার ধ্বনিটা সারাক্ষণ শুনতে পেলাম; সে ধ্বনি আমার স্বপ্নের মধ্যে ভেসে বেড়াতে লাগল; কখনও সেটা একটা কুকুর হয়ে ঘেউ-ঘেউ করতে করতে আমাকে তাড়া করল; কখনও একটা অর্গান হয়ে গেল, আর আমি হলাম তার নল; তারপর সে হয়ে গেল আমার রচিত ফরাসি কবিতা। তারপর মনে হলো ঘণ্টার ধ্বনিটা এমন একটি যন্ত্রণার যন্ত্র যা দিয়ে আমার ডান গোড়ালিটাকে অনবরত মুচড়ে দেওয়া হচ্ছে। স্বপ্নটা এতই স্পষ্ট যে আমি জেগে উঠে পাটা টিপতে টিপতে চোখ মেলে তাকালাম। পাটা বরফে অসার হতে শুরু করেছে। তখনও রাতটা সেই একই রকম আলোকিত, অস্পষ্ট, সাদা। স্লেজসহ আমিও সেই একইভাবে দুলছি; পায়ে পা ঠুকতে ঠুকতে ইগ্‌নাশ্‌কা সেই একই ভাবে কাৎ হয়ে বসে আছে। বরফের ঝড় বইছে; এক দিককার চাকাগুলো ঢেকে গেছে; ঘোড়ার পা হাঁটু পর্যন্ত বরফের মধ্যে বসে যাচ্ছে; আমাদের কলারে ও টুপিতেও বরফ জমেছে। বাতাস প্রথমে ডাইনে, তারপর বাঁয়ে বইতে লাগল; আমার কলার, ইগ্‌নাশ্‌কার কোটের কোণও ঘোড়ার লোমের উপর খেলা করতে লাগল; জোয়াল ও শকট-দণ্ডের ভিতর দিয়ে শন্-শন্ শব্দ করতে লাগল।

বাইরে ভয়ানক ঠাণ্ডা; লোমের কলারের ভিতর দিয়ে একটুখানি উঁকি দিতেই শুকনো, জমাট, ছুটন্ত বরফ আমার ভুরু, নাক ও মুখের উপর জমে উঠল, ঘাড় বেয়ে নিচে নেমে গেল। চারদিকে তাকালাম—সব সাদা, আবছা, বরফে ঢাকা। খুব ভয় পেয়ে গেলাম। স্লেজের একেবারে নিচে আমার পায়ের কাছে এলিয়োশ্‌কা ঘুমিয়ে

আছে; তার সারা পিঠ বরফে ঢেকে গেছে। ইগ্‌নাশ্‌কা কিন্তু দমে যায়নি; সে অনবরত লাগাম টানছে, হাঁক দিচ্ছে, দুটো পায়ে ঠোকাঠুকি করছে। ঘণ্টাগুলো আগের মতোই অদ্ভুত সুরে বেজে চলেছে। ঘোড়াগুলি হাঁপাচ্ছে, তবু ছুটছে; আগের থেকে কিছুটা ধীর গতিতে; মাঝে মাঝেই হোঁচট খাচ্ছে। ইগ্‌নাশ্‌কা আবার ওঠ-বস করছে, দস্তানা ঘষছে, কর্কশ, বেসুরো গলায় গান গাইছে। গান শেষ না করেই গাড়ি থামিয়ে লাগামটা স্লেজের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে সে নেমে গেল। বাতাস ভীষণভাবে গর্জন করছে; আমার লোমের জোব্বার উপর বরফ যেন বেলচাভর্তি হয়ে ঝরে পড়ছে। তৃতীয় স্লেজটা নেই (পিছনে কোথাও পড়ে আছে)। বরফাচ্ছন্ন কুয়াশার মধ্যে আমি দেখতে পেলাম, বুড়ো লোকটি দ্বিতীয় স্লেজের পাশ দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। ইগ্‌নাশ্‌কা স্লেজ থেকে তিন পা এগিয়ে বরফের উপর বসে পড়ল; বেল্টটা খুলে বুটজোড়া খুলতে শুরু করল।

"তুমি কি করছ?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

নিজের কাজ করতে করতেই সে জবাব দিলো, "বুটজোড়া খুলে ফেলতেই হবে; নইলে ঠাণ্ডায় পা দুটো অসার হয়ে যাবে।"

এত ঠাণ্ডা যে কলারের ভেতর থেকে গলা বের করে সে যে কি করছে সেটা দেখাও সম্ভব নয়। আমি সোজা হয়ে বসলাম। সামনের ঘোড়াটার দিকে চেয়ে দেখি, পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে সে একটা পা বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর বরফ-ঢাকা লেজটা নড়ছে। ইগ্‌নাশ্‌কা লাফ দিয়ে গাড়িতে ওঠায় সেই ধাক্কায় আমার ঘুম ভেঙে গেল।

জিজ্ঞাসা করলাম, "আরে, আমরা এখন কোথায়? সকাল পর্যন্তই চলব নাকি?"

সে জবাব দিলো, "আপনি ভাববেন না, আপনাকে ঠিক নিয়ে যাব। বুটজোড়া খুলে পা দুটো এখন বেশ গরম হয়েছে।"

গাড়ি ছেড়ে দিলো; ঘণ্টা বাজতে শুরু করল, এপাশ-ওপাশ দুলছে; চাকার ভিতর দিয়ে বাতাস শোঁ-শোঁ শব্দ তুলেছে। আবার আমরা সেই সীমাহীন বরফের সমুদ্রের ভিতর দিয়ে ভেসে চললাম।

১০

বেশ ভাল ঘুম হলো। এলিয়োশ্‌কা যখন ঠেলা দিয়ে আমাকে জাগিয়ে দিলো তখন চোখ মেলে দেখলাম, সকাল হয়ে গেছে। ঠাণ্ডাটা যেন রাতের চাইতেও বেশি। উপর থেকে বরফ পড়ছে না; কিন্তু তীক্ষ্ণ, শুকনো বাতাসে তখনও বরফ উড়ছে, বিশেষ করে চাকার নিচে ও ঘোড়ার ক্ষুরে। ডান দিকে পুবের আকাশে ভারী নীল রং, উজ্জ্বল কমলা রঙের তির্যক সূর্য-কিরণ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মাথার উপরে চলমান ঈষৎ লালের ছোপ লাগা সাদা মেঘের ওপারে ফ্যাকাসে নীল আকাশটা দেখা যাচ্ছে। বাঁ দিকে উজ্জ্বল মেঘগুলি দ্রুততর গতিতে ভেসে চলেছে। চারদিকে যতদূর চোখ

যায় সারা দেশ সাদা বরফে ঢেকে আছে; বরফের চাঁইগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে ওখানে ধূসব পাহাড়ের গায়ে শুকনো বরফ উড়ে উড়ে পড়ছে। কোনও স্লেজ বা মানুষ বা পশুব চিহ্নমাত্র চোখে পড়ছে না। সাদা পশ্চাৎ-পটের উপব শুধু দেখা যাচ্ছে কোচয়ানের পিঠ আর ঘোড়া।...ইগ্‌নাশ্‌কার গাঢ় নীল টুপির কোণ, তার কলার, তার চুল, এমনকি বুটজোড়া পর্যন্ত সাদা। স্লেজটা সম্পূর্ণ চাপা পড়েছে, শুধু একটা নতুন জিনিস আমার চোখে পড়ল—একটা ভার্স্ট-খুঁটি। তার উপর থেকে বরফ গড়িয়ে পড়ছে। অবাক হয়ে দেখলাম, একই ঘোড়া নিয়ে আমরা সারা রাত ছুটেছি. কোথায় যাচ্ছি না জেনেও বারো ঘণ্টাব মধ্যে কোথাও থামিনি, অথচ যে করেই হোক, আমরা পৌঁছে গেছি। ঘণ্টাগুলি খোশ মেজাজে বাজছে। নিজেকে ভাল করে ঢেকেঢুকে ইগ্‌নাশ্‌ হাঁক পাড়ছে; আমাদের পিছনের যে স্লেজে বুড়ো লোকটি ও পরামর্শদাতা রয়েছে তাব ঘোড়ার হ্রেষা ও ঘণ্টার শব্দ আমরা শুনতে পাচ্ছি; কিন্তু যে লোকটি ঘুমিয়েছিল সে এই তৃণভূমিতে পথ হারিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে। আরও আধা-ভার্স্ট চলবার পরে একটা স্লেজ ও তিনটে ঘোড়ার চলাব দাগ চোখে পড়ল; দাগগুলি তখনও ববফে ঢাকা পড়েনি; এখানে-ওখানে কিছু রক্তের দাগও দেখলাম. সম্ভবত কোনও আহত ঘোড়ার রক্ত হবে।

"নিশ্চয় ফিলিপ। আরে, সে দেখছি আমাদের আগেই এসেছে।" ইগ্‌নাশ্‌কা বলল। এতক্ষণে রাস্তার পাশে ববফের মাঝখানে সাইনবোর্ড-ঝোলানো একটা ছোট বাড়ি চোখে পড়ল। বাড়িটার ছাদ ও জানালা পর্যন্ত বরফে ঢেকে গেছে। ছোট সরাইখানাটার পাশেই তিনটে ধূসর ঘোড়াসহ একটা স্লেজ দাঁড়িয়ে আছে। দরজার কাছ থেকে ববফ সবিয়ে ফেলা হচ্ছে; পাশেই একটা কোদাল পড়ে আছে, কিন্তু বাতাসের গর্জন তখনও চলেছে. ছাদ থেকে বরফ ঝরে পড়ছে।

আমাদের ঘণ্টা শুনে একটি লালমুখ. লাল চুল কোচয়ান দবজা দিয়ে বেরিয়ে এল; তার হাতে এক গ্লাস ভদ্‌কা; আমাদের ডেকে কি যেন বলছে। ইগ্‌নাশ্‌কা আমার দিকে ফিরে এখানে গাড়ি থামাবার অনুমতি চাইল; তখনই এই প্রথম আমি তার মুখটা দেখতে পেলাম।

১১

তার চুল ও আকৃতি দেখে আমি ভেবেছিলাম তার মুখটা ধোঁয়াটে, সরু আর খাড়া নাক হবে: কিন্তু আসলে তা নয়। মুখটা গোল, হাসিখুশি, নাকটা থ্যাবড়া, মুখটা বড়. চোখ দুটো গোল, উজ্জ্বল ও হাল্কা নীল। মুখ ও ঘাড়ের রং লাল, দেখলে মনে হয় কেউ কাপড় দিয়ে ঘষেছে; তার ভুরু, চোখের পাতার লোম. মুখের নিম্নাংশের দাড়ি সবকিছু বরফে ঢাকা—একেবারে সাদা; জায়গাটা আড্ডা থেকে আধা ভার্স্ট দূরে; আমরা সেখানেই থামলাম।

বললাম, "একটু তাড়াতাড়ি করো হে।"

"এক মিনিট," লাফ দিয়ে বক্স থেকে নামতে নামতে কথাটা বলে ইগ্‌নাশ্‌কা ফিলিপের কাছে এগিয়ে গেল।

ডান হাতের দস্তানাটা খুলে চাবুকসুদ্ধু বরফের উপর ছুঁড়ে দিয়ে সে বলল, "এখানেই দাও স্যাঙাৎ"; তারপরই মাথাটা চিৎ করে ভদ্‌কার গ্লাসটা একবারেই গলায় ঢেলে দিলো।

সরাইওলা সম্ভবত একজন বুড়ো কসাক; একটা পাঁইট বোতল হাতে নিয়ে সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল।

বলল, "এটা কাকে দেব?"

ঢ্যাঙা, সরু, মাথায় শনের মতো চুল ও মুখে ছাগুলে দাড়ি চাষী ভাসিলি এবং শক্ত গড়ন, হাল্কা ভুরু, ঘন দাড়িভর্তি লালমুখ পরামর্শদাতা এগিয়ে গেল ও এক গ্লাস করে খেল। বুড়ো লোকটিও এগিয়ে গেল, কিন্তু তাকে কেউ কিছু দিলো না; তাই সে ঘোড়াগুলোর কাছে গিয়ে একটার পিঠ চাপড়াতে লাগল।

ঠিক যেমনটি ভেবেছিলাম বুড়ো লোকটি দেখতে ঠিক সেইরকম—সরু ছোট মানুষটি, কোঁচকানো নীল্‌চে মুখ, পাতলা দাড়ি, খাড়া নাক ও ক্ষয়ে যাওয়া হল্‌দে দাঁত। মাথায় কোচয়ানদের টুপিটা আন্‌কোরা নতুন, কিন্তু গ্রেটকোটটা নোংরা, আল্‌কাতরার দাগ লাগা, কাঁধের কাছে ও নিচের দিকে ছেঁড়া। তাতে তার হাঁটু ও মোটা শনপাটের তলবাস ঢাকা পড়েনি। তার শরীরটা কুঁচকে বেঁকে গেছে, মুখটা নড়ছে, আর হাঁটু দুটো কাঁপছে। শরীরটা গরম করবার জন্য সে স্লেজের কাছে ঘুরতে লাগল।

পরামর্শদাতা তাঁকে বলল, "আরে মিত্রিচ, এক ফোঁটা খাও; শরীরটা গরম হবে।"

মিত্রিচ কাঁধটা ঝাঁকুনি দিলো। ঘোড়ার পিঠে ভর দিয়ে শরীরটাকে টান করে সে জোয়ালটা ঠিক করে আমার কাছে এল।

সাদা মাথার উপর থেকে টুপিটা নামিয়ে নিচু হয়ে অভিবাদন করে সে বলল, "দেখুন স্যার, আপনার সঙ্গে আমরাও সারারাত পথে কাটিয়েছি, পথ খুঁজেছি; আপনি তো আমাকে এক গ্লাস খাওয়াতে পারেন। নিশ্চয় পারেন ইয়োর এক্সেলেন্সি। নইলে আমার গরম হবার কোনও উপায় নেই," হতাশার হাসি হেসে সে কথাগুলি যোগ করল।

আমি তাকে পঁচিশ কোপেক দিলাম। সরাইওলা একটা গ্লাস এনে বুড়ো লোকটির হাতে দিলো। লোকটি চাবুকসহ দস্তানাটা খুলে তার ঠাণ্ডা নীল হয়ে যাওয়া হাড় বের করা কালো হাতে গ্লাসটা নিল; কিন্তু বুড়ো আঙুলটা বশে না থাকায় গ্লাসটা ধরতে পারল না; গ্লাসটা পড়ে গেল; ভদ্‌কাটা বরফের উপর ছড়িয়ে পড়ল।

কোচয়ানরা হেসে উঠল।

"মিত্রিচ এতই জমে গেছে যে ভদ্‌কার গ্লাসটাও ধরতে পারল না।"

পানীয়টা ফেলে দিয়ে মিত্রিচ খুবই মর্মাহত হলো।

যা হোক, তারাই আর এক গ্লাস ঢেলে তার ঠোঁটের কাছে ধরল। এতে সে ভারি খুশি হয়ে গেল। দৌড়ে সরাইখানায় ঢুকল, পাইপটা ধরাল, হলদে দাঁত বের করে হাসতে লাগল, আর প্রতিটি কথার সঙ্গে ঈশ্বরের নামে শপথ করতে লাগল। শেষ গ্লাস শেষ করে কোচয়ানরা স্লেজে উঠল, গাড়ি ছেড়ে দিলো।

বরফ ক্রমেই এত সাদা ও উজ্জ্বল হতে লাগল যে সেদিকে চেয়ে থাকলে চোখ ব্যথা করে। মাথার উপরে আকাশে কমলা-লাল রেখাগুলো ক্রমেই উজ্জ্বলতর হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। গাঢ় নীল মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যের লাল গোলকটি দিগন্তে উদয় হলো। নীল রংটা আরও গাঢ়, আরও উজ্জ্বল হতে লাগল। আড্ডার কাছাকাছি একটা হলদেটে পথের রেখা দেখা দিলো; তাতে চাকার গভীর দাগ পড়েছে। জমাট বাতাসে একটা অদ্ভুত তাজা, হাল্কা ভাব।

আমার স্লেজটা দ্রুত ছুটতে লাগল। প্রধান ঘোড়াটার মাথার লোম জোয়ালের উপর উড়ে উড়ে পড়ছে। অন্য ঘোড়াগুলোও জোর কদমে ছুটছে। পেট ও পাছার নিচে তাদের ঝোপ্পাগুলো তালে তালে নাচছে। কখনও কখনও একটা ঘোড়া হয় তো পা ছড়িয়ে পা পিছলে বরফের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, আর তখনি উঠে দাঁড়াচ্ছে; তার চোখে মুখে বরফের গুড়ো ছড়িয়ে পড়ছে। ইগ্নাশকা খোশ মেজাজে হাঁক দিচ্ছে; চাকার তলায় শুকনো বরফ গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে, পিছন থেকে দুটো ঘণ্টার উৎসবের সুর ভেসে আসছে; কোচয়ানদের মাতলামির হল্লাও শুনতে পাচ্ছি। চারদিকে তাকালাম। ঘোড়াগুলি তালে তালে শ্বাস নিতে নিতে ঘাড় ও মুখ বেঁকিয়ে বরফের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে। ফিলিপ চাবুক কষতে কষতে টুপিটা সোজা করে নিল। আগের মতোই পা দুটো তুলে দিয়ে বুড়ো লোকটি স্লেজের মাঝখানে শুয়ে আছে।

দু মিনিট পরে স্লেজটা আড্ডায় ঢুকবার মুখে কাঠের ভেজা পাটাতনের উপর সশব্দে থেমে গেল। শিশির ও বরফে সম্পূর্ণ ঢাকা হাসি-হাসি মুখ তুলে ইগ্নাশকা আমার দিকে তাকাল। "শেষ পর্যন্ত আপনাকে নিরাপদে পৌঁছে দিলাম স্যার," সে বলল।

১৮৫৬

তিনটি মৃত্যু

Three Deaths

১

হেমন্তকাল। বড় রাস্তায় দু'খানি গাড়ি জোর কদমে ছুটে চলেছে। সামনের গাড়িতে বসে আছে দুটি স্ত্রীলোক। একটি মহিলা, কৃশকায়, বিবর্ণ; অপরটি দাসী, মোটাসোটা চকচকে লাল গাল। তার ছোট করে ছাঁটা রুক্ষ চুল বিবর্ণ টুপিটার পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে; ছেঁড়া দস্তানায় ঢাকা লাল হাত দিয়ে বারে বারেই সে চুলগুলি ঠিক করে নিচ্ছে; কাজ-করা রুমালে ঢাকা তার উদ্ধত বুকে স্বাস্থ্যের স্বাক্ষর; কালো চোখের চপল দৃষ্টি মেলে সে কখনও জানালা দিয়ে বাইরের ধাবমান মাঠঘাট দেখছে, কখনও ভীরু চোখে তাকাচ্ছে তার মনিবের দিকে, কখনও বা অস্বস্তির সঙ্গে গাড়ির কোণের দিকে চোখ ফেরাচ্ছে। উপরের তাক থেকে মহিলার টুপিটি ঝুলছে ঠিক তার নাকের উপর; তার কোলের উপর একটা পোষা কুকুর। গাড়ির মেঝেতে ছড়ানো বাক্সগুলির উপর পা রেখেছে; স্প্রিং-এর দোলানি ও জানালার খট্ খট্ শব্দকে ছাপিয়ে বাক্সের উপর তার পায়ের ঠক্‌ঠক্ শব্দ অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে।

হাঁটুর উপরে দুই হাত একত্র করে মহিলাটি চোখ বুজে পিঠের নিচে রাখা কুশনে একটু একটু দুলছে; চোখ দুটো একটু কুঁচকে সে ধীরে ধীরে সামান্য কাশল। তার মাথায় সাদা নাইটক্যাপ আর নরম, ফর্সা গলায় হাল্কা নীল রঙের রুমাল বাঁধা। তার সুন্দর, পমেড-মাখা পাকা চুলের মাঝখান দিয়ে সোজা সিঁথি কাটা হয়েছে; মাঝখানে সাদা চামড়াটা কেমন যেন শুকনো মরার মতো দেখাতে। তার সূক্ষ্ম, সুন্দর শরীরের উপর ফ্যাকাসে, হলুদ চামড়াটা ঝুলে পড়েছে; শুধু গাল দুটোতে লালের ছোপ। তার ঠোঁট দুটি শুকনো ও অস্থির, চোখের পাতা সরু ও সোজা, সুতির বেড়াবার জোব্বাটা তার ঝুলে-পড়া বুকের উপর ভাঁজ হয়ে পড়েছে। চোখ দুটো বোজা থাকলেও মহিলাটির মুখে শ্রান্তি, বিরক্তি ও দীর্ঘ যন্ত্রণার ছাপ সুস্পষ্ট। পরিচারকটি বক্সের উপর বসে রেলিং-এ অথবা আসনের উপর কনুই রেখে ঝিমুচ্ছে। ভাড়া-করা কোচয়ান চারটে বলবান, ঘর্মাক্ত ঘোড়াকে লক্ষ্য করে অনবরত হাঁক পাড়ছে, এবং পিছনের গাড়ির কোচয়ানের ডাকে সাড়া দিয়ে মাঝে মাঝেই পিছনে তাকাচ্ছে। কর্দমাক্ত পথ বেয়ে গাড়ির চাকাগুলো সহজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। আকাশ ধূসর ও ঠাণ্ডা; একটা ভেজা কুয়াশা মাঠঘাট ও রাস্তার উপর ছড়িয়ে পড়েছে। বন্ধ গাড়িতে ইউ-ডি-কোলোন ও ধুলোর গন্ধ। রুগ্ন মহিলাটি মাথাটা পিছনের দিকে টানটান করে চোখ খুলল। বড় বড় সুন্দর, কালো চোখ দুটি খুবই উজ্জ্বল।

"আবার," মহিলাটি বলল। দাসীর জোব্বার একটা কোণা মহিলাটির হাঁটুর উপর এসে পড়ছিল; তাতেই তার মুখখানি ব্যথায় কুঁচকে গেল; সুন্দর সরু কাঁপা হাতে মহিলাটি জোব্বার কোণটা সরিয়ে দিলো। মাত্রিয়োশা দুই হাতে জোব্বাটাকে নিজের কোলের উপর রেখে আরও কোণে সরে গেল। তার উজ্জ্বল মুখটা আরও লাল হয়ে উঠল। রুগ্ন স্ত্রীলোকটি তার সুন্দর কালো চোখ দুটি তুলে সাগ্রহে দাসীর কাজকর্মের উপর নজর রেখেছিল। আসনের উপর দুই হাতে ভর দিয়ে নিজেকে একটু তুলে ধরতে চেষ্টা করল, কিন্তু শক্তিতে কুলোল না। তার মুখটা বেঁকে গেল, সারা মুখে ফুটে উঠল একটা অসহায়, ক্রুদ্ধ ব্যঙ্গের ভাব। "আমাকে একটু সাহায্য তো করতে পারতে!...আঃ, তোমাকে কিছু করতে হবে না; আমি একাই পারব, শুধু দয়া করে তোমার এই সব পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি, আজেবাজে জিনিস আমার পিঠের কাছে রেখো না। তুমি যা উজবুক, আমার গায়ে হাত না দিলেই ভাল ছিল!"

মহিলাটি চোখ বুজল; আবার তখনই চোখ খুলে দাসীর দিকে তাকাল। মাত্রিয়োশা তার দিকে তাকিয়ে নিচের লাল ঠোঁটটা কামড়ে ধরেছে। রুগ্ন স্ত্রীলোকটির বুকের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল, কিন্তু নিঃশ্বাস ফেলবার আগেই কাশি দেখা দিলো। সে মুখ ফিরিয়ে চোখ কুঁচকে দুই হাতে বুকটা চেপে ধরল। কাশি থামলে সে আবার চোখ বুজে চুপচাপ বসে রইল। গাড়ি গ্রামে ঢুকল। মাত্রিয়োশা রুমালের নিচ থেকে সবল হাত দুটি বের করে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল।

"কি হলো?" মহিলাটি জিজ্ঞাসা করল।

"একটা স্টেশন ম্যাডাম।"

"আমি জানতে চাই, তুমি ক্রুশ-চিহ্ন করলে কেন?"

"একটা গির্জা ম্যাডাম।"

রুগ্ন স্ত্রীলোকটি জানালার কাছে সরে গিয়ে ধীরে ধীরে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল। গাড়িটা চলতে চলতেই সে গ্রামের বড় গির্জাটিকে একদৃষ্টিতে দেখতে লাগল।

দুটো গাড়িই স্টেশনে গিয়ে থামল। রুগ্ন স্ত্রীলোকটির স্বামী ও ডাক্তার অন্য গাড়ি থেকে নেমে তার কাছে এল।

নাড়িটা দেখতে দেখতে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করল, "কেমন বোধ করছেন?"

তার স্বামী ফরাসিতে জিজ্ঞাসা করল, "কেমন আছ গো—খুব ক্লান্ত লাগছে না তো? গাড়ি থেকে নামবে তো?"

পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি গুছিয়ে মাত্রিয়োশা একপাশে সরে গেল, যাতে তাদের কথাবার্তা বলতে কোনও বাধা না হয়।

মহিলাটি বলল, "একরকমই আছি। আমি নামব না।"

তার স্বামী গাড়ির পাশে একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে স্টেশনের দিকে চলে গেল। মাত্রিয়োশা গাড়ি থেকে নেমে কাদার মধ্যে পা টিপে টিপে গেটের দিকে দৌড়ে গেল।

ডাক্তার তখনও গাড়ির জানালার পাশেই দাঁড়িয়েছিল; ম্লান হেসে রুগ্ন মহিলাটি বলল, "আমি অসুস্থ, তাই বলে আপনি লাঞ্চ খাবেন না তা তো হয় না।"

ডাক্তার ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে লাফিয়ে স্টেশনের সিঁড়ি পেরিয়ে উঠে গেল। তখন মহিলাটি নিজের মনেই বলল, "আমাকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। তারা সুস্থ মানুষ, তাই আমার কথা ভাবে না। হে ঈশ্বর!"

ডাক্তারকে দেখে খুশির হাসি হেসে হাত ঘষতে ঘষতে তার স্বামী বলল, "এডোয়ার্ড আইভানভিচ, মদের পেটিটা আনতে বলেছি; এক বোতল চলবে তো?"

"না বলা তো উচিত না," ডাক্তার জবাব দিলো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভুরু তুলে নিচু গলায় স্বামীটি জিজ্ঞাসা করল, "ওকে কেমন দেখলে?"

"আমি তো বলেছি, ইতালি পর্যন্ত তিনি যেতে পারবেন না; মস্কো পর্যন্ত যদি পৌঁছতে পারেন তাহলেই আশ্চর্য হব, বিশেষত এই আবহাওয়ায়।"

চোখের উপর হাত রেখে স্বামী বলল, "এখন আমরা কি করি! ঈশ্বব! হে ঈশ্বর!"

সেই সময় চাকরটা মদের পেটি নিয়ে ঘরে ঢুকলে সে বলল, "এখানে রাখ।"

ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে ডাক্তার বলল, "ওকে বাড়িতে বেখে আসাই উচিত ছিল।"

স্বামী বাধা দিল, "কিন্তু সেটা কি করে কবব বলো? তুমি তো জানো, ওকে বেখে আসতে আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের আর্থিক অবস্থাব কথা, ছেলেমেয়েদের যে রেখে যেতে হবে সে কথা, আমাব ব্যবসাব কথা—সবই তাকে বলেছি, কিন্তু ও কোনও কথাই শুনতে চায না। সুস্থ, সবল মানুষেব মতোই ও বিদেশে গিয়ে জীবন কাটাবার স্বপ্ন দেখে। ওব যা সত্যিকারের অবস্থা তা বললে তো মরণ-আঘাত দেওয়া হতো।"

"কিন্তু ভাসিলি দিমিত্রিচ, তোমার তো জানা উচিত যে সে আঘাত নেমে এসেছে। ফুসফুস ছাড়া কোনও মানুষ বাঁচতে পারে না, আর ফুসফুস দুইবার জন্মে না। এটা দুঃখের কথা, কিন্তু কি কবা যাবে? ওব শেষের দিনগুলি যাতে ভালভাবে কাটে সেটা দেখাই এখন তোমার-আমার কর্তব্য। এখন দবকার একজন পুরোহিত।"

"হে ঈশ্বব! কিন্তু অবস্থাটা ভাব, শেষ ধর্মানুষ্ঠানেব কথা ওকে বলতে হবে। আমি বলতে পারব না, তাতে যা হয় হবে। তুমি তো জানো, ও কত ভাল।"

অর্থপূর্ণভাবে মাথা নেড়ে ডাক্তার বলল, "রাস্তায় যতদিন বরফ জমে থাকবে ততদিন অপেক্ষা করে থাকার কথা তো ওকে তোমাকে বলতেই হবে, নইলে রাস্তায়ই হয়ত একটা বিপদ ঘটে যাবে।"

মাথার উপরে একটা কুর্তা ওড়াতে ওড়াতে স্টেশনের পিছন দিককার নোংরা সিঁড়িতে লাফাতে লাফাতে ওভারসিয়াবের মেয়ে হাঁক দিলো, "আক্সয়ুশা, হেই আক্সয়ুশা! শার্কিন থেকে যে মহিলা এসেছে, চল্ তাকে দেখে আসি; সকলে বলছে ফুসফুসের চিকিৎসার জন্য তাকে বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে। ক্ষয়রোগীদের কেমন দেখতে আমি কখনও দেখিনি।"

আক্সয়ুশা দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল; দু'জন হাত ধবাধরি করে গেট পাব হয়ে

গেল। ধীরে ধীরে গাড়ির কাছে গিয়ে তারা জানালা দিয়ে উঁকি দিলো। রুগ্ন স্ত্রীলোকটি তাদের দিকে মুখ ফেরাল, কিন্তু তাদের কৌতূহল দেখে ভুরু কুঁচকে ঘুরে বসল।

তাড়াতাড়ি মাথাটা সরিয়ে ওভারসিয়ারের মেয়ে বলে উঠল, "হায় কপাল! উনি কী সুন্দরীই ছিলেন, আর এখন দেখতে কী হয়েছেন। সত্যি, দেখলে ভয় করে। তুই দেখেছিস আক্সয়ুশা, দেখেছিস?"

আক্সয়ুশা ঘাড় নেড়ে বলল, "হ্যাঁরে, খুব শুকিয়ে গেছে! চল্ আবার যাই; যেন কুয়ো থেকে জল আনতে যাচ্ছি এমনি ভাব দেখিয়ে আর একবার দেখে আসি। ভাল করে দেখবার আগেই উনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। ওঁর জন্য সত্যি কষ্ট হয় মাশা!"

"আঃ, কী ভীষণ কাদারে বাবা", মাশা বলল, তারপর দু'জনই দৌড়ে গেটের দিকে চলে গেল।

পঙ্গু স্ত্রীলোকটি ভাবল, "আমাকে দেখলেও লোকে ভয় পায়। আঃ, তাড়াতাড়ি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাইরে যেতে হবে, তাহলেই আমি ভাল হয়ে উঠব!"

কি যেন চিবুতে চিবুতে গাড়ির কাছে এসে তার স্বামী বলল, "এখন কেমন আছ গো?"

রুগ্ন স্ত্রীলোকটি মনে মনে বলল, "সব সময় সেই একই প্রশ্ন; অথচ এখনও খেয়েই চলেছে!"

"একই রকম", সে চিবিয়ে চিবিয়ে জবাব দিলো।

"দেখো, আমার আশংকা হচ্ছে এই আবহাওয়ার মধ্যে এতটা পথ যাওয়া তোমার পক্ষে খারাপ হবে; এডোয়ার্ড আইভানভিচও তাই বলছে। আমরা কি তাহলে ফিরে যাব?"

সে রেগে চুপ করে রইল।

"আবহাওয়া পাল্টাবে, রাস্তাগুলোও শক্ত হবে, তখন তোমার পক্ষে যাবার সুবিধা হবে, আর তখন আমরা সকলে একসঙ্গেই যাব।"

"মাফ করো। আগেই যদি তোমার কথা না শুনতাম তাহলে এতদিনে আমি বার্লিনে গিয়ে সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যেতাম।"

"দেখ সোনা, কোনও উপায় ছিল না; তুমি তো জানো সে প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এখন তুমি যদি আর মাসখানেক অপেক্ষা করো তাহলে তুমি অনেকটা ভাল হয়ে উঠবে। ততদিনে আমিও ব্যবসাপত্রের একটা বিলি-ব্যবস্থা করে ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিতে পারব।"

"ছেলেমেয়েরা তো ভালই আছে; অসুস্থ তো আমি।"

"কিন্তু ভেবে দেখো, এই আবহাওয়ায় তোমার শরীর যদি পথের মাঝখানে খারাপ হয়ে পড়ে...সেখানে অন্তত তোমার বাড়িতে তো থাকবে।"

"বাড়িতে থাকব?...বাড়িতে থেকে মরব?" রুগ্ন স্ত্রীলোকটি রেগে বলল। কিন্তু "মরব" কথাটা তাকেও ভয় পাইয়ে দিলো; জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে স্বামীর দিকে তাকাল।

স্বামী চোখ নামাল, কোনও কথা বলল না, রুগ্ন স্ত্রীলোকটি হঠাৎ ছোট শিশুর মতো মুখটা ফোলাল, তার দুই চোখে জল ঝরতে লাগল। তার স্বামী রুমালে মুখ ঢেকে কোনও কথা না বলে গাড়ির কাছ থেকে সরে গেল।

আকাশের দিকে মুখ তুলে রুগ্ন স্ত্রীলোকটি বলল, "না, আমি যাবই"; তারপর সে ফিস্‌ফিস্ করে অসংলগ্ন সব কথা বলতে শুরু করল। "হে ঈশ্বর, কিসের জন্য?" বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে দর্‌দর্ করে জল ঝরতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে সে একান্ত মনে প্রার্থনা করল, কিন্তু তার বুকের মধ্যে সেই ব্যথা ও চাপটা রয়েই গেল। আকাশ, মাঠঘাট, রাস্তা সব কিছুই ধূসর ও নিরানন্দ; সেই একই হৈমন্তী কুয়াশা, রাস্তার কাদা, কুটিরের ছাদ, গাড়ি এবং কোচয়ানদের ভেড়ার চামড়ার উপর ছড়িয়ে আছে। কোচযানরা গাড়ির চাকায় তেল দিচ্ছে, ঘোড়া জুতছে আর মনের সুখে প্রচণ্ডভাবে কথাবার্তা চালাচ্ছে।

২

ঘোড়াগুলো গাড়িতে জুড়ে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু কোচয়ান গাড়িতে ওঠেনি। সে কোচয়ানদের কুঁড়ের মধ্যে ঢুকল। ঘরের ভিতরটা যেমন গরম, তেমনি দম বন্ধ করা, অন্ধকার, ভ্যাপসা। সেখানে মানুষের গন্ধ, রুটি সেঁকার গন্ধ, বাঁধাকপির গন্ধ, ভেড়ার চামড়ার গন্ধ। একই ঘরে বেশ কয়েকজন কোচয়ান থাকে; রাঁধুনি স্টোভের কাছে কাজে ব্যস্ত; স্টোভের উপরে তাকের উপর ভেড়ার চামড়ায় শরীর ঢেকে একটি রুগ্ন লোক শুয়ে আছে।

কোচয়ান ঘরে ঢুকে ডাকল, "ফিয়োদর খুড়ো। হেই ফিয়োদর খুড়ো!" কোচয়ানটি যুবক, গায়ে ভেড়ার চামড়ার কোট, তার বেল্টে একটা চাবুক গোঁজা। সে ঐ রুগ্ন লোকটিকেই ডাকছিল।

একজন কোচয়ান বলল, "তোমার কি চাই ফেদিয়া? সবাই গাড়িতে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।"

"ওর বুটজোড়া আমার চাই; আমার বুটের তলায় গর্ত হয়ে গেছে," চুলগুলো পিছনে ঠেলে দিয়ে যুবকটি জবাব দিলো। তারপর স্টোভের কাছে গিয়ে আবার হাঁক দিলো, "তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ? হেই ফিয়োদর খুড়ো?"

"কি বলছ?" জবাবে একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল; স্টোভের উপর থেকে লাল দাড়িওয়ালা একটি শুকনো মুখ বেরিয়ে এল। একটা বড় শুকিয়ে যাওয়া, লোমে ঢাকা ফর্সা হাত ময়লা শার্টের উপর একটা কোট চাপাল। "আমাকে একটু জল দাও ভাই; তুমি কি চাও?"

যুবকটি তাকে এক হাতা জল দিলো।

তারপর ইতস্তত করে বলল, "দেখো ফেদিয়া, নতুন বুটজোড়া তো তোমার এখন লাগছে না; ওটা আমাকে দাও; তুমি তো আর এখন কোথাও যাচ্ছ না।"

চকচকে হাতাটা চেপে ধরে সেই ময়লা জলে ঝুলন্ত গোঁফটাকে ডুবিয়ে রুগ্ন লোকটি সাগ্রহে ধীরে ধীরে জলটা খেলো। তার জট-পাকানো দাড়িটা নোংরা। অনেক কষ্টে বসে-যাওয়া অনুজ্জ্বল চোখ দুটো তুলে যুবকটির মুখের দিকে তাকাল। জল খাওয়া শেষ করে ভেজা ঠোঁট মুছবার জন্য হাতটা তুলতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না; তখন কোটের আস্তিন দিয়ে ঠোঁট মুছল। কোনওরকম শব্দ না করে নাক দিয়ে ঘন ঘন শ্বাস টানতে টানতে বৃদ্ধ লোকটি সোজা যুবকটির চোখেব দিকে তাকাল।

যুবকটি বলল, "ইতিমধ্যেই যদি সেটা আব কাউকে দেবার কথা দিয়ে থাকো, তাহলে কোনও কথা নেই। ব্যাপাবটা হচ্ছে, বাইবে সব জলে-কাদায় সপ্-সপ্, আর আমাকেও একটা কাজে বাইরে যেতে হবে; তাই ভাবলাম ফেদিয়ার বুটজোড়াই চেয়ে নেব, তার তো আব এখন ওটা লাগছে না। অবশ্য যদি তোমাব নিজের দরকাব থাকে তো বলো।"

রুগ্ন লোকটির গলার মধ্যে একটা ঘর্-ঘর্ শব্দ হলো; সে পাশ ফিরল; একটা কাশির দমকে তার দম বন্ধ হয়ে এল।

হঠাৎ রেগে উঠে রাঁধুনিটি গম্-গম্ করে বলে উঠল, "ওর দরকারই লাগবে! দু'মাস হলো ও স্টোভ ছেড়ে উঠতে পারছে না। কাশতে কাশতে তো বুক ফেটে যাবার যোগাড়। তা শুনেই তো আমাব পিলে চমকে ওঠে। বুট দিয়ে ও কি কববে? নতুন জুতো পরে তো আর কববে যাবে না! অথচ একদিন ছিল, সে অনেক দিন আগে-- সে পাপের জন্য ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন। আরে, কাশতে কাশতে তো ওর বুক ফেটে যাবাব যোগাড় হয়। ওকে অন্য কোথাও সরানো দরকার। শুনেছি এ ধরনের লোকের জন্য শহরে হাসপাতাল আছে। ও তো সবটা জায়গা জুড়ে থাকে, তাহলে অন্যরা কি করে? চলাফেরাব জায়গাটা পর্যন্ত নেই। আর সবাই বলে কি না ঘরটা পরিষ্কার বাখতে হবে।"

স্টেশনের ওভারসিয়ার দরজার কাছে এসে হাঁক দিলো, "হেই সের্‌যোগা। নিজের জায়গায় যাও: ভদ্রলোকরা অপেক্ষা কবছেন।"

সের্‌যোগা জবাবের জন্য অপেক্ষা না করেই চলে যেত, কিন্তু রুগ্ন লোকটি কাশতে কাশতে যে ভাবে তাকাল তাতে মনে হলো সে কিছু বলতে চায়।

কাশি থামিয়ে মিনিটখানেক শ্বাস টেনে সে বলল, "তুমি বুটজোড়া নিয়ে নাও সের্‌য়োগা; শুধু আমি মরলে আমার জন্য একখানা পাথর কিনে দিও; বুঝলে?"

"ধন্যবাদ খুড়ো, তাহলে বুটজোড়া নিযে যাচ্ছি; আর পাথর, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কিনে দেব।"

"এই ছেলেরা, শুনলে তো?" কোনওরকমে কথাটা বলেই রুগ্ন লোকটি আবার উপুড় হয়ে কাশতে লাগল।

একজন কোচযান বলল, "ঠিক আছে, শুনলাম। চলে চলো সের্‌যোগা, নইলে ওভারসিয়ার আবার তাড়া লাগাবে। শার্কিন থেকে আগত মহিলাটি অসুস্থ হয়ে পড়েছে।"

সের্‌যোগা তাড়াতাড়ি তার ছেঁড়া ও বেখাপ্পা রকমের বড় বুটজোড়া পা থেকে খুলে একটা দেরাজের মধ্যে ঢুকিযে দিলো। ফিয়োদর খুড়োর নতুন বুটজোড়া তার পায়ে ঠিক-ঠিক লেগে গেল। বুটজোড়া দেখতে দেখতে সে গাড়ির কাছে হাজির হলো।

সের্‌য়োগা গাড়ির বক্সে উঠে চাবুকটা হাতে নিতেই চর্বির পাত্র হাতে একজন কোচয়ান বলল, "বাঃ, কী চমৎকার বুটজোড়া! এস, চর্বি লাগিয়ে দি। তোমাকে কি এমনি দিয়ে দিলো?"

উঠে দাঁড়িয়ে কোটের কোণটা ঝাড়তে ঝাড়তে সে বলল, "কেন, তোমার চোখ টাটাচ্ছে নাকি?...হাই বাছাধনরা, উঠে দাঁড়াও!" চাবুকটা দোলাতে দোলাতে সে ঘোড়াগুলোকে তাড়া দিতেই যাত্রী, বাক্স-পেঁটরা ও বিছানাপত্র নিয়ে গাড়ি দুটো ভেজা রাস্তা ধরে ছুটতে ছুটতে হেমন্তকালের ধূসর কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেই দম-বন্ধ-করা কুঁড়েঘরে রুগ্ন কোচয়ানটি একাকি স্টোভের উপর শুয়ে রইল। অনেকবার কেশেও কোনওরকম স্বস্তি না পেয়ে সে বেশ চেষ্টা করে পাশ ফিরে শুয়ে চুপচাপ পড়ে রইল। সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত সারাটা দিন কত মানুষ ঘরে এল গেল, খাওয়া-দাওয়া করল, কিন্তু রুগ্ন লোকটির সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। রাত হলে রাঁধুনিটি একটা ভেড়ার চামড়া খুঁজতে স্টোভের উপরটা হাতড়াতে হাতড়াতে তার পায়ের উপর হাত দিলো। তখন রুগ্ন লোকটি বলল, "আমার উপর রাগ করো না নাস্তাসিয়া; শিগ্‌গিরই আমি তোমার এখান থেকে চলে যাব।"

নাস্তাসিয়া জবাবে বলল, "ঠিক আছে; ঠিক আছে; আরে, সে কথা আমি বলিনি। কিন্তু তোমার কি হয়েছে খুড়ো? আমাকে খুলে বলো তো?"

"আমার ভিতরটা সব যেন ক্ষয়ে গেছে। এটা যে কি তা ঈশ্বরই জানে।"

"সে কি কথা! তুমি যখন কাশ তখন কি গলা জ্বালা করে?"

"সারা শরীর জ্বালা করে। আমি মরতে বসেছি—তা ছাড়া আর কি। আঃ আঃ আঃ!" রুগ্ন লোকটি গোঙাতে লাগল।

স্টোভের উপর থেকে নামতে নামতে তাকে একটা কোট দিয়ে চাপা দিয়ে নাস্তাসিয়া বলল, "এই ভাবে পা দুটো ঢেকে রাখো।"

ঘরের মধ্যে সারারাত একটা আবছা আলো জ্বলতে লাগল। নাস্তাসিয়া ও দশটি কোচয়ান মেঝে ও দেরাজের উপর শুয়ে সরবে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগল। শুধু রুগ্ন লোকটি অস্পষ্ট সুরে গোঙাতে লাগল, কাশল, স্টোভের উপর এপাশ-ওপাশ করল। সকালের দিকে সে একেবারে নিঃসাড় হয়ে গেল।

পরদিন সকালের আধো আলোয় শরীরটা টানটান করতে করতে রাঁধুনি বলল, "রাতে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নে দেখলাম, ফিয়োদর খুড়ো স্টোভ থেকে নিচে নেমে কাঠ কাটতে বাইরে গেল। আমাকে বলল, 'নাস্তাসিয়া, তোমার জন্যও কিছু কেটে দেব'; আর আমি বললাম, 'তুমি কেমন করে কাঠ কাটবে?' সে তখন কুড়ুলটা

তুলে নিয়ে এত তাড়াতাড়ি কাঠ কাটতে লাগল যে চ্যালাগুলো ছিটকে যেতে লাগল। আমি বললাম, 'সে কি, তুমি তো অসুস্থ ছিলে, তাই না?' সে বলল, 'না, আমি ঠিক আছি', বলেই সে এমন ভাবে কুড়ুল চালাতে লাগল যে আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। চিৎকার করে উঠতেই ঘুম ভেঙে গেল। সে কি তাহলে মারা গেছে? ফিয়োদর খুড়ো! হেই খুড়ো!'

ফিয়োদর কোনও জবাব দিলো না।

আর একটি কোচয়ানেরও ঘুম ভেঙে গেল। সে বলল, "হয় তো সে মারা গেছে। আমি উঠে দেখছি।"

লাল লোমে ঢাকা সরু হাতটা স্টোভের উপর থেকে ঝুলছে, হাতটা ঠাণ্ডা, ফ্যাকাসে।

কোচয়ানটি বলল, "আমি গিয়ে ওভারসিয়ারকে বলছি। মনে হচ্ছে সে মারা গেছে।"

ফিয়োদর অনেক দূর থেকে এসেছিল—ওর আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। ঝোপটা পেরিয়ে যে নতুন কবরখানাটা আছে পরদিন সেইখানে তাকে কবর দেওয়া হলো। তারপর বেশ কয়েক দিন নাস্তাসিয়া সকলকে তার স্বপ্নের কথা, সেই যে সর্বপ্রথম ফিয়োদর খুড়োর মরার খবর জানতে পেরেছিল সে কথা বলে বেড়াতে লাগল।

৩

বসন্ত এল। শহরের ভেজা রাস্তার জমাট গোবরের স্তূপের ভিতর দিয়ে কলকল্ শব্দে জলের স্রোত বয়ে যেতে লাগল সুন্দর সাজে সেজে লোকজনরা সব মনের সুখে গল্প করতে করতে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ছোট ছোট বাগানের বেড়ার ওপাশে গাছে গাছে ফুলের কুঁড়ি ফুটতে শুরু করেছে, তাজা বাতাসে ডালপালাগুলি সড়্সড়্ করে নড়ছে। সর্বত্র দৌড়-ঝাঁপ, ফোঁটা ফোঁটা জলের শব্দ চড়ুই পাখিরা কিচির মিচির করছে, ছোট ছোট পাখা মেলে ফুরুৎ ফুরুৎ উড়ছে। রোদ্দুরে, বেড়ার ধারে, গাছে গাছে, বাড়িতে-বাড়িতে—সর্বত্রই চলা আর চলা। আকাশে, মাটিতে মানুষের মনে—সর্বত্রই যৌবন আর খুশির মেলা। বড় রাস্তায় একটা বাড়ির সামনে অনেক খড় জমা করা রয়েছে, বাড়ির মধ্যে দূরপথযাত্রিনী একটি মুমূর্ষু স্ত্রীলোক শুয়ে আছে।

তার ঘরের বন্ধ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার স্বামী ও একটি বয়স্কা স্ত্রীলোক, চোখ নিচু করে সোফায় বসে আছে পুরোহিত, তার হাতে চাদরে জড়ানো একটা কি যেন। ঘরের এক কোণে রুগ্ন স্ত্রীলোকটির মা একটা নিচু চেয়ারে বসে ভীষণভাবে কাঁদছে। একটি দাসী পরিষ্কার ধোয়া রুমাল হাতে নিয়ে বৃদ্ধা মহিলাটির পাশে দাঁড়িয়ে আছে, সে চাইলেই সেটা তার হাতে দেবে। আর একটি দাসী মহিলাটির মাথায় কি যেন মালিশ করতে করতে তার টুপি পরা পাকাচুলভর্তি মাথায় বাতাস করছে।

দরজায় তার পাশে দাঁড়ানো বয়স্কা স্ত্রীলোকটিকে স্বামী বলল, "খৃস্ট তোমার সহায় হন; তোমাকে ও খুব বিশ্বাস করে, ওর সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় সেটা তুমি খুব ভালই জানো; ভিতরে গিয়ে ওর সঙ্গে বেশ ভালভাবে কথাবার্তা বলো।" সে দরজাটা খুলতেই যাচ্ছিল, কিন্তু তার বোন তাকে বাধা দিলো, হাতের রুমালে বারকয়েক চোখ মুছে মাথা নাড়তে লাগল।

"এবার চলো; মনে হচ্ছে, আমি যে কাঁদছিলাম সেটা এখন আর বোঝা যাচ্ছে না," এই কথা বলে সে নিজেই দরজা খুলে রোগিণীর ঘরে ঢুকল।

স্বামীটি খুবই উত্তেজিত; দেখে মনে হচ্ছে, সে একেবারেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। বৃদ্ধার দিকে এগিয়ে গিয়েও তার থেকে বেশ কয়েক পা দূরেই থেমে গেল, তারপর ঘরময় একটু পায়চারি করে পুরোহিতের কাছে গেল। তার দিকে তাকিয়ে আকাশের দিকে ভুরু দুটি তুলে পুরোহিত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। তার ঈষৎ ধূসর ঘন দাড়িও উপরের দিকে উঠে আবার নেমে এল।

"হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর!" স্বামীটি বলল।

"কিছুই করবার নেই," পুরোহিত বলল; সেই সঙ্গে আবারও তার ভুরু ও দাড়ি একবার উঠল, আবার নামল।

হতাশ হয়ে স্বামীটি বলল, "আর ওর মা এখানে বসে আছেন। তিনি তো এটা কিছুতেই মানবেন না। তিনি ওকে ভালবাসেন, এত ভালবাসেন যে .আমি কিছু জানি না। ফাদার, দেখুন আপনি যদি ওঁকে একটু সান্ত্বনা দিতে পারেন, বুঝিয়ে-সুঝিযে এ ঘর থেকে নিয়ে যেতে পারেন।"

পুরোহিত উঠে বৃদ্ধা মহিলাটির কাছে গেল।

বলল, "এ কথা খুবই সত্য যে মাতৃ-হৃদয়ের গভীরতার পরিমাপ কেউ করতে পারে না; কিন্তু ঈশ্বর করুণাময়।"

বৃদ্ধার মুখটা হঠাৎ বিকৃত হয়ে উঠল; সে পাগলের মতো কাঁদতে লাগল।

বৃদ্ধা কিছুটা শান্ত হলে পুরোহিত বলতে শুরু করল, 'ঈশ্বর করুণাময়। আপনাকে বলছি, আমার পল্লীতে একটি লোক অসুস্থ হয়েছিল, মারিয়া দিমিত্রেভ্‌নার চাইতেও খারাপ অসুখ, কিন্তু একটি সাধারণ মজুর গাছ-গাছড়া দিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাকে সারিয়ে তুলেছিল। সেই মজুরটি এখন মস্কোতে আছে। ভাসিলি দিমিত্রেভিচকে আমি বলেছি—তাকে দিয়ে একবার চেষ্টা করা যেতে পারে। অন্তত রোগিণী তাতে কিছুটা সান্ত্বনা তো পাবে। ঈশ্বর ইচ্ছা করলে সবই হতে পারে।"

বৃদ্ধা বলে উঠল, "না, ও বাঁচবে না; হায়, এর চাইতে যদি আমি যেতে পারতাম; কিন্তু ঈশ্বর ওকেই নেবে।"

রোগিণীর স্বামী দুই হাতে মুখ ঢেকে ঘর থেকে ছুটে চলে গেল।

করিডরে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল একটি ছ'বছরের ছেলের; তার চাইতেও বয়সে ছোট একটি মেয়ের পিছন পিছন সে জোরে ছুটতে ছুটতে এসেছে।

"ছেলেমেয়েদের তাদের মায়ের কাছে নিয়ে যাব কি?" নার্স জিজ্ঞাসা করল।

"না, তিনি ওদের দেখতে চান না। তাঁর কষ্ট হয়।"

বাবার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছেলেটি একমুহূর্ত দাঁড়াল, তারপরই পা ঠুকে হৈ-হৈ করতে করতে দৌড় দিলো।

বোনকে দেখিয়ে ছেলেটি চেঁচিয়ে বলল, "জানো বাপি, ওকে আমি কালো ঘোড়া বানিয়েছি।"

ওদিকে পাশের ঘরে বোনটি তখন রোগিণীর বিছানার পাশে বসে খুব কৌশলের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে তার কাছে মৃত্যুর কথাটা উত্থাপনের চেষ্টা করছে। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ডাক্তার একটি ওষুধ তৈরি করছে।

হঠাৎ সে বলে উঠল, "দেখো সোনা, আমার মনকে প্রস্তুত করবার চেষ্টা করো না। আমাকে ছেলেমানুষ ভেব না। আমি খৃস্টান! সব বুঝি। আমি জানি, আর বেশিদিন বাঁচব না; আমার স্বামী যদি আরও আগে আমার কথা শুনত তাহলে এতদিনে আমি ইতালিতে থাকতাম এবং খুব সম্ভব ভাল হয়েও যেতাম। তাকে সকলেই তাই বলেছিল। কিন্তু এখন আর কোনও উপায় নেই; হয়ত এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমি জানি, আমরা সকলেই মহাপাপী; কিন্তু ঈশ্বরের করুণায় আমি বিশ্বাস করি, তিনি সকলকেই ক্ষমা করবেন—সব্বাইকে! নিজেকে বুঝতে আমি চেষ্টা করি! আমিও মহাপাপ করেছি। কিন্তু তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দুঃখও তো অনেক পেয়েছি। সব দুঃখকে ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করতে চেষ্টাও করেছি..."

তখন বোনটি বলল, "তাহলে ফাদারকে পাঠিয়ে দেব কি সোনা? ধর্মানুষ্ঠানের পরে তুমি অনেক স্বস্তি বোধ করবে।" রোগিণী সম্মতি জানিয়ে মাথা নিচু করল।

অস্পষ্ট স্বরে বলল, "আমি পাপী, ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন।"

বোনটি বেরিয়ে গিয়ে পুরোহিতকে ইঙ্গিতে ডাকল।

অশ্রুসিক্ত চোখে সে স্বামীটিকে বলল, "ও তো দেবদূত!" স্বামীটি কাঁদতে লাগল। পুরোহিত ঘরে ঢুকল। বৃদ্ধা মহিলাটি তখনও অজ্ঞান হয়ে আছে। বাইরের ঘরে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। পাঁচ মিনিট পরে পুরোহিত বেরিয়ে এল। গায়ের চাদরটা খুলে চুলগুলো পিছনে ঠেলে দিলো।

বলল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, উনি এখন অনেক শান্ত হয়েছেন; আপনাদের দেখতে চাইছেন।"

বোন ও স্বামী ঘরে ঢুকল। পবিত্র ছবির দিকে তাকিয়ে রোগিণী নীরবে কাঁদছে।

স্বামী বলল, "তোমাকে অভিনন্দন জানাই সোনা।"

দুই সরু ঠোঁটে ঈষৎ হাসি ফুটিয়ে রোগিণী বলল, "ধন্যবাদ! এখন আমি কত সুখী। কী যে অবর্ণনীয় আনন্দ আমার হচ্ছে! ঈশ্বর কী করুণাময়! তাই নয় কি? তিনি কি করুণাময় সর্বশক্তিমান নন?" দুই অশ্রুসিক্ত চোখে আকুল প্রার্থনায় আবার সে পবিত্র ছবির দিকে তাকাল।

তখনই হঠাৎ কি যেন তাব মনে পড়ে গেল। ইশারায় স্বামীকে কাছে ডাকল। দুর্বল বিরক্ত গলায় বলল, "আমি যা বলি তা তো তুমি কোনওদিন করবে না।" গলাটা বাড়িয়ে একান্ত অনুগতভাবে স্বামী তার কথাগুলি শুনল।

"তুমি কি বলতে চাও সোনা?"

"কতবার তোমাকে বলেছি এই ডাক্তারগুলো কিচ্ছু জানে না; অনেক সাধারণ লোক আছে যারা রোগ সারাতে পাবে...ফাদার আমায় বললেন...একজন মজুর...তাকে ডেকে আনো।"

"কার জন্য সোনা?"

"হায় ভগবান, এ লোক কিচ্ছু বোঝে না!"

রোগিণী ভুরু কুঁচকে মুখ ঢাকল। ডাক্তার এগিযে গিয়ে তার হাতটা তুলে নিল। নাড়ি ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। স্বামীব দিকে ইশারা করল। সেটা লক্ষ্য করে রোগিণী সভয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। বোনটি মুখ ফিবিযে কেঁদে উঠল।

রোগিণী বলল, "কেঁদ না; নিজেদের দুঃখ দিও না, আমাকেও না; তাতে আমার মনের শান্তি আরও নষ্ট হয়ে যায়।"

তার হাতে চুমো খেয়ে বোন বলল, "তুমি একটি দেবদূত।"

"না, এখানে চুমো খাও, শুধু মৃতদেরই হাতে চুমো খায়। হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর!"

সেই সন্ধ্যায়ই রুগ্ন স্ত্রীলোকটি মাবা গেল। মস্ত বড় বাড়ির বসবার ঘরে শবাধারে তাব মৃতদেহ শুইয়ে দেওয়া হলো। বড় ঘবটির দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো; ঘবের মধ্যে একা বসে ডিয়েকন নাকি সুবে তালে তালে ডেভিডের স্তোত্রাবলী পাঠ করতে লাগল। লম্বা রূপোব মোমদানিতে বাখা মোমবাতির উজ্জ্বল আলো মৃতার ম্লান ভুরুর উপর পড়ল; হাঁটু ও গোড়ালিব কাছে শবাবরণেব শক্ত ভাঁজগুলো ভয়ানকভাবে ঠেলে উঠেছে। কথার অর্থ না বুঝেই ডিযেকন সুর করে পড়ে চলেছে; স্তব্ধ ঘরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে সে কণ্ঠস্বরও মিলিয়ে যাচ্ছে। দূবের কোনও ঘব থেকে মাঝে মাঝে শিশুদের কণ্ঠস্বর ও তাদের পায়ের শব্দ ভেসে আসছে।

স্তোত্র-পাঠকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল : "তোমার মুখের আবরণ উন্মোচন করলে, আর সকলে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। তাদের নিঃশ্বাস তুমি গ্রহণ করলে, তারা মারা গেল, যে মাটি থেকে তারা এসেছিল সেই মাটিতেই মিশে গেল। তোমার আত্মাকে তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করালে—তাদেব সৃষ্টি হলো, তাবা নতুন করে পৃথিবীতে এল। এই মুহূর্তে এবং চিরকাল ঈশ্বরের জয় হোক।"

মৃতাব মুখখানি কঠিন ও গম্ভীর। কিছুতেই তার ঠাণ্ডা ভুরু ও দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট নড়ল না। সকলেই তাকে দেখছে। কিন্তু এখন কি সে ওই বড় বড় কথাগুলির অর্থ বুঝতে পারছে?

৪

এক মাস পবে সেই মৃত স্ত্রীলোকটির কবরের উপর একটি পাথবেব স্মৃতিস্তম্ভ

গড়ে উঠল। কিন্তু কোচোয়ানটির কবরের উপর একখানি পাথরও চাপানো হলো না; সেই স্তূপের উপরে উজ্জ্বল, সবুজ ঘাস ছাড়া আব কিছুই ছিল না; একটি মানুষের অতীত অস্তিত্বের সেইটিই একমাত্র নির্দেশক।

স্টেশনের রাঁধুনিটি একদিন বলল, "দেখো সের্‌য়োগা, তুমি যদি ফিয়োদর-এর জন্য একটা পাথর না কেন তাহলে তোমার পাপ হবে। এতদিন শীতকালের দোহাই দিয়েছ, কিন্তু এখন কথা রাখ না কেন? আমি তো তখন কাছেই ছিলাম। ইতিমধ্যেই সে একদিন এসে তোমার কাছে পাথব চেয়ে গেছে: এখনও যদি সেটা না কেন তাহলে আবার সে আসবে, তোমার ঘাড় মটকাবে।"

সের্‌য়োগা জবাব দিলো, "আরে আমি কি বলেছি যে কিনব না? যখন কথা দিয়েছি তখন নিশ্চয় কিনব; রূপোর দেড় রুবল দিয়ে পাথর কিনব। আমি ভুলিনি, তবে তুমি তো জানো সেটা অনেক দূর থেকে আনতে হবে। শহরে যাবার একটা সুযোগ এলেই কিনে আনব।"

একটি বুড়ো কোচয়ান বলল, "কোনওবকমে একটা ক্রুশও বসিয়ে দিতে পারবে, নইলে খুবই লজ্জাব কথা হবে। তাব বুটজোড়া তো তুমিই পবেছ।"

"ক্রুশ কোথায পাব? জ্বালানি কাঠ কেটে তো আর ক্রুশ বানানো যায় না?"

"কি বাজে কথা বলছ? জ্বালানি কাঠ থেকে আবার ক্রুশ হয নাকি। একদিন খুব ভোবে উঠে কুড়ুল নিয়ে জঙ্গলে চলে যাও, তাহলেই একটা কেটে আনতে পাববে। একটা আস্পেন বা ঐ ধবনেব গাছ কাটলেই হবে আর তাতে একটা সুন্দব কাঠের স্মৃতি-স্তম্ভও হবে। আব না হয তো তোমাকে গিয়ে বন-রক্ষককে একপাত্র ভদ্‌কা খাওযাতে হবে। যখন-তখন যে কোনও কাজেব জন্য তো আব কেউ তাকে ভদ্‌কা খাওযায না। এই তো সেদিন গিযে আমি একটা বেশ ভাল গোছেব কাঠ কেটে নিযে এলাম, কেউ কিচ্ছু বলল না।"

খুব ভোবে তখনও ভাল কবে আলো ফোটেনি এমন সময সের্‌য়োগা তার কুড়ুলটা নিয়ে জঙ্গলে চলে গেল। চারদিকে একটা ঠাণ্ডা এক-রঙা শিশিরেব চাদর বিছানো, তাব উপব সূর্যের আলো পড়েছে। পব দিকটা ধীবে ধীরে আলো হয়ে আসছে, তাব ম্লান আলো মেঘে-ঢাকা আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। নিচের একটি ঘাস বা গাছের মগডালের একটা পাতাও নড়ছে না। শুধু মাঝে মাঝে গাছ-গাছালির ফাঁকে পাখিব ডানার শব্দে অথবা মাটিতে খস্ খস্ শব্দে জঙ্গলের শান্ত স্তব্ধতা ভঙ্গ হচ্ছে। সহসা বনের প্রান্তে একটা বিচিত্র শব্দ, কোনও প্রাকৃতিক শব্দ নয়, উঠেই আবার মিলিয়ে গেল। কিন্তু আবার সেই শব্দটা শোনা গেল; একটি নিশ্চল গাছের গুঁড়ির কাছে বার বার সেই শব্দটা শোনা যেতে লাগল। একটা গাছের মাথা বিচিত্র ভঙ্গিতে কাঁপতে লাগল; তার পাতাগুলি যেন ফিস্ ফিস্ করে কি বলছে; একটা মুখর পাখি তার শাখায় আশ্রয় নিয়েছিল; সেটাও বার দুই গাছটাকে প্রদক্ষিণ করে শিস দিতে দিতে ও লেজ নাড়তে নাড়তে আর একটা গাছে গিয়ে বসল।

কুড়ুলের একঘেয়ে শব্দ হতে লাগল; ছোট ছোট সরস কাঠের টুকরোগুলো শিশির-ভেজা ঘাসের উপর ছিটকে পড়তে লাগল; প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে একটা মৃদু মড়্-মড়্ শব্দ উঠল। গাছটার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল, মাথাটা নিচু করল, সঙ্গে সঙ্গে আবার মাথাটা উঁচু করল, শিকড়গুলো ব্যথায় কাঁপতে লাগল। মুহূর্তের জন্য সব চুপচাপ, কিন্তু আবার গাছটা নিচু হতে শুরু করল; গুঁড়িতে একটা মড়্-মড়্ শব্দ উঠল, শাখা-প্রশাখাগুলি পাতা সমেত কাঁপতে লাগল, তারপর গাছটা সশব্দে পড়ে গেল, তার মাথা লুটিয়ে পড়ল ভেজা মাটিতে। কুড়ুলের শব্দ ও পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল। মুখব পাখিটা শিস্ দিতে দিতে আবও উঁচুতে উড়ে গেল। যে ডালে সে তার পাখা গুটিয়ে বসেছিল, তার পাতাগুলি কাঁপতে কাঁপতে একসময় নিথর হয়ে গেল। গাছগুলি যেন মনের সুখে খোলা আকাশে তাদের নিশ্চল ডালপালাগুলিকে মেলে ধরল। স্বচ্ছ মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে সূর্যের প্রথম কিরণরাশি আকাশে ছড়িয়ে পড়ল, তীরবেগে নেমে এল মাটিতে। কুয়াশা পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরতে লাগল; সবুজ ঘাসের উপর শিশির-বিন্দুগুলি ঝিকমিক করতে লাগল; স্বচ্ছ মেঘের দল সাদা হয়ে নীলাভ আকাশের বুকে দ্রুত ভেসে যেতে লাগল। পাখিগুলো ঝোপে-ঝাড়ে উড়তে উড়তে যেন পাগল হয়ে খুশির গান শুরু করে দিলো। গাছের আগায় সরস পাতাগুলি মনের সুখে শান্তভাবে ফিস্ ফিস্ করতে লাগল, আর জীবন্ত গাছেব ডালপালাগুলি ভূপাতিত মৃত গাছটার উপর ধীরে ধীরে রাজকীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে দুলতে লাগল।

১৮৫৯

সর্বতশ্চক্ষু

God sees the truth, but waits

ভ্লাদিমির শহরে এক বণিক যুবক বাস করত। তার নাম আইভান দিমিত্রিচ আকসিয়নভ। দুটো দোকান ও একটা বাড়ির মালিক সে। লালচে রঙ, কোঁকড়ানো চুল, ছিমছাম চেহারা। তাছাড়া সে গাইতে পারত, আর হাসি-ঠাট্টায় ছিল পটু। আরও ছোট বয়সে সে মদ খেত প্রচুর, মাতাল হয়ে ঝগড়াঝাটিও করত। কিন্তু বিয়ে করার পর থেকে মাঝে-মধ্যে ছাড়া মদ খাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল।

একদা গ্রীষ্মকালে নিঝনির মেলায় যাত্রার প্রাক্কালে পরিবারের সকলের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় তার স্ত্রী বলল, "আইভান দিমিত্রিচ, আজ তুমি যেয়ো না। কাল রাতে তোমাকে নিয়ে একটা বড় খারাপ স্বপ্ন আমি দেখেছি।"

আকসিয়নভ হেসে বলল, "তুমি কি ভয় পাচ্ছ যে মেলায় গিয়ে আমি খুব মজা লুটে বেড়াব?"

সে বলল, "না, কিন্তু কিসের যে ভয় তা আমি নিজেই ঠিক জানি না। কিন্তু বড়ই ভয়ঙ্কর স্বপ্ন আমি দেখেছি। শহর থেকে ফিরে এসে তুমি যখন টুপিটা খুললে, আমি যেন দেখলাম তোমার মাথার সব চুল সাদা হয়ে গেছে।"

আকসিয়নভ আবার হেসে উঠল।

— "তার মানে মেলায় আমার খুব লাভ হবে। তুমি দেখে নিও, আমার কপাল এবার খুলে যাবে, আর তোমার জন্যও দামী উপহার নিয়ে আমি বাড়ি ফিরব।"

তারপর সবাইকে চুম্বন করে সে যাত্রা করল।

মাঝপথে আর একজন পরিচিত বণিকের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। রাত কাটাবার জন্য দু'জনে একই সরাইখানায় উঠল। একসঙ্গে চা খেয়ে পাশাপাশি ঘরে ঘুমুতে গেল। আকসিয়নভ বেশিক্ষণ ঘুমনো পছন্দ করত না। মাঝরাতেই তার ঘুম ভেঙে গেল। ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় পথ চলতে সুবিধে হবে বলে সে গাড়োয়ানকে ডেকে ঘোড়া জুড়তে বলল। তারপর মালিকের ঘরে গিয়ে বিলপত্র চুকিয়ে যাত্রা করল।

প্রায় চল্লিশ ভার্স্ট (১ ভার্স্ট =১১৬৬ গজ) যাবার পর সে আবার থামল। ঘোড়াগুলোকে খাইয়ে সরাইখানার সামনের বারান্দায় একটা ঘুম লাগিয়ে খাবার সময় ভিতরের বারান্দায় গিয়ে বসল। এক সামোভার চায়ের অর্ডার দিয়ে একটা গিটার নিয়ে বাজাতে লাগল।

হঠাৎ ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে একটা "ত্রয়কা" এসে সরাইখানার সামনে থামল। গাড়ি থেকে নামল একজন "সিনোভ্নিক্" ও দু'জন সৈনিক। লোকটি আকসিয়নভের কাছে গিয়ে জানতে চাইল সে কে, কোথা থেকে এসেছে। আকসিয়নভ যথাযথ জবাব দিয়ে জানতে চাইল, তিনি চা খাবেন কিনা। কর্মচারীটি কিন্তু একের পর এক প্রশ্ন করেই চলল: গত রাত্রে সে কোথায় ঘুমিয়েছিল, সে একা ছিল না একজন বণিক সঙ্গে ছিল, যাত্রা করবার আগে সকালে সে-বণিকের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল কিনা, এত ভোরে সে কেন যাত্রা করেছিল, এমনি সব প্রশ্ন। এই ভাবে জেরা করায় আকসিয়নভ বেশ বিস্মিত হলেও সে যা যা জানত সবই বলল। তারপর শুধাল, "এ সব খবর আপনি জানতে চাইছেন কেন? আমি চোরও নই, ডাকাতও নই। নিজের ব্যবসার কাজে আমি চলেছি। আমাকে এত সব প্রশ্ন করবার তো কারণ নেই।"

সিনোভ্নিক সৈনিক দু'জনকে ডেকে বলল, "আমি একজন ইস্প্রাভনিক। তোমাকে এ সব প্রশ্ন করছি, কারণ যে বণিকের সঙ্গে তুমি কাল রাত কাটিয়েছ তাকে গলা-কাটা অবস্থায় পাওয়া গেছে। তোমার জিনিসপত্র দেখাও। এই, খানাতল্লাশি কর্।"

তারা ঘরের ভিতর ঢুকে তার সুটকেস ও থলে নিয়ে এল। সেগুলোর মুখ খুলে

সব খুঁজতে লাগল। হঠাৎ ইস্‌প্রাভনিক থলের ভিতর থেকে একখানি ছুরি বের করে চেঁচিয়ে উঠল, "এ কার ছুরি?"

আকসিয়নভ চোখ তুলে তাকাল। একখানি রক্তমাখা ছোরা তার থলের ভিতর থেকে বার করা হয়েছে। দেখে সে খুব ভয় পেল।

ইস্‌প্রাভনিক প্রশ্ন করল, "ছুরিতে রক্ত এল কোত্থেকে?"

আকসিয়নভ জবাব দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু সব কথা তার গলায় আটকে গেল।

—"আমি...আমি জানি না...আমি...ছুরি...আমি...ছুরি...আমার নয়..."

ইস্‌প্রাভনিক বলল, "বণিককে আজ সকালে তার বিছানায় খুন হওয়া অবস্থায় পাওয়া গেছে। এ কাজ তুমি ছাড়া আর কেউ করতে পারে না কারণ শোবার কেবিনের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করা ছিল এবং সে ছাড়া একমাত্র তুমিই ভিতরে ছিলে। এখন এই রক্তমাখা ছুরি পাওয়া গেল তোমার থলেয়! তাছাড়া, তোমার চোখ-মুখই তোমাকে ধরিয়ে দিচ্ছে। বলো, কেমন করে তাকে খুন করেছ, আর তার কাছ থেকে কত টাকা চুরি করেছ?"

আকসিয়নভ দিব্যি করে বলল একাজ সে করেনি, একসঙ্গে চা খাবার পরে সে-বণিকের সঙ্গে তার আর দেখা হয়নি, তার কাছে শুধু তার নিজস্ব আট হাজার রুবল আছে, আর ছুরিটা তার নয়। কিন্তু তার গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল, মুখ বিবর্ণ হলো, এমনভাবে ভয়ে সে কাঁপতে লাগল যেন সে প্রকৃতই দোষী।

তার চোখের জল এবং প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইস্‌প্রাভনিক সৈন্যদের আদেশ দিলো হাত-কড়া পরিয়ে তাকে বাইরের গাড়িতে তুলে দিতে। তার সব জিনিসপত্র এবং টাকাকড়ি কেড়ে নিয়ে তাকে পার্শ্ববর্তী শহরের জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তার চরিত্র সম্পর্কে ভ্লাদিমিরে তদন্ত করা হলো। সেখানকার সব অধিবাসী ও ব্যবসায়ীরা একবাক্যে বলল যে, যদিও ছোটবেলায় সে মদ খেত ও গোলমাল করত, তবু তার মতো ভাল লোক হয় না।

বিচার আরম্ভ হলো, এবং শেষ পর্যন্ত খুন ও কুড়ি হাজার রুবল চুরির অপরাধে তার শাস্তি হয়ে গেল।

তার স্ত্রী শোকে ভেঙে পড়ল। কি যে করবে ভেবে পেল না। ছেলেমেয়েরা সব ছোট, বাচ্চাটা তো একেবারে কোলে। যে শহরে তার স্বামীকে বন্দী করে রেখেছে, সবাইকে নিয়ে সে সেখানে গেল। প্রথমে তো তাকে ঢুকতেই দিলো না। শেষে কারা কর্তৃপক্ষকে অনেক অনুনয়-বিনয় করায় তারা তাকে তার স্বামীর কাছে নিয়ে গেল। একদল চোরের সঙ্গে স্বামীকে কয়েদীর পোশাকে হাতে-পায়ে শেকল বাঁধা অবস্থায় দেখে বেচারী মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল! কিছুক্ষণ পরে ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্বামীর পাশে বসে বাড়ির সব কথা বলল, আর স্বামীর কথাও সব জিজ্ঞাসা করল। সেও তাকে সব কথা খুলে বলল।

স্ত্রী বলল, "তাহলে কি হবে?"

"আমরা জারের কাছে দরখাস্ত করব। একটা নিরপরাধ লোককে তারা মেরে ফেলতে পারে না।"

স্ত্রী বলল, "জারেব বরাবর দরখাস্ত সে পাঠিয়েছিল, কিন্তু সেটা তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়নি।"

আকসিয়নভ কিছুই বলল না। মাটির দিকে চোখ রেখে বসে রইল। স্ত্রী বলল, "তাহলে দেখো, আমি যে দেখেছিলাম তোমার সব চুল সাদা হয়ে গেছে সেটা বাজে কথা নয়। চেয়ে দেখো, দুঃখে তোমার চুল এরই মধ্যে সাদা হতে আরম্ভ করেছে। তোমার যাওয়া উচিত হয়নি।"

তার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দিতে দিতে স্ত্রী বলল, "ভানিযা, প্রিয়তম, তোমার স্ত্রীকে সত্যি কথা বলো। এ কাজ কি তুমি করোনি?"

"তুমিও সন্দেহ করছ?" দু'হাতে মুখ ঢেকে সে কেঁদে উঠল।

রক্ষী এসে বলল, এবার তাদের যেতে হবে। আকসিয়নভ শেষবারের মতো তার পরিবারকে বিদায় দিলো।

স্ত্রী চলে গেলে আকসিয়নভ সব কথা ভাবতে লাগল। যখন তার মনে পড়ল স্ত্রীও যখন তাকে সন্দেহ করেছে এবং সে বণিককে খুন করেছে কিনা এ প্রশ্নও করেছে, তখন সে আপন মনে বলে উঠল :

"স্পষ্টত একমাত্র ঈশ্বরই প্রকৃত সত্যকে জানেন। একমাত্র ঈশ্বরের দিকে চেয়ে তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা পাবার জন্যই অপেক্ষা করা উচিত।"

সেই মুহূর্ত থেকে সে দরখাস্ত পাঠানো বন্ধ করে দিলো, আশা করা ছেড়ে দিলো, এবং একমাত্র ঈশ্বরের কাছেই প্রার্থনা করতে লাগল।

তার শাস্তি হলো চাবুকের ঘা আর কঠোর পরিশ্রম। তাকে চাবুক মারা হলো। চাবুকের ঘা শুকিয়ে গেলে অন্য কয়েদীদের সঙ্গে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো সাইবেরিয়ায়।

সাইবেরিয়ায় সে ছাব্বিশ বছর কারাদণ্ড ভোগ কবল। মাথার চুল বরফের মতো সাদা হয়ে গেল। মুখের দাড়িও লম্বা, পাতলা ও সাদা হয়ে গেল। কোথায় গেল তার হাসিখুশি ভাব। শরীর কুঁজো হয়ে গেল, চুপচাপ চলাফেরা করে, কম কথা বলে, হাসে না, শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে।

জেলে থাকতে আকসিয়নভ জুতো তৈরি করতে শিখল। সেই উপার্জনের পয়সা দিয়ে 'সাধু-সন্তদের জীবনী' কিনল এবং জেলখানার মধ্যে যখনই আলো আসত সেই আলোয় বইখানি পড়ত। ছুটির দিনে সে কারাগারের গির্জায় গিয়ে 'সুসমাচার' পড়ত আর সমবেত সঙ্গীতে যোগ দিত।

বিনয়-নম্র ব্যবহারের জন্য কারাগারের কর্মচারীরা আকসিয়নভকে পছন্দ করত। কয়েদীরা তাকে সম্মান কবত, কেউ ডাকত 'ঠাকুর্দা', কেউ ডাকত 'সাধুবাবা'। কারা-

ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনও দরখাস্ত পাঠাবার দরকার হলে কয়েদীরা আকসিয়নভকেই পাঠাত কর্মচারীর কাছে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হলে তার কাছেই যেত বিচারের জন্য।

আকসিয়নভের বাড়ি থেকে কেউ তাকে চিঠিপত্র লিখত না। সে জানতও না তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা বেঁচে আছে কি না।

একদিন কারাগারে কয়েকটি নতুন কয়েদী আমদানী করা হলো। সন্ধ্যাবেলায় পুরোনো কয়েদীরা নতুনদের ঘিরে বসল এবং তারা কোন্ শহর বা গ্রাম থেকে এসেছে, কেন তাদের নির্বাসন হয়েছে, এমনি সব প্রশ্ন করতে লাগল। নতুন কয়েদীদের কাছেই একটা উঁচু লম্বা বাংকে বসে আকসিয়নভ বিষণ্ণ মনে তাদের কথাবার্তা শুনছিল।

নতুন কয়েদীদের মধ্যে একজন ছিল বেশ লম্বা দশাসই চেহারার বৃদ্ধ। বয়স প্রায় ষাট। ছাঁটা পাকা দাড়ি। সে তার গ্রেপ্তারের গল্প বলছিল।

"দেখো ভাইসব, অকারণেই আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। সরাইখানার চত্বর থেকে একজন ডাকহরকরার স্লেজ-গাড়ির একটা ঘোড়া শুধু আমি নিয়েছিলাম। আমি ওটা চুরি করেছি এই বলে ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করল। অবশ্য আমি ওদের বলেছিলাম যে তাড়াতাড়ি গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার জন্য আমি ঘোড়াটা নিয়েছিলাম, কাজ হয়ে গেলেই ফিরিয়ে দিতাম। তবু তারা বলল, না, তুমি ওটা চুরি করেছিলে, তবু তো তারা জানতাও না কোথা থেকে কেমন করে আমি চুরি করেছিলাম। অবশ্য এমন কাজ আমি এর আগে করেছি যার জন্য অনেক আগেই আমার এখানে আসা উচিত ছিল; কিন্তু তখন তারা আমাকে ধরতেই পারেনি।"

একজন কয়েদী জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কোত্থেকে আসছ?"

"ভ্লাদিমির থেকে। স্থানীয় ব্যবসাদার আমরা। আমার নাম মাকার, উপাধি সেমেনোভিচ।"

আকসিয়নভ মাথা তুলে প্রশ্ন করল, "সেমেনোভিচ, ভ্লাদিমিরের আকসিয়নভ বণিকদের কোনও খবর জানো? তারা কি বেঁচে আছে?"

"তাদের কথা কে না জানে। তারা তো মস্ত ধনী লোক, যদিও তাদের বাবা আছে সাইবেরিয়ায়। নিশ্চয় সেও আমাদেরই মতো একজন পাপী। আর তুমি দাদু, তুমি এখানে কি জন্যে এসেছ?"

নিজের দুর্ভাগ্যের কথা আলোচনা করতে ইচ্ছা করছিল না আকসিয়নভের। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, "আমার পাপের জন্য এই ছাব্বিশটা বছর আমি কঠোর পরিশ্রমে কাটিয়েছি।"

মাকার সেমেনোভিচ জিজ্ঞাসা করল, "কি পাপ?"

"এই শাস্তির উপযুক্ত পাপ।" এর বেশি কিছু বলতে চাইল না। অন্য কয়েদীরা নতুনদের কাছে সব খুলে বলল। বলল, "ও একজন জনৈক ব্যবসায়ীকে খুন করে

ছুরিটা আকসিয়নভের থলেয় রেখে দিয়েছিল, আর সেইজন্যই আকসিয়নভকে ভুল করে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।"

এই কথা শুনে মাকার বড় বড় চোখ করে আকসিয়নভের দিকে তাকিয়ে দুই হাতে হাঁটু বাজাতে বাজাতে বলে উঠল, "আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! তুমি কত বুড়ো হয়ে গেছ দাদু!"

সকলে যখন জিজ্ঞাসা করল এতে সে এতটা বিস্মিত হলো কেন, আকসিয়নভকে এর আগে সে কোথায় দেখেছে, তখন কিন্তু সে কোনও জবাব দিলো না। শুধু বলল, "ভাইসব, মানুষের সঙ্গে কখন যে কি ভাবে দেখা হয়! সবই দৈবের ব্যাপার!"

কথাগুলো শুনে আকসিয়নভের তৎক্ষণাৎ মনে হলো এ লোকটা হয়ত আসল খুনী কে তা জানে। তাই সে বলল, "আচ্ছা সেমেনোভিচ, ঘটনাটা কি তুমি এর আগে শুনেছ, বা আমাকে কখনও দেখেছ?"

"আগে কখনও শুনেছি কি না? আরে বাপ্‌রে, এ কথা তো তখন জগৎময় রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল। তবে সে তো অনেক কাল আগেকার কথা, কথা শুনলেও এখন অনেক কথাই ভুলে গেছি।"

আকসিয়নভ তবু প্রশ্ন করল, "সেই বণিককে সত্যি কে খুন করেছিল সে কথা কি কখনও শুনেছ?"

মাকার সহাস্যে বলল, "যার থলের মধ্যে ছুরিটা পাওয়া গিয়েছিল নিশ্চয়ই সেই খুন করেছিল। কেউ যদি ছুরিটা তোমার ঘাড়ে চাপিয়েও থাকে তাহলে অন্তত ডাকাতির দায়ে তোমাকে গ্রেপ্তার করা হতো না। তাছাড়া, ছুরিটা তোমার ঘাড়ে চাপাতে হলে তো খুনীকে তোমার বিছানার পাশে গিয়েও দাঁড়াতে হতো, কেমন কি না? আর সে ক্ষেত্রে তুমি নিশ্চয়ই তার শব্দ শুনতে পেতে?"

মাকারের কথা শোনামাত্রই আকসিয়নভের সন্দেহ হলো, মাকারই আসল খুনী। সে তখনই উঠে সেখান থেকে চলে গেল।

সারারাত সে ঘুমতে পারল না। অস্থিরতা তাকে পেয়ে ধরল। অতীতের সব ছবি তার মনের সামনে ভেসে উঠল। প্রথমে ভেসে উঠল তার স্ত্রীর ছবি—ঠিক যেমনটি সে দেখেছিল মেলায় যাবার আগে বিদায় নেবার সময়। সে যেন জীবন্ত হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল—সেই চোখ, সেই মুখ, তার হাসি ও কথা যেন কানে বাজতে লাগল। তারপর দেখতে পেল ছেলেমেয়েদের; ঠিক যেমনটি তখন তারা ছিল—ছোট ছোট শিশু সব, একজনের গায়ে ছোট ফারকোট, একেবারে ছোটটা মায়ের দুধ খাচ্ছে। তারপর দেখতে পেল নিজের ছবি—যুবক, উৎসাহে ভরা। মনে পড়ল যে সরাইখানায় সে গ্রেপ্তার হয়েছিল তার বারান্দায় বসে তার সেই গীটার বাজানো। কী রকম হাসিখুশি ছিল সে তখন। তারপর সেই জায়গার কথা মনে পড়ল যেখানে তাকে চাবুক মারা হয়েছিল—সেই চাবুকওয়ালা, সমবেত জনতা, শৃঙ্খল, অন্য সব কয়েদী, জেলখানার ছাব্বিশ বছরের জীবন, বার্ধক্য—সব। নৈরাশ্যের আঘাত তাকে এমন করে ধাক্কা দিলো যে সে নিজেকেই মেরে ফেলতে উদ্যত হলো।

মনে মনে বলল, এ সবের জন্য দায়ী ওই শয়তানটা। বস্তুত সেই মুহূর্তে মাকার সেমেনোভিচের উপর তার এত ক্রোধ জেগেছিল যে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জন্মের মতো সব শোধ নিতে পারত।

সারা রাত সে প্রার্থনা করল, তবু মন শান্ত হলো না। পরদিন সে একবারও মাকারের কাছে গেল না, তার দিকে তাকালও না। আরও দু' সপ্তাহ পার হয়ে গেল। রাতে আকসিয়নভ ঘুমুতে পারে না। অস্থিরতা তাকে এমনভাবে পেয়ে বসল যে সে যে কি করবে তাই বুঝে উঠতে পারে না।

একদিন রাত্রে সে যখন জেলখানার ব্যারাকের পাশ দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিল তখন দেখতে পেল, কয়েদীদের ব্যবহৃত লম্বা বাংকগুলোর একটার নিচে থেকে খানিকটা ধুলো-বালি ছিটকে পড়ছে। সে দাঁড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ বাংকের নিচ থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল মাকার সেমেনোভিচ। ভীত চোখে তাকাল আকসিয়নভের দিকে।

পাছে তার দিকে তাকাতে হয় তাই আকসিয়নভ যাবার জন্য পা বাড়াল। কিন্তু মাকার তার হাতটা ধরে ফেলে বলল, দেয়ালের নিচে একটা পথ খুঁড়েছে। রোজ সে খোঁড়া মাটিটা জুতোর ভিতরে করে বাইরে নিয়ে যায় এবং কাজে যাবার সময় সেগুলো পথের মধ্যে ফেলে আসে।

সে আরও বলল, "এ কথা কাউকে বলো না। তোমাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। কিন্তু যদি বলে দাও, বুঝতেই তো পারছ তাহলে তোমাকে খুন না করে আমি ছাড়ব না।"

শয়তানটার দিকে চেয়ে আকসিয়নভের সারা শরীর রাগে কাঁপতে লাগল। এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "এখান থেকে পালিয়ে আমার কোনও লাভ নেই, আর তুমিও আমাকে আবার খুন করতে পারবে না। সে তো তুমি অনেক আগেই করেছ। আর, খবরটা জানাব কি না সেটা নির্ভর করে ঈশ্বরের নির্দেশের উপর।"

পরদিন, কয়েদীদের যখন কাজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন সৈনিকদের নজরে পড়ল যে মাকার সেমেনোভিচ রাস্তার উপর মাটি ছড়াচ্ছে। ফলে জেলখানা সার্চ করা হলো। এবং একটা গর্ত আবিষ্কার করা হলো।

গভর্নর এলেন। একে একে সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে গর্ত খুঁড়েছে? সকলেই অস্বীকার করল। যারা জানত তারা মাকারের নাম বলল না, কারণ সকলেই জানত এ-হেন অপরাধের জন্য মাকারকে চাবকে আধমরা করে ফেলা হবে।

গভর্নর তখন আকসিয়নভের দিকে তাকালেন। তিনি জানতেন আকসিয়নভ সত্যবাদী। তাই বললেন, "বুড়ো, যারা সত্য কথা বলে তুমি তাদের একজন। ঈশ্বর সাক্ষী করে আমাকে বলো এ কাজ কে করেছে।"

মাকার পাশেই দাঁড়িয়েছিল; তাকে দেখে মনে হবে সে যেন কিছুই জানে না। তার দুটো চোখ গভর্নরের দিকে, আকসিয়নভের দিকে সে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

আকসিযনভেব ঠোঁট এবং হাত কাঁপছে। অনেকক্ষণ সে কোনও কথাই বলতে পাবল না। মনে মনে ভাবল যে আমাব জীবনটা নষ্ট কবেছে, আমি কেন তাকে বক্ষা কবব, তাকে ক্ষমা কবব? আমাব যন্ত্রণাব দাম সে দিক। কিন্তু যদি আমি বলে দিই, তাবা ওকে চাবুক মাববে। তাছাড়া আমাব সন্দেহ যদি ভুল হয? যাই হোক না কেন, আমাব দুঃখ এতে কমবে কি?"

গভর্নব আবাব বললেন, "সত্য কথা বলো বুড়ো। কে গর্ত খুঁড়েছে?"

আকসিযনভ এক মুহূর্ত মাকাবেব দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো, "হুজুব, আমি বলতে পাবব না। ঈশ্বব আমাকে সে নির্দেশ দিচ্ছেন না, কাজেই আমি বলব না। আপনাব যা খুশি করুন। আমি আপনাব অধীন।"

গভর্নব অনেক ভয দেখালেন, কিন্তু আকসিযনভ আব কিছুই বলল না। কাজেই গর্ত কে খুঁড়েছে তাও বাব কবা গেল না।

সেদিন বাতে আকসিযনভেব চোখে সবে ঘুম এসেছে, এমন সময শব্দ শুনে সে বুঝতে পাবল কেউ যেন এসে বাংকেব উপবে তাব পাযেব কাছে বসল। অন্ধকাবেও সে মাকাবকে চিনতে পাবল বলল, "আমাব কাছে তুমি কি চাও? ওখানে বসেছ কেন?

মাকাব জবাব দিলো না। আকসিযনভ একটু উঠে আবাব বলল, "কি চাও তুমি? এখান থেকে চলে যাও নইলে সৈন্যদেব ডাকব।"

মাকাব একটু ঝুঁকে পড়ে চুপি চুপি বলল, "আইভান, আমাকে ক্ষমা কবো।"

"কিসেব ক্ষমা?" আকসিযনভ প্রশ্ন কবল।

"আমিই সেই বণিককে খুন কবে ছুবিটা তোমাব ঝোলায বেখে দিযেছিলাম। তোমাকেও খুন কবতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বাইবে একটা আওযাজ হওযায ছুবিটা তোমাব থলেতে ঢুকিয়ে দিযে জানালা দিযে পালিযে যাই।"

আকসিযনভ কোনও কথা বলল না। কি বলবে তাব জানা নেই। মাকাব বাংক থেকে নেমে মেঝেতে মাথা ঠুকে বলল, "আইভান আমাকে ক্ষমা কবো ক্ষমা কবো। আমি স্বীকাব কবব যে আমি সেই বণিককে খুন কবেছি। তাহলেই ওবা তোমাকে ক্ষমা কববে। তুমি বাড়িতে যেতে পাববে।'

আকসিযনভ বলল, "তোমাব পক্ষে এ কথা বলা সোজা, কিন্তু আমাব যা ভোগ তা তো ভুগেছি। তাছাড়া কোথায আমি যাব আজ? আমাব স্ত্রী মাবা গেছে, ছেলেমেযেবা আমাকে ভুলে গেছে। আমাব যাবাব কোনও জাযগা নেই।"

মাকাব সেমেনোভিচ তবু উঠল না। মেঝেতে মাথা ঠুকে বলতে লাগল "আইভান, আইভান, ক্ষমা কবো। ওদেব চাবুকেব ঘা আমাব যত না লেগেছে তাব চেয়ে বেশি লাগছে এখন তোমাব দৃষ্টি। এখনও আমাব প্রতি তোমাব করুণা আছে, তবু তুমি বলনি—এ কথা ভাবলে খৃস্টেব দোহাই, আমাকে ক্ষমা কবো, এই হতভাগাকে ক্ষমা কবো।"

কথা বলতে বলতে সে কেঁদে ফেলল। তাকে কাঁদতে দেখে আকসিয়নভও কাঁদতে কাঁদতে বলল, "ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করুন! কে জানে হয়ত আমি তোমার চেয়েও শতগুণ খারাপ!"

তখন অকস্মাৎ তার অন্তর শান্ত হলো। বাড়ির মায়া কেটে গেল! কারাগার ছেড়ে যাবার ইচ্ছাও আর রইল না। শুধু রইল শেষের দিনের ভাবনা।

আকসিয়নভ যাই বলুক, মাকার সেমেনোভিচ তার দোষ স্বীকার করল। তবু যখন আকসিয়নভের বাড়ি ফিরে যাবার সরকারী হুকুম এল. সে আর তখন ইহজগতে নেই।

১৮৭২

ককেসাস-এর বন্দী

A Prisoner in the Caucasus

১

ঝিলিন নামক একজন অফিসার ককেসাস-এ সেনাবাহিনীতে কাজ করত।

একদিন সে বাড়ি থেকে চিঠি পেল। চিঠিটা তার মায়ের; মা লিখেছে : "আমি বুড়ি হয়ে যাচ্ছি, মরবার আগে আমার আদরের ছেলেকে আর একবার দেখে যেতে চাই। বাড়ি এসে আমাকে বিদায় জানাও ও কবর দাও; তারপর ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে আমার আশীর্বাদ নিয়ে আবার চাকরিতে ফিরে যেয়ো। কিন্তু আমি তোমার জন্য একটি মেয়ে দেখেছি; মেয়েটি বুদ্ধিমতী, সৎ এবং তার কিছু সম্পত্তিও আছে। তাকে যদি তোমার ভাল লাগে তাহলে তাকে বিয়ে করে বাড়িতে থেকে যেতেও পারো।"

ঝিলিন বিষয়টা ভেবে দেখল। সত্যি, বৃদ্ধা মহিলাটির স্বাস্থ্য খুবই তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যাচ্ছে; হয় তো তাকে জীবিত দেখবার আর একটা সুযোগ সে নাও পেতে পারে। তার যাওয়াই ভাল; আর মেয়েটি যদি সত্যি ভাল হয় তাহলে তাকে বিয়ে করতেই বা আপত্তি কি?

কাজেই সে কর্নেলের কাছে গেল, ছুটির ব্যবস্থা করল, সহকর্মীদের কাছ থেকে বিদায় নিল, বিদায়-ভোজ হিসাবে সৈনিকদের চার বাল্‌তি ভদ্‌কা খাওয়াল এবং যাত্রার জন্য তৈরি হলো।

ককেসাস-এ তখন যুদ্ধ চলেছে। দিনে বা রাতে রাস্তাঘাট কোনও সময়ই নিরাপদ নয়। কোনও রুশ যদি কখনও ঘোড়ায় চড়ে বা পায়ে হেঁটে দুর্গ ছেড়ে বেশ কিছুটা দূরে চলে যায় তাহলে তাতাররা তাকে হয় মেরে ফেলে নয়ত পাহাড়ের ভিতরে নিয়ে

যায়। তাই ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাত্রীদের এক জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় পৌঁছে দেবার জন্য প্রতি সপ্তাহে একদল সৈনিক এক দুর্গ থেকে পরবর্তী দুর্গ পর্যন্ত দল বেঁধে যাবে।

তখন গ্রীষ্মকাল। সকাল হতেই একটা মাল-গাড়ি দুর্গের কাছে হাজির হলো; সৈনিকরা দল বেঁধে বেরিয়ে এল; সকলে যাত্রা শুরু করল। ঝিলিন একটা ঘোড়ায় চাপল; তার মালপত্র নিয়ে একটা গাড়ি মাল-গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে চলল। তাদের ষোল মাইল পথ যেতে হবে। মাল-গাড়িটা ধীর গতিতে চলেছে; সৈনিকরা মাঝে মাঝে থামছে; হয় কোনও গাড়ির একটা চাকা খুলে গেল, নয়ত একটা ঘোড়া চলতে চাইছে না; তখন সকলকেই অপেক্ষা করতে হয়।

সূর্য দেখে বোঝা গেল তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে; কিন্তু তখনও তারা অর্ধেক পথও পার হতে পারেনি। পথটা ধুলোয় ভরা ও গরম, সূর্য থেকে আগুন ঝরছে, কোথাও কোনও আশ্রয়ও নেই; চারদিকে ধূ-ধূ প্রান্তর—রাস্তার ধারে একটা গাছ নেই, একটা ঝোপ নেই।

ঝিলিন আগে আগে ঘোড়া চালিয়ে যাচ্ছে; মাল-গাড়িটা এসে পৌঁছবার জন্য সে একটু থামল। তখন পিছন থেকে একটা শিঙা-ধ্বনির সংকেত সে শুনতে পেল; তাদের দলটা আবার থেমেছে। তাই সে ভাবতে লাগল; "আমি একাই ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাই না? আমার ঘোড়াটা ভাল; তাতাররা যদি আক্রমণ করেই আমি জোর কদমে চলে যেতে পারব। না কি অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ?"

বসে বসে এই সব ভাবছে এমন সময় কস্তিলিন নামক একজন বন্দুকধারী অফিসার ঘোড়ায় চড়ে সেখানে হাজির হলো। বলল

"চলে এস ঝিলিন, আমরা দু'জনেই চলে যাই। অবস্থা ভয়ঙ্কর, একে খাবার নেই, তায় ভীষণ গরম। আমার শার্টটা ভিজে জব্-জব্ করছে।"

কস্তিলিন মজবুত, ভারী গড়নের মানুষ; তার লাল মুখ বেয়ে ঘাম ঝরে পড়ছে; ঝিলিন একটু ভেবে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার বন্দুকে গুলি ভরা আছে তো?"

"হ্যাঁ, তা আছে।"

"তাহলে চলো, কিন্তু একটা শর্ত, দু'জন একসঙ্গে থাকব।"

তখন তারা প্রান্তরের ভিতরকার পথ ধরে এগিয়ে চলল। দু'জনে কথা বলছে, আর দু'দিকেই নজর রাখছে। চারদিকেই অনেক দূর পর্যন্ত নজরে আসছে। কিন্তু সমতল প্রান্তরটা পার হবার পরে রাস্তাটা দুটো পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটা উপত্যকার ভিতর দিয়ে চলে গেছে। ঝিলিন বলল . "চলো, ওই পাহাড়ের উপরে উঠে চারদিকটা একবার দেখে নিই, নইলে আমরা বুঝবার আগেই তাতাররা হয়ত আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।"

কিন্তু কস্তিলিন জবাব দিলো : "তার কি দরকার? এগিয়ে চলো।"

ঝিলিন অবশ্য একমত হলো না।

সে বলল, "না; ইচ্ছা হলে তুমি এখানে অপেক্ষা করো, আমি গিয়ে চারদিকটা দেখে আসি।" ঘোড়ার মুখ বাঁ দিকে ঘুরিয়ে সে পাহাড়ে উঠে গেল। ঝিলিন-এর ঘোড়াটা ছিল শিকারী জাতের; যেন দুটো পাখায় উড়ে সেটা পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে লাগল (একটা দলের ভিতর থেকে বেছে বাচ্চা বয়সেই সে ওটাকে একশ' রুবল দিয়ে কিনেছিল, আর নিজেই সেটার উপরে প্রথম সওয়ার হয়েছিল)। পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছামাত্রই সে দেখতে পেল তার থেকে একশ' গজ দূরেই প্রায় জনা ত্রিশেক তাতার দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দেখেই সে ঘুরে দাঁড়াল, কিন্তু ততক্ষণে তাতারবাও তাকে দেখতে পেয়ে বন্দুক উঁচিয়ে জোর কদমে তাকে লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করল। ঘোড়াব পা যতটা জোর ছুটতে পাবে ততখানি জোব কদমে নিচে নামতে নামতে ঝিলিন চেঁচিযে কস্তিলিনকে বলল : "তোমার বন্দুকটা বাগিয়ে ধর!"

আর মনে মনে ঘোড়াকে বলল : "এ বিপদ থেকে উদ্ধার করো বাপধন; যেন হোঁচট খেয়ো না, কারণ তাহলেই দফা রফা হয়ে যাবে। একবার যদি বন্দুকেব কাছে পৌঁছতে পারি, তাহলে আর আমাকে বন্দী করতে পাববে না।"

কস্তিলিন কিন্তু অপেক্ষা না করে তাতাবদের দেখামাত্রই সবেগে দুর্গের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো, কখনও এ-পাশে কখনও ও-পাশে ঘোড়াটাকে চাবুক মাবতে লাগল; ধুলোব ঝড়ে ঘোড়ার লেজটা ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না।

ঝিলিন বুঝল, অবস্থা সঙ্গীণ; বন্দুকটাও গেল, এখন শুধু তলোযাব নিয়ে সে কি করবে? পালাবাব জন্য সে আশ্রয়ের দিক লক্ষ্য করে ঘোড়ার মুখ ফেরাল। কিন্তু ছ'জন তাতাব তাকে বাধা দিতে ছুটে আসছে। তার ঘোড়াটা ভাল, কিন্তু তাদের ঘোড়াগুলো আবও ভাল; তাছাড়া তারা আসছে আড়াআড়িভাবে। ঘোড়ার লাগাম টেনে সে অন্য দিকে চালাবাব চেষ্টা করল, কিন্তু ঘোড়াটা এত দ্রুত ছুটছে যে তাকে থামানো গেল না; তীব্র গতিতে সে তাতারদের দিকেই ছুটে চলল। সে দেখতে পেল, একটা ধূসর রঙের ঘোড়ায় লাল-দাড়িওলা একজন তাতার বন্দুক উঁচিয়ে দাঁত বের করে হৈ-হৈ করতে করতে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

ঝিলিন ভাবল, "হায় তোমাদের আমি চিনি, তোমরা শয়তান। আমাকে জীবন্ত ধরতে পারলে গর্তের মধ্যে ফেলে চাবুক মারবে। বেঁচে থাকতে আমি ধরা দেব না।"

চেহারা জবরদস্ত না হলেও ঝিলিন সাহসী। তলোয়ার উচিযে সে লাল-দাড়ি তাতারটার দিকে ছুটে গেল। মনে মনে বলল : "হয় তাকে ঘোড়ায় চাঁপা দেব, নয়ত তলোয়ারের আঘাতে অকেজো করে দেব।"

সে যখন লোকটা থেকে ঘোড়ার দূরত্বে তখন পিছন থেকে একটা গুলি এসে তার ঘোড়াব গায়ে লাগল। ঘোড়াটা ধপাস করে মাটিতে পড়ল, আর সেও ছিটকে পড়ে গেল। সে উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু দুর্গন্ধ তাতারগুলো ততক্ষণ তার উপব চেপে বসে তাকে পিছ-মোড়া করে বাধার চেষ্টা করছে। অনেক চেষ্টায় তাদের ঠেলে ফেলে দিতেই আরও তিনজন তাতার ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে বন্দুকের কুঁদো

দিয়ে তার মাথায় ঘা দিতে লাগল। তার চোখের দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়ে এল, সে মাটিতে পড়ে গেল। তাতাররা তাকে পাকড়াও করে জিন থেকে কিছু বাড়তি দড়ি নিয়ে তার হাত দুটো পিছনে নিয়ে তাতার-গিঁট দিয়ে ভাল করে বেঁধে ফেলল। তার মাথার টুপিটা উড়িয়ে দিলো, বুটজোড়া খুলে নিল, সারা দেহে তল্লাশি চালাল, জামা কাপড় ছিঁড়ে দিলো এবং তার টাকা ও ঘড়িটা হাতিয়ে নিল।

ঝিলিন মুখ খুবিয়ে ঘোড়াটার দিকে তাকাল। বেচারি ঠিক যে ভাবে পড়েছিল তেমনি একপাশে পড়ে আছে; পা দুটো উপরের দিকে তোলা; বৃথাই উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। মাথার ভিতরে একটা ফুটো হয়ে গেছে; সেখান থেকে কালো রক্ত বেরুচ্ছে; চারদিকের দু' ফুট জায়গার ধুলো রক্তে কাদা হয়ে গেছে।

একজন তাতার ঘোড়াটার কাছে গিয়ে জিনটা খুলে নিল; ঘোড়াটা তখনও পা ছুঁড়ছে দেখে একটা ছোরা বের করে তার শ্বাসনলিটা কেটে দিল। তার গলার ভিতর থেকে একটা শিসের মতো শব্দ বের হয়ে এল; একটা লাফ দিলো, তারপর সব শেষ।

তাতাররা জিন ও সাজ-সরঞ্জামগুলো নিয়ে নিল। লাল-দাড়ি তাতারটা ঘোড়ায় চাপলে অন্যরা ঝিলিনকে তার জিনের পিছনে তুলে দিলো। যাতে সে পড়ে না যায় সেজন্য তারা তাতারটির কোমরের সঙ্গে তাকে বেঁধে দিলো। তারপর সকলেই পাহাড়ের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

কাজেই সেইখানে বসে ঝিলিন এ-পাশে ও-পাশে দুলতে লাগল; তার মাথাটা তাতারটির দুর্গন্ধ পিঠের সঙ্গে ঠোক্কর খাচ্ছে। তার পেশীবহুল পিঠ ও গলা এবং পরিষ্কার-কামানো গর্দান ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না। ঝিলিন-এর মাথায় আঘাত লেগেছে; চোখের উপর রক্ত জমাট বেধে আছে; কিন্তু সে নিজে সরতে-নড়তেও পারছে না, রক্তটাও মুছে ফেলতে পারছে না। বাহু দুটো এত শক্ত করে বেঁধেছে যে তার কণ্ঠাস্থি ব্যথা করছে।

দীর্ঘ পথ তারা পাহাড় বেয়ে ওঠা-নামা করল। পথে একটা নদী পড়ায় সেটাকে পার হয়ে তারা উপত্যকার ভিতর দিয়ে একটা পথে এসে পড়ল।

তারা কোন্ দিকে যাচ্ছে ঝিলিন দেখতে চেষ্টা করল; কিন্তু রক্তে তার চোখের পাতা জুড়ে আছে, কাজেই সে চোখ খুলতে পারল না।

গোধূলি নেমে এল; আর একটা নদী পার হয়ে তারা একটা পাথুরে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল। এখানে ধোঁয়ার গন্ধ নাকে এল; কুকুরগুলো ডাকছে। তারা একটা আউল-এ (তাতার গ্রাম) পৌঁচেছে। তাতাররা ঘোড়া থেকে নামল; তাতার ছেলেমেয়েরা এসে ঝিলিনকে ঘিরে দাঁড়াল, খুশিতে হল্লা করতে করতে তারা তাকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে লাগল।

তাতারটি ছেলেমেয়েদের তাড়িয়ে দিলো, ঝিলিনকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে চাকরকে ডাকল। একটি নোগা (তাতার উপজাতি) সাড়া দিলো। তার হনুর হাড় উঁচু, পরনে একটি মাত্র শার্ট (তাও এত ছেঁড়া যে সারা বুকটাই খোলা)। তাতার কি যেন

হুকুম করল। সে গিয়ে পা-বেড়ি নিয়ে এল; লোহাব আংটা লাগানো দুটো ওক কাঠের টুকরো; একটা আংটার সঙ্গে তালা লাগানো।

তারা ঝিলিন-এর হাতের বাঁধন খুলে দিলো, পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিলো, তারপর টানতে টানতে একটা গোলাঘরের কাছে নিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলো।

ঝিলিন গিয়ে পড়ল একগাদা সাবের মধ্যে। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর হাতড়ে হাতড়ে একটা নবম জায়গা খুঁজে নিয়ে বসে পড়ল।

২

সারারাত ঝিলিন একটুও ঘুমুতে পারল না। বছরের এই সময়টাতেই রাত খুব ছোট হয়। একসময় দেওয়ালের ফোকড় দিয়ে দিনের আলো দেখা গেল। সে উঠল; হাত দিয়ে আঁচড়ে ফোকড়টাকে আরও একটু বড় করে বাইরে উঁকি দিলো।

ছিদ্রের ভিতব দিয়েই সে দেখতে পেল একটা রাস্তা পাহাড় বেয়ে নেমে গেছে; ডান দিকে তাতাবদের একটা কুঁড়ে ঘর, তার পাশে দুটো গাছ, চৌকাঠের কাছে একটা কালো কুকুর শুয়ে আছে, একটা ছাগল ও কতকগুলি বাচ্চা লেজ নেড়ে নেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে আরও দেখল, একটি কমবয়সী তাতার স্ত্রীলোক লম্বা, ঢিলে, ঝকঝকে রঙিন গাউন পরে আছে, তার নিচ দিয়ে ট্রাউজার ও উঁচু বুটও দেখা যাচ্ছে! মাথাব উপর একটা কোট ভাজ করে পেতে তার উপর একটা জল-ভরা বড় পেতলের কুঁজো নিয়ে যাচ্ছে। একটি ছোট নেড়া-মাথা তাতার ছেলেকে সে হাত ধরে নিয়ে চলেছে; ছেলেটার গায়ে একটা শার্ট ছাড়া আর কিছু নেই। সহজেই ভারসাম্য বজায় রেখে স্ত্রীলোকটি চলেছে, আর তার পিঠের মাংসপেশীগুলি কাঁপছে। সে জল নিয়ে কুড়ের ভিতর ঢুকবাব পরেই গতকালের সেই লাল-দাড়ি তাতারটি রেশমের পোশাক পরে বেরিয়ে এল; তার কোমরে রূপোর হাতলওয়ালা একটা ছোরা ঝুলছে, খালি পায়ে জুতো পরেছে, একটা কালো রঙের উঁচু ভেড়াব চামড়ার টুপি মাথার একেবারে পিছন দিকে পরেছে। বাইরে এসে শরীরটাকে টানটান করে সে লাল-দাড়িতে হাত বুলোতে লাগল। একটু দাঁড়িয়ে চাকরকে একটা হুকুম করে চলে গেল।

তারপব দুটো ছেলে ঘোড়াকে জল খাইয়ে চলে গেল। ঘোড়াগুলোর মুখ ভেজা। কয়েকটা নেড়া মাথা ছেলে দৌড়ে এল; পবনে ট্রাউজার নেই, গায়ে শুধু একটা শার্ট। তারা ভিড় করে গোলাঘরেব কাছে এল, একটা গাছের ডাল কুড়িয়ে নিয়ে দেওয়ালের ফোকড়ের ভিতর ঢুকিয়ে দিলো। ঝিলিন হাঁক দিতেই তারা চিৎকার করে ছুটে পালাল; তাদের ছোট ছোট খোলা হাঁটুগুলো চিকচিক করে উঠল।

ঝিলিন-এর খুব তেষ্টা পেয়েছে; গলাটা শুকিয়ে গেছে; সে ভাবল : "ওবা যদি এসে আমাকে একবার দেখেও যেত!"

তখন শুনতে পেল কে যেন গোলাঘরের তালা খুলছে। লাল-দাড়ি তাতারটি ঘরে ঢুকল; তার সঙ্গে আর একটি লোক; ছোটখাট, কালো, ঝকঝকে কালো চোখ, লাল গাল, ছোট দাড়ি। মুখটা হাসিখুশি, সব সময়ই হাসছে। এই লোকটি অপর লোকটির চাইতেও দামী পোশাক পরেছে। সোনালী পাড় বসানো নীল রেশমের ফতুয়া গায়ে, কোমরে একখানি বড় রূপোর ছোরা, রূপোলি কাজ-করা লাল মরোক্কোর চটির উপর মোটা জুতো পায়ে, ভেড়ার চামড়ার সাদা টুপি মাথায়।

লাল-দাড়ি তাতারটি ঘরে ঢুকল, বিরক্তির সঙ্গে কি যেন বলল; দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছোরাটা নাচাতে নাচাতে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নেকড়ের মতো ঝিলিনের দিকে তাকাতে লাগল। ময়লা লোকটি অনেক বেশি চটপটে, যেন স্প্রিং-এর উপর চলছে-ফিরছে; সোজা ঝিলিন-এর কাছে এসে সামনেই বসে পড়ল, ঘাড়ের উপর চাপড় মারল ও নিজের ভাষায় অনর্গলি কথা বলতে লাগল। সে দাঁত বের করল, চোখ পিটপিট করল, জিভ চুক চুক করল, আর বারবার বলতে লাগল, "ভাল রুশ! ভাল রুশ!"

ঝিলিন একটি বর্ণও বুঝতে পারল না; বলল, "জল খাব! আমাকে জল দাও!"

কালো লোকটি হেসে উঠল। "ভাল রুশ" বলেই সে নিজের ভাষায় কথা বলতে শুরু করল।

ঝিলিন ঠোঁট ও হাত দিয়ে ইশারায় জানাল যে সে জল খেতে চায়।

কালো লোকটি বুঝতে পেরে হেসে উঠল। তারপর দরজার বাইরে তাকিয়ে কাকে যেন ডাকল : "দিনা!"

একটি ছোট মেয়ে ছুটে এল। বছর তেরো বয়স, একহারা চেহারা, মুখখানি কালো তাতারটির মতো। বোঝা যাচ্ছে, লোকটির মেয়ে। তারও চোখ দুটি কালো, মুখখানি সুন্দর। ঢোলা আস্তিনের একটা লম্বা নীল গাউন পরেছে, কোনও ঘাঘরা নেই গাউনের নিচে, সামনে ও আস্তিনে লাল পাড় বসানো। পরনে ট্রাউজার ও চটি, আর চটির উপরে শক্ত উঁচু গোড়ালির জুতো। গলায় পরেছে রুশ রূপোর টাকা দিয়ে তৈরি একটা হার। মাথাটা খালি, কালো চুল ফিতে দিয়ে বাঁধা এবং সোনালী সুতো ও রূপোর মুদ্রা দিয়ে বিনুনি করা।

তার বাবা কি হুকুম করতেই সে দৌড়ে গিয়ে একটা পিতলের জগ নিয়ে এল। জগটা ঝিলিন-এর হাতে দিয়ে এমনভাবে গুঁড়ি মেরে বসল যে তার হাঁটু দুটো আর মাথাটা সমান-সমান হলো। সেইখানে বসে সে অবাক চোখে ঝিলিন-এর জল খাওয়া দেখতে লাগল; সে যেন একটা বুনো জন্তু।

ঝিলিন যখন খালি জগটা তাকে ফিরিয়ে দিলো তখন মেয়েটি হঠাৎ একটা বুনো ছাগলের মতো এমনভাবে লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল যে তার বাবাও হেসে উঠল। আরও কি যেন আনবার জন্য সে তাকে পাঠিয়ে দিলো। জগটা নিয়ে সে দৌড়ে চলে গেল এবং একটা গোল থালায় করে খানিকটা আটা নিয়ে এল। তারপর সেখানেই গুঁড়িসুড়ি মেরে বসে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল।

তারপর তাতাররা চলে গেল। দরজায় আবার তালা পড়ল।

একটু পরে নোগা এসে বলল : "আইদা, মনিব, আইদা।"

সেও রুশ ভাষা জানে না। ঝিলিন শুধু এইটুকু বুঝল যে তাকে বাইরে কোথাও যেতে বলা হচ্ছে।

ঝিলিন নোগা-কে অনুসরণ করল; কিন্তু খোঁড়াতে লাগল, কারণ পা-বেড়ির জন্য সে মোটেই পা ফেলতে পারছিল না। গোলাঘরের বাইরে এসে সে দেখতে পেল একটা তাতার গ্রাম, তাতে খানদশেক বাড়ি ও ছোট গম্বুজওয়ালা একটি তাতার মসজিদ! একটা বাড়ির সামনে তিনটে ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে; তাদের পিঠে জিন চাপানো; ছোট ছোট ছেলেরা লাগাম ধরে আছে। কালো তাতারটি সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ঝিলিনকে হাতের ইশারায় বলল তাকে অনুসরণ করতে। তারপর সে হেসে উঠল, নিজের ভাষায় কি যেন বলে ঘরে ফিরে গেল।

ঝিলিন ঘরে ঢুকল। ঘরটা ভাল; দেয়ালগুলি মাটি দিয়ে সমান করে লেপা। সামনের দেয়ালের কাছে একগাদা ঝকঝকে রঙের পালকের বিছানা পাতা রয়েছে, পাশের দেয়ালগুলিতে দামী কার্পেট ঝোলানো রয়েছে; তাতে রূপোর কাজ করা বন্দুক, পিস্তল ও তলোয়ার আটকানো রয়েছে। একটা দেয়ালের পাশে মাটির মেঝের সমতলে একটা ছোট স্টোভ রয়েছে। মেঝেটাও ধান-মড়াইয়ের উঠোনের মতো পরিষ্কার। এক কোণে অনেকটা জায়গা জুড়ে সতরঞ্চি বিছানো, তার উপর কম্বল পাতা, আর কম্বলের উপর রয়েছে লোম-ভর্তি সব আসন। এই পাঁচটি আসনে বসে আছে পাঁচটি তাতার—একজন কালো, একজন লাল-চুল ও তিনজন অতিথি। সকলেরই পায়ে ঘরের ভিতর চলবার চপ্পল, আর প্রত্যেকেরই পিছনে একটা করে তাকিয়া। তাদের সামনে গোল থালায় সাজানো রয়েছে জোয়ারের পিঠে, বাটিতে গলানো মাখন আর এক কুঁজো বুজা বা তাতার বিয়ার। তারা হাত দিয়ে পিঠে ও মাখন খেতে লাগল।

কালো লোকটি লাফ দিয়ে উঠে হুকুম করল, ঝিলিনকে একপাশে এনে বসানো হোক—কার্পেটের উপর নয়, খালি মাটিতে। তারপর নিজে কার্পেটের উপর বসে অতিথিদের জোয়ারের পিঠে ও বুজা পরিবেশন করল। চাকররা ঝিলিনকে এনে বসাল। সেও জুতো খুলে দরজার পাশে যেখানে অন্য জুতোগুলো ছিল সেখানে রেখে দিলো, সতরঞ্চির উপর মনিবদের কাছাকাছি বসল, এবং তাদের খাওয়া দেখতে দেখতে নিজের ঠোঁট চাটতে লাগল।

তাতাররা যত খুশি খেল; সেই মেয়েটির মতো লম্বা গাউন ও ট্রাউজার পরা, মাথায় রুমাল বাঁধা একটি স্ত্রীলোক এসে ভুক্তাবশিষ্ট সব কিছু নিয়ে গেল এবং একটা সুন্দর পাত্র ও একটা সরু-মুখ বদনা এনে দিলো। তাতাররা হাত ধুলো, তারপর হাত জোড় করে হাঁটু ভেঙে বসে, চারদিকে ফুঁ দিয়ে প্রার্থনা করতে লাগল। আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে একজন অতিথি ঝিলিন-এর কাছে গিয়ে রুশ ভাষায় কথা বলতে লাগল।

লাল-দাড়ি তাতারকে দেখিয়ে সে বলল, "কাজী-মহম্মদ তোমাকে গ্রেপ্তার করে এনেছে।" তারপর কালো লোকটিকে দেখিয়ে বলল, "আর কাজী-মহম্মদ তোমাকে দিয়েছে এই আব্দুল মুরাদকে। এখন আব্দুল মুরাদই তোমার মনিব।"

ঝিলিন নীরব। তখন আব্দুল মুরাদ ঝিলিনকে দেখিয়ে হাসতে হাসতে বার বার বলতে লাগল, "সৈনিক রুশ, ভাল রুশ।"

দোভাষী বলল, "সে হুকুম দিচ্ছে, তুমি বাড়িতে মুক্তি-পণ পাঠাতে লিখে দাও, টাকাটা এলেই সে তোমাকে মুক্তি দেবে।"

এক মুহূর্ত ভেবে ঝিলিন বলল, "কত মুক্তি পণ সে চাইছে?"

তাতাররা একটু আলোচনা করল. তারপর দোভাষী বলল, "তিন হাজার রুবল।"

"না," ঝিলিন বলল, "অত আমি দিতে পারব না।"

আব্দুল লাফ দিয়ে উঠে হাত-পা নেড়ে ঝিলিন-এর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল; ভাবখানা এমন যেন সে তার কথা বুঝতে পারছে। দোভাষী ভাষান্তর করে দিলো; "তুমি কত দেবে?"

ঝিলিন ভেবেচিন্তে বলল, "পাঁচ শ' রুবল।"

একথা শুনে তাতাররা সকলে মিলে হৈ-হৈ করতে লাগল। আব্দুল লাল-দাড়ি লোকটার দিকে তাকিয়ে উচ্চৈঃস্বরে এত তাড়াতাড়ি কথা বলতে লাগল যে তার মুখ থেকে থু থু ছিটকে বেরুতে লাগল। লাল-দাড়ি লোকটি শুধু চোখ কুঁচকে মুখে চুক-চুক শব্দ করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে তারা একটু ঠাণ্ডা হলে দোভাষী বলল, "পাঁচ শ' রুবলে তোমার মনিব মানছে না। তোমার জন্য সেই তো দু' শ' দিয়েছে। কাজী মহম্মদ তার কাছ থেকে কর্জ করেছিল, সেই টাকা বাবদ সে তোমাকে দিয়ে দিয়েছে। তিন হাজার রুবল। তার কমে হবে না। যদি লিখতে রাজী না হও, তোমাকে গর্তের ভিতর ফেলে চাবুক মারা হবে।"

"হুঁ!" ঝিলিন ভাবল, "ওদের যত বেশি ভয় করব ততই খারাপ হবে।"

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, "কুত্তাটাকে বলে দাও, সে যদি আমাকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করে তাহলে আমি মোটেই লিখব না, আর সেও কিছুই পাবে না। তোমাদের মতো কুত্তাদের আমি কোনও দিন ভয় করিনি, করবও না!"

দোভাষী কথাগুলি ভাষান্তর করে দিলো, তারাও আবার আলোচনা শুরু করল।

অনেক কথার কচকচানির পরে কালো লোকটি লাফ দিয়ে উঠে ঝিলিন-এর কাছে এসে বলল ঃ "সাহসী রুশ, সাহসী রুশ!" তার পর সে হেসে দোভাষীকে কি যেন বলতেই সে জানিয়ে দিলো : "এক হাজার রুবল পেলেই সে খুশি হবে।"

ঝিলিন বলল : "পাঁচ শ' রুবলের বেশি আমি দেব না। আমাকে মেরে ফেললে তুমি কিছুই পাবে না।"

তাতাররা কিছুক্ষণ কথা বলে চাকরটাকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে একবার ঝিলিন-

এব দিকে একবার দবজার দিকে তাকাতে লাগল। পায়ে বেড়ি লাগানো একটি মজবুত, খালি পা, ছেঁড়া পোশাক পরা লোককে সঙ্গে নিয়ে চাকরটা ফিরে এল।

ঝিলিন বিস্ময়ে ঢোক গিলল · লোকটি কস্তিলিন। তাহলে তাকেও ধরেছে। তাদের পাশাপাশি বসিয়ে দেওয়া হলো। তাবাও পরস্পরের কাছে ঘটনার বিবরণ দিতে লাগল। তাতাররা চুপচাপ তাদের দেখতে লাগল। ঝিলিন তার দুর্ভাগ্যের কথা বলল; কস্তিলিনও জানাল যে, তার ঘোড়াটা থেমে গিয়েছিল. তার বন্দুকের গুলি ফস্কে গিয়েছিল এবং এই আব্দুলই তাকে গ্রেপ্তার করেছিল।

আব্দুল লাফ দিয়ে উঠে কস্তিলিন-এর দিকে আঙুল বাড়িয়ে কি যেন বলল। দোভাষী ভাষান্তর করে জানিয়ে দিলো, তারা দু'জন একই মনিবেব সম্পত্তি, আব যে আগে মুক্তি-পণ এনে দেবে তাকেই সে আগে মুক্তি দেবে।

তারপর ঝিলিনকে বলল, "এই তো দেখো, তুমি রেগে যাচ্ছ, কিন্তু তোমাব এই বন্ধুটি কেমন শান্তশিষ্ট; সে বাড়িতে লিখে দিয়েছে, তারা পাঁচ হাজাব রুবল পাঠাবে। কাজেই তাকে ভাল খাওয়ানো হবে, তার সঙ্গে ভাল ব্যবহাব করা হবে।"

ঝিলিন জবাব দিলো : "আমার বন্ধু যা ইচ্ছা করতে পাবে; হয়ত সে ধনী, আমি তা নই। আমি যা বলেছি তাই হবে। ইচ্ছা কবলে আমাকে মেরে ফেলতে পাবো—তাতে তোমাদের কোনওই লাভ হবে না: কিন্তু আমি পাঁচ শ' রুবলেব বেশিব জন্য কিছুতেই লিখব না।"

তারা চুপ করে রইল। হঠাৎ আব্দুল লাফ দিয়ে উঠল, একটা ছোট বাক্স এনে তাব ভিতব থেকে কালি. কলম ও একটুকরো কাগজ বেব করে ঝিলিনকে দিলো; তাব ঘাড়ে একটা চাপড় মেরে ইশারায তাকে লিখতে বলল। সে পাঁচ শ' রুবল নিতেই রাজী।

ঝিলিন দোভাষীকে বলল. "একটু দেবি করো; ওকে বলো যে আমাদেব ভালভাবে খাওয়াতে হবে. ভাল জামাজুতো দিতে হবে এবং দু'জনকে একসঙ্গে থাকতে দিতে হবে। তাহলেই আমাদের মন ভাল থাকবে। আর আমাদেব পা থেকে এই বেড়ি খুলে ফেলতে হবে।" এই কথা বলে সে মনিবের দিকে তাকিয়ে হাসল।

মনিবও হাসল; দোভাষীর কথা শুনে বলল : "আমি তাদের সব চাইতে ভাল পোশাক দেব : এমন জোব্বা আর জুতো দেব যে একেবারে বিয়েব সাজ হয়ে যাবে। তাদের রাজপুত্তুরের মতো খাওয়াব, আর ইচ্ছা কবলে গোলাঘরে তারা একসঙ্গেই থাকতে পারবে। কিন্তু পায়েব বেড়ি খুলতে পারব না, কারণ তারা পালিয়ে যাবে। অবশ্য রাতে বেড়ি খুলে দেব।" সে লাফ দিয়ে উঠে ঝিলিন-এর কাঁধে চাপড় মারতে মারতে বলে উঠল : "তুমি ভাল, আমি ভাল!"

ঝিলিন চিঠি লিখল, কিন্তু ঠিকানাটা ভুল লিখল যাতে সেটা গন্তব্যস্থলে না পৌঁছয়; মনে মনে ভাবল : "আমি ঠিক পালিয়ে যাব!"

ঝিলিন চিঠি লিখল, কিন্তু ঠিকানাটা ভুল লিখল যাতে সেটা গন্তব্যস্থলে না পৌঁছয়; মনে মনে ভাবল : "আমি ঠিক পালিয়ে যাব।"

ঝিলিন ও কস্তিলিনকে গোলাঘরে নিয়ে যাওয়া হলো, সেখানে তাদের খানিকটা খড, এক জগ জল, কিছু রুটি, দুটো পুরনো জোব্বা ও ছেঁড়া সামরিক বুট দেওয়া হলো—জিনিসগুলি সবই মৃত রুশ সৈনিকদের দেহ থেকেই খুলে নেওয়া বলে মনে হয়। রাতের বেলা তাদের পা থেকে বেড়িগুলি খুলে দিয়ে গোলাঘরে তালা লাগিয়ে দেওয়া হলো।

৩

ঝিলিন ও তার বন্ধু এইভাবে এক মাস কাটাল। মনিব সব সময়ই হেসে হেসে বলে "তুমি আইভান ভাল। আমি আব্দুল ভাল।" কিন্তু সে তাদের খুব খারাপ খাবার দিতে লাগল কখনও দেয় শুধু জোয়ারের মোটা পিঠে, আর কখনও বা শুধুই মাখানো কাঁচা আটা।

কস্তিলিন বাড়িতে দ্বিতীয় চিঠি লিখল, টাকার জন্য অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া তার আর কিছুই করার নেই। দিনের পর দিন সে গোলাঘরে বসে ও ঘুমিয়ে কাটাতে লাগল, আর কবে তার টাকা আসবে সেই দিন গুণতে লাগল।

ঝিলিন জানে তার চিঠি কারও হাতে পৌঁছবে না, তাই সে আর কোনও চিঠি লেখেনি। সে ভাবত "আমাকে খালাস করবার মতো এত টাকা মা কোথায় পাবে? আমি যা পাঠাতাম তাতেই তার দিন কাটত। পাঁচ শ' রুবল যোগাড় করতে হলে তার সব শেষ হয়ে যাবে। ঈশ্বর সহায় হলে আমি ঠিক পালিয়ে যাব।"

কাজেই সে পালাবার মতলব ভাজতে লাগল।

সে শিস দিতে দিতে "আউল"-এ ঘুরে বেড়ায়, অথবা বসে বসে হাতের কাজ করে, কখনও মাটি দিয়ে পুতুল বানায়, কখনও বা গাছের ডাল দিয়ে ঝুড়ি বোনে, হাতের কাজে ঝিলিন খুব ওস্তাদ।

একদিন সে একটা পুতুল বানিয়ে তাতে নাক, হাত, পা বসিয়ে ও একটা তাতার গাউন পরিয়ে ছাদের উপর রেখে দিলো। তাতার মেয়েরা যখন জল নিতে এল তখন মনিবের মেয়ে দিনা পুতুলটা দেখতে পেয়ে মেয়েদের ডাকল, তারাও কুঁজো নামিয়ে সেটা দেখে হাসাহাসি করতে লাগল। ঝিলিন পুতুলটা নামিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে দিলো। তারা হাসল, কিন্তু কেউ সাহস করে এগিয়ে এল না। তখন সে পুতুলটা নামিয়ে রেখে গোলাঘরের ভিতরে চলে গেল, সেখান থেকেই দেখতে লাগল, ওরা কি করে।

দিনা দৌড়ে পুতুলটার কাছে গেল, চারদিক দেখল, তারপর সেটা তুলে নিয়ে দৌড় দিলো।

সকালে দিনের আলো ফুটলে সে বাইরে তাকাল। দিনা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পুতুলটা নিয়ে চৌকাঠের উপর বসল। পুতুলটাকে সে লাল কাপড় দিয়ে সাজিয়েছে। সেটাকে ছোট মেয়ের মতো দোলাতে দোলাতে সে একটা ঘুম পাড়ানি গান গাইতে

লাগল। একটি বুড়ি বেরিয়ে এসে তাকে বকুনি দিলো এবং পুতুলটা কেড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলল। তারপর দিনাকে তার কাজে পাঠিয়ে দিলো।

কিন্তু ঝিলিন আগের চাইতেও ভাল করে আর একটা পুতুল বানিয়ে দিনাকে দিলো। একসময় দিনা একটা ছোট কুঁজো এনে মাটির উপর রেখে দিলো। তারপর বসে বসে ঝিলিন এর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে কুঁজো দেখিয়ে হাসতে লাগল।

"ওকে এত খুশি দেখাচ্ছে কেন?" ঝিলিন অবাক হয়ে ভাবল। কুঁজোয় জল আছে ভেবে সে ওটা তুলে দিলো। জল নয়, এতে ছিল দুধ। দুধটা খেয়ে সে বলল ঃ "খুব ভাল।"

দিনা কি খুশি। "ভাল আইভান, ভাল!" বলে সে লাফিয়ে লাফিয়ে হাততালি দিতে লাগল। তারপর কুঁজোটা নিয়ে দৌড়ে চলে গেল। সেই থেকে রোজ সে লুকিয়ে কিছুটা দুধ তাকে এনে দিত।

তাতাররা ছাগলের দুধ থেকে এক ধরনের পনির তৈরি করে, শুকোবার জন্য সেগুলোকে বাড়ির ছাদে রেখে দেয়। মেয়েটি কখনও কখনও লুকিয়ে সেই পনির ঝিলিনকে এনে দেয়। একদিন আব্দুল একটা ভেড়া জবাই করলে সে আস্তিনের ভিতর লুকিয়ে খানিকটা মাংস ঝিলিনকে এনে দিলো। জিনিসগুলি ছুঁড়ে দিয়েই সে পালিয়ে গেল।

একদিন খুব ঝড় উঠল। এক ঘণ্টা ধরে তুমুল বৃষ্টি হলো। সব নদী ফুলে ফেঁপে উঠল। খাঁড়িতে সাত ফুট উঁচু জল দাঁড়িয়ে গেল, তার প্রচণ্ড স্রোতে পাথরগুলোও গড়িয়ে যেতে লাগল। সর্বত্র জলের স্রোত বইতে লাগল। পাহাড়ে গুম্-গুম্ শব্দের বিরাম নেই। ঝড় থেমে গেলে গাঁয়ের পথে জলের স্রোত বইতে লাগল। মনিবের কাছ থেকে একটা ছুরি চেয়ে নিয়ে সে একটি ছোট গোলাকার বস্তু বানাল, কাঠের টুকরো কেটে একটা চাকা তৈরি করল, আর তার দু'দিকে দুটো পুতুল বসিয়ে দিলো। ছোট ছোট মেয়েরা কিছু জিনিসপত্র এনে দিলো আর তাই দিয়ে সে পুতুল দুটোকে সাজাল একটি চাষী ও একটি চাষী-বৌয়ের মতো করে। তারপর যথাস্থানে সে দুটিকে বেঁধে দিয়ে চাকাটাকে জলে ভাসিয়ে দিলো যাতে স্রোতের টানে চাকাটা ঘুরতে থাকে। চাকাটা সত্যি ঘুরতে লাগল আর পুতুল দুটিও নাচতে শুরু করল।

সারা গ্রাম সেখানে জমায়েত হলো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, তাতার নারী-পুরুষরা সবাই এসে জিভ চুকচুক করতে লাগল।

"আহা রুশ, আহা আইভান।"

আব্দুলের একটা ভাঙা রুশ ঘড়ি ছিল। ঝিলিনকে ডেকে জিভ চাটতে চাটতে সে ঘড়িটা তাকে দেখাল।

"আমাকে দাও; আমি ওটা মেরামত করে দেব," ঝিলিন বলল।

ছুরির সাহায্যে সে ঘড়িটাকে খুলে ফেলল, অংশগুলি সাজিয়ে নিল, তারপর আবার এমনভাবে জুড়ে দিলো যে ঘড়িটা ঠিকমতো চলতে লাগল।

মনিব খুশি হয়ে তাকে একটা পুরনো শতচ্ছিন্ন জামা উপহার দিলো। ঝিলিনকে সেটা নিতেই হলো। রাতে অন্তত গায়ে তো ঢাকা দেওয়া যাবে।

এরপর ঝিলিন-এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। দূর দূর গ্রাম থেকে তাতাররা তার কাছে আসতে লাগল, মেরামতের জন্য কেউ আনল বন্দুক বা পিস্তল, কেউ বা আনল ঘড়ি। তার মনিব কিছু যন্ত্রপাতি তাকে দিলো—সাঁড়াশি, ভ্রমর, উখো।

একদিন একটি তাতার অসুস্থ হয়ে পড়ল। সকলে ঝিলিন-এর কাছে এসে বলল, "চলো, তাকে ভাল করে তোলো!" ঝিলিন চিকিৎসার কিছুই জানে না, তবু সে লোকটিকে দেখতে গেল, ভাবল, "হয় তো সে এমনিতেই ভাল হয়ে যাবে।"

গোলাঘরে ফিরে এসে কিছুটা জল আর বালি মিশিয়ে তাদের সামনেই ফিস্ ফিস করে কিছু বলে অসুস্থ লোকটিকে সেই জল খেতে দিলো। তার ভাগ্য ভাল, লোকটি সেরে উঠল।

ঝিলিন ক্রমে তাদের ভাষাও কিছু কিছু শিখে ফেলল, কিছু তাতারের সঙ্গে তার পরিচয়ও হলো। দরকার হলেই তারা তাকে ডাকত : "আইভান! আইভান!" অন্যরা অবশ্য এখনও তাকে সন্দেহের চোখেই দেখত, যেন সে একটা বুনো জন্তু।

লাল দাড়ি তাতারটা ঝিলিনকে পছন্দ করত না। তাকে দেখলেই সে ভুরু কোঁচকাত, মুখ ঘুরিয়ে নিত, গালাগালি করত। সেখানে একটি বুড়ো লোকও ছিল। সে 'আউল'-এ থাকত না, কিন্তু পাহাড়ের নিচ থেকে এখানে আসত। সে যখন মসজিদে যেত তখনই ঝিলিন তাকে দেখতে পেত। লোকটি বেঁটে, তার টুপির চারদিকে ঘুরিয়ে একটা সাদা কাপড়ের পট্টি বাঁধা। তার দাড়ি ও গোঁফ সরু করে ছাঁটা, বরফের মতো সাদা। ইটের মতো লাল মুখটা বলিরেখায় ভরা। নাকটা বাজপাখির মতো বাঁকা, ধূসর চোখ দুটো নিষ্ঠুরতায় ভরা, দুটো গজদন্ত ছাড়া আর কোনও দাঁত নেই। পাগড়িটা মাথায় দিয়ে একটা লাঠিতে ভর দিয়ে নেকড়ের মতো চারদিক তাকাতে তাকাতে সে পথ চলত। ঝিলিনকে দেখলেই রাগে গর্গর্ করতে করতে সে অন্য দিকে চলে যেত।

বুড়ো লোকটা কোথায় থাকে দেখার জন্য ঝিলিন একদিন পাহাড় বেয়ে নেমে গেল। পথ ধরে নামতেই সামনে একটা ছোট বাগান হাজির হলো। তার চারদিকে পাথরের দেয়াল। দেয়ালের পিছনে চেরি ও খুবানির গাছ আর সমতল ছাদের একটা কুঁড়েঘর। আরও কাছে গিয়ে সে খড় ও মাটি দিয়ে তৈরি মৌচাক দেখতে পেল। মৌমাছিরা গুন গুন করে উড়ে বেড়াচ্ছে। বুড়ো লোকটি হাঁটু ভেঙে বসে একটা চাক নিয়ে কি যেন করছিল। সেটা দেখবার জন্য শরীরটা টান করতেই তার পায়ের বেড়িতে শব্দ হলো। বুড়ো লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়েই চিৎকার করে উঠে কোমর থেকে পিস্তল বের করে ঝিলিনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল; ঝিলিন কোনও ক্রমে পাথরের দেয়ালের আড়ালে গিয়ে আত্মরক্ষা করল।

বুড়ো লোকটা ঝিলিন এর মনিবের কাছে গিয়ে নালিশ করল। মনিব ঝিলিনকে ডেকে হেসে বলল, "বুড়ো লোকটার বাড়িতে গিয়েছিলে কেন?"

ঝিলিন জবাব দিলো, "আমি তো ওব কোনও ক্ষতি কবিনি। ও কি ভাবে থাকে তাই দেখতে গিয়েছিলাম শুধু।"

মনিব ঝিলিন-এব কথাগুলিই তাকে বলল।

কিন্তু বুড়ো লোকটি ভীষণ বেগে গেছে, সে হিস্‌হিসিয়ে উঠল, গজদন্ত দুটো বের কবে ঝিলিনেব দিকে ঘুষি পাকিয়ে গজব গজব কবতে লাগল।

ঝিলিন তাব সব কথা বুঝতে পাবল না, কিন্তু এটুকু বুঝল যে সে আব্দুলকে বলছে, আউল-এ বাশিযানদেব বাখা উচিত নয, আব তাব উচিত তাদেব মেবে ফেলা। যা .হাক, শেষ পর্যন্ত বুড়ো লোকটা চলে গেল।

ঝিলিন মনিবকে জিজ্ঞাসা কবল, "বুড়ো লোকটা কে?"

মনিব বলল, "সে একজন মহাপুরুষ। সে আমাদেব মধ্যে সবচাইতে সাহসী. অনেক বাশিযানকে সে মেবেছে। একসময সে খুব ধনী ছিল। তাব তিনটি বৌ ও আটটি ছেলে ছিল। সকলে এক গ্রামেই ব'স কবত। তাবপব বাশিযানবা এসে গ্রামটা ধ্বংস কবে দিলো, তাব সাতটা ছেলেকে মেবে ফেলল। শুধু একটা ছেলে বেঁচে ছিল, সেও বাশিযানদেব হাতে ধবা দিলো। বুড়ো লোকটিও গিয়ে ধবা দিলো এবং বাশিযানদেব সঙ্গে তিন মাস কাটাল। সেই সময পাব হলে সে তাব ছেলেকে খুঁজে পেল, নিজেব হাতে তাকে খুন কবল, তাবপব পালিয়ে চলে এল। তাবপবই সে যুদ্ধ কবা ছেড়ে দিলো. আল্লাব কাছে দোযা মাগুতে মক্কা গেল, সেই জন্যই তো সে পাগড়ি পবে। যে মক্কায যায লোকে তাকে বলে "হাজী", আব সেই পাগড়ি পবে। সে তোমাদেব দেখতে পাবে না। সে আমাকে বলল তোমাকে মেবে ফেলতে। কিন্তু তোমাকে আমি মাবতে পাবি না। তোমাব জন্য আমি টাকা দিয়েছি, তাছাড়া. তোমাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি আইভান। তোমাকে মাবা তো দূবেব কথা, যদি কথা না দিতাম তাহলে তোমাকে চলে যেতেও দিতাম না।" সে হেসে উঠল, রুশ ভাষায বলল, "তুমি আইভান ভাল, আমি আব্দুল ভাল।"

৪

এইভাবে ঝিলিন একটি মাস কাটাল। দিনেব বেলা সে আউল এব ভিতব ঘুবে বেড়ায, অথবা কোনও হাতেব কাজ কবে, কিন্তু বাতেব বেলা সাবা আউল যখন নিস্তব্ধ হয়ে আসে তখন সে গোলাঘবেব মেঝে খুঁড়তে শুরু কবে। কিন্তু পাথবেব মেঝে খোঁড়া সহজসাধ্য নয, তবু উখোটা দিয়ে সে কাজ চালিয়ে গেল, এবং শেষ পর্যন্ত দেযালেব নিচে এমন একটা গর্ত কবল যাব ভিতব দিয়ে গলে যাওযা যায।

মনে মনে ভাবল, "শুধু যদি এখানকাব জমিব মাপ-জোকটা আব কোন্ দিকে যেতে হবে সেটা জানতে পারতাম। কিন্তু কোনও তাতাবই তো সে কথা আমাকে বলে দেবে না।"

কাজেই একদিন মনিব বাড়ি থেকে দূবে কোথাও গেলে সেই সুযোগে খাবাব

পরেই সেও বেরিয়ে পড়ল—গ্রাম ছাড়িয়ে ওই পাহাড়টায় উঠে চারদিকটা একবার দেখে আসবে। কিন্তু বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার সময় মনিব সর্বদাই ছেলেকে হুকুম দিয়ে যায় ঝিলিন-এর উপর নজর রাখতে, সে যাতে দৃষ্টির বাইরে যেতে না পারে। কাজেই ছেলেটা এসে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "যেয়ো না! বাবার নিষেধ আছে। তুমি যদি না ফেরো, তাহলে আমি প্রতিবেশীদের ডাকব।"

ঝিলিন তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল; বলল, "আমি বেশি দূর যাচ্ছি না—শুধু ওই পাহাড়টায় চড়তে চাই। একটা ওষুধ খুঁজব, তাতে লোকের রোগ সারবে। ইচ্ছা হয় তো তুমিও সঙ্গে এস; এই বেড়ি পায়ে আমি কি দৌড়ে পালাতে পারি? কালই তোমাকে একটা তীর-ধনুক বানিয়ে দেব।"

এইভাবে ছেলেটাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দু'জনে গেল। পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে চূড়াটা দূরে মনে হয়নি, কিন্তু পায়ে বেড়ি নিয়ে পাহাড় বেয়ে ওঠা বড়ই কষ্টকর। কিন্তু ঝিলিনকে তো হাঁটতেই হবে, না হেঁটে কেমন করে সে চূড়ায় উঠবে। চূড়ায় বসে জমির অবস্থানটা সে ভাল করে লক্ষ্য করল। দক্ষিণ দিকে একটা গোলাঘর ছাড়িয়ে যে উপত্যকাটা রয়েছে সেখানে একদল ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছে, আর তার নিচেই আর একটা আউল দেখা যাচ্ছে। সেটা ছাড়িয়ে আরও খাড়া একটা পাহাড়, তারপর আরও একটা। পাহাড় দুটোর মাঝখানের নীল জায়গাটা হলো জঙ্গল; সেটাও ছাড়িয়ে আরও দূরে পাহাড়ের পর পাহাড় উঠে গেছে। সবচাইতে উঁচু পাহাড়টা চিনির মতো সাদা বরফে ঢাকা; আর একটি বরফ-ঢাকা চূড়া অন্য সবগুলোকে ছাড়িয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পুবে এবং পশ্চিমেও পাহাড়ের সারি, আর তারই খাঁজে খাঁজে আউল-এর ধোঁয়া উঠছে। সে ভাবল, "হায়, এ সবই তো তাতারদের দেশ।" তখন সে রাশিয়ার দিকটায় মুখ ফেরাল। সে দেখল, পাহাড়ের নিচে একটা নদী, বাগান-ঘেরা একটা আউল যেখানে সে থাকে। সে দেখতে পেল, ছোট ছোট পুতুলের মতো মেয়েরা নদীর পাড়ে বসে কাপড় কাচছে। আউল ছাড়িয়ে একটা পাহাড়; দক্ষিণ দিককার পাহাড়ের চাইতে নিচু; সেটা ছাড়িয়ে গাছপালায় ঢাকা আরও দুটো পাহাড়; তাদের মাঝখানে একটা নীলাভ সমতল জায়গা, আর সেই প্রান্তর পেরিয়ে দূরে—অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে একটা ধোঁয়ার মেঘ। ঝিলিন মনে করতে চেষ্টা করল, সে যখন দুর্গের ভিতর বাস করত তখন সূর্য কোন্ দিকে উঠত আর কোন্ দিকে অস্ত যেত। সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারল এতে আর কোনও ভুল নেই : ঐ প্রান্তরেই আছে রুশ দুর্গ। পালাবার পরে ঐ দুটো পাহাড়ের ভিতর দিয়েই তাকে পথ খুঁজে চলতে হবে।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সাদা, বরফ-ঢাকা পাহাড়গুলো রাঙা হয়ে উঠল : কালো পাহাড়গুলো হয়ে উঠল গাঢ় কালো; পাহাড়ের খাঁজ থেকে কুয়াশা উঠে আসছে, আর যেখানে রুশ দুর্গটা আছে বলে তার অনুমান, সূর্যাস্তের আলোয় সেই উপত্যকাটা জুড়ে যেন আগুন জ্বলছে। ঝিলিন খুব ভালভাবে তাকাল। চিমনির ধোঁয়ার মতো

কিছু যেন সেই উপত্যকার মধ্যে কাঁপছে বলে মনে হলো। সে নিশ্চিত হলো, রুশ দুর্গটা ওখানেই আছে।

অনেক দেরি হয়ে গেছে। মোল্লাদের আজান শোনা যাচ্ছে। সকলেই ঘরে ফিরছে, গরুগুলো ডাকছে, ছেলেটি বার বার বলছে, "বাড়ি চলো!" কিন্তু ঝিলিন-এর ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না।

অবশেষে তারা ফিরে গেল। ঝিলিন ভাবতে লাগল, "ঠিক আছে, রাস্তা যখন চিনেছি, এবার পালাবার সময় হয়েছে।" সেই রাতেই পালাবার কথা সে ভাবল। অন্ধকার রাত—চাঁদ ক্ষীণ হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেদিন সন্ধ্যায় তাতাররা ঘরে ফিরে এল। সাধারণত তারা গবাদি পশু নিয়ে খোশ মেজাজে ফিরে আসে। কিন্তু সেদিন তাদের সঙ্গে কোনও গবাদি পশু ছিল না। তারা বয়ে আনল একটি তাতারের মৃতদেহ—লাল-দাড়ির ভাইকে মেরে ফেলা হয়েছে। বিষণ্ণ মুখে তারা ফিরে এল, মৃতদেহ কবর দিতে সমবেত হলো। ঝিলিনও সেখানে গেল।

কোনও শবাধার ছাড়াই এক খণ্ড কাপড়ে মৃতদেহটি ঢেকে তারা গ্রামের বাইরে নিয়ে গেল এবং একটা গাছের নিচে ঘাসের উপর শুইয়ে দিলো। মোল্লা এবং বুড়ো লোকটিও এল। টুপির চারদিকে কাপড় জড়িয়ে, জুতো খুলে তারা মৃতদেহের কাছে হাঁটু ভেঙে সকলে পাশাপাশি বসে পড়ল।

সকলের সামনে মোল্লা, তার পিছনে এক সারিতে পাগড়ি মাথায় তিনজন বৃদ্ধ, তাদের পিছনে অন্য সব তাতাররা। সকলেই চোখ নিচু করে নীরবে বসে রইল। এইভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেলে মোল্লা মাথা তুলে বলল, "আল্লাহ!" এই একটি কথাই সে বলল; তারপরই সকলে আবার চোখ নামিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারা স্থির হয়ে বসে রইল, নিশ্চল নিঃশব্দ।

পুনরায় মোল্লা মাথা তুলে বলল, "আল্লাহ!" আর সকলেই আবারও বলল "আল্লাহ্! আল্লাহ!" তারপর আবার চুপ।

মৃতদেহ অচল হয়ে ঘাসের উপর পড়ে আছে, সকলেই এমন নিশ্চল হয়ে বসে আছে যেন তারাও মৃত। একজনও নড়ছে না। বাতাসে গাছের পাতা নড়ার শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। এখন মোল্লা আবার তার প্রার্থনা উচ্চারণ করলো; সকলে উঠে দাঁড়াল। মৃতদেহটিকে হাতে তুলে ধরে একটা গর্তের কাছে নিয়ে গেল। সাধারণ গর্ত নয়, গর্তটা করা হয়েছে অগভীর নালীবিশিষ্ট একটি ঘরের মতো করে। তারা ধরে ধরে মৃতদেহটিকে ধীরে ধীরে সেই গর্তের মধ্যে নামিয়ে দিয়ে উপবেশনের ভঙ্গিতে বসিয়ে তাকে মাটির নিচে ঢেকে দেওয়া হলো।

মোল্লা কিছু কাঁচা ঘাস পাতা নিয়ে এলো সেগুলোকে গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে তাকে তাড়াতাড়ি মাটি দেওয়া হলো; তারপর মাটিটাকে সমান করে বিছিয়ে দিয়ে কবরের মাথার দিকে একটা পাথরকে খাড়া করে বসিয়ে দেওয়া হলো। তারপর তারা পা দিয়ে মাটিটাকে চেপে দিয়ে কবরের পাশে আবার সারি দিয়ে বসে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

অবশেষে তারা উঠে দাঁড়াল, "আল্লাহ্! আল্লাহ্! আল্লাহ্!" বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। লাল দাড়ি তাতারটা বুড়ো লোকটিকে টাকা দিলো তারপর সেও উঠে দাঁড়াল একটা চাবুক হাতে নিয়ে তিনবার নিজের কপালে ঠুকে বাড়ি চলে গেল।

পরদিন সকালে ঝিলিন দেখল, লাল তাতারটি আরও তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে একটি ঘোটকিকে গ্রামের বাইরে নিয়ে চলেছে। গ্রাম ছাড়িয়ে গিয়ে লাল দাড়ি তাতার তার জোব্বা খুলে ফেলে আস্তিন গুটিয়ে শক্ত হাত দুটি বের করল। তারপর একটা ছোরা বের করে শান-পাথরে সেটাকে শান দিলো। অন্য তাতাররা ঘোটকিটার গলা উঁচু করে ধরল আর সে তার গলাটা কেটে ধড়টা মাটিতে ফেলে দিলো, এবং বড় বড় হাতে তার ছাল-চামড়া তুলে নিল। স্ত্রীলোক ও মেয়েরা এসে তার নাড়িভুঁড়ি ও পেটের ভিতরটা ধুয়ে ফেলে পরিষ্কার করল। ঘোটকিটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে মাংসগুলি কুঁড়েঘরে নিয়ে যাওয়া হলো এবং লাল তাতারের বাড়িতে অন্ত্যেষ্টি ভোজসভায় সারা গাঁয়ের লোক জড়ো হলো।

তিন দিন ধরে সকলে সেই মাংস আর বুজা খেল, মৃতের জন্য প্রার্থনা করল। সব তাতাররা সেখানেই থেকে গেল। চতুর্থ দিন খাবার সময় ঝিলিন দেখল, তারা চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ঘোড়া আনা হলো, তারা তৈরি হয়ে নিল, আর জনা দশেক লোক (লাল তাতারও তাদের একজন) ঘোড়ায় চেপে চলে গেল। কিন্তু আব্দুল বাড়িতেই থেকে গেল। সবে শুক্ল পক্ষের শুরু, কাজেই রাতটা এখনও অন্ধকার।

ঝিলিন ভাবল "আঃ! আজ রাতেই পালাবার উপযুক্ত সময়।" কথাটা সে কস্তিলিনকে বলল, কিন্তু কস্তিলিন ভরসা পেল না।

বলল, "কেমন করে পালাব? আমরা তো রাস্তাও চিনি না।"

"আমি রাস্তা চিনি," ঝিলিন বলল।

কস্তিলিন বলল, "তা চিনলেও এক রাতে তো আমরা দুর্গে পৌঁছতে পারব না।"

ঝিলিন বলল, "তা যদি না পারি, বনের মধ্যে ঘুমিয়ে নেব। এই দেখো, আমি কিছু পনির যোগাড় করে রেখেছি। এখানে থেকে ঘুরে বেরিয়ে লাভ কি? তারা যদি তোমার মুক্তি পণ পাঠায় তো ভাল কথা, কিন্তু ধরো, যদি টাকাটা তারা যোগাড় করতে না পারে তাহলে? তাতাররা এখন রেগে আছে, কারণ রাশিয়ানরা তাদের একজনকে মেরে ফেলেছে। তারা আমাদের মেরে ফেলবার কথাও বলছে।"

কস্তিলিন ভাবতে লাগল।

"ঠিক আছে, চলো পালাই," সে বলল।

৫

ঝিলিন গর্তের মধ্যে ঢুকল। গর্তটাকে একটু বড় করল যাতে কস্তিলিনও ঢুকতে পারে। সারা আউল নিশুতি হওয়া পর্যন্ত তারা বসে রইল।

সব চুপচাপ হয়ে গেলে ঝিলিন দেয়ালের নিচ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে চুপি চুপি কস্তিলিনকে ডাক দিলো, "এস।" কস্তিলিনও হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল, কিন্তু একটা পাথরে তার পা লেগে ঠক্ করে শব্দ হলো। মনিবের একটা বিচ্ছু কুকুর ছিল, গায়ে ফুটি-ফুটি দাগ; নাম উল্‌য়াশিন। ঝিলিন কিছুদিন থেকেই তাকে খাইয়ে-পরিয়ে বশ করে রেখেছিল। উল্‌য়াশিন শব্দটা শুনতে পেয়েই ঘেউ-ঘেউ করে লাফাতে শুরু করে দিলো। অন্য কুকুরগুলোও যোগ দিলো। ঝিলিন একটা শিস মেরে একটুকরো পনির ছুঁড়ে দিলো। উল্‌য়াশিন ঝিলিনকে চিনত, সেটা লেজ নাড়তে শুরু করল; ঘেউ-ঘেউ বন্ধ হলো।

কিন্তু মনিব কুকুরের ডাক শুনে কুঁড়েব ভিতর থেকেই হাঁক দিলো, "হেত্—হেত্ উল্‌য়াশিন!"

ঝিলিন কুকুরটার কানের পাশটা চুলকে দিতেই সেটা চুপ করে গেল, ঝিলিন-এর পা ঘষতে ঘষতে লেজ নাড়তে লাগল।

কিছুক্ষণ দু'জন এক কোণে লুকিয়ে রইল। আবাব সব চুপচাপ হয়ে গেল। চালার ভিতরে ভেড়ার কাশি শোনা গেল; গর্তের ভিতরকার পাথরের উপব জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। অন্ধকার। মাথাব অনেক উপরে তারাগুলি জ্বলছে। পাহাড়েব ওপারে নতুন চাঁদ লাল হয়ে অস্ত যাচ্ছে, তার শিং দুটো উপরের দিকে তোলা। উপত্যকাব বুকে কুয়াশা দুধের মতো সাদা।

উঠে দাঁড়িয়ে ঝিলিন সঙ্গীকে বলল, "বন্ধু চলে এস।"

তারা যাত্রা করল; কিন্তু কয়েক পা যেতেই শুনতে পেল ছাদ থেকে মোল্লা হাঁকছে, "আল্লাহ্। বিস্‌মিল্লাহ্। ইল্‌রহ্‌মান।" তার অর্থ, লোকজন এখন মসজিদে যাবে। কাজেই তারা একটা দেয়ালের পাশে লুকিয়ে পড়ল এবং লোকজন চলে যাওয়া পর্যন্ত অনেকক্ষণ অপেক্ষা কবল। শেষ পর্যন্ত আবাব সব চুপচাপ হয়ে গেল।

"এইবার। ঈশ্বব আমাদেব সহায হন!" ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দু'জন আবাব যাত্রা শুরু করল। একটা উঠোন পেরিয়ে পাহাড় বেযে নেমে নদীর ধারে পৌঁছল। নদী পার হয়ে উপত্যকার পথ ধরে চলল।

মাটির কাছে কুয়াশা ঘন হয়ে নেমেছে, কিন্তু মাথাব উপরে তারাগুলি ঝকঝক করছে। তারা দেখে ঝিলিন পথ দেখিয়ে চলতে লাগল। কুয়াশার জন্য বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, তাই হাঁটতে ভাল লাগছে; শুধু বুটগুলো ছেঁড়া বলে চলতে অসুবিধা হচ্ছে। ঝিলিন জুতো খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো; তারার দিকে চোখ রেখে খালি পাযে সে একটা পাথর থেকে আর একটা পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল। কস্তিলিন পিছিয়ে পড়ল।

বলল, "আস্তে হাঁটো; ছেঁড়া জুতোয় পাযে ফোস্কা পড়ে গেছে।"

ঝিলিন বলল, "জুতো খুলে ফেলো। তাহলে আরও আরামে হাঁটতে পারবে!"

কস্তিলিন খালি পায়ে হাঁটতে লাগল; কিন্তু তাতে আরও খারাপ হলো। পাথবে

পা কেটে যাওয়ায় সে আরও পিছিয়ে পড়ল। ঝিলিন বলল, "পা কাটলে আবার সেরে যাবে; কিন্তু তাতাররা যদি ধরতে পারে তাহলে শেষ করে ফেলবে! তাহলে সে অবস্থা আরও খাবাপ হবে।"

কস্তিলিন কথা বলল না, গোঙাতে গোঙাতে চলতে লাগল।

উপত্যকা ধরে অনেকক্ষণ পথ চলবাব পরে ডান দিকে কুকুরের ডাক শোনা গেল। ঝিলিন থামল, চারদিকে তাকিয়ে হাতের উপর ভর দিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল।

বলল, "আবে! আমবা যে ভুল পথ ধরেছি; অনেকটা ডাইনে চলে এসেছি। এখানে তো আরেকটা আউল; পাহাড়ের উপর থেকে আমি আগেই এটা দেখেছি। পিছনে ঘুবে ঐ পাহাড়টা বেয়ে বাঁ দিকে যেতে হবে। ওখানে একটা জঙ্গল থাকবার কথা!"

কিন্তু কস্তিলিন বলল, "এক মিনিট দাঁড়াও! একটু শ্বাস নিয়ে নি। আমাব পা কেটে রক্ত পড়ছে।"

"কিছু ভেবো না বন্ধু। ওসব সেবে যাবে। আরও আস্তে লাফ দাও। এই ভাবে।"

পিছন ফিরে ঝিলিন বাঁ দিকে মোড় নিয়ে জঙ্গলটা লক্ষ্য করে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল।

কস্তিলিন তখনও গোঙাতে গোঙাতেই চলেছে। ঝিলিন শুধু বলল, "চুপ।" তারপর এগিয়েই চলল।

পাহাড় বেয়ে উঠে ঝিলিন-এব কথামতোই তারা একটা জঙ্গল পেয়ে গেল। জঙ্গলে ঢুকে লতাপাতার ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলতে তাদের জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেল। অবশেষে একটা পথের হদিস পেয়ে সেটা ধবে চলতে লাগল।

"থামো।" পথেব উপব ক্ষুরের শব্দ শুনে তারা থামল, কান পাতল; শব্দটা ঘোড়ার পায়েব মতো, কিন্তু আর শোনা যাচ্ছে না। তারা এগিয়ে চলল। আবার সেই শব্দ। তাবা যখন থামে, শব্দটাও থেমে যায়। ঝিলিন গুঁড়ি মেবে আরও কাছে গিয়ে দেখল, পথেব উপর কি যেন দাঁড়িয়ে আছে। জায়গাটা তত অন্ধকার নয়। জন্তুটা ঘোড়ার মতোই দেখতে, কিন্তু ঠিক সে রকমও নয়; তাব উপরে একটা অদ্ভুত কি যেন রয়েছে, ঠিক মানুষ নয়। জন্তুটা নাক দিয়ে শব্দ কবল। "ওটা তাহলে কি হতে পারে?" ঝিলিন আস্তে শিস্ দিতেই সেটা রাস্তা থেকে ছুটে ঝোপের ভিতরে ঢুকে গেল; গাছপালা ভেঙে ছুটে চলেছে।

কস্তিলিন ভয় পেয়ে মাটিতেই বসে পড়ল। কিন্তু ঝিলিন হেসে বলল, "ওটা তো হবিণ। শুনতে পাচ্ছ না, শিং দিয়ে ডালপালা ভাঙছে? আমরা ওকে দেখে ভয় পেয়েছি, ও আমাদের দেখে ভয় পেয়েছে।"

তাবা চলতে লাগল। সপ্তর্ষি নক্ষত্র অস্ত যাচ্ছে। সকাল হয়ে আসছে। কিন্তু ঠিক পথেই যাচ্ছে কিনা তা তারা জানে না। ঝিলিন-এর মনে হলো, এই পথেই তাতাররা

তাকে ধরে এনেছিল; রুশ দুর্গটা থেকে তাবা এখনও সাত মাইল দূরে আছে। কিন্তু তাদের তো সঠিক পথ চিনবার কোনও উপায় নেই, আর রাত্রিবেলা সহজেই পথ ভুল হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে তারা একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ল। কস্তিলিন বসে পড়ে বলল ঃ "তোমার যা খুশি করো, আমি আর চলতে পারছি না! আমার পা চলছে না।"

ঝিলিন তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল।

"না, আমি কোনওদিন পৌছতে পারব না; কিছুতেই না।"

ঝিলিন রেগে তাকে ধমক দিয়ে উঠল।

"ঠিক আছে, তাহলে আমি একাই যাব। বিদায়!"

কস্তিলিন লাফ দিয়ে উঠে তার পিছু নিল। তারা আরও তিন মাইল হাঁটল। জঙ্গলের মধ্যে কুয়াশা আরও ঘন হয়ে নেমেছে; তাবারাও নিভু-নিভু হয়ে এসেছে: ফলে এক গজ দূরের কিছুও তাদের নজরে পড়ছে না।

হঠাৎ ঠিক সামনে তারা ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনতে পেল। পাথরেব উপব খট্‌খট্‌ শব্দ হচ্ছে। ঝিলিন সোজা শুয়ে পড়ে মাটিতে কান পাতল।

"হ্যাঁ, ঠিক তাই! একজন ঘোড়সওয়ার আমাদের দিকে আসছে।"

পথ ছেড়ে দৌড়ে গিয়ে তারা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ঝিলিন হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তার পাশে গিয়ে দেখল একটি তাতার ঘোড়ায় চেপে আপন মনে গুন গুন করতে করতে একটা গরুকে নিয়ে যাচ্ছে। তাতারটা তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। ঝিলিন কস্তিলিন-এর কাছে ফিরে গেল।

"ঈশ্বর ওকে আমাদের পাশ কাটিয়ে নিয়ে গেছে। উঠে পড়, এবার যাওয়া যাক।"

কস্তিলিন উঠবার চেষ্টা করল, কিন্তু আবার পড়ে গেল।

"আমি পারছি না; বিশ্বাস করো আমি পারছি না। আমার কোনও শক্তি নেই।"

সে বেশ মোটা আর শক্ত-সমর্থ; সারা গায়ে ঘাম ঝরছে। সে কুয়াশায় জমে গেছে, তার পা কেটে রক্ত ঝরছে; সত্যি সে পঙ্গু হয়ে পড়েছে।

ঝিলিন তাকে টেনে তুলতে চেষ্টা করতেই কস্তিলিন হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল : "উঃ, কী ভীষণ লাগছে!"

ঝিলিন-এর বুক কেঁপে উঠল।

"চেঁচাচ্ছ কেন? তাতারটা এখনও কাছেই আছে, তোমার গলা শুনতে পাবে যে!" তারপর নিজের মনে ভাবল, "ও সত্যি ভেঙে পড়েছে। ওকে নিয়ে এখন কি করি? একজন বন্ধুকে তো ফেলে যেতে পারি না।"

"ঠিক আছে, উঠে পড়ো, আমার কাঁধে চড়ো। তুমি যদি সত্যি হাঁটতে না পারো, আমি তোমাকে বয়ে নিয়ে যাব।"

সে কস্তিলিনকে ধরে তুলল; তার উরুর নিচে হাত ঢুকিয়ে তাকে পিঠে তুলে নিয়ে পথে নামল।

ঝিলিন বলল, "দোহাই ঈশ্বরের, আমার গলাটা চেপে ধরো না। কাঁধ দুটো চেপে ধরো।"

তাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া বেশ কষ্টকর; ঝিলিনের নিজের পা থেকেও রক্ত পড়ছে; সেও ক্লান্ত। মাঝে মাঝেই একটু উপুড় হয়ে একটা ঝাঁকি দিয়ে কস্তিলিনকে আরও একটু তুলে সে চলতে লাগল।

তাতারটি হয় তো কস্তিলিন-এর আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল। হঠাৎ ঝিলিন দেখতে পেল, তাতার ভাষায় চেঁচাতে চেঁচাতে পিছন দিক থেকে কে যেন ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। তীরের মতো সে ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল। তাতার বন্দুক তুলে গুলি ছুঁড়ল, কিন্তু তার গায়ে লাগল না। নিজের ভাষায় চিৎকার করতে করতে সে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

ঝিলিন বলল, 'সর্বনাশ হয়েছে বন্ধু! ওই কুত্তাটা দলবল নিয়ে এসে আমাদের ধরে ফেলবে! অন্তত মাইল দুই ছুটতে না পারলেই মরেছি!" তারপরেই মনে মনে ভাবল, "এই বোঝার সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রেখেছি কিসের জন্য? একা হলে আমি অনেক আগেই এদের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারতাম!"

কস্তিলিন বলল, "তুমি একাই চলে যাও। আমার জন্য তুমি কেন মরবে?"

"না, আমি যাব না! একজন বন্ধুকে ফেলে যেতে পারি না।"

পুনরায় কস্তিলিনকে পিঠে তুলে তারা অনেক কষ্টে এগিয়ে চলল। আরও আধ মাইল বা তারও বেশি পথ পার হলো। তখনও তারা বনের মধ্যেই আছে; সে-বনের শেষ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু কুয়াশা কেটে গিয়ে মেঘ জমতে শুরু করেছে; আকাশে একটা তারাও চোখে পড়ছে না। ঝিলিনও ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে। পথের পাশে পাথর দিয়ে ঘেরা একটা ঝরনার ধারে পৌঁছে ঝিলিন থামল। কস্তিলিনকে পিঠ থেকে নামাল।

বলল, "এস, একটু বিশ্রাম করে জল খেয়ে নি; কিছুটা পনিরও খাওয়া যাক। আর বেশি দূর নেই।"

কিন্তু সবে জল খাবার জন্য উপুড় হয়েছে এমন সময় তার পিছনে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনতে পেল। তীরবেগে তারা আবার ঝোপের ভিতরে ঢুকে একটা খাড়া উৎরাইয়ের উপর শুয়ে পড়ল।

তাতারদের গলা কানে এল। পথের যে জায়গাটা থেকে নেমে এসে তারা লুকিয়েছে ঠিক সেইখানে এসে তাতাররা থামল। কি যেন কথাবার্তা বলে একটা কুকুরকে লেলিয়ে দিলো। ডালপালার সর্-সর্ শব্দ হলো, আর ঝোপটা পার হয়ে একটা অপরিচিত কুকুর তাদের সামনে হাজির হলো। সেখানেই থেমে কুকুরটা ডাকতে লাগল।

তখন কতকগুলি অপরিচিত তাতার পাহাড় বেয়ে নেমে এসে ঝিলিন ও কস্তিলিনকে ধরল, তাদের বেঁধে ফেলে ঘোড়ায় তুলে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

প্রায় দু' মাইল যাবার পর তাদের সঙ্গে আব্দুল-এর দেখা হলো, তার সঙ্গে আরও দু'জন তাতার। অপরিচিতদের সঙ্গে কি সব কথা বলে আব্দুল ঝিলিন ও কস্তিলিনকে তার নিজের দুটো ঘোড়ায় চাপিয়ে আউল-এ ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

এবার আব্দুল হাসল না, একটা কথাও বলল না।

ভোরবেলা তারা আউল-এ পৌঁছে গেল। রাস্তার উপরেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হলো। ছেলেমেয়েরা এসে ভিড় করে তাদের ঘিরে ধরল, পাথর ছুঁড়তে লাগল, চেঁচাতে চেঁচাতে তাদের চাবুক মারতে লাগল।

তাতাররা গোল হয়ে বসল। পাহাড়ের নিচ থেকে বুড়ো লোকটিও এসেছে। তাদের আলোচনা শুরু হলো : ঝিলিন শুনতে পেল, তাকে ও কস্তিলিনকে নিয়ে কি করা হবে সেই কথাই তারা বলাবলি করছে। কেউ বলল, তাদের পাহাড়ের আরও ভিতরে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত; কিন্তু বুড়ো লোকটি বলল : "তাদের মেরে ফেলা উচিত।"

আব্দুল প্রতিবাদ কবে বলল : "আমি তাদের জন্য টাকা দিয়েছি, কাজেই মুক্তিপণ আমাকে পেতেই হবে।"

বুড়ো লোকটি বলল : "তারা তোমাকে কিছুই দেবে না, শুধু দুর্ভাগ্যই ডেকে আনবে। রুশদের খাওয়ানো পাপ। তাদের মেরে ফেলো, শেষ করে দাও!"

তারা চলে গেল। সকলে চলে গেলে মনিব এসে ঝিলিনকে বলল : "একপক্ষ কালের মধ্যে যদি তোমার মুক্তি-পণের টাকা না আসে তাহলে তোমাকে চাবুক মারব; আর যদি আবারও পালাতে চেষ্টা করো, তোমাকে কুকুরের মতো খুন করে ফেলব। চিঠি লিখে দাও, আর ঠিক-ঠিক লিখো।"

তাদের কাছে কাগজ এনে দেওয়া হলো; তারা চিঠি লিখল। তাদেব পায়ে বেড়ি পরিযে মসজিদের পিছনকার প্রায় বারো বর্গ ফুট একটা গভীব গর্তেব মধ্যে নামিযে দেওয়া হলো।

৬

এখন বড় কষ্টে তাদের দিন কাটতে লাগল। কোনও সমযই তাদের পা থেকে বেড়ি খোলা হয় না; কোনও সময়ই তাদের খোলা হাওয়ায় যেতে দেওয়া হয় না। আ-সেঁকা ময়দা তাদের খেতে দেওয়া হয়, তাবা যেন কুকুর; একটা পাত্রে করে জলটাও নামিয়ে দেওয়া হয়।

গর্তের ভিতরটা ভেজা, আর জায়গাও অল্প; তাব ভয়ংকর দুর্গন্ধ। কস্তিলিন অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার শরীর ফুলে গেল, সর্বাঙ্গে ব্যথা হলো; সারা দিন সে হয় আর্তনাদ করে, নয়ত পড়ে পড়ে ঘুমোয়। ঝিলিনও খুব মুষড়ে পড়েছে; সে বুঝল এ বড় কঠিন ঠাঁই; পালাবার কোনও পথই নেই।

একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়তে চেষ্টা করল, কিন্তু মাটিটা ফেলবার জায়গাও নেই। মনিব সেটা দেখতে পেয়ে তাকে খুন করবে বলে ভয় দেখাল।

একদিন সে গর্তের মেঝেতে বসে মুক্তির কথাই ভাবছে, মন-মেজাজ খুব খারাপ, এমন সময় একখানা পিঠে তার কোলের উপর এসে পড়ল, তারপর আর একখানা, এবং তারপরে অনেকগুলো চেরিফল। সে মুখ তুলে দিনাকে দেখতে পেল। তার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠেই সে পালিয়ে গেল। আর ঝিলিন ভাবল : "দিনা কি আমাকে সাহায্য করতে পারে না?"

গর্তের মধ্যে একটু জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে কিছু মাটি খুঁড়ে তাই দিয়ে সে পুতুল তৈরি করতে বসল। মানুষ বানাল, ঘোড়া বানাল, কুকুর বানাল। ভাবল, "দিনা এলে এগুলো তাকে ছুঁড়ে দেবে।"

কিন্তু পরদিন দিনা এল না। ঝিলিন ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেল; কিছু লোক ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল; মসজিদের কাছে তাতারদের আলোচনা-সভা বসল। তারা উঁচু গলায় তর্কাতর্কি করতে লাগল; "রাশিয়ান" শব্দটা বার বার শোনা গেল। সেই বুড়ো লোকটার গলাও শোনা গেল। সে সব কথাবার্তা বুঝতে না পারলেও ঝিলিনের মনে হলো যে রুশ সৈন্যদল কাছাকাছি কোথাও পৌঁছে গেছে এবং তারা আউল-এও আসতে পারে এই কথা ভেবে তারা ভয় পেয়ে গেছে; এখন বন্দীদের নিয়ে কি করবে তাই ভাবছে।

কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালিয়ে তারা চলে গেল। হঠাৎ মাথার উপরে একটা সর্ সর্ শব্দ শুনে চোখ তুলে সে দিনাকে দেখতে পেল; সে এমন ভাবে গর্তটার উপর হামাগুড়ি দিয়ে আছে যে তার হাঁটু দুটো মাথার চাইতে উঁচু হয়ে আছে এবং তার চুলের সঙ্গে আটকানো মুদ্রাগুলো গর্তের উপর ঝুলে পড়েছে। দিনার চোখ দুটি তারার মতো ঝিকমিক করছে। আস্তিনের ভিতর থেকে দু' টুকরো পনির বের করে সে ঝিলিনকে ছুঁড়ে দিলো। সেগুলো ধরে নিয়ে সে বলল,"তুমি আগে আসোনি কেন? তোমার জন্য পুতুল বানিয়ে রেখেছি। নাও, ধরো!" একে একে সে সবগুলি পুতুল ছুঁড়ে দিলো।

কিন্তু দিনা তার মাথাটা সরিয়ে নিল; পুতুলের দিকে ফিরেও তাকাল না।

বলল, "আমি কিচ্ছু চাই না।" একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলল, "আইভান, ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে!" সে নিজের গলাটা দেখাল।

"কে আমাকে মারবে?"

"বাবা; বুড়ো বলেছে, মারতেই হবে। তোমার জন্য আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।"

ঝিলিন বলল : "আচ্ছা, আমার জন্য যদি তোমার কষ্টই হচ্ছে, তাহলে আমাকে একটা লম্বা লাঠি এনে দাও।"

সে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলো, "আমি পারব না!"

দুই হাত জোড় করে ঝিলিন মিনতি করে বলল : "দিনা, দয়া করে এ কাজটা করো! প্রিয় দিনা, আমি তোমাকে মিনতি করছি।"

সে তবু বলল, "আমি পারব না! লাঠি আনতে গেলে ওরা আমাকে দেখে ফেলবে। সবাই বাড়িতে আছে।" দিনা চলে গেল।

সন্ধ্যা হলো। ঝিলিন বসে বসে মাঝে মাঝে উপরের দিকে তাকাচ্ছে। না জানি কি হবে। আকাশে তারা ফুটেছে কিন্তু এখনও চাঁদ ওঠেনি। মোল্লাদের গলা শোনা গেল; তারপর সব চুপচাপ। ঝিলিন ঢুকতে ঢুলতে ভাবছিল : "এ কাজ করতে মেয়েটি ভয় পাবে!"

হঠাৎ তার মনে হলো, তার মাথার উপর মাটি পড়ল। তাকিয়ে দেখল, একটা লম্বা লাঠি গর্তের উল্টো দিকের দেয়ালে খোঁচা মারছে। একটু পরে সেটা বাঁকা হয়ে গর্তের মধ্যে নেমে এল। ঝিলিন খুব খুশি। লাঠিটা ধরে সে নামিয়ে নিল। লাঠিটা বেশ শক্ত; মনিবের ঘরের ছাদের উপর এই লাঠিটাই সে দেখেছিল।

সে উপরে তাকাল। আকাশে তারাগুলি জ্বল্ জ্বল্ করছে; আর গর্তের ঠিক উপরে দিনার চোখ দুটি বিড়ালের চোখের মতো জ্বলছে। ঝুঁকে পড়ে গর্তের একেবারে কিনারে মুখ এনে সে চুপি চুপি ডাকল, "আইভান। আইভান।" নিজের মুখের উপর হাত নেড়ে সে ইশারায় ঝিলিনকে জানাল, সে যেন আস্তে কথা বলে।

"কি?" ঝিলিন জবাব দিলো।

"দু'জন ছাড়া সবাই চলে গেছে।"

তখন ঝিলিন বলল, "কস্তিলিন, ওঠো, এসো, শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক; আমি তোমাকে তুলে ধরছি।"

কিন্তু কস্তিলিন তার কথায় কান দিলো না।

বলল, "না; আমি ভালই জানি যে এখান থেকে আমি পালাতে পারব না। আমার যখন পাশ ফিরবার শক্তিটুকুও নেই তখন এখান থেকে যাব কেমন করে?"

"ঠিক আছে; তাহলে বিদায়! আমাকে ভুল বুঝো না।" তারা পরস্পরকে চুমো খেলো। ঝিলিন বাঁশটা চেপে ধরল, দিনাকেও উপর থেকে ধরতে বলে সে বাঁশটা বেয়ে উঠতে লাগল। দু' একবার তার হাত ফস্কে গেল, বেড়ির জন্যও খুবই অসুবিধা হলো। তবু কস্তিলিন-এর সহায়তায় সে উপরে উঠে গেল। দিনা তার ছোট্ট হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে যথাশক্তি তার শার্ট ধরে টেনে তুলল।

ঝিলিন বাঁশটা টেনে তুলে বলল, "দিনা, এটাকে যথাস্থানে রেখে দাওগে, নইলে, তারা দেখতে পেলে তোমাকে মারবে।"

দিনা বাঁশটা টানতে টানতে চলে গেল, ঝিলিনও পাহাড় বেয়ে নামতে লাগল। খাড়া পাহাড়টার নিচে পৌঁছে একটা ধারালো পাথর তুলে নিয়ে পায়ের বেড়িটা ভাঙতে চেষ্টা করল। কিন্তু বেড়িটা বেশ শক্ত, ভাঙা সহজ নয়; তাছাড়া তার হাতও জায়গামতো পৌঁচচ্ছে না। এমন সময় সে শুনতে পেল, আস্তে লাফিয়ে লাফিয়ে কে যেন পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে। ভাবল "নিশ্চয় দিনাই আবার এসেছে!"

দিনা এসে একটা পাথর নিয়ে বলল, "আমি চেষ্টা করে দেখি।"

হাঁটু ভেঙে বসে সে বেড়িটা ভাঙতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার হাত দুটো গাছের কচি ডালের মতো নরম, আর তার শক্তিই বা কতটুকু। পাথরটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে

সে কাঁদতে লাগল। তখন ঝিলিন নিজেই আবার চেষ্টা করতে লাগল। দিনা তার কাঁধের উপর হাত রেখে পাশেই বসে রইল।

ঝিলিন চারদিকে তাকিয়ে বাঁদিকে পাহাড়ের ওপারে একটা লাল্‌চে আলো দেখতে পেল। চাঁদ উঠেছে। সে ভাবল, "হায়! চাঁদ উঠবার আগেই আমাকে উপত্যকা পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকতে হবে।" সে উঠে দাঁড়াল। পাথরটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো। বেড়ি থাক আর যা থাক, তাকে যেতেই হবে।

"বিদায় প্রিয় দিনা! তোমাকে কোনও দিন ভুলব না!" সে বলল।

দিনা তাকে জড়িয়ে ধরল। তাকে কিছুটা পনির দিলো। সেও নিল।

"ধন্যবাদ সোনা মেয়ে। আমি চলে গেলে কে তোমাকে পুতুল বানিয়ে দেবে?" সে দিনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো।

দুই হাতে মুখ ঢেকে দিনা কেঁদে উঠল। মেষশাবকের মতো সে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল। তার বিনুনির মুদ্রাগুলি পিঠের উপর টুং-টাং করে বাজতে লাগল।

ঝিলিন ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল; পাছে শব্দ হয় তাই বেড়ির শিকলটা হাতে তুলে নিল; তারপর বেড়িসুদ্ধু পা দুটো টানতে টানতে যেখান থেকে চাঁদ উঠছে সেইদিকে এগিয়ে চলল। এবার সে পথ চিনেছে। সোজা পথে গেলে তাকে প্রায় ছ' মাইল পথ হাঁটতে হবে। এখন চাঁদ উঠবার আগে জঙ্গলে পৌঁছতে পারলেই হয়। নদী পার হলো। পাহাড়ের ওপারের আলো ক্রমেই সাদা হয়ে আসছে। সেইদিকে চোখ রেখে সে উপত্যকা ধরে চলতে লাগল. চাঁদ এখনও দেখা যাচ্ছে না। আলোটা ক্রমেই উজ্জ্বলতর হচ্ছে; উপত্যকার একটা দিকে ক্রমেই বেশি করে আলো পড়ছে; ছায়াগুলি ক্রমেই তার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে পাহাড়ের পাদদেশের দিকে এগিয়ে চলেছে।

ছায়ার আড়ালে আড়ালে ঝিলিন এগিয়ে চলল। সে দ্রুত এগোচ্ছে, কিন্তু চাঁদের গতি তার চাইতেও দ্রুত হয়, ডান দিককার পাহাড়ের চূড়াগুলি ইতিমধ্যেই আলোকিত হয়ে উঠেছে। সে যখন জঙ্গলের কাছে পৌঁছল তখন পাহাড়ের আড়াল থেকে সাদা চাদ দেখা দিলো; চারদিক দিনের মতো আলো হয়ে উঠল। গাছের পাতাগুলিও দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের উপর আলো পড়েছে, কিন্তু সব নিস্তব্ধ, যেন কেউ বেঁচে নেই; নিচের নদীটার কলকল ধ্বনি ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

জঙ্গলে ঢুকবার মুখে কারও সঙ্গে ঝিলিন-এর দেখা হলো না। একটা অন্ধকার জায়গা বেছে নিয়ে সে বিশ্রামের জন্য বসে পড়ল।

বিশ্রাম হলো। একটুকরো পনির খাওয়া হলো। কাছে একটা পাথর দেখতে পেয়ে আবার বেড়িটা ভাঙবার চেষ্টা করতে লাগল। ঠুকতে ঠুকতে হাতে ফোস্কা পড়ে গেল, কিন্তু বেড়ি ভাঙল না। উঠে দাঁড়িয়ে আবার পথ চলতে লাগল। আধ মাইলেরও বেশি পথ চলবার পরে তার শরীর একেবারেই ভেঙে পড়ল, পা ব্যথা করতে লাগল। প্রতি দশ পা এগিয়েই তাকে থামতে হলো। ভাবল, "তবু এ ছাড়া উপায় নেই। যতক্ষণ

শরীরে এতটুকু শক্তি আছে ততক্ষণ এইভাবে পা টেনে টেনে চলতেই হবে। একবার বসলে আর উঠতে পারব না। দুর্গে পৌছতে পারব না ঠিকই; কিন্তু সকাল হলে বনের মধ্যে শুয়ে পড়তে পারব, সেখানে সারাটা দিন কাটাতে পারব, তারপর রাত হলে আবার চলতে পারব।"

সারা রাত সে পথ চলল। দু'জন তাতার ঘোড়ায় চড়ে তাকে পার হয়ে গেল। অনেক দূর থেকেই তাদের আওয়াজ পেয়ে সে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিল।

চাঁদ ক্রমেই ম্লান হয়ে এল। শিশির পড়া শুরু হলো। ভোব হয়ে এল। কিন্তু ঝিলিন তখনও বনের কিনারে পৌছতে পারল না। ভাবল, "দেখা যাক; আরও ত্রিশ পা এগোতে পারলেই গাছপালার ভিতর ঢুকে বসে পড়ব।"

আরও ত্রিশ পা হাঁটতেই সে দেখতে পেল, বন এসে গেছে। বনের শেষ প্রান্তে এগিয়ে গেল। তখন বেশ আলো হয়ে গেছে। তার সামনেই প্রান্তর ও দুর্গ।

বাঁদিকে পাহাড়ের ঢালুটার ঠিক নিচে একটা আগুন নিভে যাচ্ছে। তার ধোঁয়া চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আগুনকে ঘিরে কিছু লোক বসে আছে।

ভাল করে তাকিয়ে সে দেখতে পেল বন্দুকগুলো চকচক করছে। ওরা সৈনিক—সৈনিক—কসাক!

ঝিলিন-এর মন আনন্দে নেচে উঠল। গায়ের সবটুকু শক্তি একত্র করে সে পাহাড় বেয়ে নামতে লাগল। মনে মনে বলল : "ঈশ্বর করুন, এখন এই খোলা মাঠে কোনও অশ্বারোহী তাতার যেন আমাকে দেখতে না পায়! যত কাছেই এসে থাকি, তাহলে আর ঠিক সময়ে ওখানে পৌছতে পারব না।"

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই শ' দুই গজ দূরে বাঁদিকের একটা পাহাড়েব উপর সে তিনটি তাতারকে দেখতে পেল।

তারাও তাকে দেখতে পেয়ে ছুটে আসতে লাগল। তার বুক ভেঙে গেল। হাত নাড়তে নাড়তে সে প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করে উঠল, "ভাইসব, ভাইসব! বাঁচাও!"

কসাকরা শুনতে পেল। তাদের একটা দল ঘোড়ায় চড়ে তীরবেগে ছুটতে লাগল তাতারদের বাধা দিতে। কসাকরা অনেক দূরে, কিন্তু তাতারবা বেশ কাছে; তবু ঝিলিনও শেষ চেষ্টা করতে লাগল। বেড়িটা হাতে নিয়ে সেও কসাকদের দিকে ছুটে চলল। সে যে কি করছে তা সে নিজেই জানে না। শুধু ক্রুশ-চিহ্ন আঁকছে আর চিৎকার করছে, "ভাইসব! ভাইসব! ভাইসব!"

দলে কসাক প্রায় পনেরোজন। তাতাররা ভয় পেয়ে ঝিলিনের কাছে পৌছবার আগেই থেমে গেল। ঝিলিন হোঁচট খেতে খেতে কসাকদের কাছে পৌছে গেল।

তাকে ঘিরে ধরে সকলে প্রশ্ন করতে লাগল : "তুমি কে? তুমি কে? কোত্থেকে আসছ?"

কিন্তু ঝিলিন-এর কোনও জ্ঞান নেই। সে শুধু কাঁদছে আর বলছে, "ভাইসব! ভাইসব!"

অন্য সৈনিকরাও ছুটে এসে ঝিলিনকে ঘিরে ধরল—কেউ রুটি দিলো, একজন দিলো ভদ্‌কা : কেউ বা একটা জোব্বা তার গায়ে ; আর একজন তার পায়ের বেড়ি ভাঙতে শুরু করল।

অফিসাররা তাকে চিনতে পারল। ঘোড়ায় চাপিয়ে দুর্গে নিয়ে গেল। তাকে ফিরে পেয়ে সকলেই খুশি। বন্ধুরা তাকে ঘিরে বসল।

ঝিলিন তাদের সব কথা খুলে বলল।

"এই ভাবেই আমি বাড়ি গিয়ে বিয়ে করলাম! না হে, বোঝাই যাচ্ছে যে আমার ভাগ্যে ও সব নেই!"

কাজেই সে ককেসাসেই চাকরি করতে লাগল। একমাস পবে পাঁচ হাজার রুবল মুক্তি-পণ দিয়ে কস্তিলিনও ছাড়া পেল। তারা যখন তাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল তখন সে মৃতপ্রায়।

১৮৭০

ভালুক-শিকার

The Bear Hunt

[এখানে বর্ণিত অভিযানটি ১৮৫৮ সালে তলস্তয়-এর নিজের জীবনেই ঘটেছিল। বিশ বছর পবে মানবিক কারণে তিনি শিকার করা ছেড়ে দিয়েছিলেন।]

একবার আমরা ভালুক-শিকারে গিয়েছিলাম। আমার বন্ধু একটা ভালুককে গুলি করল, কিন্তু তাতে সেটা আহত হলো মাত্র। বরফের উপর রক্তের দাগ দেখা গেল, কিন্তু ভালুকটা পালিয়ে গেল।

বনের মধ্যে গোল হয়ে বসে আমরা ভাবতে লাগলাম, তখনই ভালুকটার পিছনে ধাওয়া করা হবে, না কি পুনরায় স্থিতু হয়ে বসতে সেটাকে দু'-তিন দিন সময় দেওয়া হবে। ভালুক-তাড়ুয়া চাষীদের জিজ্ঞাসা করলাম, সেইদিনই ভালুকটার পাত্তা করা সম্ভব হবে কি না।

একজন বুড়ো ভালুক-তাড়ুয়া বলল, "না, সেটা অসম্ভব। ওকে শান্ত হতে সময় দিতে হবে। পাঁচ দিনের মধ্যে ওকে ঘেরাও করা সম্ভব হলেও এখনই যদি ওর পিছনে ধাওয়া করেন তাহলে ভালুকটা ভয় পেয়ে যাবে এবং কোথাও স্থিতু হয়ে বসবে না।"

কিন্তু একটি যুবক ভালুক-তাড়ুয়া বুড়োর কথার প্রতিবাদ করে বলল, "এখনই ভালুকটাকে ঘেরাও করা সম্ভব।"

সে বলল, "এরকম বরফে সেটা অনেক দূর যাবে না, কারণ ভালুকটা বেশ মোটাসোটা। সন্ধ্যার আগেই সেটা কোথাও বসে যাবে; আর তাও যদি না যায় তাহলে বরফ-জুতো পরেই আমি তাকে ধরতে পারব।"

যে বন্ধুটির সঙ্গে গিয়েছিলাম সে তখনই ভালুকটার পিছু নেবার বিরোধী; সে অপেক্ষা করতেই পরামর্শ দিলো। কিন্তু আমি বললাম :

"তর্ক করে কি হবে। তোমার যেমন ইচ্ছা তাই করো, কিন্তু আমি দেমিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে ভালুকটার খোঁজে বের হব। যদি পেয়ে যাই, ভাল কথা। যদি না পাই, তাতেও লোকসান কিছু নেই। সবে দিন শুরু হয়েছে, আর আজ আমাদের হাতে কোনও কাজও নেই।" সেই ব্যবস্থাই করা হলো।

অন্য সকলে স্লেজ-এ চেপে গাঁয়ে ফিরে গেল। দেমিয়ান ও আমি কিছু রুটি নিয়ে বনের মধ্যেই রয়ে গেলাম।

সকলে চলে যাবার পরে দেমিয়ান ও আমি আমাদের বন্দুক দুটো ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলাম, এবং আমাদের গরম কোটের কোণাগুলি বেল্টের মধ্যে গুঁজে নিয়ে ভালুকের পায়ের চিহ্ন ধরে এগিয়ে চললাম।

আবহাওয়া সুন্দর; বরফ পড়ছে; বেশ শান্ত। কিন্তু বরফ-জুতো পরে চলা খুব শক্ত কাজ। বরফ বেশ গভীর ও নরম। বনের মধ্যে বরফ মোটেই শক্ত হয়ে ওঠেনি, আগের দিনও নতুন করে বরফ পড়েছে, কাজেই আমাদের বরফ জুতো বরফের মধ্যে ছ' ইঞ্চি, কোথাও বা আরও বেশি ডুবে যাচ্ছিল।

দূর থেকে ভালুকটাকে চলতে দেখা গেল। তার চলার ভঙ্গিটাও আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম, কখনও তার পেট পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে, আর সে যেন বরফের ভিতর দিয়ে লাঙল টেনে এগিয়ে চলেছে। প্রথমে বড় বড় গাছের ফাঁক দিয়ে আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু সেটা যখন ছোট ছোট ফার এর ঝোপের ভিতর ঢুকে গেল তখন দেমিয়ান থেমে গেল।

"আর পিছনে ধাওয়া করা নয়", সে বলল। "সেটা হয় তো কোথাও চুপচাপ বসে আছে। বরফ দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছে। কাজেই ওর পায়ের দাগ ছেড়ে চলুন আমরা ঘুরে যাই, কিন্তু খুব চুপি চুপি যেতে হবে। কোনওরকম শব্দ করবেন না বা কাশবেন না। তাহলে ওটা ভয় পেয়ে যাবে।"

কাজেই পথ ছেড়ে আমরা বাঁ দিকে ঘুরে গেলাম। কিন্তু প্রায় পাঁচ শ' গজ যাবার পরে ঠিক আমাদের সামনে আবার ভালুকের পায়ের দাগ দেখতে পেলাম। সেই দাগ ধরে চলতে চলতে আমরা রাস্তায় গিয়ে পড়লাম। সেখানে থেমে ভালুকটা কোন দিকে গেছে বুঝবার জন্য আমরা পথটা ভাল করে দেখতে লাগলাম। বরফের মধ্যে এখানে-ওখানে ভালুকের থাবা, নখ, সব কিছুরই দাগ রয়েছে, আবার কোনও চাষীর বাকলের জুতোর দাগও এখানে-ওখানে রয়েছে। বোঝা যাচ্ছে যে, ভালুকটা গ্রামের দিকেই গেছে।

রাস্তা ধরে যেতে যেতে দেমিয়ান বলল :

"এখন রাস্তার উপর নজর রেখে কোনও লাভ নেই। রাস্তার পাশে বরফের উপর যে দাগ রয়েছে তাই দেখে আমাদের জানতে হবে বাঁয়ে না ডাইনে কোন্ দিকে সে রাস্তা থেকে নেমে গেছে। কোনও জায়গা থেকে সে নিশ্চয় নেমে গেছে, কারণ গ্রামের দিকে সে কিছুতেই যাবে না।"

প্রায় এক মাইল পথ যাবার পরে ভালুকটাব রাস্তা থেকে নেমে যাবার দাগ আমাদের চোখে পড়ল। দাগগুলো ভাল করে পরীক্ষা করলাম। কী আশ্চর্য! সেগুলো ভালুকের পায়ের দাগ ঠিকই, কিন্তু রাস্তা থেকে বনের দিকে না গিয়ে সেগুলো বন থেকে রাস্তায় এসে উঠেছে। আঙুলগুলো রাস্তার দিকে মুখ করা।

"এটা নিশ্চয় অন্য কোনও ভালুক", আমি বললাম।

দেমিয়ান কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে চিন্তা করতে লাগল।

তারপর বলল, "না, সেই একই ভালুক। ভালুকটা আমাদের ধোঁকা দিয়েছে; রাস্তা ছেড়ে যাবার সময় পিছন দিকে হেঁটেছে।"

ভাল করে নজর করে দেখলাম, ঠিক তাই! ভালুকটা দশ পা'র মতো পিছন দিকে হেঁটেছে; তারপর একটা ফার গাছের পিছনে গিয়ে মুখ ঘুরিয়ে সোজা সামনে চলে গেছে। দেমিয়ান থেমে বলল :

"এবার সেটাকে ঠিক ঘেরাও করতে পারব। আমাদের সামনেই একটা জলাভূমি আছে; ভালুকটা নিশ্চয় সেখানেই আস্তানা পেতেছে। চলুন ঘুরে যাই।"

ফারের জঙ্গলের ভিতব দিয়ে আমরা ঘুরে চললাম। ততক্ষণে আমি বেশ শ্রান্ত হয়ে পড়েছি; পথ চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। কখনও জুনিপার-এর ঝোপে আমার বরফ-জুতো আটকে যাচ্ছে, কখনও বা ছোট ফার-এর চারা পায়ের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, অনভ্যাসবশত বরফ-জুতো পা থেকে ফস্কে যাচ্ছে, আবার কখনও বা বরফের ভিতর লুকনো কাঠের টুকরোয় পায়ে ঠোকর লাগছে। ক্রমেই শ্রান্ত হয়ে পড়ছি; ঘামে সারা শরীর ভিজে গেছে; লোমের জোব্বাটা খুলে ফেললাম। কিন্তু দেমিয়ান কেমন সুন্দর এগিয়ে চলেছে, যেন নৌকোয় চড়ে ভেসে যাচ্ছে, তার বরফ-জুতো যেন আপনা থেকেই চলছে, কোনও কিছুর সঙ্গে ধাক্কাও লাগছে না, বা পা থেকে ফস্কেও যাচ্ছে না। বরং আমার লোমের কোটটা নিয়ে নিজের কাঁধে ফেলে আমাকে চলতে সাহায্য করল।

আরও দু' মাইল পথ চলে আমরা জলাভূমির অপর পারে পৌঁছে গেলাম। আমি পিছিয়ে পড়েছিলাম। আমার বরফ-জুতো বারে বারে ফস্কে যাচ্ছিল, আমার পা দুটোও কাঁপছিল। হঠাৎ দেমিয়ান আমার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে হাত নাড়তে লাগল। আমি তার কাছে হাজির হলে সে উপুড় হয়ে আঙুল বাড়িয়ে ফিস্-ফিস্ করে বলল :

"ঐ ঝোপটার উপরে ছাতারে পাখিটা কিচির-মিচির করছে দেখতে পাচ্ছেন? ওরা দূর থেকে ভালুকের গন্ধ পায়। সেটা নিশ্চয় ওখানেই আছে।"

আমরা মুখ ঘুরিয়ে আরও আধঘণ্টা চলবার পরে আবার সেই পুরনো রাস্তায় গিয়ে পড়লাম। আমরা তাহলে ভালুকটাকে এক পাক ঘুরে এসেছি; যে রাস্তাটা আমরা ছেড়ে এলাম সেখানেই সে আছে। আমরা থামলাম; আমি টুপি খুলে জামাগুলো একটু ঢিলে করে নিলাম। আমি যেন গরম জলে নেয়ে গেছি, জলে ডোবা ইঁদুরের মতো আমার অবস্থা। দেমিয়ান-এর মুখও লাল হয়ে উঠেছে; সে আস্তিনে মুখ মুছে নিল।

বলল, "আমাদের কাজ সারা হয়েছে স্যার, এবার বিশ্রাম করব।"

সন্ধ্যার লালচে আলো এর মধ্যেই বনের ভিতরে ছড়িয়ে পড়েছে। বরফ-জুতো খুলে তার উপর বসে পড়লাম; থলে থেকে রুটি ও নুন বের করলাম। প্রথমে কিছুটা বরফ খেয়ে তারপর রুটি খেলাম; রুটিটা এতই সুস্বাদু লাগল যে মনে হলো এমনটি জীবনে কোনওদিন খাইনি। ক্রমে গোধূলি নেমে এল। তখন আমি দেমিয়ানকে জিজ্ঞাসা করলাম, গ্রামটা বেশ দূর কিনা।

সে বলল, "হ্যাঁ। প্রায় আট মাইল হবে। আজ রাতেই সেখানে যাব, তবে আপাতত বিশ্রাম। লোমের কোটটা পরে নিন স্যার, নইলে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।"

দেমিয়ান বরফটাকে সমান করে নিয়ে কিছু ফারের ডালপালা ভেঙে নিয়ে একটা বিছানা তৈরি করে ফেলল। হাতের উপর মাথা রেখে আমরা পাশাপাশি শুয়ে পড়লাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। দু' ঘণ্টা পরে একটা কিছু ভাঙার শব্দে জেগে উঠলাম।

ঘুমটা এত গাঢ় হয়েছিল যে আমি কোথায় আছি তাই বুঝতে পারছিলাম না। চারদিকে তাকালাম। কী আশ্চর্য! আমি একটা হলের মধ্যে শুয়ে আছি; সব ঝক্‌ঝক্ করছে; সাদা থামগুলো জ্বলজ্বল করছে; উপরে তাকিয়ে দেখলাম, কাক-কালো ছাদটা রঙিন আলোয় ঝিলমিল করছে। ভাল করে লক্ষ্য করতেই মনে পড়ল, আমরা বনের মধ্যে রয়েছি, আর যাকে আমি হল ও থাম মনে করেছিলাম সেগুলো বরফ ও জমাট কুয়াশায় ঢাকা গাছ, আর রঙিন আলোগুলো গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঝিকমিক-করা তারা।

সারা রাত কুয়াশা জমেছে; ডালে ও পাতায় ঘন হয়ে পড়েছে, দেমিয়ানকে ঢেকে দিয়েছে, আমার লোমের কোটের উপরেও জমেছে, গাছ থেকে ঝরে পড়ছে।

দেমিয়ানকে জাগিয়ে তুলে বরফ-জুতো পরে আমরা রওনা দিলাম। বনের মধ্যে সব চুপচাপ। নরম বরফের ভিতর দিয়ে চলতে আমাদের জুতোর শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না; তবে মাঝে মাঝে বরফের চাপে গাছগুলোর কট্-কট্ শব্দ বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। শুধু একবারই জীবন্ত প্রাণীর ডাক শুনতে পেলাম। আমাদের পাশেই খস্ খস্ শব্দ করে কি যেন ছুটে চলে গেল। নির্ঘাৎ ভালুক। কিন্তু যেখান থেকে শব্দটা এসেছিল সেখানে পৌঁছে দেখলাম খরগোসের পায়ের দাগ এবং

কয়েকটা আস্‌পেন চারাগাছের বাকলে দাঁতের দাগ। কয়েকটা খরগোস খেতে খেতে আমাদের পায়ের শব্দে চমকে উঠল।

আমরা রাস্তায় উঠে এলাম। বরফ-জুতোগুলো টানতে টানতে এগিয়ে চললাম। এখন হাঁটতে অনেক আরাম লাগছে। আমাদের বুটের নিচে বরফ সশব্দে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে; ঠাণ্ডা জমাট কুয়াশা দাড়ির মতো আমাদের মুখের উপর জমে উঠছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে তারাগুলো আমাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ছুটছে; কখনও ঝিক্‌মিক্‌ করছে, কখনও উধাও হয়ে যাচ্ছে; সারা আকাশটাই যেন এগিয়ে চলেছে।

পৌঁছে দেখি আমার বন্ধুটি ঘুমোচ্ছে। তাকে জাগিয়ে তুলে জানালাম যে আমরা ভালুকের খোঁজ পেয়েছি। সঙ্গী চাষীটিকে সকালেই "বীটার" যোগাড় করার হুকুম দিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে আমরা শুয়ে পড়লাম।

বন্ধু জাগিয়ে না দিলে গভীর ক্লান্তিতে আমি হয় তো মাঝরাত পর্যন্তই ঘুমিয়ে থাকতাম। লাফ দিয়ে উঠে দেখি, ইতিমধ্যেই পোশাক পরে সে বন্দুকটা নিয়ে কি যেন করছে।

"দেমিয়ান কোথায়?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"অনেক আগেই বনের মধ্যে চলে গেছে। তোমরা যে পথ ধরে গিয়েছিলে এর মধ্যে সে একবার সে-পথটা ঘুরে এসেছে। এখন 'বীটার'-দের খোঁজে গেছে।"

আমিও হাত-মুখ ধুয়ে পোশাক পরলাম; বন্দুকে গুলি ভরলাম; তারপর স্লেজে চেপে রওনা হলাম।

তখনও ঘন হয়ে বরফ পড়ছে। চারদিক নিস্তব্ধ। সূর্য দেখা যাচ্ছে না। মাথার উপরে ঘন কুয়াশা। জমাট বরফে সব কিছু ঢাকা।

প্রায় দু' মাইল পথ স্লেজ চালাবার পরে বনের কাছাকাছি পৌঁছে একটা ফাঁকা জায়গা থেকে ধোঁয়ার মেঘ উঠতে দেখলাম; তারপরই দেখা হলো স্ত্রী-পুরুষ মিলে একদল চাষীর সঙ্গে; তাদের প্রত্যেকের হাতেই মোটা লাঠি।

স্লেজ থেকে নেমে তাদের দিকে এগিয়ে গেলাম। পুরুষরা আলু সিদ্ধ করতে করতে মেয়েদের সঙ্গে হাসি-তামাশা করছে।

দেমিয়ানও সেখানেই ছিল। আমরা পৌঁছতেই লোকগুলি উঠে দাঁড়াল। দেমিয়ান তাদের নিয়ে গিয়ে পরস্পর দাঁড় করিয়ে দিলো। ত্রিশটি নারী ও পুরুষ একের পর এক সার বেঁধে এগিয়ে চলল। বরফ এত গভীর হয়ে পড়েছে যে তাদের কোমর থেকে উপরটাই আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। তারা বনের দিকে ঘুরে গেল, আর বন্ধু ও আমি তাদের পথ ধরলাম।

তাদের পায়ে-পায়ে একটা পথ পড়লেও হাঁটা বেশ শক্ত; কিন্তু অন্য দিকে পড়ে যাওয়াও শক্ত : আমরা যেন দুটো বরফের দেওয়ালের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি।

এই পথ ধরে প্রায় আধ মাইল চলবার পর হঠাৎ দেখি অন্য দিক থেকে দেমিয়ান

আসছে—বরফ-জুতো পায়ে আমাদের দিকে দৌড়তে দৌড়তে সে ইশারায় আমাদেরও তার সঙ্গে যোগ দিতে বলছে। তার কাছে এগিয়ে যেতেই সে জায়গাটার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমি যথাস্থানে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালাম।

আমার বাঁ দিকে লম্বা ফার গাছের সারি। তাদের গুঁড়ির মাঝখান দিয়ে একটা ভাল পথ চোখে পড়ল, আর গাছগুলোর পিছনে একজন "বীটার"-কেও দেখতে পেলাম। আমার সামনে মানুষ-সমান উঁচু ফার গাছের একটা ঝোপ; তার ডালপালাগুলো বরফের ভারে নুয়ে পড়ে পরস্পরের গায়ে জুড়ে গেছে। সেই ঝোপের ভিতর দিয়ে ঘন বরফে-ঢাকা একটা পথ ঠিক আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে এসে শেষ হয়েছে। ঝোপটা আমার ডান দিকে একটা ফাঁকা জায়গায় শেষ হয়েছে। সেখানে দেমিয়ান আমার বন্ধুকে জায়গামতো দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে।

বন্দুক দুটো ভাল করে দেখে নিয়ে কোথায় ঠিকমতো দাঁড়ানো যায় ভাবতে লাগলাম। আমার তিন-পা পিছনেই একটা লম্বা ফার গাছ ছিল।

ভাবলাম, "ওখানেই দাঁড়াব, তাহলে দ্বিতীয় বন্দুকটাকে ওই গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রাখতে পারব।" প্রতি পদক্ষেপে হাঁটু পর্যন্ত বরফে ডুবিয়ে গাছটার দিকে এগিয়ে গেলাম। পা দিয়ে বরফ সরিয়ে দাঁড়াবার মতো এক বর্গ গজ জায়গা পরিষ্কার করে নিলাম। একটা বন্দুক হাতে নিলাম; অপরটা গুলি-ভরা অবস্থায় গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে দিলাম। তারপর ছোরাটাকে খাপ থেকে খুলে আবার ভরে রাখলাম, যাতে দরকারের সময় সহজেই সেটাকে টেনে বের করা যায়।

সবে এই সব প্রস্তুতি শেষ করেছি এমন সময় বনের মধ্যে দেমিয়ান-এর গলা শুনতে পেলাম।

"সে আসছে! সে আসছে!"

তার গলা শুনে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে চাষীরা নানা সুরে জবাব দিলো।

"আসছে, আসছে, আসছে! আউ! আউ! আউ!" লোকগুলি চেঁচাতে লাগল।

উঁচু গলায় মেয়েরাও চিৎকার করে উঠল, "আই! আই! আই!"

ভালুকটা বৃত্তের মধ্যে পড়ে গেছে; দেমিয়ান তার দিকে এগিয়ে চলেছে আর চারদিক থেকে লোকগুলো চিৎকার করছে। ভালুকটা কখন আমাদের দিকে আসে তার জন্য অপেক্ষা করে শুধু আমার বন্ধু ও আমি নীরব, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কান পেতে সেদিকে তাকিয়ে আমার বুকের ভিতরটা প্রচণ্ডভাবে দপ্ দপ্ করতে লাগল। বন্দুকটা চেপে ধরে আমি কাঁপতে লাগলাম।

"এই—এই", আমি ভাবতে লাগলাম। "সে হঠাৎ হাজির হবে। আমি নিশানা ঠিক করে গুলি ছুঁড়ব, আর সে পড়ে যাবে—"

সহসা আমার বাঁ দিকে বেশ কিছুটা দূরে বরফের উপর কিসের যেন লাফিয়ে পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। লম্বা ফার গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে প্রায় পঞ্চাশ পা দূরে

গাছের গুঁড়িগুলোর পিছনে একটা বড় কালো কি যেন দেখতে পেলাম। নিশানা ঠিক করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভাবলাম :

"ওটা কি আরও কাছে আসবে না?"

সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলাম, সে কান দুটো নেড়ে মুখ ঘুরিয়ে পিছনে হটছে। আর সেই সময়েই তার পুরো শরীরটা আমার চোখে পড়ল। প্রকাণ্ড জানোয়ার। প্রচণ্ড উত্তেজনায় আমি গুলি ছুঁড়লাম, কিন্তু আমার বুলেটটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে একটা গাছে লাগল। ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে দৃষ্টি মেলে দেখলাম, ভালুকটা ছুটে বনের মধ্যে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'যা!" আমি ভাবলাম। "আমার সুযোগটা গেল। ওটা আর আমার দিকে ফিরে আসবে না। হয় আমার বন্ধু তাকে গুলি করবে, নয়ত সে বীটারদের ভিতর দিয়ে পালিয়ে যাবে। যে কোনও অবস্থাতেই সে আমাকে আর সুযোগ দেবে না।"

যা হোক, বন্দুকে গুলি ভরে আবার কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলাম। চারদিকে চাষীরা চেঁচাচ্ছে, কিন্তু ডান দিকে, আমার বন্ধু যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে বেশি দূরেও নয়, একটি স্ত্রীলোকের উন্মত্ত চিৎকার আমার কানে এল ·

"সে এখানে! সে এখানে! এখানে আসুন! এখানে আসুন! ওঃ! ওঃ! আই! আই!"

সে নিশ্চয় ভালুকটাকে দেখতে পেয়েছে। সেটাকে দেখবার আশা ছেড়ে দিয়ে আমি ডান দিকে তাকিয়ে ছিলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম, একটা লাঠি হাতে নিয়ে বরফ-জুতো ফেলে দিয়ে দেমিয়ান একটা সরু পথ ধরে বন্ধুর দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। তার পাশে হাঁটু ভেঙে বসে কোনও কিছুকে নিশানা করার ভঙ্গিতে সে তার লাঠিটা তুলে ধরল। আর তখনই আমার বন্দুকটা তুলে সেই একই দিকে নিশানা ঠিক করল। ক্র্যাক! সে গুলি ছুঁড়ল।

ভাবলাম, "ওই! বন্ধু সেটাকে মেরেছে।"

কিন্তু আমি দেখলাম, বন্ধু ভালুকটার দিকে দৌড়ে গেল না। তাহলে তার গুলিটাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, অথবা পুরোপুরি কার্যকরী হয়নি।

ভাবলাম, "ভালুকটা দূরে চলে যাবে। একবার চলে গেলে আর আমার দিকে আসবে না—কিন্তু ওটা কি?"

ঘূর্ণি-ঝড়ের মতো কি যেন আমার দিকে ছুটে আসছে; তার নাকের গর্‌গর্‌ শব্দ হচ্ছে; আমার একেবারে সামনে বরফ ছিটকে উঠল। সামনে তাকালাম: ভয়ে আত্মহারা ভালুকটা ঝোপের ভিতরকার পথ ধরে আমার দিকেই ছুটে আসছে। সেটা তখন দু'পা দূরেও নেই, আর আমি তার পুরো চেহারাটাই দেখতে পাচ্ছি—তার কালো বুক আর লালের ছোপ-লাগা প্রকাণ্ড মাথা। ওই তো বরফ ছিটকে ফেলতে ফেলতে সোজা আমার দিকে ছুটে আসছে। তার চোখ দেখে আমি বুঝতে পারলাম, সে আমাকে মোটেই দেখেনি, কিন্তু ভয়ে পাগলের মতো হয়ে অন্ধের মতো ছুটে

আসছে; যে গাছটার নিচে আমি দাঁড়িয়ে আছি সেটাই তার পথের লক্ষ্য। বন্দুক তুলে গুলি করলাম। সে আমার একেবারে উপরে এসে পড়েছে। বুঝতে পারলাম যে আমার গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। আমার বুলেটটা তাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে, সে আমার গুলির শব্দটাও শুনতে পায়নি, কিন্তু তবু সে ছুটে আসছে। বন্দুক নিচু করে প্রায় তার মাথায় লাগিয়ে আবার গুলি ছুঁড়লাম। ক্র্যাক! গুলি লেগেছে, কিন্তু সে মরেনি।

ভালুকটা মাথা তুলল; কান দুটো পিছনে নিয়ে দাঁত বের করে আমার দিকে ধেয়ে এল।

আমি দ্বিতীয় বন্দুকটার দিকে হাত বাড়ালাম; কিন্তু সেটাতে হাত দেবার আগেই সে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং এক ধাক্কায় আমাকে বরফের উপর ফেলে দিয়ে আমাকে পেরিয়ে চলে গেল।

"কপাল ভাল যে সে আমাকে ফেলে গেছে," আমি ভাবলাম।

আমি উঠতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কে যেন আমাকে চেপে ধরে উঠতে দিলো না। ধাক্কার বেগে ভালুকটা আমাকে পার হয়ে চলে গিয়েছিল, কিন্তু সে আবার ফিরে এসে শরীরের সমস্ত ভার নিয়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বুঝতে পারলাম যে একটা ভারী বোঝা আমাকে চেপে ধরেছে, আমার মুখের উপরটা গরম লাগছে, ধীরে ধীরে আমার গোটা মাথাটাই সে তার মুখের দিকে টেনে নিচ্ছে। আমার নাক ইতিমধ্যেই তার মুখের মধ্যে চলে গেছে; মুখের গরমটা বুঝতে পারছি; তার রক্তের গন্ধও পাচ্ছি। দুই থাবা দিয়ে সে আমার কাঁধকে চেপে ধরেছে; আমি নড়তেও পারছি না; সে চেষ্টা করছে আমার নাক ও চোখের উপর দাঁত বসিয়ে দিতে, আর নাক ও চোখকে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টায় আমি আমার মাথাটাকে তার মুখ থেকে দূরে আমার বুকের দিকে নামিয়ে নিচ্ছি। তারপরই আমি বুঝতে পারলাম, তার নিচের চোয়ালের দাঁত দিয়ে আমার চুলের ঠিক নিচে কপালটাকে এবং উপরের চোয়াল দিয়ে আমার চোখের নিচেকার মাংসটাকে সে চেপে ধরেছে। আমার মুখটাকে যেন ছুরি দিয়ে কাটা হচ্ছে। নিজেকে ছাড়াবার জন্য আমি ছটফট করতে লাগলাম, আর সে চর্বণরত কুকুরের মতো তাড়াতাড়ি চোয়াল দুটো একত্র করতে চেষ্টা করতে লাগল। অনেক কষ্টে আমার মুখটাকে সরিয়ে নিলাম, কিন্তু ভালুকটা আবার আমার মুখটাকে তার মুখের দিকে টানতে লাগল।

ভাবলাম, "এবার আমার শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে!"

তারপরই মনে হলো, বোঝাটা উঠে গেছে; চোখ তুলে দেখলাম সে সময় নেই। সে এক লাফে ছুটে চলে গেছে।

আমার বন্ধু ও দেমিয়ান যখন দেখল যে ভালুকটা আমাকে ফেলে দিয়ে বিপদে ফেলেছে তখন তারা আমাকে রক্ষা করতে ছুটে আসে। আমার বন্ধু তাড়াহুড়ায় ভুল করে চলতি পথ না ধরে গভীর বরফের ভিতর দিয়ে ছুটতে গিয়ে পড়ে যায়। সে

যখন বরফ থেকে উঠে আসতে চেষ্টা করতে থাকে ততক্ষণে ভালুকটা আমাকে কামড়াতে চেষ্টা করছে। দেমিয়ান-এর হাতে বন্দুক নেই, আছে শুধু একটা লাঠি, তাই নিয়ে ছুটতে ছুটতে সে চেঁচাতে লাগল :

"মনিবকে খেয়ে ফেলল। মনিবকে খেয়ে ফেলল!"

দৌড়তে দৌড়তেই সে ভালুকটাকে বলল :

"এই বোকারাম! কি করছিস? চলে যা! চলে যা!"

ভালুকটা তার কথা শুনল; আমাকে ছেড়ে দৌড়ে চলে গেল। আমি যখন উঠে দাঁড়ালাম তখন বরফের উপর এত রক্ত পড়েছিল যেন একটা ভেড়াকে কাটা হয়েছে এবং তার মাংস কেটে কেটে আমার চোখের সামনে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, যদিও তীব্র উত্তেজনার জন্য কোনও ব্যথাই আমি বোধ করিনি।

ততক্ষণে আমার বন্ধু এসে পড়ল; অন্য সকলেও সেখানে জড়ো হয়ে আমার ঘা পরীক্ষা করে তাতে বরফ লাগিয়ে দিলো। আমি কিন্তু ক্ষতের কথা ভুলে শুধু জিজ্ঞাসা করলাম : "ভালুকটা কোথায়? কোন্ দিকে গেল?"

হঠাৎ আমি শুনলাম :

"এই যে সে এখানে! সে এখানে!"

আমরা দেখলাম ভালুকটা আবার আমাদের দিকে দৌড়ে আসছে। আমরা বন্দুক তুলে নিলাম, কিন্তু কেউ গুলি করবার আগেই সে এক দৌড়ে আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। সে এখন হিংস্র হয়ে উঠেছে; আবার আমাকে কামড়াতেই এসেছিল, কিন্তু এতগুলি মানুষ দেখে ভয় পেয়েছে। তার পথের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার মাথা থেকে রক্ত পড়ছে। তাকে অনুসরণ করতে চাইলেও আমার ক্ষতের জন্য খুব যন্ত্রণা হওয়ায় অগত্যা একজন ডাক্তারের সন্ধানে আমরা শহরে গেলাম।

ডাক্তার রেশমী কাপড় দিয়ে ক্ষতস্থানগুলি বেঁধে দিলো এবং শীঘ্রই ঘা শুকিয়ে গেল।

এক মাস পরে সেই ভালুকটিকে শিকার করতে আমরা আবার গেলাম, কিন্তু সেটাকে শেষ করবার সুযোগ আমি পেলাম না। সে জলাভূমির ভিতর থেকে কিছুতেই বেরিয়ে এল না; সেখানেই ঘুরে ঘুরে গর্জন করে বেড়াতে লাগল।

দেমিয়ান তাকে মারল। আমার গুলিতে ভালুকটার নিচের চোয়াল ভেঙে গিয়েছিল, একটা দাঁত উপড়ে গিয়েছিল।

জানোয়ারটা ছিল প্রকাণ্ড, আর তার কালো লোমশ চামড়াটাও ছিল চমৎকার।

তার ভিতরে খড় ভর্তি করে তাকে এখন আমার ঘরে রেখে দিয়েছি। আমার কপালের ঘা-টা এত সুন্দরভাবে শুকিয়ে গেছে যে তার দাগটাও আর চোখে পড়ে না।

১৮৭২

মানুষ কী নিয়ে বাঁচে

What man live by

১

এক মুচি তার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে একজন চাষীর বাড়ির এক কোণে পড়ে থাকত। তার নিজের ঘর-বাড়ি জমি-জমা কিছুই ছিল না। মুচির কাজ করেই সে তার সংসার চালাত।

তখন রুটির দাম ছিল চড়া, আর মজুরি ছিল কম; কাজেই রুজি-রোজগার যা হতো দেখতে না দেখতেই ফুরিয়ে যেত।

মুচি আব তার স্ত্রী একটিমাত্র চামড়ার কোট ভাগাভাগি কবে গায়ে দিত। সে কোটটাব তখন জীর্ণ দশা। তাই সে একটা নতুন কোট করবার মতো ভেড়ার চামড়া কিনবার জন্য তৈরি হতে লাগল।

শীত পড়বাব মুখেই মুচির হাতে বেশ কিছু টাকা জমল . তাব স্ত্রীর ট্রাংকে জমল তিন রুবল, আর গাঁয়ের চাষীদের কাছে তার পাওনা হলো পাঁচ রুবল কুড়ি কোপেক।

একদিন সকালে মুচি তার বউয়ের সুতির জ্যাকেট পরল শার্টের উপর, তার উপর চড়াল তাব গরম কাফ্‌তান। তারপর তিন রুবল পকেটে ফেলে বেড়াবাব একটা লাঠি কেটে নিয়ে যাত্রা শুরু করল।

যেতে যেতে ভাবল : "চাষীদের কাছ থেকে আগে পাচ রুবল আদায় করব, তার সঙ্গে যোগ করব পকেটের তিন রুবল; আর তাই দিয়ে কিনব নতুন কোটের জন্য একটা ভেড়াব চামড়া।"

গাঁয়ে পৌঁছে প্রথমে গেল একজন চাষীর বাড়ি। চাষী তখন বাড়ি নেই। তাব বউ বলল, "এখন তো কিছু দিতে পারব না, তবে এক হপ্তার মধ্যে টাকা সমেত আমার স্বামীকে তোমাব কাছে পাঠিয়ে দেব।"

গেল আর একজন চাষীর কাছে। সে দিব্যি করে বলল, তার হাত একেবারে খালি; তবু জুতো সারানো বাবদ দেয় কুড়ি কোপেকের ছোট ঋণটা কোনও রকমে শোধ করে দেবে।

মুচি মনে মনে ভাবল, না-হয় ধারেই ভেড়ার চামড়াটা কেনা যাবে। কিন্তু চামড়ার দোকানির মুখে অন্য কথা। সে বলল, "পুরো টাকাটা দিয়ে পছন্দমতো চামড়া নিয়ে যাও। দেনা শোধ করা যে কী জিনিস সে আমি ভালই জানি।'

সারা সকাল ঘুরে জুতো সেলাই বাবদ কুড়ি কোপেক আব মেরামতের জন্য একজোড়া জুতো হাতে পাওয়া ছাড়া আর কিছুই তার কপালে জুটল না।

মুচির মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কুড়ি কোপেক দিয়ে মদ খেয়ে বাড়ির পথ ধরল।

সকালবেলা থেকেই তার বেশ শীত-শীত করছিল। কিন্তু এখন মদ খাবার পরে গরম কোট ছাড়াই শরীর বেশ গরম লাগছিল। এক হাতে লাঠি দিয়ে পথের বরফের টুকরোগুলোকে ঠুকতে ঠুকতে এবং অন্য হাতে মেরামতির জুতোজোড়া ফিতে ধরে ঝোলাতে ঝোলাতে পথ চলতে লাগল মুচি। আর নিজের মনেই বলতে লাগল :

"কোট ছাড়াই বেশ তো গরম লাগছে। খেয়েছি তো একটুখানি, তাতেই তো দেখছি শিরার ভিতর যেন খই ফুটছে। তবে আর ভেড়ার চামড়ার দরকারটা কী! সবকিছু ভুলে বেশ তো মজাসে চলেছি! এই তো চাই! শুধু-শুধু আজে-বাজে জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি কেন? বিনা কোটে বেশ তো চলে যায়। সারা জীবনেও আমার কোটের কোনও দরকার হবে না। অবশ্যি—বাড়িতে বউ আছে। সে আবার এই নিয়ে খিটিমিটি করবে। আচ্ছা, এও তো বড় লজ্জার কথা। তুমি একজনের কাজ করে দেবে আর সে তোমাকে কলা দেখাবে। ঠিক আছে, সবুর করো বাছাধন, এক সপ্তাহের মধ্যে যদি আমার টাকা না দিয়ে যাও, তাহলে তোমার মাথার টুপি আমি খুলে নেব। মজা মন্দ নয়! ওই আর একজন—কুড়ি কোপেক যেন আমাকে ভিক্ষা দিলেন! কুড়ি কোপেকে কী হবে? কিছুটা মদ গেলা যায়—এই পর্যন্ত। দিব্যি গেলে বলল, হাত একেবারে ফাঁকা। আমিও তো বলতে পারতাম, 'শুধু কি তোমার হাতই ফাঁকা? আমার হাত ফাঁকা নয়? তোমার তো ঘর-বাড়ি আছে, গরু-বাছুর আছে, সব আছে। আমার তো যা কিছু সব এই কাঁধে। তোমার খাবার তুমি ক্ষেতে ফলাও, আর আমাকে তা কিনতে হয়। ফি হপ্তায় তিন রুবলের তো রুটিই কিনতে হয়। তাও আবার কোনওদিন হয়ত বাড়ি ফিরে দেখি রুটি ফুরিয়ে গেছে; তখন আবার দেড় রুবলের ধাক্কা। কাজেই আমার যা পাওনা আমাকে দিয়ে দাও'।"

এমনিধারা ভাবতে ভাবতে মুচি চলেছে। রাস্তাটা মোড় ঘুরতেই একটা গির্জার কাছে এসে পৌঁছল সে। গির্জার গায়ে একটা সাদা-মতো কি যেন তার নজরে পড়ল।

তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। ভাল করে নজর করেও জিনিসটা যে কি তা সে ঠিক ঠাওর করতে পারল না। একবার ভাবল, "এ রকম কোনও পাথর তো ওখানে ছিল না! তবে কি ষাঁড়? সে রকমও তো মনে হয় না। দেখতে অনেকটা যেন মানুষের মতো; তবে সারাটা দেহ কেমন যেন সাদা। তাছাড়া, মানুষ ওখানে করবেই বা কী?"

আরও কাছে এগিয়ে সবটা পরিষ্কার দেখতে পেল। কী আশ্চর্য, গির্জার গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে একটা মানুষ। মৃতই হোক আর জীবিতই হোক, বসে আছে একেবারে উলঙ্গ আর নিশ্চুপ হয়ে।

মুচি ভয়ে শিউরে উঠল। ভাবল, "নিশ্চয় কেউ লোকটাকে খুন করে জামাকাপড় খুলে নিয়ে এখানে ফেলে গেছে। পালাই বাবা, কী কাজ এসব ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে!"

মুচি লোকটাকে পেরিয়ে গেল। গির্জার অপর দিকে পৌঁছতেই লোকটাকে আর

দেখা যাচ্ছে না। আরও খানিক এগিয়ে পিছন ফিরে চাইতেই দেখে, লোকটা যেন গির্জা থেকে সরে এসে নড়ছে, তার দিকে তাকিয়ে আছে।

মুচি আরও ভয় পেয়ে গেল। ভাবল, "ওর কাছে ফিরে যাব, না চলে যাব? যদি ফিরে যাই, কে জানে কোন্ ঝামেলায় পড়ব—লোকটা যে কে তাই বা কে জানে? ভাল হলে এভাবে আসবে কেন? কাছে গেলে যদি লাফিয়ে পড়ে গলা চেপে ধরে, ওর হাত থেকে ছাড়া পাওয়া শক্ত হবে। যদি তা নাও করে, সে তো আমার ঘাড়ে চাপবে। ওরকম একটা ন্যাংটো লোককে নিয়ে করবই বা কী? নিজের গায়ের যৎসামান্য জামা-কাপড় তো ওকে খুলে দিতে পারব না। ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন।"

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলো মুচি। কিছুদূর যেতে না যেতেই বিবেক তাকে খোঁচাতে শুরু করল। আপন মনেই বলতে লাগল : "কী করছ তুমি সাইমন? একটা মানুষ মরতে বসেছে, আর তুমি তাকে ভয় পাচ্ছ? তুমি কি এতই ধনী যে টাকা-পয়সা চুরি যাবার ভয় করছ? ধিক তোমাকে সাইমন, ধিক!"

সাইমন মুখ ঘুরিয়ে লোকটার দিকে এগিয়ে চলল।

২

কাছে গিয়ে খুব ভাল করে তাকাল সাইমন। লোকটি যুবক, দেখতে স্বাস্থ্যবান, শরীরের কোথাও আঘাতের চিহ্ন নেই, কিন্তু শীতে যেন জমে যাচ্ছে, যেন খুব ভয় পেয়েছে ঃ কোনওরকমে হেলান দিয়ে বসে আছে, এমনকি সাইমনের দিকেও তাকাচ্ছে না, যেন দুটো চোখ তুলে তাকাবার ক্ষমতাও তার নেই।

সাইমন কাছে যেতেই, যেন এইমাত্র তাকে প্রথম দেখছে এমনিভাবে লোকটা সহসা মাথা ঘুরিয়ে দুই চোখ মেলে সাইমনের দিকে তাকাল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সাইমনেরও যেন লোকটিকে বড় ভাল লাগল। বুটজোড়া মাটিতে রেখে কোমরের বেল্ট খুলে তার উপর রাখল। খুলে ফেলল গায়ের কোট।

বলল, "কথা পরে বলবে। আগে জামাটা পরে নাও। এক্ষুণি। এই নাও।"

লোকটার কনুই ধরে সাইমন তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। উঠে দাঁড়াল লোকটা। সাইমন দেখল, একটি একহারা পরিচ্ছন্ন দেহ, সুডৌল হাত-পা, মিষ্টি একখানি মুখ। মুচি তার কোটটা লোকটির গলায় জড়িয়ে দিলো, কিন্তু সে ঠিক হাতার মধ্যে তার হাত দু'খানি ঢোকাতে পারল না। সাইমন ঠিকমতো হাত ঢুকিয়ে তাকে কোটটা পরিয়ে দিয়ে বেল্ট এঁটে দিলো। তারপর মাথার টুপিটা খুলে লোকটার মাথায় পরিয়ে দেবার উপক্রম করতেই তার নিজের মাথাটাই বেশ ঠাণ্ডা লাগতে লাগল। সে ভাবল, "আমার মাথাটা তো টাকে ভরা, আর ওর মাথা-ভরা কোঁকড়া চুল।" তাই সাইমন টুপিটা আবার নিজের মাথায় বসিয়ে দিলো।

"ওকে বরং বুটজোড়া দিই।" সাইমন বসে পড়ে বুটজোড়া তাকে পরিয়ে দিলো।

জামা-জুতো পরিয়ে মুচি বলল, "এই তো ঠিক হয়েছে ভাই, এইবার হাঁট, শরীরটাকে গরম করে নাও। হাঁটতে পারবে তো?"

উঠে দাঁড়িয়ে লোকটি সাইমনের দিকে তাকাল, কিন্তু কোনও কথা বলতে পারল না।

"আরে, কথা বলছ না কেন? সারা শীতকালটা তো এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। আমাকে তো বাড়ি পৌছতে হবে। নাও, এস, আর যদি দুর্বল বোধ করো আমার লাঠিটায় ভর দাও। পা-টা একটু ঝেড়ে নাও।"

লোকটি হাঁটতে শুরু করল। অনায়াসেই হাঁটতে লাগল। একটুও পিছিয়ে রইল না।

পথে যেতে যেতে সাইমন বলল, "তুমি কোথায় থাকো বলো?"

"এ অঞ্চলে নয়।"

"সে তো জানি। এ অঞ্চলের সব লোককে আমি চিনি। কিন্তু ওই গির্জের কাছে তুমি এলে কী করে?"

"বলতে পারব না।"

"কেউ তোমাকে মেরেছিল বলে মনে হচ্ছে?"

"কেউ আমাকে মারেনি। ঈশ্বর শাস্তি দিয়েছেন।"

"ঈশ্বর সব জায়গাতেই আছেন, সে তো সকলেই জানে। সেইরকম তোমারও তো একটা আস্তানা কোথাও আছে। তুমি কোথায় যাবে?"

"আমার কাছে সব জায়গাই সমান।"

সাইমন বিস্মিত হলো। লোকটি উদ্ধত নয়, তার কথাগুলি শান্ত, কিন্তু নিজের সম্পর্কে কিছুই সে বলতে চায় না। সাইমন ভাবল, "কত কিছুই তো আমরা বুঝি না।" তারপর লোকটিকে বলল :

"ঠিক আছে, নিজের আস্তানায় যাবার আগে তুমি আমার বাড়িতেই চলো!"

সাইমন হাঁটতে লাগল। লোকটিও তার পাশে-পাশেই চলল।

বাতাস উঠল। সাইমনের শার্টের ভিতর ঢুকতে লাগল। মদের গরম কেটে গিয়ে বেশ শীত করছে। যেতে যেতেই সে হাঁচতে লাগল। স্ত্রীর জ্যাকেটটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে ভাবতে লাগল : "ভেড়ার চামড়া আমাকে কোথায় টেনে এনেছে! বেরিয়েছিলাম ভেড়ার চামড়ার খোঁজে, আর ফিরছি যখন তখন নিজের কোটটাও গায়ে নেই, উপরন্তু একটা ন্যাংটো লোককে নিয়ে চলেছি সঙ্গে করে। মাত্রোনা আমাকে ছেড়ে কথা কইবে না!"

শেষের কথাটা মনে হতেই সাইমন ভীত হয়ে পড়ল। তবু লোকটির দিকে তাকাতেই তার মনে পড়ে গেল গির্জের কাছে তার সেই চাউনির কথা। সঙ্গে সঙ্গে মনটা খুশিতে ভরে উঠল।

৩

সাইমনের বউ সকাল-সকাল সব কাজকর্ম শেষ করে ফেলেছে। জ্বালানির কাঠ কেটেছে, জল এনেছে, ছেলেকে খাইয়েছে, নিজেও একটু মুখে দিয়েছে, তারপর বসে ভাবছে, কখন রুটি বানাবে : আজ না কাল? পাঁউরুটির উপরেব পুরু ছালটা তো এখনও আছে। সে ভাবল, "সাইমন যদি দুপুরের খাবারটা খেয়ে থাকে, রাতে আর বেশি কিছু খাবে না। তাহলে যে রুটি আছে কাল চলে যাবে।"

রুটির টুকরোটা ঘোরাতে ঘোরাতে মাত্রোনা ভাবল : "আজ আর রুটি বানাচ্ছি না। যা ময়দা আছে তাতে আর একখানি মাত্র পাঁউরুটি হবে। সেটা দিয়ে শুক্রবার চালিয়ে দেব।"

রুটিটা একপাশে সরিয়ে রেখে মাত্রোনা টেবিলে বসে স্বামীর শার্টের ফুটো সেলাই করতে লাগল। সেলাই করতে করতে সে স্বামীর কথাই ভাবতে লাগল; ভাবতে লাগল তাব চামড়া কেনার কথা।

"চামড়াব দোকানি তাকে না ঠকালে বাঁচি। লোকটা আবার সোজা সরল! নিজে সে কাউকে ঠকাবে না, কিন্তু একটা ছোট ছেলেও তাকে বোকা বানাতে পারে। আট রুবল তো চাট্টিখানি কথা নয়। তা দিয়ে খুব ভাল ভেড়ার চামড়াব কোট কেনা যায়। ট্যান-করা চামড়া না হলেও মোটামুটি ভাল কোটই হবে। একটা কোটের অভাবে গত শীতে বড়ই কষ্ট গেছে। নদীতে যেতে পারি না, কোথাও বেরোতে পারি না। লোকটা যখন সব কিছু গায়ে চড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত, আমাব তো গায়ে দেবাব কিছুই থাকত না। আজ যদিও খুব সকালে বেরোয়নি, তবু এতক্ষণ তো তার ফিরে আসা উচিত। জানি না আবার কোথাও মজা লুটতে বসেছেন কি না!"

মাত্রোনা যখন এইসব ভাবছে তখন সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল, কেউ যেন বাড়িতে ঢুকল। সেলাইযেব ভিতব সুঁচটা আটকে রেখে মাত্রোনা বাইরে মুখ বাড়াল। আবে—এ যে দু'জন বাড়িতে ঢুকছে—সাইমন, আর তার সঙ্গে একটি অপরিচিত মানুষ! মাথায় টুপি নেই, পায়ে ভারী বুট।

সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর মুখে ভদ্‌কার গন্ধ পেল সে। তাহলে তো মজা লুটেই এসেছেন! তার উপর এতক্ষণে নজরে পড়ল তার গায়ে কোটটাও নেই, আছে শুধু তারই জ্যাকেটটা। হাতেও কিছু নেই; তাই মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

মাত্রোনার বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল। সে ভাবল, "এ তো মদ খেয়ে সব টাকা উড়িয়ে এসেছে। এই বাজে লোকটার সঙ্গে ফুর্তি-ফার্তা করে তাকে বাড়ি অবধি নিয়ে এসেছে।"

মাত্রোনার সামনে দিয়েই তারা ঘরে ঢুকল। ভাল করে সে দেখতে পেল আগন্তুক লোকটিকে। একটি হ্যাংলা চেহারাব যুবক, গায়ে তাদেবই কোট, মাথায় টুপি নেই। কোটের নিচে শার্টও নেই। ভিতরে ঢুকে লোকটি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল, একটুও

নড়ল না, চোখ তুলে তাকালও না। মাত্রোনা ভাবল লোকটা নিশ্চয় খারাপ, তাই ভয় পেয়েছে।

মাত্রোনা ভুরু কুঁচকে স্টোভের দিকে এগিয়ে গেল। দেখতে লাগল ওরা কী করে।

সাইমন টুপি খুলে বেঞ্চিটার উপর বসল, যেন কিছুই হয়নি। বলল, "আরে মাত্রোনা, রাতের খাবারটা বানাও।"

মাত্রোনা অস্ফুটভাবে কি যেন বলে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দু'জনকে দেখতে লাগল। সাইমন বুঝল বউয়ের মেজাজ বিগড়েছে, কিন্তু কিছু তো করবার নেই। আগন্তুকের হাত ধরে সে বলল, "এস ভাই, এইখানে বসো, কিছু খাওয়া যাক।"

আগন্তুক সাইমনের পাশে বেঞ্চিটাতে বসল। সাইমন উঠে গিয়ে বউকে বলল, "কি রান্না করেছ বলো?"

মাত্রোনা রাগে ফেটে পড়ল : "রান্না করেছি, কিন্তু তোমার জন্যে না। মদ খেয়ে তো বুদ্ধিসুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। গেলে কোট কিনতে, ফিরে এলে নিজের কোটটাও খুইয়ে। আবার একটা ন্যাংটো রাস্তার লোককে ধরে এনেছ সঙ্গে করে। তোমাদের মতো মাতালদের জন্য আমি রান্না করিনি।"

"দেখো মাত্রোনা, অকারণে বক-বক করো না। আগে শোনো লোকটা কেমন..."

"আগে বলো, টাকা কী করেছ।"

সাইমন কোটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে নোট বের করে দেখাল।

"এই দেখো টাকা। ত্রিফোনফ্ টাকা দেয়নি, কাল দেবে বলেছে।"

মাত্রোনার রাগ আরও চড়ে গেল। কোট তো আনেইনি, আবার তাদের একটিমাত্র কোট খয়রাত করেছে একটা ন্যাংটো লোককে। তাকে বাড়ি অবধি নিয়ে এসেছে।

টেবিলের উপর থেকে টাকাটা ছোঁ মেরে নিয়ে লুকিয়ে রাখতে রাখতে সে বলল, "কিচ্ছু খাবার নেই; যত রাজ্যের ন্যাংটো মাতালদের আমি খাওয়াতে পারব না।"

"আঃ মাত্রোনা, চুপ করো! আগে শোনো লোকটা কে..."

"একটা বোকা মাতালের কথা আবার কী শুনব! সাধে কি আর তোমার মতো একটা মাতালকে বিয়ে করতে আমি গররাজি হয়েছিলাম! মা যা কিছু জামা-কাপড় দিয়েছিল সব তুমি মদে উড়িয়েছ। গেলে চামড়া কিনতে, তাও মদ খেয়ে উড়িয়ে দিলে।"

সাইমন বউকে বোঝাতে চাইল যে সে মাত্র কুড়ি কোপেকের মদ খেয়েছে, আর সে লোকটাকে কী অবস্থায় পেয়েছে,—কিন্তু এই কথা বলবার আগে বউ তাকে দশ কথা শুনিয়ে দিলো। ক্রমে দশ বছর আগে যা ঘটেছিল সে-সব কথাও এসে পড়ল।

বক্-বক্ করতে করতে একসময় মাত্রোনা সাইমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জামার আস্তিন চেপে ধরে বলে উঠল, "শিগ্গির আমার জ্যাকেট দাও! ওটাই তো আমার একমাত্র সম্বল, তাও তুমি নিয়ে নিয়েছ নিজে গায়ে দেবে বলে। এক্ষুণি ফিরিয়ে দাও, মাতাল কুকুর কোথাকার! তারপর জাহান্নামে যাও!"

সাইমন জ্যাকেটটা খুলতে চেষ্টা কবতেই মাত্রোনা সেটা ধরে দিলো টান। ফলে তার সেলাই গেল ছিঁড়ে। সেটাকে টেনে নিয়ে নিজের মাথায় জড়িয়ে মাত্রোনা দরজার দিকে পা বাড়াল।

হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। তার মনে হলো, রাগ দমন করা দরকার; এ লোকটা কে তাও জানা দরকার।

৪

মাত্রোনা থামল; বলল, "লোকটা যদি ভালই হবে তাহলে সে এমন ন্যাংটো হতো না যে গায়ে দেবার একটা শার্টও জোটেনি। আর তুমি যদি ভালভাবেই ছিলে সারাদিন তাহলে এই স্যাঙাৎকে কোত্থেকে জুটিয়েছ সেকথা এতক্ষণ আমাকে খুলে বলতে।"

সাইমন বলল, "বেশ তো, এখুনি সব বলছি। আমি হেঁটে আসছিলাম; দেখি গির্জার পাশে লোকটি বসে আছে; গায়ে কিছু নেই, শীতে জমে গেছে। ভেবে দেখো, লোকটি একেবারে উলঙ্গ, আর এটা গরমি কাল নয়। ঈশ্বরই আমাকে ওর কাছে পাঠিয়েছিলেন, নইলে সে নির্ঘাত মারা যেত। বলো, তখন আমি কী করি? কোনও কিছুই তো অকারণে ঘটে না। আমি তাকে হাত ধরে তুললাম, জামা-জুতো পরালাম, এখানে নিয়ে এলাম। মনটাকে একটু নরম করো মাত্রোনা; এ রকম করা পাপ। মনে রেখো, আমরাও একদিন মরব।"

মাত্রোনা আবার বকুনি দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় আগন্তুকের দিকে তার চোখ পড়ল। সে চুপ করে গেল। আগন্তুক তখনও বেঞ্চির এক কোণে চুপ করে বসে আছে। দু'খানি হাত রেখেছে হাঁটুর উপর, মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে বুকের উপর। চোখ দুটি বুজে আছে, ভুরু দুটো কুঁচকে আছে, যেন ভিতর থেকে কোনও কিছু তাকে আঘাত করছে।

মাত্রোনা চুপ করে গেল।

সাইমন বলল, "মাত্রোনা, তোমার মধ্যে কি ঈশ্বর নেই?"

এই কথা শুনে মাত্রোনা আবার আগন্তুকের দিকে চাইল। সহসা তার মনটা গলে গেল। দরজার কাছ থেকে সরে সে স্টোভের কাছে গেল। খাবার তৈরি করল। টেবিলের উপর একটি ছোট বাটি রেখে তাতে কবাস ঢালল, রুটির শেষ টুকরোটা এনে দিলো, তারপর দু'জনের দিকে কাঁটা-চামচ এগিয়ে দিলো।

"এবার খাও", সে বলল।

সাইমন আগন্তুককে টেবিলে ডেকে নিলো।

"বসো হে ভাল মানুষ" সে বলল।

সাইমন রুটি কেটে খেতে শুরু করল। মাত্রোনা টেবিলের এক পাশে দাঁড়িয়ে আগন্তুককে দেখতে লাগল। বেচারির জন্য এবার দুঃখ হলো তার। তাকে যেন ভালও লাগছে এখন।

সহসা আগন্তুকও যেন খুশি হয়ে উঠল। থেমে গেল তার ভুরুর কোঁচকানি। মাত্রোনার দিকে দু'চোখ তুলে তাকিয়ে সে হেসে ফেলল।

খাওয়া হয়ে গেল। টেবিল পরিষ্কার করে মাত্রোনা আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করল ঃ "তুমি কোত্থেকে আসছ?"

"এ অঞ্চল থেকে নয়।"

"রাস্তার ধারে এলে কেমন করে?"

"বলতে পারি না।"

"তোমার সব কিছু চুরি করেছিল কে?"

"ঈশ্বর আমাকে শাস্তি দিয়েছিলেন।"

"তাই কি তুমি ন্যাংটো হয়ে সেখানে পড়ে ছিলে?"

"তাই আমি সেখানে পড়ে ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছিলাম। সাইমন আমাকে দেখতে পেল; তার দয়া হলো, কোট খুলে আমাকে পরিয়ে দিলো। এখানে আসতে বলল। এখানে এলে তুমি আমাকে খাদ্য দিলে, পানীয় দিলে, আমাকে দয়া করলে। ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করুন।"

মাত্রোনা উঠে দাঁড়াল। সাইমনের যে শার্টটা সে সেলাই করছিল সেটা জানালার তাক থেকে তুলে নিয়ে আগন্তুককে দিলো। খুঁজে-পেতে একটা ট্রাউজারও এনে দিলো।

"তোমার তো শার্ট নেই। এইগুলো পরে ঐ তাকের উপরে বা স্টোভের উপরে যেখানে খুশি শুয়ে পড়ো।"

আগন্তুক গায়ের কোটটা খুলে শার্ট ও ট্রাউজার পরে তাকের উপরে শুয়ে পড়ল। মাত্রোনা বাতি নিভিয়ে দিয়ে কোটটা নিয়ে স্বামীর পাশে শুয়ে পড়ল। কোটের একটা কোণ দিয়ে শরীরটাকে ঢাকলেও তার চোখে ঘুম এল না। আগন্তুকের চিন্তা তার মন থেকে কিছুতেই গেল না।

তার মনে পড়ল রুটির শেষ টুকরোটাও তারা খেয়ে ফেলেছে। কালকের জন্য কিছুই নেই; মনে পড়ল, শার্ট আর ট্রাউজার দুটোই সে দান করেছে। অমনি তার মন খারাপ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল আগন্তুকের হাসিটি; অমনি আবার মন খুশি হলো।

মাত্রোনা অনেকক্ষণ জেগে রইল। একসময় তার খেয়াল হলো সাইমনও ঘুমোয়নি, কোটটা সে নিজের গায়ে টেনে নিয়েছে।

"সাইমন!"

"উঁ!"

"রুটির শেষ টুকরোটাও আমরা খেয়ে ফেলেছি। কালকের জন্য কিছু বানিয়েও রাখিনি। কাল কী হবে আমি জানি না। প্রতিবেশী মার্লানাইয়ার কাছে কিছু ধার চাইতে হবে।"

"আমরা বেঁচেই থাকব; খেতেও পাব।"

বউটি চুপ করে রইল।

"যাই হোক, লোকটি নিশ্চয়ই ভাল; তবে নিজের সম্বন্ধে কিছুই বলে না এই যা।"

"কথা বলার তার দরকার নেই।"

"সাইমন।"

"উঁ!"

"আমরা তো দিলাম, কিন্তু আমাদের কেউ কিছু দেয় না কেন?"

কী জবাব দেবে সাইমন জানে না। সে বলল, "পরে কথা হবে।"

সে পাশ ফিবে ঘুমিয়ে পড়ল।

৫

পরদিন সকালে সাইমনের ঘুম ভাঙল। ছেলেমেয়েরা তখনও ঘুমুচ্ছে। বউ গেছে প্রতিবেশীর বাড়ি রুটি কর্জ করতে। পুরোনো ট্রাউজার আর শার্ট পরে আগন্তুক উপরের দিকে তাকিয়ে বেঞ্চিতে বসে আছে। তার মুখখানি আজ কালকের চাইতেও উজ্জ্বল।

সাইমন বলল, "দেখো ভাই, পেট চায় খাবাব, আব শরীর চায় জামা-কাপড়। প্রত্যেককেই উপার্জন করতে হবে। তুমি কী কাজ জানো?"

"আমি কিছুই জানি না।"

সাইমন বিস্মিত হয়ে বলল, "ইচ্ছা থাকলে মানুষ সব কিছু শিখতে পারে।"

"মানুষ কাজ করে; আমিও কাজ করব।"

"তোমার নাম কী?"

"মিখাইল।"

"দেখো মিখাইল, নিজের সম্পর্কে তুমি কিছুই বলতে চাও না, সে তোমার খুশি। কিন্তু উপার্জন তো তোমাকে করতেই হবে। আমি যা কাজ দিই তা করবে। তাহলে আমি তোমাকে খেতে দেব।"

"ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন। নিশ্চয়ই শিখব। বলে দাও কী করতে হবে।"

সাইমন একটা সুতো নিয়ে আঙুলে পাক দিয়ে একটা গিঁট তৈরি করল।

"তুমি দেখো, কাজটা খুব শক্ত নয়..."

মিখাইল দেখল, সুতোটা নিয়ে আঙুলে পাক দিলো: দেখতে দেখতে একটা গিঁটও দিয়ে ফেলল।

সাইমন দেখিয়ে দিলো কেমন করে সেলাই করতে হয়। মিখাইল বেশ তাড়াতাড়ি সেটা রপ্ত করে নিল। মোটা সুতো দিয়ে কী করে সেলাই করতে হয় মিখাইল তাও শিখে ফেলল।

সাইমন যা কিছু দেখায় তাই সে শিখে ফেলে। তিন দিনের দিন থেকে সে এমনভাবে সেলাইয়ের কাজ করতে লাগল যেন সারা জীবন সে সেলাই করে আসছে। তার কাজে কখনও ভুল হয় না। সে খায়ও কম। শুধু মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম নেয়, আর সেই সময়টা আকাশের দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকে। কখনও সে ঘর ছেড়ে বাইরে যায় না; একটি বাজে কথা বলে না; হাসিঠাট্টাও করে না।

প্রথম দিন সন্ধ্যায় মাত্রোনা যখন তার জন্যে খাবার তৈরি করছিল কেবলমাত্র সেই দিন তারা তাকে একবার হাসতে দেখেছিল।

৬

দিন যায়, সপ্তাহ যায়, বছরও কেটে গেল। মিখাইল সাইমনের বাড়িতেই আছে, তার কাজই করছে। মিখাইলের নাম ছড়িয়ে পড়ল : তার মতো সুন্দর আর মজবুত জুতো আর কেউ সেলাই করতে পারে না। সারা জেলার লোক জুতোর জন্য সাইমনের বাড়ি আসতে লাগল। তার বরাত ফিরে গেল।

একদিন শীতকালে সাইমন বসে মিখাইলের সঙ্গে কাজ করছে এমন সময় তিন-ঘোড়ার একখানি স্লেজগাড়ি তার কুঁড়ের দরজায় এসে দাঁড়াল। মিখাইল ও সাইমন জানলা দিয়ে তাকাল: স্লেজখানি তার ঘরের সামনেই দাঁড়িয়েছে। একটি ছোট ছেলে কোচয়ানের আসন থেকে লাফ দিয়ে নেমে গাড়ির দরজা খুলে দিলো। ফার কোট গায়ে দিয়ে একজন ভদ্রলোক স্লেজ থেকে নামলেন। নেমে সাইমনের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। মাত্রোনা ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলো। মাথা নিচু করে তিনি ঘরে ঢুকলেন। আবার যখন মাথা উঁচু করলেন তখন মাথা প্রায় ছাদ ছোঁয়-ছোঁয়। ঘরের একটা কোণই তিনি দখল করে ফেললেন প্রায়।

সাইমন উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। হাঁ করে ভদ্রলোককে দেখতে লাগল। এরকম মানুষ সে এর আগে আর কখনও দেখেনি। সাইমন নিজে রোগা, মিখাইলও তাই, মাত্রোনা তো একগাছি শুকনো লাঠির মতো দেখতে। কিন্তু ইনি—যেন অন্য জগতের লোক; ফোলা ফোলা গাল মুখ, ষাঁড়ের মতো ঘাড়, ঢালাই লোহা দিয়ে গড়া দেহ।

ভদ্রলোক হাঁপাতে লাগলেন। গায়ের কোট খুলে বেঞ্চিতে বসে বললেন, "বড় মুচি কে?"

সাইমন সামনে এগিয়ে বলল, "আজ্ঞে আমি।"

ভদ্রলোক চাকরটাকে চেঁচিয়ে বললেন, "এই ফেড্‌কা, চামড়াটা নিয়ে আয়।"

ছেলেটা দৌড়ে একটা বান্ডিল নিয়ে এল। ভদ্রলোক বান্ডিলটা নিয়ে টেবিলের উপর রাখলেন।

"এটা খোল্।" তিনি বললেন। ছেলেটা বান্ডিলটা খুলে ফেলল।

চামড়াটা দেখিয়ে ভদ্রলোক সাইমনকে বললেন, "দেখো মুচি, বেশ মন দিয়ে শোনো। এটা দেখতে পাচ্ছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"জিনিসটা কেমন ঠিক বুঝতে পারছ?"

সাইমন হাত দিয়ে ছুঁয়ে বলল, "ভাল চামড়া।"

"ভালই বটে! বোকারাম, এমন চামড়া তুমি জীবনে দেখোনি। এটা জার্মানির জিনিস; দাম কুড়ি রুবল।"

সাইমন ভয় পেয়ে বলল, "এমন জিনিস আমবা কোথায় দেখব!"

"সে যাহোক, এই চামড়া দিয়ে তুমি আমাকে নতুন জুতো তৈরি করে দিতে পারবে কি?"

"আজ্ঞে পারব।"

ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন, "শুধু পারব বললেই হলো না। কী জিনিস সেলাই করতে হবে বুঝতে পারছ কি? আমাকে এমন জুতো তৈরি কবে দিতে হবে যা এক বছরের মধ্যে ছিঁড়বে না, কুঁচকাবে না, বা সেলাই খুলে যাবে না। যদি পার, চামড়াটা নিয়ে কাটাকুটি করো; যদি না পারো নিয়ো না, কেটোও না। আমি আগেই বলে রাখছি, এক বছরের আগে যদি জুতোব সেলাই ছেঁড়ে বা জুতো দুমড়ে যায়, আমি তোমাকে জেলে দেব! আর এক বছরের মধ্যে যদি না ছেঁড়ে বা না কুঁচকে যায়, তাহলে তোমাকে মজুবি দেব দশ রুবল।"

সাইমন ভয় পেয়ে গেল। কী যে বলবে বুঝতে পারছে না। মিখাইলের দিকে তাকিয়ে তাকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে ফিস্‌ফিস্ কবে বলল, "ভাই, কী কবি?"

মিখাইল মাথা নেড়ে বলল, "কাজটা নিয়ে নিন।"

মিখাইলের কথামতো সাইমন এমন জুতো তৈবি করতে রাজি হলো যা এক বছরের মধ্যে কুঁচকাবে না বা ছিঁড়বে না।

ভদ্রলোক চাকরটাকে চেঁচিয়ে ডেকে বাঁ পায়ের বুট খুলতে বললেন। তারপর পা-টা বাড়িয়ে দিলেন।

"মাপ নাও।"

সাইমন আঠারো ইঞ্চি লম্বা একখানা কাগজ সেলাই করে সেটা বেশ ভাল কবে মুছে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল। ভদ্রলোকের মোজা যাতে নোংরা না হয় সেজন্যে অ্যাপ্রনে হাত দুটো ভাল করে মুছে নিল। তারপর মাপ নিতে আরম্ভ করল। পায়ের তলা মাপল, পাতার উপরটা মাপল, তারপর পায়ের গুলি মাপাতে গেল। কিন্তু কাগজটা ততদূর পৌঁছল না। সেই বিরাট চরণের গুলিটা একটা গাছের গুঁড়ির মতো।

"দেখো যেন পায়ে না লাগে।"

সাইমন আর-এক টুকরো কাগজ জোড়া দিতে লাগল। ভদ্রলোক বসে মোজার মধ্যেই আঙুল নাড়তে লাগলেন। বাইরে তখন অনেক লোক উঁকি-ঝুঁকি মারছে।

ভদ্রলোকের নজর পড়ল মিখাইলের উপর।

"ও কে? ও কি তোমার লোক?"

"ও আমার কারিগর। ও-ই তো জুতো সেলাই করবে।"

ভদ্রলোক মিখাইলকে বললেন, "দেখো হে, মনে রেখো এমনভাবে সেলাই করতে হবে যেন এক বছরের মধ্যে কিছু না হয়।"

সাইমন মিখাইলের দিকে তাকাল। সে দেখল, মিখাইল ভদ্রলোকের দিকে না তাকিয়ে তাঁর পিছনের ঘরের কোণে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ সে মৃদু হেসে উঠল আর তার সারা শরীর ঝলমল করে উঠল।

"হাঁ করে দেখছ কী বোকারাম? বরং নজর রেখো জুতো যেন ঠিক সময় তৈরি হয়।"

মিখাইল বলল, "ঠিক যে সময়ে দরকার হবে তখনি তৈরি পাবেন।"

"তাহলেই হলো।"

বুট পায়ে দিয়ে ফার কোট গায়ে দিয়ে ভদ্রলোক দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু মাথা নিচু করতে ভুল হওয়ায় তাঁর মাথাটা লিন্টেলের সঙ্গে ঠোক্কর খেল।

একটা শাপ-মন্যি করে মাথা ঘষতে ঘষতে ভদ্রলোক স্লেজে চেপে চলে গেলেন।

যাবার পরে সাইমন বলল, "ব্যাটা যেন পাহাড়। হাতুড়ি পিটেও তুমি ওকে মারতে পারবে না! মাথায় লেগে দরজাটা জখম হলো, কিন্তু ওর কিছুই হলো না।"

মাত্রোনা বলল, "ওদের যেমন জীবন তাতে শক্ত-পোক্ত তো হবেই! এ রকম লোহার মানুষকে মৃত্যুও ছুঁতে পারে না।"

৭

সাইমন মিখাইলকে বলল :

"কাজটা যখন নিয়েছি, দেখো যেন কোনওরকম গোলমালে না পড়ি। চামড়াটা দামী, ভদ্রলোকও বদমেজাজী। দেখতে হবে যাতে কোনও ভুল না হয়। দেখো, তোমার নজর আমার চাইতে সূক্ষ্ম। আর তোমার হাতও এখন আমার হাতের চেয়ে পাকা। মাপজোপগুলো নিয়ে চামড়াটা তুমিই কাটো, আমি বরং উপরের চামড়াটা সেলাই করব।"

সেই কথামতো মিখাইল ভদ্রলোকের চামড়াটা নিয়ে টেবিলের উপরে পাতল। দুই ভাঁজ করে কাঁচি নিয়ে কাটতে শুরু করল।

ঘরে ঢুকল মাত্রোনা। মিখাইলের চামড়া কাটা দেখে সে অবাক হয়ে গেল। মুচির কাজ মাত্রোনাও ভালই বোঝে। সে দেখল মিখাইল চামড়াটা বুটের মতো করে না কেটে গোল গোল টুকরো করে কাটছে। কিছু বলতে গিয়েও মাত্রোনা ভাবল : "হয়ত ভদ্রলোকদের বুট কেমন করে বানায় আমি জানি না। মিখাইল নিশ্চয় আমার থেকে ভাল জানে। কাজেই আমার কিছু না বলাই ভাল।"

কাটা শেষ করে মিখাইল সুতো নিয়ে সেলাই করতে শুরু করল,—বুট-জুতোর জন্য দরকার জোড়া সুতোর বদলে চটিজুতোর মতো একটা সুতো দিয়ে।

মাত্রোনা আবারও অবাক হয়ে গেল। কিন্তু এবারও সে কিছু বলল না। মিখাইল সেলাই করেই চলল।

বেলা দুপুর হলে সাইমন উঠে দাঁড়িয়ে চোখ ফেরাল। একি! ভদ্রলোকের চামড়াটা দিয়ে মিখাইল যে একজোড়া চটি তৈরি করে ফেলেছে!

সাইমন আর্তনাদ করে উঠল। ভাবল, "আজ এক বছর মিখাইল এখানে আছে, কোনওদিন একটা ভুল করেনি, আজ সে এমন মারাত্মক ভুল কেমন করে করল? ভদ্রলোক অর্ডার দিয়ে গেলেন উঁচু বুটের, আর ও তৈরি করে বসেছে চটিজুতো! চামড়াটাকেই যে নষ্ট করেছে! ভদ্রলোককে আমি মুখ দেখাব কেমন করে? ও রকম চামড়াও তো পাওয়া যাবে না।"

তখন সে মিখাইলকে বলল, "এ তুমি কী করেছ ভাই? তুমি যে আমার গলা কেটেছ! ভদ্রলোক অর্ডার দিয়ে গেলেন বুটের, আর তুমি এ কী করেছ?"

সাইমন সবে কথা বলতে আরম্ভ করেছে, এমন সময় দরজার কড়া নড়ে উঠল। সাইমন ও মিখাইল জানালা দিয়ে তাকাল। ঘোড়ায় চড়ে একটি লোক এসেছে। ঘোড়াটাকে বাঁধছে।

তারা দরজা খুলে দিলো। সেই ভদ্রলোকের একটি চাকর ভিতরে ঢুকল।

"শুভদিন!"

"শুভদিন। কী চাই?"

"কর্ত্রী আমাকে পাঠালেন সেই বুটের ব্যাপারে।"

"বুটের আবার কী হলো?"

"কী হলোই বটে! আমার মনিবের আর বুটের দরকার নেই। আমার মনিব মারা গেছেন।"

"বলো কী!"

"এখান থেকে তিনি বাড়িও ফেরেননি, স্লেজের মধ্যেই মারা গেছেন। আমরা যখন বাড়ি পৌঁছলাম, সকলে তাঁকে ধরাধরি করে নামাতে এল; কিন্তু তিনি একটা বস্তার মতো গড়িয়ে পড়লেন। সব শেষ, তিনি তখন মারা গেছেন। তাঁকে স্লেজ থেকে নামিয়ে আনতে না আনতেই কর্ত্রী আমাকে ডেকে বললেন, 'মুচিকে বলবে, একজন ভদ্রলোক চামড়া জমা দিয়ে একজোড়া বুটের অর্ডার দিয়েছিলেন, সে বুট আর দরকার নেই, বরং যত শীঘ্র সম্ভব সেই চামড়া দিয়ে শবাধারের জন্য একজোড়া চটি যেন তৈরি করে দেয়। যতক্ষণ তৈরি না হয় অপেক্ষা করে চটি নিয়ে তবে আসবে।' তাই আমি এসেছি।"

মিখাইল টেবিল থেকে টুকরো চামড়াগুলো নিয়ে গোল পাকাল, তৈরি চটিজোড়া একসঙ্গে বেঁধে অ্যাপ্রন দিয়ে ভাল করে মুছল, তারপর সেগুলি ছেলেটাকে দিয়ে দিলো। ছেলেটা হাত পেতে চটিজোড়া নিল।

"বিদায়, মশায়রা! শুভদিন!"

৮

আরও এক বছর কেটে গেল। তারপর দু'-বছর। ক্রমে সাইমনের বাড়িতে মিখাইলের দু'-বছর হলো। সে ঠিক আগের মতোই আছে। কখনও কোথাও যায় না, একটা বাজে কথা বলে না। এতদিনের মধ্যে মাত্র দু'বার হেসেছে : একবার, যখন স্ত্রীলোকটি তার জন্য রাতের খাবার তৈরি করেছিল, আর দ্বিতীয়বার সেই ভদ্রলোককে দেখে। লোকটিকে নিয়ে সাইমনেরও খুশির সীমা নেই। কোথা থেকে সে এসেছে, এ কথা সে আর জিজ্ঞাসা করে না। তার একমাত্র ভয়, পাছে মিখাইল চলে যায়।

একদিন দু'জনই বাড়িতে। মুচির বউ উনুনে পাত্র চাপাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা বেঞ্চির পাশে দৌড়োদৌড়ি করছে আর মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে দেখছে। একটা জানালার পাশে বসে সাইমন সেলাই করছে। আরেকটা জানালার পাশে বসে মিখাইল জুতোর গোড়ালিতে কাঁটা মারছে।

সাইমনের ছোট ছেলে দৌড়ে এসে মিখাইলের ঘাড়ের উপর ঝুঁকে পড়ে জানালা দিয়ে তাকাল।

"মিখাইলকাকা, দেখো, ছোট-ছোট মেয়েদের নিয়ে একজন বণিকের স্ত্রী এইদিকেই আসছে। একটি ছোট মেয়ে আবার খোঁড়া।"

সঙ্গে সঙ্গে মিখাইল হাতের কাজ রেখে জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে পথের দিকে তাকাল। সাইমন অবাক হয়ে গেল। এর আগে মিখাইল তো কখনও রাস্তার দিকে তাকায়নি। অথচ এখন সে কি যেন দেখবার জন্য জানালার একেবারে ধার ঘেঁষে বসেছে। সাইমনও জানালা দিয়ে তাকাল। সেও দেখল, পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা একটি স্ত্রীলোক তার বাড়ির দিকেই আসছে। দুটি মেয়েকে সে হাত ধরে নিয়ে আসছে। দুটি মেয়ে দেখতে একেবারে এক রকম। দু'জনেরই গায়ে কোট আর গরম স্কার্ফ গায়ে। দু'জনকে আলাদা করাই মুস্কিল, শুধু একজনের পা একটু বাঁকা, সে খুঁড়িয়ে হাঁটে।

স্ত্রীলোকটি সিঁড়ি বেয়ে উঠে হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলল এবং মেয়ে দুটিকে সামনে রেখে ঘরের ভিতরে পা দিলো।

'নমস্কার।'

'আসুন। কী চাই আপনার?'

স্ত্রীলোকটি টেবিলের পাশে বসল। মেয়ে দুটি তার হাঁটু ঘেঁষে দাঁড়াল।

স্ত্রীলোকটি বলল, "এই মেয়েদের বসন্তকালে পরবার মত চামড়ার জুতো চাই।"

"ভাল কথা, করে দেব। এত ছোট জুতো এর আগে আমরা করিনি, কিন্তু সবরকমই আমরা করতে পারি। আগাগোড়া চামড়ার জুতোও করাতে পারেন, আবার কাপড়ের লাইনিং দেওয়াও করাতে পারেন। এই আমার বড় কারিগর মিখাইল।'

সাইমন মিখাইলের দিকে তাকাল। সে তখন হাতের কাজ রেখে মেয়ে দুটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছে।

সাইমন খুবই বিস্মিত হলো। এ কথা ঠিক যে মেয়ে দুটি দেখতে খুব সুন্দর। কালো চোখ, গোলগাল লাল টুকটুকে শরীর। গায়ের কোট আর স্কার্ফও সুন্দর। কিন্তু মিখাইল কেন যে একান্ত পরিচিতের মতো তাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে কিছুতেই বুঝতে পারল না।

যাহোক, সাইমন স্ত্রীলোকটির সঙ্গে দর-দাম করতে লাগল। কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেলে মাপ নিতে বসল। খোঁড়া মেয়েটাকে কোলের উপর তুলে স্ত্রীলোকটি বলল, "এর দু'-পায়ের মাপ নাও; একপাটি জুতো করো খোঁড়া পায়ের মাপে, আর তিন পাটি করো ভাল পায়ের মাপের। তাহলেই হবে। এদের দু'জনের পা ঠিক এক মাপের; এরা যমজ।"

মাপ নেবার পর সাইমন বলল, "আহা, এমন সুন্দর মেয়েটি, এরকম কেমন করে হলো? জন্মের থেকেই কি এই রকম?"

"না, ওর মা-ই পা-টা ভেঙে ফেলেছিল।"

এই সময় মাত্রোনা ঘরে ঢুকে বলল, "আপনি তাহলে ওদের মা নন?"

"না গো ভালমানুষের মেয়ে, আমি ওদের মা নই, কোনওরকম আত্মীয়ও নই। এদের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্কই নেই। আমি ওদের লালন-পালন করেছি মাত্র।"

"আপনার মেয়ে নয়, অথচ আপনি ওদের এত ভালবাসেন!"

"ভাল না বেসে কী করি? এদের দু'জনকেই যে আমার বুকের দুধ খাইয়ে বড় করেছি। আমার নিজের একটি সন্তান ছিল, ঈশ্বর তাকে নিয়ে নিলেন। এদের যত ভালবাসি তত ভাল বুঝি সেটাকেও বাসতাম না।"

"এরা তাহলে কার মেয়ে?"

স্ত্রীলোকটি বলতে আরম্ভ করল।

"ছ' বছর আগেকার কথা। এক সপ্তাহের মধ্যে এরা বাবা-মাকে হারাল; বাপকে কবর দেওয়া হলো মঙ্গলবার, মা মারা গেল শুক্রবার। জন্মের তিনদিন আগে বাপকে হারাল, মা মারা গেল জন্মের দিন। তখন আমার স্বামী আর আমি চাষবাসের কাজ করি। আমরা ছিলাম তাদের প্রতিবেশী; পাশের বাড়িই ছিল আমাদের। ওদের বাবাও ছিল চাষী, জঙ্গলে কাজ করত। কেমন করে যেন একটা গাছ তাব উপরে পড়ে; শরীরের একেবারে আড়াআড়ি। ফলে ভিতরটা একেবারে গুঁড়ো হয়ে যায়। তাকে যখন বাড়ি নিয়ে এল, তখন সব শেষ। সেই সপ্তাহেই তার স্ত্রীর দুটি যমজ মেয়ে হলো, এই দুটি মেয়ে। দুঃখে দুর্দশায় সে ছিল একেবারে একা—যুবতী বা বৃদ্ধা কোনও আত্মীয়াই ছিল না। একাই সে শিশুদের জন্ম দিলো, একাই মারা গেল।

"পরদিন সকালে আমি তাকে দেখতে গেলাম। ওর বাড়ি পৌঁছে দেখি বেচারি তখন মরে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ঠিক মরবার সময় সে পাশ ফিরে একটা মেয়ের উপর গড়িয়ে পড়ে। তাতেই ওর বাঁ পা গুঁড়িয়ে বেঁকে যায়। লোকজন জড় হয়ে তাকে ধোয়া-পোঁছা করে, পোশাক পরিয়ে কফিন তৈরি করে কবর দেবার ব্যবস্থা করল।

তারা সবাই লোক ভাল। মেয়ে দুটি একা পড়ে গেল। কোথায় তাদের রাখা হবে? তখন একমাত্র আমার কোলেই সন্তান ছিল; আমার সেই ছেলের বয়স তখন আট সপ্তাহ। কাজেই তখনকার মতো আমিই তাদের ভার নিলাম। চাষীরা সব একত্র হয়ে অনেক ভেবেচিন্তে আমাকে বলল, 'মারিয়া, আপাতত তুমিই ওদের নাও, তারপর আমরা ভেবে দেখি কী ব্যবস্থা করতে পারি।' সুস্থ মেয়েটাকে বুকের দুধ খাওয়াতে লাগলাম। প্রথমটা পা-ভাঙা মেয়েটাকে দুধ দিইনি, ও যে বাঁচবে তা ভাবিনি। পরে ভাবলাম : এমন পরীর মতো মেয়েটা কেন মারা যাবে? আমার মনে দয়া হলো। তাকেও দুধ দিতে লাগলাম। কাজেই আমার একটি আর এই দুটি—তিনজনকেই বুকের দুধ খাওয়াতে লাগলাম। আমার তখন বয়স অল্প, স্বাস্থ্য ভাল, ভাল খাওয়া-দাওয়া করতাম। ঈশ্বরও বুকে এত দুধ দিতেন যে অনেক সময় উপচে পড়ত। একসঙ্গে দু'জনকে খাওয়াতাম, তৃতীয় জন অপেক্ষা করত। একজন থামলে তখন তৃতীয়টিকে খাওয়াতাম। ঈশ্বরেরই বুঝি ইচ্ছা যে আমি এই দুটোকেই মানুষ করি, তাই দ্বিতীয় বছরেই আমার নিজেরটিকে কবরে শুইয়ে দিলাম। ঈশ্বর আমাকে আর সন্তান দিলেন না, কিন্তু আমাদের অবস্থা ফিরতে লাগল। এখন আমরা মিলের মালিক হয়েছি। আমাদের আয় যথেষ্ট, থাকিও ভালভাবে। নিজেদের ছেলেপিলে নেই, এই দুটিকে না পেলে কী নিয়ে আমি বাঁচতাম! ওদের ভাল না বেসে কি আমি পারি! ওরাই তো আমার প্রদীপের সলতে।"

স্ত্রীলোকটি এক হাতে খোঁড়া মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে আরেক হাতে তার চোখের জল মুছিয়ে দিলো।

মাত্রোনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "এই জন্যই বুঝি লোকে বলে, বাপ-মা ছাড়া তুমি বাঁচতে পারো, কিন্তু ঈশ্বরকে ছেড়ে বাঁচতে পারো না।"

কথাবার্তা শেষ করে স্ত্রীলোকটি যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। মুচি আর তার বউ দরজা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে গেল। তারপব মিখাইলের দিকে তাকাল। হাঁটুর উপরে দুই হাত ভাঁজ করে সে বসে আছে। চেয়ে আছে উপরের দিকে। হাসছে।

৯

সাইমন তার কাছে গিয়ে বলল, "এইবার সব কথা খুলে বলো তো মিখাইল।"

হাতের কাজ সরিয়ে রেখে মিখাইল বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়াল। অ্যাপ্রনটা খুলে মুচি আর তার বউকে নমস্কার করে বলল, "তোমরা দু'জন আমাকে ক্ষমা করো। ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করেছেন। তোমরাও ক্ষমা করো।"

উভয়ে দেখতে পেল, মিখাইলকে ঘিরে একটা আলো ঝলমল করছে। সাইমন দাঁড়িয়ে মিখাইলকে নমস্কার জানিয়ে বলল, "বুঝতে পারছি মিখাইল, তুমি সাধারণ মানুষ নও, তোমাকে আর আমি ধরে রাখতে পারব না; তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করাও চলে না। শুধু একটা কথা বলো : প্রথম সাক্ষাতের পরে তোমাকে যখন বাড়ি

নিয়ে আসি তখনই বা তুমি বিষণ্ণ ছিলে কেন, আবার আমার স্ত্রী যখন তোমাকে রাতের খাবার পরিবেশন করল তখনই বা তুমি হাসলে কেন, বা মনে মনে খুশি হয়ে উঠলে কেন? তারপর, সেই ভদ্রলোক যখন বুটের অর্ডার দিলেন, তখনই বা তুমি দ্বিতীয়বার হাসলে কেন, বা অধিকতর খুশি হয়ে উঠলে কেন? এবং এইমাত্র স্ত্রীলোকটি যখন মেয়ে দুটিকে নিয়ে এল তখনই বা তুমি তৃতীয়বার হাসলে কেন, বা পুরোপুরি খুশি হয়ে উঠলে কেন? বলো মিখাইল, তোমার চারদিকে এমন আলো কেন, আর কেনই বা তুমি তিনবার হেসেছ?"

মিখাইল বলল, "আমার শাস্তি হয়েছিল, কিন্তু যখন ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করেছেন, তাই এই আলো। আমি তিনবার হেসেছি, কারণ তিনটি ঐশ্বরিক সত্য আমার জানবার ছিল। ঈশ্বরের সেই সত্য আমি জেনেছি। প্রথম সত্য যখন জানলাম তখন তোমার স্ত্রী আমার প্রতি করুণা করল; তাই আমি প্রথমবাব হাসলাম। আরেকটি সত্য জানলাম যখন ধনী লোকটি বুটের অর্ডাব দিলো, তাই দ্বিতীয়বার হাসলাম। এখন এই মেয়ে দুটিকে দেখে আমি তৃতীয় এবং শেষ সত্যটি জানলাম। তাই তৃতীয়বার হাসলাম।"

সাইমন বলল, "বলো মিখাইল, কেন ঈশ্বর তোমাকে শাস্তি দিয়েছিলেন, আর ঈশ্বরের সত্য তিনটিই বা কী কী। সব আমি জানতে চাই।"

মিখাইল বলল, 'ঈশ্বরের আদেশ আমি অমান্য করেছিলাম, তাই তিনি আমাকে শাস্তি দিয়েছিলেন। আমি ছিলাম স্বর্গের দেবদূত। ঈশ্বরকে আমি অমান্য করেছিলাম।

"আমি স্বর্গের দেবদূত ছিলাম। ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছিলেন একটি স্ত্রীলোকের আত্মা নিয়ে যেতে। পৃথিবীতে উড়ে গিয়ে দেখলাম একটি স্ত্রীলোক অসুস্থ হয়ে একাকী শুয়ে আছে। সবেমাত্র তার দুটি যমজ সন্তান জন্মেছে—দুটি মেযে। মেয়ে দুটি মাযেব পাশে পড়ে আছে, ওদের যে দুধ খাওযাবে সে শক্তিও প্রসূতির নেই। স্ত্রীলোকটি আমাকে দেখতে পেল, বুঝতে পাবল তাব আত্মা নিতেই আমি এসেছি। চোখেব জল ফেলে সে বলল, 'ঈশ্বরের দূত! আমার স্বামী গাছ চাপা পড়ে মারা গেছে; সবাই মিলে সবে তাকে কবর দিয়েছে। আমার বোন নেই, মাসি-পিসি নেই, ঠাকুরমা নেই, বাপ-মা-মবা মেয়ে দুটোকে দেখবার কেউ নেই। আমার আত্মা নিয়ো না। মেযে দুটোকে খাইয়ে-পবিয়ে তাদের পায়ে দাঁড়াবার মতো করে তুলতে দাও। বাপ মা ছাড়া তো সন্তান বাঁচতে পারে না!' প্রসূতির কথা শুনে আমি একটি মেয়েকে তার বুকে তুলে দিলাম, আরেকটি তুলে দিলাম তার কোলে, তারপর স্বর্গে ঈশ্বরের কাছে চললাম। ঈশ্বরেব কাছে উড়ে গিয়ে বললাম, 'সদ্যপ্রসূতিব আত্মা আনতে আমি পাবিনি। গাছ চাপা পড়ে বাপ মবেছে; মায়ের দুটি যমজ সন্তান জন্মেছে, সে আমাকে অনুরোধ করল তার আত্মা না নিতে। সে বলল, 'আমার মেয়েদের লালন-পালন করতে দাও, তাদের পায়ে দাঁড়াবার মতো করতে দাও। বাপ-মা ছাড়া শিশু-সন্তান বাঁচতে পারে না।'...সে মায়ের আত্মা আমি আনিনি।' তখন ঈশ্বর বললেন, 'যাও

মায়ের আত্মা নিয়ে এস, আর তিনটি সত্য জেনে এস; জেনে এস মানুষের কী আছে, মানুষের কী নেই, আর মানুষ কী নিয়ে বাঁচে। এই তিনটি সত্য জেনে তবে স্বর্গে ফিরে আসবে।' আমি আবার পৃথিবীতে উড়ে গেলাম, মায়ের আত্মা নিয়ে এলাম।

"শিশু দুটি মায়ের বুক থেকে গড়িয়ে পড়ল। তার মৃতদেহ শয্যার উপরে ঘুরে পড়তেই একটি মেয়েকে চাপা দিলো; তার পা বেঁকে গেল। আত্মা নিয়ে ঈশ্বরের কাছে উড়ে চলেছি এমন সময় আমি ঝড়ে পড়লাম, আমার পাখা দুটো খসে পড়ল। আত্মা একাই ঈশ্বরের দিকে চলে গেল। আমি পৃথিবীতে একটি পথের ধারে পড়ে গেলাম।"

সাইমন ও মাত্রোনা বুঝতে পারল কাকে তারা খাইয়েছে, পরিয়েছে; কে তাদের সঙ্গে এতদিন ছিল। তখন ভয়ে ও আনন্দে তারা কাঁদতে লাগল।

দেবদূত বলল, "মাঠের মধ্যে উলঙ্গ অবস্থায় আমি একা পড়ে রইলাম। মানুষের কী দরকার আমি জানতাম না। শীত বা ক্ষুধা কাকে বলে তাও জানতাম না। কিন্তু তখন আমি মানুষ হয়ে গিয়েছি। আমি তখন ক্ষুধায় কাতর, ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি; কিন্তু কী যে করব কিছুই জানি না। তখন মাঠের মধ্যে তৈরি একটি ঈশ্বরের উপাসনা-মন্দির দেখতে পেয়ে আশ্রয়ের আশায় সেখানেই গেলাম। গির্জা তালাবন্ধ। ভিতরে ঢুকতে পারলাম না। ঠাণ্ডা বাতাস থেকে আত্মরক্ষার জন্য গির্জার পিছনে বসে রইলাম। সন্ধ্যা নেমে এল। আমি অভুক্ত, ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি, সারা শরীর কাঁপছে। হঠাৎ একটা শব্দ শুনলাম; একটা লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে, হাতে একজোড়া বুট; নিজের মনেই কি যেন বলছে। মানুষের মরণশীল মুখ আমি দেখলাম। সে মুখ দেখে আমার ভয় হলো। চোখ ফিরিয়ে নিলাম। আমি শুনতে পেলাম লোকটি বলছে, এই বরফের মতো ঠাণ্ডায় কী করে সে নিজের শরীরকে বাঁচাবে, কেমন করে তার স্ত্রী পুত্রকে খাওয়াবে। আমি ভাবলাম, 'ঠাণ্ডায় ও ক্ষুধায় আমি মরে যাচ্ছি, আর এই লোকটা শুধু নিজের কথাই ভাবছে; কেমন করে নিজেকে আর বউকে ফার কোট দিয়ে ঢাকবে, কেমন করে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে খাওয়াবে। এ কখনও আমাকে সাহায্য করবে না।' লোকটি আমাকে দেখল, ভুরু কোঁচকালো, যেন আরও ভয় পেয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আমি হতাশায় ভেঙে পড়লাম। হঠাৎ শব্দ শুনে বুঝলাম লোকটা ফিরে আসছে। আমি চোখ তুললাম, কিন্তু দেখলাম এ যেন সে লোক নয়। তখন তার মুখে ছিল মৃত্যুর ছায়া, এখন সহসা সে যেন বেঁচে উঠেছে, তার মুখে আমি ঈশ্বরকে দেখতে পেলাম। সে আমার কাছে এল, আমাকে জামা-জুতো পরাল, সঙ্গে নিল, তার বাড়িতে নিয়ে গেল। তার বাড়িতে ঢুকতেই তার বউ এগিয়ে এসে বক্-বক্ করতে লাগল। বউটি যেন লোকটির চাইতেও ভয়ংকরী—তার মুখ দিয়ে যেন একটি মৃত আত্মা কথা বলছে, মৃত্যুর দুর্গন্ধে আমার যেন দম আটকে আসছিল। সেই ঠাণ্ডায় সে আমাকে বাইরে তাড়িয়ে দিতে চাইল। আমি জানতাম, আমাকে তাড়িয়ে দিলেই সে মারা যাবে। তখন তার স্বামী তাকে ঈশ্বরের কথা স্মরণ করিয়ে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকটির পরিবর্তন হলো। তারপর সে যখন খাবার দিয়ে আমার দিকে তাকাল, আমি দেখলাম—তার মুখে মৃত্যুর ছায়া আর নেই: সে যেন বেঁচে উঠেছে; তার মুখে আমি ঈশ্বরকে দেখতে পেলাম।

"তখনই আমার মনে পড়ে গেল ঈশ্বরের প্রথম কথা : 'জেনে এস, মানুষের কী আছে।' আমি জানলাম, মানুষের প্রেম আছে। আমি খুশি হলাম, কারণ ঈশ্বর আমাকে যা বলেছিলেন সেই সত্য আমার কাছে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছেন। সেই আমি প্রথমবার হাসলাম। কিন্তু সবকিছু তখনও শেখা হয়নি। তখনও জানিনি, মানুষের কী নেই, বা মানুষ কী নিয়ে বেঁচে থাকে।

"তোমাদের সঙ্গে একটি বছর কাটালাম। তারপর একদিন একজন লোক এসে এমন বুটের অর্ডার দিলো যা এক বছরের মধ্যে ছিঁড়বে না বা ফাটবে না। তার দিকে তাকাতেই তার পিছনে আমার সঙ্গী মৃত্যুদূতকে দেখতে পেলাম। বুঝলাম, সূর্যাস্তের আগেই সে এই ধনী লোকটির আত্মা নিয়ে যাবে। তখন ভাবলাম . 'মানুষ এক বছরের কথা ভাবে, অথচ সে জানে না যে সন্ধ্যা পর্যন্তও তার আয়ু নেই।' তখনই মনে পড়ল ঈশ্বরের দ্বিতীয় কথা : 'জেনে এস, মানুষের কী নেই।'

"মানুষের কী আছে আমি আগেই জেনেছি। এখন জানলাম, মানুষের কী নেই। নিজের শরীরের জন্য কী প্রয়োজন সে জ্ঞানও মানুষের নেই। তখনই আমি দ্বিতীয়বার হাসলাম। আমার সঙ্গী দেবদূতকে দেখে এবং ঈশ্বর আর একটি সত্য আমার কাছে প্রকাশ করেছেন জেনে আমার ভারি আনন্দ হলো।

"কিন্তু তখনও আমার সব জানা হয়নি। আমি তখনও জানিনি, মানুষ কী নিয়ে বাঁচে। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম, কবে ঈশ্বর বাকি সত্যটা আমার কাছে প্রকাশ করবেন। ষষ্ঠ বছরে দুটি যমজ মেয়ে নিয়ে স্ত্রীলোকটি এল। আমি তাদের চিনতে পারলাম; তারা কী করে বেঁচে আছে তাও শুনলাম। সব শুনে ভাবলাম : 'মেয়েদের জন্য মা আমার কাছে জীবন-ভিক্ষা চেয়েছিল, মায়ের কথা আমি বিশ্বাস করেছিলাম—ভেবেছিলাম বাবা-মা ছাড়া শিশু সন্তান বাঁচতে পারে না, অথচ একজন অপরিচিতা তাদের বড় করে তুলেছে!' অন্যের মেয়ের প্রতি স্নেহে স্ত্রীলোকটি যখন কাঁদল, তখন তার মধ্যে আমি জীবন্ত ঈশ্বরকে দেখতে পেলাম, আমি জানলাম মানুষ কী নিয়ে বাঁচে। তখন আমি বুঝলাম, ঈশ্বর আমার কাছে তৃতীয় সত্য প্রকাশ করেছেন, আমাকে ক্ষমা করেছেন। তাই আমি তৃতীয়বার হাসলাম।"

১০

দেখতে দেখতে দেবদূতের দেহ নেমে এল। এমন তীব্র আলো দিয়ে সে দেহ গড়া যে সেদিকে তাকানো যায় না। অতি উচ্চ উঠে সে কথা বলতে লাগল। মনে হলো, কথাগুলো তার ভিতর থেকে আসছে না, স্বর্গ থেকে আসছে। দেবদূত বলল, "আমি জানলাম, মানুষ নিজের কৌশলে বাঁচে না, বাঁচে প্রেমে।

"মা-টি জানত না বাঁচবার জন্য তার মেয়েদের কী দরকার ছিল। ধনী লোকটিও জানত না তার কী দরকার ছিল। কোনও মানুষই জানে না, সন্ধ্যা নাগাদ তার দেহের জন্য বুটজুতো লাগবে, না মৃতদেহের জন্য চটিজুতো লাগবে।

"মানুষ হিসাবে আমি বেঁচে রইলাম—আমার চেষ্টায় নয়, বেঁচে রইলাম যেহেতু একজন পথের লোক ও তার স্ত্রীর হৃদয়ে প্রেম ছিল, তারা আমাকে দয়া করেছিল, ভালবেসেছিল। বাপ-মা-হারা মেয়ে দুটি বেঁচে রইল কোনও স্বার্থ-চিন্তার দ্বারা নয়, বেঁচে রইল, যেহেতু অপরিচিতার হৃদয়ে প্রেম ছিল, সে তাদের দয়া করেছিল, ভালবেসেছিল। সব মানুষই বেঁচে থাকে—নিজেদের পরিকল্পনা অনুসারে নয়, মানুষের হৃদয়ের প্রেমের শক্তিতে।

"আগে জানতাম ঈশ্বর মানুষকে জীবন দান করেন, তিনি চান তারা বেঁচে থাকুক; এখন আমি আরও কিছু জানলাম।

"আমি জানলাম, ঈশ্বর চান না যে তারা আলাদা হয়ে বাঁচুক, তাই যার-যার নিজের জন্য কী দরকার তা তার কাছে প্রকাশ করেন না; তিনি চান, সকলে মিলেমিশে বাঁচুক, তাই যার-যার নিজের জন্য যা দরকার এবং অপর সকলের জন্য যা দরকার সবই তিনি তাদের কাছে প্রকাশ করেন।

"আমি বুঝতে পারলাম, যদিও মানুষ মনে করে যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রচেষ্টাতেই সে বাঁচে, সে কিন্তু বাঁচে একমাত্র প্রেমে। যে মানুষ প্রেমময়, ঈশ্বর তার সঙ্গী, তার মধ্যে ঈশ্বর আছেন; কারণ ঈশ্বরই প্রেম।"

দেবদূত ঈশ্বরের জয়গান করতে লাগল, তার কণ্ঠস্বরে ঘরখানি কেঁপে কেঁপে উঠল। ঘরের ছাদ দুই ভাগ হয়ে পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্ত একটা অগ্নিস্তম্ভ উঠে গেল। সাইমন, তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা মেঝেয় পড়ে গেল। দেবদূতের পিঠে পাখা গজাল, সে আকাশে উড়ে গেল।

সাইমনের যখন জ্ঞান ফিরে এল, তখন তার কুঁড়েঘর যেমন ছিল তেমনি আছে, আর তার নিজের পরিবার ছাড়া আর কেউ সেখানে নেই।

১৮৮১

দুই বৃদ্ধ

Two old men

১

দুই বৃদ্ধের বাসনা হলো, ঈশ্বরকে ভজনা করতে জেরুজালেম যাবে। একজন সম্পন্ন চাষী, নাম এফিম তাবাসিক সেবেলেফ। অপর জনের নাম এলিজা বোদ্রোফ, অবস্থা মাঝামাঝি। এফিম, ধীর স্থির মানুষ; ভদ্‌কা খায় না, চুরুট খায় না, নস্যিও নেয় না; সারা জীবনে কখনও একটা খারাপ কথা বলেনি; কঠোর, স্থিরপ্রতিজ্ঞ। দু' দু'বার সে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হয়ে কাজ করেছে, কখনও আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করেনি। তার পরিবার বড় : দুটি ছেলে ও একটি বিবাহিত নাতি তার সঙ্গে থাকে। সে স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ; তার লম্বা দাড়ি ষাট বছর পেরিয়ে সবে পাকতে শুরু করেছে।

এলিজা খুব ভাল মানুষ; ধনীও নয়, গরীবও নয়। ছিল ছুতোর, বুড়ো বয়সে সে-কাজ ছেড়ে দিয়ে মৌমাছি পালন শুরু করেছে। এক ছেলে কাজের খোঁজে বাইরে গেছে, আর এক ছেলে বাড়িতেই থাকে। এলিজা হাসি-খুশি আমুদে লোক; সে ভদ্‌কা খায়, নস্যি নেয়, গান গাইতে ভালবাসে; নম্র স্বভাব, আত্মীয়-পরিজন ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব ভাল ভাব। বেঁটে খাটো মানুষটি, ঘোরবর্ণ, কোঁকড়ানো দাড়ি, যদিও মাথাজোড়া একটা মস্ত টাক, ঠিক তার গুরুদেব মহাপুরুষ এলিজার মতো।

অনেকদিন আগে দুই বৃদ্ধ প্রতিজ্ঞা করেছিল, একত্রে জেরুজালেম যাবে; কিন্তু এফিমের আর সময় হয়ে ওঠে না, সব সময়েই তার কিছু না কিছু কাজ থাকে! একটা কাজ শেষ না হতেই আর একটা এসে হাজির হয়। প্রথমে নাতির বিয়ে, তারপর ছোট ছেলে সেনাদল থেকে ফিরে আসবে তার জন্য অপেক্ষা, তারপর শুরু হলো একটা নতুন ঘর তৈরির কাজ।

এক রবিবারে একটা কাঠের স্তূপের উপর বসে দুই বৃদ্ধ গল্প করছিল।

এলিজা বলল, "আচ্ছা, আমাদের সে প্রতিজ্ঞা আর কবে পূরণ হবে?"

এফিম ভুরু কুঁচকে বলল, "আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবেই। এ বছরটা আমার পক্ষে বড়ই খারাপ যাচ্ছে। শ' খানেক রুবল খরচ হবে ভেবে নিয়ে ঘরখানায় হাত দিয়েছিলাম, কিন্তু এরই মধ্যে তিনশ' রুবল খরচ হয়ে গেছে, অথচ ঘর এখনও শেষ হলো না। আমার তো মনে হচ্ছে, গরমকাল অবধি এ কাজ চলবে। কাজেই ঈশ্বরের ইচ্ছায় গরমের সময় আমরা নিশ্চয় বেরোতে পারব।"

এলিজা বলল, "আমার মতে কিন্তু আর দিন পেছোনো ঠিক নয়। এখনই আমাদের যাওয়া উচিত। বসন্তকালই তো সবচেয়ে ভাল সময়।"

"সময় ভালই হোক আর মন্দই হোক, কাজ যখন হাতে নিয়েছি তখন সেটা ছেড়েছুড়ে যাই কী করে?"

"কেন, আর কেউ কি তোমার হয়ে কাজটা শেষ করতে পারে না? তোমার ছেলেই তো পারে।"

"তবেই হয়েছে! বড় ছেলেটার উপর মোটে ভরসা করা চলে না। ওটা এত বেশি মদ খায় যে কী বলব।"

"আরে বাবা, একদিন তো আমরা মরব। তখন আমাদের ছাড়াই ওদের চলে যাবে। কাজেই এখন থেকেই ছেলেকে কাজকর্ম শিখতে দাও।"

"যাই বলো, আমি নিজের চোখে কাজটার শেষ দেখে যেতে চাই।"

"হায় বন্ধু! সব কাজ কি কখনও একেবারে শেষ হয়? এই তো সেদিন বাড়ির মেয়েরা উৎসবের জন্য সবকিছু ধোয়া-পোঁছা, যোগাড়-যন্ত্র করছিল। এখানে কিছু কাজ, ওখানে কিছু কাজ, কাজ আর শেষ হয় না। আমার পুত্রবধূ খুব চালাক-চতুর, সে বলল, 'ভাগ্যিস আমরা তৈরি না হলেও উৎসবের দিনগুলো এসে পড়ে!' কাজ যতই করো না কেন, কখনও কেউ পুরোপুরি তৈরি হতে পারে না।"

এফিম ভাবতে লাগল। বলল, "ঘবটা তৈরি করতে অনেক টাকা খবচ করে ফেলেছি। এখন খালি হাতে তো পথে বেরোতে পারি না। বেশ মোটা টাকাই তো চাই—অন্তত একশ' রুবল।"

এলিজা হেসে উঠল। বলল, "বাজে কথা বলো না বন্ধু। আমার চাইতে দশগুণ বেশি তোমার আছে, তবু তুমি টাকার কথা তুলছ। দিন স্থির করে ফেল; আমার হাতে একটা 'কোপেক'ও নেই, কিন্তু দেখবে দরকারী টাকা ঠিক জুটে যাবে।"

এফিমও হাসতে লাগল। বলল, "আবে, তুমি যে একেবারে বড়লোকের মতো কথা বলছ হে! টাকাটা পাব কোথায় বলো তো?"

"এখান থেকে ওখান থেকে যোগাড় করে ফেল। যা কম পড়বে, আমার প্রতিবেশীর কাছে ডজনখানেক মৌচাক বিক্রি করলেই পেয়ে যাবে। সে বেচারি অনেক কাল ধরে ওগুলোব জন্য অপেক্ষা করে আছে।"

"মৌমাছিরা যদি দলে দলে ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলে যায, তখন তো মনে দুঃখ পাবে।"

"দুঃখ? না বন্ধু, দুঃখ পাব না। আজ পর্যন্ত দুঃখ যা পেয়েছি তা শুধু পাপের জন্যই পেযেছি। আত্মাব চাইতে দামী আর কিছু নেই।"

"তা তো ঠিকই; তবে গৃহস্থালির ব্যাপারে অবহেলা করাও তো ঠিক নয়।"

"কিন্তু আত্মাকে যখন অবহেলা করা হয় সে যে আরও খারাপ। প্রতিজ্ঞা যখন করেছি তখন যাওয়াই উচিত। সত্যি, চলো বেরিয়ে পড়ি।"

২

এলিজা বন্ধুকে অনেক বোঝাল। অনেক ভেবে-চিন্তে এফিম পরদিন সকালে

এলিজার কাছে গিয়ে বলল, "আচ্ছা, চলো বেরিয়েই পড়ি। তুমি ঠিকই বলেছ। বাঁচা-মরা ঈশ্বরের হাতে। শক্ত-সমর্থ হয়ে বেঁচে থাকতে থাকতেই আমাদের যাওয়া উচিত।"

সপ্তাহ-খানেকের মধ্যেই দুই বৃদ্ধ তৈরি হলো।

এফিমের ঘরেই যথেষ্ট টাকা ছিল; সে তীর্থযাত্রার জন্য একশ' রুবল নিল, আর স্ত্রীর কাছে রেখে গেল দু'শ'।

এলিজাও তৈরি হলো। প্রতিবেশীর কাছে দশটা মৌচাক সে বিক্রি কবল। ঠিক হলো, চাক থেকে যত মৌমাছি জন্মাবে সব সে পাবে। এর জন্য সে দাম পেল সত্তর রুবল। বাকিটা সে পরিজনবর্গের কাছ থেকে যোগাড় করল। ফলে বাড়িতে প্রায় কিছুই থাকল না। তার স্ত্রী নিজের শেষকৃত্যের জন্য যা কিছু সঞ্চয় করেছিল তার শেষ কড়িটি পর্যন্ত তাকে দিয়ে দিলো। তার পুত্রবধূর কাছে যা কিছু ছিল তাও দিয়ে দিলো।

এফিম তাবাসিক বড় ছেলেকে সব কিছু শিখিয়ে-পড়িয়ে দিলো : কোথায় কতটা খড় কাটতে হবে, কোথায় সার ফেলতে হবে, কেমন করে ঘরখানা শেষ কবে ছাদ দিতে হবে—সব। সে সব ব্যাপারে যথেষ্ট ভেবেচিন্তে যথাযোগ্য নির্দেশাদি দিয়ে গেল।

এদিকে এলিজা শুধু তার স্ত্রীকে বলল, বিক্রি-করা চাকের মৌমাছিগুলো যেন অন্য মৌমাছি থেকে আলাদা করে রাখে এবং প্রতিবেশীকে কোনওরকম না ঠকিয়ে সেগুলো তাকে দিয়ে দেয়। গৃহস্থালির অন্যান্য ব্যাপারে সে কিছুই উচ্চবাচ্য করল না। শুধু বলল, "কখন কী করতে হবে, দরকারের সময় তা নিজেই বুঝতে পারবে। তোমার উপরেই সব ভার। যা ভাল বুঝবে তাই করবে।"

যাত্রার জন্য দু'জনে প্রস্তুত হলো। মেয়েরা রুটি বানিয়ে দিলো, বোঁচ্‌কা সেলাই করে দিলো, পায়ে জড়াবার জন্য নতুন পট্টি কেটে দিলো। নতুন চামড়ার জুতো পরে, পুরোনো জুতো সঙ্গে নিয়ে তারা রওনা দিলো। পরিবারের লোকজনেরা গ্রামের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বিদায় জানাল। দুই বৃদ্ধের যাত্রা শুরু হলো।

গ্রাম ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা-চিন্তা সব ভুলে এলিজা বেশ খোশমেজাজে চলতে লাগল। তার একমাত্র চিন্তা—কেমন করে সহযাত্রীকে খুশি রাখবে, কাউকে একটা কড়া কথা না বলে পথ চলবে, কেমন করে শান্তিতে ও প্রীতিতে গন্তব্যস্থানে পৌঁছবে ও বাড়ি ফিরবে। পথ চলতে চলতে এলিজা নিজের মনে প্রার্থনা করে, কখনও বা মুখস্থ-করা সন্ত-জীবনী আওড়ায়। পথের মাঝে বা রাত্রের আস্তানায় যখনই কারও সঙ্গে দেখা হয় তার সঙ্গেই যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করে, দুটো ভাল কথা বলে। খুশি মনেই সে পথ চলে। শুধু একটা ব্যাপারে একটু অসুবিধায় পড়ে। নস্যি নেওয়া ছেড়ে দেবার জন্য সে ইচ্ছা করেই নস্যির কৌটো বাড়িতে রেখে এসেছে। কিন্তু এখন দেখছে, ভারি ফ্যাসাদ। একজন পথের লোকের কাছ থেকে কিছুটা চেয়ে

এনেছে, মাঝে মাঝে পিছিয়ে পড়ে (সহযাত্রীকে যাতে পাপের পথে নিয়ে যেতে না হয়) তাব থেকেই একটু একটু নিচ্ছে।

এফিম তারাসিকও বেশ ভালভাবেই একটানা চলতে লাগল। সে আজে-বাজে কথাও বলে না, কারও কোনও ক্ষতিও করে না। তবে তার মন-মেজাজ তেমন ভাল নেই। বাড়ির দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা সে কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পাবছে না।— এই রে, ছেলেকে বুঝি এটা না হয় ওটার কথা বলতেই ভুলে গেছি। হয়ত পথে কাউকে দেখল আলুর চারা লাগাচ্ছে বা সার দিচ্ছে, অমনি ভাবতে লাগল : ছেলে আমার কথামতো এ সব কাজ ঠিক-ঠিক করছে তো? মনে হতো, তখুনি ফিরে গিয়ে সব দেখিয়ে দেয়, বা নিজেই করে দিযে আসে।

৩

পাঁচ সপ্তাহ একটানা চলতে চলতে ঘরে তৈরি জুতো ছিঁড়ে যাওয়ায় নতুন জুতো কিনে দুই বৃদ্ধ ইউক্রেনে পৌছল। বাড়ি ছাড়বার পর থেকে এতদিন তারা থাকা, খাওয়ার পযসা নিজেরাই দিচ্ছিল। কিন্তু ইউক্রেনে আসবার পর সব বাড়ি থেকেই তাদের থাকা, খাওয়া, শোয়ার জন্য ডাক আসতে লাগল। দুই বৃদ্ধের কাছ থেকে তাবা কিছুতেই টাকা নিল না। উল্টে পথে খাবার জন্য রুটি বা কেক তাদেব বোঁচকায ভরে দিলো।

এইভাবে প্রায সাতশ' 'ভার্স্ট' চলবার পব দুই বৃদ্ধ আব এক দেশে পৌছল। সেখানে সে-বছব ফসল ফলেনি। তবু সেখানকাব লোকেরা তাদের বিনা পয়সায় থাকতে-শুতে দিলো, কিন্তু খাওয়াতে পারল না। রুটি দুষ্প্রাপ্য, এমন কি পয়সা দিয়েও সব জাযগায মেলে না। সবাই বলল, আগের বছর সেখানে একেবারেই ফসল হয়নি। ধনীদেব অবস্থা পড়ে গেছে, যারা স্বল্পবিত্ত তারা নিঃস্ব হয়েছে, আর যে সব গরিব মানুষ পালিয়ে যায়নি তাবা হয় ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে আর না হয় সারা শীতকাল ভূযি আব শাকপাতা খেযে কোনওমতে বেঁচে আছে।

একদিন রাতে দুই বৃদ্ধ একটা ছোট গ্রামে থামল। কুড়ি পাউন্ড রুটি কিনল, ঘুমোল, তারপর ভোর হবার আগেই আবার যাত্রা করল যাতে রোদ চড়বার আগেই অনেকটা পথ এগুনো যায। দশ 'ভার্স্ট' হাঁটবার পর তারা একটা ছোট নদীর তীরে পৌছল। বসল, বাটিতে করে জল তুলে রুটি ভিজিয়ে খেলো, পায়ের পট্টি পাল্টে নিলো, তারপর বিশ্রাম করতে লাগল।

এলিজা তার নস্যির কৌটো বের করল।

এফিম তারাসিক ঘাড় নেড়ে বলল, "এই বাজে অভ্যেসটা ছাড়তে পারো না?"

এলিজা হাত নেড়ে বলল, "এ বড় শক্ত পাপ, কী করি বলো?"

তারা উঠে পড়ল। প্রায় 'ভার্স্ট'-বারো পথ পার হয়ে একটা বড় শহরে পৌছে তার ভিতর দিয়ে এগোতে লাগল। দিনের তাপ তখন বেশ বেড়ে গেছে। বড়ই শ্রান্ত

বোধ করায় এলিজা একটু বিশ্রাম করে একটু জল খেয়ে নিতে চাইল। কিন্তু এফিম এগিয়েই চলল। এফিম হাঁটায় বেশ পটু; ফলে তার সঙ্গে তাল রাখা এলিজার পক্ষে বেশ কষ্টকর।

"আমি একটু জল খেতে চাই।"

"বেশ তো, খাও। আমার কোনও দরকার নেই।"

এলিজা সেখানেই থামল। বলল, "আমার জন্য তুমি অপেক্ষা করো না। একদৌড়ে আমি এই কুঁড়ে থেকে একটু জল খেয়ে আসছি। শিগগিরই তোমাকে ধরে ফেলব।"

এফিম বলল, "ঠিক আছে।" সে একাই পথে পা বাড়াল। এলিজাও কুঁড়ের দিকে এগোল।

ছোট একখানা মাটির ঘর। নিচের অংশটা কালো, উপরটা সাদা। দেয়ালের পলস্তারা খসে পড়েছে। বোঝা যায় অনেক দিন চুনকাম করা হয়নি। ঘরের ছাদ একদিকে হেলে পড়েছে। উঠোনের ভিতর দিয়েই ঘরে ঢুকবার একমাত্র পথ। উঠোনে ঢুকেই এলিজা দেখল, একটা জীর্ণশীর্ণ লোক মাটিতে শুয়ে আছে। তার মুখে দাড়ি নেই, ইউক্রেনীয় স্টাইলে পরনের শার্টটা ট্রাউজারের ভিতর গোঁজা। লোকটা নিশ্চয়ই ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে সেখানে শুয়েছিল, এখন সূর্য একেবারে সোজা তার উপরে এসে পড়েছে। লোকটা ঠিক ঘুমোয়নি, শুধু শুয়ে আছে। এলিজা জল চাইল, কিন্তু লোকটা কোনও জবাব দিলো না। "লোকটা হয় রুগ্ন আর না হয় অসামাজিক—" এই কথা ভেবে এলিজা দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কান পেতে শুনল, কুঁড়ের ভিতর একটি শিশু কাঁদছে। দরজার কড়া নেড়ে ডাকল, 'মালিক!' কেউ সাড়া দিলো না। আবার ডাকল, 'খৃস্টান!' সব চুপ। 'ঈশ্বরের সেবক!' কোনও জবাব নেই।

ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই এলিজার কানে এল দরজার ওপারে কে যেন গোঙাচ্ছে। ভাবল, "লোকগুলো নিশ্চয় কোনও বিপদে পড়েছে। একবার দেখা দরকার।"

৪

দরজায় চাবি দেওয়া ছিল না, এলিজা হাতলটা ঘোরাল। দরজা খুলে গেল। সরু পথ দিয়ে সে এগিয়ে গেল। বড় ঘরের দরজা খোলাই ছিল। বাঁ দিকে একটা স্টোভ, সোজা সামনে কতগুলো পবিত্র মূর্তি, তারপর টেবিল, টেবিলের পিছনে বেঞ্চি। সেমিজ-পরা একটা টাক-মাথা বুড়ি মাথাটা টেবিলের উপর রেখে বেঞ্চির উপর বসে ছিল। তার পাশে দাঁড়িয়ে একটা শুকনো, বিবর্ণ, পেট-মোটা ছেলে খুন-খুন করে কাঁদছে আর বুড়ির আস্তিন ধরে টানতে টানতে কি যেন চাইছে।

এলিজা ঘরে ঢুকল। বাতাসে ভ্যাপসা গন্ধ। চারদিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, স্টোভের পিছনে মেঝের উপর একটি স্ত্রীলোক শুয়ে আছে। তার দুই চোখ বোজা,

সাঁই-সাঁই করে নিঃশ্বাসের শব্দ হচ্ছে, মাঝে মাঝেই একটা পা টান-টান করছে আবার ভাঙছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, স্ত্রীলোকটি একেবারে অসহায়, তাকে দেখবার কেউ নেই। যন্ত্রণায় বার বার এ-পাশ ও-পাশ করছে।

বুড়িটা আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী চাও এখানে? কী চাও? আমাদের কিছু নেই।"

ইউক্রেনীয় ভাষায় কথাগুলো বললেও এলিজা বুঝতে পারল। এগিয়ে কাছে গিয়ে বলল, "ঈশ্বরের সেবিকা, আমি একটু জল খেতে এসেছি।"

"নেই, নেই। জল আনবার কেউ নেই। চলে যাও।"

এলিজা শুধাল, "এই স্ত্রীলোকটির জন্য কিছু করতে পারে এ রকম সুস্থ কি এখানে কেউ নেই?"

"না কেউ নেই। উঠোনে আমার ছেলে মরছে। এখানে আমরা মরছি।"

আগন্তুককে দেখে ছেলেটা চুপ করে ছিল। এখন বুড়িকে কথা বলতে দেখে সে তার আস্তিন টেনে ধরে বলল, "রুটি দাও ঠাম্‌মা, রুটি দাও!" বলেই সে কেঁদে উঠল।

এলিজা বুড়িকে কি যেন জিজ্ঞাসা করতে যাবে, এমন সময় স্খলিত পদে ঘরে ঢুকল একটি চাষী। বেঞ্চিটার কাছে যাবার জন্যে দেযাল ধরে কোনওমতে ফালি পথটা ধরে এগিয়ে যেতে চৌকাঠেব পাশেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। কিছুতেই উঠতে পাবল না। সেখান থেকেই থেমে থেমে বলতে লাগল · "রোগ...ধরল, আর...ক্ষুধা। ওই তো...না খেতে পেয়ে...মরছে..."

মাথা নেড়ে ছোট ছেলেটাকে দেখিয়ে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

এলিজা এক ঝাঁকিতে কাঁধ থেকে বোঁচকাটা নামিয়ে মেঝেতে রাখল। তারপর সেটাকে বেঞ্চির উপর তুলে মুখটা খুলে ফেলল। বের করল খানিকটা রুটি আর একখানা ছুরি। একটুকরো রুটি কেটে চাষীটিকে দিলো।

চাষীটা নিলো না; ইঙ্গিতে ছোট ছেলেটিকে আর স্টোভের পাশে শোয়া একটি ছোট মেয়েকে দেখিয়ে দিলো। এলিজা রুটিটা ছোট ছেলেটাকে দিলো। ছেলেটা জোরে নিঃশ্বাস টেনে দুই হাতে রুটিটা আঁকড়ে ধরে তার মধ্যে নাক ডুবিয়ে দিলো।

মেয়েটা উঠে এসে রুটিটার দিকে তাকিয়ে রইল।

এলিজা তাকেও কিছুটা দিলো। আবও একটুকরো কেটে বুড়িকে দিলো। বুড়ি সেটা চিবুতে লাগল। বলল, "জল আনো। ওদের মুখ শুকিয়ে গেছে। আমি জল আনতে চেষ্টা করেছিলাম—কাল না আজ ঠিক মনে পড়ছে না। তাবপব পড়ে গেলাম। জলের কাছে আর যেতে পারলাম না। কেউ যদি না নিয়ে থাকে তাহলে ওখানে এক বালতি জল হয়ত আছে।"

এলিজা কুয়োটা কোথায় জেনে নিয়ে বাইরে গেল। বালতি করে জল আনল, সবাইকে দিলো। ছেলেমেয়েরা জলের সঙ্গে আরও খানিকটা রুটি খেলো। বুড়িও খেলো। কিন্তু চাষীটা খেলো না। বলল, "আমি খেতে পারব না।"

তরুণীটি তখনও অচৈতন্য অবস্থায় এ-পাশ ও-পাশ করছে।

এলিজা সেখান থেকে বেরিয়ে গাঁয়ের মুদি দোকানে গেল। জোয়ার, নুন, ময়দা আর তেল কিনল। বাড়ি ফিরে কুড়ুল খুঁজে নিয়ে কাঠ কেটে স্টোভ ধরাল। ছোট মেয়েটির সাহায্যে রুটি ও 'কাশা' তৈরি করল সবাইকে খাওয়াবার জন্য।

৫

চাষী অল্প কিছু খেলো; বুড়িও খেলো; ছেলেমেয়েরা একটা বাটিভর্তি খাবার চেটে-পুটে খেয়ে এ-ওর গলা জড়িয়ে ধরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

চাষী আর বুড়ি এলিজাকে সব কথা বলতে লাগল :

"আমরা তো বড়লোক নই, কোনওরকমে দিন কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ অজন্মা দেখা দিলো। সেই দুর্দিনে আমাদের যা কিছু ছিল তাই খেতে শুরু করলাম। খেতে খেতে তাও ফুরিয়ে গেল। প্রতিবেশী স্বজনদের কাছে ভিক্ষা চাইতে হলো। প্রথম-প্রথম তাঁরা দিতেন। তারপর হাত গুটোলেন। কেউ-কেউ হয়ত খুশি মনেই দিতেন, কিন্তু তাঁদেরও কিছু ছিল না। চাইতেও বড় লজ্জা করত। সবাব কাছে ধাব—টাকা, মযদা, রুটি।"

লোকটি বলল, "কাজের জন্য চেষ্টা কবলাম, পেলাম না। শুধু দুটি খাবার জোগানোর মতো কাজের জন্যই লোকেবা নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করতে লাগল। কেউ হয়ত একদিন ছোটখাট একটা কাজ পেল; তারপব আর একটা কাজ যোগাড় কবতেই দুটো দিন কেটে গেল। এই বুড়ি আর মেয়েটা ভিক্ষে কবতে অনেক দূরে চলে যেত। যৎসামান্য পেত—রুটি তো তখন প্রায় কারোবই নেই। তবু কোনওরকমে খেয়ে-পরে বেঁচে রইলাম। মনে আশা ছিল, পবের ফসলের সময় দিন ফিববে। কিন্তু বসন্তকাল এসে গেল, তখনও কেউ কিছু দিলো না। ফলে আমরা বোগে পড়লাম। বড় অসহায় অবস্থা। একদিন খাওয়া জোটে তো দু'দিন জোটে না। ক্রমে ঘাস খেতে লাগলাম; হয়ত ঘাস খেয়েই আমার স্ত্রী অসুখে পড়ল। সে ভেঙে পড়ল। আমিও গায়ে জোব পাই না। নিজেব পায়ে দাঁড়াতে পর্যন্ত পাবি না।"

বুড়ি বলল, "না খেয়েই যুঝতে লাগলাম। গায়ের জোর ফুরিয়ে গেল। মেয়েটাও দুর্বল আর ভীতু হয়ে পড়ল। কোনও প্রতিবেশীর কাছে পাঠালে যেতে চায় না। ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকে, কিছুতেই বেবোতে চায় না। পরশুব আগের দিন একজন প্রতিবেশিনী আমাদের ঘরে এল। কিন্তু যখন দেখল আমরা সবাই ক্ষুধার্ত, রুগ্ন, তখন মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। কি জানো, সম্প্রতি তার স্বামী মারা যাওয়ায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খাওয়াবার সংস্থানও তার নেই। কাজেই আমরাও এখানে মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়ে আছি।"

তাদের কাহিনী শুনে এলিজা স্থির করল, সেদিন সহযাত্রীকে ধরবার চেষ্টা না করে রাতটা সে সেখানেই থেকে যাবে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির সব কাজের ভার সে নিজে নিলো, যেন সে-ই বাড়ির কর্তা। বুড়ির সঙ্গে ময়দা মাখল, স্টোভ ধরাল। দরকারি জিনিসপত্রের জন্য ছোট মেয়েটিকে সঙ্গে করে প্রতিবেশীদের কাছে গেল। কিন্তু কারও কাছে কিছু পেল না; খাদ্যের জন্য গেরস্থালির তৈজসপত্র, এমনকি জামাকাপড় পর্যন্ত সবাই বিক্রি করে বসে আছে। কাজেই দরকারি জিনিসপত্র এলিজাই সব দিলো—কতক কিনে দিলো, কতক বা তৈরি করে দিলো।

সারাটা দিন এলিজা সেখানে কাটাল। তারপর আর একটা দিন। ক্রমে তৃতীয় দিনটাও কেটে গেল। ছোট ছেলেটা ভাল হয়ে উঠল। সে এখন বেঞ্চি ধরে এগিয়ে এলিজার গা ঘেঁষে বসে। মেয়েটাও বেশ হাসিখুশি হয়ে উঠেছে। সব কাজেই এগিয়ে যায়। সর্বক্ষণ এলিজার কাছে কাছে থাকে, তাকে 'দিদু!' 'দিদুসিউ।' বলে ডাকে। বুড়ি উঠে প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে লাগল। চাষীও দেয়াল ধরে ধরে ঘরের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। স্ত্রীলোকটি অচৈতন্যই ছিল, তবে তিন দিনের দিন তার চেতনা ফিরে এল। সে খেতে চাইল।

এলিজা ভাবল, "ভাল, পথের মাঝখানে এতদিন কাটাতে হবে তা তো ভাবিনি। কালই রওনা হতে হবে।"

৬

চতুর্থ দিনটা ছিল একটা ভোজের দিন। এলিজা ভাবল, "এদের সঙ্গেই বরং 'পার্বণ'টা শেষ করি, উৎসব উপলক্ষে এদের কিছু উপহার কিনে দিই, তারপর সন্ধ্যাবেলা যাব।"

দুধ, ময়দা আর চর্বি কিনবার জন্য এলিজা আবার গাঁয়ের দিকে গেল। সকালে সে আর বুড়ি রান্না করল, রুটি বানাল, এলিজা প্রার্থনা সভায় গেল। ফিরে এসে সকলের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করল। সেদিন স্ত্রীটিও কোনওরকমে উঠে একটু বেড়াল। চাষী দাড়ি কামাল, একটা সাদা শার্ট পরল (শার্টটা বুড়িই ধুয়ে দিয়েছিল), তারপর গাঁয়েরই একজন ধনী কৃষকের কাছে গেল তার অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে। সেই কৃষকের কাছেই তার মাঠ আর চাষের জমি বন্ধক ছিলো। নতুন ফসল না ওঠা পর্যন্ত সেই মাঠ আর জমি ব্যবহার করবার অনুমতি ভিক্ষা করতেই গিয়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা হতাশ হয়ে ফিরে এসে কাঁদতে লাগল। ধনী কৃষক তাকে কোনও করুণা করেনি, শুধু বলেছে, "টাকা নিয়ে এস।"

এলিজা আবার ভাবনায় পড়ল। "কেমন করে এরা এখন বাঁচবে? অন্যরা ফসল কাটবে, কিন্তু এদের তো কিছুই নেই, মাঠটাও বন্ধক দেওয়া। রাই পাকলে অন্যরা কাটতে আরম্ভ করবে (মাটি-মা কী ফসলই ফলিয়েছে!)। কিন্তু এদের তো কোনও আশা নেই, তিন একর জমিই তো ধনী কৃষকের কাছে বাঁধা দেওয়া। আমি যদি চলে যাই, এরা যে অবস্থায় ছিল আবার সেখানেই ফিরে যাবে।"

নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে করতে সে সন্ধ্যায়ও এলিজার যাওয়া হলো না। সকাল পর্যন্ত যাত্রা স্থগিত রেখে সে উঠোনে শুতে গেল। সে প্রার্থনা করল; শুয়ে পড়ল, কিন্তু কিছুতেই ঘুমুতে পারল না। এবার তার যাওয়া উচিত- এদের জন্য ইতিমধ্যে অনেক সময় আর টাকা সে ব্যয় করেছে। তবু এদের জন্য তার দুঃখও হলো।

"সব্বাইকে তুমি খাওয়াতে পরাতে পারো না। এদের তুমি জল দিয়েছিলে, একটুকরো রুটি দিয়েছিলে। আর ভেবে দেখো, এখন তুমি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছ। তুমি এদের জমি-জমা উদ্ধার করতে চাইছ। উদ্ধার হলে ছেলেমেয়েদের জন্য তোমাকে একটা গরু কিনতে হবে, কিনতে হবে খড়ের আঁটি, গাড়িতে করে চালান দেওয়ার জন্য একটা ঘোড়া। ভাই এলিজা কুজমিক, তুমি বড়ই জড়িয়ে পড়েছ তুমি একেবারে নোঙর গেড়ে বসেছ তাই ঠিক-বেঠিক বিচার করতে পারছ না।"

এলিজা উঠে দাঁড়াল। মাথার তলা থেকে কোটটা বের করে ভাঁজ খুলে নস্যির কৌটো বের করল। মাথাটা পরিষ্কার করবার জন্য এক টিপ নস্যি নিল। অনেক ভাবল, কিন্তু কিছুই স্থির করতে পারল না। বুঝল যে তার যাওয়াই উচিত, কিন্তু লোকগুলোর জন্য তার দুঃখও হতে লাগল কী যে করবে বুঝতে পারল না। কোটটা ভাঁজ করে মাথার নিচে দিয়ে শুয়ে পড়ল। যখন ঘুম এল তখন মোরগ ডাকতে শুরু করেছে।

স্বপ্ন দেখল, কেউ যেন হঠাৎ খুব রূঢ়ভাবে ডেকে তাকে জাগিয়ে দিলো। দেখল সে যেন বোঁচকা কাঁধে লাঠি হাতে গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। গেটটা খোলা, কিন্তু কেবল একজন লোক তার ভিতর দিয়ে যেতে পারে। গেট পেরোবার সময় তার বোঁচকাটা একদিকে আটকে গেল। সেটা ছাড়াতে চেষ্টা করতেই তার পায়ের পট্টি আটকে গেল আর এক দিকে। খুলতে গিয়ে দেখে, বেড়ায় তো আটকায়নি, বোঁচকাটা টেনে ধরেছে ছোট মেয়েটি, বলছে, "দিদু, দিদুসিউ রুটি।" পায়ের দিকে তাকাতে দেখে, পায়ের পট্টি ধরে আছে ছোট ছেলেটি, আর বুড়ি এবং কৃষক জানালা দিয়ে দেখছে।

এলিজার ঘুম ভেঙে গেল। নিজেকেই যেন জোর গলায় বলে উঠল, "কালই আমি জমি আর মাঠ খালাস করে আনব, ওদের কিনে দেব একটা ঘোড়া ফসলের সময় পর্যন্ত চলবার মতো ময়দা, আর ছোটদের জন্য একটা গরু। সাত-সমুদ্দুর পেরিয়ে যীশুকে খুঁজে খুঁজেও তুমি হয়ত নিজের মধ্যেই তাঁকে হারিয়ে ফেলতে পার। এই লোকগুলোকে আমি ওদের পায়ে দাঁড় করাবই।"

ভোর পর্যন্ত এলিজা জুত করে ঘুমোল।

সকালে উঠেই গেল ধনী ব্যবসায়ীর বাড়ি। জমি ও মাঠ খালাস করল। একটা কাস্তে কিনে (লোকে তখন কাস্তেও বিক্রি করছিল) বাড়িতে নিয়ে এল। কৃষককে পাঠাল ফসল কাটতে, আর নিজে খোঁজ-খবর করে জানতে পারল, সবাইখানায়

একটা ঘোড়া আর একখানা গাড়ি বিক্রি হবে। সবাইওলার সঙ্গে দর দাম ঠিক করে ঘোড়া ও গাড়ি কিনল, এক বস্তা ময়দা কিনে গাড়িতে তুলে রেখে গেল গরু কিনতে। যেতে যেতে দেখল, দুটি ইউক্রেনীয় স্ত্রীলোক কথা বলতে বলতে চলেছে। তারা তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বললেও এলিজা বুঝতে পারল তারা তার কথাই বলাবলি করছে

"আরে প্রথমটা ওরা জানতই না লোকটি কী ওরা ভেবেছিল একজন মামুলি মানুষ। ওরা তো বলে জল খেতে এসে সেখানে থেকে গেছে। এখন কত জিনিস ওদের কিনে দিয়েছে। এই তো আজই সবাইওলার কাছ থেকে ঘোড়া কিনল, গাড়ি কিনল। জগতে এমন লোক তুমি ক'টা পাবে? আমার তো একবার গিয়ে দেখে আসতে ইচ্ছে করছে।"

এলিজা বুঝল, তাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রশংসা করা হচ্ছে। গরু কিনতে না গিয়ে সে সবাইওলার কাছে ফিরে গেল ঘোড়ার দাম দিতে। গাড়িতে ঘোড়া জুড়ে ময়দা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। গেটের কাছে পৌঁছেই গাড়ি থেকে নামল

বাড়ির লোকেরা তো ঘোড়া দেখে অবাক। তারা বুঝল তাদের জন্যই ঘোড়া কেনা হয়েছে, কিন্তু সেকথা বলতে সাহস পেল না। বাড়ির কর্তা এগিয়ে এসে গেট খুলে দিয়ে বলল, "ঘোড়া কোথায় পেলে দিদু?"

"কিনলাম," এলিজা বলল, "ওর সস্তায় যাচ্ছিল। যাও কিছু ঘাস কেটে এনে রাতের মতো গোয়াল রেখে এস।"

সবাই শুতে গেল। বোঁচকাটা পাশে নিয়ে এলিজা পথের পাশেই শুয়ে পড়ল।

সেদিন রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে উঠল। বোঁচকা বাঁধল, পায়ে পট্টি জড়াল, কোট গায়ে দিল। তারপর এফিমের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

৭

পাঁচ ভার্স্ট পথ হাঁটল এলিজা।

ভোর হয়ে আসছে, একটা গাছের নিচে বসে সে বোঁচকা খুলল। গুণে দেখল, সাত রুবল কুড়ি কোপেক মাত্র আছে।

মনে মনে ভাবল, "তাহলে? এই টাকায় তো সাগর পাড়ি দেওয়া যাবে না। আর ভিক্ষে করে খাওয়ার থেকে না যাওয়াই ভাল। এফিম একাই সেখানে যাক, আমার জন্য একটা দীপ সে জ্বেলে দেবেই। হয়ত মৃত্যু পর্যন্ত এই অপূর্ণ প্রতিজ্ঞা আমার বিবেকের উপর চেপে থাকবে। তবে ঈশ্বর একমাত্র ভরসা—ঈশ্বর করুণাময়, তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন।"

এলিজা উঠে দাঁড়াল। কাঁধের উপর বোঁচকা ঝুলিয়ে বাড়ির পথে পা বাড়াল। পাছে লোকজনদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাই গ্রামকে পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছল। যাবার সময় বেশ কষ্ট হয়েছে। এফিমের সঙ্গে তাল রাখতে প্রাণান্ত। কিন্তু

ঈশ্বরের দয়ায় ফিরতে তার সেরকম পরিশ্রম হলো না। লাঠি দোলাতে দোলাতে খুশি মনে সে হেঁটে চলল। দিনে সত্তর ভার্স্ট হাঁটতে লাগল।

যখন সে বাড়ি পৌঁছল তখন ফসল কাটা শেষ হয়েছে। বাড়ির লোকেরা বুড়োকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করল। কেমন করে কী ঘটল, সব জানতে চাইল। সহযাত্রীর সঙ্গে রইল না কেন? কেন তীর্থ পর্যন্ত গেল না? কেনই বা বাড়ি ফিরে এল?

এলিজা সব কথা খুলে বলল না।

"ঈশ্বরের ইচ্ছে নয় তাই। পথে আমার টাকা হারিয়ে গেল, সঙ্গীও অনেক এগিয়ে গেল, তাই আর গেলাম না। যীশুর দোহাই, আমাকে তোমরা ক্ষমা করো।"

টাকা যা হাতে ছিল এলিজা তার স্ত্রীকে দিলো। বাড়ি ঘরের সব খবর জিজ্ঞাসা করল। সব ঠিক আছে। সব কাজ ঠিকমতো করা হয়েছে। জমির কাজে কেউ গাফিলতি করেনি। সবাই সুখে শান্তিতেই ছিল।

এলিজা ফিরেছে জেনে এফিমের পরিবারের লোকেরা সেইদিনই এফিমের খবর জানতে গেল। এলিজা ওই একই কথা তাদেরও বলল।

"সেন্ট পিটার দিবসের ঠিক তিন দিন আগে যখন আমাদের ছাড়াছাড়ি হয় তখন পর্যন্ত তোমাদের বুড়ো বেশ ভালভাবেই হাঁটছিল। আমি ভেবেছিলাম তাকে ধরে ফেলব, কিন্তু এমন সব ঝামেলা হলো। আমার টাকা হারিয়ে গেল। কী নিয়ে যাব? কাজেই ফিরে এলাম।"

সবাই অবাক হলো। তার মতো একজন চালাক চতুর লোক এমন বোকার মতো কাজ কেমন করে করল—পথে বের হলো কিন্তু পৌঁছুতে পারল না? আবার সব টাকা উড়িয়ে দিলো?

অবাক হতে হতে একদিন সবাই ভুলে গেল।

এলিজাও ভুলে গেল। সে বাড়ির কাজকর্মে মন দিলো। ছেলেকে নিয়ে সে শীতের জন্য কাঠ যোগাড় করল, মেয়েদের নিয়ে ফসল ঝাড়ল, চাল ছাইল, মৌমাছিগুলোর উপরে ঢাকনা দিলো, এবং দশটি মৌচাক ও তার মৌমাছি প্রতিবেশীকে দিয়ে দিলো। এলিজা যে দশটি মৌচাক বিক্রি করেছিল তার থেকে অনেকগুলো নতুন মৌমাছি তার স্ত্রী লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু সব জিনিস এলিজার নখ দর্পণে। সে দশটার বদলে প্রতিবেশীকে সতেরো ঝাঁক মৌমাছি দিয়ে দিলো। সব ঠিকঠাক করে এলিজা ছেলেকে মজুরের কাজ করতে বাইরে পাঠিয়ে দিলো। নিজে বাড়িতে থেকে জুতোর "লাভ" তৈরি এবং মৌমাছির জন্য কাঠের টুকরো কেটে ফাঁপা করতে লাগল।

৮

যে প্রথম দিনটা এলিজা সেই কুটিরে রুগ্ন লোকগুলোকে নিয়ে কাটিয়েছিল সেই পুরো দিনটাই এফিম তার সঙ্গীর জন্য অপেক্ষা করল। কিছুটা পথ চলেই এফিম বসে

পড়ল; অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল; একটু ঘুমিয়ে নিলো, ঘুম ভেঙে আবার অপেক্ষা করল—এলিজার দেখা নেই। যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে রইল। গাছ-গাছালির পিছনে সূর্য অস্ত গেল—কোথায় এলিজা!

"তবে কি আমাকে ছাড়িয়ে গেল না কি একটা ঘোড়া পেয়ে, আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলাম তখন আমাকে না দেখতে পেয়ে চলে গেল? কিন্তু আমাকে না দেখবে কেন? এই প্রান্তরের মধ্যে অনেক দূর থেকে সব কিছু দেখা যায়। আমি যদি ফিরে যাই, আর এদিকে সে যদি এগিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে? ক্রমেই তো আমরা পরস্পর থেকে দূরে সরে যাব। তার চেয়ে আমি এগিয়েই যাই। রাতের চটিতে নিশ্চয় দেখা হবে।"

একটা গ্রামে পৌঁছে চৌকিদারকে বলে রাখল, এই রকম, এই রকম একটি বুড়ো এলে যেন তার কুঁড়েয় পৌঁছে দেয়। সে রাতে এলিজা এল না। এফিম এগিয়ে চলল। পথে যাকে পায় তাকেই জিজ্ঞাসা করে, একটি ছোটখাট টাকমাথা বুড়োকে দেখেছে কি না। কেউ দেখেনি। এফিমের অবাক লাগে, তবু সে একাই পথ চলে। ভাবে: "ওডেসায় বা জাহাজে নিশ্চয় আমাদের দেখা হবে।"

তারপর আর ভাবে না।

পথে একজন তীর্থযাত্রীর সঙ্গে দেখা হলো। তার পরনে পুরোহিতের কোট, আঁটো টুপি, মাথায় লম্বা চুল। সে মাউন্ট এথোসে গিয়েছে; জেরুজালেমে এই তার দ্বিতীয় যাত্রা। একই জায়গায় তারা রাত কাটাল, আলাপ-পরিচয় হলো, তারপর একসঙ্গে যাত্রা করল।

বিনা কষ্টেই তারা ওডেসা পৌঁছল। সেখানে জাহাজের অপেক্ষায় তিন দিন তিন রাত্রি বসে রইল। অনেক জায়গা থেকে এসে আরও বহু যাত্রী বসে আছে। এফিম তাদের এলিজার কথা জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু কেউ তাকে দেখেনি।

তীর্থযাত্রীটি ব্যাখ্যা করে বোঝাতে লাগল, কেমন করে বিনা টিকিটে জাহাজে চাপা যায়। কিন্তু এফিম তারাসিক সে কথা শুনল না। বলল, "আমি বরং টাকাই দেব। এই জন্যই আমি টাকা জমিয়েছিলাম।"

পাঁচ রুবল দিয়ে সে একখানা বৈদেশিক পাসপোর্ট করল, জাহাজে যাতায়াতের দরুন চল্লিশ রুবল দিলো, আর জাহাজে খাবার জন্য রুটি আর মাছ কিনল।

জাহাজ বোঝাই হলো। এফিম ও তার সঙ্গী সহ-তীর্থযাত্রীরা সবাই উঠল। নোঙর তোলা হলো। সবাই জাহাজে ভাসল।

একদিন বেশ ভালভাবেই কেটে গেল। সন্ধ্যার দিকে বাতাস উঠল, বৃষ্টি শুরু হলো, জাহাজও খুব দুলতে লাগল।

যাত্রীরা এ-ওর গায়ে ঢলে পড়তে লাগল, স্ত্রীলোকরা কান্না জুড়ে দিলো; দুর্বল লোকগুলো একটু নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছুটোছুটি করতে লাগল। এফিমও ভয় পেল, কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করল না। সমস্ত রাত এবং তার পরদিনও সে জাহাজে উঠেই যেখানে বসেছিল সেখানেই বসে রইল। পাশেই ছিল তামবফ্ থেকে আসা

আর একটি বুড়ো। দু'জনেই যার যার বোঁচকা ধরে বসে রইল। কোনও কথা বলল না। তৃতীয় দিন অবস্থা শান্ত হলো। পঞ্চম দিনে জাহাজ কন্সট্যান্টিনোপলে নোঙর করল। কতক যাত্রী তীরে নেমে গেল বিজ্ঞ সেন্ট সোফিয়ার গির্জা দেখতে। গির্জাটা তখন তুর্কীদের অধিকারে। এফিম জাহাজেই থাকল। কিছু সাদা পাঁউরুটি কিনল। পরদিন জাহাজ ছাড়ল। স্মার্না ও আলেকজান্দ্রিয়ায় থেমে জাফায় পৌঁছল। জাফায় সব তীর্থযাত্রী নেমে গেল। সেখান থেকে জেরুজালেম পায়ে হেঁটে সত্তর ভার্স্ট পথ।

জাহাজ থেকে নামবার সময় সবাই খুব ভীত হয়ে পড়ল। জাহাজ খুব উঁচু। সেখান থেকে যাত্রীদের নিচে ছোট ছোট নৌকোয় নামিয়ে দেওয়া হলো। যে-কেউ ছিটকে বাইরে পড়ে যেতে পারে। জনা-দুই লোক তো চুবোনিও খেল। যাহোক সবাই নিরাপদে তীরে পৌঁছল।

পায়ে হেঁটে হেঁটে তারা জেরুজালেম পৌঁছল তৃতীয় দিনে। শহরেব বাইরে রুশ যাত্রীনিবাসে আশ্রয় নিলো। সেখানে তাদেব পাসপোর্টে স্ট্যাম্প মারা হলো। দুপুরেব খাবার খেয়ে এফিম আর তার সঙ্গী পুণ্যস্থানগুলি দেখে বেড়াল। পবিত্র পীঠস্থানে প্রবেশের শুভলগ্ন আসতে তখনও দেরি ছিল। কাজেই তারা সাধু-সন্তদের মঠে গিয়ে হাজির হলো। অনেক লোক সেখানে জমায়েত হয়েছে। সেখানে স্ত্রীলোক আর পুরুষকে আলাদা করে দেওয়া হলো। সবাইকে জুতো-মোজা খুলে গোল হযে বসতে বলা হলো। একজন সন্ন্যাসী একখানা তোয়ালে নিয়ে এসে একে-একে সকলের পা ধুইয়ে দিলো। ধুযে-পুঁছে পায়ে চুমো খেল একে একে সকলেবই। এফিমেব পা ধুইযে চুমো খেল। সেও প্রাতঃকালীন ও সান্ধ্য উপাসনায় যোগ দিলো, প্রার্থনা করল, মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলো, সমবেত প্রার্থনার সময় পড়বার জন্য তার নাম লিখিয়ে দিলো। যাত্রীদের খাবার ও মদ দেওযা হলো।

মিশরেব মেরী যে গুহায় মুক্তিলাভ করেছিলেন, পরদিন তারা সেখানে গেল। সেখানে মোমবাতি জ্বালিয়ে, প্রার্থনা কবে অ্যাব্রাহামের মঠে গেল। যে সাবেকফ উদ্যানে অ্যাব্রাহাম ঈশ্বরেব কাছে তার ছেলেকে বলি দিতে চেয়েছিল, সেটাও তাবা দেখল। তারপর তাবা গেল সেই জায়গায় যেখানে যীশু মেবী ম্যাগডালেনকে দেখা দিয়েছিলেন। প্রভুর ভাই সেন্ট জেম্‌সের গির্জায়ও গেল। সঙ্গী তীর্থযাত্রীটিই তাকে সব কিছু দেখাল, কোথায কত দক্ষিণা দিতে হবে বলে দিলো। দুপুরে তারা খাবার জন্য হোটেলে ফিবল। যেই তারা বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়েছে অমনি সেই তীর্থযাত্রী চিৎকার করে জামা-কাপড় হাতড়ে কি যেন খুঁজতে লাগল।

সে বলতে লাগল, "কারা আমার থলে সরিয়েছে। তাতে পঁচিশ রুবল ছিল। দু'খানা দশ রুবলের নোট আর তিনটে মুদ্রা।" নানাভাবে সে বিলাপ করতে লাগল। কিন্তু কিছুই তো করবার নেই। সকলে আবার শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

৯

শুয়ে শুয়ে নানা দুষ্ট চিন্তা এফিমের মাথায় ঘুরতে লাগল। তার মানে হলো,

"তীর্থযাত্রীটির টাকা হয়ত চুরি যায়নি। সে তো কোনও স্থানেই কিছু দান করেনি। আমাকেই শুধু কোথায় কী দিতে হবে তাই বলেছে, নিজে কিছুই দেয়নি। বরং আমার কাছ থেকে এক রুবল ধার নিয়েছে।"

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে সে আবার নিজেকে তিরস্কারও করতে লাগল ঃ "অন্যকে বিচার করা আমার পক্ষে পাপ। এ চিন্তা আমাকে দূর করতে হবে।" কিন্তু ভুলে যাওয়ামাত্রই আবার মনে পড়তে থাকে—টাকার উপর তীর্থযাত্রীটির যেরকম কড়া নজর, তার টাকা চুরি যাওয়া মোটেই সম্ভব নয়। সে ভাবে, "নিশ্চয় লোকটার কোনও টাকা ছিল না। আমাকে ধোঁকা দিতেই ও কথা বলেছে।"

সকালে উঠে তারা "পবিত্র সমাধিস্তম্ভের পুনরুজ্জীবনের বড় গির্জা"র প্রার্থনাসভায় গেল। তীথযাত্রীটিও এফিমের সঙ্গে গেল, তার পাশেই রইল সর্বক্ষণ।

গির্জায় পৌঁছে দেখে লোকে লোকারণ্য —রুশ, গ্রীক, আর্মেনীয়, তুর্কী, সিরীয় ইত্যাদি বিভিন্ন জাতির তীর্থযাত্রী ও পূজারী সেখানে সমবেত হয়েছে। জনতার সঙ্গে এফিম "পবিত্র ফটক"-এ পৌঁছল। একজন সন্ন্যাসী এসে তাদের তুর্কী রক্ষীদলকে পার করে সেইখানে নিয়ে গেল যেখানে যীশুকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে তৈলাভিষেক করা হয়েছিল। বড় বড় নটি মোমবাতি সেখানে জ্বলছে। সন্ন্যাসী সব কিছু দেখাল, বুঝিয়ে দিলো। এফিমও একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলো। তারপর সিঁড়ি বেয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো গলগোথায়। সেখানেই ক্রুশটি পোঁতা হয়েছিল। এফিম সেখানে প্রার্থনা করল। মাটির সেই ফাটলটাও তাকে দেখানো হলো যেখানে পৃথিবী পাতাল পর্যন্ত বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। যীশুর হাতে ও পায়ে যেখানে পেরেক ঠোকা হয়েছিল সে জায়গাটাও দেখা হলো। তারপর আদমের সমাধি – সেখানে তার কঙ্কালের উপর যীশুর রক্ত ঝরে পড়েছিল। তাকে নিয়ে গেল সেই পাহাড়ে যেখানে বসিয়ে যীশুর মাথায় কাঁটার মুকুট পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর সেই দণ্ডটির কাছে, যাতে বেঁধে যীশুকে চাবুক মারা হয়েছিল। এফিম যীশুর পায়ের ছাপের গর্ত-করা পাথরটিও দেখল। সন্ন্যাসীরা তাকে আরও অনেক কিছু দেখাত, এমন সময় জন-সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল। সবাই "পবিত্র সমাধিস্তম্ভের" গুহার দিকে ছুটতে লাগল। বিদেশীদের প্রার্থনা-সভা শেষ হয়ে তখন গোঁড়া রুশদের প্রার্থনা সভা সবে শুরু হয়েছে। এফিমও জনতার সঙ্গে সেই গুহার দিকে অগ্রসর হলো।

তীর্থযাত্রীটির সঙ্গ সে এড়িয়ে যেতে চাইল (মনে মনে তখনও সে তার সম্পর্কে খারাপ চিন্তা করে চলেছে), কিন্তু লোকটা কিছুতেই তাকে ছাড়ল না, সেও সঙ্গে সঙ্গে চলল।

এফিম আরও সামনে এগোতে চাইল, কিন্তু পারল না। এত লোক তখন জমায়েত হয়েছে যে এগোনো পেছনোও অসম্ভব। প্রার্থনা করতে করতে সে মাঝে মাঝেই টাকার থলিটা হাত দিয়ে দেখছিল। তার মন তখন সেই দিকে। প্রথমে ভাবল, তীর্থযাত্রীটি তাকে ধোঁকা দিয়েছে; আবার ভাবল, যদি সে সত্য কথাই বলে থাকে,

যদি তার টাকা খোয়া গিয়েই থাকে, তাহলে সেরকমটা তো আমার বেলায়ও ঘটতে পারে।

১০

এফিম দাঁড়াল। প্রার্থনা করতে করতে সে সম্মুখের পবিত্র স্তম্ভের আসনের দিকে তাকাল। মাথার উপরে ছত্রিশটা বাতি জ্বলছে। জনতার মাথার উপর দিয়ে ভাল করে তাকাতেই হঠাৎ—ও কী! একেবারে সামনে প্রজ্জ্বলিত পবিত্র অগ্নিব উপবকার আলোগুলির ঠিক নিচে একটা মোটা ধূসর কোট গায়ে দাঁড়িয়ে আছে ছোটখাটো একটি বুড়ো মানুষ, তার মাথার টাক চক্‌চক্ করছে ঠিক এলিজা বোদ্রোফের মতো। সে ভাবল, "এলিজার মতো দেখতে বটে, কিন্তু সে তো হতে পারে না। আমার আগে সে তো এখানে আসতে পারে না! আমাদের আগেকার জাহাজ ছেড়েছিল সাতদিন আগে। এত আগে তো তার পক্ষে পৌছনো সম্ভব নয়। আবার আমাদের জাহাজেও সে আসেনি। প্রতিটি যাত্রীকে আমি ভাল করে দেখেছি।"

এই কথাগুলি ভাবতে ভাবতেই সে দেখল, সেই ছোটখাট বুড়োটি তিনবার মাথা নোয়াল ঃ একবার ঈশ্বরের সামনে, তারপর দুই পাশের প্রার্থনারত জনতাব দিকে। বুড়োটি যখন ডান দিকে মাথাটা ঘোরাল, তখন এফিম তাকে চিনতে পারল। এ তো স্বয়ং বোদ্রোফ—তার গালের কাছে পাক-ধরা কালো কোঁকড়ানো দাড়ি, তাব ভুরু, চোখ, নাক, মুখ। সে-ই তো। সঙ্গী পেয়ে এফিম ভারি খুশি। সে যে তার আগেই এসে পৌছেছে, এটা খুবই বিস্ময়কর।

"আরে বোদ্রোফ, তুমি অতটা সামনে গেলে কেমন করে!" সে ভাবল। "নিশ্চয়ই এমন কারও সঙ্গে তাব দেখা হয়েছিল যে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে। বেরোবার পথেই তাকে ধরব; তীর্থযাত্রীটিকে ঝেড়ে ফেলে এলিজার সঙ্গ নেব; সে হয়ত আমাকে কি ভাবে সকলের আগে যাওয়া যায় সে পথ দেখিয়ে দেবে।"

এলিজা যাতে হারিয়ে না যায় সেজন্য তাকে সে চোখে চোখে রাখল। প্রার্থনা শেষ হলে জনতা সমাধিস্তম্ভকে চুম্বন করবার জন্য সবেগে অগ্রসর হতে লাগল; তাদের চাপে এফিম একপাশে ছিটকে গেল। ওদিকে আবার ভয়, বুঝি টাকার থলি চুরি যায়। হাতের মুঠোয় থলিটা চেপে ধরে এফিম খোলা জায়গায় যাবার জন্য ধস্তাধস্তি করতে লাগল। বাইরে বেরিয়ে গির্জার ভিতরে ও বাইরে এখানে-ওখানে অনেক ঘুরল, এলিজাকে অনেক খুঁজল। গির্জার ছোট ঘরে সে অনেক লোককে দেখতে পেল,—কেউ খাচ্ছে, কেউ বা পান করছে, ঘুমুচ্ছে। কিন্তু এলিজা কোথাও নেই।

এফিম যাত্রীনিবাসে ফিরে এল। সেখানেও এলিজাকে দেখতে পেল না।

সেইদিন সন্ধ্যায় তীর্থযাত্রীটিও ফিরে এল না। তার রুবল ফিরিয়ে না দিয়েই সে উধাও হয়ে গেল। এফিম একেবারে একা পড়ে গেল।

পরদিন এফিম আবার পবিত্র স্মৃতিস্তম্ভে গেল। সঙ্গী জাহাজের পরিচিত তান্‌বোকের সেই বৃদ্ধ। সে একেবারে সামনের সারিতে যেতে চেষ্টা করল, কিন্তু পিছনেই পড়ে রইল। সেখানেই একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে লাগল। সামনে তাকিয়ে আবার সে দেখতে পেল—সমাধিস্তম্ভের আলোর ঠিক নিচে একটা খুব ভাল জায়গায় এলিজা দাঁড়িয়ে আছে; পবিত্র আসনে দণ্ডায়মান পুরোহিতের মতো তার দুই হাত সামনে প্রসারিত, তার গোল টাক মাথাটা চক্‌-চক্‌ করছে।

এফিম ভাবল, "আচ্ছা, এবার আর ওকে হারাচ্ছি না।" সে জোর করে সামনে এগোতে লাগল। দুই হাতে ভিড় সরিয়ে সামনে গিয়ে দেখল, এলিজা সেখানে নেই।

তৃতীয় দিন সে আবার পবিত্র সমাধিস্তম্ভে গেল। আবারও দেখল, একেবারে সর্বোচ্চ আসনে পরিষ্কার দাঁড়িয়ে আছে এলিজা। তার হাত সম্মুখে প্রসারিত, যেন কাউকে দেখছে এমনিভাবে ঊর্ধ্বদিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

এফিম ভাবল, "আচ্ছা, এবার তাকে হারাচ্ছি না। বের হবার পথে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। তাহলে আর কেউ কাউকে হারাব না!"

বাইরে গিয়ে এফিম অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। দুপুর গড়িয়ে গেল; সকলেই তার পাশ দিয়ে চলে গেল; শুধু গেল না এলিজা।

ছ' সপ্তাহ এফিম জেরুজালেমে কাটাল। সর্বত্র গেল—বেথলেহেম, বেথানি, জর্ডন, সব জায়গায়। নিজের কবরের জন্য সে একটি নতুন শার্ট পবিত্র সমাধিস্তম্ভ থেকে মন্ত্রপূত করিয়ে নিলো, জর্ডন নদীর জল সংগ্রহ করল, খানিকটা পবিত্র মাটি ও পবিত্র অগ্নিতে জ্বালানো একটা মোমবাতি সঙ্গে নিল, আট জায়গায় প্রার্থনার নাম লেখাল, এবং শুধুমাত্র বাড়ি ফিরবার টাকা রেখে আর সব খরচ করে ফেলল। তারপর শুরু হলো ফিরতি যাত্রা। পায়ে হেঁটে জাফায় এসে জাহাজে চড়ল। সেখান থেকে ওডেসায় এসে আবার পায়ে হেঁটে বাড়ি পৌছল।

১১

এফিম বাড়ি ফিরবার সেই একই পথ ধরল। যত এগোয় ততই তার দুশ্চিন্তা বাড়ে, তার অনুপস্থিতিতে ঘর-গেরস্তালি সব ঠিকমতো চলেছে তো? এক বছরে তো অনেক জল বয়ে গেল। ঘর গড়তেই সময় লাগে, ভাঙতে আর কী। তাকে ছাড়া ছেলে সব ঠিকমতো করতে পেরেছে তো? বসন্তকাল কেমন কেটেছে কে জানে। শীতে গরু-ভেড়াগুলোই বা কেমন ছিল? নতুন ঘরখানি কি শেষ হয়েছে?

এক বছর আগে এলিজার সঙ্গে যেখানে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল সেইখানে পৌছল এফিম। লোকগুলোকে এখন যেন আর চেনা যায় না। এক বছর আগে তারা সব না খেয়ে মরছিল, এবার সবারই বরাত ফিরেছে, ফসল ভাল হয়েছে। গত বছরের দুঃখ-কষ্টকে ঝেড়ে ফেলেছে সবাই।

এক বছর আগে এলিজা যে গাঁয়ে থেকে গিয়েছিল সেই গাঁয়ে পৌছল এফিম। গাঁয়ে ঢুকতেই সাদা ফ্রক-পরা একটি ছোট্ট মেয়ে ঘব থেকে ছুটে বেবিয়ে এল।

"দিদু! দিদুসিউ! আমাদের বাড়ি এস।"

এফিম নিজের পথেই এগোতে চাইল। কিন্তু মেয়েটি নাছোড়বান্দা : তাব কোটেব নিচু দিকটা আঁকড়ে ধরে হাসতে হাসতে তাকে বাড়িব দিকে টেনে নিয়ে চলল।

ছোট ছেলেকে নিয়ে একটি স্ত্রীলোকও বেবিয়ে এসে তাকে ডাকল : "আসুন দিদু, খেয়ে-দেয়ে এখানেই বাতটা কাটান।"

এফিম ভিতবে ঢুকল। ভাবল, এলিজার কথা জিজ্ঞেস কর্বি। হয়ত এই বাড়িতেই সে জল খেতে ঢুকেছিল।

ঘরে ঢুকলে স্ত্রীলোকটি তার ঘাড় থেকে বোঁচকাটা নামাল, হাত-মুখ ধোবাব জল দিলো, তারপর খাবাব টেবিলে নিয়ে বসাল। দুধ আব কাশা খেতে দিলো।

এফিম তাকে ধন্যবাদ জানাল, তীর্থযাত্রীদেব আপ্যায়ন কবাব জন্য তাকে প্রশংসা করল।

স্ত্রীলোকটি মাথা নেড়ে বলল, "তীর্থযাত্রীকে আমবা কখনও ফেবাই না। একজন তীর্থযাত্রীর কাছেই আমরা বাঁচতে শিখেছি। আমবা ঈশ্ববকে ভুলে ছিলাম, তাই ঈশ্বব আমাদের শাস্তি দিয়েছিলেন। মরতেই তো বসেছিলাম। গত গ্রীষ্মে সবাই তো অসুস্থ হযে পড়েছিলাম। এক কণা খাবাব ছিল না। মবেই যেতাম, এমন সময আপনাব মতো একজন বৃদ্ধকেই ঈশ্বর পাঠালেন। জল খেতে এসে আমাদেব দেখে তার দযা হলো, এখানেই থেকে গেলেন। তিনি আমাদেব খাদ্য দিলেন, পানীয দিলেন, আমাদের বাঁচালেন, জমি খালাস করে দিলেন, ঘোড়া ও গাড়ি কিনে তাও আমাদেব দিয়ে গেলেন।"

ঠিক সেই সময বুড়ি ঘরে ঢুকে বাধা দিয়ে বলতে লাগল, "জানি না তিনি মানুষ না স্বর্গেব দেবদূত! তিনি আমাদেব ভালবাসা দিলেন, দযা কবলেন, তাবপব চলে গেলেন। পবিচয়ও জানালেন না যে তাঁর জন্য একটু প্রার্থনা জানাব। এখনও মনে হয যেন আজকেব ঘটনা . ওইখানে আমি শুয়ে আছি, মবণ এলেই হয এমন অবস্থা। চোখ মেলে দেখি সাদাসিধা ছোটখাটো টাকমাথা একটি বুড়ো মানুষ জল চাইছে। পাপীব মন তো, আমি ভাবলাম : ও আবার কি জন্য উঁকিঝুঁকি মারছে? তাবপব লোকটি কী করাই না কবল। আমাদের দেখেই ধপাস করে বোঁচকাটা ফেলে দিলো। ঠিক ওইখানে। তাবপব সেটা খুলে ফেলল।"

ছোট মেয়েটিও বলতে ছাড়ল না।

"হলো না ঠাকুমা। তিনি প্রথমে বোঁচকাটা রাখলেন ওখানে ঘবেব ঠিক মাঝখানে, তারপর তুলে বাখলেন বেঞ্চিটার উপব।"

তারপব শুরু হলো তাদেব কথা-কাটাকাটি. তার সব কথা, তার সব কাজেব ফিরিস্তি বর্ণনা : কোথায় সে বসেছিল, কোথায ঘুমিয়েছিল, কী করেছিল, কী বলেছিল, সব।

সন্ধ্যায় কৃষক ফিরে এল ঘোড়া নিয়ে। বুড়ো মানুষটার গল্প বলতে সেও কমতি গেল না।

"তিনি যদি না আসতেন, আমরা সবাই মরে যেতাম। গভীর হতাশায় মরতে বসে আমরা অভিযোগ করছিলাম ঈশ্বর আর মানুষের বিরুদ্ধে। তিনিই আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখালেন। মানুষের মধ্যে সৎকে দেখতে শেখালেন! যীশু তাঁর আত্মার কল্যাণ করুন। গরু ভেড়া-র মতো বেঁচে ছিলাম আমরা। তিনি আমাদের মানুষ করে গেছেন।"

এফিমকে খাদ্য ও পানীয় জুগিয়ে শোবার জায়গা করে দিয়ে তারাও সকলে শুতে গেল।

এফিম জেগেই রইল। জেরুজালেমে সে যে বারবার তিনবার এলিজাকে দেখেছিল, এ চিন্তা কিছুতেই তার মাথা থেকে গেল না।

তার মনে হলো, "বুঝেছি কেমন করে সে আমার আগে পৌঁছে গেছে। আমার তীর্থযাত্রার পুণ্য যথাস্থানে পৌঁচেছে কি না জানি না, কিন্তু তার যাত্রা ঈশ্বরের কাছেই পৌঁছে গিয়েছিল।"

সকালে সকলে মিলে এফিমকে বিদায় জানাল, পথের জন্য তার বোচকায় কিছু খাবার ভরে দিলো, তারপর যে যার কাজে চলে গেল।

এফিমও পথে পা বাড়াল।

১২

ঠিক এক বছর এফিম তীর্থভ্রমণ করেছে। সে যখন বাড়ি ফিরল তখন বসন্তকাল। সন্ধ্যার দিকে বাড়ি পৌঁছে দেখে, ছেলে বাড়ি নেই, মদের দোকানে গেছে। বেশি রাত করে মদ গিলে ছেলে বাড়ি ফিরল। এফিম তখন নানারকম কৈফিয়ৎ তলব করল। দেখা গেল, তার অনুপস্থিতিকালে ছেলেটা কিছুই করেনি। বোকার মতো কাজ করে সব দিক ডুবিয়েছে। বাপ ছেলেকে বকতে লাগল। ছেলেও পাল্টা জবাব দিলো :

"তোমারই তো দোষ! তুমিই তো টাকা-পয়সা সব নিয়ে চলে গেলে। এখন আমাকে দোষ দিলে চলবে কেন?"

বৃদ্ধ রেগে তাকে প্রহার করল।

পরদিন সকালে এফিম তারাসিক গ্রাম প্রধানের বাড়ি গেল ছেলের বিষয়ে আলোচনা করতে। পথে এলিজার বাড়ি। এলিজার স্ত্রী বাড়ির দরজা থেকেই তাকে ডেকে বলল, "এই যে, ভাল তো? তীর্থধর্ম বেশ ভালই হলো তো?"

এফিম দাঁড়াল। বলল, "ঈশ্বরের কৃপায় ভালই হয়েছে। তোমাদের বুড়ো তো মাঝপথেই হারিয়ে গেল। শুনলাম সেও বাড়ি ফিরেছে।"

বুড়ি মহা গপ্পে, সে অমনি মুখ খুলল : "তা ফিরেছে, অনেকদিন হলো ফিরেছে।

ধরুন, উৎসবের ঠিক আগে, বা কাছাকাছি সময়ে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে ফিরে আসায় ভালই হয়েছে। ওকে ছাড়া বড়ই একা-একা লাগত। কাজকর্ম অবশ্য এখন আর বেশি কিছু করতে পারে না—দিন তো হয়ে এল। তবু সে যে এখনও বাড়ির কর্তা তাতেই আমাদের আনন্দ। আর ছেলেও খুব খুশি—ওকে ছাড়া যেন অকূল পাথারে পড়েছিল। যাই বলুন, ওকে ছাড়া যেন আমাদের চলে না। ওকে আমরা ভালবাসি। সোহাগ করি।"

"সে কি এখন বাড়ি আছে?"

"বাড়িতেই তো আছে। মৌ-ঘরে মৌমাছিদের চাকে বসাচ্ছে। ও তো বলছে খুব ভাল মৌমাছি হয়েছে; ঈশ্বরের ইচ্ছায় এমন বড়-সড় হয়েছে যে-রকম বড় একটা দেখা যায় না। ও তো বলে, ঈশ্বর আমাদের করুণা করে পাপের শাস্তি দেননি। আরে, আপনি ভিতরে আসুন। আপনাকে দেখলে ও খুব খুশি হবে।"

বাড়ির ভিতরে গিয়ে এফিম এলিজার মৌ-ঘরে চলে গেল।

আরে! বার্চ গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে এলিজা। হাতে জাল নেই, দস্তানা নেই, একটা ধূসর রঙের কোট গায়ে। হাত দু'খানি সামনে বাড়িয়ে উপরের দিকে চেয়ে আছে, সারা টাক-মাথাটা চক্‌ চক্‌ করছে,—ঠিক যেমন সে দাঁড়িয়েছিল জেরুজালেমের 'পবিত্র সমাধি'র পাশে। মাথার উপরে বার্চ গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো ঠিক তেমনিভাবে পড়েছে যেমন পড়েছিল জেরুজালেমের পবিত্র অগ্নিশিখা। সোনালী মৌমাছিগুলো গুন-গুন করে মাথার চারদিকে ঘুরছে অথচ কামড়াচ্ছে না, ঠিক যেন একটা জ্যোতির্মণ্ডল।

এলিজার স্ত্রী ডেকে বলল, "তোমার বন্ধু এসেছেন।"

এলিজা খুশিমনে ফিরে তাকাল। ধীরে ধীরে দাড়ির ভিতর থেকে মৌমাছিগুলোকে সরিয়ে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এল।

"নমস্কার, নমস্কার বন্ধু! তারপর ধর্মকর্ম সব ভাল হলো তো?"

"পা দুটো ঠিকই চলেছে। জর্ডন নদীর জলও তোমার জন্য এনেছি। গিয়ে নিয়ে এসো। তবে প্রভু আমার তীর্থযাত্রা গ্রহণ করেছেন কি না "

"আরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। যীশু তোমার মঙ্গল করুন।"

একটু চুপ করে থেকে এফিম বলল, "আমার পা দুটো সেখানে গিয়েছিল, কিন্তু অন্তরটা আমার, না অন্য কারও..."

এলিজা বাধা দিলো, "সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা বন্ধু, সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

"ফেরবার পথে সেই বাড়িতে উঠেছিলাম যেখানে তুমি –"

আঁতকে উঠে এলিজা তাড়াতাড়ি বলল, "ঈশ্বরের ইচ্ছা বন্ধু, সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। চলো, ঘরে চলো, তোমাকে মধু খাওয়াব।"

প্রসঙ্গ পাল্টে এলিজা গৃহস্থালির কথা শুরু করল।

এফিম একটা নিঃশ্বাস ফেলল। সে-বাড়ির লোকজনদের কথা, জেরুজালেমে তাকে দর্শনের কথা কিছুই এলিজাকে বলল না।

শুধু তার মনে হলো, মৃত্যুদিন পর্যন্ত আমরা প্রত্যেকে যেন ভালবাসা আর কাজের ভিতর দিয়ে আমাদের কর্তব্য পালন করি—এই ঈশ্বরের ইচ্ছা।

১৮৮৫

জীবে প্রেম করে যেই জন

Where love is God is

কোনও এক শহরে এক সময়ে এক মুচি বাস করত। তার নাম মার্টিন এব্‌ডিশ। একতলার যে ছোট্ট ঘরটিতে সে থাকত তার একটিমাত্র জানালা। আর সে জানালাটি ছিল রাস্তার দিকে। কাজেই তার ভিতর দিয়ে রাস্তার লোকজন দেখা যেত। অবশ্য দেখা যেত শুধু তাদের পা, আর মার্টিন এব্‌ডিশও জুতো দেখেই লোক চিনতে পারত। অনেক কাল ধরে সে এখানে আছে, কাজেই অনেকের সঙ্গেই তার জানাশোনা। দু'-একবার তার হাতে এসে পড়েনি এমন একজোড়া জুতো এ তল্লাটে খুঁজে পাওয়া ভার। কোনও জুতো 'রি-সোল' করেছে, কোনওটায় বা নতুন করে গোড়ালি লাগিয়েছে। অনেক সময়ই সে জানালা দিয়ে চেয়ে তার কাজগুলো দেখত। কাজও পেত সে প্রচুর, কারণ সে কাজ করত সৎ পথে, ভাল জিনিস দিত, দাম নিত অল্প, আর সব সময় কথা ঠিক রাখত। ঠিক সময় মতো যে কাজ করে দিতে পারবে শুধু সেই কাজই সে নিত; না পারলে আগেই সেকথা বলে দিত, অকারণে কাউকে ভোগাত না। এব্‌ডিশকে সকলেই চিনত, তাই সে কাজও পেত প্রচুর।

স্বভাবতই সে মানুষ ভাল। তার উপর যতই বয়স বাড়তে লাগল ততই সে বেশি করে ভাবতে লাগল তার অন্তরাত্মার কথা, ততই সে বেশি করে ঝুঁকল ঈশ্বরের দিকে। শিক্ষানবিশ থাকাকালেই তার স্ত্রী মারা যায় একটিমাত্র তিন বছরের ছেলে রেখে। তাদের অন্য সব সন্তান আগেই মারা গিয়েছিল। প্রথমে মার্টিন ভেবেছিল ছোট ছেলেটিকে তার বোনের কাছে গ্রামে পাঠিয়ে দেবে; কিন্তু পরে সে মত বদলাল, ভাবল : 'কোনও অপরিচিত পরিবারে মানুষ হতে হলে আমার ছোট্ট ক্যাপিটোশ্‌কের কষ্ট হবে। তার চেয়ে সে আমার কাছেই থাকুক।' কাজেই শিক্ষানবিশী শেষ করে এব্‌ডিশ ছোট ছেলেকে নিয়ে একটা বাসাবাড়িতে গিয়ে উঠল। কিন্তু ঈশ্বর তার কপালে পুত্র-সুখ লেখেননি। ছেলেটি বড় হয়ে সবে বাপকে কিছু-কিছু সাহায্য করে তাকে সুখী করতে শুরু করেছে, এমন সময় সে অসুখে পড়ল, বিছানা নিল, আর এক সপ্তাহ জ্বরে ভুগে মারা গেল।

মার্টিন ছেলেটিকে কবর দিলো। গভীর হতাশায় ভেঙে পড়ল একেবারে। এমনকি

ঈশ্বরে পর্যন্ত বিশ্বাস হারাতে বসল। গভীর নৈরাশ্যে বার বার ঈশ্বরের কাছে মৃত্যুভিক্ষা করল; এমনকি তার মতো একটা বুড়ো-হাবড়ার পরিবর্তে তার একমাত্র প্রিয় পুত্রকে কাছে টেনে নেবার জন্য ঈশ্বরকে তিরস্কার করল পর্যন্ত। শেষটায় সে গির্জায় যাওয়াই ছেড়ে দিলো।

তারপর একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে এল তাদেরই গাঁয়ের একজন বুড়ো তীর্থযাত্রী,—সাত বছর ধরে সে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কথায় কথায় এব্‌ডিশ তাকে জানাল তার নিজের দুঃখের কথা।

সে বলল, "আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না বাবাজী, আমি শুধু মরতে চাই। ঈশ্বরের কাছে এ ছাড়া আর কিছুই আমার চাওয়ার নেই। আজ আমার কেউ নেই, কোনও আশাও নেই।"

বুড়ো তীর্থযাত্রী জবাব দিলো, "না না, এমন কথা বলো না মার্টিন। ঈশ্বরের কাজের বিচারক আমরা নই। ঈশ্বরের বিচারের উপরেই আমাদের নির্ভর করতে হবে, আমাদের বুদ্ধির উপরে নয়। তিনি যখন ভেবেছেন যে তোমার ছেলেকে মরতে হবে আর তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে, তখন সেটাকেই ঠিক বলে মনে করতে হবে। তুমি যে এত দুঃখ পাচ্ছ তার কারণ, শুধুমাত্র নিজের সুখের জন্যই তুমি বাঁচতে চেয়েছ।"

"তাহলে আর কিসের জন্য লোক বেঁচে থাকে?" মার্টিন প্রশ্ন করল।

"শুধুমাত্র ঈশ্বরের জন্য।" বুড়ো লোকটি জবাব দিলো। "এ জীবন তাঁরই দান, কাজেই তাঁর জন্যই তোমার বেঁচে থাকা উচিত। যখন তাঁর জন্য বেঁচে থাকতে শুরু করবে, দেখবে তখন আর তোমার ক্ষোভ থাকবে না, সব কিছুই তোমার কাছে বেশ সহজ হয়ে আসবে।"

মার্টিন চুপ করে রইল। তারপর বলল, "কিন্তু ঈশ্বরের জন্য আমি কেমন করে বাঁচব?"

বুড়ো লোকটি বলল, "সে পথ তো যীশুই আমাদের দেখিয়েছেন। তুমি পড়তে পারো তো? একখানা 'টেস্টামেন্ট' কিনে পড়, তাহলেই বুঝতে পারবে কেমন করে ঈশ্বরের জন্য বাঁচতে হয়। হ্যাঁ, সে বইতে সব লেখা আছে।"

কথাগুলো এব্‌ডিশের অন্তরে গভীর রেখাপাত করল। সেইদিনই বেরিয়ে সে বড় হরফে ছাপা একখানি 'নিউ টেস্টামেন্ট' কিনে পড়তে আরম্ভ করল।

এব্‌ডিশ প্রথমে ভেবেছিল শুধু ছুটির দিনগুলোতে বইখানা পড়বে। কিন্তু একবার পড়তে আরম্ভ করে মনে এমন শান্তি পেল যে রোজই পড়তে লাগল। একদিন তো পড়ায় এমন ডুবে গেল যে বাতির সবটা কেরোসিন পুড়ে শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে বই ছেড়ে উঠতেই পারল না। যতই পড়ে ততই যেন সে স্পষ্ট করে বুঝতে পারে ঈশ্বর তার কাছে কি চায়, কেমন করে ঈশ্বরের জন্য বাঁচা যায়; ততই তার অন্তর হাল্কা হতে থাকে। আগে আগে যখনই সে ঘুমের জন্য শুতো তখনই তার ছোট্ট ক্যাপিটোশ্‌কার কথা মনে করে যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করে উঠত। কিন্তু এখন সে

শুধু বার বার বলে, "হে প্রভু! তোমার জয় হোক! তোমার জয় হোক! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!"

সেই দিন থেকে এব্‌ডিশের জীবন সম্পূর্ণ বদলে গেল। আগে সে ছুটির দিনগুলোতে সরাইখানায় গিয়ে একটু চা খেত, কখনও বা এক গ্লাস ভদ্‌কাও খেত। বন্ধুর সঙ্গে অল্প কিছু পান করে যখন সে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে আসত তখন, ঠিক মাতাল না হলেও, তার পা টলত এবং আজে-বাজে বকত; কখনও বা বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া-চেঁচামেচিও করত। কিন্তু এখন এসব সে ছেড়ে দিয়েছে; তার জীবনে ফিরে এসেছে সুখ ও শান্তি। খুব ভোরে উঠে সে কাজে বসত, যতক্ষণ কাজ করবার একটানা খাটত; তারপর তাকের উপর থেকে বাতিটা নামিয়ে সেটা জ্বেলে পড়তে বসত। যত পড়ে তত সব বোঝে; যত বোঝে তত তার মন পরিষ্কার হয়, আনন্দে ভরে ওঠে।

একদিন পড়তে পড়তে অনেক রাত হয়ে গেল। সেন্ট লুক লিখিত সুসমাচারের ষষ্ঠ অধ্যায়ের এই শ্লোকগুলো সে পড়ছিল :

"যদি কেউ তোমার একটা গালে চড় মারে, তাহলে অপর গাল তার দিকে এগিয়ে দাও; কেউ যদি তোমার ক্লোকটা নেয়, তাকে তোমার কোটটাও দিয়ে দাও। তোমার কাছে কেউ কিছু চাইলে তা তাকে দাও, আর যা তোমার তাও যদি কেউ চায়, তাও কখনও তুমি ফিরে চেয়ো না। মানুষের কাছে যেমন ব্যবহার তুমি আশা করো, ঠিক তেমনি ব্যবহার তাদের সঙ্গে করো।"

আরও এগিয়ে সেই শ্লোকগুলো সে পড়তে লাগল যেখানে প্রভু বলছেন :

"তোমরা আমাকে মুখে বলবে প্রভু, অথচ আমি যা বলি তা করবে না, এ কেমন কথা? যে লোক আমার কাছে আসে, আমার আদেশ শোনে, সেগুলো পালন করে, সে কেমন লোক বলছি সে হচ্ছে সেই মানুষ যে বাড়ি তৈরি করতে অনেক গভীর করে খুঁড়ে পাথরের উপর ভিত্তি স্থাপন করল। তারপর বন্যা এল, নদী আছড়ে পড়ল সেই বাড়ির উপর, কিন্তু একটুও নড়াতে পারল না, কারণ সে বাড়ি যে পাথরের উপর গড়া। কিন্তু যে লোক আমার কথা শোনে, অথচ তা পালন করে না, সে হচ্ছে সেই মানুষ যে বিনা ভিত্তিতে মাটির উপর বাড়ি তৈরি করে; তারপর নদী যখন আছড়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যায়, আর বাড়িটার ক্ষতিও হয় প্রচুর।"

এই কথাগুলো পড়ে এব্‌ডিশের মন খুশিতে ভরে উঠল। সে চশমাটা খুলে বইয়ের উপর রাখল, এবং টেবিলের উপর কনুই রেখে ভাবতে লাগল। ওই কথাগুলো দিয়ে নিজের জীবনের পরিমাপ করতে বসে সে নিজের মনেই ভাবতে লাগল :

"আমার বাড়ি কিসের উপর স্থাপিত—পাথরের উপর না বালির উপর? যদি পাথরের উপর হয়, তাহলেই ভাল। এখানে একা বসে তো বেশ ভালই লাগছে। কিন্তু আমি তো অনায়াসেই ভাবতে পারি যে ঈশ্বরের সব নির্দেশ মেনে চলেও হয়ত

অসতর্কতার দরুন আবার পাপ করে বসলাম। যাই হোক, আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না। আর তার ফল তো ভালই হয়েছে। হে প্রভু! তুমি আমার সহায় হও।"

এই রকম ভাবতে ভাবতে তার ঘুমোবার সময় হলো, তবু বই ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করল না। সেন্ট লুকের সপ্তম অধ্যায় পড়তে শুরু করল। একে একে শত সৈন্যের সেনাপতি, বিধবার পুত্র, জনের শিষ্যদের প্রতি উপদেশ, একজন ধনী ফ্যারিসি কর্তৃক প্রভুকে অতিথি হিসাবে স্বগৃহে আমন্ত্রণ, ভ্রষ্টা স্ত্রীলোক কর্তৃক তাঁর পায়ে তেল মাখানো ও চোখের জলে ধুইয়ে দেওয়া এবং প্রভু কর্তৃক তার উদ্ধার সাধন প্রভৃতি সব সে পড়ে ফেলল। তারপর চুয়াল্লিশ নম্বর শ্লোকে পৌঁছে সে পড়তে লাগল :

"তখন স্ত্রীলোকটির দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি সাইমনকে বললেন, এই স্ত্রীলোকটিকে দেখছ? আমি তোমার বাড়িতে এলাম, কিন্তু তুমি আমার পা ধোবার জল দিলে না; আর এই স্ত্রীলোকটি চোখের জলে আমার পা ধুইয়ে দিয়েছে, মাথার চুল দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছে! তুমি আমাকে স্বাগত জানিয়ে চুম্বন করোনি, কিন্তু আমি আসার পর থেকে সে অবিরাম আমার পা দু'খানি চুম্বন করছে। তুমি আমার মাথার তেল দাওনি, কিন্তু সে আমার পায়ে প্রলেপ মাখিয়ে দিয়েছে।"

শ্লোকগুলি পড়ে সে ভাবতে লাগল : "তুমি বলে দাওনি, তুমি চুম্বন করোনি, তুমি আমার মাথায় তেল ঢালোনি..."—আবার সে চশমা খুলে বইয়ের উপরে রেখে চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল। নিজেকে বলতে লাগল : "এই ফ্যারিসিটি ঠিক আমার মতো। আমার মতোই সে শুধু নিজের কথাই ভেবেছে। অতিথির কথা চিন্তা না করে সে গরমে বসে আরাম করে চা খেয়েছে। সে নিজের যত্ন নিজে নিয়েছে, অতিথিকে যত্ন করেনি। আর, সে অতিথি কে? স্বয়ং প্রভু! তিনি যদি আমার কাছে আসেন, আমিও কি অমনি করব?"

দুই হাতের মধ্যে মাথা রেখে কখন যে এব্‌ডিশ ঘুমিয়ে পড়েছে সে নিজেই টের পায়নি।

"মার্টিন!"—অকস্মাৎ একটি কণ্ঠস্বর যেন নিঃশ্বাসের মতো তার কানে এসে বাজল।

তন্দ্রার মধ্যেই জেগে উঠল মার্টিন।

কে ওখানে? মার্টিন চারদিকে চোখ ঘোরাল। তাকাল দরজার দিকে। কেউ নেই। আবার সে টেবিলের উপর ঝুঁকে বসল। সহসা সে আবার স্পষ্ট শুনতে পেল :

"মার্টিন! মার্টিন ! কাল রাস্তার দিকে চেয়ে থেকো। আমি তোমাকে দেখতে আসব।"

মার্টিনের ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দাঁড়াল চেয়ার থেকে। চোখ মুছল। বুঝতে পারল না, কথাগুলো সে শুনেছে, না স্বপ্ন দেখেছে।

বাতি নিভিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে ভোর হবার আগেই এব্‌ডিশ উঠে পড়ল, প্রার্থনা করল, স্টোভ

ধরাল, কপির ঝোল আর 'কাশা' চড়াল, 'সামোভার' জ্বালাল, অ্যাপ্রন পরল, তারপর জানালার পাশে কাজে বসল। কাজ করতে করতেই গত রাত্রের ঘটনার কথা ভাবতে লাগল। তার মনে দুটো ভাব দেখা দিলো। একবার মনে হলো, সে স্বপ্ন দেখেছে; আবার পরমুহূর্তেই মনে হলো, সত্যি সে-কণ্ঠস্বর সে শুনেছে। মনে মনে ভাবল, হ্যাঁ, এমন ঘটনা তো ঘটেই।

জানালার পাশে বসে মার্টিন যত না কাজ করল তার চাইতে বেশি সময় তাকিয়ে রইল বাইরে। যখনই কেউ অচেনা জুতো পরে আসে, অমনি সে মুখ নিচু করে জানালা দিয়ে তাকিয়ে তার মুখ এবং জুতো দুই-ই দেখতে চেষ্টা করে। নতুন ফেল্ট বুট পরে এল একজন দারোয়ান। একজন জলের ভারী চলে গেল। তারপর প্রথম নিকোলাসের সময়কার একজন বুড়ো সৈনিক পুরোনো তালিমারা জুতো পায়ে হাতে একটা শাবল নিয়ে একেবারে জানালার নিচে এসে দাঁড়াল। জুতো জোড়া দেখেই এব্‌ডিশ তাকে চিনল। লোকটার নাম স্টেপানিচ, জনৈক প্রতিবেশী ব্যবসায়ীর বাড়িতে সে থাকে। তাঁর কাজ দারোয়ানকে সাহায্য করা। স্টেপানিচ এব্‌ডিশের জানালার বাইরের জমা বরফ সরাতে লাগল। এব্‌ডিশও তার দিকে একবার তাকিয়ে কাজে মন দিলো।

"আরে! বুড়ো বয়সে কি তোমার ভিমরতি হলো?"—কথাটা ভাবতেই এব্‌ডিশ হেসে ফেলল। "স্টেপানিচ এসেছে বরফ পরিষ্কার করতে, আর আমি ভাবছি যীশু এসেছেন আমার কাছে। কী বুড়ো গাধাই যে আমি হয়েছি!"

যাহোক, ডজনখানেক ফোঁড় দেবার পরেই আবার সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। সে দেখতে পেল, স্টেপানিচ শাবলটাকে দেয়ালের গায়ে রেখে বিশ্রাম করছে আর নিজেকে একটু গরম করতে চেষ্টা করছে।

এব্‌ডিশ মনে মনে বলল, "লোকটা বুড়ো হয়েছে, শরীরও ভেঙে পড়েছে; বরফ পরিষ্কার করবার মতো জোরও নেই। ওকে একটু চা দিলে কেমন হয়? সামোভারে জল এতক্ষণে নিশ্চয় ফুটেছে।"

চামড়ার গায়ে সেলাইয়ের কাঁটাটাকে আটকে রেখে সে উঠে পড়ল। সামোভারটা টেবিলের উপর রাখল, চা তৈরি করল, এবং জানালার পাল্লায় আঙুলের টোকা মারল। স্টেপানিচ মুখ ঘুরিয়ে আবার জানালার দিকে এগিয়ে এল।

"ভিতরে এসে একটু গরম হয়ে নাও," মার্টিন বলল, "তুমি যে একেবারে জমে গেছ!"

স্টেপানিচ বলল, "যীশু তোমার মঙ্গল করুন! আমার হাড়গুলো অবধি কাঁপছে।"

ভিতরে ঢুকে সে গায়ের বরফ ঝেড়ে ফেলতে লাগল। যদিও দুটো পা তখনও ঠক-ঠক করে কাঁপছে, তথাপি ঘরের মেঝে পাছে নোংরা হয়ে যায় তাই খুব যত্ন করে পা মুছতে শুরু করল।

"তোমাকে আর পা মুছতে হবে না। তোমার জুতো আমিই পরিষ্কার করে দেব। ও তো আমারই কাজের অঙ্গ। এখানে এসে বসো, একটু চা খাও।"

এব্‌ডিশ দু-গ্লাস চা তৈরি কবল। একটা অতিথির দিকে এগিয়ে দিলো, আর নিজেরটা থালায় ঢেলে নিয়ে ফুঁ দিতে লাগল।

স্টেপানিচ গ্লাসের সবটা চা খেয়ে গ্লাসটা উপুড় করে অবশিষ্ট চিনির টুকরোটা তার উপর রেখে দিলো। তাকে ধন্যবাদ দিলো। বেশ বোঝা গেল, আবও কিছুটা চা চাই।

দু'জনের জন্য আর এক গ্লাস কবে চা ঢেলে এব্‌ডিশ বলল, "আর এক গ্লাস খাও।"

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে তাকাতে এব্‌ডিশ চা খেতে লাগল।

তাব অতিথি জিজ্ঞেস করল, "কারও আসবার জন্য তুমি অপেক্ষা করছ নাকি?"

"অপেক্ষা? কার জন্য যে অপেক্ষা করছি সেকথা বলতেও লজ্জা হচ্ছে। অপেক্ষা,—মানে ঠিক অপেক্ষা করা নয়, অথচ কথাগুলোকে মন থেকে তাড়াতেও পারছি না। আমি নিজেই জানি না, সেটা স্বপ্ন না কি। দেখো ভাই, কাল রাতে আমি প্রভু যীশুব সুসমাচার পড়ছিলাম। এই পৃথিবীতে এসে কত যে দুঃখ তিনি পেয়েছেন। সে সব তো তুমিও শুনেছ, কি বলো?"

স্টেপানিচ জবাব দিলো, "হ্যাঁ, শুনেছি। তবে আমরা তো মুখ্যু লোক, পডতেও জানি না।"

"তারপর শোনো, আমি পড়ছিলাম এই পৃথিবীতে তিনি কেমন ছিলেন, কেমন কবে তিনি একদিন এক ফ্যারিসির বাড়ি গেলেন, অথচ সে লোকটা তাঁব অভ্যর্থনার কোনও আয়োজন করল না। জানো ভাই, কাল রাতে এই সব পড়ে সেই কথাই ভাবছিলাম—ভাবছিলাম, একদিন হযত আমিও আমাদেব প্রিয় পিতা যীশুকে উপযুক্ত সম্মান দেখাতে ভুলে যাব। নিজেব মনেই আমি ভাবছিলাম, ধরো, তিনি আমার কাছে বা আমাবই মতন আব কাবও কাছে এলেন, লর্ড সাইমনেব মতো আমবাও কি তাঁকে অভ্যর্থনা কবতে ভুলে যাব? তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এগিয়ে যাব না? এই সব ভাবতে ভাবতে যেখানে বসে ছিলাম সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লাম। সেই অবস্থায়ই শুনতে পেলাম, কে যেন আমাব নাম ধরে ডাকল। আমি উঠে পড়লাম। সেই কণ্ঠস্বর যেন আমার কানে কানে চুপি চুপি বলল, 'কাল আমার জন্য অপেক্ষা করো, কাবণ আমি তোমার কাছে আসব।' দু' বাব এ কথাগুলি সে বলল। সেই থেকে কথাগুলো যেন আমার মনেব মধ্যে গেঁথে আছে। আর, যতই বোকামি হোক তবু তাঁবই জন্য আমি অপেক্ষা করে আছি—অপেক্ষা করে আছি আমাদের প্রিয় পিতার জন্য।"

স্টেপানিচ শুধু ঘাড় নাড়তে লাগল, মুখে কিছুই বলল না। গ্লাসের সবটা খেয়ে একপাশে নামিয়ে রাখল। এব্‌ডিশ গ্লাসটা নিয়ে আবার ভরে দিলো।

বলল, "এটাও খেয়ে ফেল। এতে তোমার উপকার হবে। হ্যাঁ, তারপর শোনো।

আমি প্রায়ই ভাবি, আমাদের ছোট্ট পিতা যখন এই পৃথিবীতে ছিলেন, তিনি কাউকে ঘৃণা করতেন না, তা সে যত ছোটই হোক। তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গেই মিশতেন, তাদের সঙ্গেই থাকতেন, আর প্রধানত আমাদের মতো পাপী-তাপী শ্রমিকদের মধ্যে থেকেই তাঁর শিষ্যদের বেছে নিতেন। তিনি বলতেন, 'যে বড় আছে সে-ই ছোট হবে, আর যে ছোট আছে সে-ই বড় হবে।' তিনি আরও বলতেন, 'তোমরা আমাকে প্রভু বলো, তবু আমি তোমাদের পা ধুইয়ে দেব। যে পথ দেখাতে চায় তাকে সকলের দাস হতে হবে। কারণ যারা দরিদ্র, যারা দীন, যারা নরম, যারা দয়ালু তারাই ধন্য।' ''

স্টেপানিচ চা খেতে একদম ভুলে গিয়েছিল। বুড়ো মানুষ সে, সহজেই তার চোখে জল আসে। চুপ করে বসে শুনতে শুনতে তার দুই গাল বেয়ে জল গড়াতে লাগল।

এব্‌ডিশ বলল, ''নাও, আরও একটু খাও।''

কিন্তু স্টেপানিচ ক্রুশ চিহ্ন করল, তারপর তাকে ধন্যবাদ দিয়ে গ্লাস সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল।

বলল, ''আমাকে নেমন্তন্ন করার জন্য ধন্যবাদ মার্টিন এব্‌ডিশ, তুমি আমার দেহ ও মন দুইয়েরই খোরাক জুগিয়েছ।''

এব্‌ডিশ বলল, ''তুমি আবার এসো। অতিথি-অভ্যাগত এলে আমার খুব ভাল লাগে।''

স্টেপানিচ চলে গেলে মার্টিন বাকি চা-টা ঢেলে নিয়ে খেল, চায়ের সাজ-সরঞ্জাম সরিয়ে রাখল, তারপর জানালার পাশে গিয়ে কাজে বসল। জুতো সেলাই করতে করতে কেবলই সে বাইরে তাকাচ্ছিল, আশা করছিল যীশুকে দেখতে পাবে; তাঁর এবং তাঁর কার্যাবলীর কথাই ভাবছিল। যীশুর বাণীগুলোই তার মাথার মধ্যে চলাফেরা করতে লাগল।

দু'জন সৈন্য চলে গেল,—একজনের পায়ে সামরিক বুট, অন্যের পায়ে সাধারণ জুতো। রবারের পরিষ্কার ঢোলা জুতো পরে চলে গেল একজন প্রতিবেশী। একজন রুটিওয়ালা গেল ঝুড়ি নিয়ে। তারপর এল একটি স্ত্রীলোক। পায়ে পশমী মোজা ও খুব পুরনো জুতো। জানালা পার হয়ে পাশের দেয়ালের গাশে গিয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। এব্‌ডিশ জানালা দিয়ে দেখতে পেল, স্ত্রীলোকটি আগন্তুক; তার পোশাক-পরিচ্ছদও খারাপ। একটি শিশুকে কোলে নিয়ে বাতাসের দিকে পিঠ দিয়ে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়েছে। শিশুটিকে ভালভাবে ঢাকবার চেষ্টা করছিল সে, কিন্তু ঢাকবার মতো কিছুই তার ছিল না। তার পরনে ছিল গ্রীষ্মের কাপড়-জামা; তাও ছেঁড়া। জানালার ওপাশ থেকেই এব্‌ডিশ শুনতে পেল শিশুটি কাঁদছে, আর স্ত্রীলোকটি তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করছে। এব্‌ডিশ উঠে দাঁড়াল, দরজা পার হয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে ডাকল, ''ওগো ভালমানুষের মেয়ে!''

স্ত্রীলোকটি শুনতে পেয়ে ফিরে দাঁড়াল।

"শিশুটিকে নিয়ে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে আছ কেন? ভিতরে এস। এখানে ওকে আরও ভালভাবে গরমে ঢেকে রাখতে পারবে। চলে এস।"

অ্যাপ্রন-পরা নাকে-চশমা-আঁটা একটি বুড়োমানুষ তাকে ডাকছে দেখে বিস্মিত হলেও স্ত্রীলোকটি তার পিছনে পিছনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঘরে ঢুকল।

বুড়ো স্ত্রীলোকটিকে বিছানার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, "ভালমানুষের মেয়ে, এখানে বসে পড়ো। কাছেই স্টোভটা রয়েছে, নিজে গরম হও, আর বাচ্চাকে কিছু খাওয়াও।"

স্ত্রীলোকটি বলল, "আমার তো বুকে দুধ নেই। আর আমি নিজেও সকাল থেকে কিছু খাইনি।"

তথাপি শিশুটিকে সে বুকে চেপে ধরল।

এব্‌ডিশ মাথা নাড়তে নাড়তে টেবিলের কাছে গেল, রুটি ও একটা পাত্র আনল। তারপর উনুনের ঢাকনা খুলে কপির ঝোল ঢালল পাত্রে। 'কাশা'র পাত্রটাও বের করল, কিন্তু সেটা তখনও তৈরি হয়নি। কাজেই শুধু ঝোলটাই টেবিলের উপর রাখল। টেবিলের উপর একটা চাদর বিছিয়ে দিয়ে রুটি নিয়ে এল।

"ভালমানুষের মেয়ে, এখানে বসে খাও। তোমার বাচ্চাকে আমি নিচ্ছি। আমার নিজেরও ছেলেপিলে আছে, তাদের কেমন করে রাখতে হয় আমি জানি।"

স্ত্রীলোকটি ক্রুশ চিহ্ন করে টেবিলে বসে খেতে শুরু করে দিলো। এব্‌ডিশ বাচ্চাকে নিয়ে বিছানায় বসল। ঠোঁট দিয়ে সে দুই-একবার চুক্-চুক্ শব্দ কবল, কিন্তু তাব মুখে একটিও দাঁত না থাকায় শব্দটা ঠিকমতো হলো না। ফলে বাচ্চাটা কেঁদে উঠল। তখন তাকে চমকে দেবার জন্য সে আঙুলটাকে বাচ্চাটার মুখেব সামনে বারবার নাড়াচাড়া করতে লাগল, কিন্তু একবারও আঙুলটা বাচ্চার মুখের ভিতরে পুরে দিলো না, কারণ সেলাইয়ের মোম লেগে লেগে আঙুলটা কালো হয়ে ছিল। আঙুলের দিকে তাকিয়ে বাচ্চা শান্ত হলো, হাসতে লাগল। এব্‌ডিশও খুশি হলো। এদিকে স্ত্রীলোকটি খেতে খেতেই তাব নিজের কথা বলতে লাগল,—সে কে বা কোথায় যাচ্ছে।

"আমি একজন সৈনিকের স্ত্রী। আট মাস আগে আমার স্বামীকে কোথায় কোন্ দূরদেশে পাঠিয়েছে, সেই থেকে তার কোনও খবর নেই। বাচ্চা হবাব আগে আমি রাঁধুনির কাজ করেছি—কিন্তু একটি বাচ্চাসুদ্ধু তারা আমাকে রাখল না। এ তিন মাস আগেকার কথা। তখন থেকে আমার কোনও কাজ নেই। যা কিছু সঞ্চয় ছিল ফুরিয়ে গেছে। নার্সের কাজ করতে চেয়েছি, কিন্তু কেউ কাজে নেয়নি, সকলেই বলে আমি খুব রোগা। একজন ব্যবসায়ীর স্ত্রীব সঙ্গে দেখা করেছিলাম, সেখানে আমার ঠাকুরমা কাজ করে। তিনি কথা দিয়েছিলেন আমাকে নেবেন, আমিও তাই ভেবেছিলাম, কিন্তু আজ সেখানে যেতে তিনি পরের সপ্তাহে আসতে বললেন। এখান থেকে অনেক দূরে তিনি থাকেন। শুধু শুধু আমি নিজেও হেঁটে মরলাম, বাচ্চাটাকেও ভোগালাম, তবু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমার বাড়িওয়ালী আমার প্রতি সদয়, যীশুর নামে তিনি আমাদের থাকতে দিয়েছেন। নইলে কোথায় যে মাথা গুঁজতাম জানি না।"

এব্‌ডিশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তোমার কি গরম জামা-কাপড় কিছুই নেই?"

স্ত্রীলোকটি এগিয়ে এসে বাচ্চাটাকে কোলে নিল। এব্‌ডিশ উঠে আলমারির কাছে গেল। সেখানে অনেক খুঁজে-পেতে একটা পুরনো জামা নিয়ে ফিরে এল। বলল, "এই নাও। এটা খুব পুরনো, তাহলেও তোমার শরীরটা ঢাকতে পারবে।"

স্ত্রীলোকটি একবার জামাটার দিকে তাকাল, বুড়ো মানুষটির দিকে তাকাল, জামাটা নিল, এবং তারপরেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

এব্‌ডিশ মুখ ঘুরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে নিচে গেল। সেখান থেকে একটা পুরনো তোরঙ্গ টেনে বের করে তার ভিতরে কি যেন হাতড়াতে লাগল। তাবপর স্ত্রীলোকটির সামনে গিয়ে বসল।

তখন স্ত্রীলোকটি তাকে বলল, "দাদু, যীশুর নামে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। নিশ্চয় তিনিই আমাকে আপনার জানালার নিচে পাঠিয়েছিলেন। না হলে তো ঠাণ্ডায় এই বাচ্চার মৃত্যু আমাকে দেখতে হতো। আমি যখন বেরিয়ে আসি তখন আবহাওয়া গরম ছিল। এখন তো ঠাণ্ডায় সব জমে যাচ্ছে। কিন্তু তিনিই আমাকে আপনার জানালার কাছে এনে দিয়েছেন যাতে আমার দুববস্থা দেখে আমার উপর আপনার দয়া হয়।"

এব্‌ডিশ হেসে বলল, "একথা ঠিক যে তিনিই আমাকে ওখানে বসিয়ে বেখেছিলেন। কিন্তু ভালমানুষেব মেয়ে, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই আমি বাইরে তাকিয়েছিলাম।"

মার্টিন তখন সৈনিকেব স্ত্রীব কাছে সব খুলে বলল—তাব স্বপ্নের কথা, সেদিন তাব কাছে আসবার যে প্রতিশ্রুতি প্রভু তাকে দিয়েছিলেন তার কথা।

"সে তো হতেই পারে," এই কথা বলে স্ত্রীলোকটি উঠে দাঁড়িয়ে জামাটা নিল, তা দিয়ে বাচ্চাটাকে জড়াল। তারপর আবার তাকে অভিবাদন জানিয়ে ধন্যবাদ দিলো।

"যীশুব নামে এটাও নাও, এটা দিয়ে তোমার শালটা ফিরিয়ে এনো," বলে এব্‌ডিশ তার হাতে একটা দুই 'গ্রিভেংকা' দিলো।

স্ত্রীলোকটি ক্রুশ চিহ্ন আকল। সেও তাই করল। তাবপর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে তাকে বিদায় দিলো। স্ত্রীলোকটি চলে গেলে এব্‌ডিশ সামান্য ঝোল খেল, বাসন-পত্তর পরিষ্কার করল, তারপর কাজে বসল। সারাক্ষণ কিন্তু চোখ তার জানালাব দিকেই রইল। যখনই সেখানে কোনও ছায়া পড়ে অমনি সে চোখ বাড়িয়ে দেখে কে যাচ্ছে। তার পরিচিত অনেকে গেল, অপরিচিত অনেকেও গেল; কিন্তু বিশিষ্ট কাউকে চোখে পড়ল না।

এমন সময় হঠাৎ কি যেন তার নজরে পড়ল। তার জানালাব উল্টো দিকে একটি বুড়ি ফেরিওয়ালী এসে দাঁড়িয়েছে একঝুড়ি আপেল নিয়ে। আপেল প্রায় সবই বিক্রি হয়ে গেছে, ঝুড়িতে সামান্যই বাকি আছে। কিন্তু তার কাঁধে ছিল এক ছালাভর্তি কাঠের টুকরো; একটা অসম্পূর্ণ বাড়ির কাছ থেকেই সেগুলো সে নিশ্চয় কুড়িয়ে

পেয়েছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে বোঝাটা তার ঘাড়ে খুব ভারী হয়েই চেপেছে। সেটাকে ঘাড় বদলাবার জন্যই সে দাঁড়িয়েছে। আপেলের ঝুড়িটা একটা থামের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখে ছালাটাকে রাস্তায় নামিয়ে কাঠের টুকরোগুলোকে ঝাঁকাতে লাগল। বুড়ি যখন তার ছালা ঝাঁকাতে ব্যস্ত তখন কোথা থেকে ছেঁড়া টুপি মাথায় একটা ছেলে ছুটে এসে ঝুড়ি থেকে একটা আপেল তুলে নিল। যেই পালাতে যাবে অমনি বুড়ি মুখ ফিরিয়ে তার জামার আস্তিন টেনে ধরল।

ছেলেটা হাতের মুঠো ছাড়িয়ে পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু বুড়ি তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে মাথার টুপিটা ফেলে দিয়ে তার চুলের মুঠি ধরল। ছেলেটা চিৎকার করতে লাগল। বুড়িও গালাগাল দিতে লাগল।

হাতের সেলাইয়ের কাজ মেঝের উপর ফেলে এব্‌ডিশ একলাফে দরজার কাছে গেল। চশমাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কোনওরকমে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। দৌড়ে রাস্তায় গিয়ে দেখল, স্ত্রীলোকটি ছেলেটির চুলের মুঠি ধরে টানছে আর গালাগালি দিচ্ছে, তাকে পুলিশে দেবে বলে ভয় দেখাচ্ছে; আর ছেলেটা নিজেকে ছাড়াবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে। সে বার-বার বলছে, "আমি কখনও নিইনি, কেন আমাকে মারছ? আমাকে ছেড়ে দাও!"

এব্‌ডিশ দু'জনকে সবিয়ে দিয়ে ছেলেটার হাত ধরে বলল, "দিদিমা, ওকে ছেড়ে দাও। যীশুর দোহাই, ওকে ক্ষমা করো, সব ভুলে যাও।"

"আমি ওকে এমন শিক্ষা দিয়ে দেব যা ও জীবনে ভুলবে না! ও মড়াকে আমি পুলিশে দেব!"

এব্‌ডিশ তবু অনুনয়-বিনয় করে বলল. "ওকে ছেড়ে দাও দিদিমা, এমন কাজ ও আর কখনও করবে না। যীশুর দোহাই, ওকে ছেড়ে দাও।"

বুড়ি ওকে ছেড়ে দিলো। অমনি ছেলেটা দৌড়ে পালাচ্ছিল, এব্‌ডিশ তাকে ধরে ফেলল। বলল, "বুড়ির কাছে ক্ষমা চা! বল্, আর কখনও এ কাজ করবি না! আমি নিজে তোকে আপেলটা নিতে দেখেছি।"

ছেলেটা কেঁদে ফেলল। এব্‌ডিশেব কথামতো বুড়িব কাছে ক্ষমা চাইল।

এব্‌ডিশ বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। এইবার আমি তোকে একটা দিচ্ছি। এই নে।"

ঝুড়ি থেকে একটা আপেল নিয়ে সে ছেলেটাকে দিলো। বুড়িকে বলল, "এটার পয়সা আমি তোমাকে দেব গো ভালমানুষের মেয়ে।"

বুড়ি বাধা দিলো : "ঠিক আছে। কিন্তু এই করে তুমি ক্ষুদে শয়তানটার মাথা খাচ্ছ। ওকে এমন পুরস্কার দেওয়া উচিত ছিল যা ও সাত দিনেও ভুলত না।"

এব্‌ডিশ বলে উঠল, "আহা ভালমানুষের মেয়ে, আমাদের পুরস্কারের ব্যবস্থাটা হয়ত ও রকম হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের ব্যবস্থা তা নয়। আপেলটা নেবার জন্য ছেলেটাকে যদি চাবুক মারা হয়, তাহলে আমাদের পাপের জন্য কি আমাদেরও শাস্তি পাওয়া উচিত নয়?"

বুড়ি চুপ করে গেল। তখন এব্‌ডিশ বুড়িকে সেই উপাখ্যানটা বলল যাতে এক মনিব তার চাকরকে অনেক টাকা ঋণ মকুব করে দিলো, আর সেই অকৃতজ্ঞ চাকর সেখান থেকে গিয়ে তার নিজের খাতকের গলা টিপে ধরল।

বুড়ি শুনল, ছেলেটাও শুনল। এব্‌ডিশ বলতে লাগল, "ঈশ্বর আমাদের বলেছেন পরস্পরকে ক্ষমা করতে, নইলে তো তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন না। সকলকেই আমাদের ক্ষমা করা উচিত, বিশেষ করে এই অবুঝ ছেলেটাকে তো বটেই।"

বুড়ি ঘাড় নাড়ল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তা হতে পারে। কিন্তু এই ক্ষুদে শয়তানগুলো যে একেবারে গোল্লায় গেছে!"

সে বলল, "তাহলেও তো আমাদের মতো বড়দেরই কাজ হলো ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে ভাল করে তোলা।"

বুড়ি এবার যোগ দিলো, "একথা তো আমিও অনেক সময় বলি। এক সময়ে বাড়িতে আমার সাতটা ছেলেমেয়ে ছিল। এখন শুধু একটা মেয়ে বেঁচে আছে।"

তারপর সে বলতে লাগল—সে ও তার মেয়ে কোথায় থাকে, কী করে, তার কতগুলো নাতি-নাতনি আছে—সব।

"আমার তো শরীরের এই হাল দেখছ, তবু আমি খুব খাটি, খাটি আমার ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনিদের জন্য। বড় ভাল ওরা। ওদের মতো কেউ আমাকে ভালবাসে না। আক্‌সিন্‌টকা তো আমার কাছে ছাড়া কারু কাছে থাকবেই না। ঠাক্‌মা ঠাক্‌মা করে একেবারে পাগল।"

বুড়ির মনটা তখন বেশ নরম হয়ে এসেছে। ছেলেটার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, "এও তো ছেলেমানুষ, ঈশ্বর এর সহায় হন!"

বুড়ি এবার তার ছালাটা ঘাড়ে তুলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ছেলেটা ছুটে এসে বলল, "ওটা আমাকে দাও ঠাক্‌মা, আমিও ওই পথেই যাব।"

বুড়ি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল, ছালাটা তার ঘাড়ে তুলে দিলো, তারপর দু'জনে রাস্তা ধরে চলে গেল। এব্‌ডিশের কাছ থেকে আপেলের দাম চেয়ে নিতেও ভুলে গেল বুড়ি।

অনবরত বক্‌বক্‌ করতে করতে দু'জনে চলে গেল। এব্‌ডিশ সেখানে দাঁড়িয়ে তাদের দেখতে লাগল, তাদের কথা শুনতে লাগল।

ওরা চলে গেলে এব্‌ডিশ ঘরে ফিরে গেল। চশমা-জোড়া সিঁড়ির উপরেই পড়ে ছিল। সূঁচটা হাতে নিয়ে আবার সে কাজে বসে গেল। কিছুক্ষণ কাজ করবার পর ভাল করে চোখেই দেখতে পাচ্ছিল না। বাইরে চেয়ে দেখল, রাস্তার আলো জ্বালাতে বাতিওয়ালা এসে গেছে। সে ভাবল, আমাকেও তো আলো জ্বালাতে হবে। তখন সে বাতিটা উস্কে দিলো, তারপর সেটা ঝুলিয়ে দিয়ে আবার কাজে মন দিলো। একটা জুতো শেষ করে দেখল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। না, বেশ ভালই হয়েছে। তারপর যন্ত্রপাতি গুছিয়ে, টুকরো-টাকরা যা পড়ে ছিল ঝাঁট দিয়ে সূঁচ-সুতো তুলে বাতিটা এনে

টেবিলের উপর রাখল এবং তাকের উপর থেকে 'সুসমাচার'-খানা পেড়ে নিলো। ইচ্ছা ছিল, আগের দিন যে জায়গাটায় এক ফালি চামড়া দিয়ে চিহ্ন দিয়ে রেখেছিল বইয়ের সেই জায়গাটাই খুলবে, কিন্তু খুলল অন্য জায়গা। 'সুসমাচার' খুলতেই এব্ড়িশেব স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কার পায়ের শব্দ তার কানে এল। কে যেন তার পিছনে এসে দাঁড়াল।

পিছনে তাকাতে তার মনে হলো, অন্ধকার কোণটায় কারা যেন দাঁড়িয়ে আছে। অথচ তাদের চেহারা সে ঠিক ঠাহর করতে পারছে না।

কে যেন তার কানে চুপি-চুপি বলল, "মার্টিন, মার্টিন, আমাকে চিনতে পারছ না?"

মার্টিন বলল, "কে?"

কণ্ঠস্বর বলল, "আমি। আমি গো।"

অন্ধকার কোণ থেকে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল বুড়ো স্টেপানিচ। আবার হাসল সে। তারপর মেঘের মতো মিলিয়ে গেল। আর তাকে দেখা গেল না।

আর একটি কণ্ঠস্বর বলল, "আমি গো।" সেই স্ত্রীলোকটি বাচ্চা কোলে কবে অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে এসে হাসতে লাগল। বাচ্চাটাও হেসে উঠল। তাবপর তারাও অদৃশ্য হয়ে গেল।

"আর এই তো আমি", আর একটি কণ্ঠস্বর বলল। সেই বুড়ি, আর আপেল হাতে ছেলেটা এগিয়ে এল। তারাও হেসে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এব্ড়িশের মন খুশিতে ভবে গেল। সে ক্রুশ চিহ্ন কবে চোখে চশমা পরে বইয়ের যেখানটা খুলেছিল সেইটেই পড়তে লাগল। একটা পাতায় একেবারে উপর থেকে জোর গলায় পড়তে লাগল :

"আর আমার ক্ষুধা পেলে তুমি খেতে দিলে, তৃষ্ণা পেলে পানীয় দিলে; আমি অপরিচিত, তবু তুমি আমাকে ভিতরে ডাকলে।"

সেই পাতার নিচের দিকে সে পড়ল :

"যেহেতু আমার একটি ভাইয়ের জন্য তুমি এসব করেছ, এসব তুমি আমাব জন্যই করেছ।" (ম্যাথু, ১৪শ অধ্যায়)

তখন এব্ড়িশ বুঝতে পারল, তার স্বপ্ন তাকে প্রতারণা করেনি, ত্রাণকর্তা সেদিন সত্যি তার কাছে এসেছিলেন, আর সেও সত্যি তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিল।

১৮৮৫

সময় থাকতে আগুন নেভাও

A spark neglected burns the house

একদা কোনও এক গাঁয়ে আইভান শেরবাকফ নামে এক চাষী বাস করত। বেশ ভালভাবেই সে থাকত। নিজে বেশ শক্ত-সমর্থ, গাঁয়ের সবার সেরা কাজের লোক; তার উপর তিন তিনটে জোয়ান ছেলে। একটি বিয়ে-থা করেছে, আর একটির বিয়ের কথা চলছে, আব ছোটটি ঘোড়াগুলি দেখাশোনা করতে পারে, চাষ করতেও শিখেছে। আইভানের স্ত্রীও বেশ চতুর ও হিসেবি। পুত্রবধূটি যেমন শান্ত, তেমনি কাজের মানুষ। ফলে আইভান পরিবারের খাবারের অভাব নেই। একমাত্র অকেজো মানুষ বুড়ো রুগ্ন বাবা (ছ'বছর হলো হাঁপানিতে শয্যাশায়ী হয়ে স্টোভের উপরের বাঙ্কে পড়ে আছে)।

আইভানের সবকিছুই যথেষ্ট আছে—তিনটে ঘোড়া ও একটি বাচ্চা, একটি গরু ও একটি বাছুর, আর পনেরোটি ভেড়া। মেয়েরা পরিবারেব সকলের জন্যে জুতো ও কাপড় বানায়, মাঠে কাজ করে, আর পুরুষেরা খামারে কাজ করে। প্রতি বছর তারা যে ফসল পায় তাতে পরের ফসল পর্যন্ত তাদের অনায়াসে চলে যায়, 'ওট' যা পায় তাতে ট্যাক্স ও অন্যান্য দরকার মিটে যায়। আইভান ছেলেপিলে নিয়ে বেশ সুখেই ছিল, শুধু একটি ব্যাপারে ছাড়া : পাশের খামারে বাস করত গর্দেই ইভানফের ছেলে খোঁড়া গ্যাব্রিয়েল, তার সঙ্গে ছিল আইভানের শত্রুতা।

যতদিন বুড়ো গর্দেই বেঁচে ছিল আর আইভানের বাবা ছিল সংসারের কর্তা ততদিন দুই চাষী পরিবার ভালভাবেই পাশাপাশি বাস করত ; যখনই মেয়েদের একটা চালনি বা বালতির দরকার পড়ত, বা পুরুষদের দরকার হতো একটা বস্তা বা গাড়ির চাকা—যার যা দরকার এক খামার থেকে আরেক খামারে চেয়ে পাঠাত, প্রতিবেশীর মতোই একে অপরকে সাহায্য করত। একজনের বাছুর যদি প্রতিবেশীর উঠোনে ঢুকে পড়ত, প্রতিবেশী সেটাকে তাড়িয়ে দিত, আর শুধু বলত "ওটাকে ছেড়ে দিও না, আমাদের ফসল এখনও তোলা হয়নি।" কোথাও লুকিয়ে রাখা, বা খোঁয়াড়ে দেওয়া বা অপরের ক্ষতি করা—না, সেরকম কখনও করা হতো না।

বাপের আমলে এই রকমই চলছিল। তারপর ছেলেরা সংসারের ভার নিল। অবস্থাও মোড় ঘুরল।

শুরু হলো তুচ্ছ জিনিস নিয়ে।

আইভানের পুত্রবধূর মুরগিটা ডিম দিতে শুরু করেছে। ঈস্টার উৎসবের জন্য সে ডিমগুলি জমিয়ে রাখছে। চালাঘরের গাড়ির নিচ থেকে রোজই সে ডিম কুড়িয়ে

আনে। একদিন মুরগিটা বাচ্চাদের তাড়া খেয়ে বেড়ার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে প্রতিবেশীর উঠোনে ডিম পাড়ল। মুরগির ডাক শুনে বউটি ভাবল :

"আমি এখন বড় ব্যস্ত, উৎসবের আগেই ঘরটা মেরামত করতে হবে।"

সন্ধ্যাবেলা যখন সে চালাঘরে গাড়ির নিচ থেকে ডিম আনতে গেল, দেখে সেখানে ডিম নেই। শাশুড়িকে শুধাল, দেওরকে শুধাল—কেউ ডিম আনেনি। তারা বলল, "না, আমরা আনিনি।" ছোট দেওর তারাস্‌কা বলল,

"তোমার মুরগি তো প্রতিবেশীর উঠোনে ডিম পেড়েছে। সেখান থেকেই ডেকে উড়ে গেছে।"

বউটি মুরগির খোঁজে গিয়ে দেখে সেটা দাঁড়ের উপর একটা মোরগের পাশে বসে ঘুমে চোখ বুজে আছে। মুরগিটাকে জিজ্ঞাসা করতে চাইল কোথায় ডিম পেড়েছে, কিন্তু তাতে তো আর জবাব মিলবে না। সে প্রতিবেশীর বাড়ি গিয়ে এক বুড়ির দেখা পেল।

সে বলল, "হ্যাঁগো মেয়ে, কাকে চাই?"

"আচ্ছা ঠাক্‌মা, আমার মুরগিটা আজ তোমাদের উঠোনে উড়ে এসেছিল, সে কি একটা ডিম পেড়ে রেখে গেছে?"

"তা তো জানি নে বাছা। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের মুরগিটা সেই কবে থেকে ডিম দিচ্ছে। তাই আমরা জমিয়ে রাখছি, অন্যের ডিমে আমাদের দরকার কী! অন্যের উঠোনের ডিম আমরা কুড়িয়ে বেড়াই না।"

কথার ধরন শুনে বউটি দুঃখিত হলো। সেও বলল বেশ দু'কথা, প্রতিবেশিনী জবাব দিলো তার দ্বিগুণ। শুরু হলো ঝগড়া। আইভানের বউ জল নিয়ে আসছিল, সেও যোগ দিলো। তেড়ে এল গ্যাব্রিয়েলের বউ, সত্যি-মিথ্যে জড়িয়ে সমানে বকতে লাগল। যে যত পারে গলা চড়ায়। একটা হৈ-চৈ লেগে গেল। তুই হ্যানো তুই ত্যানো, তুই ডাকাত, তুই ভ্রষ্টা, তুই শ্বশুরকে না খাইয়ে মেরে ফেলেছিস; তুই একটা কিম্ভুত—এমনি সব কথা।

"হতচ্ছাড়ি, তুই তো আমার চাল্‌নিতে একটা ফুটো করে দিয়েছিলি। এই যে বাঁকে করে জল এনেছিস, এটা তো আমাদের! দিয়ে দে এটা!"

বাঁক ধরে দিলো এক টান। সব জল পড়ে গেল। গাউন ছিঁড়ে গেল। শুরু হলো কিলোকিলি। মাঠ থেকে ফিরে গ্যাব্রিয়েল স্ত্রীর পক্ষ নিল। আইভান আর তার ছেলেরাও ছুটে এল। আইভানের গায়ে খুব জোর। সে সবাইকে হটিয়ে দিলো। গ্যাব্রিয়েলের একগোছা দাড়িও উপড়ে নিল। গ্রামবাসীরা ছুটে এসে কোনওরকমে ঝগড়া মেটাল।

এই হলো সূচনা।

গ্যাব্রিয়েল দাড়ির গোছা কাপড়ে জড়িয়ে স্থানীয় আদালতে গেল। বলল, "ব্যাটা হাঁটু-ভাঙা আইভাস্কা উপড়ে নেবে বলে তো আমি দাড়ি গজাইনি!"

এদিকে তার বউ প্রতিবেশীদের কাছে গিয়ে বলে বেড়াতে লাগল, আইভানকে সাইবেরিয়ায় পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। ঝগড়া বেড়েই চলল।

স্টোভের উপর শুয়ে বুড়ো প্রথম দিন থেকেই ওদের বোঝাতে চেষ্টা করছে, কিন্তু তার কথা কে শোনে।

সে বলল, "কেন বোকার মতো একটা তুচ্ছ জিনিস নিয়ে এরকম হৈ-চৈ করছ? ভেবে দেখো, পুরো ব্যাপারটার সূচনা একটা ডিম নিয়ে। ছেলেমেয়েরা যদি ডিমটা নিয়েই থাকে—নিক না; একটা ডিমে কী যায় আসে? ঈশ্বর তো আমাদের যথেষ্ট দিয়েছেন। বুড়ি যদি দুটো খারাপ কথা বলেই থাকে,—বেশ তো তাকে শিখিয়ে দাও ভাল কথা কেমন করে বলতে হয়। ঝগড়া করে হবে কী—আমরা সবাই তো পাপী। যা হয়েছে হয়েছে, যাও এবার সব মিটিয়ে ফেলো। যদি রাগ করে বসে থাকো, ফল আরও খারাপ হবে।"

ছেলেরা শুনল না। তারা ভাবল, বুড়ো বাপ বাজে কথা বলছে: বুড়ো হলে যেমন হয়, সব ব্যাপারেই জ্ঞান দিচ্ছে।

আইভান কিছুতেই প্রতিবেশীর কাছে ছোট হবে না।

"আমি দাড়ি ওপড়াইনি; ও নিজে উপড়েছে। ওর ছেলে আমার শার্ট ছিঁড়েছে, বোতাম ছিঁড়েছে। এই দেখো।"

আইভানও আদালতে গেল,—গ্রাম পঞ্চায়েতেব কাছ থেকে জেলা আদালত পর্যন্ত। মামলা চলছে। একদিন গ্যাব্রিয়েলের গাড়ির একটা জোড়-হুড়কো হারিয়ে গেল। গ্যাব্রিয়েলের বাড়ির মেয়েরা বলে বেড়াল, আইভানের ছেলে সেটা চুরি কবেছে।

"একদিন রাতে তাকে জানালার নিচ দিয়ে গাড়ির কাছে যেতে দেখেছি আমরা।" আবার একজন পড়শিও বলেছে, সে নাকি সরাইখানায় গিয়ে তার মালিককে সেটা গছাতে চেষ্টা করেছিল।

তারা আবার মামলা করল। এমন দিন নেই যেদিন গালাগালি বা মারামারি না চলে। বড়দের দেখাদেখি ছোটরাও গালাগালি শিখল। আর মেয়েরা যখন নদীতে কাপড় কাচতে যায়, তখন তো ধোবার পাটে যত না শব্দ হয় তার চেয়ে বেশি শব্দ হয় তাদের মুখে মুখে।

প্রথম-প্রথম এক পক্ষ অপর পক্ষের নিন্দে করে বেড়াত। তারপর আরম্ভ হলো ছ্যাঁচড়ামি, যে যার জিনিস পায় হাত-সাফাই করে। মেয়েরা, এমনকি ছোটরাও তাদের দেখাদেখি তাই করতে লাগল। তাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। আইভান শেরবাকফ ও খোঁড়া গ্যাব্রিয়েল পরস্পরের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকতে লাগল,—গ্রামসভায়, জেলা-আদালতে, গ্রাম-পঞ্চায়েতে। ক্রমে জজরাও অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। গ্যাব্রিয়েল চেষ্টা করে আইভানের অর্থদণ্ড বা কারাদণ্ড করাতে; আবার আইভানেরও সেই একই চেষ্টা। পরস্পরের প্রতি যত খারাপ কাজ করে, তত রাগ বাড়ে। দুটো কুকুর যখন

ঝগড়া করে, লড়াই যত বাড়ে রাগ তত বাড়ে। এই চাষীদের ব্যাপারেও সেইরকমই দাঁড়াল। একটা কুকুরকে যদি তখন অপর কেউ পিছন থেকে আঘাত করে, কুকুরটা ভাবে অপর কুকুরই তাকে কামড়েছে, আর তত সে রেগে যায়। ঠিক সেই রকম, এরাও আদালতে যায়, যে কেউ একজনের শাস্তি হয়—অর্থদণ্ড বা কারাদণ্ড, আর তাদের মেজাজ আরও চড়ে যায়। "দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা।" এইরকম চলল ছ'বছর। স্টোভের উপর থেকে বুড়ো মানুষটা বার বার তাদের কাছে আবেদন জানাল। বলল,

"বাপু, তোমরা করছ কী? রাগ ঝেড়ে ফেলো; যার যার কাজকর্মের এই ক্ষতি বন্ধ করো, মানুষের প্রতি ঘৃণা থামাও; দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। যত ঘৃণা করবে, অবস্থা তত খারাপ হবে।"

বুড়োর কথায় কেউ কান দেয় না।

সপ্তম বছরে এক বিয়ে বাড়িতে আইভানের পুত্রবধূ সকলের সামনে গ্যাব্রিয়েলকে অপমান করতে লাগল,—সে নাকি ঘোড়া চুরি করেছে। গ্যাব্রিয়েল তখন মদে চুর। রাগ সামলাতে না পেরে সে বউটিকে এমন মারল যে সাতদিন সে বিছানায় পড়ে রইল। সে আবার তখন গর্ভবতী। আইভান তো খুব খুশি, সে চলল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করতে। ভাবল, "এইবার বাছাধনকে এখান থেকে সরাব; হয় কারাগারে না হয় সাইবেরিয়ায়, এক জায়গায় তাকে যেতেই হবে।"

কিন্তু আইভানের মামলা টিকল না। ম্যাজিস্ট্রেট তার দরখাস্তই নিলেন না। বউটিকে পরীক্ষা করা হলো। সে তখন সেরে উঠেছে; তার গায়ে আঘাতের কোনও চিহ্নই নেই।

আইভান গ্রাম-পঞ্চায়েতের কাছে গেল। তিনি মামলা পাঠালেন জেলা-আদালতে। আইভান জেলা-আদালতে চরকিপাক ঘুরতে লাগল; কেরানি আর প্রধানকে দশ পাঁইট মদও খাওয়াল। গ্যাব্রিয়েলের শাস্তি হলো চাবুক।

আদালতে গ্যাব্রিয়েলের সে দণ্ডাদেশ শোনানো হলো। কেরানি পড়ল : "আদালত স্থির করেছে যে জেলা-আদালতের সামনে গ্যাব্রিয়েল গরদিফকে বার্চ লাঠির দশ ঘা চাবুক খেতে হবে।"

দণ্ডাদেশ শুনে আইভান গ্যাব্রিয়েলের দিকে তাকাল—এবার কী করবে? গ্যাব্রিয়েলও শুনল। তার মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল। মুখ ঘুরিয়ে সে আদালত-কক্ষ ছেড়ে চলে গেল।

আইভানও তার পিছু-পিছু নিজের ঘোড়ার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে শুনল গ্যাব্রিয়েল বলছে :

"ঠিক আছে। ওরা আমাকে মারবে, আমার পিঠ জ্বালা করবে; কিন্তু ওর এমন কিছু পুড়বে যাতে জ্বালা আরও বেশি করবে।"

কথাগুলো শুনে আইভান তৎক্ষণাৎ জজের কাছে ফিরে গেল।

"মহামান্য বিচারক, ও আমাকে শাসাচ্ছে, আমার ঘর পোড়াবে। সাক্ষীদের সামনেই ও একথা বলেছে।"

গ্যাব্রিয়েলকে ডেকে পাঠানো হলো।

"এ কথা তুমি বলেছ?"

"আমি কিছুই বলিনি। আপনার ক্ষমতা আছে, আমাকে চাবুক মারুন। দেখতেই তো পাচ্ছি, ঠিক পথে থেকেও আমাকেই শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে। আরও যা খুশি তাই করতে পারেন।"

গ্যাব্রিয়েল আরও কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু তাঁর ঠোঁট আর গলা তখন থর্-থর্ করে কাঁপছে। সে দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল।

তাব চোখ-মুখ দেখে জজরাও ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন, "এ নিশ্চয় বাইরে গিয়ে এর প্রতিবেশীর বা নিজের একটা ক্ষতি করবে।"

তখন বুড়ো জজ বললেন, "দেখো বন্ধুরা, তোমরা আপোসে মিটিয়ে ফেল। দেখো ভাই গ্যাব্রিয়েল, একটি গর্ভবতী স্ত্রীলোককে আঘাত করা কি তোমার ঠিক হয়েছে? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে বিপদ কিছু ঘটেনি, কিন্তু খুবই ক্ষতি তো হতে পারত। কাজটা কি ঠিক করেছ? দোষ স্বীকার করে তুমি ওর কাছে ক্ষমা চাও। ও তোমাকে ক্ষমা করবে। আমরা তোমার শাস্তি বদলে দেব।"

এ কথা শুনে কেরানি বলল, "১১৭ ধারা মতে এ অসম্ভব; আপোস-মীমাংসা যখন হয়নি, তখন আদালতে দণ্ড হবেই; আর সে দণ্ড পেতেই হবে।"

জজ কিন্তু কেরানির কথা শুনলেন না, বললেন, "থামো। দেখো বন্ধু, আইনের প্রথম ধারা হচ্ছে, ঈশ্বরকে স্মরণে রাখা। আর ঈশ্বর বলেছেন শান্তিতে থাকতে।"

জজ চাষীদের বোঝাতে পারলেন না। গ্যাব্রিয়েল তাঁর কথা শুনল না। বলল, "এক বছরের মধ্যেই আমার বয়স হবে পঞ্চাশ বছর। আমার ছেলেরও বিয়ে হয়ে গেছে। জন্মের পর থেকে কখনও চাবুক খাইনি, আর আজ হাঁটু-ভাঙা ভাংকা আমাকে চাবুক খাওয়াচ্ছে। তার কাছে ক্ষমা চাইব আমি! তবে আর বাকি রইল কী?...ভাংকাও যাতে আমাকে মনে রাখে তাই আমি করব।"

গ্যাব্রিয়েলের গলা কাঁপতে লাগল। গলা দিয়ে আর স্বর বেরুচ্ছে না। মুখ ঘুরিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

আদালত থেকে খামার প্রায় দশ ভার্স্ট পথ। আইভানের বাড়ি ফিরতে দেরি হলো। মেয়েরাই গরু-বাছুর আনতে মাঠে চলে গেছে।

আইভান ঘোড়াটাকে খুলে দিয়ে আস্তাবলে রেখে ঘরে ঢুকল। বাড়িতে কেউ নেই। ছোটরা মাঠ থেকে ফেরেনি, মেয়েরা গরু চরাচ্ছে। ভিতরে ঢুকে বেঞ্চিতে বসে আইভান ভাবতে লাগল। তার মনে পড়ল, দণ্ডাদেশ পড়বার সময় গ্যাব্রিয়েল কেমন সাদা হয়ে গিয়েছিল, দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসেছিল। আইভানের বুকটা ব্যথা করে উঠল। যদি তাকে চাবুক মারার আদেশ হতো, তাহলে কী হতো! গ্যাব্রিয়েলের জন্য তার দুঃখ হতে লাগল।

স্টোভের উপর বুড়ো বাবা কাশতে শুরু করেছে, পাশ ফিরে পা ঝুলিয়ে সে

নামতে চেষ্টা করল। কোনওরকমে নিচে নেমে সে বেঞ্চিতে বসল। এইটুকুতেই তার খুব পরিশ্রম হয়েছে। বার-বার কেশে গলাটা পরিষ্কার করে টেবিলে ঝুঁকে পড়ে সে বলল, "আচ্ছা, ওর কী শাস্তি হয়েছে?"

আইভান বলল, "কুড়ি ঘা চাবুক।"

বুড়ো শুনে মাথা নাড়তে লাগল। "আইভান, তুমি অন্যায় করেছ, খুব অন্যায় করেছ। তার প্রতি নয়—তোমার নিজের প্রতি। তারা ওর পিঠে চাবুক মারবে, আর তুমি কি তাতে খুশি হবে?"

আইভান বলল, "এমন কাজ সে আর করবে না।"

"আর কববে না মানে? তোমার চেয়েও খারাপ কাজ সে কী করেছে?"

আইভান প্রতিবাদ করল, "কী করেছে মানে? আপনি কী বলছেন? সে তো আমার পুত্রবধূকে মেরে ফেলতে পারত! এখন আবার শাসাচ্ছে, আমাদের পুড়িয়ে মারবে। আর আমি তাকে পুজো করব?"

বুড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "দেখো আইভান, বছরেব পর বছর আমি স্টোভের উপর পড়ে আছি, আর তুমি পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে পৃথিবী চক্কর দিচ্ছ, তাই তুমি ভাবছ সবই দেখতে পাচ্ছ, আর আমি কিছুই দেখতে পাই না। না বাবা, তুমিই কিছু দেখতে পাচ্ছ না—রাগ তোমাকে অন্ধ কবে রেখেছে। অন্যের পাপটাই তোমার চোখে পড়েছে, নিজেরটা নয়। তুমি বলছ, দোষ তার। আরে, তাই কি কখনও হয়! দোষ যদি তার একার হতো, তাহলে তো রাগই থাকত না। এক কাঠি কি কখনও বাজে? দু'জন না হলে ঝগড়া হয় না। তার নষ্টামি তুমি দেখছ, কিন্তু নিজেরটা দেখতে পাচ্ছ না। শুধু সে যদি মন্দ হতো, আর তুমি ভাল হতে, তাহলে ঝগড়া লাগত না। কে তার দাড়ি ছিঁড়েছিল? কে তার খড়ের গাদা নষ্ট করেছে? কে তাকে আদালতে টেনে নিয়ে গেছে? তবু তুমি বলবে, সবই তার দোষ? তুমি নিজেই ঠিক নেই, সেখানেই যত গোলমাল। আমি এরকম ছিলাম না, তোমাকেও তো এরকম শিক্ষা আমি দিইনি। ওব বাবা বা আমি কি কখনও এরকম করেছি? আমরা কেমনভাবে দিন কাটিয়েছি? ভাল প্রতিবেশীর মতো। তার যদি ময়দা কম পড়ত, তার স্ত্রী এসে বলত, 'ফ্রল খুড়ো, আমার ময়দা চাই।' আমি বলতাম, 'গোলায় গিয়ে যা দরকার নিয়ে যাও।' তার যদি ঘোড়াগুলোকে দেখবার লোক না থাকত, আমি বলতাম, 'ভারিয়া, যাও, ঘোড়াগুলোকে মাঠে নিয়ে যাও।' আবার আমরাও কোনও কিছুর অভাব পড়লে তার কাছেই যেতাম : 'গরদেই খুড়ো, আমার যে এটা-ওটা চাই।' 'ফ্রল খুড়ো, যা দরকার নিয়ে যাও।' এই ছিল আমাদের কালে। আমরা সুখে ছিলাম। আর এখন? এই তো সেদিন একজন সৈনিক প্লেভ্‌নার যুদ্ধের কথা বলছিল। তোমাদের যুদ্ধ তো আরও খারাপ। এই কি জীবন? এ তো পাপ! তুমি মানুষ, তুমি এ সংসারের কর্তা। তোমাকেই এর জবাবদিহি করতে হবে। বাড়িব মেয়েদের আর ছোটদের তোমরা কী শিক্ষা দিচ্ছ? কুকুরের মতো খেয়োখেয়ি করতে? এই তো সেদিন এইটুকু

ছেলে তারাস্‌কা আরিনা খুড়িকে যাচ্ছেতাই গালাগালি করল, আর ওর মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িতে হাসতে লাগল। এটা কি ভাল? তোমাকেই এর জবাবদিহি করতে হবে। নিজের কথা ভাব। সব ঠিকমতো চলছে কি? তুমি আমাকে একটা খারাপ কথা শোনালে, আমি দ্বিগুণ শোনালাম; তুমি আমাকে আঘাত করলে, আমি দ্বিগুণ আঘাত করলাম। না বাবা, আমাদের মতো বোকাদের এ কথা শেখাতে খৃস্ট পৃথিবীতে আসেননি। তোমাকে যদি কেউ কিছু বলে, চুপ করে থাকো—তার নিজের বিবেকই তাকে খোঁচাবে। এই কথাই তিনি শিখিয়েছেন। আমি যদি তোমাকে আঘাত করি, তুমি অপর গাল পেতে দিয়ে বলবে, 'আমি যদি দোষ করে থাকি আমাকে মারো।' তার বিবেকই তাকে কামড়াবে, তার মন নরম হবে। সে তোমার কথা শুনবে। এই কথাই তিনি শিখিয়েছেন, মাথা গরম করতে নয়। চুপ করে আছো কেন? আমি যা বলছি তা কি ঠিক নয়?"

আইভান চুপ করে শুনল।

বুড়ো কাশতে লাগল। অনেক কষ্টে থুথু ফেলে আবার বলতে লাগল :

"তুমি কি মনে করো খৃস্ট ভুল শিখিয়েছেন? সবই আমাদের ভালোর জন্য। তোমাদের কথাই ধরো, তোমাদের এই প্লেভ্‌নার যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে তোমরা ভাল আছ, না আগের চাইতে খারাপ আছ? হিসেব করে দেখো, মামলা-মোকর্দমায়, যাতায়াতে আর খাওয়ায়-দাওয়ায় তোমরা কত খরচ করেছ। তোমার ছেলেরা ঈগলের মতো বড় হচ্ছে; তোমরা ভালভাবে থাকতে পারতে, কিছু জমাতেও পারতে; তার বদলে তোমাদের সম্পত্তি কমে যাচ্ছে। কারণ কী? কারণ ওই এক। কারণ তোমাদের অহঙ্কার। ছোটদের সঙ্গে নিয়ে চাষবাস করবে, বীজ বুনবে, তা না, তোমার শত্রু তোমাকে কোর্ট-ঘর করাচ্ছে, নয়ত কোনও ছিঁচকে উকিলের বাড়ি ঘুরিয়ে মারছে। সময়ে চাষ করোনি, সময়ে বীজ বোননি, ধরিত্রী মা তোমাদের জন্য ফসলও ফলাবে না। 'ওট' হলো না কেন? কখন বুনেছিলে? শহর থেকে ফিরে এসে। অথচ আদালতে কী পেয়েছ? খালি ঝঞ্ঝাট আর ঝামেলা। দেখো বাপু, নিজের কাজে অবহেলা করো না; ছোটদের সঙ্গে নিয়ে মাঠের কাজ করো, বাড়ি-ঘর দেখো। কেউ যদি তোমাকে অপমান করে, মহত্ত্বের সঙ্গে তাকে ক্ষমা করো; তবেই জীবন সুখের হবে, বুকের বোঝা হাল্কা হবে।"

আইভান চুপ করে রইল।

"আইভান, আমি বুড়ো মানুষ, আমার কথা শোনো। যাও, ঘোড়ায় জিন লাগিয়ে সোজা আদালতে চলে যাও, সেখানে সব ব্যাপার মিটিয়ে ফেলো। সকালে গ্যাব্রিয়েলের কাছে গিয়েও সব কিছু ভালোয় ভালোয় মিটিয়ে ফেলো। কালকের উৎসবে তাকে তোমার বাড়ি নেমন্তন্ন করে এসো; এক বোতল ভদ্‌কা নিয়ে বস, সব গোলযোগ মিটে যাক; যেন ভবিষ্যতে আর কিছু না ঘটে। মেয়েদের আর ছোটদেরও তাই করতে বলে দাও।"

আইভান দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার মনে হলো বুড়ো ঠিকই বলেছে। তার মন যেন অনেকটা হাল্কা হয়েছে। কিন্তু সে ঠিক বুঝতে পারছে না, কেমন করে কী করবে—গোলযোগ মেটাবে কী করে।

আইভানের মনের ভাব বুঝতে পেরে বুড়ো আবার বলল, "যাও ভানিয়া, এ কাজ ফেলে রেখো না। ছড়াবার আগে গোড়াতেই আগুন নিভিয়ে ফেলো, নইলে এ আগুন আর নেভাতে পারবে না।"

বুড়ো আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় মেয়েরা ঘরে ঢুকে ছাতারে পাখির মতো কিচির-মিচির শুরু করে দিলো। সব খবরই তারা পেয়ে গেছে : গ্যাব্রিয়েলকে চাবুক মারা হবে; সেও শাসিয়েছে ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেবে। কতক তারা শুনেছে, কতকটা আবার নিজেরা জুড়েছে। ইতিমধ্যেই গ্যাব্রিয়েলের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে তারা ঝগড়া করে এসেছে। এখন তারা বলে বেড়াচ্ছে : গ্যাব্রিয়েলের পুত্রবধূ সরকারী উকিলকে দিয়ে তাদের ক্ষতি করবার চেষ্টা করছে। সরকারী উকিলের সঙ্গে গ্যাব্রিয়েলের খুব ভাব; সব ব্যাপারটাই সে নাকি উল্টে দেবে। স্কুলের মাস্টারমশাই নাকি এরই মধ্যে আইভানের বিরুদ্ধে নতুন করে দরখাস্ত পর্যন্ত লিখে ফেলেছে। দরখাস্ত লেখা হয়েছে স্বয়ং জারকে। তাতে সব কথা লেখা হয়েছে : গাড়ির হুড়কো, সব্‌জি বাগান—সব কিছু। তাতে অনুরোধ জানানো হয়েছে, আইভানের অর্ধেক সম্পত্তি গ্যাব্রিয়েলকে দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা হোক।

তাদের কথা শুনে আইভানের মন আবার শক্ত হয়ে উঠল। গ্যাব্রিয়েলের সঙ্গে ঝগড়াটা মিটিয়ে ফেলার ব্যাপারটা সে নতুন করে ভাবতে লাগল।

বাড়ির কর্তার খামারে অনেক কাজ থাকে। মেয়েদের সঙ্গে বসে গল্প করবার সময় নেই আইভানের। সে ঘর ছেড়ে খামারে চলে গেল। সব কিছু ঠিক করে যখন সে বাড়ি ফিরল তখন সূর্য পাটে বসেছে; সকলে মাঠ থেকে ফিরছে। আইভান ভাবল, 'এইবার খেয়েদেয়ে ঘুম।' সে বাড়ির দিকে চলল।

গ্যাব্রিয়েলের কথা, তার বাবার কথা—সবই সে ভুলে গেছে। দরজার হাতলে হাত দিতেই সে শুনল, বেড়ার পিছন থেকে প্রতিবেশী তীব্র স্বরে তাকে অভিশাপ দিচ্ছে।

গ্যাব্রিয়েল চিৎকার করে কাকে যেন বলছে, "ও শয়তানের উপযুক্ত শাস্তি কী? একমাত্র শাস্তি মৃত্যু।"

কথাগুলো শুনে আইভানের সব রাগ আবার জ্বলে উঠল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব সে শুনল। তারপর গ্যাব্রিয়েল থামলে ঘরের ভিতরে চলে গেল।

ভিতরে আলো জ্বলছিল। ছেলের বউ এক কোণে বসে সেলাই করছে। স্ত্রী রাতের খাবার তৈরি করতে ব্যস্ত। বড় ছেলে জুতোর জন্য চামড়ার ফালি কাটছে। মেজ ছেলে একখানা বই নিয়ে টেবিলে বসে আছে। আর ছোট ছেলে মাঠে রাত কাটাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। সবকিছুই শান্ত, সুন্দর; অন্তত তাই হতো, যদি এই বিরূপ প্রতিবেশীর অভিশাপ না থাকত।

রেগেমেগেই আইভান ঘরের ভিতর ঢুকল। কোটটা বেঞ্চির উপর ছুঁড়ে ফেলে জলের বালতিটা বে-জায়গায় রাখার জন্য মেয়েদের বকল। মন খারাপ করে বসে বসে ঘোড়ার কলারটা মেরামত করতে লাগল। বার বার তার মনে পড়তে লাগল আদালতে গ্যাব্রিয়েলের সেই শাসানির কথা, আর রুক্ষ গলায় এইমাত্র যে কথা সে বলছিল,—কার যেন মৃত্যুই একমাত্র শাস্তি।

বয়স্ক স্ত্রীলোকটি তারাস্‌কাকে খেতে দিলো। খাবার পর ছেলেটা মোটা একটা ভেড়ার চামড়ার কোট পরে তার উপরে একটা সুতির কোট চাপিয়ে বেল্ট লাগিয়ে সঙ্গে কিছু রুটি নিল, তারপর ঘোড়ার খোঁজে বেরিয়ে গেল। বড় ভাই তাকে এগিয়ে দেবার জন্য উঠে দাঁড়াতে আইভান নিজেই উঠে দাঁড়াল এবং বারান্দায় গেল।

বাইরে খুব অন্ধকার। কালো অন্ধকারে আকাশ ছেয়ে গেছে। বাতাস উঠেছে।

আইভান সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছেলেকে ঘোড়ায় চড়তে সাহায্য করল, বাচ্চাটাকে তার সঙ্গে জুড়ে দিলো, তারপর তারাস্‌কাকে যতক্ষণ দেখা গেল সেইদিকে তাকিয়ে রইল। গেটের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গ্যাব্রিয়েলের কথাগুলোই তার মনের মধ্যে ঘুরতে লাগল : "ওর এমন কিছু পুড়বে যাতে জ্বালা আরও বেশি করে।"

সে ভাবতে লাগল : "ওর সঙ্কোচের বালাই নেই। সবকিছুই এখন শুকনো, বাতাসও আছে। পিছন দিক থেকে এসে ব্যাটা শয়তান কোনওরকমে একটু আগুন ধরিয়ে দিয়েই সরে পড়বে। তারপর সব পুড়ে যাবে। হাতে-নাতে যদি ব্যাটাকে ধরতে পারি তো বেশ হয়!"

কুচিন্তাটা এমনভাবেই মাথায় চেপে বসল যে আইভান সিঁড়ি বেয়ে ভিতরে না গিয়ে গেট পার হয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল। ভাবল, "বাড়ির চারদিক ঘুরে দেখতে হবে। কিছুই বলা যায় না।"

বেড়ার ধার ঘেঁষে নিঃশব্দে সে হাঁটতে লাগল। একটা মোড় ঘুরতেই তার মনে হলো, উল্টো মোড়ের দিকে কি যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হলো, কেউ যেন বেরিয়েই আবার লুকিয়ে পড়ল। আইভান থেমে গিয়ে কান পাতল। চারদিক নিস্তব্ধ। বাতাসে উইলো গাছের পাতাগুলি নড়ছে, আর খড়ো চালের খড়গুলি সর্‌-সর্‌ শব্দ করছে।

বাইরে বেশ অন্ধকার হলেও ধীরে ধীরে সেই অস্পষ্ট আলোয়ও বহুদূর পর্যন্ত সে দেখতে পেল। কেউ কোথাও নেই।

আইভান ভাবল, "হয়ত সবই আমার কল্পনা। তবু চারদিকে একটু ঘুরে দেখাই ভালো।"

সে এত আস্তে হাঁটতে লাগল যে নিজের পায়ের শব্দ পর্যন্ত শোনা যায় না। দূরের মোড়টায় পৌছে সামনে তাকাতেই নজরে পড়ল, লাঙলটার পাশে একটা সাদা কি যেন নড়ে-চড়েই আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

আইভানের বুকের ভিতরটা ধ্বক করে উঠল। সে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর ঠিক সেই সময় সেই একই জায়গায় কি যেন দেখা গেল। এবার সে স্পষ্টই দেখতে পেল, টুপি

মাথায় একটা লোক তার দিকে পিছন ফিরে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে এক বান্ডিল খড়ে আগুন ধরাল।

আইভানের বুকের ভিতরটা পাখির মতো নেচে উঠল। বড় বড় পা ফেলে সে এগিয়ে গেল। ভাবল, "এবার আর পালাতে হচ্ছে না! একেবারে হাতে-নাতে ধরে ফেলব।"

বেশকিছুটা পথ তখনও বাকি, এমন সময় হঠাৎ একটা উজ্জ্বল আলো তার চোখে লাগল—ঠিক আগেকার জায়গায় নয়, আর ছোটখাটো আগুনের ঝিলিকও নয়,—ঘরের চালের ছাঁচতলায় খড়ের গাদাটা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠেছে। আগুনের শিখা ঘরেব চাল ছোঁয়-ছোঁয়। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, গ্যাব্রিয়েল সেখানে দাঁড়িয়ে।

বাজপাখি যেমন করে চাতক পাখির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক তেমনিভাবে আইভান গ্যাব্রিয়েলেব দিকে ছুটে গেল। ভাবল, "ওকে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব! এবার আর পালাতে হয় না!"

খোঁড়া গ্যাব্রিয়েলের কানে ততক্ষণ পায়ের শব্দ পৌঁছে গেছে। চারদিক তাকিয়ে সে খরগোসেব মতো প্রাণপণ শক্তিতে ছুট দিলো।

তার পিছন পিছন ধাওয়া করে আইভান চেঁচিয়ে বলল, "এবার আব বেহাই নেই!"

আইভান গ্যাব্রিয়েলেব গলা জড়িয়ে ধরতেই সে তাব হাত থেকে গলে গেল। আইভান তার কোটেব কোণটা চেপে ধবল। কোট ছিঁড়ে গিয়ে আইভান মাটিতে পড়ে গেল। লাফ দিয়ে উঠে সে চিৎকার কবে উঠল, "কে আছ, ধবো, ওকে ধরো!" বলতে বলতে সে দৌড়তে লাগল।

আইভান উঠে দাঁড়াবাব আগেই গ্যাব্রিয়েল তার বাড়িতে পৌঁছে গেছে। সেখানেই আইভান তাকে চেপে ধরতে গেল। ঠিক সেই সময় পাথরের মতো কি যেন একটা তার মাথায় পড়ল। গ্যাব্রিয়েল একটা ওক কাঠের লাঠি নিয়ে সজোরে তার মাথায় মেরেছে।

আইভানের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল; চোখের সামনে সরষে ফুল ফুটতে লাগল। তারপর সব অন্ধকার। তার পা কাঁপতে লাগল। আবার যখন জ্ঞান ফিরে এল, গ্যাব্রিয়েল ততক্ষণে হাওয়া।

তার বাড়ির দিক থেকে একটা আগুনের আভা আসছে; একটা মেশিন যেন চলছে, এমনি গর্জন ও ফট্-ফট্ আওয়াজ আসছে। আইভান মুখ ঘুরিয়ে দেখতে পেল, পিছনের চালাটা জ্বলছে, পাশেরটায়ও আগুন ধরেছে। আগুন আর ধোঁয়া। জ্বলন্ত খড় আর ধোঁয়া এগিয়ে চলেছে শোবার ঘরের দিকে।

হাত নাড়তে নাড়তে আইভান চিৎকার করে উঠল, "এ কী হলো ভাইসব, এ কী হলো! চালার তলা থেকে জ্বলন্ত খড়গুলো সরিয়ে নিভিয়ে দিতে হবে যে! এ কী হলো ভাইসব, এ কী হলো!"

সে আবার চিৎকার করতে চাইল, গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। দৌড় দিতে চাইল, পা সরে না, একটার সঙ্গে আরেকটার ঠোকাঠুকি লাগল। এক পা এগিয়েই মাথা ঘুরে পড়ে গেল! আবার দম আটকে এল তার। একটু দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিয়ে চলতে লাগল। চালার চারদিক ঘুরে যখন আগুনের কাছে পৌছল তখন শোবার ঘরের একটা কোণ ও গেটটা জ্বলছে, ঘরের ভিতর থেকে আগুনের হলকা বেরুচ্ছে। উঠোনে ঢোকে কার সাধ্য! দৌড়োদৌড়ি কবে অনেক লোক জমায়েত হয়েছে, কিন্তু কিছুই করতে পারছে না। প্রতিবেশীরা যার যার ঘর থেকে জিনিসপত্র টেনে বের করছে, গোয়াল থেকে গরু-বাছুর তাড়িয়ে দিচ্ছে।

আইভানের বাড়ির পরে গ্যাব্রিয়েলের বাড়িও আগুনে পুড়ল। অর্ধেকটা গ্রামই ধ্বংস হয়ে গেল।

আইভানেব বাড়ির থেকে একমাত্র তার বুড়ো বাবাকে উদ্ধার করা গেল। অন্য সবাই এক বস্ত্রে বেরিয়ে এসেছিল। আর সব কিছু পুড়ে গেছে। যে ঘোড়াগুলো বাতের জন্য বাইরে গিয়েছিল ঘাস খেতে, সেগুলো ছাড়া গরু-বাছুর সব পুড়ে মরেছে; মুরগিগুলো মরেছে; গাড়ি, লাঙল, জোয়াল, জামা-কাপড়ের প্যাঁটরা, ফসলের বেড়ি—সব পুড়ে গেছে।

গ্যাব্রিয়েলেব বাড়ি থেকে গরু-বাছুরগুলো আর যৎসামান্য জিনিস বের করা হয়েছে।

অনেকক্ষণ ধবে আগুন জ্বলতে লাগল : সারা রাত। আইভান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল আর বার বার বলতে লাগল : "এ কী হলো ভাইসব! কোনও কিছুই যে বের করা হলো না!"

ঘরের ছাদ যখন ভেঙে পড়ছে তখন আইভান সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা জ্বলন্ত কাঠের কড়ি টেনে বের করতে চেষ্টা করল। মেয়েরা অনেক ডাকাডাকি করল। আইভান ততক্ষণে সে কড়িটা টেনে বের কবে আর একটা আনতে গিয়েই হোঁচট খেয়ে আগুনের মধ্যে পড়ে গেল। একটি ছেলে তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে টেনে বেব করে আনল।

আইভানের চুল-দাড়ি পুড়ে গেছে, কাপড় পুড়েছে, হাতে লেগেছে; কিন্তু কোনও কিছুতেই তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সকলে বলতে লাগল, "শোকে আর ক্ষোভে তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

ক্রমে আগুন নিভে এল। আইভান তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে কেবল বলছে, "ভাইসব এ কী হলো! তোমরা যদি একটু চেষ্টা করতে!"

সকালের দিকে গ্রাম-প্রধানের ছেলে এল আইভানকে ডাকতে।

"আইভান খুড়ো, তোমার বাবার শেষ সময় উপস্থিত। শেষ দেখা দেখবার জন্য তিনি তোমাকে ডেকেছেন।"

বা .ার কথা আইভান সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। কে যে কী বলছে ঠিক বুঝতেও পারছে না। সে বলল, "কে? তার নাম কী?"

গ্রাম-প্রধানের ছেলে আইভানের হাত ধরে বলল, "শেষ দেখা দেখবার জন্য তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তোমার কাছে। আমাদের বাড়িতে তিনি মৃত্যুশয্যায়। এস আইভান খুড়ো।"

আইভান ছেলেটির পিছন পিছন চলল।

বুড়োকে ঘর থেকে বের করবার সময়েই সে পুড়ে গিয়েছিল। সকলে মিলে অগ্নিকাণ্ড থেকে অনেক দূরে গ্রামের প্রান্তে প্রধানের বাড়িতে তাকে নিয়ে গিয়েছিল।

আইভান যখন বাবার কাছে পৌছল, তখন সেখানে ছিল শুধু প্রধানের স্ত্রী। ছেলেমেয়েরা স্টোভের উপরে বাঙ্কে শুয়ে ছিল। আর সবাই আগুনের কাছে গিয়েছে। তার বাবা দুই হাতে মোমবাতি নিযে বেঞ্চির উপর শুয়ে আছে। মাথাটা দরজার দিকে। ছেলে ঘরে ঢুকতে তার শরীরটা নড়ে উঠল। প্রধানেব স্ত্রী বলল, "ছেলে এসেছে তোমাকে দেখতে।" ছেলেকে আরও কাছে আসতে বলল সে। আইভান কাছে গেলে বুড়ো বলল, "দেখো ভানিয়া, আমি কী বলেছিলাম তোমাকে? কে সারা গ্রামটাকে জ্বালিয়ে দিলো?"

আইভান বলল, "সব সে করেছে বাবা। সেই আগুন দিযেছে। আমি তাকে ধরেছিলাম। খড়েব চালে আগুন দিতে তাকে আমি দেখেছি। জ্বলন্ত খড় মুঠি ক'রে ধরে তখন যদি সেটা নিভিয়ে ফেলতাম, তাহলে কিছুই হতো না।"

বুড়ো বলল, "আইভান, আমার শেষ সময উপস্থিত, একদিন তুমিও যাবে। এ কাব পাপ?"

আইভান কোনও কথা বলতে পাবল না। নিঃশব্দে বাবার দিকে তাকিযে রইল।

"ঈশ্বরকে সামনে বেখে বলো · এ কার পাপ? আমি তোমাকে কী বলেছিলাম?"

এতক্ষণে যেন সহসা আইভানের বুদ্ধি ফিরে এল। ভাঙা-ভাঙা গলায় সে বলল, "আমার পাপ, বাবা!"

বাবার পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে সে কেঁদে ফেলল। বলল, "আমাকে ক্ষমা করো বাবা! তোমার কাছে, ঈশ্বরের কাছে আমি অপরাধী!"

বুড়ো মোমবাতিটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিলো, ক্রুশ-চিহ্ন করবার জন্য ডান হাতটা কপালের দিকে টানতে চেষ্টা করল; কিন্তু ততদূর নিতে পারল না। একটু চুপ করে থেকে ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমাবই জয় হোক, প্রভু, তোমারই জয় হোক!" তারপর বলল,

"ভানিয়া! ভানিয়া!"

"বলো বাবা।"

"এখন কী করবে?"

আইভান সমানে কাঁদছে।

"আমি জানি না বাবা। কেমন করে আমরা বেঁচে থাকব বাবা?"

বুড়ো চোখ বুজল। তার ঠোঁট নড়তে লাগল, যেন মনের মধ্যে শক্তি সঞ্চার

করছে; তারপর আবার চোখ মেলে বলল : "তোমরা বাঁচবে। ঈশ্বরপরায়ণ হও, তাহলেই তোমরা বাঁচবে।"

বুড়ো আবার চুপ করল। একটু হেসে বলল, "দেখো ভানিয়া, কে আগুন লাগিয়েছিল কাউকে বলো না। অন্যের একটা পাপ যদি তুমি ঢেকে রাখ, তাহলে ঈশ্বর তোমার দুটো পাপ ক্ষমা করবেন।"

বুড়ো দুই হাতে মোমবাতি নিল, বুকের উপর দুটো হাত এক করল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, শরীরটা টান-টান করল, তারপর মারা গেল।

গ্যাব্রিয়েলের কথা আইভান প্রকাশ করল না। কেউ জানল না আগুন কেমন করে লেগেছিল।

গ্যাব্রিয়েলের প্রতি আইভানের যে রাগ ছিল তা চলে গেল। গ্যাব্রিয়েলও অবাক হয়ে গেল যে, আইভান কাউকে তার কথা বলল না। প্রথমে সে আইভানকে ভয় করে চলত; ক্রমে ভয় কেটে গেল। নতুন করে বাড়ি-ঘর তৈরি করবার সময় দুই পরিবার একই ঘরে একটি পরিবারের মতোই বাস করতে লাগল।

তারপর গ্যাব্রিয়েল ও আইভান তাদের বাবাদের মতোই ভাল প্রতিবেশীর মতো বাস করতে লাগল। আইভান শেরবাকফ তার বাবার সেই আদেশ, ঈশ্বরের সে নির্দেশ কখনও ভোলেনি যে, সূচনাতেই আগুন নিভিয়ে ফেলা উচিত। কেউ যদি তার প্রতি অন্যায় করত, প্রতিহিংসার বদলে সে তার প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করত; কেউ তাকে খারাপ কথা বললে, অধিকতর খারাপ কথায় তার জবাব না দিয়ে সে তাকে খারাপ কথা ব্যবহার না করাটা শেখাতে চেষ্টা করত; মেয়েদের এবং ছোটদেরও সে সেই শিক্ষাই দিতো।

এমনি করে আইভান সবকিছু ঠিক করে ফেলল। এখন সে আগেকার চাইতে অনেক ভাল আছে।

১৮৮৬

শিব ও শয়তান

Evil allures, but good endures

অনেককাল আগে একজন ভাল মনিব বাস করতেন; অনেক সম্পত্তির মালিক তিনি, তাঁর ক্রীতদাসও ছিল অনেক। ক্রীতদাসরাও তাদের মনিবের সম্পর্কে গর্ব করে বলত : সূর্যের নিচে আমাদের মনিবের চাইতে ভাল মনিব আর কেউ নেই। তিনি

আমাদের খেতে দেন, পরতে দেন; আমরা করে উঠতে পারি এমন কাজ দেন; কাউকে তিনি বকেন না, কাউকে দ্বেষ করেন না। অন্য মনিবরা তাঁদের ক্রীতদাসের প্রতি গরু-ছাগলের চাইতে খারাপ ব্যবহার করেন, দোষী-নির্দোষ নির্বিশেষে শাস্তি দেন, কখনও একটা ভাল কথা বলেন না। কিন্তু আমাদের মনিব সেরকম নন। তিনি আমাদের ভাল চান, ভাল করেন, এবং আমাদের সঙ্গে সদয়ভাবে কথা বলেন। এর চাইতে ভাল জীবন আমরা চাই না।

এমনিভাবেই ক্রীতদাসরা তাদের মনিবকে প্রশংসা করত। কিন্তু ক্রীতদাসরা তাদের মনিবের সঙ্গে এরূপভাবে ভালবাসায় মিলেমিশে আছে দেখে শয়তান ভারি বিব্রত হয়ে পড়ল। সেই তখন মনিবের আলেব নামে একজন ক্রীতদাসকে দলে টেনে তাকে আদেশ দিলো অন্য সবাইকে লোভ দেখাতে।

একদিন ক্রীতদাসরা সবাই যখন বিশ্রামকালে মনিবের প্রশংসা করছিল তখন আলেব বলে উঠল : "বন্ধুগণ, অকারণেই তোমরা আমাদের মনিবের গুণগান করছ। তোমরা যদি শয়তানকে খুশি করতে পারো, তাহলে তো শয়তানও তোমাদের ভাল করবেন। আমরা ভালভাবে আমাদের মনিবের সেবা করি, তাঁকে খুশি রাখতে সব কিছু করি। কোনও কথা তাঁর মনে উদয় হওয়া মাত্রই তাঁর মনের কথা ধরে নিয়ে আমরা সে কাজটা করে ফেলি। এরপরেও কি তিনি ভাল না হয়ে পারেন? তাঁকে খুশি করা বন্ধ করে দাও, একদিন তাঁর ক্ষতি করো, দেখবে তিনিও অন্য সব খারাপ মনিবদের মতো খারাপের বদলায় আরও খারাপ ব্যবহার করবেন।"

অন্য ক্রীতদাসরা আলেবের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিলো। তর্ক করতে করতে এক সময় বাজি ধরল। কথা দিলো, আলেব তাদের ভাল মনিবকে রাগিয়ে দেবে, তা যদি না পারে তাহলে সে ছুটির দিনের জামা-কাপড় থেকে বঞ্চিত হবে; আর যদি মনিবকে রাগাতে পারে, তাহলে অপর সকলে তাদের ছুটির দিনের জামা-কাপড় তাকে দিয়ে দেবে, এবং যদি তাকে শেকলে বেঁধে রাখা হয় বা জেলে দেওয়া হয় তবে তাকে মনিবের হাত থেকে রক্ষা করবে, তাকে উদ্ধার করবে। আলেব কথা দিলো, পরদিন সকালেই সে মনিবকে রাগাতে চেষ্টা করবে।

আলেবের উপর ছিল ভেড়ার খোঁয়াড়ের ভার। দামী ভাল জাতের ভেড়াগুলোর দেখাশোনা সে করত।

পরদিন সকালে মনিব যখন তাঁর দামী আদরের ভেড়াগুলো অতিথিদের দেখাবার জন্য তাঁদের নিয়ে খোঁয়াড়ে গেলেন, তখন শয়তানের দোসর আলেব সঙ্গীদের দিকে চোখ ঠারল। যেন বলতে চাইল, "চেয়ে দেখো, তোমার মনিবকে কেমন পাগলা বানিয়ে দি।"

দরজার ফাঁক দিয়ে আর বেড়ার উপর দিয়ে ব্যাপারটা দেখবার জন্য ক্রীতদাসরা সব জড় হলো। এদিকে তার দোসর কেমন করে তার কাজ করে দেখবার জন্য শয়তান গোলাবাড়ির উপরকার একটা গাছে চড়ে বসল।

গোলাবাড়ির ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনিব আঙুল তুলে তাঁর মেষ আর ছাগলছানাগুলো অতিথিদের দেখাতে লাগলেন। শেষটায় তাঁর ইচ্ছা হলো, সবচেয়ে ভাল ভেড়াটা তাঁদের দেখাবেন।

বললেন, "বাকি যা আছে সবই ভাল। তবে, বাঁকানো-শিংওয়ালা ভেড়াটা একেবারে অমূল্য। সেটা আমার দুটো চোখের চাইতেও বেশি প্রিয়।"

লোকজন দেখে ভেড়াগুলো তখন খোঁয়াড়ের মধ্যে ইতস্তত দৌড়তে শুরু করে দিয়েছে। ফলে সেই দামী ভেড়াটাকে অতিথিরা ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছিল না। ভেড়াটা যেই একটু শান্ত হয়ে দাঁড়ায় অমনি শয়তানের দোসর, যেন হঠাৎই ঘটে গেল এমনি ভাব দেখিয়ে আবার সব ভেড়াগুলোকে ভয় পাইয়ে দিতে লাগল। ফলে সব ভেড়া আবার মিলেমিশে একাকার; ফলে অমূল্য ভেড়াটাকে চেনাই মুস্কিল হলো অতিথিদের।

ব্যাপার দেখেশুনে খুব বিব্রত হয়ে মনিব বললেন, "ভাই আলেব, বাঁকানো শিংওয়ালা সেরা ভেড়াটাকে ধরতে চেষ্টা করো তো। ওটাকে একটু শান্ত করে রাখো।"

মনিব এই কথা বলামাত্র আলেব সিংহবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভেড়াগুলোর উপর এবং দামী ভেড়াটার লোম আঁকড়ে ধরল। জোর করে চেপে ধরে আলেব তার পিছনের বাঁ পা-টা এক হাতে ধরে সেটাকে উঁচু করে তুলে ধরল এবং মনিবের চোখের সামনেই তার পা-টা উপরের দিকে মুচড়ে দিলো। গাছের শুকনো ডালের মতো পা-টা মটাৎ করে ভেঙে গেল। ভেড়াটা চিৎকার করতে করতে সামনের দুই হাঁটুর উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আলেব তখন পিছনের ডান পা ধরে সেটাকে তুলে ধরল; দোমড়ানো বাঁ পা-টা চাবুকের মতো ল্যাংচাতে লাগল।

অতিথি এবং ক্রীতদাস সকলে তখন হাঁ হয়ে গেছে। আলেব কেমন নিপুণভাবে কাজটা সমাধা করেছে দেখে শয়তান ভারি খুশি। মনিবের মুখ রাতের মতো কালো। চোখে ভ্রূকুটি। একটা কথাও না বলে তিনি মাথা নিচু করলেন।

অতিথি এবং ক্রীতদাসরা চুপ করে আছে। না জানি কী ঘটবে।

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে মনিব নিজেকে একটা ঝাঁকুনি দিলেন, যেন একটা কিছু ঝেড়ে ফেললেন। তারপর মাথা তুলে আকাশের দিকে একদৃষ্টিতে তাকালেন।

বেশিক্ষণ নয়, মুহূর্তকাল পরেই তাঁর মুখের কুঁচকে যাওয়া দাগগুলো সরে গেল; হাসিমুখে তিনি আলেবের দিকে তাকালেন। তাকিয়ে আবার হাসলেন, তারপর বললেন ঃ "আলেব! আলেব! তোমার প্রভু তোমাকে আদেশ দিয়েছিলেন আমাকে রাগাতে। কিন্তু আমার প্রভু তোমার চাইতেও শক্তিমান। তুমি আমাকে রাগাতে পারোনি, কিন্তু আমি তোমার প্রভুকে রাগাব। তুমি ভয় পেয়েছিলে যে আমি তোমাকে শাস্তি দেব, তাই তুমি মুক্ত হতে চেয়েছিলে। জেনে রাখ, আমি তোমাকে শাস্তি দেব না, আর আমার অতিথিদের সাক্ষী রেখে এখানে এই মুহূর্তে তোমার আকাঙ্ক্ষিত

মুক্তি তোমাকে দেব। এই নাও তোমার ছুটিব দিনের জামা-কাপড়, তারপর চলে যাও তোমার যেখানে খুশি।"

তারপর সেই ভাল মনিব অতিথিদের নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। আর সেই শয়তান দাঁত কড়-মড় করতে করতে গাছ থেকে নেমে মাটির মধ্যে ঢুকে গেল।

১৮৮৬

বোকা আইভানের কাহিনী

The story of Ivan the fool

[এবং তার দুই ভাই সৈনিক সাইমন ও শক্তিমান তরাস, এবং বোবা বোন মার্থা এবং বুড়ো শয়তান ও তিন ক্ষুদে শযতানেব কাহিনী]

১

একসময়ে কোনও এক দেশেব কোনও এক প্রদেশে এক ধনী কৃষক বাস কবত। তার ছিল তিন ছেলে · সৈনিক সাইমন, শক্তিমান তবাস ও বোকা আইভান, তাছাড়া তাব ছিল একটি অবিবাহিতা মেয়ে বার্থা, মেয়েটি বোবা ও কালা। সৈনিক সাইমন রাজার চাকরি নিয়ে যুদ্ধে চলে গেল, শক্তিমান তরাস শহবে এক বণিকেব কাছে গেল বাণিজ্য করতে; আব বোকা আইভান মেয়েটিকে নিয়ে বাড়িতেই থেকে গেল, জমি চষতে চষতে তাব পিঠ বাঁকা হয়ে গেল।

সৈনিক সাইমন উচ্চপদ ও সম্পত্তি লাভ করে জনৈক সম্ভ্রান্ত লোকেব মেয়েকে বিয়ে করল। তার অনেক মাইনে, আর সম্পত্তিও বেশ বড়, তবু খরচে কুলোয না। স্বামী যাকিছু বোজগার করে সবই তাব স্ত্রী উড়িয়ে দেয, ফলে কোনও সময়েই তাদেব হাতে টাকা থাকে না।

কাজেই সৈনিক সাইমন তাব জমিদারিতে গেল টাকা আদায় কবতে। সেখানে সরকার বলল, "টাকা আসবে কোথেকে? আমাদের গরু-মোষ নেই, যন্ত্রপাতি নেই, ঘোড়া নেই, লাঙল নেই, বিদে-মই নেই। আগে এসব যোগাড় করতে হবে, তবে তো টাকা আসবে!"

তখন সৈনিক সাইমন বাবার কাছে গিয়ে বলল, "বাবা, তুমি ধনী মানুষ, কিন্তু আমাকে কিছুই দাওনি। তোমাব যা আছে ভাগ করে আমাকে তিন ভাগেব এক ভাগ দিয়ে দাও; তাহলেই আমার জমিদাবিব উন্নতি করতে পারব।"

বৃদ্ধ বলল, "আমার বাড়িতে তুমি কিছুই দাওনি, আমি তোমাকে এক-তৃতীয়াংশ দেব কেন? তাতে আইভান ও মেয়েটির প্রতি অবিচার করা হবে।"

কিন্তু সাইমন জবাব দিলো, "সে তো বোকা, আর ওই বুড়ি কুমারীটা তো বোবা ও কালা; তারা সম্পত্তি দিয়ে কি করবে?"

বৃদ্ধ বলল, "এ বিষয়ে আইভান কি বলে আমাদের দেখতে হবে।"

আর আইভান বলল, "ও যা চায় তা নিয়ে যাক।"

ফলে সৈনিক সাইমন বাবার সম্পত্তির অংশ নিজের জমিদারিতে স্থানান্তরিত করে পুনরায় রাজার চাকরিতে চলে গেল।

শক্তিমান তরাসও অনেক টাকা-পয়সা করে এক বণিকের পরিবারে বিয়ে করল। কিন্তু তার আরও টাকার দরকার। তাই সেও বাবার কাছে গিয়ে বলল, "আমার অংশ আমাকে দাও।"

কিন্তু তরাসকে তার অংশ দেবার ইচ্ছা বৃদ্ধের ছিল না। সে বলল, "এখানে তুমি কিছুই দাওনি। এ বাড়িতে যা কিছু আছে সবই আইভান উপার্জন করেছে। তার ও মেয়েটার প্রতি অন্যায় করব কেন?"

কিন্তু তরাস বলল, "তার আবার কি দরকার? সে তো বোকা! সে বিয়ে করতে পারবে না, কারণ কেউ তাকে গ্রহণ করবে না; বোকা মেয়েটারও কোনও কিছুরই দরকার নেই। শোনো আইভান", সে বলল, "আমাকে ফসলের অর্ধেক দাও; আমি যন্ত্রপাতি কিছু চাই না, আর গৃহপালিত পশুদের মধ্যে আমি শুধু ধূসর ঘোড়াটা নেব, সেটা তো চাষের ব্যাপারে তোমার কোনও কাজেই লাগে না।"

আইভান হেসে বলল, "তোমার যা ইচ্ছে নিয়ে যাও। আমি কাজ করে আবার সব কবব।"

এইভাবে তারা তরাসকেও তার অংশ দিয়ে দিলো। সে গাড়ি বোঝাই করে ফসল নিয়ে শহরে চলে গেল; ধূসর ঘোড়াটাকেও সঙ্গে নিল। আর আইভানের রইল শুধু একটা বুড়ো ঘোটকি; তাই নিয়েই সে পূর্বের মতোই তার চাষী জীবন কাটাতে লাগল; বাবা-মাকেও প্রতিপালন করতে লাগল।

২

সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়ে ভাইরা ঝগড়া-ঝাঁটি না করে শান্তিপূর্ণভাবে চলে গেল দেখে বুড়ো শয়তান খুবই বিরক্ত হলো; তিন ক্ষুদে শয়তানকে সে কাছে ডাকল।

বলল, "দেখ্, তিন ভাই আছে : সৈনিক সাইমন, শক্তিমান তরাস ও বোকা আইভান। তাদের ঝগড়া করাই উচিত ছিল, কিন্তু তারা বেশ শান্তিতে আছে আর বন্ধুত্বপূর্ণভাবেই মেলামেশা করছে। বোকা আইভানই সবকিছু ভেস্তে দিয়েছে। এবার তোরা তিনজন চলে যা, তিন ভাইয়ের সঙ্গে বোঝাপড়া কর্‌গে, তাদের এমন ক্ষেপিয়ে তুলবি যেন আঁচড়ে-কামড়ে একে অন্যের চোখ খুব্‌লে নেয়! কি বলিস্, পারবি তো?"

"হ্যাঁ, তাই করব," তারা বলল।

"কি ভাবে কাজ শুরু করবি?"

তারা বলল, "কেন, প্রথমে তাদের সর্বনাশ করে দেব। আর যখন তাদের খাবার দানাটিও থাকবে না তখন তাদের একসঙ্গে জুড়ে দেব, তাহলেই তারা নির্ঘাৎ লড়াই শুরু করে দেবে!"

"খাসা হবে; দেখছি তোদের কাজ তোরা ভালই বুঝিস্। চলে যা; যতদিন তাদের কান ধরে শায়েস্তা করতে না পারবি ততদিন ফিরবি না; নইলে তোদের জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নেব!"

একটা জলাভূমিতে গিয়ে ক্ষুদে শয়তানরা কিভাবে কাজ শুরু করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করতে বসল। তাদের ঝগড়ার আর শেষ হয় না; সকলেই চায় সবচাইতে হাল্কা কাজটি করতে। শেষ পর্যন্ত তারা স্থির করল, কে কোন্ ভাইকে নিয়ে পড়বে সেটা লটারি করে ঠিক হবে। যার কাজ আগে শেষ হবে সে গিয়ে অন্যদের সাহায্য করবে। কাজেই ক্ষুদে শয়তানরা ভাগ্য-পরীক্ষা করল; এবং কে সফল হলো ও কার সাহায্য দরকার সে সব জানবার জন্য পরে আবার কখন তারা দেখা করবে সে দিন-ক্ষণও স্থির করল।

নির্ধারিত দিনটি এসে গেলে পূর্বব্যবস্থা মতো তিন ক্ষুদে শয়তান আবার সেই জলাভূমিতে মিলিত হলো। প্রত্যেকেই যার যার কাজের ফিরিস্তি দিলো। পয়লা নম্বরের ভাগে পড়েছিল সৈনিক সাইমন; সে বলল, "আমার কাজ ভালই চলছে। আগামীকাল সাইমন তার বাবার বাড়িতে ফিরে যাবে।"

সহকর্মীরা শুধাল, "তুমি কেমন করে কাজ হাসিল করলে?"

সে বলল, "প্রথমে আমি সাইমনের বুকে এত সাহস এনে দিলাম যে সে রাজার কাছে বিশ্ব জয় করে দেবার প্রস্তাব করল, আর রাজাও তাকে সেনাপতি করে দিয়ে ভারতবর্ষের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠাল। তারা যুদ্ধের জন্য পরস্পরের মুখোমুখি হলো। কিন্তু আগের দিন রাতে আমি সাইমনের শিবিরের সব বারুদ ভিজিয়ে রাখলাম এবং ভারতের রাজার স্বপক্ষে এত বেশি সংখ্যক খড়ের সৈন্য তৈরি করে দিলাম যে তোমরা গুণেও শেষ করতে পারবে না। সেই সব খড়ের সৈন্যরা তাদের ঘিরে ধরেছে দেখে সাইমনের সৈন্যরা ভয় পেয়ে গেল। সাইমন তাদের গোলা-গুলি চালাবার আদেশ দিলো, কিন্তু তাদের কামান ও বন্দুক থেকে একটা গোলা-গুলিও ছুটল না। তখন সাইমনের সৈন্যরা অত্যন্ত ভয় পেয়ে ভেড়ার মতো দৌড়তে শুরু করল আর ভারতের রাজা তাদের সাবাড় করে দিলো। রাজা সাইমনের উপর চটে গেল। তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, এবং আগামীকাল তার মৃত্যুদণ্ড হবে। আমার হাতে আর একদিনের কাজ বাকি আছে—সে যাতে পালিয়ে বাড়ি চলে যেতে পারে সেজন্য তাকে কারাগার থেকে বের করে আনতে হবে। আগামীকাল থেকে তোমাদের মধ্যে যার দরকার হবে তাকেই আমি সাহায্য করতে পারব।"

দু'নম্বর ক্ষুদে শয়তানের হাতে ছিল তরাস; সে তার কথা বলতে শুরু করল। বলল, "আমার কোনও সাহায্যের দরকার নেই, আমার কাজ ভালই চলছে। তরাস আর এক সপ্তাহের বেশি চালাতে পারবে না। প্রথমে আমি তাকে লোভী ও পেট-মোটা করে তুললাম। তার লোভ এত বেড়ে গেল যে সে যা পেল তাই কিনতে চাইল। প্রচুর মালপত্র কিনে সে সব টাকা খরচ করে ফেলেছে, এবং এখনও কিনেই চলেছে। এর মধ্যেই সে ধার-কর্জ করতে শুরু করেছে। ঋণের বোঝা তার গলায় ভারী হয়ে ঝুলছে, আর সে এতই জড়িয়ে পড়েছে যে কোনও মতেই তার হাত থেকে রেহাই পাবে না। এক সপ্তাহের মধ্যেই তাকে সব ধার শোধ করতে হবে; তার আগেই তার সব সঞ্চিত ফসল আমি নষ্ট করে দেব। ধার শোধ করতে না পেরে সে তখন বাড়িতে তার বাবার কাছে যেতে বাধ্য হবে।"

তখন তারা তিন নম্বর ক্ষুদে শয়তানকে (আইভানের) জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কেমন চলছে?"

সে বলল. "দেখো, আমার কাজকর্ম বড়ই খারাপ চলছে। প্রথমে তার পানীয়ে থুথু ছিটিয়ে দিলাম যাতে তার পেটে ব্যথা হয়; তারপর মাঠে গিয়ে মাটি পিটিয়ে পাথরের মতো শক্ত করে দিলাম যাতে সে চাষ করতে না পারে। আমি ভেবেছিলাম সে এমিতে লাঙল দেবে না, কিন্তু লোকটা এতই বোকা যে সে লাঙল নিয়ে মাঠ চষতে শুরু করে দিলো। পেটের ব্যথায় আর্তনাদ করলেও সে লাঙল চালাতেই লাগল। তার লাঙলটা ভেঙে দিলাম, কিন্তু সে বাড়িতে গিয়ে আর একটা লাঙল এনে ক্ষেত চষতে লাগল। আমি মাটির নিচে ঢুকে তার লাঙলের ফলাটা চেপে ধরলাম, কিন্তু তাকে রুখতে পারলাম না; সে লাঙলের উপর ঝুঁকে পড়ল, আর লাঙলের ধারালো ফলায় আমার হাতই কেটে গেল। মাঠে লাঙল দেওয়া সে প্রায় শেষ করে এনেছে; আর একটা ছোট ফালি মাত্র বাকি আছে। ভাই, তোমরা এসে আমাকে সাহায্য করো; কারণ তাকে পরাজিত করতে না পারলে আমাদের সব চেষ্টাই বিফল হবে। বোকাটা যদি নিজের পথে থেকে জমিতে কাজ করতে থাকে তাহলে তার ভাইদেরও কোনও অভাব থাকবে না, কারণ সে তাদের দু'জনকেই খাওযাবে।"

সৈনিক সাইমনের ক্ষুদে শয়তান কথা দিলো, পরদিন সে সাহায্য করতে যাবে। তারপর তারা বিদায় নিল।

৩

এক চিল্‌তে ছাড়া আর সবটা জমিই আইভান চাষ করে ফেলেছিল। বাকিটাও শেষ করতে এল। পেট যতই ব্যথা করুক, চাষ তাকে করতেই হবে। জোয়ালের দড়ি খুলে লাঙল ঘুরিয়ে সে কাজ শুরু করে দিলো। এক শিরালা চালাবার পরে লাঙলের মুখ ঘোরাতেই লাঙলের ফলাটা বেঁধে গেল, যেন কোনও শিকড়ে আটকে গেছে। আসলে ক্ষুদে শয়তানটা দুই পা দিয়ে লাঙলের ফলাটা জড়িয়ে ধরে সেটাকে আটকে দিয়েছে।

আইভান ভাবল, "এ কী আশ্চর্য ব্যাপার। এখানে তো কোনও শিকড় ছিল না, অথচ একটা শিকড় দেখতে পাচ্ছি।"

শিরালার মধ্যে অনেকখানি হাত ঢুকিয়ে দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে একটা শক্ত মতো জিনিস হাতে লাগায় আইভান সেটাকে টেনে তুলল। জিনিসটা শিকড়ের মতো কালো হলেও কেমন যেন মোচড়াতে লাগল। আরে, এ যে একটা জ্যান্ত ক্ষুদে শয়তান।

"কী নোংরা জিনিস", এই কথা বলে সেটাকে লাঙলের উপর আছাড় মারতে উদ্যত হতেই ক্ষুদে শয়তান আর্তনাদ করে উঠল :

"আমাকে আঘাত করো না; তুমি যা বলবে আমি তাই করব।"

"তুমি কি করতে পারো?"

"যা করতে বলবে তাই পারব।"

আইভান মাথা চুল্‌কোতে লাগল।

বলল, "আমার পেট বাথা করছে; সারিয়ে দিতে পারবে?"

"নিশ্চয় পারব।"

"ঠিক আছে; সাবিয়ে দাও।"

ক্ষুদে শয়তান শিবালার মধ্যে ঢুকে গিয়ে থাবা দিয়ে আঁচড়ে-আঁচড়ে তিনটে ছোট শিকড়ের একটা গোছা এনে আইভানেব হাতে দিলো।

বলল, "এই নাও; এর একটা যে খাবে তার যে কোনও অসুখ সেবে যাবে।"

আইভান শিকড়গুলো নিয়ে একটাকে আলাদা করে গিলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে তার পেটের ব্যথা সেরে গেল। ক্ষুদে শয়তান তখন তাকে ছেড়ে দিতে বলল। "এখনই আমি এক লাফে মাটির ভিতর ঢুকে যাব; আর কখনও আসব না।"

আইভান বলল, "ঠিক আছে; চলে যাও; ঈশ্বর তোমার সহায় হন!"

যেই না আইভান ঈশ্ববের কথা বলল অমনি ক্ষুদে শয়তান জলেব ভিতর ছুঁড়ে দেওয়া পাথরের মতো মাটির মধ্যে ঢুকে গেল। পড়ে রইল শুধু একটা গর্ত।

বাকি শিকড় দুটো টুপির মধ্যে গুঁজে রেখে আইভান আবার লাঙল চালাতে লাগল। শেষ ফালিটুকুও শেষ করে সে লাঙল তুলে বাড়ি ফিরে গেল। ঘোড়াটাকে খুলে দিয়ে কুঁড়েতে ঢুকে সে দেখল, তার বড় ভাই সৈনিক সাইমন ও তার স্ত্রী খেতে বসেছে। সাইমনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে, সে কোনওরকমে কারাগার থেকে পালিয়ে এসেছে, আর এখন থেকে তার বাবার বাড়িতেই থাকবে।

আইভানকে দেখে সাইমন বলল, "তোমার সঙ্গে থাকতেই এলাম। আর একটা চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত আমাকে ও আমার স্ত্রীকে তুমিই খাওয়াবে।"

আইভান বলল, "ঠিক আছে, তোমরা আমাদের সঙ্গেই থাকতে পারো।"

কিন্তু আইভান যখন বেঞ্চিতে বসতে গেল তখন তার গায়ের গন্ধ মহিলাটির পছন্দ হলো না; সে তার স্বামীকে বলল, "একটা নোংরা চাষার সঙ্গে বসে আমি খেতে পারব না।"

তখন সৈনিক সাইমন বলল, "আমার স্ত্রী বলছে তোমার গায়ের গন্ধ ভাল নয়। তুমি বরং বাইরে গিয়ে খাও।"

আইভান বলল, "ঠিক আছে; ঘোটকিটাকে ঘাস খাওয়াবার জন্য আমাকে তো রাতটা বাইরেই কাটাতে হবে।"

কাজেই কিছু রুটি ও কোটটা নিয়ে ঘোটকিটাকে সঙ্গে করে সে মাঠে চলে গেল।

৪

সেদিন রাতে নিজের কাজ শেষ করে সাইমনেব ক্ষুদে শয়তান তার কথামতো আইভানের ক্ষুদে শয়তানটাকে সাহায্য করতে ও বোকাটাকে পর্যুদস্ত করতে এসে হাজির হলো। মাঠে পৌঁছে সে অনেক খুঁজল—কিন্তু তাব বন্ধুর বদলে দেখতে পেল শুধু একটা গর্ত।

সে ভাবল, "পরিষ্কার বুঝতে পাবছি, বন্ধুর কোনও বিপদ ঘটেছে। তার জায়গা আমাকেই নিতে হবে। জমি তো চাষ করাই হয়ে গেছে, কাজেই মাঠেই বোকাটার ব্যবস্থা করতে হবে।"

ক্ষুদে শয়তান তখন মাঠে গিয়ে আইভানের খড়ের মাঠ এমনভাবে জলে ভবে দিলো যে সব খড কাদায় মাখামাখি হযে গেল।

ভোরবেলা গোচারণ ভূমি থেকে ফিরে আইভান কাস্তেটাতে শান দিযে খড় কাটতে মাঠে গেল। কিন্তু কাস্তেটা দু'একবার চালাতেই তাতে আর খড় কাটা গেল না; আবার নতুন কবে ধার দেওয়া দরকার। আইভান বারকযেক চেষ্টা করে বলল, "এ ভাবে হবে না। বাড়ি গিয়ে একটা যন্তব এনে কাস্তেটাকে সোজা করতে হবে: সেই সঙ্গে এক চাঙড় রুটিও নিয়ে আসতে হবে। এখানে যদি এক সপ্তাহও কাটাতে হয় তথাপি খড়কাটা শেষ না করে এখান থেকে যাব না।"

এই কথা শুনে ক্ষুদে শয়তান মনে মনে ভাবল, "এ বোকাটা তো ভারি ত্যাঁদোড়; এভাবে ওর সঙ্গে পারা যাবে না। অন্য চালাকি খেলতে হবে।"

ফিরে এসে কাস্তেতে শান দিযে আইভান আবার খড় কাটতে শুরু করল। ক্ষুদে শয়তান হামাগুড়ি দিয়ে ঘাসের মধ্যে ঢুকে গোড়ালি দিয়ে কাস্তেটাকে চেপে ধরে তার মুখটাকে মাটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে লাগল। ফলে কাজটা করতে খুব কষ্ট হলেও সমস্ত মাঠের খড়ই সে কেটে ফেলল, শুধু জলাভূমির অংশটুকু বাকি রইল। ক্ষুদে শয়তান সেই জলাভূমিতে ঢুকে ভাবল, "আমার থাবাগুলো যদি কেটেও যায় তবু তাকে খড় কাটতে দেব না।"

আইভান জলাভূমিতে নামল। ঘাসগুলো খুব ঘন নয়, অথচ কাস্তে বসছে না। আইভান রেগে গিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে কাস্তে চালাতে শুরু করল। ক্ষুদে শয়তান হার মানল; সে আর কাস্তেটা ধরে রাখতে পারল না; গতিক ভাল নয় বুঝে সে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। আইভান ঝোপটা চেপে ধরে কাস্তে চালাতেই ক্ষুদে

শয়তানের লেজের অর্ধেকটা কাটা পড়ল। তারপর ঘাসকাটা শেষ করে বোনকে সেগুলো দিয়ে গাদা সাজাতে বলে সে গম কাটতে চলে গেল। সে কাস্তেটা হাতে নিয়েই গেল, কিন্তু লেজ-কাটা ক্ষুদে শয়তান তার আগেই সেখানে পৌঁছে গমকে এমনভাবে পেঁচিয়ে রাখল যে সে কাস্তে কোনও কাজেই এল না। কিন্তু আইভান বাড়ি ফিরে গিয়ে তার ছোট কাস্তেটা নিয়ে এল এবং তাই দিয়ে কাজ শুরু করে সবটা গমই কেটে ফেলল।

সে বলল, "এবার যই কাটার সময় হয়েছে।"

একথা শুনে লেজ-কাটা ক্ষুদে শয়তান ভাবল, "গমের বেলায় ওর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারিনি, কিন্তু যইয়ের বেলায় নিশ্চয় পারব। শুধু সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।"

সকালে ক্ষুদে শয়তান তাড়াতাড়ি যইয়ের মাঠে গেল, কিন্তু ততক্ষণে সব যই কাটা হয়ে গেছে। যাতে বেশি ফসল ঝরে না যায় সেজন্য আইভান রাতের মধ্যেই সব যই কেটে ফেলেছে। ক্ষুদে শয়তান ভয়ানক রেগে গেল।

"এই বোকাটা আমার সারা শরীর কেটে দিয়েছে, আমাকে ক্লান্ত করে ফেলেছে। এ তো যুদ্ধের চাইতেও খারাপ। এই বোকাটা ঘুমোয় না পর্যন্ত; ওর সঙ্গে এঁটে ওঠা ভার। এবার ওর খড়ের গাদায় ঢুকে সেগুলোকে নষ্ট করে দেব।"

তখন ক্ষুদে শয়তান গমের মধ্যে ঢুকে তার আঁটিগুলোর মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়ে সেগুলোকে পচিয়ে ফেলতে লাগল। সেগুলো গরম হতেই তার নিজেরও বেশ আরাম লাগায় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

আইভান ঘোটকির পিঠে জোয়াল কষিয়ে বোনকে সঙ্গে নিয়ে গমের আঁটি গাড়িতে বোঝাই করতে গেল। দুটো আঁটিকে টানাটানি করে সে সাঁড়াশিটা তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো—ক্ষুদে শয়তানের একেবারে পিঠের মধ্যে। সাঁড়াশিটা তুলে ধরে দেখে তার দাঁড়ার উপর সেই লেজ-কাটা ক্ষুদে শয়তানটা মুচড়ে-দুমড়ে লাফিয়ে পড়তে চেষ্টা করছে।

"আরে পাজি, তুমি এখানেও হাজির হয়েছ?"

ক্ষুদে শয়তান বলল, "আমি অন্য লোক। এক নম্বরটা আমার ভাই। আমি তোমার ভাই সাইমনের কাছে ছিলাম।"

আইভান বলল, "সে তুমি যেই হও, তোমার কপালেও সেই একই শাস্তি।"

ক্ষুদে শয়তানটাকে গাড়ির উপর আছাড় দিতে গেলে সেটা চেঁচিয়ে বলে উঠল: "আমাকে ছেড়ে দাও; আমিও তোমাকে ছেড়ে তো যাবই; উপরন্তু তুমি যা করতে বলবে তাই করব।"

"তুমি কি করতে পারো?"

"যে কোনও জিনিস দিয়ে সৈন্য বানাতে পারি।"

"কিন্তু তারা কি কাজে লাগবে?"

"তাদের দিয়ে যেকোনও কাজ করাতে পারো, তোমার যা ইচ্ছা তারা তাই করতে পারবে।"

"তারা গাইতে পারবে?"

"হ্যাঁ, তুমি চাইলেই পারবে।"

"ঠিক আছে; আমাকে কিছু সৈন্য বানিয়ে দাও।"

তখন ক্ষুদে শয়তান বলল, "দেখো, এক আঁটি গম নাও, তারপর সেটাকে মাটিতে আছড়াতে আছড়াতে শুধু বলো:

"খড়ের আঁটি। খড়ের আঁটি! আমার চাকর হুকুম দিলো।
একটি করে সৈন্য দাঁড়াক যেথায় যত খড়বা ছিল।"

আইভান খড়ের আঁটিটা নিয়ে মাটিতে আছড়ে ক্ষুদে শয়তানের শেখানো কথাগুলি বলল। আঁটিটা খুলে ছড়িয়ে পড়ল আর প্রতিটি খড় একটি করে সৈন্যে পরিণত হলো। তাদের সামনে একজন ভেরীবাদক ও একজন ঢাকবাদকও বাজাতে শুরু করে দিলো। ফলে একটা পুরো রেজিমেন্ট তৈরি হয়ে গেল।

আইভান হেসে উঠল।

বলল, "তাহলে তো দারুণ! ভারি চমৎকার! মেয়েরা খুব খুশি হবে।"

ক্ষুদে শয়তান বলল, "এবার আমাকে ছেড়ে দাও।"

আইভান বলল, "না। মাড়াই করা খড় থেকে আমি সৈন্য বানাতে চাই, নইলে অনেক ফসল নষ্ট হবে। এগুলোকে কেমন করে আবার খড়ে পরিণত করা যাবে সেটা আমাকে শিখিয়ে দাও। আমি খড়গুলো ঝাড়াই করব।"

তখন ক্ষুদে শয়তান বলল, "তাহলে আবার বলো

"সৈন্যরা সব খড় হয়ে যাও আবার।
আমার চাকর দিচ্ছে হুকুম আবার।"

আইভান এই কথা বলতেই আবার সব খড় হয়ে গেল।

ক্ষুদে শয়তান পুনরায় মিনতি করে বলল, "এবার আমাকে যেতে দাও।'

"ঠিক আছে।" তাকে গাড়ির পাশে চেপে ধরে আইভান সাঁড়াশিটা টেনে নিল।

"ঈশ্বর তোমার সহায় হন," সে বলল।

সে ঈশ্বরের নাম করামাত্রই জলের মধ্যে পাথরের মতো ক্ষুদে শয়তান মাটির ভিতরে ঢুকে গেল। পড়ে রইল শুধু একটা গর্ত।

আইভান বাড়ি ফিরে গেল। সেখানে তখন তার অপর ভাই তারাস ও তার স্ত্রী খেতে বসেছে।

শক্তিমান তারাস ঋণ শোধ করতে না পেরে পাওনাদারদের কাছ থেকে পালিয়ে তার বউকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে এসেছে। আইভানকে দেখে সে বলল, "দেখো ইভান, আমি আবার একটা ব্যবসা শুরু করতে না পারছি ততদিন আমাকে ও আমার স্ত্রীকে খাওয়াবার ভার তোমাকেই নিতে হবে।"

আইভান বলল, "ঠিক আছে, তোমাদের ইচ্ছা হলে এখানে থাকতে পারো।"

আইভান কোটটা খুলে টেবিলে বসল। তখন বণিকের স্ত্রী বলল, "এই ভাঁড়ের সঙ্গে এক টেবিলে আমি বসতে পারব না; ওর গায়ে ঘামের গন্ধ।"

তখন শক্তিমান তরাস বলল, "আইভান, তোমার গায়ে বড় বেশি গন্ধ। তুমি বাইরে গিয়ে খাও।"

কিছু রুটি নিয়ে উঠোনে যেতে যেতে আইভান বলল, "ঠিক আছে। ঘোটকিটাকে চরাবার সময় তো হয়েই গেছে।"

৫

তরাসের ক্ষুদে শয়তানও নিজের কাজ শেষ করে সেই রাতেই পূর্ব ব্যবস্থামতো বোকা আইভানকে পর্যুদস্ত করার ব্যাপারে তার বন্ধুদের সাহায্য করতে এল। ফসলের ক্ষেতে পৌঁছে সে সঙ্গীদের অনেক খুঁজল—কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। শুধু একটা গর্ত সে দেখতে পেল। সে তখন প্রান্তরের দিকে গেল এবং সেখানে জলাভূমিতে ক্ষুদে শয়তানের একটা লেজ এবং গমের নাড়ার মধ্যে একটা গর্ত দেখতে পেল।

সে ভাবল, "নিশ্চয় আমার সঙ্গীদের কোনও বিপদ ঘটেছে। আমাকেই তাদের জায়গা নিয়ে বোকাটার মোকাবিলা করতে হবে।"

ক্ষুদে শয়তান তখন আইভানকে খুঁজতে লাগল। সে তখন ফসল বোঝাই শেষ করে জঙ্গলে কাঠ কাটতে শুরু করেছে। এক বাড়িতে বাস করার ফলে দুই ভাই ইতিমধ্যেই ঠাসাঠাসি বোধ করায় আইভানকে কাঠ কেটে এনে তাদের জন্য নতুন ঘর তৈরি করে দিতে বলেছে।

ক্ষুদে শয়তান দৌড়ে জঙ্গলে গেল; গাছের ডালে চড়ে সে আইভানের গাছ কাটায় বাধা দিতে লাগল। আইভান একটা গাছের গোড়া কেটে দিলে সেটার সরাসরি মাটিতে পড়ে যাবার কথা, কিন্তু পড়বার মুখে গাছটা বেঁকে গিয়ে কয়েকটা ডালে আটকে গেল। আইভান একটা লম্বা লাঠি কেটে নিয়ে সেটা দিয়ে ঠেলা দিয়ে ঠেলা দিয়ে অনেক কষ্টে গাছটাকে মাটিতে ফেলে দিলো। আর একটা গাছ কেটে ফেলতে চেষ্টা করল—আবারও সেই একই ঘটনা; অনেক চেষ্টা করে তবে সে গাছটাকে মাটিতে ফেলে দিলো। তৃতীয় গাছ কাটার বেলায়ও সেই একই ঘটনা ঘটল।

আইভান আশা করেছিল পঞ্চাশটা ছোট গাছ কাটতে পারবে; কিন্তু মাত্র দশটা কাটবার আগেই রাত নেমে এল, আর সেও খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তার গা থেকে গরম ধোঁয়া কুয়াশার মতো জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, তবু সে কাজ করেই চলল। আরও একটা গাছের গোড়া কাটতেই তার পিঠ এত ব্যথা করতে লাগল যে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। কুড়ুলটা গাছের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে সে বিশ্রাম নিতে বসে পড়ল।

আইভান কাজ বন্ধ করেছে দেখে ক্ষুদে শয়তানটা খুশি হয়ে উঠল।

সে ভাবল, "শেষ পর্যন্ত সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে! এবার সে কাজে ক্ষান্ত হবে। এবার আমি নিজেও একটু বিশ্রাম নিতে পারি।"

একটা ডালের দু'দিকে পা ঝুলিয়ে বসে সে মুখ টিপে হাসল। কিন্তু একটু পরেই আইভান উঠে দাঁড়াল এবং কুড়ুলটা তুলে উল্টো দিক থেকে এত জোরে আঘাত করল যে গাছটা সঙ্গে সঙ্গে সবেগে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ক্ষুদে শয়তান এটা আশা করেনি; তাই সে পা দুটো সরিয়ে নেবার সময় পেল না, গাছটা ভেঙে পড়বার সময় তার থাবাটাকে চেপে ধরল। ডালপালাগুলো কাটতে কাটতে সে দেখতে পেল, একটা ক্ষুদে শয়তান গাছ থেকে ঝুলে রয়েছে! আইভান বিস্মিত হলো।

বলল, "আরে বেয়াড়া চিজ! তুমি আবার এখানে এসেছ!"

ক্ষুদে শয়তান বলল, "আমি অন্য লোক। আমি তোমার ভাই তরাসের সঙ্গে ছিলাম।"

"তুমি যেই হও, নিয়তি তোমাকে টেনেছে," এই কথা বলে আইভান কুড়ুল ঘুরিয়ে পিছন দিকটা দিয়ে তাকে আঘাত করতে যাবে এমন সময় ক্ষুদে শয়তান তার কাছে করুণা ভিক্ষা করল : "আমাকে মেরো না, তুমি আমাকে যা করতে বলবে তাই করব।"

"তুমি কি করতে পারো?"

"তুমি যত চাও তত টাকা তোমাকে বানিয়ে দিতে পারি।"

"ঠিক আছে, কিছু বানিয়ে দেখাও।" তখন ক্ষুদে শয়তান তার কেরামতি দেখাতে লাগল।

সে বলল, "এই ওক গাছ থেকে কিছু পাতা নিয়ে তোমার হাতের মধ্যে ঘষতে থাকো, তাহলেই মাটিতে সোনা ঝরে পড়বে।"

আইভান কিছু পাতা নিয়ে ঘষতে লাগল, আর তার হাত থেকে সোনা ঝরে পড়তে লাগল।

সে বলল, "খুব ভাল হলো; ছুটির দিনে ছোটরা এ নিয়ে বেশ খেলা করতে পারবে।"

ক্ষুদে শয়তান বলল, "এবার আমাকে যেতে দাও।"

"ঠিক আছে", বলে আইভান তাকে ছেড়ে দিলো। "এবার চলে যাও! ঈশ্বর তোমার সহায় হন," সে বলল।

যেই না ঈশ্বরের কথা বলা অমনি জলের মধ্যে পাথরের মতো ক্ষুদে শয়তান মাটির মধ্যে ঢুকে গেল। পড়ে রইল শুধু একটা গর্ত।

৬

এইভাবে দাদারা ঘর-বাড়ি বানিয়ে আলাদা বাস করতে লাগল। আইভান ফসল

কাটা শেষ করল, বীয়ার চোলাই করল, এবং পরবর্তী উৎসবের সময়টা তার সঙ্গে কাটাবার জন্য দাদাদের আমন্ত্রণ করল। কিন্তু দাদারা এল না।

তারা বলল, "চাষীদের উৎসব নিয়ে আমাদের উৎসাহ নেই।"

কাজেই আইভান কৃষকদের ও তাদের বৌদের আপ্যায়ন করল। বীয়ার খেয়ে তার চোখে রং ধরল। একদল নাচিয়ের সঙ্গে সে রাস্তায় গেল এবং সেখানে তার সম্মানে একটি গান গাইতে মেয়েদের অনুরোধ করল; সে বলল, "আমি তোমাদের এমন একটা জিনিস দেব যা তোমরা জীবনে কখনও দেখোনি!"

মেয়েরা হাসতে হাসতে তার প্রশস্তি গাইতে শুরু করল। গান শেষ করে তারা বলল, "এবার তোমার উপহার দাও।"

"এখনই নিয়ে আসছি", সে বলল।

একটা বীজ-ভর্তি ঝুড়ি নিয়ে সে জঙ্গলের দিকে ছুটে গেল। মেয়েরা হেসে উঠল। "ও একটা বোকা!" এই কথা বলে তারা অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

কিন্তু আইভান শীঘ্রই দৌড়ে ফিরে এল; কোনও ভারী জিনিস দিয়ে তার ঝুড়িটা ভর্তি।

"এটা তোমাদের দেব কি?"

"হ্যাঁ, দাও।"

একমুঠো সোনা তুলে নিয়ে আইভান মেয়েদের দিকে ছুঁড়ে দিলো। সেগুলি কুড়িয়ে নেবার জন্য তারা যে ভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে একটা দেখবার মতো দৃশ্য। আশেপাশের পুরুষরাও তার জন্য হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিলো এবং একে অন্যেরটা কেড়ে নিতে লাগল। একটা বুড়িকে তো চেপে মেরেই ফেলেছিল আর কি। আইভান হাসতে লাগল।

বলল, "আরে বোকারো! তোমরা ঠাকুরমাকে চেপে ধরেছ কেন? শান্ত হও, আমি তোমাদের আরও দিচ্ছি।" এই বলে সে আরও কিছু ছড়িয়ে দিলো। লোকজন সব চারদিক থেকে ভিড় জমিয়ে তুলল, আর আইভান ক্রমে ক্রমে সব সোনাই ছড়িয়ে দিলো। তারা আরও চাইলে আইভান বলল, "এখন তো আমার কাছে আর নেই। অন্য সময়ে আরও কিছু তোমাদের দেব। আপাতত এস, আমরা সকলে নাচ শুরু করি, আর তোমরাও আমাকে গান শুনিয়ে দাও।"

মেয়েরা গাইতে শুরু করল।

সে বলল, "তোমাদের গান মোটেই ভাল নয়!"

"এর চাইতে ভাল গান কোথায় পাবে?" তারা বলল।

"এখনই তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি," সে বলল।

তারপর সে গোলাবাড়িতে গিয়ে একটা আঁটি নিয়ে ফসল ঝেড়ে ফেলে সেটাকে খাড়া করে ধরে মাটিতে আছড়ে ফেলল।

এবার সে বলল,

"খড়ের আঁটি! খড়ের আঁটি! আমার চাকর হুকুম দিলো .

একটি করে সৈন্য আসুক যেথায় যত খড়রা ছিল।"

অমনি আঁটিটা খুলে গিয়ে দেখা দিলো একদল সৈনিক। ভেরী ও ঢাক বেজে উঠল। আইভান সৈনিকদের গান-বাজনা করতে হুকুম করল ও তাদের রাস্তায় নিয়ে হাজির করল। সকলে তো অবাক! সৈনিকরা বাদ্য বাজাল, গান করল। তখন আইভান (সকলকে তাকে অনুসরণ করতে নিষেধ করে) সকলকে গোলাবাড়িতে নিয়ে গিয়ে আবার খড়ের আঁটিতে পরিণত করে যথাস্থানে রেখে দিলো!

তারপর সে বাড়ি ফিরে আস্তাবলে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

৭

পরদিন সকালে এ সব কথা শুনে সৈনিক সাইমন ভাইয়ের কাছে গেল।

বলল, "আমাকে বলো তো এত সব সৈন্য তুমি পেলেই বা কোথায়, আর তাদের রেখেছই বা কোথায়?"

"তা শুনে তুমি কি করবে?" আইভান বলল।

"কি করব? দেশা সৈন্য হাতে পেলে যা ইচ্ছা করা যায়। একটা রাজ্য জয় করা যায়।"

আইভান অবাক হলো। বলল, "সত্যি নাকি? এ কথা আগে বলোনি কেন? তুমি যত চাও তত সৈন্য আমি তোমাকে দিতে পারি। বোন ও আমাতে মিলে ফসল ঝেড়ে অনেক খড় জমা করেছি।"

আইভান দাদাকে সঙ্গে করে গোলাবাড়িতে গিয়ে বলল,

"একটা কথা, তোমাকে সৈন্য বানিয়ে দেওয়ামাত্রই তুমি তাদের এখান থেকে নিয়ে যাবে, কারণ তাদের যদি এখানে খাওয়াতে হয় তাহলে একদিনেই তারা সারা গ্রামটাকেই খেয়ে ফেলবে।"

সৈনিক সাইমন কথা দিলো, সৈন্যদের নিয়ে চলে যাবে, আর আইভানও সৈন্য বানাতে শুরু করল। এক আঁটি খড় সে উঠোনে আছড়ে ফেলল— আর একদল সৈন্য উদয় হলো। আর এক আঁটি ফেলল-- আর একদল সৈন্য হলো। এইভাবে সে এত সৈন্য বানিয়ে ফেলল যে গোটা মাঠই ছেয়ে গেল।

"এতে হবে তো?" সে প্রশ্ন করল।

সাইমন আনন্দে আত্মহারা। বলল, "এতেই হবে। ধন্যবাদ আইভান।"

আইভান বলল, "ঠিক আছে। যদি আরও দরকার হয়, আমাকে এসে বলো, বানিয়ে দেব। এ বছর যথেষ্ট খড় পাওয়া গেছে।"

সৈনিক সাইমন সঙ্গে সঙ্গে সেনাদলকে নিজের অধীনে এনে তাদের সাজিয়ে-গুছিয়ে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে গেল।

সৈনিক সাইমন চলে যাবার পরক্ষণেই শক্তিমান তরাস এসে হাজির হলো। সেও গতকালকার সব ব্যাপার শুনেছিল; তাই ভাইকে বলল,

"এত সোনা তুমি কোথায় পেলে আমাকে দেখাও। আমি যদি কিছু সোনা হাতে পেতাম, তাহলে সাবা পৃথিবীর টাকা আমার কাছে এনে হাজির করতে পারতাম।"

আইভান তো অবাক।

বলল, "সত্যি! এ কথা আগে বললেই পারতে। যত চাও তত সোনা তোমাকে দেব।"

তার দাদা তো ভারি খুশি।

"শুরুতে আমাকে তিন ঝুড়ি দাও।"

আইভান বলল, "ঠিক আছে। আমার সঙ্গে বনে চলো; বরং ঘোটকিটাকে নিয়ে যাই, কারণ অত সোনা তুমি বয়ে আনতে পারবে না।"

ঘোড়ায় চড়ে তারা বনে ঢুকল। আইভান ওক গাছের পাতা নিয়ে হাতে ঘষতে লাগল। সোনার স্তূপ জমে গেল।

"এতে হবে তো?"

তরাসেব খুশি ধরে না।

বলল, "আপাতত এতেই হবে। ধন্যবাদ আইভান!"

আইভান বলল, "ঠিক আছে। যদি আরও লাগে তো চলে এসো। গাছে অনেক পাতা আছে।"

গাড়ি-বোঝাই সোনা নিয়ে শক্তিমান তরাস বাণিজ্য করতে চলে গেল।

এই ভাবে দুই দাদাই চলে গেল। সাইমন গেল যুদ্ধ করতে, আর তরাস গেল কেনা-বেচা করতে। সৈনিক সাইমন একটা রাজ্য জয় করল; তরাসও ব্যবসা করে অনেক টাকা করল।

দুই ভাইয়েব দেখা হলে একে অপরকে সব কথা বলল : সাইমন কি ভাবে সৈন্যদের পেল, আর তরাস কি ভাবে টাকাটা পেল। তখন সৈনিক সাইমন ভাইকে বলল, "একটা রাজ্য জয় করে আমি বেশ জাঁকজমকের সঙ্গেই আছি, কিন্তু সৈন্যদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আমার নেই।"

আর শক্তিমান তরাস বলল, "আর আমি অনেক টাকা কবেছি, কিন্তু বিপদ হয়েছে এই যে টাকা পাহারা দেবার কেউ নেই।"

সৈনিক সাইমন বলল, "চলো, আমরা ভাইয়ের কাছে যাই। আমি তাকে আরও সৈন্য বানাতে বলব, আর তোমাব টাকা পাহারা দেবার জন্য তাদের তোমাকে দিয়ে দেব; আবার তুমি তাকে আমার জন্য যে টাকা তৈরি করতে বলবে তাই দিয়ে আমি আমার সৈন্যদের খাওয়াব।"

তখন তারা আইভানের কাছে গেল।

সাইমন বলল, "আদরের ভাই, আমাব যথেষ্ট সৈন্য নেই; আরও দুই গাদা বা ঐ রকম সৈন্য আমাকে বানিয়ে দাও।"

আইভান মাথা নাড়ল।

বলল "না! আমি তোমাকে আর সৈন্য বানিয়ে দেব না।"

"কিন্তু তুমি দেবে বলে কথা দিয়েছিলে।"

"জানি কথা দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি আর সৈন্য বানাব না।"

"কিন্তু কেন বানাবে না বোকা?"

"কারণ তোমার সৈন্যরা একটি লোককে মেরেছে। এই তো সেদিন রাস্তার ধারে লাঙল চালাচ্ছিলাম এমন সময় দেখলাম একটি স্ত্রীলোক কাঁদতে কাঁদতে গাড়িতে করে একটা শবাধার নিয়ে চলেছে। কে মারা গেছে জানতে চাইলাম। সে বলল, 'সাইমনের সৈন্যরা যুদ্ধে আমার স্বামীকে মেরে ফেলেছে।' আমি ভেবেছিলাম সৈন্যরা শুধু সুর বাজাবে, কিন্তু তারা মানুষ মেরেছে। কাজেই আর সৈন্য আমি দেব না।"

যে কথা সেই কাজ; সে কিছুতেই সৈন্য বানাবে না।

শক্তিমান তরাসও তার জন্য আরও সোনা বানাতে অনুরোধ করতে লাগল। কিন্তু আইভান মাথা নাড়ল।

"না, আর সোনা বানাব না," সে বলল।

"তুমি আমাকে কথা দাওনি?"

"দিয়েছিলাম, কিন্তু আর বানাব না," সে বলল।

"কেন বানাবে না বোকা?"

"কারণ তোমার স্বর্ণমুদ্রা মাইকেলের মেয়ের গরুটা নিয়ে গেছে।"

"কেমন করে?"

"স্রেফ নিয়ে গেছে! মাইকেলের মেয়ের একটা গরু ছিল। তার ছেলেমেয়েরা সেই গরুর দুধ খেতো। কিন্তু সেদিন তার ছেলেমেয়েরা আমার কাছে দুধ চাইতে এসেছিল। আমি বললাম, 'তোদের গরু কোথায় গেল?' তারা জবাব দিলো, 'শক্তিমান তরাসের গোমস্তা এসে মাকে তিনটুকরো সোনা দিলো আর মা তাকে গরুটা দিয়ে দিলো; কাজেই আমাদের খাবার দুধ নেই।' আমি ভেবেছিলাম সোনার টুকলোগুলো দিয়ে তুমি শুধু খেলা করবে, কিন্তু তুমি ছেলেমেয়েদের গরুটা নিয়ে এসেছ। তাই তোমাকে আর সোনা দেব না।"

যে কথা সেই কাজ, আইভান তাকে আর সোনা দিলো না। কাজেই দুই ভাই চলে গেল। তাদের অভাবগুলো কি ভাবে দূর করা যায়, যেতে যেতে সেই কথাই তারা আলোচনা করতে লাগল। সাইমন বলল :

"দেখো, কি করতে হবে আমি বলে দিচ্ছি। সৈন্যদের খাওয়াবার জন্য তুমি আমাকে টাকা দাও, আর তোমার টাকা-পয়সা পাহারা দেবার জন্য আমি তোমাকে দেব অর্ধেক রাজ্য আর যথেষ্ট সৈন্য।" তরাস সম্মত হলো। এইভাবে দুই ভাই যার যা ছিল ভাগ করে নিলো; ফলে দু'জনই রাজা হলো, আর দু'জনই ধনী হলো।

৮

আইভান বাড়িতে থেকে বাবা-মার ভরণ পোষণ করতে লাগল এবং বোবা বোনটিকে নিয়ে ক্ষেতে কাজ করে চলল। এখন হলো কি, আইভানের কুকুরটা অসুস্থ হয়ে পড়ল। গা-ময় পাচড়া হয়ে সে প্রায় মরতে বসল। তার প্রতি করুণাবশত আইভান বোনের কাছ থেকে কিছুটা রুটি নিয়ে তার টুপির মধ্যে ভরে বাইরে নিয়ে কুকুরটার সামনে ছুঁড়ে দিলো। টুপিটা ছিল ছেঁড়া, তাই রুটির সঙ্গে একটা ছোট শিকড় মাটিতে পড়ে গেল। বুড়ো কুকুরটা রুটি সমেত সেটা খেয়ে ফেলল, আর সঙ্গে সঙ্গেই সেটা লাফাতে লাগল, খেলা করতে লাগল, ডাকতে লাগল আর লেজ নাড়তে লাগল—এক কথায় সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেল।

বাবা আর মা তা দেখে তো অবাক।

তারা জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি করে কুকুরটাকে সারালে?"

আইভান জবাব দিলো "যেকোনও ব্যথা সারাবার মতো দুটো ছোট শিকড় আমার কাছে ছিল। কুকুরটা তার একটা গিলে খেয়েছে।'

এদিকে ঠিক সেই সময়ই রাজার মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় রাজা সমস্ত শহরে ও গ্রামে ঘোষণা করে দিলো যে কেউ তার মেয়েকে সারিয়ে তুলতে পারবে রাজা তাকেই পুরস্কৃত করবে, আর যদি কোনও অবিবাহিত লোক রাজার মেয়েকে সারাতে পারে তাহলে সেই তাকে পত্নীরূপে পাবে। আইভানের গ্রামে এবং অন্য সর্বত্রই এই ঘোষণা প্রচার করা হয়েছিল।

বাবা ও মা আইভানকে কাছে ডেকে বলল, "রাজা কি ঘোষণা করেছেন শুনেছ? তুমি বললে, তোমার কাছে এমন শিকড় আছে যাতে যে-কোনও ব্যাধি সারবে। তুমি গিয়ে রাজার মেয়েকে সারিয়ে তোলো, তাহলেই সারা জীবন সুখী হতে পারবে।"

"ঠিক আছে" সে বলল।

তখন আইভান যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। বাবা তাকে যথাসাধ্য ভালভাবে সাজিয়ে দিলো। কিন্তু দরজা থেকে বেরিয়েই নুলো হাতওয়ালা একটি ভিখারিনীর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল।

ভিখারিনী বলল, "আমি শুনেছি তুমি সবাইকে ভাল করে দিতে পারো। আমি প্রার্থনা জানাই, আমার হাতটা ভাল করে দাও কারণ জুতোজোড়া পর্যন্ত আমি নিজে পরতে পারি না।"

"ঠিক আছে," বলে আইভান ছোট শিকড়টা তাকে দিয়ে গিলে ফেলতে বলল। ভিখারিনী সেটা খেয়েই ভাল হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই সে বেশ ভালভাবে তার হাতটা নাড়তে লাগল।

আইভানের সঙ্গে রাজার কাছে যাবার জন্য তার বাবা ও মাও বেরিয়ে এল। কিন্তু

তারা যখন শুনল যে শিকড়টা সে দিয়ে দিয়েছে এবং রাজার মেয়েকে সারাবার মতো আর কিছুই তার কাছে নেই, তখন তারা আইভানকে বকতে শুরু করল।

তারা বলল, "তুমি ভিখারিনীকে দয়া করলে, কিন্তু রাজার মেয়ের জন্য তোমার দুঃখ হলো না।" তবে আইভান রাজার মেয়ের জন্যও দুঃখিত হলো। তাই সে ঘোড়াটা জুতে গাড়িতে বসবার জন্য খড় বিছিয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

"তুমি কোথায় চললে বোকা?"

"রাজার মেয়েকে সারাতে।"

কিন্তু তাকে সারাবার মতো কিছুই তো তোমার নেই।"

'সেজন্য ভেবো না,' এই কথা বলে সে গাড়ি ছেড়ে দিলো।

রাজার প্রাসাদে পৌঁছে যেই সে চৌকাঠে পা দিলো অমনি রাজার মেয়ে ভাল হয়ে গেল।

রাজা খুব খুশি। আইভানকে কাছে ডেকে এনে তাকে রাজ-পোশাকে সাজাবার ব্যবস্থা করল

"তুমি আমার জামাই হও,' রাজা বলল।

'ঠিক আছে" আইভান বলল।

তখন আইভান রাজকুমারীকে বিয়ে করল। তার কিছু পরেই তার বাবা মারা গেল এবং আইভান রাজা হলো। এইভাবে তিনটি ভাইই রাজা হলো।

৯

তিন ভাই বেশ সুখে থেকে রাজত্ব করতে লাগল। বড় ভাই সৈনিক সাইমনের আরো উন্নতি হলো। খড়ের সৈন্য ছাড়াও সে তার আসল সৈন্য সংগ্রহ করল। সে রাজ্যময় ঘোষণা করে দিলো প্রতি দশটি বাড়ি থেকে একজন করে সৈন্য পাঠাতে হবে, যার সে সৈন্য হবে দীর্ঘদেহ এবং দেহে ও মুখে পরিচ্ছন্ন। এই রকম সৈন্য সংগ্রহ করে সে তাদের শিক্ষিত করে তুলল। কেউ তাকে বাধা দিলেই তৎক্ষণাৎ ওই সব সৈন্য পাঠিয়ে সে তাকে বশে আনতে লাগল। ফলে সকলেই তাকে ভয় করতে লাগল এবং বেশ আরামে তার জীবন কাটতে লাগল। যেদিকে সে চোখ ফেলবে, যা সে চাইবে, সবই তার হয়ে যাবে। যখন যা চাই তাই সে পাঠিয়ে নিয়ে আসতে লাগল।

শক্তিমান তরাসও আরামেই দিন কাটাতে লাগল। আইভানের কাছ থেকে পাওয়া টাকার অপচয় না করে সে বরং তাকে অনেক গুণ বাড়িয়ে তুলল। রাজ্যে আইন ও শৃঙ্খলা প্রবর্তন করল। সব টাকা সে সিন্দুকে রেখে দিলো। প্রজাদের ওপর কর বসাল মাথা পিছু কর, হাঁটা ও গাড়ি চালানোর উপর কর, জুতো, মোজা ও পোশাকের লেসের উপর কর বসল। যা কিছু চাইছে সবই পাচ্ছে। টাকার জন্য সকলেই তাকে সব কিছু এনে দিচ্ছে। সকলেই তার কাজ করতে ইচ্ছুক, কারণ সকলেই চায় টাকা।

বোকা আইভানের অবস্থাও কিছু খারাপ নয়। শ্বশুরকে কবর দেবার সঙ্গে সঙ্গেই

সে সব রাজার পোশাক খুলে ফেলে সেগুলো স্ত্রীকে দিলো বাক্সবন্দী করে রাখতে, আর পুনরায় শনের শার্ট, আঁটো পায়জামা ও চাষী-জুতো পরে সে কাজে লেগে গেল।

বলল, "বড়ই একঘেয়ে লাগছে। মোটা হয়ে যাচ্ছি, ঘুম কমে যাচ্ছে!" অতএব বাবা, মা ও বোবা বোনটাকে নিজের কাছে এনে সে আগের মতোই কাজ করতে শুরু করল।

লোকে বলল, "কিন্তু তুমি যে রাজা!"

সে বলল, "হ্যাঁ, কিন্তু রাজাকেও তো খেতে হবে।"

একজন মন্ত্রী এসে বলল, "মাইনে দেবার মতো টাকা নেই।"

সে বলল, "ঠিক আছে, তাহলে কাউকে মাইনে দিও না।"

"তাহলে তো কেউ সেবা করবে না।"

"ঠিক আছে; কাউকে সেবা করতে হবে না। তাতে তারা কাজের জন্য আরও বেশি সময় পাবে; তারা গাড়িতে সার বোঝাই করুক। ঝাড়ুদারের কাজ তো অনেক করবার আছে।"

আইভানের কাছে লোকে বিচারের জন্য আসে। একজন বলল, "সে আমার টাকা চুরি করেছে।" আর আইভান বলল, "ঠিক আছে; এতেই বোঝা যাচ্ছে তার টাকার দরকার ছিলো।"

এইভাবে সকলেই বুঝতে পারল যে, আইভান একটি বোকা লোক। তার স্ত্রী তাকে বলল, "লোকে বলে তুমি বোকা।"

"ঠিক আছে," আইভান বলল।

তার স্ত্রী ভাবল আর ভাবল; কিন্তু সেও ছিল বোকা।

বলল, "আমি কি আমার স্বামীর বিরুদ্ধে যাব? যেদিকে সূঁচ যায়, সুতোও সেইদিকেই যায়।"

কাজে কাজেই সেও রানির পোশাক খুলে বাক্সবন্দী করে রাখল, আর বোবা মেয়েটির কাছ থেকে কাজ শিখতে লাগল। কাজ শিখে স্বামীকে সাহায্য করতে শুরু করে দিলো।

ক্রমে সব জ্ঞানী লোকরা আইভানের রাজ্য ছেড়ে চলে গেল, রইল শুধু বোকারা। তাদের কারোরই টাকা নেই। তারা বেঁচে-বর্তে থেকে কাজ করতে লাগল। নিজেদের খাবার ব্যবস্থা করল, অন্যদেরও খাওয়াল।

১০

ক্ষুদে শয়তানদের কাছ থেকে তিন ভাইয়ের সর্বনাশের খবরের জন্য বুড়ো শয়তান অপেক্ষা করছে তো করছেই। কিন্তু কোনও খবর এলো না। সুতরাং সে নিজেই খোঁজ করতে বেরিয়ে পড়ল। খুঁজতে খুঁজতে তিন ক্ষুদে শয়তানের বদলে দেখতে পেল তিনটে গর্ত।

সে ভাবল, "নিশ্চয় ওরা কিছু করতে পারেনি। আমাকেই একটা কিছু করতে হবে।"

সুতরাং সে ভাইদের খোঁজে গেল। কিন্তু তারা তো আর আগের জায়গায় নেই। তিনটে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে সে তাদের দেখতে পেল। সকলেই বহাল তবিয়তে রাজত্ব করছে। এতে বুড়ো শয়তান খুবই বিরক্ত হলো।

বলল, "আচ্ছা, আমি নিজেই এ কাজে হাত লাগাব।"

প্রথমে সে গেল রাজা সাইমনের কাছে। নিজের চেহারায় না গিয়ে একজন সেনাপতির ছদ্মবেশ ধরে সে ঘোড়ায় চড়ে সাইমনের রাজপ্রাসাদে গেল।

বলল, "রাজা সাইমন, আমি শুনেছি আপনি একজন বড় যোদ্ধা; তাই যেহেতু ও কাজটা আমি ভালই জানি তাই আমি আপনার সেবা করতে চাই।"

রাজা সাইমন তাকে নানা রকম প্রশ্ন করে যখন বুঝল যে লোকটি জ্ঞানী, তখন তাকে চাকরিতে নিল।

কি ভাবে একটা শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে হয় নতুন সেনাপতি সে কথা রাজা সাইমনকে বোঝাতে লাগল।

বলল, "প্রথমে আমাদের আরও সৈন্য সংগ্রহ করতে হবে কারণ আপনার রাজ্যে অনেক বেকার লোক আছে। সব যুবকদেরই আমরা সেনাদলে ভর্তি করব, কাউকে বাদ দেব না। তাদের আগের চাইতে পাঁচগুণ বেশি সৈন্য আপনি পাবেন। দ্বিতীয়ত, নতুন বন্দুক ও কামান আমাদের অবশ্য যোগাড় করতে হবে। আমি এমন বন্দুক বানাব যা থেকে একসঙ্গে একশ' গুলি ছোঁড়া যাবে; গুলি মটরদানার মতো ছুটবে। আর এমন কামান বানাব যাতে মানুষ, ঘোড়া, দেয়াল সব কিছু জ্বলবে। সে কামান সব কিছু পুড়িয়ে ফেলবে!"

রাজা সাইমন নতুন সেনাপতির কথা মন দিয়ে শুনল, বিনা ব্যতিক্রমে সব যুবককে সেনাদলে ভর্তি হবার হুকুম জারি করল, আর নতুন নতুন কারখানা খুলে প্রচুর পরিমাণে উন্নত ধরনের বন্দুক ও কামান তৈরি করে ফেলল। কালবিলম্ব না করে সে একজন প্রতিবেশী রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। প্রতিপক্ষ বাহিনীর সম্মুখীন হয়েই রাজা সাইমন সৈন্যদেব গুলিবর্ষণ করতে ও কামান থেকে গোলা ছুঁড়তে আদেশ দিলো। এক আঘাতেই শত্রুপক্ষের অর্ধেক সৈন্যকে সে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে পঙ্গু করে দিলো। প্রতিবেশী রাজা অত্যন্ত ভয় পেয়ে পরাজয় মেনে নিয়ে নিজের বাজ্য ছেড়ে দিলো। রাজা সাইমনও খুশি হলো।

বলল, "এবার আমি ভারতের রাজাকে জয় করব।"

কিন্তু ভারতের রাজা আগে থেকেই রাজা সাইমনের কথা শুনে তাব সব নতুন আবিষ্কারই গ্রহণ করেছিল এবং নিজেও কিছু কিছু যোগ করেছিল। ভারতের রাজা শুধু সব যুবকই নয়, সব অবিবাহিতা যুবতীকেও সৈন্যদলে ভর্তি করে নিয়েছিল এবং রাজা সাইমনের সেনাদল থেকেও বড় সেনাদল গড়ে তুলেছিল। রাজা সাইমনের

বন্দুক ও কামান নকল করা ছাড়াও সে আকাশ থেকে বিস্ফোরক বোমা ছুঁড়বার জন্য বাতাসে উড়বার একটা নতুন পদ্ধতিও আবিষ্কার করেছিল।

রাজা সাইমন ভারতীয় রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হলো। সে আশা করেছিল অপর রাজার মতোই তাকেও পরাজিত করতে পারবে; কিন্তু যে কাস্তে তখন এত ভাল কেটেছিল এখন তার ধার পড়ে গেছে। ভারতের রাজা সাইমনের বাহিনীকে বন্দুকের পাল্লার মধ্যেই আসতে দিলো না; সাইমনের বাহিনীর উপর আকাশ থেকে বিস্ফোরক বোমা ছুঁড়বার জন্য নারী-বাহিনীকে আকাশপথে পাঠিয়ে দিলো। তারাও আরসোলার উপর বোরাক্সের মতো সৈন্যদের উপর বোমাবর্ষণ করতে লাগল। সৈন্যরা পালিয়ে গেল, রাজা সাইমন একা পড়ে রইল। এই ভাবে ভারতের রাজা সাইমনের রাজ্য অধিকার করল আর সাইমন যথাশক্তি দ্রুত পালিয়ে গেল।

ভাইকে শেষ করে বুড়ো শয়তান এবার রাজা তরাসের কাছে গেল; বণিকের ছদ্মবেশে সে তরাসের রাজ্যে বসবাস শুরু করল, একটা ব্যবসার পত্তন করল এবং যথেষ্ট টাকা খরচ করতে লাগল। সে সব জিনিসেরই চড়া দাম দিতে লাগল, আর টাকার জন্য সকলেই নতুন বণিকের কাছে ছুটতে লাগল। লোকের হাতে এত টাকা জমল যে তারা সব কর মিটিয়ে দিলো এবং বকেয়া করও দিয়ে দিলো। ফলে রাজা তরাসও খুশি হলো।

সে ভাবল, "নতুন বণিককে ধন্যবাদ, আমি আগের থেকে অনেক বেশি টাকা পাব, এবং আরও আরামে থাকতে পারব।"

তখন রাজা তরাস নতুন পরিকল্পনা নিয়ে একটা নতুন প্রাসাদ গড়তে শুরু করল। সে সকলকে জানিয়ে দিলো, তারা যেন তাকে কাঠ ও পাথর এনে দেয় এবং তার কাজ করতে আসে। সব কিছুর জন্যই সে বেশ চড়া দরও ঠিক করে দিলো। রাজা তরাস ভেবেছিল, লোকেরা আগের মতোই দলে দলে কাজ করতে আসবে, কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল সব কাঠ আর পাথরই বণিকের বাড়িতে চলে যাচ্ছে, আর মজুররাও সব সেখানেই যাচ্ছে। রাজা তরাস দর বাড়িয়ে দিলো, কিন্তু বণিক আরও বাড়িয়ে দিলো। রাজা তরাসের অনেক টাকা ছিল বটে, কিন্তু বণিকের ছিল আরও বেশি; প্রতি পদেই সে রাজার চাইতে বেশি দর দিতে লাগল।

রাজার প্রাসাদ তৈরির কাজ থেমে গেল; বাড়ি উঠল না।

রাজা তরাস একটা বাগানের নক্সা করে হেমন্তকাল পড়তেই লোকদের ডেকে পাঠাল বাগানে গাছ পুঁতে দিতে, কিন্তু কেউ এল না। সব লোক বণিকের একটা পুকুর কাটাতে ব্যস্ত। শীতকাল এল। রাজা তরাস একটা নতুন ওভারকোট বানাবার জন্য বেজির লোম কিনতে চাইল। সে লোক পাঠালে তারা ফিরে এসে জানাল, "কোনও লোম পাওয়া গেল না। বণিক সব কিনে নিয়েছে। চড়া দাম দিয়ে কিনে সেই চামড়া দিয়ে সে কার্পেট তৈরি করেছে।"

রাজা তরাস কয়েকটা ঘোড়া কিনতে চাইল। সেজন্য লোক পাঠালে তারা এসে

জানাল, "বণিক সব ভাল ঘোড়া কিনে নিয়েছে, সেগুলো তার পুকুর ভর্তি করবার জন্য জল বয়ে আনছে।"

রাজার সব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল, তার কাজ কেউ করতে চায় না, সকলেই বণিকের কাজে ব্যস্ত, বণিকের টাকায় কর শোধ করবার জন্যই শুধু তারা রাজার কাছে আসে।

এদিকে রাজার হাতে এত টাকা জমে গেল যে রাখবার জায়গা নেই, ফলে তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। সব নতুন পরিকল্পনা বন্ধ করে দিয়ে সে এখন সাদাসিধেভাবে বাস করতে পারলেই খুশি কিন্তু তাও পারছে না। সব কিছুতেই টান পড়তে লাগল, একে একে রাঁধুনি কোচম্যান, চাকর সকলেই তাকে ছেড়ে বণিকের কাছে চলে যেতে লাগল। শীঘ্রই তার খাবারের অভাব দেখা দিল। বাজারে কোনও জিনিস কিনতে পাঠালে কিছুই পাওয়া যায় না—বণিক সবকিছু কিনে নিয়েছে লোকেরা রাজার কাছে আসে শুধু টাকা নিয়ে—কর দিতে

রাজা তখন নিরুপায় হয়ে বণিককে দেশ থেকে নির্বাসিত করল। কিন্তু বণিক সীমান্তের ওপারেই ঘাঁটি বানিয়ে আগের মতোই চালাতে থাকল, বণিকের টাকার জন্য লোকেরা সবকিছুই রাজার বদলে তার কাছেই নিয়ে যেতে লাগল।

রাজার অবস্থা [illegible] নেই। দিনের পর দিন [illegible] জোটে না। এমন কি গুজব রটল যে বণিক নাকি বড়াই করছে [illegible] রাজাকেই কিনে নেবে। তারাস ভয় পেয়ে গেল, কী যে করবে বুঝতে পারল না।

এই সময় সিমিয়ন সৈনিক তার কাছে এসে বলল, "[illegible] সাহায্য করো, ভাইয়ের রাজা আমাকে পরাজিত করেছে।"

কিন্তু রাজা তারাস নিজেই তখন দেনায় ডুবে আছে। সে বলল, "আজ দু'দিন আমার নিজেরই খাবার জোটেনি।"

১১

দুই ভাইকে শেষ করে বুড়ো শয়তান আইভানের কাছে গেল। একজন সেনাপতির ছদ্মবেশে আইভানের কাছে গিয়ে সে তাকে বোঝাতে লাগল যে তারও একটা সৈন্যদল থাকা উচিত।

সে বলল, "সৈন্যদল না থাকলে একজন রাজাকে মানায় না। আপনি শুধু হুকুম করুন, তাহলেই আপনার প্রজাদের ভিতর থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে আমি একটি বাহিনী গড়ে তুলব।"

আইভান তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে বলল, "ঠিক আছে একটা সেনাদল গঠন করে তাদের ভাল গান গাইতে শেখাও। তাদের গান শুনতে আমার খুব ভাল লাগে।"

বুড়ো শয়তান তখন আইভানের রাজ্যময় সৈন্য সংগ্রহ করে বেড়াতে লাগল।

সে তাদের বলল, সেখানে গিয়ে সৈন্যদলের তালিকায় নাম লেখালেই প্রত্যেকে তিন-পোয়া বোতল মদ ও একটা ভাল লাল টুপি পাবে।

শুনে সকলে হেসে উঠল।

বলল, "মদ আমাদের যথেষ্ট আছে। আমরা নিজেরাই তো বানাই। আর টুপি, সেও মেয়েরাই সব রকম বানাতে পারে, এমন কি ডোরা-কাটা ঝোপ্পা দেওয়া টুপি পর্যন্ত।"

কাজেই কেউ নাম লেখাতে রাজী হলো না।

বুড়ো শয়তান আইভানেব কাছে এসে বলল, "তোমার ঐ বোকারা কেউ স্বেচ্ছায় নাম লেখাবে না। তাদের দিয়ে জোর করে নাম লেখাতে হবে।"

আইভান বলল, "ঠিক আছে; তুমি চেষ্টা করে দেখতে পারো।"

তখন বুড়ো শয়তান প্রচার করে দিলো—সকলকেই নাম লেখাতে হবে, আর যে অস্বীকার করবে আইভান তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে।

সকলে সেনাপতির কাছে এসে বলল, "তুমি বলছ আমরা যদি সৈন্য না হই তাহলে রাজা আমাদের মৃত্যুদণ্ড দেবে, কিন্তু নাম লেখালে কি হবে তা তো তুমি বলছ না। আমরা শুনেছি যে সৈন্যরা মারা পড়ে।"

"হ্যাঁ, কখনও কখনও সে রকমটা ঘটে।"

এই কথা শুনে সকলে এককাট্টা হয়ে গেল।

বলল, "আমরা যাব না। তার চাইতে বাড়িতে থেকে মরাই ভাল। যেভাবেই হোক, মরতে তো আমাদের হবেই।"

বুড়ো শয়তান বলে উঠল, "বোকা! তোমরা সব বোকা! একজন সৈন্য মরতেও পারে, নাও মরতে পারে, কিন্তু তোমরা যদি না যাও তাহলে রাজা আইভান তোমাদের নির্ঘাৎ মেরে ফেলবেন।"

লোকগুলো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বোকা আইভানের কাছে গেল পরামর্শ করতে।

তারা বলল, "একজন সেনাপতি এসে বলছে, আমাদের সবাইকে সৈন্য হতে হবে। সে বলছে, 'তোমরা সৈন্য হয়ে গেলে মরতেও পার আবার না মরতেও পারো, কিন্তু যদি না যাও তাহলে রাজা আইভান তোমাদের নির্ঘাৎ মেরে ফেলবে।' এ কথা কি সত্যি?"

আইভান হেসে বলল, "আমি একা তোমাদের সকলকে মারব কেমন করে? আমি যদি বোকা না হতাম তাহলে ব্যাপারটা তোমাদের বুঝিয়ে দিতে পারতাম; কিন্তু আমি তো নিজেই এতটা বুঝতে পারি না।"

তারা বলল, "তাহলে আমরা সৈন্যদলে যাব না।"

সে বলল, "ঠিক আছে, যেয়ো না।"

সুতরাং সকলে সেনাপতির কাছে গিয়ে নাম লেখাতে আপত্তি জানাল। বুড়ো শয়তানও বুঝল যে এ খেলা চলবে না। সে তখন সেখান থেকে চলে গেল এবং আরসলা-দেশের রাজার সঙ্গে ভাব জমাল।

তাকে বলল, "আমরা যুদ্ধ করে রাজা আইভানের দেশকে জয় করে নেব। সে দেশে টাকা নেই সত্য, কিন্তু আছে প্রচুর ফসল ও গবাদি পশু, আছে আর সব কিছু।"

কাজেই আরসলা-দেশের রাজা যুদ্ধের জন্য তৈরি হলো। বিরাট বাহিনী সাজিয়ে, কামান-বন্দুক নিয়ে সে সীমান্ত অভিমুখে অভিযান করল এবং আইভানের রাজ্যে প্রবেশ করল।

সব লোক আইভানের কাছে এসে বলল, "আরসলা-দেশের রাজা আসছে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।"

আইভান বলল, "ঠিক আছে, আসতে দাও।"

সীমান্ত পার হয়ে আরসলা-দেশের রাজা স্কাউটদের পাঠাল আইভানের সেনাদলকে দেখে আসতে। তারা অনেক খুঁজে খুঁজেও কোথাও কোনও সেনাদল দেখতে পেল না ! যদি কোথাও কোনও সেনাদল এসে পড়ে সেই আশায় তারা অনেক অপেক্ষা করল, কিন্তু কোনও সেনাদলেরই দেখা মিলল না, যুদ্ধ করবার মতো কাউকে পাওয়া গেল না। আরসলা-দেশের রাজা তখন গ্রামগুলোকে অবরোধ করতে সৈন্যদের পাঠিয়ে দিল। সৈন্যরা একটা গ্রামে ঢুকতেই মেয়ে-পুরুষ সব লোক ছুটে বেরিয়ে এসে সৈন্যদের দেখে বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। সৈন্যরা তাদের ফসল ও গবাদি পশু নিয়ে নিতে শুরু করল; আর লোকেরাও তাতেই সায় দিলো, কোনওরকম বাধা দিলো না। সৈন্যরা আরেকটা গ্রামে গেল। সেখানেও ঐ একই জিনিস ঘটল। সারাটা দিন সৈন্যরা এগিয়ে চলল, দ্বিতীয় দিনও কেটে গেল; সর্বত্র সেই একই জিনিস ঘটল। লোকরা তাদের সবকিছু দিলো, কেউ বাধা দিলো না। শুধু সৈন্যদের তাদের সঙ্গে থাকতে আমন্ত্রণ জানাল।

তারা বলল, "আহা বেচারিরা, নিজেদের দেশে তোমাদের জীবন যদি এতই কষ্টের তাহলে সকলে এসে চিরদিনের মতো আমাদের সঙ্গে থাকো না কেন?"

সৈন্যরা গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে এগিয়ে চলল : কোথাও কোনও সৈন্য নেই; লোকজন আছে, নিজেরা খাচ্ছে ও অপরকে খাওয়াচ্ছে; কেউ বাধা দিচ্ছে না, বরং সকলেই সৈনিকদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তাদের সঙ্গে থেকে যেতে, বসবাস করতে। এ কাজ সৈন্যদের কাছে একঘেয়ে হয়ে উঠল। তারা আরসলা-দেশের রাজার কাছে এসে বলল, "এখানে আমরা যুদ্ধ করতে পারছি না, আমাদের অন্য কোথাও নিয়ে চলুন। যুদ্ধ তো ভাল, কিন্তু এ কী হচ্ছে? এ যেন মটরের ঝোল কেটে খাওয়া। এখানে আমরা আর যুদ্ধ করব না।"

আরসলা-দেশের রাজা খুব রেগে গেল; সৈন্যদের হুকুম দিলো : সাবাটা রাজ্য চষে ফেল, গ্রামগুলো ধ্বংস করো, ফসল ও ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দাও, গবাদি পশুকে হত্যা করো। আর আমার হুকুম যদি না মানো, তাহলে তোমাদের সকলেরই প্রাণদণ্ড হবে।

সৈন্যরা ভয় পেয়ে রাজার হুকুমমাফিক কাজ করতে লাগল। তারা বাড়ি-ঘর ও

ফসল জ্বালিয়ে দিলো, গবাদি পশু হত্যা করল। কিন্তু বোকা লোকগুলো তথাপি বাধা দিলো না শুধু কাঁদতে লাগল। বুড়োরা কাঁদল বুড়িরা কাঁদল, যুবক যুবতীরাও কাঁদল।

তারা বলল, "তোমরা আমাদের ক্ষতি করছ কেন? ভাল জিনিসগুলো তোমরা নষ্ট করছ কেন? ওগুলো যদি তোমাদের কাজে লাগে তাহলে নিজেরা নিয়ে নিচ্ছ না কেন?"

শেষ পর্যন্ত সৈন্যরাও এ অবস্থাটা সহ্য করতে পারল না। তারা আরও অগ্রসর হতে অস্বীকার করল সৈন্যরা দল ভেঙে দিয়ে পালিয়ে গেল।

১২

বুড়ো শয়তান আগেই হাল ছেড়ে দিয়েছিল সৈন্যদের সাহায্য নিয়েও সে আইভানের সঙ্গে পেরে উঠল না। কাজেই একজন চৌকস ভদ্রলোক সেজে সে আইভানের রাজ্যে বাস করতে শুরু করল। তারাসের মতো আইভানকেও সে টাকা দিয়ে জয় করতে চাইল।

বলল, 'আমি আপনার কিছু উপকার করতে চাই আপনা[illegible] [illegible] ও বুদ্ধি জোগাতে চাই। আপনার রাজ্যে একটি বাড়ি তৈরি করে [illegible] ব্যবসা [illegible]।'

আইভান বলল 'ঠিক আছে, আপনা[illegible] ইচ্ছে হলে। আমাদের মধ্যে [illegible] করুন।'

পরদিন সকালে [illegible] ভদ্রলোকটি এক[illegible] [illegible] সোনা ও [illegible] [illegible] নিয়ে পাবলিক স্কোয়ারে গিয়ে বলল, '[illegible] সকলেই [illegible] মতো বেঁচে [illegible]। [illegible] করে ভালভাবে বাঁচতে হয় সেটা আমি তোমাদের শিখিয়ে দেব। এই নকশা অনুসারে আমাকে একটা বাড়ি তৈরি করে দাও। তোমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তোমাদের [illegible] [illegible]।' [illegible] সব সোনা। [illegible] দেখাল।

[illegible] সব অবাক হয়ে গেল, তাদের মধ্যে [illegible] প্রচলন ছিল না। তারা জিনিস বিনিময় করত এবং [illegible] শ্রমের দ্বারা [illegible]। [illegible] মোহরগুলি দেখতে লাগল।

[illegible] সুন্দর জিনিস।'

[illegible] বদলে তারা ভদ্রলোকটির কাছে থেকে [illegible] সোনা [illegible] বুড়ো শয়তান [illegible] সোনা। [illegible] সব লোক সোনা [illegible] তারে সব জিনিস দিতে লাগল [illegible] কাজ করে দিতে লাগল

বুড়ো শয়তান তো খুব খুশি [illegible] সে ভাবল, 'এইবার ঠিক পথ ধরেছি। [illegible] মতো এবার এই বোকাটারও সর্বনাশ করব তার [illegible] সব কিনে নেব

কিন্তু বোকারা সব করল কি—সেই সব স্বর্ণমুদ্রা হাতে পেয়ে মেয়েদের গলার হারে পরতে দিলো। মেয়েরা সেগুলি বেণীতে ঝুলিয়ে দিলো। শেষ পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা সেগুলি নিয়ে পথে খেলা করতে লাগল। সকলেরই প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা জমে গেল; তারা সেগুলি নেওয়া বন্ধ করে দিলো। কিন্তু সুন্দর ভদ্রলোকের বাড়ি তখনও অর্ধেকও হয়নি; সারা বছরের মতো ফসল ও গবাদি পশুরও ব্যবস্থা করা হয়নি। কাজেই সে প্রচার করে দিলো যে সে চায় সব লোক এসে তার কাজ করে দিক, গবাদি পশু ও ফসল জমা করে দিক; প্রতিটি জিনিস ও প্রতিটি কাজের জন্য সে আরও অনেক স্বর্ণমুদ্রা দিতে প্রস্তুত।

কিন্তু কেউ কাজ করতে এল না; কোনও জিনিসও এল না। শুধু মাঝে মাঝে দু'একটি ছেলে বা মেয়ে হয়ত স্বর্ণমুদ্রার বদলে একটি ডিম দিয়ে যায়; আর কেউ আসে না, ফলে তার খাওয়াও জোটে না। ক্ষুধায় কাতর হয়ে সুন্দর ভদ্রলোকটি গ্রামের পথে বেরিয়ে পড়ল; দেখা যাক কিছু খাবার কিনতে পারা যায় কি না। এক বাড়িতে ঢুকে একটা মোরগের বদলে সে একটা স্বর্ণমুদ্রা দিতে চাইল, কিন্তু বাড়ির গৃহিণী তা নিতে চাইল না।

বলল, "ও আমার অনেক আছে।"

একটি বিধবার বাড়ি গিয়ে একটা হেরিং-মাছ কেনার জন্য সে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিতে চাইল।

সে বলল, "দেখুন মশাই, ওটা আমি চাই না। আমার তো কোনও ছেলে-মেয়ে নেই যে ওটা নিয়ে খেলা করবে। সৌখীন জিনিস হিসাবে ওরকম তিনটে মুদ্রা আমার বাড়িতেই রেখে দিয়েছি।"

একজন চাষীর কাছ থেকে রুটি কিনতে চেষ্টা করল, কিন্তু সেও টাকা নিতে চাইল না। বলল, "ওটার কোনও দরকার নেই; তবে আপনি যদি 'খৃস্টের নামে' ভিক্ষা চান তো একটু সবুর করুন, আমি গিন্নিকে বলছি আপনাকে একটুকরো রুটি কেটে দেবে।"

সে কথা শুনে শয়তানটা থুথু ফেলে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। খৃস্টের নামে কোনও কিছু পাওয়া তো দূরের কথা, খৃস্টের নাম উচ্চারণ শুনলেই তার বুকের মধ্যে যেন ছুরি বসে যায়।

এইভাবে কোনও রুটিই সে পেল না। প্রত্যেকেরই সোনা আছে, তাই বুড়ো শয়তান যেখানেই যায় টাকার বদলে কেউ তাকে কিছু দিতে চায় না; সকলেই বলে, "হয় অন্য কিছু নিয়ে এস, নয় তো এসে কাজ করো, আর না হয়তো খৃস্টের নামে কিছু ভিক্ষা চাও।"

কিন্তু শয়তানের তো টাকা ছাড়া আর কিছু নেই; কাজ করবার ইচ্ছাও তার নেই; আর "খৃস্টের নামে" কোনও কিছু তো সে নিতেই পারে না। বুড়ো শয়তান ভয়ানক রেগে গেল।

বলল, "আমি তো তোমাদের টাকা দিচ্ছি, এর বেশি তোমরা কি চাও? সোনা দিয়ে তোমরা সব কিছু কিনতে পারো, যেকোনও মজুরকে খাটাতে পারো।" কিন্তু বোকারা কেউ তার কথায় কান দিলো না।

তারা বলল, "না, আমরা টাকা চাই না। আমাদের কাউকে টাকা দিতে হয় না, আমাদের কোনও কর নেই, কাজেই টাকা দিয়ে আমরা কি করব?"

বুড়ো শয়তান না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

বোকা আইভানকে সব কথা বলা হলো। সকলে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, "আমরা কি করব? একজন ভাল ভদ্রলোক এসেছে; সে ভাল খেতে-পরতে চায়, কিন্তু কাজ করতে চায় না, 'খৃস্টের নামে' ভিক্ষাও করে না, শুধু সকলকে স্বর্ণমুদ্রা দিতে চায়। প্রথম প্রথম সে যা চেয়েছে লোকে তাই দিয়েছে; কিন্তু এখন সকলের হাতে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা জমে গেছে, এখন আর কেউ তাকে কিছু দেয় না। তাকে নিয়ে কি করা যায়? অচিরেই সে যে না খেয়ে মারা যাবে।"

আইভান মন দিয়ে শুনল।

বলল, "ঠিক আছে, আমরাই তাকে খাওয়াব। মেষপালকদের মতো সেও পালা করে এক-এক জনের বাড়িতে থাকুক।"

কোনও উপায় নেই; বুড়ো শয়তানকে বাড়ি-বাড়ি ঘুরতেই হলো।

যথাসময়ে আইভানের বাড়িতে যাবার পালা এল। বুড়ো শয়তান খেতে এল; বোবা মেয়েটিও খাবাব তৈরি করে চলেছে।

এর আগে আলসে লোকগুলো তাকে অনেক ঠকিয়েছে; নিজেদের ভাগের কাজ শেষ না করেই আগেভাগে এসে সবটা 'পরিজ' খেয়ে গেছে; তাই সে এখন হাত দেখে ফাঁকিবাজদের ধরে ফেলতে শিখেছে। যাদের হাতে কড়া পড়েছে তাদের সে টেবিলে বসতে দেয়, আর বাকিদের খেতে দেয় উচ্ছিষ্ট এঁটো-কাঁটা।

বুড়ো শয়তান টেবিলে বসতেই বোবা মেয়েটি তাব হাত দুটো তুলে ধরে ভাল করে দেখল—হাতের কোনও জায়গাই শক্ত নয় : দুটি হাতই পবিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, তাতে লম্বা নখ। বোবা মেয়েটি ধমক দিয়ে শয়তানটাকে টেবিল থেকে তুলে দিলো। তখন আইভানের স্ত্রী তাকে বলল, "সুন্দর ভদ্রলোক, আপনি রাগ করবেন না। হাতে কড়া না থাকলে আমার ননদিনী তাকে টেবিলে বসতে দেয না। একটু অপেক্ষা করুন, সকলের খাওযা হয়ে গেলে যা পড়ে থাকবে সেটা আপনি পাবেন।"

রাজার বাড়িতে তাকে শুয়োরের মতো খেতে দেওয়া হবে দেখে বুড়ো শয়তান খুব অসন্তুষ্ট হলো। সে আইভানকে বলল, "প্রত্যেককেই নিজের হাতে কাজ করতে হবে, আপনার রাজ্যের এই আইন খুবই অর্থহীন। আপনার বোকামিই এর আবিষ্কর্তা। মানুষ কি শুধু তার হাত দিয়েই কাজ করে? জ্ঞানী মানুষরা কি দিয়ে কাজ করে বলুন তো?"

আইভান বলল, "আমরা বোকা মানুষ তা কেমন করে জানব? আমরা তো অধিকাংশ কাজই হাত ও পিঠ দিয়েই করে থাকি।"

"তার কারণ আপনারা বোকা! আমি আপনাদের শিখিয়ে দেব কেমন করে মাথা দিয়ে কাজ করতে হয়। তাহলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে হাত দিয়ে কাজ করার চাইতে মাথা দিয়ে কাজ করা অনেক বেশি লাভজনক।"

আইভান অবাক হলো।

বলল, "তাই যদি হয় তাহলে তো আমাদের বোকা বলার কিছুটা অর্থ আছেই।"

তখন বুড়ো শয়তান বলতে লাগল, "তবে মাথা দিয়ে কাজ করাটা সহজ নয়। আমার হাতে কোনও শক্ত জায়গা নেই বলে আপনারা আমাকে কিছুই খেতে দেননি, কিন্তু আপনারা জানেন না যে মাথা দিয়ে কাজ করা আরও শতগুণ বেশি শক্ত। অনেক সময় মাথাটা যেন ভেঙে পড়তে চায়।"

আইভান বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল।

"বন্ধু, তাহলে নিজেকে এত কষ্ট দিচ্ছেন কেন? মাথাটা ভেঙে পড়া কি আরামের ব্যাপার? হাত আর পিঠ দিয়ে সহজভাবে কাজ করাই কি তার চাইতে ভাল নয়?"

কিন্তু শয়তান বলল, "আপনাদের মতো বোকাদের জন্যই এ কাজ আমি করি। আমি যদি নিজেকে কষ্ট না দেই তাহলে যে আপনারা চিরকালই বোকা থেকে যাবেন। কিন্তু আমি মাথা দিয়ে কাজ করেছি বলেই আজ আপনাদের শেখাতে পারছি।"

আইভান বিস্মিত হলো।

বলল, "আমাদের শিখিয়ে দিন। যাতে আমাদের হাতে খিল ধরলে আমরা কিছু সময়ের জন্য মাথাটা ব্যবহার করতে পারি।"

তখন শয়তান কথা দিলো, সে সকলকেই শিখিয়ে দেবে। কাজেই আইভান রাজ্যময় ঘোষণা করে দিলো ঃ একজন ভাল ভদ্রলোক এসেছেন; মাথা দিয়ে কেমন করে কাজ করতে হয় তা তিনি সকলকে শিখিয়ে দেবেন; হাতের চাইতে মাথা দিয়ে অনেক বেশি কাজ করা যায়; এবং সকলেরই এগিয়ে এসে সে সব শিখে নেওয়া উচিত।

এখন আইভানের রাজ্যে একটা খুব উঁচু দুর্গ ছিল; অনেকগুলি সিঁড়ি বেয়ে তার মাথায় উঠতে হয়; দুর্গের চূড়ায় ছিল একটা লণ্ঠন। সকলেই যাতে দেখতে পায় সেজন্য আইভান ভদ্রলোকটিকে সেখানে নিয়ে গেল।

কাজেই দুর্গের চূড়ায় উঠে ভদ্রলোক কথা বলতে শুরু করল, আর তাকে দেখবার জন্য লোক এসে ভিড় করল। তারা ভেবেছিল, হাতের বদলে কেমন করে মাথা দিয়ে কাজ করা যায় সত্যি সত্যি সেটাই সে তাদের দেখাবে। কিন্তু বুড়ো শয়তান কথার জাল বুনে তাদের শুধু বোঝাতে লাগল কাজ না করে কি করে বেঁচে থাকা যায়। লোকদের মাথায় কিছুই ঢুকল না। হাঁ করে তাকিয়ে তারা অনেকক্ষণ ভাবল; তারপর যার যার কাজে চলে গেল।

বুড়ো শয়তান সারাটা দিন দুর্গের উপর দাঁড়িয়ে রইল; দ্বিতীয় দিনও সেই ভাবে কেটে গেল; সারাক্ষণ সে শুধু কথাই বলল। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে থেকে তার ক্ষিধে

পেয়ে গেল, কিন্তু দুর্গের মাথায় তাকে খাবার পৌঁছে দেবার কথা বোকা লোকদের মনেই এল না। তারা ভাবল, সে যখন হাতের চাইতে মাথা দিয়েই ভালভাবে কাজ করতে পারে, তখন সে সহজেই রুটির ব্যবস্থা করে নিতে পারবে।

বুড়ো শয়তান শুধু কথা বলে বলেই আরও একটা দিন সেই দুর্গের চূড়ায় কাটিয়ে দিলো। লোকজনরা কাছে এসে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখল, তারপর চলে গেল।

আইভান জিজ্ঞাসা করল, "ভদ্রলোক কি মাথা দিয়ে কাজ কবতে শুরু করেছে?"

তারা বলল, "এখনও করেনি; এখনও কথার ঝর্ণাই বইযে চলেছে।"

বুড়ো শয়তান আরও একটা দিন দুর্গের উপর দাঁড়িয়ে রইল। ক্রমেই সে এত দুর্বল হয়ে পড়ল যে টলতে টলতে পড়ে গিয়ে লণ্ঠনের একটা থামে তার মাথায় আঘাত লাগল। একজন সেটা দেখতে পেয়ে আইভানের স্ত্রীকে বলল, আর সে দৌড়ে তার স্বামীর কাছে মাঠে চলে গেল।

বলল, "দেখবে এস। ওরা বলছে, ভদ্রলোকটি মাথা দিয়ে কাজ করতে শুরু করেছে।"

আইভান অবাক হয়ে গেল।

"সত্যি নাকি?" বলেই সে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দুর্গের দিকে ছুটল।

যতক্ষণে সে দুর্গে পৌঁছল ততক্ষণে বুড়ো শয়তান ক্ষিধেয় আরও ক্লান্ত হয়ে অনবরত টলে পড়ছে আর থামের গায়ে তার মাথাটা ঠুকে যাচ্ছে। আব ঠিক যে মুহূর্তে আইভান দুর্গের কাছে পৌঁছে গেল তখন শয়তানটা টলতে টলতে পড়ে গেল এবং সিঁড়ির প্রতিটি ধাপে ধপ্-ধপ্ করে ঠোক্কর খেতে খেতে ও মাথা ঠুকে ঠুকে প্রতিটি ধাপ গুণতে গুণতে সিঁড়ির একেবারে নিচে গিয়ে পড়ল।

আইভান বলল, "আরে! ভাল ভদ্রলোক তো ঠিকই বলেছিল যে 'অনেক সময় মাথাটা একেবারে ভেঙে যায়।' এ তো দেখছি ছড়ে যাওয়াব চাইতেও খারাপ; এ ধরনের কাজের পরে তো মাথাটা ফুলে উঠবেই।"

বুড়ো শযতান সিঁড়ির নিচে গড়িয়ে পড়তেই মাটিতে তাব মাথাটা ঠুকে গেল। সে কতটা কাজ করেছে দেখবার জন্য আইভান তাব কাছে এগিয়ে যাবাব উদ্যোগ করতেই—হঠাৎ মাটি ফাঁক হয়ে গেল আর বুড়ো শয়তান তার ভিতব সেঁধিয়ে গেল। পড়ে রইল শুধু একটা গর্ত।

আইভান মাথা চুলকোতে লাগল।

বলল, "কী সব বাজে ব্যাপার! এও নির্ঘাৎ আর একটা শয়তান! কী লাফ দিলো! এটা নিশ্চয় সেগুলোর বাপ!"

আইভান এখনও বেঁচে আছে। সকলেই তার রাজ্যে গিয়ে ভিড় করেছে। তার নিজের ভাইরাও এসে তার সঙ্গেই বাস করছে, আর সে তাদেরও খাওয়াচ্ছে। যে কেউ এসে বলে, "আমাকে খেতে দাও!" তাকেই আইভান বলে, "ঠিক আছে। আমাদেরই সঙ্গে থাক; সব কিছুই প্রচুর পরিমাণে আমাদের আছে।"

শুধু তার রাজ্যে একটি বিশেষ প্রথা আছে : যাদের হাতে কড়া আছে তারা টেবিলে বসবে, আর যাদের নেই তারা অন্যারা যা ফেলে যায় তাই খাবে।

১৮৮৫

বড়র চাইতে ছোটর বুদ্ধি বেশি

Little girls wiser than men

ইস্টারের গোড়ার দিক। স্লেজ চালানোর মরশুম সবে শেষ হয়েছে। উঠোনে তখনও বরফ জমে আছে, কিন্তু গ্রামের রাস্তা দিয়ে জলের স্রোত বয়ে চলেছে।

দুটো আলাদা বাড়ির দুটি ছোট মেয়ের সঙ্গে গলিতে দেখা হয়ে গেল। গোলাবাড়িগুলো থেকে বয়ে আসা নোংরা জল পড়ে গলিটায় একটা বড় ডোবার মতো হয়েছে। একটি মেয়ে খুবই ছোট, অপরটি একটু বড়। মেয়েরা দু'জনকেই নতুন ফ্রক পরিয়ে দিয়েছে। ছোটটি পরেছে নীল ফ্রক, বড়টি পরেছে হলুদ ছাপা ফ্রক; দু'জনেরই মাথায় লাল রুমাল বাঁধা। গির্জা থেকে ফিরবার পথে এইমাত্র তাদের দেখা হয়েছে। প্রথমেই দু'জন দু'জনকে নতুন জামা দেখাল; তারপর খেলতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পরেই তাদের জলে নামবার শখ হলো। ছোটটি জুতো-জামা সমেতই ডোবার মধ্যে নামতে যাচ্ছিল, বড়টি তাকে বাধা দিলো।

বলল, "ওখানে যেয়ো না মলাশা, তোমার মা বকবে। আমার জুতো-মোজা খুলে ফেলছি, তুমিও জুতো মোজা খুলে ফেলো।"

দু'জনে তাই করল; তারপর স্কার্টের কোনা তুলে ধরে ডোবার ভিতর দিয়ে পরস্পরের দিকে এগোতে লাগল। জলে মলাশা র গোড়ালি ভিজে গেল। সে বলে উঠল

"অনেক জল অকুল্যা, আমার ভয় করছে।"

অপরটি জবাব দিলো, "চলে এস। কোনও ভয় নেই। জল ওর বেশি উঠবে না।"

দু'জনে কাছাকাছি হলে অকুল্যা বলল, "দেখো মলাশা, জল ছিটিও না। সাবধানে হাঁটো।"

বলতে না বলতেই মলাশা ধপ করে পড়ে গেল, আর জল ছিটকে উঠে অকুল্যার ফ্রক ভিজিয়ে দিলো। শুধু ফ্রক না, জল ছিটকে অকুল্যার নাকে চোখেও লাগল। ফ্রকে দাগ লেগেছে দেখে অকুল্যা রেগে মলাশাকে মারতে ছুটল। ওদিকে মলাশাও ভয় পেয়ে বাড়িতে পালিয়ে যাবার জন্য ডোবার ভিতর দিয়েই ছুটতে লাগল। ঠিক সেই সময় অকুল্যা-র মা সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। মেয়ের স্কার্টে কাদা লেগেছে, আস্তিন নোংরা হয়েছে দেখে মা বলে উঠল, "এই যে, দুষ্টু মেয়ে, কি করছিলে?"

"মলাশা ইচ্ছে করে করেছে," মেয়েটি জবাব দিলো।

এ-কথা শুনে অকুল্যার মা মলাশাকে ধরে তার গর্দানের উপর আঘাত করল। মলাশা এমনভাবে চেঁচাতে লাগল যে সারা পথের লোক তা শুনতে পেল। তার মাও বেরিয়ে এল।

"আমার মেয়েকে ঠেঙাচ্ছ কেন?" বলে সে প্রতিবেশিনীকে বকতে শুরু করল। এক কথা দুই কথায় দু'জনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া লেগে গেল। পুরুষরা সব বেরিয়ে এল; পথে লোক জমে গেল; সকলেই চিৎকার শুরু করে দিলো; কেউ কারও কথায় কান দিলো না। সকলেই ঝগড়ায় মেতে উঠল; একজন আরেকজনকে ধাক্কা দিলো: তাই নিয়ে হাতাহাতি মারামারি হবার যোগাড়, এমন সময় অকুল্যার বুড়ি ঠাকুরমা মাঝখানে পড়ে তাদের শান্ত করবার চেষ্টা করল।

"তোমরা সব ভেবেছ কি? এ রকম ব্যবহার করা কি উচিত? আর আজকের মতো দিনে! এখন তো আনন্দ করবার সময়, এ রকম বোকামি করার সময় নয়।"

বুড়ির কথায় কেউ কান দিলো না। তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় আর কি। আর অকুল্যা ও মলাশা না থাকলে সে বুড়ি কিছুতেই লোকগুলোকে শান্ত করতে পারত না। মেয়েরা যখন খিস্তি খেউড় করছিল তখন অকুল্যা ফ্রকের কাদা মুছে ফেলে আবার ডোবায় নেমে গেল। একটা পাথর তুলে নিয়ে সে এমনভাবে একটা নালি কেটে দিলো যাতে ডোবার জমা জলটা বেরিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়তে পারে। তা দেখে মলাশাও একটুকরো কাঠ হাতে নিয়ে নালি কাটতে অকুল্যাকে সাহায্য করতে লাগল। লোকগুলোর মধ্যে ঝগড়া বাধবার উপক্রম হতেই মেয়েদের কাটা নালি দিয়ে জলের স্রোত গিয়ে বড় রাস্তায় ঠিক সেইখানে পড়তে লাগল যেখানে বুড়িটি লোকগুলোকে শান্ত করতে চেষ্টা করছিল। জলের স্রোতের দু'দিক ধরে দৌড়তে দৌড়তে মেয়ে দুটিও সেখানে গিয়ে হাজির হলো।

"ওটাকে ধরো মলাশা! ওটাকে ধরো!" অকুল্যা চেঁচিয়ে বলল, হাসির দমকে মলাশা কথাই বলতে পারল না।

কাঠের টুকরোটাও তাদের সঙ্গে সঙ্গে জলের স্রোতে ভেসে চলেছে দেখে মেয়ে দুটি মহা আনন্দে দৌড়তে দৌড়তে একেবারে লোকগুলির জটলার মধ্যে গিয়ে হাজির হলো। তাদের দেখতে পেয়ে বুড়ি লোকগুলোকে ডেকে বলল,

"তোমাদের লজ্জা করে না? মেয়ে দুটো সব ভুলে গিয়ে আবার মনের সুখে খেলা করছে, আর তোমরা তাদের হয়ে লড়াই শুরু করেছ? ছোট্ট সোনারা আমার! ওরা তো তোমাদের চাইতে বেশি বুদ্ধি রাখে!"

ছোট মেয়ে দুটিকে দেখে সকলেই লজ্জা পেল; সকলেই হাসতে হাসতে যার যার বাড়ি চলে গেল।

"তোমাদের যদি পরিবর্তন না হয়, তোমরা যদি ছোট শিশুদের মতো না হতে পারো, তাহলে কোনওক্রমেই তোমরা স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।"

১৮৮৫

ইলিয়াস

Elias

উফা প্রদেশে ইলিয়াস নামে একজন বাস্‌কির বাস করত।

ইলিয়াসের বিয়ের এক বছর পরে যখন তার বাবা মারা গেল তখন সে না ধনী, না দরিদ্র। সাতটা ঘোটকী, দুটো গরু আর কুড়িটা ভেড়া—এই তার যা কিছু বিষয়-সম্পত্তি। কিন্তু ইলিয়াসের সুব্যবস্থায় তার সম্পত্তি কিছু কিছু করে বাড়তে লাগল। সে আর তার স্ত্রী সকলের আগে ঘুম থেকে ওঠে আর সকলের পরে ঘুমুতে যায়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করে। ফলে প্রতি বছরই তার অবস্থার উন্নতি হতে লাগল।

এইভাবে পঁয়ত্রিশ বছর পরিশ্রম করে সে প্রচুর সম্পত্তি করে ফেলল। তখন তার দুশো ঘোড়া, দেড়শো গরু-মোষ আর বারোশো ভেড়া। ভাড়াটে মজুররা তার গরু-ঘোড়ার দেখাশোনা করে, ভাড়াটে মজুরনীরা দুধ দোয়, কুমিস, মাখন আর পনীর তৈরি করে। মোট কথা, ইলিয়াসের তখন খুব বোল-বোলাও, পাশেপাশের সকলেই তাকে ঈর্ষা করে। বলে : 'ইলিয়াস তো ভাগ্যবান পুরুষ; কোনও কিছুরই অভাব নেই; ওর তো মরবারই দরকার নেই।'

ক্রমে ভাল ভাল লোকের সঙ্গে তার পরিচয় হতে লাগল। দূর-দূরান্তর থেকে অতিথিরা তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। সকলকেই স্বাগত জানিয়ে সে তাদের ভোজ্য-পানীয় দিয়ে সেবা করে। যে যখনই আসুক, কুমিস, চা, সরবত আর মাংস সব সময়েই হাজির। অতিথি এলে একটা বা দুটো ভেড়া মারা হয়; সংখ্যায় বেশি হলে ঘোটকীও মারা হয়।

ইলিয়াসেব দুই ছেলে, এক মেয়ে। সকলেরই বিয়ে হয়ে গেছে। ইলিয়াস যখন গরিব ছিল, ছেলেরা তার সঙ্গে কাজ করত, গরু-ভেড়া চরাত। কিন্তু বড়লোক হবার পরে তারা আয়েসী হয়ে উঠল। একজন তো মদই খেতে শুরু করল। বড়টি এক মারামারিতে পড়ে মারা গেল। ছোটটি এমন এক ঝগড়াটে বউ বিয়ে করল যে তারা বাপের আদেশই অমান্য করতে শুরু করল। ফলে ইলিয়াসের বাড়ি থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হলো।

ইলিয়াস তাকে একটা বাড়ি দিলো, কিছু গরু-ঘোড়াও দিলো। ফলে ইলিয়াসের সম্পত্তিতে টান পড়ল। তারপরেই ইলিয়াসের ভেড়ার পালে মড়ক লেগে অনেকগুলো মরে গেল। তার পরের বছর দেখা দিলো দুর্ভিক্ষ। খড় পাওয়া গেল না একেবারে। ফলে সে-বছর শীতকালে অনেক গরু-মোষ না খেয়ে মরল। তারপর

'কিরবিজ'রা তাব সবচাইতে ভাল ঘোড়াগুলো চুরি করে নিয়ে গেল। ইলিযাসের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ল। যত তার অবস্থা পড়তে লাগল ততই তার শরীরের জোরও কমতে লাগল। এমনি করে সত্তর বছর বয়সে ইলিয়াস বাধ্য হয়ে তাব পশমের কোট, কম্বল, ঘোড়ার জিন, তাঁবু এবং সবশেষে গৃহপালিত পশুগুলোকে বিক্রি করে দিয়ে দুর্দশার একেবারে চরমে নেমে গেল। আসল অবস্থা বুঝে উঠবাব আগেই সে একেবারে সর্বহারা হয়ে পড়ল। ফলে বৃদ্ধ বযসে স্বামী-স্ত্রীকে অজানা লোকের বাড়িতে বাস করে, তাদের কাজ করে খেতে হতো। সম্বলের মধ্যে রইল শুধু কাঁধে একটা বোঁচকা—তাতে ছিল একটা লোমের তৈরি কোট, টুপি, জুতো আব বুট, আর তার বৃদ্ধা স্ত্রী শাম-শেমাগি। বিতাড়িত পুত্র অনেক দূব দেশে চলে গেছে, মেয়েটিও মারা গেছে। বৃদ্ধ দম্পতিকে সাহায্য করবার তখন কেউ নেই।

মহম্মদ শা নামে এক প্রতিবেশীর করুণা হলো বুড়ো-বুড়ির জন্য। সে নিজে ধনীও নয়, গরীবও নয়, তবে থাকত সুখে, আর লোকও ভাল। ইলিয়াসের অতিথিবৎসলতার কথা স্মরণ করে তার খুব দুঃখ হলো। বলল,

"ইলিয়াস, তুমি আমার বাড়ি এসে আমার সঙ্গে থাকো। বুড়িকেও নিয়ে এসো। যতটা ক্ষমতায় কুলোয় গ্রীষ্মে আমার তরমুজের ক্ষেতে কাজ করবে আর শীতকালে গরু-ঘোড়াগুলোকে খাওয়াবে। শাম-শেমাগিও ঘোটকীগুলোকে দুইতে পারবে, কুমিস তৈরি করতে পারবে। আমি তোমাদের দু'জনেরই খাওয়া-পরা দেব। এছাড়া যদি কখনও কিছু লাগে, বলবে, তাও দেব।"

ইলিয়াস প্রতিবেশীকে ধন্যবাদ দিলো। সে আর তার স্ত্রী মহম্মদ শার বাড়িতে ভাড়াটে মজুরের মতো কাজ করে খেতে লাগল। প্রথমে বেশ কষ্ট হতো, কিন্তু ক্রমে সব সয়ে গেল। যতটা পারত কাজ করত আর থাকত।

বুড়ো-বুড়িকে রেখে মহম্মদ শারও লাভই হলো, কাবণ নিজেরা একদিন মনিব ছিল বলে সব কাজই তারা ভালভাবে করতে পারত। তাছাড়া তাবা অলস নয়, সাধ্যমতো কাজকর্ম করত। তবু এই সম্পন্ন মানুষ দুটির দুরবস্থা দেখে মহম্মদ শার দুঃখ হতো।

একদিন মহম্মদ শার একদল আত্মীয় অনেক দূর থেকে এসে তার বাড়িতে অতিথি হলো। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মোল্লা। মহম্মদ শা ইলিয়াসকে একটা ভেড়া এনে মারতে বলল। ইলিয়াস তার চামড়া ছাড়িয়ে, সেদ্ধ করে অতিথিদের কাছে পাঠিয়ে দিলো। অতিথিরা খাওয়া-দাওয়া করল, চা খেল, তারপর কুমিস-এ হাত দিলো। মেঝেয় কম্বলের উপরে পাতা কুশনে গৃহস্বামীর সঙ্গে বসে অতিথিরা বাটি থেকে কুমিস পান করতে করতে গল্প করছিল। এমন সময় কাজ শেষ করে ইলিয়াস দরজার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখতে পেয়ে মহম্মদ শা অতিথিদেব বলল,

"দরজার পাশ দিয়ে যে বুড়ো মানুষটি চলে গেল তাকে আপনারা লক্ষ্য করেছেন কি?"

একজন বলল, "আমি তাকে দেখিনি। কিন্তু ওর মধ্যে বিশেষ করে দেখবার কিছু আছে নাকি?"

"বিশেষত্ব এই যে, একসময় সে ও তল্লাটের সবচেয়ে ধনী ছিল। নাম ইলিয়াস। নামটা আপনারা হয়ত শুনে থাকবেন।"

অতিথি বলল, "নিশ্চয়। না শোনবার জো কী? লোকটিকে কখনও চোখে দেখিনি, কিন্তু তার সুনাম ছড়িয়েছিল বহুদূর।"

"অথচ আজ তার কিছু নেই। আমার কাছে মজুরের মতো থাকে, আর তার স্ত্রী আমার ঘোটকীদের দুধ দোয়।"

অতিথি সবিস্ময়ে জিভ দিয়ে চুক্-চুক্ শব্দ করল। ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল, "সত্যি, ভাগ্য যেন চাকার মতো ঘোরে; একজন উপরে ওঠে তো আর একজন তলায় পড়ে যায়। আহা, বলুন তো, বুড়ো লোকটা এখন নিশ্চয়ই খুব বিষণ্ণ?"

"কী জানি, খুব চুপচাপ আর শান্ত হয়ে থাকে। কাজও করে ভাল।"

অতিথি বলল, "লোকটির সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি কি? জীবন সম্পর্কে ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই আমি।"

গৃহস্বামী বলল, "নিশ্চয়ই পারেন।" তারপর তাঁবুর বাইরে গিয়ে ডাকল : "বাবাই, একবার এদিকে এস তো! তোমার বুড়িকেও সঙ্গে নিয়ে এস। আমাদের সঙ্গে একটু কুমিস পান করবে।"

ইলিয়াস আর তার স্ত্রী এল। ইলিয়াস অতিথি ও গৃহস্বামীকে নমস্কার করল, প্রার্থনা করল, তারপর দরজার পাশে এক কোণে বসল। তার স্ত্রী পর্দার আড়ালে গিয়ে কর্ত্রীর পাশে বসল।

ইলিয়াসকে এক বাটি কুমিস দেওয়া হলো। সে আবার অতিথি ও গৃহস্বামীকে মাথা নিচু করে নমস্কার করল এবং একটু খেয়ে বাকিটা নামিয়ে রাখল।

অতিথি তাকে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা বাবাই, আমাদের দেখে তোমার অতীত জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির কথা স্মরণ করে এবং এখনকার দুরবস্থার কথা ভেবে কি খুব কষ্ট হচ্ছে?"

ইলিয়াস হেসে বলল, "সুখ-দুঃখের কথা যদি বলি, আপনারা হয়ত আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। বরং আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি মেয়েমানুষ, তাঁর মনেও যা মুখেও তাই। এ বিষয়ে তিনিই পুরো সত্য বলতে পারবেন।"

অতিথি তখন পর্দার দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা ঠাক্‌মা, আগেকার সুখ আর এখনকার দুঃখ সম্পর্কে তোমার মনের কথাটা বলো তো!"

পর্দার আড়াল থেকে শাম-শেমাগি বলতে লাগল :"এই হলো আমার মনের কথা : পঞ্চাশ বছর এই বুড়ো আর আমি একত্র বাস করেছি, সুখ খুঁজেছি; কিন্তু কখনও পাইনি। আর আজ এখানে এই আমাদের দ্বিতীয় বছর, যখন আমাদের কিছুই

নেই, যখন আমরা ভাড়াটে মানুষের মতো বেঁচে আছি, তখন আমরা পেয়েছি সত্যিকাবের সুখ; আজ আর কিছুই চাই না।"

অতিথিরা বিস্মিত। গৃহস্বামীও বিস্মিত। সে উঠে দাঁড়াল। পর্দা সরিয়ে বুড়ির দিকে তাকাল। দুই হাত ভেঙে বসে সে স্বামীর দিকে চেয়ে হাসছে। স্বামীও হাসছে।

বুড়ি আবার কথা বলল : "আমি সত্য কথাই বলছি, তামাশা করছি না। অর্ধ-শতাব্দী ধরে আমরা সুখ খুঁজেছি; যতদিন ধনী ছিলাম, কখনও সুখ পাইনি। কিন্তু আজ এমন সুখের সন্ধান আমরা পেয়েছি যে আর কিছুই আমরা চাই না।"

"কিন্তু এখন কিসে তোমাদের সুখ হচ্ছে?"

"বলছি। যখন ধনী ছিলাম, বুড়োর বা আমার এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি ছিল না,—কথা বলবার সময় নেই। অন্তরের কথা ভাববার সময় নেই, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবার সময় নেই। দুশ্চিন্তারও অন্ত ছিল না। হয়ত অতিথিরা এলেন—এক দুশ্চিন্তা ঃ কাকে কী খেতে দিই, কী উপহার দিই যাতে লোকে নিন্দা না করে। আবার অতিথিরা চলে গেলে মজুরদের দিকে নজর দিতে হয়; তারা যেমন কম খেটে বেশি খেতেই ব্যস্ত, তেমনি আমরাও নিজেদের স্বার্থে তাদের উপর কড়া নজর রাখি,—সেও তো পাপ। অন্যদিকে দুশ্চিন্তা—এই বুঝি নেকড়েতে ঘোড়াব বাচ্চা বা গরুর বাছুরটাকে নিয়ে গেল। কিংবা চোর এসে ঘোড়াগুলোই নিয়ে সরে পড়ল। রাতে ঘুমুতে গেলাম, কিন্তু ঘুমুবার উপায় নেই, মনে দুশ্চিন্তা—ভেড়ী বুঝি ছানাগুলোকে চেপে মেরে ফেলল। ফলে সারারাত ঘুমই ছিল না। একটা দুশ্চিন্তা পেরোতেই আর একটা এসে মাথা চাড়া দিতো,—শীতের জন্য যথেষ্ট খড় মজুত আছে তো! এ ছাড়া বুড়োর সঙ্গে মতবিরোধ ছিল; সে হয়ত বলল এটা এভাবে করা হোক, আমি বললাম অন্যরকম। ফলে ঝগড়া। সেও তো পাপ। কাজেই এক দুশ্চিন্তা থেকে আর এক দুশ্চিন্তায়, এক পাপ থেকে আর এক পাপেই দিন কাটত, সুখী জীবন কাকে বলে কোনওদিন বুঝিনি।"

"আর এখন?"

"এখন বুড়ো আর আমি একসঙ্গে সকালে উঠি, দুটো সুখ-শান্তির কথা বলি। ঝগড়াও কিছু নেই, দুশ্চিন্তাও কিছু নেই,—আমাদের একমাত্র কাজ প্রভুর সেবা করা। যতটা খাটতে পাবি স্বেচ্ছায়ই খাটি, কাজেই প্রভুব কাজে আমাদের লাভ বই লোকসান নেই। বাড়িতে এলেই খাবার ও কুমিস পাই। শীতকালে গরম হবার জন্য লোমের কোট আছে, জ্বালানি আছে। আত্মার কথা আলোচনা করবার বা ভাববার মতো সময় আছে, সময় আছে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবার। পঞ্চাশ বছর ধরে সুখ খুঁজে খুঁজে এতদিনে পেয়েছি।"

অতিথিরা হেসে উঠল। কিন্তু ইলিয়াস বলল, "বন্ধুগণ, হাসবেন না। এটা তামাশা নয়। এটাই মানুষের জীবন, আমার স্ত্রী আর আমি অবুঝ ছিলাম, তাই সম্পত্তি হারিয়ে

কেঁদেছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের কাছে সত্যকে উন্মুক্ত করেছেন। আর সে কথা যে আমরা আপনাদের বললাম তা ফূর্তির জন্য নয়, আপনাদের কল্যাণের জন্য।"

তখন মোল্লা বললেন, "এটা খুবই জ্ঞানের কথা। ইলিয়াস যা বলল সবই সত্য, এবং পবিত্র গ্রন্থে লেখা আছে।"

শুনে অতিথিরা ভাবতে বসল।

১৮৮৬

আইভান ইল্‌য়িচ-এর মৃত্যু

The Death of Ivan ilyich

১

মেল্‌ভিন্‌স্কি মামলার শুনানির বিরতির সময় বিচারক পরিষদের সদস্যগণ ও সরকারী উকিল নিজে আদালতের বড় বাড়িটার ভিতরে আইভান ইয়েগরভিচ শেবেক-এর খাস কামরায় একত্রিত হয়ে ক্রাসভ্‌স্কি মামলা নিয়ে আলোচনা করছিল। ফিয়দর ভাসিলীভিচ সরবে জানাল যে ঐ মামলা এই আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। ইয়েগর আইভানভিচ নিজের মত প্রকাশের জন্য উঠে দাঁড়াল; কিন্তু পিয়ত্‌ব আইভানভিচ প্রথম থেকেই চুপ করে ছিল, এবারও এ ব্যাপারে কোনও আগ্রহ প্রকাশ করল না, বরং সদ্য আনা সংবাদপত্রের পাতায় মনোনিবেশ করল।

"ভদ্রমহোদয়গণ!" সে বলল, "আইভান ইল্‌য়িচ মারা গেছেন!"

"অমন কথা বলবেন না!"

"এই তো রয়েছে, পড়ে দেখুন". ভিজে-ভিজে গন্ধমাখা তাজা খবরের কাগজখানা ফিয়দর-এর হাতে দিয়ে সে বলল।

কালো রেখার মধ্যে ছাপা হয়েছে : "প্রাস্কোভিয়া ফিয়োদরভ্‌না গলোভিন আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে তাঁর প্রিয় স্বামী 'কোর্ট অব্ জাস্টিস'-এর সদস্য আইভান ইল্‌য়িচ গলোভিন-এর বন্ধু ও আত্মীয়জনকে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ জানাচ্ছেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তিনি পরলোকগমন করেছেন। বৃহস্পতিবার বেলা একটায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে।"

আইভান ইল্‌য়িচ সমবেত ভদ্রজনদের সহকর্মী ছিল। সকলেই তাকে পছন্দ করত। কয়েক সপ্তাহ আগে সে অসুস্থ হয়; বলা হয়. তার রোগ দুরারোগ্য। তার পদটা শূন্যই রাখা হয়েছিল; সকলে ভেবেছিল তার মৃত্যু হলে আলেক্সয়ীভ তার কাজটা পাবে, এবং ভিনিকভ বা শ্‌তাবেল আলেক্সয়ীভ-এর স্থলাভিষিক্ত হবে। সুতরাং আইভান

ইল্‌য়িচ-এর মৃত্যুসংবাদ শুনবার পরে সমবেত প্রত্যেকটি ভদ্রলোকের প্রথম চিন্তাই হলো, এই মৃত্যুর ফলে নিজেদের বা বন্ধুবান্ধবদের চাকরির ক্ষেত্রে বদলি বা উন্নতিব অবস্থাটা কি দাঁড়াবে।

ফিয়দর ভাসিলীভিচ ভাবল, "শ্‌তাবেল বা ভিনিকভ-এর স্থানটা এবার আমি নিশ্চয় পাব। অনেক আগেই এটা আমাকে দেওয়া হবে বলে কথা দেওয়া হয়েছিল; আর এই পদোন্নতির মানেই অফিস পবিচালনার দরুন অনুদান ছাড়াও আটশ' রুবল অতিরিক্ত উপার্জন।"

পিয়তর আইভানভিচ ভাবল, "আমার শ্যালক যাতে কাল্‌গা থেকে বদলি হতে পারে তার জন্য আমাকে এখনই দরখাস্ত কবতে হবে। আমার স্ত্রী খুব খুশি হবে। তার পরিবারের জন্য আমি কখনও কিছু করিনি, এ কথা সে আর বলতে পারবে না।"

পিয়তর আইভানভিচ মুখে বলল, "তিনি যে আর শয্যা ছেড়ে উঠতে পাববেন না সেটা আমার মনেই হয়েছিল! আমি দুঃখিত!"

"কিন্তু তার আসলে হয়েছিলটা কি?"

"ডাক্তাররা ঠিক ধরতে পারেনি। তার মানে, রোগ তারা ধবেছিল, তবে আলাদা আলাদা। আমি যখন তাঁকে শেষ দেখতে গিয়েছিলাম তখন কিন্তু মনে হয়েছিল তিনি সেরে উঠবেন।"

"দেখুন, ছুটিব পরে আমাব আর তার সঙ্গে দেখা করাই হযনি। অবশ্য যাবাব ইচ্ছা খুবই ছিল।"

"তাঁর কোনও সম্পত্তি ছিল কি?"

"মনে হয় তার স্ত্রীর সামান্য কিছু আছে। তবে সে খুবই যৎকিঞ্চিৎ।"

"হ্যাঁ, অনেকটা পথ গিয়ে তবে দেখা করতে হবে। বড্ড বেশি দূরে তারা থাকেন।"

"বলুন যে আপনার বাড়ি থেকে অনেকটা পথ। আপনাব আস্তানা থেকে তো সব জায়গাই অনেক দূরের পথ।"

শেবেক-এর দিকে তাকিয়ে পিয়তর আইভানভিচ বলল, "এই দেখুন আমি যে নদীর ওপারে থাকি সেটা তিনি কিছুতেই ক্ষমা কবতে পারেন না।" তারপর শহবের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে কোথায় কত বেশি দূরত্ব সে বিষয়ে আলোচনা করতে করতে তারা আদালত-কক্ষে ফিরে গেল।

এই মৃত্যুর ফলে চাকরিক্ষেত্রে রদ-বদল ও উন্নতির আলোচনা ছাড়াও একজন ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিতজনের মৃত্যুর সংবাদে সাধারণত যা হয়ে থাকে এক্ষেত্রেও তাই হলো ঃ সকলের মনেই একই অনুভূতি জাগল যে "তিনি মারা গেছেন, আমি নই।"

প্রত্যেকেই ভাবতে লাগল বা অনুভব করল, "ভাবুন তো! তিনি মারা গেছেন কিন্তু আমি এখানে বহাল তবিয়তেই আছি।' আইভান ইল্‌য়িচ-এব সঙ্গে যারা বেশি

ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, যারা তার তথাকথিত বন্ধু, তাদের মনে আরও একটা ভাবনা দেখা দিলো যে এখনই তাদের কতকগুলি অতীব ক্লান্তিকর সামাজিক কর্তব্য পালন করতে হবে—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে হবে এবং বিধবাটির সঙ্গে দেখা করে শোক জানাতে হবে।

প্রয়াত সহকর্মীর সঙ্গে সবচাইতে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিল ফিযদর ভাসিলীভিচ ও পিয়তর আইভানভিচ।

পিযতর আইভানভিচ ছিল তার আইন-বিদ্যালয়ের সতীর্থ এবং আইভান ইল্যিচ-এর প্রতি সে কৃতজ্ঞ বোধ করত।

খাবার সময় স্ত্রীকে আইভান ইল্যিচ-এর মৃত্যু-সংবাদ ও তার ভাইয়ের বদলির সম্ভাবনার কথা জানিয়ে পিয়তর আইভানভিচ একটু ঘুমিয়ে নেবার জন্য শুয়ে না পড়ে ফ্রক-কোটটা গায়ে চড়িয়ে আইভান ইল্যিচ-এর বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

আইভান ইল্যিচ-এর ফ্ল্যাটের সামনের ফটকেই সে একটা গাড়ি ও দুটো ভাড়াটে ঘোড়া দেখতে পেল। ঢোকার মুখেই সিঁড়ির নিচে হাট-স্ট্যান্ডের পাশেই সদ্য পালিশকরা একটা শবাধারের ঢাকনা দেয়ালের গায়ে দাঁড় করানো ছিল। দুটি মহিলা তাদের জোব্বা খুলে রাখছিল। তাদের একজনকে সে চেনে, আইভান ইল্যিচ-এর বোন; অপর মহিলাটি তার অপরিচিত। পিয়তর আইভানভিচ-এর সহকর্মী শ্ভার্ত্স্ নিচে নেমে আসছিল; সিঁড়ির উপর থেকেই আগন্তুককে দেখতে পেয়ে সে দাঁড়িয়ে তার দিকে চোখ টিপল, যেন বলতে চাইল : "আইভান ইলয়িচ সব গোলমাল পাকিয়ে রেখেছে, আপনার-আমার কথা অবশ্য আলাদা।"

শ্ভার্ত্স্-এর মুখের ইংরেজসুলভ গোঁফ আর ফ্রক-কোট পরা কৃশ শরীরের জন্য তাকে সব সময়ই পরিচ্ছন্ন ও গম্ভীর দেখায়। শ্ভার্ত্স্-এর আমুদে স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত এই গাম্ভীর্য এখানে বিশেষভাবে বেমানান লাগছিল বলে পিয়তর আইভানভিচ-এর মনে হলো।

মহিলাদ্বয়কে তার আগে উঠে যেতে দিয়ে পিয়তর আইভানভিচ ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। শ্ভার্ত্স্ নিচে না নেমে সিঁড়ির মাথায়ই অপেক্ষা করে রইল। কেন যে অপেক্ষা করে আছে পিয়তর আইভানভিচ তা জানে; সেদিন সন্ধ্যায় তাসের "স্ক্রু" খেলার আসরটা কোথায় বসবে সেটাই সে তার সঙ্গে ঠিক করে নিতে চায়। মহিলা দুটি বিধবার ঘরের দিকে চলে গেল; আর শ্ভার্ত্স্ ঠোঁট দুটি গম্ভীরভাবে চেপে ধরে, দুই চোখ নাচিয়ে, ভুরু দুটিকে বেঁকিয়ে যে ঘরে মৃতদেহটি রয়েছে সেইদিকে পিযতর আইভানভিচ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

এ সব ক্ষেত্রে সকলেরই যেরকম হয়ে থাকে পিযতর আইভানভিচও সেইরকম সেখানে গিয়ে কি করতে হবে না জেনেই ঘরের ভিতর ঢুকল। শুধু একটা জিনিস সে ঠিকই জানে—এ সব ক্ষেত্রে ক্রুশ-চিহ্ন করতে কখনও ভুল হওয়া উচিত নয়। কিন্তু ক্রুশ-চিহ্ন করবার সময় মাথা নিচু করা দরকার কি না ঠিক জানা না থাকায় সে

একটা মাঝামাঝি পথ বেছে নিল। ঘরে ঢুকে সে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল এবং মাথাটা খানিকটা নোয়ালো। সেই অবস্থায় যতটা সম্ভব হাত ও মুখ ঘুরিয়ে সে ঘরের চারদিকটা দেখে নিল। দুটি যুবক ক্রুশ-চিহ্ন শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে; তাদের মধ্যে একজন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। হয়ত কোনও ভাইপো। একটি বৃদ্ধা নিশ্চল দাঁড়িয়েছিল, আর একটি মহিলা অদ্ভুতভাবে ভুরু দুটি তুলে তাব কানে কানে কি যেন বলছিল। ফ্রক কোট গায়ে একজন ডিয়েকন এমন ভঙ্গি করে উচ্চৈঃস্বরে একটা কিছু পড়ছিল যাতে মনে হয় যে তার কথার কোনওরকম প্রতিবাদ করাই চলতে পারে না। গেরাসিম নামক একটি তরুণ চাষী এখানে পরিচারকের কাজ করত; আস্তে আস্তে পা ফেলে পিয়তর আইভানভিচ-এর সামনে এসে সে মেঝের উপব কি যেন ছিটিয়ে দিতে লাগল। সেটা চোখে পড়তেই বাসি মরার একটা হাল্কা গন্ধ পিয়তর আইভানভিচ-এর নাকে লাগল। আইভান ইল্‌য়িচকে যখন শেষ দেখতে এসেছিল তখন পিয়তর আইভানভিচ্ এই চাষীটিকে তার ঘরে দেখেছিল; সে তখন রোগীর সেবা করত, আর আইভান ইল্‌য়িচ তাকে বিশেষ ভালও বাসত। শবাধার, ডিয়েকন এবং ঘরের কোণের টেবিলের উপরকার পবিত্র মূর্তিগুলির একটা মাঝামাঝি জায়গার উদ্দেশে পিয়তর আইভানভিচ ক্রুশ-চিহ্ন ও অভিবাদন করতে লাগল। তারপর যখন মনে হলো যে ও কাজটা অযথা অনেক বেশি সময় ধরে করা হয়েছে তখন সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে মৃত লোকটিকে ভাল করে দেখতে লাগল।

মৃত লোকদের বেলায় যেমন হয়ে থাকে এই মৃত লোকটিও সেই একই বিশেষ ভঙ্গিতে একান্ত মৃতবৎ শুয়ে ছিল; শক্ত হাত-পাগুলো শবাধারের কুশনের মধ্যে বসে গেছে; মাথাটা চিরকালের মতো বালিশের উপর ঢলে পড়েছে; চুপসে যাওয়া টাক-মাথাটার সামনে মোমের মতো কপালটায় হল্‌দে ছোপ ধরেছে; উপরের ঠোঁটের উপর নাকটা যেন হঠাৎ খাড়া হয়ে ঠেলে উঠেছে। পিয়তর আইভানভিচ তাকে যখন শেষ দেখেছিল তার থেকে এখন সে অনেকটা বদলে গেছে, বেশ কিছুটা শুকিয়ে গেছে; আর—মৃতদের বেলায় সব সময়ই যেমনটি হয়ে থাকে—তার মুখখানি এখন যেন জীবিত অবস্থার চাইতেও বেশি সুন্দর ও আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে। যা করার ছিল সবই করা হয়েছে এবং ভালভাবেই করা হয়েছে—এই ভাবটাই যেন মুখের উপর ফুটে উঠেছে। তাছাড়া সেই মুখে যেন জীবিতদের প্রতি কিছুটা তিরস্কার বা অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার ভাবও ফুটে উঠেছে। এই মনে করিয়ে দেবার ভাবটা পিয়তর আইভানভিচ-এর কাছে অবাঞ্ছিত এবং অন্তত তার পক্ষে অবান্তর বলে মনে হলো। তার মনের মধ্যে একটা অপ্রীতির ভাব জেগে উঠল; ফলে সে অত্যন্ত দ্রুত আর একবার ক্রুশ-চিহ্ন এঁকেই ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। শ্‌ভার্ত্‌স্ পাশের ঘরেই তার জন্য অপেক্ষা করে ছিল; পা দুটি ফাঁক করে দাঁড়িয়ে হাত দুটি পিছনে নিয়ে টুপিটা নাড়াচাড়া করছিল। শ্‌ভার্ত্‌স্-এর ফুর্তিবাজ, চতুর ও পরিচ্ছন্ন মূর্তির দিকে একনজর তাকিয়েই পিয়তর আইভানভিচ মনের বল ফিরে পেল। সে

বুঝল, শ্‌ভার্ত্‌স্ এ সবের উর্ধ্বে, সে কখনও মন খারাপ করবে না। তার মুখের উপরেই যেন এই কথাগুলি লেখা আছে ঃ আইভান ইল্‌য়িচ-এর মৃতদেহের সৎকারের ঘটনা কখনও এ মরশুমের কাজকর্ম বন্ধ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ হতে পারে না,—অন্য কথায় পরিচারক যখন সন্ধ্যাবেলা আমাদের টেবিলে চারটি সাধারণ মোমবাতি জ্বালিয়ে দেবে তখন এই ঘটনাটির জন্য আমাদের তাসের আড্ডাটি বন্ধ থাকতে পাবে না; বস্তুত, সন্ধ্যাবেলাটা ফুর্তি করে কাটাবার পথে এই ঘটনাটি কোনওরকম বাধার সৃষ্টি করতে পারে এ কথা ভাববার কোনও কারণই থাকতে পারে না। বেরিয়ে আসতে আসতে এই কথাগুলিই পিয়তর আইভানভিচকে জানিয়ে সে প্রস্তাব করল যে, ফিয়দর ভাসিলীভিচ-এর বাড়িতেই আজ সকলে জমায়েত হবে। কিন্তু স্পষ্টতই বোঝা গেল সেদিন সন্ধ্যায় "স্ক্রু" খেলা পিয়তর আইভানভিচ-এর কপালে ছিল না। প্রাস্কোভ্‌য়া ফিয়দরভ্‌না কয়েকটি মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে তার নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বেঁটে, মোটা এই মহিলাটি যথেষ্ট প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কাঁধ থেকে নিচেব দিকে ক্রমাগতই স্থূলতর হয়ে চলেছে; তার পরনে কালো পোশাক, মাথায় লেস, এবং ভুরু দুটি শবাধারের পাশে দাঁড়ানো মহিলাটিব মতোই অদ্ভুতভাবে বাঁকানো। সকলকে নিযে মৃতেব ঘরে ঢুকে সে বলল, "অনুষ্ঠান এখনই শুরু হবে; আপনারা আসুন।"

শ্‌ভার্ত্‌স্ কোনওবকমে মাথাটা নিচু করে দাঁড়িয়ে বইল: আমন্ত্রণটি গ্রহণও কবল না, প্রত্যাখ্যানও কবল না। পিয়তর আইভানভিচকে চিনতে পেবে প্রাস্কোভ্‌য়া ফিয়দরভ্‌না দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা তার কাছে এগিয়ে গেল; তাব হাতটা ধবে বলল, "আমি জানি আপনি ছিলেন আইভান ইল্‌য়িচ এর প্রকৃত বন্ধু।" কথাগুলিব যথাযথ প্রত্যুত্তরেব প্রত্যাশায সে তার দিকে তাকিযে রইল। পিয়তর আইভানভিচ জানে, আগেব মতোই তাকে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকতে হবে এবং মহিলাটিব হাতখানি ধরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলতে হবে, "আহা, সত্যি তাই ছিলাম।" সে কবলও তাই। সেই সঙ্গে সে বুঝতেও পারল যে প্রত্যাশিত ফলটি ফলেছে সে নিজে অভিভূত হয়েছে, আর মহিলাটিও অভিভূত হয়েছে।

বিধবা বলল, "আসুন; এখনও কাজ শুরু হযনি, এই ফাঁকে আপনাকে কিছু বলতে চাই। আপনার হাতটা বাড়িয়ে দিন।"

পিয়তর আইভানভিচ হাত বাড়িয়ে দিলো। শ্‌ভার্ত্‌স্-এর পাশ দিয়ে তারা ভিতরের ঘবে চলে গেল। শ্‌ভার্ত্‌স্ বিষণ্ন মনে তার দিকে বাঁকা চোখে তাকাল।

তার দুষ্টুমি-ভরা দৃষ্টি যেন বলল, "'স্ক্রু' খেলা হয়ে গেল। আমরা আর একজন খেলুড়ে যোগাড় করে নিলে কিছু মনে করবেন না। ছাড়া পেয়ে ফিরে গেলে আপনি পঞ্চম খেলুড়ে হতে পারবেন।"

পিয়তর আইভানভিচ আরও হতাশভাবে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। প্রাস্কোভ্‌য়া ফিয়োদরভ্‌না কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তার হাতটা চেপে ধরল। তারা বসবার

ঘরে ঢুকল। ঘরে লাল মোটা পর্দা ঝুলছে, একটা বিষণ্ণ-দর্শন বাতি জ্বলছে। দু'জন টেবিলে গিয়ে বসল; মহিলাটি বসল সোফায়, আর সে বসল একটা নিচু "অটোমান"-এ; "অটোমান"-এর স্প্রিংগুলো খারাপ হয়ে যাওয়ায় তার ভারে কিছুটা বসে গেল। প্রাস্কোভ্য়া ফিয়দরভ্না তাকে অন্য একটা আসনে বসতে বলতেই যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ তার মনে হলো এ ধরনের অনুরোধ করা তার মর্যাদার পরিপন্থী, তাই সে চুপ করে গেল। "অটোমান"-এর উপরে বসে পিয়তর আইভানভিচ-এর মনে পড়ে গেল, আইভান ইলয়িচ কি ভাবে এই ঘরটাকে সাজিযে ছিল, এই সবুজ পাতা ও লাল ফুলে ছাপা পর্দাব ব্যাপাবে তার সঙ্গে পরামর্শ করেছিল। বসবার ঘরটা নানা রকম আসবাব ও জিনিসপত্রে ভর্তি। মহিলাটি যখন টেবিলটা সরিয়ে সোফায় বসতে গেল তখন তার ত্রিকোণ গলাবন্ধের ফিতেটি টেবিলের কোনায় আটকে গেল। সেটা ছাড়িয়ে দেবার জন্য পিয়তব আইভানভিচ উঠে দাঁড়াতেই তার ভাব-মুক্ত "অটোমান"টি হুস করে ফুলে উঠল। মহিলাটি নিজেই সেটা খুলে নেওয়ায় পিয়তর আইভানভিচ আবাব "অটোমান"-এর বিদ্রোহী স্প্রিংগুলোকে চেপে তার আসনে বসে পড়ল। কিন্তু বিধবাটি নিজেকে সম্পূর্ণ ছাড়াতে পারল না দেখে পিয়তর আইভানভিচ আবাব উঠে দাঁড়াল, আর সঙ্গে সঙ্গে "অটোমান"টাও আবার এক ঝাঁকিতে উদ্ধত মাথাটা তুলে ধরল। এ সব ঝঞ্ঝাট মিটে গেলে মহিলাটি একখানি ক্যাম্বিকেব রুমাল বের করে কাঁদতে বসল। একদিকে ফিতে আব অন্য দিকে "অটোমান"-এব স্প্রিং— এই দুইয়ের ধাক্কায় নাজেহাল হয়ে পিযতর আইভানভিচ বিষণ্ণ বদনে বসে রইল। আইভান ইল্য়িচ-এর খানসামা সকলভ ঘবে ঢোকায় এই অস্বস্তিকর অবস্থাটার অবসান ঘটল। সে জানাল, সমাধিক্ষেত্রের যে স্থানটি প্রাস্কোভ্য়া ফিযদরভ্না বেছে নিয়েছে তার জন্য দু'শ' রুবল খরচ পড়বে। কান্না থামিয়ে আহত শিকারের মতো দৃষ্টিতে পিয়তর আইভানভিচ-এর দিকে তাকিয়ে বিধবাটি বলল যে, তার কাছে এটা বড়ই দুঃসংবাদ। পিয়তর আইভানভিচও নীরবে এমন ভঙ্গি করল যেন সে বিষয়ে সে নিজেও নিঃসংশয়।

উদার অথচ ভগ্ন কণ্ঠে মহিলাটি বলল, "দয়া করে ধূমপান করুন"; তারপব সে কবরের জন্য নির্দিষ্ট স্থানটির দাম দিয়ে সকলভ-এর সঙ্গে আলোচনা কবতে লাগল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে পিযতর আইভানভিচ সমাধিক্ষেত্রের বিভিন্ন স্থানের দাম সম্পর্কে বিধবার নানা মন্তব্য ও সে সম্পর্কে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল। স্থান-নির্বাচন শেষ করে বিধবাটি গায়কদলের ব্যবস্থাও করে ফেলল। সকলভ চলে গেল।

টেবিলের উপর যে অ্যালবামগুলো পড়ে ছিল সেগুলো একপাশে সাজিয়ে রাখতে রাখতে সে বলল, "সব কিছুই আমি নিজে দেখাশুনা করি।" হঠাৎ তার নজরে পড়ল, সিগারেটের ছাইতে টেবিলটা নষ্ট হতে পারে; তাই তাড়াতাড়ি পিয়তর আইভানভিচ-এর দিকে একটা ছাই-দানি এগিয়ে দিয়ে সে বলল, "আমার দুঃখের জন্য প্রয়োজনীয়

কাজকর্মেব দিকে নজব দিতে পাবব না—এ বকম ভান কবতে আমি পাবি না। ববং যদি কোনও কিছুতে আমি——না, ঠিক সান্ত্বনা নয়. একটু ভুলে থাকতে পাবি, সেটা হলো তাব জন্য সব কিছুব সুব্যবস্থা কবা।" আবাব সে কমালখানা হাতে নিল, বুঝি বা আবাব কাঁদবাবই আযোজন হচ্ছে, কিন্তু সহসা যেন নিজেব সঙ্গে লডাই কবতে শবীবটাকে একটু ঝাঁকি দিযে সে শান্ত গলায বলল, "কিন্তু আপনাব সঙ্গে আমাব কাজেব কথা আছে।"

সতর্কভাব সঙ্গে "অটোমান" এব স্প্রিংগুলো চেপে বেখে পিযতব আইভানভিচ মাথাটা নোযাল।

"শেষেব ক'টা দিন সে বডই কষ্ট পেযেছে।"

"তিনি কি খুবই কষ্ট পেযেছেন?" পিযতব আইভানভিচ জিজ্ঞাসা কবল।

"ওঃ, খুব কষ্ট। শেষেব দিকটা, শেষ কযেক ঘণ্টা সে তো অনববত চিৎকাব কবেছে। তিন দিন তিন বাত সে একটানা আর্তনাদ কবেছে। অসহ্য। কি ভাবে যে সহ্য কবেছি জানি না, তিনটে বন্ধ দবজা পাব হযেও সে আর্তনাদ কানে আসে। ওঃ, কী কষ্টই না গেছে।"

"ওব জ্ঞান ছিল?" পিযতব আইভানভিচ জিজ্ঞাসা কবল।

সে ফিসফিস কবে বলল, "হ্যাঁ, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। মৃত্যুব পনেবো মিনিট আগে সে আমাদেব সকলেব কাছ থেকে বিদায নিল, ভলদযাকেও সবিযে নিযে যেতে বলল।"

নিজেব এবং এই নাবীব কপটতা সম্পর্কে অপ্রীতিকব সচেতনতা সত্ত্বেও যে মানুষটিকে প্রথমে হাসিখুশি মানুষ একটি স্কুলেব ছেলে হিসাবে ও তাবপবে বড হযে "হুইস্ট" খেলাব সঙ্গী হিসাবে সে এত ঘনিষ্ঠভাবে সে চিনত তাব দুঃখ যন্ত্রণাব কথা ভেবে পিযতব আইভানভিচ সহসা অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত হযে পডল। সেই কপাল, সেই ঠোঁটেব উপব চেপে বসা নাক আবাব তাব মনে পডল সঙ্গে সঙ্গে তাব নিজেবই ভয হলো। "তিন দিন তিন বাত ভীষণ যন্ত্রণা ও মৃত্যু। সে তো যেকোনও মুহূর্তে, এখনই আমাব বেলাতেও ঘটতে পাবে," এই কথা ভেবে মুহূর্তেব জন্য ভযংকব বকমেব ভীত হযে পডল। কিন্তু সে নিজেই বলতে পাবে না কেন ঠিক পবমুহূর্তেই সেই চিবাচবিত চিন্তা তাব মনকে শক্ত কবে তুলল যে, এ বকমটা আইভান ইল্যিচ এব বেলায ঘটেছে, তাব নিজেব বেলায নয়, আব তাব বেলায এটা ঘটবে না, ঘটতে পাবে না, তাছাডা এ ধবনেব চিন্তাব প্রশ্রয দিযে নিজে আতংকিত হওযা যে উচিত নয শ্ভার্তস্ এব মুখেব ভাবই তো তাব প্রমাণ। এই সব ভেবে পিযতব আইভানভিচ আশ্বস্ত বোধ কবল এবং সাগ্রহে আইভান ইল্যিচ-এব মৃত্যু সম্পর্কে খোঁজ খবব নিতে লাগল, যেন মৃত্যু আইভান ইল্যিচ এব জীবনেব একটি দুর্ঘটনামাত্র, তাব সঙ্গে তাব নিজেব কোনও সম্পর্কই নেই।

আইভান ইল্যিচ-এব ভযাবহ দৈহিক যন্ত্রণাব বিস্তাবিত বিববণ (আইভান

ইল্‌য়িচ-এর যন্ত্রণার যে প্রতিক্রিয়া প্রাস্কোভ্‌য়া ফিয়দরভ্‌নার স্নায়ুতন্ত্রের উপর ঘটেছিল তার সাহায্যেই পিয়তর আইভানভিচ সে বিবরণ জানতে পেরেছে) সম্পর্কে নানাবিধ মন্তব্য করার পরে বিধবাটি ভাবল যে এবার কাজের কথায় যাওয়া যাক।

"ও, পিয়তর আইভানভিচ, সে যে কত কঠিন, কী ভয়ংকর রকমের কঠিন!" বলতে বলতে সে আবার কান্না জুড়ে দিলো।

পিয়তর আইভানভিচ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিধবাটির নাক ঝাড়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। সে কাজ হয়ে গেলে সে বলল, "সত্যি তাই," আর বিধবাটিও কথাপ্রসঙ্গে তার কাজের কথাটি জানিয়ে দিলো। কাজের কথাটি হলো ঃ স্বামীর মৃত্যুর পরে সরকারের কাছ থেকে কেমন করে সে একটি অনুদান পেতে পারে সে সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া। কি করে একটা পেন্সন পাওয়া যেতে পারে সে বিষয়েও বিধবাটি তার পরামর্শ জানতে চাইল। কিন্তু সে বুঝতে পারল, এই মৃত্যুর ফলে সরকারের কাছ থেকে কোথায়, কি ভাবে, কতটা আদায় করা যেতে পারে তার বিস্তারিত বিবরণ বিধবাটি যতটা জানে সে নিজেও তা জানে না; সে শুধু জানতে চাইছিল, আরও কিছু বেশি পাবার কোনও পথ আছে কি না। তারপরই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে অতিথিদের হাত থেকে রেহাই পাবার একটা অজুহাত সে খুঁজতে লাগল। সেটা বুঝতে পেরে পিয়তর আইভানভিচ সিগারেটটা নিভিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং বিধবার হাতটাতে চাপ দিয়ে দালানে বেরিয়ে গেল।

একদা যে পুরনো কালের দেয়াল-ঘড়িটা কিনতে পেরে আইভান ইল্‌য়িচ খুব খুশি হয়েছিল সেটা খাবার ঘরেই ছিল। সেখানে পুরোহিত এবং আরও কয়েকজন পরিচিত লোকের সঙ্গে পিয়তর আইভানভিচের দেখা হলো। সকলেই মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে এসেছে। আইভান ইল্‌য়িচ-এর সুন্দরী তরুণী কন্যাটিও এসেছে। তার পরনে কালো পোশাক। তার কৃশ তনু আরও কৃশ দেখাচ্ছে। তার বিষণ্ণ, কঠিন মুখে যেন একটা রাগের ছাপ। পিয়তর আইভানভিচকে সে এমনভাবে অভিবাদন জানাল যেন এ ব্যাপারের জন্য সেও কিছুটা দায়ী। মেয়েটির পিছনে সেই একই রকম বিরক্ত মুখে একটি ধনী যুবক দাঁড়িয়েছিল। পিয়তর আইভানভিচ জানে সে একজন তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট; সে শুনেছে, যুবকটি এই তরুণীর প্রণয়ী। বিষণ্ণ চিত্তে তাকে অভিবাদন জানিয়ে সেও হয়ত মৃতের ঘরেই চলে যেত, এমন সময় সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল মৃতের ছেলে। উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র, দেখতে হুবহু আইভান ইল্‌য়িচ-এর মতো। পিয়তর আইভানভিচ যে বালক আইভান ইল্‌য়িচকে চিনত সেই যেন আবার ফিরে এসেছে। তার চোখ দুটো কেঁদে লাল হয়ে গেছে; তেরো-চৌদ্দ বছর বয়সের নোংরা ছেলেদের মতো তার চোখের দৃষ্টি। পিয়তর আইভানভিচকে দেখে ছেলেটি বিষণ্ণ ও লজ্জিতভাবে মুখটা বাঁকাল। ইঙ্গিতে তাকে ডেকে পিয়তর আইভানভিচ মৃতের ঘরে ঢুকল। শেষকৃত্য শুরু হলো—মোমবাতি, আর্তনাদ, ধূপধুনো, চোখের জল, চাপা কান্না। পিয়তর আইভানভিচ ভুরু কুঞ্চিত করে নিজের পায়ের উপর দৃষ্টি রেখে

দাঁড়িয়ে রইল। একবারও সে মৃতের দিকে তাকাল না, অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত কোনও সময়ই দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ হতে দিলো না, এবং সকলের আগে সেখান থেকে চলে গেল। হল-ঘরে কেউ ছিল না। চাষীছেলে গেরাসিম মৃতের ঘর থেকে ছুটে এসে শক্ত হাতে সবগুলি ফারের জোব্বার ভিতর থেকে পিয়তর আইভানভিচ-এর জোব্বাটা খুঁজে বের করে তার হাতে দিলো।

যেন কিছু বলবার জন্যই পিয়তর আইভানভিচ বলল, "এই যে বাবা গেরাসিম, খুবই দুঃখের কথা, নয় কি?"

হেসে দাঁত বের করে গেরাসিম বলল, "সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমাদেরও এ দিন আসবে।" তারপরই অত্যন্ত কাজের মানুষের মতো সে চটপট দরজা খুলে কোচয়ানকে ডাকল, পিয়তর আইভানভিচকে গাড়িতে তুলে দিলো, এবং পরবর্তী কাজ সারবার জন্য দ্রুত পায়ে সিঁড়ির দিকে ফিরে গেল।

ধূপ, মৃতদেহ ও কার্বলিক অ্যাসিডের গন্ধের পরে খোলা হাওয়ায় এসে পিয়তর আইভানভিচ-এর খুব ভাল লাগতে লাগল।

কোচয়ান জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাবেন?"

"এখনও সময় আছে। একবার ফিয়দর ভাসিলীভ-এর বাড়ি ঘুরে যাব।"

সেখানে পৌঁছে পিয়তর আইভানভিচ দেখল, সবে প্রথম রাবারটি শেষ হয়েছে; কাজেই এক হাত খেলবার পক্ষে ঠিক সময়েই সে হাজির হয়েছে।

২

আইভান ইল্‌য়িচ-এর পূর্ব-ইতিহাস খুবই সরল, খুবই সাধারণ এবং অত্যন্ত ভয়াবহ।

বিচারক পরিষদের সদস্য ভাইভান ইল্‌য়িচ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে মারা যায়। সে ছিল একজন সরকারী কর্মচারীর ছেলে। তার বাবা ছিল সেই ধরনের একজন কর্মচারী যারা পিতার্সবুর্গের কর্মজীবনে বহু মন্ত্রিসভা ও বিভাগ ঘুরে ঘুরে এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছয় যখন তাদের দ্বারা কোনও সত্যিকারের কাজ হবে না জেনেও দীর্ঘ দিনের চাকরির কথা এবং পদ-মর্যাদার কথা ভেবে তাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা যায় না; সুতরাং একটি কাল্পনিক পদ বিশেষভাবে সৃষ্টি করে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়, এবং কাল্পনিক হাজার হাজারের বদলে ছয় থেকে দশের উপর নির্ভর করেই শেষ বার্ধক্য পর্যন্ত তাদের জীবনযাত্রা চালাতে হয়। এমনি এক খাস মন্ত্রিসভার সদস্য, নানা বাড়তি প্রতিষ্ঠানের বাড়তি সদস্য ছিল ইলিয়া এফিমভিচ গলোভিন।

তার ছিল তিন ছেলে। আইভান ইল্‌য়িচ দ্বিতীয় ছেলে। একটা স্বতন্ত্র বিভাগে হলেও বড় ছেলের কর্মজীবন ঠিক তার বাবার মতোই, এবং চাকরিতে প্রায় অনুরূপ অবস্থায় উপনীত হবার সময় তারও এসে গেছে। তৃতীয় ছেলেটির জীবনে কিছুই হয়নি। নানা চাকরির ক্ষেত্রে তালগোল পাকিয়ে এখন সে রেল বিভাগে চাকরি করে।

তাব বাবা ও দাদাবা, বিশেষ কবে তাদেব স্ত্রীবা, শুধু যে তাব সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎটা অপছন্দ কবত তাই নয়, অত্যন্ত প্রয়োজন না হলে তাব অস্তিত্বেব কথাটাই ভুলে থাকত। তাব বোন বিয়ে কবেছিল ব্যাবন গ্রেফ কে, সেও শ্বশুবেব মার্কা-মাবা পিতার্সবুর্গেব একজন চাকুবে। লোকে বলত, আইভান ইল্‌যিচ ছিল পবিবাবেব একমাত্র ব্যতিক্রম। সে বড ছেলেব মতো অনড, কাঠখোট্টাও না আবাব ছোট ছেলেব মতো দুবন্তও না। সে ছিল দুইয়েব মধ্যবর্তী একটি সুখী মানুষ—বুদ্ধিমান, চটপটে ও সুশিক্ষিত। ছোট ভাইয়েব সঙ্গে সেও আইনেব বিদ্যালয়ে পডেছে। ছোট ভাই পডা শেষ কববাব আগে পঞ্চম শ্রেণীতে থাকতেই বিদ্যালয থেকে বহিষ্কৃত হয। আইভান ইল্‌যিচ সাফল্যেব সঙ্গে পাঠক্রম সম্পূর্ণ কবে। পববর্তী সাবাটা জীবন সে যে ভাবে কাটিয়েছে বিদ্যালযেও ঠিক সেই বকমই ছিল,—বুদ্ধিমান, বসিক ও সামাজিক, কিন্তু কর্তব্যে অবিচলভাবে নিষ্ঠাবান। তাব উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যে কাজকে তাব কর্তব্য বলে মনে কবত সেও তাই মেনে নেওযাকেই তাব কর্তব্য বলে মেনে নিত। তাই বলে ছেলে বযসেও সে কাবও চাটুকাব ছিল না বড হয়েও না, কিন্তু পতঙ্গ যেমন আলোব দিকে আকৃষ্ট হয তেমনি সেও ছোটবেলা থেকেই পৃথিবীব বড বড মানুষেব প্রতি আকর্ষণ বোধ কবত, তাদেব চাল চলন ও জীবনযাত্রাকে নিজেব জীবনে গ্রহণ কবত, তাদেব সঙ্গে বন্ধুত্বেব সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কবত। কিন্তু ক্রমে শৈশব ও যৌবনেব সেই উৎসাহে ভাঁটা পডল, তাব কোনও প্রভাবই তাব জীবনে বইল না, সে ইন্দ্রিয়াসক্তি ও অহংকাবেব পথে নেমে গেল বিদ্যালয়েব উচ্চ শ্রেণীতে উঠবাব পবে উদাবনৈতিক মতবাদেব দিকে ঝুঁকে পডল কিন্তু সবল অবস্থাতেই স্বীয় প্রবৃত্তিব দ্বাবা নির্ভুলভাবে চিহ্নিত নির্দিষ্ট সীমাব মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ বেখে চলতে লাগল।

বিদ্যালয়ে থাকতে সে এমন সব কাজ কবেছে যাকে সে আগে পাপ বলে মনে কবত এবং সেই সব কাজ কববাব সময নিজেব প্রতি তাব ঘৃণাও হতো। কিন্তু পববর্তীকালে যখন সে দেখল যে উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন লোকবাও সে সব কাজ কবে থাকে এবং তাকে খাবাপ কাজ বলে মনে কবে না তখন সেও সে সব কাজকে ভাল কাজ মনে না কবলেও সে সব কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেল এবং সে সব স্মৃতি আব তাকে মর্মাহত কবত না।

দশম শ্রেণীতে আইন বিদ্যালয ত্যাগ কবে বাবাব কাছ থেকে পোশাক-আশাকেব জন্য টাকা পেয়ে আইভান ইলযিচ শাবমাব-এব দোকানে পোশাকেব অর্ডাব দিলো, ঘডিব চেনে "ফলেন পবিচিযতে" কথাটা খোদাই কবা একটা পদক ঝোলাল, বিদ্যালয়েব অধ্যক্ষকে বিদায-সম্ভাষণ জানাল, বন্ধুবান্ধবদেব নিয়ে একটা বিদাযী ভোজসভাব আয়োজন কবল "দোনন" এ, এবং নতুন কেনা সৌখীন সব জিনিসপত্র—ভ্রমণোপযোগী ট্রাংক বিছানা, কযেক প্রস্থ স্যুট, দাডি-কামাবাব ও স্নানেব সবঞ্জাম, ভ্রমণোপযোগী কম্বল ইত্যাদি বড বড দোকান থেকে কেনা সব জিনিস নিয়ে একটি প্রাদেশিক সবকাবেব বিশেষ কমিশনেব সচিব এব পদে যোগ দিতে চলে গেল, চাকবিটা তাব বাবাই যোগাড় কবে দিয়েছিল।

আইন-বিদ্যালয়ে থাকতে সে যেমন একটা সহজ পরিচিতি লাভ করেছিল, নতুন কর্মক্ষেত্রেও অচিরেই আইভান ইল্‌য়িচ সেই পরিচিতি অর্জন করে নিল। সে যথাযথভাবে নিজের কাজ করল, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল, আবার সেই সঙ্গে একটি সুস্থ, সুন্দর সামাজিক জীবনও যাপন করতে লাগল। মাঝে মাঝেই সরকারী কাজে তাকে বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শনে যেতে হতো; সেখানে সে উর্ধ্বতন ও অধস্তন সকল কর্মচারীর সঙ্গেই মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করত; তার উপর ন্যস্ত কর্তব্য সে এমন নির্ভুলভাবে ও সন্দেহাতীত সততার সঙ্গে পালন করত যে সে জন্য সে নিজেই গর্ববোধ করত। তার অল্প বয়স এবং হাল্কা আমোদ-প্রমোদের প্রতি আকর্ষণ সত্ত্বেও সরকারী কাজে ব্যাপৃত থাকার সময় সে থাকত অত্যন্ত সংযত, বিধিসম্মত, এমন কি কিছুটা কঠোর। কিন্তু সামাজিক জীবনে সে সব সময়ই ফুর্তিবাজ ও সুরসিক; তার স্বভাব ভাল, শিক্ষা-দীক্ষা ভাল; তার উপরওয়ালা ও তার স্ত্রীর সঙ্গে সে তো এক পরিবারের লোকের মতোই থাকত; তারাই তাকে বলত "খাসা ছেলে।"

সে অঞ্চলে থাকার সময় সেই সব মহিলাদের একজনের সঙ্গে তার কিছু যোগাযোগও ঘটেছিল যারা সৌখীন আইনজ্ঞ যুবকটির উপর তাদের রূপের প্রভাব ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। মাঝে মাঝে উৎসাহী কর্মচারীরা কাছাকাছি কোথাও গিয়ে পান ভোজন করত; কখনও বা নৈশাহারের পরে শহরের উপকণ্ঠস্থ অঞ্চলেও বেড়াতে যেত; উপরওয়ালা ও তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারে কিছুটা হীন চাটুকারিতাও প্রকাশ পেত। কিন্তু সে সব কাজই সে এমন উন্নত রুচির সঙ্গে সম্পন্ন করত যে তাতে কোনওরকম দোষ ধরা যেত না; সব দোষই ফরাসি প্রবাদ "যৌবনে দাও জয়-টীকা"র দ্বারা খণ্ডিত হয়ে যেত। সবকিছুই করা হতো পরিচ্ছন্ন হাতে পরিচ্ছন্ন পোশাকে, অলংকারবহুল ফরাসি ভাষায় এবং সর্বোপরি অভিজাত সমাজে, কাজেই পদস্থ ব্যক্তিদের সমর্থন তাতে সব সময়ই থাকত।

আইভান ইল্‌য়িচ-এর জীবনের পাঁচটি বছর এইভাবে কাটল; তারপরই তার চাকরি-জীবনে একটা পরিবর্তন এল। বিচারের নতুন পদ্ধতি প্রচলিত হলো; সেগুলি চালাবার জন্য নতুন লোকের প্রয়োজন দেখা দিলো। আর আইভান ইল্‌য়িচ হলো সেই নতুন লোকদের অন্যতম। তাকে তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি দেওয়া হলো। যদিও সেটা অন্য প্রদেশে এবং সেখানে গেলে এখানকার গড়ে তোলা সব বন্ধনকে ছিন্ন করে নতুন করে সব কিছু গড়ে তুলতে হবে; তবু চাকরিটা সে নিল। আইভান ইল্‌য়িচ-এর বন্ধুরা তাকে বিদায় জানাতে সমবেত হলো, সকলের ফটো তোলা হলো, একটি রূপোর সিগারেট কেস তাকে উপহার দেওয়া হলো, আর তারপরেই সে নতুন চাকরিতে যোগ দিতে যাত্রা করল।

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সচিব হিসাবে যেমন ছিল, তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবেও আইভান ইল্‌য়িচ তেমনি উপযুক্ততা ও দক্ষতার পরিচয় দিলো, তেমনি নৈপুণ্যের সঙ্গে সরকারী কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের পার্থক্য বজায় রেখে চলল, তেমনি

সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হয়ে উঠল। নতুন পদের কাজকর্ম বরং তার কাছে আরও বেশি আকর্ষণীয় মনে হলো। আগেকার চাকরিতে থাকার সময় সে যখন শারমার-এর তৈরি ইউনিফর্ম পরে তার জন্য অপেক্ষমান দরখাস্তকারী ও কর্মচারীদের ভিড়ের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হেলেদুলে গভর্নরের খাস কামরায় গিয়ে ঢুকত এবং তার সঙ্গে বসে চা ও সিগারেট খেত তখন খুবই ভাল লাগত বটে কিন্তু তখন তার অধীনস্থ কর্মচারীর সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। শুধু যখন সে বিশেষ কোনও কমিশনে কাজ করত তখন তার অধীনে থাকত পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও বিরোধীরা। সে অবশ্য তাদের সঙ্গে সহকর্মীর মতোই সদয় ব্যবহার করত; তাদের বুঝিয়ে দিত যে তাদের সর্বনাশ করে দেবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে তাদের সঙ্গে এতখানি সরল ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করছে। কিন্তু তখন এ ধরনের লোকের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প। কিন্তু এখন তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে আইভান ইল্‌য়িচ বুঝতে পেরেছে যে প্রতিটি মানুষ—কেউ বাদ নেই—অত্যন্ত সম্মানিত ও অতীব আত্মতুষ্ট মানুষরা সকলেই আছে তার হাতের মুঠোয়; একখানা নাম-ঠিকানা ছাপানো কাগজে সে কয়েকটি মাত্র কথা লিখলেই সেই সব সম্মানিত, আত্মতুষ্ট মানুষদের তার সামনে এনে হাজির করা হবে আসামী অথবা সাক্ষী হিসাবে; আর বসতে না বললে তার সামনে দাঁড়িয়েই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

আইভান ইল্‌য়িচ কখনও এই ক্ষমতার অপব্যবহার করেনি; ববং সে চেষ্টা করেছে তার প্রকাশকে যথাসম্ভব নরম করতে। কিন্তু এই ক্ষমতা যে তার আছে এবং ইচ্ছা করলেই সে ক্ষমতাব ব্যবহারকে সে নরম করতে পারে এই চেতনাই নতুন পদমর্যাদাকে তার কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এ কাজ তার কাছে নতুন। ১৮৬৪ সালের আইনে বিচার-পদ্ধতির যে সংস্কার সাধন করা হয়েছে তাকে প্রথম যারা রূপায়িত করেছে সে তাদের একজন।

তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে একটি নতুন শহরে বসবাস করার ফলে অনেক নতুন মানুষের সঙ্গে আইভান ইল্‌য়িচ-এর পরিচয় হলো, নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হলো; সে নতুন পথ তৈরি করল, নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু দেখতে শিখল। প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব রক্ষা করে সে চলতে লাগল, আরও শহবের ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মতো যারা সেরা মানুষ তাদেরই সঙ্গী হিসাবে বেছে নিল এবং সরকার, উদারনৈতিক মতবাদ ও মহৎ নাগরিক গুণাবলীর প্রতি ঈষৎ অপ্রসন্নতার মনোভাব গ্রহণ করল। এদিকে চেহারায় বা সাজ-পোশাকে সুরুচির কোনওরকম পরিবর্তন না ঘটিয়ে আইভান ইল্‌য়িচ নতুন কাজে যোগ দেবার পর থেকে দাড়ি কামানো ছেড়ে দিলো এবং তার দাড়ি স্বাধীনভাবে বাড়তে লাগল। নতুন শহরে তার উপস্থিতিকে সকলেই স্বাগত জানাল; যারা গভর্নরের বিবোধিতা করেছিল তারা তাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করল; তার উপার্জন অনেক বেড়ে যাওয়ায় সে "হুইস্ট" খেলায় আরও বেশি আনন্দ পেতে লাগল; এবং খোশমেজাজে তাস খেলতে পারার জন্য ও অত্যন্ত দ্রুত

সঠিক হিসাব করতে পারার জন্য তাসের আড্ডায় সে সব সময় বিজয়ীদের দলেই থাকত।

নতুন শহরে দুটি বছর কাটাবার পরে আইভান ইল্‌য়িচ তার ভাবী স্ত্রীর দেখা পেল। যে সমাজে সে চলাফেরা করত তার মধ্যে প্রাস্কোভ্‌য়া ফিয়োদরভ্‌না মিহেল ছিল সবচাইতে আকর্ষণীয়, চটপটে ও ভাল মেয়ে। ম্যাজিস্ট্রেটের কাজের খাটুনির পরে অন্যবিধ আমোদ-প্রমোদ ও অবসর বিনোদনের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রাস্কোভ্‌য়া ফিয়দরভ্‌নার সঙ্গে একটু হাল্কা পূর্ব-রাগের খেলাও দেখাতে শুরু করে দিলো।

সহকারী সচিব হিসাবে আইভান ইল্‌য়িচ রীতি হিসাবেই নাচে যোগদান করত; তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে সে নাচে যোগদান করত ব্যতিক্রম হিসাবে। এখন সে নাচে যেন প্রতিবাদ হিসাবে; যেন সে বলতে চায়, "যদিও আমি সংশোধিত নতুন আইনের অনুবর্তী হয়ে কাজে যোগদান করেছি এবং সরকারী মর্যাদা অনুসারে আমার স্থান পঞ্চম, তবু নাচের প্রশ্ন যখন দেখা দেয় তখন সে ক্ষেত্রেও অন্যের চাইতে আমি অধিকতর দক্ষ।" এই মনোভাব নিয়েই সে মাঝে মাঝে সান্ধ্য-আসরের একেবারে শেষের দিকে প্রাস্কোভ্‌য়া ফিয়োদরভ্‌নার সঙ্গে নাচত এবং এই সব নাচের ভিতর দিয়েই সে তার মনকে জয় করে। বিয়ে করার কোনও স্পষ্ট বাসনা তার ছিল না; কিন্তু মেয়েটি যখন তার প্রেমে পড়ল তখন নিজেকেই সে প্রশ্ন করল : "তাহলে বিয়ে করতে আপত্তি কিসের?"

প্রাস্কোভ্‌য়া ভাল পরিবারের মেয়ে, দেখতে সুন্দরী। ছোটখাটো সম্পত্তিও ছিল। হয়ত আরও ভাল সম্বন্ধ আইভান ইল্‌য়িচ-এর হতে পারত, কিন্তু এ সম্বন্ধও তো ভাল। আইভান ইল্‌য়িচ-এর নিজের বেতন রয়েছে; মেয়েটিরও অনুরূপ আয় আছে। পরিবারটি ভাল; মেয়েটি মিষ্টি, সুন্দরী, ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত! আইভান ইল্‌য়িচ তার স্ত্রীকে ভালবেসেছিল এবং তার জীবনযাত্রার প্রতি স্ত্রীর সহানুভূতি আছে এ কথা বুঝতে পেরেছিল বলেই সে তাকে বিয়ে করেছিল একথা বললে যেমন অসত্যভাষণ হবে, ঠিক তেমনি পৃথিবীসুদ্ধু লোক তাদের বিয়েকে সমর্থন করেছিল এ-কথাও ঠিক নয়। এই উভয় প্রকার বিবেচনাই তাকে প্রভাবিত করেছিল; এ রকম একটি স্ত্রী পেয়ে সে খুশি হয়েছিল বলেই বিয়ে করেছিল, আবার উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা এটাকে সঠিক পথ বলে বিবেচনা করেছিল বলেও সে কাজটি করেছিল।

এবং আইভান ইল্‌য়িচ বিয়ে করল।

বিয়ের ব্যাপারটা, বিবাহিত জীবনের প্রাথমিক পর্বটা, স্বামী-স্ত্রীর আদর-ভালবাসা, নতুন আসবাব, নতুন বাসন-কোসন, নতুন শয্যাদ্রব্য—স্ত্রীর সন্তান সম্ভাবনা পর্যন্ত সব কিছুই বেশ ভালভাবেই চলল; ফলে আইভান ইল্‌য়িচ ভেবে বসল, যে খুশিভরা হাল্কা জীবনকে সে এতদিন স্বাভাবিক জীবন বলে ধরে নিয়েছে, বিয়ের ফলে সে জীবন ভেঙে তো যাবেই না, বরং তাকে মধুরতর করে তুলবে। কিন্তু এই ব্যাপারে স্ত্রীর সন্তান সম্ভাবনার প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই এমন একটি অপ্রত্যাশিত,

অপ্রীতিকর, ক্লান্তিকর ও অশোভন নতুন অবস্থার সৃষ্টি হলো যেটা সে আগে কখনও বুঝতে পারেনি, অথচ তার হাত থেকে অব্যাহতিও নেই।

আইভান ইল্‌য়িচ-এর মনে হতে লাগল, তার স্ত্রী সম্পূর্ণ বিনা কারণে তাদের জীবনের মাধুর্য ও শোভনতাকে বিঘ্নিত করছে। ঈর্ষার তিলমাত্র কারণ না থাকা সত্ত্বেও মহিলাটি নানাভাবে জোর করে তাকে কাছে টানতে লাগল, সবকিছু নিয়ে খিটিমিটি বাধাতে লাগল এবং তাকে নিয়ে অত্যন্ত স্থূল ও অশালীন দৃশ্যের অবতারণা করতে লাগল।

প্রথম দিকে আইভান ইল্‌য়িচ আশা করেছিল, অন্যান্য অসুবিধার ক্ষেত্রে যে রকম সহজ, হাল্কাভাবে সে সব বিষয়ের মোকাবিলা করেছে ঠিক সেই ভাবেই এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির হাত থেকেও নিষ্কৃতি পেতে পারবে। স্ত্রীর বদ-মেজাজকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সে আগের মতোই হাল্কাভাবে জীবন চালাতে লাগল, বন্ধুদের তাসের আড্ডায় ডেকে আনল, অথবা নিজেই তাদেব ক্লাবে ও বাড়িতে যেতে লাগল। কিন্তু একদিন তার স্ত্রী এমন উৎসাহের সঙ্গে স্থূল ভাষায় গালাগালি শুরু করল এবং তার দাবি মেনে সর্বদা বাড়িতে থাকতে আপত্তি করলেই এমনভাবে সে গালাগালি চালিয়ে যেতে লাগল যে আইভান ইল্‌য়িচ আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। সে বুঝতে পারল, এই বিবাহ-বন্ধন, অন্তত তার স্ত্রীটির সঙ্গে, সব সময়ই জীবনের আনন্দের অনুকূল তো হয়ই না, বরং অনেক সময়েই সে পথের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়; কাজেই এই সব গোলযোগের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য একটা প্রাচীর তোলা একান্তই প্রয়োজন। আর সেও আত্মরক্ষার সেইরকম একটা পথই খুঁজতে লাগল। একমাত্র তাব সরকারী কাজকর্মকেই প্রাস্কোভ্‌য়া ফিয়োদরভ্‌না ভাল চোখে দেখত; কাজেই নিজের স্বাধীন জগৎটাকে স্ত্রীর দৃষ্টির আড়ালে রাখাব চেষ্টায় সে তার চাকরি ও তৎসংক্রান্ত কাজকেই ব্যবহার করতে লাগল।

একটি শিশু জন্মাবার পরে তার দেখাশুনা, তার খাবার ব্যবস্থা নিয়ে নানা বকম অসফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা, শিশুর ও প্রসূতির প্রকৃত ও কাল্পনিক অসুস্থতা, প্রভৃতি ব্যাপারে আইভান ইল্‌য়িচ-এর ধারণা পর্যন্ত না থাকলেও সে সব যখন তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা হতে লাগল, তখন তার পক্ষে পারিবারিক জীবনেব বাইরে একটি স্বতন্ত্র জীবন গড়ে তোলা একান্তভাবেই অনিবার্য হয়ে উঠল। ফলে স্ত্রীর দাবি যত বাড়তে লাগল, সে যত বেশি বিরক্তিকর হয়ে উঠল, আইভান ইল্‌য়িচ ততই সরকারী কাজকেই জীবনের কেন্দ্র-বিন্দুতে পরিণত করতে লাগল। সরকারী কর্তব্য সম্পাদনেব প্রতি তাব আকর্ষণ ক্রমাগত বাড়তে লাগল, বাড়তে লাগল জীবনের উচ্চাকাংখা।

বিয়ের পর একটি বছর যেতে না যেতেই বড় তাড়াতাড়ি আইভান ইল্‌যিচ বুঝতে পারল, দাম্পত্য জীবনে কিছু সুখ ও আরাম থাকলেও আসলে সে জীবন এতই জটিল ও বিঘ্নসংকুল যে কেউ যদি সমাজসম্মতভাবে কর্তব্য পালন করে চলতে চায় তাহলে সরকারী চাকরির মতো একটি সুনির্দিষ্ট পথ ধরেই তাকে চলতে হবে।

আইভান ইল্‌যিচও বিবাহিত জীবনে সেইরকম একটা পথ বেছে নিল। বাড়িতে তার প্রত্যাশা রইল শুধু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা এবং গৃহস্থালী শয্যার আরাম। তার বাইরে সে চায় প্রাণ-খোলা সহজ আনন্দ। সেটা যদি বাড়িতেই মেলে তাহলে তো খুবই ভাল কথা। কিন্তু তার বদলে যদি জোটে বাধা ও কলহ, তাহলেই সে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে গুটিয়ে নেয় সরকারী কাজকর্মের বেড়ার আড়ালে তার স্বতন্ত্র জগতে, আর সেখানেই সে পায় শান্তি ও সান্ত্বনা।

সরকারী কর্মচারী হিসাবে আইভান ইল্‌য়িচ-এর সুনাম হলো, তিন বছর পরেই সে সরকারী উকিলের পদটা পেয়ে গেল। নতুন পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, তার মর্যাদা, যে কোনও লোককে বিচার করবার ও জেলে পুরবার ক্ষমতা, সংবাদপত্রে বক্তৃতার প্রচার এবং কর্ম-জগতে সাফল্য—এই সব নানা কারণে সরকারী কাজকর্ম তার কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠল।

আরও সন্তানের জন্ম হলো। তার স্ত্রী ক্রমেই আরও কলহপ্রিয় ও বদমেজাজী হয়ে উঠল; কিন্তু গার্হস্থ্য জীবন সম্পর্কে যে পথ আইভান ইল্‌য়িচ বেছে নিয়েছিল তাতে স্ত্রীর কুঁদুলেপনা তার কাছে পৌঁছবার পথ খুঁজে পেত না।

সেই শহরে সাত বছর চাকরি করবার পরে আইভান ইল্‌য়িচকে সরকারী উকিল হিসাবে আর একটি প্রদেশে বদলি করা হলো। তারা সেখানে চলে গেল। টাকা-পয়সায় টান পড়ল। নতুন জায়গাটা স্ত্রীর পছন্দ হলো না। বেতন কিছুটা বাড়ল বটে, কিন্তু খরচ বেড়ে গেল বিস্তর। তাছাড়া দুটি সন্তান মারা যাওয়াতে বাড়ির আবহাওয়া আইভান ইল্‌য়িচ-এর পক্ষে আরও দুঃখকর হয়ে উঠল।

নতুন জায়গায় এসে যা কিছু অসুবিধা দেখা দেয় তার জন্যই প্রাস্কোভ্যা ফিয়দরভ্‌না তার স্বামীকে দোষী করে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনওরকম আলোচনা, বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা নিয়ে আলোচনা শুরু হলেই আগেকার কোনও ঝগড়ার জের টেনে নতুন করে ঝগড়া লেগে যেত। মাঝে-মধ্যে দু'জনের প্রেম-ভালবাসার মুহূর্ত এলেও সে খুবই ক্ষণস্থায়ী। সেই মুহূর্তগুলি যেন এক-একটি দ্বীপবিশেষ; সেখানে কিছু সময় কাটিয়েই আবার তাদের যাত্রা শুরু হয় গোপন বিরোধের সমুদ্রে; পরস্পরের কাছ থেকে ক্রমেই তারা দূরে সরে যায়। সে যদি মনে করত যে এ বিচ্ছিন্নতা ঘটা উচিত নয় তাহলে হয়ত এর জন্য সে দুঃখ পেত, কিন্তু এতদিনে সে এটাকেই স্বাভাবিক জীবন বলে গ্রহণ করেছে এবং গার্হস্থ্য জীবনে সেই লক্ষ্যের দিকেই সে এগিয়ে চলেছে। পারিবারিক জীবনের এই অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে নিজেকে ক্রমাগত মুক্ত করে রাখা এবং সে সব পরিস্থিতি যাতে ক্ষতিকর না হতে পারে অথবা অশোভন হয়ে না ওঠে সেটাই তার লক্ষ্য। বাড়িতে যথাসম্ভব অল্প সময় কাটিয়ে সে ঐ লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করে; আর যতক্ষণ বাধ্য হয়ে বাড়িতে থাকতে হয় ততক্ষণ বাইরের অতিথি-সমাগম ঘটিয়ে নিজের শান্তিকে নির্বিঘ্ন করতে চেষ্টা করে। আপিসটাই তার কাছে খুব বড় হয়ে উঠল। তার জীবনের সব আগ্রহ ও

স্বার্থ সেই কাজের জগতের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হতে লাগল। সেই স্বার্থের মধ্যেই সে ডুবে রইল। স্বীয় ক্ষমতা, কারও সর্বনাশ করতে চাইলে তা সাধন করবার শক্তি, আদালতে ঢুকবার সময় অথবা অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা হলে সকলের কাছে নিজ পদের মর্যাদা, উর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্মচারীদের চোখে তার সাফল্য এবং সর্বোপরি সমস্ত মামলার তার সার্থক পরিচালনা—এ সব কিছুই তাকে খুশিতে ভরে তোলে; তার উপরে সহকর্মীদের সঙ্গে আড্ডা, বাইরে আহারাদি ও "হুইস্ট" খেলা তার জীবনকে ভরে রেখেছে। সুতরাং মোটামুটিভাবে আইভান ইল্‌য়িচ-এর জীবন সুখ ও শালীনতার সঙ্গে তার ঈপ্সিত পথেই চলতে লাগল।

এইভাবে সে আরও সাত বছর বেঁচে রইল। বড় মেয়েটির বয়স হলো ষোল, আরও একটি সন্তান মারা গেল, রইল আর একটিমাত্র ছেলে, উচ্চ-বিদ্যালয়ের ছাত্র; তাকে নিয়েও দু'জনের মধ্যে মতবিরোধ। আইভান ইল্‌য়িচ-এর ইচ্ছা তাকে আইন-বিদ্যালয়ে পাঠাবে, অথচ তাকে বাধা দেবার জন্য প্রাস্কোভ্‌য়া ফিয়দরভ্‌না ছেলেকে পাঠাল উচ্চ-বিদ্যালয়ে। মেয়েটি বাড়িতেই লেখাপড়া শিখেছে এবং বেশ ভালই হয়েছে; ছেলেটিও পড়াশুনায় বেশ ভাল।

৩

এই হলো বিয়ের পর আইভান ইল্‌য়িচ-এর সতেরো বছরের জীবন। বেশ কিছুদিন হলো সে সরকারী উকিল হয়েছে এবং একটি আকাংখিত পদের আশায় বেশ কয়েকটি নতুন চাকরিব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। এমন সময় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটায় তার মনের শান্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল। আইভান ইল্‌য়িচ আশা করেছিল, একটি বিশ্ববিদ্যালয় শহরের প্রধান বিচারকের পদটি সে পাবে; কিন্তু জনৈক গোপ্পে তার উপর টেক্কা মেরে চাকরিটা বাগিয়ে নিল। আইভান ইল্‌য়িচ অসন্তুষ্ট হলো, ভদ্রলোককে গালাগালি করল, তার সঙ্গে এবং উর্ধ্বতন কর্মচারীদের সঙ্গে ঝগড়া করল। সকলে তার উপর অসন্তুষ্ট হলো এবং পরবর্তী নিয়োগের সময়ও তার দাবিকে মানা হলো না।

এটা ১৮৮০ সালের কথা। আইভান ইল্‌য়িচ-এর জীবনে সেটা সবচাইতে বেদনাদায়ক বছর। সেই বছরই বোঝা গেল যে, একদিকে তার মাইনে তার খরচের পক্ষে অপ্রতুল, আর অন্যদিকে যে ব্যাপারটা তার কাছে অত্যন্ত দানবীয় ও নিষ্ঠুরতম অন্যায় বলে মনে হলো, অন্য সবাই সেটাকে খুবই সাধারণ ঘটনা বলে মেনে নিলো। এমন কি তার বাবা পর্যন্ত তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল না। তার মনে হলো, সবাই তাকে পরিত্যাগ করেছে, তার এই তিন হাজার পাঁচ শ' রুবলের চাকরিটাকে সকলেই স্বাভাবিক ও ভাগ্য বলে মনে করছে। কিন্তু তার উপর তখন চেপে বসেছে তার প্রতি কৃত অবিচার, স্ত্রীর সীমাহীন অবহেলা এবং সাধ্যাতীত খরচপত্রের দরুন ক্রমবর্ধমান ঋণের বোঝা। তাই একমাত্র সেই জানে যে এ চাকরি তার পক্ষে মোটেই স্বাভাবিক নয়।

খরচপত্র কমাবার জন্য সে বছর গ্রীষ্মকালে ছুটি নিয়ে সে সস্ত্রীক তার শ্যালকের গ্রামে অবসর যাপন করতে চলে গেল।

গ্রামে গিয়ে হাতে কোনও কাজ না থাকায় আইভান ইল্‌য়িচ এই সর্বপ্রথম শুধু একঘেয়েমি নয় একটা দুঃসহ অবসাদেরও শিকার হয়ে পড়ল। সে মনস্থির করে ফেলল যে এ ভাবে চলতে পারে না, একটা চূড়ান্ত পথ তাকে বেছে নিতেই হবে।

ছাদের উপরে পায়চারি করে একটা বিনিদ্র রাত কাটিয়ে দিয়ে আইভান ইল্‌য়িচ স্থির করল, সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে সে পিতার্সবুর্গ যাবে এবং যাবা তার কাজের প্রকৃত মূল্য বুঝতে পারেনি তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে সে অন্য কোনও বিভাগে বদলির ব্যবস্থা করবে।

পরদিন শাশুড়ি ও স্ত্রীর যথেষ্ট আপত্তি সত্ত্বেও সে পিতার্সবুর্গ যাত্রা করল।

একটিমাত্র লক্ষ্য তার সামনে—পাঁচ হাজার আয়ের একটা চাকবি যোগাড় করা। যে কোনও বিভাগে, যে কোনও রকমের, যে কোনও কাজ করতে সে রাজী। তার একটি চাকরি চাই—যে চাকরির মাইনে পাঁচ হাজার, তা সে শাসন বিভাগে হোক, ব্যাংকে হোক, রেলওয়েতে হোক, এম্প্রেস মারিয়ার প্রতিষ্ঠানে হোক; এমন কি শুল্ক বিভাগে হোক—আসল কথা পাঁচ হাজার; আর একটি কথা, যে বিভাগ তার মূল্য বোঝেনি সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া।

আর কী আশ্চর্য, আইভান ইল্‌যিচ-এব এই অভিযান অপ্রত্যাশিতভাবে সাফল্য লাভ করল। কুর্সক্ স্টেশনে পূর্বপরিচিত এফ. এস. ইল্‌য়িন সেই একই প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠল। সেই জানাল যে কুর্সক্-এর গভর্নর এইমাত্র একটি তারবার্তায় জেনেছে, মন্ত্রিসভায় একটি পবিবর্তন হতে চলেছে—আইভান সেমিয়নভিচ আসছে পিয়তর আইভানভিচ-এর জায়গায়।

এই প্রস্তাবিত পরিবর্তনের গুরুত্ব রাশিয়ার দিক থেকে যাই হোক, আইভান ইল্‌যিচ-এর পক্ষে বিশেষভাবে অর্থবহ; একটি নতুন লোক পিয়তর পেত্রভিচ সামনেব সারিতে আসা মানেই তার বন্ধু জোহর আইভানভিচ-এর প্রথম সারিতে আসা, আর সেটাই আইভান ইল্‌য়িচ-এব পরিকল্পনার একান্ত অনুকূল। জোহর আইভানভিচ আইভান ইল্‌য়িচ-এর বন্ধু ও সহপাঠী।

মস্কোতে সে সংবাদ সমর্থিত হলো। পিতার্সবুর্গে পৌঁছে আইভান ইল্‌য়িচ জোহর আইভানভিচকে খুঁজে বের করল এবং তার পূর্বতন কর্মক্ষেত্র বিচার বিভাগেই একটি চাকরির সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি পেয়ে গেল।

এক সপ্তাহ পরে সে তার স্ত্রীকে তারবার্তা পাঠাল : "জোহর মিলারের বাড়ি। প্রথম সংবাদ চাকরি পেয়েছি।"

এই সব পরিবর্তনকে ধন্যবাদ, আইভান ইল্‌য়িচ অপ্রত্যাশিতভাবে আগেকার বিভাগেই এমন একটি চাকরি পেয়ে গেল যাতে সে পূর্বতন সহকর্মীদের চাইতে দু'ধাপ উপরে উঠে গেল, আর তার আয় দাঁড়াল পাঁচ হাজার এবং যাতায়াতের খরচ

বাবদ আরও তিন হাজার পাঁচ শ' সরকারী ভাতা। আগেকার শত্রু ও বিভাগীয় লোকজনদের সঙ্গে যে মনোমালিন্য ছিল সব ভুলে গিয়ে আইভান ইল্যিচ সব দিক থেকেই সুখী হয়ে উঠল।

অনেক দিন পরে বেশ হাল্কা মনে ও খোশ মেজাজে আইভান ইল্যিচ গ্রামে ফিরে গেল। প্রাস্কোভ্য়া ফিযদরভ্না্র মেজাজও ভাল হয়ে গেল; দু'জনের মধ্যে শান্তি ফিরে এল। আইভান ইল্যিচ সবিস্তারে বর্ণনা করতে লাগল যে, পিতার্সবুর্গে সকলেই তাকে খুব শ্রদ্ধা-সম্মান করেছে, আগেকার শত্রুরা সব লজ্জায় মুখ নিচু করেছে, তার নতুন চাকরি ও পিতার্সবুর্গে তার মান-মর্যাদা দেখে তারা ঈর্ষায় জ্বলেছে।

প্রাস্কোভ্য়া ফিয়োদরভ্না সব কথা শুনে বিশ্বাস করার ভান করল, কিন্তু তার কোনও কথার প্রতিবাদ করল না; বরং শহরে গিয়ে কি ভাবে গুছিয়ে বসবে তারই পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আর সে সব যে তারই পরিকল্পনা তা দেখে আইভান ইল্যিচও খুশি হলো; তার জীবনের গোলযোগের অধ্যায়টা কেটে গিয়ে আবার তার স্বাভাবিক হাল্কা মেজাজ ও শালীনতা ফিরে এল।

খুব অল্প কিছুদিনের জন্যই সে গ্রামে ফিরে এসেছিল। ১০ই সেপ্টেম্বর তাকে নতুন চাকরিতে যোগ দিতে হবে, তাছাড়া নতুন জায়গায় গুছিয়ে বসতে, আগেকার কর্মস্থল থেকে জিনিসপত্রগুলি আনাতে ও বাড়তি কিছু জিনিসপত্র কিনতে ও অর্ডার দিতে—এক কথায় তার নিজের মনের মতো করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাস্কোভ্য়া ফিয়দরভ্নার মনের মতো করে সব কিছু বিধি-ব্যবস্থা করতেও তো কিছুটা সময় লাগবে।

এবারে সব ব্যবস্থাই ভালভাবে হয়ে গেল. সে আর তার স্ত্রী সব বিষয়ে এতখানি একমত হতে লাগল যে বিবাহিত জীবনের প্রথম কিছুদিন ছাড়া আর কখনও সেরকমটি হয়নি। আইভান ইল্যিচ ভেবেছিল সপরিবারেই কর্মস্থলে যাবে, কিন্তু তার শ্যালক ও তার স্ত্রী হঠাৎ তাদের সকলের প্রতি এতই সদয় ও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল এবং তাদের আরও কিছুদিন বাড়িতে রাখতে এতই পীড়াপীড়ি করতে লাগল যে সে একাই কর্মস্থলে যাত্রা করল।

আইভান ইল্যিচ চলে গেল; নতুন সাফল্যের দরুন তার হাল্কা মনমেজাজ এবং স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ভাব দুয়েই মিলে তার মনটা বেশ খুশিই ছিল। যে বাসাটা সে পেল সেটাও চমৎকার; ঠিক যে রকমটি স্বামী ও স্ত্রী কল্পনা করেছিল। পুরনো কালের ধাঁচে তৈরি একটা প্রশস্ত, উঁচু বসবার ঘর, তার নিজের জন্য একটি বেশ আরামদায়ক রুচিপূর্ণ পড়ার ঘর, স্ত্রী ও মেয়ের ঘর, ছেলের থাকা-পড়ার ঘর, সব কিছু যেন তাদের প্রয়োজন মতো করেই তৈরি করা হয়েছে। আইভান ইল্যিচ মনের মতো করে বাসাটা সাজাল; দেয়াল-কাগজ পছন্দ করল, বেছে বেছে পুরনো ধরনের আসবাবপত্র কিনে আনল কারণ ঐ রকম জিনিসই তার কাছে বেশ সভ্যভব্য মনে হয়। এইভাবে জিনিসপত্র বাড়াতে বাড়াতে সব কিছু তার মনের মতো করে সাজাতে লাগল। কাজ

যখন অর্ধেক এগিয়েছে তখন দেখা গেল যে তার নিজের মনের বাসনাকেও সে ছাড়িয়ে গেছে। সবটা সারা হয়ে গেলে না জানি কেমন দাঁড়াবে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখতে লাগল বসবার ঘরটা কেমন দেখাবে; অগ্নিকুণ্ড, পর্দা, ফুলদানি, এখানে-ওখানে বসানো ছোট ছোট চেয়ার, দেয়ালে ডিশ, প্লেট, ব্রোঞ্জের মূর্তিগুলি—সব যেন তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। সবকিছু দেখে প্রাস্কোভ্য়া ও লিজাংকা কেমন অবাক হয়ে যাবে ভাবতেও তার খুব ভাল লাগল। এরকমটা নিশ্চয় তারা আশা করবে না। অনেক খুঁজে খুঁজে সে কিনে আনল বিশেষ করে পুরনো অথচ সস্তার আসবাবপত্র, কারণ তাতে একটা বিশেষ ধরনের আভিজাত্যের ছাপ থাকে। চিঠিপত্রে সে ইচ্ছা করেই সব ব্যাপারটাকে খাটো করে লিখল যাতে তাদের একেবারে অবাক করে দিতে পারে। এই সব নিয়ে সে এতই মশগুল হয়ে পড়ল যে সরকারী কাজে এত উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও তাতে তার মন আশানুরূপভাবে বসল না। আদালতে বসেই মাঝে মাঝে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত; তার মনে ভাবনা ঢুকত জানালার পর্দাগুলি কি ধরনের হলে ভাল হয়। গৃহস্থালির কাজে তার আগ্রহ এতখানি বেড়ে গেল যে অনেক সময় সে নিজের হাতেই কাজ করতে লাগল, একটা আসবাব ঠেলে সরিয়ে দিলো, অথবা একটা পর্দা খাটিয়ে দিলো। একদিন তো মজুরকে একটা কাজ বুঝিয়ে দেবার জন্য মই বেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে ভুল করে পা ফেলে পড়ে যাচ্ছিল আর কি, কোনওরকমে মইটা ধরে ঝুলে আত্মরক্ষা করল বটে, কিন্তু একটা ফ্রেমের ধাক্কা লাগল তার বুকে। জায়গাটা ছড়ে গিয়ে ব্যথা হলো, তবে শিগগিরই সেরে গেল। এই সময়টা তার খুবই ভাল কাটতে লাগল। সে লিখল, "আমার বয়স যেন পনেরো বছর কমে গেছে।" সে ভেবেছিল, বাসা সাজানো সেপ্টেম্বরেই শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু কাজটা চলল অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। তবে ফল হলো চমৎকার; শুধু সেই নয়, যে দেখল সেই বলল।

আসলে কিন্তু তার মধ্যে অসাধারণ কিছু ছিল না; যে সব লোক ধনবান না হয়েও নিজেদের ধনবান বলে জাহির করতে চায়, এবং তা করতে গিয়ে একে অন্যের অনুরূপ হয়ে ওঠে, অর্থাৎ সেই একই ঝাড়-লণ্ঠন, কালো কাঠ, ফুল, কম্বল, ব্রোঞ্জের মূর্তি, সব কিছু ঝকঝকে করে পালিশ করা, যে সব জিনিস এক শ্রেণীর সব লোকের আছে বলে অন্য আরেক শ্রেণীর লোকেরও থাকা চাই, সেই সব জিনিস দিয়েই আইভান ইল্যিচও ঘর-বাড়ি সাজিয়েছিল। তার ফল এই দাঁড়াল যে সে সব জিনিস মনের উপর কোনও বিশেষ প্রভাব ফেলতে না পারলেও সে নিজে ভাবল যে একটা বিশেষ রকমের কিছু করেছে। রেল স্টেশন থেকে পরিবারের লোকদের নিয়ে এসে সে যখন নতুন করে সাজানো বাড়িতে ঢুকল, তখন সমস্ত বাড়িটাতে আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে; সাদা টাই-পরা একজন পরিচারক এসে দরজা খুলে দিলো; প্রথম ঘরটা ফুল দিয়ে সাজানো; একে একে তারা বসবার ঘরে ও পড়ার ঘরে ঢুকে আনন্দে হৈ-হৈ করে উঠল; তা দেখে সেও খুশি হয়ে তাদের সব কিছু দেখাতে লাগল, আনন্দে

ঝলমলিয়ে উঠে তাদের অভ্যর্থনা জানাতে বার বার পানীয়ে চুমুক দিতে লাগল। সেদিন সন্ধ্যায় চা খেতে খেতে সে যখন নানা বিষয়ে কথা বলছিল, তখন প্রাস্কোভ্য়া ফিয়োদরভ্না তার পড়ে যাওয়াব প্রসঙ্গটা তুলতেই সে হো-হো করে হেসে উঠে তাদের দেখিয়ে দিলো কেমন করে একটা লাফ দিয়ে সে শয্যাকারীকে একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল।

"আরে, আমি তো একজন খেলোয়াড় মানুষ। অন্য কেউ হলে হয়ত মরেই যেত, কিন্তু আমার শুধু এখানটায় একটু লেগেছিল; এখানে হাত দিলে লাগে, তবে ধীরে ধীরে সেরে যাচ্ছে; একটুখানি ছড়ে গিয়েছিল মাত্র।"

সচরাচর যেমন হয়ে থাকে, নতুন বাসায় বাস করতে করতে তাদেরও এক সময় মনে হতে লাগল যে বাসাটায় একটা ঘর যেন কম আছে, আর তাদের আযটাও যৎসামান্য—মানে এই পাঁচশ' রুবলের মতো কম হচ্ছে; নইলে আর সবই বেশ ভাল। সাজানো-গোছানো চূড়ান্তভাবে শেষ হবার আগে পর্যন্ত সবই ভালভাবে চলতে লাগল, কারণ তখনও অনেক কিছু করার ছিল—কিছু কেনাকাটা, কিছু অর্ডার দেওয়া, কিছু সরানো-নড়ানো, কিছু ঠিক মতো ঠিক জায়গায় রাখা। অবশ্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কিছু খিটিমিটি যে বাধল না তা নয়, তবে দু'জনেই এত খুশি ছিল, আর হাতে এত কাজ ছিল যে বড় রকমের ঝগড়া-ঝাটি কিছু হলো না। তবে সব কাজকর্ম যখন সারা হয়ে গেল তখন কিছুটা একঘেয়ে লাগতে লাগল, কিসের যেন অভাব বোধ হতে লাগল। কিন্তু ততদিনে কিছু নতুন লোকজনের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় এবং নতুন কিছু অভ্যাস গড়ে ওঠায় জীবন আবার ভরে উঠল।

সকাল বেলাটা আদালতে কাটিয়ে আইভান ইল্য়িচ খাবার সময় বাড়ি ফিরত। সাধারণত সে সময় তার মেজাজ বেশ ভাল থাকত, তবে নতুন বাসাটা নিয়ে মাঝে মাঝে কিছুটা বিচলিত বোধ করত। টেবিল-ঢাকায় বা পর্দায় একটা দাগ পড়লে, অথবা জানালার পর্দার একটা দড়ি ছিঁড়ে গেলে সে ভারি বিরক্ত হতো। এত কষ্ট করে সে ঘরগুলি সাজিয়েছিল যে তার একটু এদিক-ওদিক হলেই তার মনে লাগত। তবে মোটামুটিভাবে আইভান ইল্য়িচ-এর জীবন তার আশানুরূপভাবেই চলতে লাগল—সহজ, স্বচ্ছন্দ ও শোভন। ন'টায় উঠে সে কফি খেত, খবরের কাগজ পড়ত, তারপর সরকারী পোশাক পরে আদালতে যেত। সেখানে দৈনন্দিন কর্মসূচী তৈরি করাই থাকত, সেও কাজ শুরু করে দিত। দরখাস্ত হাতে লোকজন, নানা রকম খোঁজ-খবর, আপিসের কাজ, সরকারী ও বেসরকারী সাক্ষাৎকার। এ সব কাজে একমাত্র দরকার হলো লোকের সঙ্গে কাজের সম্পর্ক ছাড়া অন্য সব রকম সম্পর্ককে অস্বীকার করে চলা; সব কাজকর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি; সমস্ত কাজটাই তো তাই। ধরা যাক, একটি লোক কোনও খবর জানতে এল। আইভান ইল্য়িচ যদি তখন কর্তব্যরত অবস্থায় না থাকে তাহলে লোকটির জন্য তার কিছুই করণীয় থাকবে না, কিন্তু আদালতের একজন সদস্য হিসাবে লোকটির সঙ্গে যদি তার কোনও সম্পর্ক

থাকে (যে সম্পর্ককে সরকারী শিরোনামভূষিত কাগজে লিখিতভাবে উল্লেখ করা যায়) তাহলে তার জন্য সে যথাসাধ্য সব কিছু করবে এবং তা করতে গিয়ে মানবিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক অর্থাৎ সামাজিক জীবনের রীতিনীতিকেই মেনে চলবে। কিন্তু সরকারী সম্পর্কের যেখানে ইতি, অন্য সব কিছুরও সেখানেই ইতি। সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তব জীবনের মধ্যে এই পার্থক্যকে বজায় রেখে চলবার কৌশলটা সে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্ত করে নিয়েছিল; দীর্ঘ অনুশীলন ও স্বাভাবিক প্রবণতার গুণে সে অনেক ক্ষেত্রেই সরকারী ও মানবিক সম্পর্ককে একসঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে ধূমপান করত, চা খেত, রাজনীতির কথাবার্তা বলত, সাধারণের কথা নিয়ে আলোচনা করত, তাসের কথাও হতো কিন্তু সব চাইতে বেশি কথা হতো চাকরিসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে। খুশি মনে শান্ত দেহে সে বাড়ি ফিরত। মেয়ে ও তার মা কোনওদিন হয়ত কোথাও বেড়াতে যায়, কোনওদিন বা অন্যরাই এ বাড়িতে আসে; ছেলে তার শিক্ষকের কাছে পড়াশুনা করে, বিদ্যালয়ের পড়াগুলি নির্ভুলভাবে শেখে। সবকিছু ঠিক-ঠিক মতোই চলে। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে কোনও অতিথি না থাকলে আইভান ইল্‌য়িচ কোনও বহু আলোচিত বই নিয়ে পড়তে বসে; সন্ধ্যার পরে কাজ করে, অর্থাৎ সরকারী কাগজপত্রে চোখ বোলায়, আইনের সঙ্গে সেগুলি মিলিয়ে নেয়, এজাহারগুলি আইন-মোতাবেক সাজিয়ে রাখে। এসব কাজ তার কাছে ক্লান্তিকরও মনে হয় না, আকর্ষণীয়ও লাগে না। "স্ক্রু" খেলা থাকলে এসব কাজ ভাল লাগে না; কিন্তু তা যখন না থাকে তখন একা একা অথবা স্ত্রীর সঙ্গে বসে কাটানোর চাইতে এ কাজ অনেক ভাল লাগে। ছোটখাট ভোজসভার আয়োজন করায় আইভান ইল্‌য়িচ-এর খুব আনন্দ। তাই সে সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন নারীপুরুষদের প্রায়ই বাড়িতে আমন্ত্রণ করে আনে।

একবার তারা একটা পার্টিও দিলো—নাচের পার্টি। আইভান ইল্‌য়িচ সেটা খুব উপভোগ করল; হলোও বেশ ভাল; শুধু চাটনি ও মিষ্টির ব্যাপার নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে একটা তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল। প্রাস্কোভ্‌য়া ফিয়দরভ্‌নার একরকম ইচ্ছা ছিলো; কিন্তু আইভান ইল্‌য়িচ জিদ করে একটা দামী দোকান থেকে মিষ্টিগুলো আনাল আর চাটনি আনাল অনেক বেশি পরিমাণে। এই নিয়ে লেগে গেল ঝগড়া, কারণ চাটনিটা পড়েই রইল, আর মিষ্টিওয়ালার বিল উঠল পঁয়তাল্লিশ রুবল। ঝগড়াটা এতই তুঙ্গে উঠল যে একসময় প্রাস্কোভ্‌য়া ফিয়দরভ্‌না তাকে বলল "বোকা, অপদার্থ," আর সেও দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরে রাগের মাথায় বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা বলে ফেলল। কিন্তু পার্টিটা খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। সব সেরা লোকরা এসেছিল এবং "আমার বোঝা বহন করো" নামক দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বোন রাজকুমারী ক্রুফনভ-এর সঙ্গে নেচেছিল আইভান ইল্‌য়িচ নিজে। কিন্তু তার সবচাইতে ভাল লেগেছিল "স্ক্রু" খেলাটা, যার রুশ নাম "পোকার"। সে নিজেই স্বীকার করে, তখন তার জীবনে যত অপ্রীতিকর ঘটনাই ঘটে থাকুক, হৈ-হৈ করা

খেলুড়ে নয় সত্যিকারের ভাল খেলুড়ের সঙ্গে বসে "স্ক্রু" খেলার আনন্দ সব কিছুকে ছাপিয়ে জ্বলন্ত মোমবাতির শিখার মতো জ্বল জ্বল করে; অবশ্য খেলাটা চার হাতের হওয়া চাই (অনেকে পছন্দ করলেও পাঁচ হাতের খেলাটা মোটেই জমে না) এবং ভাল তাস পাওয়া চাই; তখন গম্ভীরভাবে খেল, ভোজন করো, তারপর এক গ্লাস মদে চুমুক দাও। "স্ক্রু" খেলা শেষ করে, অল্পসল্প কিছু বাজি জিতে (বেশি টাকা জেতা ভাল না) আইভান ইল্‌য়িচ খুশি মনে ঘুমুতে চলে যেত।

এইভাবে দিন কাটতে লাগল। তারা উঁচু মহলে চলাফেরা করত; পদস্থ লোক ও যুবকরাও তাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করত। যুবকদের নজর পড়ল লিজাংকার উপর। দিমিত্রি আইভানভিচ পেত্রিশ্‌চেভ-এর ছেলে, তার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী ও তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট পেত্রিশ্‌চেভ লিজাংকার প্রতি এতদূর মনোযোগী হয়ে উঠল যে তাদের দু'জনকে একটি স্লেজ-ভ্রমণে পাঠাবার বা কোনও থিয়েটারে পাঠাবার ব্যবস্থা করা দরকার কিনা সে কথা নিয়ে আইভান ইল্‌য়িচ স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা পর্যন্ত শুরু করে দিলো। এইভাবেই দিন কাটতে লাগল। বিনা পরিবর্তনে সবকিছু এইভাবেই চলতে লাগল এবং ভালই চলতে লাগল।

৪

সকলেরই স্বাস্থ্য ভাল ছিল। আইভান ইল্‌য়িচ মাঝে মাঝে বলত, তার মুখটা বিস্বাদ লাগে, আর পাকস্থলীর বাঁদিকটায় একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়! কিন্তু সেটাকে তো কেউ স্বাস্থ্যহীনতার লক্ষণ বলবে না।

কিন্তু সেই অস্বস্তিকর অনুভূতিটা ক্রমেই বাড়তে লাগল এবং ঠিক ব্যথা না হলেও একটা পাশ যেন ভারী মনে হতে লাগল, আর মেজাজটাও খিটখিটে হয়ে উঠল। সেই খিটখিটে মেজাজটা বাড়তে বাড়তে ক্রমে গলোভিন পরিবারের সহজ স্বাচ্ছন্দ্য ও শালীনতাকেই নষ্ট করে ফেলতে লাগল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হয়, জীবনের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিদায় নিলো, অতি কষ্টে বাইরের চাল-চলনটা বজায় রেখে তারা দিন কাটাতে লাগল। মাঝে মাঝেই আবার অশালীন ঘটনা ঘটতে লাগল। বিনা সংঘর্ষে স্বামী-স্ত্রীর মিলন আবারও গোলযোগের সমুদ্রে কয়েকটি ছোট দ্বীপসদৃশ হয়ে উঠল। প্রাস্কোভ্‌য়া ফিয়োদরভ্‌না অকারণেই বলতে লাগল যে তার স্বামীর মেজাজ বড়ই খারাপ হয়ে পড়েছে' সর্বকিছু বাড়িয়ে বলার স্বভাবের জন্য সে বলতে লাগল, তার স্বামীর এই বদমেজাজ চিরদিনের ব্যাপার, নিজের স্বভাব ভাল বলেই সে বিশ বছর তার সঙ্গে ঘর করতে পেরেছে। তার রাগের ঝড় বইত ঠিক খাবার আগে, এবং প্রায়শই ঝোলটা মুখে দেবার ঠিক আগে। তার চোখে পড়ত, বাসনের একটা কোনা হয়ত ভেঙে গেছে, বা রান্নাটা ভাল হয়নি, অথবা ছেলে টেবিলের উপর কনুই তুলে বসেছে, বা মেয়ের চুলটা পরিষ্কার করে বাঁধা হয়নি। আর সে সব কিছুর জন্যই সে দায়ী করত প্রাস্কোভ্‌য়া ফিয়দরভ্‌নাকে। প্রথম প্রথম প্রাস্কোভ্‌য়া ফিয়দরভ্‌নাও

পাল্টা জবাব দিত, স্বামীকে তুলোধোনা করত; কিন্তু দু'দিন খাবার ঠিক আগে তার স্বামী এমন পাগলের মতো রেগে গেল যে সে বুঝতে পারল, এটা মাথার গোলমালের জন্য ঘটেছে, আর তাই সে নিজেকে সংযত করে নিল; কোনও জবাব না দিয়ে তাড়াতাড়ি খাবার পাট চুকিয়ে ফেলল। সে তখন ঠিক ধরে নিল যে তার স্বামীর মেজাজ ভয়ংকর হয়ে উঠেছে, ফলে তার জীবন হয়ে উঠেছে শোচনীয়, নিজের জন্য তার দুঃখের আর অবধি রইল না। যত নিজের দুঃখের কথা ভাবে, স্বামীর প্রতি ঘৃণা ততই বাড়ে। একসময় তার মনে হলো, এর চাইতে স্বামীর মৃত্যু হলেও ছিল ভাল; আবার তার মৃত্যুও সে কামনা করতে পারে না, কারণ তাহলে যে সংসারের কোনও আয় থাকবে না। আর তাতেই স্বামীর প্রতি সে আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। নিজেকে সে ভয়ংকরভাবে ভাবতে লাগল, কারণ তার স্বামীর মৃত্যুও তাকে বাঁচাতে পারবে না। মনের এই তীব্র বিরক্তিকে সে চেপেই রাখল; ওদিকে তার এই চাপা বিরক্তি তার স্বামীর মেজাজকে আরও খিটখিটে করে তুলল।

আবার একদিন তুমুল ঝগড়া হলো। সেদিন আইভান ইল্‌য়িচ-এরই দোষ ছিল। নিজের পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে সে বলল, সত্যি তার মেজাজ খিটখিটে হয়ে পড়েছে আর তার অসুস্থতাই এর কারণ। তখন স্ত্রীও বলল, সে যদি অসুস্থই হয়ে থাকে তাহলে তার উচিত উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া এবং একজন নাম-করা ডাক্তারকে দেখাবার জন্য সে পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

তাই সে গেল। সেখানেও যেমনটি আশা করা গিয়েছিল সব কিছু সেই রকমই ঘটল। ডাক্তার বলল, এটা-ওটা দিয়ে প্রমাণ হচ্ছে যে আপনার শরীরের মধ্যে এই এই ত্রুটি ঘটেছে; কিন্তু সেটা যদি এটা-ওটার পরীক্ষার দ্বারা সমর্থিত না হয় তাহলে আমরা এটা অথবা ওটা ধরে নেব। যদি আমরা এটা অথবা ওটা ধরে নেই, তাহলে— ইত্যাদি, ইত্যাদি। আইভান ইল্‌য়িচ-এর একটিমাত্র প্রশ্ন : তার অবস্থাটা বিপজ্জনক কি না? ডাক্তার কিন্তু সে অবান্তর প্রশ্নের দিকেই গেল না। ডাক্তারের দিক থেকে সে-প্রশ্নটা গৌণ, আলোচনাব মূল বিষয় নয়; আসল প্রশ্ন হলো—মূত্রাশয়ের দুর্বলতা, পুরাতন শ্লেষ্মা ও অ্যাপেন্ডিসাইটিস এই তিনটির মধ্যে কোন্‌টির সম্ভাবনা অধিক। আইভান ইল্‌য়িচ-এর জীবনের কথাটা বড় নয়, কথা হলো মূত্রাশয়ের দুর্বলতা, না আন্ত্রিক বিবর্ধন। আর আইভান ইল্‌য়িচ-এর মনে হলো, ডাক্তার খুব চমৎকারভাবেই আন্ত্রিক বিবর্ধনের সপক্ষে রায় ঘোষণা করল; অবশ্য একটি শর্ত যোগ করে দিলো যে প্রস্রাব পরীক্ষা করলে যদি নতুন কোনও হদিস পাওয়া যায় তাহলে তার রায়টাও বদলে যেতে পারে। এই সব দেখে শুনে আইভান ইল্‌য়িচ-এর নিজের জন্য যেমন করুণা হলো, তেমনি রাগ হলো ডাক্তাবের উপব।

কিন্তু মুখে সে কিছুই বলল না। উঠে দাঁড়িয়ে ডাক্তারের প্রাপ্য অর্থটা টেবিলে রেখে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমরা বোগীরা হয়ত অনেক সময়ই অসুবিধাজনক প্রশ্ন করে থাকি। আমাকে বলুন, এটা মারাত্মক রোগ কি না?"

ডাক্তার চশমার ভিতর দিয়ে এক চোখে তার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল; যেন বলতে চাইল : "কাঠগড়ায় বন্দী, তোমাকে যে সব প্রশ্ন করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তার সীমার মধ্যে যদি না থাক, তাহলে তোমাকে আদালতের সীমানার বাইরে পাঠাবাব মতো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে আমি বাধ্য হবো।" মুখে বলল, "যা বলা দরকার ও উচিত তা তো বলে দিয়েছি, বাকিটা পরীক্ষায় ধরা পড়বে।" ডাক্তার অভিবাদন জানিয়ে তাকে বিদায় দিলো।

হতাশ হৃদয়ে ধীর পায়ে বেরিয়ে এসে আইভান ইল্যিচ স্লেজে চড়ে বাড়ি ফিরে গেল। সারাটা পথ সে মনে মনে ডাক্তারের কথাগুলিই আওড়াতে লাগল; সেই সব জটিল, অস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক শব্দের একটা সরল নির্গলিতার্থ বের করে তার প্রশ্নের জবাব খুঁজতে লাগল—এটা কি খুব খাবাপ, না কি এখনও তেমন খারাপ কিছু হয়নি? সব কিছু ভেবেচিন্তে তার মনে এই ধারণা জন্মাল যে অবস্থা খুবই খারাপ। পথে যেতে যেতে আইভান ইল্যিচ-এর কাছে সব কিছুই নিরানন্দ বলে মনে হতে লাগল। স্লেজ-চালকরা নিরানন্দ, বাড়িগুলি নিরানন্দ, চলমান জনস্রোত ও দোকানপাট সবই নিরানন্দ। এই ব্যথা, এই একটানা কামড়ানো ব্যথা, যে ব্যথা এক সেকেন্ডের জন্যও থামে না, ডাক্তাবেব অস্পষ্ট কথাগুলির সঙ্গে যুক্ত হযে তা যেন নতুন করে গুরুতর হয়ে দেখা দিলো। এখন থেকে একটা নতুন দুঃখ নিয়ে সে তাব ব্যথাটার উপব নজব বেখে চলল।

বাড়িতে পৌছে সব কথাই সে স্ত্রীকে বলল। তার স্ত্রী বসে শুনছিল; কিন্তু কথার মাঝখানে তার মেয়ে টুপিটা হাতে নিয়ে মাকে সঙ্গে নিয়ে বেবিয়ে যাবাব জন্য প্রস্তুত হযে ঘরে ঢুকল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে আধা বসে এই একঘেয়ে বিবরণ শুনতে লাগল; কিন্তু বেশিক্ষণ শুনতে পারল না; তাব মাও শেষ পর্যন্ত শুনল না।

বলল, "দেখো, আমি খুব খুশি হযেছি; এবার তুমিও নিশ্চিন্ত হয়ে নিয়মিত ওষুধ খাবে। ব্যবস্থাপত্রটা আমাকে দাও; গেবাসিমকে ওষুধেব দোকানে পাঠাচ্ছি।" সেও বাইরে যাবার জন্য তৈরি হতে ঘর থেকে চলে গেল।

স্ত্রী যতক্ষণ ঘরে ছিল ততক্ষণ আইভান ইল্যিচ নিঃশ্বাস নিতে পারেনি; সে চলে গেলে তবে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

বলল, "দেখা যাক, হয় তো এখনও তেমন কিছুই হয়নি।"

সে ওষুধ খেতে শুরু করে দিলো। ডাক্তারের নির্দেশ মতো চলতে লাগল। প্রথম দিকে তাতে মনে বেশ স্বস্তিও ফিরে এল।

ব্যথাটা কমল না; কিন্তু আইভান ইল্যিচ জোর কবেই ভাবতে লাগল যে সে অনেক ভাল হযে গেছে। আর যতদিন উদ্বেগজনক কিছু না ঘটল ততদিন এই বিশ্বাসেই সে নিজেকে ঠকিয়ে চলল। কিন্তু যে মুহূর্তে একটা খারাপ কিছু ঘটত, হয়ত স্ত্রীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হলো, সরকারী কাজ ঠিকমতো করা হলো না, "স্ক্রু" খেলতে বসে হাতে খারাপ তাস এল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে অসুখের কথা তার মনে পড়ে

যেত। এর আগে এ ধরনের আকস্মিক ঘটনাকে সে মানিয়ে নিতে পারত, আশা করত ভুলটা শুধরে নেবে, সংগ্রাম করবে, কাজে সফলতা লাভ করবে, হাতে ভাল তাস পাবে। কিন্তু ইদানীং খারাপ কিছু ঘটলেই সে মুষড়ে পড়ে, হতাশায় ভেঙে পড়ে। নিজের মনেই বলে : "এই তো সবে ভাল হতে আরম্ভ করেছি, ওষুধের ফল ফলতে শুরু করেছে, এরই মধ্যে আবার দুর্ঘটনা ও হতাশা।" সঙ্গে সঙ্গে সেই দুর্ঘটনা ও যারা সেটা ঘটিয়ে তাকে মেরে ফেলছে সে সব কিছুর উপর সে খাপ্পা হয়ে ওঠে; সে বুঝতে পারে যে এই মানসিক উত্তেজনা তার ক্ষতি করছে, কিন্তু নিজেকে সংযত করতে পারে না। কেউ ভাবতে পারে যে, এই উত্তেজনা যে তার ক্ষতি করছে এবং এই সব অপ্রীতিকর ঘটনার দিকে যে তার নজর দেওয়া উচিত নয় এ কথা তো তার বোঝা উচিত। কিন্তু তার চিন্তার ধারাটা ঠিক উল্টো দিকে চলে। সে বলে, সে শান্তি চায়, কাজেই যা কিছু তার শান্তিতে বিঘ্ন ঘটায় তার প্রতিই তাকে নজর রাখতে হয়, আর সেই শান্তির তিলমাত্র বিঘ্ন ঘটলেই সে ক্রোধে ফেটে পড়ে। সে নিয়মিত ডাক্তারি বই পড়ে ও ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করে বলেই তার অবস্থা আরও খারাপ হতে লাগল। যখনই ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করে তখনই তার মনে হয় যে তার অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে এবং বেশ দ্রুত গতিতেই খারাপ হয়ে চলেছে। আর তা সত্ত্বেও ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করা তার চাই।

সে-মাসে আরও একজন খ্যাতনামা ডাক্তারকে সে দেখাল। প্রথম খ্যাতনামাটি যা যা বলেছিল দ্বিতীয় খ্যাতনামাটিও একই কথা বলল, শুধু প্রশ্নগুলি করল ভিন্নভাবে; ফলে আইভান ইল্যিচ-এর সন্দেহ ও আতংক আরও বেড়ে গেল। তার বন্ধুর বন্ধু একটি ভাল ডাক্তার রোগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্নমত প্রকাশ করল; রোগ নিরাময় সম্পর্কে নিশ্চিত আশ্বাস দিলেও তার নানা রকম প্রশ্ন ও ধারণার কথা শুনে আইভান ইল্যিচ-এর মনে সব কিছু এমনভাবে গুলিয়ে গেল যে তার সন্দেহটাই আরও বেড়ে গেল। একজন হোমিওপ্যাথ আবার অন্যরকমভাবে রোগ-নির্ণয় করে ওষুধ দিলো এবং সেও লুকিয়ে এক সপ্তাহ সে ওষুধ খেল। কিন্তু এক সপ্তাহ পরেও রোগ হ্রাস না পাওয়ায় অপর ডাক্তার এবং হোমিওপ্যাথ দু'জনের উপরেই বিশ্বাস হারিয়ে সে আরও মন-মরা হয়ে পড়ল। পরিচিত এক মহিলা একদিন পবিত্র ছবির সাহায্যে রোগ-নিরাময়ের কথা বলল। আইভান ইল্যিচ মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনল এবং বিশ্বাসও করে বসল। এই ঘটনাটি তাকে আরও আতংকিত করে তুলল। নিজে নিজেই বলল, "আমার বুদ্ধি কি এতই ভোঁতা হয়ে গেছে? যত সব অর্থহীন বাজে কথা! এ ধরনের স্নায়বিক আতংক আর নয়। এবার থেকে একজন ডাক্তার ঠিক করে তার চিকিৎসামতোই চলব। তাই করব। এটা একেবারে পাকা। আগামী গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত আর এ নিয়ে ভাবব না। যা হয় তারপর দেখা যাবে। এই দো-টানা ভাবটা বন্ধ করতেই হবে!" কথাটা বলা সহজ, কিন্তু মেনে চলা কঠিন। পাশের ব্যথাটা লেগেই আছে, ক্রমেই যেন বাড়ছে আর এক নাগাড়ে চলেছে; মুখের স্বাদটাও

যেন অদ্ভুত ঠেকছে, নিঃশ্বাসেও যেন একটা দুর্গন্ধ বের হচ্ছে, আর ক্ষুধা ও গায়ের জোরও কমে আসছে। নিজেকে ঠকিয়ে তো লাভ নেই; আইভান ইল্‌য়িচ-এর জীবনে এমন কিছু ঘটছে যা এর আগে কখনও ঘটেনি, যা ভয়ংকর ও নতুন। এ কথা শুধু সেই জানে। তার আশেপাশের লোকরা তা জানে না, জানতে চায়ও না। তারা মনে করছে, জগৎটা ঠিক আগেকার মতোই চলছে! আর এটাই আইভান ইল্‌য়িচকে সব চাইতে বেশি যন্ত্রণা দিচ্ছে। তার নিজের বাড়ির লোকজন, বিশেষ করে তার স্ত্রী ও মেয়ে, অতিথিদের স্রোত নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকে যে তার অবস্থাটা তারা বোঝেই না; বরং তার এই মন-মরা খুঁতখুঁতে ভাবের জন্য বিরক্ত হয়ে তাকেই দোষী সাব্যস্ত করে। তার স্ত্রী তো সকলের কাছেই বলে বেড়ায : "অন্য সাধারণ লোকদের মতো আইভান ইল্‌য়িচ তো কোনও ডাক্তারের কথামতোই চলে না। একদিন হয়ত ঠিকমতো ওষুধ খেল, যথাসময়ে শুতে গেল; কিন্তু পরদিন আমি নজর না দিলেই সে ওষুধ খেতে ভুলে যাবে, 'স্টার্জন' গিলবে। (যেটা ডাক্তারের বারণ) এবং মাঝ রাত পর্যন্ত জেগে 'স্ক্রু' খেলবে।"

বিরক্ত হয়ে আইভান ইল্‌য়িচ একদিন পিয়তর আইভানভিচকে বলল, "সে কি, সেরকমটা আবার কখন করলাম?"

"কেন, কাল, শেবেক-এর সঙ্গে।"

"তাতে কি হল? ব্যথার জন্য আমি ঘুমুতে পারছিলাম না।"

"দেখো কি জন্য কি করেছ সেটা কথা নয়। মোদ্দা কথা এভাবে চললে তুমি কোনওদিন ভাল হয়ে উঠবে না, আর আমাদের জ্বালাবে।"

চাকরি-জীবনেও তার প্রতি সকলের ব্যবহারে একটা পরিবর্তন সে লক্ষ্য করল, অন্তত তার সেইরকম মনে হতে লাগল। কখনও তার মনে হতো, সকলে তার দিকে এমন কৌতূহলের সঙ্গে তাকিয়ে আছে যেন শীঘ্রই সে চাকরি ছেড়ে চলে যাচ্ছে, কখনও বা বন্ধুরা তার স্নায়বিক আতংক নিয়ে তার পিঠটা একটু চাপড়ে দেয়, যেন তার জীবনের এই ভয়ংকর অবস্থাটাও তাদের কাছে একটা তুচ্ছ হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার। বিশেষ করে ফুর্তিবাজ শ্‌ভার্তস্‌ তার দশ বছর আগেকার জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে আরও উত্তেজিত করে তোলে।

আর এইভাবে একা তাকে জীবন কাটাতে হচ্ছিল যেন পর্বতের একেবারে কিনারায় দাঁড়িয়ে : তাকে বুঝতে পারে, তার জন্য কষ্টবোধ করতে পারে এমন কেউ তখন তার পাশে নেই।

৫

এইভাবে একমাস, তার পরের মাস কেটে গেল। নববর্ষের ঠিক আগে তার শ্যালক শহরে এল তাদের সঙ্গে দেখা করতে। সে যখন পৌঁছল, আইভান ইল্‌য়িচ তখন আদালতে, প্রাস্কোভ্‌য়া ফিয়দরভনা বেরিয়ে গেছে কেনাকাটা করতে। বাড়িতে

ফিরে পড়ার ঘরে গিয়ে সে দেখল তার শ্যালক ট্রাংকটা খুলে জিনিসপত্র বের করছে। আইভান ইল্য়িচ-এর পায়ের শব্দ শুনে সে মাথাটা তুলল, এবং কোনও কথা না বলে এক সেকেন্ড তার দিকে তাকাল। সেই তাকানোই আইভান ইল্য়িচকে সবকিছু বলে দিলো। সবিস্ময়ে "ওঃ!" কথাটা বলতে গিয়েও শ্যালক নিজেকে সংযত করে নিল। তাতেই সব বলা হয়ে গেল।

"কি! আমি বদলে গেছি, না?"

"হ্যাঁ, পরিবর্তন হয়েছে।"

তারপর আইভান ইল্য়িচ কথা বলার চেষ্টা করেও শ্যালকের মৌনতা ভাঙতে পারল না। প্রাস্কোভ্য়া ফিয়দরভ্না বাড়ি ফিরলে শ্যালক তার সঙ্গে দেখা করতে গেল। আইভান ইল্য়িচ দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখতে লাগল; প্রথমে মুখোমুখি তারপর পাশ থেকে। স্ত্রীব সঙ্গে তোলা ফটোখানা হাতে নিয়ে তার সঙ্গে আয়নায় দেখা চেহারাটা মিলিয়ে দেখল। অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তারপর কনুই পর্যন্ত হাতটা খুলে দেখে আবার আস্তিনটা নামিয়ে দিলো; আবার "অটোমান"-টায় গিয়ে বসল; তাব মন তখন রাতের চেযেও অন্ধকার।

"এ ভাবে চলবে না," নিজের মনেই কথাগুলি বলে সে লাফ দিয়ে উঠে টেবিলের কাছে গেল, দেরাজ খুলে কিছু সরকারী কাগজ বের করে পড়তে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। দরজা খুলে বসবার ঘরে গেল। দরজাটা বন্ধ। পা টিপে টিপে এগিয়ে সে কান পাতল।

প্রাস্কোভ্য়া ফিযদরভ্না বলছে, "না, না, তুমি বাড়িয়ে বলছ।"

"বাড়িয়ে বলছি? তোদেব চোখ নেই। আরে, ও তো মবা মানুষের সামিল। চোখের দিকে তাকিয়ে দেখিস— সেখানে আলোর চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু ওর হয়েছে কি?"

"কেউ বলতে পারছে না। নিকোলেভ (জনৈক ডাক্তার) কি যেন বলেছে, আমি জানি না। লেশ্চেতিস্কি (সেই বিখ্যাত ডাক্তার) বলেছে ঠিক তার উল্টো।"

আইভান ইল্যিচ ধীর পায়ে তার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে বলল ঃ "মূত্রাশয়—দুর্বল মূত্রাশয়।" ডাক্তারের কথাগুলি তাব মনে পড়ে গেল; কেমন করে এটা ঘটেছে, মূত্রাশয়টি কেমন করে দুর্বল হয়ে পড়েছে; কল্পনায় সে যেন মূত্রাশয়টিকে চেপে ধরে তার শক্তি ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করল। তার মনে হলো, কত অল্পতেই সব ঠিক হয়ে যেতে পারে। "না, আবার আমি পিয়তর আইভানভিচ-এর কাছে যাব (এই হলো সেই বন্ধু যার একজন ডাক্তার বন্ধু আছে)।" ঘণ্টা বাজিয়ে ঘোড়াটা জুত্তে বলে সে বেরিয়ে যাবার জন্য তৈরি হলো।

মুখে বিশেষ বিষণ্ণতা ও অত্যন্ত বেশি করুণার ভাব ফুটিয়ে তার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় চললে জিন?"

এই বিশেষ করুণার ভাবটা তাকে মরিয়া করে তুলল। কঠোর দৃষ্টিতে সে স্ত্রীর দিকে তাকাল।

"পিয়তর আইভানভিচ-এর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

বন্ধুর কাছে পৌঁছে তাকে নিয়ে ডাক্তার-বন্ধুব কাছে গেল। ডাক্তার বাড়িতেই ছিল। তার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনাও হলো।

ডাক্তারের মতে তাব দেহে শারীর-সংস্থানগত যে সব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলেছে সেগুলি পর্যালোচনাব ফলে সব ব্যাপারটা সে বেশ বুঝতে পারল। একটিমাত্র জিনিস—একটু সামান্য আন্ত্রিক গোলযোগের ব্যাপার। সবই ভাল হয়ে যেতে পারে। শুধু একটি দুর্বল অঙ্গকে কিছুটা শক্তিশালী করে তোলো, আব অপর একটি অঙ্গের অত্যধিক চলাচলকে সীমিত করো, তাহলেই দেহযন্ত্রের ক্রিয়া যথাযথ হবে এবং সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

খেতে যেতে তার একটু দেরি হয়ে গেল। খাওয়া শেষ করে বেশ খুশি মনে সে কথাবার্তা বলল এবং বেশ কিছু সময় পরে তার ঘরে গেল হাতের কাজ শেষ করতে। আইনের কাগজপত্রগুলি পড়ল, কিছু কিছু কাজও করল, কিন্তু মন বসল না। যা হোক, কাজ শেষ করে সে চা খেতে গেল। বসবার ঘরে তখন অনেক লোক। কথাবার্তা, পিয়ানো বাজনা ও গান হচ্ছে। মেয়ের ভাবী বর সেই তদন্তকাবী ম্যাজিস্ট্রেটও হাজির। প্রাস্কোভ্যা ফিয়দরভ্না লক্ষ্য করল, আইভান ইল্যিচ সন্ধ্যাটা বেশ খোশ মেজাজেই কাটাল। এগারোটার সময় সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে তার ঘবে চলে গেল। রোগেব পর থেকেই পড়ার ঘরের সঙ্গে লাগোযা একটা ছোট ঘরে সে ঘুমোয়। ঘরে ঢুকে পোশাক বদলে সে জোলা-র একটা উপন্যাস হাতে নিল, কিন্তু মোটেই পড়ল না; একটা চিন্তা তাকে পেয়ে বসল। কল্পনায় সে দেখতে পেল, তাব বহু আকাঙ্ক্ষিত রোগমুক্তি ঘটেছে। গ্রহণ ও বর্জনের পথ ধবে অন্ত্রের নিয়মিত কাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

"কেন, ব্যাপারটা খুবই সরল," নিজেই নিজেকে বলল। "প্রকৃতিকে সাহায্য কবা চাই।" ওষুধটার কথা মনে পড়ল, উঠে ওষুধটা বের কবে খেল, চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল, তাবপর ওষুধের ক্রিয়ায ব্যথাটা কখন চলে যায় সেটা লক্ষ্য করতে লাগল। "ওষুধটা নিয়মিত খেতে হবে এবং অন্য সব ক্ষতিকর প্রভাবকে এড়িয়ে চলতে হবে; সে কি, এরই মধ্যে আমি ভাল বোধ করেছি, অনেকটা ভাল।" পাশটা চেপে ধরল; তাতে কোনওরকম ব্যথা লাগল না। "হ্যাঁ, ব্যথা লাগছে না,—সত্যি, এর মধ্যেই অনেকটা ভাল।" মোমবাতিটা নিভিয়ে সে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। "আন্ত্রিক বিবর্ধনটা অনেক ভাল হয়ে এসেছে।" হঠাৎ আবার সেই একটানা কামড়ানো ব্যথাটা মাথাচাড়া দিলো। মুখের ভিতরে আবার সেই অদ্ভুত স্বাদ। তার মন দমে গেল, মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল, সব যেন কেমন ধোঁয়া-ধোঁয়া। "হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর!" সে বলে উঠল, "আবার, আবার; এ বুঝি কোনওদিন থামবে না।" সহসা সমস্ত ব্যাপারটা যেন একটা নতুন রূপ নিয়ে তার সামনে দেখা দিলো। নিজেব মনেই সে বলে উঠল, "আন্ত্রিক বিবর্ধন। মূত্রাশয়। এ সব কথা নয়, আসল কথা হলো জীবন এবং...মৃত্যু। হ্যাঁ, জীবন

আছে, কিন্তু এখন চলে যাচ্ছে; আমি তাকে থামাতে পারছি না। হ্যাঁ। নিজেকে ঠকিয়ে লাভ কি? একমাত্র আমি ছাড়া আর সকলেই জানে যে আমি মরতে বসেছি; এখন শুধু সময়ের ব্যাপার—সপ্তাহ, দিন—হয় তো এই মুহূর্ত। ছিল আলো, এখন অন্ধকার। আমি এখানে ছিলাম, এবার চলে যাচ্ছি! কোথায়?" একটা শীতল হাওয়ায় সে কেঁপে উঠল; তার নিঃশ্বাস থেমে গেল। নিজের হৃৎপিণ্ডের ধুক-ধুক শব্দ ছাড়া আর কিছুই সে শুনতে পেল না।

"আমি আর থাকব না; তখন তাহলে কি থাকবে? কিছুই থাকবে না। যখন এখানে থাকব না, তখন কোথায় থাকব? এরই নাম কি মৃত্যু? না, আমি মরতে চাই না!" লাফ দিয়ে উঠে সে মোমবাতিটা ধরাতে চেষ্টা করল; তার কাঁপা হাত থেকে বাতিদানসুদ্ধু মোমবাতিটা মেঝেতে পড়ে গেল; সেও আবার বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। হাঁ করে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই সে বলে উঠল, "হৈ-চৈ করে লাভ কি? কিছুই যায়-আসে না। মৃত্যু। হ্যাঁ, মৃত্যু। আর তারা—তারা সকলেই—কিচ্ছু বোঝে না, বুঝতে চায় না, একটু করুণাও অনুভব করে না। তারা তো খেলছে। (অনেক কথার ঢেউ বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে ভেসে আসছে) তাদের কোনও খেয়ালই নেই। কিন্তু তারাও মরবে। বোকার দল! আমি আগে, তারা পরে; কিন্তু সকলেরই এক পরিণাম। অথচ তারা কী খুশি! জানোয়ারের দল!" রাগে তার গলা আটকে গেল। দুঃসহ যন্ত্রণায় সে কাতরাতে লাগল। "সব কালে সব মানুষেরই এই ভয়ংকর নিয়তি—তা হতে পারে না।" সে আবার উঠে বসল।

"এই চিন্তার মধ্যে কোথাও ভুল আছে। আমাকে শান্ত হতে হবে; প্রথম থেকে আবার ভেবে দেখতে হবে।" সে আবার ভাবতে বসল। "হ্যাঁ, আমার রোগের গোড়ার কথা। বুকের পাশটায় একটা আঘাত লেগেছিল, কিন্তু সেদিন এবং তারপর অনেক দিন আমি যেমন তেমনি ছিলাম; একটু ব্যথা হলো, ব্যথাটা বাড়ল, তারপর ডাক্তার, মন খারাপ, কষ্ট, এবং আবার ডাক্তার; এমনই করে ক্রমেই অতল গহ্বরের দিকে এগোতে লাগলাম। আর আজ শরীর ক্ষয় হয়েছে, চোখে আলো নেই। আমি ভাবছি কি করে আন্ত্রিক রোগ সারবে, কিন্তু এ তো মৃত্যু। এই কি মৃত্যু?" আবার আতংক তাকে ঘিরে ধরল; হাঁপাতে হাঁপাতে উপুড় হয়ে দেশলাই খুঁজতে গিয়ে কনুইটা পাশের টেবিলে ঠুকে গেল। টেবিলটা তার পথের মাঝখানে ছিল, তাই ধাক্কা লাগল। টেবিলটার উপরই রাগ হলো, আর সেই রাগে আরও জোরে ধাক্কা মেরে সেটাকে উল্টে দিলো। হতাশায় রুদ্ধশ্বাস হয়ে সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে সে আসন্ন মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল।

তখন অতিথিদের যাবার সময় হয়েছে। প্রাস্কোভ্য়া ফিয়দরভ্না তাদের এগিয়ে দিতে গেছে। হঠাৎ একটা কিছু পড়ার শব্দ শুনে সে ঘরে ঢুকল।

"ব্যাপার কি?"

"কিছু না। হঠাৎ কি যেন একটা পড়ে গেছে।"

তার স্ত্রী বেবিয়ে গিয়ে একটা মোমবাতি নিয়ে এল। স্বামী শুয়ে আছে; সে এমন ভাবে হাঁপাচ্ছে যেন এক মাইল পথ দৌড়ে এসেছে। একদৃষ্টিতে সে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আছে।

"ব্যাপার কি জিন?"

"কি—চ্ছু না। আমি বলছি। কি যেন ফেলে দিয়েছি।"—মনে মনে ভাবল, "বলে কি লাভ? ও কিছু বুঝবে না।"

সত্যি তার স্ত্রী কিছু বুঝল না। মোমবাতিটা তুলে জ্বালিয়ে দিয়ে সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে চলে গেল। একজন বিদায়ী অতিথিকে সম্ভাষণ জানানো তখনও বাকি। সে যখন ফিরে এল, আইভান ইল্‌য়িচ তখনও সেই একই ভাবে উপরের দিকে তাকিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে।

"কেমন আছ—আরও খারাপ?"

"হ্যাঁ।"

স্ত্রী মাথা নেড়ে বসে পড়ল।

"আচ্ছা জিন, লেশ্‌চেতিৎস্কিকে একবার এখানে ডেকে এনে দেখালে ভাল হতো না?"

এর অর্থ খরচের পরোয়া না করে সেই বিখ্যাত ডাক্তাবকে আবার ডাকা। অপ্রসন্ন হাসি হেসে সে বলল—"না।" স্ত্রী আব একমুহূর্ত বসে থেকে উঠে তার কাছে গেল এবং তার কপালে চুমো খেল।

স্ত্রী যখন চুমো খাচ্ছিল সে তখন মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে ঘৃণা করছিল; অনেক চেষ্টা করে তবে তাকে সবিয়ে দেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পেরেছিল।

"শুভ রাত্রি। ঈশ্বব করুন, তুমি যেন ঘুমোতে পাবো।"

"হ্যাঁ।"

৬

আইভান ইল্‌য়িচ বুঝতে পারল তাব মৃত্যু আসন্ন; হতাশায় তার বুক ভরে গেল।

অন্তবের গভীরে সে জানল যে তার মৃত্যু আসন্ন, কিন্তু সে সত্যকে মেনে নেওয়া তো দূরের কথা, সে সত্যকে সে উপলব্ধিই করতে পারল না—উপলব্ধি করতে সে সম্পূর্ণ অক্ষম।

কাইয়ুস একটি মানুষ, মানুষরা মরণশীল, সুতরাং কাইয়ুস মরণশীল—কিসেভেটার-এর ন্যায়শাস্ত্রে ন্যায়-অনুমানের এই যে দৃষ্টান্তটি সে শিখেছিল সারাটা জীবন সে জেনে এসেছে সেটা কাইয়ুসের বেলায়ই সত্য, তার বেলায় নয়। সে ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল কাইয়ুসের, একটা মানুষের, একটা বিমূর্ত মানুষের আর তাই সেটা ছিল সত্য; কিন্তু সে তো কাইয়ুস নয়, সে তো বিমূর্ত মানুষ নয়; সে তো

আগাগোড়াই একটি প্রাণী, অন্য সবার চাইতে স্বতন্ত্র একটি প্রাণী; মা ও বাবা এবং মিতিয়া ও ভলদ্যার কাছে সে ছিল ছোট্ট ভানিয়া; তার খেলার সামগ্রী ছিল, কোচয়ান ছিল, নার্স ছিল; তারপর শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের সব সুখ, দুঃখ ও আনন্দ নিয়ে সে কাতেংকার সঙ্গে দিন কাটিয়েছে। যে চামড়ার বলটা ভানিয়ার বড় প্রিয় ছিল তার সুঘ্রাণের কথা কাইয়ুস কি জানে? কাইয়ুস কি তার মায়ের হাতখানিতে অমন করে চুমো খেয়েছে? তার মায়ের রেশমের ঘাগরার খস্‌খস্ শব্দ তো কাইয়ুস শোনেনি। সে তো স্কুল পুডিং নিয়ে হৈ-চৈ করেনি। কাইয়ুস এমন ভাবে ভালবেসেছে? কাইয়ুস কি আদালতে প্রধানের আসনে বসেছে?

কাইয়ুস নিশ্চয়ই মরণশীল ছিল, তাই তার পক্ষে মরাই ঠিক হয়েছে; কিন্তু আমি, ছোট্ট ভানিয়া আইভান ইল্যিচ, আমার পক্ষে ব্যাপারটা আলাদা। তাই আমার মরা উচিত এটা কখনও ঠিক হতে পারে না। সেটা বড় বেশি ভয়ংকর।

এই তার মনের কথা। "কাইয়ুস-এর মতো আমিও যদি মরণশীল হতাম, তাহলে আমি সেটা জানতে পারতাম, কোনও অন্তরের কণ্ঠস্বর আমাকে তা বলে দিত। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটেনি। আমি এবং আমার বন্ধুরা বরং জানতাম যে, আমাদের অবস্থা কাইয়ুস-এর মতো নয়। আর আজ এই অবস্থা! এটা হতে পারে না, কিন্তু হয়েছে! কি করে হলো? এটাকে কি ভাবে বুঝব?" এটা সে বুঝতে পারত না; তাই এ ধারণাটাকে মিথ্যা, বেঠিক ও অসুস্থ মনে করে তাকে মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তার জায়গায় অন্য সঠিক ও সুস্থ ধারণার আমদানি করতে চেষ্টা করত। কিন্তু এটা তো শুধু ধারণা নয়, এ যে বাস্তব ঘটনা, তাই এটা ফিরে ফিরে এসে তার পথ রোধ করে দাঁড়াত।

একসময় সে হয়ত ভাবত, "আবার সরকারী কাজের মধ্যেই ডুবে থাকব। একসময় তো তাই নিয়েই বেঁচে থাকতাম।" আর সব সন্দেহ দূরে ঠেলে দিয়ে আদালতেই যেত। সেখানে সহকর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলত, পুরনো অভ্যাস মতো হেলান দিয়ে বসে যেন স্বপ্নের ভিতর দিয়ে নিচের জনতাকে দেখত, আগেকার মতোই ওক কাঠের চেয়ারের হাতলে শীর্ণ হাত দুটি রেখে কোনও সহকর্মীর দিকে ঝুঁকে তার হাতে কোনও কাগজপত্র দিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে কিছু বলত, আর তার পরেই হঠাৎ চোখ নামিয়ে খাড়া হয়ে বসে মামলার মুখবন্ধ হিসাবে অতি পরিচিত কথাগুলি উচ্চারণ করত। কিন্তু হঠাৎ মাঝখানে সেই পাশের ব্যথাটা মাথাচাড়া দিতো। আইভান ইল্যিচ-এর সব মনোযোগ সেইদিকে ঘুরে যেত। ব্যথার চিন্তাটাকে সে মন থেকে তাড়িয়ে দিলেও তার কাজের বিরাম ঘটত না, আর তারপরেই সে এল, তার সামনে দাঁড়াল, তার দিকে তাকাল। আইভান ইল্যিচ যেন পাথর হয়ে গেল, তার চোখের আলো নিভে গেল, সে আবার নিজেকে প্রশ্ন করল, "তাহলে সেই কি একমাত্র সত্য?" আর তার সহকর্মী ও অধস্তন কর্মচারীরা সবিস্ময়ে ও সখেদে লক্ষ্য করল যে সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন সফল বিচারক হয়েও সে কথার খেই হারিয়ে ফেলছে, ভুল বলছে। নিজেকে নাড়া দিয়ে সে আত্মসংযম ফিরে পেতে চেষ্টা করল, এবং কোনও

রকমে মামলাটা শেষ করে এই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ি ফিরল যে আগেকার মতো বিচারসংক্রান্ত কাজকর্ম দিয়েও সে সব কিছু চাপা দিতে পারে না; সরকারী কাজের আড়াল দিয়েও সে তার কাছ থেকে পালাতে পারে না। আর এ ব্যাপারের সব চাইতে খারাপ দিকটা হলো, কোনও বিশেষ কাজের জন্য সে আইভান ইল্‌য়িচকে নিজের দিকে আকর্ষণ করত না; সে চাইত সে শুধু তার মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে থাকুক, তাকিয়ে থাকুক আর কোনও কাজ না করে অব্যক্ত যন্ত্রণা ভোগ করুক।

এই রকম অবস্থার মধ্যে কখনও কখনও সে তার নিজের হাতে সাজানো বসবার ঘরটায় যেত, সেই ঘর যেখানে সে পড়ে গিয়েছিল, যার জন্য—আজ সে কথা ভাবাও কী ভয়ংকর রকমের হাস্যকর—যে ঘর সাজাবার জন্য তার জীবনটাই বলি দিয়েছে, কাবণ সে জানে সেই ছড়ে যাওয়া থেকেই এই রোগেব সূত্রপাত। ভিতরে ঢুকেই তার নজরে পড়ল, পালিশ-করা টেবিলটায় অনেক আঁচড় লেগেছে। কাবণ খুঁজতে গিয়ে সে বুঝতে পারল, অ্যালবামটার ব্রোঞ্জেব আংটাটাব ঘষাতেই আঁচড়গুলো পড়েছে। অ্যালবামটা দামী। কত যত্ন করে সে এটাকে সাজিযেছিল। সেটাকে হাতে নিয়ে মেয়ে ও তার বন্ধুবান্ধবুদের অযত্নের জন্য সে বিরক্ত হলো। কোথাও একটা পাতা ছিঁড়ে গেছে, কোথাও বা ফটোটা স্থানচ্যুত হয়েছে। সযত্নে সেগুলি ঠিক করে সে অ্যালবামটা সরিয়ে রাখল।

তখন তার মনে হলো, অ্যালবামের পুরো সরঞ্জামটাই ঘরের অপর কোণে সরিয়ে নিয়ে যাবে। সে পরিচায়ককে ডাকতেই তার স্ত্রী ও মেয়ে এসে হাজির হলো। তারা তার সঙ্গে একমত হলো না, তার কথাব প্রতিবাদ করল; সেও পাল্টা তর্ক করল, রেগে গেল। তবু সেও ভাল, কারণ তখন সে আর 'তার' কথা ভাবছিল না; 'সে' আর তখন দেখা দিচ্ছিল না।

কিন্তু সে যখন নিজেই কিছু জিনিস সরাতে গেল তখন তার স্ত্রী বলল, "কাজটা চাকরদের করতে দাও, নইলে তুমি হয়ত আঘাত পাবে।" ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে পর্দার ভিতর দিযে আবার 'সে' উঁকি দিলো, আর সেও 'তাকে' দেখতে পেল। সে 'তাকে' দেখতে পেলেও সে তখনও আশা করছিল যে 'সে' নিজেকে লুকিয়ে ফেলবে। আপনা থেকেই নিজের পাশটাতে তার দৃষ্টি পড়ল; সেখানে ব্যথাটা একভাবেই আছে, সে-ব্যথা সে ভুলতে পারছে না। আর পিছন থেকে 'সে' প্রকাশ্যে তার দিকে তাকিয়ে আছে। এ সবের দরকার কি?

"আব প্রকৃত ঘটনা হলো এখানে, এই পর্দার উপরে যেন একটা দুর্গ দখল হয়ে গেল, আমি আমার জীবনকে হারালাম। এও কি সম্ভব? কী ভয়ংকর! আব কী বাজে! এ হতে পারে না, অথচ তাই হয়েছে।"

সে নিজের ঘরে চলে গেল, শুয়ে পড়ল, একলা ঘরে তখনও 'সে'। তার মুখোমুখি 'সে', অথচ 'তাকে' নিয়ে কিছুই করবাব নেই। শুধু 'তাব' দিকে তাকিয়ে থাকা আর থরথর করে কাঁপা।

৭

আইভান ইল্‌য়িচ-এর অসুখের তৃতীয় মাসে অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াল সেটা বলা অসম্ভব, কারণ সেটা ঘটল একটু একটু করে, সকলের অলক্ষে; কিন্তু অবস্থাটা এই দাঁড়াল যে তার স্ত্রী, তার মেয়ে, তার ছেলে, এবং তাদের চাকর-বাকর, তাদের পরিচিত জন, ডাক্তার এবং সর্বোপরি সে নিজে—সকলেই বুঝতে পারল যে তাকে নিয়ে অন্য সকলের সমস্যা হচ্ছে। কত তাড়াতাড়ি সে তার জায়গাটা খালি করে দেবে, তার উপস্থিতির বোঝা থেকে জীবিত লোকদের রেহাই দেবে এবং নিজেরও সব জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে।

তার ঘুম কমতে লাগল; তারা তাকে আফিম দিলো, মর্ফিন ইঞ্জেক্‌শন দিলো। কিন্তু তাতেও সে আরাম পেল না। আধা ঘুমন্ত অবস্থায় যে বোবা ব্যথাটা সে বোধ করত প্রথম প্রথম, একটা পরিবর্তন হিসাবে সেটা ভালই লাগত, কিন্তু পরে সেটা প্রকাশ্য যন্ত্রণার মতোই, যা তার চাইতেও খারাপ লাগত। ডাক্তারের নির্দেশমতো তার জন্য বিশেষ খাবার করে দেওয়া হতো, কিন্তু সে খাবার ক্রমেই তার কাছে অধিকতর বিস্বাদ ও বিরক্তিকর লাগতে লাগল।

অন্যান্য জৈবিক প্রয়োজনের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়েছিল, আর সেটা তার কাছে সব সময়ই কষ্টদায়ক মনে হতো। ঐ সব কাজে অন্য লোকের সহায়তা নেবার কষ্ট ছাড়াও অপরিচ্ছন্নতা, অশোভনতা ও দুর্গন্ধজনিত কষ্টও ছিল।

কিন্তু রোগের এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি থেকেই আইভান ইল্‌য়িচ একটা আরামের সন্ধানও পেয়ে গেল। এই সব সময়ে তাকে পরিষ্কার করবার জন্য তার ঘরে আসত গেরাসিম নামক সেই চাষী যুবকটি যে খাবার পরিবেশন করত।

গেরাসিম এমনিতেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; তার উপর শহরে বাস করার ফলে বেশ শক্ত-সমর্থ ও স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠছে। সব সময়ই হাসিখুশি ও ঝকঝকে। প্রথম দিকে রুশ ভঙ্গিতে পরিষ্কার পোশাক পরা এই ছেলেটিকে এ ধরনের নোংরা কাজ করতে দেখে আইভান ইল্‌য়িচ অস্বস্তি বোধ করত।

একদিন মলত্যাগের পরে অত্যধিক দুর্বলতার জন্য পোশাক না পাল্টেই সে একটা নিচু নরম চেয়ারে বসে পড়ল; খোলা, শক্তিহীন উরু দুটির দিকে তাকিয়ে তার কেমন ভয় করতে লাগল।

তখন হাল্কা, শক্ত পা ফেলে ঘরে ঢুকল গেরাসিম; তার পায়ের ভারী বুট থেকে আল্‌কাতরার সুন্দর গন্ধ বেরুচ্ছে; যেন এক ঝলক শীতের তাজা বাতাস ঘরে ঢুকল। তার পরনে শন পাটের পরিষ্কার অ্যাপ্রন ও পরিষ্কার সুতীর শার্ট। শার্টের আস্তিন কনুই পর্যন্ত গোটানো। তার মুখের খুশিভরা উজ্জ্বলতা চোখে পড়লে পাছে রুগ্ন লোকটির মনে আঘাত লাগে তাই তার দিকে না তাকিয়েই গেরাসিম মল-পাত্রের দিকে এগিয়ে গেল।

"গেরাসিম," আইভান ইল্‌য়িচ অস্পষ্ট স্বরে ডাকল।

গেরাসিম চমকে উঠল; তার ভয় হলো হয়ত কোনও ভুল করে বসেছে। দ্রুত মুখ ফিরিয়ে সে রুগ্ন লোকটির দিকে তাকাল। তার তাজা, সরল, তরুণ মুখে সবে দাড়ির রেখা দেখা দিয়েছে।

"বলুন স্যার।"

"আমি বুঝি কাজটা তোমার পক্ষে খুবই অপ্রীতিকর। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি নিরুপায়।"

"এ কী বলছেন স্যার!" গেরাসিম-এর চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে উঠল; স্মিত হাসিতে তার সাদা দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ল। "কষ্ট কিসের? আপনি তো অসুস্থ স্যার।"

নিপুণ, শক্ত হাতে কাজ শেষ করে আস্তে আস্তে পা ফেলে সে চলে গেল। পাঁচ মিনিট পরে সেই একই ভাবে হাল্কা পা ফেলে ফিরে এল।

আইভান ইল্‌য়িচ তখনও সেই একইভাবে হাতল-চেয়ারে বসে ছিল।

বলল, "গেরাসিম, আমাকে একটু সাহায্য করো: এদিকে এসো।" গেরাসিম এগিয়ে গেল। "আমাকে তুলে ধরো। একা উঠতে পারি না, এদিকে দিমিত্রিকেও বাইরে পাঠিয়েছি।"

গেরাসিম তার কাছে গেল; যেমন হাল্কা পায়ে সে এসেছে তেমনি হাল্কাভাবেই নিজের শক্ত বাহু দিয়ে তাকে আস্তে অথচ সুকৌশলে জড়িয়ে ধরে এক হাতে তার ট্রাউজারটা তুলে দিলো। সে হয়ত আবার তাকে চেয়ারেই বসিয়ে দিতো, কিন্তু আইভান ইল্‌য়িচ তাকে সোফায় নিয়ে যেতে বলল। গেরাসিম অক্লেশে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ধরে প্রায় বয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে সোফায় বসিয়ে দিলো।

"ধন্যবাদ; কেমন সুন্দরভাবে...তুমি সব কাজগুলি করো।"

গেরাসিম আবার হাসল। সে হয়ত চলেই যেত, কিন্তু সে কাছে থাকলে ভাল লাগে বলে আইভান ইল্‌য়িচ তাকে যেতে দিতে চায় না।

"দেখো, ওই চেয়ারটা আমার কাছে একটু এগিয়ে দেবে? না, ওটা আমার পায়ের নিচে দিয়ে দাও। পা দুটো একটু উঁচু হলে আরাম পাই।"

গেরাসিম চেয়ারটা এনে আস্তে ঠিক জায়গায় বসিয়ে আইভান ইল্‌য়িচ-এর পা দুটি তার উপর তুলে দিলো। আইভান ইল্‌য়িচ-এর মনে হলো, গেরাসিম যখন তার পা দুটি উঁচু করে ধরল তখন তার খুব ভাল লাগল।

সে বলল, "পা দুটো উঁচু হলে অনেক ভাল লাগে। কুশনটাকে পায়ের নিচে দাও।"

গেরাসিম তাই করল। কুশনটা পায়ের নিচে রাখতে সে আবার আইভান ইল্‌য়িচ-এর পা দুটো তুলে ধরল। আর আইভান ইল্‌য়িচ-এর আবার মনে হলো, গেরাসিম পা দুটো তুললেই সে আরাম বোধ করে। আবার যখন সে পা দুটি নামিয়ে রাখল, তখনই সে অস্বস্তি বোধ করল।

সে বলল, "গেরাসিম, তুমি কি এখন ব্যস্ত আছ?"

"মোটেই না স্যার," গেরাসিম বলল। শহুরে চাকরদের কাছ থেকে সে ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা বলার আদব-কায়দা শিখে নিয়েছে।

"তোমার আর কি কাজ বাকি আছে?"

"সে কি, কি কাজ আবার বাকি থাকবে? সব কাজ শেষ করেছি, শুধু আগামী কালের জন্য কাঠটা কাটতে হবে।"

"তাহলে আমার পা দুটো ওইভাবে একটু তুলে ধরো—পারবে কি?"

"নিশ্চয় পারব।" গেরাসিম পা দুটো তুলে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে আইভান ইল্‌য়িচ-এর মনে হলো, পা দুটো ওই অবস্থায় থাকলে ব্যথাটা একেবারেই থাকে না।

"কিন্তু কাঠের কি হবে?"

"সে নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না স্যার। অনেক সময় আছে।"

আইভান ইল্‌য়িচ-এর কথামতো গেরাসিম সেখানে বসে তার পা দুটো তুলে ধরে গল্প করতে লাগল। আর কী আশ্চর্য, গেরাসিম পা দুটো ধরতেই সে যেন অনেকটা ভাল বোধ করতে লাগল।

সেদিন থেকে আইভান ইল্‌য়িচ মাঝে মাঝে গেরাসিমকে কাছে ডাকে; সে এসে পা দুটো কাঁধের উপর রেখে সেখানে বসে; আইভান ইল্‌য়িচও তার সঙ্গে গল্প করতে ভালবাসে। গেরাসিম এমন সহজ, সবল আন্তরিকতার সঙ্গে কাজটা করে যে আইভান ইল্‌য়িচ মুগ্ধ হয়ে যায়। অন্য সকলের স্বাস্থ্য, শক্তি ও আন্তরিকতা তাকে ক্ষুব্ধ করে; কিন্তু গেরাসিম-এর শক্তি ও আন্তরিকতা তাকে মর্মাহত করে না, বরং সান্ত্বনা দেয়।

আইভান ইল্‌য়িচ জানে, কেউ তার দুঃখ বোঝে না, কারণ তার অবস্থাটাই কেউ ধরতে পারে না। গেরাসিমই একমাত্র লোক যে তার অবস্থা বোঝে, তার জন্য দুঃখ বোধ করে। আর সেইজন্যই গেরাসিম কাছে থাকলে আইভান ইল্‌য়িচও আরাম বোধ করে। কখনও কখনও গেরাসিম একটানা সারা রাত তাব পা দুটো তুলে ধরে থাকে; কিছুতেই শুতে যেতে চায় না, বলে, "আপনি এ নিয়ে ভাববেন না তো, ঘুমুবার অনেক সময় পাব; আপনি যদি অসুস্থ না হয়ে ভালও থাকতেন, তাহলেও তো আপনার সেবা আমাকে করতেই হতো।" একমাত্র গেরাসিমই মিথ্যা বলে না; সে এ সবের অর্থ বোঝে আর বোঝে বলেই কোনও কিছু লুকোতে চায় না, শুধু তার রুগ্ন, ক্ষয়িষ্ণু মনিবের জন্য দুঃখ বোধ করে। একদিন আইভান ইল্‌য়িচ যখন তাকে চলে যেতে বলেছিল তখন কথাটা সে সোজাসুজিই বলে ফেলল।

"আমরা সবাই তো মরব। সুতরাং একটু-আধটু কষ্টে কি যায় আসে?" এই কথার দ্বারা সে বলতে চায়, একজন মুমূর্ষু লোকের জন্য কষ্টটা ভোগ করছে বলেই সে এ নিয়ে কোনও অভিযোগ করছে না, কারণ সেও আশা করে যে তার যখন এ রকম সময় উপস্থিত হবে তখন আর কেউ এসে এ রকম কষ্ট সহ্য করবে।

পরিবারের অন্য সকলের ধোঁকাবাজি ছাড়াও আইভান ইল্‌য়িচ-এর সব চাইতে

বেশি দুঃখ এই যে কেউ তার কথা ভাবে না, অন্তত তারা আশানুরূপভাবে ভাবে না। দীর্ঘ দিন রোগে ভুগে ভুগে আইভান ইল্যিচ কখনও কখনও চাইত যে কোনও রুগ্ন শিশুর জন্য লোকে যে মমতা দেখায় তার প্রতিও সেই রকম মমতা দেখানো হোক। সে চাইত, ছোট শিশুর মতো তাকেও কেউ আদর করুক, চুমো খাক, তার জন্য কাঁদুক। সে জানে, সে আদালতের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, তার মুখে পাকা দাড়ি, কাজেই সে সব সম্ভব নয়। তবু তাই সে চায়। আর গেরাসিম-এব সঙ্গে তার সম্পর্ক অনেকটা সেই রকমের বলেই গেরাসিম-এর সঙ্গ তাকে এতটা আরাম দেয়। আইভান ইল্যিচ কাঁদতে চায়, চায় কেউ তাকে আদর করুক, তার জন্যে কাঁদুক, আর তখনই হয়ত সহকর্মী শেবেক এসে হাজির হয়: ফলে চোখের জল ও আদরের বদলে আইভান ইল্যিচ মুখটা গুরুগম্ভীর করে তোলে এবং নিছক অভ্যাসবশতই আপিল-আদালতের রায়ের ফলাফল সম্পর্কে তার মতামত ঘোষণা করে তা নিয়ে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। বাইরে ও ভিতরে এই মিথ্যাচার আইভান ইল্যিচ-এর শেষের দিনগুলোকে বিষাক্ত করে তুলল।

৮

সকাল হয়েছে। আইভান ইল্যিচ-এর কাছে সকালের একমাত্র ঘটনা গেরাসিম চলে গেছে, আর তার বদলে ঘরে ঢুকেছে পরিচারক পিয়তর। সে মোমবাতিগুলো নিভিয়েছে, একটা পর্দা তুলে দিয়েছে এবং ঘরের এটা-ওটা কাজ করতে শুরু করেছে। সকাল কি সন্ধ্যা, শুক্রবার কি রবিবার, কোনও তফাৎ নেই। সবই এক। তীব্র ব্যথাটা একমুহূর্তের জন্যও থামছে না; আশাহীন জীবনের স্রোতে লেগেছে ভাঁটার টান, কিন্তু এখনও থেমে যায়নি; ভয়াবহ, ঘৃণ্য মৃত্যু নেমে আসছে তাকে লক্ষ্য করে; মৃত্যুই একমাত্র সত্য, আর সবই মিথ্যা। দিন, সপ্তাহ বা ঘণ্টার কি মূল্য তার কাছে?

"চা দেব স্যার?"

"ও চায় সব কাজ যথাযথভাবে হোক। সকালেই সকলের চা খাওয়া উচিত," কথাগুলো ভেবে আইভান ইল্যিচ শুধু বলল—

"না।"

"সোফায় গিয়ে বসবেন কি?"

"ও ঘরটাকে পরিচ্ছন্ন করতে চায়, আমি তাতে বাধা। আমি মূর্তিমান অপরিচ্ছন্নতা, বিশৃঙ্খলা", কথাগুলি ভেবে সে শুধু বলল—

"না, আমাকে একা থাকতে দাও।"

চাকরটি তবু কাজ করতে লাগল। আইভান ইল্যিচ হাতটা বাড়াল। তাকে সাহায্য করতে পিয়তর ছুটে গেল।

"আপনার কি চাই?"

"ঘড়িটা।"

হাতের নিচে থেকে ঘড়িটা তুলে পিয়তর তাকে দিলো।

"সাড়ে আটটা। সবাই উঠেছে?"

"এখনও ওঠেননি স্যার। ভ্লাদিমির আইভানভিচ (তার ছেলে) স্কুলে গেছে, আর প্রাস্কোভ্য়া ফিয়দরভ্না হুকুম করেছেন, আপনি ডাকলে তবে তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে দিতে হবে। তাঁকে ডেকে দেব কি?"

"না, দরকার নেই।"..."একটু চা খেলে কেমন হয়," সে ভাবল।

"হ্যাঁ, চা...নিয়ে এস।"

পিয়তর বেরিয়ে যাচ্ছিল। আইভান ইল্যিচ একা থাকতে ভয় পেল। "ওকে কেমন করে এখানে রাখি?...হ্যাঁ, ওষুধ, পিয়তর, ওষুধটা দাও। হয়ত ওষুধ খেলে কিছুটা ভাল হতে পারে।" চামচ নিয়ে সে ওষুধটা খেলো। "না, কিছুই হলো না। সব বাজে, ফাঁকি," বিস্বাদ ওষুধটা খেয়ে সে বলল। "না, কিছুতেই আর বিশ্বাস হয় না। কিন্তু ব্যথাটা, এই ব্যথাটা; এক মিনিটের জন্যও যদি থামত।" সে আর্তনাদ করে উঠল। পিয়তর ঘুরে দাঁড়াল। "না, যাও। চা নিয়ে এস।"

পিয়তর চলে গেল। একলা ঘরে যতটা ব্যথার জন্য তার চাইতে বেশি মনের দুঃখে আইভান ইল্যিচ গোঙাতে লাগল। বার বার সেই একই জিনিস, সেই শেষহীন দিন ও রাত্রির আবর্তন। যদি আর একটু দ্রুত হতো। দ্রুত হয়ে কোথায় যেত? মৃত্যু, অন্ধকার। না, না। মৃত্যু অপেক্ষা ভাল কোথাও!"

ট্রে-তে করে পিয়তর চা নিয়ে এলে আইভান ইল্যিচ কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল; যেন বুঝতেই পারছে না সে কে এবং কি চায়। সেই দৃষ্টি দেখে পিয়তর অস্বস্তি বোধ করল। আর তার সেই অস্বস্তি দেখে আইভান ইল্যিচ-এর সম্বিত ফিরে এল।

সে বলল, "ওঃ, হ্যাঁ, চা এনেছ, ভাল, রাখো। হাতমুখ ধুয়ে একটা ফর্সা শার্ট পরতে আমাকে একটু সাহায্য করো।"

আইভান ইল্যিচ হাত-মুখ ধুতে শুরু করল। ধীরে ধীরে হাত ধুলো, তারপর মুখ ধুলো, দাঁত মাজল, চুলে চিরুনি চালাল, আয়নায় মুখ দেখল। আয়নায় যা দেখল, বিশেষ করে ম্লান কপালের উপর লেপ্টে থাকা চুলগুলো দেখে সে ভয় পেয়ে গেল। সে বুঝতে পারল, শার্ট বদলাবার সময় শরীরের দিকে নজর পড়লে সে আরও ভয় পাবে, তাই সে সময় সে আয়নার দিকে তাকালই না। সে পর্ব শেষ হলো। ড্রেসিং-গাউনটা পরে একটা কম্বলে শরীরটা ঢেকে সে চা খাবার জন্য হাতল-চেয়ারটায় বসল। মুহূর্তের জন্য নিজেকে বেশ তাজা মনে হলো; কিন্তু চা খেতে শুরু করতেই আবার সেই বিস্বাদ, সেই ব্যথা। জোর করে চা-টা শেষ করে সে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। সেই অবস্থায়ই সে পিয়তরকে ছেড়ে দিলো।

সেই একই অবস্থা। মুহূর্তের জন্য আশার আলো ঝিলিক দেয়, তারপরই আবার সেই হতাশার সমুদ্র তাকে ঘিরে গর্জন করে ফেরে; সব সময়ই ব্যথা, শুধুই ব্যথা,

হৃৎপিণ্ডের ব্যথা, সব সময় একই অবস্থা। একা একা ভীষণ খারাপ লাগে; কাউকে ডাকতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সে আগে থেকেই জানে যে অন্য কারও উপস্থিতিতে অবস্থা আরও খারাপ হবে। "আবার যদি মর্ফিন দিত—শুধু ভুলে থাকবার জন্য। ডাক্তারকে বলতে হবে অন্য কিছু ভাবতে। এ ভাবে চলতে পারে না; এ ভাবে চলতে পারে না।"

এই ভাবে এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা কেটে যায়। সদর দরজায় ঘণ্টা বাজে। হয়ত ডাক্তার।

প্রচণ্ডভাবে ডাক্তার হাত দুটি ঘষতে থাকে।

"খুব ঠাণ্ডা লেগেছে। বাইরে বরফ পড়ছে। একটু গরম হয়ে নি," এমন ভাব দেখিয়ে ডাক্তার কথাগুলি বলে যেন তার একটু গরম হতে যা দেরি, তার পরেই সে সব কিছু ঠিক করে দেবে।

"তারপর কেমন আছেন?"

আইভান ইল্য়িচ জানে, ডাক্তার বলতে চায়, "ব্যথাটা কেমন আছে", কিন্তু সে কথা সে বলতে পারে না বলেই বলে, "রাতটা কেমন কেটেছে?"

আইভান ইল্য়িচ চোখ তুলে ডাক্তারের দিকে তাকাল; যেন বলতে চাইল—

"এও কি সম্ভব যে মিথ্যা বলতে আপনার কখনও লজ্জা করে না?"

কিন্তু চোখের সে ভাষা বুঝবার বালাই ডাক্তারের নেই।

আইভান ইল্য়িচ বলে—

"সেই একই রকম; ব্যথাটা কখনও আমাকে ছাড়ে না, থামে না। যদি আর কোনও পথ থাকত!"

"আঃ, আপনারা সকলেই ওই রকম, সব রোগীরাই একই কথা বলে। আসুন. ঠাণ্ডায় একেবারে জমে গেছি। প্রাস্কোভ্য়া ফিবদরভ্না পর্যন্ত আমার চিকিৎসার কোনও ত্রুটি ধরতে পারেন না। ঠিক আছে, আসুন, গুড মর্নিং।" ডাক্তার কর-মর্দন করল।

আগেকার চপলতা পরিহার করে ডাক্তার এবার গম্ভীর মুখে রোগীকে পরীক্ষা করতে শুরু করল; নাড়ি দেখল, তাপ মাপল, তারপর বুক পিঠ ঠুকে দেখল।

আইভান ইল্য়িচ ভালভাবেই জানে যে এ সবই অর্থহীন, ফাঁকা ধোঁকাবাজি; তবু ডাক্তার যখন হাঁটু ভেঙে বসে তার উপর উপুড় হয়ে শরীরের উপরে ও নিচে কান লাগিয়ে দেখল, এবং গম্ভীর মুখে নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করে তাকে পরীক্ষা করতে লাগল, তখন আইভান ইলয়িচ কিছুটা প্রভাবিত হলো, যেমন আদালতে সে অনেক সময় উকিলদের বক্তৃতা শুনে প্রভাবিত হতো, যদিও সে ভালভাবেই জানত যে তারা সারাক্ষণ মিথ্যা কথাই বলছে এবং কি কারণে বলছে তাও জানত।

সোফার উপর হাঁটু ভেঙে ডাক্তার তখনও তাকে পরীক্ষা করে চলেছে। এমন সময় দরজার কাছে প্রাস্কোভ্য়া ফিয়দরভ্নার রেশমী পোশাকের খস্‌খস্ শব্দ শোনা

গেল; ডাক্তার যে এসেছে এ কথা তাকে না জানাবার জন্য সে পিয়তরকে বকাবকি করল।

সে ঘরে ঢুকে স্বামীকে চুমো খেল এবং তারপরই সকলকে জানাল যে সে অনেকক্ষণ ঘুম থেকে জেগেছে, কিন্তু একটা ভুল বোঝাবুঝির জন্য ডাক্তার আসা সত্ত্বেও সে এতক্ষণ এখানে আসতে পারেনি।

আইভান ইল্যিচ স্ত্রীর দিকে তাকাল, আগাগোড়া তাকে লক্ষ্য করল — তার ফর্সা মেদবহুল দেহ, তার পরিচ্ছন্ন হাত ও গলা, চুলের উজ্জ্বলতা, তার দুই চোখে পরিপূর্ণ জীবনের আভা। মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে তাকে ঘৃণা করে। স্ত্রী যখন তাকে স্পর্শ করে, তখন তার প্রতি তীব্র ঘৃণায় তার বুকের ভিতর জ্বালা করে ওঠে।

তার প্রতি ও তার রোগের প্রতি তার স্ত্রীর মনোভাব সেই একই আছে। ডাক্তার যেমন রোগীর চিকিৎসার ব্যাপারে একটা পথ গ্রহণ করেছে এবং এখন সে পথ থেকে সরতে পারে না, তেমনি মহিলাটিও তার স্বামীর ব্যাপারে একটা মনোভাব গ্রহণ করেছে —তার যা করা উচিত সে তা করে না, সব দোষই তার আর এই ত্রুটির জন্য ভালবেসেই সে স্বামীকে বকে থাকে এবং সে মনোভাব এখন আর বদলাতে পারে না।

"আপনারা তো জানেন, ও আমার কথাই শোনে না, ঠিক সময়ে ওষুধ পর্যন্ত খায় না। তার চাইতেও খারাপ, দুই পা উপরে তুলে দিয়ে এমনভাবে সে শুতে চায় যেটা তার পক্ষে অত্যন্ত খারাপ।"

গেরাসিম যে তার কথায় পা দুটো উপরে ধরে রাখত সে কথাও সে সবিস্তারে বর্ণনা করে শোনাল।

কৃপাপরবশ হাসি হেসে ডাক্তার বলল, 'দেখুন, এ ব্যাপারে কিছু করার নেই, রোগীদের এরকম সব অদ্ভুত খেয়াল হয়ে থাকে। ও সব আমাদের ক্ষমা করেই চলতে হয়।"

পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার ঘড়ি দেখল। তখন প্রাস্কোভ্যা ফিয়োদরভ্না স্বামীকে জানাল, যদিও তার ইচ্ছা মতোই সব কিছু হবে তবু আজ সে একজন বিখ্যাত ডাক্তারকে আনতে লোক পাঠিয়েছে, সে এসে তাকে পরীক্ষা করবে এবং মিখাইল দানিলোভিচ-এর (তাদের নিয়মিত ডাক্তার) সঙ্গে পরামর্শ করবে।

"দয়া করে এবার আর বাধা দিও না। আমার নিজের গরজেই এ ব্যবস্থা করছি।" ব্যঙ্গের সুরে প্রাস্কোভ্যা ফিয়দরভ্না বলল। আইভান ইল্যিচ ভুরু কুঁচকে চুপ করে রইল। সে বুঝতে পারল, মিথ্যার জালে তাকে এমনভাবে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে যে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা বড় শক্ত।

সাড়ে এগারোটা নাগাদ বিখ্যাত ডাক্তারটি এল। আবার শরীর টিপে টুপে সেই পরীক্ষা, তার সামনে ও পাশের ঘরে মূত্রাশয় ও আন্ত্রিক বিবর্ধন নিয়ে সেই গুরুগম্ভীর আলোচনা, সেই প্রশ্নোত্তরের পালা, আবারও জীবন-মৃত্যুর মূল সমস্যার পরিবর্তে সেই একই মূত্রাশয়-আন্ত্রিক বিবর্ধন নিয়ে আলোচনাই চলল সারাক্ষণ।

বিদায় নেবার সময় বিখ্যাত ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হলেও আশাহীন ছিল না। আতংক ও আশায় জ্বল-জ্বল করা দুটি চোখ তুলে আইভান্ ইল্য়িচ যখন ভীরু কণ্ঠে প্রশ্ন করল, নিরাময়ের কোনও আশা আছে কি; তখন ডাক্তার জবাব দিলো যে তা সে বলতে পারে না, তবে আশা নিশ্চয়ই আছে। ডাক্তার চলে যাবার সময় আইভান ইল্য়িচ-এর আশা-ভরা চোখ দুটি এতই করুণ দেখাচ্ছিল যে তা দেখে প্রাস্কোভ্য়া ফিয়দরভ্না্র চোখ ফেটে জল এসে গেল; বিখ্যাত ডাক্তারের ফী-টা দেবার জন্য সে পাশের ঘরে চলে গেল।

ডাক্তারের আশ্বাসের ফলে আশার যে আলোটুকু জ্বলেছিল তাও বেশি সময় স্থায়ী হলো না। আবার সেই একই ঘর, একই ছবি, পর্দা, দেয়াল-কাগজ, ওষুধের বোতল এবং সেই চিরকালের যন্ত্রণাকাতর দেহ। আইভান ইল্য়িচ গোঙাতে শুরু করল; ইনজেকশন দেওয়া হলো; সে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল। যখন জাগল তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে; তার খাবার এনে দেওয়া হলো। জোর করে সে কিছুটা ঝোল খেলো। তারপর আবার সেই একঘেয়েমি, আবার সেই আসন্ন রাত।

আহারাদির পর সাতটা নাগাদ প্রাস্কোভ্য়া ফিয়দরভ্না উৎসবের সাজে সেজে ঘরে ঢুকল। তার বুকে শক্ত করে কাঁচুলি আঁটা, মুখে পাউডারের প্রলেপ। সকালেই সে স্বামীকে বলেছিল যে তারা থিয়েটারে যাবে। সারা বার্নহার্ড শহরে এসেছে; তাদেরও একটা বক্স নেওয়া আছে, আর আইভান ইল্য়িচ-এর পীড়াপীড়িতেই সেটা নেওয়া হয়েছিল! কিন্তু এতদিন পরে সেকথা সে ভুলে গিয়েছিল, আর সেইজন্যই তার এই পোশাকের আড়ম্বর দেখে সে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কিন্তু এখন তার মনে পড়েছে যে সেই জোর করে এই বক্সটা নিয়েছিল, কারণ এ ধরনেব আনন্দ-অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া ছেলেমেয়েদের পক্ষে যেমন কল্যাণকর তেমনি শিক্ষাপ্রদ। তাই আগেকার মনোভাব সে মনের মধ্যেই চেপে রাখল।

বেশ খুশি মনে ঘরে ঢুকলেও প্রাস্কোভ্য়া ফিয়দরভ্নার মনে একটা অপরাধবোধও ছিল। পাশে বসে সে স্বামী কেমন আছে জিজ্ঞাসা করল; অবশ্য স্বামীও বুঝল যে কোনও জবাব শুনবার জন্য নয়, জিজ্ঞাসা করবার জন্যই সে জিজ্ঞাসা করেছে। মহিলা আরও বলল, কেন থিয়েটারে যাওয়াটা একান্ত প্রয়োজন; সে কিছুতেই যেত না, কিন্তু বক্সটা আগেই নেওয়া হয়ে গেছে, আর তাদের মেয়ে এলেন ও পেত্রিশ্চেভও (তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট ও মেয়ের প্রণয়ী) যখন যাচ্ছে তখন তাদের তো একা যেতে দেওয়া যায় না। এখন সে চলে যাবার পরে স্বামীটি ডাক্তারের ব্যবস্থা মতো চলবে এটা জানতে পারলেই সে নিশ্চিন্ত হতে পারে।

"দেখো, ফিয়দর পেত্রিশ্চেভ (প্রণয়ী) ভিতরে আসতে চায়। আসবে কি? আর লিজাও?"

"হ্যাঁ, তাদের আসতে বলো।"

পুরো পোশাক পরে মেয়ে ঘরে ঢুকল। তার দেহের অনেকখানিই খোলা। তার

নিজের শরীর তাকে এত কষ্ট দিচ্ছে, আর মেয়ে তার শরীর দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। সে এখন স্বাস্থ্যবতী, প্রেমময়ী; এই রোগ, যন্ত্রণা ও মৃত্যু তার সুখের পথে বিঘ্ন; এই সব কিছুর প্রতি সে বিরক্ত।

ফিয়দর পেত্রিশ্চেভও ঘরে ঢুকল। পরনে সান্ধ্য পোশাক। কোঁকড়া চুল দীঘল পেশীবহুল গলা একটা সাদা কলারে শক্ত করে আটকানো, প্রশস্ত ফর্সা বুক, সরু কালো ট্রাউজারের তলায় শক্ত উরু দুটি স্পষ্ট প্রকাশমান, সাদা দস্তানা পরা হাতে দামী অপেরা হ্যাট।

তার পিছনে অলক্ষ্যে গুড়ি মেরে ঢুকল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রটি। পরনে নতুন ইউনিফর্ম, হাতে দস্তানা, চোখের নিচে বিষণ্ন নীল দাগ যার অর্থ আইভান ইল্যিচ ভালই জানে।

ছেলের জন্য সব সময়ই তার কষ্ট হয়। বাবার প্রতি সহানুভূতিবশত সেও কষ্ট পায়। তাই সেই দুঃখমাখা মুখখানি বড়ই করুণ। আইভান ইল্যিচ মনে করে গেরাসিম ছাড়া একমাত্র ভলদ্যা-ই তাকে বুঝতে পারে, তার জন্য দুঃখ পায়।

সকলে বসল, সকলেই জানতে চাইল সে কেমন আছে। তারপর চুপচাপ। লিজা মার কাছে অপেরা-গ্লাসটার খোঁজ করল। কে সেটা নিয়েছে, বা কোথায় সেটা রাখা হয়েছে এই নিয়ে মা ও মেয়ের মধ্যে কথাকাটাকাটি হলো। ফলে একটা অপ্রীতিকর বিতণ্ডার সৃষ্টি হলো।

ফিয়দর পেত্রিশ্চেভ জানতে চাইল, আইভান ইল্যিচ সারা বার্নহার্ডকে দেখেছে কিনা। আইভান ইল্যিচ প্রথমে প্রশ্নটা বুঝতেই পারল না; পরে বলল, "না। তুমি কি তাকে আগে দেখেছ?"

"হ্যাঁ। 'আদ্রিয়েন লেকুভরুর'-এ।"

প্রাস্কোভ্য়া ফিয়দরভ্না মন্তব্য করল, ঐ ভূমিকায় সে বিশেষভাবে ভাল অভিনয় করে থাকে। মেয়েটিও কিছু কিছু মন্তব্য করল। ফলে শিল্প ও তার স্বাভাবিকতার উপরে এমন একটা আলোচনার সূত্রপাত হলো যা সর্বত্র হয়ে থাকে এবং সব সময় একই রকম হয়।

আলোচনার মাঝখানে ফিয়দর পেত্রিশ্চেভ একবার আইভান ইল্যিচ-এর দিকে তাকিয়ে আবার চুপ করে গেল। অন্যরাও তার দিকে তাকিয়ে বোবা হয়ে গেল। আইভান ইল্যিচ ঝকঝকে চোখে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে; স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তাদের উপর সে ভীষণ রেগেছে। তাকে শান্ত করা দরকার। কিন্তু সে কাজটা সোজা নয়। যেমন করেই হোক এই নিস্তব্ধতা ভাঙতে হবে। সে সাহস কারও নেই। সকলেই শংকিত হয়ে পড়ল যে ভদ্রতার মুখোশ খুলে পড়ছে, প্রকৃত সত্য এবার প্রকাশ হয়ে পড়বে। লিজাই প্রথমে সাহস দেখাল। নিস্তব্ধতা ভাঙল। সকলের মনের কথা চাপা দিতেই সে চেয়েছিল, কিন্তু অনবধানতাবশত সবই বলে ফেলল।

বাবার দেওয়া ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, "যদি যেতেই হয় তাহলে

আমাদের এখনই ওঠা দরকার।" এবং একটি প্রায়-অদৃশ্য অর্থপূর্ণ হাসি হেসে যুবকটিকে কিসের যেন ইঙ্গিত করে ঘাগরার খস্‌খস্‌ শব্দ তুলে সে উঠে দাঁড়াল।

সকলেই উঠল, বিদায় নিল, চলে গেল। সকলে যাবার পরে আইভান ইল্‌য়িচ-এর মনে হলো সে যেন কিছুটা স্বচ্ছন্দ বোধ করছে; মিথ্যার অস্তিত্ব আর নেই, তাদের সঙ্গেই চলে গেছে; কিন্তু ব্যথাটা আছে। সেই একটা ব্যথা, একটানা আতংক, তার বৃদ্ধিও নেই, হ্রাসও নেই। সেটা সব সময়ই খারাপ।

আবার সেই মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সেই এক অবস্থা, তার শেষ নেই, আছে শুধু সেই ভয়ংকরতর অনিবার্য পরিণাম।

পিয়তর-এর প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, "হ্যাঁ, গেরাসিমকে পাঠিয়ে দাও।"

৯

অনেক রাতে স্ত্রী ফিরল। সে পা টিপে টিপে এল, তবু তার পায়ের শব্দ সে শুনতে পেল, চোখ খুলল, আবার তখনই বন্ধ করল। গেরাসিমকে পাঠিয়ে দিয়ে স্ত্রী নিজেই তার পাশে বসে থাকতে চাইল। চোখ খুলে সে বলল "না, তুমি চলে যাও।"

"তোমার কি খুব বেশি ব্যথা হচ্ছে?"

"একই রকম।"

"একটা আফিম খাও।"

সম্মতি জানিয়ে তাই খেলো। স্ত্রী চলে গেল।

তিনটে পর্যন্ত সে শোচনীয়ভাবে ঘুমোল। তার মনে হলো, তার ব্যথাসুদ্ধ তাকে যেন একটা সংকীর্ণ, গভীর, কালো বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে একেবারে সেটার তলায় ফেলে দেবার জন্য তাকে অনবরত ঠুঁসে দিচ্ছে। এই ভয়ংকর কাজের ফলে তার খুব কষ্টও হচ্ছিল। ভয় পেয়েও সে বস্তার ভিতরে ঢুকতেই চাইছে, বাধা দিলেও সে ওটার ভিতরে থাকতেই চেষ্টা করছে। হঠাৎ সে পিছলে নিচে পড়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম ভেঙে গেল। গেরাসিম তখনও সেই একইভাবে পায়ের কাছে বসে শান্ত মনে ধৈর্য ধরে ঝিমুচ্ছে। আর মোজা-পরা শুকনো পা দুটিকে গেরাসিম-এর কাঁধের উপর রেখে সে শুয়ে আছে; অন্তহীন ব্যথাটা একভাবেই চলেছে।

"তুমি যাও গেরাসিম", সে ফিসফিস্‌ করে বলল।

"ঠিক আছে স্যার। আর একটু থাকি।"

"না, চলে যাও।"

পা দুটি নামিয়ে সে পাশ ফিরে শুলো। নিজের জন্যই তার কষ্ট হতে লাগল। গেরাসিম পাশের ঘরে যাওয়া পর্যন্ত সে কোনওরকমে অপেক্ষা করল; তারপর আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না, ছোট ছেলের মতো কেঁদে উঠল। সে কাঁদল নিজের অসহায়তার জন্য, ভয়ানক একাকিত্বের জন্য, মানুষের নিষ্ঠুরতার জন্য, ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতার জন্য, ঈশ্বরের অনুপস্থিতির জন্য।

"কেন তুমি এমন করলে? কিসের জন্য আমার এই অবস্থা? কেন, কেন আমাকে এত ভীষণ দুঃখ দিচ্ছ?"

এ প্রশ্নের কোনও জবাব সে আশা করে না, আসলে সে কাঁদছিল কারণ এ প্রশ্নের কোনও জবাব নেই, জবাব থাকতে পারে না। যন্ত্রণাটা আবার বেড়ে গেল, কিন্তু সে একটুও নড়ল না, কাউকে ডাকল না।

শুধু নিজের মনেই বলতে লাগল, "এস, আরও কাছে এস, এস, আঘাত করো। কিন্তু কেন? আমি তোমার কি করেছি? কেন?"

তারপর সে চুপ করে গেল, কান্না থামাল, নিঃশ্বাস বন্ধ করল, কান পাতল, কান পাতল কোনও মুখর কণ্ঠস্বর শুনতে নয়, আত্মার কণ্ঠস্বর নিজের ভিতরে যে চিন্তার স্রোত বয়ে যাচ্ছিল তাকেই শুনতে।

"তুমি কি চাও? কি বললে? দুঃখ চাও না, চাও বাঁচতে", সেই জবাব দিলে।

তারপর এমন গভীর মনোযোগের মধ্যে ডুবে গেল যে ব্যথাটাও তার মনকে সরাতে পারল না।

"বাঁচতে চাও? কিন্তু কেমন করে বাঁচবে?" আত্মার কণ্ঠস্বরই প্রশ্ন করল।

"কেন, আগে যে ভাবে বেঁচেছি সেইভাবেই বাঁচতে চাই - সুখে ও স্বচ্ছন্দে।"

"কেমন সুখে ও স্বচ্ছন্দে আগে বেঁচেছিলে?" কণ্ঠস্বর প্রশ্ন করল। তারপরেই কল্পনায় সে তার সুখী জীবনের সেই শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলিতে ফিরে গেল। কিন্তু কী আশ্চর্য, সুখী জীবনের সেই শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলিকে এখন যেন আর আগেকার মতো মনে হলো না। অবশ্য শুধু তার শৈশবের স্মৃতিগুলি ছাড়া—সেই শৈশবে এমন কিছু আনন্দের উপকরণ ছিল যাতে সে জীবন ফিরে পেলে সকলেই খুশি মনে তার মধ্যে বাঁচতে চায়। কিন্তু হায়, যে সুখের দিনগুলি যার জীবনে এসেছিল আজ আর সে নেই, সে যেন অন্য কোনও মানুষের স্মৃতি।

শৈশব থেকে যতই সে বর্তমানের দিকে এগোতে লাগল ততই সেদিনের আনন্দ তার কাছে অর্থহীন ও অনিশ্চিত হয়ে উঠল। আইন বিদ্যালয়ের দিনগুলি থেকেই তার সূত্রপাত। তখন জীবনে সত্যিকারের ভাল কিছু ছিল, ফুর্তি ছিল, বন্ধুত্ব ছিল, আশা ছিল। কিন্তু উপরের শ্রেণীতে উঠতে উঠতেই সেই শুভ মুহূর্তগুলি ক্রমেই বিরল হতে লাগল। পরবর্তীকালে, চাকরি জীবনের প্রথম অধ্যায়ে, গভর্নর হবার সময়ে, কিছু কিছু শুভ মুহূর্ত এসেছিল কিন্তু তাতে দুঃখের ভেজাল ছিল, সে শুভ ক্রমেই দুঃখের দিকে ঢলে পড়ছিল। শুভদিন ক্রমেই কমতে লাগল, যত দিন গেল সুখ ততই কমতে লাগল।

তার বিবাহ তার স্ত্রীর নিঃশ্বাস ও জৈবিকতা, প্রবঞ্চনা। তারপর সেই মারাত্মক চাকরি-জীবন, অর্থলিপ্সা, সেইভাবে এক বছর, দু' বছর, দশ, বিশ, সারাটা জীবন। যত দিন গেল, ততই অবস্থা মারাত্মক হতে লাগল। "আমি যেন ক্রমান্বয়ে নিচে নেমে যাচ্ছিলাম, অথচ মনে হচ্ছিল যেন উপরে উঠছি। আসলেও তাই লোকের চোখে

আমি উপরেই উঠছিলাম, কিন্তু আমি যতই উপরে উঠছিলাম, জীবনে ততই লেগেছিল ভাঁটার টান...আর এবার সব কাজের অবসান, এবার শুধু মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা।"

"কিন্তু এটা কি হলো? কেন হলো? এ হতে পারে না। জীবন কি এত অর্থহীন, এত ঘৃণার বস্তু হতে পারে? আর তাই যদি হয়, তাহলে মৃত্যুতে এত কষ্ট কেন? নিশ্চয় কোথাও একটা ভুল হয়েছে।"

"তাহলে কি যে ভাবে বাঁচা উচিত আমি সে ভাবে বাঁচিনি?" হঠাৎ এই প্রশ্নটা মাথায় এল। "কিন্তু তাই বা নয় কেন? যা কিছু করণীয় সবই তো আমি করেছি।" সঙ্গে সঙ্গে জীবন-মৃত্যুর সব রহস্যের এই একমাত্র সমাধানকে সে সম্পূর্ণ অবান্তর বলে বাতিল কবে দিলো।

"এখন তুমি কি চাও? বাঁচতে? কেমন করে বাঁচতে? ঘোষক যখন চেঁচিয়ে বলে 'বিচারক আসছেন!' তখন আদালতে তুমি যেভাবে বাঁচতে সেই ভাবে বাঁচতে চাও কি?"..."বিচারক আসছেন! বিচারক আসছেন!" কথাগুলি সে বার বার আবৃত্তি করল। ক্রোধে সে আর্তনাদ করে উঠল, "এই তো তিনি এসেছেন! বিচারক এসেছেন! কিন্তু আমার তো কোনও দোষ নেই! তাহলে কেন এই দুঃখ?" কান্না থামিয়ে সে দেওয়ালের দিকে মুখ ফেরাল। বার বাব একই প্রশ্ন করতে লাগল, "কেন, কিসের জন্য এত আতংক?"

কিন্তু সে যতই ভাবুক, কোনও জবাব খুঁজে পেল না। যে ভাবে বাঁচা উচিত ছিল সে ভাবে সে বাঁচেনি এই ধারণা যতবার তার মাথায এল ততবারই নিজের সঠিক জীবনযাত্রার কথা ভেবে এই বিচিত্র ধারণাকে সে মন থেকে বাতিল করে দিলো।

১০

আরও একটি পক্ষকাল পার হয়ে গেল। আইভান ইল্‌য়িচ এখন আর সোফা থেকে উঠতে পারে না। বিছানায় শুয়ে থাকতে ভাল লাগে না বলে সে সোফার শুয়ে থাকে। প্রায সর্বক্ষণ দেয়ালেব দিকে মুখ রেখে শুযে সে একাকিত্বেব অবর্ণনীয় দুঃখ সহ্য করে. আর একা একা সেই ব্যাখ্যাতীত প্রশ্নেব কথাই ভাবে . এটা কি? এই কি মৃত্যু? ভিতর থেকে কে যেন জবাব দেয, "হ্যাঁ, ঠিক তাই।" এর বাইরে আর কিছুই নেই।

আইভান ইল্‌য়িচ প্রথম যখন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল, রোগের একেবারে সেই প্রথম সময় থেকেই তার জীবন দুটি পরস্পববিরোধী মনোভাবে ভাগ হয়ে গেছে. সেই দুটি মনোভাবই তার জীবনে ঘুরে ঘুরে এসেছে—একটি হতাশা ও দুর্বোধ্য ভয়াবহ মৃত্যুর প্রতীক্ষা; অপরটি আশা ও একান্ত মনোযোগেব সঙ্গে নিজের শরীরেব উপর লক্ষ্য রাখা। প্রথম দিকে সাময়িকভাবে অকেজো একটি মূত্রাশয় ও অন্ত্র ছাড়া আর কোনও সমস্যা তাব সামনে ছিল না; তাব পরেই এল চির-অজ্ঞাত ভয়ংকর মৃত্যুর চিন্তা যার হাত থেকে কোনওক্রমেই পরিত্রাণ নেই।

রোগের সূচনা থেকেই এই দুটি মনোভাব ঘুরে ঘুরে এসেছে; কিন্তু রোগ যতই বাড়তে লাগল, মূত্রাশয়ের অবস্থা ততই সন্দেহজনক ও অস্বাভাবিক হয়ে দেখা দিলো, আর আসন্ন মৃত্যুর অনুভূতি ততই প্রকট হয়ে উঠতে লাগল।

তিন মাস আগে সে কি ছিল আর আজ সে কি হয়েছে—এই কথাটা ভাবলেই বোঝা যায় কত দ্রুত সে নিচে নেমে যাচ্ছে যার ফলে সব আশাই ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

ইদানীং কালে দেয়ালের দিকে মুখ রেখে সোফায় শুয়ে যে একাকিত্বের মধ্যে সে দিন কাটায়; একটি জনবহুল শহরের মাঝখানে অসংখ্য পরিচিত জন ও পরিবারপরিবৃত হয়েও যে একাকিত্ব তাকে সহ্য করতে হয়, যার চাইতে অধিক একাকিত্ব কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না—না সমুদ্রের তলদেশে, না মৃত্যুর অতল গহ্বরে; ইদানীং কালে সেই ভয়াবহ একাকিত্বের মধ্যে আইভান ইল্‌য়িচ অতীতের স্মৃতিচারণের মধ্যেই বেঁচে আছে। অতীতের সব ছবি একের পর এক তার সামনে ভেসে ওঠে। সব সময়ই নিকট অতীত থেকে আরম্ভ করে সে স্মৃতি-চারণা ক্রমাগত পিছনে যেতে যেতে শৈশবকালে গিয়ে থামে। খাবার সময় কুলের ঝোল দেওয়া হলে তার মন চলে যায় শৈশবের সেই দিনগুলিতে যখন সে চটচটে, শুকনো ফরাসি কুল মজা করে খেত, তার মনে পড়ে যেত সেই কুলের বিচিত্র স্বাদ, বীচিগুলো চুষবার সময় মুখে জল আসার কথা; আর সেই সঙ্গে মনে পড়ে যেত সেই সময়কার অনেক স্মৃতি—তার নার্স, তার ভাই, খেলার সাথীরা। "না, এ সব আর নয়...এ সব বড় বেদনাদায়ক," নিজের মনেই কথাগুলি বলে আইভান ইল্‌যিচ আবার বর্তমানে ফিরে এল।

সঙ্গে সঙ্গে আব একটা স্মৃতির মিছিল তার মনেব সামনে এসে দাঁড়াল—তার বোগেব সূচনা ও বৃদ্ধি। রোগ অনেক দিন থেকেই আছে, কিন্তু যত পিছনে ফিরে যাওয়া যায় ততই জীবনের দেখা মেলে। জীবনের যা কিছু ভাল সবই সেখানে ছিল; ছিল জীবনও। দুইই মিলেমিশে একাকার হয়েছিল। ব্যথাটা যেমন ক্রমেই খারাপ হতে আরও খারাপ হয়ে চলেছে, তেমনি জীবনটাও খারাপ হতে আরও খারাপ হয়ে চলেছে। এসব কিছুর পিছনে আছে জীবনের সূচনায় একটিমাত্র উজ্জ্বল বিন্দু তারপরই নেমে এল কালো অন্ধকার—দ্রুত হতে দ্রুততর গতিতে। আইভান ইল্‌য়িচ-এর মনে হলো, "সে গতি চলেছে মৃত্যুর দূরত্বের বর্গের বিপরীত অনুপাতে।" তখনই ক্রমবর্ধমান গতিতে পতনশীল একটি পাথরের ছবি তার মনের মধ্যে গেঁথে গেল। ক্রমবর্ধমান যন্ত্রণার পথ বেয়ে অতি দ্রুত গতিতে জীবন ছুটে চলেছে তাব পরিণতির দিকে—"আমি পড়ে যাচ্ছি", এই অনুভূতিতে। সে কেঁপে উঠল, চোখ সরিয়ে নিল, গতিরোধ করতে চাইল, কিন্তু আগে থেকেই সে জানে যে রোধ কববার ক্ষমতা তাব নেই; সে দিকে চেয়ে চোখ শ্রান্ত হয়ে উঠল তবু চোখ সরিয়ে নেবাব ক্ষমতা নেই; তাই সোফার পিছন দিকে চোখ ফিরিয়ে সেই ভয়াবহ পতন, আঘাত ও ধ্বংসের

জন্য অপেক্ষা করে রইল। নিজে নিজেই বলল, "প্রতিরোধ অসম্ভব। তবু কেন এই ধ্বংস তা যদি বোঝা যেত। কিন্তু তাও অসম্ভব। যদি কেউ বলতে পারত যে যথাযথ জীবন যাপন করিনি, তাহলে হয়ত এর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যেত। কিন্তু সে অভিযোগও করা যাবে না। সেটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।" একটা ব্যঙ্গের হাসি তার ঠোঁটে ফুটে উঠল, যেন তার সেই হাসি দেখে কেউ ভুল বুঝতে পারে। "কোনও ব্যাখ্যা নয়! যন্ত্রণা, মৃত্যু.. কিন্তু কেন?"

১১

এইভাবে একটি পক্ষ কেটে গেল। এর মধ্যে এমন একটি ঘটনা ঘটল যা আইভান ইলিচ ও তার স্ত্রী মনে-প্রাণে চেয়েছিল। পেত্রিশ্চেভ বিয়ের প্রস্তাব করল। ব্যাপারটা ঘটল সন্ধ্যাবেলা। ফিয়দর পেত্রিশ্চেভ এর প্রস্তাবের কথাটা কি করে স্বামীকে জানাবে সে কথা ভাবতে ভাবতেই পরদিন প্রাস্কোভ্যা ফিয়দরভ্‌না তার ঘরে ঢুকল। সেদিন রাতে আইভান ইলয়িচ্ এর অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়েছে। সে উপুড় হয়ে শুয়ে গোঙাচ্ছে; একদৃষ্টিতে সামনের দিকে সোজা তাকিয়ে রয়েছে।

স্ত্রী ওষুধের কথা বলতেই সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে ফিরে তাকাল। সেই দৃষ্টিতে স্ত্রীর প্রতি এত তীব্র ঘৃণা ধরা পড়ছিল যে সে তার কথা শেষ করতেই পারল না।

আইভান ইলযিচ বলল, "খৃস্টের দোহাই, আমাকে শান্তিতে মরতে দাও।"

স্ত্রী হয়ত চলে যেত, কিন্তু সেই সময় তার মেয়ে ঘরে ঢুকল এবং শুভ সকাল জানাবার জন্য বাবার দিকে এগিয়ে গেল। আইভান ইলযিচ যে ভাবে স্ত্রীর দিকে তাকিয়েছিল সেই একই ভাবে মেয়ের দিকেও তাকাল। সে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করায় শুকনো গলায় বলে দিলো যে শীঘ্রই সকলে তার হাত থেকে রেহাই পাবে। মা ও মেয়ে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে গেল।

লিসা মাকে বলল, "এতে আমাদের কি দোষ বলো? যেন আমরাই এ সব করেছি। বাবার জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু তাই বলে আমাদের কষ্ট দেওয়া কেন?"

যথাসময়ে ডাক্তার এল। বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আইভান "হ্যাঁ, না" বলেই কাটিয়ে দিলো। শেষের দিকে বলল, "আপনি তো জানেন কিছু করতে পারবেন না, কাজেই আমাকে একা থাকতে দিন।"

"আমরা আপনার যন্ত্রণাটা কমিয়ে দিতে পারি," ডাক্তার বলল।

"তাও আপনি পারেন না: ছেড়ে দিন।"

বসবার ঘরে গিয়ে ডাক্তার প্রাস্কোভ্যা ফিয়দরভ্‌নাকে বলল যে অবস্থা খুবই খারাপ, এখন আফিম খাইয়ে যন্ত্রণার লাঘব করাই একমাত্র পথ, কারণ সে খুবই কষ্ট পাচ্ছে। ডাক্তার জানাল, শারীরিক কষ্ট খুব বেশি তো বটেই, কিন্তু তার চাইতেও বেশি কষ্ট পাচ্ছে মানসিক যন্ত্রণায়, আর সেটাই তার আসল কষ্ট।

সেদিন রাতে গেরাসিম-এর সরল, চওড়া-গাল ঘুমন্ত মুখের দিকে চোখ পড়তেই হঠাৎ তার মাথায় একটা নতুন চিন্তা ঢুকে পড়ল "তাহলে কি সত্যি সত্যি সারা জীবন, সারা সচেতন জীবন আমি ঠিক পথে চলিনি?" এই চিন্তা থেকেই তার নৈতিক যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। তার ধারণা জন্মে গেছে যে এতদিন যেটাকে সে অসম্ভব মনে করেছে তাই আজ সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে · যে ভাবে তার জীবন চালানো উচিত ছিল তা সে করেনি। তার সরকারী কাজ, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, এই সব সামাজিক ও সরকারী কাজকর্ম—কোনও কিছুই তো ঠিকমতো করা হয়নি। আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা সে করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যাকে সে সমর্থন করতে চাইছে তার দুর্বলতা তার চোখে ধরা পড়ে গেল। সমর্থনের চেষ্টা বৃথা।

নিজের মনেই সে বলল, "কিন্তু তাই যদি হয়ে থাকে আর এই কথা জেনে আমি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছি যে যা কিছু আমি পেয়েছিলাম সবই হারিয়েছি এবং প্রতিকারের আর কোনও পথ খোলা নেই, তাহলে কি হবে?" চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে সে নতুন করে সমস্ত জীবনের পর্যালোচনা করতে লাগল। সকালে যখন পরিচারক ঘরে এল, এল তার স্ত্রী, তার মেয়ে, এল ডাক্তার, তখন তাদের দেখে, তাদের প্রতিটি কথা শুনে সে বুঝতে পারল যে গত রাত্রে যে ভয়ংকর সত্য তার কাছে উদ্ভাসিত হয়েছে তাই ঠিক। তাদের মধ্যে সে নিজেকেই দেখতে পেল, তার সমস্ত জীবনকেই দেখতে পেল, পরিষ্কার বুঝতে পারল সে তার কোনও কিছুই ঠিক নয়, একটা বিরাট ভয়ংকর প্রবঞ্চনা তার জীবন ও মৃত্যুকে লুকিয়ে রেখেছিল এই চেতনা তার দৈহিক যন্ত্রণাকে তীব্রতর করে তুলল, দশ গুণ বাড়িয়ে দিল। আর্তনাদ করতে করতে সে বিছানায় গড়াতে লাগল, গায়ের চাদরটা ধরে টানতে লাগল। তার মনে হতে লাগল, চাদরটা তাকে চেপে ধরেছে, তার দম বন্ধ করে দিচ্ছে। আর সেজন্য সে সবাইকে ঘৃণা করতে লাগল।

তারা তাকে একমাত্রা আফিম খাইয়ে দিল। সে চেতনা হারাল, খাবার সময় আবার সেই একই কষ্ট শুরু হল। সকলকে তাড়িয়ে দিয়ে সে বিছানায় ছটফট করতে লাগল।

তার স্ত্রী কাছে গিয়ে বলল, "জন, প্রিয়তম, আমার জন্য এটা করো (আমার জন্য?), এতে কোনও ক্ষতি নেই, বরং অনেক সময়ই এতে উপকার হয়। আরে, এ তো কিছু না। অনেক সময় সুস্থ লোকেরাও—"

সে বড় বড় করে তাকাল।

"কি? ধর্মানুষ্ঠান? কিসের জন্য? না। তাছাড়া . ।"

তার স্ত্রী কেঁদে উঠল।

"হ্যাঁগো। আমি পুরোহিতকে ডেকে পাঠাচ্ছি। তিনি বড় ভাল মানুষ।"

"ঠিক আছে, খুব ভাল," সে বলল।

পুরোহিত এসে তার স্বীকারোক্তি নেবার পর সে অনেকটা নরম হলো, সন্দেহের হাত থেকে মুক্তি পেল, ফলে যন্ত্রণারও বুঝি অবসান হলো, মুহূর্তের জন্য আশা জাগল মনে। আর একবার আন্ত্রিক বিবর্ধনের কথা এবং রোগ নিরাময়ের সম্ভাবনার কথা সে ভাবতে লাগল! অশ্রুসিক্ত চোখে সে ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দিলো।

অনুষ্ঠানের পরে আবার যখন তাকে শুইয়ে দিলো তখন সে আরাম অনুভব করল, তার মনে আবার জীবনের আশা জেগে উঠল। যে অস্ত্রোপচারের কথা তাকে বলা হয়েছিল তার কথা সে ভাবতে শুরু করল। নিজেকেই বলল, "আমি বাঁচতে চাই।" স্ত্রী এসে তাকে অভিনন্দন জানাল; তার মুখে চিরাচরিত কথাগুলিই উচ্চারিত হলো—

"আসলে তুমি অনেক ভাল হয়ে গেছ, তাই নয় কি?"

স্ত্রীর দিকে না তাকিয়েই সে বলল, "হ্যাঁ।"

তার পোশাক, তার চেহারা, তার মুখের ভাব, তার কণ্ঠস্বর—সব একই কথা বলছে : "এটা আসল কথা নয়। তুমি যা কিছু নিয়ে বেঁচেছিলে এবং এখনও বেঁচে আছ সে সবই মিথ্যা, প্রবঞ্চনা; জীবন ও মৃত্যুকে তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।" এই চিন্তা মনের মধ্যে আসামাত্রই তার মধ্যে জেগে উঠল ঘৃণা, সেই ঘৃণার সঙ্গে দেখা দিলো দৈহিক যন্ত্রণা, আর সেই যন্ত্রণার সঙ্গে এল অনিবার্য, আসন্ন ধ্বংসের আভাস। নতুন কিছু ঘটতে লাগল; তীক্ষ্ণ মোচড়ানো যন্ত্রণা দেখা দিলো; নিঃশ্বাস আটকে আসতে লাগল।

যখন সে "হ্যাঁ" শব্দটি উচ্চারণ করল তখন তার মুখের ভাব ভয়ংকর হয়ে উঠল। "হ্যাঁ" বলে স্ত্রীর মুখের দিকে সোজা তাকিয়েই সে মুখ ফিরিয়ে নিলো, আর্ত কণ্ঠে বলে উঠল—

"চলে যাও, চলে যাও, আমাকে একা থাকতে দাও!"

১২

সেই মুহূর্ত থেকে সেই যে আর্তনাদ শুরু হলো তিন দিন তা আর থামল না। সে আর্তনাদ এতই ভয়াবহ যে দুটো বন্ধ দরজার ওপার থেকে শুনলেও আতংকে বুক কেঁপে ওঠে। স্ত্রীর প্রশ্নের জবাব দেওয়ামাত্রই সে বুঝতে পারল যে তার পতন ঘটেছে, ফিরবার কোনও পথ নেই, পরিণাম—শেষ পরিণাম সমাগত, অথচ সন্দেহের অবসান এখনও হলো না, সন্দেহ সন্দেহই থেকে গেল।

"আঃ! আঃ!—আঃ!" নানা সুরে সে আর্তনাদ করতে লাগল।

আর্তনাদের শুরুতেই সে বলেছিল, "আমি চাই না-আ!" তাই তার আর্তনাদের সেই একই স্বরবর্ণ "আ" বার বার উচ্চারিত হতে লাগল।

তার কাছে তখন সময় বলে কিছু ছিল না বটে, কিন্তু এই তিনটি দিন সেই কালো বস্তার মধ্যে সে অবিরাম সংগ্রাম করেছে—একটি অদৃশ্য অপ্রতিরোধ্য শক্তি যেন

জোর করে তাকে সেই বস্তার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। নিজেকে বাঁচাতে পারবে না জেনেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি যেমন জল্লাদের সঙ্গে সংগ্রাম করে সেও সেইভাবেই সংগ্রাম করেছে। প্রতিটি মুহূর্তে সে বুঝতে পারছে, তার সব চেষ্টা সত্ত্বেও যাকে দেখে তার এত ভয়, ক্রমাগত তার দিকেই সে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে। সে বুঝতে পারছে, ঐ কালো গর্তটার মধ্যে তাকে যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে সে জন্য তো বটেই, কিন্তু তার চাইতেও বেশি সে যে সোজা তার মধ্যে ঢুকতে পারছে না—এই উভয় কারণেই তার এই যন্ত্রণা। তার জীবন যে ভালভাবে কেটেছে এই দাবিই তাকে ওখানে ঢুকতে বাধা দিচ্ছে। জীবনেব এই শক্তিই তাকে জোর করে ধরে রেখেছে, তাকে এগিয়ে যেতে দিচ্ছে না, আর সে জন্যই তার সব চাইতে বেশি যন্ত্রণা।

অকস্মাৎ একটি শক্তি তার বুকের ওপাশে আঘাত করল, ক্রমেই তার শ্বাস রোধ করে দিতে লাগল; সে গড়িয়ে সেই গর্তের মধ্যে পড়ে গেল; আর তার শেষ প্রান্তে সে একটা আলো দেখতে পেল। অনেক সময় রেলগাড়িতে যেতে যেতে যখন সে আসলে পিছন দিকে চলেছে তখন তার মনে হয়েছে যে সে সামনের দিকে যাচ্ছে এবং তারপর হঠাৎ আসল দিকটা বুঝতে পেরেছে। এখনও ঠিক তাই ঘটল।

নিজেব মনেই সে বলল, "হ্যাঁ, কোনও কাজই ঠিকমতো করা হয়নি, কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। ঠিক কাজটা সে তো করতে পারত। কিন্তু ঠিক কাজটা কি?" প্রশ্নটা মনে জাগতেই সে চুপ করে গেল।

এটা তার মৃত্যুর দু'ঘণ্টা আগে তৃতীয় দিন শেষ হবার সময়কার কথা। ঠিক সেই সময় স্কুলের ছেলেটি চুপি চুপি বাবার ঘরে ঢুকে তার বিছানার পাশে গেল। মুমূর্ষু লোকটি আর্তনাদ করতে কবতে হাত নাড়ছিল। তার একটা হাত স্কুলেব ছেলেটির মাথায় পড়ল। ছেলেটি হাতটা ধরে তার ঠোঁটের উপর চেপে ধরে কেঁদে উঠল।

ঠিক সেই মুহূর্তে আইভান ইল্যিচ গড়িয়ে গর্তটার মধ্যে পড়ে গেল; সেই আলোটা তার চোখে পড়ল; সে দেখতে পেল, তার জীবন যেমনটি হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি বটে, কিন্তু সে জীবনকে এখনও ঠিক পথে নেওয়া যায়। সে নিজেকে প্রশ্ন করল, "ঠিক কথাটার মানে কি?"—তারপর চুপ কবে কান পেতে রইল। তখন তার মনে হলো, কে যেন তার হাতে চুমো খাচ্ছে। চোখ মেলে সে ছেলেকে দেখতে পেল। তার জন্য দুঃখ হলো। স্ত্রী তার কাছে এল। সে তার দিকেও চোখ ফেরাল। হাঁ কবে স্ত্রী তার দিকে তাকিয়ে আছে, না-মোছা চোখের জল তার নাক ও গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে, তার মুখে হতাশার ছায়া। স্ত্রীর জন্যও তার দুঃখ হলো।

সে ভাবল, "হ্যাঁ, আমি তাদের দুঃখের মধ্যে ফেলে যাচ্ছি। এরা দুঃখ পাচ্ছে, কিন্তু আমি মারা গেলে এদের ভালই হবে।" এই কথাগুলি সে বলতে চেয়েছিল, কিন্তু বলবার সাহস হলো না। সে ভাবল, "তাছাড়া বলে কি হবে, কাজেই দেখাব।" স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ছেলেকে দেখিয়ে সে বলল—

"নিয়ে যাও. .ওর জন্য দুঃখিত ..আর তুমিও. .।" সে বলতে চেষ্টা করল "ক্ষমা করো", কিন্তু শুধু "ক্ষমা..." দুর্বলতার জন্য সবটা বলতে পারল না, শুধু মাথা নাড়ল; সে জানত. যাঁর জানা দরকার সেটা ঈশ্বর ঠিকই জানবেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে সে পরিষ্কার বুঝতে পারল, যা তাকে এতদিন কষ্ট দিয়েছে, কিছুতেই তাকে ছাড়েনি, আজ তা হঠাৎ খসে পড়েছে—দু'দিক থেকে, দশদিক থেকে, সব দিক থেকে। সে তাদের জন্য দুঃখিত, তাই এমন কাজ সে করবে যাতে দুঃখ না পায়। এই যন্ত্রণার হাত থেকে সে নিজে মুক্তি পাবে, তাদেরও মুক্তি দেবে। "কী ঠিক আর কত সরল!" সে ভাবল। "কিন্তু যন্ত্রণাটা?" নিজেকেই প্রশ্ন করল। "সে কোথায় গেল? এই যন্ত্রণা, তুমি কোথায়?"

সে যন্ত্রণাকে খুঁজতে লাগল।

"হ্যাঁ, এখানে আছে। বেশ তো, তাতে কি, থাকুক না।"

"আর মৃত্যু। সে কোথায়?"

চির-অভ্যস্ত মৃত্যুর আতংককে সে খুঁজতে লাগল, পেল না। "সে কোথায়? মৃত্যু কি?" আর কোনও আতংক নেই, কারণ মৃত্যু আতংক নয়।

মৃত্যুর বদলে দেখা দিলো আলো।

"তাহলে এই সে!" হঠাৎ সে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল।

"কী আনন্দ!"

তার কাছে একটি মুহূর্তে এ সব কিছু ঘটে গেল; সেই মুহূর্তটির অর্থ পরে কোনওদিন পরিবর্তিত হলো না। যারা সেখানে ছিল তাদের কাছে তার যন্ত্রণা আরও দু'ঘণ্টা স্থায়ী হলো। তার গলায় একটা ঘর্ ঘর্ শব্দ হলো, তার শুকনো দেহটা কুঁচকে গেল। তারপর বেশকিছু সময় পরে পরে ঘর্ঘর্ শব্দ হতে লাগল, হাঁপ ধরতে লাগল।

"সব শেষ", তার উপর ঝুঁকে পড়ে কে যেন বলল।

কথাগুলিকে সে আঁকড়ে ধরল, আত্মার মধ্যে আবৃত্তি করতে লাগল।

নিজেকে বলল, "মৃত্যুর অবসান হলো. সে আর নেই।"

সে নিঃশ্বাস টানল, মাঝপথে থেমে গেল, শরীরটা টান টান করল, মারা গেল।

মার্চ ২৬, ১৮৮৬

তিন সন্ন্যাসী

The Three Hermits

(ভল্‌গা অঞ্চলে প্রচলিত একটি উপকথা)

একজন বিশপ জাহাজে চড়ে আর্কাঞ্জেল থেকে সলোভেৎস্ক মঠে যাচ্ছিল। সেখানকার পবিত্র স্থানগুলি দর্শনের উদ্দেশ্যে একদল তীর্থযাত্রীও সেই একই জাহাজে যাচ্ছিল। যাত্রা নির্বিঘ্নেই চলল। বাতাস অনুকূল; আবহাওয়া পরিষ্কার। তীর্থযাত্রীরা ডেক-এর উপর আসন নিয়েছে; কেউ খাচ্ছে, কেউ বা দল বেঁধে গল্প করছে। বিশপও ডেক-এ নেমে এল। ডেক-এর উপর পায়চারি করতে করতে বিশপ দেখল, একদল লোক জাহাজের গলুইতে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে একটি জেলের কথা শুনছে। জেলেটি সমুদ্রের দিকে আঙুল বাড়িয়ে তাদের কি যেন বলছে। বিশপ পায়চারি থামিয়ে সেইদিকে নজর ফেরাল। সূর্যের আলোয় সমুদ্রের ঝিকিমিকি ছাড়া সে আর কিছুই দেখতে পেল না। ভাল করে শোনবার জন্য সে আরও এগিয়ে গেল, কিন্তু তাকে দেখেই লোকটি মাথার টুপি নামিয়ে চুপ করে গেল। অন্য সকলেও টুপি খুলে বিশপকে অভিবাদন জানাল।

বিশপ বলল, "বন্ধুগণ, আমার জন্য আপনারা বিব্রত হবেন না। এই ভালমানুষটি কি বলছে সে কথা শুনতেই আমি এসেছি।"

"জেলেটি সন্ন্যাসীদের কথা বলছিল", অপেক্ষাকৃত সাহসী বণিকটি জবাব দিলো।

জাহাজের পাশে গিয়ে একটা বাক্সের উপর বসে বিশপ জিজ্ঞাসা করল, "কোন্ সন্ন্যাসী? তাদের কথা আমাকে বলো। আমিও জানতে চাই। আপনারা কি দেখাচ্ছিলেন আঙুল দিয়ে?"

"কেন, দূরে ঐ যে দেখতে পাচ্ছেন ওই ছোট দ্বীপটা", একটু ডান দিক ঘেঁষে সামনের একটা জায়গা দেখিয়ে লোকটি বলল। "আত্মার মুক্তির জন্য সন্ন্যাসীরা তো ঐ দ্বীপেই থাকেন।"

"দ্বীপ কোথায়? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না", বিশপ বলল।

"ঐ যে দূরে—আমার হাত বরাবর তাকান। একটুকরো মেঘ দেখতে পাচ্ছেন তো? তারই নিচে, একটু বাঁয়ে, ঐ যে অস্পষ্ট রেখা, ওটাই দ্বীপ।"

বিশপ ভাল করে তাকাল; কিন্তু তার অনভ্যস্ত চোখে রৌদ্রালোকিত জলের ঝিকিমিকি ছাড়া আর কিছুই ধরা পড়ল না।

সে বলল, "আমি দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু ওখানে যে সন্ন্যাসীরা থাকেন তাঁরা কারা?"

জেলেটি উত্তর দিলো, "তাঁরা ধর্মাত্মা লোক। অনেক দিন ধরে তাঁদের কথা শুনেছি, কিন্তু গেল বছরের আগে কখনও তাঁদের দেখার সুযোগ পাইনি।"

তারপর জেলেটি সব কথা খুলে বলল। একদিন রাতে মাছ ধরতে বেরিয়ে পথ হারিয়ে সে ঐ দ্বীপে গিয়ে উঠেছিল; তখন সে জানতেও পারেনি কোথায় গিয়ে উঠেছে। সকালে দ্বীপের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে সে একটি মাটির কুটির দেখতে পেল; একটি বুড়ো মানুষ সেখানে দাঁড়িয়েছিল। আরও দু'জন বেরিয়ে এল। তাকে খাইয়ে-দাইয়ে, তার জিনিসপত্র শুকিয়ে তারা তিনজন নৌকোটা মেরামত করতেও তাকে সাহায্য করল।

"আর তারা দেখতে কেমন?" বিশপ জিজ্ঞাসা করল।

"একজন বেশ ছোটখাট, পিঠটা কুঁজো। তাঁর পরনে পুরোহিতের জোব্বা, আর খুব বুড়ো; আমার তো ধারণা, বয়স একশ'র উপরে। তিনি এত বুড়ো যে তাঁর পাকা দাড়িতে সবুজের আভা লেগেছে, কিন্তু মুখখানি সর্বদাই হাসিখুশি, আর স্বর্গের দেবদূতের মতোই উজ্জ্বল। দ্বিতীয় জন একটু লম্বা, কিন্তু তিনিও খুব বুড়ো। পরনে শতচ্ছিন্ন একটা চাষীদের কোট। চওড়া দাড়ি, তাতে হল্‌দেটে ধূসর রঙের ছোপ। তিনি বেশ শক্ত-সমর্থ। আমি হাত লাগাবার আগেই তিনি এমনভাবে আমার নৌকোটাকে উল্টে দিলেন যেন একটা গামলা। তিনিও খুব দয়ালু আর হাসিখুশি। তৃতীয় জনও লম্বা; বরফের মতো সাদা দাড়ি হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। কিছুটা কড়া ধাতের মানুষ; ভুরু দুটি ঝুলে পড়েছে; কোমরে জড়ানো এক খণ্ড মাদুর ছাড়া পরনে আর কিছু নেই।"

"আর তাঁরা কি তোমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন?" বিশপ জিজ্ঞাসা করল।

"অধিকাংশ সময়ই তাঁরা চুপচাপ কাজ করছিলেন; নিজেদের মধ্যেও কথাবার্তা বলছিলেন খুবই কম। একজন হয়ত চোখ তুলে তাকালেন, অন্যরা তাতেই তাঁর মনের কথা বুঝে ফেললেন। সবচাইতে লম্বা লোকটিকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁরা অনেক কাল ধরে সেখানে আছেন কি না। তিনি ভুরু কুঁচকে বিড়বিড় করে কি যেন বললেন; মনে হলো তিনি রাগ করেছেন। কিন্তু সবচাইতে বুড়ো মানুষটি তাঁর হাত ধরে হাসলেন, আর তখনই লম্বা লোকটি শান্ত হলেন। বুড়ো মানুষটি শুধু বললেন, 'আমাদের করুণা করুন', তারপর হাসলেন।"

জেলেটি কথা বলতে বলতেই জাহাজটা দ্বীপের আরও কাছে পৌঁছে গেল।

হাত বাড়িয়ে দ্বীপটা দেখিয়ে বণিকটি বলে উঠল, "ঐ যে, প্রভু যদি দয়া করে ও দিকে তাকান তাহলেই এবার পরিষ্কার দেখতে পাবেন।"

বিশপ তাকাল; এবার সে একটা কালোমতো জিনিস দেখতে পেল—সেটাই দ্বীপ। সেদিকে একটুখানি তাকিয়ে সে গলুই ছেড়ে জাহাজের পিছন দিকে গিয়ে মাঝিকে জিজ্ঞাসা করল, "ওটা কোন্ দ্বীপ?"

লোকটি উত্তর দিলো, "ওটার কোনও নাম নেই। এই সমুদ্রে ওরকম অনেক দ্বীপ আছে।"

"আত্মার মুক্তিলাভের আশায় ওখানে সন্ন্যাসীরা বাস করেন এ-কথা কি সত্যি?"

"সেরকমই তো শুনেছি প্রভু, তবে সত্যি কি না জানি না। জেলেরা তো বলে তাদের দেখেছে; তবে তারা তো বানিয়ে গল্পও বলতে পারে।"

বিশপ বলল, "ঐ দ্বীপে নেমে লোকগুলিকে আমি দেখতে চাই। কি করে যাব বলো তো?"

মাঝি বলল, "জাহাজ তো দ্বীপে ভিড়তে পারবে না, তবে নৌকোতে চেপে ওখানে যেতে পারেন। আপনি বরং কাপ্তানের সঙ্গে কথা বলুন।"

কাপ্তানকে ডেকে পাঠাতেই সে এসে হাজির হলো।

বিশপ বলল, "আমি ঐ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখা করতে চাই। নৌকো করে আমাকে কি তীরে নামিয়ে দেওয়া যাবে না?"

কাপ্তান তাকে নিবৃত্ত করতে অনেক চেষ্টা করল।

বলল, "সে ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা যায়, তবে আমাদের অনেকটা সময় নষ্ট হবে। আর প্রভু যদি অভয় দেন তো বলি, এত কষ্ট করে গিয়ে দেখবার মতো লোক সে বুড়োরা নয়। শুনেছি তারা বোকা-সোকা বুড়ো মানুষ, কিছুই বোঝে না, জলের মাছের মতোই কখনও কোনও কথাও বলে না।"

বিশপ বলল, "আমি ওদের দেখতে চাই। আপনাদের যে অসুবিধা ও সময় নষ্ট হবে সেটা আমি পুষিয়ে দেব। দয়া করে একটা নৌকোর ব্যবস্থা করে দিন।"

কোনও উপায় নেই; অগত্যা সেই হুকুমই দেওয়া হলো। নাবিকরা পাল নামিয়ে দিলো, মাঝি হাল ধরল, আর জাহাজের মুখটা দ্বীপের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হলো; আগা-গলুইতে বিশপের জন্য একটা চেয়ার পেতে দেওয়া হলো। সেখানে বসে সে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। যাত্রীরা সকলেই সেখানে জড়ো হয়ে দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে রইল। যাদের চোখ ভাল তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বীপের একটা পাহাড় এবং তারপরেই একটা মাটির কুটির দেখতে পেল। একজন তো শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসীদেরও দেখতে পেল। কাপ্তান একটা দূরবীন এনে চোখে লাগিয়ে তারপর সেটা বিশপের হাতে দিলো।

"ঠিকই বটে। তীরে তিনটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। ঐ যে, বড় পাহাড়টার একটু ডান দিকে।"

বিশপ দূরবীনটা হাতে নিয়ে ঠিক মতো চোখে লাগিয়ে তিনজনকেই দেখতে পেল : একজন লম্বা, একজন অপেক্ষাকৃত কম লম্বা, ও একজন বেঁটে আর কুঁজো; হাত ধরাধরি করে তীরে দাঁড়িয়ে আছে।

কাপ্তান বিশপের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

"জাহাজ তো আর এগোতে পারবে না প্রভু। যদি তীরে যেতে চান, আপনাকে নৌকোয় যেতে হবে; আমরা এখানেই নোঙর ফেলে অপেক্ষা করব।"

দড়ি-দড়া বের করা হলো; নোঙর নামানো হলো; পাল গুটিয়ে ফেলা হলো।

একটা ধাক্কা খেয়ে জাহাজটা কেঁপে উঠল। তারপর নৌকোটা নামিয়ে দিয়ে দাঁড়িরা লাফিয়ে নেমে পড়ল। বিশপ সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসন গ্রহণ করল। লোকজনরা দাঁড়ে টান দিলো; নৌকোটা দ্রুত দ্বীপের দিকে এগিয়ে চলল। কাছাকাছি পৌঁছতেই তারা তিন বৃদ্ধকে দেখতে পেল : একজন লম্বা, কোমরে একখণ্ড মাদুর জড়ানো, একজন তার চাইতে বেঁটে, পরনে শতচ্ছিন্ন চাষীদের কোট; আর একজন খুব বুড়ো, বয়সের ভারে ন্যুব্জদেহ, পরনে পুরনো জোব্বা—তিনজন হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে।

দাঁড়িরা নৌকোটাকে টেনে তীরের কাছে নিয়ে গেলে বিশপ মাটিতে নামল।

তিন বৃদ্ধ তাকে অভিবাদন জানালে বিশপ তাদের আশীর্বাদ করল। তখন তারা মাথা আরও বেশি নোয়াল। তখন বিশপ তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি শুনেছি, আপনারা পুণ্যাত্মা লোক, নিজেদের আত্মার মুক্তির জন্য এবং আপনাদের প্রতিবেশীদের জন্য প্রভু যীশু খৃস্টের কাছে প্রার্থনা করেই আপনারা এখানে দিন কাটান। আমি খৃস্টের একজন অক্ষম সেবক; ঈশ্বরের কৃপায়ই তাঁর মেষপালকে পালন করবার ও শিক্ষা দেবার দায় আমার উপর পড়েছে। আপনারাও ঈশ্বরের সেবক, তাই আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, যাতে আপনাদেরও কিছু শিক্ষা দিতে পারি।"

বৃদ্ধরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল, কিন্তু চুপ করে রইল।

বিশপ বলল, "আমাকে বলুন, আত্মার মুক্তির জন্য আপনারা কি করছেন, আর এই দ্বীপে কেমন করেই বা আপনারা ঈশ্বরের সেবা করছেন।"

দ্বিতীয় সন্ন্যাসীটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সবচাইতে প্রবীণ লোকটির দিকে তাকাল। সে মৃদু হেসে বলল, "কি করে ঈশ্বরের সেবা করতে হয় আমরা জানি না। হে ঈশ্বরের সেবক, আমরা শুধু নিজেদের সেবা করি, নিজেদের পালন করি।"

"আর ঈশ্বরের কাছে কেমন করে প্রার্থনা করেন?" বিশপ জিজ্ঞাসা করল।

সন্ন্যাসী জবাব দিলো, "এইভাবে আমরা প্রার্থনা করি : তুমিও তিন, আমরাও তিন, আমাদের দয়া করো।"

বুড়ো মানুষটি এই কথা বললে তিনজনই আকাশের দিকে চোখ তুলে তার পুনরাবৃত্তি করল :

"তুমিও তিন, আমরাও তিন, আমাদের দয়া করো!"

বিশপ মৃদু হাসল। বলল, "পবিত্র ত্রিমূর্তির কথা আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন। কিন্তু আপনাদের প্রার্থনাটা ঠিকমতো হচ্ছে না। আপনারা পুণ্যাত্মা, আপনাদের আমার ভাল লেগেছে। বুঝতে পারছি, প্রভুকে আপনারা খুশি করতে চান, কিন্তু কি ভাবে তাঁকে সেবা করতে হয় সেটা জানেন না। প্রার্থনা করার রীতি ওটা নয়; আমার কথা শুনুন, আমি আপনাদের শিখিয়ে দেব। আমার নিজস্ব কোনও ধারা আপনাদের শেখাব না; পবিত্র গ্রন্থে ঈশ্বর স্বয়ং সকলকে যেভাবে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন সেটাই আপনাদের শিখিয়ে দেব।"

তখন বিশপ সন্ন্যাসীদের বোঝাতে লাগল কি ভাবে ঈশ্বর মানুষের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন; ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র, ঈশ্বর পবিত্র আত্মা —এই তত্ত্বও সে তাদেব বুঝিয়ে দিলো।

বলল, "ঈশ্বব পুত্র মাটির পৃথিবীতে নেমে এলেন মানুষকে উদ্ধার করতে, আর তিনি আমাদের শেখালেন এইভাবে প্রার্থনা কবতে। ভাল করে শুনুন, আর আমার সঙ্গে সঙ্গে বলুন : 'আমাদের পিতা।'

প্রথম বৃদ্ধটি বলল, "আমাদের পিতা"; দ্বিতীয় জন বলল, "আমাদের পিতা", আর তৃতীয় জনও বলল, "আমাদের পিতা।"

"যিনি স্বর্গে অবস্থান করেন", বিশপ বলতে লাগল।

প্রথম সন্ন্যাসী বলল, "যিনি স্বর্গে অবস্থান করেন", কিন্তু দ্বিতীয় সন্ন্যাসী কোনওরকমে কথাগুলি উচ্চারণ করল, আব তৃতীয় সন্ন্যাসী ঠিকমতো বলতেই পারল না। তার লম্বা চুল মুখের উপর এসে পড়ায় সে পরিষ্কারভাবে কথা বলতেই পারে না। একটা দাঁতও না থাকায় অতিবৃদ্ধ সন্ন্যাসীটির কথাও জড়িয়ে যায়।

বিশপ কথাগুলি আবার বলল, বৃদ্ধরাও তার পুনরাবৃত্তি করল। বিশপ একটা পাথরের উপব বসল, আর তিন বৃদ্ধ তার সামনে দাঁড়িয়ে তার মুখের ভঙ্গি দেখে দেখে কথাগুলি উচ্চারণ করতে লাগল। সারাটি দিন বিশপ একনাগাড়ে পরিশ্রম করে গেল; একই কথা বিশ, ত্রিশ, একশ' বার বলল, আব বৃদ্ধবা তার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি আওড়াতে লাগল। তাদের ভুল হলে শুধরে দিলো, আবাব নতুন করে শুরু করল।

প্রভুব প্রার্থনার সম্পূর্ণটা তাদের না শেখানো পর্যন্ত বিশপ সেখান থেকে গেল না। ক্রমে তাব সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলো বলতে তো তাবা শিখলই, এমনকি নিজেরাই কথাগুলি বলতেও শিখে ফেলল। মাঝামাঝি বৃদ্ধটিই সকলেব আগে শিখে ফেলে একাই সবটা আবৃত্তি করতে পারল। বিশপ তাকে দিয়ে প্রার্থনাটা বাব বাব বলাতে লাগল, আব শেষ পর্যন্ত সকলেই সেটা বলতে শিখে গেল।

ক্রমে অন্ধকার হয়ে গেল; সাগরেব বুক থেকে চাঁদ উঠল। তখন বিশপ জাহাজে ফিরে যাবাব জন্য উঠে দাঁড়াল। বৃদ্ধদেব কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় তাবা ষাষ্টাঙ্গ হয়ে তাকে অভিবাদন জানাল। সে প্রত্যেককে তুলে তাদের চুম্বন কবল, তাব শেখানো মতো করে প্রার্থনা কবতে বলল। তারপব নৌকোতে চেপে জাহাজে ফিরে গেল।

নৌকোতে বসে জাহাজেব দিকে যেতে যেতে সে শুনতে পেল, সন্ন্যাসীদের তিনটি কণ্ঠস্বর সোচ্চারে প্রভুব প্রার্থনা আবৃত্তি করে চলেছে। নৌকো যখন জাহাজেব কাছে পৌছে গেল তখন আব তাদের গলা শোনা গেল না; কিন্তু চাঁদের আলোয দেখা গেল, ঠিক যে ভাবে বিশপ তাদেব সমুদ্রেব তীরে ছেড়ে এসেছিল ঠিক সেইভাবেই তারা দাঁড়িয়ে আছে, সবচাইতে ছোট মানুষটি মাঝখানে, সবচাইতে লম্বা মানুষটি ডাইনে, আর মাঝারি মানুষটি বাঁয়ে। বিশপ জাহাজেব কাছে পৌছে উপবে উঠে

যেতেই নোঙর তুলে পাল খুলে দেওয়া হলো। পালে বাতাস লাগতেই জাহাজ চলতে শুরু করল; গলুইতে বসে বিশপ ফেলে-আসা দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ সন্ন্যাসীদেব দেখা গেল; তারপর তারা অদৃশ্য হয়ে গেল; চোখের সামনে ভাসতে লাগল কেবলমাত্র চন্দ্রালোকিত সাগরের ঢেউগুলি।

তীর্থযাত্রীরা শুয়ে পড়ল; ডেকটা চুপচাপ। বিশপের ঘুমুতে ইচ্ছা করল না; একাকি সে গলুইতে বসে রইল। সমুদ্রের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়েও দ্বীপটাকে দেখতে পেল না। ভালমানুষ বৃদ্ধদের কথাই ভাবতে লাগল। মনে পড়ল, প্রভুর প্রার্থনাটা শিখতে পেরে তারা কত খুশিই না হয়েছে। এমন পুণ্যাত্মা লোকদের কিছু শেখাতে, কিছুটা সাহায্য করতে ঈশ্বর তাকে সেখানে পাঠিয়েছেন বলে সে তাঁকে মনে মনে অনেক ধন্যবাদ জানাল।

বসে বসে এই সব ভাবতে ভাবতে সে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল। দ্বীপটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার চোখের সামনে চাঁদের আলো যেন ঢেউয়ের তালে তালে নেচে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, চাঁদের আলো পড়ে সাগরের বুকে যে উজ্জ্বল পথটা তৈরি হয়েছে তার উপর একটা সাদা কিছু যেন ঝকঝক কবছে। ওটা কি কোনও সামুদ্রিক পাখি, না কি কোনও ছোট নৌকোর চকচকে পাল? বিশপ অবাক হয়ে সেইদিকে তাকিয়ে রইল।

মনে মনে বলল, "নিশ্চয় কোনও নৌকো পাল তুলে আসছে; কিন্তু এটা তো অত্যন্ত দ্রুত এগিয়ে আসছে। এক মিনিট আগেই অনেক দূরে ছিল, কিন্তু এর মধ্যেই অনেকটা কাছে এসে গেছে। ওটা তো নৌকো হতে পারে না, কারণ কোনও পাল দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু যাই হোক না কেন, ওটা আমাদের লক্ষ্য করেই আসছে, আর প্রায় পৌঁছেও গেছে।"

কিন্তু জিনিসটা যে কি তা সে বুঝতে পারল না। নৌকো নয়, পাখি নয়, মাছও নয়। মানুষের চাইতে অনেক বড়। তাছাড়া সমুদ্রের মাঝখানে তো আর একটা মানুষ যেতে পারে না। বিশপ উঠে হালধারীকে বলল :

"ওদিকে দেখো তো বন্ধু, ওটা কি? আরে, এ কি?" কথাটা বললেও বিশপ এবার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে—তিনটি সন্ন্যাসী জলের উপব দিয়ে দৌড়ে আসছে; সারা শরীর সাদা, পাকা দাড়ি চকচক করছে; তারা এত দ্রুত জাহাজের কাছে এগিয়ে আসছে যেন জাহাজটা মোটেই চলছে না।

সেদিকে তাকিয়ে হালধারী আতংকে হালটা ছেড়ে দিলো।

"হে প্রভু! সন্ন্যাসীরা জলের উপর দিয়ে এমনভাবে আমাদের দিকে দৌড়ে আসছে যেন ওটা শুকনো মাটি।"

তার কথা শুনে যাত্রীরা লাফ দিয়ে উঠে গলুই-এর কাছে ভিড় করল। তারাওদেখল, সন্ন্যাসীরা হাত ধরাধরি করে এগিয়ে আসছে; দু'পাশের দু'জন ইঙ্গিতে জাহাজটাকে থামাতে বলছে। তিনজনই জলের উপর দিয়ে এগিয়ে আসছে পা না

ফেলে। জাহাজটা থামাবার আগেই সন্ন্যাসীরা পৌঁছে গেল; মাথা উঁচু করে তিনজন একসঙ্গে বলতে লাগল ঃ

"ঈশ্বরেব সেবক, আপনার শিক্ষা আমরা ভুলে গেছি। যতক্ষণ আবৃত্তি করছিলাম ততক্ষণ মনে ছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ বলা বন্ধ করতেই একটা শব্দ বাদ পড়ে গেল. আর এখন সব ভুলে গেছি। কিছুই মনে করতে পারছি না। আবার আমাদের শিখিয়ে দিন।"

বিশপ ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে জাহাজের পাশে ঝুঁকে পড়ে বলল :

"আপনাবা ঈশ্বরের প্রিয়জন, আপনাদের নিজস্ব প্রার্থনাই প্রভুর কাছে পৌঁছবে। আপনাদের শেখাবার শক্তি আমার নেই। আমাদের মতো পাপীদের জন্য প্রার্থনা করবেন।"

তখন বিশপ নত হয়ে বৃদ্ধদের অভিবাদন করল; তারাও মুখ ঘুরিয়ে সমুদ্রের উপর দিযে ফিরে গেল। যে জায়গায় গিয়ে তারা দৃষ্টি-পথের আড়ালে চলে গেল, ভোর না হওয়া পর্যন্ত সেখানে একটা আলো জ্বলতে লাগল।

১৮৮৬

ক্ষুদে শয়তান ও পাঁউরুটির ছিল্‌কা

The imp and the crust

একদিন খুব সকালে একটি গরীব চাষী লাঙল চযতে গেল। প্রাতরাশের জন্য সঙ্গে নিল পাঁউরুটির উপরকার একটুকরো ছিল্‌কা। লাঙলটা ঠিকঠাক করে, রুটির ছিল্‌কাটাকে কোট দিয়ে চাপা দিয়ে একটা ঝোপের নিচে রেখে সে কাজ শুরু করে দিলো। কিছুক্ষণ পরে ঘোড়াটা ক্লান্ত হয়ে পড়ল; তার নিজেরও ক্ষিধে পেযে গেল; তাই লাঙল থেকে খুলে ঘোড়াটাকে চবতে দিলো এবং কোট ও প্রাতরাশ আনতে ঝোপের দিকে এগিযে গেল।

কোটটা তুলে দেখে, রুটিটা উধাও! অনেক খুঁজল, কোটটা ঘুরিয়ে-ফিরিযে দেখল, ঝাড়ল—কিন্তু রুটিটা কোথাও নেই। ব্যাপার কি কিছুই বুঝতে পারল না।

ভাবল, "আশ্চর্য ব্যাপার! কাউকে তো দেখতে পাইনি। কিন্তু কেউ না কেউ নিশ্চয় এসেছিল; এসে রুটিটা নিয়ে গেছে!"

চাষী যখন জমিতে লাঙল দিচ্ছিল সেই সময় ক্ষুদে শয়তান এসে রুটিটা চুরি করেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে সে ঝোপের আড়ালেই বসে ছিল; অপেক্ষা কবছিল কখন চাষীটা দিব্যি গেলে শয়তানকে ডাকবে।

প্রাতরাশটা হারিয়ে চাষীর খুব দুঃখ হলো; তবু সে বলল, "তা আর কি করা যাবে। আমি তো আর ক্ষিধেয় মরে যাব না। হয়ত দরকার ছিল বলেই কেউ রুটিটা নিয়েছে। তার কাজে লাগুক!"

তখন সে কুয়োর কাছে গিয়ে অনেকটা জল খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। তারপর ঘোড়াটাকে লাঙলে জুতে আবার চষতে শুরু কবল।

চাষী কোনও পাপ কাজ করল না দেখে ক্ষুদে শয়তানটা মন-মরা হয়ে পড়ল; সব কথা জানাতে তাব মনিব শযতানেব কাছে চলে গেল।

শয়তানের কাছে গিয়ে সে চাষীর রুটি নিযে নেবার কথাটা জানাল; আরও জানাল যে, এতে তাকে গালাগালি না করে সে বরং বলেছে, "তার কাজে তো লাগুক।"

শয়তান রেগে জবাব দিলো : "লোকটা যদি তোমার উপর টেক্কা মেবে থাকে, সেটা তোমার দোষ—তুমি নিজের কাজও বোঝো না! যদি চাষীরা ও তাদের বৌরা ওই পথেই চলে তাহলে তো আমাদের দফা রফা। এ ভাবে চলতে দেওয়া যায় না। এখনই ফিরে যাও, সব ঠিক করে ফেলো। তিন বছরের মধ্যে যদি ওই চাষীর উপর টেক্কা দিতে না পারো তাহলে তোমাকে পবিত্র জলে চুবিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব!"

ক্ষুদে শয়তানটা ভয় পেয়ে গেল। পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে ভাবতে বসল কি করে তার দোষেব প্রতিকার করা যায়। অনেক ভেবে-চিন্তে একটা ভাল মতলব ঠাওড়াল।

একটা মানুষের বেশ ধবে, গরীব চাষীর বাড়িতে গিয়ে সে চাকরি নিল। প্রথম বছর সে চাষীকে জলাজমিতে ফসল বুনবার পরামর্শ দিলো। তার পবামর্শমতো চাষীও জলাজমিতেই ফসল বুনল। সে বছরটা খুব খরা হলো। ফলে অন্য সব চাষীব ফসল রোদের তাপে পুড়ে গেল, কিন্তু সেই গরীব চাষীর ফসল খুব ঘন, লম্বা, আর দানায় ভরা হলো। শস্য যা পেল তাতে সারা বছর চলেও বেশ কিছুটা উদ্বৃত্ত হবে।

পবেব বছব ক্ষুদে শয়তান পাহাড়ের উপরে ফসল বুনতে পরামর্শ দিলো। আর সে বছব গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টি হলো। অন্য সকলের ফসল জমিতে শুয়ে পড়ল, পড়ে গেল, দানাও ভাল হলো না; কিন্তু পাহাড়ের উপরে বলে চাষীর খুব ভাল ফসল হলো। আগেব তুলনায় এত বেশি ফসল বেঁচে গেল যে তা নিয়ে কি কবরে বুঝতে পারল না।

তখন ক্ষুদে শয়তান কেমন করে শস্য গুঁড়ো করে চোলাই মদ বানাতে হয সেটা চাষীকে শিখিয়ে দিলো। চাষীও কড়া মদ তৈরি করে নিজে খেল, বন্ধুবান্ধবদেরও খাওয়াল।

কাজেই ক্ষুদে শয়তান তাব মনিব শয়তানেব কাছে গিয়ে গর্ব করে জানাল যে তার পরাজয়ের বদলা সে নিয়েছে। শয়তান বলল, সে নিজে গিয়ে অবস্থাটা দেখে আসবে।

চাষীর বাড়িতে গিয়ে দেখল, চাষী সব প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করে এনে মদ

খাওয়াচ্ছে। তার বৌ অতিথিদের মদ পরিবেশন করছে। সকলের হাতে হাতে মদ দিতে গিয়ে টেবিলে হোঁচট খেয়ে সে এক গ্লাস মদ ঢেলে ফেলল।

চাষী রেগে গিয়ে বৌকে বকুনি দিলো : "এটা কি করলি মাগী? এটা কি নর্দমার জল পেয়েছিস যে ভাল জিনিসটা মেঝেময় ছড়িয়ে দিলি?"

ক্ষুদে শয়তান কনুই দিয়ে তার মনিব শয়তানকে খোঁচা দিয়ে বলল, "দেখো, এই লোকই তার একমাত্র রুটির ছিল্‌কাটা হারিয়েও কিছু মনে করেনি!"

বৌকে বকতে বকতে চাষী নিজেই মদ পরিবেশন কবতে লাগল। সেই সময় একটি গরীব চাষী কাজ থেকে ফিরে বিনা নিমন্ত্রণেই সেখানে হাজির হলো। সকলকে অভিবাদন জানিয়ে সেও বসে গেল। সকলেই মদ খাচ্ছে। সারাদিনেব খাটুনির ফলে সেও খুব শ্রান্ত; তাই তার মনে হলো, এক ফোঁটা পেলে ভাল হতো। সে বসে আছে তো বসেই আছে। তার মুখে জল আসতে লাগল। কিন্তু সেই চাষী তাকে মদ তো দিলোই না, বরং নিজের মনে বক্‌বক্‌ করতে লাগল · "যে কেউ এসে হাজির হলেই তো তাকে মদ দিতে পারি না।"

এতে শয়তানটা খুশি হলো; কিন্তু ক্ষুদে শয়তান মুচকি হেসে বলল, "দাঁড়াও না, এখনও অনেক বাকি আছে!"

ধনী চাষীরা মদ খেলো; বাড়ির মালিকও খেল। তাবপর তারা পরস্পবকে বানানো সব খোশামুদে কথা বলতে লাগল।

সে সব শুনে শয়তানটা ক্ষুদে শয়তানের তারিফ কবতে লাগল।

বলল, "মদ যখন ওদের এতখানি চালাক করে তুলেছে যে একে অন্যকে ঠকাতে শুরু করেছে, তখন শীঘ্রই ওরা আমাদের খপ্পরে এসে পড়বে।"

ক্ষুদে শয়তানটি বলল, "দেখোই না কি হয়। আর এক পাত্র করে চলুক না। এখন তো সব শেয়াল বনে গেছে, লেজ নাড়তে নাড়তে একে অন্যের পিছনে ঘুরছে; একটু পরেই দেখবে সব বুনো নেকড়ে হয়ে গেছে।"

চাষীরা আরও এক গ্লাস করে টানল, আর তাদের কথাবার্তাও আরও বেপরোয়া ও ভয়ানক হয়ে উঠল। তেল-দেওয়া কথার বদলে এবার তারা পরস্পরকে খিস্তি-খেউড় করতে শুরু করল। দেখতে দেখতে শুরু হয়ে গেল লড়াই, নাকের উপর চলল ঘুষি। বাড়ির মালিকও তাতে মদত দিতে গিয়ে উত্তম-মধ্যম খেল।

শয়তান তো এ সব দেখেশুনে মহা খুশি।

"একেবারে পয়লা নম্বর।" সে বলে উঠল।

ক্ষুদে শয়তান বলল : "দাঁড়াও না—আসল খেলাই তো বাকি। আগে তিন নম্বর গ্লাস চলুক। এখন ওরা নেকড়ের মতো গর্জাচ্ছে, আর এক পাত্তর পেটে পড়লে একেবারে শুয়োর বনে যাবে।"

তৃতীয় গ্লাসও ঘুরে গেল। সকলেই জন্তু বনে গেল। কোনও কিছু না জেনে-বুঝেই হৈ-হল্লা শুরু করে দিলো; কারও কথা কেউ কানে তুলছে না।

তারপর সভা ভঙ্গ হলো। কেউ একা, কেউ জোড়-বেঁধে, কেউ বা তিনজন এক জুটিতে—সকলেই টলতে টলতে পথ চলতে লাগল। বাড়ির মালিক অতিথিদের এগিয়ে দিতে গিয়ে একটা ডোবার মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে গেল; পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাদায় মাখামাখি; সেখানে পড়েই সে শুয়োরের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগল।

শয়তানটা আরও খুশি।

সে বলল, "আরে, তুমি তো দেখছি বেশ পয়লা নম্বরের মদের ব্যবস্থা করেছ; রুটির বেলায় যে ভুলটা করেছিলে সেটা শুধরে নিয়েছ। কিন্তু এবার বলো দেখি এ-মদটা কেমন করে বানানো হয়। প্রথমে নিশ্চয় এতে শেয়ালের রক্ত মিশিয়েছিলে; তাই ওরা শেয়ালের মতো ধূর্ত হয়ে উঠেছিল। তারপর মনে হয় মিশিয়েছিলে নেকড়ের রক্ত; তাই ওরা নেকড়ের মতো হিংস্র হয়ে উঠেছিল। আর শেষ করেছিলে নির্ঘাৎ শুয়োরের রক্ত দিয়ে, যাতে ওরা শুয়োরের মতোই আচরণ করে।"

ক্ষুদে শয়তান বলল, "না, ও ভাবে করিনি। চাষী যাতে প্রয়োজনেব অতিরিক্ত ফসল পায় শুধু সেই চেষ্টাই করেছি। পশুর রক্ত তো মানুষের মধ্যে সব সময়ই থাকে; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কেবলমাত্র নিত্যপ্রয়োজনীয় ফসলটুকুই তার থাকে, ততক্ষণ সে পশুটা ঘুমিয়ে থাকে। সেইরকম অবস্থাতেই শেষ রুটির ছিল্‌কেটুকুর জন্যও তার মন টলেনি। কিন্তু যখনই বাড়তি ফসল হাতে পড়ল তখনই সে তাকে ভোগের সামগ্রী করে তুলতে চাইল। আর সেই ভোগের পথটাই আমি দেখিয়ে দিলাম—সেটা মদ খাওয়া। আর যেই ঈশ্বরের দানকে সে আত্ম-সুখেব মদে পরিণত করল, অমনি তার ভিতবকার শেয়ালের, নেকড়ের ও শুয়োরের রক্ত সব বেরিয়ে এল। মদ খেতে শুরু করলেই সে পশুতে পরিণত হবে।"

শয়তানটা ক্ষুদে শয়তানকে প্রশংসা করল, আগেকার ভুলের জন্য তাকে ক্ষমা করল, আরও উঁচু মর্যাদার আসনে তাকে বসিয়ে দিলো।

১৮৮৬

মুরগির ডিমের মতো বড় শস্য-কণা

A grain as big as a hen's egg

একদিন কিছু ছেলেমেয়ে পাহাড়ের খাদে একটা জিনিস পেল; দেখতে শস্যকণার মতো, মাঝ-বরাবর খাঁজ-কাটা; কিন্তু আকারে একটা মুরগির ডিমের মতো বড়। সেই পথে যেতে যেতে জনৈক পথিক সেটা দেখতে পেয়ে ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে এক পেনি দিয়ে কিনে শহরে গিয়ে দুর্লভ বস্তু হিসাবে রাজার কাছে বিক্রি করল।

রাজা জ্ঞানীজনদের ডেকে জানতে চাইল জিনিসটা কি। তারা অনেক ভাবনা-চিন্তা করে মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না। শেষ পর্যন্ত একদিন হলো কি, জিনিসটা যখন জানালার গোবরাটে পড়েছিল তখন একটা মুরগি উড়ে এসে সেটাকে ঠুকরে একটা গর্ত করে ফেলল, আর তখনই সকলে বুঝতে পারল যে সেটা একটা শস্য-কণা। বিজ্ঞজনরা রাজাকে গিয়ে বলল ঃ

"এটা একটা শস্য-কণা।"

শুনে রাজা খুব বিস্মিত হলো; হুকুম জারী করল, এ রকম শস্য কবে কোথায় উৎপন্ন হয়েছিল সেটা খুঁজে বের করতে হবে। বিজ্ঞজনরা আবার ভাবতে বসল, পুঁথির পাতা ওল্টাল; কিন্তু কোনও হদিস পেল না। অতএব রাজার কাছে ফিরে গিয়ে তারা জানাল :

"আমরা কোনও জবাব দিতে পারলাম না। পুঁথিপত্রে এর কোনও উল্লেখ নেই। আপনি চাষীদের জিজ্ঞাসা করুন। এ রকম বড় আকারের শস্য কবে ও কোথায় জন্মাত সে খবর তাদের কেউ কেউ পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শুনে থাকতে পারে।"

তখন রাজা হুকুম দিলো, খুব বুড়ো একজন চাষীকে তার কাছে ধরে আনতে হবে; চাকররাও সেরকম একজনকে পেয়ে তাকে রাজার কাছে হাজির করল। লোকটি বুড়ো ও কুঁজো, গায়ের রং ছাইয়ের মতো, একটাও দাঁত নেই; কোনওমতে দুটো লাঠিতে ভর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে রাজার কাছে উপস্থিত হলো।

রাজা তখন শস্যটা দেখালো, কিন্তু বুড়ো লোকটি কিছু দেখতেই পায় না; জিনিসটা হাতে নিয়ে তাতে হাত বুলোতে লাগল। রাজা জিজ্ঞাসা করল :

"তুমি কি বলতে পারো বুড়ো, এ ধরনের শস্য কোথায় জন্মাত? এ রকম শস্য কি কখনও কিনেছ, বা তোমার ক্ষেতে বুনেছ?"

বুড়ো লোকটি এত কালা যে রাজার কথা তার কানেই গেল না; অনেক কষ্টে কিছুটা বুঝে নিয়ে বলল, "না! আমার ক্ষেতে এ রকম শস্য কখনও বুনিওনি, কাটিওনি, বা কখনও কিনিওনি। আমরা যখন শস্য কিনতাম তখন সেগুলি এখনকার

মতোই ছোট ছিল। আপনি বরং আমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। এ রকম শস্য কোথায় জন্মাত সেটা তিনি হয়ত শুনে থাকবেন।"

রাজা তখন বুড়ো লোকটির বাবাকে আনতে লোক পাঠাল, আর তারাও তাকে এনে রাজার কাছে হাজির করল। সে কিন্তু একটা লাঠিতে ভর দিয়ে হেঁটেই এল। রাজা তাকে শস্য-কণাটা দেখালো। বুড়ো চাষীটি এখনও চোখে দেখতে পায়। সেটাকে হাতে নিয়ে সে ভাল করে দেখতে লাগল। রাজা জিজ্ঞাসা করল :

"তুমি কি বলতে পার বুড়ো, এ রকম শস্য কোথায় জন্মাত? এ রকমটা কি কখনও কিনেছ, বা তোমার ক্ষেতে বুনেছ?"

এই বুড়োটি কানে কম শুনলেও তাব ছেলেব চাইতে ভাল শুনতে পেত।

সে বলল, "না। আমার ক্ষেতে এ রকম শস্য কখনও বুনিনি বা কাটিনি। আর কেনার কথা যদি বলেন, আমাদের আমলে টাকাবই চলন ছিল না, কাজেই আমি কখনও কিছু কিনিনি। প্রত্যেকেই যার যার শস্য জন্মাত, এবং কারও কিছু প্রয়োজন হলে আমরা নিজেরাই ভাগাভাগি করে নিতাম। এ ধরনের শস্য কোথায় জন্মাত আমি জানি না। আজকালকার গমের চাইতে আমাদের গম আকারে বড় ছিল এবং তা থেকে ময়দাও বেশি পাওয়া যেত, কিন্তু এত বড় শস্য আমি কখনও দেখিনি। অবশ্য বাবার কাছে শুনেছি, তার আমলে শস্য অনেক বড় হতো এবং আমাদেব কালেব চাইতে বেশি ময়দা তা থেকে পাওযা যেত। আপনি ববং তাকে জিজ্ঞাসা করুন।"

কাজেই রাজা এই বুড়োব বাবাকে আনবাব জন্য লোক পাঠাল, আর তারাও তাকে পেয়ে রাজার কাছে হাজির করল। সে লাঠি ছাড়াই সহজভাবে হেঁটে এল; তার চোখ পরিষ্কার, কান ভাল, কথাও স্পষ্ট। রাজা তাকে শস্য-কণাটা দেখালো; বুড়ো ঠাকুর্দা সেটাকে হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল।

বলল, "কতদিন পবে এত ভাল একটা শস্য-কণা দেখতে পেলাম।" একটুকরো দাঁতে কেটে নিয়ে সেটা খেতে লাগল।

"ঠিক সেই স্বাদ", সে আরও বলল।

রাজা বলল, "বলো তো ঠাকুর্দা, কবে ও কোথায এরকম শস্য জন্মাত? তুমি কি এরকম শস্য কখনও কিনেছ, বা তোমাব ক্ষেতে বুনেছ?"

বুড়ো লোকটি জবাব দিলো :

"আমার আমলে এরকম শস্য সব জায়গায়ই জন্মাত। যৌবনকালে আমবা তো এইরকম শস্যই খেতাম, অপরকেও খাওযাতাম। আর এইরকম শস্যই তো আমরা বুনতাম, কাটতাম, ঝাড়াই করতাম।"

রাজা জিজ্ঞাসা করল, "বলো তো ঠাকুর্দা, সে শস্য কি তোমরা কিনতে, না সবটাই নিজেরা ফলাতে?"

বুড়ো লোকটি হাসল। জবাবে বলল, "আমার কালে রুটি কেনা-বেচার মতো পাপের কথা কেউ ভাবতেই পারত না; তাছাড়া টাকা কাকে বলে তাও আমরা জানতাম না। প্রত্যেকেই যথেষ্ট ফসল ফলাত।"

রাজা জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে বলো তো ঠাকুর্দা, তোমাদের জমি কোথায় ছিল—কোথায় তোমরা এ ধরনের ফসল ফলাতে?"

ঠাকুর্দা জবাব দিলো, "আমার জমি ছিল ঈশ্বরের পৃথিবীতে। যেখানেই লাঙল চালাতাম, সেখানেই আমার জমি। শুধুমাত্র পরিশ্রমেরই ছিল ব্যক্তিগত মালিকানা।"

রাজা বলল, "আমার আরও দুটো প্রশ্নের জবাব দাও। প্রথম প্রশ্ন, তখন মাটিতে এত ভাল ফসল ফলত, কিন্তু এখন আর ফলে না কেন? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন, তোমার নাতি হাঁটে দুটো লাঠিতে ভর দিয়ে, তোমার ছেলের লাগে একটা লাঠি, আর তোমার একটাও লাগে না—এটা কি রকম ব্যাপার? তোমার দৃষ্টি পরিষ্কার, দাঁত ভাল, কথা স্পষ্ট ও শ্রুতিমধুর। এটা কেমন করে হলো?"

বুড়ো লোকটি জবাব দিলো :

"এরকমটা ঘটার কারণ মানুষ নিজের পরিশ্রমে জীবিকা অর্জন না করে অপরের পরিশ্রমের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। সেকালে মানুষ চলত ঈশ্বরের নিয়মে। যা নিজের তাই নিয়েই তারা সন্তুষ্ট ছিল, অন্যের ফসলের উপর কখনও লোভ করত না।"

১৮৮৬

অনুতপ্ত পাপী

The Repentant Sinner

একটি লোক পৃথিবীতে সত্তর বছর বেঁচেছিল, আর সারা জীবনই পাপে ডুবে ছিল। সে অসুস্থ হলো, তবু অনুতপ্ত হলো না। শুধু মৃত্যুকালে শেষ মুহূর্তে কাঁদতে কাঁদতে বলল :

"প্রভু! আমাকে ক্ষমা করো, কারণ এ অবস্থায় তুমি ক্রুশবিদ্ধ চোরকেও তো ক্ষমা করেছ।"

এই কথা বলতে বলতেই তার আত্মা দেহ ছেড়ে চলে গেল। আর সেই পাপীর আত্মা, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও তাঁর করুণায় বিশ্বাসবশত, স্বর্গের দরজায় গিয়ে কড়া নেড়ে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশের অনুমতি চাইল।

দরজার ভিতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল :

"স্বর্গের দরজায় কে কড়া নাড়ছে, আর বেঁচে থাকতে সে কি কি কাজই বা করেছে?"

জবাবে অভিযোগকারীর কণ্ঠ জানালো যে লোকটি সারা জীবন শুধু পাপ কাজই করেছে, একটাও ভাল কাজ করেনি।

তখন দরজার ভিতর থেকে কণ্ঠস্বরটি বলল,

"পাপীরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না। এখান থেকে চলে যাও।"

তখন লোকটি বলল,

"প্রভু, আমি তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না, তোমার নামটাও জানি না।"

কণ্ঠস্বর উত্তর দিলো

"আমি শিষ্য পিটার।"

তখন পাপী বলল,

"শিষ্য পিটার, আমাকে করুণা করো। মানুষের দুর্বলতা আর ঈশ্বরের করুণার কথা স্মরণ করো। তুমি কি খৃস্টের শিষ্য নও? তাঁর নিজের মুখের বাণী কি তুমি শোনোনি? তাঁর দৃষ্টান্ত কি তোমার সামনে নেই? তাহলে স্মরণ করো, দুঃখিত চিত্তে, পীড়িত হৃদয়ে যীশু যখন তিন তিন বার তোমাকে জেগে থেকে প্রার্থনা করতে বলেছিল, তখন তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে, কারণ তোমার চোখ ঘুমে ভারী হয়ে এসেছিল, আর তিনবারই যীশু তোমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন আমারও সেই অবস্থা। আরও স্মরণ করো, আমৃত্যু তাঁর প্রতি অনুগত থাকবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তুমি তিনবার তাঁকে অস্বীকার করেছ আর তিনবার তাঁকে কাইয়াফাস-এর সামনে হাজির করা হয়েছে। আমারও সেই অবস্থা। আরও স্মরণ করো, মোরগ ডেকে উঠতেই তুমি বাইরে তীব্রস্বরে কেঁদেছিলে। আমারও সেই অবস্থা। কাজেই আমাকে ভিতরে ঢুকতে দিতে তুমি আপত্তি করতে পারো না।"

তারপরই দরজার ওপাশের কণ্ঠস্বর চুপ হয়ে গেল।

তখন সেই পাপী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার কড়া নেড়ে স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশের অনুমতি চাইল।

দরজার ওপাশে আবার একটি কণ্ঠস্বর সে শুনতে পেল। সে বলল,

"লোকটি কে? পৃথিবীতে সে কি ভাবে জীবন কাটিয়েছে?"

অভিযোগকারীর কণ্ঠস্বর আবারও জানিয়ে দিলো, সেই পাপী শুধু পাপ কাজই করেছে, একটাও ভাল কাজ করেনি।

আর দরজার ওপাশ থেকে কণ্ঠস্বর বলল,

"এখান থেকে চলে যাও। এই সব পাপীরা স্বর্গে আমাদের সঙ্গে বাস করতে পারে না।"

তখন পাপী বলল, "প্রভু, আমি তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না, তোমার নামও জানি না।"

কণ্ঠস্বর বলল,

"আমি ডেভিড, রাজা ও ঈশ্বর-ভক্ত।"

পাপী আশা ছাড়ল না, বা স্বর্গের দবজা ছেড়েও গেল না; বলল,

"আমাকে করুণা করো রাজা ডেভিড! মানুষেব দুর্বলতা ও ঈশ্বরেব করুণার কথা স্মরণ করো। ঈশ্বর তোমাকে ভালবাসত, অন্য মানুষের চাইতে উপরে তোমাকে বসিয়েছিল। তুমি তো সব পেয়েছিলে; রাজত্ব, সম্মান, সম্পদ, স্ত্রী, সন্তান; কিন্তু গৃহশীর্ষ থেকে একটি গরিব মানুষের স্ত্রীকে দেখে তোমার মনে পাপ ঢুকল, ইরিয়ার স্ত্রীকে হরণ করে লোকটাকে তুমি অ্যামোনাইট্স্‌দের তরবারিতে হত্যা করলে। তুমি ধনী হয়েও একটি গরিব মানুষেব মেষীটিকে অপহরণ করে লোকটিকে খুন করেছ। আমিও তাই করেছি। স্মরণ করো, তাবপরই তুমি কি ভাবে অনুতাপ করেছিলে, কেমন করে বলেছিলে, 'আমার অপরাধ আমি স্বীকার করছি, আমার পাপ সর্বদাই আমার চোখের সামনে ভাসছে।' আমিও তাই করেছি। আমার ভিতরে ঢোকায় তুমি তো আপত্তি করতে পারো না।"

দরজার ভিতরকার কণ্ঠস্বর চুপ হয়ে গেল।

পাপী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবাবও কড়া নেড়ে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করতে চাইল। আর দরজার ভিতর থেকে তৃতীয় কণ্ঠস্বর শোনা গেল :

"লোকটি কে? পৃথিবীতে সে কি ভাবে জীবন কাটিযেছে?"

অভিযোগকাবীর কণ্ঠস্বর তৃতীয়বার সেই পাপীর শুধু পাপ কাজেব বিবরণই দিলো, একটাও ভাল কাজের কথা বলল না।

দবজার ভিতর থেকে কণ্ঠস্বর বলল,

"এখান থেকে বিদায় হও! পাপীরা স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ কবতে পারে না।"

তখন পাপী বলল,

"তোমার কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না, তোমার নামও জানি না।"

তখন কণ্ঠস্বব বলল :

"আমি খৃস্টের প্রিয় শিষ্য মহাত্মা জন।"

পাপী খুশি হয়ে বলল,

"এবাব নিশ্চয় আমাকে ঢুকতে দেওয়া হবে। পিটার ও ডেভিড আমাকে ঢুকতে দিতে বাধ্য, কারণ মানুষের দুর্বলতা ও ঈশ্বরের করুণার কথা তারা জানে; আর তুমি আমাকে ঢুকতে দেবে, কারণ তুমি সকলকে বড় ভালবাসো। মহাত্মা জন, তুমিই কি লেখনি যে ঈশ্বর প্রেমময়; আর যে মানুষ ভালবাসে না সে ঈশ্বরকেও জানে না? আর বৃদ্ধ বয়সে তুমি কি মানুষকে বলোনি : 'ভাইসব, একে অন্যকে ভালবাস?' তাহলে কেমন করে তুমি আমার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাবে, আমাকে তাড়িয়ে দেবে? হয় তুমি যা কিছু বলেছ তা প্রত্যাহার করে নেবে, আর নয়ত আমাকে ভালবেসে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করতে দেবে।"

স্বর্গের দরজা খুলে গেল; জন অনুতপ্ত পাপীকে আলিঙ্গন করে তাকে নিয়ে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করল।

১৮৮৬

ধর্মছেলে

The Godson

এক গরিব চাষীর ঘরে একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করল। ভারি খুশি হয়ে চাষী গেল এক প্রতিবেশীব কাছে। বলল, "তুমি আমার ছেলের ধর্ম-বাপ হও।" গরিবের ছেলের ধর্ম-বাপ হতে সে নারাজ; তাই সে চাষীকে ফিরিয়ে দিলো। একই অনুরোধ নিয়ে চাষী আর এক প্রতিবেশীর কাছে গেল। সেও তাকে ফিরিয়ে দিলো।

একে একে সারা গ্রাম সে ঘুরল কিন্তু কেউ ধর্ম-বাপ হতে রাজি হলো না। অগত্যা সে অন্য জায়গার খোঁজে বের হলো।

পাশেব গ্রামে পথে দৈবাৎ একজন পথিকের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল।

পথিক চাষীকে থামিয়ে বলল, "শুভ দিন চাষী ভাই, ঈশ্বরের ইচ্ছায় কোথায় চলেছ?"

চাষী জবাব দিলো, "ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমার একটি ছেলে হয়েছে। সে আমার যৌবনের আনন্দ, বার্ধক্যের আশ্রয়, আর মৃত্যুর পবে আমার স্মৃতি-চিহ্ন। তবু আমি গরিব বলে কেউ তার ধর্ম-বাপ হতে রাজি হলো না। তাই অন্য গাঁয়ে চলেছি তার ধর্ম-বাপ-মার খোঁজে।"

আগন্তুক বলল, "আমাকে ধর্ম-বাপ করে নাও।"

চাষী তো ভারি খুশি। এই প্রস্তাবের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, "কিন্তু তার ধর্ম-মা তাহলে কে হবে?"

লোকটি জবাব দিলো, "আমার পরিচিত এক বণিকের মেয়ে। শহরে চলে যাও। স্কোয়ারের মুখোমুখি দোকানওয়ালা একটা পাথরের বাড়ি পাবে। সেই বাড়িতে ঢুকে মালিককে বলবে তাঁর মেয়েকে তিনি যেন ধর্ম-মা হবার অনুমতি দেন।"

চাষী একটু ইতস্তত কবে বলল, "কিন্তু ভাই, একজন ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা করে এ কথা বলবার আমি কে? সে তো ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নেবে। মেয়েকেও অনুমতি দেবে না।"

"তাতে তোমার তো কোনও অপরাধ হবে না। সেখানে গিয়ে তাঁকে বলেই দেখো না। কাল সকালেই উৎসবের আয়োজন করো। আমি ঠিক সময়ে হাজির হবো।"

চাষী বাড়ি ফিরে এল। তারপব গেল শহরে বণিকেব বাড়ি। উঠোনে পৌছে ঘোড়া বাঁধতে না বাঁধতেই বণিক স্বযং বেরিয়ে এল।

বলল, "কী চাই?"

চাষী জবাব দিলো, "চাই—মানে, ঈশ্বব আমাকে একটি পুত্র-সন্তান দিয়েছেন। সে হবে আমার যৌবনের আনন্দ, বার্ধক্যের আশ্রয়, আর মৃত্যুব পবে সে হবে আমার স্মৃতি চিহ্ন। আপনার কাছে আমাব প্রার্থনা, আপনার মেয়েকে তাব ধর্ম-মা হবাব অনুমতি দিন।"

"উৎসব কখন হবে?"

"কাল সকালে।"

"তাই হবে। ঈশ্বর তোমার সহায হন। কাল আমাব মেয়ে উৎসবে উপস্থিত হবে।"

ঠিক তাই হলো; পরদিন সকালে ধর্ম-বাপ ও ধর্ম-মা দু'জনেই এল। উৎসব সম্পন্ন হলো। কিন্তু শেষ হবাব সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম-বাপ নিজেব পবিচয না জানিযে চলে গেল। কেউ আর তাকে দেখতে পেল না।

২

ছেলে বড় হতে লাগল। বাপ-মার আনন্দ আর ধবে না। ছেলে শক্ত-সমর্থ, পবিশ্রমী, বুদ্ধিমান, শান্তশিষ্ট।

দশ বছব বযসে বাপ মা তাকে লেখা পড়া কবতে পাঠাল। অন্য ছেলেরা পাঁচ বছরে যা শেখে এ ছেলে এক বছরেই তা শিখে ফেলল। অল্প দিনেই তাব লেখা-পড়া শেষ হযে গেল।

একবাব 'পবিত্র সপ্তাহে' ছেলে যথারীতি ধর্ম-মাকে ঈশ্ববেব আলিঙ্গন জানাতে গেল। সেখান থেকে বাড়ি ফিবে সে বলল,

"বাবা, মা, আমাব ধর্ম বাপ কোথায় থাকেন? আমাব বড ইচ্ছা সেখানে গিয়ে তাঁকেও ঈশ্বরের অভিবাদন জানাই।"

বাবা বলল, "বাবা, তোমাব ধর্ম-বাপ যে কোথায় থাকেন তা তো আমবা জানি না। একথা আমবাও অনেকবাব ভেবেছি। তোমাব নামকরণ উৎসবের পরে আর তাঁকে আমবা দেখিনি, তাঁব কথাও কাবও কাছে শুনিনি। কাজেই তিনি কোথায থাকেন, অথবা তিনি বেঁচে আছেন কি না তাও জানি না।"

ছেলেটি তখন বাপ-মাব সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, "তোমবা অনুমতি দাও, আমি তাঁকে খুঁজে দেখি। হযত আমি তাঁকে খুঁজে পাব, ঈশ্ববেব অভিবাদন জানাতে পাবব।"

বাবা-মাব অনুমতি পেযে ছেলে ধর্ম-বাপেব সন্ধানে যাত্রা কবল।

৩

বাড়ি থেকে বেবিয়ে সে বড বাস্তা ধবে চলতে লাগল। আধ-বেলা হাঁটবাব পবে একজন লোকেব সঙ্গে তাব দেখা হলো।

আগন্তুক থেমে বলল, "শুভদিন বাছা, ঈশ্ববেব ইচ্ছায তুমি কোথায চলেছ?"

ছেলেটি জবাব দিলো, "আজ সকালে আমি গিযেছিলাম আমাব ধর্ম-মাব সঙ্গে দেখা কবে ঈস্টাবেব অভিবাদন জানাতে। সেখান থেকে বাড়ি ফিবে বাবা-মাকে জিজ্ঞাসা কবলাম "আমাব ধম বাবা কোথায থাকেন? আমাব ইচ্ছা, তাঁব কাছে গিযে তাঁকেও ইস্টাবেব অভিবাদন জানাই।" তখন বাবা-মা আমাকে বললেন, "বাছা, তোমাব ধর্ম-বাপ কোথায থাকেন আমবা জানি না। তোমাব নামকবণ উৎসব শেষ হবাব সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমাদেব বাড়ি থেকে চলে যান। কাজেই তাঁব কথা আমবা কিছুই জানি না, তিনি বেঁচে আছেন কি না তাও জানি না।" কিন্তু ধর্ম-বাবাকে দেখতে আমাব ভাবি ইচ্ছা হযেছে। তাই তাঁকে খুঁজতে বেবিযেছি।"

তখন আগন্তুক বলল, "আমিই তোমাব ধর্ম-বাপ।"

ছেলে তো আনন্দে আত্মহাবা। তৎক্ষণাৎ সে ধর্ম-বাপকে ঈস্টাবেব আলিঙ্গন কবল।

বলল, "ধর্ম-বাপ, আপনি এখন কোথায চলেছেন? যদি আমাদেব ওদিকে যান, তাহলে আমাব সঙ্গে আমাদেব বাড়িতে আসুন আব যদি আপনাব বাড়িতে যান, তাহলে আমি আপনাব সঙ্গে যাব।"

ধর্ম-বাপ বলল, "না, এখন তোমাদেব বাড়ি যাবাব সময নেই কাবণ এইসব গাঁযে আমাব অনেক কাজ আছে। কাল সকালে আমি বাড়ি ফিবব, তখন তুমি আমাব কাছে আসতে পাবে।"

"আপনাব বাড়িব পথ আমি চিনব কেমন করে ধর্ম বাব?"

"সূর্যোদযেব পথে সোজা এগিযে যাবে। যেতে যেতে একটা জঙ্গল দেখতে পাবে। তাব মাঝখানে অনেকটা ফাঁকা জাযগা। সেইখানে বসে বিশ্রাম কববে, আব সেখানে যা কিছু ঘটে তা লক্ষ্য কববে। তবপব বন থেকে বেবিযেই তোমাব সামনে একটা বাগান দেখতে পাবে। সেই বাগানেব মধ্যে দেখতে পাবে একটা ঘব, তাব ছাদটা সোনাব। সেইটেই আমাব বাড়ি। বাগানেব দবজা পর্যন্ত সটান চলে যাবে। সেখানেই তোমাব সঙ্গে আমাব দেখা হবে।"

এই কথা বলেই ধর্ম বাপ ছেলেব সামনেই অদৃশ্য হযে গেল।

৪

তখন ছেলেটি ধর্ম-বাপেব কথামতো পথ ধবে চলতে লাগল।

চলতে চলতে পেল সেই জঙ্গল আব তাব মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জাযগা।

ফাঁকা জায়গাটার ঠিক মাঝখানে ছিল একটা পাইন গাছ। গাছের একটা ডালে একটা দড়ি বাঁধা। দড়িটার অপরদিকে প্রায় তিন "পুড" ওজনের একটা ওক কাঠের খণ্ড ঝোলানো। কাষ্ঠখণ্ডের ঠিক নিচে ছিল এক ভাঁড় মধু। ছেলেটি ভাবতে লাগল, এখানে এভাবে মধুর ভাঁড়টা রাখা হয়েছে কেন? ঠিক সেই সময়ে বনের ভিতরে একটা খচ্‌মচ্‌ আওয়াজ শুনে চেয়ে দেখে, কয়েকটা ভালুক আসছে। সকলের আগে মা-ভালুক, তার পিছনে একটা কচি বাচ্চা, আর তারও পিছনে আরও তিনটে বাচ্চা।

ভালুক-মা লম্বা নাক উঁচু করে কি যেন শুঁকল, তারপরে বাচ্চাগুলোকে নিয়ে সোজা ভাঁড়ের দিকে এগিয়ে গেল; প্রথমে সে নিজের নাকটা ভাঁড়ের মধ্যে ডুবিয়ে দিলো, তারপর ডাক দিলো বাচ্চাগুলোকে। বাচ্চাগুলো এক ছুটে গিয়ে ভাঁড়ে মুখ দিলো। ফলে ঝোলানো কাঠটা এদিক-ওদিক দুলতে লাগল, আর তার ধাক্কায় বাচ্চাগুলোও ছিটকে ছিটকে পড়তে লাগল। ব্যাপার দেখে ভালুক-মা থাবা দিয়ে কাঠটাকে চেপে ধরে একদিকে সরিয়ে দিলো। ফলে সেটা আরও বেশি জোরে দুলতে দুলতে ফিরে এসে দুটো বাচ্চাকে আঘাত করল—একটার মাথায় ও আর একটার পিঠে। বাচ্চা দুটো চেঁচাতে চেঁচাতে একপাশে লাফিয়ে পড়ল। এতে ভালুক-মা আরও রেগে গেল। এবারে দুই থাবা তুলে কাঠটাকে ধরে মাথার উপরে তুলে আরও দূরে ঠেলে দিলো। কাঠটা অনেকটা উঁচুতে উঠে যেতেই বাচ্চা ভালুকটা একলাফে ভাঁড়ের উপর উঠে মধুর মধ্যে নাক ডুবিয়ে হাপুস্‌-হাপুস্‌ গিলতে শুরু করে দিলো। অন্য বাচ্চাগুলোও আবার সেদিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু তারা ভাঁড়ের কাছে পৌঁছবার আগেই কাঠটা দ্রুতবেগে এসে বাচ্চাটার মাথায় পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই সেটা মরে গেল।

ভালুক মা এবার তীব্র কণ্ঠে চিৎকার করতে করতে কাঠটাকে চেপে ধরে প্রাণপণ শক্তিতে দূরে ঠেলে দিলো। কাঠটা উপরে উঠতে লাগল। আরও—আরও উপরে। ডালটাকেও ছাড়িয়ে গেল। ছিঁড়েই যাবে বুঝি দড়িটা।

এদিকে ভালুক-মা বাচ্চাদের নিয়ে আবার ভাঁড়ের দিকে এগিয়ে গেল। উপরে উঠতে উঠতে কাঠটা একটু থামল, তারপর নিচে নামতে লাগল। যত নিচে নামছে, গতি তত দ্রুততর হচ্ছে। দ্রুত—আরও দ্রুত—কাঠটা এসে ভালুক-মাকে আঘাত করল; তার মাথাটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

উপুড় হয়ে পড়ে হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে ভালুক-মা মরে গেল। বাচ্চাগুলো পালিয়ে গেল।

৫

ব্যাপার দেখে ছেলেটি তো অবাক। আবার সে চলতে শুরু করল। তারপর দেখতে পেল একটা বড় বাগান। বাগানের মাঝখানে একটা খুব উঁচু বাড়ি। তার ছাদটা সোনার।

বাগানের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ধর্ম-বাপ হাসছে। সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে সে

ধর্ম-ছেলেকে ভিতরে টেনে নিল। এগিয়ে চলল দু'জনে। সে বাগানে এত সৌন্দর্য ও মাধুর্য ছড়ানো ছিল যা ছেলেটি কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি।

ধর্ম-বাপ তাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল। ভিতরটা বুঝি বাগানের চেয়েও বেশি সুন্দর। তারা ঘরের পর ঘর পার হয়ে চলল। প্রতিটি ঘরই যেন আগের ঘরের চাইতে বেশি জমকালো ও মনোহারী।

অবশেষে তারা একটা সীল-করা দরজার কাছে পৌঁছল।

ধর্ম-বাপ বলল, "এই দরজাটা দেখছ? এতে কোনও তালা নেই, শুধু সীল-করা। যদিও এটা অনায়াসে খোলা যায় তবু তোমাকে বলছি, অমন কাজও করো না। তুমি এখানে থাকতে পারো, খেলা করতে পারো, যেখানে খুশি যেমন খুশি যেতে পারো, সবকিছু উপভোগ করতে পারো। শুধু একটি বিধান তোমাকে দিচ্ছি—কখনও এই দরজা খুলে ভিতরে ঢুকো না। যদি কখনও এ ঘরে ঢুকতে চাও, তাহলে একটু আগে তুমি বনের মধ্যে যা দেখেছ তা স্মরণ করো।"

এই কথা বলে ধর্ম-বাপ অদৃশ্য হলো। তার পর থেকে ধর্ম-ছেলে একা একা সেখানে এতই আনন্দে ও খোশ মেজাজে দিন কাটাতে লাগল যে ত্রিশ বছর সেখানে বাস করবার পরেও তার মনে হলো, সে বুঝি মাত্র তিন ঘণ্টা হলো সেখানে এসেছে। এই ত্রিশ বছর পরে ধর্ম-ছেলে একদিন সীল-করা দরজাটার কাছে নিজেব মনে ভাবতে লাগল, "ধর্ম-বাপ আমাকে এই ঘরে ঢুকতে নিষেধ করেছেন কেন? আমি যদি এই ঘরে ঢুকে ভিতরে কি আছে দেখি তাহলে কি হয়?"

তখন সে দরজায় ধাক্কা দিতেই সীল ভেঙে দরজাটা খুলে গেল। ঘরে ঢুকে দেখল, এ-ঘরটি অন্য সব ঘরের চাইতে বড় ও ঝলমলে, আর তার মাঝখানে বসানো রয়েছে একটি সোনার সিংহাসন। ঘরগুলিব ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে সিংহাসনেব কাছে গিয়ে পৌঁছল। সিঁড়ি বেয়ে উঠে বসে পড়ল সিংহাসনেব উপব। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে পড়ল, সিংহাসনের পাশে একটি রাজদণ্ড রয়েছে। রাজদণ্ডটি হাতে তুলে নিতেই—

একি! মুহূর্তের মধ্যে চারদিকের সব ঘরের সবগুলি দেয়াল গোল পাকিয়ে মিলিয়ে গেল। চারদিকে তার দৃষ্টি হলো অবাধ। এক পলকে সে দেখতে পেল সমস্ত জগৎ, আর সেখানকাব মানুষের সব কাজকর্ম। সম্মুখে সে দেখতে পেল সমুদ্রের বুকে জাহাজগুলো পাল তুলে চলেছে। দক্ষিণে দেখতে পেল সমস্ত বিদেশী অ-খ্রিস্টান জাতিগুলোর জীবনধারা। বাঁদিকে দেখতে পেল রুশ ছাড়া অন্য সব খ্রিস্টান জাতির কর্মধারা। সর্বশেষে, চতুর্থ দিকে সে দেখতে পেল কেমন করে আমাদের নিজেব জাতি—রুশরা জীবন কাটাচ্ছে।

নিজে নিজেই সে বলে উঠল, "আচ্ছা, আমাব নিজের বাড়িতে কী হচ্ছে, ফসল ভাল হয়েছে কি না, যদি দেখতে চাই কেমন হয়?"

নিজের দেশের ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে সে দেখতে পেল, ফসলের আঁটিগুলো

দাঁড় করানো রয়েছে। তখন সে গুণে দেখতে লাগল কতগুলি আঁটি আছে। এমন সময় তার চোখে পড়ল, মাঠের উপর দিয়ে একখানি গরুর গাড়ি চলেছে, আর একটি চাষী তাতে বসে আছে।

প্রথমে সে ভাবল, তার বাবাই চলেছে রাতারাতি ফসলের আঁটি ঘরে আনতে। কিন্তু আর একবার দেখেই সে বুঝতে পারল, গাড়িখানি চালাচ্ছে একটি পাকা চোর, ভাসিলি কুদ্‌নিসভ্‌। আঁটিগুলোর কাছে গিয়ে সে সব আঁটি গাড়িতে বোঝাই করতে লাগল।

ব্যাপার দেখে ধর্ম-ছেলে রেগে চেঁচিয়ে উঠল, "বাবা! ওরা তোমার ক্ষেত থেকে ফসলের আঁটি চুরি করছে যে!"

তার বাবা মাঝরাতে ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। বলল, "মনে হলো যেন স্বপ্ন দেখলাম, কারা আমার ফসলের আঁটি চুরি করছে। গিয়ে বরং দেখেই আসি।"

ঘোড়ায় চেপে সে বেরিয়ে পড়ল। মাঠে পৌঁছে ভাসিলিকে দেখতে পেল, আর সঙ্গে সঙ্গে চেঁচামেচি শুরু করে দিলো। চাষীরা সব জড় হলো, ভাসিলিকে মারধোর করে জেলে পাঠিয়ে দিলো।

তারপর ধর্ম-ছেলে শহরে তার ধর্ম-মার দিকে দৃষ্টি ফেরাল। সে তখন একজন বণিককে বিয়ে করেছে। ধর্ম-মা ঘুমিয়ে আছে, ওদিকে তার স্বামী লুকিয়ে এক উপপত্নীর ঘরে চলে যাচ্ছে। ধর্ম ছেলে বণিকের স্ত্রীকে ডেকে বলল, "ওঠ, তোমার স্বামী যে পাপ কাজ করতে উদ্যত!"

ধর্ম মা লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। পোশাক পরে বের হলো স্বামীর খোঁজে। তাকে যাচ্ছেতাই করে বকল, উপপত্নীকে মারধোর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলো।

তারপর দৃষ্টি দিলো তার মায়ের দিকে। দেখল, মা কুঁড়েঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। এদিকে একটা ডাকাত ঘরে ঢুকে তার সিন্দুক ভাঙতে শুরু করেছে। ঠিক সেই সময় সে জেগে চিৎকার করে উঠল। ডাকাতটা তখন একটা কুড়ুল হাতে নিয়ে তাকে মারতে উদ্যত হলো।

ধর্ম ছেলে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারল না, ডাকাতটাকে লক্ষ্য করে হাতের রাজদণ্ড ছুঁড়ে মারল। ঠিক মাথায় আঘাত লেগে ডাকাতটা সেখানেই মারা গেল।

৬

ডাকাতটাকে মারবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বাড়ির দেওয়ালগুলি আবার চারদিক থেকে ঘিরে এল এবং জায়গাটা আবার আগেকার মতো হয়ে গেল।

দরজা খুলে ঘরে ঢুকল ধর্ম-বাপ। ধর্ম-ছেলের কাছে গিয়ে তার হাত ধরে সিংহাসন থেকে নামিয়ে আনল।

বলল, "আমার আদেশ তুমি মান্য করোনি। এমন একটি কাজ তুমি করেছ যা তোমার করা উচিত ছিল না : নিষিদ্ধ দরজাটা তুমি খুলেছ। দ্বিতীয় আর একটি কাজ তুমি করেছ সেটাও তোমার করা উচিত ছিল না : তুমি সিংহাসনে বসেছ আর আমার রাজদণ্ড হাতে তুলে নিয়েছ। তৃতীয় আর একটি কাজও তুমি করেছ যা তোমার করা উচিত ছিল না। পৃথিবীর অনেক ক্ষতি তুমি করেছ। আর এক ঘণ্টা যদি তুমি ওখানে বসে থাকতে তাহলে অর্ধেক মানুষকে তুমি ধ্বংস করে ফেলতে।"

ধর্ম-বাপ তখন তার ধর্ম-ছেলেকে আবার সিংহাসনের কাছে নিয়ে গেল এবং রাজদণ্ডটি হাতে নিলো। সবগুলি দেওয়াল আবার গোল পাকিয়ে সরে গিয়ে সারা জগৎ দৃশ্যমান হয়ে উঠল।

ধর্ম-বাপ বলল, "প্রথমে দেখো তুমি তোমার বাবার কী করেছ। ভাসিলি এক বছর জেলে কাটিয়ে সবরকম পাপ শিখেছে এবং প্রতিবেশীদের উপর তিত-বিরক্ত হয়ে উঠেছে। এবার দেখো, এইমাত্র সে তোমার বাবার দুটো ঘোড়া চুরি করেছে এবং তার গোলা পুড়িয়ে দিচ্ছে। তোমার বাপের এই দুর্দশা তুমিই করেছ।"

ধর্ম-ছেলে দেখতে পেল, তার বাবার গোলা দাউ-দাউ করে জ্বলছে। কিন্তু ঠিক তখনই ধর্ম-বাপ সে-দৃশ্য তার চোখ থেকে আড়াল করে তাকে অন্য দিকে তাকাতে বলল।

"ওখানে দেখো। এক বছর হলো তোমার ধর্ম-মার স্বামী একটা অবৈধ প্রণয়ের ব্যাপারে তাকে পরিত্যাগ করেছে। মনের দুঃখে সে মদ ধরেছে। তার স্বামীর উপপত্নীরও অশেষ দুর্গতি হয়েছে। তোমার ধর্ম-মার এই হাল তুমিই করেছ।"

ধর্ম-বাপ এ-ছবিও তার ধর্ম-ছেলের চোখ থেকে আড়াল করে তার নিজের বাড়ির দিকে তাকে দৃষ্টি ফেরাতে বলল। সেখানে তাব মা নিজের পাপেব জন্য অনুশোচনায় চোখের জল ফেলছে আর বলছে : "ডাকাত যদি আমাকে মেরে ফেলত সেও এর চেয়ে ভাল ছিল, কারণ তাহলে আমার পাপ আরও কম হতো।"

"তোমার মায়ের এই দশা তুমি করেছ।" এই কথা বলে ধর্ম-বাপ সে দৃশ্য ধর্ম-ছেলের চোখ থেকে আড়াল করে নিচের দিকে তাকাতে বলল। সেখানে সে দেখল, অন্ধকার এক কারাকক্ষের সামনে সেই ডাকাত দাঁড়িয়ে আছে। দু'জন প্রহরী তাকে দু'দিক থেকে ধরে আছে।

ধর্ম-বাপ বলল, "আজ পর্যন্ত এই লোকটা দশটি জীবন নষ্ট করেছে। তুমি না মেরে ফেললে এইসব পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাকেই করতে হতো। কিন্তু এখন সে সব পাপ তুমি তোমার ঘাড়ে তুলে নিয়েছ, তোমাকেই তার জবাবদিহি করতে হবে। এখন বোঝ, তোমার নিজের কী দশা তুমি নিজে করেছ।"

ধর্ম-বাপ আরও বলল, "মা-ভালুক যখন প্রথমবার কাঠটাকে ধাক্কা দিলো, তখন তার বাচ্চাগুলো সামান্য ভয় পেল মাত্র। দ্বিতীয়বার সে যখন সেটাকে দূরে ঠেলে দিলো, তখন ছোট বাচ্চাটা মারা গেল। আর তৃতীয়বার কাঠটাকে ঠেলে দিয়ে সে

নিজেই মারা গেল। তুমিও তাই করেছ তবু তোমাকে আমি ত্রিশ বছর সময় দিলাম। এই সময়ের মধ্যে তুমি সাবা জগৎ ঘুরে ঐ ডাকাতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। তা যদি না পারো তাহলে ঐ ডাকাত যেখানে গেছে তোমাকেও সেখানেই যেতে হবে।"

তখন ধর্ম-ছেলে বলল, "তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি কেমন করে করব?"

জবাবে ধর্ম-বাপ বলল, "জগতে যতটা পাপ তুমি এনেছ ততটা পাপ যেদিন দূর করতে পারবে সেইদিনই তোমার পক্ষে ডাকাতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হবে।"

ধর্ম-ছেলে আবার প্রশ্ন করল : "কিন্তু কেমন করে আমি জগতের পাপ দূর করব?"

ধর্ম-বাপ বলল, "সোজা চলে যাও সূর্যোদয়ের দিকে। একটা মাঠে অনেক লোকজন দেখতে পাবে। খুব ভালভাবে লক্ষ্য করবে তারা কি করে, আর তুমি যা কিছু শিখেছ তাও তাদের জানাবে। আবার এগিয়ে যাবে সামনের দিকে, যা কিছু দেখার ভাল করে লক্ষ্য করবে। চতুর্থ দিনে পাবে একটি বন। তার মধ্যে আছে এক ঋষির আশ্রম। সেই আশ্রমে এক বৃদ্ধ বাস করেন তোমার জীবনে যা কিছু ঘটেছে তাঁকে বলবে। তিনিই তোমাকে উপদেশ দেবেন। তাঁর কথামতো সব কাজ করা হলেই ডাকাতের পাপ ও তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হবে।

এই কথা বলে ধর্ম-বাপ তাকে ফটক থেকে বিদায় দিলো।

৭

ধর্ম-ছেলে চলেছে—চলেছে। যেতে যেতে সে ভাবতে লাগল : "জগতের পাপ আমি কেমন করে দূর করব? পাপ দূর করা যায় পাপীকে নির্বাসনে পাঠিয়ে, জেলে পাঠিয়ে, ফাঁসি-কাঠে ঝুলিয়ে। তাহলে অন্যের পাপ নিজের ঘাড়ে না নিয়ে কেমন করে আমি জগৎকে পাপ-মুক্ত করব?"

এমনি নানাভাবে সে ভাবতে লাগল, কিন্তু সমস্যার কোনও সমাধান করতে পারল না।

চলতে চলতে সে একটা মাঠে এসে পৌছল। সারা মাঠে ঘন হয়ে প্রচুর ফসল ফলেছে। এখন কেটে নিলেই হয়।

হঠাৎ সে দেখতে পেল, একটা বাছুর ক্ষেতের মধ্যে নেমে পড়েছে, আর চাষীরা দেখতে পেয়ে ঘোড়ায় চড়ে ক্ষেতের একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। যখনই বাছুরটা ক্ষেত থেকে বের হবার চেষ্টা করছে, তখনই কেউ না কেউ তাকে তাড়া করছে। ফলে সে ভয়ে আবার ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। ঘোড়সওয়াররা তখন আবার তাকে মাঠময় তাড়া করছে। আর সারাক্ষণ একটি বুড়ি বড় রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে চেঁচিয়ে বলছে, "আমার বাছুরটাকে মেরে ফেললে গো!"

তখন ধর্ম-ছেলে চাষীদের বলল, "এভাবে ছুটছ কেন? তোমরা সবাই ক্ষেত থেকে বেরিয়ে এস, তখন বুড়ি ডাকলেই বাছুরটা তার কাছে চলে যাবে।"

চাষীরা তার কথা শুনল। তারা এসে ক্ষেতের পাশে দাঁড়াল। বুড়ি তখন চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, "আয়, আয়, পাগলা আমার, চলে আয়!"

বাছুরটা কান খাড়া করে কিছুক্ষণ শুনল। তারপর ছুটে গিয়ে মাথা দিয়ে বুড়ির স্কার্টে এমন ধাক্কা মারল যে বেচারি পড়ে যায় আর কি। যাহোক, শেষ পর্যন্ত চাষীরা খুশি হলো, বুড়িও খুশি হলো, বুঝি বাছুরটাও তথৈবচ।

পথ চলতে চলতে ধর্ম-ছেলে ভাবতে লাগল : "এইবার বুঝতে পেরেছি, পাপ দিয়ে পাপকে দূর করা যায় না। মানুষ যত বেশি পাপ করে, ততই পাপ বেড়ে চলে। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, পাপের কাছে পাপ ক্ষমতাহীন। কিন্তু সে পাপ কেমন করে দূর করতে হবে তা আমি জানি না। বাছুরটা বুড়ির ডাক শুনল দেখে ভালই লাগল। কিন্তু সে যদি ডাক না শুনত, তাহলে বুড়ি কেমন করে তাকে ক্ষেত থেকে সরিয়ে আনত?"

এই কথা ভাবতে ভাবতে ধর্ম-ছেলে এগিয়ে চলল।

৮

চলতে চলতে সে একটা গ্রামে পৌঁছল। সেখানে প্রথম বাড়িটায় সে রাতের মতো আশ্রয় চাইল, বাড়ির কর্ত্রীও তাকে আশ্রয় দিলো। বাড়িতে সে একা মানুষ, সব কিছু ধোয়া-মোছা করছিল।

ঘরের ভিতর ঢুকে নিঃশব্দে স্টোভের কাছে গিয়ে সে স্ত্রীলোকটির কাজকর্ম দেখতে লাগল। মেঝে শেষ করে সে তখন টেবিল ধুতে শুরু করেছে। ঢক-ঢক করে খানিকটা জল ঢেলে দিয়ে একটা ময়লা ন্যাকড়া দিয়ে টেবিলটা মুছতে লাগল। প্রাণপণে ঘষেই চলেছে, তবু টেবিল পরিষ্কার হলো না, কারণ ময়লা ন্যাকড়ার দাগ থেকেই যাচ্ছে। আবার উল্টো দিক থেকে ঘষে কিছু দাগ তুলে ফেলল। কিন্তু আবার নতুন দাগ পড়ল। এবার লম্বালম্বি ঘষে আবার উল্টো দিক থেকে ঘষল। ফল কিন্তু একই রয়ে গেল—ময়লা ন্যাকড়ার নতুন দাগ পড়ল অনেক।

ধর্ম-ছেলে কিছুক্ষণ দেখে দেখে শেষটায় বলল, "হ্যাঁগো ভালমানুষের মেয়ে, এ তুমি কী করছ?"

সে বলল, "কেন? দেখতে পাচ্ছ না? উৎসবের দিন আসছে, তাই সব ধোয়া-মোছা করছি। কিন্তু এত খেটেও টেবিলটা কিছুতেই পরিষ্কার করতে পারছি না।"

"কিন্তু ময়লা ন্যাকড়াটা ভাল করে ধুয়ে নিঙড়ে নিয়ে তবে তো টেবিলটা মুছবে।"

স্ত্রীলোকটি তাই করল, আর অল্প সময়ের মধ্যেই টেবিলটাও পরিষ্কার হয়ে গেল। সে বলল, "তুমি আমাকে যা শেখালে সেজন্য ধন্যবাদ।"

সকালে কর্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে আবার চলতে শুরু করল। হাঁটতে হাঁটতে একটা বনে এসে পৌঁছল। সেখানে দেখল, জনাকয়েক চাষী চাকার বেড় তৈরি

করছে। আরও কাছে এগিয়ে সে দেখল, বেড় তৈরির গোল চাকটার চারদিকে তারা যতই ঘুরুক, বেড়টা কিছুতেই বেঁকছে না। একটু লক্ষ্য করেই সে বুঝতে পারল যে চাকটা খিল দিয়ে মাটির সঙ্গে আটকানো নয় বলেই তারা ঘুরবার সঙ্গে চাকটাও ঘুরছে, তাই বেড়টা বেঁকছে না।

সে তখন বলল, "ভাই, তোমরা কী করছ?"

তারা জবাব দিলো : "আমরা চক্রবেড় বাঁকাচ্ছি। এগুলোকে দু'বার জলে ভেজালাম, ঘুরতে ঘুরতে হায়রান হয়ে গেলাম, তবু কিছুতেই বাঁকাতে পারছি না।"

সে বলল, "কিন্তু সকলের আগে চাকটাকে ভাল করে আটকে নাও, তখন দেখবে, যেমন তোমরা ঘুরতে শুরু করবে, বেড়টাও আবার বেঁকতে থাকবে।"

এই কথা শুনে চাষীরা চাকটাকে আটকে দিলো। ফলে তাদের কাজ বেশ ভালভাবে এগোতে লাগল।

তাদের সঙ্গে রাত কাটিয়ে সে আবার চলতে শুরু করল। সারা দিন সারা রাত সে হাঁটল। ভোর-ভোর হতে সে একদল পশু-বিক্রেতার দেখা পেয়ে তাদের পাশে বসে পড়ল। দেখল, পশুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে তারা আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছে। তারা করছে কি, শুকনো ডালপালায় আগুন দিয়ে ভাল করে ধরে উঠবার আগেই তার উপর কতগুলো ঝোপ-ঝাড় চাপিয়ে দিচ্ছে। ফলে আগুনটা নিভে যাচ্ছে। বার বার তারা শুকনো ডালপালায় আগুন ধরাচ্ছে, আর বার বার তার উপরে ভিজে ঝোপ-ঝাড় চাপা দেওয়ায় আগুন নিভে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে অনেক চেষ্টা তারা করল, কিন্তু কিছুতেই আগুন জ্বালাতে পারল না।

শেষকালে ধর্ম-ছেলে বলল, "অত তাড়াতাড়ি ঝোপ-ঝাড়গুলো চাপা দিও না। আগুনটাকে আগে ভালভাবে জ্বলে উঠতে দাও। যখন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠবে তখন ওগুলো চাপা দিও।"

পশু বিক্রেতারা তাই করল। আগে আগুনটাকে বেশ ভাল করে ধরিয়ে দিয়ে তারপর ঝোপ ঝাড় চাপা দিলো। তখন সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোতেও আগুন ধরে দাউ-দাউ করে সবটা জ্বলে উঠল।

তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আবার সে চলতে শুরু করল। যেতে যেতে সে ভাবতে লাগল, এই তিনটি ঘটনা সে কেন দেখল? কিন্তু ভেবে কোনও কিনারা করতে পারল না।

৯

সারাদিন পথ চলে সে বনের মধ্যে এক ঋষির আশ্রমে এসে পৌঁছল। আশ্রমের কাছে গিয়ে সে দরজায় টোকা দিলো। ভিতর থেকে স্বর ভেসে এল . "কে?"

ধর্ম-ছেলে বলল, "এক মহাপাপী অন্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছে।"

একটি বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করল : "অন্যের কী কী পাপ তোমার ঘাড়ে চেপেছে?"

ধর্ম-ছেলে একে-একে সবই তাকে বলল —তার ধর্ম-বাপের কথা, ভালুক ও তার বাচ্চাদের কথা, ধর্ম-বাপের নির্দেশের কথা, মাঠে-দেখা চাষীদের কথা, তাদের শস্যক্ষেতের উপর দিয়ে ঘোড়া চালানোর কথা, বাছুরটা যে স্বেচ্ছায় বুড়ির কাছে ফিরে গেল সে কথাও। তারপর সে বলল, "তখনই আমি বুঝলাম যে, পাপ দিয়ে পাপকে দূর করা যায় না। কিন্তু কেমন করে যে দূর করা যায় তা তো আমি এখনও জানি না। দয়া করে সেটা আমাকে শিখিয়ে দিন।"

তখন বৃদ্ধ বলল, "তাহলে আগে আমাকে বলো আসতে আসতে পথে তুমি আর কী কী দেখেছ।"

ধর্ম-ছেলে তখন স্ত্রীলোকটির টেবিল পরিষ্কার করার কথা, যে চাষীরা চক্রবেড় বাঁকাচ্ছিল তাদের কথা এবং যে পশু-বিক্রেতারা আগুন জ্বালাচ্ছিল তাদের কথা বলল।

সব কথা শুনে বৃদ্ধ ঘবের ভিতর থেকে একখানি ছোট কুড়ুল এনে বলল, "আমার সঙ্গে এস।"

কিছু দূর এগিয়ে একটা গাছ দেখিয়ে বলল, "ওটা কাটো।"

কুড়ুল চালিয়ে সে গাছটা কেটে ফেলল।

"এইবার এটাকে তিন টুকরো করো।"

ধর্ম-ছেলে তাই করল। বৃদ্ধ আবার ঘরের ভিতর গিয়ে একটা জ্বলন্ত মশাল নিয়ে এল। বলল, "এই তিনটে কাঠের টুকরোতে আগুন লাগাও।"

মশালটা নিয়ে সে কাঠের তিনটে টুকরোতেই আগুন ধরাল। সব পুড়ে তিনটে পোড়া কাঠ মাত্র অবশিষ্ট রইল।

"এইবার এগুলোকে অর্ধেকটা পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে দাও।"

তাই সে করল।

বৃদ্ধ বলতে লাগল, "পাহাড়ের নিচে একটা ছোট নদী আছে। সেখান থেকে মুখে করে জল এনে এই পোড়া কাঠ তিনটের উপর ছিটিয়ে দাও। কুটিরবাসিনী স্ত্রীলোককে যেমন উপদেশ দিয়েছিলে তেমনিভাবে প্রথম কাঠটার উপর জল ছিটোবে। চক্রবেড় বাঁকানো লোকগুলোকে যেমন পরামর্শ দিয়েছিলে তেমনিভাবে দ্বিতীয় টুকরোটার উপর জল ছিটোবে। আর পশু-বিক্রেতাদের যেমন পরামর্শ দিয়েছিলে তেমনিভাবে তৃতীয় টুকরোটার উপর জল ছিটোবে। এই তিনটি পোড়া কাঠে যখন পাতা গজাবে, পোড়া কাঠ যখন আপেল গাছে পরিণত হবে, তখনই তুমি বুঝতে পারবে মানুষের ভিতর থেকে কেমন করে পাপ দূর করা যায়; আর তখনই তোমার সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।"

এই কথা বলে বৃদ্ধ ঘরের ভিতর চলে গেল। ছেলেটি অনেক ভেবে-চিন্তেও তাঁর কথার অর্থ কিছু বুঝতে পারল না। তবু বৃদ্ধ যেমনটি বলেছিল সেইভাবেই সে কাজ করতে শুরু করল।

১০

নদীতে গিয়ে একমুখ-ভর্তি জল এনে সে প্রথম পোড়া কাঠখানার উপর ছিটিয়ে দিলো। এমনি করে সে বার বার জল এনে অপর দু'টুকরো কাঠেও ছিটিয়ে দিলো। তারপর খুব শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত বোধ করায় সে পানাহার করার জন্য আশ্রমে ফিরে গেল। ঘরে ঢুকেই দেখে, বৃদ্ধ লোকটি উপাসনা-বেদীর উপরেই মরে পড়ে আছে।

চারদিকে তাকিয়ে কিছু শুকনো বিস্কুট দেখতে পেয়ে তাই সে খেলো। তারপর একখানি কোদাল দেখতে পেয়ে বুড়ো লোকটির জন্য কবর খুঁড়তে লাগল। খোঁড়া শেষ করে বৃদ্ধকে কবর দিতে যাবে, এমন সময় পাশের গ্রামের কয়েকটি চাষী বৃদ্ধ ঋষির জন্য খাবার নিয়ে হাজির হলো।

তারা যখন শুনল বৃদ্ধ মারা গেছে এবং ধর্ম-ছেলেকেই তাঁর উত্তরাধিকাবী কবে গেছে, তখন তারা বৃদ্ধকে কবর দিতে তাকে সাহায্য করল, তার ব্যবহাবেব জন্য খাবার রেখে গেল, এবং আরও খাবার জোগাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল।

কাজেই ধর্ম-ছেলে সেই বৃদ্ধের আশ্রমেই রয়ে গেল, গ্রামবাসীদের দেওযা খাবারেই তার দিন চলতে লাগল। বৃদ্ধের আদেশ-মতোই সে কাজ করতে লাগল—অর্থাৎ, নদী থেকে মুখে করে জল এনে পোড়া কাঠগুলোকে ভেজাতে লাগল।

এইভাবে কেটে গেল একটি বছর।

চারদিকে রটে গেল, একজন পুণ্যাত্মা ব্যক্তি বনের মধ্যে সাধকের জীবন যাপন করছে,—সে রোজ পাহাড়ের নিচ থেকে জল এনে তিনটে পোড়া কাঠে ছিটিয়ে দেয়। ফলে বহু লোক তার কাছে আসতে আরম্ভ করল। অনেকে তাকে দর্শন করতে আসে, ধনী ব্যবসায়ীরা নানা উপহার নিয়ে আসে। কিন্তু সে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই গ্রহণ করে না। আর যে যা দেয় সব সে গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়।

ক্রমে তার জীবনের কর্মধারা এইরকম এসে দাঁড়াল। অর্ধেক দিন সে কাটায় মুখে করে জল এনে পোড়া কাঠে ঢালতে, আর বাকি অর্ধেক দিন কাটায় বিশ্রামে, বা দর্শনার্থীদের সঙ্গে কথাবার্তায়। ক্রমে তার মনে বিশ্বাস জন্মাল যে এইভাবে জীবন কাটালেই সে জগৎ থেকে পাপ দূর করতে সমর্থ হবে এবং তার নিজের পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত হবে।

দ্বিতীয় বছরও কেটে গেল। এক দিনের জন্যও সে কাঠে জল ঢালা বন্ধ করেনি। কিন্তু আজও পর্যন্ত তিনটের একটা কাঠেও পাতা আর গজালো না।

একদিন সে আশ্রমে বসে আছে এমন সময় শুনতে পেল একটি লোক ঘোড়ায় চড়ে আপন মনে গান গাইতে গাইতে চলেছে। লোকটা কেমন দেখবার জন্য বাইবে বেরিয়ে সে দেখতে পেল একটি সুন্দর শক্তিমান যুবক। পরনে মূল্যবান পোশাক, ঘোড়া এবং গদিও বেশ দামী।

ধর্ম-ছেলে তাকে কাছে ডেকে জানতে চাইল, সে কী কাজ করে, কোথায় চলেছে। লোকটি ঘোড়ার রাশ টেনে থামালো।

বলল, "আমি একজন দস্যু। রাজপথে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াই আর মানুষকে হত্যা করি। যত বেশি লোক মারতে পারি ততই অধিকতর খুশিতে আমি গান গাই।"

ধর্ম ছেলে আতঙ্কিত হয়ে ভাবতে লাগল : "এই লোকটার মন থেকে পাপ দূর করব আমি কেমন করে? যারা আমার কাছে আসে তাদের সদুপদেশ দেওয়া সোজা, কারণ তারা অনুতপ্ত। কিন্তু এ লোকটা যে তার পাপ নিয়ে গৌরব বোধ করে।"

যাহোক, সে মুখে কিছু না বলে লোকটার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে লাগল : "এখন আমি কী করি? এই দস্যু যদি এই পথে ঘোড়া ছোটায়, তাহলে লোকজন সব ভীত হয়ে পড়বে, কেউ আর আমার কাছে আসবে না। তাহলে এখানে থাকবার আমার দরকার কী?"

সেইখানে দাঁড়িয়ে সে দস্যুকে বলল, "সকলে আমার কাছে আসে পাপের জন্য গৌরব করতে নয়, পাপের জন্য অনুতাপ করতে ও ক্ষমা ভিক্ষা করতে। যদি ঈশ্বরকে তোমার এতটুকু ভয় থাকে তাহলে তুমিও অনুতাপ করো। আর যদি তা নাই করো, তাহলে অন্য পথে তোমার ঘোড়া চালাও, এদিকে আর কখনও এসো না, আমার শান্তি নষ্ট করো না বা লোককে আতঙ্কিত করো না।"

দস্যু হেসে উঠল।

"আমি ঈশ্বরকেও ভয় করি না, তোমার কথাও শুনব না। তুমি আমার প্রভু নও। তুমি থাকো তোমার পূজা-অর্চনা আর ভাবভক্তি নিয়ে, আমি থাকব আমার নরহত্যা নিয়ে। সবাইকে তো বাঁচতে হবে। যেসব বুড়ি তোমার কাছে আসে তাদেরই তোমার উপদেশ শুনিও, আমাকে কিছু শেখাতে চেষ্টা করো না। তবে যেহেতু আজ তুমি আমাকে ঈশ্বরের কথা শুনিয়েছ, আগামীকাল আমি দুটি মানুষ বেশি মারব। এই মুহূর্তেই আমি তোমাকে হত্যা করতে পারি, কিন্তু সে কাজ করে আমার হাত কলুষিত করতে চাই না। সুতরাং, আমার কাছ থেকে দূরে থেকো।"

এইভাবে ভয় দেখিয়ে দস্যু ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। তবে তারপর থেকে এ পথে সে আর আসেনি।

ধর্ম ছেলেও আগের মতো শান্তিতে আরও আট বছর কাটিয়ে দিলো।

১১

একদিন রাতে কাঠে জল ছিটানো শেষ করে ধর্ম ছেলে আশ্রমে ফিরে বিশ্রাম করছিল। সেখানে বসেই সে লক্ষ্য করছিল, ছোট বনপথ দিয়ে কোনও চাষী তার সঙ্গে দেখা করতে আসছে কি না। সেদিন কেউ তার কাছে এল না। সারা সন্ধ্যা সে একাই বসে রইল। শেষটায় ক্লান্ত হয়ে সে নিজের অতীত জীবনের কথা ভাবতে লাগল। তার মনে পড়ল, ভগবদ্ভক্তি নিয়ে বেঁচে আছে বলে দস্যু সেদিন তাকে তিরস্কার করেছিল। এখন সে তার সারা জীবনের কথা ভাবতে বসল।

সে ভাবল "ঈশ্বরের বিধান অনুসারে তো আমি জীবন কাটাচ্ছি না! বৃদ্ধ আমার

উপর চাপিয়ে গেছে প্রায়শ্চিত্তের বোঝা, আর সেই বোঝাকে আমি জীবিকার ব্যবস্থা ও সুনামে পরিণত করেছি। এই ব্যবস্থা আমাকে এতই লোভী করে তুলেছে যে একদিন কেউ না এলে সময় যেন কাটতেই চায় না। আবার তারা এসে আমার ভগবদ্ভক্তির খুব প্রশংসা করলে তবেই আমি খুশি হই! এভাবে বেঁচে জীবন ধারণ করা তো আমার উচিত নয়। মানুষের প্রশংসা আমাকে বিপথগামী করেছে। কাজেই অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা দূরে থাক, আমি বরং নতুন পাপ সঞ্চয় করছি। আমি এবার বনে চলে যাব; এমন কোনও নতুন জায়গায় যাব যেখানে কেউ আমাকে খুঁজে পাবে না। সেখানে আমি একেবারে একা বাস করব, যাতে আমার অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি, আবার নতুন কোনও পাপও সঞ্চিত না হয়।"

মনে মনে এই রকম ভেবে বিস্কুটের একটি ছোট থলে ও একখানা কোদাল নিয়ে সে আশ্রম থেকে বেরিয়ে পড়ল। একটা পাহাড়ি নদীর খাত ধরে এগিয়ে চলল। ঠিক করল, অনেক দূরে গিয়ে একখানি মাটির ঘর বানিয়ে সেখানেই নিজেকে লুকিয়ে রাখবে।

বিস্কুটের থলে আর কোদাল নিয়ে সে পথ চলছে, এমন সময় ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে হাজির হলো সেই দস্যু। সে ভয় পেয়ে পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার আগেই দস্যু তাকে ধরে ফেলল।

দস্যু জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাচ্ছ তুমি?"

সে বলল, "এমন এক জায়গায় নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাই যেখানে কেউ খুঁজে না পায়।" এ কথা শুনে দস্যু খুব অবাক হলো।

বলল, "কেউ যদি তোমার সঙ্গে দেখা করতে না আসে তাহলে তুমি কি খেয়ে বাঁচবে?"

ধর্ম-ছেলে আগে এ-কথা ভাবেনি। দস্যু কথাটা তোলাতেই খাবারের কথা তার মনে পড়ে গেল। সে বলল, "ঈশ্বর নিশ্চয় আমার খাবার ব্যবস্থা করবেন।"

আর কোনও কথা না বলে দস্যু ঘোড়ায় চেপে বসল।

হঠাৎ ধর্ম-ছেলের মনে হলো, "এ আমি কী ভাবছি? ওই লোকটাকে সে কেমন আছে তাও তো জিজ্ঞাসা করা হলো না। হয়ত এখন সে অনুতপ্ত হয়েছে। আজ তাকে অনেকটা নরম মনে হলো। একবারও তো সে আমাকে খুন করবার হুমকি দিলো না!"

সে তখন দস্যুকে ডেকে বলল, "তবু তোমাকে বলছি, অনুতাপ করো, কারণ ঈশ্বরের হাত থেকে কারও পরিত্রাণ নেই।"

এ কথা শুনে দস্যু ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে কোমর থেকে ছোরা বের করে ধর্ম-ছেলের দিকে উঁচিয়ে ধরল। ভয় পেয়ে সে সোজা বনের মধ্যে পালিয়ে গেল। দস্যু তাকে আর তাড়া করল না। শুধু বলল, "বুড়ো, দু'-দু'বার তোমাকে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু সাবধান, তৃতীয়বার দেখা হলেই তোমাকে খুন করব!"

এই কথা বলে সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

সেদিন সন্ধ্যায় যথারীতি পোড়া কাঠে জল দিতে গিয়ে দেখে—আরে। একটার গায়ে যে অঙ্কুর গজিয়েছে! তার ভিতর থেকে একটা ছোট আপেল গাছ জন্ম নিচ্ছে!

১২

সেই থেকে ধর্ম-ছেলে লোকালয় থেকে লুকিয়ে সম্পূর্ণ নির্জন জীবন যাপন করতে লাগল।

সামান্য বিস্কুট যখন ফুরিয়ে গেল তখন সে ভাবল, "এইবার আমাকে গাছের মূলের খোঁজ করতে হবে।"

পথে পা দিয়েই সে দেখতে পেল, তাব সামনে একটা ডাল থেকে ছোট একটা বিস্কুটের থলে ঝুলছে। সেটাকে নামিয়ে নিয়ে সে বিস্কুটগুলি খেলো। খাওয়া শেষ হতে না হতেই দেখতে পেল, সেই একই ডালে আবেকটা থলে ঝুলছে।

এইভাবে বিনা উদ্বেগে তার দিন কাটতে লাগল। একটিমাত্র ভয় তখনও ছিলো—দস্যুর ভয়। তার আসার শব্দ শুনলেই সে লুকিয়ে পড়ত, ভাবত : "ও যদি আমাকে মেরে ফেলে তাহলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হবে না।"

এইভাবে সে দশ বছর কাটালো। পোড়া কাঠটা থেকে গজানো আপেল গাছটি দিন দিন বড় হতে লাগল। অপর দুটি কাঠ কিন্তু যেমন ছিল তেমনই রইল।

একদিন সকালে উঠে সে কাঠে জল ছিটোতে গেল। কাজ শেষ হয়ে গেলে বড়ই ক্লান্ত বোধ করায় বসে পড়ল বিশ্রামের জন্য। সেখানে বসে সে ভাবতে লাগল : "নিশ্চয় আমার পাপ বেড়েই চলেছে, কারণ এখনও আমি মৃত্যুকে ভয পাচ্ছি।"

সুতরাং সে দস্যুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা কববার জন্য বওনা হলো।

সে দেখল, অশ্বারোহী দস্যু একা নয়, তার পিছনে আর একটি লোক। তার হাত বাঁধা, মুখ কাপড় গুঁজে বন্ধ করা। লোকটি কোনও কথাই বলতে পারছে না, কিন্তু দস্যু তাকে অবিরাম গালাগালি করছে।

ধর্ম-ছেলে এগিয়ে ঘোড়ার সামনে দাঁড়াল।

বলল, "এ লোকটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

দস্যু জবাব দিলো, "বনের মধ্যে। ও একজন ব্যবসায়ীর ছেলে। ওর বাবাব টাকা-পয়সা কোথায় লুকোনো আছে কিছুতেই বলছে না। যতক্ষণ না বলবে চাবকে ওর পিঠের ছাল তুলে নেব।"

বলেই দস্যু ঘোড়া ছুটিযে দিতে চাইল। কিন্তু ধর্ম-ছেলে ঘোড়ার রাশ টেনে তাকে থামাল, বলল, "ছেড়ে দাও ওকে।"

দস্যু রেগে তার দিকে ঘুষি তুলল। বলল, "ওর দশা তোমারও হোক তাই কি চাও? অনেক দিন আগে বলেছিলাম, তোমাকে খুন করব। তাই বলছি, যেতে দাও আমাকে।"

কিন্তু ধর্ম-ছেলে আজ নির্ভয়। সে বলল, "আমি তোমাকে যেতে দেব না। আমি তোমাকে ভয় করি না, ভয় করি একমাত্র ঈশ্বরকে। ঈশ্বর আমাকে আদেশ দিয়েছেন তোমাকে আটকাতে। ছেড়ে দাও ওকে।"

দস্যু ভ্রূ কুঁচকে কি ভাবল। তারপর ছোরা দিয়ে বাঁধন কেটে ব্যবসায়ীর ছেলেকে ছেড়ে দিলো। বলল, "দু'জনই চলে যাও। কিন্তু আর কখনও আমার পথ মাড়িও না।"

ব্যবসায়ীর ছেলে লাফ দিয়ে নেমেই পালিয়ে গেল। দস্যু ঘোড়া ছাড়তে উদ্যত হতেই ধর্ম-ছেলে আবার তাকে থামাল, সেই অসৎ পথ ছাড়তে তাকে অনুরোধ করল।

দস্যু চুপ করে সব শুনল। জবাবে কিছুই না বলে চলে গেল।

সকালে কাঠে জল দিতে গিয়ে সে দেখে—আরে! দ্বিতীয় কাঠ থেকেও একটি আপেল গাছ জন্ম নিচ্ছে।

১৩

আরও দশ বছর কেটে গেল। একদিন সে যখন সব রকম উদ্বেগ ও ভয় রহিত হয়ে মনে অপার শান্তি নিয়ে বসে ছিল, তখন তার মনে হলো, "ঈশ্বর মানুষকে কত আশীর্বাদ করেন! যখন সর্বদাই তাদের শান্তিতে থাকা উচিত তখন অকারণেই তারা নিজেদের বিরক্ত করে।"

মানুষের সীমাহীন দুষ্কর্মের কথা সে ভাবতে লাগল। অকারণেই মানুষ নিজের বিপদ ডেকে আনে। ভাবতে ভাবতে মানুষের জন্য তার করুণা হতে লাগল। সে ভাবল, "এভাবে থাকা আমার উচিত নয়। আমি যা জেনেছি তা মানুষকে বলা আমার কর্তব্য।"

ঠিক সেই সময় সে দস্যুর আসবার শব্দ শুনতে পেল। "এ লোকটাকে কোনও কথা বলা নিরর্থক", এই কথা ভেবে প্রথমে সে দস্যুকে এড়িয়ে যেতে চাইল। কিন্তু একটু পরেই মত পরিবর্তন করে রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল।

খুব নিরাশ মনে মাটির দিকে চোখ রেখে দস্যু ঘোড়া চালিয়ে আসছিল। তাকে দেখে ধর্ম-ছেলের ভারি করুণা হলো। ছুটে তার কাছে গিয়ে তার হাঁটু জড়িয়ে ধরল।

চিৎকার করে বলে উঠল, "ভাই, নিজের আত্মাকে দয়া করো, কারণ তোমার মধ্যেও ঈশ্বর আছেন। এইভাবে যদি তুমি নিজেকে জ্বালাও, আর অপরকেও জ্বালাও, তাহলে কঠোরতর যন্ত্রণা তোমার কপালে আছে। শুধু ভাবো, ঈশ্বর তোমার দিকে সাগ্রহে চেয়ে আছেন, তোমাব জন্য তাঁর আশীর্বাদের অন্ত নেই। ভাই, নিজেকে ধ্বংস করো না, শুধু জীবনের পথটা পাল্টাও।"

দস্যু ভ্রূ কুঁচকে সরে গেল। বলল, "ছেড়ে দাও আমাকে!"

ধর্ম-ছেলে তবু তার হাঁটু জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল।

দস্যু এবার চোখ তুলে তার দিকে তাকাল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ ঘোড়া থেকে নেমে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে বলে উঠল, "বৃদ্ধ, অবশেষে তুমি আমাকে জয় করেছ। কুড়ি বছর আমি তোমার সঙ্গে লড়াই করেছি। ক্রমে ক্রমে তুমি আমার সব শক্তি হরণ করেছ, আজ আর আমি আমাতে নেই। আমাকে নিয়ে তোমার যা খুশি তাই করো। প্রথম যখন তুমি আমাকে বোঝাতে চেয়েছিলে তখন আমি আরও রেগে গিয়েছিলাম। তুমি যখন মানুষের কাছ থেকে দূরে চলে গেলে, যখন বুঝলে মানুষের সাহায্যের তোমার দরকার নেই, তখনই তোমার কথাগুলো আমাকে চিন্তিত করে তুলল। সেইদিন থেকেই তোমার জন্য গাছের ডালে আমি বিস্কুটের থলে ঝুলিয়ে রাখতাম।"

এইবার ধর্ম-ছেলের মনে পড়ল, কেন ময়লা ন্যাকড়া পরিষ্কার করে নিঙড়ালে তবে টেবিল পরিষ্কার হয়। সে বুঝল, যে মুহূর্তে সে নিজের ভাবনা ছেড়েছে তখনই তার হৃদয় পবিত্র হয়েছে, একমাত্র তখনই অপরের হৃদয় পবিত্র করবার ক্ষমতা তার রয়েছে।

দস্যু বলতে লাগল : "কিন্তু আমার হৃদয়ের প্রথম প্রকৃত পরিবর্তন হলো যখন আমার হাতে আসন্ন মৃত্যুকে তুমি তুচ্ছ করলে।"

তৎক্ষণাৎ ধর্ম-ছেলের মনে পড়ল, চক্রবেড় পাকানোর লোকগুলি যখন মূল চাকটাকে শক্ত করে আটকে নিলো একমাত্র তখনই বেড়গুলোকে বাঁকাতে পারল। সেই রকম, যখন সে নিজের জীবনকে ঈশ্বরের হাতে সঁপে দিলো এবং নিজের দাম্ভিক মনকে বিনীত করতে শিখল, একমাত্র তখনই তার মৃত্যুভয় দূর হলো।

দস্যু শেষকালে বলল, "আর আমার প্রতি যখন তোমার করুণা হলো, আমার সামনে যখন তুমি কাঁদতে লাগলে, তখনই আমার হৃদয় সম্পূর্ণ বদলে গেল।"

গভীর আনন্দের সঙ্গে ধর্ম-ছেলে দস্যুকে সঙ্গে করে পোড়া কাঠের টুকরোগুলোর কাছে গেল। আরে! তৃতীয় কাঠটা থেকেও একটা আপেল গাছ গজিয়েছে।

তখন তার মনে পড়ল, পশু-ব্যবসায়ীদের আগুন যখন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল একমাত্র তখনই ভেজা ঝোপ-ঝাড়গুলোও জ্বলে উঠল। সেই রকম তার অন্তরের মধ্যে আগুন জ্বলেছে বলেই এখন সে অপরের হৃদয়ের আগুনকেও জ্বালাতে পেরেছে।

আনন্দের সঙ্গে সে উপলব্ধি করল, এতদিনে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে।

দস্যুকে সব কথা বলতে বলতে সে মারা গেল।

দস্যু তাকে কবরে শুইয়ে দিলো। তারপর ধর্ম-ছেলের নির্দেশমতো জীবনযাপন করতে লাগল, আর অপরকেও তাই করতে বলল।

১৮৮৬

আক্রমণ*

The Raid

১

১২ই জুলাই তারিখে ক্যাপ্টেন হ্লপভ্ আমার কুটিরের নিচু দরজায় এসে হাজির হলো। তার পরনে স্কন্ধত্রাণ ও তরবারি সমন্বিত পূর্ণ সামরিক পোশাক। ককেসাস-এ আসার পর থেকে তাকে কখনও এ পোশাকে দেখিনি।

আমার চোখের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে সে বলল, "আমি কর্নেলের কাছ থেকে সোজা এখানে আসছি; আমাদের সেনাদল আগামীকাল যাত্রা শুরু করবে।"

"কোথায়?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"এন.—এ —। সৈন্যরা সেখানেই জমায়েত হবে।"

"তাহলে কি সেখান থেকেই তাদের সামরিক তৎপরতা শুরু হবে?"

"খুব সম্ভব।"

"কোথায়? আপনি কি মনে করেন?"

"আমি কিছুই মনে করি না, যা জানি তাই আপনাকে বললাম। কাল রাতে একজন তাতার ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে সেনাপতির নির্দেশ নিয়ে— দু'দিনের মতো বিস্কুট সঙ্গে নিয়ে সেনাদলকে যাত্রা করতে হবে। কিন্তু কোথায় যাবে, কি জন্য যাবে, আর কতদিনের জন্য যাবে, সে কথা আমরা কেউ জানি না মশায়; আমাদের যাত্রা করতে বলা হয়েছে, বাস, ওই যথেষ্ট।"

"অবশ্য আপনারা যখন মাত্র দু'দিনের বিস্কুট সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন, তখন সেনাদলকে নিশ্চয় তার চাইতে বেশি দিন আটকে রাখা হবে না —"

"দেখুন, ও থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না। ."

"কি রকম?" আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

"কেন, তারা তো এক সপ্তাহের মতো বিস্কুট সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করেছিল দার্গিতে, আর সেখানে ছিল প্রায় এক মাস।"

একটু চুপ করে থেকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি কি?"

"তা নিশ্চয় পারেন, তবে আমার পরামর্শ, না যাওয়াই ভাল। আপনি এ ঝুঁকি নিতে যাবেন কেন?"

* একটি স্বেচ্ছা-সৈনিকের কাহিনী

"না, আমাকে আপনার পরামর্শ মতো না চলবার অনুমতি দিন। একটা যুদ্ধ দেখবার সুযোগের অপেক্ষায় আমি এখানে একটা পুরো মাস বসে আছি, আর আপনি আমাকে সে সুযোগটাও হারাতে বলছেন।"

"যেতে চান যাবেন। তবু এখানে থেকে গেলেই কি ভাল হতো না? আমরা ফিরে আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করতে পারেন; ঈশ্বরের ইচ্ছায়, আমরা চলে গেলে কিছু শিকারও করতে পারেন। সেটাই তো সব চাইতে ভাল হতো।" এমন আবেগের সঙ্গে সে কথাগুলি বলল যে প্রথমে আমিও ভেবেছিলাম যে সেটাই সব চাইতে ভাল ব্যবস্থা। যা হোক, আমি দৃঢ়স্বরে জানালাম যে কোনও কারণেই আমি এখানে পড়ে থাকতে চাই না।

তবু আমাকে বোঝাবার জন্য ক্যাপ্টেন বলল, "আচ্ছা, সেখানে এমন কি আছে যা আপনি দেখেননি? যদি জানতে চান যে যুদ্ধ ব্যাপারটা কি তাহলে মিখাইলস্কি ডেনিয়েলেভস্কি-র "যুদ্ধের বিবরণ" পড়ুন—চমৎকার বই। তাতে সবকিছু খুঁটিনাটি বিবরণ আছে—কোথায় কোন্ সেনাদলকে মোতায়েন করা হয়েছিল এবং কি ভাবে যুদ্ধটা হয়েছিল।"

"কিন্তু সে সব জানবার আগ্রহ আমার নেই", আমি জবাব দিলাম।

"তাহলে কিসে আপনার আগ্রহ? মনে হচ্ছে, মানুষ কি ভাবে খুন হয় আপনি শুধু সেটাই দেখতে চান।...১৮৩২ সালেও এখানে একজন অসামরিক লোক ছিল; সম্ভবত স্পেন-এর মানুষ। এক ধরনের নীল জোব্বা গায়ে চড়িয়ে সে দুটো অভিযানে আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল...তার জন্যও ব্যাপারটা ঐ রকমই ঘটেছিল। এখানে আপনি কাউকে অবাক করে দিতে পারবেন না মশাই।"

আমার অভিপ্রায়ের এমন একটা ঘৃণ্য ব্যাখ্যা করায় ক্যাপ্টেনের কথা শুনে আমি দুঃখিত হলাম; কিন্তু তার মনোভাব বদলাবার কোনও চেষ্টা করলাম না।

"সে কি খুব সাহসী লোক ছিল?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"কেমন করে বলব? সব সময়ই সে সামনের সারিতে এগিয়ে যেত; যেখানেই গুলি-গোলা চলত, সেখানেই সে হাজির।"

"তাহলে তো সাহসী লোকই ছিল," আমি বললাম।

"না, যেখানে তাকে দরকার নেই সেখানে ছুটে গেলেই প্রমাণ হয় না যে লোকটি সাহসী।"

"তাহলে কাকে আপনারা সাহসী বলেন?"

"সাহসী? সাহসী?" ক্যাপ্টেন কথাটাকে বার বার এমনভাবে উচ্চারণ করল যেন এ ধরনের প্রশ্ন এই প্রথম তাকে করা হচ্ছে। একটুখানি ভেবে সে বলল, "তাকেই আমরা সাহসী বলি যে তার পক্ষে উচিত ব্যবহারটি করে।"

সাহসিকতার যে সংজ্ঞা প্লেটো দিয়েছেন সেটা আমার মনে পড়ে গেল—কাকে ভয় করতে হবে আর কাকে ভয় করতে হবে না সেই জ্ঞানই সাহস। ক্যাপ্টেনের

বক্তব্যের মধ্যে যতই অস্পষ্টতা থাকুক না কেন, আমার মনে হলো যে মূলত দু'জনের চিন্তাধারার মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই; আসলে গ্রীক দার্শনিকের সংজ্ঞার চাইতে ক্যাপ্টেনের সংজ্ঞাই অধিকতর সঠিক, কারণ সে যদি নিজেকে প্লেটোর মত ভালভাবে প্রকাশ করতে পারত তাহলে সে হয়ত বলত যে, যে-মানুষ যাকে ভয় করা উচিত তাকেই ভয় করে, যাকে ভয় করা উচিত নয় তাকে নয়, সেই মানুষই প্রকৃত সাহসী।

আমার মনোভাব ক্যাপ্টেনকে বুঝিয়ে বলতে চাইলাম।

বললাম, "হ্যাঁ, আমার মনে হয় যে সব বিপদের ক্ষেত্রেই বেছে নেবার একটা সুযোগ থাকে, আর সেই বেছে নেবার কাজটা যখন কর্তব্যবোধের প্রেরণায় করা হয় সেটাই সাহসিকতা; অপর পক্ষে বেছে নেবার কাজটা যখন করা হয় কোনও নিচু প্রবৃত্তির বশে, সেটাই ভীরুতা; কারণ যে মানুষ অহংকার, কৌতূহল বা লাভের বশবর্তী হয়ে জীবনের ঝুঁকি নেয় তাকে সাহসী বলা যায় না; অপর পক্ষে যে মানুষ পরিবারের প্রতি কর্তব্যের মতো কোনও সম্মানজনক অনুভূতির বশবর্তী হয়ে অথবা অন্য কোনও সুবিবেচনাপ্রসূত কারণে বিপদের সম্মুখীন হতে অস্বীকার করে তাকে ভীরু আখ্যা দেওয়া যায় না।"

আমি যখন কথা বলছিলাম তখন ক্যাপ্টেন একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল।

পাইপে তামাক ভরে সে বলল, "দেখুন, সে কথা প্রমাণ করবার মতো যোগ্যতা আমার নেই, কিন্তু আমাদের একজন ধ্বজাবাহী সৈনিক আছে যে দার্শনিক আলোচনা ভালবাসে। আপনি তার সঙ্গে কথা বলুন। সে কবিতাও লেখে।"

রাশিয়ায় থাকতে ক্যাপ্টেন সম্পর্কে অনেক কিছু জানলেও ককেসাস-এ এসেই তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। তার মা মারিয়া আইভানভ্না হল্‌পভ্ আমাদের বাড়ি থেকে মাইল দেড়েক দূরে তার ছোট জমিদারিতে বাস করেন। ককেসাস-এর উদ্দেশে যাত্রা করবার আগে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তার পাশেংকা-র সঙ্গে আমার দেখা হবে (পাকা-চুল বয়স্ক ক্যাপ্টেনকে তিনি ঐ নামেই ডাকেন), জীবন্ত চিঠির মতো তার জীবনযাত্রার সব কথা আমি ক্যাপ্টেনকে বলতে পারব, এবং বাড়ি থেকে দেওয়া একটা প্যাকেট তাকে পৌছে দেব—এই সব ভেবে বৃদ্ধা মহিলাটি খুবই খুশি হলেন। চমৎকার পিঠে ও নোনা মাংস দিয়ে আমাকে ভালভাবে খাইয়ে মারিয়া আইভানভ্না শোবার ঘরে ঢুকলেন এবং কালো রেশমী ফিতে দিয়ে সেলাই করা একটা বড় কালো কবচ নিয়ে এলেন।

সেটা আমার হাতে দেবার আগে ক্রুশ-চিহ্ন করে এবং যীশু-জননীর মূর্তিকে চুম্বন করে তিনি বললেন, 'ইনি আমাদের পবিত্র গৃহ-দেবতা, জ্বলন্ত জঙ্গলের জননী। দয়া করে এটা তাকে দেবেন। কি জানেন, সে যখন ককেসাস-এ যায় তখন তার জন্য আমি একটি প্রার্থনা-সঙ্গীতের আয়োজন করেছিলাম, আর শপথ নিয়েছিলাম যে সে যদি জীবিত ও অক্ষত থাকে তাহলে পবিত্র জননীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করব। আজ আঠারো

বছর হয়ে গেল আমাদের গৃহ-দেবতা ও পবিত্র সন্তগণ তাকে রক্ষা করে চলেছেন। একটিবারও সে আহত হয়নি, অথচ কী ভীষণ যুদ্ধই না সে করেছে! তার সঙ্গী মিখাইলো যখন সে সব কথা আমাকে বলল তখন, আপনি কি বিশ্বাস করবেন আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। তার যা কিছু খবর সবই পাই অন্যের কাছ থেকে, সে নিজে কিন্তু তার অভিযান সম্পর্কে একটি কথাও আমাকে লেখে না—তার ভয়, পাছে আমি ভয় পাই।"

ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে না হলেও ককেসাস-এ এসেই আমি জেনেছি যে চার চার বার সে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে, আর বলাই বাহুল্য যে কি তার অভিযানের কথা আর কি তার আঘাতের কথা কিছুই সে তার মাকে লিখে জানায়নি।

মহিলাটি বলতে লাগলেন, "কাজেই এই পবিত্র প্রতীকটা সে যেন ধারণ করে, এর সঙ্গেই রইল আমার আশীর্বাদ। গৃহ দেবতা জননীই তাকে রক্ষা করবেন। সে যেন সব সময়, বিশেষ করে যুদ্ধের সময় এটা ধারণ করে। দয়া করে তাকে বলবেন এটা তার মায়ের আদেশ।'

তার সব কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব বলে কথা দিলাম।

বৃদ্ধা বলতে লাগলেন, 'আমি জানি তুমি তার পাশে থাকলে তোমার ভাল লাগবে। সে বড় ভাল ছেলে। তুমি কি বিশ্বাস করবে, ফি বছর সে আমাকে টাকা পাঠায় আর আমার মেয়ে অনুশকাও তার কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়ে থাকে। আর সে সবই তো আসে তার মাইনে থেকে। এমন একটি ছেলে দেবার জন্য ঈশ্বরের কাছে আমি সত্যি কৃতজ্ঞ।" তিনি কথা শেষ করলেন।—তার দুই চোখে জল ঝরতে লাগল

"তিনি কি প্রায়ই আপনাকে চিঠি লেখেন?"

"প্রায়ই লেখে না, সাধারণত বছরে একবার, যখন টাকা পাঠায় সেই সঙ্গে দু'একটা কথা লেখে, তার বেশি না। সে বলে, 'চিঠি না লিখলেই বুঝবে আমি বেঁচে আছি, ভাল আছি। ঈশ্বর না করুন, সে রকম কিছু ঘটলে ওরাই তো মাকে আমার কথা লিখবে'।"

তার মায়ের উপহারটা যখন ক্যাপ্টেনকে দিলাম—সেটা আমার কুটিরেই ছিল—তখন সে একটুকরো কাগজ চেয়ে নিয়ে সেটাকে সযত্নে মুড়ে রেখে দিল। তার মায়ের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি বিবরণ তাকে শোনালাম, ক্যাপ্টেন একটি কথাও বলল না। আমার কথা শেষ হলে সে একটু দূরে গিয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে পাইপে তামাক ভরল।

মুখ না ঘুরিয়েই কেমন একটা ফ্যাসফেসে গলায় বলল, "হ্যাঁ, আমার মা চমৎকার মানুষ! জানি না ঈশ্বর আমাকে আর কখনও তার কাছে নিয়ে যাবে কিনা।"

সামান্য এই ক'টি কথার ভিতর দিয়েই অনেক ভালবাসা ও বেদনা যেন ফুটে বের হলো।

"আপনি এ চাকরি করেন কেন?" আমি বললাম।

সে দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, "আমাকে করতেই হবে। সামরিক চাকরির দ্বিগুণ বেতন আমার মতো একজন গরিব মানুষের পক্ষে অনেকখানি।"

ক্যাপ্টেন খুব সাবধানে থাকে: খেলাধূলা করে না; মদ খায় না; যে সস্তা তামাক খায় কেন জানি না তাকে কড়া না বলে "সাম্‌ব্রোতালিক" বলে। প্রথম থেকেই ক্যাপ্টেনকে আমার ভাল লেগেছে; তার মুখে সেই শান্ত, স্পষ্ট ভাব যেটা রুশদের বৈশিষ্ট্য; তার চোখের দিকে আনন্দে ও সহজে তাকানো যায়। কিন্তু এই আলাপচারিব পরে তার প্রতি আমার সত্যিকারের শ্রদ্ধা হলো।

২

পরদিন সকাল চারটের সময় ক্যাপ্টেন আমাকে তুলে নিতে এল। পরনে একটা সুতো বের-করা পুরনো কোট, তাতে স্কন্ধত্রাণ নেই, পুরো ককেসীয় ট্রাউসেস, এলোমেলো হলদে পশমের একটা সাদা অস্ত্রাখান টুপি, আর বাজে দেখতে একখানা এশিয়া-মার্কা তলোয়ার কাঁধ থেকে ঝুলছে। যে সাদা ককেসীয় টাট্টু ঘোড়ায় সে চড়েছে সেটা মুখ নিচু করে হাল্কা কদমে চলেছে, আর সরু লেজটাকে অনবরত দোলাচ্ছে। ভাল মানুষ ক্যাপ্টেনটিব চেহারায় সামরিক বৈশিষ্ট্য বা সুদর্শন ভাব কিছু না থাকলেও তার ভিতর দিয়ে চারপাশের সব কিছুর প্রতি এমন একটা উদাসীনতা ফুটে উঠেছিল যে আপনা থেকেই একটা শ্রদ্ধার ভাব আমার মনে জেগে উঠল।

তাকে এক মিনিটও দাঁড় কবিয়ে না রেখে আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় চাপলাম, এবং দু'জনে একসঙ্গে দুর্গের ফটক পার হয়ে গেলাম।

ইতিমধ্যেই সেনাদল আমাদের থেকে প্রায় ছয় শ' গজ এগিয়ে গেছে; তাদের দেখাচ্ছে একটা কালো ঘন বস্তুর মতো। আমরা শুধু বুঝতে পারলাম ওটা পদাতিক বাহিনী, কারণ তাদের বেয়নেটগুলো দেখাচ্ছিল একচাপ সরু সূঁচের মতো; মাঝে মাঝে সৈনিকদের গান, ঢাকের বাজনা ও ষষ্ঠ কোম্পানির প্রধান গায়কের চমৎকাব সুরেলা গলার কিছু কিছু অংশ আমাদেব কানে আসছিল। দুর্গের মধ্যে ঐ গান আমি একাধিকবাব শুনেছি। একটা ছোট নদীর তীর ঘেঁষে একটা গভীর ও চওড়া গিরি-পথ ধরে রাস্তাটা চলে গেছে। ছোট নদীটা তখন "টই-টম্বুর", অর্থাৎ দু'-কূল ছাপিয়ে চলেছে। বুনো পায়রারা ঝাঁক বেঁধে ইতস্তত উড়ে বেড়াচ্ছে; কখনও নদীর পাথুরে তীরে বসছে, আবার বাতাসে পাক খেতে খেতে চক্রাকারে উড়ে দ্রুত দৃষ্টিপথের বাইবে চলে যাচ্ছে। সূর্য এখনও চোখে পড়ছে না, কিন্তু ডান দিককার পাহাড়ের চূড়ায় রোদের ছোঁয়া লাগতে শুরু করেছে। সূর্যোদয়ের স্বচ্ছ সোনালী আলোয় ধূসর, সাদাটে পাথর, হলদে-সবুজ শেওলা ও নানা ধরনের বুনো গাছ-গাছালি অসাধারণ স্পষ্টতায় ফুটে উঠেছে। কিন্তু সুড়ঙ্গ ও গিরি-খাতের বিপরীত দিকটা তখনও স্যাঁৎসেঁতে ও অন্ধকার। একটা ঘন কুয়াশা ধোঁয়ার মতো অসমানভাবে তাব উপর দিয়ে পাক খেয়ে

চলেছে; আর তারই ভিতর দিয়ে চোখে পড়ে আশ্চর্য এক রঙের খেলা—কখনও হাল্কা লিলাক, কখনও প্রায় কালো, গাঢ় সবুজ ও সাদা। ঠিক আমাদের সামনে গাঢ় নীল দিগন্তরেখার পশ্চাৎপটে ঝকঝকে একঘেয়ে সাদা বরফ-ঢাকা পাহাড়গুলি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে; তাদের অদ্ভুত ছায়া ও আকার সুস্পষ্ট সুন্দর রেখায় ফুটে উঠেছে। কাঠ-ফড়িং, ঝিঁঝি ও অন্য হাজার রকম কীট-পতঙ্গ বড় বড় ঘাসের মধ্যে জেগে উঠেছে; তাদের কর্কশ অবিশ্রাম ঐকতানে বাতাসকে ভরে তুলেছে। অসংখ্য ছোট ছোট ঘণ্টা যেন ঠিক কানের কাছেই বাজছে। জল, ঘাস ও কুয়াশার গন্ধে, বস্তুত গ্রীষ্মের সুন্দর সকালবেলাকার গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

ক্যাপ্টেন আগুন জ্বালিয়ে পাইপ ধরালো; "সাম্বোতালিক" তামাক ও চকমকির গন্ধ আমার অদ্ভুত ভাল লাগল।

যাতে পদাতিক বাহিনীকে তাড়াতাড়ি ধরে ফেলা যায় সেজন্য আমরা রাস্তাটার ধার ঘেঁষে চলতে লাগলাম। ক্যাপ্টেনকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছিল। "দাঘেস্তান" পাইপটাকে মুখ থেকে মোটেই নামাচ্ছিল না, আর প্রতি এক গজ অন্তরই টাট্টুটাকে আরও জোরে চলবার জন্য পা দিয়ে গুঁতো মারছিল; ফলে সেটা এঁকেবেঁকে চলার দরুন পথের ভেজা লম্বা ঘাসের উপর একটা গাঢ় সবুজ পথের চিহ্ন ঈষৎ চোখে পড়ছিল। একটা বুড়ো মোরগ কলধ্বনি করে পাখা ঝট্‌পটিয়ে টাট্টুটার একেবারে ক্ষুরের কাছ থেকে এমন ভাবে উড়াল দিলো যাতে যেকোনও খেলোয়াড়ের বুকের ভিতরটাও কেঁপে উঠবে। কিন্তু ক্যাপ্টেন সেটা নজরেও আনল না।

পদাতিক বাহিনীকে প্রায় ধরে ফেলতে যাচ্ছি এমন সময় আমাদের পিছনে জোর কদমে ছুটে-আসা ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনতে পেলাম, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একটি অতি সুশ্রী অল্পবয়সী যুবক ঘোড়ায় চড়ে এসে হাজির হলো। পরনে অফিসারের পোশাক, মাথায় উঁচু, সাদা অস্ত্রাখান টুপি। আমাদের পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে সে হাসল, মাথা নাড়ল, চাবুকটা দোলালো।...ওইটুকু সময়ে আমি শুধু দেখলাম, ঘোড়ার পিঠে বসে সুকুমার ভঙ্গিতে সে রাশটা হাতে ধরেছে, কালো চোখ দুটি বড় সুন্দর, নাকটা টিকলো, সবে গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। আমরা যখন সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম তখন সে যে না হেসে পারেনি তাতেই আমি বিশেষভাবে মোহিত হয়েছিলাম। ওই হাসিটুকু দেখলেই যে কেউ বুঝতে পারবে যে সে এখনও নবীন যুবক।

ঠোঁট থেকে পাইপটা না সরিয়েই ক্যাপ্টেন ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠল, "ঘোড়া ছুটিয়ে সে চলেছে কোথায়?"

"লোকটা কে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"ধ্বজাবাহী এলানিন, আমার সেনাদলের অধীন একজন সৈনিক। মাত্র এক মাস হলো সামরিক বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এখানে যোগ দিয়েছে।"

আমি বললাম, "মনে হচ্ছে এই প্রথম সে যুদ্ধে অংশ নিতে যাচ্ছে।"

"আর ঠিক সেই কারণেই এ নিয়ে সে এত খুশি!" পণ্ডিতি ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে ক্যাপ্টেন বলল। "হায় যৌবন!"

"আহা, খুশি না হয়ে কি সে পারে? আমি তো বুঝি, একজন তরুণ অফিসারের পক্ষে এটা খুবই আকর্ষণীয়।"

মিনিট দুইয়েক ক্যাপ্টেন কোনও কথা বলল না।

"আমিও ঠিক তাই বলছি; এই তো যৌবন!" নিচু গলায় সে বলতে লাগল। "কিন্তু ব্যাপারটা কি না জেনেই এতে খুশি হবার কি আছে! বারকয়েক যাতায়াত করলে তখন আর খুশির কিছু থাকবে না। ধরা যাক, আমাদের বিশ জন অফিসার এখন যুদ্ধে যাত্রা করেছে; কিছু লোক যে নিহত বা আহত হবে সেটা তো নিশ্চিত। আজ আমার পালা, কাল তোমার, পরশু আর কারও। কাজেই এতে খুশি হবার কি আছে?"

৩

পাহাড়ের পিছন থেকে উজ্জ্বল সূর্য উঠে উপত্যকার বুকে কিরণ ছড়াতে না ছড়াতেই কুয়াশার মেঘরা সরে গেল, আর বেশ গরম বোধ হতে লাগল। কাঁধে বন্দুক আর পিঠে থলে নিয়ে সৈন্যরা সব ধুলো-ভর্তি রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল; তাদের রুশ ভাষার কথাবার্তা ও হাসির টুকরো শব্দ মাঝে মাঝে কানে আসছে। সাদা ক্যান্‌ভাসের পোশাক-পরা কিছু বুড়ো সৈনিক—তাদের অধিকাংশই সার্জেন্ট বা কর্পোরাল—পাইপ টানতে টানতে শান্তভাবে কথা বলতে বলতে রাস্তার ধার ঘেঁষে এগিয়ে চলেছে। মালপত্রে উঁচু করে বোঝাই-করা তিন-ঘোড়ায় টানা মাল-গাড়িগুলো ধুলোর মেঘ উড়িয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। অফিসাররা ঘোড়ায় চেপে চলেছে সকলের আগে। তারা চাবুক মেরে ঘোড়াগুলোকে দিয়ে নানা রকম কসরৎ করাচ্ছে। অন্য সকলে মনের সুখে গান শুনছে, আর গায়করাও শ্বাস-রোধ করা গরমের মধ্যেও অবিশ্রান্তভাবে একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছে। পদাতিক বাহিনীর প্রায় তিন শ' গজ আগে তাতার অশ্বারোহী বাহিনীর দ্বারা পরিবৃত হয়ে একটা বড় সাদা ঘোড়ায় চেপে চলেছে একজন অফিসার; উদ্দাম দুঃসাহসিকতা এবং যেকোনও লোকের মুখের উপর সত্য কথা বলার জন্য বেজিমেন্টে তার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। লোকটি লম্বা, সুদর্শন, এশিয়া মহাদেশের কায়দায় সজ্জিত পরনে জরির কাজ-করা পোশাক, তার সঙ্গে মেলানো পায়ের পট্টি, দামী কাজ-করা আঁটো জুতো, হলদে সির্কাশিয়ান কোট, এবং মাথার পিছন দিকে চেপে বসানো উঁচু অস্ত্রাখান টুপি। বুক ও পিঠের ওপর দিয়ে ঝোলানো রূপোলি কাজ-করা ফিতের সঙ্গে সামনে ঝুলছে বারুদ-ভরা একটা শিঙা আর পিছনে ঝুলছে তার পিস্তল। তার কোমর-বন্ধনীতে ঝুলছে তার দ্বিতীয় পিস্তলটি এবং রূপোর খাপে ঢাকা একখানা ছুরি। এ সব কিছুর উপর দিয়ে ঝুলছে জরির কাজ-করা লাল মরোক্কো চামড়ার খাপে ঢাকা একখানি তলোয়ার, আর কালো খাপে মোড়া একটা রাইফেল। তার সাজ-পোশাক, তার অশ্ব-চালনার ভঙ্গি,

তার প্রতিটি চাল-চলনেই সে যেন বোঝাতে চাইছে যে সে একজন তাতার। এমন কি সঙ্গী তাতার অশ্বারোহীদের সঙ্গে যে ভাষায় সে কথা বলছে সে ভাষাটাও আমি জানি না। কিন্তু তাতার সৈনিকরা যেবকম বিভ্রান্ত হয়ে সকৌতুকে পবস্পরের দিকে তাকাচ্ছিল তাতে আমার মনে হলো, তারাও তাব কথা কিছু বুঝতে পারছে না। সে একজন তরুণ লেফ্‌টেন্যান্ট; সে তাদেবই একজন যাদের আদর্শ হলো মার্লিনস্কি ও লার্মন্টভ্। এই লোকগুলি "আমাদের সমকালীন বীব", মোল্লানুব ইত্যাদির চশমার ভিতর দিয়ে ছাড়া ককেসাসকে দেখতে জানে না; প্রতিটি পদক্ষেপে এই সব মহাবীবদের দৃষ্টান্তের দ্বাবাই তা পবিচালিত হয়, নিজেদেব রুটিনমাফিক কখনও নয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এই লেফ্‌টেন্যান্টটি হয়তো উঁচু মহলেব নরনাবীর সঙ্গই পছন্দ কবে—পছন্দ করে সেনাপতি, কর্নেল ও সহকাবীদের সঙ্গে মিশতে—বস্তুত আমি নিশ্চিত জানি যে ঐ ধবনেব সমাজই তাব প্রিয় কারণ সে অত্যন্ত অহংকাবী। নিজের চরিত্রের কর্কশ দিকটা সকলের দিকে মেলে ধরাটাকেই সে তাব অবশ্য কর্তব্য বলে মনে কবে, যদিও সে কর্কশতা খুব একটা চড়া রকমের নয়। কিন্তু যখনই কোনও মহিলা দুর্গে আসে তখনই মনের মতো সঙ্গীদের নিয়ে লাল শার্ট গায়ে চড়িয়ে, মোজাহীন পায়ে শুধুমাত্র চপ্পল পবে সে তার জানালাব নিচে গিয়ে হাজিব হবেই এবং যথাসম্ভব উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার-চেঁচামেচি ও শপথ গ্রহণ কবতে থাকবে। কিন্তু মহিলাটির বিবক্তি উৎপাদনের জন্য যে সে এসব কাজ করে তা কিন্তু নয়, সে শুধু দেখাতে চায় তার দুটি পা কী চমৎকাব সাদা, আর সে চাইলেই তাব সঙ্গে প্রেম কবা কত সহজেই সম্ভব।

প্রায়ই রাতের বেলা দু'তিন জন শান্তিপ্রিয় তাতারকে সঙ্গে নিয়ে সে পাহাড়েব দিকে চলে যায়; সেখানে পথেব পাশে ওঁৎ পেতে থেকে শত্রুপক্ষের তাতাবদেব দেখলেই তাদেব মেরে ফেলে, সে-কাজটা যে খুব দুঃসাহসিক কিছু নয় তা সে মনে মনে বোঝে, তবু কোনও না কোনও কাবণে তাদেব উপর বিরূপ হবাব জন্যই সে তাদেব ঘৃণা কবে, অবজ্ঞা করে, আব সেই জন্যই যেন তাদের কষ্ট না দিয়ে পারে না। দুটি জিনিস সে কখনও শবীর থেকে খুলে রাখে না; গলায় একটি বড় দেবমূর্তি, আর শার্টেব উপর ঝোলানো একটা ছুবি যেটা সে শোবার সময়ও সঙ্গেই রাখে। সে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে তার অনেক শত্রু আছে। কাবও উপর প্রতিশোধ নিতে হবেই, আব রক্ত দিয়ে কোনও অপমানেব দাগ তাঁকে ধুয়ে ফেলতে হবেই—এ ধারণা মনের মধ্যে পোষণ করে সে ভারী আনন্দ পায়। তার দৃঢ় ধাবণা, মানুষের প্রতি বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা ও ঘৃণাই মহত্তম এক কবিত্বময় অনুভূতি। কিন্তু একসময় তাব সির্কাসীয় মেয়েমানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় হলে সে আমাকে বলেছিল যে তাব মতো দয়ালু ও ভদ্র মানুষ হয় না; প্রতিদিন সন্ধ্যায় তার বিষণ্ণ চিন্তাধারাগুলিকে লিপিবদ্ধ করে রুলটানা কাগজে হিসাব-নিকাশ শেষ করে সে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করে। হায়, তার আদর্শ অনুসারে চলবার জন্য কী কষ্টটাই না সে সহ্য কবে! তার

সংকর্মী ও সৈনিকদের কাছ থেকে যে শ্রদ্ধা সে পেতে চায় তা তারা দেয় না। একদিন সঙ্গীদের নিয়ে নৈশ অভিযানে বেরিয়ে সে জনৈক শত্রুপক্ষীয় উপজাতি মানুষের পায়ে গুলি লাগিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনার পরে লোকটি সাত সপ্তাহ ধরে লেফ্‌টেন্যান্টের বাসায়ই ছিল। সেই সময় লেফ্‌টেন্যান্ট এমন ভাবে তার দেখাশুনা ও সেবাশুশ্রূষা করেছে যেন সে তার প্রিয়তম বন্ধু আর তার ঘা শুকিয়ে গেলে প্রচুর উপহার সঙ্গে দিয়ে সে তাকে ছেড়ে দেয়। পরবর্তীকালে একদা কোনও অভিযান-কালে লেফ্‌টেন্যান্ট যখন শত্রুপক্ষকে বাধা দিতে গুলি চালাতে চালাতে তার স্কাউটদের নিয়ে পিছু হটছিল, তখন শত্রুপক্ষের ভিতর থেকে কে যেন তার নাম ধরে ডেকে উঠল এবং তার সেই আহত অতিথি এগিয়ে এসে ইঙ্গিতে লেফ্‌টেন্যান্টকে আমন্ত্রণ জানাল। সেও এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে কর-মর্দন করল। পাহাড়ী লোকগুলো দূরে দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল না; কিন্তু লেফ্‌টেন্যান্ট ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া মাত্রই কয়েকজন তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল এবং একটা গুলি তার শিরদাঁড়ার নিচটা ঘেষ্‌টে গেল।

আর একটা ঘটনা আমার নিজের চোখে দেখা। একদিন রাতে দুর্গে আগুন লেগেছিল, আর দুই দল সৈন্য সেই আগুন নেভানোর কাজে ব্যস্ত ছিলো। হঠাৎ কয়লা-কালো ঘোড়ায় চেপে একটি দীর্ঘকায় মানুষ ভিড়ের মধ্যে এসে হাজির হলো। আগুনের লাল আভা তার উপর ছড়িয়ে পড়ল। ভিড় ঠেলে লোকটি সোজা আগুনের কাছে চলে গেল। একেবারে আগুনের কাছে পৌঁছে লেফ্‌টেন্যান্ট লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে বাড়িটার দিকে দৌড়ে গেল। সেই বাড়িটারই একটা অংশ তখন জ্বলছে। পাঁচ মিনিট পরে সে বেরিয়ে এল। তার চুল পুড়ে গেছে, কনুই-এর খানিকটা পুড়ে গেছে। আগুনের ভিতর থেকে কোটের পকেটে ভরে সে উদ্ধার করে এনেছে দুটো পায়রা।

তার উপাধি ছিলো বোজেনক্রাঞ্জ; কিন্তু সে প্রায়ই তার বংশ-পরিচয়ের কথা বলত। তারা যে ভারেঙ্গীয়দেরই বংশধর একথা বুঝিয়ে দিয়ে সে অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করে দিত যে সে ও তার পূর্বপুরুষরা পবিত্র রুশ রক্তেরই উত্তরাধিকারী।

৪

সূর্য মাথার উপর থেকে সরে গেল। তার কিরণরাশি ঝল্‌সানো বাতাসের ভিতর দিয়ে দগ্ধ পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ল। গাঢ় নীল আকাশটা ঝক্‌ঝক্‌ করছে, শুধু বরফ-ঢাকা পাহাড়গুলোর নিচে সাদাটে লিলাক রঙের মেঘ জমতে শুরু করেছে। বাতাস যেন তখনও এক ধরনের স্বচ্ছ ধুলোয় আচ্ছন্ন। সে বাতাস অসহ্য গরম। অর্ধেকটা পথ পার হয়ে আমরা একটা ছোট নদী পেলাম। সৈন্যরা সেখানে থামল। রাইফেলগুলো জড়ো করে রেখে সৈন্যরা নদীর দিকে ছুটে গেল; সৈন্যদলের ভারপ্রাপ্ত অফিসারটি ছায়ায় একটা ঢাকের উপর বসে পড়ল; মুখের ভাবভঙ্গিতে

নিজের পদমর্যাদাকে পরিস্ফুট করে সে অফিসারদের সঙ্গেই নিজের আহারের ব্যবস্থাটা করে নিলো। ক্যাপ্টেন মালপত্রের গাড়িটার নিচে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল। সাহসী লেফ্‌টেন্যান্ট রোজেনক্রাঞ্জ ও আরও কয়েকজন তরুণ অফিসার জোব্বা বিছিয়ে তার উপর বসে একটা মদের আসর বসাবার আয়োজন করে ফেলল। চারদিকে নানা আকারের মদের বোতল সাজানো; গায়কদের দল মহা উৎসাহে অর্ধ-বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে "লেস্‌গিংকা"-র সুরে সুর মিলিয়ে একটা ককেসীয় নাচের গানের তালে নাচছে আর শিস দিচ্ছে :

"শামিল দিয়েছিল বিদ্রোহের ডাক
অনেক—অনেক কাল আগে।
ত্রি—রি, রা—তা—তি, ত্রি—বি—
অনেক—অনেক কাল আগে।"

এই সব অফিসারদের মধ্যে সেই তরুণ ধ্বজাবাহীও ছিল। সকালেই সে এসে দলে ভিড়েছে। সে খুব খোশ-মেজাজে আছে; তার চোখ চক্‌চক্ করছে, জিভে মাঝে মাঝে কথা ফস্কে যাচ্ছে; সকলকেই সে চুমো খেতে চাইছে আর বলছে সে তাদের কত ভালবাসে।...বেচারি ছেলেমানুষ! সে এখনও বুঝতে শেখেনি যে এ ধরনের ব্যবহারের ফলে সে ঠাট্টার পাত্র বনে যেতে পারে; তার এই দিলখোলা ভাব, সকলকে ভালবাসার এই চেষ্টা অন্য সকলকে তার প্রতি আকৃষ্ট না করে বরং তার প্রতি বিদ্রূপাত্মক করেই তুলবে। অবশ্য সে এটাও জানত না যে সে যখন জোব্বার উপর শুয়ে পড়ে দুই হাতে ভর রেখে তার ঘন কালো চুলের রাশি নাচাচ্ছিল তখন তাকে অত্যন্ত মনোহরণ লাগছিল।

দু'জন অফিসার একটা গাড়ির নিচে বসে একটা পিপেকেই তাসের টেবিল বানিয়ে "বোকা-বোকা" খেলছিল।

সাগ্রহে আমি সৈনিক ও অফিসারদের কথাবার্তা শুনছিলাম, মনোযোগ দিয়ে তাদের মুখের ভাব লক্ষ্য করছিলাম। কিন্তু আমার নিজের মধ্যে যে অস্বস্তি বোধ করছিলাম তার তিলমাত্রও তাদের কারও মধ্যে দেখতে পেলাম না। ঠাট্টা-তামাশা, হাসি, আর গাল-গল্প—সব কিছুর ভিতর দিয়েই ফুটে উঠেছে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে তাদের চিন্তাহীনতা ও উদাসীনতা। তাদের মধ্যে কেউ না কেউ যে এ পথ দিয়ে আর ফিরবে না সে কথাটা যেন কেউ ভাবছেই না।

৫

ধূলি-ধূসরিত ও শ্রান্ত হয়ে সন্ধ্যা সাতটায় আমরা "এন"—দুর্গের সুরক্ষিত ফটকের ভিতরে প্রবেশ করলাম। সূর্য অস্ত যাচ্ছে; তার তির্যক লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে দুর্গের সুসজ্জিত কামানশ্রেণীর উপর, বাগানের উঁচু পপলার-গাছের উপর, চাষ করা হলুদ ক্ষেতের উপর, আর সাদা মেঘের উপর। সাদা মেঘগুলো যেন বরফ-

ঢাকা পাহাড়গুলোকে নকল করেই নানা রকম আশ্চর্য সুন্দর আকার ধারণ করেছে। দিগন্তরেখায় নবোদিত বাঁকা চাঁদ এক খণ্ড স্বচ্ছ মেঘের মতো দেখাচ্ছে। দুর্গের কাছাকাছি একটি তাতার গ্রামে জনৈক তাতার কুঁড়েঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে সকলকে প্রার্থনায় যোগ দিতে ডাকছে। আমাদের গায়করাও নতুন উৎসাহে আবার গান শুরু করে দিলো।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে আমার পরিচিত জনৈক সহকারীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, সে যাতে আমার উদ্দেশ্যটা সেনাপতিকে জানায় সেই কথা বলতে। শহরের যে প্রান্তে আমি থাকতাম সেখান থেকে যাবার পথে "এন"-এর দুর্গে যা দেখলাম তা কখনও দেখতে পাব বলে আশা করিনি। চার-চাকার একটা সুন্দর "ভিক্টোরিয়া" গাড়ি আমাকে ধরে ফেলল। তার ভিতরে দেখতে পেলাম একটা কেতাদুরস্ত টুপি, আর শুনতে পেলাম ফরাসী ভাষার গুঞ্জন। সেনাপতির বাড়ির খোলা জানালা দিয়ে ভেসে এল পিয়ানোতে অত্যন্ত বেসুরে বাজানো কিছু "লিজাংকা" অথবা "কাতেংকা" পল্‌কা-নাচের সুর। একটা সরাইখানার পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম, কয়েকজন করণিক সিগারেট হাতে বীয়ারের গ্লাস নিয়ে বসে আছে; শুনতে পেলাম তাদেরই একজন আর একজনকে বলছে : "মাফ করবেন... কিন্তু রাজনীতির ব্যাপারে মারিয়া গ্রিগরেভ্‌নাই আমাদের প্রধানা নেত্রী।"

ন্যুব্জদেহ রুগ্ন চেহারার একটি ইহুদি ছেঁড়া কোট পরে একটা ভাঙা পিপে-বাদ্যযন্ত্র টেনে নিয়ে চলেছে আর সারা অঞ্চলটা তার "লুসিয়া" সুরের শব্দে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ঘাগরা-পরা, মাথায় রেশমী রুমাল-বাঁধা, উজ্জ্বল রঙের ছোট ছাতা হাতে দুটি স্ত্রীলোক কাঠের ফুটপাথ ধরে আমার পাশ দিয়ে যেন ভেসে চলে গেল। একটা নিচু ছোট বাড়ির সামনে দুটি মেয়ে খালি মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। একজনের পরনে লাল পোশাক, অপর জনের নীল। তারা উচ্চকণ্ঠে নকল হাসি হাসছে। স্পষ্টতই রাস্তা দিয়ে হেঁটে-যাওয়া অফিসারদের মনোযোগ আকর্ষণ করাই তাদের উদ্দেশ্য। নতুন কোট, সাদা দস্তানা ও ঝক্‌ঝকে স্কন্ধত্রাণ পরে অফিসাররা রাজপথ ও বীথিকা দিয়ে খোশ-মেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেনাপতির বাড়ির একতলাতেই আমার পরিচিত লোকটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সবে আমার বক্তব্য বুঝিয়ে বলেছি আর সেও জবাবে জানিয়েছে যে সে ব্যবস্থাটা সহজেই করা যেতে পারে, এমন সময় ফটকে যে সুন্দর গাড়িখানা দেখেছিলাম সেটা আমাদের জানালার পাশ দিয়ে ভিতরে ঢুকল। মেজরের স্কন্ধত্রাণসমন্বিত পদাতিক বাহিনীর পোশাকে সজ্জিত একটি দীর্ঘকায় সুগঠিতদেহ লোক গাড়ি থেকে নেমে সেনাপতির বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

উঠে দাঁড়িয়ে আমার পরিচিত সহকারীটি বলল, "মাফ করবেন, এখনই সেনাপতিকে খবর দিতে হবে।"

"কে এলেন?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"কাউন্টেস"; জবাবটা দিয়েই পোশাকের বোতাম এঁটে সে দৌড়ে দোতলায় উঠে গেল।

কয়েক মিনিট পরে একটি বেঁটে কিন্তু খুবই সুদর্শন পুরুষ স্কন্ধত্রাণবিহীন কোট পরে বোতামের ঘরে একটা সাদা ক্রুশ ঝুলিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। তার পিছনে এল মেজর, সহকারী ও আরও দু'জন অফিসার। গাড়িটা দেখে, কণ্ঠস্বর শুনে এবং প্রতিটি ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় যে সেনাপতিটি তার পদমর্যাদা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।

গাড়ির জানালায় হাত রেখে সে বলে উঠল, "মাদাম লা-কোঁতেস, বোঁ সয়ের (শুভ সন্ধ্যা)।"

কিড-চামড়ার দস্তানা-পরা একখানি হাত তার হাতটা চেপে ধরল; গাড়ির জানালায় দেখা দিল একখানি সুন্দর হাসি-মাখা মুখ।

কথা প্রসঙ্গে সেনাপতি কি যেন বলতেই গাড়ির মধ্যে খিল্‌খিল্‌ হাসির শব্দ হলো। তারপর বিদায় জানিয়ে সেনাপতি সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল, আর গাড়িটাও চলে গেল।

বাসায় ফিরবার পথে আমি ভাবতে লাগলাম, "এই আর একটি মানুষ একজন রুশ যা কামনা করে তার সব কিছুই যার আছে; মর্যাদা, অর্থ ও সম্মান—অথচ যে যুদ্ধের শেষ পরিণতি কি হবে তা শুধু ঈশ্বরই জানেন সেই যুদ্ধের প্রাক্কালে সেই লোকটিই একটি সুন্দরী নারীর সঙ্গে এমনভাবে হাসি-তামাশা করছে এবং পরের দিন তার সঙ্গে চা খাবে বলে কথা দিচ্ছে যেন একটা বল-নাচের আসরে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে!"

সহকারীর ওখানে আরও একটি লোকের সঙ্গে আমার দেখা হলো; সে আমাকে আরও অবাক করেছে। সে কে. রেজিমেন্টের একজন লেফ্‌টেন্যান্ট; যুবকটির আচরণে মেয়েলি ভীরুতা ও নম্রতার প্রকাশ আসন্ন যুদ্ধে তার সৈনাপত্য লাভের বিরুদ্ধে কিছু লোক ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে এই অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও উষ্মা প্রকাশের জন্যই সে আমার বন্ধুর কাছে এসেছে। সে বলল, এ ধরনের আচরণ অত্যন্ত বিরক্তিকর, সহকর্মীদের অনুপযুক্ত, এ কথা সে কোনওদিন ভুলবে না, ইত্যাদি। সাগ্রহে তার মুখের ভাব লক্ষ্য করে এবং তার সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে আমি না ভেবে পারলাম না যে, সির্কাসিয়ানদের গুলি করবার এবং নিজে তাদের গুলির সম্মুখীন হবার সুযোগ না পেয়ে সে সত্যি সত্যি মর্মাহত ও হতাশ হয়েছে। অকারণে চাবুক খাওয়া কোনও শিশুর মতোই সে আহত হয়েছে। ...এ সবের অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

৬

রাত দশটায় সৈন্যদের যাত্রা করবার কথা। সাড়ে আটটার সময় ঘোড়ায় চেপে আমি সেনাপতির বাড়িতে গেলাম। কিন্তু সেনাপতি ও সহকারী দু'জনেই তখন খুব

ব্যস্ত থাকবে ভেবে আমি রাস্তার উপরেই অপেক্ষা করতে লাগলাম। বেড়ার সঙ্গে ঘোড়াটাকে বেঁধে দেওয়ালের একটা বের-করা খাঁজের উপর বসে রইলাম। মনে ইচ্ছা, সেনাপতি ঘোড়ায় চেপে বের হলেই তাকে ধরে ফেলব। সূর্যের তাপ ও ঝলসানির বদলে এখন নেমে এসেছে রাতের শীতল প্রশান্তি। নক্ষত্রখচিত গাঢ় নীল আকাশের বুকে অর্ধবৃত্তাকার অস্পষ্ট আলো ছড়িয়ে বাঁকা চাঁদ অস্ত যাচ্ছে। বড় বাড়িগুলোর জানালায় এবং মাটির কুটিরগুলোর খড়খড়ির ফাঁকে ফাঁকে আলো জ্বলছে। চুনকাম-করা কুটিরগুলোর খড়ের ছাদের উপর চাঁদের আলো পড়েছে। তারই পশ্চাৎপটে দিগন্তরেখার উপর দাঁড়িয়ে থাকা বাগানের দীর্ঘ পপলার-শ্রেণীকে আরও লম্বা, আরও কালো দেখাচ্ছে। বাড়ি-ঘর, গাছপালা ও দেওয়ালের লম্বা ছায়াগুলি ঈষৎ-উজ্জ্বল ধুলোভর্তি রাস্তার উপর ছবির মতো ছড়িয়ে পড়েছে।.. নদীর ধারে ব্যাঙগুলো অবিশ্রাম ডেকে চলেছে; রাস্তার দ্রুত পায়ের শব্দ, কথাবার্তা ও ঘোড়ার পা ঠুকবার শব্দ কানে এল; শহরতলি থেকে পিপে-বাদ্যযন্ত্রের সুর ভেসে আসছে; প্রথমে "বাতাস বহে সুমন্দ" ও পরে "ঊষা-সঙ্গীত"।

আমার মনের কথা এখানে প্রকাশ করব না। প্রথমত, চারদিকে হাসি-গান ও আনন্দের ফোয়ারা ছাড়া আর কিছু না দেখতে পেয়ে আমার বুকের মধ্যে বিষাদের যে ছবি একের পর এক আঁকা পড়ছে সে কথা স্বীকার করতেও আমার লজ্জা বোধ করা উচিত; আর দ্বিতীয়ত, তার সঙ্গে আমার গল্পের কোনও সম্পর্ক নেই। নিজের চিন্তার মধ্যে আমি এতোই ডুবে গিয়েছিলাম যে কখন এগারোটার ঘণ্টা বেজে গেছে, কখন সেনাপতি সদলবলে আমার পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেছে, তা আমি খেয়ালই করিনি। সেনাদলের পিছনের অংশটাই তখন দুর্গের ফটকে পৌঁছে গেছে। কামান, বারুদের গাড়ি ও মালপত্রবাহী গাড়ির ভিড় ঠেলে, নির্দেশদানকারী অফিসারদের চিৎকার শুনতে শুনতে অনেক কষ্টে দুর্গের সেতুটা পার হলাম।

ফটক পেরিয়ে দুল্‌কি চালে চলতে চলতে অন্ধকারে ধীরগতিতে এগিয়ে চলা প্রায় এক ভার্স্ট লম্বা সেনাবাহিনীকে অতিক্রম করে আমি সেনাপতিকে ধরে ফেললাম। ভারী গোলন্দাজ বাহিনী ও অশ্বারোহী বাহিনীর দীর্ঘ সারি, এবং বন্দুকধারী সৈনিক, অফিসার ও অন্যান্যদের কোলাহলকে ছাপিয়ে একটা বেসুরো গম্ভীর ঐকতানের মতো ভেসে এল একটি জার্মানের কণ্ঠস্বর :

"খৃস্টবিরোধী, কামান দাগবার একটা মশাল দাও!" সঙ্গে সঙ্গে জনৈক সৈনিক বলল, "শেভ্‌চেংকো! লেফ্‌টেন্যান্ট একটা আলো চাইছেন!"

আকাশের অনেকটা জুড়ে গাঢ় ধূসর মেঘ জমেছে; তার ফাঁকে ফাঁকে এখানে-ওখানে তারাগুলি অস্পষ্টভাবে ঝিকমিক করছে। কালো পাহাড়গুলোর ওপারে দিগন্তে চাঁদ অস্ত গেছে; কিন্তু ডান দিকে এখনও চাঁদটা দেখা যাচ্ছে; তার ঈষৎ কাঁপা আলো পাহাড়ের চূড়ার উপর পড়েছে, অথচ পাহাড়ের পাদদেশ নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা। আবহাওয়া এখনও গরম; চারদিক এত চুপচাপ যে একটা ঘাসের ডগা বা একটুকরো

মেঘও যেন নড়ছে না। এত অন্ধকার যে হাতের কাছের জিনিসও ভাল দেখা যায় না। আমার মনে হলো রাস্তার পাশে যেন পাহাড়, জন্তু ও বিচিত্র চেহারার সব মানুষ দেখতে পেলাম; কিন্তু পরক্ষণেই তাদের খস্‌খস্‌ শব্দে ও তাদের গায়ে জমে থাকা তাজা শিশিরের গন্ধে বুঝতে পারলাম যে সেগুলো সবই ঝোপঝাড়। আমার সামনে দেখতে পেলাম, একটি জমাট-বাঁধা কালো বস্তু এগিয়ে চলেছে, আর তার পিছন পিছন চলেছে চলমান কালো কালো দাগ; আসলে ওটা সেনাপতি ও তার দলবল এবং তাদের অনুবর্তী অশ্বারোহী বাহিনী। আমাদের মাঝখানেও অনুরূপ একটা কালো বস্তু এগিয়ে চলেছে; এটা আগেরটার চাইতে নিচু; এটা পদাতিক বাহিনী। সর্বত্র এত পরিপূর্ণ স্তব্ধতা বিরাজ করছে যে রাতের সব রকম শব্দ একত্র মিলিত হয়ে একটা আশ্চর্য আকর্ষণ নিয়ে কানে বাজছে। শেয়ালদের বহুদূরবর্তী আর্ত চিৎকার, কখনও হতাশার আর্তনাদের মতো, কখনও বা মুচকি হাসির মতো, কাঠ-ফড়িং, ব্যাঙ ও ভারুই পাখির একঘেয়ে ডাক, দূর হতে ভেসে-আসা একটা অস্পষ্ট ধ্বনি, আর প্রকৃতির নিশাকালীন চলাফেরার যে সব শব্দের কোনও ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা দেওয়া যায় না—সব মিলিয়ে এমন একটা সুরেলা ঐকতানের সৃষ্টি হয়েছে যাকে আমরা বলি রাতের নৈঃশব্দ্য। সেই নৈঃশব্দ্য এখন বিঘ্নিত হচ্ছে, অথবা তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এই শ্লথ-গতি সেনাবাহিনীর একঘেয়ে অশ্বক্ষুরধ্বনি এবং তাদের পায়ের নিচেকার লম্বা ঘাসের খস্‌খস্‌ শব্দ।

মাঝে মাঝে সেনাবাহিনীর ভিতর থেকে ভারী কামানের গড়্‌গড়্‌ শব্দ, বেয়নেটের ঝন্‌ঝনানি, অস্পষ্ট কথাবার্তা, বা ঘোড়ার নাকের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

সমস্ত প্রকৃতি যেন শান্তিপ্রদ শক্তি ও সৌন্দর্যে ভরপুর।

এই নক্ষত্রখচিত সীমাহীন আকাশের নিচেকার এই সুন্দর পৃথিবীতে শান্তিতে বেঁচে থাকবার মতো যথেষ্ট জায়গা কি মানুষের নেই? এই মোহময়ী প্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্রোধ, প্রতিহিংসা, বা মানুষকে খুন করবার বাসনা মানুষের মনের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকে কেমন করে? যে প্রকৃতিতে সৌন্দর্য ও কল্যাণ এমন অকুণ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করে তার ছোঁয়ায় তো মানুষের মনের সব পাপ হাওয়ায় মিশিয়ে যাওয়া উচিত।

৭

দুই ঘণ্টার উপর আমরা পথ চলছি। আমার শীত-শীত করছে। ঘুমও পাচ্ছে। অন্ধকারে সেই অস্পষ্ট বস্তুগুলি আবার ভেসে উঠেছে। কিছুটা দূরে সেই একই অন্ধকারের দেয়াল; মাঝে মাঝে চলমান বিন্দু। আমার ঠিক পাশেই একটা সাদা ঘোড়ার পাছা দেখা যাচ্ছে; তার লেজটা দুলছে, পিছনের পা দুটো ফাঁক করে চলেছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি একটি কালো মূর্তি, পরনে সাদা সির্কাসিয়ান কোট, কালো খাপে একটা রাইফেল ও কারুকার্য-করা খাপে-ভরা পিস্তলের সাদা কুঁদোটা। সিগারেটের

আলোয় দেখা যাচ্ছে শনের মতো একজোড়া গোঁফ, একটা বীভার কলার ও চামড়ার দস্তানায় ঢাকা একটা হাত।

চোখ বুজে ঘোড়ার পিঠেব উপরই ঝুঁকে বসেছিলাম; কয়েক মিনিটের জন্য নিজেকে বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিলাম; হঠাৎ সেই একই পরিচিত খস্‌খস্‌ শব্দ ও পায়ের খট্‌খট্‌ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। চারদিকে তাকিয়ে মনে হলো যে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি আর সামনেকার কালো দেওয়ালটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে, অথবা দেয়ালটাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে আর আমিই এক মুহূর্তের মধ্যে তার উপর গিয়ে পড়ব। এইরকম একটা হঠাৎ জেগে ওঠার মুহূর্তে সেই অজ্ঞাত অবিশ্রান্ত গুঞ্জন-ধ্বনি যেন কাছে আসতে আসতে একসময় খুবই জোরে কানে এসে লাগল; সেটা জলের শব্দ। আমরা একটা গভীব গিরি-নালায় প্রবেশ করেছি, কাছেই একটা পাহাড়ী নদী তীর ছাপিয়ে বয়ে চলেছে। শব্দটা ক্রমেই বাড়তে লাগল, ভেজা ঘাস ক্রমেই ঘন ও লম্বা হতে লাগল, ঝোপগুলো ক্রমেই কাছে এগিয়ে এল, দিগন্তরেখাটা নিকটতর হলো। পাহাড়গুলোর কালো পশ্চাৎপটের উপর এখানে-ওখানে আগুন জ্বলছে, আবার পরমুহূর্তেই নিভে যাচ্ছে।

আমাব পাশেই যে তাতারটি ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল তাকে ফিস্‌ফিস্‌ করে জিজ্ঞাসা কবলাম, "দয়া কবে বলো তো ওই আলোগুলো কিসের?"

"সে কি, আপনি জানেন না?" সে জবাব দিলো।

"না, আমি জানি না।"

ভাঙা ভাঙা রুশ ভাষায় সে বলল, "পাহাড়ী লোকেরা একটা লাঠিতে খড় বেঁধে আগুনটাকে ঘোরাচ্ছে।"

"কি জন্য?"

"যাতে সকলেই জানতে পারে যে রুশরা আসছে।" সে হেসে আবও বলল, "সাবা গাঁয়ে এবার আই-আই শুরু হয়ে যাবে, একটা হৈ-চৈ পড়ে যাবে; সকলেই যার যার জিনিসপত্র নিয়ে লুকিয়ে পড়বে।"

"সে কি! পাহাড়ী লোকেবা কি এরই মধ্যে জেনে ফেলেছে যে সৈন্যরা আসছে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"আই! আই! নিশ্চয় জানে। ওবা সব সময়ই জানতে পারে। আমাদেব লোকগুলোই ওই রকম।"

"তাহলে কি শামিল-ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে?" আমি জিজ্ঞাসা কবলাম।

মাথা নেড়ে সে জবাব দিলো, "না, শামিল যুদ্ধ করতে বেরিয়ে আসবে না। শামিল তার সাকরেদদেব পাঠাবে আর উপর থেকে একটা নলের ভিতর দিয়ে সব কিছু দেখবে।"

"সে কি অনেক দূরে থাকে?"

"না, খুব দূরে নয়। ওই দূবে বাঁ দিকে, দশ ভার্স্ট দূরে।"

"তুমি কেমন করে জানলে?" আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। "তুমি কি কখনও সেখানে গিয়েছ?"

"তা গিয়েছি। আমরা সকলেই তো পাহাড়ে ছিলাম।"

"তুমি কি শামিলকে দেখেছ?"

"পিচ্। শামিলকে চোখে দেখা যায় না। একশ', তিনশ', হাজার রক্ষী তাকে ঘিরে থাকে। শামিল থাকে মাঝখানে!" দাসসুলভ প্রশংসার সুরে সে বলল।

আকাশের দিকে তাকালাম। বেশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। পূর্বদিকে একটা আলোর আভাস চোখে পড়ছে। দিগন্তে সপ্তর্ষি অস্ত যাচ্ছে। কিন্তু যে গিরি-খাত ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি সেটা স্যাঁতসেঁতে ও অন্ধকার।

হঠাৎ আমাদের একটু সামনেই কয়েকটি আলোর ফুল্‌কি ঝিলিক দিয়ে উঠল, আর সেই মুহূর্তে কয়েকটা গুলি শাঁ করে আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। চারদিকে রাতের নিস্তব্ধতা। গুলির শব্দ অনেক দূর থেকে আমাদের কানে এল, কানে এল কান-ফাটানো চিৎকার। ওরা শত্রুপক্ষের অগ্রবর্তী দল। সেই তাতাররা হৈ-হৈ করতে করতে বেপরোয়াভাবে গুলি চালাতে চালাতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

সব চুপচাপ। সেনাপতি দোভাষীকে ডাকল। সাদা সির্কাসিয়ান কোট-পরা তাতারটি ঘোড়া চালিয়ে তার কাছে হাজির হয়ে নানা রকম অঙ্গভঙ্গি সহকারে ফিসফিস করে অনেকক্ষণ ধরে কি যেন বোঝাতে লাগল।

তখন সেনাপতি শান্ত, একটানা, কিন্তু স্পষ্ট গলায় বলল, "কর্নেল হাসানভ হুকুম জারি করুন, স্কাউটরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়ুক।"

সৈন্যদলটি নদীতে পৌঁছে গেল। গিরি-খাতের পাহাড়গুলি পিছনে পড়ে রইল। আলো ফুটতে শুরু করল। মনে হচ্ছে, আকাশটা অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। তার বুকে ম্লান, অস্পষ্ট তারাগুলি আর ভাল করে চোখে পড়ছে না। পুবের আকাশে ভোরের প্রথম রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়ছে। পশ্চিম থেকে একটা নতুন ঠাণ্ডা বাতাস উঠে এসেছে। কলমুখর নদীর উপরে একটা ঝিকিমিকি কুয়াশা বাষ্পের মতো ছড়িয়ে পড়েছে।

৮

পথ-প্রদর্শক নালাটা দেখিয়ে দিলো। অগ্রগামী অশ্বারোহী বাহিনী এবং সেনাপতি ও তার দলবল সেই পথে চলতে লাগল। নালার জল ঘোড়াগুলোর বুক-সমান উঠে এল। জলের নিচে যে সাদা পাথরগুলো দেখা যাচ্ছে তার ভিতর দিয়ে তীব্রবেগে জলস্রোত বয়ে চলেছে। ফলে ঘোড়াগুলোর পায়ের চারদিকে ফেনায়িত স্রোতের ঘূর্ণি সৃষ্টি হচ্ছে। স্রোতের সেই শব্দে সচকিত ঘোড়াগুলো মাথা তুলে কান খাড়া করে অসমান গিরি-খাত ধরে স্রোতের বিরুদ্ধে এগিয়ে চলেছে। অশ্বারোহীরা পা তুলে বন্দুকগুলোও তুলে ধরে আছে। পদাতিক বাহিনীর পরনে শার্ট ছাড়া বিশেষ কিছু

নেই; গাদা বন্দুকের মাথায় তাদের জামা-কাপড় ও থলে ঝুলিয়ে সেটাকে জলের উপর তুলে ধরে তারা এগোচ্ছে। লোকজনরা কুড়িজন করে হাতে হাত ধরে সার বেঁধে অনেক কষ্টে সেই স্রোতের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। গোলন্দাজ সৈনিকরা চিৎকার করতে করতে ঘোড়াগুলোকে জোর কদমে জলের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কামানগুলোর উপর দিয়ে মাঝে মাঝে জলের স্রোত বয়ে গেলেও সেগুলি নিচেকার পাথরের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলতে লাগল। আর কর্মঠ কসাক ঘোড়াগুলো জলে ফেনা ফুটিয়ে সব কিছু টেনে নিয়ে এগিয়ে চলল। তারপর একসময় ভিজে লেজ ও লোম নিয়ে নালার ওপারে উঠল।

নালাটা পার হওয়ামাত্রই সেনাপতির মুখখানা সহসা গম্ভীর ও চিন্তিত হয়ে উঠল। ঘোড়ার মুখটা ঘুরিয়ে সে অশ্বারোহী বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে সম্মুখে প্রসারিত জঙ্গলের ভিতরকার খোলা পথ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। কসাক অশ্বারোহী স্কাউটরা বনের প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। সির্কাসিয়ান কোট ও টুপি পরা একজন পদযাত্রীকে আমরা জঙ্গলের মধ্যে দেখতে পেলাম; তারপর আর একজন...ও তৃতীয় জন। আর একজন অফিসার বলল, "ওই তো তাতাররা।" তারপর গাছের আড়ালে খানিকটা ধোঁয়া দেখা গেল.. একটা গুলি...আরও একটা। আমাদের গোলাগুলির শব্দে শত্রুপক্ষের গুলির শব্দ ঢেকে গেল। শুধু মাঝে মাঝে দু'একটা গুলি মৌমাছির গুঞ্জনের মতো শব্দ করে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়াতেই বুঝতে পারছিলাম যে গুলিটা শুধু আমাদের দিক থেকেই চালানো হচ্ছে না। তারপর পদাতিক বাহিনী দৌড়ে এবং গোলন্দাজ বাহিনী জোর কদমে স্কাউটদের লাইনকে ভেদ করে এগিয়ে গেল। কামানের গম্ভীর গম্ভীর শব্দ, কার্তুজের ক্লিক-ক্লিক ধাতব শব্দ, ছুটন্ত গোলার শাঁ-শাঁ ও বন্দুকের ফট্-ফট্ শব্দ কানে আসতে লাগল। খোলা জায়গাটার চারদিকেই অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনী চোখে পড়তে লাগল। কামান ও বন্দুকের ধোঁয়া জঙ্গলের সবুজের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে কুয়াশার সঙ্গে মিলিয়ে গেল। কর্নেল হাসানভ্ ঘোড়া ছুটিয়ে সেনাপতির কাছে হাজির হয়ে হঠাৎ ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল।

সির্কাসিয়ান টুপিতে হাত রেখে সে বলল, "ইয়োর এক্সেলেন্সি, অশ্বারোহী বাহিনীকে আক্রমণ করবার হুকুম দিন; ওই নিশান দেখা যাচ্ছে।" সে চাবুক বাড়িয়ে কয়েকজন অশ্বারোহী তাতারকে দেখালো; তাদের আগে আগে দুটি লোক লাঠির সঙ্গে লাল-নীল কম্বল বেঁধে ঘোড়ায় চেপে চলেছে।

সেনাপতি বলল, "ঠিক আছে আইভান মিখাইলোভিচ।"

সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে তলোয়ার শূন্যে দোলাতে দোলাতে চিৎকার করে বলল,

"হুর্‌রা।"

"হুর্‌রা। হুর্‌রা! হুর্‌রা!" সৈন্যরা সমস্বরে বলে উঠল। তার পিছনে ছুটে চলল অশ্বারোহী বাহিনী।

সকলেই সাগ্রহে তাকালো; প্রথমে একটা নিশান, তারপর আর একটা, তৃতীয়টা, চতুর্থটা...।

শত্রুপক্ষে আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করল না। বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে তারা গুলি চালাতে লাগল।

সেনাপতি ও মেজরের মধ্যে রণ-কৌশল নিয়ে কিছু কথাবার্তা হলো। সেনাপতি কি একটা কথা বলে হেসে উঠল। মেজর অভিবাদন জানাল।

ঠিক সেই মুহূর্তে অপ্রীতিকর দ্রুত হিস্-হিস্ শব্দে শত্রুপক্ষের একটা গোলা আমাদের পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে কাকে যেন আঘাত করল। পিছন থেকে কোনও আহতের আর্তনাদ শোনা গেল। সেই আর্তনাদ আমাকে এমনভাবে বিচলিত করে তুলল যে এই চমৎকার যুদ্ধ-দৃশ্যের সব আকর্ষণ মুহূর্তের মধ্যে আমার মন থেকে মুছে গেল; কিন্তু মনে হলো শুধু আমি ছাড়া আর কেউই এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করেনি। মেজর মনের সুখে হো-হো করে হাসছে। আর একজন অফিসার শান্তভাবে তার মুখের কথাটি শেষ করল। সেনাপতি উল্টো দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত হাসির সঙ্গে ফরাসী ভাষায় কি যেন বলল।

জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে সেনাপতির কাছে এসে গোলন্দাজ বাহিনীর অধিকর্তা জিজ্ঞাসা করল, "ওদের গুলির জবাব কি আমরা দেব?"

"হ্যাঁ! ওদের একটু ভয় দেখিয়ে দিন." একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে একান্ত উদাসীনভাবে সেনাপতি সম্মতি দিলো।

শ্রেণীবদ্ধভাবে কামান সাজিয়ে শুরু হলো গোলাবর্ষণ। সে শব্দে পৃথিবী আর্তনাদ করে উঠল। অবিশ্রাম আলোর ঝলকানি ও ধোঁয়া। তার ভিতর দিয়ে গোলন্দাজদের চেহারা ভাল করে দেখাও যায় না। চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

তাতার গ্রামের উপরেও গোলাগুলি চলতে লাগল। কর্নেল হাসানভ্ আবার সেনাপতির কাছে ছুটে এল এবং তার নির্দেশমতো গ্রামের দিকে ছুটে গেল। আর একবার রণ-হুংকার উঠল; ধুলোর ঝড়ের মধ্যে অশ্বারোহী বাহিনী অদৃশ্য হয়ে গেল।

দৃশ্যটি চমৎকার। কিন্তু এতে আমার কোনও ভূমিকা নেই। এ ধরনের দৃশ্য দেখতে আমি অভ্যস্তও নই। তাই একটা অনুভূতি আমার মনোভাবকে নষ্ট করে দিলো; এই গতি, এই উত্তেজনা, এই চিৎকার—সবই আমার কাছে কেমন যেন অনাবশ্যক মনে হতে লাগল। একটা লোক যেন কুড়ুল বাগিয়ে ফাঁকা বাতাসে কোপ বসাচ্ছে—এমনি একটা চিন্তাকে কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারলাম না।

৯

আমাদের সৈন্যরা তাতার গ্রামটি দখল করে নিলো; সেনাপতি যখন সদলবলে—সে দলে আমিও ছিলাম—সে গ্রামে প্রবেশ করল তখন শত্রুপক্ষের একটি লোকও সেখানে ছিলো না। উঁচু-নিচু পাহাড়ের চূড়ায় পরিচ্ছন্ন কুটিরের সারি তৈরি করা

হয়েছে; উপরে সমতল মাটির ছাদ আর সুদৃশ্য চিমনি; পাহাড়গুলোর ফাঁকে ফাঁকে একটা ছোট নদী বয়ে চলেছে। একদিকে সব সবুজ বাগান; উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় আলোকিত। সেখানে বড় বড় ন্যাসপাতি ও কুলের গাছ। অপর দিকে অদ্ভুত সব ছায়া পড়েছে—কবরখানার লম্বা, খাড়া পাথর আর উঁচু কাঠের খুঁটি,—তার মাথায় গোলক ও নানা রঙের নিশান বাঁধা (এইগুলিই "জিগিৎ"দের কবর।)।

ফটকের পাশে সৈন্যরা সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। মিনিটখানেকের মধ্যেই অশ্বারোহী, কসাক ও পদাতিক বাহিনীর লোকরা মনের আনন্দে গ্রামের অলিতে-গলিতে ঢুকে পড়ল; শূন্য গ্রামটা মুহূর্তের মধ্যে আবার যেন জীবন ফিরে পেল! এখানে একটা ছাদ ভেঙে ফেলা হলো; শক্ত কাঠের উপর কুড়ুল মারবার শব্দ কানে এল; একটা দরজা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল; আর এক জায়গায় একটা খড়ের গাদা পুড়ছে, একটা বেড়া ও কুটির জ্বলছে; পরিষ্কাব বাতাসে ঘন মেঘের মতো ধোঁয়া উঠছে। এখানে জনৈক কসাক এক বস্তা ময়দা ও একটা কম্বল টেনে নিয়ে চলেছে। একজন সৈনিক হাসতে হাসতে একটা টিনের কড়াই ও একটা কম্বল কুটিরের ভিতর থেকে টেনে বার করছে; আর একজন চেষ্টা করছে হাত বাড়িয়ে দুটো মুরগিকে ধরতে; মুরগি দুটো কক্-কক্ করে ডাকতে ডাকতে দেয়ালের গায়ে পাখা ঝাপ্‌টাচ্ছে; আরও একজন খুঁজে-পেতে পেয়েছে একটা বড় দুধের পাত্র; খানিকটা দুধ চুমুক দিয়ে খেয়ে সে হাসতে হাসতে বাকিটা মাটিতে ঢেলে দিলো।

যে বাহিনীটির সঙ্গে আমি এন—দুর্গ থেকে এসেছিলাম সেটাও ওই গ্রামেই ছিল। একটা কুটিরের ছাদে বসে ক্যাপ্টেন একটা ছোট পাইপ থেকে এমন স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে "সাম্বোতালিক" তামাকে ঘন ধোঁয়া ছাড়ছিল যে তাকে দেখে আমি ভুলেই গেলাম যে আমি একটা শত্রুপক্ষের গ্রামে আছি; মনে হলো যেন আমার বাড়িতেই আরামে আছি।

আমাকে দেখে সে বলল, "আরে, আপনি এখানেও হাজির!"

লেফ্‌টেন্যান্ট রোজেন্‌ক্রাঞ্জ-এর দীর্ঘ দেহটা সারা গ্রামময় ছুটে বেড়াতে লাগল। অনবরত নানারকম নির্দেশ দিয়ে চলেছে; দেখে মনে হচ্ছে সে যেন কোনও কিছু নিয়ে বিব্রত। একসময় দেখলাম, বিজয়গর্বে সে একটা কুটির থেকে বেরিয়ে এল; পিছনে দু'জন সৈনিক হাত-বাঁধা অবস্থায় একটা বুড়ো তাতারকে ধরে নিয়ে চলেছে। বুড়ো মানুষটির পরনে একটা ছেঁড়া রঙিন জামা আর শতচ্ছিন্ন ব্রীচেস; শরীরটা এতই কুঁজো যে পিছ-মোড়া দিয়ে কষে বাঁধা হাড়-বের-করা হাত দুটো যেন কাঁধ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে; খালি পা দুটো বুঝি আর চলতেও পারছে না। তার মুখ ও কামানো মাথার কিছুটা অংশ বলি-রেখায় ভর্তি। দাঁতহীন বিকৃত মুখটা ছোট করে ছাঁটা ধূসর গোঁফ-দাড়ির জঙ্গলের ভিতর থেকেও অনবরত নড়ছে; যেন কিছু চিবিয়ে চলেছে; কিন্তু তার লোমহীন চোখের পাতার নিচে দুটি লাল চোখে এখনও যেন আগুন জ্বলছে; পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে জীবনের প্রতি বুড়ো মানুষটির কী তীব্র ঘৃণা!

দো-ভাষীর সাহায্যে রোজেন্‌ক্রাঞ্জ তাকে জিজ্ঞাসা করল, অন্যদের সঙ্গে সেও চলে যায়নি কেন।

শান্তভাবে চারদিকে তাকিয়ে সে বলল, "কোথায় যাব?"

"যেখানে আর সকলে গেছে," কে যেন জবাব দিলো।

"জিগিৎ-রা গেছে রুশদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে, কিন্তু আমি তো বুড়ো।"

"সে কি? তুমি কি রুশদের ভয় করো না?"

চারদিকে ঘিরে-আসা লোকগুলির দিকে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে আবাব বলল, "রুশরা আমার কী করবে? আমি তো বুড়ো মানুষ।"

ফিরবার পথে সেই বুড়ো মানুষটিকে আবাব দেখেছিলাম। মাথায় টুপি নেই, হাত দুটি বাঁধা, সেনাদলের জনৈক কসাকের জিনেব টানে ঝাঁকুনি খেতে খেতে চলেছে; চোখে-মুখে সেই একই উদাসীনতার আভাস। বন্দী-বিনিময়ের সুবিধার জন্যই তাকে প্রয়োজন।

ছাদে উঠে ক্যাপ্টেনেব পাশে বসে পড়লাম।

এইমাত্র যা ঘটে গেল সে সম্পর্কে তাব মতামত জানবাব জন্য বললাম, "মনে তো হচ্ছে শত্রুপক্ষের কেউ এখানে নেই।"

"শত্রু?" সে অবাক বিস্ময়ে বলে উঠল। "আবে, শত্রু তো কেউ ছিল না। এদের কি আপনি শত্রু বলেন? সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, দেখুন আমরা কেমন করে এখান থেকে যাই। দেখবেন, ওরাই আমাদের পথ দেখিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেবে; দেখবেন, তারা কেমন ডিগবাজি খায়।" মুখের পাইপটা বাড়িয়ে সেই ঝোপ-ঝাড়গুলো সে দেখালো যেগুলি আমবা সকালে পার হয়ে এসেছি।

"ওটা কি?" ক্যাপ্টেনের কথায় বাধা দিয়ে অস্বস্তির সঙ্গে আমি জিজ্ঞাসা কবলাম। আমাদের এখান থেকে খানিকটা দূবে ডন কসাকদের একটা ছোট জটলাকে দেখিয়েই প্রশ্নটা আমি করলাম।

জটলার ভিতর থেকে একটা শিশুর কান্নার মতো শব্দ এবং এই কথাগুলি আমাদের কানে এল ঃ

"ছুরি মেরো না! থামো...ওবা আমাদেব দেখে ফেলবে. .তোমার কাছে কি ছুরি আছে এভ্‌স্টিগ্‌নীচ? ছুরিটা আমাদের দাও।"

"ওরা কিছু ভাগাভাগি করছে, বদমাশের দল।" ক্যাপ্টেন ঠাণ্ডা গলায় বলল।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে সেই সুন্দর ধ্বজাবাহী সৈনিকটি মুখ লাল করে এক দৌড়ে মোড় ঘুরে হাত নাড়তে নাড়তে কসাকদের দিকে ছুটে গেল।

ছেলেমানুষী গলায সে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "এটাকে ছুঁয়ো না! এটাকে মেবো না!"

একজন অফিসারকে দেখে কসাকরা সবে দাঁড়িয়ে ছোট ছাগলছানাটাকে ছেড়ে দিলো। তরুণ ধ্বজাবাহী একেবারেই অপ্রস্তুত হয়ে বিড়্ বিড়্ করে কি যেন বলতে বলতে লজ্জিত মুখে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

ক্যাপ্টেন ও [illegible] ছাদের ওপর দেখতে পেয়ে তার মুখ লজ্জায় [illegible] হয়ে উঠল। হাত [illegible] দৌড়ে সে আমাদের কাছে এল।

লরেন্স কৌতুকে হেসে বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম ওরা এবার [illegible] করতে যাচ্ছে।'

১০

ভোরবেলায় বাহিনীর [illegible] সেনাপতি চলেছে [illegible] সেনাদলের সঙ্গে আমি এবং [illegible] এসেছিলাম [illegible] সকলের [illegible]। ক্যাপ্টেন [illegible] ও [illegible] সেনাদল নিয়ে চলেছে একসঙ্গে।

ক্যাপ্টেনের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ সত্য প্রমাণিত হলো। [illegible] কথা [illegible] পৌঁছবার পর [illegible] দুই [illegible] আমরা [illegible] দেখতে পেলাম। [illegible] চাই [illegible] এবং [illegible] পাচ্ছি [illegible] বন্দুক [illegible] এক [illegible] ছোটাছুটি করছে [illegible] ক্যাপ্টেন [illegible] বলতে [illegible] আমরা [illegible] পেলাম। [illegible] চেঁচিয়ে বলছে [illegible] আর [illegible] থেকে [illegible] দুদিক [illegible] নিয়ে [illegible] তার [illegible] থেকে [illegible] [illegible] ফিরে [illegible] ডাকছে [illegible] আমাদের [illegible] ভর্তি। — এই সব

[illegible] দিয়ে [illegible] ছুটবার [illegible] দুর্বল হয়ে পড়ে। [illegible] এবং [illegible] [illegible] চিৎকার, হৈচৈ [illegible] বাড়তে [illegible]।

গ্রাম [illegible] দেখতে [illegible] আমাদের [illegible] উপর দিয়ে সশব্দে ছুটে যেতে লাগল। দেখলাম একটা [illegible] লেগে একজন সৈনিক [illegible] পেল [illegible] আমি [illegible] দূরে [illegible] অনেক কিছু দিতে বাকী তখন সে দুঃখময় দৃশ্যের বিবরণ দিয়ে [illegible]।

[illegible] সৈন্যদের [illegible] নিয়োগ বন্দুক [illegible] গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। [illegible] জোরে সে চুপ করে [illegible] গলায় সৈন্যদের উৎসাহ দিচ্ছে [illegible] ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে সেনাবাহিনীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। এখন তাকে কিছুটা ম্লান দেখাচ্ছে, কিন্তু তার সামরিক চেহারার সঙ্গে সেটা বেশ মানিয়ে গেছে।

সুদর্শন ধ্বজাবাহী খুশিতে ডগমগ, তার সুন্দর কালো চোখ দুটি সাহসে জ্বলছে,

ঠোঁটে সামান্য হাসি, বার বার সে ঘোড়া ছুটিয়ে ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে জঙ্গলের ভিতর ছুটে যাবার অনুমতি চেয়ে নিচ্ছে।

বেশ জোরের সঙ্গে সে বলল, "আমরা ওদের হটিয়ে দেব; নিশ্চয় দেব।"

ক্যাপ্টেন সংক্ষেপে জবাব দিলো. "কোনও দরকার নেই; আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে।"

ক্যাপ্টেনের সেনাদল বনের প্রান্তে ঘাঁটি গেড়ে শুয়ে পড়ে গুলি চালিয়ে শত্রুপক্ষকে দূরে সরিয়ে রাখছে। ময়লা কোট ও ভেজা টুপি মাথায ক্যাপ্টেন তাব সাদা ঘোড়ার রাশে ঢিল দিয়ে চুপ করে বসে আছে; রেকাব ছোট হওযায তাকে হাঁটু ভেঙে বসতে হয়েছে। (সৈন্যরা তাদের কাজ ভালই জানে, আর সেইভাবে কাজও চালাচ্ছে, কাজেই কোনওরকম নির্দেশের প্রয়োজন নেই)। শুধু মাঝে মাঝে গলা ছেড়ে সৈন্যদের হাঁক-ডাক করছে। ক্যাপ্টেনের উপস্থিতিব সাময়িক গুরুত্ব কিছু ছিলো না: কিন্তু তার ঐকান্তিকতা ও সরলতা আমার মনেব উপব অসাধারণ প্রভাব বিস্তাব করল।

"এই তো সত্যিকারেব সাহস", স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কথাটাই আমার মনে উদয হলো।

তাকে সর্বদা যেমনটি দেখেছি ঠিক তেমনই আছে; সেই শান্ত চলাফেরা, সেই শান্ত কণ্ঠস্বর. মুখের সেই অকপট খোলা ভাব; শুধু তাব দৃষ্টিব অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতাব মধ্যে চোখে পড়ে স্বীয় কর্তব্যের মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবে যাওয়ার একান্ত প্রয়াস। "সর্বদা একই রকম" কথাটা বলা কত সহজ, কিন্তু অন্যের মধ্যে নানা সময়ে কত পার্থক্যই না চোখে পড়ে; কেউ চায় স্বাভাবিক অবস্থার চাইতে নিজেকে বেশি প্রশান্ত দেখাতে, কেউ বা চায় দেখাতে কঠোবতা; আবার তৃতীযজন হযতো নিজেকে বেশি প্রফুল্ল দেখাতে চায়: কিন্তু ক্যাপ্টেনের মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, নিজেকে অন্য কোনওরকম দেখাবার চেষ্টা যে লোকে কেন করে তা সে জানেই না।

যে ফরাসী লোকটি ওয়ার্টালুর রণক্ষেত্রে বলেছিল, "La garde meurt, mais ne se rend pas" এবং অন্য সব বীররা, বিশেষ করে ফরাসী মহাবীর যারা স্মরণীয় উক্তি করে গেছে, তারা সকলেই সাহসী, আর তাদের উক্তিগুলোও মনে রাখবার মতো। কিন্তু তাদের সাহসিকতা আর এই ক্যাপ্টেনের সাহসিকতার মধ্যে তফাৎ আছে। যে কোনও অবস্থায় আমার এই বীরের অন্তরে যদি কোনও মহৎ বাণী জেগে ওঠে তাহলেও আমার স্থির বিশ্বাস যে সে-বাণী সে উচ্চারণ করবে না; প্রথমত, সে ভয় পাবে যে ঐ মহৎ বাণী উচ্চারণ করতে গিয়ে সে তার মহৎ কাজটিকে নষ্ট করে ফেলবে; আর দ্বিতীয়ত, কোনও লোক যখন বুঝতে পারে যে একটি মহৎ কাজ করবার মতো শক্তি তার আছে তখন কোনও বাণীরই প্রয়োজন হয় না। আমার মতে এই হলো রুশ সাহসিকতার মহৎ ও বিশেষ লক্ষণ; তা যদি সত্য হয় তাহলে একজন রুশ যখন শুনতে পায় যে আমাদেরই তরুণ অফিসাররা অপ্রচলিত ফরাসী বীরত্বের

অনুকরণে গতানুগতিক ফরাসী বয়েৎ উচ্চারণ করছে তখন কি সে অন্তরে যন্ত্রণা অনুভব না করে পারে?

হঠাৎ ধ্বজাবাহী সুদর্শন অফিসারটি যেদিকে দাঁড়িয়েছিল সেই দিক থেকে একটা ধ্বনি উঠল "হুররা!" শব্দ লক্ষ্য করে তাকিয়ে দেখলাম, প্রায় ত্রিশটি সৈন্য হাতে বন্দুক নিয়ে আর পিঠে থলে চাপিয়ে চষা ক্ষেতের ভিতর দিয়ে ছুটে আসছে। তাদের পা হড়কে যাচ্ছে, তবু তারা চিৎকার করতে করতে এগুচ্ছে। তরুণ ধ্বজাবাহী অফিসারটি তলোয়ার উঁচিয়ে ঘোড়াসুদ্ধু তাদের সামনে লাফিয়ে পড়ল।

সকলেই জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কয়েক মিনিট ধরে হৈ-চৈ ও বন্দুকের গুলি চলবার পরে একটি ভয়ার্ত ঘোড়া ছুটে বেরিয়ে এল, আর নিহত ও আহতদের বয়ে নিয়ে জঙ্গলের প্রান্তে দেখা দিলো একদল সৈন্য; আহতদের মধ্যে রয়েছে তরুণ ধ্বজাবাহী অফিসার। দুটি সৈন্য বগলের নিচে হাত রেখে তাকে তুলে ধরেছে। সে যেন রুমালের মতো সাদা হয়ে গেছে; তার ছোট্ট সুন্দর মুখখানিতে মুহূর্তকাল আগে দেখা সামরিক উল্লাসের একটা ক্ষীণ ছায়া তখনও লেগে রয়েছে; দুটি কাঁধের ভিতর দিয়ে মাথাটা বুকের উপর ঝুলে পড়েছে। বুক-খোলা কোটের নিচে সাদা শার্টের উপর একটা লাল দাগ দেখা যাচ্ছে।

এই করুণ দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে আমি বলে উঠলাম, "আঃ! কী দুঃখের কথা!"

একজন বুড়ো সৈনিক বিষণ্ণ মুখে বন্দুকের উপর ভর দিয়ে আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, "সত্যি খুব দুঃখের।" তারপর আহত যুবকটির দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে বলল, "কোনও কিছুকেই তিনি ভয় করতেন না, এ কাজ যে লোকে কেমন করে পারে? আহা, এখনও যে সে যুবক বোকাই আছে আর সেই জন্যই এ মূল্য তাকে দিতে হলো।"

"সেকি? আপনি কি ভয় পেয়েছেন?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"নিশ্চয়।"

১১

চারজন সৈনিক ধ্বজাবাহী অফিসারকে স্ট্রেচারে করে বয়ে নিয়ে চলেছে। তাদের পিছনে চলেছে দুর্গের একটি সৈনিক; অস্ত্রোপচারের জিনিসপত্র ভর্তি দুটো সবুজ বাক্স পিঠে নিয়ে একটি পরিশ্রান্ত ঘোড়া চলেছে তাদের সঙ্গে। তারা ডাক্তারের প্রতীক্ষা করছে। অফিসাররা ঘোড়ায় চেপে স্ট্রেচারের কাছে এসে আহত যুবকটিকে উৎসাহ ও সান্ত্বনা দিতে লাগল।

তার কাছে এসে লেফ্‌টেন্যান্ট রোজেনক্রাঞ্জ হেসে বলল, "আরে ভাই আলানিন, আর বেশি দেরি নেই, একটু পরেই আবার আমরা নাচের আসরে নেমে পড়ব।"

সে হয়তো আশা করেছিল যে এই কথাগুলি শুনে ধ্বজাবাহী অফিসার মনে সাহস

পাবে; কিন্তু তার মুখের ঠাণ্ডা, বিষণ্ণ ভাব দেখেই বোঝা গেল যে ঐ কথায় আশানুরূপ কোনও ফল হয়নি।

ক্যাপ্টেনও তার কাছে এগিয়ে গেল। সে সাগ্রহে আহত ছেলেটিকে দেখতে লাগল। সাধারণত তার মুখ ভাবলেশহীনই থাকে, কিন্তু এখন সেখানেও ফুটে উঠেছে সত্যিকারের সহানুভূতি।

"প্রিয় আনাতোল আইভানভিচ, মনে হচ্ছে এটা ঈশ্বরেরই ইচ্ছা।" এমন সাদর মমতায় সে কথাগুলি বলল যেটা আমি তার কাছ থেকে আশা করিনি।

আহত ছেলেটি চারদিকে তাকাল, তার বিবর্ণ মুখে দুঃখের হাসি ফুটে উঠল।

"হ্যাঁ; আপনার কথা আমি শুনিনি।"

"তার চাইতে বলো এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা", ক্যাপ্টেন আবার কথাটা বলল।

ডাক্তার এসে পড়ল। সহকারীর কাছ থেকে কিছু ব্যান্ডেজ, একটা শলাকা ও অন্য টুকিটাকি জিনিস নিয়ে হাতের আস্তিন গুটিয়ে মুখে উৎসাহব্যঞ্জক হাসি হেসে রোগীর দিকে এগিয়ে গেল।

নিস্পৃহ গলায় তামাশার ভঙ্গিতে সে বলল, "দেখি, মনে হচ্ছে একটা সুস্থ স্থানে তারা একটা ছোট গর্ত করে দিয়েছে। দেখান তো।"

ধ্বজাবাহী কথা মতো কাজ করল, কিন্তু এই হাল্কা মনের ডাক্তারটির দিকে যে দৃষ্টিতে সে তাকাল তার মধ্যে মিশে ছিল বিস্ময় ও তিরস্কার; অবশ্য ডাক্তার সেটা লক্ষ্য করল না. সে ক্ষতস্থানটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সব দিক থেকে পরীক্ষা করতে লাগল, কিন্তু আহত ছেলেটি ধৈর্য হারিয়ে তীব্র স্বরে আর্তনাদ করে হাতটা সরিয়ে নিল

প্রায় অস্ফুট স্বরে সে বলল, "আমাকে ছেড়ে দিন। মরতে তো আমাকে হবেই।"

কথাগুলি বলেই সে একেবারে এলিয়ে পড়ল। যে লোকগুলি তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল, পাঁচ মিনিট পরে তাদের কাছে গিয়ে একজন সৈনিককে জিজ্ঞাসা করলাম, ধ্বজাধারী অফিসারটি কেমন আছে; সে জবাব দিল, "তিনি পরলোকে যাত্রা করেছেন।"

১২

আরও অনেক পরে পুরো বাহিনীটা দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে মার্চ করে দুর্গের দিকে চলতে লাগল। বরফ-ঢাকা পাহাড়ের ওপারে সূর্য অস্ত গেছে। স্বচ্ছ নির্মল দিগন্তরেখার উপর ঝুলে-থাকা দীর্ঘ মেঘের সারির উপর তার শেষ গোলাপি রশ্মিরেখা ছড়িয়ে পড়েছে। বরফ-ঢাকা পাহাড়গুলি একটা রক্তিম কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে; অস্তসূর্যের লাল আলোয় শুধু তাদের সুউচ্চ রেখাগুলি আশ্চর্য স্পষ্টতায় ফুটে উঠেছে। চাঁদ অনেকক্ষণ উঠেছে; আকাশের গাঢ় নীলের পশ্চাৎপটে স্বচ্ছ চাঁদটি ক্রমেই সাদা হতে শুরু করেছে। ঘাস ও গাছগাছালির সবুজ রং অন্ধকারে কালো হয়ে উঠছে; তাদের উপর ঝরে পড়ছে শিশির-কণা।

উর্বর প্রান্তরের ভিতর দিয়ে স্থির পদক্ষেপে সৈন্যদল এগিয়ে চলেছে একটা অন্ধকার স্তূপের মতো। চারদিক থেকে ভেসে আসছে বড় খঞ্জনী, ঢাক ও আনন্দ-সঙ্গীতের শব্দ। ষষ্ঠ বাহিনীর গায়ক গলা ছেড়ে গান ধরেছে, তার গভীর, জোরালো অনুভূতি-ভরা কণ্ঠস্বর সন্ধ্যার স্বচ্ছ বাতাসে দূর হতে দূরান্তরে ভেসে যাচ্ছে।

১৮৮৬

মোমবাতি : অথবা ভাল মানুষ চাষী কেমন করে নিষ্ঠুর ওভারসীয়ারকে পরাজিত করেছিল

The Candle : Or How the good peasant overcame the cruel Overseer

এই ঘটনাটি ঘটেছিল মালিকদের আমলে। (অর্থাৎ ১৮৬১ সালে ভূমিদাসদের মুক্তির আগে।) অবশ্য মালিক ছিল নানা রকমের। একদল ছিল যারা ঈশ্বরকে ও মৃত্যুর মুহূর্তকে স্মরণ করত বলে ভূমিদাসদের প্রতিও করুণা করত; আর একদল ছিল—তারা নেহাৎই পশু—যারা ওই দুইয়ের কাউকেই স্মরণ করত না। এই সব মহাপ্রভুদের মধ্যে আবার নিকৃষ্ট ছিল তারা যারা নিজেরাই এককালে ভূমিদাস ছিল—যারা পাঁক থেকে উঠে এসে হয়েছিল রাজার সহচর। তাদের অধীনে বাস করাই ছিল সবচাইতে শক্ত।

কোনও জমিদারিতে এইরকম একজন ওভারসীয়ার নিযুক্ত হয়েছিল। সেখানকার চাষীরা কাজ করত "বার্স্টচিনা" অর্থাৎ বেগার পদ্ধতিতে। (সপ্তাহে কয়েকটি নির্দিষ্ট দিন বাধ্যতামূলক কাজের বিনিময়ে তারা জমি ভোগদখল করত।) স্ত্রী ও দুটি বিবাহিতা মেয়েকে নিয়ে ছিল সেই ওভারসীয়ারের সংসার। লোকটা যেমন উচ্চাকাংখী, তেমনই দুষ্টপ্রকৃতির। সৎপথে অথবা অসৎপথে যে কোনও উপায়ে টাকা রোজগার করাই ছিল তার লক্ষ্য। প্রথমেই সে "বার্স্টচিনা" প্রথায় নির্দিষ্ট কাজের দিনের মাত্রা বাড়িয়ে দিলো। তারপর একটা ইট-খোলা শুরু করে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সব চাষীকেই খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেলবার যোগাড় করল, আর ইট বেচে প্রচুর টাকা করতে লাগল। কিছু চাষী মস্কোতে গিয়ে জমিদারের কাছে নালিশ করল, কিন্তু তাতে কোনও লাভ হলো না। জমিদার তাদের খালি হাতে ফিরিয়ে দিলো; ওভারসীয়ারকে কিছুই বলল না। কথাটা ওভারসীয়ারের কানে যেতেই সে তাদের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে আরও শোচনীয় করে

তুলল। তার উপর, চাষীদের মধ্যে কয়েকজন ছিল অসত্যপরায়ণ; তারা পরস্পরের কথা ওভারসীয়ারের কানে তুলে নিজেদের মধ্যে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলল; ফলে কথাটা সারা জেলায় ছড়িয়ে পড়ল, আর ওভারসীয়ারও আরও নির্দয় হয়ে উঠল।

অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়াল যে চাষীরা সেই ওভারসীয়ারকে ক্রুদ্ধ বুনো জন্তুর মতো ভয় করতে লাগল। যখনই সে ঘোড়ায় চড়ে কোনও গ্রামে যেত, সেখানকার প্রতিটি লোক নেকড়ের মতো তার কাছ থেকে দূরে সরে থাকত; সকলেই চেষ্টা করত তার চোখের আড়ালে থাকতে। ওভারসীয়ার সবই বুঝতে পারল। তারা তাকে এত ভয় করে দেখে সে আরও রেগে গেল। সে তাদের চাবুক মারতে লাগল, দিন-রাত খাটাতে লাগল, আর তার হাতে পড়ে অনেকেরই কষ্টের অবধি রইল না।

যাই হোক, কালক্রমে তার অত্যাচারে চাষীরা বেপরোয়া হয়ে উঠল, এবং নিজেদের মধ্যে পরামর্শ শুরু করে দিলো। কোনও গোপন জায়গায় তারা একত্র হতো, আর তাদের মধ্যে বেশি সাহসী কেউ হয়তো বলত, "এই উপরওয়ালা জন্তুটাকে নিয়ে আর কতকাল আমরা চলব? এসো, চিরদিনের মতো এ অবস্থার শেষ করে দেই। এরকম মানুষকে খুন করলে পাপ হবে না।"

একবার সব চাষীদের হুকুম করা হলো, জঙ্গলের আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। পবিত্র সপ্তাহের ঠিক আগের কথা। দুপুরের খাবারের জন্য একত্র হয়ে তারা আবার বলাবলি শুরু করল।

তারা বলল, "এ ভাবে আর কতদিন চলবে? লোকটা আমাদের মরিয়া করে তুলেছে। সম্প্রতি সে আমাদের এত বেশি খাটাতে শুরু করেছে যে আমাদের নিজেদের বা মেয়েদের কারোরই দিনে-রাতে এক মুহূর্ত বিশ্রাম জুটছে না। তাছাড়া, কোনও কাজ যদি ঠিক তার মনোমতো না হয় তাহলেই সে রেগে গিয়ে আমাদের মারধোর করে। তার চাবুক খেয়ে সাইমন মারা গেল, আর এইমাত্র এনিসিমকে কত যন্ত্রণা ভোগ করতে হলো। এরপরও কী দেখতে চাও? আজ সন্ধ্যায়ই জন্তুটা আসবে আর আমাদের উপর জিভের ঝাল ঝাড়বে। দেখো, আমাদের একমাত্র কাজ হলো তাকে ঘোড়া থেকে টেনে নামিয়ে মাথায় কুড়ুলের এক কোপ বসিয়ে দিয়ে সব শেষ করে দেওয়া। হ্যাঁ, তারপর দেহটাকে কোথাও নিয়ে গিয়ে টুকরো টুকরো করে জলে ভাসিয়ে দাও। একমাত্র দরকার—আমাদের সকলকে একমত হতে হবে, একসঙ্গে দাঁড়াতে হবে। বিশ্বাসঘাতকতা করা চলবে না।"

ভাসিলি মিনাফ-ই এ ব্যাপারে বেশি উৎসাহী কারণ ওভারসীয়ারের উপর তার ছিল বিশেষ রাগ। সে যে তাকে প্রতি সপ্তাহে চাবুক মারত তাই শুধু নয়, সে তার বউকে নিয়ে গেছে রাঁধুনির কাজ করাতে।

চাষীরা এইভাবে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলল, আর সন্ধ্যাবেলা ওভারসীয়ার এসে হাজির হলো। আসামাত্রই সে রাগে জ্বলে উঠল, কারণ কাঠগুলো তার মনের

মতো করে চেলা করা হয়নি। তাছাড়া, জ্বালানি কাঠের স্তূপের মধ্যে সে একটা আস্ত কাঠও লুকনো দেখতে পেল।

বলে উঠল, "তোদের না লেবুগাছ কাটতে বারণ করেছিলাম! এ কাজ কে করেছে? বল্, নইলে তোদের সব্বাইকে চাব্‌কাব।"

লেবুগাছটা কার ভাগে পড়েছিল সে কথা পুনরায় জিজ্ঞাসা করায় চাষীরা সিদরকে দেখিয়ে দিলো। তখন ওভারসীয়ার চাবুক মেরে তার মুখটা রক্তাক্ত করে দিলো, আর ভাসিলির কাটা জ্বালানির স্তূপটা ছোট হওয়ায় তাকেও চাবুক মারল। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

সেদিন রাতে যথারীতি জমায়েত হবার পরে ভাসিলি বলল :

"তোমরা কেমন লোক হে! তোমরা কি মানুষ, না চড়ুই পাখি! তোমরা মুখে বলো, তৈরি হও, এবার তৈরি হও, আর যখন সময় আসে তখন সকলেই ভয়ে কাঁপতে থাকো। বাজপাখিকে বাধা দেবার জন্য চড়ুই পাখিরাও এই রকমই তৈরি হয়েছিল। তারাও বলেছিল, তৈরি হও, এবার তৈরি হও—কেউ কাউকে ধরিয়ে দিও না; কিন্তু বাজপাখি যখন ছোঁ মেরে নিচে নেমে এল তখন সকলেই কাঁটা-ঝোপে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল, আর বাজপাখিটা ইচ্ছামতো চড়ুইটাকে ধরে নখে ঝুলিয়ে উঠে চলে গেল। চড়ুইগুলো তখন লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল। 'টুইট্, টুইট্!' বলে কাঁদতে কাঁদতে দেখল, তাদের মধ্যে একজন হারিয়ে গেছে। তারা বলল, 'আমাদের মধ্যে কে গেল? আহা, শুধু ছোট্ট ভানিয়া। এটাই ওর নিয়তি; আমাদের সকলের জন্য ও জীবনটা দিলো।' তোমাদেরও সেই একই হাল; তোমাদের 'বিশ্বাসঘাতকতা নয়, বিশ্বাসঘাতকতা নয়' বলে যত চিৎকার তারও ঐ একই পরিণতি। লোকটা যখন সিদর-কে মারতে লাগল তখন তোমাদের উচিত ছিল সাহসে ভর করে তাকে শেষ করে দেওয়া। কিন্তু না; মুখে বললে, 'তৈরি হও, তৈরি হও! বিশ্বাসঘাতকতা নয়!'—কিন্তু বাজপাখি যখন ছোঁ মারল তখন তোমরা সকলেই ঝোপের আড়ালে গা-ঢাকা দিলে।"

এই নিয়ে চাষীদের আলোচনা ক্রমেই বাড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত তারা ওভারসীয়ারকে শেষ করে দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হলো।

এদিকে, "খৃস্টের মৃত্যু সপ্তাহের প্রাক-সন্ধ্যা"-য় সে খবর পাঠাল, যই-চাষের জন্য "বার্স্টচিনা" জমিতে লাঙল দেবার জন্য তারা যেন তৈরি থাকে। চাষীরা এটাকে "মৃত্যু সপ্তাহ"-এর প্রতি অসম্মান বলে মনে করল এবং ভাসিলি-র খিড়কির উঠোনে সমবেত হয়ে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে বসল।

তারা বলল, "সে যদি ঈশ্বরকে ভুলে গিয়ে এ ধরনের কাজের হুকুম দিতে পারে, তাহলে আমাদেরও অবশ্য কর্তব্য তাকে খুন করা। সে কাজটা চিরদিনের মতো চুকিয়ে ফেলা হোক।"

ঠিক সেই সময় সেখানে হাজির হলো পিটার মিস্‌চিফ্। পিটার শান্তিপ্রিয় মানুষ; আজ পর্যন্ত এই সব আলোচনায় যোগ দেয়নি। সব কথা শুনে সে বলল :

"ভাইসব, তোমরা একটা বড় পাপ কাজের কথা ভাবছ। কোনও মানুষের জীবন নেওয়াটা ভয়ংকর কাজ। অপরের জীবন নেওয়া তো সহজ কিন্তু নিজের জীবন? এ লোকটা যদি খারাপ কাজ করে থাকে, তাহলে তার পরিণামও খারাপ হবে। তোমরা একটু ধৈর্য ধরে থাকো ভাইসব।"

একথা শুনে ভাসিলি রেগে উঠল।

বলল, "তোমার মুখে তো ঐ এক কথা—মানুষকে মারা পাপ। হ্যাঁ, নিশ্চয় পাপ কিন্তু এরকম ক্ষেত্রে নয়। একটি ভাল মানুষকে মারা পাপ, কিন্তু এরকম একটা কুত্তাকে? আরে, ঈশ্বরই আমাদের আদেশ করেছেন ওটাকে খুন করতে। সেই বা আমাদের জীবন নষ্ট করতে থাকবে কেন? তাকে খুন করা যদি কষ্টও পেতেও হয়, আমরা তাই করব আমাদের ভাইদের ভালোর জন্য, আর তাই এ কাজের জন্য তারা আমাদের ধন্যবাদ জানাবে। তোমার এ সব ফাঁকা বুলি মিসচিফ। খৃস্টের পবিত্র উৎসবের সময় মাঠে গিয়ে কাজ করলে কি আমাদের পাপ কিছু কম হবে? আরে, তুমি নিজেও নিশ্চয় কাজে যেতে চাও না?"

"কেন যাব না?" পিটার জবাব দিলো। "আমাকে যদি চষ করতে পাঠানো হয়, সে আদেশ আমি মানব। নিজের জন্য তো কাজটা করব না। পাপটা কার হবে সেটা ঈশ্বরই বিচার করবেন, আমরা শুধু চষ করতে করতে তাঁকে স্মরণ করব, ব্যস, তাহলেই হবে। এগুলো আমার কথা নয় ভাইসব। আমরা পাপ দিয়ে পাপকে দূর করব—এই যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হতো তাহলে সেই মর্মে তিনি আমাদের বিধান দিতেন এবং এটাকেই পথ হিসাবে দেখিয়ে দিতেন। না। পাপ দিয়ে পাপকে দূর করলে সে আবার ফিরে আসবে। মানুষকে খুন করা বোকামি, কারণ রক্ত আত্মাকে কলঙ্কিত করে। একজনের আত্মাকে নিলে তোমার নিজের আত্মাকেই রক্তে ডুবিয়ে দেওয়া হবে। এমন কি তুমি যদি মনে করো যে, যাকে তুমি খুন করেছ সে লোকটি পাপী, এবং তাকে খুন করে তুমি পৃথিবী থেকে পাপকে দূর করেছ—তাহলেও ভেবে দেখো, তার চাইতেও অনেক বেশি খারাপ কাজটিই তুমি করে বসেছ। তার চাইতে বরং দুর্ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করো, দেখবে দুর্ভাগ্যও তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করবে।"

এর ফলে চাষীরা দ্বিমত হয়ে গেল, কতক ভাসিলির সঙ্গে একমত হলো, আবার কিছু লোক ধৈর্য ধরে পাপ কাজ থেকে দূরে থাকবার যে পরামর্শ পিটার দিয়েছে তাকেই মেনে নিলো।

উৎসবের প্রথম দিন (রবিবার) চাষীরা ছুটি পালন করল; কিন্তু সন্ধ্যায় জমিদার বাড়ি থেকে "স্তারোস্তা" (গ্রাম-প্রধান) লোকজন নিয়ে এসে বলল

"ওভারসীয়ার মাইকেল সেমেনোভিচ আমাদের পাঠিয়েছে তোমাদের সতর্ক করে দিতে : কাল তোমরা যই-চাষের জন্য লাঙল চালাতে প্রস্তুত হয়ে থেকো।"

"স্তারোস্তা" লোকজন নিয়ে সারাটা গ্রামে ঘুরে সব চাষীদের পরদিন মাঠে লাঙল

চালাতে বলল। কিছু চাষী থাকে নদীর ওপারে, কিছু থাকে বড় রাস্তার ধারে, সকলের কাছেই তারা গেল। চাষীরা পড়ল মহাবিপদে। তবু আদেশ অমান্য করবার সাহস হলো না; পরদিন সকালে লোকজন নিয়ে মাঠে চাষ করতে শুরু করল। প্রাতঃকালীন প্রার্থনা সভার সময় গির্জায় ঘণ্টা বাজতে লাগল, সমস্ত দেশ জুড়ে চলেছে উৎসব, আর চাষীরা—তারা ক্ষেতে লাঙল চালাচ্ছে।

ওভারসীয়ার সেদিন দেরি করে ঘুম থেকে উঠল, যথারীতি সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখল। বাড়ির লোকজন সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ভাল পোশাক পরে গাড়িতে চেপে গির্জায় গেল। তারা ফিরে এলে দাসী সামোভার এনে দিলো, ওভারসীয়ার গোলাবাড়ি থেকে ফিরে এল, তার সঙ্গে একসঙ্গে বসে চা খেতে লাগল। চায়ের পর্ব শেষ হলে মাইকেল পাইপটা ধরিয়ে "স্তারোস্তা"কে ডেকে পাঠাল।

"চাষীদের লাঙল দিতে পাঠিয়েছ?" সে প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ মাইকেল সেমেনোভিচ।"

"সবাই গেছে, তাই না?"

"হ্যাঁ, সকলেই গেছে। আমি নিজে তাদের কাজ ভাগ করে দিয়েছি।"

"দেখো, তুমি হয়তো কাজ ভাগ করেছ, কিন্তু তারা সত্যি সত্যি মাঠে লাঙল দিচ্ছে কিনা সেটাই প্রশ্ন। গিয়ে দেখে এসো, আর তাদের বলে এস যে রাত্তিরে আমি নিজে সেখানে যাব। তাদের আরও বলবে যে প্রতি একজনকে লাঙল দিয়ে এক 'দেসিয়াতিন' জমি চাষ করতে হবে, আর লাঙল চালানো যেন ভাল হয়। আর যদি কাজ ঠিকমতো হয়নি, তা হলে কিছু না করবার এই কবর উৎসবই বরং মাটি হবে।"

"ঠিক আছে মাইকেল সেমেনোভিচ", এই কথা বলে "স্তারোস্তা" বেরিয়ে যাবার উপক্রম করতেই মাইকেল তাকে আবার ডাকল। তাকে আরও কিছু বলবার জন্যই সে ডাকল, কিন্তু কি ভাবে যে কথাটা বলবে ঠিক বুঝতে পারছিল না। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে শেষ পর্যন্ত বলল:

"ভালো চাও তো এই বদমাশরা আমার সম্পর্কে যা বলছে সেটা তুমি মন দিয়ে শুনবে। যদি কোনো বেটা আমাকে গালাগালি করেছে, তাহলে তার সব কথা আমাকে জানাবে। ওই শয়তানদের আমি ভাল করে চিনি। তারা কাজ করতে চায় না—শুধু চায় চিৎ হয়ে থাকতে, আর গোড়ালি নাচাতে। ঢকঢক্ করে মদ গেলা আর ছুটি কাটানো—এই তো তারা ভালবাসে। আর আমি যদি ঢিল দিই তাহলে সময়মতো চাষ হলো কি না, বা সব যব ফসলের কাজ শেষ হলো কিনা তা নিয়ে তারা মোটেই মাথা ঘামায় না। কাজেই তুমি সোজা সেখানে চলে যাও, তাদের কথাবার্তা মন দিয়ে শোনো, তারা কি বলছে খেয়াল রাখো, আর এখানে এসে আমাকে সব জানাও। চোখ কান খাড়া রাখো, খোলাখুলি সব কথা জানাও, কিছুই চেপে রেখো না—তোমার উপর এই আমার হুকুম।"

"স্তারোস্তা" ঘাড় ফিরিয়ে বেরিয়ে গেল। ঘোড়ার পিঠে চেপে জোর কদমে ছুটল মাঠে চাষীদের কাছে।

এদিকে "ওভারসীয়ারের" স্ত্রী সব কথাই শুনে ফেলল। চাষীদের পক্ষ নিয়ে কিছু বলবার জন্য সে তার কাছে এল। স্ত্রীটি শান্ত প্রকৃতির মেয়েমানুষ; তার মনটাও ভাল। সুযোগ পেলেই সে তার স্বামীর মনটাকে নরম করতে চেষ্টা করত এবং চাষীদের পক্ষ সমর্থন করত।

সেই উদ্দেশ্য নিয়েই স্বামীর কাছে এসে সে কথাটা পাড়ল।

"প্রিয়তম মাইকেল, প্রভুর বড় উৎসবের প্রতি এই মহাপাপ তুমি করো না। খৃস্টের দোহাই, চাষীদের যেতে দাও।"

কিন্তু মাইকেল তার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে হেসে উঠল।

বলল, "অনেক দিন বুঝি তোমার পিঠে চাবুক পড়েনি; তাই যেটা তোমার ব্যাপার নয় তাতে নাক গলাবার সাহস তোমার হয়েছে।"

"কিন্তু মাইকেল প্রিয়তম, তোমাকে নিয়ে এমন খারাপ একটা স্বপ্ন আমি দেখেছি। আমার কথা শোনো, চাষীদের ছেড়ে দাও।"

সে জবাব দিলো, "তোমাকে শুধু একটা কথাই বলতে চাই। তুমি তোমার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। তোমার পিঠে আবার চাবুক পড়া দরকার। এই নাও!" রাগে দিশেহারা হয়ে নিজের জ্বলন্ত পাইপের বাটিটা তার স্ত্রীর ঠোঁটের উপব চেপে ধরল; তারপর তাকে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়ে খাবার পাঠিয়ে দিতে হুকুম করল।

জেলি, মটরশুঁটি, শুয়োরের মাংস দেওয়া "শ্চি" (বাঁধাকপিব ঝোল), ঝলসানো শূকর-ছানা, আর সেমাইয়ের পুডিং—সব কিছু গিলে চেরি-মদ দিয়ে সেগুলোকে গলা দিয়ে নামাল। আহারাদি শেষ করে রাঁধুনিকে ডেকে পাঠাল, তাকে পিয়ানো বাজাতে বসিয়ে দিলো, আর নিজে গীটার হাতে নিয়ে তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাজাতে লাগল। এইভাবে মৌজ করে বসে সে যখন হিক্কা তুলছিল, গীটারের কান মোচড়াচ্ছিল, আর রাঁধুনিটির সঙ্গে হাসাহাসি করছিল, তখন "স্তারোস্তা" ফিরে এসে মনিবকে অভিবাদন করে মাঠে যা দেখে এসেছে তার বিবরণ দিতে লাগল।

মাইকেল জিজ্ঞাসা করল, "তারা কি যার যার নির্দিষ্ট জমিতে লাঙল দিচ্ছে?"

"স্তারোস্তা" জবাব দিলো, "হ্যাঁ, অর্ধেকের বেশি কাজ এর মধ্যেই শেষ করে ফেলেছে।"

"কোনও কাজ ফেলে রাখেনি তো?"

"না, আমি তো সেরকম কিছু দেখিনি। তারা ভালই লাঙল চালাচ্ছে, কারণ অন্য কিছু করতে তারা ভয় পায়।"

"আর জমি বেশ ভাল তৈরি হয়েছে তো?"

"হ্যাঁ, খুব নরম হয়েছে; পোস্তদানার মতো উড়ছে।"

ওভারসীয়ার একমুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপরেই বলে উঠল, "আচ্ছা, আমাব সম্পর্কে তারা কি বলছে? গালাগালি করছে কি?"

"স্তারোস্তা" ইতস্তত করতে লাগল; কিন্তু ওভারসীয়াব সত্য কথা বলতে হুকুম দিলো।

বলল, "সব কথা আমাকে বলো। তুমি তো তোমার কথা বলছ না, বলবে তাদের কথা। সত্য কথা বলো, তোমাকে পুরস্কার দেব। কিন্তু ওই লোকগুলোকে যদি আড়াল করো, তাহলে কিন্তু ক্ষমা করব না—কষে চাবুক মারব। হেই কাতিয়ুশ্‌কা! মনের জোর আনতে ওকে এক গ্লাস ভদ্‌কা দাও।"

রাঁধুনি এক গ্লাস-ভর্তি ভদ্‌কা এনে "স্তারোস্তা"-কে দিলো। তখন সে মনিবকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ভদ্‌কাটা খেলো এবং মুখটা মুছে সব কথা বলতে শুরু করল।

মনে মনে ভাবল, "যাই হোক, লোকটার যে প্রশংসা করবার মতো কোনও গুণ নেই সেটা তো আমার দোষ নয়; কাজেই তিনি যখন হুকুম করছেন, আমি সত্য কথাই বলব।"

সুতরাং "স্তারোস্তা" মনে সাহস এনে বলতে লাগল :

"তাবা গোলমাল কবছে মাইকেল সেমেনোভিচ। তাবা ভীষণ গোলমাল করছে।"

"কিন্তু ঠিক ঠিক কি বলছে তাই বলো।"

"একটা কথা তারা সকলেই বলছে—সেটা হলো, ঈশ্বরের প্রতি আপনাব বিশ্বাস নেই।"

ওভাবসীয়ার হো-হো কবে হেসে উঠল।

"তাদের মধ্যে কে কে এ কথা বলছে?"

"সকলেই। বস্তুত, তারা বলছে যে আপনি শয়তানেব সেবা কবেন।"

ওভারসীয়ার আরও জোরে হেসে উঠল।

বলল, "চমৎকার কথা। এবাব বলো, আলাদা আলাদা ভাবে তারা আমার সম্পর্কে কি বলে? যেমন ধরো, আমাদেব বন্ধু ভাসিলি কি বলে?"

এতক্ষণ পর্যন্ত নিজের বন্ধুদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে "স্তারোস্তা" অনিচ্ছুক ছিল; কিন্তু তার ও ভাসিলির মধ্যে একটা অনেক দিনের ঝগড়া আছে।

সে জবাব দিলো, "ভাসিলি আপনাকে শাপান্ত করে সকলের চাইতে বেশি।"

"সে কি বলে সেটা বলো।"

"সে কথা উচ্চারণ করতে আমার সংকোচ হয়, কিন্তু তার মনের আশা, একদিন যেন আপনার একটা শোচনীয় পরিণতি ঘটে।"

ওভারসীয়াব চেঁচিয়ে উঠল, "তাই নাকি, সেই ছোকরাটা তাই বলে নাকি? দেখো, সে আমাকে কোনও দিন খুন করতে পাববে না, কারণ আমার গায়ে হাত তুলবার সুযোগ সে কোনওদিনই পাবে না। ঠিক আছে বন্ধু ভাসিলি, তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হবে। আর সেই খেঁকি কুত্তা তিশ্‌কা কি বলে?"

"দেখুন, কেউ আপনাকে ভাল বলে না। তারা সকলেই আপনাকে শাপান্ত করে, শাসায়।"

"আর পিটার মিস্‌চিফ্? সে কি বলে? আমি জোর গলায় বলতে পারি, যারা আমাকে শাপ-শাপান্ত করে, ঐ বুড়ো বদমাশটাও তাদেরই একজন।"

"না, তা কিন্তু নয় মাইকেল সেমেনোভিচ।"

"তাহলে সে কি বলে?"

"তাদের মধ্যে সেই একমাত্র লোক যে কোনও কথাই বলেনি। একজন চাষীর তুলনায় সে অনেক কিছু জানে। আজ তো তাকে দেখে আমি অবাক।"

"কি রকম?"

"তার কাজকর্ম দেখে। অন্য সকলেও অবাক।"

"সে কি করেছে?"

"খুবই আশ্চর্য কাজ, তুর্কিন পাহাড়ের পাশে যে ঘাসের জমি আছে সেখানেই সে লাঙল দিচ্ছিল। ঘোড়া হাঁকিয়ে তার কাছে যেতেই মনে হলো কে যেন সুন্দর নিচু গলায় গান করছে, আর তার হল-দণ্ডের মাঝখানে কি যেন জ্বলছে।"

"বটে?"

"জিনিসটা জ্বলছে একটা ছোট্ট আগুনের শিখার মতো। কাছে গিয়ে দেখলাম পাঁচ-কোপেক দামের একটা মোমবাতি হল-দণ্ডের সঙ্গে বাঁধা। তখন বাতাস থাকলেও মোমবাতিটা নেভেনি।"

"আর সে বলছিল কি?"

"কিছুই বলেনি, শুধু আমাকে দেখেই ঈস্টারের শুভকামনা জানাল, আর তারপরেই আবার গাইতে শুরু করল। একটা নতুন শার্ট পরে ঈস্টার-স্তোত্র গাইতে গাইতে সে লাঙল চালাচ্ছে। একটা শিরালার শেষ প্রান্তে পৌঁছে সে লাঙলটাকে ঘুরিয়ে দিলো, সেটাকে নাড়া দিলো, তবু মোমবাতিটা নিভল না। সত্যি, লাঙলের ফলা থেকে সে যখন ঠুকে মাটির ঢেলা সরাচ্ছিল আর হাতলটাকে তুলে ঘোরাচ্ছিল তখন আমি তার খুব কাছেই ছিলাম। তবু যতক্ষণ সে লাঙলটা চালাল, মোমবাতিটা আগের মতোই জ্বলতে লাগল।"

"আমি কিছুই বলিনি, কিন্তু অন্য সব চাষীরা সেখানে এসে তাকে দেখে হাসাহাসি শুরু করল। বলল, 'চালিয়ে যাও বাবা! 'পবিত্র সপ্তাহে' লাঙল চালাবার প্রায়শ্চিত্ত করতে মিস্‌চিফ্-এর দেখছি এক শতাব্দী লেগে যাবে।"

"তা শুনে সে কি বলল?"

"শুধু বলল, 'পৃথিবীতে থাক শুধু শান্তি ও মানুষের প্রতি শুভেচ্ছা।' তারপরই ঝুঁকে পড়ে লাঙলটা ধরে ঘোড়া চালিয়ে দিলো, আর নিচু গলায় গান গাইতে লাগল। মোমবাতিটা কিন্তু সারাক্ষণই জ্বলতে লাগল, একবারও নিভল না।

ওভারসীয়ারের হাসি থেমে গেল। গীটারটা রেখে দিয়ে বুকের উপর মাথাটা নুইয়ে সে চিন্তায় ডুবে গেল।

রাঁধুনি ও "স্তারোস্তা"-কে বিদায় করে দিয়ে সে বসেই রইল। তারপর পর্দাটা সরিয়ে শোবার ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। বোঝাই খড়ের ভারে গাড়ি যে রকম আর্তনাদ করে, বিছানায় শুয়ে সেও সেইরকম দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে আর্তনাদ করতে লাগল। স্ত্রী তার কাছে গিয়ে আবার বোঝাতে চেষ্টা করল, কিন্তু দীর্ঘ সময় সে তার কথার কোনও জবাবই দিলো না।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত একসময় বলল, "ঐ লোকটি আমার উপরে টেক্কা দিয়েছে। এখন আমি সব বুঝতে পারছি।"

স্ত্রী তখনও তাকে বোঝাতে লাগল।

মিনতি করে বলল, "এখনই চলে যাও। চাষীদের সবাইকে ছেড়ে দাও। এটা তো কিছুই না। ভাব তো তুমি কী কাজ করেছ; তবু তো ভয় পাওনি। তাহলে এখন এ কাজ করতে ভয় পাবে কেন?"

জবাবে সে শুধু বলল, "এই লোকটি আমাকে জয় করেছে। আমি শেষ হয়ে গিয়েছি; যদি আস্ত থাকতে চাও তো এখান থেকে চলে যাও। এ সব ব্যাপার তুমি বুঝবে না।"

সে সেখানেই পড়ে রইল।

কিন্তু সকালে উঠে সে যথারীতি কাজে লেগে গেল। তবু সে যেন আগেকার সেই মাইকেল সেমেনোভিচ নয়। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, তার মনে একটা আঘাত লেগেছে। তাকে যেন বিষণ্ণতায় পেয়ে বসেছে। কোনও কাজেই মন নেই। চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকে। তার দাপট আর বেশি দিন চলল না। সেন্ট পিটার ভোজ উৎসবের সময় মালিক নিজে এল জমিদারি পরিদর্শনে। প্রথম দিনই ওভারসীয়ারকে ডেকে পাঠাল, কিন্তু সে তখন অসুস্থ। পরদিন আবার ডেকে পাঠাল, তখনও সে অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী। তখন জমিদার জানতে পারল যে মাইকেল ভীষণ মদ খাচ্ছে। কাজেই তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো। প্রাক্তন ওভারসীয়ার তখনও বাড়ির মধ্যেই দিন কাটাতে লাগল। কোনও কাজ করে না। দিন দিন আরও বিমর্ষ হতে লাগল। যা কিছু ছিল সব মদে উড়িয়ে দিলো; এমন কি স্ত্রীর শালটা পর্যন্ত চুরি করে নিয়ে সরাইখানায় সেটা বিক্রি করে দিয়ে মদ খেলো। এমন কি চাষীরা পর্যন্ত করুণাবশে তাকে মদ এনে দিতো। আর একটি বছরও সে বেঁচে রইল না; ভদ্‌কা খেয়েই শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হলো।

১৮৮৬

গজকাঠি *

Yardstick

১

ক্রমেই বেশি করে আলো ফুটতে লাগল, সূর্য আরও উপরে উঠে এল, অস্বচ্ছ রূপোলি শিশিরকণাগুলো ক্রমেই সাদা হয়ে চকচক করতে লাগল, চাঁদের কাস্তেটা হয়ে এল অস্পষ্টতর, অরণ্য—গুঞ্জনমুখর, মানুষ চলাফেরা শুরু করল, আর জমিদারবাড়ির আস্তাবলে নাকের ঘর্-ঘর্ ও খড়ের খচ্মচ্ শব্দ ক্রমেই বাড়তে লাগল; এমন কি কোনও কিছু নিয়ে রেগে ধাক্কাধাক্কি কবতে করতে ঘোড়াগুলো কর্কশ হ্রেষাধ্বনি করতে লাগল।

সশব্দে গেটটা খুলে আস্তাবলের বুড়ো সহিসটি বলে উঠল, "হেই, ওদিকে! যথেষ্ট সময় আছে! তোমাদের কিছু না খাইয়ে রাখা হয়নি!" একটা ঘোটকি গেটের দিকে ছুটে যেতেই লোকটি হাত বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "ফিরে আয়!"

লোকটির নাম নেস্টার। চামড়ার বেল্ট-আঁটা একটা কসাক-কুর্তা তার গায়। সেই বেল্টে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি ঝুলছে; চাবুকটা রেখেছে কাঁধের উপর; দাড়িটাকে তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে বেল্টের মধ্যে গুঁজে দিয়েছে। হাতে একটা জিন ও লাগাম।

নেস্টারের বকুনিতে ঘোড়াগুলো ভয়ও পেল না, রাগও করল না; তার কথায় কান না দিয়ে আপন মনেই তারা ফটক থেকে সরে এল—শুধু লাল্চে বাদামী রঙের একটা ঘোটকি কান দুটো পিছনের দিকে ভাঁজ করে দ্রুতগতিতে তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। তা দেখে একটা বাচ্চা ঘোটকিও হ্রেষাধ্বনি করে পিছনের দুই পায়ে পাশের একটা ঘোড়াকে দিলো এক লাথি কসিয়ে।

আস্তাবলের এক কোণে সরে গিয়ে সহিস রুক্ষ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "হেই-রে!"

আস্তাবলে যতগুলো ঘোড়া ছিল (প্রায় শ'খানেক) তার মধ্যে গায়ে ফুট্ফুট্ দাগ একটা দামড়া ঘোড়া চালার নিচে একলা দাঁড়িয়ে চোখ দুটো অর্ধেক বুজে চারদিকে চাইতে চাইতে চালার ওক কাঠের খুঁটিটাকে চাটছিল। খুঁটিটায় কি যে স্বাদ ছিলো বলা কঠিন, কিন্তু দামড়া ঘোড়াটা গম্ভীর, বিষণ্ণ মুখে সেটা চেটেই চলেছে।

ঘোড়াটার কাছে এগিয়ে গিয়ে নেস্টার জিন ও জিনের চকচকে চাদরটা একগাদা সারের উপরে রেখে দিয়ে সেই একই গলায় বলল, "আবার দুষ্টুমি হচ্ছে?"

খুঁটি চাটা বন্ধ করে দামড়া ঘোড়াটা একটুও না নড়ে নেস্টারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঘোড়াটা হাসল না, ভ্রূকুটি করল না, রাগল না, কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের

*একটি ঘোড়াকে নিয়ে গল্প

মধ্যেই তার পেটটা কেঁপে উঠল; একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে সরে গেল। হাত দিয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরে নেস্টার তাতে লাগাম পরিয়ে দিলো।

নেস্টার শুধালো, "আবার দীর্ঘশ্বাস পড়ল কেন?"

দামড়াটা শুধু লেজ নাড়ল, যেন বলতে চাইল, "ও কিছু নয় নেস্টার।" নেস্টার জিন ও জিনের চাদরটা পেতে দিলো, কান দুটো পিছনে ভাঁজ করে দামড়াটা আপত্তি জানাল, আর তার জন্য বোকা বলে বকুনি খেলো। জিনের পেটিটা কোমরে কষে বাঁধা হলে সেটা থামাবার জন্য দামড়াটা হাঁক দিয়ে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে মুখে একটা ঘুষি ও পেটে একটা হাঁটুর গুঁতো খেতেই তার আক্কেল গুড়ুম। তথাপি নেস্টার যখন দাঁত দিয়ে পেটিটা কষতে লাগল তখন দামড়াটা আবারও সাহস করে কান দুটো পিছন দিকে ফেরাল, এমন কি মুখটা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাল পর্যন্ত। সে জানে এতে কোনও লাভ হবে না, তবু তার আপত্তিটা সে নেস্টারকে জানাতে চায়; আপত্তিটা চেপে যাবার কোনও বাসনা তার নেই। জিন আঁটা হয়ে গেলে সে ফোলা ডান পাটা সোজা করে লোহার খলীনটা চিবুতে শুরু করল; খলীনটার যে কোনই স্বাদ নেই সে কথাটা এতদিনে তার জানা উচিত।

ছোট বেকাবে পা রেখে নেস্টার ঘোড়াটার পিঠে সওয়ার হলো। চাবুকটা খুলল; হাঁটুর নিচ দিয়ে কোটটা খুলে ফেলল; তারপর কোচয়ান, শেয়াল-শিকারী ও সহিসদের বিশেষ ভঙ্গিতে জিনের উপর বসে লাগামে টান দিলো। যেখানে বলবে সেখানেই যাব—এমনই ভাব দেখিয়ে দামড়াটা মাথা উঁচু করল, কিন্তু নড়ল না। সে জানে যাত্রা শুরু করবার আগে তার সওয়ারী ভাস্কাকে, অন্য সহিসদের ও ঘোড়াগুলিকেও নানা রকম হুকুম করবে। সত্যি তাই; নেস্টার চেঁচাতে শুরু করল।

বলতে লাগল, "ভাস্কা! হাই ভাস্কা! ঘোটকিগুলোকে বের করে দিয়েছিস তো? কোথায় গেলি রাস্কেল? এখনও ঘুমিয়ে আছিস? গেটটা খোল্। আগে ঘোটকিগুলো বের করে দে।" এমনি সব কথা।

গেটটা কেঁচড়-কেঁচড় শব্দ করে খুলে গেল। বিরক্ত ভাস্কা ঘুম-ঘুম চোখে একটা ঘোড়ার লাগাম ধরে খুঁটিটার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে অন্য ঘোড়াগুলোকে বের করে দিলো। খড়গুলো শুঁকতে শুঁকতে তার উপর সাবধানে পা ফেলে ঘোড়াগুলো একটার পর একটা গেট পার হয়ে গেল : ছোট-বড় নানারকম বাচ্চা ঘোড়া আর গর্ভবতী ঘোটকিগুলো মস্ত বড় পেট নিয়ে ধীরে ধীরে সার ধরে চলল। একটু বড় বাচ্চাগুলো দুটো তিনটে করে দল বেঁধে একটার পিঠে আর একটা মাথা তুলে দিয়ে, তাড়াতাড়িতে কারও বা পা মাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল, আর তার জন্য সহিস তাদের বাপান্ত করে ছাড়ল। একেবারে দুধের বাচ্চাগুলো কখনও একেবারে অপরিচিত কোনও ঘোটকির পায়ের ভিতর দিয়ে গলে গিয়ে মায়েদের হ্রেষা শুনে কর্কশ গলায় ডেকে উঠল।

একটা ছোট ঘোটকি আহ্লাদে লাফাতে লাফাতে গেটটা পার হয়েই মাথাটা উপরে-

নিচে দোলাতে দোলাতে পিছনের পা দুটি ছুঁড়ে আস্তে ডেকে উঠল, কিন্তু ফুটফুট্ দাগওয়ালা বুড়ো ঘোটকি ঝুল্‌দিবা-র কাছ থেকে দূরে ছুটে যেতে সাহস পেল না; ঝুল্‌দিবা সব সময়ই বড় পেটটা এ-পাশ ও-পাশ দোলাতে দোলাতে গভীরভাবে পা ফেলে ধীর গতিতে অন্য সব ঘোড়ার আগে আগে চলে।

কয়েক মিনিট পরেই জমজমাট আস্তাবলটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। শুধু চালার খুঁটিগুলো একটা বিষন্ন, নির্জন চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল; আর রইল গোবর মেশা ভাঙা-চোরা খড় ইতস্তত ছড়ানো। দামড়া ঘোড়াটা এসব দেখে অভ্যস্ত, তবু যেন তারও মন খারাপ হয়ে গেল। যেন কাউকে ইশারা করছে এই ভাবে ধীরে ধীরে মাথাটা উপরে-নিচে দোলাতে দোলাতে সে একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলল, আর তারপরেই হাড়-জিরজিরে পিঠের উপর বুড়ো নেস্টারকে নিয়ে তার শক্ত, বাঁকা ঠ্যাংগুলো টানতে টানতে দলের পিছনে পিছনে চলতে লাগল।

সে ভাবতে লাগল, "বড় রাস্তায় পড়লে সে নিশ্চয় পিতলের পাত ও চেন লাগানো পুরনো পাইপটাতে আগুন দিয়ে টানতে শুরু করবে। আমার খুব খুশি লাগছে, কারণ ভোরবেলা শিশিরবিন্দুগুলো যতক্ষণ ঘাসের উপর থাকে ততক্ষণ তার পাইপের গন্ধ শুঁকতে বড় আরাম; ঐ গন্ধটা আমাকে অনেক সুখের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমার শুধু একটাই আপত্তি, বুড়ো মানুষটা যেই দাঁত দিয়ে পাইপটা চেপে ধরে অমনি তার মেজাজ বদলে যায়, নিজেকে একজন কেউকেটা কল্পনা করে সে একপাশে চেপে বসে—আর সব সময়ই আমার ব্যথার পাশটাতেই চাপ দেয়। কিন্তু সে কথা থাক। পরের সুখের জন্য নিজেকে এই তো প্রথম বলি দিচ্ছি না। ঘোড়া হলেও সে কথাটা ভাবতেও আমার আনন্দ হয়। বেচারি! না হয় একটু কেতাই দেখালই। তবে এ ভাবটা সে তখনই দেখায় যখন সে একা থাকে যখন তাকে কেউ দেখতে পায় না; তার যদি ভাল লাগে, না হয় একপাশেই বসুক।" খড়বড়ে পায়ে সাবধানে রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে দামড়া ঘোড়াটা এই সব ভাবতে লাগল।

২

ঘাস খাওয়াবার জন্য ঘোড়ার পালকে নদীতীরে নিয়ে যাবার পরে নেস্টার দামড়াটার পিঠ থেকে নেমে জিনটা খুলে ফেলল। সেখানকার শিশির ভেজা প্রান্তর, চারদিক ঘোরানো নদী ও মাটির বুক থেকে উঠে-আসা কুয়াশায় ঢাকা। ঘোড়াগুলো ধীরে ধীরে সেই ভেজা প্রান্তরের দিকে এগিয়ে গেল।

লাগামটা খুলে নিয়ে নেস্টার দামড়াটার থুতনির নিচটা চুলকে দিতে লাগল; ঘোড়াটাও চোখ বুজে তার আরাম ও কৃতজ্ঞতা জানাল। নেস্টার বিড়বিড় করে বলল, "বোকা বুড়োর ভারি আরাম।" কিন্তু দামড়াটা এ কাজকে মোটেই পছন্দ করে না; ভদ্রতার খাতিরেই সে ভাল লাগার ভান করে আর সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে! কিন্তু

হঠাৎ কোনওরকম সতর্ক না করে বা যুক্তি না দেখিয়েই (অবশ্য নেস্টার যদি মনে করে থাকে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতার ফলে দামড়াটার চোখে তার গুরুত্ব কমে যেতে পারে সেটা আলাদা কথা) বুড়ো লোকটি ঘোড়ার মাথাটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কোমরের পেটি দিয়ে ঘোড়াটার শুট্‌কো পায়ে ভীষণভাবে আঘাত করতে লাগল; আব তাবপর কোনও কথা না বলে ঢিবির উপরকার একটা কাঠেব দিকে এগিয়ে গেল; সেখানেই সে সাধারণত বসে।

এই আচরণে দামড়াটা বিরক্ত হলেও হাবভাবে তা প্রকাশ করল না। সে শুধু মুখটা ঘুবিয়ে দড়ির মতো লেজটাকে ধীরে ধীরে দোলাতে দোলাতে. বাতাস শুঁকে, লোক-দেখানোর ভঙ্গিতে ঘাস-পাতা চিবুতে চিবুতে নদীর দিকে নেমে গেল। বাচ্চা ঘোড়াগুলো সেই সুন্দর সকাল বেলায় মনের আনন্দে তাকে ঘিবে লাফিয়ে লাফিযে খেলা করতে লাগল, কিন্তু সে তাদের দিকে ফিরেও তাকাল না। সে জানে. খালি পেটে বেশ খানিকটা জল খেয়ে তাবপর প্রাতবাশ খাওয়াই স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল. বিশেষত তার মতো বয়সে। তাই নদীতীরের সব চাইতে ঢালু ও চওড়া জাযগাটা বেছে নিয়ে ক্ষুর ও পায়ের লোম জলে ভিজিযে নাকটা জলে ডুবিয়ে দিযে শুকনো ঠোঁটে জল খেতে লাগল; তখন তার পেটটা ফুলতে লাগল, সরু লেজটা দুলতে লাগল।

ঘোড়ার পাশে একটা ঘোটকি ছিল যেটা সব সময়ই বুড়ো দামড়াটাকে তিতিবিরক্ত করত; যেন কোনও দরকার আছে এমনি ভাব দেখিয়ে ঘোটকিটা জল ভেঙে তাব দিকে এগিয়ে এল; কিন্তু সেটার আসল উদ্দেশ্য সেখানকার জলটাকে ঘোলা করে দেওয়া। কিন্তু ততক্ষণে দামড়াটার জল খাওয়া শেষ হয়ে গেছে; যেন ঘোটকিটাব বদ উদ্দেশ্য কিছুই বুঝতে পাবেনি এমনি শান্তভাবে কাদার ভিতর থেকে একটার পর একটা পা তুলে মাথা নাড়তে নাড়তে বাচ্চাগুলো থেকে নিবাপদ দূরত্বে গিয়ে প্রাতরাশ শুরু করল। তিনটি ঘণ্টা ধরে সে খেয়েই চলল; মাথাটা পর্যন্ত তুলল না; এমন অদ্ভুতভাবে পাগুলোকে ছড়িয়ে দিলো যাতে বেশি ঘাস চাপা না পড়ে। পেট পুরে খাবার ফলে ভর্তি বস্তার মতো তার পেটটা পাঁজরের হাড় ঠেলে ঝুলে পড়ল; সেই অবস্থায় চারটি ব্যথাওলা পায়ে বিশেষ কবে সব চাইতে ঠুনকো ডানদিকের সামনের পা-টায় কোনওক্রমে শরীরের ভর রেখে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

বার্ধক্য কখনও মহান, কখনও বিরক্তিকর, কখনও শোচনীয়। কখনও আবার একই সঙ্গে মহান ও বিরক্তিকর। এই ফুট্‌কি-ফুট্‌কি দামড়াটার বার্ধক্য সেই জাতেব।

দামড়াটা বেশ বড়সড়—অন্তত সাড়ে পাঁচ ফুট উঁচু। গায়েব রং প্রায় কালো—মাঝে মাঝে সাদা ফুট্‌কি। মানে, এককালে তাই ছিলো. এখন ফুট্‌কিগুলো আবছা বাদামী হয়ে গেছে। তার গায়ে সর্বসমেত তিনটে সাদা দাগ আছে; একটা নাকের একপাশ থেকে বেঁকে মাথার উপর দিয়ে ঘাড়ের অর্ধেকটা ঢেকে দিয়েছে। চোরকাঁটা-জড়ানো ঘাড়ের লম্বা লোম কোথাও সাদা, কোথাও বাদামী। দ্বিতীয়টা ডান পাশ দিয়ে

গিয়ে অর্ধেকটা পেটকে ঢেকে দিয়েছে। তৃতীয়টা পাছার উপর থেকে শুরু হয়ে লেজের উপরের দিক ও পাশের অর্ধেকটা পর্যন্ত ছড়ানো। লেজের বাকিটায় সাদা ফুট্‌কি। মস্ত বড় মাথাটা হাড় বের করা; চোখের চারদিকে গভীর গর্ত; আর কালো, কাটা-কাটা ভারী নিচের ঠোঁটটা যেন কাঠ-খোদাই ঘাড় থেকে অনেকখানি ঝুলে পড়েছে। ঝুলে-পড়া ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে মুখের ভিতরকার কালচে জিভটা ও হলুদ দাঁতের গোড়া চোখে পড়ে। কাটা দাগওয়ালা একটা কানসহ দুটো কানই সারাক্ষণ ঘাড়ের উপর পাতা থাকে; তবে মাঝে মাঝে মাছি তাড়াতে সেটাকে নাড়াতে হয়। কানের পিছনকার কিছুটা লোম এখনও ঝুলে আছে; কপালটা বসে গেছে, তাতে অনেক বলি-রেখা; আর গলকম্বল ঝুলে পড়েছে খালি বস্তার মতো। একটা মাছি বসলেই মাথা ও ঘাড়ের গিঁট-গিঁট শিরাগুলো থর্‌থর্ করে কেঁপে ওঠে। মুখের ভাবে কঠোর সংযম, গাম্ভীর্য ও দীর্ঘ যন্ত্রণার প্রকাশ। সামনের পা দুটো হাঁটুর কাছে বাঁকা, দুটো ক্ষুরই ফুলে উঠেছে, ফুট্-ফুট্ দাগওয়ালা সামনের ডান পাটার হাঁটুর কাছে হাতের মুঠোর মতো বড় আকারের একটা মাংস-পিণ্ড ঠেলে বেরিয়েছে। পিছনের পা দুটো অনেকটা ভাল হলেও দুই পাশের লোমগুলো কবে যে ঘষায়-ঘষায় উঠে গেছে, আর গজায়নি। চামড়া-সার শরীরের তুলনায় পাগুলোকে অনেক বেশি লম্বা দেখায়। পাঁজরগুলো গোল-গোল হলেও এমন ঠেলে বেরিয়েছে যে দেখলে মনে হয়, চামড়াটা পরে তার উপর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। পিঠ ও পিঠের উঁচু জায়গাটায় অনেক চাবুকের দাগ; চাবুকের উপরে তো এখনও রয়েছে একটা দগ্‌দগে তাজা ফোলা ঘা। তবু বার্ধক্যের এতসব চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও সকলেরই মনে হবে, আর যেকোনও বিশেষজ্ঞ তো বলতে বাধ্য, যে এককালে সেটা খুব ভাল ঘোড়াই ছিল।

বস্তুত, একজন বিশেষজ্ঞ অবশ্যই বলবে যে রাশিয়াতে মাত্র একটি জাতই আছে যে বংশে এত রকম চওড়া হাড়, এত বড় মালাই-চাকি, এত সুন্দর ক্ষুর, এমন পাতলা পা, এমন মনোরম ঘাড়, আর বিশেষ করে এত সুন্দর মাথা হয়ে থাকে; বড় বড় কালো জ্বলজ্বলে চোখ, মুখের ও ঘাড়ের শিরাগুলির আভিজাত্যব্যঞ্জক বাঁধুনি, চামড়া ও লোমের সুন্দর রং বার্ধক্যের নানা বিরক্তিকর উপসর্গ সত্ত্বেও ঘোড়াটাকে ঘিরে যে বংশ-মাহাত্ম্য ও গভীর আত্মপ্রত্যয় ফুটে উঠেছে তা একমাত্র যে সব জীব নিজেদের শক্তি ও সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন তাদের মধ্যেই দেখা যায়।

একটা জীবন্ত ধ্বংস-স্তূপের মতো ঘোড়াটা একাকি সেই শিশির-ভেজা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে রইল, আর অনতিদূরেই ইতস্তত ছড়িয়ে-পড়া বাচ্চা ও যুবক ঘোড়াগুলি নেচে-কুঁদে, হ্রেষারবে চারদিক মুখরিত করে বেড়াতে লাগল।

৩

ক্রমে সূর্য গাছপালার উপরে উঠে এল; মাঠে ও নদীর বাঁকে ঝকঝকে রোদ ছড়িয়ে পড়ল। শিশির শুকিয়ে ছোট ছোট ফোঁটা হয়ে চিকচিক করছে; জলাভূমি ও

বনের উপরে বিলীয়মান কুয়াশা পাতলা ধোঁয়ার মতো ঘুরছে। আকাশে মেঘ জমেছে, কিন্তু এখনও বাতাস উঠে আসেনি। নদীর ওপারে যবের গাছগুলি নলের মতো সবুজ শিষ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; কচি পাতা ও ফুলের গন্ধে বাতাস ভরে উঠেছে। বনের ভিতর থেকে একটা কোকিল কর্কশ গলায় ডেকে উঠল। আর নেস্টার চিৎ হয়ে শুয়ে জীবনের আর কতদিন বাকি আছে তাই গুণতে লাগল। যবের ক্ষেতে ও জলাভূমির উপরে চাতক পাখিরা উড়ে বেড়াচ্ছে। ঘাসের ভিতর শুয়ে ভাস্‌কা ঘুমিয়ে পড়ল। ঢালু জমির উপর ঘোড়াগুলো তাকে ঘিরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

সুন্দরী ঘোটকিদের দলে সব চাইতে সুন্দরী ও দুষ্টু হল ফুট্‌-ফুট্‌ দাগওয়ালা ঘোটকিটা; সে যা করে অন্য সুন্দরীরাও তাই করে। সে যেখানে যায় অন্য সবাই দল বেঁধে সেখানেই যায়। আজ সকালে তার মেজাজটা বুঝি বিশেষরকম ভাল; মানুষের যেমন মাঝে মাঝে মেজাজ ভাল হয় এও ঠিক তাই। নদীতীরে বুড়ো দামড়াটার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে যেন কোনও কিছু দেখে ভয় পেয়েছে এমনি ভাব দেখিয়ে সে জলের ধার বরাবর ছুটতে শুরু করে দিলো। তার দেখাদেখি অন্য ঘোড়াগুলিও ছুটতে লাগল। ফলে ভাস্‌কাও তাদের পিছনে জোর কদমে ছুটতে লাগল। খানিকক্ষণ ঘাস খেয়ে সে মাটিতে গড়াগড়ি দিলো, ঘোটকিগুলোর নাকের কাছ দিয়ে ছুটাছুটি করে তাদের বিরক্ত করল, এবং শেষটায় একটা বাচ্চাকে তার মায়ের কাছ থেকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে যেন কামড়ে দেবে এমনিভাবে তার পিছনে ছুটতে লাগল। মা-টা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল, বাচ্চাটাও ভয়ে ডাকতে লাগল, কিন্তু ঘোটকি তাকে একটু ছুঁলো না পর্যন্ত; শুধু তার ঘোটকি বান্ধবীদের মজার জনাই সে বাচ্চাটাকে ভয় দেখাচ্ছিল। হঠাৎ তার মাথায় একটা ফন্দি এল; নদী থেকে অনেকটা দূরে একটি মুঝিক (রুশ চাষী) যবের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে একটা চাষের ঘোড়াকে নিয়ে যাচ্ছিল। ঘোটকিটা হঠাৎ থেমে গেল, সগর্বে মাথাটা তুলল, তারপর একটানা মিষ্টি স্বরে ডেকে উঠল। সে ডাকে ছিল মনের একটা আবেগ ও একটা বিশেষ দুঃখের আভাস। ছিল বাসনা, ভালবাসার প্রতিশ্রুতি আর ভালবাসার জন্য আকুলতা।

নলবনের মধ্যে একটা পাখি লাফিয়ে লাফিয়ে কর্কশ গলায় সঙ্গিনীকে ডাকছে; একটি কোকিল ও একটি ভাড়ুই পাখিও প্রেমের গান গাইছে, এমন কি ফুলেরাও পরস্পরের জন্য ছড়িয়ে দিচ্ছে সুগন্ধী পরাগ।

ঘোটকিটিও ডাকতে ডাকতে ভাবল, "আমি সুন্দরী যুবতী, কিন্তু আজও পর্যন্ত ভালবাসার মিষ্টি স্বাদ পেলাম না; শুধু তাই নয়, এতদিনেও একটি প্রেমিকও আমার দিকে ফিরে তাকাল না।"

তার যৌবনের এই বিষণ্ণ হ্রেষা নদীর ঢালু পাড় বেয়ে দূরের মাঠের উপর দিয়ে একটা ধূসর রঙের ঘোড়ার কানে পৌঁছল। ঘোড়াটা কান খাড়া করে ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ল। মুঝিক বাকলের জুতো দিয়ে তাকে লাথি মারল, কিন্তু ঘোড়াটা সেই রূপোলি কণ্ঠস্বরে এতই মুগ্ধ হয়ে পড়েছে যে সেখানে দাঁড়িয়েই ডাকতে লাগল। চাষী রেগে

লাগাম ধরে টান দিলো, আর এত জোরে আবার তার পেটে লাথি মারল যে ঘোড়াটা মাঝখানে ডাক থামিয়ে চলতে শুরু করল। কিন্তু একটা মধুর বিষণ্ণতা তাকে পেয়ে বসল; তার আবেগভরা হ্রেষারব আর মুঝিক-এর ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ এত দূর থেকেও নদীর ওপারে ঘোড়ার পালের কাছে গিয়ে পৌঁছল।

হায়, একটা ঘোটকির ডাকেই যদি ধূসব ঘোড়াটাকে এতদূর মুগ্ধ করে থাকে যে সে তার কর্তব্য ভুলে গেল, না জানি তার সব সৌন্দর্য দেখলে সে কী করত; তখন ঘোটকিটির কান দুটো খাড়া হয়ে উঠেছে, নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হচ্ছে, বাতাসে ঘন ঘন শ্বাস টানছে, তার সুন্দর যৌবনপুষ্ট দেহটা থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে।

কিন্তু তার এই ভাব বেশিক্ষণ রইল না। ঘোড়ার ডাক ক্রমে থেমে যেতেই আর একটিবার মাত্র ডেকে সে মাথাটা নামিয়ে মাটি আঁচড়াতে আঁচড়াতে এগিয়ে গিয়ে বুড়ো দামড়াটাকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি শুরু করে দিলো। বাচ্চাগুলো সব সময়ই তাকে নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করে; মানুষের চাইতে তাদের হাতেই সে নাজেহাল হয় বেশি।

অথচ সে কখনও কারও ক্ষতি করেনি। এখনও সে মানুষের কাজে লাগে, কিন্তু বাচ্চাগুলো তাকে কষ্ট দেয় কেন?

৪

সে বুড়ো, তারা যুবক, সে চর্মসার, তারা নধর; সে বিষণ্ণ, তারা খুশি। এক কথায়, সে অপরিচিত, দলছুট একটা আলাদা জীব, কাজেই তার প্রতি করুণা দেখানোরও দরকার নেই। ঘোড়ারা পরস্পরকে করুণা করে, অবশ্য তার ব্যতিক্রমও আছে। কিন্তু বুড়ো চর্মসার ও কুৎসিত হবার জন্য তো দামড়াটাকে দোষ দেওয়া যায় না। অন্তত দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু অন্য ঘোড়াদের বিচারে তারই দোষ, আর যে সব ঘোড়া যুবক, শক্তিমান ও সুখী, যাদের সামনে আছে ভবিষ্যৎ, তিলমাত্র উত্তেজনাতেই যাদের মাংসপেশীগুলো কেঁপে ওঠে আর লেজটা খাড়া হয়, তাদের কোনও দোষ নেই। হয়তো দামড়াটাও তা বোঝে, তাই যখন মন-মেজাজ ভাল থাকে তখন সেও স্বীকার করে যে এত দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকাটাই দোষের, আর তার খেসারত তাকে দিতেই হবে। কিন্তু সে তো একটা ঘোড়ামাত্র, তাই এই সব ঘোড়াগুলো যখন তাকে অকারণে কষ্ট দেয়, অথচ একদিন জীবনের শেষভাগে তাদের প্রত্যেককেই তো এই অবস্থায় পড়তে হবে, তখন সে দুঃখিত, আহত ও বিক্ষুব্ধ না হয়ে থাকতে পারে না। ঘোড়াগুলোর এই নিষ্ঠুরতার পিছনে একটা আভিজাত্যবোধও কাজ করত। তারা সকলেই বিখ্যাত স্রেতাংকা বংশের সন্তান, কিন্তু দামড়াটার বংশ-পরিচয় কেউ জানে না। তিন বছর আগে ঘোড়ার হাট থেকে তাকে কিনে আনা হয়েছে আশি রুবল দিয়ে।

ঘোটকিটা অত্যন্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে তাকে দিলো একটা ধাক্কা। এর চাইতে ভাল ব্যবহার সেও আশা করেনি; তাই চোখ তুলে কান দুটো নামিয়ে নেওয়া ও দাঁতগুলো মেলে দেওয়া ছাড়া আর কিছু সে করল না। ঘোটকিটা তার দিকে পিছন

ফিরে লাথি মারার ভঙ্গি করল। সে চোখ মেলে দূরে সরে গেল। ঘুম কেটে যাওয়ায় সে ঘাস খেতে লাগল। ঘোটকি ও তার বান্ধবীরা আবার তার চারপাশে ঘুরঘুর করতে লাগল। একটা দু'বছরের বাচ্চা বোকা ঘোটকি সব সময়ই বড় ঘোটকিটাব নকল করে। এবার সেও তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে সব নকলনবীশেব মতোই তাকে বাড়াবাড়িভাবে নকল করতে শুরু করল। সে সোজা গিয়ে নিজের পেট দিয়ে দামড়াকে মারল এক ধাক্কা। এবার কিন্তু সে দাঁত বের করে হুংকার দিয়ে উঠল; তারপর অপ্রত্যাশিত তৎপরতার সঙ্গে সেটাকে তাড়া করে পাছায় একটা কামড় বসিয়ে দিলো। টাক-মাথা বাচ্চাটাও পিছনের পা তুলে মারল তাকে লাথি; তার হাড়-বের-করা পাঁজরে ভীষণ লাগল। বুড়ো ঘোড়াটা নাক ঝেড়ে সেটাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েও কি যেন ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেখান থেকে চলে গেল।

স্বভাবতই দলের সব বাচ্চা ঘোড়াগুলো স্থির করল, এই দুঃসাহসিক আক্রমণের জন্য তারা দামড়াটার উপর প্রতিশোধ নেবে; তারা অনবরত এমনভাবে তাকে খোঁচাতে লাগল যে বেচারি সারাদিনে খাবার ফুরসৎটাও পেল না। সহিসটা অনেকবার সেগুলোকে তাড়িয়ে দিলো, ওগুলো কেন যে এরকম করছে তা সে বুঝতে পারল না। দামড়াটাও এত রেগে গেছে যে বাড়ি ফিরবার সময় হতেই সে নিজে থেকেই নেস্টার-এর কাছে ফিরে এল এবং তার পিঠে জিন চাপিয়ে সহিস যখন তার পিঠে চেপে বসল তখন সে অনেক বেশি সুখী ও নিরাপদ বোধ করল।

বুড়ো সহিসকে বাড়ি নিয়ে যেতে যেতে তার মনে কি ভাবনার উদয় হয়েছিল তা কে জানে? হয়তো সে যৌবনের নিষ্ঠুরতার কথাই ভাবছিল; অথবা হয়তো অন্য সব বুড়োদের মতোই সগর্ব নীরব ঘৃণার সঙ্গে তাদের সব দোষ ক্ষমা করেছিল। মনে যাই থাকুক, আস্তাবলে পৌঁছানো পর্যন্ত সে কথা সে মনেই রেখে দিলো।

সেদিন সন্ধ্যায় জনৈক প্রতিবেশী নেস্টার-এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। জমিদার বাড়ির চাকরদের কুঁড়েঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে দেখতে পেল তার বাড়ির খুঁটির সঙ্গে একটা ঘোড়া ও একখানি গাড়ি বাঁধা রয়েছে, কাজেই তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরবার তাগিদে ঘোড়ার পালকে আস্তাবলে ঢুকিয়ে দিয়েই সে দামড়াটাকে ছেড়ে দিলো; ভাসিলকে ডেকে বলল জিনটা খুলে দিতে। তারপর ফটকে তালা লাগিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে চলে গেল।

সেদিন রাতে আস্তাবলের মধ্যে একটা অসাধারণ ঘটনা ঘটল। হয়তো যে চামড়াব রোগে ভোগা ঘোড়াটাকে হাট থেকে কিনে আনা হয়েছে, যাব বাপ মায়ের খবর কেউ জানে না, সে যে স্মেতাংকা'র প্রো দৌহিত্রী সেই টাক-মাথা বাচ্চাটাকে (এবং সেই সঙ্গে সমস্ত দলটার আভিজাত্যকে) অপমান করেছে সেটাই এত ঘটনাব কারণ অথবা হয়তো উঁচু জিন পরা সওয়ারবিহীন দামড়াটাব কিম্ভুত চেহারাই হল কারণ। ছোট বড় সবগুলো ঘোড়া দাঁত বের করে তার দিকে তেড়ে গেল, ক্ষুর দিয়ে তাব পেটের দুই পাশে লাথি মেরে এদিক ওদিক ছুটিয়া নিয়ে বেড়াল, সে তারস্বরে আর্তনাদ করতে

লাগল। শেষ পর্যন্ত আর সহ্য করতে না পেরে দামড়াটা আস্তাবলের মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল; অক্ষম বৃদ্ধ বয়সের অসহায়তা মেশানো একটা ক্ষীণ ক্রোধ তার মুখে ফুটে উঠল। কান দুটো নামিয়ে হঠাৎ সে এমন একটা কাণ্ড করে বসল যাতে সবগুলো ঘোড়া যার যার জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ল। সব চাইতে বুড়ি ঘোটকি ভিয়াজোপুরিখা দামড়াটাকে একটুখানি শুঁকে একটা দীর্ঘশ্বাস টানল। দামড়াটাও দীর্ঘশ্বাস টানল।

৫

চন্দ্রালোকিত আস্তাবলের মাঝখানে উঁচু জিন-আঁটা দীর্ঘদেহ নিয়ে দামড়াটা দাঁড়িয়ে আছে। এইমাত্র সে যা বলেছে তা শুনে বিস্মিত হয়ে অন্য ঘোড়াগুলিও নীরব, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সত্যি তারা অবাক হয়ে গেছে।

আসলে ঘটনাটি এই।

* * *

প্রথম রাত

''আমি 'মনোহর-প্রধান' ও 'বাবা'-র সন্তান। যদিও বংশ-বিচারে আমাব নাম মুঝিক-প্রধান, তবু সকলেই আমাকে 'গজকাঠি' বলে ডাকে; আমি যেরকম লম্বা পা ফেলে চলতে পারি সাবা রাশিয়াতে আর কেউ তা পারে না বলেই লোকে আমাকে ঐ নামটা দিয়েছিল। পৃথিবীতে আর কোনও ঘোড়ার ধমনীতেই আমার মতো সৎ রক্ত বয় না। এ কথা কোনওদিনই তোমাদের বলতাম না—কেনই বা বলব— ভিয়াজোপুরিখা-র মতো তোমরাও আমাকে চিনতে পারতে না; অথচ এই ভিয়াজোপুরিখা আমার যৌবনকালে খ্রেনোভোতে আমাব সঙ্গেই থাকত, আর এতক্ষণ চিনতে না পারলেও এইমাত্র আমাকে চিনেছে; ভিয়াজোপুরিখা সাক্ষী না দিলে তোমরা আমাব কথা বিশ্বাসও করতে না; তোমাদের কোনওদিনই একথা বলতাম না—একদল ঘোড়ার করুণা লাভেব কোনও দরকার আমার নেই –কিন্তু তোমরা আমাকে এ-কথা বলতে বাধ্য করেছ। হ্যাঁ, আমি সেই 'গজকাঠি' যাকে ঘোড়ার মাংসের বিশেষজ্ঞরা সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে কিন্তু পাচ্ছে না, যে 'গজকাঠি'কে স্বয়ং কাউন্টও চিনত এবং তার প্রিয় 'রাজহাঁস'কে দৌড়ে হারিয়ে দেওয়ার জন্য আস্তাবল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।''

* * * *

''জন্মের সময় আমি জানতাম না সাদা-কালো ফুট্‌কিযুক্ত বলতে কি বোঝায়। শুধু জানতাম আমি একটা ঘোড়া। মনে পড়ে, আমার গায়ের রং সম্পর্কে প্রথম মন্তব্য শুনে আমার মা ও আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলাম। রাতের বেলা আমার জন্ম হয়েছিল; মা আমার শরীরটা চেটে পরিষ্কার কববার পরে সকাল বেলায়ই আমি

পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখলাম। মনে পড়ে, কি যেন চাইছিলাম, আর সব কিছুই বিস্ময়কর অথচ খুব সরল মনে হয়েছিল। একটা লম্বা গরম বারান্দায় ছিল আমাদের আস্তাবল; তার গরাদে-দেওয়া দরজা দিয়ে সব কিছু দেখতে পেতাম। মা আমাকে মাই খেতে দিত, কিন্তু তখন আমি এত অজ্ঞ ছিলাম যে আমার নাকটা দিয়ে কখনও তার পায়ে কখনও তার তলপেটে ঢুঁ মারতাম। হঠাৎ মা গরাদের ফাঁক দিয়ে কি যেন দেখতে পেয়ে আমার উপর একটা পা তুলে দিয়ে আমাকে পিছনে সরিয়ে নিলো। সেদিনকার সহিসটা গরাদের ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল।

"আরে দেখো, 'বাবা' বাচ্চা বিইয়েছে", এই কথা বলে সে হুড়কোটা ঠেলে দিলো। তাজা খড়ের উপর দিয়ে হেঁটে এসে সে আমার গায়ে হাত রাখল।

বলল, "তারাস, দেখবে এস। এটার গায়ে ছাতাবে পাখির মতো ফুট্-ফুট্ দাগ।"

"তার কাছ থেকে ছুট দিতে গিয়ে আমি পা ভেঙে পড়ে গেলাম।"

"হেই! ব্যাটা বিচ্ছু!" সে বলল।

"মার খুব খারাপ লাগল, কিন্তু আমাকে বাঁচাবার কোনও চেষ্টা করল না; একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সরে গেল। অন্য সহিসরাও এসে আমাকে দেখতে লাগল। একজন আস্তাবলের রক্ষককে খবর দিতে গেল। আমার গায়ের রং দেখে সকলেই হাসতে লাগল, আর নানারকম মজার মজার নাম দিতে লাগল। মা বা আমি সে সব নামের অর্থ কিছুই বুঝতে পারলাম না। তখনও পর্যন্ত আমাদের পরিবারে বা আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে ফুট্-ফুট্ দাগওয়ালা কেউ ছিলো না। ঘোড়ার গায়ের রং-এর মধ্যে যে দোষের কিছু থাকতে পারে সে সম্পর্কে আমাদের কোনও ধারণাই ছিল না। তবু আমার গায়ের জোর ও সুন্দর শরীরের প্রশংসা সকলেই করতে লাগল।

"সহিস বলল, "দেখো, বাচ্চাটা কেমন চট্‌পটে! ধরে রাখাই যাচ্ছে না।"

"কিছুক্ষণের মধ্যেই আস্তাবল রক্ষক এল; সেও অবাক হলো, এমন কি তাকে চিন্তিতই দেখালো।

"বলে উঠল, "এই ক্ষুদে দানবটা এল কোত্থেকে? সেনাপতি তো এটাকে পালে রাখবে না।" মার দিকে ফিরে বলল, "হতভাগা 'বাবা', এটা কি করলে! এই ফুট্-ফুট্ দাগওয়ালা ভাঁড়ের চাইতে একটা টাক-মাথা বাচ্চাও তো দিতে পারতে!"

"মা কিছুই বলল না; শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল; এ রকম অবস্থায় এ রকমই সে করত :

"শয়তানটা কার মতো দেখতে হয়েছে? ঠিক যেন একটা মুঝিকের মতো", সে বলতে লাগল। "এটাকে তো পালে রাখা যাবে না, আমাদের তাতে বদনাম হবে। কিন্তু ঘোড়াটা—খুব সুন্দর।" যে আমাকে দেখল সেই এই কথা বলল।

"কয়েকদিন পরে স্বয়ং সেনাপতি এল আমাকে দেখতে। সেও ভয় পেয়ে আমার চামড়ার রং-এর জন্য আমাকে ও মাকে বকতে লাগল।

"যাই হোক, ঘোড়াটা চমৎকার—ভারি চমৎকার", যে দেখল সেই এ-কথা বলল।

"বসন্তকাল পর্যন্ত আমরা আস্তাবলেই যার যার মতো কাটালাম; কিন্তু সূর্যের উত্তাপে ছাদের উপরকার বরফ যখন গলতে শুরু করল তখন মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে তাজা ঘাসে ভর্তি বড় ঘেরা মাঠটায় যেতে পেতাম। সেখানেই প্রথম নিকট ও দূর আত্মীয়দের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। দেখতাম, তখনকার সব বিখ্যাত ঘোটকিরাই বাচ্চাদের নিয়ে আলাদা আলাদা দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসত। তাদের মধ্যে ছিল বুড়ো গোলাংকা; স্মেতাংকার মেয়ে মুশ্‌কা; ক্রাশ্‌নুখা; ও দোব্রোখোতিখা—সেদিনের সব সেরা ঘোড়া। সুন্দরীতে ভরা সেই খোঁয়াড়ের কথা আজও আমার মনে পড়ে। আজ তোমাদের বিশ্বাস করা কঠিন হতে পারে, কিন্তু একদিন আমিও যুবক আর চটপটে ছিলাম। সেখানেই ভিয়াজোপুরিখার সঙ্গে আমার দেখা হয়; সে তো তখন বাচ্চা, কিন্তু খুব হাসিখুশি আর তেজী ছিল। কোনও খারাপ মতলব ছাড়াই আমি বলছি, আজ তোমরা তাকে যতই উঁচু বংশের বলে মনে করো না কেন, সেদিন সে পালের মধ্যে তার স্থান ছিল বেশ নিচেই। এ কথা সে নিজেও মানবে।

"আমার এই ফুট্-ফুট্ দাগ মানুষের যতই খারাপ লাগুক, ঘোড়াদের খুব ভালই লাগত। তারা আমাকে ঘিরে থাকত, আমার প্রশংসা করত, আমার সঙ্গে খেলা করত। গায়ের রং-এর ব্যাপারে মানুষের কথা ভুলে গিয়ে সুখেই দিন কাটাচ্ছিলাম। কিন্তু শীঘ্রই প্রথম দুঃখের অভিজ্ঞতা আমার হলো, আর সে দুঃখ দিলো আমার মা।

"যখন বরফ গলতে শুরু করল, ছাদের নিচে চড়ুইপাখিরা কিচির মিচির শুরু করে দিলো, বসন্তের সুগন্ধে ভরে উঠল বাতাস, তখন আমার প্রতি মায়ের মনোভাব বদলে গেল। আসলে, তার সব কিছুই বদলে গেল, সারাটা খোঁয়াড় জুড়ে সে এমন ভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে বেড়াত যেটা তার বয়সে মোটেই মানায় না; নয়তো দিবাস্বপ্ন দেখতে দেখতে চিঁ-হিঁ-হিঁ করে ডেকে উঠত নয়তো অন্য ঘোড়াদের কামড়ে দিতো, নয়তো আমাকে শুঁকতে শুঁকতে ঘৃণাভরে নাক ডাকাত, আর নয়তো আমাকে রুক্ষভাবে দুধের বাঁট থেকে সরিয়ে দিয়ে তার জ্ঞাতি ভাই কুপচিংকার ঘাড়ের উপরে মাথাটা তুলে দিয়ে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে তার পিঠ চুলকে দিতো।

"একদিন আস্তাবল-রক্ষক এসে গলায় লাগাম পরিয়ে তাকে নিয়ে গেল। তার হ্রেষারব শুনে আমিও নাক ডাকাতে ডাকাতে তার পিছু নিলাম। কিন্তু মা আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। সহিস তারাস এসে আমাকে কোলে তুলে নিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলো। হাত পা ছুঁড়ে সহিসকে খড়ের গাদায় ফেলে দিলাম; কিন্তু দরজায় তালা ঝুলছে; মার হ্রেষারব ক্রমেই অস্পষ্টতর হতে লাগল। কিন্তু সে হ্রেষায় আমার জন্য কোনও ডাক ফুটে উঠল না, সে ডাক সম্পূর্ণ আলাদা। পরে জেনেছিলাম, আর একটি কণ্ঠ, আরও গম্ভীর ও জোরালো একটা ডাকেই সে সাড়া দিচ্ছিল; সেটা দোব্রি-র কণ্ঠস্বর; দুটি সহিস তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল মায়ের সঙ্গে

মোলাকাতের জন্য। আমার মনটা এতই ভেঙে গিয়েছিল যে ওবাস কখন আস্তাবল ছেড়ে চলে গেছে আমি টেরও পাইনি। শুধু বুঝলাম, মায়ের ভালবাসা আমি চিরদিনের মতো হারালাম। তখনই গায়ের রং সম্পর্কে লোকের কথাগুলি মনে পড়ে গেল। ভাবলাম 'আমার ফুট্-ফুট্ দাগের জন্যই এ সব হলো।' তখন আমার এত রাগ হতে লাগল যে আস্তাবলের দেয়ালে মাথা ও হাঁটু ঠুকতে লাগলাম, ঠুকতে ঠুকতে সারা শরীরে ঘাম ঝরতে লাগল, ক্লান্ত হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

"কিছুক্ষণের মধ্যেই মা ফিরে এল। শুনতে পেলাম, অস্বাভাবিক-ভাবে পা ফেলে ফেলে সে বারান্দা দিয়ে এগিয়ে আসছে। দরজাটা খোলা হলো, কিন্তু সে এতই যুবতী ও সুন্দরী হয়ে গেছে যে আমি তাকে চিনতেই পারলাম না। সে আমাকে শুঁকল, নাক ডাকল, তারপর হেসে উঠল। সে যে আমাকে আর ভালবাসে না সেটা তার সব কিছুতেই স্পষ্ট বোঝা গেল। সে আমাকে বলল দেব্রি কত সুন্দর, আর তাকে কত ভালবাসে। বারে বারে তাকে দেব্রি-র কাছে নিয়ে যাওয়া হতে লাগল, আর মায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে এল।

"কিছুদিন পরেই আমাদের ঘাস খাওয়ার জন্য বাইরে যেতে দেওয়া হলো। ফলে জীবনে যে নতুন আনন্দ পেলাম তাতে মায়ের ভালবাসা হারাবার ক্ষতির কিছুটা পূরণ হলো। নতুন বন্ধু ও কমরেড জুটল, একসঙ্গে ঘাস খেতে শিখলাম, বড় ঘোড়াদের মতো ডাকতে শিখলাম আর মায়েদের ঘিরে ঘিরে লাফাতে শিখলাম। কী সুখের দিনই ছিল! আমার সবকিছু ক্ষমা করা হলো, সবাই আমাকে ভালবাসত, প্রশংসা করত, আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত।

"কিন্তু বেশিদিন এরকম চলল না। শীঘ্রই একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটল।' দামড়াটা গভীর শ্বাস টেনে চলে গেল।

ভোর হয়ে এল। দরজায় ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ হলো। ঘরে ঢুকল নেস্টার। ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হলো। সহিস দামড়াটার পিঠে চড়ে বসে এটা ও তার পালকে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে চলল।

৬
দ্বিতীয় রাত

সন্ধ্যায় মাঠ থেকে ফিরবার পরেই ঘোড়ার পাল আবার ফুট্-ফুট্ দাগ দামড়াটাকে ঘিরে ধরল।

সেও বলতে শুরু করল, "আগস্ট মাসে আমাকে মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হলো। তাতে আমার বিশেষ কষ্ট হলো না, বুঝতে পারলাম আমার মা শীঘ্রই আমার ছোট ভাই (বিখ্যাত উসান) কে জন্ম দিতে চলেছে। তাই এককালে আমি তার কাছে যা ছিলাম এখন আর তা নেই। আমার কোনওরকম ঈর্ষা হলো না। তাছাড়া, আমি জানতাম যে মাকে ছাড়বার পরে আমাকে বাচ্চা ঘোড়াদের আস্তাবলে রাখা

হবে; সেখানে আমরা দু'জন তিনজন করে একসঙ্গে থাকব, আর প্রত্যেক দিন আমাদের হাওয়া খাওযাতে বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে। আমাকে ডার্লিং-এর সঙ্গে এক খোঁয়াড়ে রাখা হলো। এই ডার্লিংই পরবর্তীকালে সম্রাটের ঘোড়া হয়েছিল; কত শিল্পী তার ছবি এঁকেছিল, কত ভাস্কর তার মূর্তি বানিয়েছিল। সে সময় সে কিন্তু একটা সাধারণ বাচ্চাই ছিলো। অবশ্য তার চামড়া ছিল নরম ও চকচকে, গলাটা ছিল হাঁসেব মতো, আর পাগুলো বীণাব তারের মতো সরু ও টান-টান। সে ছিল খুবই আমুদে ও সৎপ্রকৃতির; লাফিযে বেড়াতে, বন্ধুদের গা চাটতে এবং বড় ঘোড়া ও মানুষেব সঙ্গে লাগতে ভালবাসত। সে ও আমি খুব বন্ধু হয়ে উঠলাম; সারা যৌবনকালই সে বন্ধুত্ব অটুট রইল। সে সময় সে ছিল খুব ফুর্তিবাজ ও চটপটে। তখন থেকেই সে বাচ্চা ঘোটকিদের সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করেছিল; আমার ভালমানুষী দেখে সে শুধু হাসত। দুঃখের কথা কি বলব, আত্মমর্যাদার দায়েই আমিও তার পথে পা বাড়ালাম। শীঘ্রই আমিও প্রেমে পড়লাম। এই প্রথম মোহ আমার জীবনে একটা প্রচণ্ড পরিবর্তনের কাবণ হয়ে দাঁড়াল।

"হ্যাঁ, আমি প্রেমে পড়লাম। ভিয়াজোপুবিখা আমার চাইতে এক বছবের বড় হলেও সে আর আমি ঘনিষ্ঠ বন্ধু হযে উঠলাম। কিন্তু হেমন্তকাল আসতেই আমি লক্ষ্য করলাম যে আমাকে দেখে সে লজ্জা পাচ্ছে। .প্রথম প্রেমের সব কাহিনী বলতে চেষ্টা করব না; তাব নিজেরই মনে আছে, সে সময তার জন্য যে উন্মাদ আবেগ আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, তার পরিণতিতে আমার জীবনে কী গুরুতব পরিবর্তন ঘটেছিল। সহিসটি তাকে আমার কাছ থেকে তাড়িযে দিলো আব আমাকে নির্মমভাবে মারধোর করল। একদিন তারা আমাকে একটা বিশেষ খোঁযাড়ে নিযে গেল। সারাটা রাত চিৎকাব করে কাটালাম; পরদিন আমাব কপালে যা ছিল সেটা বোধহয আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

"পরদিন সেনাপতি, আস্তাবল-রক্ষক, সহিসবা সকলেই বারান্দা পার হযে আমার খোঁয়াড়ে এসে হাজির হলো। ভয়ানক হৈ-চৈ পড়ে গেল। সেনাপতি আস্তাবল-রক্ষককে বকতে লাগল, সে নিজেকে বাঁচাবার জন্য জানাল যে আমাকে বাইবে যেতে না দেবার হুকুম সে জারি করেছিল কিন্তু সহিসরা তার কথা শোনেনি। সেনাপতি বলল, সে সবাইকে কড়কে দেবে আর বাচ্চা ঘোড়াটাকে অবশ্য দামড়া করে দিতে হবে। আস্তাবল-রক্ষক জানাল, তার সব হুকুমই পালন করা হবে। সব হৈ-চৈ থেমে গেল; তারাও চলে গেল। আমি কিছু বুঝতে পারলাম না, কিন্তু আমাকে নিয়ে একটা কিছু যে করা হবে তা বুঝলাম।

* * * *

"পরদিনই আমার হ্রেষারব চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে গেল; আজ আমি যা আছি তাই হলাম। আমার কাছে জগৎটাই বদলে গেল। কোনও কিছুতেই আর আনন্দ পাই না। নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিলাম আব নিজের ভাবনাতেই ডুবে গেলাম।

প্রথম দিকে কোনও কিছুতেই আমার উৎসাহ ছিল না। বন্ধুদের সঙ্গে খেলা তো দূরের কথা, কিছু খেতাম না, পান করতাম না, বেড়াতাম না। কিছুদিন পরে মাঝে মাঝে ইচ্ছামতো একটু লাফ ঝাঁপ করি, জোরকদমে ছুটি, হ্রেষাধ্বনি করি; কিন্তু তখনই সেই ভয়ংকর প্রশ্নটা মনে জাগত : 'কেন? কিসের জন্য?' আর সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সব রস যেন শুকিয়ে যেত।

"একদিন ঘোড়ার পালকে মাঠ থেকে ফিরিয়ে আনবার সময় আমাকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অনেক দূরে দেখলাম, একটা ধুলোর ঝড় আমাদের ঘোটকিগুলোর আবছা মূর্তিকে ঢেকে ফেলেছে। তাদের খুশির হাসি ও পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। সহিসের টানে গলার দড়িটা আমার গলায় বসে গেলেও আমি দাঁড়িয়ে পড়ে সেই দলটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম —ঠিক যে ভাবে চিরদিনের মতো হারিয়ে-যাওয়া কোনও সুখের দিকে কেউ তাকিয়ে থাকে। কাছে এলে একের পর এক সব্বাইকে চিনতে পারলাম—সব পুরনো বন্ধুর দল; এখন তারা কত বড় হয়েছে, সুন্দর হয়েছে, চিকন ও স্বাস্থ্যবতী হয়েছে। কেউ কেউ আমার দিকে ফিরে তাকাতে লাগল। সহিস গলার দড়ি ধরে কেবলই টানছে, কিন্তু তখন সে যন্ত্রণা তো কিছুই না। নিজের অবস্থা ভুলে গিয়ে আমি আগেকার মতোই ডেকে উঠে তাদের দিকে ছুটে গেলাম। কিন্তু আমার গলার হ্রেষারব কেমন যেন বিষণ্ণ, হাস্যকর ও সঙ্গতিহীন শোনাল। পুরনো বন্ধুরা কেউ হাসল না বটে, কিন্তু সৌজন্যবশত অনেকেই আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। নিশ্চয়ই আমাকে দেখে তাদের বিরক্তিকর, করুণ, লজ্জাজনক এবং সর্বোপরি হাস্যকর মনে হয়েছিল। আমার সরু দড়ির মতো গলা, মস্ত বড় মাথাটা (ইতিমধ্যে আমার ওজন অনেক কমে গেছে), লম্বা অদ্ভুত পাগুলো, আর বোকা-বোকা চলন দেখে নিশ্চয় তাদের হাসি পাচ্ছিল। আমার ডাকে কেউ সাড়া দিলো না; সকলেই আমাকে ফেলে চলে গেল। হঠাৎ যেন সব কিছু বুঝতে পারলাম: তাদের কাছে আমি চিরদিনের মতো পর হয়ে গেছি। তখন এত কষ্ট হয়েছিল যে কেমন করে যে আস্তাবলে ফিরে গিয়েছিলাম তার কিছুই মনে নেই।

"অনেক দিন থেকেই গম্ভীর ও চিন্তাশীল হয়ে পড়েছিলাম; এবার সেটা পুরোপুরি হয়ে গেলাম। গায়ের ফুট্-ফুট্ দাগের জন্য সকলে কেন যে আমাকে ঘৃণা করে বুঝতে পারি না; আস্তাবলে আমার অদ্ভুত অবস্থার কারণও ধরতে পারি না; ফলে ক্রমেই নিজের মধ্যে গুটিয়ে যেতে লাগলাম। সব সময় মানুষের অবিচারের কথাই ভাবি; গায়ের ফুট্-ফুট্ দাগের জন্য তারাই তো আমাকে দোষ দেয়; মায়ের ভালবাসা, নারীমাত্রেরই ভালবাসা যে কত ভঙ্গুর, তা যে সম্পূর্ণভাবে একটা দেহগত ব্যাপার, তাও বসে ভাবি; আর সব চাইতে বেশি করে ভাবি মানুষ নামক এক শ্রেণীর বিচিত্র জীবের কথা আমাদের জীবনে যাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—তাদের খেয়ালের জন্যই তো আজ আস্তাবলে আমার এমন দুরবস্থা হয়েছে যার কোনও কারণ আমি খুঁজে পাই না। মানুষের যে মনোভাব থেকে এই অবস্থার উৎপত্তি একটি ঘটনায় তা আমার কাছে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হলো।

"শীতকালীন ছুটির সময় ব্যাপারটা ঘটল। সারা দিন আমাকে কিছুই খেতে দেওয়া হলো না—না খাদ্য, না পানীয়। পরে জেনেছিলাম, সহিস মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল বলেই এটা ঘটেছিল। সেদিন আস্তাবল-রক্ষক খোঁয়াড়ে ঢুকে আমাকে অভুক্ত দেখে অনুপস্থিত সহিসকে একপ্রস্থ গালাগালি করে চলে গেল। পরদিন সহিস ও তার বন্ধু যখন আমাদের খোঁয়াড়ে খড় এনে দিলো তখন দেখলাম সে খুবই মন-মরা হয়ে পড়েছে; তার পিঠের অবস্থা দেখে আমার করুণা হলো। রাগের সঙ্গে সে খড়গুলো ছড়িয়ে দিলো। গরাদের ভিতর দিয়ে মাথাটা বের করে তার কাঁধের উপর রাখতেই সে আমার নাকের উপর এক ঘুষি বসিয়ে দিলো। তারপর পেটে মারল এক লাথি।

"এই ব্যাটাচ্ছেলের জন্যই যত গোলমাল", সে বলল।

"সে কি?" অন্য সহিস বলল।

"আরে সে তো কাউন্টের বাচ্চাগুলোকে একবারও দেখে না; অথচ নিজেরটাকে দেখতে আসে দিনে দু'বার করে।"

"নিজেরটা? ওই ফুট্-ফুট্ দাগটাকে কি তাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে?"

'দিয়েই দিয়েছে না বিক্রি করেছে কে তার খবর রাখে। কাউন্টের বাচ্চাগুলো না হয় না খেয়ে মরুক তাতে কার কি, কিন্তু তার জিনিসকে আমি না খাইয়ে রাখলাম কোন সাহসে? 'শুয়ে পড়্!' বলেই সে শুরু করে দিলো। আচ্ছা খৃস্টান বটে! মানুষের চাইতে পশুর জন্য দরদ বেশি' লোকটা যে ঈশ্বরকে মানে না তা তো সকলেই জানে। এত বড় জানোয়ার যে চাবুকের মারগুলো নিজেই গুণেছে সেনাপতিও কখনও এভাবে চাবুক মারে না—আমার পিঠটা একেবারে চষে ফেলেছে। ব্যাটার মন বলে কিছু নেই।'

"খৃস্টধর্ম ও চাবুকের কথা সে যা বলল তা তো ভালই বুঝতে পারলাম, কিন্তু 'তার নিজের', 'তার জিনিস' এই সব কথার কোনও অর্থই তখন বুঝতে পারিনি শুধু এইটুকু বুঝলাম যে আস্তাবল-রক্ষক ও আমার মধ্যে একটা সম্পর্কের কথা তারা বলাবলি করছে। সেটা যে কি সে বিষয়ে কোনও ধারণাই তখন আমার ছিল না। আরও কিছুদিন পরে যখন আমাকে অন্য সব ঘোড়া থেকে আলাদা করে রাখা হলো তখন সব বুঝলাম। অবশ্য আমাকে কেন যে একজন মানুষের সম্পত্তি বলা হতো, সেটা আমার মাথায় ঢুকত না। আমি একটা জ্যান্ত ঘোড়া, অথচ আমাকে বলত 'আমার ঘোড়া'; কথাটা আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকত; যেন সে বলছে 'আমার মাটি, আমার বাতাস, আমার জল।'

"তথাপি এই কথাগুলি আমার মনের উপর যেন চেপে বসল। অনেক ভেবেচিন্তে, মানুষের সম্পর্কে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হবার পরে তবে বুঝতে পারলাম এই সব কথার ভিতর দিয়ে মানুষ কি বলতে চায়। এ সব কথার অর্থ : মানুষের জীবন পরিচালিত হয় কাজের দ্বারা নয়, কথার দ্বারা। কোনও কিছু

করা বা না করা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না, কতকগুলি বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করতেই তারা আনন্দ পায়। তাদের কাছে সব চাইতে দামী কথা হলো 'আমি' ও 'আমার'; সবরকম প্রাণী ও জিনিস, এমন কি মাটি, মানুষ ও ঘোড়ার ব্যাপারেও তারা এই কথা দুটি ব্যবহার করে। নিজেদের মধ্যে তারা ঠিক করে নিয়েছে যে কোনও একটি নির্দিষ্ট জিনিসকে 'আমার' বলবার অধিকার শুধু একজনেরই থাকবে। আর এই খেলায় যে লোকটি সব চাইতে বেশিসংখ্যক জিনিস সম্পর্কে এই কথাটা ব্যবহার করবার অধিকার অর্জন করবে তাকেই বলা হবে সব চাইতে সুখী লোক। এটা যে কেমন করে হয় তা জানি না, শুধু তাই হয়। এতে যে কি সুবিধা হয় সেটা বুঝতে আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু বুঝতে পারিনি।

"যেমন ধরো, যারা আমাকে তাদের সম্পত্তি বলে এমন অনেক লোক আমার পিঠে চড়ে না, চড়ে অন্য লোক। তারা আমাকে খাওয়ায় না, খাওয়ায় অন্য লোক। তারা আমার সেবাও করে না, সে কাজ করে অন্য লোক—কোচয়ান, সহিস ও অন্যরা। এই ভাবে ব্যাপক পর্যবেক্ষণের ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে শুধু আমাদের মতো ঘোড়ার কথা নয়, সব কিছুর ব্যাপারেই 'আমি' ও 'আমার' এই ধারণাগুলির মূল ভিত্তি হলো মানুষের সেই জঘন্য পাশব প্রবৃত্তি যাকে তারা বলে থাকে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রবৃত্তি (বা অধিকার)। মানুষ বলে 'আমার বাড়ি', অথচ সে বাড়িতে সে বাস করে না; সে শুধু সেই বাড়িটা তৈরি করেছে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ করছে। আবার কোনও ব্যবসায়ী বলে 'আমার কাপড়ের দোকান,' অথচ সে দোকানের কোনও ভাল কাপড় সে পরে না। এমন অনেক লোক আছে যারা একটুকরো জমিকে তাদের জমি বলে, অথচ সে জমি তারা কখনও চোখেও দেখেনি, বা তাতে কোনওদিন পাও ফেলেনি। এমন কি এমন অনেক লোক আছে যারা অন্য লোককে বলে তাদের সম্পত্তি, অথচ সে সব লোককে তারা কখনও চোখেও দেখেনি, আর সেই সব লোকের সঙ্গে তাদের একমাত্র সম্পর্ক তাদের ক্ষতি করা। অনেক লোক আছে যারা কোনও কোনও স্ত্রীলোককে বলে 'তাদের' মেয়েমানুষ, 'তাদের' স্ত্রী, যদিও সেই সব স্ত্রীলোক অন্য পুরুষের সঙ্গে বাস করে। মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—যত বেশি সম্ভব ভাল কাজ করা নয়, যত বেশি সংখ্যক জিনিসকে 'নিজস্ব' বলতে পারা। আমি তো একান্তভাবে বিশ্বাস করি, মানুষদের সঙ্গে এখানেই আমাদের তফাৎ। মানুষের কাজকর্ম, অন্তত যে সব মানুষের সংস্পর্শে আমি এসেছি তাদের কাজকর্ম পরিচালিত হয় কথার দ্বারা, আর আমাদের কাজকর্ম পরিচালিত হয় কাজের দ্বারা; আর মানুষের তুলনায় আমাদের আর যে সব সুবিধা আছে সেগুলি ছেড়ে দিলেও কেবলমাত্র এই একটি কারণেই আমরা বলতে পারি যে প্রাণীজগতের মই তে আমরা মানুষের তুলনায় এক ধাপ উপরে দাঁড়িয়ে আছি।

"দেখো, আমাকে 'আমার' ঘোড়া বলবার এই অধিকার আস্তাবল-রক্ষককে দেওয়া হয়েছিল বলেই সে সহিসকে চাবুক মেরেছিল। এ-কথা জেনে এবং আমার

গায়ের রং-এর ব্যাপারে মানুষের মনোভাবের কথা জেনে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। মায়েব বিশ্বাসঘাতকতার দুঃখের সঙ্গে এই সব মিশেই আমাকে আজকের এই গম্ভীর ও চিন্তাশীল দামড়ায় পরিণত করেছে।

"তিন দিক থেকে আমি দুর্ভাগা : আমার গায়ে ফুট্-ফুট্ দাগ, আমি দামড়া, আর প্রত্যেক জীবের পক্ষে যেটা স্বাভাবিক সেই মতে একমাত্র ঈশ্বরের বা আমার নিজের সম্পত্তি না হয়ে গেলাম আস্তাবল-রক্ষকের সম্পত্তি।

"আমার সম্পর্কে তাদের এই ধারণার অনেক রকম ফল ফলতে লাগল। তার প্রথমটা হলো, আমাকে অন্য সব ঘোড়া থেকে আলাদা কবে রাখা হতো, ভাল খাবার দেওয়া হতো, অনেক বেশি দলাই-মলাই করা হতো। তিন বছর বয়সের সময় প্রথম আমাকে লাগাম পরানো হলো। সে দিনটার কথা খুব ভালই মনে পড়ে। আস্তাবল-রক্ষক তো আমাকে তার নিজস্ব সম্পত্তি বলেই মনে করত। একদিন একদল সহিসকে সঙ্গে নিয়ে সে এল আমাকে গাড়িতে জুড়তে। সে হযতো ভেবেছিল আমি তাতে বাধা দেব, আর আমাকে সহজে বাগ মানানো যাবে না। তারা আমার ঠোঁটটাকে চিড়ল; শকট-দণ্ড দুটোর মাঝখানে আমাকে ঠেলে দিয়ে দড়ি দিয়ে কষে বাঁধল; পিঠের উপব আড়াআড়ি করে দুটো চামড়ার পেটি ফেলে শকট-দণ্ডের সঙ্গে এমনভাবে বেঁধে দিলো যাতে আমি পা চালাতে না পারি; অথচ সারাক্ষণ কাজেব প্রতি ভালবাসা ও বাসনাই আমার মনটাকে ভরে রেখেছিল।

"আমি যখন একটা বুড়ো ঘোড়ার মতো পা ফেলে বাইবে এলাম তখন তারা অবাক হয়ে গেল। তারা আমাকে চালাতে লাগল, আব আমিও কদমে চলা অভ্যাস করতে লাগলাম। আমি এত উন্নতি করে ফেললাম যে তিন মাস পবেই স্বয়ং সেনাপতি ও অন্য সকলেই আমাব চলবার ঠাটের খুব প্রশংসা করতে লাগল। কিন্তু কী আশ্চর্য, আমি যে আমার নিজের নই, আস্তাবল-রক্ষকের সম্পত্তি এ-কথা ভাবত বলেই তাদের কাছে আমার এই ঠাটের অর্থ দাঁড়াল সম্পূর্ণ আলাদা।

"অন্য সব বাচ্চা ঘোড়াদের ঘোড়দৌড়ের মাঠে নিয়ে যাওয়া হতো, তাদের দৌড়ের রেকর্ড রাখা হতো, লোকজন তাদের দেখতে আসত, সোনালী কাজকরা এক্কায় তাদের জুড়ে দেওয়া হতো, পিঠে বিছিয়ে দেওয়া হতো দামী ঢাকনা। আর আমাকে জুড়ে দেওয়া হতো রক্ষকের সাধারণ গাড়িতে, নিয়ে যাওয়া হতো চেস্‌মেংকা ও আশপাশের অন্য গাঁয়ে। আর সে সব কিছুরই কারণ আমার গায়ে ফুট্-ফুট্ দাগ, আর তাদের মতে কাউন্টেব বদলে আমি রক্ষকের সম্পত্তি।

"আমি তাব সম্পত্তি—রক্ষকের এই ধারণা আমাকে কী গভীর গাড্ডায় নিয়ে ফেলল, যদি বেঁচে-বর্তে থাকি তো সে কথা কাল তোমাদের শোনাব।"

পরদিন সারাক্ষণ ঘোড়াগুলি 'গজকাঠি'কে খুবই সম্মানের চোখে দেখতে লাগল। নেস্টার কিন্তু আগের মতোই খারাপ ব্যবহার করে চলল। মুঝিক-এর ধূসর রং-এর চাষের ঘোড়াটা আবার দলের মধ্যে ঢুকে ডাকতে লাগল, আর ফুট্-ফুট্ দাগওয়ালা ঘোটকিটা আবারও তার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি জুড়ে দিলো।

৭
তৃতীয় রাত

সবে বাঁকা চাদ উঠেছে। খোঁয়াড়ের মাঝখানে দাঁড়ানো 'গজকাঠি'র উপর ছড়িয়ে পড়েছে তার আলো। তাকে ঘিরে ভিড় করেছে অন্য ঘোড়ার দল।

ফুট্-ফুট্ দামড়াটা বলতে লাগল, "সেনাপতির বা ঈশ্বরের না হয়ে আমি যে রক্ষকের সম্পত্তি বনে গেলাম তার বিস্ময়কর ফল এই দাঁড়াল যে একটা ঘোড়ার সব চাইতে বড় গুণ আমার দ্রুত চলার ভঙ্গিই আমার নির্বাসনের কারণ হলো।

"একদিন 'রাজহাঁস'কে দৌড় করানো হচ্ছিল; এমন সময় রক্ষক চেস্‌মেংকা থেকে ফিরবার পথে আমাকে সেখানে নিয়ে গেল। 'রাজহাঁস' আমাদের পাশ কাটিয়ে গেল। সে ভালই ছুটছিল; তবে দেখতেই ভাল; একটা ক্ষুর মাটি স্পর্শ করামাত্রই আর একটা ক্ষুর তুলে নেবার যে কৌশল আমি আয়ত্ত করেছিলাম, যার ফলে একটা পদক্ষেপও নষ্ট হতো না এবং সর্বপ্রযত্নে শরীরটাকে সামনে ঠেলে দেওয়া যেত, সে কৌশল তখনও সে শেখেনি। আগেই বলেছি, 'রাজহাঁস' আমাদের পাশ কাটিয়ে গেল। আমিও মাঠের দাগ-টানা দৌড়ের পথের দিকে এগিয়ে গেলাম; রক্ষক বাধা দিলো না। চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'এই ফুট্-ফুট্-টাকে একবার চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়?' 'রাজহাঁস' আর এক পাক ঘুরে আমাদের কাছে আসতেই রক্ষক আমাকে ছেড়ে দিলো। 'রাজহাঁস' ইতিমধ্যেই অনেকটা এগিয়ে গেছে, কাজেই প্রথম পাকে সে আমাকে ছেড়ে বেরিয়ে গেল, কিন্তু দ্বিতীয় পাকে আমি অনেকটা এগিয়ে গেলাম, গাড়িটাকে ধরে ফেললাম, গলায় গলায় এক হলাম, তারপর তাকে মেরে বেরিয়ে গেলাম। আমাকে আর একটা সুযোগ দেওয়া হলো। আবারও একই ঘটনা। আমার গতি দ্রুততর। তাতে সকলেই ভয় পেয়ে গেল। স্থির হলো, এমন কোনও দূর দেশে আমাকে বেচে দেওয়া হবে যেখানে কেউ আমার খোঁজ-খবর পাবে না। 'কাউন্ট এ সব শুনলে হৈ-চৈ বাঁধিয়ে বসবেন।' তারা বলাবলি করতে লাগল।

"ফলে একজন অশ্ব-ব্যবসায়ীর কাছে আমাকে বেচে দেওয়া হলো। সেও আমাকে বেশিদিন রাখল না। জনৈক অশ্বারোহী সৈনিক (হুজার) আমাকে কিনে নিলো। তাকে নতুন করে ঘোড়ায় চড়া শিখতে হবে। এখানকার সব ব্যবস্থা এতই নিষ্ঠুর ও অন্যায় ছিল যে আমাকে খ্রেনোভো থেকে, যা কিছু এতদিন ছিল আমার প্রিয় তার কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাওয়া হলো তখন আমি খুশিই হয়েছিলাম। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে থাকতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। তাদের জন্য ছিল—ভালবাসা, সম্মান, মুক্তি; আর আমার জন্য ছিল—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাজ আর অসম্মান, অসম্মান আর কাজ। কেন? হায় কেন? একমাত্র কারণ আমার গায়ে ফুট্-ফুট্ দাগ আর সেই জন্য আমি যে হয়েছি অপরের 'সম্পত্তি'।"

সে রাতে গল্পের বাকিটা বলবার সুযোগ 'গজকাঠি' পেল না। এমন একটা কিছু

ঘটল যাতে ঘোড়াদেব মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। ঘোটকি কুপ্‌চিখা-ব তখনও কোনও বাচ্চা হয়নি, সেও মন দিয়ে গল্প শুনছিল, হঠাৎ উঠে পড়ে সে ধীবে ধীবে চালাব দিকে চ'লে গেল সেখানে এত জোবে সে গোঙাতে শুরু কবল যে সব ঘোড়াই সেদিকে মুখ ফেবাল। তা'বা দেখল, সে একবাব শুয়ে পড়ছে, কোনওবকমে উঠে দাঁড়াচ্ছে, আবাব শুয়ে পড়ছে। বুড়ি ঘোড়াগুলো ব্যাপাবটা বুঝতে পাবল, কিন্তু বাচ্চাগুলো খুব ভয় পেয়ে দামড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে তাকে ঘিবে দাঁড়াল।

সকাল নাগাদ আব একটা বাচ্চা নড়বড়ে পায়ে ভব দিয়ে উঠে দাঁড়াল। নেস্টাব সহিসকে ডাকল, সহিস ঘোটকি ও তাব বাচ্চাকে আস্তাবলে নিয়ে গেল, আব সে বাকি ঘোড়াব পাল নিয়ে বেবিয়ে গেল।

৮
চতুর্থ বাত

সেদিন সন্ধ্যায় যখন ফটক বন্ধ হয়ে গেল তাব চাবদিক চুপচাপ হয়ে এল, তখন দামড়াটা তাব গল্প শুরু কবল।

"এক হাত থেকে আব এক হাতে ঘুবতে ফিবতে অনেক বকম মানুষ ও ঘোড়া আমি দেখলাম। দু'জন মনিবেব কাছে আমি অনেক দিন ক'বে ছিলাম একজন প্রিন্স, একটি অশ্বাবোহী বাহিনীব 'হুজাব', আব একটি বৃদ্ধা, থাকত অঘটন ঘটনাকাবী সেন্ট নিকোলাস-এব গির্জাব কাছে।

"আমাব জীবনেব শ্রেষ্ঠ দিনগুলি কেটেছে সেই 'হুজাব' এব কাছে। সেই লোকটিই আমাব সর্বনাশেব কাবণ; জীবনে সে কোনও মানুষকে বা প্রাণীকে কখনও ভালবাসেনি, তবু তাকে আমি ভালবেসেছিলাম, ঠিক এই কাবণেই ভালবেসেছিলাম। তাকে ভালবেসেছিলাম কাবণ সে সুদর্শন, ধনী ও সুখী আব সেই জন্যই সে কাউকে ভালবাসত না। তোমবা হয়তো ব্যাপাবটা বুঝতে পাববে, ঘোড়াদেব এটাই মহৎ অনুভূতি। তাব উদাসীনতা, তাব উপব আমাব একান্ত নির্ভবতা—এইসব কাবণেই তাব প্রতি আমাব ভালবাসা আবও বেড়ে গেল। সেই পুবনো সোনাব দিনগুলিতে আমি ভাবতাম, 'আমাকে মাবো, আমাকে মৃত্যুব দিকে ঠেলে দাও, তাতেই আমি আবও সুখী হবো।'

"বক্ষক আমাকে যে অশ্ব-ব্যবসায়ীব কাছে বিক্রি কবেছিল তাব কাছ থেকেই আমাকে কিনেছিল আট'শ কবল দিয়ে। ফুট ফুট দাগওয়ালা ঘোড়া আব কাবও ছিল না বলেই সে আমাকে কিনেছিল। সেগুলিই আমাব জীবনেব সেবা দিন। তাব একটি বক্ষিতা ছিল। বোজ আমি তাকে তাব বাড়িতে নিয়ে যেতাম, কখনও বা দু'জনকেই বেড়াতে নিয়ে যেতাম বলেই আমি কথাটা জানতাম। বক্ষিতাটি ছিল সুন্দবী, সেও তাই, আব তাব কোচয়ানও তাই, সেই জন্যই আমি তাদেব ভালবাসতাম। আমি তখন কত সুখীই না ছিলাম।

"এই ভাবে আমার দিন কাটত ঃ সকালে সহিস আসত আমার দেখাশুনা করতে—কোচয়ান নয়, সহিস। আমাদের গায়ের ভাপ বেরিয়ে যাবার জন্য সে দরজাটা খুলে দিতো; গোবরগুলো বাইরে ফেলে দিতো; তারপর পিঠের চাদরটা তুলে একটা মোটা চিরুনি দিয়ে আমার গা ঘষে দিত; সাদা সাদা লোমের গুচ্ছগুলি মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ত। আমি খেলার ছলে তার হাত কামড়ে দিতাম, পা ঠুকতাম। তখন সে উঁচু তারের বেড়ার উপর দিয়ে কিছু খড় ফেলে দিত এবং কাঠের গামলায় যই ঢেলে দিতো। সব শেষে আসত বড় কোচয়ান ফিয়োফান।

"কোচয়ানটি ঠিক তার মনিবের মতো। দু'জনের একজনও শুধু নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ভয়ও করত না, ভালও বাসত না; আর সেই জন্যই সকলেই তাদের ভালবাসত। ফিয়োফান-এর পরনে লাল কুর্তা, ভেলভেটের ট্রাউজার ও আস্তিনবিহীন কোট। ছুটির দিনে সে যখন আস্তিনবিহীন কোট পরে, চুল ও গোঁফকে তেল দিয়ে চকচকে করে আস্তাবলে ঢুকে হাঁক দিতো, 'কিরে জানোয়ার, আমাকে ভুলে গেছিস?' এবং তামাশা করার জন্য উকণঠেঙার হাতল দিয়ে আমার পাছায় একটা খোঁচা মারত, তখন আমার বেশ মজা লাগত। ব্যাপারটাকে ঠাট্টা বলে জানতাম বলেই আমিও কান দুটো পেতে দাঁত কড়কড় করতাম।

"একটা কালো বাচ্চার সঙ্গে আমি একত্রে কাজ করতাম। রাতেও আমাকে তার সঙ্গেই জুড়ে দেওয়া হতো। পোল্কানটা হাসি-তামাশা বুঝত না, আর বেজায় হিংসুটে ছিলো। আমাদের খোঁয়াড় ছিল পাশাপাশি; গরাদের ভিতর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমরা সত্যি সত্যি কামড়া-কামড়ি করতাম। ফিয়োফান সেটাকে মোটেই ভয় পেত না। সোজা তার কাছে গিয়ে এমন ভাবে গর্জে উঠত যে তাকে বুঝি মেরেই ফেলবে, কিন্তু না—দড়ির ফাঁসটা নিয়ে তার কাছে গিয়েই সে আবার ফিরে আসত। একদিন পোল্কান আর আমি বেরিয়ে গিয়ে কজ্‌নেৎস্কি স্ট্রীট ধরে দিলাম ছুট জোর কদমে। কিন্তু মনিব বা কোচয়ান কেউ ভয় পেল না; তারা হাসতে হাসতে লোকজনদের চেঁচিয়ে সাবধান করে দিয়ে আমাদের দু'জনকে এমন সুকৌশলে ফিরিয়ে নিয়ে এল যে একটা লোকেরও কোনও রকম আঘাত লাগল না।

"জীবনের অর্ধেক সময় ও শ্রেষ্ঠ গুণগুলি তাদেরই দিয়েছিলাম। তারা আমাকে এত বেশি মদ খেতে দিতো যে তাতেই আমার পাগুলির সর্বনাশ হয়ে গেল; কিন্তু তবু সেই সময়টাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন।

"বারোটার সময় এসে তারা আমাকে সাজ পরাত, ক্ষুরে চর্বি মাখাত, লোম ও ঝুঁটি ভিজিয়ে দিত এবং শকট-দণ্ড দুটির মধ্যে আমাকে জুড়ে দিতো।

"আমাদের স্লেজটা ছিল বাঁশের তৈরি, তাতে ভেলভেটের পাড় বসানো, সাজটার গায়ে ছিল ছোট ছোট রূপোর বক্‌লস্, এবং রাশ ও জালটা ছিল রেশমের। ফিয়োফান-এর পাছার দিকটা তার কাঁধের চাইতে চওড়া; এক হাতে ঘাগরাটা তুলে ধরে রেকাবে পা রেখে মস্করা করে মিছিমিছিই হাতের চাবুকটা দোলাত, কারণ, সে

কখনও ওটা আমার উপব ব্যবহার করত না; তাবপরই সে হাঁক দিতো, 'জোবসে ছোট!' আমিও এক লাফে ফটকটা পাব হয়ে যেতাম; বাঁধুনিটা বালতি হাতে নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ত, আব মুঝিকবা উঠোনে জ্বালানি কাঠ আনতে আনতে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত।

''ফটকের বাইবে কিছুটা গিয়েই আমরা থেমে যেতাম। তখন খানসামা ও অন্য কোচয়ানরা এসে আমাদের সঙ্গে ভিড়ে যেত আর গল্প-গুজব শুরু হয়ে যেত। আমরা ফটকের কাছেই অপেক্ষা করতাম; কখনও বা একটু-আধটু দৌড়ে গিয়ে আবার ফিবে এসে দাঁড়িয়ে থাকতাম।

''শেষ পর্যন্ত ফটকের কাছে একটা হাঁক-ডাক শোনা যেত, আর পাকা চুল ভুঁড়িওয়ালা তিখোন একটা ফ্রক-কোট পরে দৌড়ে এসেই হাঁক ছাড়ত, 'চালাও!' তখনকার দিনে তারা বোকাব মতো বলত না 'আগে বাড়ো!' যেন আগে যেতে হবে, না পিছু হটতে হবে তাও আমরা বুঝি না। ফিয়োফান জিভ দিয়ে একটা শব্দ করত, আর আমরা ছুটতে শুরু করতাম। মেজাজ ভাল থাকলে প্রিন্স ফিয়োফান-কে দু'একটা মজার কথা বলত, আর ফিয়োফানও মাথাটা ঈষৎ ঘুরিয়ে লাগামে সামান্য টান দিতো। তার অর্থ বুঝতাম শুধু আমি। সঙ্গে সঙ্গে জোর কদম—ক্লপ, ক্লপ, ক্লপ; প্রতি পদক্ষেপে গতি দ্রুততব হচ্ছে, শবীরের প্রতিটি পেশী কাঁপছে, পায়ের চাপে ববফ ও কাদা ছিটকে যাচ্ছে। তখনকাব দিনে 'হেঁট-হেঁট' করার বোকা অভ্যাসটাও ছিল না; ওই শব্দটা শুনলেই মনে হয বুঝি কোচয়ানের পেটব্যথা হয়েছে; তখন তারা হাঁক দিত 'দেখে চলো।' ফিয়োফানও বলত, 'দেখে চলো!' আর পথেব লোকজন সবে গিয়ে রাস্তা কবে দিত, এবং গলা বাড়িয়ে সুন্দর ঘোড়া, সুন্দব কোচয়ান ও সুন্দব প্রিন্সকে দেখত।

''অন্য ঘোড়াকে দৌড়ে মেবে দিতে খুব ভালবাসতাম। কোনও গাড়িতে প্রতিযোগিতাব উপযুক্ত ঘোড়া দেখলেই ফিয়োফান ও আমি বাতাসেব গতিতে তার পিছনে ছুটতাম, একটু একটু করে দূরত্ব কমিয়ে এনে অন্য স্লেজটাব গায়ে কাদা ছিটিয়ে দিতাম, স্লেজেব যাত্রীকে পেরিয়ে গিয়ে ঘোড়াটার পাশাপাশি ছুটতে শুরু করতাম, আর তারপরে তাকে মেরে দিয়ে এত বেশি এগিয়ে যেতাম যে তখন আর সেটাকে দেখতে পেতাম না, শুধু শুনতাম তার চলার শব্দ অস্পষ্ট হতে হতে আমার পিছনে মিলিয়ে যাচ্ছে। তবে অন্য ঘোড়াটাকে মেরে বেরিয়ে যেতে যেমন ভালবাসতাম, তেমনি কোনও ভাল ঘোড়াকে কদমে ছুটে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখলেও খুব ভাল লাগত; একটি মুহূর্তমাত্র, একটু সাঁ সাঁ শব্দ, একটি পলকের দেখা, তারপরেই সে উধাও; আবার দু'জন ছুটে চলেছি যার যার পথে।''

ফটকটা সশব্দে খুলে গেল; নেস্টার ও ভাস্‌কার গলা শোনা গেল।

পঞ্চম রাত

আবহাওয়া বদলাতে শুরু করেছে। সকাল থেকেই আকাশের মুখ গোমড়া; শিশির পড়েনি; বাতাস গরম, আর ঝাঁকে ঝাঁকে মশা উড়ছে। ঘোড়ার পাল খোঁয়াড়ে ফিরে আসামাত্রই সকলে দামড়াটাকে ঘিরে ধরল, আর সে তার গল্পের শেষাংশ বলতে লাগল।

"শীঘ্রই আমার সুখের দিন শেষ হলো। মাত্র দু'বছরের সে জীবন। দ্বিতীয় শীতের পরেই পেলাম জীবনের মধুরতম আনন্দের স্বাদ, আর ঠিক তার পরেই পেলাম তীব্রতম দুঃখের স্বাদ।

"শ্রোভ্‌টাইড্‌-উৎসবের সময় প্রিন্সকে নিয়ে গেলাম ঘোড়-দৌড়ে। দৌড় হবে আত্‌লাস্‌নি ও বাইচোক-এর মধ্যে। বাজির ঘরে গিয়ে মনিব কি কথা বলে এল জানি না, কিন্তু বেরিয়ে এসেই আমাকে দৌড়ের আসরে নিয়ে যেতে ফিয়োফানকে হুকুম করল। মনে আছে, আত্‌লাস্‌নির সঙ্গে দৌড়বার জন্য আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আত্‌লাস্‌নি টানছিল একটা হাল্কা দুই চাকার গাড়ি, আর আমার ছিল একটা শহুরে স্লেজ। বাঁকের মুখে আমি তাকে পেরিয়ে গেলাম। চারদিক উচ্চ হাসি ও উল্লাস-ধ্বনিতে ফেটে পড়ল।

"আমাকে বাইরে নিয়ে এলে সারা মাঠ আমাকে ঘিরে ধরল। জনা পাঁচেক অশ্ব-প্রেমিক মনিবকে আমার জন্য হাজার-হাজার দিতে চাইল। কিন্তু মনিব শুধু তার সুন্দর সাদা দাঁতের পাটি বের করে হাসল।

বলল, "না, না; ও তো ঘোড়া নয়, আমার বন্ধু; এক পাহাড় সোনা পেলেও ওকে বেচব না। চলি, ভদ্রমহাশয়রা।" স্লেজের দরজা খুলে সে ভিতরে ঢুকল।

"অস্তোঝেংকা স্ট্রীট-এ চলো।" তার রক্ষিতার ঠিকানা। আমরা ছুটে চললাম।

"সেটাই আমার শেষ সুখের দিন।

"রক্ষিতার বাড়িতে পৌঁছলাম। প্রিন্স বলত রক্ষিতা তার, কিন্তু সে ভালবাসত অন্য একজনকে; তার সঙ্গেই চলে গেছে। রক্ষিতার ফ্ল্যাটে পৌঁছলে সেই কথাই জানানো হলো। তখন পাঁচটা বাজে; আমাকে গাড়ি থেকে না খুলেই রক্ষিতার খোঁজে গাড়ি হাঁকিয়ে দেওয়া হলো। আর আমার প্রতি এমন ব্যবহার করা হলো যা এর আগে আর কখনও করা হয়নি। পিঠে চাবুক মেরে আমাকে জোরে ছুটতে বাধ্য করা হলো। সেই প্রথম আমার পা ফেলতে ভুল হলো; তাতেই লজ্জা পেয়ে নিজেকে শুধরে নিতে চাইলাম, কিন্তু হঠাৎ শুনলাম প্রিন্স গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, "জল্‌দি ছোট্‌ ব্যাটা।" সপাং করে চাবুক পড়ল আমার পিঠে; জোর কদমে পা চালালাম। পঁচিশ ভার্স্ট পথ পেরিয়ে তবে রক্ষিতাকে ধরা গেল।

"মনিবকে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম, কিন্তু সারা রাত শরীরের কাঁপুনি থামল না; কিছু খেতেও পারলাম না। সকালে কিছুটা জল দিলো। তাই খেলাম। কিন্তু সেই থেকে

আমি যেন বদলে গেলাম। অসুস্থ হয়ে পড়লাম; তারাও আমাকে কষ্ট দিতে লাগল, ক্ষত-বিক্ষত করে তুলল – লোকে যাকে বলে 'ধোলাই দেওয়া' তাই করল। পায়ের ক্ষুর নড়বড়ে হয়ে গেল, ঘা হলো, পাগুলো বেঁকে গেল, বুকটা ঢুকে গেল; দেহে ও মনে নির্জীব হয়ে পড়লাম।

"তারা আমাকে এক অশ্ব ব্যবসায়ীর কাছে বেচে দিলো। সে আমাকে গাজর ও আরও অনেক কিছু খাওয়াল। যারা কিছু জানে না তাদের বোকা বানাবার জন্য আমি যা নই আমাকে তাই বানিয়ে তুলল। তখন আমার না আছে ক্ষমতা, না আছে দ্রুতগতি। যখনই কোনও খদ্দের আসত তখনই সে আস্তাবলে ঢুকে আমাকে যন্ত্রণা দিত, চাবুক মারত। তারপর চাবুকের দাগ মুছে ফেলে আমাকে বাইরে নিয়ে যেত।

"এক বুড়ি আমাকে কিনল। সে আমাকে অঘটন-ঘটনাকারী সেন্ট নিকোলাস-এর গির্জায় চালিয়ে নিয়ে যেত, আর কোচয়ানকে চাবুক মারত। কোচয়ান আস্তাবলে আমার কাছে এসে কাঁদত। তখনই প্রথম জানলাম, চোখের জলেরও একটা মধুর নোনতা স্বাদ আছে। বুড়ি মারা গেল। তার গোমস্তা আমাকে বেচে দিলো এক দোকানির কাছে। তার কাছে থাকার সময় অনেক বেশি গম খাওয়ার ফলে আমার অসুখ বেড়ে গেল। সে আমাকে এক চাষীর কাছে বেচে দিলো। তার লাঙল টানতাম, আর বলতে গেলে কিছুই খেতাম না। আবার অসুস্থ হয়ে পড়লাম।

"কিছু জিনিসের বিনিময়ে আমাকে দিয়ে দেওয়া হলো এক বেদেকে। সে আমার সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার করত এবং শেষ পর্যন্ত এখানকার এক পেয়াদার কাছে আমাকে বেচে দিলো। সেই থেকে এখানেই আছি।"

কারও মুখে একটি শব্দ নেই। বৃষ্টি পড়তে লাগল।

৯

পরদিন সন্ধ্যাবেলা ঘোড়ার পালকে যখন বাড়ি ফিরিয়ে আনা হচ্ছিল তখন তাদের সঙ্গে মনিবের দেখা হয়ে গেল। সঙ্গে একজন অতিথি। ঝুলুদিবাই তাদের প্রথম দেখতে পায়—দুটি পুরুষ মানুষ: একজন খড়ের টুপি মাথায় তরুণ মনিব, অপর জন সামরিক পোশাক পরিহিত, লম্বা ও মোটাসোটা। বুড়ো ঘোটকিটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে পাশ কাটিয়ে গেল। কিন্তু বয়স অল্প হওয়ায় অন্য ঘোড়াগুলো লজ্জা ও অস্বস্তি বোধ করতে লাগল, বিশেষ করে মনিব যখন অতিথিকে নিয়ে একেবারে তাদের মাঝখানে ঢুকে গেল এবং তাদের দেখিয়ে দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করে দিলো।

"ঐ ধূসর-কালো ঘোড়াটা কিনেছিলাম ভোয়িকভ-এর কাছ থেকে", মনিব বলল।

"সাদা পা ঐ কালো বাচ্চাটা কার? ওটা তো ভারি সুন্দর", অতিথি বলল।

দৌড় করিয়ে, দাঁড় করিয়ে নানাভাবে অনেকগুলো ঘোড়া তারা দেখল। ফুট্-ফুট্ দাগ ঘোটকিটাকেও দেখল।

"ওটা খ্রেনোভো-র সওয়ারী জাতের ঘোড়া", মনিব বলল।

তারা সবগুলো ঘোড়া দেখে উঠতে পারল না। মনিব নেস্টারকে ডাকল। দামড়াটাকে জোর কদমে চালিয়ে বুড়ো লোকটি হাজির হলো। একটা পায়ে খুঁড়িয়ে চললেও দামড়াটা জোর ছুটে এল; পরিষ্কার বোঝা গেল, তাকে রুদ্ধশ্বাস গতিতে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে ছুটে যেতে বললেও সে আপত্তি করত না। জোর কদমে ছুটতে সে ভালবাসে, আর ভাল পাগুলোর সাহায্যে সেই চেষ্টাই করল।

অন্য একটা ঘোড়াকে দেখিয়ে মনিব বলল, "আমার কথা বিশ্বাস করুন, সারা রাশিয়াতে ওর চাইতে ভাল ঘোটকি আপনি একটাও পাবেন না।" অতিথিও সেটার প্রশংসায় কিছু বলল। মনিব উত্তেজিতভাবে দৌড়োদৌড়ি শুরু করে দিলো; ঘোড়াগুলোকে দেখিয়ে তাদের ইতিহাস ও বংশ-মর্যাদার বিবরণ শোনাতে লাগল। সে সব কথা অতিথির ভাল লাগছিল না, তবু আগ্রহেব ভান করে সে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগল।

"হ্যাঁ? ওঃ।" অন্যমনস্কভাবে সে বলল।

অতিথির বিরক্তি বুঝতে না পেরে মনিব বলল, "এটাকে দেখুন। পাগুলো লক্ষ্য করুন। ওর পিছনে অনেক টাকা ঢেলেছি, কিন্তু তিন বছরের বাচ্চাটা এর মধ্যেই কদমে ছুটতে শিখেছে।"

"খুব ভাল ছোটে বুঝি?" অতিথি প্রশ্ন করল।

একটার পর একটা ঘোড়ার কথা আলোচনা করতে করতে আর যখন বলবার কিছু রইল না, তখন তারা চুপ করল।

"আচ্ছা, এবার তাহলে চলি?"

"চলুন।"

তাবা ফটক পেরিয়ে গেল। এবার বাড়ি ফিরে পান-ভোজন-ধূমপান করা যাবে ভেবে অতিথি মনে মনে খুশি হলো। তখন তার মেজাজ বেশ খুশ্। দামড়ার পিঠে বসে নেস্টার হুকুমের অপেক্ষায় ছিল। তার পাশ দিয়ে যাবার সময় অতিথি তার মস্ত বড় মাংসল হাত দিয়ে দামড়াটার পাছায় জোর একটা থাপ্পড় কষালো।

বলে উঠল, "এটি আপনার চমৎকার সম্পত্তি! আপনার কি মনে আছে, আপনাকে বলেছি একসময় আমারও একটা ফুট্-ফুট্ দাগওয়ালা ঘোড়া ছিলো?"

তার নিজের ঘোড়ার কথা নয় বলে মনিব সেদিকে কান দিলো না; নিজের ঘোড়ার পালের দিকেই তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ একটা দুর্বল, অক্ষম, অদ্ভুত হ্রেষাধ্বনি কানে যেতেই সে চমকে উঠল। দামড়াটা ডাকছে! কিন্তু শেষ না করেই সেটা মাঝপথে থেমে গেল। মনিব বা অতিথি কেউ তার দিকে নজর না দিয়ে বাড়ি চলে গেল।

"গজকাঠি" মোটা লোকটিকে চিনতে পেরেছে—সেই তার প্রিয় মনিব একদা ধনী ও সুদর্শন প্রিন্স সের্পুখভ্স্কোই।

১০

ঝির-ঝির করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। খোঁয়াড়ের অবস্থা হলো শোচনীয়, কিন্তু বড় বাড়িটার তাতে কিছু হলো না। বিলাস-বহুল বসবার ঘরে বিলাস-বহুল চা পরিবেশন করা হলো। চায়ের টেবিলে গৃহকর্তা, কর্ত্রী ও অতিথি সমাসীন।

গৃহকর্ত্রী গর্ভবতী। তার উঁচু পেট, সামোভারের ওপাশে খাড়া হয়ে বসবার ভঙ্গি, ফোলা ফোলা চেহারা, বিশেষ করে তার অন্তর্মুখী দুটি গম্ভীর, নরম বড় বড় চোখ দেখলেই সেটা বোঝা যায়।

গৃহস্বামীর হাতে দশ বছরের পুরনো বিশেষ গুণ-সম্পন্ন চুরুটের একটা বাক্স; এ ধরনের চুরুট তার কাছে ছাড়া আর কোথাও নেই, গর্বভরে এই কথাই সে অতিথিকে বলছিল। গৃহস্বামী পঁচিশ বছরের সুশ্রী যুবক—সুদর্শন, সুসজ্জিত, সুবেশ। বাড়িতে সে পরে লন্ডনের দর্জি দিয়ে তৈরি ঢিলে পশমী সুট। ঘড়ির চেন থেকে ঝুলছে সোনার ভারী পদক। আস্তিনের ভারী সোনার বোতামে নীল পাথর বসানো। সে দাঁড়ি ছেঁটেছে তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর ঢঙে; উপরের ঠোঁটের দু'দিকে ইঁদুরের লেজের মতো ঠেলে উঠেছে; সেটাকে মোমে মাজা হয়েছে প্যারিসীয় পরিচ্ছন্নতায়।

অতিথি নিকিতা সেরপুখভ্স্কোই-র বয়স চল্লিশের উপরে—লম্বা, মোটা, টাক-মাথা, পুরু গোঁফ ও জুলপি। যৌবনে সে নিশ্চয়ই সুপুরুষ ছিল; কিন্তু এখন দেখে মনে হয় দৈহিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক—সব দিক থেকেই সে একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে।

একসময়ে নিকিতা সেরপুখভ্স্কোই-র বিশ লক্ষ রুবলের সম্পত্তি ছিল, আর এখন সে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার রুবল ঋণগ্রস্ত। এ ধরণের লোকের বাজারে যে সুনাম থাকে তার জোরেই সে এত রুবল ধার করতে পারে যাতে আরও দশটা বছর সেই একই হারে জাঁকজমকের ভিতর দিয়েই কাটিয়ে দেওয়া যায়। ক্রমে সে দশ বছরও কেটে গেল; সুনাম গেল মিলিয়ে; আর তাই এখন নিকিতার কাছে জীবন একটা বোঝার মতো হয়ে উঠেছে; সে মদ ধরেছে—তার মানে, মদই তাকে ধরেছে। আসলে মদ সে কখনও ধরেওনি, ছাড়েওনি। গৃহস্বামীর সুখ-সম্পদ দেখে নিকিতার নিজেকে বড়ই ছোট মনে হতে লাগল; যে অতীত চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে তার স্মৃতি মনে পড়ায় তাকে ঈর্ষাতুর করে তুলল।

"আমরা ধূমপান করলে কি আপনার আপত্তি হবে দেবী?" —বহু অভিজ্ঞতালব্ধ এমন সুরে ও ভঙ্গিতে সে কথাগুলি বলল যেভাবে ভদ্রজনরা বন্ধুর স্ত্রীর থেকে আলাদা করে তার রক্ষিতার সঙ্গে কথা বলে থাকে।

সে একটা চুরুট হাতে নিল। গৃহস্বামী বোকার মতো মুঠো-ভর্তি চুরুট তুলে তার দিকে এগিয়ে ধরল।

"এই যে এগুলো নিন; খেয়ে দেখুন কত ভাল জিনিস।"

নিকিতা সেগুলোকে একপাশে সরিয়ে রাখল। তার দুই চোখে অপমান ও আঘাত যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল।

"ধন্যবাদ!" নিজের সিগারেট-কেস বের করল। "আমার জিনিস একটা খান।"

গৃহকর্ত্রীটি আরও স্পর্শকাতর। এ সব দেখে শুনে সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "চুরুট খেতে আমি ভীষণ ভালবাসি। আমার তো মনে হয়, আশেপাশের কেউ ধূমপান না করলেও আমার লোভ কমবে না।" বলেই সে মিষ্টি করে হাসল। জবাবে নিকিতাও আধখানা হাসি হাসল; তার দুটো দাঁত নেই।

গৃহস্বামী তবু বলল, "না, এটা খান। ওগুলো বড়ই নরম। ফ্রিজ, একটা নতুন বাক্স নিয়ে এস তো!"

জার্মান পরিচারক একটা নতুন বাক্স এনে দিলো।

"আপনি কি বেশি ভালবাসেন কড়া? তাহলে তো এই সেরা জিনিস। এই সবগুলোই আপনি নিন।" বিরল সম্পত্তি দেখাবার সুযোগ পেয়ে সে বুঝি বুদ্ধি-বিবেচনা সবই হারিয়ে ফেলেছে। সের্‌পুখভ্‌স্কোই একটা চুরুট ধরিয়ে আবার আলোচনা শুরু করল।

"আত্‌লাস্‌নি-র জন্য কত খরচ করেছেন বললেন?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"মোটা টাকা। অন্তত পাঁচ হাজার। তবে ঘোড়াটা তার উপযুক্তই বটে। তার বাচ্চাটাকে আপনার দেখা উচিত।"

"ভাল দৌড়বাজ কি?"

"প্রত্যেকটি। এ বছর তার বাচ্চাটা তিনটে পুরস্কার জিতেছে: একটা তুলা-য়, একটা মস্কো তে, আর একটা সেন্ট পিতার্সবুর্গে। ওই ব্যাটা জকি যদি চার-চারটে ভুল না করত, তাহলে ও তো সেটাকে পতাকার কাছেই মেরে বেরিয়ে যেত।"

সের্‌পুখভ্‌স্কোই বলল, "এখনও একটু কাঁচা আছে। আমার কথা যদি মানেন তো বলি, ওর মধ্যে ওলন্দাজ রক্ত একটু বেশিমাত্রায়ই আছে।"

"আর ঘোটকিগুলো? কাল আপনাকে সব দেখাব। দোব্রিনিয়ার জন্য খরচ করেছি তিন হাজার, আর লাস্কোভায়ার জন্য দুই।"

গৃহস্বামী আবার তার ধন-দৌলত নিয়ে গর্ব করতে লাগল। গৃহকর্ত্রীটি বুঝতে পারল যে, এতে সের্‌পুখভ্‌স্কোই কষ্ট পাচ্ছে, আর সব কথা শুনবার ভান করছে মাত্র।

সে জিজ্ঞাসা করল, "এখন কি তোমরা একটু চা খাবে?"

"না" বলেই গৃহস্বামী আবার গল্প জুড়ে দিলো। মহিলাটি উঠে দাঁড়াতেই গৃহকর্তা তাকে বাধা দিলো, দুই হাতে জড়িয়ে ধরে তাকে চুমো খেলো।

তাদের কাণ্ড দেখে সের্‌পুখভ্‌স্কোই হাসতেই যাচ্ছিল—যদিও একটু অস্বাভাবিক হাসি, কিন্তু গৃহস্বামী যখন স্ত্রীর কোমর জড়িয়ে ধরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল, তখন তার মুখের ভাব বদলে গেল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল; তার ফোলা মুখে একটা হতাশার ভাব ফুটে উঠল। এমন কি একটা ক্রুদ্ধ প্রতিবাদের ছায়াও পড়ল।

১১

হাসতে হাসতে ফিরে এসে গৃহস্বামী নিকিতার উল্টোদিকে বসল। কিছুক্ষণ কেউ কিছু বলল না।

একসময় সের্‌পুখভ্‌স্কোই বলে উঠল, "আপনি ওকে ভোয়িতভ এর কাছ থেকে কিনেছিলেন বললেন না?"

"হাঁ, আত্‌লাস্‌নি-কে। দুবোভিৎস্কির কাছ থেকেও একটা ঘোটকি কিনতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পছন্দমতো একটাও পেলাম না।"

"তার তো বারোটা বেজে গেছে," কথাগুলি বলেই সের্‌পুখভ্‌স্কোই হঠাৎ থেমে গিয়ে চারপাশে তাকাল। তার মনে পড়ল "এই বারোটা বেজে যাওয়া" ভদ্রলোকের কাছেই তার বিশ হাজার রুবল দেনা আছে। লোকে যদি দুবোভিৎস্কি কেই বলে সর্বস্বান্ত, তাহলে তাকে কি বলবে? সে চুপ করে গেল।

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ। অতিথির কাছে কি কি জিনিস নিয়ে গর্ব প্রকাশ করা যায় গৃহস্বামী মনে মনে তারই হিসাব করতে লাগল। আর সের্‌পুখভ্‌স্কোই ভাবতে লাগল, কেমন করে সে বোঝাবে যে তার বারোটা এখনও বাজেনি। চুরুটের কড়া মৌতাত সত্ত্বেও দু'জনের চিন্তাই বেশ ধীরগতি।

সের্‌পুখভ্‌স্কোই মনে মনে বলল, "না জানি কখন ইনি কিছু পান করতে বলবেন?"

আবার গৃহস্বামীও ভাবতে লাগল, "একটু কিছু পান করা যাক, নইলে কিছুই ভাল লাগছে না।"

"আপনি কি এখানে অনেক দিন থাকবেন?" সের্‌পুখভ্‌স্কোই জিজ্ঞাসা করল।

"আর এক মাস। একটু কিছু খেলে কেমন হয়? ফ্রিজ, খানা তৈরি?"

তারা খাবার ঘরে গেল। ঝাড়-লণ্ঠনের নিচে একটা টেবিল পাতা। তাতে কয়েকটা বাতিদান ও নানাবিধ রুচিসম্পন্ন জিনিস সাজানো; বক যন্ত্র, পুতুলের মুখ লাগানো বোতল, ভদ্‌কা, ভাল মদে ভর্তি কাঁচের পাত্র, সুখাদ্য বোঝাই থালা। তারা পান করল, খেলো, আবার পান করল, আবার খেলো, তারপর আবার গল্প শুরু করল। সের্‌পুখভ্‌স্কোই-র মুখ লাল হয়ে উঠল, আর মুখের লাগামও গেল ঢিলে হয়ে।

তারা নারীসংক্রান্ত আলোচনায় মেতে উঠল। যে সব মেয়েমানুষ নিয়ে তারা দিন কাটিয়েছে সেই সব বেদেনী, ফরাসিনী ও নাচনেওয়ালীদের কথা বলতে লাগল।

গৃহস্বামী প্রশ্ন করল, "তাহলে মাতিয়েব-কে আপনি ছেড়ে দিলেন?" এই মাতিয়েরই সের্‌পুখভ্‌স্কোইর বারোটা বাজিয়েছে।

"আমি ছাড়িনি, সেই আমাকে ছেড়েছে। আরে, পুরুষকে যে কত ভোগান্তিই ভুগতে হয়! আজকাল হাজার হাজার রুবল হাতে নিয়ে বেশ মজাতেই আছি। সব কিছু ছেড়ে দিয়ে কোথাও চলে যেতে চাই। মস্কোতে আর থাকতে পারছি না। সব মনে পড়ে যায়!"

সের্‌পুখভ্‌স্কোই-র কথাবার্তা গৃহস্বামীর মোটেই ভাল লাগছে না। সে চায় নিজের কথা বলতে, ঐশ্বর্যের চমক দেখাতে। আর সের্‌পুখভ্‌স্কোই চায় তার কথা, তার অতীত জাঁকজমকের কথা বলতে। অতিথিকে এক গ্লাস মদ ঢেলে দিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল কতক্ষণে তার গ্লাসটা ফুরোবে আর সেও তাকে প্রাণ ভরে শোনাতে পারবে কেমন করে সে এমন একটা ঘোড়ার খামার তৈরি করেছে যেমনটি কেউ কোনও দিন ভাবতেও পারেনি; সে আরও শোনাবে যে, মেরী তাকে হৃদয় দিয়েই ভালবাসে, শুধু টাকার জন্য নয়।

"আমি বলতে চাই যে আমার খামারে—" সে শুরু করতেই সের্‌পুখভ্‌স্কোই বাধা দিলো।

"সত্যি বলছি, এমন একসময় ছিল যখন আমি জীবনকে ভালবাসতাম, কেমন করে বাঁচতে হয় তা জানতাম। আপনি তো ঘোড়ায় চড়ার কথা বলছিলেন; বলুন তো সব চাইতে দ্রুতগামী কোন ঘোড়ায় আপনি চড়েছেন?"

গৃহস্বামী মওকা পেয়ে যেই তার ঘোড়ার খামারের কথা বলতে যাবে অমনি সের্‌পুখভ্‌স্কোই আবার বাধা দিলো।

"জানি, জানি, আপনারা খামারওয়ালারা বোঝেন শুধু নাম কেনা; কেমন করে জীবনকে ভোগ করতে হয়, মজায় দিন কাটাতে হয়, তা জানেন না। আমি কোনওদিন ও রকম ছিলাম না। মনে আছে তো, আপনাকে বলেছিলাম যে আপনার মতো আমারও একটা ফুট্‌ফুট্ দাগওয়ালা ঘোড়া ছিলো? সে যে কী ঘোড়া বললে বিশ্বাস করবেন না! সে ধরুন '৪২ সালের কথা। সবে মস্কোতে এসেছি। ঘোড়া-ব্যবসায়ীদের কাছে গিয়ে একটা ফুট্‌ফুটে দামড়া দেখতে পেলাম। পছন্দসই মাল। দাম? এক হাজার। পছন্দ হলো, কিনে ফেললাম, সওয়ার হয়ে ছুটতে লাগলাম। সেরকম আর একটা ঘোড়া আপনি, আমি, বা আর কেউ কোনও দিন পাবে না! কি গতি, কি বল, কি রূপ---কিছুতেই তার জুড়ি নেই। আপনি তো তখন ছেলেমানুষ; তাকে চেনবার কথা নয়; তবে নাম নিশ্চয় শুনেছেন। তখন সারা মস্কো জুড়ে তার নাম।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও গৃহস্বামী বলল, "হ্যাঁ, মনে হচ্ছে যেন তার কথা শুনেছি। আমি আপনাকে বলতে চাই আমার—"

"সে তো বলেইছেন। সঙ্গে সঙ্গে কিনে ফেললাম; কাগজপত্র দেখলাম না, বংশমর্যাদার খোঁজ নিলাম না, কারও সুপারিশের জন্যও অপেক্ষা করলাম না। ভোয়িকভ ও আমিই তার পূর্বপুরুষের খোঁজ বের করলাম। নাম ছিল 'গজকাঠি'; মনোহর-প্রধানের ছেলে। এক একটা পা ফেলে এই এতখানি লম্বা। খ্রেনোভো ঘোড়ার খামার থেকে তাকে বিক্রি ক'রে দেওয়া হয়েছিল আস্তাবল-রক্ষকের কাছে। আস্তাবল-রক্ষক তাকে দামড়া ক'রে এক অশ্বব্যবসায়ীব কাছে বেচে দিলো। সেরকম ঘোড়া আর হয় না! আহা, কী দিনই ছিল। যৌবন, আমার হারানো যৌবন!" মুখে বেদেদের একটা গানের কলি ভেঁজে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "সত্যি সে সব দিনকাল

ছিল বটে। বয়স পঁচিশ বছর, বছরে আশি হাজার আয়, মাথায় এক গাছি চুলও পাকেনি, মুক্তোর মতো দাঁতগুলো সব ঠিক আছে। যাতে হাত দিই তাতেই লক্ষ্মী; আর আজ—সব শেষ।"

সে একটু থামাতে সুযোগ পেয়ে গৃহস্বামী বলল, "সেকালের ঘোড়াগুলো এখনকার ঘোড়াদের মতো ছুটতে পারত না। যদি শোনেন তো বলি, আমার প্রথম ঘোড়াগুলো যখন দৌড়তে শুরু করে—"

"আপনার ঘোড়া! আরে, তখনকার ঘোড়া সব কত জোর ছুটত!"

"কি বলছেন? জোর ছুটত?"

"ঠিক বলছি—খুব জোর। মনে আছে, মস্কোর এক ঘোড়-দৌড়ে একবার 'গজকাঠি'-কে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার নিজের কোনও ঘোড়ার নাম তালিকায় লেখাইনি। ঘোড়-দৌড় আমি কোনও কালেই পছন্দ করি না; আমি কেবল ভাল ভাল ঘোড়া পুষতাম : সেনাপতি, শোলেট, মহম্মদ। ফুট্-ফুট্ ঘোড়াকে নিয়ে গেলাম। কোচয়ানটাও ছিল চমৎকার। লোকটাকে ভালবাসতাম। মদ গিলেই মরল। যাহোক, দৌড়ের মাঠে তো গেলাম। সকলে জিজ্ঞাসা করল, 'সেরপুখভ্স্কোই, কবে আপনি দৌড়ের ঘোড়া কিনবেন?' আমি বললাম, 'দৌড়ের ঘোড়া কিসে লাগবে? আমার এই টাট্টুই তোমাদের বাছা-বাছা দৌড়ের ঘোড়াকে মেরে বেরিয়ে যাবে।' তারা বলল, 'সেটি আর আপনার জীবনে হচ্ছে না।' আমি বললাম, 'বেশ, এক হাজার রুবল বাজি।' কর-মর্দন করা হলো। দৌড় শুরু হলো। আমার ঘোড়াই পাঁচ সেকেন্ড আগে পৌঁছে প্রথম হলো। হাজার রুবল জিতে নিলাম। কিন্তু সেটা কিছুই নয়। একবার জাত-ঘোড়ার এক 'ত্রয়কা' (তিন ঘোড়ার গাড়ি) চেপে তিন ঘণ্টায় এক শ' ভার্স্ট পথ পাড়ি দিয়েছিলাম। মস্কোতে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল।"

সেরপুখভ্স্কোই এমন কৌশলের সঙ্গে একটানা মিথ্যা বলে যেতে লাগল যে গৃহস্বামী মুখ খুলবারই অবসর পেল না। মুখে একটা মন-মরা ভাব ফুটিয়ে তার মুখোমুখি বসে দু'জনের জন্য গ্লাসে মদ ঢালা ছাড়া আর কিছুই তার করবার ছিলো না।

আলো দেখা দিলো। তারা তখনও বসে। গৃহস্বামীর এত একঘেয়ে লাগছিল যে বলা যায় না। শেষ পর্যন্ত সে উঠে দাঁড়াল।

"আচ্ছা, শোবার সময় হয়েছে," বলে সেরপুখভ্স্কোই গাল ফুলিয়ে স্খলিত পায়ে তার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

গৃহস্বামী তার ঘরণীর পাশে শুয়ে আছে।

"লোকটা একেবারে অসহ্য। মদে চুর হয়ে কেবলই মিথ্যা বলে গেল।"

"আর আমার সঙ্গেও ফষ্টিনষ্টির চেষ্টা করেছিল।"

"ভয় হচ্ছে, আবার ধার না চেয়ে বসে।"

পোশাক-পরা অবস্থাতেই সেরপুখভস্কোই বিছানায় শুয়ে আছে।

ভাবছে, "একগাদা মিথ্যা বললাম। তাতে কি হয়েছে? মদটা ভাল, তবে লোকটা শুয়োরের বাচ্চা। ব্যবসায়ীর মতো। আর আমিও তো শুয়োরের বাচ্চা।" সে হেসে উঠল। "আগে আমি তাদের রাখতাম, এখন তারাই আমাকে রাখে। সেই উইংক্রার মেয়েমানুষটাই আমাকে পুষছে—আমি তার কাছ থেকে টাকা নেই। সে-ব্যাটাকে টিট করেছে; য্যায়সা কা ত্যায়সা। কিন্তু পোশাকটা খোলা দরকার। এই বুটজোড়াকে কিছুতেই খুলতে পারছি না।"

"হেই!" চেঁচিয়ে হাঁক দিলো; কিন্তু চাকরটা অনেক আগেই বিছানা নিয়েছে।

উঠে বসল, জোব্বা ও ওয়েস্টকোট খুলল, ট্রাউজারটাকেও কোনওক্রমে লাথি মেরে ছুঁড়ে দিলো, কিন্তু নরম ভুঁড়ির বাধা ডিঙিয়ে বুটজোড়াকে কিছুতেই খুলতে পারল না। শেষ পর্যন্ত একটা যদি বা খুলল, অনেক টানাহ্যাঁচড়াতেও আর একটা কিছুতেই স্থানচ্যুত হলো না। তখন সে বুটসুদ্ধই বিছানায় ঢুকে গেল এবং নাক ডাকাতে শুরু করে দিলো। সমস্ত ঘরটা তামাক, মদ ও বার্ধক্যের বদ গন্ধে ভরে গেল।

১২

সেদিন রাতে 'গজকাঠি' আরও অনেক কথাই মনে করতে পারত, কিন্তু ভাস্কা এসে বাধার সৃষ্টি করল। তার পিঠে একটা চাদর ফেলে ভাস্কা তাকে জোর কদমে ছুটিয়ে নিয়ে সারা রাত একটা সরাইখানার সামনে বেঁধে রাখল। তার পাশেই ছিল জনৈক চাষীর একটা ঘোড়া; তারা পরস্পরের গা চাটতে লাগল। সকাল হলে তারা দলের মধ্যে ফিরে এল, আর 'গজকাঠি' নিজের গা চুলকোতে শুরু করল।

"এত চুলকোচ্ছে কেন?" সে ভাবল।

পাঁচদিন কেটে গেল। তারা পশু-চিকিৎসককে ডেকে আনল।

ডাক্তার হেসে বলল, "এটার চুলকানি হয়েছে। বেদেদের কাছে বেচে দাও।"

"কি দরকার? এই মুহূর্তে ওটা যদি এখান থেকে দূর হয়ে না যায় তো ওর গলা কেটে ফেলো, যা খুশি তাই করো।"

পরিষ্কার, শান্ত সকাল। ঘোড়ার পাল চরাতে গেছে। গজকাঠি একা রয়ে গেছে। তার দিকে এগিয়ে এল একটি অদ্ভুত-দর্শন লোক—সরু চেহারা, কালো, নোংরা, সারা কোটে কালো-কালো দাগ। সে পশুদের ছাল চামড়া ছাড়ায়। 'গজকাঠি'র দিকে না তাকিয়েই তার মুখের দড়িটা ধরে তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল। 'গজকাঠি' চুপচাপ চলতে লাগল। পিছনে ফিরেও তাকাল না। যথারীতি পা টেনে টেনে খড়ের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল। ফটক পার হবার সময় একবার কুয়োটার দিকে এগিয়ে যেতেই লোকটা তাকে টেনে বলল :

"ওদিকে গিয়ে কি হবে?"

ভাস্কা পিছন-পিছন আসছিল। দু'জনে মিলে তাকে ইটের চালাটার পিছনকার একটা গিরি-খাতের মধ্যে নিয়ে থামল। সেই অতি সাধারণ জায়গাটায় বোধ হয়

অসাধারণ কিছু ঘটতে যাচ্ছে। ঘোড়ার দড়িটা ভাস্‌কার হাতে দিয়ে লোকটা গায়ের কোট খুলল, আস্তিন গোটাল, বুটের উপর থেকে একটা ছুরি ও শান-পাথর বের করে ছুবিটাতে শান দিতে লাগল। দামড়াটা দড়িটার দিকে মুখ বাড়াল, যাতে সেটা চিবুতে চিবুতে সময়টা কাটাতে পাবে; কিন্তু দড়িটা তার নাগালের বাইরে; একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে চোখ বুজল। তার ঠোঁট ঝুলে পড়েছে, হল্‌দে দাঁতেব মাড়ি দেখা যাচ্ছে; ছুরি শানাবাব শব্দের তালে তালে সেও ঘুমে ঢুলতে লাগল। ফোলা পাটার ব্যথাই তাকে যা একটু কাবু করেছে। হঠাৎ তাব মনে হলো, কে যেন তাব চোয়ালটা চেপে ধরে এক ঝাঁকিতে মাথাটাকে উপরের দিকে তুলে ধরেছে। চোখ খুলল। সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুটো কুকুর। একটা সেই লোকটার দিকে মুখ নিয়ে বাতাসে কি যেন শুঁকছে; অপরটি যেন তার কাছ থেকেই কিছু পাবার আশায় দামড়াটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তাদের দিকে চোখ রেখে যে-লোকটি তাকে ধরে ছিল তার হাতের উপর সে নিজের গলাটা ঘষতে লাগল।

ভাবল, "এরা আমাকে ওষুধ দেবে। ভাল কথা, দিক।"

আর ঠিক তাই; সে বুঝতে পাবল তারা ওর গলায কি যেন করছে। তীক্ষ্ণ খোঁচার একটা যন্ত্রণা হলো: সে আঁতকে উঠেই লাথি কষাল; তারপর নিজেকে সংযত করে এরপর কি ঘটে দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তার গলা ও বুক বেয়ে একটা গরম ধাবা বযে যেতে লাগল। এত জোরে একটা নিঃশ্বাস টানল যে তার পেটেব দু'পাশ ফুলে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা ভাল বোধ করল। জীবনেব সব বোঝা যেন সরে যাচ্ছে। সে চোখ বুজল, মাথাটা নিচু হযে পড়ল। কেউ তুলে ধরল না। গলাটা ঝুলে পড়ল, পা কাঁপতে লাগল, শরীরটা টল্‌মল্‌ করতে লাগল। যত না ভয, তার চাইতে বেশি বিস্ময়। সব কিছুই এত আলাদা। অবাক হযে সে সামনে ছুটতে, লাফিয়ে উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু তাব পাগুলো পাকিযে গেল; কাৎ হযে পড়ে যেতে লাগল। যে লোকটা চামড়া ছাড়ায় সে অপেক্ষা কবছে; দেহের খিঁচুনি যতক্ষণ না থামে ততক্ষণ কুকুর দুটোকে ঠেকিয়ে রাখল, তাবপর একটা পা ধরে ঘোড়াটাকে চিৎ করে শুইযে দিলো; আর ভাস্‌কোকে ধরতে বলে চামড়া ছাড়াতে শুরু করল।

"বয়সকালে খুব ভাল ঘোড়া ছিল," ভাস্‌কা বলল।

লোকটি বলল, "আর একটু মাংস থাকলে চামড়াটাও খুব ভাল হতো।"

সন্ধ্যায় ঘোড়ার পাল পাহাড় বেয়ে উঠে এল; যারা বাঁদিকে ছিল তাদের চোখে পড়ল, মাটিতে লাল মতো একটা বস্তুকে ঘিবে কয়েকটি কুকুব খুব ব্যস্ত, আর তাদের উপরে কিছু কাক ও চিল উড়ছে। একটা কুকুর বস্তুটাকে দুই থাবায় চেপে ধরে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল, আর চপ্‌চপ্‌ শব্দ করে খানিকটা টুকরো ছিঁড়ে না আসা পর্যন্ত মাথাটা নাড়তে লাগল।

ফুট্‌ফুট্‌ দাগওয়ালা ঘোটকিটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ল, গলাটা বাড়াল, আর অনেকক্ষণ ধরে বাতাসটা শুঁকতে লাগল। অন্যবা কিছুতেই তাকে সেখান থেকে সরাতে পারল না।

ভোরবেলা কয়েকটা নেকড়ের বাচ্চা পুবনো জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে সেই গিরি-খাতের ঘন ঝোপের মধ্যে মনের সুখে লাফালাফি করতে লাগল। মোট পাঁচটা বাচ্চা, চারটে প্রায় এক বয়সের, আর একটা ছোট; তার মাথাটা শরীরের তুলনায় বড়। একটা শুঁট্‌কি মা-নেকড়ে ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল; বাঁটওয়ালা পেটটা মাটি পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। বাচ্চাগুলোর সামনে গিয়ে বসতেই তারা তাকে ঘিরে ধরল। একেবারে ছোট বাচ্চাটার কাছে গিয়ে সামনের পা দুটো বেঁকিয়ে মাথাটা নিচু করল, মুখটা খুলল, এবং পেটটাকে বারকয়েক মোচড় দিয়ে বড় এক টুকরো ঘোড়ার মাংস উগড়ে বের করল। বড় বাচ্চাগুলো ছুটে আসতেই মা তাদের তাড়িয়ে দিয়ে পুরো টুকরোটাই ছোট বাচ্চাটাকে দিলো। ছোট বাচ্চাটা যেন রেগে গর্‌গর্‌ করে উঠল, মাংসের টুকবোটাই দুই থাবায় ধরে ছিঁড়তে লাগল। সেই একইভাবে মাটা আরও একটা, আরও একটা টুকরো উগড়ে বের করল, আর এইভাবে পাঁচটা বাচ্চারই খাদ্য জুটল; তারপরেই মা-নেকড়েটা বাচ্চাদের পাশে শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগল।

এক সপ্তাহ কালের মধ্যে ইটের চালাটার কাছে একটা বড় খুলি ও দুটো জংঘাস্থি ছাড়া আর কিছুই রইল না; আর সব কিছুই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। একটি মুঝিক গ্রীষ্মকালের জন্য হাড় কুড়োতে বেরিয়ে খুলি ও জংঘাস্থিগুলোও নিয়ে গেল এবং দরকারের সময় কাজে লাগবে বলে জড়ো করে রেখে দিলো।

আরও বেশ কিছুদিন পানাহারের পরে সের্‌পুখভ্‌স্কোই-র মৃতদেহটাকেও মাটিতে শুইয়ে দেওয়া হলো। তার চামড়া, মাংস, আর হাড় কারও কাজে লাগল না। আর ঠিক যেমন তার জীবন্ত মৃতদেহটা বিশ বছর ধরে একটা বোঝার মতোই পৃথিবীর বুকে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছিল ঠিক তেমনই সে দেহটা যখন কবর দেওয়া হলো তখনও যাদের উপর সে কাজেব ভারটা পড়ল তাদের কাছে সে একটা বোঝার মতোই হয়ে দাঁড়াল।

দীর্ঘদিন যাবৎই সে কারও কোনও কাজে লাগছিল না, সে ছিল একটা উৎপাতবিশেষ, তবু যারা তাকে কবর দিলো তারা তার ফুলে-ওঠা, পচনোন্মুখ দেহটাকে সুন্দর পোশাক পবাল, ভাল জুতো পরাল, চার কোণে নতুন ঝোপ্পা লাগানো একটা সুন্দর নতুন শবাধারে তাকে শুইয়ে দিলো, নতুন শবাধারটাকে আর একটা সীসের শবাধারের মধ্যে ভরে মস্কো নিয়ে গেল; আব সেখানে কবরখানায মাটি খুঁড়ে অনেক মানুষের হাড় বের করল যাতে ঠিক সেই একই জায়গায় তার নতুন পোশাক ও চকচকে জুতো পরানো কীটে কাটা ক্ষয়িষ্ণু দেহটাকে কবর দেওয়া যায়।

১৮৮৫

ক্রীসাস ও সোলন

Croesus and Solon

প্রাচীন কালে--খৃস্টের আবির্ভাবের অনেক, অনেক বছর আগে—কোনও এক দেশে ক্রীসাস নামে এক মস্ত বড় রাজা ছিলো। তার ছিল অনেক সোনারূপো ও অনেক মণি-রত্ন, আর ছিল অসংখ্য সৈন্য ও ক্রীতদাস। বস্তুত, সে ভাবত সারা পৃথিবীতে তার চাইতে সুখী লোক আর কেউ নেই।

কিন্তু ঘটনাক্রমে সোলন নামে একজন গ্রীক দার্শনিক ক্রীসাস-এর রাজ্যে বেড়াতে এল। জ্ঞানবান ও ন্যায়বান মানুষ হিসাবে সোলন-এর খ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত, তার খ্যাতি ক্রীসাসের কানেও পৌছেছিল; তাই রাজা আদেশ দিলো, সোলনকে তার সামনে হাজির করা হোক।

অত্যন্ত জমকালো রাজবেশ পরে সিংহাসনে বসে ক্রীসাস সোলনকে জিজ্ঞাসা করল : "এর চাইতে চমৎকার কিছু কি আপনি কখনও দেখেছেন?"

"নিশ্চয় দেখেছি," সোলন জবাব দিলো। "ময়ূর, মোরগ ও 'ফেজান্ট' পাখিরা এত বিচিত্র ও ঝকঝকে রঙে সজ্জিত যে মানুষের কোনও কলা-কৌশলই তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না।"

ক্রীসাস চুপ করে ভাবতে লাগল · "এতে যখন হলো না তখন তাকে অবাক করে দেবার জন্য আরও কিছু দেখাতে হবে।"

তখন নিজের সব ঐশ্বর্য সোলন-এর চোখের সামনে মেলে ধরে সে গর্বভরে বলতে লাগল, কত শত্রু সে মেরেছে আব কত রাজ্য সে জয় করেছে। তারপর দার্শনিককে বলল :

"এ পৃথিবীতে আপনি অনেক দিন বাস করছেন; অনেক দেশও আপনি দেখেছেন। আমাকে বলুন তো, জীবিত মানুষদের মধ্যে কাকে আপনি সব চাইতে সুখী বলে মনে করেন?"

"আমার মতে এথেন্সের অধিবাসী জনৈক গরীব মানুষই জীবিত লোকদের মধ্যে সব চাইতে সুখী", সোলন জবাব দিলো।

জবাব শুনে রাজা অবাক হয়ে গেল, কারণ সে নিশ্চিত ভেবেছিল যে সোলন তার নামই বলবে; অথচ সে কিনা একজন সম্পূর্ণ অখ্যাত লোকের কথা বলল!

"আপনি এ কথা বলছেন কেন?" ক্রীসাস জিজ্ঞাসা করল।

সোলন জবাব দিলো, "কারণ যার কথা আমি বলছি সেই লোকটি সারা জীবন

কঠোর পরিশ্রম করেছে, অল্পেই সন্তুষ্ট থেকেছে, সন্তানদের ভালভাবে মানুষ করেছে, নিজের নগরকে সম্মানের সঙ্গে সেবা করেছে, আর সুখ্যাতি অর্জন করেছে।"

এ কথা শুনে ক্রীসাস চিৎকার করে বলে উঠল :

"তার মানে আমার সুখকে আপনি কোনও মূল্যই দিচ্ছেন না এবং মনে করছেন যে আপনার উল্লেখিত লোকটির সঙ্গে আমার কোনও তুলনাই হয় না?"

উত্তরে সোলন বলল :

"অনেক সময়ই এ রকমটা ঘটে যে একটি গরীব মানুষ একজন ধনী মানুষের চাইতে বেশি সুখী হয়। মৃত্যুর আগে কোনও মানুষকেই আপনি সুখী বলতে পারেন না।"

রাজা সোলনকে বিদায় দিলো, কারণ তার কথাবার্তা তার ভাল লাগেনি, আর তার কথা সে বিশ্বাসও করেনি।

সে ভাবল, "দুঃখ নিয়ে বাড়াবাড়ি! মানুষ যতদিন বাঁচবে সুখের জন্যই বাঁচবে।"

ক্রমে রাজা সোলনকে একেবারেই ভুলে গেল।

কিছুদিন যেতে না যেতেই রাজার ছেলে শিকারে গিয়ে দুর্ঘটনায় আহত হলো আর তা'তেই মারা গেল। তারপর, ক্রীসাস শুনল, শক্তিমান সম্রাট সাইরাস তাকে আক্রমণ করতে আসছে।

তখন ক্রীসাস এক বিশাল বাহিনী নিয়ে সাইরাস-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হলো; কিন্তু শত্রুপক্ষ প্রবলতর হওয়ায় ক্রীসাস-এর সেনাবাহিনীকে বিধ্বস্ত করে তারা যুদ্ধে জয়লাভ করল ও রাজধানীতে ঢুকে পড়ল।

তারপর বিদেশী সৈন্যরা রাজা ক্রীসাস-এর সব সম্পত্তি লুঠ করতে লাগল, অধিবাসীদের হত্যা করল, রাজধানীতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে লুঠপাট শুরু করে দিলো। একজন সৈন্য স্বয়ং ক্রীসাসকে ধরে ফেলে তাকে অস্ত্রাঘাত করতে উদ্যত হতেই রাজার ছেলে বাবাকে রক্ষা করতে ছুটে এসে চিৎকার করে বলল :

"ওঁর গায়ে হাত দিও না। ইনি রাজা ক্রীসাস!"

তখন সৈন্যরা ক্রীসাসকে বেঁধে সম্রাটের কাছে নিয়ে গেল; কিন্তু সাইরাস তখন বিজয়-উৎসবে ব্যস্ত থাকায় বন্দীর সঙ্গে কথা বলতে পারল না; ক্রীসাস-এর প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়ে গেল।

নগর-উদ্যানের ঠিক মাঝখানে সৈন্যরা মস্ত বড় একটা চিতা তৈরি করল; রাজা ক্রীসাসকে তার উপরে বসিয়ে একটা শূলের সঙ্গে বাঁধল; তারপর চিতায় আগুন ধরিয়ে দিলো।

ক্রীসাস চারদিকে তাকাল; দেখতে পেল তারই নগর, তারই প্রাসাদ। তখন গ্রীক দার্শনিকের কথাগুলি তার মনে পড়ে গেল। চোখের জলে ভেসে শুধু বলে উঠল :

"হে সোলন, সোলন!"

সৈন্যরা চিতাটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় সম্রাট সাইরাস স্বয়ং সেখানে

হাজির হলো মৃত্যুদণ্ড দেখতে। ক্রীসাস-এর কথাগুলি তার কানে গেল, কিন্তু তার অর্থ কিছু বুঝতে পারল না।

তখন তার হুকুমে ক্রীসাসকে চিতা থেকে নামিয়ে আনা হলে সম্রাট জানতে চাইল সে কি বলছিল। ক্রীসাস জবাব দিলো

"আমি একজন জ্ঞানী লোকের নাম করছিলাম মাত্র—তিনি আমাকে একটি পরম সত্য কথা বলেছিলেন—সে সত্য সব পার্থিব সম্পদ, আমাদের সব রাজকীয় গৌরবের চাইতে অনেক বেশি মূল্যবান।"

তারপর সোলন এর সঙ্গে তার যে সব কথা হয়েছিল ক্রীসাস সে সবই সাইরাসকে বলল। সে কাহিনী শুনে সম্রাটের হৃদয়ও বিগলিত হলো, কারণ সে ভাবল, সেও তো মানুষ, তার ভাগ্যেই বা কি আছে তা তো সেও জানে না। কাজেই শেষ পর্যন্ত ক্রীসাস-এর প্রতি তার দয়া হলো এবং দু'জনই পরস্পরের বন্ধু হয়ে গেল।

১৮৮৬

কতটা জমি দরকার

How much land does a man need

১

শহর থেকে দিদি এসেছে বোনের বাড়ি বেড়াতে। দিদির বিয়ে হয়েছে এক মহাজনের সঙ্গে, আর বোনের বিয়ে হয়েছে এক চাষীর সঙ্গে। দু'জনে চা খেতে খেতে গল্প করছিল। দিদি পাঁচখানা করে বলতে লাগল শহর জীবনের সুখ সুবিধের কথা—কত আরামে-আয়েসে সে থাকে, ছেলেমেয়েদের ভাল জামা-কাপড় পরায়, কত রকমারি জিনিস খায়, স্কেট করে, বেড়ায়, থিয়েটারে যায়।

দিদির কথাবার্তায় ভারি বিরক্ত হলো ছোট বোন। সেও পাল্টা মহাজনের স্ত্রীর জীবনযাত্রার নিন্দে করে নিজের গ্রাম্য জীবনের খুব খানিকটা প্রশংসা করল।

সে বলল, "আমার কথা যদি বলো, আমি তো কিছুতেই তোমার সঙ্গে আমার জীবনধারা বদলাতে রাজি নই। অবশ্য তোমার এ-কথা আমি মানি যে আমাদের এখানকার জীবন খুব সাদাসিধে, আর তাতে উত্তেজনাও কিছু নেই। কিন্তু তোমাদের কথাটাও ভাবো। তোমরা খাও-পরো ভাল বটে, কিন্তু তোমরা হয় ভাল ব্যবসা করে খুব বড়লোক হবে, না হয় তো একেবারে ফকির হবে। সেই প্রবাদটা তুমি নিশ্চয়ই জানো—লাভ-ক্ষতি দুই ভাই। দ্যাখ, আজ তুমি ধনী, কিন্তু কাল তুমি পথের ভিখারী হতে পারো। আমরা কিন্তু এখানে তার চেয়ে অনেক ভাল আছি। চাষীরা খায় হয়ত

কম, কিন্তু তারা সব সময়েই খেতে পায়। সোজা কথায়, চাষীরা ধনী না হতে পারে, কিন্তু প্রচুর খাবার তাদের সব সময়েই থাকে।"

দিদি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, "কী বললে? প্রচুর? কতকগুলো শুয়োরের বাচ্চা আর গরুর বাচ্চা ছাড়া তোমাদের আর কী আছে শুনি? ভাল একটা পোশাক নেই, ভাল সঙ্গী-সাথী নেই, তার আবার প্রচুর! আরে বাপু, তোমার বাড়ির লোকটি যতই খাটুক না, তোমরা থাকবে মাটির ঘরে, আর মরবেও সেখানে—হ্যাঁ, তাই। আর তোমার ছেলেপুলেদেরও সেই দশাই হবে।"

ছোট জবাব দিলো, "না না, আমাদের অবস্থা বরং এইরকম : যদিও আমাদের খুব খাটতে হয়, তবু যে-জমিতে বাস করি সেটা অন্তত আমাদের নিজেদের। আর, অন্যের খোসামুদি আমাদের কখনো করতে হয় না। আর তোমরা শহুরেরা—একটা বিশ্রী আবহাওয়ার মধ্যে তোমাদের জীবন কাটে। আজ তুমি বেশ আছো, কিন্তু কালই হয়তো শনির দৃষ্টি পড়ল তোমার উপর, আর তোমার স্বামী হয়তো ভুলল জুয়ায় বা মদে, ফলে তোমরা একেবারে শেষ হয়ে গেলে। কেমন, তাই নয় কি?"

স্টোভটার পাশে বসে ছোট বোনের স্বামী পাখোম সবই শুনছিল।

সে বলল, "সে কথা ঠিক। ছোটবেলা থেকে মাটি-মায়ের কোলেই পড়ে আছি, তাই মাথায় কখনো কোনওরকম বদখেয়াল ঢুকতে পারেনি। তবে একটা অভাব আমার আছে, বড় অল্প জমি আমার। জমি যদি পাই তাহলে আমি কাউকে ডরাই না—স্বয়ং শয়তানকেও না।"

দুই বোন চা খাওয়া শেষ করে আরও খানিকক্ষণ বসে জামা-কাপড়ের গল্প করল, চায়ের বাসনগুলো ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করল, তারপর শুতে গেল।

এদিকে শয়তান কিন্তু সারাক্ষণ বসে ছিল স্টোভটার পিছনে, আর শুনছিল সব। চাষীর বৌয়ের কথায় তার স্বামী যখন গর্ব করে বলল যে জমি একবার পেলে স্বয়ং শয়তানও তা কেড়ে নিতে পারবে না, সে-কথা শুনে শয়তান ভারি খুশি হলো।

সে ভাবল, চমৎকার! তোমাকে নিয়েই একটা খেলা খেলব। আগে তোমাকে অনেক জমি দেবো—আর তারপর তা কেড়ে নেব।

২

এই চাষীদের বাড়ির কাছেই একটি মহিলা বাস করতেন। তিনি ছিলেন ১২০ ডেসিয়াটিন[১] জমির মালিক। এতদিন চাষীদের সঙ্গে তাঁর বেশ সদ্ভাবই ছিল। নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার তিনি কখনো করেননি। কিন্তু সম্প্রতি তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিককে জমিদারির ওভারসিয়ার নিযুক্ত করেছেন। সেই লোকটি নানারকম জরিমানা করে চাষীদের উপর অত্যাচার করতে লাগল। পাখোম যতই সতর্ক হোক, তবু কখনো হয়তো তার একটা ঘোড়া ঢুকল সেই মহিলার ওট ক্ষেতে, কখনো বা

১। এক ডেসিয়াটিন = ২ একর

গরুটা গেল তাঁর বাগানে, নয়তো বাছুরটা বেড়া ডিঙিয়ে ঢুকে পড়ল তাঁর গো-চরে; ফলে তাকে অনেক জরিমানা দিতে হতো।

সেবার শীতকালে চারদিকে গুজব রটে গেল যে বারিনা[১] তাঁর সব জমি বিক্রি করে ফেলবেন এবং সেই জমি ও তৎসংলগ্ন যাতায়াতের রাস্তাটা কিনে নেবে তাঁর ওভারসিয়ার। ক্রমে কথাটা চাষীদের কানেও পৌঁছুল; ফলে তারা খুব মুষড়ে পড়ল।

তারা ভাবল, ওভারসিয়ার যদি জমির মালিক হয় তাহলে পূর্বের চেয়ে আরও বেশি করে জরিমানা চাপিয়ে আমাদের বিব্রত করবে। অথচ ঐ জমির চারদিকেই আমাদের বসবাস। কাজেই যেমন করেই হোক ও জমি আমাদের হাত করতেই হবে।

তখন গ্রাম্য পঞ্চায়েত বা মীর-এর একটি প্রতিনিধিদল গেল বারিনার সঙ্গে দেখা করতে। তাঁকে অনুরোধ করল, জমিটা ওভারসিয়ারের কাছে বিক্রি না করে যেন তাদের দেওয়া হয়, তারা বেশি টাকা দিতে রাজি আছে। বারিনা এ প্রস্তাবে রাজি হলেন। তখন চাষীরা মীর-এর পক্ষ থেকে সমস্ত সম্পত্তিটা কিনে নেবার জোগাড়-যন্ত্র করতে লাগল। এ নিয়ে তারা একটা সভা করল, কিন্তু কোনও মীমাংসা করতে পারল না। আসল ব্যাপার হলো কী, শয়তান অলক্ষ্যে থেকে এমন ব্যবস্থা করতে লাগল যাতে তারা কিছুতেই একমত হতে না পারে। তখন চাষীরা স্থির করল যে, প্রত্যেকে আলাদাভাবে যে যতটা পারে জমি কিনে নেবে। আর বারিনাও সে প্রস্তাবে রাজি হলেন। একদিন পাখোম শুনতে পেল, তাদের এক প্রতিবেশী কুড়ি ডেসিয়াটিন জমি কিনে ফেলেছে এবং বারিনা নাকি টাকার অর্ধেক এক বছর পরে নিতে রাজি হয়েছেন। শুনে পাখোমের ঈর্ষা হতে লাগল। সে ভাবল, অপরে যদি সব জমি কিনে ফেলে তাহলে আমি কী করব? তাই সে স্ত্রীর পরামর্শ চাইল : দ্যাখো, সবাই কিছু-কিছু জমি কিনছে। আমাদেরও দশ ডেসিয়াটিন জমি কেনা উচিত। যা দিন-কাল পড়েছে, তাতে তো খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করাই শক্ত, কারণ ওভারসিয়ার তো জরিমানা হিসাবে সবই নিয়ে নিচ্ছে। কাজেই জমিটা কী ভাবে কেনা যায় তাই তারা ভাবতে লাগল।

একশো রুব্‌ল্ তাদের আগে থেকেই জমানো ছিল। তার উপর একটি গাধার বাচ্চা ও অর্ধেক মৌমাছি বিক্রি করে এবং ছেলেকে চাকরিতে পাঠিয়ে তারা কোনওরকমে বাকি অর্ধেক টাকা জোগাড় করল।

সব টাকা জুটিয়ে পনেরো ডেসিয়াটিন জমি ও ছোট একটা বাগান পছন্দ করে পাখোম বারিনার কাছে গেল জমি কিনতে। কথাবার্তা পাকা হয়ে গেলে দু'জনে করমর্দন করল। পাখোম কিছু টাকা তখুনি দিয়ে দিলো। তারপর সে গেল শহরে। দলিল রেজিস্ট্রি করা হলো (জমির অর্ধেক টাকা তখুনি দিতে হবে, আর বাকিটা দিতে হবে দু'বছরের মধ্যে)—ব্যস্! পাখোম হয়ে বসল জমির মালিক। শ্যালকের কাছ থেকে আরো কিছু টাকা ধার করে সে বীজ কিনল। তারপর যথাসময়ে নতুন-কেনা

১। বারিনা = জমিদার মহিলা

জমিতেই সেই বীজ সে বুনে দিলো, আর ফসল পেল প্রচুর। ফলে এক বছরের মধ্যেই সে বারিনার টাকা আর শ্যালকের দেনা দুই-ই শোধ করে দিলো। তখন সে হলো জমির পুরো মালিক। নিজের জমিতে সে বীজ বুনল, তুলল নিজের ফসল, কাটল নিজের জ্বালানি কাঠ আর চরালো নিজের গরু-বাছুর। চাষ করতে অথবা ফসল এবং গো-চরের তত্ত্বাবধান করতে যখনই সে ঘোড়ায় চড়ে তার নিজস্ব জমিতে যেত, তখনই আনন্দে ভরে উঠত তার মন। এমনকি জমির ঘাসগুলোকে পর্যন্ত মনে হতো অন্য ঘাসের চেয়ে স্বতন্ত্র, ফুলগুলোও যেন ফুটত অন্যভাবে। আগে যখন সে জমির উপর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যেত, তখন জমিকে জমি ই মনে হতো; এখন সেই জড় মাটি যেন তার চোখে আলাদা হয়ে দেখা দেয়।

৩

এমনি করে বেশ সুখেই পাখোমের দিন কাটতে লাগল। এবং কাটতও তাই, শুধু যদি অন্য চাষীরা তার ফসল আর গো-চরগুলোকে রেহাই দিতো। বার বার সে বৃথাই প্রতিবাদ জানাল। মেষপালকেরা প্রায়ই তার গো-চর মাঠের মধ্যে ঢুকিয়ে দিত তাদের মেষের দল, আর রাতের বেলায় তাদের ঘোড়াগুলো ঢুকে পড়ত ফসলের ক্ষেতে। বার-বার পাখোম সেগুলোকে তাড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত রইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। জেলা আদালতে সে একটা নালিশ রুজু করে দিলো। সে জানত, জমির অভাবেই চাষীরা এ কাজ করত, তার ক্ষতি করবার জন্য নয়। তবু এ অবস্থা সে আর চলতে দিতে পারে না। ওরা যে খেয়ে সব তছনছ করে দিলো! একটা শিক্ষা মেষপালকদের দিতেই হবে।

আদালতে সে প্রথমে তাদের একজনকে শিক্ষা দিলো। তারপর আর একজনকে। প্রথমে একজনের জরিমানা হলো। তারপর আর-একজনের। ফলে সবাই তার উপর চটে গেল এবং প্রতিবেশীরা এবার ইচ্ছে করেই তার ফসল চুরি করতে আরম্ভ করল। একদিন রাত্রে একজন তো বাগানে ঢুকে দশ-দশটা লিন্ডেন গাছের বাকল আগাগোড়া তুলে নিলো। সেখান দিয়ে যেতে যেতে একদিন এই ব্যাপার দেখে তার মুখ কালো হয়ে গেল। আরও কাছে গিয়ে দেখল, বাকলগুলো সব ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে আর গাছগুলো সব শিকড়সুদ্ধ উপড়োনো রয়েছে। দুষ্কৃতিকারীরা একটা গাছ শুধু রেখে গেছে; তারও আবার সব ডালপালা কেটে ফেলেছে। বাদবাকি সব গাছ তারা কেটে একেবারে সাফ করে দিয়েছে। পাখোম তো রেগে আগুন! সে মনে মনে ভাবল, উঃ! যদি জানতে পারতাম কে এ কাজ করেছে, একবার দেখে নিতাম সামনা-সামনি! সে অনেক ভাবল, লোকটা কে হতে পারে। হুঁ, এ কাজ যদি কেউ করে থাকে তবে সে সেম্‌কা। তখুনি সে গেল সেম্‌কার কাছে। কিন্তু শুধু গালাগালি ছাড়া তার কাছ থেকে আর কিছুই পাওয়া গেল না। তবু ক্রমেই তার নিশ্চিত ধারণা হলো যে এ কাজ সেম্‌কার। তার বিরুদ্ধে সে মামলা ঠুকে দিলো। ফলে দু'জনেরই ডাক এল আদালত

থেকে। অনেক আলাপ-আলোচনার পর ম্যাজিস্ট্রেট প্রমাণ অভাবে মামলা খারিজ করে দিলো। এতে আরও রেগে গেল পাখোম। গাঁয়ের মাতব্বর আর ম্যাজিস্ট্রেট— দু'-দলকেই সে দোষ দিতে লাগল : "বাবুরা, আপনাদের সঙ্গে নিশ্চয় চোরদের যোগসাজশ আছে। আপনারা যদি সৎ হতেন তাহলে কিছুতেই সেম্‌কাকে খালাস করে দিতেন না।" ক্রমেই সে নিজের জমিতে একা-একা বাস করতে লাগল। মীরদের সঙ্গেও তার সম্পর্ক ক্রমেই ঢিলে হতে লাগল।

সেই সময় একটা গুজব রটল যে, কিছু-কিছু চাষী এ দেশ ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবছে। এ কথা শুনে পাখোম মনে-মনে ভাবল : কিন্তু আমার জমি ছেড়ে কোথাও যাবার কোনও কারণই নেই। যদি অন্যেরা যায়, ভালই তো, আমার আরও বেশি জমি হবে, তাদের জমিগুলো আমি কিনে নিতে পারব। তখন চারদিকে সবই হবে আমার জমি, আমি আরও আরামে থাকতে পারব। এখন বড়ই চাপাচাপিতে আছি।

কিছুদিন পরের ঘটনা। একদিন পাখোম বাড়িতেই বসে ছিলো। এমন সময় একজন পথিক চাষী সেখানে এসে থামল। পাখোম তাকে এক রাতের জন্য আশ্রয় দিলো, খেতে দিলো। কথাপ্রসঙ্গে সে তাকে শুধোল সে কোথা থেকে এসেছে। লোকটি জবাবে বলল যে, ভল্‌গার ওপারে যেখানে সে চাকরি কবত সেখান থেকে উজান হেঁটে সে এসেছে। তারপর সে আরও বলল, "সেখানে একটি নতুন বসতির পত্তন হচ্ছে। যারাই সেখানে গিয়ে গ্রাম্য পঞ্চায়েতে নাম লেখাচ্ছে তাদেরই দশ ডেসিয়াটিন করে জমি দিচ্ছে। আব, সে কী জমি! কী চমৎকার তার ফসল! তার খড়গুলোই এত লম্বা যে তার মধ্যে একটা ঘোড়া ঢুকলেও আর দেখা যাবে না। আর ঘনও এমনি যে পাঁচ মুঠো নিলেই একতাড়া হয়ে যাবে।" লোকটা বলেই চলল : "একজন চাষী যখন সেখানে প্রথম এল তখন সে একেবারেই গরিব। খেটে খাবার দু'খানি হাত ছাড়া তার আর কোনও সম্বলই ছিল না। এবার সে পঞ্চাশ ডেসিয়াটিন জমিতে শুধু গমই ফলিয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, গত এক বছরে একমাত্র গম বেচেই সে ৫০০০ রুবল্‌ পেয়েছে।"

এ-কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠল পাখোমের মন। সে ভাবতে লাগল : এমন উপার্জন যদি সেখানে করতে পারি, তাহলে এখানে এমন গরিবের মতো কুঁকড়ে পড়ে থাকব কেন? এখানকার জমি, বাড়ি সব বেচে দিয়ে সেই টাকায় সেখানে গিয়ে নতুন বাড়ি করব, ক্ষেত করব। এখানে এই ছোট জমিতে দুঃখকষ্ট তো লেগেই আছে। অন্ততপক্ষে সেখানে একবার গিয়ে খোঁজ-খবর নিতে তো পারি!

গরম পড়তেই সে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল। ভল্‌গা নদীতে স্টীমারে চড়ে পৌঁছল সামারা। সেখান থেকে ৪০০ ভার্স্ট[১] পায়ে হেঁটে পৌঁছল গন্তব্যস্থানে। যেমনটি শুনেছিল ঠিক তাই। মাথা-পিছু দশ ডেসিয়াটিন জমি নিয়ে চাষীরা খাসা

১। এক ভার্স্ট = ১১৬৬ গজ

আছে সেখানে। পঞ্চায়েত তাকেও সাদরে গ্রহণ করল। তাছাড়া তাকে বলা হলো যে, সেখানে যারা টাকা নিয়ে আসে তারা কায়েমি স্বত্বে যত খুশি জমি কিনতে পারে। ডেসিয়াটিন-প্রতি তিন রুব্‌ল্‌ দামে যত খুশি সবার সেরা জমি কেনা যায়।

এইসব খবর জেনে পাখোম হেমন্তকালে বাড়ি ফিরল। এসেই সব বিক্রি শুরু করল। জমি, বাড়ি, ফসল সব সে ভাল দামেই বেচে ফেলল। তারপর মীর-এর খাতা থেকে নিজের নাম কাটিয়ে বসন্তকাল আসতেই সপরিবারে যাত্রা শুরু করল নতুন দেশে।

৪

যথাসময়ে তারা পৌঁছল সেখানে। সঙ্গে সঙ্গেই পাখোমকে নতুন বসতির মীর-এর সভ্য করে নেওয়া হলো (অবশ্য মাতব্বরদের গলা কিছুটা ভিজিয়ে প্রয়োজনীয় দলিল সম্পাদনের পর)। তারপব মাথা-পিছু দশ ডেসিয়াটিন হিসাবে তাকে দেওয়া হলো পঞ্চাশ ডেসিয়াটিন জমি। তাছাড়া গো-চরের অংশ তো আছেই। পাখোম নতুন করে বাড়িঘর করল। আগে তার যে জমি ছিল তার দ্বিগুণ জমি সে এমনিতেই পেল। সবই আবার ফসলের জমি। মোটের উপর যেখান থেকে সে এসেছে তার তুলনায় এখানকার জীবন দশগুণ ভাল। এখন চাষের জমি এবং গো-চর দুয়েরই মালিক সে, আর সে গো-চর এত বড় যে সে যত ইচ্ছে গরু-ঘোড়া রাখতে পারে।

প্রথম-প্রথম বাড়ি-ঘর করে সাজিয়ে-গুছিয়ে নেবার সময় সবই তার কাছে মনে হয়েছিল চমৎকার। কিন্তু একটু পা ছড়িয়ে বসবাব পবে তার আবার মনে হতে লাগল যে জায়গা যেন বড় কম। অন্যের দেখাদেখি তারও সাদা তুর্কি-গম ফলাবার ইচ্ছে হলো। কিন্তু যে পাঁচ টুকরো জমি তার ভাগে পড়েছিল তাব কোনওখানাই গমের উপযুক্ত নয়। গম জন্মায় ঘাসজমি, নতুন জমি বা ফেলে-রাখা জমিতে। সেসব জমি একবার চায করে দু'বছব ফেলে রাখতে হয়, যাতে ভাল কবে ঘাস গজাতে পারে। অবশ্য নরম জমি তার যথেষ্ট ছিলো, কিন্তু তাতে ফলে শুধু রাই ফসল। গমের জন্য দরকার শক্ত জমি। আর শক্ত জমির প্রার্থীও বেশি। আবার সেরকম জমি যথেষ্ট ছিলও না সেখানে। উপরন্তু, সেসব জমি নিয়ে ঝামেলাও অনেক। ধনী চাষীরা নিজেদের জমিতে ফসল বোনে। কিন্তু যারা গরিব তারা মহাজনেব কাছে জমি বন্ধক দিতে বাধ্য হয়।

প্রথম বছর পাখোম তার জমিতে গম বুনে চমৎকার ফসল পেল। পরের বারেও সে গম বুনতে চাইল। কিন্তু তাব এত জমি ছিল না যে গত বছরের ফসলের জমি পাখোম ফেলে রেখেও নতুন জমিতে ফসল বোনা চলে। কাজেই আরও জমি তার দরকার। তাই সে এক মহাজনের কাছে গিয়ে কিছু গমের জমি এক বছরের জন্য লীজ নিলো। সে জমি চাষ করে ফসল পেল প্রচুর। কিন্তু জমিটা ছিল নতুন বসতি থেকে অনেক দূরে। তাই গাড়ি করে সব ফসল বয়ে আনতে হলো পনের ভার্স্ট পথ।

পাখোম দেখেছে অনেক কৃষি মহাজন চাষের জমির পাশেই চমৎকার বাড়িঘর করে যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি করেছে। তাই সেও ভাবতে লাগল, তাদের মতো আমিও যদি জমিটা লম্বা লীজ নিয়ে সেখানে বাড়িঘর করি তাহলে কেমন হয়? আমি তো তাহলে জমির কাছাকাছি থাকতে পারি! কাজেই সে সেই ব্যবস্থাতেই মন দিলো।

এমনি করে ক্রমাগত নতুন জমি নিয়ে আর তাতে গম বুনে পাখোম পাঁচ বছর কাটিয়ে দিলো। সবগুলো বছরই ছিল ভাল, গম ফলনও প্রচুর আর টাকাও এল ঢের; কিন্তু এই একঘেঁয়ে জীবন ক্রমেই তার কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠল। ফি বছর নতুন করে জমি লীজ নিয়ে সেখানে চাষের সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়ার হাঙ্গামাও অনেক। তাছাড়া, ভাল জমি একটা পাওয়া গেলেও অন্য চাষীরাও সেখানে ভিড় জমাত। ফলে সমস্ত জমিটা নিজের নামে লীজ নেবার আগেই সেটা ভাগ বাঁটোযারা হয়ে যেত। একবার কয়েকজন চাষীর একটা গো-চর জমি সে এক মহাজনের সঙ্গে ভাগে নিয়ে আবাদ করল। এদিকে সেই জমি নিয়ে একটা মামলায় মহাজন গেল হেরে। ফলে তার সমস্ত পরিশ্রমটাই বরবাদ হয়ে গেল। জমিটা যদি তার একার হতো, তাহলে তো আর কোনও হাঙ্গামা হতো না!

তখন থেকেই সে একটা পুরো সম্পত্তি একেবারে কিনে নেবার চেষ্টায় রইল। জনৈক চাষীর অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ায় সে তার ৫০০ ডেসিয়াটিন জমি সস্তায় বেচে দিতে রাজি হলো। পাখোম অনেক কথা-কাটাকাটির পর জমির দাম ১৫০০ রুব্‌লে রফা করল—অর্ধেক নগদ দিতে হবে, বাকিটা পরে। এর কয়েক দিন পরে একজন মহাজন একদিন পাখোমের বাড়িতে এসে উঠল তার ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেবার জন্য। দু'জনে এক পাত্র চা খেতে খেতে অনেক গল্প করল। মহাজনটি বলল, সে অনেক, অনেক দূরের বাসকিরদের দেশ থেকে এসেছে। সেখানে (সে তো তাই বলল) সে মাত্র ১০০০ রুব্‌লে ৫০০০ ডেসিয়াটিন জমি কিনেছে। কৌতূহলী হয়ে পাখোম তাকে অনেক প্রশ্ন করল। সেও জবাব দিলো। সে বলল, "আমি অবশ্য কাজের মধ্যে এই করেছি যে, গাঁয়ের মাতব্বরদের কিছু উপহার দিয়েছি, (কিছু খালাত[1], কার্পেট আর এক বাক্স চা) কয়েকশো রুব্‌ল্ ছড়িয়েছি, আর যারা চেয়েছে কিছু ভড্‌কা খাইয়েছি। ফলে ডেসিয়াটিন প্রতি কুড়ি কোপেক[2] দামে জমিটা আমি পেয়ে গিয়েছি।" পাখোমকে সে জমির দলিলটাও দেখালো। তারপর বলল, "জমিটা একেবারে নদীর উপরে, চারদিক খোলা; কেবল ঘাস-জমি আর মাঠ।" পাখোম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে আরও অনেক প্রশ্ন করল।

মহাজনটি আরও বলল, 'সারা বছর খুঁজলেও অমন জমি আপনি পাবেন না। আর বাসকিরদের দেশের সব জমিই ঐরকম। তাছাড়া সেখানকার মানুষগুলি

১। খালাত = একরকম লম্বা কোট

২। কোপেক = অল্পদামি মুদ্রা

একেবারে ভেড়ার মতো সরল। আপনি অনায়াসে যে-কোনও জিনিস তাদের কাছ থেকে বাগিয়ে নিতে পারেন।"

পাখোম মনে মনে ভাবল, আচ্ছা, ১০০০ রুব্‌ল্‌ খরচ করলে আমি যখন একটা জমিদার বনে যেতে পারি তখন সেই টাকা দিয়ে ৫০০ ডেসিয়াটিন জমি কিনে আমার লাভ কী? তাও আবার ঘাড়ে ঝুলে থাকবে একটা ঋণের বোঝা।

৫

মহাজনটির কাছ থেকে পাখোম বাসকিরদের দেশে যাবাব জন্য তৈরি হলো। স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে একজন মাত্র মজুরকে সঙ্গে নিয়ে সে হাজির হলো একটা শহরে। সেখানে মহাজনের পরামর্শ-মতো এক বাক্স চা, ভড্‌কা ও অন্যান্য উপহার কিনে আবার দু'জনে যাত্রা করল। ৫০০ ভার্স্ট পথ পার হয়ে সাত দিনের দিন বাসকিরদের তাঁবুতে গিয়ে হাজির হলো। মহাজন যেমন যেমন বলেছিল ঠিক তাই। খোলা প্রান্তরের ভিতর দিয়ে যে নদীটা বয়ে চলেছে, তারই ধারে ধারে চামড়ার ছাউনি-দেওয়া গাড়িতে তারা বাস করে। তারা জমিও চাষ করে না, কোনও ফসলও পায় না। খোলা মাঠে চরে বেড়াচ্ছে গরু-মহিষ আর কসাক ঘোড়াব দল। ঘোড়ার বাচ্চাগুলো সব বাঁধা রয়েছে গাড়ির পিছনে। দিনে দু'বার করে তাদের মাকে তাড়িয়ে আনা হয় বাচ্চাদের দুধ দিতে। লোকের প্রধান খাদ্যই হলো ঘোড়ার দুধ। সেই দুধ দিয়ে মেয়েরা একরকম পানীয় তৈরি করে, তার নাম কুমিস। কুমিস থেকে আবার তৈরি হয় পনীর। বাসকিরদের একমাত্র পানীয় কুমিস বা চা, তাদেব একমাত্র খাদ্য ভেড়ার মাংস। আর তাদের একমাত্র প্রমোদ বাঁশি বাজানো। তবু দেখতে তারা বেশ হাসিখুশি, সারা বছর ধরেই যেন তাদের ছুটি লেগেই থাকে। লেখাপড়া জানে খুবই কম, রুশ ভাষা জানেই না; কিন্তু মানুষ হিসেবে তারা দয়ালু ও আকর্ষণীয়।

পাখোমকে দেখেই তারা সব গাড়ি থেকে নেমে তাকে ঘিরে দাঁড়াল; একজন দোভাষীও পাওয়া গেল। পাখোম তাকে জানালো যে সে জমি কিনতে এসেছে। একথা শুনে লোকগুলো ভারি খুশি হয়ে পাখোমকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তাকে নিয়ে গেল সবচেয়ে ভাল বাড়িটাতে। সেখানে তাকে বসতে দিলো একবোঝা কম্বলের উপর পাতা নরম গদিতে, চা দিলো, আর দিলো কুমিস। একটা ভেড়া মেরে তার মাংস দিলো খেতে। পাখোমও তার টারান্টাস[১] থেকে উপহারের জিনিসগুলো এনে তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিলো। খুব খুশি হলো তারা। তখন বাসকিরনা কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে কি যেন আলোচনা করে দোভাষীকে কথা বলতে বলল।

দোভাষী বলল, "আমি আপনাকে জানাতে চাই যে এরা সবাই আপনাব উপর খুব সন্তুষ্ট হয়েছে এবং এদের রীতি হলো কোনও উপহার পেলে তার বিনিময়ে যে-

---

১। টারান্টাস = ছোট দু'-চাকার গাড়ি

কোনও উপায়ে অতিথির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা। আপনি আমাদের উপহার দিয়েছেন, বলুন আমাদের এমন কোন্ জিনিস আছে যা আমরা আপনাকে দিতে পারি।"

পাখোম জবাব দিলো, "আমি বিশেষ করে চাই আপনাদের কিছু জমি। যেখান থেকে এসেছি সেখানে যথেষ্ট জমি নেই। যাও বা আছে সব আবাদ হয়ে গেছে। অথচ আপনাদের অনেক জমি আছে। বেশ ভাল জমি, এমন জমি, যা আমি এর আগে কখনো দেখিনি।"

দোভাষী কথাগুলো অনুবাদ করে দিলো। বাসকিররা আবার নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলোচনা করল। তাদের কথা অবশ্য পাখোম কিছুই বুঝতে পারছিল না, কিন্তু দেখল, তারা আহ্লাদে গদ-গদ হয়ে উচ্চকণ্ঠে কি যেন বলছে আর হো-হো করে হেসে উঠছে। অবশেষে আলোচনা থামিয়ে তারা পাখোমের দিকে তাকাল আর দোভাষী কথা বলতে লাগল।

সে বলল, "আমি আপনাকে বলতে চাই যে আপনার সদয়-ব্যবহারের বিনিময়ে আপনি যত জমি চান তাই আপনার কাছে বেচতে আমরা রাজি আছি। আপনি শুধু হাত তুলে দেখান কত জমি আপনার চাই। ব্যস, তাই আপনি পাবেন।"

এই সময় লোকগুলো আবার যেন কি নিয়ে আলোচনা করতে করতে হঠাৎ তর্কাতর্কি শুরু করে দিলো। পাখোম শুধালো, "ব্যাপার কী?" দোভাষী বলল, "একদল বলছে জমির কথাটা আগে স্টার্শিনাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত এবং তাকে ছাড়া কিছু করা উচিত নয়, আর অপর দল বলছে তার কোনও দরকার নেই।"

৬

বাসকিররা যখন ঐরকম কথা-কাটাকাটি করছে তখন হঠাৎ সেই গাড়িতে শেয়ালের চামড়ার টুপি-পরা একটি লোক ঢুকল। তাকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়াল। দোভাষী পাখোমকে বলল, "এই হচ্ছে স্বয়ং স্টার্শিনা।" পাখোম তৎক্ষণাৎ সবচেয়ে ভাল খালাতটা তাকে উপহার দিলো, আর দিলো পাঁচ পাউন্ড চা। স্টার্শিনা যথারীতি সেগুলো গ্রহণ করল। সে তার সম্মানিত আসন গ্রহণ করবার পর বাসকিররা তাকে সমস্ত ব্যাপারটা বোঝাতে লাগল। সে মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনল। হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। রুশ ভাষায় সে কথা বলল পাখোমের সঙ্গে।

সে বলল, "বেশ কথা, আপনার মনোমতো যে-কোনও জমি আপনি বেছে নিন। অনেক জমি আমাদের আছে।"

পাখোম মনে মনে ভাবল, আমি তাহলে যত খুশি জমি নিতে পারি। তবু ব্যবস্থাটাকে পাকা করে নিতে হবে। আজ হয়তো বলল এ জমি তোমার আবার কাল যদি কেড়ে নেয়!

সে বলে উঠল, "আপনার সদয় কথাবার্তার জন্য আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি বলছেন আপনার অনেক জমি, আর আমারও কিছু জমির দরকার। আমি

শুধু জানতে চাই ঠিক কোন্ জমিটুকু আমার হবে, যাতে কোনওবকমে সেই জমিটুকু মাপ-জোপ করে আপনি দলিল করে আমাকে দিতে পারেন। জন্ম-মৃত্যু ভগবানের হাত। আপনারা ভাল মানুষ, আজ হয়তো জমিটা আমাকে দিলেন, কিন্তু আপনাব পরবর্তী বংশধরেরা আবার সেটা কেড়েও তো নিতে পারে!"

স্টার্শিনা হাসল।

সে বলল, "দলিল ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। এইরকম সভাতেই আমরা দলিল পাকা করে থাকি। এর চেয়ে পাকা দলিল আর হয় না।"

পাখোম বলল, "কিন্তু আমি শুনেছি একজন মহাজন সম্প্রতি আপনাদের এখানে এসেছিল, এবং আপনারা তার কাছে জমি বিক্রি করে তাকে যথারীতি জমিব হস্তান্তর দলিল দিয়েছেন। তাই আমার প্রার্থনা আমার বেলাতেও সেই ব্যবস্থা করুন।"

স্টার্শিনা এবার সব বুঝতে পারল।

সে বলল, "তাই হবে। আমাদের এখানে একজন মুন্সি আছে। সে-ই শহরে গিয়ে প্রয়োজনীয় দলিল নিয়ে আসবে!"

"কিন্তু জমির দাম কত দিতে হবে?" পাখোম শুধালো।

"জমির দাম?" স্টার্শিনা জবাব দিলো, "দিন প্রতি ১০০ রুব্‌ল্ মাত্র।"

'দিন-প্রতি' ব্যাপারটা পাখোম ঠিক বুঝতে পারল না। সে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করল, "তাতে কতটা জমি হবে?"

স্টার্শিনা বলল, "ওভাবে আমরা জমি মাপি না। আমরা বিক্রি কবি দিন হিসেবে। অর্থাৎ আপনি যতটা জমি একদিনে ঘুবে আসতে পারবেন পাযে হেঁটে তার সবটাই আপনার। এই হচ্ছে আমাদেব মাপ, আর তার দাম হলো ১০০ রুব্‌ল্।"

পাখোম অবাক হয়ে গেল।

সে বলল, "সেকি? একদিনে একটা লোক তো অনেক ঘুরে আসতে পারে!"

স্টার্শিনা আবার হাসল।

সে বলল, "বেশ তো, সে-সব জমিই আপনার হবে। তবে, একটি মাত্র শর্ত আছে—মানে, যেখান থেকে আপনি হাঁটতে শুরু করবেন, দিনমানে যদি সেখানে ফিরে আসতে না পারেন, আপনাব টাকা বাজেয়াপ্ত হযে যাবে।"

পাখোম শুধালো, "কিন্তু কোন্খান থেকে হাঁটতে শুরু করব আপনারা জানবেন কেমন করে?"

স্টার্শিনা জবাব দিলো, "আপনি যেখান থেকে খুশি হাঁটতে শুরু করুন, আমরা সেইখানেই দাঁড়াব। আমার কিছু লোক এবং আমি সেখানে উপস্থিত থাকব আর আপনি হাঁটতে শুরু করবেন। আমাদের কযেকটি যুবক ঘোড়ায় চড়ে আপনার পিছনে পিছনে যাবে, আর আপনি যেখানে যেখানে বলবেন সেখানেই একটা করে খুঁটি পুঁতবে। তারপর সেই খুঁটি-বরাবর লাঙল চালিয়ে দেওয়া হবে। আপনি যেখান দিয়ে খুশি বৃত্ত এঁকে যাবেন। শুধু সূর্যাস্তের আগেই আপনাকে যাত্রার স্থলে ফিরে আসতে হবে। যতটা জমি আপনি ঘুরে আসতে পারবেন সবটাই হবে আপনার।"

পাখোম সেই প্রস্তাবেই রাজি হলো। স্থির হলো, আগামী কাল খুব সকালে যাত্রা শুরু হবে। তারপর সকলে মিলে অনেক কথা বলল, অনেক কুমিস পান করল, অনেক ভেড়ার মাংস খেলো, আর অনেক চা খেলো। রাত পর্যন্ত উৎসব চলল। অবশেষে পাখোম শুতে গেল পাখির পালকের বিছানায়, এবং বাকি সকলে পরদিন সকালে প্রথমে নদীর পাড়ে জমায়েত হয়ে সূর্যোদয়ের আগেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে যার ঘরে চলে গেল।

৭

পাখির পালকের বিছানায় শুয়েও, যে-জমির মালিক সে হবে তার চিন্তায় সারা রাত পাখোম দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না।

সে নিজের মনে ভাবতে লাগল, কাল সকালে ওদের প্রতিশ্রুত জমির অনেকখানিই দাগ কেটে নিতে পারব। সারা দিনে অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ ভার্স্ট পথ ঘুরে আসতে পারব। আর পঞ্চাশ ভার্স্ট পথ ঘুরে আসতে মোটামুটি হিসাবে ১০,০০০ ডেসিয়াটিন জমি খুবই বেড় দিতে পারব। তখন আর আমি কারো তোয়াক্কা করব না। একটা জোড়া-বলদে-টানা লাঙল আর দু'জন মজুর রাখতে পারব। সেরা জমিগুলো চাষ করব, আর বাকিটা থাকবে গো-চর।

সারারাত পাখোম চোখ বুজাতে পারল না, কিন্তু ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল সে। সঙ্গে সঙ্গে সে একটা স্বপ্ন দেখল। সে যেন একটা গাড়িতে শুয়ে শুয়ে শুনতে পাচ্ছে বাইরে কে যেন হাসছে আর কথা বলছে। কে এমন করে হাসছে দেখবার জন্য বাইরে গিয়ে সে দেখল, মাটির উপর বসে আছে স্টার্শিনা। বুকের দুই পাশ চেপে ধরে খুশির উল্লাসে সে গড়াগড়ি যাচ্ছে। স্বপ্নের মধ্যেই পাখোম হেঁটে তার কাছে গিয়ে হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করল। সঙ্গে সঙ্গে সে দেখতে পেল, লোকটি স্টার্শিনা নয়, যে মহাজন সম্প্রতি তার বাড়ি গিয়ে এই দেশের কথা বলেছিল সে-ই। তখন সে জিজ্ঞাসা করল, "কিছুদিন আগে আপনাকেই কি আমার বাড়িতে দেখিনি?" বলতে-বলতেই মহাজনের বদলে দেখা গেল ভল্গার ভাঁটি থেকে আসা সেই চাষীটিকে, যে তার পুরনো গোলাবাড়িতে তার সঙ্গে দেখা করেছিল। সবশেষে পাখোম দেখল, এ চাষীটি মোটেই চাষী নয়, এ হচ্ছে স্বয়ং শয়তান, মাথায় শিং আর পায়ে খুর। মাটিতে বসে হাসতে হাসতে কিসের দিকে যেন সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে, আর এমন হাসছেই বা কেন? স্বপ্নেই সে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেল, একটি লোক—খালি পায়ে, শুধু শার্ট আর ব্রীচেস পরে—চিত হয়ে পড়ে আছে। তার মুখ কাগজের মতো সাদা। লোকটির দিকে তাকিয়ে পাখোম দেখতে পেল, লোকটি সে নিজে।

তার দম যেন আটকে এল। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল ঘুম। কিন্তু জেগেও তার

মনে হতে লাগল, স্বপ্নটা বুঝি সত্যি। তখন সে চেয়ে দেখল ফর্সা হয়েছে কি না। দেখল, ভোর হয়-হয়।

সে ভাবল, যাত্রার সময় হয়েছে। এদের ঘুম এবার ভাঙাতে হবে।

পাখোম বিছানা ছেড়ে উঠল। ট্যারান্টাস থেকে তার মজুরটিকে ডাকল। তাকে বলল গাড়িতে ঘোড়াটা জুড়ে বাসকিরদের ডাকতে, কারণ মাঠে গিয়ে জমির মাপ শুরু করবার সময় হয়েছে। বাসকিররাও ঘুম থেকে উঠে তৈরি হয়ে নিলো। স্টার্শিনাও এল। কুমিস দিয়ে প্রাতরাশ সারল সবাই। পাখোমকেও চা দিতে চাইল। কিন্তু সে আর অপেক্ষা করতে পারে না। বলল, "যদি আমাদের যেতে হয় তো এখুনি চলুন। সময় হয়ে গেছে।"

৮

বাসকিররা তৈরি হলে সকলে যাত্রা করল—কেউ ঘোড়ায়, কেউ গাড়িতে। পাখোম তার মজুরকে নিয়ে চলল তার ট্যারান্টাসে চড়ে। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা হাজির হলো প্রান্তরে। একটা ছোট গোল পাহাড়ের দিকে সবাই এগিয়ে চলল। বাসকিরদের ভাষায় ঐ পাহাড়কে বলে শিকান। সবাই এসে জমায়েত হলো সেখানে। স্টার্শিনা পাখোমের পাশে গিয়ে হাত ঘুরিয়ে চারদিক দেখিয়ে বলল, "এখান থেকে যত জমি আপনি দেখতে পাচ্ছেন সব আমাদের। আপনি যেদিকে খুশি এগিয়ে যান।" পাখোমের চোখ চক্‌চক্‌ করে উঠল, কারণ সমস্ত জমি ঘাসে ভর্তি, আর হাতের তালুর মতো সমতল। শুধু যেখানে গভীর খাদ আছে সেখানেই ঘাস নেই, তাছাড়া সর্বত্র বুক-সমান উঁচু ঘাস। স্টার্শিনা তার শেয়ালের চামড়ার টুপি খুলে শিকানের ঠিক মাঝখানে সেটাকে রেখে বলল, "এই হলো চিহ্ন। এইখানে আপনার চাকরটি থাকবে। এই চিহ্নিত জায়গা থেকে আপনি যাত্রা করবেন, আবার এখানেই ফিরে আসবেন। যতটা জমি ঘুরে আসতে পারবেন সবটাই আপনি পাবেন।"

পাখোম টাকা বের করে টুপিটার মধ্যে রাখল। তারপর গায়ের ক্লোকটা খুলে ফেলল। পেটের উপরে বেল্টটা কষে বাঁধল। ঝোলাটায় রুটি ভরে বেঁধে দিলো বুকের ভিতরে, জলের পাত্রটা স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধল ঘাড়ের সঙ্গে। পায়ের বুট দিলো টেনে। তৈরি হলো যাত্রার জন্য। সে নিজের মনে ভাবতে লাগল, সবদিকেই তো ভাল জমি, এখন কোন্ দিক আমি বেছে নেব? অবশেষে সে ঠিক করল, ঠিক আছে, সব দিকই যখন সমান, আমি হাঁটব সূর্যোদয়ের দিকে। কাজেই সেই দিকে মুখ করে সূর্যোদয়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। মনে মনে ভাবল, এতটুকু সময় আমি নষ্ট করব না, কারণ বাতাস ঠাণ্ডা থাকতে থাকতেই আমাকে সবচেয়ে বেশি পথ হেঁটে নিতে হবে।

তখন অশ্বারোহী বাসকিররাও শিকানে চড়ে পাখোমের পিছনে এসে দাঁড়াল। সূর্যের প্রথম রশ্মি দিক্‌চক্রে ফুটে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই পাখোম এগিয়ে চলল সুমুখের দিকে। অশ্বারোহীরা চলল তার পিছনে পিছনে।

সে হেঁটে চলল—আস্তেও নয়, আবার খুব জোরেও নয়। এক ভার্স্ট যাবার পরে সে থামল। একটি খুঁটি পোঁতা হলো। আবার সে চলতে লাগল। প্রথম চলার জড়তা কাটিয়ে ক্রমেই সে লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগল। আবার থেমে আরেকটি খুঁটি পুঁতিয়ে দিলো। সূর্যের দিকে তাকাল একবার। এতক্ষণ আলো ছড়িয়ে পড়েছে গোল পাহাড়টার উপরে—সেখানে দাঁড়ানো মানুষগুলোর উপরে। হিসেব করে দেখল, প্রায় পাঁচ ভার্স্ট সে হেঁটেছে। ক্রমেই শরীর গরম লাগছে। ওয়েস্ট-কোটটা খুলে আবার সে বেল্ট এঁটে দিলো। আরও পাঁচ ভার্স্ট গিয়ে থামল সে। তখন সত্যি বেশ গরম পড়েছে। আবার সে সূর্যের দিকে চাইল। প্রাতরাশের সময় হয়েছে। মনে মনে বলল, দিনের এক ভাগ তো শেষ হলো। আরো চার ভাগ এখনো হয়নি। তবু পায়ের জুতো এবার খুলে ফেলতে হবে। কাজেই সেখানে বসে জুতো খুলে সে আবার চলতে শুরু করল। আরও সহজে এখন সে হাঁটতে পারছে। মনে-মনে ভাবল, আর পাঁচ ভার্স্ট পার হয়েই বাঁ দিকে মোড় ঘুরব। এই স্থানটিতে বড়ই ভাল জমি পাচ্ছি। কাজেই আবার সে এগিয়ে চলল। একবার পিছন ফিরে চাইল,—গোল পাহাড়টা এখন প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। উপরের লোকগুলোকে দেখাচ্ছে ছোট-ছোট পিঁপড়ের মতো।

অবশেষে সে ভাবল, এতক্ষণে বেড়টা বেশ বড়ই হয়েছে। এইবার মোড় ঘুরতে হবে। ঘাম ঝরছে শরীরে। তেষ্টাও পেয়েছে। ফ্লাস্ক থেকে জল খেল খানিকটা। সেখানে আর-একটা খুঁটি পোঁতা হলো। তখন সে বাঁদিকে খাড়া বেঁকে গেল। লম্বা লম্বা ঘাস আর সেই আগুন-গরমের ভিতর দিয়ে চলল এগিয়ে। ক্রমেই সে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছে। সূর্যের দিকে চেয়ে বুঝল, দুপুরের খাবারের সময় হয়েছে। মনে মনে বলল, এবার নিশ্চয় একটু বিশ্রাম নিতে পারি। সেখানে দাঁড়িয়েই খানিকটা রুটি খেলো। কিন্তু মাটিতে বসল না, কারণ সে ভাবল, একবার বসলেই শুতে ইচ্ছে করবে, আর শুলেই পড়বে ঘুমিয়ে। কাজেই আরও খানিকটা জিরিয়ে আবাব চলতে শুরু করল। প্রথমটা হাঁটতে একটু সুবিধে হলো, কাবণ খাবার খেয়ে সে খানিকটা জোর ফিরে পেয়েছে। কিন্তু সূর্য প্রখরতর হয়েছে, একটুখানি হেলেছে সন্ধ্যার দিকে। পাখোমের শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে এবার, তবু সে ভাবল, এক ঘণ্টার কষ্টে আমার শতেক কড়ি লাভ।

বৃত্তের এই অংশের প্রায় দশ ভার্স্ট পার হয়ে সে ফিরবার পথে বাঁদিকে বাঁক নেবে, এমন সময় তার চোখে পড়ল, একটা শুকনো খাদের চারদিক ঘিরে রয়েছে, সুন্দর একটুকরো জমি। এটুকু ছেড়ে যাওয়া বড়ই দুঃখের কথা। সে ভাবল, চমৎকার তিসি হবে ও জমিতে; কাজেই সে সোজা এগিয়ে চলল সেই খাদ পর্যন্ত। সেখানে একটা খুঁটি পোঁতা হলে চাকার মতো ঘুরে চলল ভিতরের দিকে। শিকানের দিকে চেয়ে দেখল, লোকগুলো একেবারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ওরা পনেরো ভার্স্টের চেয়ে কম দূরে হবে না। মনে মনে বলল, মোট পথের দুটো লম্বা অংশ তো পার হয়েছি। এবার শেষ অংশটা পার হতে হবে খুব সোজা পথে। কাজেই এবার খুব তাড়াতাড়ি

পা ফেলতে লাগল সে। আবার চাইল সূর্যের দিকে। সান্ধ্য আহারের সময় হয়ে এসেছে, অথচ মাত্র দুই ভার্স্ট পথ সে পার হয়েছে। যাত্রার স্থান এখনো তেরো ভার্স্ট দূরে। সে মনে মনে বলল, জমিটা যদিও বেখাপ্পা মাপের হয়ে যাবে, তবু এবার সোজা ফিরে যাব। ফিরবার পথে আর নতুন জমি নিতে চেষ্টা করব না। যা নিয়েছি তাই যথেষ্ট। তাড়াতাড়ি একটা গর্ত খুঁড়ে পাখোম সোজা এগিয়ে চলল গোল পাহাড়ের দিকে।

৯

সোজা পথেই সে এগিয়ে চলেছে, তবু হাঁটতে এখন বড় কষ্ট হচ্ছে। পা দুটো কেটে ছিঁড়ে গিয়ে খুবই যন্ত্রণা হচ্ছে এখন। পা দুটো যেন আর চলতেও চায় না। কাঁপছে থর্-থর্ করে। একটু বিশ্রামের বিনিময়ে সে যেকোনও কিছু দিতে এখন প্রস্তুত। অথচ সে জানে, সূর্যাস্তের আগে গোল পাহাড়ে পৌঁছতে হলে বিশ্রাম করা তার চলবে না। সূর্য তো অপেক্ষা করে থাকবে না! কে যেন গাড়ির চালকের মতো তাকে চাবুক মেরে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে সে যেন টলে টলে পড়ছিল। নিজের মনেই সে কথা বলতে লাগল বার বার, নিশ্চয়ই আমি হিসেবে ভুল করিনি! দ্রুত চলেও সময়ে ফিরতে পারব না—নিশ্চয়ই এত জমি আমি ঘুরিনি। এখনো কত পথ পাড়ি দিতে হবে, অথচ আমি যে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছি! তবে কি আমার সব অর্থ, সব পরিশ্রম বৃথা যাবে? দেখা যাক, সাধ্যমতো চেষ্টা তো করি!

আবার শক্তি সঞ্চয় করে পাখোম দৌড়তে শুরু করল। পা ছিঁড়ে রক্ত ঝরছে, তবু সে দৌড়োচ্ছে, দৌড়োচ্ছে, আর দৌড়ে চলেছে। ওয়েস্ট-কোট, জুতো, ফ্লাস্ক, টুপি—সব ছুঁড়ে ফেলে দিলো। ভাবল, হায়, সব কিছু দেখে আমি কত খুশিই না হয়েছিলাম! এখন তো সবই গেল! সূর্যাস্তেব আগে কিছুতেই আমি লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারব না! ভয় পাবার দরুন তার দম আরও ফুরিয়ে গেল। তবু সে দৌড়তে লাগল। শার্ট আর ব্রীচেস ঘামে ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে গেল। গলা উঠল কাঠ হয়ে। বুকের ভিতর কে যেন একজোড়া হাপর টানছে, হৃৎপিণ্ডের ভিতরে মারছে হাতুড়ির ঘা। পা দুটো আর সইছে না দেহের ভার, ভেঙে ভেঙে পড়ছে; সেদুটো যেন তার নিজের পা নয়। জমির কথা আর এখন তার মনে নেই। পরিশ্রমের দরুন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাই এখন তার একমাত্র চিন্তা। তবুও, মৃত্যুর ভয় যতই থাকুক. তবু সে থামতে পারল না। সে ভাবতে লাগল, এত পথ চলে এখন থামব! ওরা যে তাহলে বোকা মনে করবে আমাকে। এই সময় সে শুনতে পেল, বাসকিবরা চিৎকার করে তাকে উৎসাহ দিচ্ছে। তাদের চিৎকার শুনে তার মনে জাগল নতুন বল। শেষ শক্তিটুকু নিয়ে সে দৌড়তে লাগল সামনে—আরও সামনে। সূর্য তখন দিকচক্ররেখা ছোঁয়-ছোঁয়। হায়! সে তো প্রায় লক্ষ্যস্থলে এসে পৌঁচেছে! সে দেখতে পেল, গোল পাহাড়ের উপর থেকে সবাই হাত নেড়ে তাকে ডাকছে। সে দেখতে পেল শেয়ালের

চামড়ার টুপিটা পড়ে রয়েছে মাটিতে, তার মধ্যে রয়েছে টাকা, আর তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে স্টার্শিনা। হঠাৎ পাখোমের মনে পড়ল স্বপ্নের কথা। সে ভাবল, তবু এখন আমার অনেক জমি, শুধু ভগবান আমাকে নিরাপদে গিয়ে জমির উপর বেঁচে থাকতে দিলেই হয়! কিন্তু আমার মন বলছে, নিজেকে আমি খুন করেছি। তবু সে দৌড়তে লাগল। শেষবারের মতো চাইল সূর্যের দিকে। প্রকাণ্ড লাল সূর্যটা মাটি ছুঁয়েছে, ডুবতে বসেছে দিকচক্রবেখার নিচে। পাখোম যখন গোল পাহাড়টায় পৌছল তখন সূর্য অস্ত গিয়েছে। "আঃ!" বলে গভীর হতাশায় সে চেঁচিয়ে উঠল, কারণ সে ভাবল যে সবই গেল। সহসা তার মনে পড়ল, গোল পাহাড়ের উচুতে যারা রয়েছে তাদের কাছে সূর্য হয়তো এখনও অস্ত যায়নি। ছুটল সে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে। হাত-পা দিয়ে পাহাড়টাকে আঁকড়ে ধরে উঠতে উঠতে সে দেখল, টুপিটা তখনও সেখানে আছে। হঠাৎ সে পা হড়কে নিচে পড়ে গেল। পড়তে পড়তেও একবার দু'হাত বাড়িয়ে দিলো টুপিটার দিকে— সেটাকে স্পর্শ করল একবার।

স্টার্শিনা চিৎকার করে উঠল, "হায় যুবক, অনেক জমি তুমি পেলে বটে।"

পাখোমের মজুর ছুটে গেল মনিবের কাছে। তাকে তুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার মুখ দিয়ে তখন রক্তের ধারা বইছে।

পাখোম মরে গেছে। আতংকে চিৎকার করে উঠল মজুরটা। স্টার্শিনা কিন্তু মাটিতেই বসে রইল, দুই হাত ঝুলিয়ে দিয়ে হাসতে লাগল।

অবশেষে সে উঠে দাঁড়াল; মাটি থেকে একখানা কোদাল তুলে নিয়ে মজুরটার দিকে ছুঁড়ে দিলো।

শুধু বলল, "ওকে কবর দাও।"

বাসকিরবা দুঃখ প্রকাশ করতে জিভ দিয়ে চু-চু শব্দ করল

মজুরটা কোদাল নিয়ে পাখোমের মাপ মতো একটা কবর খুঁড়ে তাকে সমাধি দিলো। পাখোমের মাথা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত মাত্র তিন কুশ 'এল' (এক এল=আড়াই হাত) জমি তার দরকার হলো।

১৮৮৬

সের্গেই বাবা

Father Sergius

১

চল্লিশের দশকে যখন মহামান্য সম্রাটের অশ্বারোহী বাহিনীর একটি দলের অধিপতি সুদর্শন কোনও এক রাজপুত্র—যার সম্পর্কে সকলেই আশা করেছিল যে সম্রাটের অধীনে সহকারীর পদ লাভ করে সে জীবনে প্রভূত উন্নতি করে এবং সম্রাজ্ঞীর প্রিয় সহচরী জনৈকা সুন্দরীর সঙ্গে যার বিয়ে পরবর্তী মাসেই স্থির হয়েছিল—কমিশন থেকে পদত্যাগ করে বসল, বিয়েটা ভেঙে দিলো, এবং বিষয়-সম্পত্তি সব বোনের হাতে তুলে দিয়ে সন্ন্যাসী হবার জন্য মঠে চলে গেল, তখন সেন্ট পিতার্সবুর্গ শহরের মানুষের আর বিস্ময়ের অন্ত রইল না। এর পিছনের কারণ যারা জানত না তাদের কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই অসাধারণ ও দুর্বোধ্য বলে মনে হলো; কিন্তু স্বয়ং প্রিন্স স্তেপান কাসাৎস্কির কাছে সিদ্ধান্তটা ছিল এতই স্বাভাবিক যে এ ছাড়া আর কিছু সে ভাবতেও পারত না।

স্তেপান কাসাৎস্কি-র বয়স যখন মাত্র বারো বছর তখন তার বাবা রক্ষীবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল মশায় মারা যায়। ছেলেকে বাড়ি থেকে বাইরে পাঠাবার একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার মা স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে সাহস করল না; তার মনের বাসনা ছিল, যদি তার মৃত্যু ঘটে তাহলে মা যেন ছেলেকে বাড়িতে না রেখে সামরিক শিক্ষার্থী বাহিনীতে পাঠিয়ে দেয়। তাই সে ছেলেকে সমর-শিক্ষার্থী বাহিনীতে পাঠিয়ে দিয়ে মেয়ে ভার্‌ভারা-কে নিয়ে সেন্ট পিতার্সবুর্গ-এ চলে গেল; তাতে ছেলের কাছাকাছি থাকার এবং ছুটির দিনে তাকে বাড়িতে পাবার সুবিধা হবে।

বিশেষ দক্ষতা ও প্রচণ্ড আত্মাভিমানই ছিল ছেলেটির চারিত্রিক লক্ষণ; তার ফলে কি ক্লাসের কাজে—বিশেষত অংকে ছিল তার বিশেষ আকর্ষণ—কি অশ্বারোহণ ও অন্যবিধ সামরিক কলা-কৌশলে, সব ক্ষেত্রেই সে অন্য সকলকে ছাড়িয়ে গেল। দেখতে সুদর্শন, আর অস্বাভাবিক লম্বা হলেও শরীরটি সুগঠিত, আচরণও সুবিন্যস্ত। শুধু যদি মেজাজটা রাগী না হতো, তাহলে চরিত্রের দিক থেকেও হতে পারত আদর্শ শিক্ষার্থী। মদে বা লাম্পট্যে তার কোনও রকম আসক্তি ছিল না; আর তার সত্যবাদিতা ছিল বিস্ময়কর। হঠাৎ রেগে যাওয়াই ছিল তার একমাত্র দোষ; তখন নিজের উপর সব নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সে যেন একটা ক্রুদ্ধ পশুতে পরিণত হতো। একদিন তো তার ধাতু-সংগ্রহ নিয়ে ঠাট্টা করায় একটি শিক্ষার্থীকে সে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল আর কি। আর একদিনও প্রায় বিপদ ঘটিয়ে বসেছিল; নিজের

কথাকে অস্বীকার করে ডাহা মিথ্যা কথা বলার জন্য ভাণ্ডারীকে লক্ষ্য করে এক প্লেট কাটলেট ছুঁড়ে দিয়ে তার দিকে রুখে গিয়েছিল; সকলে বলে তাকে নাকি মারধোরও করেছিল। শিক্ষার্থী বাহিনীর ডিরেক্টর যদি ভাণ্ডারীকে বরখাস্ত করে দিয়ে ব্যাপারটা চাপা না দিতো তাহলে হয়তো তার শাস্তিই হয়ে যেত।

আঠারো বছর বয়সে রক্ষী-বাহিনীর একটি অভিজাত রেজিমেন্টে সে কমিশন পেয়ে গেল। সম্রাট নিকোলাই পাভ্‌লোভিচ শিক্ষার্থী অবস্থায়ই তার উপর নজর রেখেছিল; রেজিমেন্টে ঢোকার পরেও বিশেষ সুবিধা দেবার জন্য তাকেই বেছে নিলো; সকলেই আশা করল যে সে সম্রাটের সহকারীর মর্যাদায় উন্নীত হবে। তার মনের একান্ত বাসনাও তাই ছিলো; তার উচ্চাকাংখাই যে তার কারণ তাও নয়; তার প্রধান কারণ সমর-শিক্ষার্থী বাহিনীতে থাকার সময় থেকেই নিকোলাই পাভ্‌লোভিচ-এর প্রতি তার মনে জেগেছিল সাগ্রহ—হ্যাঁ, এটাই একমাত্র উপযুক্ত ভাষা : সাগ্রহ—অনুরাগ। নিকোলাই পাভ্‌লোভিচ যতবার শিক্ষার্থী-শিবির পরিদর্শনে এসেছে—সে পরিদর্শন মাঝে মাঝেই ঘটত; দীর্ঘ দেহ, প্রশস্ত বক্ষ, সামরিক পরিচ্ছদ, উন্নত নাসিকা, গোঁফ ও চওড়া জুল্‌ফি নিয়ে যতবার সে দ্রুত পদক্ষেপে সেখানে ঢুকেছে, উদাত্ত কণ্ঠে শিক্ষার্থীদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছে, ততবারই কাসাৎস্কি তার জন্য অনুভব করেছে প্রেমিকের উন্মাদনা—ঠিক যে উন্মাদনা সে পরবর্তীকালে তার প্রেমিকার জন্য অনুভব করেছে। শুধু নিকোলাই পাভ্‌লোভিচ-এর প্রতি যে উন্মাদনা সেটা ছিল আরও তীব্র। যাকে সে পূজা করে তার প্রতি অসীম অনুরাগের প্রমাণ দিতে ছেলেটি যে কোনও ত্যাগ স্বীকার করতে, এমন কি নিজেকে উৎসর্গ করতেও সর্বদা প্রস্তুত। আর নিকোলাই পাভ্‌লোভিচও সেটা জানত বলে ইচ্ছা করেই তাকে এ ব্যাপারে উৎসাহ জোগাত। সে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে খেলাধূলা করত, জটলা পাকাত, কখনও বালকের সরলতায়, কখনও বয়স্ক বন্ধুর মতো, কখনও বা রাজকীয় মহিমায় তাদের সঙ্গে নানা কথাবার্তা বলত। ভাণ্ডারীর সঙ্গে কাসাৎস্কির গণ্ডগোলের পরে নিকোলাই পাভ্‌লোভিচ কোনও কথাই বলল না; কিন্তু ছেলেটি যখন তার সঙ্গে দেখা করল, তখন সে নাটকীয় ভঙ্গিতে তাকে চলে যেতে বলল, এবং ভুরু কুঁচকে তার দিকে আঙুলটা বাড়িয়ে দিলো; আর চলে যাবার সময় বলল :

"তোমার বোঝা উচিত যে আমি সব জানি। কিন্তু এমন অনেক জিনিস আছে যা আমি জানতে চাই না। কিন্তু এখানে ওরা মিথ্যা কথা বলে থাকে।"

এই বলে সে ছেলেটির বুকের উপর হাত রাখল।

অবশ্য পরবর্তীকালে স্নাতক শিক্ষার্থীরা যখন তার সামনে হাজির হলো, সম্রাট তখন সে ঘটনার উল্লেখমাত্র না করে চিরকালের প্রথামতোই তাদের বলল, প্রয়োজন হলেই তারা যেন সরাসরি তার সঙ্গে দেখা করে; তাকে এবং মাতৃভূমিকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে সেবা করাই তাদের কর্তব্য; এবং সেও সর্বদাই তাদের সবচাইতে বড় বন্ধু হয়ে থাকবে। যথারীতি শিক্ষার্থীরা অভিভূত হলো; আর পূর্বেকার কথা স্মরণ করে

কাসাৎস্কি সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলল; প্রতিজ্ঞা করল, প্রিয় জার-এর সেবাতেই সে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করবে।

কাসাৎস্কি কমিশন পাবার পরে তার মা ও বোন প্রথমে মস্কোতে এবং পরে তাদের গ্রামের বাড়িতে চলে গেল। কাসাৎস্কি তার অর্ধেক সম্পত্তি বোনকে দিয়ে দিলো। বাকি সম্পত্তি থেকে যা আয় হতো তাতেই তার খরচপত্র চলে যেত; কারণ যে রেজিমেন্ট-এ সে কাজ করত সেটা নেহাৎই গিল্টিতে মোড়া।

কাসাৎস্কিকে বাইরে থেকে দেখলে একটি মেধাবী, উচ্চাকাংখী যুবক রক্ষী-সৈনিক যে রকম হয়ে থাকে তার চাইতে বেশি কিছু বলে মনে হবে না। কিন্তু তলে তলে সর্বদাই সে জটিল ও প্রচণ্ড প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করে রেখেছে। তার শৈশবকাল থেকেই সে প্রচেষ্টাটি চলে আসছে—তার বাইরের চেহারা আলাদা আলাদা রূপ নিলেও প্রচেষ্টাটি মূলত একই : জীবনে যে কাজেই সে আত্মনিয়োগ করুক তাতেই এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে হবে, এমন বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে যাতে অন্য সকলের মনে প্রশংসা ও বিস্ময় জেগে ওঠে। যখন জ্ঞানলাভের ও পড়াশুনার ব্যাপার ছিলো, তখন সে এমনভাবে বইতে মুখ গুঁজে থাকত যে যতক্ষণ সকলে তাকে আদর্শ ছাত্র বলে প্রশংসা না করত ততক্ষণ সে মুখ তুলত না। একটা বিষয় জানা হয়ে গেলেই অন্য বিষয় ধরত। এইভাবেই সে ক্লাসে প্রথম হতো; এইভাবেই শিক্ষার্থী-শিবিরে থাকার সময়েও প্রথম দিকে ফরাসি সংলাপের বেলায় কিছুটা অসুবিধা ভোগ করবার পরে সে ফরাসি ভাষাকেও রুশ ভাষার মতোই আয়ত্ত করে ফেলল; আর এইভাবেই দাবা খেলা যখন তাকে আকর্ষণ করল তখন সে খেলায়ও সে উঁচুদরের দক্ষতা অর্জন করল।

জার ও দেশকে সেবা করবার যে সাধারণ লক্ষ্য সে জীবনে গ্রহণ করে নিয়েছিল তা ছাড়াও কাসাৎস্কির সামনে সর্বদাই একটা আসন্ন লক্ষ্য থাকত; সে লক্ষ্য যত তুচ্ছই হোক তাতেই সে সম্পূর্ণ মেতে উঠত, এবং যতক্ষণ সে লক্ষ্যে না পৌঁছত ততক্ষণই সেটা তার ধ্যান-জ্ঞান হয়ে থাকত। কিন্তু সে লক্ষ্যে পৌঁছন মাত্রই একটা নতুন লক্ষ্য এসে তার জায়গা দখল করে বসত। এই যে বৈশিষ্ট্য অর্জনের সাধনা, একটার পর একটা লক্ষ্যে পৌঁছবার এই যে প্রচেষ্টা, এটাই তার জীবনের সার কথা। এরই জন্য কমিশন লাভের পরে সে স্থির করল চাকরি সংক্রান্ত সব কিছুই সে পুরোপুরি জেনে নেবে; অচিরেই সে একজন আদর্শ অফিসার হয়ে উঠল—যদিও এখানেও তার সেই অসংযত মেজাজ তাকে এমন একটা কাজের মধ্যে ঠেলে দিলো যেটা এমনিতেই খারাপ এবং তার পরবর্তী উন্নতির পক্ষেও ক্ষতিকর হয়ে দেখা দিলো। তারপর একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে তার শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাব সম্পর্কে সে সচেতন হয়ে পড়ল এবং সে ত্রুটি সংশোধনের সংকল্প নিয়ে আবার বইয়ের মধ্যে ডুবে গেল এবং সাফল্য লাভও করল। তারপর তার ইচ্ছা হলো, সমাজ-জীবনেও বিশিষ্টতা অর্জন করবে; সঙ্গে সঙ্গে বল-নাচের শিক্ষা নিয়ে এতটা দক্ষতা অর্জন করল

যে সমাজের প্রতিটি বল-নাচেই তার আমন্ত্রণ আসতে লাগল; এমন কি ছোট ছোট নাচের আসরও বাদ পড়ত না। কিন্তু তাতে তার মন ভরল না। প্রথম স্থান অধিকার করতেই সে অভ্যস্ত; অথচ সমাজে তার স্থান সেখান থেকে অনেক দূরেই রয়ে গেল।

সে কালে সমাজ গঠিত হতো—আমার তো মনে হয় সব কালে সব দেশে ঐ একই অবস্থা—চার শ্রেণীর মানুষ নিয়ে : (১) যারা ধনী ও রাজদরবারের লোক; (২) যারা ধনী নয়, কিন্তু জন্মে ও শিক্ষা-দীক্ষায় রাজদরবারের লোকদের পরিবারভুক্ত; (৩) ধনবান লোক যারা রাজদরবারের লোকদের অনুগ্রহভাজন, এবং (৪) যারা ধনীও নয় রাজদরবারের লোকও নয়, কিন্তু ঐ উভয় শ্রেণীর লোকের অনুগ্রহভাজন হতে ব্যাকুল। কাসাৎস্কি প্রথম শ্রেণীর লোক নয়। শেষ দুটি শ্রেণীর মানুষরাই তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করত। সমাজে ঢুকতে গিয়ে তার প্রথম লক্ষ্যই ছিল সমাজের কিছু নারীর সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা, আর আশার অতিরিক্ত কম সময়ের মধ্যেই সে লক্ষ্যে সে পৌঁছে গেল। কিন্তু শীঘ্রই সে বুঝতে পারল, যে-সমাজে সে চলাফেরা করছে সেটা নিচু স্তরের; সমাজে এর চাইতেও উঁচু স্তর আছে, এবং সেই সব উঁচু রাজকীয় মহলে তার ডাক পড়লেও সেখানে সে বহিরাগত মাত্র। তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারই করা হতো, তবু প্রতিটি কথায় ও কাজে সে বুঝতে পারত যে অন্য সকলেই সেই সমাজের মানুষ, কিন্তু সে তা নয়। অথচ সেই সমাজের মানুষ সে হতে চায়। তার জন্য পথও আছে। একটা পথ সম্রাটের সহকারী হওয়া—আর সেটা হতে পারবে বলেই সে আশা করছে। দ্বিতীয় পথ, এই মহলের কাউকে বিয়ে করা। রাজ-দরবার মহলের একটি সুন্দরী মেয়েকে সে পছন্দ করল; যে মহলে সে প্রবেশ করতে চাইছে মেয়েটি সেই মহলের; শুধু তাই নয়, সেই উঁচু মহলে অত্যন্ত নিরাপদে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত অনেকেই সেই মেয়েটির বন্ধুত্ব কামনা করে। তার নাম করৎকোভা। শুধু উচ্চাকাংখা বশেই কাসাৎস্কি সেই কাউন্টেসটিকে বেছে নেয়নি। সে খুবই মনোরমা, আর অচিরেই সে তার প্রেমে পড়ে গেল। প্রথমে মেয়েটি তাকে উদাসীনভাবেই গ্রহণ করল; কিন্তু তারপরেই হঠাৎ সব বদলে গেল। মেয়েটি বেশ নরম হয়ে গেল, আর তার মা তো তাকে বিশেষ সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করল।

কাসাৎস্কি প্রস্তাব করল; প্রস্তাব গৃহীত হলো। এত সহজে সে সুযোগ পেয়ে সেও বিস্মিত হলো। মা ও মেয়ের ব্যবহারে এমন কিছু ছিল যেটা তার কাছে বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক বলে মনে হলো। কিন্তু সে তখন গভীর ভালবাসায় ডুবে গেছে, তাই অন্ধ হয়ে গেছে। আর তাই শহরের প্রায় প্রত্যেকেই যে-কথা কানাকানি করতে লাগল সে নিজে সেটা জানতে পারল না : তার এই বাগ্‌দত্তা এক বছর আগে নিকোলাই পাভ্‌লোভিচ-এর রক্ষিতা ছিল।

২

বিয়ের নির্দিষ্ট দিনের দু'সপ্তাহ আগে কাসাৎস্কি ত্সারাস্কোয়ে সেলো-তে তার

বাগ্‌দত্তার গ্রীষ্মকালীন বাস-ভবনে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। তখন মে মাস, খুব গরম। তারা কিছুক্ষণ বাগানে পায়চারি করে বেড়াল, তারপর একটা পথের পাশে বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। লম্বা লেবু গাছের ছায়ায় জায়গাটা ঢাকা। ভারতীয় মসলিনের সাদা পোশাকে কাউন্টেস মেরিকে সেদিন খুবই সুন্দরী দেখাচ্ছিল। পবিত্রতা ও প্রেমের মূর্তিস্বরূপা হয়ে সে সেখানে মাথা নিচু করে বসে ছিল; মাঝে মাঝে মুখ তুলে সুদর্শন, বলিষ্ঠ লোকটির দিকে তাকাচ্ছিল; আর সেও এমন মমতায়, এমন শান্তভাবে কথা বলছিল যাতে তার কোনও কথা বা আচরণ মেয়েটির দেবদূতসুলভ পবিত্রতাকে আহত বা ক্ষুণ্ণ না করে। কাসাৎস্কি চল্লিশের দশকের সেই মানুষদের অন্যতম—আজকের দিনে সে রকম লোক বিরল—যারা নিজেদের চারিত্রিক কলুষকে মেনে নিলেও এবং তাতে দোষেব কিছু না দেখলেও, স্ত্রীদের বেলায় আদর্শ স্বর্গীয় পবিত্রতাই দাবি করত; এবং তাদেব সমাজের সব মেয়েই সেই স্বর্গীয় পবিত্রতার অধিকারিণী বলে ধবে নিয়ে সেইভাবেই তাদের সঙ্গে ব্যবহার করত। ঐ ধরনের মতামতের অনেকটাই ভুল; পুরুষের বেলায় যে উচ্ছৃংখলতাকে মেনে নেওয়া হতো সেটাও খুবই ক্ষতিকব; কিন্তু নারীব সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আজকের যুবকদের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় অনেক বেশি হিতকব বলেই আমি মনে করি। আজকের যুবকরা তো যে-কোনও মেয়েকেই পুরুষ-সঙ্গী-সন্ধানী নারী বলেই মনে করে। তাদের আদর্শ স্বরূপিণী মনে করা হতো বলেই মেয়েরা আদর্শ নারী হবার যথাসাধ্য চেষ্টা করত। কাসাৎস্কি মেয়েদের এই দৃষ্টিতেই দেখত, তার বাগ্‌দত্তার সম্পর্কেও তার সেই ধারণাই ছিল। সেদিন তাব প্রেমে যতই মশগুল সে হোক না কেন, তবু তার প্রতি তিলমাত্র দৈহিক আকর্ষণ সে অনুভব কবেনি; বরং সে যে অপ্রাপনীয়া সেই চিন্তায়ই তার খুশির সীমা ছিল না।

দুই হাত তরবারিব উপর রেখে একটু ঝুঁকে সে মেয়েটির সামনে উঠে দাঁড়াল। বলল, "জীবন যে কত আনন্দ দিতে পারে তা শুধু এই মুহূর্তেই আমি জানতে পেরেছি; আর সে জন্য আমি তোমাব—তোমার কাছেই ঋণী!"

ঈষৎ লজ্জায় সে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসল। সে তখন যে অবস্থায় পৌচেছে তাতে অতি ঘনিষ্ঠতার "তুমি" সম্বোধন ভাল করে রপ্ত হয়নি; তাই এই দেবদূতটিকে এত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বোধন কবে ফেলে সে যেন একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

সে বলতে লাগল, "আজ আমি জেনেছি, নিজেকে আমি যা ভাবতাম আমি তার চাইতেও ভাল, আর এ জন্য ধন্যবাদ জানাই...তোমাকে।"

মেয়েটি বলল, "আমি কিন্তু অনেক আগে থেকেই জানতাম। আর জানতাম বলেই তোমাকে ভালবেসেছি।"

কাছাকাছি কোথায় একটা নাইটিঙ্গেল পাখি ডেকে উঠল। একটা দমকা বাতাসে গাছের কচি পাতাগুলিতে সর্‌-সর্‌ শব্দ হলো।

কাসাৎস্কি মেয়েটির হাতখানি ধরে তাতে চুমো খেল। তার দুই চোখ জলে ভরে

গেল। মেয়েটি বুঝতে পারল : সে তাকে ভালবাসে এ কথা বলার জন্য কাসাৎস্কি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। কোনও কথা না বলে কাসাৎস্কি কিছুক্ষণ পায়চারি করে আবার তার পাশে গিয়ে বসল।

"আমি কিন্তু...তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম...। যাকগে, ও কিছু নয়। প্রথম একটা স্বার্থই আমাকে তোমার কাছে এনেছিল। আমি চেয়েছিলাম সমাজে একটা স্থান করে নিতে। কিন্তু তারপর...তোমাকে যখন জানলাম তখন বুঝলাম সে সব কত তুচ্ছ ব্যাপার। এ-কথা শুনে তুমি রাগ করলে না তো?"

মেয়েটি জবাব দিলো না; তার হাতখানি কাসাৎস্কির হাতকে ছুঁল।

সেও বুঝতে পারল। না, মেয়েটি রাগ করেনি।

"দেখো, আমি তোমাকে বলতে শুনেছি..." পাছে দুঃসাহসের পরিচয় হয়ে পড়ে এই ভয়ে সে থেমে গেল। "দেখো, তুমি তো আমাকে ভালবেসেছ। কিন্তু—আমাকে ক্ষমা করো। এটা অবিশ্বাসের কথা নয়। কিন্তু এমন কিছু আছে যা তোমাকে বিব্রত করছে, অশান্ত করে তুলেছে। সেটা কি?"

মেয়েটি মনে মনে বলল, হ্যাঁ, এখনই না বললে আর কখনও বলা হবে না। একদিন না একদিন সে তো জানবেই। কিন্তু এখন—এখন সে আমাকে ত্যাগ করবে না। আহা, সে যদি তাকে ত্যাগ করে তাহলে মেয়েটি তো তা সহ্য করতে পারবে না।

গভীর আবেগে মেয়েটি দু'চোখ ভরে তার দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, আকর্ষণীয় শরীরটাকে দেখতে লাগল। এখন সে তাকে ভালবাসে—সম্রাটকে যত ভালবাসত তার চাইতে অনেক বেশি ভালবাসে। একমাত্র রাজকীয মর্যাদা ছাড়া আর কোনও কারণেই সেই সম্রাটকে তার চাইতে বেশি পছন্দ করত না।

"তাহলে শোন। তোমার কাছে মিথ্যা বলতে পারব না। সত্য কথাই তোমাকে বলব। তুমি প্রশ্ন করেছ—সেটা কি? সেটা এই : আগেও আমি ভালবেসেছি।"

ভীরু অনুনয়ের ভঙ্গিতেই সে কাসাৎস্কির হাতে হাত রাখল।

কাসাৎস্কি কোনও কথা বলল না।

"কাকে ভালবেসেছি বলব কি? তাঁকে, হ্যাঁ, মহামান্য সম্রাটকে।"

"আমরা সকলেই তো মহামান্য সম্রাটকে ভালবাসি। মনে হচ্ছে, যখন তুমি স্কুলে পড়তে..."

"না। স্কুল ছাড়বার পরে। সেটা ছিল মোহ, এখন সে মোহ কেটে গেছে। কিন্তু তোমাকে বলা দরকার যে..."

"বেশ তো, বলে ফেলো।"

"শুধুই মোহ নয়..."

সে দুই হাতে মুখটা ঢেকে ফেলল।

"কী? তুমি কি বলতে চাও তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলে?"

সে জবাব দিলো না।

"তুমি কি বলতে চাও, তার রক্ষিতা হয়ে ছিলে?"

সে জবাব দিলো না।

কাসাৎস্কি লাফ দিয়ে তার মুখোমুখি উঠে দাঁড়াল। তার নিজের মুখ মৃত্যু-পাণ্ডুর। ঠোঁট কাঁপছে। হঠাৎ তার মনে পড়ল, নেভ্স্কিতে একদিন তার সঙ্গে দেখা হলে তার বিয়ের খবর শুনে নিকোলাই পাভ্লোভিচ কত আদর করে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল।

"হায় ভগবান! এ আমি কি করলাম!" মেয়েটি কেঁদে উঠল।

"ছুঁয়ো না! তুমি আমাকে ছুঁয়ো না! ওঃ! কত বড় আঘাত তুমি আমাকে দিয়েছ!"

মুখ ঘুরিয়ে সে বাড়ি ফিরে গেল। হল-এ তার মায়ের সঙ্গে দেখা হলো।

"কি হলো, ব্যাপার কি প্রিন্স? আমি তো ভাবলাম..."

কিন্তু তার মুখের চেহারা দেখে মা থেমে গেল। কাসাৎস্কির মুখ উত্তেজনায় রাঙা হয়ে উঠেছে।

সে চিৎকার করে বলল, "আপনি জানতেন! আমাকে শিখণ্ডী খাড়া করতে চেয়েছিলেন! আপনি যদি পুরুষ মানুষ হতেন..."

তার প্রচণ্ড ঘুষিটা উদ্যত হলো। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে সে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তার বাগ্দত্তার প্রাক্তন প্রেমিক যদি অপর কেউ হতো, সে তাকে খুন করে ফেলত। কিন্তু সে যে তারই পরমপূজ্য সম্রাট।

পরদিনই সে ছুটির দরখাস্ত করল; সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ-পত্রও দাখিল করল। পাছে কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাই জানিয়ে দিলো যে সে অসুস্থ। অচিরেই সে দেশত্যাগ করল।

গ্রীষ্মকালটা নিজের জমিদারিতেই কাটাল। সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করল। গ্রীষ্ম শেষ হলে সেন্ট পিতার্সবার্গে ফিরে না গিয়ে সন্ন্যাসী হবার আশায় একটা মঠের উদ্দেশে যাত্রা করল।

তার মা সেখানে চিঠি লিখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে তাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করল। উত্তরে সে লিখল, ঈশ্বরের নির্দেশের স্থান সব বিবেচনার আগে, আর সেই নির্দেশই সে পেয়েছে। বোন ভার্ভারাই শুধু তাকে বুঝতে পেরে সহানুভূতি জানাল; সে যে দাদার মতোই আত্মাভিমানী ও উচ্চাকাংখী।

সেই শুধু বুঝতে পারল, যে সব লোক মনে করে যে তারা তার দাদার চাইতে বড়, নিজেকে তাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই সে সন্ন্যাস জীবনকে বেছে নিয়েছে। সে ঠিকই ধরেছে। সন্ন্যাস জীবনে প্রবেশ করে সে প্রমাণ করেছে যে অন্যের কাছে যে সব জিনিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাকে সে ঘৃণা করে; সামরিক জীবনে সেও ঐ সব জিনিসকে গুরুত্ব দিতো; কিন্তু আজ সে এমন উচ্চতায় উঠেছে যেখান থেকে

সে সেই সব মানুষদেরই তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারছে যাদের সে নিজে একদিন হিংসা করত। ভার্‌ভারা এ রকমটা ভাবলেও শুধু এই মনোভাবের দ্বারাই সে পরিচালিত হয়নি। তার অহংকার সর্বক্ষেত্রে প্রথম হবার তাগিদের সঙ্গে মিশেছিল আরও একটা প্রেরণা যার কথা ভার্‌ভারা জানত না—একটা প্রকৃত ধর্মীয় অনুপ্রেরণা। বাগ্‌দত্তা মেরিকে সে দেবীরূপে কল্পনা করেছিল; তার সে স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়েছে; সে আঘাত এতই নির্মম যে হতাশায় সে ডুবে গেল; আর সে হতাশায় তাকে নিয়ে গেল—কোন পথে? ঈশ্বরের দিকে, তার শৈশবের বিশ্বাসেব দিকে; সে বিশ্বাস কোনওদিন তাকে ছাড়েনি।

৩

কাসাৎস্কি যেদিন মঠে প্রবেশ করল সেটা ছিল সন্তদের প্রার্থনা (Intercession) দিবস।

এই মঠের প্রধান একজন সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত লোক; তাছাড়া সে একজন ধর্মগুরু (Starets); যে সাধুর দল ওয়ালাচিয়া থেকে এসেছে, যারা মনোনীত নেতা ও গুরুব প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্যের জন্য বিখ্যাত, সেও তাদেরই একজন। এই প্রধান সন্ন্যাসীটি বিখ্যাত ধর্মগুরু আম্ব্রোসি-র শিষ্য—তিনি আবার ধর্মগুরু মাকারি-ব শিষ্য—মাকাবি ধর্মগুরু লিওনিদ-এর শিষ্য—লিওনিদ পৈসি ভেলিচ্‌কভ্‌স্কি-র শিষ্য। কাসাৎস্কি তাকেই নিজের ধর্মগুরু বলে স্বীকাব করে নিল।

মঠে ঢুকবার পরে কাসাৎস্কি বুঝতে পারল যে এখানকার অন্য সকলের চাইতে সে বড়; এই মনোভাব ছাড়াও এই নতুন জীবনের দায়িত্ব পালন কবতে গিয়ে ভিতরে-বাহিরে পূর্ণতার সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পেরে তাব মন খুশিতে ভরে উঠল। ঠিক যেমন রেজিমেন্টে থাকবার সময় সে শুধু একজন অনিন্দ্য অফিসাব হয়েই সন্তুষ্ট থাকেনি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাজ করেছে, সরকারী প্রয়োজন ছাড়াও অনেক কর্তব্য পালন করেছে—তেমনি এখনও সন্ন্যাসী হিসাবে পূর্ণতাই হলো তাব কাম্য; তার সাধনা হলো কর্মে ও চিন্তায় পরিশ্রমী, মিতাচারী, নিরীহ, শান্ত, পবিত্র এবং অনুগত হওয়া। এই শেষ গুণ বা ধর্ম—এই আনুগত্যই এখানে তাব জীবনকে সহজ কবে তুলল। একটি সাধারণ মঠের সন্ন্যাসীকে এমন অনেক কিছু করতে হয় যা তার কাছে অপ্রীতিকর, যা তাকে লোভের পথে নিয়ে যায়; কিন্তু আনুগত্যবোধ তাকে তা থেকে রক্ষা করেছে; সে ভেবেছে : বিচারের দায়িত্ব তো আমার নয়; আমার উপর যে কর্তব্যের ভার দেওয়া হয়েছে, সে যাই হোক না কেন, আমাকে তাই করে যেতে হবে।

শুধু একটি চিন্তা তাকে কষ্ট দিতো: তার বাগ্‌দত্তার স্মৃতি। শুধু স্মৃতিমাত্র নয়, যা হতে পারত তার সুস্পষ্ট উপলব্ধি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার মনে পড়ত, সম্রাটের আবও একজন প্রাক্তন প্রেমিকা পরবর্তীকালে বিয়ে করে আদর্শ পত্নী ও জননী হতে

পেরেছিল। তার স্বামীকে উচ্চপদে নিয়োগ করা হয়েছিল; সে পেয়েছিল ক্ষমতা ও সম্মান, আর সেই সঙ্গে একটি অনুতপ্ত স্ত্রী।

যখন মন ভাল থাকত তখন এ সব চিন্তা তাকে বিব্রত করত না; বরং লোভের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে বলে তার আনন্দ হতো। কিন্তু এমন অনেক সময় আসত যখন বর্তমান জীবনে সে যা কিছু নিয়ে আছে সবই অস্পষ্ট ও নিষ্প্রভ মনে হতো; তখন নতুন জীবনের প্রতি বিশ্বাস না হারালেও তাকে নিয়ে যে স্বপ্ন সে দেখছিল সেটা যেন হারিয়ে যেত। তখনই স্মৃতিরা এসে তাকে ঘিরে ধরত, আর সভয়ে সে অনুভব করত যেন এই ধর্মের পথ গ্রহণ করায় সে অনুতাপ বোধ করছে।

এইভাবে কাসাৎস্কি প্রথম মঠে সাত বছর কাটিয়ে দিলো। তৃতীয় বছরের শেষে তাকে পুরোহিত-সন্ন্যাসী করে দেওয়া হলো, আর তার নাম দেওয়া হলো সের্গেই। তার আত্মিক জীবনের এ একটি পরম মুহূর্ত। সমবেত ধর্মানুষ্ঠানে যোগদান তাকে আগাগোড়াই সান্ত্বনা ও আত্মিক উন্নতি এনে দিতো; কিন্তু এখন সে নিজে সেই যজ্ঞের হোতা হওয়ায় তার মন এক উচ্ছ্বসিত আনন্দে ভরে উঠত। অবশ্য কালক্রমে এই আনন্দের তীব্রতা হ্রাস পেতে লাগল; এবং একদিন যখন তার মন মানসিক অবসন্নতায় ভুগছিল তখন একটি বিশেষ ধর্মানুষ্ঠানের সময় সে বুঝতে পারল যে এটুকু আনন্দও চলে যাবে। বাস্তব ক্ষেত্রে, আনন্দের উচ্ছ্বাসটা ক্রমেই কমতে লাগল; কিন্তু অভ্যাসটা থেকেই গেল।

মোটামুটি বলতে গেলে এই মঠে জীবনযাপনের সপ্তম বর্ষে সের্গেইর কাছে সবকিছু একঘেয়ে হয়ে উঠল। সেখানে শিখবার বা জানবার যা কিছু ছিল সবই তার আয়ত্তাধীন; কাজেই তার মনকে বেঁধে রাখবার মতো আর কিছুই সেখানে ছিলো না।

অন্যদিকে জীবনের এই অসফলতা-বোধ ক্রমাগতই বাড়তে লাগল। এই সময়েই এল তার মায়ের মৃত্যুসংবাদ; এল অন্য একজনের সঙ্গে কাউন্টেস মেরির বিয়ের সংবাদ; কিন্তু তাতে সে কোনওরূপ বিচলিত বোধ করল না। তার সব চিন্তা, সব শক্তি একমাত্র আত্মিক জীবনেই কেন্দ্রীভূত।

পুরোহিতপদে অভিষিক্ত হবার পরবর্তী চতুর্থ বর্ষে বিশপ তার প্রতি বিশেষ সদয় হলে তার ধর্মগুরু বলল, আরও উচ্চতর কোনও পদের জন্য তার নাম করা হলে সে যেন আপত্তি না জানায়। তখনই তার মনে আবার সেই উচ্চাকাংখা দেখা দিলো যেটা একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে নিন্দনীয় বলেই সে মনে করে। রাজধানীর নিকটবর্তী একটি মঠে তাকে নিয়োগ করা হলো। সে হয় তো আপত্তি জানাতো, কিন্তু গুরুদেব তাকে পদটা গ্রহণ করতে বলল। কাজেই নতুন পদটি স্বীকার করে গুরুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে নতুন মঠের উদ্দেশে যাত্রা করল।

এইভাবে রাজধানীর কাছাকাছি চলে আসাটা সের্গেইর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রলোভন এসে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল, আর তাকে প্রতিহত করতেই তার সব শক্তি ব্যয় হতে লাগল।

প্রথম মঠে সের্গেইর সামনে যৌন প্রলোভন বলে কিছু ছিল না। কিন্তু এখানে সে প্রলোভন প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে দেখা দিলো। একটু স্পষ্ট রূপেই দেখা দিলো। কুখ্যাত একটি মহিলা তার মনোযোগ আকর্ষণে সচেষ্ট হলো। সের্গেই-এর সঙ্গে কথা বলে তাকে তার বাড়িতে যেতে বলল। সেও তাকে সরাসরি ফিরিয়ে দিলো। কিন্তু নিজ বাসনার তীব্র অনুভূতি তাকে ভীত করে তুলল। সে এতদূর ভীত হয়ে পড়ল যে গুরুকে ব্যাপারটা জানিয়ে চিঠি লিখল। এমন কি নিজেকে সংযত রাখবার জন্য অহংকারের মাথা খেয়ে অনুচর যুবকটির কাছে এই দুর্বলতার কথা স্বীকার করে তাকে নির্দেশ দিলো, সে যেন সব সময় তার উপর নজর রাখে এবং প্রার্থনা-সভা ও মঠের কাছে ছাড়া তাকে যেন কোথাও যেতে না দেয়।

আর একটি বড় প্রলোভন দেখা দিলো নতুন মঠের প্রধানের প্রতি সের্গেই-এব তীব্র বিতৃষ্ণার ভিতর দিয়ে। লোকটি কুটিল, বৈষয়িক স্বার্থসম্পন্ন ও উচ্চাকাংখী। অনেক চেষ্টা করেও এই বিরূপতাকে সে জয় করতে পারল না। অবস্থাটাকে সে মেনে নিল—কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সে তাকে ঘৃণা কবত। ক্রমে এই অন্যায় অনুভূতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল।

ঘটনাটা ঘটল নতুন মঠে আসবার দ্বিতীয় বছরে। আর ঘটল এইভাবে। সেটা ছিল সন্তদের প্রার্থনা-দিবস। বড় গির্জায় সান্ধ্য উপাসনা চলছে। অনেক দর্শনার্থীর ভিড়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করছে প্রধান নিজে। সের্গেই বাবা যথাস্থানে দাঁড়িয়েছিল। তার মন প্রার্থনায় ডুবে ছিল, অথবা তার মনে চলেছে সেই দ্বন্দ্ব যা অনুষ্ঠানের সময় সে সর্বদাই অনুভব করে। দর্শনার্থীরা, ভদ্রজনরা এবং বিশেষভাবে মহিলারা যে ধরনের বিরক্তি ঘটান তার জন্যই এই মানসিক দ্বন্দ্ব। তাদের দিকে নজর না দিতে, গির্জার মধ্যে কি চলছে সেটা না দেখতেই সে চেষ্টা কবত . গীর্জাব ভিতবে জনৈক সৈনিক জনতাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ভদ্রজনকে ঢুকবার পথ করে দিচ্ছে; মহিলারা একে অন্যকে ইঙ্গিত করে সন্ন্যাসীদের দেখিয়ে দিচ্ছে—কখনও হয তো তাকেই দেখাচ্ছে, অথবা সুন্দর মুখের অন্য কোনও সন্ন্যাসীকে দেখাচ্ছে। নিজেকে আড়াল করে রাখবার চেষ্টা সে করত; তার মনোযোগকে সবিয়ে রাখত; দেবমূর্তির সামনেকার জ্বলন্ত মোমবাতির শিখা ও কর্তব্যরত সন্ন্যাসী ছাড়া আর কোনও দিকেই সে দৃষ্টি দিতো না; গীত বা কথিত প্রার্থনা ছাড়া আব কিছুই শুনত না; কর্তব্যবোধ ছাড়া আর কোনও অনুভূতিকেই মনে ঠাঁই দিত না।

একদিকে নিস্পৃহ নিন্দা আর অপরদিকে স্বেচ্ছায় নিজের চিন্তা ও অনুভূতিকে অচল করে রাখা—মনের মধ্যে এই দ্বন্দ্বকে নিয়ে সের্গেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনার প্রয়োজনানুসারে কখনও মাথা নিচু করছিল, কখনও বা ক্রুশ-চিহ্ন আঁকছিল। এমন সময় গির্জার ভাণ্ডারী নিকোদিম বাবা তার কাছে এল। এই নিকোদিমকে নিয়েই সের্গেই বাবার অনেক জ্বালা। প্রধানের প্রতি তার স্তাবকতা ও অনুগ্রহভাজন হবার চেষ্টাকে সে ঘৃণা না করে পারত না। প্রায় উপুড় হয়ে নিকোদিম বাবা বক্তব্য জানাল;

প্রধান সের্গেই বাবাকে ডাকছে। মাথাটা ঢেকে দর্শনার্থীদের কোনওরকম অসুবিধা না ঘটিয়ে সের্গেই ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল।

"দেখো, দেখো লিজা! ঐ যে ডান দিকে। ঐ তো তিনি," একটি মহিলা হেঁকে বলল।

"কোথায়? কোথায়? তিনি তো ততটা সুন্দর নন।"

সে জানত, তারা তার কথাই বলছে। কথাগুলি কানে আসতেই সে বার বার নিজেকে বলতে লাগল, "আমাদের প্রলোভনের পথে নিয়ে যেয়ো না।" মাথা নিচু করে আনত চোখে সে জনতার ভিতর দিয়ে পথ করে ভজনালয়ে হাজির হলো। মাথা তুলতেই সে দেখতে পেল প্রধানকে আর তার পাশে দাঁড়ানো একটি ঝলমলে লোককে।

প্রধান দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে আছে; মোটা মোটা হাত দুটি ভুঁড়ির উপর রেখে আঙুল দিযে নিজের পোশাকের সোনালী কারুকার্য নিয়ে খেলা করছে। সেনাপতির পোশাকপরিহিত একটি লোকের সঙ্গে সে হেসে হেসে কথা বলছে। লোকটির পোশাকের সোনালী পট্টি ও কাঁধের গাঁটগুলি সের্গেই বাবার অভ্যস্ত সামরিক চোখ সহজেই চিনতে পারল। এই লোকটি প্রিন্স কাসাৎস্কির রেজিমেন্টের বিভাগীয় প্রধান ছিল। দেখে মনে হলো, লোকটি উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী; আর প্রধানও সেটা জানে, কারণ তার টাক মাথার নিচেকার মোটা লাল মুখখানা খুশিতে ঝলমল কবছে। সের্গেই বাবা অসন্তুষ্ট হলো; তার রাগও হলো; কারণ তার একদা সহকর্মী এই লোকটি তাকে দেখতে চেয়েছে বলে তার কৌতূহল মেটাতেই প্রধান তাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

হাতটা বাড়িযে দিয়ে সেনাপতি বলল, "দেবদূতেব পোশাকে তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম। আশা কবি একজন পুরনো সহকর্মীকে তুমি ভুলে যাওনি।"

ধূসর দাড়ির ফ্রেমে-আঁটা প্রধানের হাসি-হাসি লাল মুখে সেনাপতির কথাগুলিবই সমর্থন ফুটে উঠল; সেনাপতির মুখখানিও সযত্নে সজ্জিত, তাতে খুশির হাসি, মুখে মদের গন্ধ, গোঁফে গন্ধ সিগারের—এ সবই সের্গেই বাবার ক্রোধের পক্ষে যথেষ্ট। প্রধানকে আর একবার অভিবাদন জানিয়ে সে বলল :

"মাননীয় মহাশয় আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।"

সে থামল; কিন্তু তার মুখে, তার ভঙ্গিতে ফুটে উঠল একটি প্রশ্ন, "কিন্তু কেন?"

"কেন? আরে, এই সেনাপতির সঙ্গে দেখা করতে", প্রধান বলল।

সের্গেই বাবার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল।

কাঁপা ঠোঁটে বলল, "মাননীয় মহাশয়, প্রলোভনের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যই আমি সংসার ছেড়েছি। তাহলে কেন আপনি আমাকে প্রলোভনের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন—তাও এখানে, এই ঈশ্বরের স্থানে, প্রার্থনার সময়ে?"

রাগে লাল হয়ে ভ্রূকুটি করে প্রধান হেঁকে উঠল, "যাও, তাহলে চলে যাও।"

পরদিন সেগেঁই বাবা প্রধানের কাছে, অন্যান্য সহকর্মীদের কাছে তার আচরণের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিল; তথাপি একটা পুরো রাত প্রার্থনায় কাটাবার পরে সে স্থির করল, এ মঠ ছেড়ে চলে যাবে। গুরুদেবকে সব কথা জানিয়ে তার মঠে ফিরে যাবার অনুমতি চেয়ে সে চিঠি লিখল। লিখল, গুরুর সাহায্য ছাড়া এই প্রলোভন দমন করতে সে অক্ষম। পরের ডাকেই গুরুর চিঠি এল। গুরু লিখল, সব গোলযোগের মূলে রয়েছে তার অহংকার। সে যে নিজেকে নত করে রেখেছে, গীর্জার সম্মান ও পদোন্নতিকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে তার কারণ ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ নয় বলেই এই ক্রোধোন্মত্ত বিস্ফোরণ ঘটেছে। সেই জন্যই প্রধানের আচরণকে সে সহ্য করতে পারেনি। সব সময়ই তার মনের ভাব—ঈশ্বরের জন্য সে সব কিছু ছেড়েছে, তবু কেন একটা অদ্ভুত জন্তুর মতো তাকে সকলের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে।

"ঈশ্বরের জন্যই যদি তুমি পদোন্নতি অস্বীকার করতে তাহলে তুমি ব্যাপারটাকে মেনে নিতে পারতে। জাগতিক অহংকার এখনও তোমার মধ্যে রয়েছে। দেখো বাবা, তোমার কথা আমি ভেবেছি, প্রার্থনা করেছি, এবং তোমার সম্পর্কে ঈশ্বর আমাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন : আগের মতো চলতে থাক আর সব মেনে নাও। এই সব কথা ভাবছি এমন সময় খবর এল মহাত্মা ইলারিয়ন তাঁর মঠে মারা গেছেন। আট বছর তিনি সেখানে ছিলেন। তাম্বিনো প্রধান জানতে চেয়েছেন, সেখানে থাকতে ইচ্ছুক কোনও ভাইকে পাওয়া যাবে কি না। তখন আমার সামনে খোলা তোমার চিঠি। তাম্বিনো মঠে পৈসি বাবার কাছে চলে যাও। আমি তাকে লিখে দিচ্ছি। ইলারিয়ন-এর কুটিরটি চেয়ে নাও। ইলারিয়ন-এর স্থান তুমি পূর্ণ করতে পারবে না; কিন্তু নিজের অহংকারকে দমন করার জন্য তোমার নির্জনতার বড় প্রয়োজন। ঈশ্বরের আশীর্বাদ যেন তোমার সঙ্গে থাকে।"

সেগেঁই গুরুর আদেশ মাথা পেতে নিল। প্রধানকে চিঠিখানা দেখিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে তার কুটির ও জিনিসপত্র মঠকে দিয়ে সে তাম্বিনো আশ্রমের পথে যাত্রা করল।

সেখানকার প্রধান একজন বণিক শ্রেণীর লোক; খুব ভাল ব্যবস্থাপক; শান্ত মর্যাদার সঙ্গে সে সেগেঁইকে অভ্যর্থনা করল; ইলারিয়ন-এর কুটিরেই তাকে থাকতে দিলো; প্রথমে তার সেবা-পরিচর্যার জন্য একজন ভাইকে সঙ্গে দিলো, কিন্তু পরে সেগেঁই-এর ইচ্ছানুসারেই তার একাকি থাকবারই ব্যবস্থা হলো। পাহাড় কেটে একটা গুহা বানিয়ে সেটাকেই কুটির করা হয়েছে। ইলারিয়নকে সেখানেই সমাধি দেওয়া হয়েছে। গুহার মধ্যে একটা ভিতরের ঘরে ইলারিয়ন-এর সমাধি; বাইরের ঘরে একটা ছোট টেবিল, বইয়ের তাক ও দেবমূর্তি দিয়ে সাজানো; পাশের ছোট ঘরটায় খড়ের গদি পাতা। গুহার দরজাটা তালাবন্ধ করা যায়। বাইরেও একটা তাক আছে; দিনে একবার মঠ থেকে একজন সন্ন্যাসী এসে সেখানে খাবার রেখে যায়।

সেই থেকে সেগেঁই বাবা ঋষি হয়ে গেল।

৪

সের্গেই-এর নির্জনবাসের যষ্ঠ বছরে "শ্রোভটিড" উৎসবের সময় একদল ধনী আমুদে নর-নারী মরশুমের পিঠে ও মদের টানে পার্শ্ববর্তী শহরে এসে হাজির হলো। একদিন স্লেজ-গাড়ি চেপে তারা বেড়াতে বের হলো। দলে ছিল দু'জন উকিল, একজন ধনী জমিদার ও একজন অফিসার। বাকি চারজন স্ত্রীলোক : অফিসারের স্ত্রী, জমিদারের স্ত্রী ও অবিবাহিতা বোন, আর চতুর্থ জন বিবাহ-বিচ্ছিন্না—ধনী ও সুন্দরী, অদ্ভুত আচরণ ও বিচিত্র নষ্টামির জন্য সুবিদিত। তাদের নিয়ে সারা শহরে গাল-গল্প-গুজবের আর অন্ত রইল না।

সন্ধ্যাটা চমৎকার। রাস্তাটা মসৃণ ও শক্ত। শহর ছাড়িয়ে দশ ভার্স্ট পথ পার হবার পরে তারা ভাবতে বসল : আরও এগিয়ে যাবে, না ফিরবে?

"এই পথটা কোথায় শেষ হয়েছে?" বিবাহ-বিচ্ছিন্না সুন্দরী মাকভ্‌কিনা শুধাল।

তার অনুগ্রহপ্রার্থী উকিলটি জবাব দিলো, "তাম্বিনো-তে। আরও বারো ভার্স্ট পথ।"

"আর তাম্বিনো থেকে—কোথায় গেছে?"

"মঠ ছাড়িয়ে এল-এর দিকে।"

"যেখানে সের্গেই বাবা থাকে?"

"ঠিক বলেছেন।"

"কাসাৎস্কি? সেই সুদর্শন ঋষি?"

"ঠিক বলেছেন।"

"মহিলা ও ভদ্রজন! চলুন, কাসাৎস্কিকে দেখে আসি। তাম্বিনোতেই আমরা আহারাদি সেরে বিশ্রাম করতে পারব।"

"কিন্তু সেখানে গেলে তো আজ রাতে ফেরা যাবে না।"

"তাতে কি। কাসাৎস্কির সঙ্গেই কাটিয়ে দেব।"

"দেখুন—মঠে একটা ভাল হস্টেল আছে, মোটেই খারাপ নয়। মাখিন্ মামলা পরিচালনার সময় আমি সেখানে ছিলাম।"

"আমি সেখানে যাচ্ছি না। রাতটা কাসাৎস্কির সঙ্গেই কাটাব।"

"হুম্। যতই সর্বশক্তিময়ী হন, সেটা অসম্ভব।"

"অসম্ভব? বেশ, বাজি রাখুন।"

"খুব ভাল কথা। তার সঙ্গে যদি রাত কাটাতে পারেন—বলুন কি চান?"

"যদি বলি যা আমার খুশি?"

"নিশ্চয়; যদি সেটা আপনার বেলায়ও প্রযোজ্য হয়।"

"আলবৎ। চলুন, যাওয়া যাক!"

স্লেজ-চালকদের মদ দেওয়া হলো, আর নিজেদের জন্য নেওয়া হলো রুটি, মদ

ও মেঠাই। মহিলারা লোমের সাদা জোব্বায় গা ঢেকে বসল। কে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তা নিয়ে স্লেজ-চালকদের মধ্যে কিছু তর্কাতর্কি হলো; শেষে একটি যুবক তার আসনে উঠে বাঁকা হয়ে বসে লম্বা চাবুকটা দুলিয়ে ঘোড়াগুলোকে লক্ষ্য করে হাঁক দিলো। শুরু হলো যাত্রা; ঘণ্টার টুং-টাং আর হ্রেষাধ্বনি।

স্লেজগুলি হেলেদুলে চলছে। ঘোড়াগুলি মনের আনন্দে ছুটছে। রাস্তাটা অনবরত পিছনে সরে যাচ্ছে। চালক যেন ঘোড়ার রাশ নিয়ে খেলা করছে। সামনের আসন থেকে উকিল আর অফিসার মাকভ্‌কিনা তার প্রতিবেশিনীকে লক্ষ্য করে অনবরত বাজে বকুনি ছুঁড়ছে। কিন্তু মাকভ্‌কিনা সাদা জোব্বায় শরীর ঢেকে নিশ্চল বসে নিজের কথাই ভেবে চলেছে : "সর্বত্র এক—সর্বদা সর্বত্রই সেই এক, আর সর্বদাই ভয়ংকর। চকচকে লাল মুখ, তাতে মদ ও তামাকের গন্ধ। সর্বদা একই আলোচনা, সর্বদা একই চিন্তা, আর সব কিছুর পিছনে সর্বদা সেই একই নোংরামি। আর সকলেই কেমন খুশি, যেন বেঁচে থাকবার ঐ একটাই পথ। আর এই ভাবেই তারা মৃত্যুর দিন পর্যন্ত পারে। আমি পারি না। এ সবকিছু আমার অসহ্য লাগে। আমি এমন কিছু চাই যা এ সবকিছু উল্টে দেবে, পাল্টে ফেলবে। যেমন—মানে, সারাতভ্‌ বা অন্য যে কোনও স্থানের সেই লোকগুলির মতো যারা কোথায় যেন যাত্রা করে বরফে জমে মারা গিয়েছিল। এই লোকগুলি কি করবে? কেমন আচরণ করবে? মনে হয়, ঘৃণ্যভাবে। প্রত্যেকেই নিজের জন্য। আর আমিও তাই—সমান ঘৃণ্য। কিন্তু আমি তো তবু দেখতে ভাল। তারা তা জানে। আর সেই সন্ন্যাসী? সে কি এ রসে বঞ্চিত? না—তা হতে পাবে না। এটাই তো সকলে চায়। গত হেমন্তকালের সেই শিক্ষার্থীর মতো। কী বোকাই ছিল ছেলেটা!"

"আইভান নিকোলায়েভিচ", সে জোরে হাঁক দিলো।

"আদেশ করুন!"

"তার বয়স কত?"

"কার?"

"কাসাৎস্কির।"

'চল্লিশ পেরিয়ে গেছে।"

"শুনেছি সে সকলকেই গ্রহণ করে।"

"সকলকেই, কিন্তু সব সময় নয়।"

"কম্বলটা আমার পায়ে জড়িয়ে দাও। ওভাবে নয়। কী বাজে লোকরে বাবা! হুঃ—আরও কষে, আরও কষে। ঠিক আছে। তাই বলে আমার পা দুটো চ্যাপ্টা করে দিও না।"

অবশেষে তারা সেই জঙ্গলে পৌঁছে গেল যেখানে কুটিরটি আছে।

সে স্লেজ থেকে নেমে অন্যদের গাড়ি চালিয়ে চলে যেতে বলল। এ কাজ থেকে সকলেই তাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করল, কিন্তু তাতে সে আরও রেগে গেল;

সবাইকে চলে যেতে হুকুম দিলো। সকলে চলে গেল। তখন সে একাকি পথে নামল। গায়ে লোমের সাদা জোব্বা। উকিলটি গাড়ি থেকে নেমে সবকিছু দেখবার জন্য অপেক্ষা করে রইল।

৫

সের্গেই বাবার নির্জনবাসের সেটা ষষ্ঠ বছর। তার বয়স উনপঞ্চাশ বছর। কঠোর জীবন। উপবাসে ও প্রার্থনায় কঠোর নয়—সে সব তো কঠিন কাজ নয়; তার মধ্যে চলেছে সেই কঠিন অন্তর্দ্বন্দ্ব যা সে আগে কখনও দেখেনি। দ্বন্দ্বের দুটি কারণ : সংশয় ও কামনা। আর সব সময় তারা একসঙ্গেই আসে। সে ভেবেছিল তারা দুটি আলাদা শত্রু; কিন্তু আসলে তারা এক। যে মুহূর্তে সংশয়কে জয় করা হয়, অমনি কামনা হয় পদানত। কিন্তু সে ভাবল তারা আলাদা দানব, তাই আলাদা করে সে তাদের সঙ্গে লড়তে লাগল।

সে শুধু ভাবত, "হে প্রভু, হে আমার ঈশ্বর, তুমি আমাকে বিশ্বাস দিচ্ছ না কেন? কামনা—সেটা আমি বুঝতে পারি। কামনা সেন্ট অ্যান্টনি ও আরও অনেককে দগ্ধ করেছে। কিন্তু বিশ্বাস! তাদের তো বিশ্বাসটা ছিল, কিন্তু আমার বেলায় এমন অনেক মুহূর্ত, ঘণ্টা ও দিন আসে যখন এতটুকু বিশ্বাস থাকে না। পৃথিবী যদি পাপেই ভরা হয়, তাকে ত্যাগ করাই যদি কর্তব্য হয়, তাহলে এই সুন্দর পৃথিবীটা আছে কেন? এই প্রলোভন তুমি কেন সৃষ্টি করেছ? প্রলোভন? কিন্তু এই প্রলোভনের জন্যই কে পৃথিবীর সব আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে এমন একটি স্থানের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে চেয়েছি যেখানে—হয় তো—সেখানে কিছুই নেই।"

কিন্তু এ-কথা ভাবামাত্রই তার মন আতংকে, তীব্র আত্ম-ধিক্কারে কুঁকড়ে উঠল।

নিজেকেই বলে উঠল, "পশু! পশু! আর বাইরে সাধুর ভড়ং করছি!"

তারপরই সে প্রার্থনায় বসে গেল। প্রার্থনা শুরু করতেই হঠাৎ মঠে থাকবার সময়কার তার নিজের একটা স্পষ্ট ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল—একটি মহিমান্বিত মূর্তি। অমনি সে মাথা নেড়ে ভাবল, "না। এটা সত্য নয়। এটা নকল। কিন্তু—এ চেহারা দিয়ে অন্যকে ভোলাতে পারলেও নিজেকে ভোলাতে পারি না—ভোলাতে পারি না ঈশ্বরকে। না, আমি মহিমান্বিত নই। আমি হাস্যকর, করুণার পাত্র।"

সঙ্গে সঙ্গে গায়ের জোব্বাটা খুলে ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে মাথা নিচু করে প্রার্থনা শুরু করল। প্রার্থনার ভিতরেই একটা কথা তার মনে এল, "তাহলে কি এই শয্যাই আমার শব-শয্যা হবে?"—আর তখনই একটা দানব যেন তার কানে কানে বলল, "সঙ্গীহীন শয্যা তো শব-শয্যাই বটে। মিথ্যা, মিথ্যা!" আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সেই বিধবার দুটি কাঁধ যার সঙ্গে সে পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিল। সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে আবার সে প্রার্থনায় বসল। বিধানাবলী আবৃত্তির পরে স্টেটমেন্টখানা হাতে

নিয়ে পাতা ওল্টাল। এমন একটা পাতা খুলে গেল যেটা বার বাব আবৃত্তিতে তার মুখস্থ হয়ে গেছে : "প্রভু, আমি বিশ্বাস কবি; আমার অবিশ্বাস তুমি দূব করে দাও।" মনের সব সংশয়কে সে টেনে বের কবে দিলো। মনে শান্তি ফিরে এল। তখন সে শৈশবের প্রার্থনা শুরু করল, "প্রভু, নাও, আমাকে নাও!" এতে তার মন শুধু যে শান্ত হলো তাই নয়, উচ্ছ্বসিত আনন্দে ভরে উঠল। ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে সে সরু বেঞ্চিটায় শুয়ে পড়ল; বিছানায় শুধু খড়ের একটা পাতলা গদি পাতা, আর গরমের দিনের পাতলা জোব্বাটাই তার বালিশ। সে ঘুমিয়ে পড়ল। হাল্কা ঘুমের মধ্যেই সে যেন স্লেজের ঘণ্টার টুং-টাং শব্দ শুনতে পেল—সেটা স্বপ্ন কি সত্য সে জানে না। কিন্তু তারপরেই দরজায় একটা টোকা পড়তে তার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসল, নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারল না। আবার টোকা পড়ল। হ্যাঁ, শব্দটা তার দরজাতেই হয়েছে। একটি নারী-কণ্ঠ ডাকছে।

হায় ভগবান! এও কি সত্য হতে পাবে! সন্তদের জীবনীতে সে পড়েছে—শয়তান অনেক সময় নারীর ছদ্মবেশ ধরে আসে। হ্যাঁ, এ তো নারীর কণ্ঠস্বর। কী নরম, ভীরু, মনোরম! দূর হও!

সে থুতু ফেলল।

কিন্তু না, সবটাই তার কল্পনা।

ঘরের কোণে ছোট পড়ার টেবিলটাব কাছে গিয়ে সে হাঁটু গেড়ে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বসল—এভাবে বসে সে আবাম ও সুখ পায়। মাথাটা নিচু করল। চুলগুলি মুখের উপর এসে পড়ল।

বুড়ো পাইমেন বাবার শেখানো সেই স্তোত্রটি সে আবৃত্তি করবে যেটি মনেব উপব চেপে বসা ধারণাকে জয় কবতে সাহায্য কবে। উঠে দাঁড়াল। স্তোত্রটি আবৃত্তি করতে উদ্যত হলো—কিন্তু তাব বদলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে কান পাতল সেই কণ্ঠস্ববটি শুনতে। তার মন সেটাই চাইছে। চাবদিক নিস্তব্ধ। ছাদেব গলা বরফ টুপ্-টুপ্ কবে নিচেব টবে পড়ছে। বাইরের জগৎ ভেজা, ঠাণ্ডা কুয়াশায় ঢাকা। নিস্তব্ধ—ভীষণ নিস্তব্ধ। তারপর হঠাৎ জানালায় একটা খস্খস্ শব্দ, আর একটা সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর—সেই একই নরম, ভীরু কণ্ঠস্বব; সে কণ্ঠস্বর কোনও মনোরমা নারী ভিন্ন আর কারও হতে পারে না।

কণ্ঠস্বর বলল, "খৃস্টের দোহাই, দবজা খুলুন।"

তার মনে হলো, সব রক্ত বুকের মধ্যে এসে থেমে গেছে। নিঃশ্বাস ফেলতেও পারছে না।

"প্রভু জাগো, তোমার শত্রুদের তাড়াও..."

"সে কি, আমি কোনও ভূত-প্রেত নই!"—গলা শুনে তার মনে হলো সে ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠেছে। "আমি ভূত-পেত্নী নই। একটি পাপী নারী পথ হারিয়ে ফেলেছি। আক্ষরিক অর্থেই বলছি, অন্য ভাবে নয়।" নারী হেসে উঠল। "আমি অর্ধেক জমে গিয়েছি। দয়া করে আশ্রয় দিন।"

সের্গেই বাবা জানালার কাঁচে মুখটা চেপে ধরল। কাঁচের উপর দেবমূর্তির বাতির প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই তার চোখে পড়ল না। তখন চোখের উপর হাত রেখে আলোটাকে ঢেকে সে আবার বাইরে তাকাল। কুয়াশা-ঢাকা অন্ধকার। একটা গাছ। আর—ঠিক তার ডাইনে। সাদা লোমের জোব্বা গায়ে ও ছোট টুপি মাথায় একটি নারী। কী সুন্দর মুখখানি, প্রীতিপূর্ণ অথচ ভয়ার্ত—মাত্র এক বা দু' ইঞ্চি দূরে তার দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে-চোখে দেখা হলো, একে অন্যকে চিনল। তাদের যে আগে কখনও দেখা হয়েছিল তা নয়—না, তাদের কখনও দেখা হয়নি; কিন্তু দৃষ্টি-বিনিময় মাত্রই তাদের মনে হলো যে তারা পরস্পরকে জানে, বোঝে। এই দৃষ্টি-বিনিময়ের পরে ভূত-পেত্নীর কোনও কথাই উঠতে পারে না। না, সে একটি নারী মাত্র—সরল, সদয়; মনোরমা, ভীরু একটি নারী।

"আপনি কে? কি চান?" সে প্রশ্ন করল।

"আহা, আগে দরজাটা খুলুন", রসিকতার ভঙ্গিতে নারী আদেশ করল যেন। "আমি অর্ধেক জমে গেছি। বললাম তো, পথ হারিয়ে ফেলেছি।"

"কিন্তু আমি সন্ন্যাসী। কুটিরবাসী।"

"আগে দরজা খুলুন। নাকি আপনি চান যে আপনি ওখানে প্রার্থনা করবেন আর আপনার জানালার বাইরে আমি ঠাণ্ডায় জমে মরে যাব?"

"কিন্তু তা কেমন করে..."

"আচ্ছা, আমি তো আপনাকে খেয়ে ফেলছি না। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে ভিতরে যেতে দিন। ভীষণ শীত করছে।"

এতক্ষণে তারও ভয় ধরেছে। তার কণ্ঠস্বরে অশ্রুর আভাস।

জানালা থেকে সরে গিয়ে সে মুখ ফিরিয়ে খৃস্ট-মূর্তির দিকে তাকাল; তাঁর মাথায় কাঁটার মুকুট। নত হয়ে ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে সে অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল, "আমাকে বাঁচাও প্রভু, আমাকে বাঁচাও।" তারপর ফটকের কাছে গিয়ে অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে দরজার হুড়কোটা পেয়ে গেল। বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। জানালার কাছ থেকে নারী দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। "উঃ!"—নারী সহসা চিৎকার করে উঠল। বাইরে যে জলটা জমেছে বোধ হয় তার মধ্যেই সে পা ফেলেছে। সের্গেই বাবার হাত কাঁপছে, আর হুড়কোটাও বেশ আঁট করে লাগানো। সে খুলতে পারল না।

"খুলুন না! কেন আমাকে বাইরে রেখে দিয়েছেন? আমি যে ভিজে গেছি, জমে গেছি। শুধু নিজের আত্মার কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবছেন না, আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে জমে যাচ্ছি।"

সে সজোরে টানল। হুড়কোটা আলগা হতেই সেটা খুলে ফেলল। দরজাটা খুলতেই সে এত জোরে সেটাকে ধাক্কা মারল যে মহিলাটির গায়ে আঘাত লাগল।

হঠাৎ তার অভ্যস্ত পুরনো ভদ্রতাবোধ জেগে উঠল; সে বলল, "আহা, মাফ করবেন।"

"মাফ" কথাটি শুনে ভদ্রমহিলাটি হেসে ফেলল। না, আর যাই হোক সে খুব দুর্ভেদ্য নয়।

দরজায় তাকে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বলল, "কিছু না, কিছু না। মাফ তো আমারই চাওয়া উচিত। এ ধৃষ্টতা আমার কিছুতেই হতো না, শুধু—এই ভয়ানক অবস্থায়।"

এক পাশে সরে পথ করে দিয়ে সে বলল, "ভিতরে আসুন।"

অনেক দিন ভুলে-যাওয়া আতরের সুগন্ধ তার নাকে লাগল। মহিলা ঘরের ভিতরে চলে গেলে সে বাইরের দরজা বন্ধ করে দিলো, কিন্তু হুড়কো লাগাল না; পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে ঘরের ভিতরে গেল।

"প্রভু যীশু খৃস্ট, ঈশ্বর-পুত্র, আমাকে করুণা করো, আমি পাপী। প্রভু, আমাকে করুণা করো, আমি পাপী," সে অবিরাম প্রার্থনা করতে লাগল; শুধু অন্তরে নয়, তার ঠোঁটও আপনা থেকেই নড়তে লাগল।

"আরাম করে বসুন," সে বলল।

ভেজা অবস্থায়ই ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মহিলাটি অদ্ভুতভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইল; তার দুই চোখে হাসির আভাস।

"আপনার নির্জনতা ভঙ্গ করেছি বলে আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আপনিই দেখুন, কী দুরবস্থায় পড়েছি। এ সব কিছুর কারণ কি জানেন, আমরা গাড়ি নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম; পথে বাজি ধরে বসলাম ভরোভিয়ভ্কা থেকে শহর পর্যন্ত সারাটা পথ আমি একাই পায়ে হেঁটে ফিরে যাব। কিন্তু পথ হারিয়ে ফেললাম, আর আপনার এই কুটির যদি পথে না পড়ত তাহলে..."

মহিলাটি থেমে গেল। সন্ন্যাসীর মুখ দেখে সে এতই বিব্রত বোধ করল যে মিথ্যাটা বেশিক্ষণ চালাতে পারল না। সে অন্য কিছু আশা করছিল। সে যতটা কল্পনা করেছিল সন্ন্যাসী ততটা সুন্দর নয়, কিন্তু তার কাছে খুবই সুন্দর লাগল। আধপাকা কোঁকড়া চুল ও দাড়ি, সুগঠিত, উন্নত নাক, আর জ্বলন্ত কয়লার মতো দুটি কালো চোখ—সব নিয়ে সন্ন্যাসী সহজ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

সে বুঝতে পেরেছে, এই নারী মিথ্যা বলছে।

"হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি," বলে সে আবার তার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলো। "এবার আমি চলে যাচ্ছি। আপনি আরাম করুন।"

বাতিটা নামিয়ে তার থেকে একটা মোমবাতি ধরিয়ে অভিবাদন করে সে পিছনের ছোট ঘরটায় চলে গেল। একটু পরেই মহিলাটি শুনতে পেল, দেয়ালের ও পাশে সে একটা ভারী জিনিস সরিয়ে আনছে।

"পাছে আমি ঢুকে পড়ি তাই হয়তো দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছেন," এই কথা ভেবে মহিলাটি হাসল।

লোমের জোব্বাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে টুপি ও শালটাও খুলে ফেলল। জানালায়

দাঁড়িয়ে কথা বলবার সময় তার মোটেই ঠাণ্ডা লাগেনি; শুধু ভিতরে ঢুকবার জন্যই সে কথাগুলি বলেছিল। কিন্তু দরজার কাছে আসবার সময় একটা ডোবার মধ্যে পড়ে গিয়ে তার বাঁ পাটা হাঁটু অবধি ভিজে গেছে, এবং তার জুতো আর উপরকার জুতো দুইই জলে ঢোল হয়ে আছে। জুতো খুলবার জন্য সে খড়ের গদি পাতা সরু বেঞ্চির বিছানার উপর বসল। কুটিরটা তার কাছে বেশ ভালই লাগছে। ছোটখাটো ঘরটি, মাপে তিন × চার "আর্শিন", ঝকঝকে, তকতকে। যার উপর বসেছে সেই বেঞ্চিটা, একটা বইয়ের তাক আর এক কোণে ছোট টেবিলটা ছাড়া কোনও আসবাব নেই। দরজার পাশে দেয়ালে পেরেক পুঁতে একটা জোব্বা ও একটা লোমের কোট ঝুলিয়ে রাখা আছে। টেবিলের উপর খৃস্টের একটি মূর্তি, মাথায় কাঁটার মুকুট, আর তাঁর সামনে একটা বাতি জ্বলছে। ঘরময় একটা অদ্ভুত গন্ধ—বাতির তেল, ঘাম ও মাটির গন্ধ। সব কিছুই তার ভাল লাগছে। এমনকি গন্ধটাও।

ভিজে পায়ের জন্য, বিশেষ করে বাঁ পাটার জন্য তার অস্বস্তি লাগছিল; তাই তাড়াতাড়ি পা থেকে সব খুলে ফেলে মনের খুশিতে হাসতে লাগল—বাজি জিতেছে বলে খুশি নয়, সে যে এই বিচিত্র, মনোরম, মনোমুগ্ধকর পুরুষটির মনে গোলযোগের সৃষ্টি করতে পেরেছে সেটাই তার খুশির কারণ। একথা ঠিক যে সে কোনও রকম সাড়া দেয়নি। কিন্তু তাতে কি?

"সের্গেই বাবা! সের্গেই বাবা! এটাই তো আপনার নাম, নয় কি?"

"কি চাই?"—নিচু গলায় জবাব এল।

"আপনার নির্জনতা ভঙ্গ করেছি বলে দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন। আমার কোনও উপায় ছিল না, সত্যি উপায় ছিল না। নইলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়তাম। এখনও অসুখ করতে পারে। একেবারে ভিজে গেছি; পা দুটো বরফের মতো ঠাণ্ডা।"

নিচু গলায় জবাব এলো, "আমি দুঃখিত। কিন্তু আমার করবার কিছু নেই।"

"উপায় থাকলে কখনও আপনাকে বিরক্ত করতাম না! দিনের আলো ফোটা পর্যন্তই আমি থাকব।"

আর কোনও জবাব এল না। একটা ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ শুনে মহিলাটি বুঝল, সে প্রার্থনা করছে।

সে হেসে বলল, "এখানে আসছেন না তো? কি জানেন, আমি এবার পোশাক ছেড়ে শুকোতে দেব।"

সের্গেই বাবা জবাব দিলো না। তার প্রার্থনার অস্পষ্ট সুর ভেসে এল।

জল-ভর্তি বাইরের জুতোটা টানতে টানতে সে ভাবল, "হ্যাঁ, এই একটি মানুষ, খাঁটি মানুষ।"

অনেক টানাটানি করেও বাইরের জুতোটা কিছুতেই খুলতে পারল না। এতে মজা পেয়ে সে অনুচ্চ স্বরে হেসে উঠল। কিন্তু লোকটি তার হাসি শুনতে পেয়েছে এবং সেই হাসি তার উপরে মনোমতো প্রভাবও বিস্তার করতে পেরেছে—এই কথা ভেবে

সে আরও জোরে হেসে উঠল। আর সত্যি সত্যি তার সেই হাসির ইচ্ছানুরূপ ফলই ফলল।

সে ভাবতে লাগল, "হ্যাঁ এমন মানুষকেই ভালবাসা যায়। ঐ দুটি চোখ। আর কী মুখ! সরল, মহৎ, আব—যতই প্রার্থনা করুক—হ্যাঁ, কামময়! মেয়েদের বোকা বানানো যায় না। আরে, জানালায় মুখটা চেপে ধরে যখনই সে আমাকে দেখতে পায়, তখনই সে সব জানতে পাবে, বুঝতে পারে। তার চোখের দৃষ্টিতেই সব কিছু ফুটে উঠেছিল। আমার প্রতি ভালবাসা ও কামনা সে অনুভব করেছিল। হ্যাঁ, কামনাও।"

জুতো ও উপরের জুতো খুলে এবার সে মোজা নিয়ে পড়ল। লম্বা ফিতে-লাগানো মোজা খুলতে হলে আগে ঘাগরাটা তুলে ধরা দরকার। তার লজ্জা করতে লাগল; বলে উঠল :

"বেরিয়ে আসবেন না।"

অন্য ঘর থেকে কোনও জবাব এল না। একঘেয়ে বিড়-বিড় শব্দটাই চলতে লাগল। তারপর নড়াচড়ার শব্দ শোনা গেল।

সে ভাবল, "প্রার্থনা নিয়েই আছেন। কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হবে না। তিনি আমার কথাই ভাবছেন। ঠিক যেমন আমি ভাবছি তাঁর কথা। আমাব এই পা দু'খানিব কথাই ভাবছেন।"—ভেজা মোজা পা থেকে খুলে এবার সে খোলা পা দুটো গবম করার জন্য খড়ের গদির উপর রাখল। মনে মনে তখনও একই ভাবনা চলেছে . "আরে, আমরা কি অরণ্যে বাস কবছি! কী চুপচাপ! কেউ কাউকে কোনওদিন জানবে না।" অন্য ঘরে কোনও সাড়াশব্দ নেই। গলার ফিতের সঙ্গে ঝোলানো ছোট ঘড়িটার দিকে তাকাল। দুটো বাজে। তিনটে নাগাদ স্লেজগুলি ফিরবে। মাত্র এক ঘণ্টা আছে।

এই একটা ঘণ্টা সে কি একা একাই কাটাবে? কী হাস্যকব! কিছুতেই না। এখনই তাকে এ ঘরে ডাকবে।

"সের্গেই বাবা! সের্গেই বাবা! সের্গেই দ্মিত্রিয়েভিচ! প্রিন্স কাসাৎস্কি!"

অন্য ঘরে কোনও সাড়া নেই।

"এত নিষ্ঠুব আপনি কেমন করে হলেন? কখনও আপনাকে ডাকতাম না। দরকার না পড়লে কখনও ডাকতাম না। আমি অসুস্থ। কি অসুখ যে হয়েছে তাও বুঝতে পারছি না।" যন্ত্রণাকাতর গলায় চেঁচিয়ে বলল, "ওগো প্রিয়! ওগো প্রিয়!"—সে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল। আর বিস্ময়কব হলেও তার মনে হলো যে সত্যি সত্যি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার সমস্ত শরীবে ব্যথা; যেন জ্বরের প্রকোপে থর্ থর্ করে কাঁপছে।

"দয়া করে এসে আমাকে সাহায্য করো! ব্যাপার কি কিছুই বুঝতে পারছি না। ওঃ প্রিয়, হে প্রিয়!"

পোশাকের হুকগুলো ছাড়িয়ে সে বুকটা খুলে ফেলল; কনুই পর্যন্ত খোলা দুই বাহু ছড়িয়ে দিলো।

"প্রিয়! হে প্রিয়!"

সের্গেই বাবা সারাক্ষণ পিছনের ঘরে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করে চলেছে। সব সান্ধ্য প্রার্থনা সেরে এখন সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; দুটি চোখ নাসিকাগ্রে কেন্দ্রীভূত। মনে মনে প্রার্থনা তখনও চলেছে, "প্রভু যীশুখৃস্ট, ঈশ্বর-পুত্র, আমাকে করুণা করো।"

কিন্তু সব কিছুই সে শুনতে পেয়েছে—পোশাকটা তুলবার সময় রেশমের খস্‌খস্‌ শব্দ, গদীর উপর খোলা পায়ের দপদপানি, আর হাত দিয়ে ভেজা পা ঘসবার শব্দ। নিজের দুর্বলতা বুঝতে পেরেছে; বুঝতে পেরেছে যে-কোনও মুহূর্তে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে; আর তাই অনবরত প্রার্থনা করে চলেছে। রূপকথার যে রাজপুত্রকে লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে শুধু সামনেই চোখ মেলে রাখতে হবে, মুহূর্তের জন্যও পিছনে তাকানো চলবে না, তার মনের অবস্থাও ঠিক তারই মতো। সেই রাজপুত্রের মতো সেও বুঝতে পেরেছে—সেও জেনেছে যে বিপদ, নরক তার মাথার উপর ঝুলছে, তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে, আর সেদিকে ফিরে না তাকানোই হচ্ছে উদ্ধারের একমাত্র পথ। কিন্তু অকস্মাৎ সে দিক দিয়ে তাকাবার ইচ্ছাই তাকে পেয়ে বসল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে মহিলাটি বলে উঠল :

"তুমি একেবারে অমানুষ। আমার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে।"

হ্যাঁ, সে মহিলাটির কাছে যাবে—সেই পবিত্র পিতার মতো যাবে যিনি তাঁর এক হাত রেখেছিলেন ব্যভিচারিণীর মাথায় আর অন্য হাত রেখেছিলেন জ্বলন্ত ধুনুচির মধ্যে। তার কাছে ধুনুচি ছিল না। ঘরের চারদিকে তাকাল। একটা বাতি। তার শিখার উপরে একটা আঙুল বাড়িয়ে দিলো; ভুরু কুঁচকে সে যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ কোনও অনুভূতিই বুঝি হলো না; কিন্তু হঠাৎ—অগ্নিশিখার স্পর্শে কষ্ট হলো কি না, বা কতটা কষ্ট হলো সে বুঝতেও পারল না—বিরক্তিভরে মুখ সিঁটকে এক ঝাঁকিতে হাতটা সরিয়ে নিল। না, এ কাজ তাকে দিয়ে হবে না।

"ঈশ্বরের দোহাই! এস; আমাকে বাঁচাও! আমি যে মরে যাচ্ছি!"

তাহলে, সত্যি কি সে তলিয়ে যাবে? না, কখনও না।

দরজা খুলে সে বলল, "এক মুহূর্তের মধ্যেই তোমার কাছে যাচ্ছি।" মহিলার প্রতি ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত না করে সে ঐ ঘরের ভিতর দিয়ে বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। এখানেই সে সব সময় জ্বালানি কাঠ কাটে। হাতড়াতে হাতড়াতে যার উপর রেখে কাঠ কাটা হয় সেই মুগুড়টাও পেয়ে গেল; দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা কুড়ুলখানাও পেল।

"এখনি যাচ্ছি," সে আবার বলল; তারপর ডান হাতে কুড়ুলটা ধরে বাঁ হাতের তর্জনীটা রাখল মুগুড়ের উপর। কুড়ুলটা তুলে তর্জনীর দ্বিতীয় গাঁটের নিচে সজোরে আঘাত করল। অতটুকু মোটা কাঠের চাইতেও অনেক সহজে আঙুলটা দু-খণ্ড হয়ে

গেল। ছিট্‌কে উপরের দিকে উঠে নেমে এল প্রথমে মুগুড়ের উপর, আর তারপরে মেঝেতে।

মেঝেতে ছিট্‌কে পড়ার শব্দ সে শুনতে পেল। তখনও পর্যন্ত কোনও যন্ত্রণা সে বুঝতে পারেনি। কোনও যন্ত্রণা হচ্ছে না কেন একথা ভাবতে ভাবতেই তীব্র জ্বালা-পোড়া শুরু হলো; আঙুল থেকে গরম রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল। তাড়াতাড়ি জোব্বা দিয়ে কাটা আঙুলটা জড়িয়ে শরীরের একপাশে চেপে ধরল। তারপর ঘরের ভিতরে গিয়ে মহিলাটির সামনে দাঁড়িয়ে চোখ নিচু করে শান্ত গলায় বলল :

"আপনি কি চাইছিলেন?"

তার ফ্যাকাসে মুখ ও বাঁ গালের কাঁপুনি তার চোখে পড়ল। হঠাৎ সে অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করল। লাফ দিয়ে উঠে জোব্বাটা তুলে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে নিল।

"মানে...আমার কষ্ট হচ্ছিল...ঠাণ্ডা লেগেছে...আমি..সের্গেই বাবা...আমি..."

সে চোখ তুলল; প্রশান্ত আনন্দে তার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল; বলল : "প্রিয় বোনটি, কিসের জন্য তুমি তোমার অমর আত্মার সর্বনাশ করছ? পৃথিবীতে প্রলোভন তো থাকবেই, কিন্তু যাদের ভিতর দিয়ে প্রলোভন আসে তারাই তো করুণার পাত্র।...ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো, তিনি যেন আমাদের ক্ষমা করেন।"

তার মুখের দিকে তাকিয়ে মহিলাটি মনোযোগ দিয়ে সের্গেই বাবার কথাগুলি শুনল। হঠাৎ ফোঁটা ফোঁটা কি যেন পড়ার শব্দ তার কানে গেল। নিচে তাকিয়ে দেখল, জোব্বার ভাঁজ বেয়ে তার হাত থেকে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

"তোমার হাতে কি করেছ?"

মনে পড়ে গেল, একটা শব্দ সে শুনেছিল। বাতিটা হাতে নিয়ে ছুটে দরজার কাছে গেল। সেখানেই মেঝের উপর রক্তাক্ত আঙুলটা দেখতে পেল। তার মুখ আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ফিরে গিয়ে সের্গেই বাবাকে কিছু বলতেই চেয়েছিল; কিন্তু তা না করে নিঃশব্দে পিছনের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো।

বলল, "আমাকে ক্ষমা করো। বলো কি করলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে?"

"চলে যাও।"

"তোমার আঙুলটা বেঁধে দেই।"

"চলে যাও।"

নিঃশব্দে খুব তাড়াতাড়ি সে পোশাক পরে নিল। তৈরি হয়ে জোব্বাটা গায়ে জড়িয়ে সেখানে বসেই সে অপেক্ষা করতে লাগল। একটু পরেই স্লেজের ঘণ্টা শোনা গেল।

"সের্গেই বাবা, আমাকে ক্ষমা করো।"

"চলে যাও। ঈশ্বর ক্ষমা করবেন।"

"সের্গেই বাবা, আমার জীবন বদলে ফেলব। আমাকে ত্যাগ করো না।"

"চলে যাও।"

"আমাকে ক্ষমা করো, আশীর্বাদ করো।"

অন্য ঘর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "ঈশ্বর, ঈশ্বব-পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বলছি, চলে যাও।"

কাঁদতে কাঁদতে মহিলাটি কুটির ছেড়ে চলে গেল। উকিলটি এগিয়ে এসে তার সঙ্গে দেখা করল।

"দেখুন, আমি হেরে গেছি; কপাল মন্দ! আপনি কোন্ আসনে বসবেন?"

"একটা হলেই হলো।"

সে স্লেজে উঠে বসল। শহরে পৌঁছনো পর্যন্ত একটা কথাও বলল না।

এক বছর পরে। মহিলাটি দীক্ষা নিয়ে একটা মঠে কঠোর ধর্মীয় জীবন যাপন করছে। ঋষি আর্সেনি তার গুরু। সেই মাঝে মাঝে তার চিঠিপত্রও লিখে দেয়।

৬

সের্গেই বাবা আবও ছ'বছর সেই আশ্রমে কাটাল।

প্রথম দিকে দুধ, চিনি, চা, সাদা রুটি, পোশাক, জ্বালানি—যা কিছু তাকে দেওযা হতো তাব প্রায় সবটাই সে ব্যবহার করত। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল ততই তার জীবনযাত্রা কঠোরতব হতে লাগল। সব রকম সুখ-সুবিধা ত্যাগ করল এবং শেষ পর্যন্ত সপ্তাহে মাত্র একদিন খানিকটা মোটা কালো রুটি খেযে দিন কাটাতে লাগল। আর যা কিছু তাকে এনে দেওয়া হতো সব গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতো।

কুটিবে বসে প্রার্থনা করে আর দর্শনার্থীদের সঙ্গে কথা বলেই তার দিন কাটত। দর্শনার্থীর সংখ্যাও ক্রমে বাড়তে লাগল। বছরে দু' তিনবার গির্জায় যেতে বা দবকার হলে জ্বালানি ও জল আনতেই সে শুধু কুটির থেকে বের হতো।

এইভাবে পাঁচ বছর কেটে যাবার পবে সেই বিবাহ-বিচ্ছিন্না মহিলার নৈশ দর্শন শুরু হলো. তার জীবনে এল আমূল পরিবর্তন, সেও মঠবাসিনী হলো। এ সবই জানাজানি হযে গেল, আর সের্গেই বাবাব সুখ্যাতিও ছড়াতে লাগল। দর্শনার্থীর সংখ্যা বেড়েই চলল। কুটিরকে ঘিরে অনেক সন্ন্যাসী বাস করতে শুরু করল। একটা গির্জা ও হোস্টেল নির্মিত হলো। যথারীতি সের্গেই বাবার সুখ্যাতি অতিরঞ্জিত হয়ে চারদিকে ছড়াতে লাগল। দূর দূর অঞ্চল থেকে লোক এসে ভিড় করতে লাগল। রুগ্ন ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষরা তার কাছে আসতে লাগল, কারণ সকলেই বলতো যে সে রোগ নিরাময় করতে পারে।

আশ্রম জীবনের অষ্টম বর্ষে সে প্রথম রোগ সারায়। চোদ্দ বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মা এল আশ্রমে, আর সের্গেই বাবাকে বলল তার মাথায় হাত রাখতে। সে যে রোগ সারাতে পারে একথা কখনও তার মনেই আসেনি। এ ধরনের চিন্তা তার কাছে দূষণীয় বলেই মনে হতো। কিন্তু মা পীড়াপীড়ি করতে লাগল, তার সামনে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল, কিছুতেই ছাড়ল না। বলল, তিনি তো আরও অনেককে

সারিয়েছেন। তাহলে তার ছেলেকে সারাবেন না কেন? খৃস্টের নাম করে সে তাকে মিনতি করতে লাগল। সের্গেই বাবা যখন বলল যে রোগ-সারানো ঈশ্বরের কাজ তখন মা বলল যে সে তো শুধু তার হাতখানা ছেলের মাথায় রেখে প্রার্থনা করতে বলছে। সের্গেই বাবা রাজী না হয়ে কুটিরে ঢুকে গেল। কিন্তু পরদিন সে যখন জল আনতে বের হলো (তখন হেমন্তকাল; রাতটা বেশ ঠাণ্ডা) তখন দেখল, সেই স্ত্রীলোকটি তখনও অপেক্ষা করে রয়েছে; সঙ্গে তার ছেলে,—চোদ্দ বছরের একটি শীর্ণ বিবর্ণ বালক। স্ত্রীলোকটি আবারও অনুনয়-বিনয় শুরু করল। অন্যায়াচারী বিচারকের নীতি-কাহিনী সের্গেই বাবার মনে পড়ে গেল, আর তার মন একটু নরম হলো। সেই রকম মনের অবস্থা নিয়ে সে প্রার্থনা কবতে আরম্ভ করল এবং প্রার্থনার মধ্যেই তার কর্তব্য স্থির হয়ে গেল। সে স্থির করল, স্ত্রীলোকটির কথামতো কাজই সে করবে; হয়তো মায়ের বিশ্বাসই ছেলেকে রক্ষা করবে; আর সে এক্ষেত্রে হবে ঈশ্বরের হাতে একটি অক্ষম যন্ত্র মাত্র।

তখন সের্গেই বাবা কুটির থেকে বেরিয়ে এসে স্ত্রীলোকটির কাছে গেল, এবং তার ইচ্ছামতো কাজই করল। ছেলেটিব মাথায় হাত রেখে প্রার্থনা করল।

তারা চলে গেল। এক মাস পরেই ছেলেটি স্বাস্থ্য ফিরে পেল। আর সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে খবব রটে গেল যে গুরু সের্গেই রোগ নিবাময়ের অলৌকিক শক্তিব অধিকারী। আজকাল লোকে তাকে গুরু সের্গেই বলেই ডাকে। সেই থেকে প্রতি সপ্তাহেই রোগীরা তার কাছে আসতে লাগল এবং একজনের অনুরোধ মেনে নেবার পর অন্যকে সে আর নিরাশ কবতে পারত না। তাদের মাথায় হাত রেখে সে প্রার্থনা করত; অনেকেই ভাল হয়ে যেত; আর তার খ্যাতি আবও দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল।

এইভাবে বছরের পর বছর কেটে গেল; মঠে ন' বছর আর এই আশ্রমে তেরো বছর। এখন সের্গেই বাবার সৌম্য শান্ত মূর্তি। তার লম্বা দাড়ি সাদা হয়ে গেছে। মাথার চুল বেশ পাতলা হয়ে গেলেও এখনও তেমনি কোঁকড়া ও কালোই রয়েছে।

৭

কয়েক সপ্তাহ ধরে সের্গেই বাবার মনের মধ্যে একটি চিন্তাই অবিরাম ঘুরতে লাগল : নিজের ইচ্ছায় যতটা না হোক বড় প্রধান ও প্রধানের ইচ্ছায় যে আসনে সে নিজেকে বসিয়েছে সেটা কি তার পক্ষে ঠিক হয়েছে? চোদ্দ বছরের সেই ছেলেটিকে সারাবার পর থেকেই এটার শুরু। সেই থেকে যত মাস, সপ্তাহ ও দিন যাচ্ছে ততই সের্গেই বুঝতে পারছে যে তার আত্মিক জীবন ক্রমাগত ভেঙে পড়ছে, আর তার জায়গায় বেড়ে উঠছে একটা সম্পূর্ণ জাগতিক জীবন। কেউ যেন তার জীবনটাকেই উল্টে দিয়েছে।

সে জানে, দর্শনার্থী আকর্ষণ করে মঠের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করবার, একটা যন্ত্র হিসাবেই সে কাজ করছে; আর সেজন্য মঠের কর্তৃপক্ষ তাব জীবনযাত্রাকে

এমনভাবে ঘুরিয়ে দিয়েছে যাতে তাকে সবচাইতে বেশি কাজে লাগানো যায়। ফলে, এখন আর তাকে শারীবিক শ্রম করতে দেওয়া হয় না। তার যা কিছু প্রয়োজন সবই তাকে সরবরাহ করা হয়; বিনিময়ে তার কাছে শুধু একটি দাবি করা হয়ে থাকে . যারাই তার কাছে আসবে তাদের যেন সে অভ্যর্থনা করে ও তাদের আশীর্বাদ করে। তার সুবিধার জন্য দর্শনার্থীদের নির্দিষ্ট দিন ধার্য করে দেওয়া হয়েছে। পুরুষদের জন্য একটা অভ্যর্থনা-ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে, আব দর্শনার্থিনীরা যাতে ভিড় করে তাকে ঠেলে ফেলে দিতে না পারে সেজন্য একটা সমাবেশ-মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে; সেখান থেকে সে সকলকে আশীর্বাদ করতে পারে। যখন তাকে বোঝানো হলো যে মানুষের তাকে প্রয়োজন; খৃস্টের প্রেম ধর্মের প্রতি অনুগত হলে মানুষের প্রয়োজনে তাদের ফিরিয়ে দেবার কোনও অধিকার তার নেই; তাদের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখলে সেটা হবে চরম নিষ্ঠুরতা; তখন তাদের কথা না শুনে সে পারেনি। কিন্তু এই জীবন তাকে যতই কাছে টানছে ততই সে বেশি করে উপলব্ধি করছে যে তার আত্মিক জীবন একটা জাগতিক জীবনে রূপান্তর লাভ করছে; তার অন্তব থেকে জীবনের রসধারা শুকিয়ে যাচ্ছে; সব কিছুই সে করছে মানুযেব জন্য, ঈশ্বরের জন্য নয়।

তার কাজের কতটা ঈশ্বরের জন্য করা হচ্ছে, আর কতটা করা হচ্ছে মানুষেব জন্য—এই প্রশ্নই তাকে অবিবাম যন্ত্রণা দিতে লাগল। এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া তো দূরের কথা, সে জবাবের মুখোমুখি দাঁড়াবার ক্ষমতাও তার নেই। অন্তরের অন্তস্থলে সে জানে, ঈশ্বরের জন্য কাজের বদলে শয়তান তার জন্য জুটিয়ে দিয়েছে মানুষের জন্য কাজ। এটা সে বুঝতে পারছে কারণ একদিন যে নির্জনতা বিঘ্নিত হলে সে কষ্ট পেত সেই নির্জনতাই এখন তাকে কষ্ট দেয়। দর্শনার্থীরাই তাকে চেপে ধরে, তাকে শ্রান্ত করে তোলে; তবু তাদের নিয়ে মনে মনে সে খুশি হয়, খুশি হয় তাদের মুখের প্রশস্তি-গানে।

এমন একসময় এসেছিল যখন সে এখান থেকে পালিয়ে চলে যাওয়াই স্থির করেছিল। কি ভাবে কি করতে হবে তার পরিকল্পনাও করে ফেলেছিল। শার্ট, ট্রাউজার, টুপি, কোট—একপ্রস্থ চাষীদের পোশাক তৈরি করিয়েছিল; ভিক্ষায় বেরুতে হলে এ সব দরকার হবে। পোশাকগুলি কুটিরে রেখে দিয়ে মনে মনে মতলব আঁটল কেমন করে একদিন সেগুলি পরে ছোট করে চুল ছেঁটে এখান থেকে কেটে পড়বে। প্রথমে ট্রেনে চড়ে তিনশ' ভার্স্ট-এর মতো যাবে; তারপর ট্রেন থেকে নেমে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পায়ে হেঁটে বেড়াবে। একদিন একটি বুড়ো সৈনিক তাব কাছে এলে সে নানা রকম প্রশ্ন করে তার কাছ থেকে জেনে নিলো, কি ভাবে তার দিন চলে, কেমন করে সে ভিক্ষা চায় বা রাতের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করে। সৈনিকটি তাকে সব বুঝিয়ে বলল; কোথায় ভিক্ষা ও আশ্রয় পাওয়া সহজ তাও বলে দিলো। সের্গেই বাবা ভাবল, এই বুড়ো সৈনিকটির মতোই সে সব কিছু করবে। একদিন রাতে সত্যি

সত্যি সে চাষীদের পোশাক পরে যাবার জন্য তৈরি হলো; কিন্তু চলে যাওয়া না থাকা, কোন্‌টা ভাল হবে তাই স্থির করতে পারল না। কিছুদিন এই সংশয়ের মধ্যেই কাটল। তারপর সংশয় কেটে গেল। এই জীবনেই সে অভ্যস্ত হয়ে উঠল; আত্মসমর্পণ করল শয়তানের কাছে। আর সেই চাষীর পোশাকটা তার একদার চিন্তা ও অনুভূতির স্মারক হয়েই থেকে গেল।

প্রতিদিন আরও বেশি লোক তার কাছে আসতে লাগল, আর ততই তার প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিক সুরক্ষার সময় কমে যেতে লাগল। মন ভাল থাকলে কখনও কখনও সে ভাবত, সে যেন ঠিক তেমনি একটি স্থান যেখানে একদা ছিল একটি প্রস্রবণ।

"এখানে ছিল একটি প্রস্রবণ; ছিল জীবনেব একটি শান্ত জলধারা; সে ধারা আমার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়ত। সেটা ছিল সত্যের জীবন। তারপর এল সে"—এখন সে মাতা অগ্নিয়া। সেই রাতের কথা, তার কথা সে চিরদিন আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করে—"সে এল আমাকে প্রলুব্ধ করতে। সেই পবিত্র জলের অংশ সে পেল। কিন্তু আজ, জল জমবার আগেই তৃষ্ণার্তরা ছুটে আসে সে জল পান করতে, ভিড় করে ধাক্কাধাক্কি করে। তাদের পায়ের আঘাতে প্রস্রবণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আছে শুধু পাঁক।"

কিছু কিছু বিরল মুহূর্তে এই সব চিন্তা তার মনে আসে। কিন্তু গভীর ক্লান্তিতে আর সেই ক্লান্তি থেকে উদ্ভূত আত্মতুষ্টিতে মগ্ন হয়ে থাকতেই সে এখন অভ্যস্ত।

বসন্তকাল। "প্রিপলোভেনিয়ে" উৎসবের আগের দিন সের্গেই বাবা গুহা-নির্জয়া সান্ধ্য উপাসনা পরিচালনা করছিল। জনা বিশেক লোক উপস্থিত—গুহার ভিতরে তার বেশি লোক ধরে না; সকলেই ভদ্র ও ব্যবসায়ী সমাজের ধনী লোক। সের্গেই বাবার কাছে সকলেরই দ্বার খোলা, কিন্তু তার সেবায়েৎ সন্ন্যাসী আর প্রত্যেক দিন মঠ থেকে যে সহকারীটিকে পাঠানো হয় তারা দু'জনে মিলে দর্শনার্থীদের বাছাই করে। বাইরে প্রায় আশি জন তীর্থযাত্রী সের্গেই বাবার দর্শন ও আশীর্বাদ লাভের আশায় দরজার আশেপাশে ভিড় করে আছে; তাদের বেশির ভাগই স্ত্রীলোক।

উপাসনা চলেছে। গান গাইতে গাইতে সের্গেই বাবা তার পূর্ববর্তী সন্ন্যাসীর সমাধিব কাছে পৌছবার পথেই হঠাৎ তার মাথাটা ঘুরে গেল; পাশের বণিকটি ও ডিয়েকন সন্ন্যাসীটি ধবে না ফেললে সে হয় তো পড়েই যেত।

"কী হলো? সের্গেই বাবা! ভালমানুষটি!"—অনেকগুলি নারীকণ্ঠ ধ্বনিত হলো। "প্রভু আমাদের রক্ষা করুন। আপনি যে কাগজের মতো সাদা হয়ে পড়েছেন!"

সের্গেই বাবা তাড়াতাড়িই সামলে নিলো; বণিক ও ডিয়েকনকে সরিয়ে দিয়ে আবার গান শুরু করল। ডিয়েকন সেরাপিয়ন বাবা, সেবায়েৎরা আর সোফিয়া আইভানভ্‌না নাম্নী যে মহিলাটি সব সময় আশ্রমের কাছে কাছে থেকে সের্গেই বাবার উপর নজর রাখত—সকলেই তাকে উপাসনা ভেঙে দিতে অনুরোধ করল।

"কিছু হয়নি, কিছু না," মৃদু হাসিতে ঠোঁট বেঁকিয়ে সের্গেই বাবা বলল। "উপাসনায় বাধা দেবেন না।"

মনে মনে বলল, "সন্তরা এই রকমই করে থাকেন।"

আর সঙ্গে সঙ্গে—

"সন্ত! ঈশ্বরের পবিত্র দেবদূত!" তার পিছন থেকে সোফিয়া আইভানভ্না ও বণিকটির কণ্ঠস্বর ভেসে এল। কিন্তু সের্গেই কোনও অনুবোধ মানল না, গান গেয়েই চলল। একসঙ্গে ভিড় কবে সকলে সংকীর্ণ পথটা ধরে ছোট গির্জায় গিয়ে পৌঁছল; আর সেখানেই কিছুটা সংক্ষিপ্ত করে সে উপাসনা অনুষ্ঠান শেষ করল।

উপাসনার শেষে সের্গেই বাবা সমবেত সকলকে আশীর্বাদ করল, এবং দরজা পার হয়ে গুহার প্রবেশ-মুখে এল্‌ম্ গাছের ছায়ায় রাখা একটা বেঞ্চির কাছে গেল। তাজা বাতাসে একটু বিশ্রাম নেবার ইচ্ছা হলো; তার প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু সেখানে হাজির হওয়া মাত্রই অপেক্ষমান লোকজনবা সকলেই তাকে ঘিরে ধরল, তার আশীর্বাদ চাইল, তার পরামর্শ ও সাহায্য ভিক্ষা করল। তীর্থযাত্রীদের দলে এমন সব স্ত্রীলোক ছিল যারা সারা জীবন তীর্থে তীর্থেই ঘুরে বেড়ায়, এক গুরুর কাছ থেকেই আরেক গুরুর কাছে যায়, যে কোনও গুরুকে, যে কোনও পবিত্র বস্তুকে দেখলেই যাদের চোখে জল আসে। সের্গেই বাবা তা জানে; এরা অতি সাধারণ, ধর্মবোধবিহীন, শীতল-হৃদয়, গতানুগতিক মানুষ। তীর্থযাত্রীদলে এমন পুরুষ অনেক আছে যারা সৈন্যদল থেকে বরখাস্ত হয়ে যে কারণেই হোক স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেকে বঞ্চিত হয়েছে; আছে সেই সব বৃদ্ধ, দারিদ্র্যপ্রপীড়িত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাতালের দল যারা পথ চলতে চলতে ভিক্ষা পাবার আশাতেই মঠ থেকে মঠে ঘুরে বেড়ায়। তীর্থযাত্রীদলে এমন সব চাষী, এমন সব অজ্ঞান নর-নারীও আছে যারা এসেছে যার যার নিজ স্বার্থের তাগিদে—যেমন রোগ সারানো, এবং নানারকম বৈষয়িক ব্যাপারের মীমাংসার পরামর্শের জন্য; কারো মেয়ের বিয়ে, বা গ্রামের দোকানটা ভাড়া দেওয়া, বা জমি কেনা, অথবা একটি শিশুকে ঘুমের মধ্যে চেপে মেরে ফেলা বা বিবাহ-বন্ধন ছাড়াই সন্তানের জন্ম দেওয়ার পাপের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ। এ সবের সঙ্গে তার অনেক দিনের পরিচয়, কাজেই তাতে সের্গেই বাবার কোনও আগ্রহই নেই। সে জানে, এরা তাকে কোনও নতুন কথা শোনাতে পারবে না, তার মনে কোনও ধর্মের ভাবও জাগাতে পারবে না; তবু তাদেব দেখতে তার ভাল লাগে, কারণ তার উপস্থিতি, তার বাণী, তার আশীর্বাদকে বড় প্রয়োজন। কাজেই এই জনতা তার একদিকে যেমন বিরক্তির কারণ, অন্যদিকে তেমনি সুখেরও উৎস। সেরাপিয়ন বাবা তীর্থযাত্রীদের ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে জানাল যে সের্গেই বাবা এখন ক্লান্ত। কিন্তু সের্গেই বাবা বলল, সে ওদের সঙ্গে দেখা করবে—কথাটা বলতেই তার মনে পড়ে গেল পবিত্র পুঁথির বাণী, "ওদের (শিশুদের) আমার কাছে আসতে দাও;" কথাগুলি মনে হতেই আত্মতৃপ্তির একটা উষ্ণ আলো যেন তার মধ্যে জ্বলে উঠল।

সে উঠে রেলিং-এর কাছে গেল। সেখানেই ভিড় জমেছে। এমন দুর্বল কণ্ঠে সে তাদের আশীর্বাদ করতে ও প্রশ্নের জবাব দিতে লাগল যে সে নিজেই অভিভূত বোধ

করল। কিন্তু যত ইচ্ছাই থাকুক, তাদের সকলের সঙ্গে দেখা করা তার পক্ষে সম্ভব হলো না। আবার তাকে ঘিরে সেই অন্ধকার নেমে এল; সে টলতে লাগল; কোনও মতে রেলিংটা ধরে সামলে নিলো। আবার তার মাথায় রক্ত উঠে এল; তার মুখটা প্রথমে ফ্যাকাসে হয়ে তারপর হঠাৎ রাঙা হয়ে উঠল।

"মনে হচ্ছে, তোমাদের আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। আজ আর আমি পারছি না," এই কথা বলে সকলকে একসঙ্গে আশীর্বাদ করে সে বেঞ্চিটার দিকে ঘুরল। বণিকটি এবারও তাব হাত ধরে বেঞ্চির কাছে নিয়ে গেল ও সেখানে বসিয়ে দিলো।

"বাবা!" ভিড়ের মধ্যে সকলে চিৎকার করে ডাকতে লাগল। "বাবা! বাবা! আপনি আমাদের ত্যাগ করবেন না! আপনি ছাড়া আমাদের কে আছে!"

সেগেঁই বাবাকে এল্‌ম্‌ গাছের ছায়ায় বেঞ্চিতে বসিয়ে রেখে বণিকটি এবার পুলিশি কর্তব্য পালনে লেগে গেল; মহা উৎসাহে সে জনতাকে হটিয়ে দিতে লাগল। এ কথা ঠিক যে পাছে সেগেঁই বাবা শুনতে পায় তাই সে গলার স্বর নিচু পর্দায়ই রাখল, কিন্তু তার কথাগুলি যেমন রাগী তেমনি কঠোর।

"দূর হও, দূর হও! তিনি তো আশীর্বাদ করেছেন, করেননি? তাহলে, আর কি চাই? চলে যাও। নইলে আমিই পাঠাবার ব্যবস্থা করব—হ্যাঁ, করবই। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও! এই যে, পায়ে কালো পট্টি বাঁধা—এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও বুড়ি! আরে, এদিকে কোথায় আসছ? বলে তো দেওয়া হলো—আজ আর হবে না। আবাব কাল এসো। আজ তিনি বড়ই ক্লান্ত।"

"একটিবার দেখব," বুড়ি কাকুতি-মিনতি শুরু করল। "ঐ মিষ্টি মুখখানি একটিবার দেখব।"

"দেখা শিখিয়ে দেব। আরে, ঠেলেঠুলে কোথায় চলেছ?"

সেগেঁই বাবা দেখল, বণিকটি বড় কঠোর ব্যবহার কবছে; তাই একটি অনুচরকে আস্তে আস্তে বলল, কাউকে তাড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। সেগেঁই বাবা জানত, যেমন করেই হোক বণিক তাদের তাড়িয়ে দেবেই; আর বিশ্রামের জন্য সেও একা থাকতে চায়। তবু যে সে অনুচরকে এ কথা বলে পাঠাল তার কারণ সে জানে যে এর ফল খুব ভাল হবে।

বণিক বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। কাউকে তাড়াব না। আমি শুধু তাদের সুবুদ্ধি দিতে চেষ্টা করছি। লাইন দিলে যে তারা লোকটিকে মেবে ফেলবে। তাদের তো হৃদয় বলে কিছু নেই—নিজের কথা ছাড়া অপর কারও কথাই ভাবে না। চলে যাও। আমি বলছি! চলে যাও! কাল আবার আসতে পারো।"

শেষ পর্যন্ত বণিক সকলকেই তাড়িয়ে দিলো।

বণিকের এত উৎসাহের আংশিক কারণ তার শৃংখলা-প্রীতি, লোককে বিতাড়নের সুখ; কিন্তু প্রধান কারণ সেগেঁই বাবার সাহায্য তারও দরকার। সে মৃতদার; একটিমাত্র

কন্যা অসুস্থ, তাই তার বিয়েও দিতে পারছে না; তাই চোদ্দ শ' ভার্স্ট দূর থেকে মেয়েকে সঙ্গে করে এনেছে যাতে সেগেই বাবা তাকে সারিয়ে তোলে। অসুখের পর দু'বছর ধরে অনেক চেষ্টা সে করেছে। প্রথমে, বিশ্ববিদ্যালয় শহরে একটা ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়েছিল। কোনও ফল হয়নি। তারপর গিয়েছিল সামারা জেলার এক চাষী কবরেজের কাছে। তাতে কিছুটা ফল হয়েছে। তারপর নিয়ে গিয়েছিল মস্কোর এক ডাক্তারের কাছে; সেখানে টাকার শ্রাদ্ধ হলেও ফল হয়নি কিছুই। তারপরেই লোকের মুখে সেগেই বাবার রোগ সারানোর কথা শুনে মেয়েকে এখানে নিয়ে এসেছে। তাই লোকজনদের তাড়িয়ে দিয়ে বণিক সেগেই বাবার কাছে গিয়ে হাজির হলো এবং কোনও রকম ভণিতা না করে নতজানু হয়ে সোচ্চারে বলে উঠল:

"সন্ত বাবা, নানা রোগে ও ব্যথায় আমার এই মেয়েটি বড়ই কষ্ট পাচ্ছে; আপনি আশীর্বাদ দিয়ে তাকে ভাল করে দিন। আপনার পবিত্র পদযুগলে আমার আবেদন রাখতে পারি কি?"

নিবেদনের ভঙ্গিতে সে দুই হাত জোড় করল।

সেগেই বাবা তাকে উঠে দাঁড়িয়ে সব কথা বলতে লাগল। বণিক জানাল, তার মেয়ের বয়স বাইশ বছর; গত দু'বছর যাবৎ ভুগছে; মায়ের আকস্মিক মৃত্যুর পরেই হঠাৎ চিৎকার করে উঠেই বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে ফেলে; তাই তো চোদ্দ শ' ভার্স্ট দূর থেকে তাকে নিয়ে এসেছে; সেগেই বাবার ডাকের অপেক্ষায় সে হোস্টেলে অপেক্ষা করছে। আলোর ভয়ে দিনের বেলা সে কোথাও বেরোয় না; সূর্য ডুবে গেলে তবে বাইরে আসে।

"সে কি তাহলে খুবই দুর্বল?" সেগেই বাবা জিজ্ঞাসা করল।

"না ঠিক দুর্বল বলব না, গায়ে গতরে যথেষ্ট মাংস আছে; তবে স্নায়বিক চাপে ভুগছে—ডাক্তাররা তো তাই বলে। সেগেই বাবা বললেই আমি তাকে এখানে এনে হাজির করব। সন্ত বাবা, একটি পিতার অন্তরকে বাঁচান, তার বংশটা রক্ষা করুন, আপনার প্রার্থনা দিয়ে তার মেয়েকে রোগমুক্ত করুন।"

বণিক আবার নতজানু হয়ে দুই জোড় হাতের উপর মাথা রেখে কাৎ হয়ে তাকে অভিবাদন করল। সেগেই আবার তাকে উঠে দাঁড়াতে বলল; গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের কঠিন পরিশ্রমের কথা ভেবে এক মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বলল :

"ঠিক আছে। আজ সন্ধ্যায় তাকে নিয়ে এস, তার জন্য আমি প্রার্থনা করব। কিন্তু এখন আমি বড়ই শ্রান্ত"—তার চোখের পাতা নেমে এল। "তোমাকে পরে জানাব।"

বালির উপর দিয়ে এমনভাবে পা টিপে টিপে বণিক চলে গেল যাতে তার জুতোর শব্দ আরও বেশি হতে লাগল। সেগেই বাবা একা রইল।

সেগেই বাবার জীবনের সর্বক্ষণই নানা অনুষ্ঠান ও দর্শনার্থীদের নিয়ে কাটে। কিন্তু এই দিনটি ছিল সব চাইতে বেশি কর্মব্যস্ত। সকালে একজন সম্ভ্রান্ত অতিথি এসে অনবরত বকবক করে গেছে। তারপর একটি মহিলা এসেছিল তার ছেলেকে নিয়ে।

ছেলেটি তরুণ অধ্যাপক, নাস্তিক; আর তার মা একান্ত ভক্তিমতী ও সের্গেই বাবার অনুগতা। তার বিশেষ ইচ্ছা, বাবা তার ছেলের সঙ্গে একটু আলোচনা করে। কাজটা খুবই কঠিন। যুবকটি একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তর্ক করতে অনিচ্ছুক; তাই সে সন্ন্যাসীর সব কথাই মেনে নিল, ঠিক যে ভাবে মানুষ দুর্বল প্রতিপক্ষের কথা মেনে নেয়। সের্গেই বাবা স্পষ্টই বুঝতে পারছিল যে ছেলেটি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, এবং তা সত্ত্বেও সে বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই আছে। তখনকার কথাবার্তা মনে করে সের্গেই বাবার মন খারাপ হয়ে গেল।

"এবার কিছু খেয়ে নিন বাবা", অনুচর বলল।

"হ্যাঁ, কিছু নিয়ে এস।"

গুহার ফটক থেকে কয়েক পা দূরে যে নতুন কুটিরটি তৈরি করা হয়েছে অনুচরটি তার মধ্যে ঢুকে গেল। সের্গেই বাবা আবার একা।

ইতিপূর্বে সের্গেই বাবা নির্জনে বাস করত, নিজের সব কাজ নিজে করত এবং সর্বসাধারণের খাবার পাঁউরুটি ও কালো রুটি ছাড়া আর কিছু খেত না। সেদিন পার হয়ে গেছে। অনেক দিন আগেই তাকে বোঝানো হয়েছে যে নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করবার কোনও অধিকার তার নেই; অল্প অথচ পুষ্টিকর খাদ্যই তাকে দেওয়া হতো। এখনও সে সামান্যই খায়, কিন্তু সেটা আগের চাইতে অনেকটা বেশি। তাছাড়া, আগে সে খাবার সময় সর্বদাই একটা বিতৃষ্ণা ও পাপবোধ অনুভব করত, কিন্তু এখন সে খাবার ব্যাপারে বেশ আনন্দ পায়। আজও তাই হলো। সে খেল কিছু পরিজ আর চায়ের সঙ্গে অর্ধেকটা সাদা রুটি।

অনুচরটি চলে গেল। এল্‌ম্‌ গাছের নিচে বেঞ্চিতে সে একা বসে রইল।

মে মাসের সুন্দর সন্ধ্যা। বার্চ, এল্‌ম্‌, আস্পেন, বার্ড-চেরি ও ওক গাছে গাছে সবে নতুন পাতা বেরিয়েছে। এল্‌ম্‌ গাছগুলির ওপাশে বার্ড-চেরির ঝোপে অজস্র ফুল ফুটে আছে, আর সে ফুল এখনও ঝরতে শুরু করেনি। নাইটিঙ্গেল পাখিরা গান ধরেছে—একটি কাছে, আর দু'তিনটি নদীর তীরে ঝোপে-ঝাড়ে। নদীর ওপার থেকে একটা গান ভেসে আসছে; বোধ হয় চাষীরা দিনের কাজ সেরে বাড়ি ফিরছে। বনান্তরালে সূর্য অস্ত যাচ্ছে; তার বাঁকা রশ্মিগুলি উজ্জ্বল আভায় পাতার ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে পড়েছে; পৃথিবীর সেই জায়গাটা ফিকে সবুজে ঢাকা, বাকি সবটাই অন্ধকার। মে মাসের পোকারা উড়ছে, লাফাচ্ছে, নিচে পড়ছে।

আহারান্তে সের্গেই বাবা মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল, "ঈশ্বর-পুত্র প্রভু যীশু খৃস্ট, আমাদের করুণা করো"; তারপর সে একটা স্তোত্র আবৃত্তি করতে লাগল।

মাঝে মাঝে সে ভেবে অবাক হয়, স্তেপান কাসাৎস্কি কেমন করে একজন অসাধারণ সন্ত ও অলৌকিক ঘটনার অধিকারী হয়ে উঠল। সে যে অধিকারী হয়েছে সে বিষয়ে তো তিলমাত্র সন্দেহ নেই। প্রথম রুগ্ন বালকটি থেকে আরম্ভ করে সর্বশেষ যে বৃদ্ধার চোখ সে ভাল করে দিয়েছে—সে সবই তো তার নিজের চোখে দেখা।

যত বিস্ময়করই মনে হোক, ঘটনাগুলি তো সত্য। বণিকের মেয়েটি তার মনে আগ্রহ সৃষ্টি করেছে, কারণ ব্যাপারটা একটু নতুন, আর মেয়েটিও তাকে বিশ্বাস করে। তাছাড়া, তাকে সারিয়ে তুলতে পারলে তার রোগ-নিরাময়ের ক্ষমতা নতুন করে প্রমাণিত হবে। মনে মনে বলল, "হাজার ভার্স্ট দূর থেকে লোক আসছে। খবরের কাগজে লেখা হচ্ছে। মহামান্য সম্রাটও জেনেছেন। সারা ইওরোপ, নাস্তিক ইওরোপ জেনেছে।" কিন্তু হঠাৎ এই আত্মম্ভরিতার লজ্জা তাকে অভিভূত করে তুলল। আবার সে প্রার্থনা করতে বসল।

"হে প্রভু, স্বর্গের রাজা, সান্ত্বনাস্বরূপ, সত্যের আত্মা, তুমি এস, আমাদের মধ্যে তোমার আসন গ্রহণ করো, সব পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করো, আমাদের আত্মাকে রক্ষা করো, গৌরবময় করো। এই যে আত্মম্ভরিতা আমাকে পেয়ে বসেছে তার হাত থেকে আমাকে মুক্ত করো।" প্রার্থনা করতে করতেই তার মনে পড়ল, এ প্রার্থনা তো সে কতই করল, কিন্তু আজ পর্যন্ত সবই তো বিফলে গেল। তার প্রার্থনা অন্যকে এনে দেয় অলৌকিক নিরাময়, অথচ ঈশ্বরের কাছে অনেক চেয়েও এই নীচ মনোবৃত্তির হাত থেকে সে তো মুক্তি পেল না।

এখানে আসবার পরে প্রথম দিককার প্রার্থনার কথা তার মনে পড়ল। তখন সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করত পবিত্রতা, বিনয় ও প্রেমের জন্য; তখন তার মনে হতো, ঈশ্বর তার সে প্রার্থনা শুনতেন; তখন সে ছিল পবিত্র, তার আঙুলটাই কেটে ফেলেছিল। হাতটা তুলে সে শুকনো কাটা আঙুলটায় চুমো খেলো। এখন তার মনে হলো, সে সময় সে সত্যি সত্যি বিনীত ছিল বলেই নিজের পাপ বাসনার জন্য নিজেকে এতটা ঘৃণা করতে পেরেছিল; তার আরও মনে হলো, সে সময় তার মনে ছিল ভালবাসা—একটি বৃদ্ধ মাতাল সৈনিক এবং সেই মহিলাটি যখন তার কাছে এসেছিল তখন তার মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল তাও তার মনে পড়ে গেল। আর আজ? সে নিজেকেই প্রশ্ন করল : সে কি কাউকে ভালবাসে? ভালবাসে সোফিয়া আইভানভ্না, বা সেরাপিয়ন বাবাকে? আজ যে সব মানুষ তার কাছে এসেছিল তাদের প্রতি কি তার ভালবাসা ছিল? শুধুমাত্র নিজের মানসিক ক্ষমতা ও অবিস্মরণীয় শিক্ষাকে প্রমাণ করবার তাগিদেই যে শিক্ষিত যুবকটিকে সে আজ নীতি-কথা বলেছে তার প্রতি? মানুষের ভালবাসায় সে সুখ পায়, সেটা তার দরকার; কিন্তু বিনিময়ে সে তো তাদের ভালবাসে না। আজ তার মনে ভালবাসা নেই, নম্রতা নেই, না, পবিত্রতাও নেই।

বণিকের মেয়ের বয়স বাইশ বছর শুনে সে খুশি হয়েছিল; সে জানতে চেয়েছিল মেয়েটি দেখতে ভাল কি না। সে যখন জানতে চাইল মেয়েটি খুব দুর্বল কি না তখন তার আসল উদ্দেশ্য ছিল নারীর আকর্ষণ তার মধ্যে আছে কি না সেটা জেনে নেওয়া।

সে অবাক হয়ে ভাবল, "সত্যি কি আমি এত নিচে নেমে গেছি? প্রভু, আমার

প্রভু, হে ঈশ্বর, আমার সহায় হও, আমাকে উদ্ধার করো।" দুই হাত জোড় করে সে প্রার্থনা করতে লাগল। নাইটিঙ্গেল পাখিরা গলা ছেড়ে গান ধরেছে। একটা ঝিঁ-ঝিঁ পোকা কানের পাশ দিয়ে উড়ে এসে তার ঘাড় বেয়ে উঠতে লাগল। সেটাকে ঝেড়ে ফেলল। "কিন্তু—সত্যি কি তিনি আছেন? আমি বন্ধ দরজায় আঘাত করছি না তো? যে দরজা বাইরে থেকে তালাবন্ধ, যার তালাটা আমি সহজেই দেখতে পাই? নাইটিঙ্গেল পাখিরা, ঝিঁ-ঝিঁ পোকারা, এই প্রকৃতি—এরাই কি তালা নয়? যদি সেই যুবকটির কথাই ঠিক হয়?" আবার সে সোচ্চারে প্রার্থনা শুরু করল; অনেকক্ষণ চলল সে প্রার্থনা; ক্রমে সে সব চিন্তা চলে গিয়ে আবার সে শান্ত হলো, তার বিশ্বাস ফিরে এল। তখন সে ঘণ্টাটা বাজাল; অনুচর ঘরে ঢুকলে বলল, বণিক ও তার মেয়ে এখন আসতে পারে।

মেয়ের হাত ধরে বণিক এল। তাকে কুটিরে রেখেই সে চলে গেল।

মেয়েটি সুকেশিনী ও অত্যন্ত সুদর্শনা, বিবর্ণ ও মোটাসোটা, অত্যন্ত ভীরু; মুখখানি ভীত শিশুর, কিন্তু দেহলতা পূর্ণযৌবনা নারীর। গুহার দরজার পাশের বেঞ্চিতেই সের্গেই বাবা বসে ছিল। মেয়েটি এসে তার পাশে দাঁড়াল; সে তাকে আশীর্বাদ করল; কিন্তু তার চোখ দুটি যেভাবে মেয়েটির দেহের দিকে তাকাল তাতে সে আতংকিত হয়ে উঠল। মেয়েটি ভিতরে চলে গেল। তার মুখ দেখেই সের্গেই বাবা বুঝতে পারল, মেয়েটি ইন্দ্রিয়পরায়ণা ও দুর্বলচিত্ত। সেও উঠে কুটিরের ভিতরে গেল। মেয়েটি একখানি টুলে বসে তারই প্রতীক্ষা করছে।

সে ঘরে ঢুকতেই মেয়েটি উঠে দাঁড়াল।

"আমি বাড়ি যেতে চাই," সে বলল।

"ভয় পেয়ো না; আমাকে বলো : তোমার কি কষ্ট?"

"সব কিছুতেই আমার কষ্ট," মেয়েটি বলল; সঙ্গে সঙ্গে মৃদু হাসিতে তার মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"তুমি ভাল হয়ে যাবে। প্রার্থনা করো।"

"প্রার্থনা করে কি লাভ? অনেক প্রার্থনা করেছি, কোনও ফল হয় না।" মেয়েটি তখনও হাসছে। "আপনি প্রার্থনা করুন, আব আমার মাথায় আপনার হাতটা রাখুন। আমি আপনাকে স্বপ্নে দেখেছি।"

"কি স্বপ্ন দেখেছ?"

"স্বপ্ন দেখেছি আপনাব হাতটা আমার বুকের উপর রেখেছেন, এইভাবে"—সের্গেই বাবার হাতটা ধরে সে তার বুকে চেপে ধরল। "ঠিক এখানে।"

সের্গেই বাবা ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

তার আপাদমস্তক কেঁপে উঠল। জিজ্ঞাসা করল, "তোমার নাম কি?" সে বুঝতে পারল, তার পরাজয় ঘটেছে। কামনা সব সংযমকে আক্রমণ করেছে।

"মারিয়া। কেন?"

মেয়েটি তার হাতটা ধরে তাতে চুমো খেল; তারপর দুই বাহুতে তাকে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নিল।

সে বলে উঠল, "কি করছ? মারিয়া! তুমি শয়তান!"

"আহা, এতে কী আর এমন ক্ষতি!"

তখনও তাকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে মেয়েটি বিছানায় বসে পড়ল; তাকে টেনে পাশে বসাল।

ভোর হতেই সে বারান্দায় বেরিয়ে গেল।

সত্যি কি এ সব ঘটেছে? এখনি তার বাবা আসবে। সে তো সব কথা বলে দেবে। সে তো শয়তান। কি করি, কি করি? আহা! ওই তো রয়েছে—সেই কুড়ুলটা যা দিয়ে সে আঙুলটা কেটেছিল! কুড়ুলটা হাতে নিয়ে কুটিরের দিকে ফিরল।

অনুচরটি ছুটে এল।

"আপনার কি জ্বালানি দরকার? কুড়ুলটা আমাকে দিন।"

কুড়ুলটা দিয়ে সে কুটিরে ফিবে গেল। মেয়েটি ঘুমিয়ে আছে। সভয়ে তার দিকে তাকাল: তারপর পিছনের ঘরে গিয়ে চাষীর পোশাকগুলি নামিয়ে এনে পরে ফেলল। একটা কাঁচি খুঁজে নিয়ে চুল কেটে ফেলল। তারপব বাইরে গিয়ে নদীর পথ ধরে এগিয়ে চলল। চার বছর পরে এই প্রথম সেখানে গেল।

নদীর তীব বরাবর একটা পথ চলে গেছে। সেই পথ ধরে দুপুর পর্যন্ত হাঁটল। দুপুবে একটা গমের ক্ষেতে ঢুকে তার মধ্যে শুয়ে পড়ল। সন্ধ্যার দিকে একটা গ্রামের দিকে গেল। কিন্তু গ্রামে না ঢুকে নদীর খাড়া পাড়েব দিকে এগিয়ে চলল।

ভোর হলো। সূর্যোদয়ের আধ ঘণ্টা বাকি। সব কিছুই ধূসর ও বিষণ্ণ। পশ্চিম দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। হ্যাঁ, সব শেষ করে দিতে হবে। ঈশ্বর নেই। কেমন করে শেষ করবে? জলে ঝাঁপ দেবে? কিন্তু সে তো সাঁতার জানে। ডুবে যাবে না। ফাঁসিতে ঝুলবে? হ্যাঁ, এই বেল্টটা দিয়ে। একটা গাছ থেকে। মৃত্যু ঘটানো কত সহজ, সে মৃত্যু কত কাছে,—ভাবতেই তার মন আতংকে ছেয়ে গেল। প্রার্থনার ইচ্ছা জাগল মনে; হতাশার মুহূর্তে সব সময়েই জাগে। কিন্তু কার কাছে প্রার্থনা করবে? ঈশ্বর তো নেই। হাতের উপর মাথা রেখে সেখানেই শুয়ে পড়ল। হঠাৎ ভীষণ ঘুম পেয়ে গেল। মাথাটাকে বেশিক্ষণ হাতের উপর রাখতে পারল না। হাতটা ছড়িয়ে দিয়ে তার উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু সে ঘুম ক্ষণস্থায়ী মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল। মনের মধ্যে স্মৃতির ভিড়। অথবা সে হয় তো স্বপ্ন দেখছে।

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। তখন সে নেহাৎ শিশু। মার সঙ্গে দেশের বাড়িতে থাকে। একদিন একটা গাড়ি এসে বাড়ির সামনে থামল। গাড়ি থেকে নামল কাকা নিকোলাই সের্গেয়েভিচ; মুখে কোদাল-মার্কা কালো দাড়ি; সঙ্গে পাশেংকা—অস্থিচর্মসার ছোট মেয়েটি, করুণ ছোট মুখখানিতে দুটি বড় বড় ভীরু চোখ।

পাশেংকাকে ছোটদের ঘরে নিয়ে আসা হলো ছেলেরা তার সঙ্গে খেলা করবে এই আশায়। কিন্তু খেলা জমল না। মেয়েটি এত বোকা। শেষ পর্যন্ত সে সকলের ঠাট্টার পাত্রী হয়ে উঠল। সে যে সাঁতার কাটতে পারে তা কেউ বিশ্বাসই করল না: বলল, তাহলে সাঁতার কেটে দেখাক। মেয়েটি তখন মেঝেতে নেমে সাঁতার কাটা দেখিয়ে দিলো। সকলে হো হো করে হেসে উঠল। মেয়েটা কী বোকা! মেয়েটি বুঝতে পারল; তার মুখে লালের ছোপ লাগল; তাকে বড়ই করুণ দেখাল; এতই করুণ যে কাসাৎস্কি নিজেই লজ্জা পেল; মেয়েটির বাঁকা ঠোঁটের সেই শান্ত, বিনীত হাসিটি সে কোনও দিন ভুলতে পারবে না।

পরবর্তীকালেও যখন তার সঙ্গে দেখা হয়েছে সে দিনের কথাও মনে পড়ল। মঠে ঢুকবার ঠিক আগেই অনেক বছর পরে আবার যখন তার সঙ্গে দেখা হলো তখন তার বিয়ে হয়েছে একটি গ্রাম্য জোতদারের সঙ্গে; সে লোকটি সব বিষয়-সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়েছে, আর তাকে মারধোরও করে। তার দুটি সন্তান—একটি ছেলে, একটি মেয়ে; ছেলেটি অল্প বয়সেই মারা গেছে।

মেয়েটির তখনকার সেই অসুখী মুখ তার মনে পড়ল। মঠে যখন আবার দেখা হলো তখন সে বিধবা। সেই আগের মতোই আছে—ঠিক বোকা নয়, তবে কেমন যেন নীরস; অর্থহীন, করুণ। মেয়ে ও মেয়ের প্রেমিককে নিয়ে সে মঠে এসেছিল। তখন তারা বেশ গরিব। আরও পরে জেনেছিল, আরও গরিব অবস্থায় একটা ছোট শহরে সে বাস করছে।

বেছে বেছে তার কথাই কেন যে ভাবছে, তাতেই সে অবাক হলো। কিন্তু না ভেবেও পারল না। তার কি হয়েছে? সাঁতার জানাটা দেখাবার জন্য যখন সে মেঝেতে নেমেছিল, এখনও কি তেমনি হতভাগিনী ও অসুখীই আছে? কিন্তু তার কথা কেন ভাবছ? তাকে ভুলে যেতে হবে! সব শেষ করে দেবার সময় এসেছে।

আবার ভয় এসে তাকে ঘিরে ধরল। আর আবারও অনিবার্য ঘটনার চিন্তা থেকে বাঁচবার জন্য সে পাশেংকার কথাই ভাবতে লাগল।

এইভাবেই কিছুক্ষণ পড়ে রইল; কখনও ভাবছে নিজের শেষ পরিণতির কথা, আবার কখনও ভাবছে পাশেংকার কথা। পাশেংকার চিন্তাতেই যেন তার মুক্তি। শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখল, একটি দেবদূত তার কাছে এসে বলছে, "পাশেংকার কাছে চলে যাও, তার কাছ থেকেই তোমার কর্তব্য জেনে নাও; জেনে নাও কিসে তোমার পাপ, আর কিসেই বা তোমার মুক্তি।"

ঘুম ভাঙতে সে বুঝতে পারল এ-স্বপ্ন ঈশ্বর প্রেরিত। সে খুশি হয়ে উঠল। স্থির করল, স্বপ্নে যে আদেশ এসেছে তাই সে করবে। পাশেংকা কোন্ শহরে থাকে সে জানত। তিনশ' ভার্স্ট দূরে। সেই শহরের পথে সে যাত্রা করল।

৮

পাশেংকা এখন আর সেই ছোট্ট পাশেংকা নেই। সে এখন প্রাস্কভ্য়া

মিখাইলভ্না—একটি বৃদ্ধা, চামড়া কুঁচকে গেছে, শরীর শুকিয়ে গেছে; মাভ্রিকেভ নামক একজন ভাগ্যহীন, নেশাখোর সরকারি করণিকের শাশুড়ি। যে ছোট শহরটিতে তার জামাই সর্বশেষ চাকরিতে ছিল সেখানেই সে এখন বাস করে। সংসারে আছে মেয়ে, স্নায়বিক রোগগ্রস্ত জামাই, আর পাঁচটি নাতি-নাতনি। ঘণ্টায় পঞ্চাশ কোপেক পারিশ্রমিকে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মেয়েদের গান শিখিয়ে সে এই সংসার চালায়। কোনও দিন চারটে পাঠ, কোনও দিন বা পাঁচটা পাঠ দিয়ে সে মাসে ষাট রুবলের মতো আয় করে। জামাই যতদিন নতুন কোনও চাকরি না পাবে ততদিন এইভাবেই তাদের দিন কাটাতে হবে। তার জামাইয়ের জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে প্রাস্কভ্য়া মিখাইলভ্না তার সব আত্মীয় ও পরিচিতজনকে লিখেছে। সেই সময় সের্গেইকেও লিখেছিল। কিন্তু চিঠি পৌঁছবার আগেই সে আশ্রম ছেড়ে চলে এসেছে।

সেদিন শনিবার। প্রাস্কভ্য়া মিখাইলভ্না মিষ্টি কিসমিস-দেওয়া রুটি বানাবার জন্য ময়দা মাখছিল। তাই দিয়েই নাতি-নাতনিদের রবিবারের ভোজ হবে।

মেয়ে মাশা বাচ্চাটাকে সামলাতেই ব্যস্ত। বড় ছেলেমেয়ে দুটি স্কুলে গেছে। সারা রাত অনিদ্রায় কাটিয়ে জামাই পড়ে পড়ে ঝিমুচ্ছে। প্রাস্কভ্য়া মিখাইলভ্নারও ভাল ঘুম হয়নি. স্বামীর উপর মেয়েব রাগ থামাতে মাশার সঙ্গে কথাকাটাকাটিতেই অনেক রাত কেটে গেছে।

প্রাস্কভ্য়া মিখাইলভ্না বোঝে, স্বামী বেচারি বড়ই দুর্বল, তার কথাবার্তার ধরন বা জীবনযাত্রার চাল-চলন বদলাবার শক্তি তার নেই। স্ত্রীর গালাগালিতেও কোনও ফল হবে না। তাই মিলেমিশে থাকতে সে সাধ্যমতো চেষ্টা করে।

কি করে ময়দাটা মাখতে হয় সেই কলা-কৌশল সে লুকেরিয়া-কে বুঝিয়ে বলছিল, এমন সময় তার নাতি ছোট্ট মিশা দৌড়ে সেখানে হাজির হলো। তার বয়স ছ' বছর, পরনে ফতুয়া, কাঠি-কাঠি পায়ে তালি-মারা মোজা। দেখে মনে হলো সে খুব ভয় পেয়েছে।

"দিদা! একটা কিম্ভূত বুড়ো মানুষ তোমাকে খুঁজছে।"

লুকেরিয়া দরজার কাছে গেল।

"ঠিকই ঠাকরুণ। তীর্থযাত্রীর মতো দেখতে।"

প্রাস্কভ্য়া মিখাইলভ্না কনুই থেকে ময়দা ঝেড়ে ফেলে এপ্রন-এ হাত মুছল; তীর্থযাত্রীটির জন্য পাঁচ কোপেক আনতে রান্নাঘর থেকে পা বাড়াল; হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল যে থলিতে দশ-কোপেকের কম মূল্যের কোনও মুদ্রা নেই; তাই কোপেকের বদলে রুটি দেওয়াই স্থির করল। এমন সময় তার মনে পড়ল যে ভিক্ষা দেওয়া সে পছন্দ করে না; তাই লুকেরিয়াকে এক টুকরো ভাল রুটি কাটতে বলে দশ-কোপেকটি আনতে গেল। দুনো ভিক্ষা দিলে কেউ আর তাকে কৃপণ বলতে পারবে না।

রুটি ও মুদ্রাটি দেবার সময় সে তীর্থযাত্রীটির কাছে ক্ষমা চাইল। সে যে তাকে

কিছু দিল এজন্য তার মনে কোনও গর্ব নেই, বরং এত অল্প দেবার জন্য সে লজ্জাবোধই করল—লোকটির চেহারা খুব ভাল।

খৃস্টের নাম নিয়ে ভিক্ষা করতে করতেই লোকটি তিনশ' ভার্স্ট পাব হয়ে এসেছে। অস্থিচর্মসার, রোদে-পোড়া বিধ্বস্ত চেহারা, চুলগুলি ছোট করে ছাঁটা। পরনে চাষীদের টুপি ও জুতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও, যে অতি বিনয়ে সে দরজায় দাঁড়িয়ে নিচু হয়ে অভিবাদন জানাল তা সত্ত্বেও সের্গেই-এর চেহারায় এখনও সেই আকর্ষণ আছে যা একদিন বহু লোককে তার কাছে টেনে আনত। কিন্তু প্রাস্কভ্য়া মিখাইলভ্না তাকে চিনতে পারল না। তিরিশ বছর পরে দেখে চেনা সম্ভবও নয়।

"ক্ষমা করবেন বাবা। আপনি বোধহয় ক্ষুধার্ত।"

সে রুটি ও টাকাটা নিল। প্রাস্কভ্য়া মিখাইলভ্না অবাক হয়ে দেখল, লোকটি চলে না গিয়ে তাব দিকে তাকিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

"পাশেংকা। আমি তোমার কাছেই এসেছি। আমাকে তাড়িয়ে দিও না।"

তার সুন্দর কালো চোখ দুটি একদৃষ্টিতে মহিলাটির চোখের দিকেই তাকিয়ে রইল। দুটি চোখে অশ্রুর আবরণ চিক্‌চিক্ করছে। পাকা গোঁফেব নিচে ঠোঁট দুটি করুণভাবে কাঁপছে।

প্রাস্কভ্য়া মিখাইলভ্না হাঁ করে তাকিয়ে রইল; তার হাত দু'খানি উঠে গেল শুকনো বুকের উপর। দুই চোখে তীর্থযাত্রীর মুখে কি যেন সে খুঁজছে।

"এ হতে পারে না! স্তেপান! সের্গেই! সের্গেই বাবা!"

"হ্যাঁ," সের্গেই নিচু গলায় জবাব দিলো। "শুধু—সের্গেই নয়, সের্গেই বাবা নয়, মহাপাপী শয়তান স্তেপান কাসাৎস্কি, অধঃপতিত পাপী শয়তান। আমার সহায় হও। আমাকে তাড়িয়ে দিও না।"

"এ হতে পারে না! তোমার এ দুর্দশা হলো কেমন করে! আহা, ভিতরে এস, ভিতরে এস।"

সে হাত বাড়িয়ে দিলো। কিন্তু স্তেপান হাত ধরল না। তার পিছনে পিছনে বাড়িতে ঢুকল।

কিন্তু তাকে বসাবে কোথায়? তাদের যে স্থানের বড় অভাব। একটা খুব ছোট ঘর আছে; প্রথমে সেটাতেই সে থাকত; কিন্তু পরে সেটাও মাশাকে দিয়ে দিয়েছে। এখন সেখানে বসেই মাশা বাচ্চাকে দোলা দিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে।

রান্নাঘরের বেঞ্চিটা দেখিয়ে প্রাস্কভ্য়া মিখাইলভ্না বলল, "আপাতত এখানেই একটু বস।"

সের্গেই সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল। পিঠ থেকে বোঝাটা নামাল। প্রথমে এক কাঁধের ফিতে খুলে পরে অন্য কাঁধেরটা খুলল। কাজটা এখন তার অভ্যাস হয়ে গেছে।

"হা ঈশ্বর, হা ঈশ্বর! তোমার এ কী দুর্দশা হয়েছে! এত জয়জয়কার, আর তারপরেই হঠাৎ—"

বোঝাটা বেঞ্চির উপর নামিয়ে সের্গেই একটুখানি হাসল; কোনও জবাব দিলো না।

"ইনি কে জান মাশা?"

প্রাস্কভ্য়া মিখাইলভ্না মেয়ের কানে কানে অতিথির পরিচয়টা বলল। তারপর দু'জনে মিলে মাশার বিছানাপত্র সরাল, দোলনাসুদ্ধু বাচ্চাটাকে বাইরে নিয়ে গেল, আর ছোট ঘরটা সের্গেই-এর জন্য ছেড়ে দিলো।

প্রাস্কভ্য়া মিখাইলভ্না সের্গেইকে সঙ্গে করে সেই ঘরে নিয়ে গেল।

"এখানে বিশ্রাম করো। আমি দুঃখিত যে ঘরটা বড়ই ছোট। কিন্তু এবার আমাকে যেতে হবে।"

"কোথায়?"

"গান শেখাতে। তোমাকে সে কথা বলতেও লজ্জা করে।"

"গান? সে তো খুব ভাল কথা। কি জান প্রাস্কভ্য়া মিখাইলভ্না, একটা গুরুতর কাজে তোমার কাছে এসেছি। কখন তোমার সঙ্গে কথা হবে বলতো?"

"সে তো আমার পক্ষে মহাসুখের কথা। আজ সন্ধ্যায় হয় না?"

"নিশ্চয় হবে। শুধু—আর একটা কথা। আমি কে সে কথা কাউকে বলো না। শুধু তোমাকে বিশ্বাস করেই এখানে এসেছি। আমি কোথায় গিয়েছি তা কেউ জানে না। তাই এটা খুবই দরকারী।"

"আহা! আমি যে মেয়েকে বলে ফেলেছি!"

"তাহলে তাকে বলে দাও, সে যেন কাউকে না বলে।"

সের্গেই জুতো খুলে শুয়ে পড়ল; রাতে না ঘুমিয়ে চল্লিশ ভার্স্ট পথ সে হেঁটে এসেছে; শোয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়ল।

প্রাস্কভ্য়া মিখাইলভ্না যখন ফিরল, সের্গেই তখন ঘুম ভেঙে তার জন্যই অপেক্ষা করছিল। খাবার জন্যও সে ছোট ঘরটা থেকে বাইরে যায়নি; লুকেরিয়াই তার জন্য কিছুটা ঝোল ও পরিজ এনে দিয়েছিল।

সের্গেই বলল, "তুমি যেমনটি বলে গিয়েছিলে তার চাইতে আগেই চলে এসেছ। সেটা কি করে হলো? এখন কি আমাদের কথা হতে পারে?"

"ভেবে দেখো তো, এমন অতিথি আমার বাড়িতে এসেছে! এত সুখ আমার কপালে মিলেছে! এমন কী আমি করেছি? তাই কোনও রকমে কাজ সেরে চলে এসেছি। পরে ঠিক করে দেব।...তোমার কাছে যাবার কথাই ভাবছিলাম। তোমাকে চিঠিও লিখেছি। আর এখন—এত অপ্রত্যাশিত সুখ!"

"পাশেংকা, এখন তোমাকে যা বলব—সেটাকে ঈশ্বরের কাছে আমার মৃত্যুকালীন পবিত্র জবানবন্দী বলে মনে করবে। পাশেংকা, আমি মহাত্মা নই, না, একজন সাধারণ মানুষও নই। আমি একজন পাপী, অতি নীচ, জঘন্য, মূর্খ, দাম্ভিক পাপী। আমি নরাধম অপেক্ষাও নরাধম।"

প্রথমে পাশেংকা বড় বড় চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তার কথা সে কেমন করে বিশ্বাস করবে? পরে যখন সত্যি বিশ্বাস করল তখন তার হাতটা ধরে বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল :

"তুমি হয় তো বাড়িয়ে বলছ স্তেপান।"

"না পাশেংকা। আমি ব্যভিচারী। আমি খুনী। আমি মিথ্যাবাদী, প্রতারক।"

"হায় ভগবান! তা কি করে হয়?" "প্রাস্কভ্য়া মিখাইলভ্না ফিস্‌ফিস্ করে বলল।

"কিন্তু বাঁচতে তো হবেই। একদিন আমি মনে করতাম যা কিছু জ্ঞাতব্য সব আমি জানি, অন্য সবাইকে আমি বাঁচবার উপায় বলে দিতাম; কিন্তু আমি তো কিছুই জানি না; তাই তো তোমার কাছে শিখতে এসেছি।"

"তুমি কি বলছ স্তেপান? তুমি আমাকে নিয়ে তামাশা করছ। সব সময়ই মানুষ যে আমাকে নিয়ে তামাশা করে কেন?"

"দেখো, যদি বলতে চাও যে তামাশা করছি তো বলো। শুধু বলে দাও : তুমি কি ভাবে বেঁচে আছ? আর কি ভাবেই বা জীবনটা কাটিয়েছ?"

"আমি? সে কি, আমি তো জীবন কাটিয়েছি অত্যন্ত বাজে ও নীচ পথে। আর তাই তো ঈশ্বর আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন—ঠিকই করছেন। জীবন বড় খারাপ, বড় খারাপ..."

"তোমার বিয়ে কেমন করে হয়েছিল? আর বিবাহিত জীবন তুমি কি ভাবে কাটিয়েছ?"

"সব খারাপ, সব খারাপ। কি ভাবে বিয়ে করলাম? প্রেমে পড়ে, আর সেটাই তো জঘন্যতম পথ। বাবা সে বিয়ের বিরুদ্ধে ছিল। কিন্তু আমি কোনও কথা শুনিনি। বিয়ে হয়ে গেল। আর বিয়ের পর স্বামীকে সাহায্য করার পরিবর্তে ঈর্ষার আগুনে তাকে জ্বালাতে লাগলাম। কারণ তাকে আমি জয় করতে পারিনি।"

"শুনেছিলাম সে মদ খেত।"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমিও তো তার স্নায়ুকে শান্ত করতে শিখিনি। তাকে শুধু বকেই যেতাম। আসলে, এও তো একটা রোগ। সে না খেয়ে পারত না। এখনও মনে পড়ে ও জিনিস আমি সরিয়ে তালাবন্ধ করে রেখেছিলাম। আর তাই নিয়ে সে কি কাণ্ড।"

সে-দৃশ্য মনে পড়ায় তার সুন্দর চোখ দুটিতে যন্ত্রণার মেঘ নেমে এল।

কাসাৎস্কির মনে পড়ল, সে গুজব শুনেছিল যে পাশেংকার স্বামী তাকে মারধোর করত। আর এখন তার শীর্ণ, শুকনো গলা, কানের দু'পাশের ঠেলে-ওঠা মাংস আর কাঁচা-পাকা চুলের জট দেখে সবই সে বুঝতে পারল।

"আর তারপরেই দুটি সন্তানকে নিয়ে আমি একেবারে একা পড়ে গেলাম। জীবিকার কোনও পথই রইল না।"

"সে কি, তোমাদের তো জমি ছিল।"

"ভাসিয়া বেঁচে থাকতেই সে জমি আমরা বেচে দিয়েছিলাম, আর...সে টাকাও

হাওয়া হয়ে গিয়েছিল। তার ফলে—কোনও রকমে বেঁচে রইলাম, কিন্তু কি যে করব কিছুই বুঝতে পারলাম না। ভদ্রলোকদের মেয়েদের যে দশা হয় আর কি। শুধু আমার অবস্থাটা ছিল বিশেষভাবে খারাপ, বিশেষভাবে অসহায়। যা কিছু ছিল তাতেই কোনও রকমে চলতে লাগল। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠালাম, নিজেও একটু-আধটু লেখাপড়া শিখলাম। তারপর স্কুলে যাবার পরে চতুর্থ বছরে মিতিয়া অসুখে পড়ল, আর প্রভু তাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেন। মাশা পড়ল ভানিয়া-র প্রেমে—সে আমার জামাই হলো। কি জানো, সে মানুষ ভাল, তবে অসুখী। তার শরীরও ভাল নয়।"

মেয়ের গলা শোনা গেল, "মা! বাচ্চাটাকে নাও! সব কিছু আমি একলা পারি না!"

প্রাস্কভ্যা মিখাইলভ্না চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটি দু'বছরের ছেলেকে কোলে নিয়ে তখনই ফিরে এল। ছেলেটি ক্রমাগত ছটফট করতে করতে তার রুমাল ধরে টানাটানি করতে লাগল।

"কি যেন বলছিলাম? হ্যাঁ। ভানিয়া এখানে একটা চাকরি পেল; ভাল চাকরি, আর উপরওয়ালাও ভাল মানুষ। কিন্তু বেশিদিন চালাতে পারল না। পদত্যাগ করতে হলো।"

"কারণ কি? তার কি অসুখ?"

"স্নায়ু-বিকার। বড় খারাপ রোগ। ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করেছি—তারা বলে হাওয়া-বদল করা দরকার, কিন্তু আমাদের তো সে সঙ্গতি নেই। তবু আশা করছি, এ অবস্থা কেটে যাবে। তার এমনিতে তো কোনও যন্ত্রণা নেই, শুধু ."

"লুকেরিয়া!" অসুস্থ লোকটির দুর্বল ও বিরক্ত গলা শোনা গেল। "ঠিক দরকারের সময়ই তাকে কোথাও না কোথাও পাঠানো হয়। মা!"

"যাচ্ছি।" কথা থামিয়ে প্রাস্কভ্যা মিখাইলভ্না হাঁক দিলো। "ওর এখনও খাওয়া হয়নি। ও তো আমাদের সকলের সঙ্গে খেতে পারে না।"

সে ঘর থেকে চলে গেল। তার চলাফেরার শব্দ শোনা যেতে লাগল। তারপর শীর্ণ, রোদে-পোড়া হাত মুছতে মুছতে সে ফিরে এল।

"তারপর, এইভাবেই চলেছে। অভাব, অভিযোগ, অসন্তোষ লেগেই আছে। তবু ঈশ্বরের কৃপায় ছেলেমেয়েগুলো বড় লক্ষ্মী, তাই দিন ভালই কাটছে। কিন্তু আমার কথা জানতে চাইছ কেন?"

"কি করে তোমাদের চলে?"

"কেন, আমি যা হোক কিছু উপার্জন করি। কোনওদিনই গান আমার ভাল লাগত না, অথচ সেই গানই এখন কত কাজে লাগছে।"

সে পাশের ডেস্কটার উপর হাত রাখল। একখানি ছোট, শীর্ণ হাত। যেন একটা সুর বাজাচ্ছে এমনিভাবে আঙুলগুলো চালাতে লাগল।

"গান শিখিয়ে কত পাও?"

"এক রুবল, বা পঞ্চাশ কোপেক। কেউ ত্রিশও দেয়। সকলেই আমাব উপব কত সদয়।"

"আচ্ছা, ওরা সত্যি সত্যি গান শেখে?" কাসাৎস্কি জিজ্ঞাসা করল; তার দুই চোখে হাসির প্রেত-ছায়া।

প্রাস্কভ্য়া মিখাইলভ্না প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেনি যে প্রশ্নগুলিকে সে কোনও গুরুত্ব দিচ্ছে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে তার দিকে তাকাল।

"হ্যাঁ, শেখে। একটি মিষ্টি ছোট মেয়ে আছে, কসাই ব মেয়ে। খুব ভাল মেয়ে। অবশ্য আমি যদি কাজের মানুষ হতাম তাহলে বাবাব পুরনো বন্ধুদের ধবে ভানিয়াব একটা কাজ জোটাতে পাবতাম। কিন্তু আমি যে কোনও কম্মের না, তাই তো আজ সকলের এই হাল হয়েছে।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে," মাথা নিচু করে কাসাৎস্কি বিড়বিড় করে বলল। "আচ্ছা গির্জার ব্যাপার কেমন পাশেংকা—তুমি কি সেখানে যাতাযাত করো?"

"আহা, সে কথা না বলাই ভাল। গির্জার ব্যাপারে আমাব যা অবহেলা সেটা খুব খারাপ। 'লেন্ট'-উৎসবের সময় আমরা উপোস কবি, আর গির্জায় যাই। কিন্তু অনেক সময়ই মাসের পর মাস আমাব যাওয়াই হয় না। ছেলেমেয়েদের পাঠাই।"

"নিজে যাও না কেন?"

"দেখো, সত্যি কথা বলতে কি"—তার মুখ লাল হয়ে উঠল—"ময়লা পোশাকে আমি সেখানে যাই আর আমাব মেয়ে ও বাচ্চাবা লজ্জা পাক সেটা আমি চাই না। আমাব তো নতুন পোশাক নেই। আর—কি জানো, আমি একটু আল্সেও আছি।"

"তাহলে বাড়িতে প্রার্থনা করো কি?"

"তা কবি, তবে সেটা ঠিক প্রার্থনা নয—নিয়মবক্ষা মাত্র। আমি জানি, এভাবে হয় না, কিন্তু আমার তো সত্যিকারের কোনও অনুভূতি নেই। শুধু আছে আমাব নীচতার বোধ।"

"তা বটে, তা বটে। বুঝেছি, বুঝেছি," যেন তাকে সমর্থন করেই কাসাৎস্কি জবাব দিলো।

জামাই আবাব ডাকল।

"যাচ্ছি যাচ্ছি," বলে সে আবার ঘর থেকে চলে গেল। এবার ফিরে আসতে বেশ কিছুক্ষণ দেরি হলো। শেষ পর্যন্ত যখন এল তখনও কাসাৎস্কি হাঁটুর উপর কনুই বেখে সামনে ঝুঁকে ঠিক আগের মতোই বসে ছিল। কিন্তু এখন বোঁচকাটা পিঠে তুলে নিয়েছে।

ঢাকনা-ছাড়া একটা ছোট টিনেব বাতি নিয়ে সে যখন ঘরে ঢুকল তখন কাসাৎস্কি একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুন্দর ক্লান্ত চোখ দুটি তুলে তার দিকে তাকাল।

প্রাস্কভ্য়া মিখাইলভ্না ভয়ে ভয়ে বলল, "তোমাব পরিচয় তো তাদের জানাইনি।

শুধু বলেছি—একজন সম্ভ্রান্ত তীর্থযাত্রী, একসময় আমি তোমাকে চিনতাম। তুমি কি চা খেতে খাবার ঘরে যাবে না?"

"না।"

"তাহলে এখানে এনে দেই।"

"না। কোনও দরকার নেই। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন পাশেংকা। আমাকে যেতেই হবে। আমাকে যদি ভালবাস তাহলে তোমার সঙ্গে যে আমার দেখা হয়েছে একথা কাউকে বলো না। ঈশ্বরের নামে মিনতি করছি, এ কথা কাউকে বলো না। তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার সামনে আমি আভূমি নত হতাম—কিন্তু আমি জানি তাতে তুমি বিব্রত বোধ করতে। তোমাকে ধন্যবাদ। খৃস্টের নামে আমাকে ক্ষমা করো।"

"আমাকে আশীর্বাদ করে যাও।"

"ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করবেন। খৃস্টের নামে আমাকে ক্ষমা করো।"

সে তখনই চলে যেত, কিন্তু প্রাস্কভ্য়া মিখাইলভ্না তাকে অপেক্ষা করতে বলল; তার জন্য রুটি, চাপাটি ও মাখন নিয়ে এল। সবকিছু হাত পেতে নিয়ে সে চলে গেল।

অন্ধকার নেমে এসেছে। মাত্র দুটো বাড়ি পেরিয়ে যাবার পরেই আর তাকে দেখা গেল না; শুধু বড় পুরোহিতের কুকুরের ঘেউ-ঘেউ শব্দ শুনেই সে বুঝতে পারল যে কাসাৎস্কি তখনও সেখান থেকে চলে যায়নি।

"তাহলে এই আমার স্বপ্নের অর্থ। যা আমার হওয়া উচিত ছিল, অথচ আমি হইনি, পাশেংকা ঠিক তাই হয়েছে। ঈশ্বরের জন্য বাঁচার ভান করে আমি বেঁচেছিলাম মানুষের জন্য; আর সে বেঁচে আছে ঈশ্বরের জন্য, যদিও সে মনে করে যে মানুষের জন্যই সে বেঁচে আছে। হ্যাঁ, মানুষের হাততালি পাবার জন্য আমি এতকাল যা করেছি তার চাইতে পুরস্কারের প্রত্যাশা না করে একটি সৎকাজ, একপাত্র জলদানের মূল্য অনেক বেশি। কিন্তু"—নিজেকেই সে প্রশ্ন করল—"ঈশ্বরের সেবা করবার এতটুকু সত্যিকারের বাসনাও কি আমার মনে ছিল না?" তার জবাবে তাকে বলতেই হল, "হ্যাঁ ছিল, কিন্তু মানুষের বাহবা লাভের অতিরিক্ত বাসনা সে বাসনাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, তাকে নষ্ট করে দিয়েছিল। না, আমার মতো যারা মানুষের স্তুতি লাভের জন্য বেঁচে থাকে তাদের কোনও ঈশ্বর থাকতে পারে না। কিন্তু এবার আমি তাঁর সন্ধানেই যাব।"

ঠিক যেভাবে সে পাশেংকার কাছে এসেছিল সেইভাবেই ফিরে চলল; পায়ে হেঁটে নরনারী নির্বিশেষে কখনও তীর্থযাত্রীদের দলে মিশে, কখনও তাদের দল ছেড়ে দিয়ে, খৃস্টের নামে আহার ও বাসস্থান ভিক্ষা করতে করতে গ্রাম থেকে গ্রামান্তর পেরিয়ে। কখনও কোনও বদমেজাজী গিন্নী গাল-মন্দ করেছে, কোনও চাষী খেতে খেতে তিরস্কার করেছে; কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাকে দিয়েছে খাদ্য ও পানীয়, এমন

কি পথ চলবার জন্যও কিছু খাবার সঙ্গে দিয়েছে। তার চেহারার আভিজাত্যও অনেকের মনকে আকর্ষণ করেছে। আবার কেউ কেউ বা একটি ভদ্রসন্তানকে ভিক্ষা করতে দেখে মনে মনে খুশি হয়েছে। কিন্তু তার শান্ত আচরণ সকলকেই জয় করেছে।

কখনও কোনও বাড়িতে ধর্মগ্রন্থ পেলে উচ্চৈঃস্বরে তা থেকেই পাঠ করেছে; অনেক দিনের চেনা জিনিস হলেও যেন নতুন কিছু শুনছে এইভাবেই সর্বত্র সকলে অভিভূত ও বিস্মিত হয়ে তার পাঠ মনোযোগ দিয়ে শুনেছে।

সুযোগ পেলেই পরামর্শ দিয়ে, নিরক্ষর চাষীদের চিঠি বা দলিলপত্র লিখে দিয়ে, ঝগড়ার সালিশী করে সে সকলকে সাহায্য করেছে, কিন্তু কারও কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করেনি, কারণ, কৃতজ্ঞতা জানাবার আগেই সে সেখান থেকে সরে পড়েছে। আর এইভাবেই একটু একটু করে সে তার ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছে।

একদিন দুটি বুড়ি ও একটি বরখাস্ত সৈনিকের সঙ্গে সে পথ চলছিল। কয়েকজন ভদ্র যাত্রী তাদের থামাল। সেই যাত্রীদলের একটি ভদ্রলোক ও মহিলা যাচ্ছিল দুই ঘোড়ার একটা ছোট গাড়িতে, আর অপর ভদ্রলোক ও মহিলা যাচ্ছিল ঘোড়ায় চেপে। গাড়িতে ছিল একজন ফরাসী অতিথি ও একটি মহিলা, আর ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছিল মহিলাটির স্বামী ও কন্যা।

অতিথিকে "তীর্থযাত্রী" দেখাবার জন্যই তাদের থামানো হলো— রুশ জনসাধারণের মনের স্বাভাবিক কুসংস্কারবশত যে সব নরনারী কাজকর্মের পরিবর্তে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ায় তারাই তীর্থযাত্রী।

তীর্থযাত্রীরা যাতে তাদের কথা বুঝতে না পারে সেজন্য তারা ফরাসী ভাষায়ই কথাবার্তা বলতে লাগল।

ফরাসী ভদ্রলোক বলল, "ওদের এই তীর্থযাত্রায় ঈশ্বর খুশি হবেন—এটা ওরা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে কি না জিজ্ঞাসা করুন তো।"

প্রশ্ন করা হলে বুড়ি জবাব দিলো :

"সে কথা ঈশ্বরই জানেন। তীর্থক্ষেত্রে আমরা পা রাখতে পেরেছি। হয় তো আমাদের অন্তরও সেখানেই পৌঁছে যাবে।"

সৈনিকটিকে জিজ্ঞাসা করা হলো। সে জবাব দিলো, এ জগতে সে একা, কোথাও থাকবার তার স্থান নেই।

তখন তারা কাসাৎস্কিকে জিজ্ঞাসা করল, কে সে।

"ঈশ্বরের সেবক।"

"সে কি বলছে? প্রশ্নের জবাব তো দিলো না।"

"সে বলছে, সে ঈশ্বরের সেবক।"

"সম্ভবত কোনও পুরোহিতের ছেলে। দেখেই বোঝা যায় ভাল বংশের ছেলে। আপনার কাছে কিছু খুচরো আছে কি?"

ফরাসী ভদ্রলোকের পকেটে কিছু রূপোর মুদ্রা ছিলো। প্রত্যেক তীর্থযাত্রীকে বিশ কোপেক করে দিলো।

"ওদের বলে দিন, টাকাটা মোমবাতি কিনবার জন্য নয়, এটা দিলাম চা খাবার জন্য। চা, চা—বলে সে হাসল। তারপর দস্তানা-পরা হাতে কাসাৎস্কির কাঁধটা চাপড়ে দিয়ে বলল, "আপনার জন্য দাদু।"

টুপিটা হাতে নিয়ে টাক মাথাটা নুইয়ে কাসাৎস্কি বলল, "খৃস্ট আপনাকে রক্ষা করুন।

এই সাক্ষাৎকারের ফলে কাসাৎস্কি বিশেষ খুশি বোধ করল, কারণ মানুষ তার সম্পর্কে কি ভাবল সেটাকে সে অগ্রাহ্য করতে পেরেছে, সব চাইতে সরল, সব চাইতে সহজ কাজটি করতে পেরেছে—সবিনয়ে বিশ কোপেক হাত পেতে নিয়েছে, এবং পরে সেটা একটি অন্ধ ভিক্ষুককে দান করেছে। মানুষের কথা তার কাছে যত অর্থহীন হয়ে উঠছে, ততই বেশি করে সে তার ঈশ্বরকে অনুভব করতে পারছে।

এইভাবে আটটি মাস কেটে গেল। নবম মাসে একটি শহরের ভিতর দিয়ে যাবার সময় অন্য পথিকদের সঙ্গে যেখানে সে রাতটা কাটিয়েছে সেখানে তাকে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো; আর যেহেতু সে পাশপোর্ট দেখাতে পারল না সেজন্য আরও জেরা করতে তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হলো। তার নাম কি, আর তার পাশপোর্টই বা কোথায়,—এই প্রশ্নের জবাবে সে জানালো যে তার কোনও পাশপোর্ট নেই, সে ঈশ্বরের সেবক। ভবঘুরে হিসাবে তার বিচার হলো, সাজা হলো, এবং তাকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হলো।

সাইবেরিয়ায় একটি ধনী চাষীর গোলাবাড়িতে সে আশ্রয় পেল; আজও সে সেখানেই আছে। ঐ চাষীর বাগানে সে কাজ করে, গ্রামের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখায় আর রোগীর সেবাশুশ্রূষা করে।

—১৮৯৮

ফাঁকা ঢাক

The Empty Drum

(ভল্‌গা অঞ্চলে দীর্ঘ প্রচলিত একটি লোককথা)

এমেল্‌য়ান নামে একটি মজুর ছিল; সে এক মনিবের কাছে কাজ করত। একদিন কাজে যাবার পথে মাঠ পার হবার সময় একটা ব্যাঙ লাফিয়ে তার সামনে পড়ল। আর একটু হলেই ব্যাঙটা তার পায়ের নিচে চাপা পড়ত; কোনও রকমে সে সামলে নিল। হঠাৎ তার কানে এল, পিছন থেকে কে যেন তাকে ডাকছে।

এমেল্‌য়ান মুখ ফিরিয়ে একটি সুন্দরী কন্যেকে দেখতে পেল। সে বলল, "এমেল্‌য়ান তুমি বিয়ে করছ না কেন?"

মজুর বলল, "কেমন করে বিয়ে করি কন্যে? পরনের কাপড়টুকু ছাড়া আমার তো আর কিছু নেই; কাজেই কেউ আমাকে স্বামী বলে বরণ করবে না।"

কন্যে বলল, "তুমি আমাকে বৌ করে নাও।"

কন্যেটিকে এমেল্‌য়ান-এর পছন্দ হলো। বলল. "সে তো খুব সুখের কথা। কিন্তু আমরা থাকব কোথায়? খাব কি?"

কন্যে বলল. "তা নিয়ে ভাববার কি আছে? একটু কম ঘুমিয়ে কাজ একটু বেশি করলে একটা মানুষ যে-কোনও জায়গায় খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে পারে।"

"ঠিক আছে, তাহলে এস আমরা বিয়ে করি," এমেল্‌য়ান বলল। কিন্তু সেজন্য কোথায় যেতে হবে?"

"চলো শহরে যাই।"

এইভাবে এমেল্‌য়ান ও সেই কন্যে শহরে গেল। শহরের একেবারে লাগোয়া একটা ছোট কুটীরে কন্যে তাকে নিয়ে গেল। আর সেখানেই তারা বিয়ে করে সংসার পাতল।

একদিন রাজা মশায় শহরের পথ দিয়ে গাড়িতে চেপে যেতে যেতে এমেল্‌য়ান-এর কুটীরের সামনে হাজির হলো। এমেল্‌য়ান-এর বৌও রাজাকে দেখবার জন্য বাইরে এল। রাজা তো তাকে দেখে অবাক!

"এত রূপ এখানে কোথা থেকে এল?" রাজা ভাবল; তারপর গাড়ি থামিয়ে এমেল্‌য়ান-এর বৌকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কে?"

"চাষী এমেল্‌য়ান-এর বৌ," সে জবাব দিলো।

রাজা বলল, "এত সুন্দরী হয়েও তুমি একটা চাষীকে বিয়ে করলে কেন? তোমার তো রাণী হওয়া উচিত।"

বৌটি বলল, "এমন ভাল কথা বলার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, কিন্তু আমার কাছে চাষী বরই ভাল।"

তার সঙ্গে আরও কিছু কথা বলে রাজা মশায় গাড়ি হাঁকিয়ে দিলো। কিন্তু প্রাসাদে ফিরেও এমেল্‌য়ান-এর বৌয়ের কথা তার মাথা থেকে গেল না। সারা রাত সে ঘুমোতে পারল না; মনে শুধু এক চিন্তা, কেমন করে তাকে নিজের করে পাবে। নিজে কোনও পথ বের করতে না পেরে রাজা মশায় চাকরদের একটা পথ বের করতে বলল।

চাকররা রাজাকে বলল : "এমেল্‌য়ান-কে হুকুম করুন, সে এসে রাজবাড়িতে কাজে লাগুক; তখন আমরা তাকে খাটিয়ে খাটিয়েই মেরে ফেলব। তখন তার বৌ বিধবা হবে, আর আপনিও তাকে নিয়ে আসতে পারবেন।"

রাজা মশায় তাদের পরামর্শমতই কাজ করল। হুকুম দিলো, এমেল্‌য়ানকে রাজবাড়িতে কাজ করতে হবে, আর বৌকে নিয়ে রাজবাড়িতেই থাকতে হবে।"

দূতরা এসে এমেল্‌য়ানকে রাজার হুকুম জানালো। বৌ বলল, 'যাও এমেল্‌য়ান; সারাদিন সেখানে কাজ করবে, কিন্তু রাত হলেই বাড়ি চলে আসবে।"

এমেল্‌য়ান রাজবাড়িতে পৌঁছতেই রাজার সরকার বলল, "তুই একা এসেছিস কেন? বৌকে সঙ্গে আনিসনি কেন?"

"তাকে কেন এখানে টেনে আনব?" এমেল্‌য়ান বলল। "তার তো নিজের ঘর সংসার আছে।"

বাজবাড়িতে এমেল্‌যানকে দু'জনের কাজ করতে দেওযা হলো। শেষ করতে পারবে না জেনেই সে কাজে হাত লাগাল; কিন্তু সন্ধ্যা হলেই দেখা গেল, কী আশ্চর্য! সব কাজ সারা হয়ে গেছে। তা দেখে সরকাব তাকে পরের দিনেব জন্য চারগুণ কাজ দিলো।

এমেল্‌যান বাড়ি গেল। সেখানে সবকিছু তকতকে, ঝকঝকে: উনুনে আঁচ দেওয়া হয়েছে, খাবাব বান্না হয়ে তৈরি, আব তার বৌ টেবিলে বসে সেলাই করতে করতে তার জন্য অপেক্ষা করছে। বৌ তাকে আদর করে কাছে ডাকল, টেবিল সাজিযে খাদ্য ও পানীয দিলো, তারপর তার দিনের কাজের কথা জিজ্ঞাসা করল।

সে বলল, "উঃ! বড় খারাপ কাজ; আমার ক্ষমতার চাইতেও বেশি কাজ দিয়ে ওরা আমাকে মেরে ফেলতে চায।"

বৌ বলল, "কাজ নিয়ে খিটখিট করো না; কাজ কতটা কবেছ আর কতটা বাকি আছে তা দেখবার জন্য আগে-পিছে তাকিও না; শুধু নিজের কাজ করে যাও; দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

তখন এমেল্‌য়ান শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন সকালে আবার কাজে গেল, আর কোনও দিকে না তাকিয়ে কাজ করে চলল। আর কি আশ্চর্য দেখ! সন্ধ্যা নাগাদ সব কাজ সাবা হয়ে গেল, আব অন্ধকার হবাব আগেই সে বাড়ি ফিলে এল।

বাব বার তারা এমেল্‌য়ান-এর কাজ বাড়াতে লাগল, আর প্রতিবারই সে যথাসমযে কাজ শেষ কবে কুটীরে ফিরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। এক সপ্তাহ কেটে গেল। রাজার চাকররা দেখল, বেশি কাজ দিয়ে তাকে মারা যাবে না; তখন তারা তাকে এমন কাজ দিতে লাগল যাতে দক্ষতা দরকার। কিন্তু তাতেও কোনও ফল হলো না। ছুতোরমিস্ত্রির কাজ, রাজমিস্ত্রির কাজ, ঘবছাওয়ার কাজ— যে কাজই দেওয়া হয় সেটা যথাসময়ে শেষ করে এমেল্‌য়ান রাতে বৌযের কাছে ফিবে যায়। এইভাবে দ্বিতীয় সপ্তাহ কেটে গেল।

রাজা মশায় চাকরদের ডেকে বলল, তোমাদের কি এই জন্য পুষছি; দুটো সপ্তাহ কেটে গেল, অথচ দেখছি তোমরা কিছুই করতে পারোনি। তোমরা কাজের চাপে

এমেল্‌য়ানকে কাবু করতে চেয়েছিলে, কিন্তু জানালা দিয়ে আমি তো দেখি রোজ সন্ধ্যায় সে মনের সুখে গান করতে করতে বাড়ি ফিরে যায়। তোমরা কি আমাকে বোকা পেয়েছ?"

রাজার চাকররা নানা রকম ওজর দেখাতে লাগল। বলল, পরিশ্রমের কাজ দিয়ে তাকে কাবু করতে আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করছি; কিন্তু কোনও কাজই তার পক্ষে কষ্টকর নয়; যেন ঝাঁটার এক বাড়িতেই সে সবকিছু সাফ করে ফেলে। কিছুতেই তার ক্লান্তি হয় না। তখন তাকে এমন কাজ করতে দিলাম যাতে দক্ষতার দরকার; ভাবলাম সে সব কাজ করবার ক্ষমতা তার নেই; কিন্তু সে সব কাজও অনায়াসে করে ফেলে। যে কাজই দেওয়া হোক তাই সে করে ফেলে; কেমন করে যে করে তা কেউ জানে না। নিশ্চয় সে বা তার বৌ কোনও তুকতাক জানে; তাই দিয়েই কাজ হাসিল করে। তাকে নিয়ে আমরা তো হয়রান হয়ে গেলাম; তাই এমন একটা কাজ খুঁজে বের করতে চাই যা সে কোনওমতেই করতে পারবে না। এবার ভেবেছি, তাকে এক রাতের মধ্যে একটা গির্জা তৈরি করে দিতে বলব। এমেল্‌য়ানকে ডেকে পাঠিয়ে হুকুম দিন একদিনের মধ্যে রাজবাড়ির সামনে একটা গির্জা তৈরি করে দিক। তখন যদি বাছাধন সে কাজ না করে তাহলে কথার অবাধ্য হবার অপরাধে তার গর্দান নিন।"

রাজা মশায় এমেল্‌য়ানকে ডেকে পাঠাল। বলল, "আমার হুকুম শোনো। আমার প্রাসাদের সামনে যে দীঘি আছে সেখানে আমার জন্য একটা গির্জা তৈরি করে দাও; কাল সন্ধ্যার মধ্যেই সেটা তৈরি হওয়া চাই। যদি পার পুরস্কার পাবে, আর যদি না পারো তোমার মাথাটাই কাটা যাবে।"

রাজার হুকুম শুনে এমেল্‌য়ান বাড়ি ফিরে গেল। ভাবল, "আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে।" স্ত্রীর কাছে এসে বলল, "বৌ, তৈরি হও, এখান থেকে আমাদের পালাতে হবে, নইলে বিনা দোষে আমার সর্বনাশ হবে।"

বৌ বলল, "তুমি এত ভয় পেয়েছ কেন? আর কেনই বা আমরা পালিয়ে যাব?"

"ভয় না পেয়ে কি করি? রাজার হুকুম, কাল একদিনের মধ্যে তার জন্য একটা গির্জা তৈরি করে দিতে হবে। যদি না পারি, আমার মাথাটা কাটা যাবে। এখন তো একটা পথই খোলা আছে; সময় থাকতে থাকতে এখনই পালিয়ে যেতে হবে।"

কিন্তু তার বৌ সে কথা শুনল না। বলল, "রাজার অনেক সৈন্যসামন্ত; তারা আমাদের ধরে ফেলবেই। পালিয়ে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না; কাজেই যতক্ষণ শক্তিতে কুলোয় তার কথামতো কাজই করতে হবে।"

"কাজটা যে আমার শক্তির অতীত; তাহলে তার কথামতো কাজ করব কেমন করে?"

"আহা, ভালমানুষ, ভেঙে পড়ো না। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ো। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।"

এমেল্‌য়ান শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন ভোরে বৌ তাকে ডেকে তুলল। বলল, "শিগ্‌গির যাও, গির্জার বাকি কাজ শেষ করে দাও। এই নাও পেরেক আর হাতুড়ি; এখনও একদিনের মতো কাজ বাকি আছে।"

এমেল্‌য়ান শহরে গিয়ে রাজবাড়ির দীঘিতে পৌছে দেখে, একটা মস্ত বড় গির্জা গড়ে উঠেছে, তবে কাজ এখনও সারা হয়নি। এমেল্‌য়ান বাকি কাজে হাত লাগাল এবং সন্ধ্যার মধ্যেই গির্জা তৈরি হয়ে গেল।

রাজা মশায় ঘুম থেকে উঠে প্রাসাদ থেকেই দেখতে পেল, গির্জাটা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, আর এমেল্‌য়ান এখানে-ওখানে পেরেক মেরে চলেছে। কিন্তু গির্জা দেখে রাজা মশায় খুশি হলো না—এমেল্‌য়ানকে দণ্ড দিয়ে তার বৌকে নিয়ে আসতে না পারায় তার মন খিঁচড়ে গেল। আবার সে চাকরদের ডাকল। "এমেল্‌য়ান এ কাজটাও করে ফেলেছে; কাজেই তার গর্দান নেবার ছুতো তো পাওয়া গেল না। আরও কোন চতুর ফন্দি তোমাদের বের করতে হবে, নইলে তোমাদেরই গর্দান যাবে।"

তখন চাকররা ফন্দি আঁটল, এমেল্‌য়ানকে রাজবাড়ির চারদিক ঘুরিয়ে একটা নদী বানাতে হবে, আর তাতে পাল তোলা নৌকো চালাতে হবে। রাজামশায় এমেল্‌য়ানকে ডেকে পাঠিয়ে নতুন কাজের ভার দিলো।

বলল, "তুমি যখন এক রাতে একটা গির্জা বানাতে পেরেছ, তখন এটাও পারবে। কাল সকালেই সব ঠিক হওয়া চাই। নইলে তোমার মাথাটাই কাটা যাবে।"

এমেল্‌য়ান এবার আরও ভেঙে পড়ল; বিষণ্ণ মনে বাড়িতে বৌয়ের কাছে ফিরে গেল।

এমেল্‌য়ান সব কথা জানিয়ে বলল, "চলো পালাই।"

কিন্তু বৌ বলল, "সৈন্যসামন্তদের হাত থেকে পালানো যাবে না; যেখানে যাব সেখান থেকেই তারা আমাদের পাকড়াও করবে। রাজার আদেশ মানা ছাড়া আর কোনও পথ নেই।"

এমেল্‌য়ান আর্ত গলায় বলল, "এ কাজ কেমন করে করব?"

"এহ্‌ ভালমানুষ, ভেঙে পড়ো না। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ো। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবে যথাসময়ে সব কাজ হয়ে গেছে।"

কাজেই এমেল্‌য়ান ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে বৌ তাকে জাগিয়ে তুলল। বলল, "রাজবাড়িতে চলে যাও। কাজ সারা হয়ে গেছে। শুধু রাজবাড়ির সামনে জেটির কাছে একটা মাটির ঢিবি রয়েছে; একটা কোদাল নিয়ে সেটা সমান করে দাও গে।"

রাজা মশায় ঘুম থেকে উঠে দেখল, যেখানে নদীর চিহ্ন ছিল না সেখানে একটা নদী বয়ে চলেছে, নদীতে কত জাহাজ চলাচল করছে, আর এমেল্‌য়ান কোদাল দিয়ে একটা ঢিবি কেটে সমান করছে। রাজা মশায় অবাক হয়ে গেল; কিন্তু নদী বা জাহাজ

দেখে মোটেই খুশি হলো না; বরং এমেল্‌য়ানকে দণ্ড দিতে না পারায় বড়ই বিরক্ত হয়ে উঠল। ভাবতে লাগল, "এমন কোনও কাজ নেই যা এই লোকটা করতে না পারে। কি করা যায়?" তখন চাকরদের ডেকে আবার তাদের পরামর্শ চাইল।

বলল, "এমন কোনও কাজ খুঁজে বের করো যা এমেল্‌য়ান-এর সাধ্যের বাইরে। আমরা যা করতে বলি তাই তো সে করে ফেলে, আর আমিও তার বৌকে নিয়ে আসতে পারি না।"

রাজার চাকররা অনেক ভেবে ভেবে আর একটা ফন্দি বের করল। রাজার কাছে গিয়ে বলল, "এমেল্‌য়ানকে ডেকে বলুন, 'অজানা দেশে যাও, আর অজানা জিনিস নিয়ে এস।' এবার আর তার রেহাই নেই। সে যেখানেই যাক না কেন আপনি বলতে পারবেন যে সে ঠিক জায়গায় যায়নি, আর যে জিনিসই নিয়ে আসুক না কেন আপনি বলতে পারবেন যে সেটা ঠিক জিনিস নয়। তখন আপনি তার গর্দান নেবেন এবং তার বৌকে পাবেন।"

রাজা মশায় খুব খুশি। বলল, "খুব ভাল মতলব।" অতএব এমেল্‌য়ানকে ডেকে বলল, "অজানা দেশে যাও, আর অজানা জিনিস নিয়ে এস। যদি না আনতে পারো তোমার গর্দান যাবে।"

এমেল্‌য়ান বাড়ি ফিরে বৌকে রাজার কথা বলল। তার বৌও চিন্তিত হয়ে পড়ল। বলল, "দেখো, তোমাকে জব্দ করার ফন্দি তারা রাজাকে শিখিয়েছে। এবার আমাদের সাবধানে কাজ করতে হবে।" সে বসে বসে অনেক ভেবেচিন্তে স্বামীকে বলল, "অনেক দূরে চলে যাও; সেখানে আমাদের ঠাকুরমা—সব সৈনিকদেব মা—এক চাষী বুড়ি থাকে; তার কাছে গিয়ে সাহায্য চাও। সে যদি কিছু দেয় তাই নিয়ে সোজা রাজবাড়িতে চলে যেয়ো, আমি সেখানেই থাকব: এবার তাদের হাত থেকে আমার রেহাই নেই। তারা আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে, তবে বেশিদিন রাখতে পারবে না। তুমি যদি ঠাকুরমার কথামতো সব কাজ করতে পারো, তাহলেই তুমি আমাকে উদ্ধার করতে পারবে।"

এইভাবে বৌ এমেল্‌য়ান-এর যাত্রার আয়োজন করে দিলো। তাকে দিলো একটা ঝুলি ও একটা তক্‌লি। বলল, "এটা তাকে দিও। এটা দেখলেই সে বুঝতে পারবে যে তুমি আমার বর।" তারপর সে তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিলো।

এমেল্‌য়ান যাত্রা করল। শহর ছাড়িয়ে গেল। এক জায়গায় সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করছিল। এমেল্‌য়ান দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। কুচকাওয়াজের পরে সৈন্যরা বিশ্রাম করতে বসল। এমেল্‌য়ান তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা ভাই, তোমরা বলতে পারো অজানা দেশে কোন্ পথে যেতে হয়, আর অজানা জিনিসই বা কোথায় পাওয়া গেল?"

সৈন্যরা তার কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। "এ কাজে তোমাকে কে পাঠিয়েছে?" তারা জানতে চাইল।

"রাজা মশায়," সে বলল।

তারা বলল, "আরে ভাই, যেদিন থেকে সেনাদলে ঢুকেছি সেদিন থেকেই তো কোথায় যে চলেছি তা জানি না এবং আজ পর্যন্তও সেখানে পৌঁছতে পারিনি; আর কি যে খুঁজছি তাও জানি না এবং তা পাইওনি। আমরা তোমাকে সাহায্য করতে পারব না।"

সৈন্যদের কাছে কিছুক্ষণ বসে এমেল্য়ান আবার যাত্রা কবল। অনেক পথ পার হয়ে শেষ পর্যন্ত একটা বনে হাজির হলো। সেই বনে একটা কুঁড়ে ঘরে থাকে এক থুথ্থুরি বুড়ি, সব চাষী সৈন্যদের মা; বুড়ি সুতো কাটে আর কাঁদে। সুতো কাটতে কাটতে সে থুথু দিয়ে আঙুল ভেজাবার জন্য মুখে হাত দেয় না, আঙুল ভেজায় চোখের জলে। এমেল্যানকে দেখেই সে চেঁচিয়ে উঠল, "এখানে এসেছিস কেন?" তখন এমেল্য়ান তাকে তক্লিটা দিয়ে বলল, বৌ তাকে এটা দিয়েছে।

বুড়ি সঙ্গে সঙ্গে নরম হয়ে তাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল। এমেল্য়ান সারা জীবনের বৃত্তান্ত তাকে বলল, কি করে কন্যেকে বিয়ে করল; কেমন করে শহরে গিয়ে সংসার পাতল; কি কাজ করত, আর রাজবাড়িতে কি কি করেছে; কেমন করে গির্জা তৈরি করেছে, পালতোলা জাহাজ সমেত নদী বানিয়েছে; আর রাজা মশায় এবার তাকে বলেছে অজানা দেশে গিয়ে অজানা জিনিস আনতে।

ঠাকুরমা সব কথা মন দিয়ে শুনল। তার কান্না থামল। নিজের মনেই বলল, "এবার সময় হয়েছে;" এমেল্যানকে বলল, "ঠিক আছে বাছা। এখানে বোস্, তোকে কিছু খেতে দেব।"

এমেল্য়ান খেলো। তখন ঠাকুরমা কি কি করতে হবে তা বলল। এই নে একটা সুতোর গুলি। এটাকে গড়িয়ে দিয়ে তার পিছন পিছন চলে যা। সাগরে না পৌঁছা পর্যন্ত একটানা চলতে থাকবি। সেখানে গেলেই একটা মস্ত বড় নগর দেখতে পাবি। নগরের ভিতর ঢুকে একেবারে শেষের বাড়িটায় গিয়ে রাতটা কাটাতে চাইবি। যা খুঁজছিস সেখানেই খুঁজে পাবি।"

"সেটাকে দেখে চিনব কি করে ঠাকুরমা?"

"যখনই দেখবি মানুষ কোনও কিছুকে বাবা-মায়ের চাইতেও বেশি মান্য করছে তখনই বুঝবি এটাই সেই জিনিস। সেইটে নিয়ে রাজার কাছে চলে যাবি। রাজার কাছে নিয়ে গেলেই সে বলবে সেটা ঠিক জিনিস নয়, তখন তুই জবাবে বলবি : 'এটা যদি ঠিক জিনিস না হয় তাহলে এটাকে ভেঙে চুরমার করে ফেলতে হবে, আর তুই সেটা বাজাতে বাজাতে নদীর তীরে নিয়ে যাবি, সেটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করবি ও জলে ফেলে দিবি। তাহলেই তোর বৌকেও ফিরে পাবি আর আমার চোখের জলও শুকোবে।"

এমেল্য়ান ঠাকুরমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুতোর গুলিটা গড়িয়ে দিলো।

গড়াতে গড়াতে সেটা সাগবে গিয়ে থামল। সাগরের তীরে একটা বড় নগর, আর নগরের শেষ প্রান্তে একটা বড় বাড়ি। সেখানে এমেল্য়ান রাতে থাকবার অনুমতি চাইতে তা মঞ্জুর করা হলো। সে ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে ঘুম ভাঙতেই শুনল, বাবা তার ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে জ্বালানির জন্য কাঠ কেটে আনতে বলল। কিন্তু ছেলে তার কথা শুনল না। বলল, "এত সকালে গিয়ে কি হবে? এখনও অনেক সময় আছে। তারপর এমেল্য়ান শুনল, মা বলছে, "যাও বাবা; তোমার বাবার হাড়ে ব্যথা; তুমি কি চাও যে সে কাঠ কাটতে যাক। ঘুম থেকে উঠবার সময়ও তো হয়ে গেছে!"

কিন্তু ছেলে বিড় বিড় করে কি যেন বলে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। সবে সে ঘুমিয়েছে এমন সময় রাজপথে কিসের যেন গর্জন ও ঢপ্-ঢপ্ শব্দ শোনা গেল। ছেলেটি লাফ দিয়ে উঠে কোনও রকমে জামা পরে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গেল। এমেল্য়ান লাফ দিয়ে উঠে তার পিছু নিল : কোন্ জিনিসকে ছেলে বাবা ও মায়ের চাইতে বেশি মান্য করে তা সে দেখবে। সে দেখল, একটি লোক রাস্তা দিয়ে চলেছে; তার পেটের সঙ্গে একটা জিনিস বাঁধা; লোকটি হাতে লাঠি নিয়ে সেই জিনিসটাতে আঘাত করছে; আর তাতেই মেঘের মতো শব্দ ও ঢপ্ ঢপ্ আওয়াজ হচ্ছে; সেই আওয়াজ শুনেই ছেলে ছুটে এসেছে। এমেল্য়ান ছুটে গিয়ে সেটাকে ভাল করে দেখল। জিনিসটা একটা গামলার মতো গোল, দু' দিকেই চামড়া দিযে ছাওয়া। সে জানতে চাইল, জিনিসটার নাম কি।

তাকে বলা হলো, "ঢাক।"

'আর এটা কি ফাঁকা?"

"হ্যাঁ, এটা ফাঁকা।"

এমেল্য়ান অবাক হয়ে গেল। সে তাদের কাছে জিনিসটা চাইল, কিন্তু তারা দিলো না। তখন হাত না পেতে সে ঢাকওয়ালার পিছু নিল। সারাদিন তাব পিছনে পিছনে চলবার পরে ঢাকী শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তেই সে ঢাকটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুটতে শুরু করল।

ছুটতে ছুটতে সে নিজের শহরে পৌঁছে গেল। বৌএর সঙ্গে দেখা করতে গেল, কিন্তু তাকে বাড়িতে পেল না। সে চলে যাবার পর দিনই রাজামশায় তাকে নিয়ে গেছে। কাজেই এমেল্য়ান রাজবাড়িতে গিয়ে রাজার কাছে সংবাদ পাঠাল : "যে লোক অজানা দেশে গিয়েছিল সে অজানাকে নিয়ে ফিরে এসেছে।"

সে কথা শুনে রাজা জানাল যে তাকে পরদিন আবার আসতে হবে।

কিন্তু এমেল্য়ান বলল, "রাজাকে বলো আমি এসেছি, আর তিনি যা চেয়েছিলেন তা নিয়ে এসেছি। হয় তিনি আমার কাছে আসুন, নইলে আমিই তাঁর কাছে যাব।"

রাজা মশায় বেরিয়ে এল। বলল, "তুমি কোথায় গিয়েছিলে?"

এমেল্য়ান বলল।

রাজা মশায় বলল, "সেটা তো ঠিক জায়গা নয়। তুমি কি এনেছ?"

এমেল্‌য়ান ঢাকটা দেখাল, কিন্তু রাজা সেদিকে ফিরেও তাকাল না।

"এটা সে জিনিস নয়।"

এমেল্‌য়ান বলল, "এটা যদি সে জিনিস না হয় তাহলে এটাকে ভেঙে চুরমাব করে ফেলব; এটার উপর শয়তান ভর করুক।"

এমেল্‌য়ান রাজবাড়ি ছেড়ে ঢাকটা বাজাতে বাজাতে চলে গেল। আর সেই বাজনা শুনে রাজার যত সৈন্য-সামন্ত সবাই এসে এমেল্‌য়ানকে অভিবাদন জানাল, তার আদেশের অপেক্ষায় রইল, তাকে অনুসরণ করে চলল।

রাজা মশায় জানালা থেকে চিৎকার করে সৈন্যদের তার পিছু নিতে নিষেধ করল; কিন্তু কেউ তার কথা শুনল না; সকলেই এমেল্‌য়ান-এর পিছন পিছন চলল।

এ-দৃশ্য দেখে রাজা মশায় হুকুম দিলো, এমেল্‌য়ান-এর বৌকে তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক; আর এমেল্‌য়ান-এর কাছে লোক পাঠিয়ে তাকে ঢাকটা দিতে বলল।

এমেল্‌য়ান বলল, "তা তো হবে না। আমাকে বলে দেওয়া হয়েছে, ভেঙে চুরমার করে টুকরোগুলো জলে ফেলে দিতে হবে।"

কাজেই এমেল্‌য়ান ঢাকটা নিয়ে নদীর দিকে চলল। সৈন্যসামন্তরাও চলল তার পিছু পিছু। নদীতীরে পৌছে এমেল্‌য়ান ঢাকটাকে চুরমার করে তার টুকরোগুলো নদীর জলে ফেলে দিলো। আর তারপরেই সৈন্যরা সবাই দৌড়ে চলে গেল।

এমেলয়ান বৌকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। তারপর থেকে রাজাও তাকে কোনও রকম কষ্ট দিতো না। ফলে তারা চিরদিন সুখে বাস করতে লাগল।

—১৮৯১

আসিরিয়ার রাজা এসারহাদ্দন

Esarhaddon, King of Assyria

আসিরিয়ার রাজা এসারহাদ্দন রাজা লাইলীর রাজ্য জয় করে তার শহর-নগর ধ্বংস করে পুড়িয়ে দিলো, সেখানকার অধিবাসীদের বন্দী করে দেশে নিয়ে গেল, যোদ্ধাদের হত্যা করল, কিছু সেনাপতির শিরচ্ছেদ করল, অন্যদের হয় শূলে চড়ালো নয়তো গায়ের চামড়া তুলে নিল, আর স্বয়ং রাজা লাইলীকে খাঁচায় বন্দী করে রাখল।

একদিন রাতে বিছানায় শুয়ে রাজা এসারহাদ্দন ভাবছিল কি ভাবে লাইলীর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায়, এমন সময় হঠাৎ বিছানার কাছে একটা খস্ খস্ শব্দ শুনে

চোখ মেলে একটি বৃদ্ধকে দেখতে পেল; তার মুখে লম্বা পাকা দাড়ি, আর চোখ দুটি বড় শান্ত।

বুড়ো মানুষটি জিজ্ঞাসা করল, "তুমি লাইলীকে হত্যা করতে চাও?"

রাজা জবাব দিলো, "হ্যাঁ। কিন্তু কিভাবে হত্যা করব তা বুঝতে পারছি না।"

"কিন্তু তুমিই তো লাইলী", বুড়ো বলল।

রাজা জবাব দিলো, "তা তো নয়। লাইলী—লাইলী, আর আমি—আমি।"

"তুমি আর লাইলী এক", বুড়ো জবাব দিলো। "তুমি শুধু কল্পনা করছ যে তুমি লাইলী নও, আর লাইলীও তুমি নও।"

রাজা বলল, "আপনি কি বলতে চান? আমি এখানে, নরম বিছানায় শুয়ে আছি; আমাকে ঘিরে কত ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী; আজকের মতোই কালও আমি বন্ধুদের নিয়ে পান-ভোজন করব; আর ওদিকে লাইলী খাঁচায় বন্ধ পাখির মতো বসে আছে, কাল তাকে শূলে দেওয়া হবে, যতক্ষণ মৃত্যু না হবে ততক্ষণ বাঁচবার চেষ্টায় তার জিভটা বেরিয়ে আসবে, আর তারপরে তার দেহটা কুকুরে ছিঁড়ে খাবে।"

"তার জীবন তুমি ধ্বংস করতে পাবো না", বুড়ো বলল।

"তাহলে যে চৌদ্দ হাজার সৈনিককে আমি মেরেছি, যাদের মৃতদেহ দিয়ে একটা স্তূপ বানিয়েছি, তাদের কি হলো? আমি তো বেঁচে রয়েছি, কিন্তু তারা কেউ নেই। তাতেই কি প্রমাণ হয় না যে আমি জীবনকে ধ্বংস করতে পারি।"

"তুমি কি করে জানলে যে তারা বেঁচে নেই?"

"কারণ তাদের আমি আর দেখতে পাই না। আর তাছাড়া, তারা কত যন্ত্রণা ভোগ করেছে, আমি তা করিনি। সেটা তাদের কাছে দুর্ভাগ্য, কিন্তু আমার কাছে সৌভাগ্য।"

"সেটাও তোমার ধারণামাত্র। তাদের নয়, নিজেকেই তুমি কষ্ট দিয়েছ।"

রাজা বলল, "আমি বুঝতে পারছি না।"

"তুমি কি বুঝতে চাও?"

"হ্যাঁ, চাই।"

"তাহলে ওখানে চলো", একটা বড় জলাশয় দেখিয়ে বুড়ো বলল।

রাজা উঠে জলাশয়ের কাছে গেল।

"পোশাক খুলে জলাশয়ে নামো।"

এসারহাদ্দন বুড়োর কথা মতো কাজ করল।

একটা কলসি জলে ভরে নিয়ে বুড়ো বলল, "যেই আমি এই জল তোমার মাথায় ঢালতে শুরু করব অমনি তুমি জলে ডুব দেবে।"

বুড়ো কলসিটা রাজার মাথার উপর উপুড় করতেই রাজা সেই জলের নিচে মাথাটা নুইয়ে জলে ডুব দিলো।

জলের তলে চলে যাওয়ামাত্রই রাজা এসারহাদ্দন-এর মনে হলো সে আর

এসারহাদ্দন নেই, সে যেন অন্য কেউ। নিজেকে অন্য লোক মনে হতেই সে দেখল, একটা দামী বিছানায় সে শুয়ে আছে, আর তার পাশে একটি সুন্দরী নারী। তাকে সে আগে কখনও দেখেনি, কিন্তু মনে হলো সে তার স্ত্রী। বিছানায় উঠে বসে নারী বলল :

"প্রিয় স্বামী লাইলী! গত কালের কাজের ফলে ক্লান্ত হয়ে তুমি অন্য দিনের তুলনায় অনেক বেশি ঘুমিয়েছ; আমিও বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটবে বলে তোমাকে ডাকিনি। কিন্তু এখন রাজপুত্ররা দরবারে অপেক্ষা করছে। পোশাক পরে তাদের সঙ্গে দেখা করো গে।"

আর এসারহাদ্দন এসব কথা শুনে বুঝল যে সেই লাইলী; এতে সে মোটেই বিস্মিত হলো না, তবে এই ভেবে অবাক হলো যে একথা সে আগে জানত না। যা হোক, বিছানা ছেড়ে সাজ-পোশাক পরে সে দরবার-কক্ষে গেল। সেখানে রাজপুত্ররা তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

আভূমি নত হয়ে রাজপুত্ররা তাদের রাজা লাইলীকে অভ্যর্থনা করল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে তার নির্দেশমতোই আসন গ্রহণ করল। জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র কথা বলতে শুরু করল। সে বলল, দুষ্টমতি রাজা এসারহাদ্দন-এর অপমান আর সহ্য করা অসম্ভব; তারা অবিলম্বে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করবে। কিন্তু লাইলী তাতে সম্মত হলো না; সে আদেশ দিলো, রাজা এসারহাদ্দন-এর সঙ্গে একটা মিটমাট করবার জন্য দূত পাঠানো হোক; আর রাজপুত্রদের সেখান থেকে চলে যেতে বলল। পরে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে রাজদূত রূপে নিয়োগ করে রাজা এসারহাদ্দন-এর সঙ্গে তারা কি ধরনের আলোচনা করবে তাও বুঝিয়ে দিলো। রাজকার্য শেষ করে এসারহাদ্দন—তখনও সে নিজেকে লাইলীই ভাবছে—অনেক গাধা সঙ্গে নিয়ে শিকার করতে চলে গেল। শিকার বেশ ভাল হলো। দুটো বুনো গাধা সে নিজে মারল, আর বাড়িতে ফিরে বন্ধুদের নিয়ে খেতে বসে ক্রীতদাসীদের নাচ দেখল। পরদিন দরবারে গিয়ে দেখল অনেক দরখাস্তকারী, দর্শনার্থী ও বিচারাধীন বন্দী তার জন্য অপেক্ষা করছে। সব কাজই সে যথারীতি সম্পন্ন করল। কাজ শেষ করে আবার সে ঘোড়ায় চেপে শিকারে চলে গেল। আবারও বেশ ভাল শিকার হলো : এবার সে নিজের হাতে একটি সিংহীকে মেরে তার বাচ্চা দুটোকে ধরল। শিকারের পরে আবার সে বন্ধুদের সঙ্গে পান-ভোজন করল, গান শুনল, নাচ দেখল, আর প্রিয়তমা পত্নীর সঙ্গে রাত কাটাল।

এইভাবে রাজকার্য ও সুখ-সম্ভোগের ভিতর দিয়ে অনেক দিন, অনেক সপ্তাহ কেটে গেল। যে সব রাজদূতকে রাজা এসারহাদ্দন (সে নিজেই)-এর কাছে পাঠিয়েছিল তাদের জন্য সে অপেক্ষা করতে লাগল। এক মাস পরে নাক-কান কাটা অবস্থায় তারা ফিরে এল।

রাজা এসারহাদ্দন হুকুম দিয়েছে, তারা যেন ফিরে গিয়ে রাজা লাইলীকে বলে দেয়—সে যদি অবিলম্বে সোনা, রূপো ও সাইপ্রেস-কাঠের উপঢৌকন তাকে না

পাঠায় এবং স্বয়ং এসে রাজা এসারহাদ্দনকে শ্রদ্ধা নিবেদন না করে, তাহলে রাজা লাইলীরও ঐ একই দশা করা হবে।

প্রাক্তন এসারহাদ্দন ও বর্তমান লাইলী পুনরায় রাজপুত্রদের ডেকে এ অবস্থায় কি করা উচিত সে বিষয়ে তাদের পরামর্শ চাইল। তারা সকলেই একবাক্যে বলল, এসারহাদ্দন তাদের আক্রমণ করবার আগেই তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করবে। রাজা সম্মত হলো; এবং স্বয়ং সৈন্যদলের পুরোভাগে থেকে অভিযান শুরু করল। সাত দিন অভিযান চলল। সৈন্যদের মনে সাহস জাগিয়ে তুলবার জন্য প্রতিদিন রাজা ঘোড়ায় চড়ে সৈন্যদল পরিদর্শন করত। অষ্টম দিনে একটা বিস্তীর্ণ উপত্যকায় তার সৈন্যদল এসারহাদ্দন-এর সৈন্যদলের মুখোমুখি হলো। উপত্যকার মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে একটা নদী। লাইলীর সৈন্যদল সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল; কিন্তু লাইলী—প্রাক্তন এসারহাদ্দন—দেখল, শত্রুসৈন্য পিঁপড়ের সারির মতো দলে দলে পাহাড় বেয়ে নেমে এসে উপত্যকা ছেয়ে ফেলেছে; তারা সংখ্যায় তার সৈন্যদলের চাইতে অনেক বেশি। সে তখন রথ চালিয়ে রণক্ষেত্রের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ল; শত্রুসৈন্যকে কচু-কাটা করতে লাগল। কিন্তু লাইলীর সৈন্য যদি এক শ' হয় তো এসারহাদ্দন-এর সৈন্য এক হাজার। লাইলী স্বয়ং আহত হয়ে বন্দী হলো। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় এসারহাদ্দন-এর সৈন্যদের পাহারায় সে নয় দিন ধরে অন্য বন্দীদের সঙ্গে পথ চলল। দশম দিনে নিনেভে-তে পৌঁছলে তাকে একটা খাঁচার মধ্যে রেখে দেওয়া হলো। ক্ষুধায় ও আঘাতে তার যত কষ্ট হলো তার চাইতে অনেক বেশি কষ্ট হতে লাগল লজ্জায় ও নিষ্ফল ক্রোধে। এত কষ্ট সয়েও শত্রুর উপর প্রতিহিংসা নিতে সে একান্তই অক্ষম। তার কষ্ট দেখে শত্রুরা যাতে মজা না পেতে পারে, শুধু এইটুকুই সে করতে পারে: তাই সে স্থির করল, সাহসের সঙ্গে সব কষ্ট সহ্য করবে; তারা যাই করুক না কেন, একটা কথাও বলবে না। বিশ দিন ধরে খাঁচার মধ্যে সে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগল। চোখের সামনে তার আত্মীয়-বন্ধুদের বধ্যভূমিতে নিয়ে যেতে লাগল; দণ্ডিতদের আর্তনাদ তার কানে ভেসে আসছে; কারও হাত-পা কেটে ফেলছে, কারও বা জ্যান্ত চামড়া তুলে নিচ্ছে; কিন্তু চঞ্চলতা, দুঃখ, বা ভয় কিছুই সে প্রকাশ করল না। সে আরও দেখতে পেল, দুটি কালো খোজা তার প্রিয়তমা পত্নীকে হাত-পা বেঁধে নিয়ে চলেছে। সে বুঝল, ক্রীতদাসী হিসাবেই তাকে এসারহাদ্দন-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একটি কথাও না বলে তাও সে সহ্য করল। কিন্তু জনৈক প্রহরী তাকে বলল, "আপনাকে দেখে আমার দুঃখ হচ্ছে লাইলী; ছিলেন রাজা, আর এখন কি হাল হয়েছে আপনার?" এ কথায় লাইলীর মনে পড়ে গেল, কী না সে হারিয়েছে। দুই হাতে খাঁচার শিক চেপে ধরে সে তার উপর মাথা ঠুকতে লাগল। কিন্তু এ ভাবে নিজেকে শেষ করে ফেলার মতো শক্তিও তখন তার ছিল না; হতাশায় আর্তনাদ করতে করতে সে খাঁচার মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

শেষ পর্যন্ত দুটি জল্লাদ এসে খাঁচার দরজা খুলল; তাকে পিঠ-মোড়া করে বেঁধে বধ্যভূমিতে নিয়ে গেল। বধ্যভূমিটা রক্তে ভাসছে। লাইলী দেখল, একটা ধারালো শূল বেয়ে রক্ত ঝরছে; হয়তো এইমাত্র তার কোনও বন্ধুর মৃতদেহ ওই শূল থেকে ছিঁড়ে বের করে নেওয়া হয়েছে; যাতে তাকেও ঐ একই শূলে চড়ানো যায় তার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারা লাইলীর পোশাক খুলে ফেলল। সে অবাক হয়ে গেল। একদা তার শরীর ছিল শক্ত ও সুন্দর; এখন সেটা কত শুকিয়ে গেছে। দুই জল্লাদ তার সরু উরু দুটি ধরে তাকে শূন্যে তুলে শূলে চড়াতে উদ্যত হলো।

"এই তো মৃত্যু, ধ্বংস!" এই কথা ভেবে সাহসের সঙ্গে সব কিছু সহ্য করবার সংকল্প ভুলে গিয়ে লাইলী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, করুণা ভিক্ষা করল। কিন্তু কেউ তাতে কান দিলো না।

সে ভাবতে লাগল, "কিন্তু এ তো হতে পারে না। নিশ্চয় আমি এখনও ঘুমিয়ে আছি। আর এটা একটা স্বপ্ন।" নিজের ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা সে করল; জেগেও উঠল; কিন্তু জেগে উঠে দেখল সে এসারহাদ্দনও নয়, লাইলীও নয়—সে এক ধরনের জন্তু। সে যে একটি জন্তু একথা জেনে সে অবাক হলো; সে আরও অবাক হলো এই ভেবে যে আগে সে এটা জানতই না।

একটা উপত্যকায় সে চরে বেড়াচ্ছে; দাঁত দিয়ে নরম ঘাস ছিঁড়ছে, আর লম্বা লেজটা দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে। তার চার পাশে পিঠে ডোরা-কাটা লম্বা লম্বা ঠ্যাং একটা গাঢ় ধূসর রঙের গাধার বাচ্চা লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। পিছনের পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে বাচ্চাটা এক দৌড়ে এসারহাদ্দন-এর কাছে ছুটে এল এবং ছোট শিং দিয়ে তলপেটে গুঁতো মেরে শান্ত হয়ে দুধ খেতে লাগল। এসারহাদ্দন এতক্ষণে বুঝতে পারল যে সে একটা গাধী, ওই বাচ্চাটার মা। এতে বিস্মিত বা দুঃখিত না হয়ে সে বরং খুসিই হলো। নিজের ও বাচ্চাটার জীবনে জীবন যুক্ত হওয়ায় একটা মধুর অনুভূতির অভিজ্ঞতা সে লাভ করল।

এমন সময় হঠাৎ কি যেন একটা হিস্-হিস্ শব্দ করে উড়ে এসে তার পেটে আঘাত করল; তখন তীক্ষ্ণধার মুখটা চামড়া কেটে তার মাংসের মধ্যে ঢুকে গেল। তীব্র যন্ত্রণায় এসারহাদ্দন—এখন সে তো একটা গাধী—বাচ্চাটার দাঁত থেকে বাঁট ছাড়িয়ে নিয়ে দুই কান নিচু করে পালের দিকে ছুটে গেল। তার পাশে পাশে বাচ্চাটাও লাফাতে লাফাতে ছুটল। তারা পালের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে এমন সময় আর একটা তীব দ্রুত এসে বাচ্চাটার গলায় বিঁধল। চামড়া কেটে মাংসের মধ্যে বসে গিয়ে তীরটা কাঁপতে লাগল। বাচ্চাটা আর্তনাদ করে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। এসারহাদ্দন সেটাকে ছেড়ে যেতে পারল না, বাচ্চাটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাচ্চাটা উঠতে চেষ্টা করল; সরু, লম্বা ঠ্যাঙগুলি কাঁপতে কাঁপতে আবার মাটিতে পড়ে গেল। একটা ভয়ংকর দো-পেয়ে জীব—একটা মানুষ—ছুটে এসে তার গলাটা কেটে ফেলল।

"এ তো হতে পারে না; আমি এখনও স্বপ্ন দেখছি!" এই কথা ভেবে এসারহাদ্দন জেগে ওঠার জন্য শেষ চেষ্টা করল। অবশ্যই আমি লাইলী নই, গাধী নই, এসারহাদ্দনও নই!

সে চিৎকার করে উঠল; আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সে জলাশয় থেকে মাথাটা তুলল।...বুড়ো মানুষটি তখনও তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে; কলসির শেষ জলের ফোঁটাগুলি তার মাথায় ঢালছে।

"উঃ, কী ভীষণ কষ্ট ভোগ করলাম। আর অনেক সময় ধরে।" এসারহাদ্দন বলে উঠল।

বুড়ো বলল, "অনেক সময়! এই তো সবে মাথাটা জলে ডুবিয়ে আবার তুললে। দেখনা, কলসির সবটা জল এখনও ফুরোয়নি। এখন বুঝেছ তো?"

এসারহাদ্দন জবাব দিলো না; শুধু সভয়ে বুড়ো মানুষটিব দিকে তাকিয়ে রইল।

বুড়ো বলতে লাগল, "এখন বুঝেছ তো তুমিই লাইলী, আবার যে সৈনিকদের তুমি মেরেছ তারাও তুমি? আর শুধু সেই সৈনিকরাই নয়, শিকারে গিয়ে যে সব প্রাণীকে মেরেছ ও তাদের মাংস দিয়ে ভোজ খেয়েছ, তারাও তুমি। তুমি মনে করতে, জীবন শুধু তোমার মধ্যেই আছে; সেই ভুলের পর্দা সবিয়ে দিয়ে আমি তোমাকে দেখিয়ে দিলাম যে অপরের অনিষ্ট করে তুমি নিজেরই অনিষ্ট কবেছ। সকলের মধ্যে আছে একই জীবনধারা, আর তোমার জীবন সেই জীবনধারারই একটি অংশমাত্র। আর তোমার সেই আংশিক জীবনটাকেই তুমি ভাল বা মন্দ করে গড়ে তুলতে পারো—তাকে বড় করতেও পারো, আবার ছোট কবতেও পারো। যে বেড়া তোমার জীবনকে অন্যের জীবন থেকে আলাদা করে রেখেছে তাকে ভেঙে ফেললে এবং অন্য সবাইকে নিজের মনে করে ভালবাসলে তবেই তোমার নিজের জীবনের উন্নতি হতে পারে। একমাত্র এই পথেই মহাজীবনে তোমার অংশকে তুমি বাড়িয়ে তুলতে পারো। যখন তোমার জীবনকেই একমাত্র জীবন বলে মনে করো এবং অপরের জীবনের বিনিময়ে নিজের জীবনের কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত হও, তখন তুমি নিজের জীবনেরই ক্ষতি কবো। সে পথে তোমার জীবন আরও ছোট হয়ে যায়। অপরের মধ্যে যে জীবনের বাসা তাকে ধ্বংস করা তোমার সাধ্যাতীত। যাদের তুমি হত্যা করেছ তাদের জীবন তোমার চোখের সম্মুখ থেকে অদৃশ্য হলেও তার ধ্বংস হয়নি। তুমি চেয়েছিলে তাদের জীবনকে সংক্ষিপ্ত করে তোমার জীবনকে দীর্ঘায়িত করতে, কিন্তু তা করতে তুমি পারো না। জীবন স্থান ও কালকে স্বীকার করে না। এক মুহূর্তের জীবন আর হাজার বছরের জীবন, তোমার জীবন এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য অন্য সব প্রাণীর জীবনই সমতুল্য। জীবনকে ধ্বংস করা, অথবা তার পরিবর্তন করা অসম্ভব, কারণ একমাত্র জীবনই সত্য। আর যা কিছু সবই আমাদের কাছেই শুধু সত্য বলে মনে হয়।"

এই কথা বলে বুড়ো মানুষটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরদিন সকালে এসারহাদ্দন আদেশ জারি করল, লাইলীসহ সব বন্দীদের মুক্তি দাও, আর সব রকম প্রাণদণ্ড বন্ধ করো।

তৃতীয় দিনে সে তার ছেলে আসুর-বাণী-পলকে ডেকে তার হাতে রাজ্যের ভার তুলে দিলো, আর যা কিছু সে শিখেছে তারই ধ্যানে দিন কাটাবার জন্য মরুভূমিতে চলে গেল। পরবর্তীকালে সে শহর ও গ্রামের পথে পথে ঘুরে মানুষকে এই শিক্ষা দিতে লাগল যে, সব জীবনই এক; আর মানুষ যখনই অন্যের ক্ষতি করতে চায় তখন আসলে সে নিজেরই ক্ষতি করে।

—১৯০৩

কাজ, মৃত্যু ও ব্যাধি

Work, Death and Sickness

(একটি উপকথা)

এই উপকথাটি দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত।

তারা বলে, ঈশ্বর প্রথমে মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছিলেন যাতে তাদের কোনও রকম কাজ করারই দরকার হতো না : তাদের ঘরবাড়ির প্রয়োজন ছিল না; পোশাক-আশাক বা খাদ্যেরও দরকার ছিল না; তারা সকলেই একশ বছর বাঁচত, আর ব্যাধি কাকে বলে তা জানত না।

কিছুদিন পরে ঈশ্বর যখন দেখতে এলেন মানুষ কি ভাবে বেঁচে আছে, তখন তিনি দেখলেন, জীবনে সুখী হওয়ার পরিবর্তে তারা পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করছে এবং প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে যাতে জীবনকে ভোগ করা তো দূরের কথা, তারা জীবনকে অভিশাপ দিচ্ছে।

তখন ঈশ্বর নিজের মনে বললেন, "এরা প্রত্যেকেই যার যার মতো করে আলাদাভাবে বাঁচতে চাইছে বলেই এ রকমটা ঘটেছে।" তাই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য তিনি এমন ব্যবস্থা করলেন যাতে মানুষের পক্ষে কাজ না করে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল। শীতে ও ক্ষুধায় কষ্ট পাবার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য মানুষকে তখন বাধ্য হয়ে ঘরবাড়ি বানাতে হলো, জমি চাষ করতে হলো, আর ফল ও ফসল জন্মাতে ও সংগ্রহ করতে হলো।

ঈশ্বর ভাবলেন, "কাজের ভিতর দিয়ে তারা এক হবে। যন্ত্রপাতি তৈরি করা, কাঠ

কেটে তাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়া, বাড়ি তৈরি করা, ফসল বোনা ও কাটা, সুতো কাটা ও কাপড় বোনা, পোশাক তৈরি করা—এ সব কাজ তো আর প্রত্যেকে আলাদা আলাদা করতে পারবে না।

"এ থেকেই তারা বুঝতে পারবে যে যত তারা মিলেমিশে কাজ করবে, তত বেশি জিনিস তারা পাবে, ততই তারা ভালভাবে বাঁচতে পারবে, আর এই ভাবেই তারা ঐক্যবদ্ধ হবে।"

দিন যায়। ঈশ্বর আবার দেখতে এলেন, মানুষ কেমন আছে, আর এখন তারা সুখী হয়েছে কি না।

কিন্তু দেখলেন, তাদের অবস্থা আগের চাইতেও খারাপ হয়েছে। তারা একসঙ্গে কাজ করছে বটে (না করে যে উপায় নেই), কিন্তু সকলে মিলেমিশে নয়, ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে। প্রত্যেক দলই চেষ্টা করছে অন্য দলের কাজ ছিনিয়ে নিতে, অন্য দলের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে, ঝগড়া-বিবাদ করে সময় ও শক্তির অপচয় করছে, আব ফলে সকলেরই দিনকাল খারাপ যাচ্ছে।

এই দুরবস্থা দেখে তিনি স্থির করলেন, এমন ব্যবস্থা করবেন যাতে মানুষ তার মৃত্যুর সময় জানতে পারবে না, যে কোনও সময় তার মৃত্যু হতে পারে; আব সে কথা তিনি সকলকে জানিয়ে দিলেন।

ঈশ্বর ভাবলেন, "প্রতিটি মানুষ যে কোনও মুহূর্তে মারা যেতে পারে এ-কথা জানবার পরে ক্ষণস্থায়ী লাভের পিছনে ছুটতে গিয়ে মানুষ তার জীবনের নির্দিষ্ট সময়টুকু নষ্ট করবে না।"

কিন্তু ফল হলো বিপরীত। মানুষ কেমন আছে দেখবার জন্য ঈশ্বর যখন আবার এলেন তখন দেখলেন, তাদের অবস্থা আগের মতোই খারাপ।

মানুষ তো যে কোনও সময়ই মরতে পারে এই সত্যের সুযোগ নিয়ে শক্তিমান মানুষরা দুর্বল মানুষদের পদানত করে রাখল; কাউকে হত্যা করল, আবার কাউকে বা মৃত্যুর ভয় দেখাল। আর ফল দাঁড়াল—শক্তিমান মানুষ ও তাদের বংশধররা কোনও কাজই করে না; সীমাহীন আলস্যে তাদের জীবন ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে; আব যারা দুর্বল তাদের শক্তির অতিরিক্ত কাজ করতে হয় বলে তারা বিশ্রামের অভাবে কষ্ট পায়। তাই একদল অন্য দলকে ভয় করে, ঘৃণা করে। আর মানুষের জীবন আরও অসুখী হয়ে ওঠে।

এই সব দেখে অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য ঈশ্বর তাঁর শেষ পন্থার আশ্রয় নিলেন; সব রকম রোগ-ব্যাধি মানুষের মধ্যে পাঠিয়ে দিলেন। ঈশ্বর ভাবলেন, সব মানুষই যখন রোগ-ব্যাধির শিকার হতে পারে তখন যারা সুস্থ থাকবে তারা নিশ্চয়ই রোগগ্রস্তদের দয়া করবে, তাদের সাহায্য করবে, কারণ তারা জানবে যে তাহলেই নিজেরা অসুস্থ হলে অপর লোক তাদের সাহায্য করতে আসবে।

এই ব্যবস্থা করে ঈশ্বর আবার চলে গেলেন; ব্যাধির শিকার হবার ফলে মানুষ এখন কেমন আছে সেটা দেখবার জন্য তিনি যখন আবাব এলেন তখন মানুষের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়েছে। যে রোগ-ব্যাধি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করবে বলে ঈশ্বর ভেবেছিলেন তার ফলে মানুষে মানুষে ভেদ আরও বেড়ে গেছে। যে শক্তিমান মানুষরা অন্যাকে দিয়ে নিজেদের কাজ করিয়ে নিতো, রোগগ্রস্ত হলে তারাই তাদের সেবা শুশ্রূষা করতেও বাধ্য করে; কিন্তু অন্যরা অসুস্থ হলে তারা তাদের সেবা করে না। আর এইভাবে যারা শক্তিমান অসুস্থ লোকদের সেবা করতে বাধ্য হয় তারা অতিরিক্ত কাজের চাপে এতই ক্লান্ত হযে পড়ে যে নিজের আত্মীয়-পরিজন অসুস্থ হলেও তাদের দেখাশুনা করবার সময় পায় না; ফলে তারা বিনা শুশ্রূষায়ই রোগে ভুগতে থাকে। রুগ্ন মানুষদের দুর্দশা দেখে ধনীদের সুখের যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেজন্য গরীব মানুযরা যেখানে রোগে ভুগে মারা যায় সে সব বাড়িঘর তৈরি কবা হয় ধনীদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে; ফলে যে সব আত্মীয়-পরিজনের সহানুভূতি তাদের অসুস্থ জীবনকে কিছুটা আনন্দময় করে তুলতে পারত তা থেকে বঞ্চিত হয়ে ভাড়াটে লোকের সহানুভূতিহীন বিরক্তিজনক সেবার উপর নির্ভর করেই তাদের রোগে ভুগে মবতে হয়। তার উপরে কিছু রোগকে সংক্রামক মনে করে পাছে তাদের ছোঁয়াচ লাগে এই ভয়ে মানুষ তাদের সঙ্গ তো পরিহাব করেই, এমন কি সেই সব রোগীদের যারা সেবা কবে তাদের কাছ থেকেও দূরে সবে থাকে।

তখন ঈশ্বর নিজেব মনে বললেন, "এ পথেও যখন মানুষ বুঝল না কিসে তাদের সুখ হবে, তখন তারা কষ্টের ভিতর দিয়েই সে শিক্ষা পাক।" ঈশ্বব সেই থেকে মানুষকে তার নিজের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন।

এইভাবে ঈশ্বর কর্তৃক পরিত্যক্ত অবস্থায় অনেক কাল কাটিয়ে তবে মানুষ বুঝল যে তাদের সকলেরই সুখী হওয়া উচিত এবং সুখী হতে তারা পারে। অতি সম্প্রতিকালে কিছু কিছু মানুষ বুঝতে শুরু করেছে, কাজ যেন কখনও কারও ভয়ের ও ক্রীতদাসত্বের রূপ নিয়ে না আসে; কাজ হবে সকলের পক্ষে সমান সুখের কারণ, সকলকে করবে ঐক্যবদ্ধ। তারা আরও বুঝতে শুরু করেছে, মৃত্যু যখন নিয়ত আমাদের শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে তখন জীবনের নির্দিষ্ট প্রতিটি বছর, মাস, ঘণ্টা ও মিনিটকে ঐক্যে ও প্রেমে অতিবাহিত করাই প্রতিটি মানুষের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত কাজ হওয়া উচিত। তারা বুঝতে শুরু করেছে, ব্যাধি মানুষকে দূরে সরিয়ে না দিয়ে বরং পরস্পরকে ভালবাসার বন্ধনে বেঁধে দেবার সুযোগ করে দেবে।

—১৯০৩

তিনটি প্রশ্ন

Three Questions

একদা এক রাজার মনে হলো, কোনও কাজ আরম্ভ করবার সঠিক সময় যদি সে জানতে পারত, কাদের পরামর্শ শুনবে আর কাদের এড়িয়ে চলবে, এবং সবশেষে যদি সে জানতে পারত কোন্ অবস্থায় কোন্ কাজটা করা জরুরী, তাহলে কোনও কাজে হাত দিয়ে তাকে বিফল হতে হতো না।

এই কথা মনে হতেই রাজা তার রাজ্যময় ঘোষণা কবে দিলো, যে লোক তাকে বলে দিতে পারবে প্রত্যেক কাজের সঠিক সময় কখন, কোন্ মানুষ সব চাইতে বেশি দরকারী এবং কেমন করে সে জানতে পারবে কোন্ কাজটা সব চাইতে জরুরী তাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে।

নানা জ্ঞানীজন বাজার কাছে এল; কিন্তু তাবা সকলেই তার প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন জবাব দিলো।

প্রথম প্রশ্নেব জবাবে কেউ বলল, প্রতিটি কাজের সঠিক সময় জানতে হলে দিন, মাস ও বছর অনুযায়ী একটা কর্মসূচী আগাম তৈরি করে নিয়ে জীবনে সেটাকে কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। একমাত্র এইভাবেই প্রতিটি কাজ করা সম্ভব। অবার কেউ বলল, প্রতিটি কাজের সঠিক সময় আগে থেকে স্থির করা অসম্ভব; কিন্তু অলস আমোদ-প্রমোদে ডুবে না থেকে সর্বদা ঘটনা-প্রবাহের উপর লক্ষ্য রেখে সব চাইতে দরকারী কাজটা কবাই কর্তব্য। আবার কেউ কেউ বলল, ঘটনা-প্রবাহ সম্পর্কে রাজা যতই অবহিত থাকুক না কেন প্রতিটি কাজেব সঠিক সময় নির্ধারণ করা কোনও একজন লোকের পক্ষে কখনও সম্ভব নয়; কাজেই প্রতিটি কাজের সঠিক সময় স্থির করে দিতে পারে এ রকম একটি জ্ঞানী-পরিষদ তাকে গঠন করতে হবে।

আবার অন্যরা একথাও বলল যে, এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলিকে জ্ঞানী-পরিষদের সামনে উপস্থিত করবার সময়ই পাওয়া যায় না, যেগুলি সম্পর্কে সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে ফেলতেই হবে। কিন্তু সে সব বিষয়. .সম্পর্কে মনস্থির করতে হলে কি ঘটবে সেটা আগে থেকেই জানা দরকার। একমাত্র যাদুকরদের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

দ্বিতীয় প্রশ্নেরও ঐ বকম ভিন্ন ভিন্ন জবাব পাওয়া গেল। কেউ বলল, রাজার সব চাইতে দরকারী লোক তার মন্ত্রীরা; কেউ বলল পুরোহিতরা; কেউ বলল চিকিৎসকরা; আবার কেউ বলল যোদ্ধারাই সব চাইতে বেশি দরকারী।

কোন্ কাজটা সব চাইতে জরুরী সে প্রশ্নের জবাবে কেউ বলল, জগতে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিজ্ঞান; কেউ বলল রণ-কৌশল; আবার কেউ বলল, ধর্মোপাসনা।

ভিন্ন ভিন্ন উত্তর পাওয়াতে রাজা কোনটার সঙ্গেই একমত হলো না এবং কাউকেই পুরস্কারও দিলো না। তবু নিজের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর জানবার বাসনায় রাজা স্থির করল, গভীর জ্ঞানের জন্য সর্বত্র পরিচিত এক সাধুর সঙ্গে পরামর্শ করবে।

সাধু বাস করত এক বনেব মধ্যে; সাধাবণ মানুষ ছাড়া কারও সঙ্গে সে দেখা করত না। কাজেই রাজা সাধারণ পোশাক পরল, সাধুর কুটীরে পৌছবার আগে ঘোড়া থেকে নামল, এবং দেহরক্ষীকে রেখে একাই সেখানে গেল।

রাজা যখন হাজির হলো তখন সেই সাধু কুটীরের সামনে মাটি কাটছিল। রাজাকে দেখে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সে আবার মাটি কাটতে লাগল। সাধু যেমন দুর্বল, তেমনই ক্ষীণপ্রাণ; যতবার মাটিতে কোদাল বসিয়ে কিছুটা মাটি সরাচ্ছে ততবারই সে ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছে।

রাজা তার কাছে গিয়ে বলল, "বিজ্ঞ সাধু, আমি আপনার কাছে এসেছি তিনটি প্রশ্নের উত্তর জানতে: ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করতে শিখব কেমন করে? কোন্ মানুষকে আমার সব চাইতে বেশি দরকার, আর অপরের চাইতে কোন্ মানুষেব প্রতিই বা আমি বেশি মনোযোগ দেব; আর, কোন্ কাজ সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং তদনুযায়ী সর্বাগ্রে মনোযোগের যোগ্য?"

সাধু মনোযোগ দিয়ে রাজার কথা শুনল, কিন্তু কোনও জবাব দিলো না। শুধু হাতে থুথু লাগিয়ে আবার মাটি কোপাতে শুরু করল।

রাজা বলল, "আপনি পরিশ্রান্ত; আমাকে কোদালটা দিন, আমি কিছুক্ষণ আপনার কাজটা করে দিচ্ছি।"

"ধন্যবাদ", বলে সাধু রাজাব হাতে কোদালটা দিয়ে মাটিতে বসল।

দুই সারি মাটি কুপিয়ে রাজা কাজ থামিয়ে আবার প্রশ্নগুলি করল। সাধু এবারও কোনও জবাব দিলো না, উঠে দাঁড়িয়ে কোদাল নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে বলল :

"এবার আপনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন—আমি ততক্ষণ কাজ করছি।"

কিন্তু রাজা কোদালটা তাকে নি দিয়ে নিজেই মাটি কাটতে লাগল। এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল; পরে আরও এক ঘণ্টা। সূর্য গাছের আড়ালে অস্ত যাচ্ছে। রাজা তখন কোদাল দিয়ে মাটিতে একটা কোপ বসিয়ে বলল, "বিজ্ঞ সাধু, আমার প্রশ্নের জবাবের জন্যই আমি আপনার কাছে এসেছিলাম। যদি উত্তর না দিতে পারেন তো বলে দিন, আমি বাড়ি ফিরে যাই।"

"কে যেন এই দিকে ছুটে আসছে," সাধু বলল, "দেখা যাক লোকটা কে।"

রাজা মুখ ফিরিয়ে দেখল একটি গোঁফওয়ালা লোক বনের ভিতর থেকে ছুটে

আসছে। লোকটি দুই হাতে পেটটা চেপে ধরে আছে আর সেখান থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে। রাজার কাছে পৌঁছেই সে অস্ফুট আর্তনাদ করতে করতে মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। রাজা ও সাধু মিলে তার পোশাক খুলে ফেলল। তার তলপেটে মস্ত একটা ক্ষতচিহ্ন। রাজা সাধ্যমতো সেটাকে ধুইয়ে দিয়ে নিজের রুমাল ও সাধুর দেওয়া তোয়ালে দিয়ে বেঁধে দিলো। কিন্তু রক্ত পড়া বন্ধ হলো না। রাজা বার বার গরম রক্তে ভেজা পটিগুলো বদলে দিয়ে ক্ষতটা ভাল করে ধুয়ে আবার বেঁধে দিতে লাগল। অবশেষে রক্ত বন্ধ হলে লোকটির জ্ঞান ফিরে এল; সে জল খেতে চাইল। রাজা জল এনে তাকে খেতে দিলো। ইতিমধ্যে সূর্য ডুবে গেছে; একটু ঠাণ্ডা পড়েছে। কাজেই সাধুর সহায়তায় রাজা লোকটিকে তুলে কুটীরের ভিতর নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলো। বিছানায় শুয়ে লোকটি চোখ বুজে চুপ করে রইল। কিন্তু হাঁটাহাঁটি ও কাজের ফলে রাজা এতই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল যে চৌকাঠের উপর গুড়িসুড়ি মেরে বসে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল—গ্রীষ্মের ছোট রাত গভীর ঘুমের মধ্যেই কেটে গেল। সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন সে কোথায় আছে বা ঐ যে অপরিচিত গোঁফওয়ালা লোকটি বিছানায় শুয়ে চকচকে চোখ মেলে একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে সেই বা কে—এ সব মনে করতে তার বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল।

রাজা জেগে উঠে তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে গোঁফওয়ালা লোকটি ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, "আমাকে ক্ষমা করুন!"

রাজা বলল, "আমি আপনাকে চিনি না, কাজেই ক্ষমা করবারও কিছু নেই।"

"আপনি আমাকে চেনেন না, কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। আমি আপনার শত্রু। আপনি আমার ভাইকে প্রাণদণ্ড দিয়ে তার সম্পত্তি দখল করে নিয়েছেন। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আপনার উপরে তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব। আমি জানতে পেরেছিলাম, আপনি একা সাধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তাই স্থির করেছিলাম, ফেরার পথে আপনাকে খুন করব। কিন্তু দিন কেটে গেল, আপনি ফিরলেন না। তাই আপনার খোঁজে গুপ্ত আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এলাম। আপনার দেহরক্ষীর সঙ্গে দেখা হতেই তারা আমাকে চিনতে পেরে আঘাত করল। তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এলাম। কিন্তু আপনি আমার ক্ষতস্থান বেঁধে না দিলে রক্তপাতের ফলেই আমার মৃত্যু হতো। আমি চেয়েছিলাম আপনাকে খুন করতে, আর আপনি আমার প্রাণ বাঁচালেন। এখন যদি বেঁচে উঠি, আর আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহলে আপনার একান্ত বিশ্বস্ত দাস হয়ে আপনার সেবা করব, আর আমার ছেলেদেরও তাই করতে বলব। আমাকে ক্ষমা করুন!"

শত্রুর সঙ্গে এত সহজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং তাকে একজন বন্ধু হিসাবে পাওয়ায় রাজা খুব খুসি হলো; সে তাকে ক্ষমা তো করলই, আরও বলল, তার সেবা করবার জন্য নিজের চাকরদের ও নিজস্ব চিকিৎসককে তার কাছে পাঠিয়ে দেবে এবং তার সম্পত্তিও ফিরিয়ে দেবে।

আহত লোকটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজা বারান্দায় বেরিয়ে সাধুর খোঁজ করতে লাগল। তার ইচ্ছা, ফিরে যাবার আগে আর একবার তার প্রশ্নের জবাব জানতে চাইবে। কুটীরের বাইরে উপুর হয়ে বসে সাধু আগের দিনে তৈরি করা জমিতে বীজ বুনছিল।

তার কাছে এগিয়ে গিয়ে রাজা বলল :

"এই শেষ বারের মতো মিনতি করছি, দয়া করে আমার প্রশ্নগুলির জবাব দিন।"

সরু পায়ের উপর ভর দিয়ে বসেই রাজার দিকে তাকিয়ে সাধু বলল, "আপনার প্রশ্নের জবাব তো আগেই পেয়ে গেছেন!"

"কি করে জবাব পেলাম? আপনি কি বলছেন?" রাজা জিজ্ঞাসা করল।

সাধু জবাব দিলো. "আপনি বুঝতে পারেননি। কাল আমাকে দুর্বল দেখে যদি আপনার করুণা না হতো, আমার হয়ে যদি মাটি না কোপাতেন, ও নিজের পথে ফিরে যেতেন, তাহলে ঐ লোকটি আপনাকে আক্রমণ করত, আর আমার এখানে না থাকার জন্য আপনাকে অনুতাপ করতে হতো। কাজেই আপনি যখন মাটি কোপাচ্ছিলেন সেটাই ছিল সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত; আর আমি ছিলাম সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, আর আমার উপকার করাটাই ছিল আপনার পক্ষে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পরবর্তী সময়ে লোকটি যখন ছুটে আমাদের কাছে এল, তখন আপনি যে তার সেবা করছিলেন সেটাই ছিল সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সময়, কারণ আপনি তার ক্ষতস্থান বেঁধে না দিলে আপনার সঙ্গে মিটমাট হবার আগেই সে মারা যেত। কাজেই তখন সেই ছিল সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ লোক, আর তার জন্য আপনি যা করেছেন সেটাই আপনার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অতএব মনে রাখবেন : একটিমাত্র সময়ই গুরুত্বপূর্ণ—বর্তমান! এটাই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটাই একমাত্র সময় যার উপর আপনার অধিকার আছে। সেই মুহূর্তে যার সঙ্গে আপনি থাকবেন সেই সব চাইতে দরকারী লোক, কারণ আর কারও সঙ্গে আপনাকে চলতে হবে কি না তা কেউ জানে না : আর সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ তারই কল্যাণ করা, কারণ একমাত্র সেই উদ্দেশ্যেই মানুষকে এই জীবন দেওয়া হয়েছে!"

—১৯০৩

খরচ বড় বেশি!

Too Dear!

গী দ্য মপাসার একটি গল্প অবলম্বনে

ভূমধ্য সাগরের তীরে ফ্রান্স ও ইতালির সীমান্তের নিকটে মোনোকো নামে একটি অতি ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। অনেক ছোট মফস্বল শহরই এই রাজ্যটির চাইতে বেশি জনসংখ্যার দাবী করতে পারে, কারণ সেখানকার মোট জনসংখ্যা মাত্র সাত হাজারের মতো, আর রাজ্যের সমস্ত জমি অধিবাসীদের মধ্যে ভাগ করে দিলে প্রত্যেকের ভাগে এক একরও জুটবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই খেলনা রাজ্যেরও একজন সত্যিকারের ক্ষুদে রাজা আছে; আছে রাজপ্রাসাদ, সভাসদবর্গ, সচিবগণ, বিশপ, সেনাপতি ও একটি সেনাবাহিনী।

সৈন্যদলটি বড় নয়, সৈন্য-সংখ্যা মাত্র ষাট, তবু সেনাদল তো বটে। অন্য সব জায়গার মতো এখানেও আছে নানা রকম কর . তামাকের উপর কর, সদ্যজাতীয় পানীয়ের উপর কর এবং মাথা-গুণ্‌তি কর। যদিও অন্য সব দেশের মতোই সেখানকার লোকরাও মদ ও ধূমপান করে, তবু সেখানকার লোকসংখ্যা এতই কম যে একটি নতুন ও বিশেষ ধরনের রাজস্বের ব্যবস্থা না করলে সভাসদ, কর্মচারী ও নিজের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা রাজার পক্ষে শক্ত হয়ে পড়ত। এই বিশেষ রাজস্ব আসে একটি জুয়ার আড্ডা থেকে; সেখানে সকলে 'রুলেত্‌' খেলে। লোকে সেখানে জুয়া খেলে; তারা হারুক বা জিতুক আড্ডার পরিচালক শতকরা হিসাবে একটা মুনাফা পায় আর সেই লভ্যাংশের একটা বড় অংশ সে রাজাকে দেয়। ইওরোপে এখন এইটিই এ ধরনের একমাত্র জুয়ার আড্ডা বলেই সেটা থেকে রাজা এত বেশি টাকা পেয়ে থাকে। কিছু কিছু ছোটখাট জার্মান নৃপতিরও এই ধরনের জুয়ার আড্ডা ছিল, কিন্তু কয়েক বছর আগে সেগুলি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই সব জুয়ার আড্ডা অনেক ক্ষতি করত বলেই সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একটি লোক হয়তো এল, ভাগ্য-পরীক্ষা করল, তার যা কিছু ছিল বাজি ধরে সর্বস্ব হারল, তারপর যে টাকা তার নিজস্ব নয় সেটা বাজি ধরেও হেরে গেল, আর তারপর হতাশ হয়ে হয় নদীতে ডুবে মরল, নয়তো নিজেকেই গুলি করে বসল। কাজেই শাসকরা যাতে এ পথে টাকা উপার্জন করতে না পারে জার্মানরা সেই ব্যবস্থাই করল। কিন্তু মোনাকো-র রাজাকে বাধা দেবার কেউ ছিল না, কাজেই এই একচেটিয়া ব্যবসাটা তার হাতেই রয়ে গেছে।

কাজে কাজেই এখন যারই জুয়া খেলবার ইচ্ছা হয় সেই মোনাকো-তে চলে যায়। তারা হারুক আর জিতুক, রাজা যথারীতি লাভবান হয়।

প্রবাদ আছে, "সৎপথে পরিশ্রম করে কখনও পাথরের রাজপ্রাসাদ বানানো যায় না"; মোনাকো-র ক্ষুদে রাজা জানে যে কাজটা নোংরা, কিন্তু তার উপায় কি? তাকে তো বাঁচতে হবে; মদ ও তামাক থেকে রাজস্ব আদায় করাও তো ভাল কাজ নয়। এই করেই তো সে বেঁচে আছে, রাজত্ব করছে, টাকা উপার্জন করছে, এবং সত্যিকারের রাজার মতো জাঁকজমকের সঙ্গেই দরবারে বসছে।

তার রাজ্যে অভিষেক হয়, দরবার বসে; সেও পুরস্কার দেয়. দণ্ড বিধান করে, ক্ষমাও করে; রাজকার্যের পর্যালোচনার ব্যবস্থা আছে, পবিষদ আছে, আইন আছে, বিচারালয় আছে : অন্য সব রাজারাজরার মতোই সব কিছু আছে, শুধু একটু ছোট মাপের এই যা তফাৎ।

এদিকে হলো কি. কয়েক বছর আগে এই খেলনা বাজাব রাজত্বে একটা খুন হলো। রাজ্যেব অধিবাসীবা সকলেই শান্তিপ্রিয়; এ ধবনের ঘটনা সেখানে আগে কখনও ঘটেনি। রীতিমতো আনুষ্ঠানিকভাবে বিচারকরা সমবেত হয়ে আইন অনুসারে মামলার বিচাব কবল। বিচাবক এলো, উকিল এলো. জুরি এলো, ব্যারিস্টার এলো। তারা অনেক তর্ক-বিতর্ক করল, বিচার বিবেচনা করল, এবং শেষ পর্যন্ত আইনের নির্দেশ মতো অপরাধীর মুণ্ডচ্ছেদের দণ্ড বিধান কবল। খুব ভাল কথা। তারপব তার সেই দণ্ডাজ্ঞা রাজাব কাছে পাঠাল। রাজা দণ্ডাদেশ পড়ে সমর্থন কবল। "লোকটির প্রাণদণ্ড যদি দিতেই হয় তো দেওয়া হোক।"

এ ব্যাপাবে কিন্তু একটিমাত্র অসুবিধা দেখা দিলো; তাদের না ছিল মুণ্ড কাটবার মতো গিলোটিন. আর না ছিল কোনও জল্লাদ। অনেক বিচার-বিবেচনা করে সচিবগণ স্থির করল, ফরাসী সরকারের কাছে এই মর্মে আবেদন কবা হোক যে তারা অপরাধীর মুণ্ডচ্ছেদ করবার মতো একটা যন্ত্র ও একজন বিশেষজ্ঞকে ধাব দিতে পারে কিনা, এবং পারলে তার দরুন কত খরচ পড়বে দয়া করে সেটা জানাক। চিঠি পাঠানো হলো। এক সপ্তাহ পরে জবাব এল : একটি যন্ত্র ও একজন বিশেষজ্ঞ পাঠানো যেতে পারে, আর সে জন্য খরচ পড়বে ১৬,০০০ ফ্রাঁ। জবাবটা বাজার সামনে পেশ করা হলো। রাজা অনেক ভাবল। ষোল হাজার ফ্রাঁ! সে বলল, "হতভাগাটার দাম এত হতে পারে না। আবও সস্তায় কি কাজটা করা যায় না? আরে, ১৬,০০০ ফ্রাঁ খরচ হলে তো সারা দেশের জনপ্রতি দু' ফ্রাঁ-র বেশি খরচ পড়বে! প্রজারা কিছুতেই তা সহ্য করবে না; ফলে একটা দাঙ্গা বেঁধে যেতে পারে!"

কাজেই এ অবস্থায় কি কর্তব্য স্থির করবার জন্য পরিষদকে ডাকা হলো। সেখানে স্থির হলো, ইতালীর বাজার কাছে অনুরূপ আবেদন পাঠানো হোক। ফরাসী সরকার প্রজাতন্ত্রবাদী, কাজেই রাজাদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল নয়; কিন্তু ইতালীর রাজা আর

এক সহোদরপ্রতিম রাজা, কাজেই সে হয় তো সস্তায় কাজটা করে দিতে পারে। তাকে চিঠি লেখা হলো, আর চটপট জবাবও পাওয়া গেল।

ইতালীয় সরকার লিখে জানাল, আনন্দের সঙ্গেই তারা একটি যন্ত্র ও একজন বিশেষজ্ঞকে পাঠাবে, আর যাতায়াতসহ মোট খরচ পড়বে ১২,০০০ ফ্রাঁ। এটা অনেক সস্তা, কিন্তু তবু বড়ই বেশি। ঐ বদমাশটার জন্য এত টাকা খরচ করা চলে না। এর অর্থই দাঁড়াবে জনপ্রতি আরও প্রায় দু ফ্রাঁ করে করবৃদ্ধি। আব একটি পরিষদ ডাকা হলো। আরও কম খরচে কাজটা কি করে করা যায় তাই নিয়ে অনেক আলোচনা ও চিন্তা-ভাবনা করা হলো। ধরা যাক, কোনও একটি সৈন্যকে দিয়ে কি সাদামাটাভাবে কাজটা করানো যায় না? সেনাপতিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হলো : "এই লোকটার মুণ্ডুটা কেটে ফেলতে পারে এমন একজন সৈনিক কি তুমি দিতে পারো না? যুদ্ধে তো তারা অনেক লোকজন মেরে থাকে। আসলে, সেই কাজের জন্যই তো তাদের তালিম দেওয়া হয়।" তখন সেনাপতি সৈনিকদের নিয়ে আলোচনায় বসল, তাদের মধ্যে কেউ এই কাজের ভার নিতে রাজি কি না সেটা জানতে। কিন্তু সৈন্যবা কেউ রাজি হলো না। বলল, "না, এ কাজ কি ভাবে করতে হয় তা আমরা জানি না; এ ধরনের কাজ তো আমাদের শেখানো হয়নি।"

কি করা যায়? সচিবগণ আবার পুনর্বিবেচনায় বসল। তারা একটি কমিশন বসাল; পরে একটা কমিটি ও একটা সাব-কমিটি বসাল, এবং শেষ পর্যন্ত স্থির করল, মৃত্যুদণ্ড পরিবর্তন করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করাই শ্রেষ্ঠ পথ। এতে রাজা ক্ষমা প্রদর্শনও করতে পাববে, আর খরচও অনেক কম পড়বে।

রাজাও এতে সম্মতি দিলো এবং সেই মতো ব্যবস্থাই করা হলো। তখন একমাত্র অসুবিধা দেখা দিলো, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত লোকের মতো কোনও কারাগার সেখানে ছিল না। লোকদের সাময়িকভাবে আটক করে রাখবার মতো একটা হাজত সেখানে ছিল, কিন্তু স্থায়ীভাবে বসবাস করবার মতো শক্তপোক্ত কোনও কারাগার ছিল না। যা হোক, প্রয়োজনীয় একটা জায়গা খুঁজেপেতে যুবকটিকে সেখানে রেখে একজন রক্ষীর ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো। অপরাধীকে পাহারা দেওয়া এবং প্রাসাদের রান্নাঘর থেকে তার খাবার এনে দেওয়াই রক্ষীর কাজ।

বন্দী লোকটি মাসের পর মাস সেখানে কাটাতে লাগল। বছর পার হয়ে গেল। বৎসরান্তে ক্ষুদে রাজা একদিন বসে বসে আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করতে করতে ব্যয়ের একটা নতুন দফা দেখতে পেল। সেটা হলো সেই অপরাধীর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়, আর ব্যয়ের অংকটা খুব ছোটও নয়। একটি বিশেষ রক্ষী ও লোকটির আহারাদির ব্যয় বছরে ৬০০ ফ্রাঁ-রও বেশি। ব্যাপারটা আরও শোচনীয় এই জন্য যে, লোকটি এখনও যুবক এবং আরও পঞ্চাশ বছর বেঁচে থাকতে পারে। সে সব হিসেব করলে তো গুরুতর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। এ তো চলতে পারে না। সুতরাং রাজা সচিবগণকে ডেকে বলল,

"এই বদমাশটার জন্য আরও শস্তায় কোনও ব্যবস্থা তোমাদের করতে হবে। বর্তমান ব্যবস্থাটা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য।" সচিবরা একত্র মিলিত হয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তা করল। শেষে একজন বলল, "ভদ্রজনরা, আমার মতে রক্ষীটাকে বরখাস্ত করা হোক।" তখন অন্য সচিব বলল, "কিন্তু তাহলে যে লোকটা পালিয়ে যাবে।" প্রথম বক্তা বলল, "বেশ তো, পালিয়ে গিয়ে ফাঁসিতে ঝুলুক!" ক্ষুদে রাজার কাছে গিয়ে তারা সব কথা নিবেদন করল, আর রাজাও তাদের মতে সায় দিলো। রক্ষীকে বরখাস্ত করা হলো; তারপর কি ঘটে দেখবার জন্য তারা অপেক্ষা করতে লাগল। মোদ্দা এই ঘটল যে, দুপুরের খাবার সময় বাইরে বেরিয়ে এসে রক্ষীকে দেখতে না পেয়ে বন্দী নিজেই খাবার আনতে রাজার রান্নাঘরে চলে গেল। যা পেল তাই নিয়ে কারাগারে ফিরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে ভিতরে থেকে গেল। পরদিনও সেই একই ঘটনা ঘটল। যথাসময়ে সে খাবার আনতে গেল, কিন্তু পালিয়ে যাবার তিলমাত্র লক্ষণও তার মধ্যে দেখা গেল না। কি করা যায়? বিষয়টা নিয়ে তারা আবার ভাবতে বসল।

বলল, "ওকে সরাসরিই বলে দিতে হবে যে তাকে আমরা রাখতে চাই না।" সেই অনুসারে বিচারবিভাগীয় মন্ত্রী তাকে ডেকে পাঠাল।

"তুমি কেন পালিয়ে যাচ্ছ না? তোমাকে রাখবার মতো রক্ষী আমাদের নেই। তুমি যেখানে খুসি যেতে পারো; তাতে রাজা কিছু মনে করবেন না।"

লোকটি জবাব দিলো, "রাজা যে কিছু মনে করবেন না তা আমিও ভালই জানি, কিন্তু আমার যে যাবার জায়গা নেই। আমি কি করতে পারি? দণ্ড দিয়ে আপনারা আমার চরিত্র নষ্ট করেছেন; লোকে আমাকে দেখলেই মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাছাড়া, আমার কাজকর্মের অভ্যাসও চলে গেছে। আপনারা আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছেন। এটা ঠিক নয়। প্রথমত, একবার যখন আপনারা আমার প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন তখন সে দণ্ডাদেশ কার্যকরী করাই আপনাদের উচিত ছিল; কিন্তু তা আপনারা করেননি। এই হলো এক দিক। তা নিয়ে আমি কোনও অভিযোগ করিনি। তারপব আমাকে আজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে আমার খাবার এনে দেবার জন্য একটি রক্ষী মোতায়েন করলেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই তাকে সরিয়ে দিলেন, আর আমাকেই আমার খাবার আনতে হতো। তবু আমি কোনও নালিশ জানাইনি। কিন্তু এখন আপনারা আমাকে সত্যি সত্যি চলে যেতে বলছেন! এ তো আমি মেনে নিতে পারি না। আপনারা যা খুসি তাই করতে পারেন, কিন্তু আমি এখান থেকে যাব না!"

কি করা যায়? আবার পরিষদকে ডাকা হলো। তারা কি করবে? লোকটা তো যাবে না। তারা অনেক ভাবল, অনেক চিন্তা করল। তার হাত থেকে রেহাই পাবার একমাত্র উপায় তার জন্য একটা অবসরকালীন বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেওয়া। রাজাকে সেই প্রস্তাবই তারা দিলো। বলল, "এ বিষয়ে আর কিছু করার নেই। যেমন করেই হোক ওর হাত থেকে রেহাই পেতেই হবে।" ৬০০ ফ্রাঁ পেন্সন ধার্য হলো, এবং সেটা বন্দীকে জানিয়ে দেওয়া হলো।

সে বলল, "ঠিক আছে; আপনারা যতদিন টাকাটা নিয়মিতভাবে দেবেন ততদিন আমি কিছু বলব না। এই শর্তে আমি চলে যেতে রাজি আছি।"

এইভাবেই ফয়সালা হয়ে গেল। বার্ষিক বৃত্তির এক-তৃতীয়াংশ অগ্রীম নিয়ে লোকটি সেই রাজার রাজত্ব ছেড়ে চলে গেল। রেলপথে মাত্র পনেরো মিনিটের পথ; সে রাজ্য ছেড়ে ঠিক তার সীমান্ত পার হয়েই সে একখণ্ড জমি কিনল, শব্জি-বাগান করল এবং বেশ আরামেই বাস করতে লাগল। যথাসময়ে গিয়ে বৃত্তিটা নিয়ে আসে। সেটা পেয়েই জুয়ার টেবিলে যায়, দুই বা তিন ফ্রাঁ বাজি ধরে, কখনও জেতে আবার কখনও হারে, তারপর বাড়ি ফিরে যায়। সে বেশ সুখে-শান্তিতেই আছে।

সে যে এমন একটা দেশে অপরাধটা করেনি যেখানে মানুষ কারও মুণ্ডু কাটতে বা তাকে আজীবন কারাগারে রাখতে অর্থ ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হয়না—সেটাই তার পক্ষে মঙ্গল।

—১৮৯৭

সুরাট-এর কফিখানা

The Coffee house of Surat

(বানার্দ দ্য সেঁত-পিয়ের অনুসরণে)

ভারতবর্ষের সুরাট শহরে একটি কফিখানা ছিল। পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চল থেকে আগত পর্যটক ও বিদেশীরা সেখান সমবেত হয়ে নানা রকম আলোচনা করত।

একদিন জনৈক পারসিক পণ্ডিত ধর্মবেত্তা সেই কফিখানায় হাজির হলো। ঈশ্বরের স্বরূপ পর্যালোচনায় ও তৎবিষয়ক নানা গ্রন্থ পাঠে ও প্রণয়নেই তার জীবন কেটেছে। ঈশ্বরকে নিয়ে সে এত ভাবনা-চিন্তা করেছে, এত পড়েছে ও লিখেছে যে কালক্রমে তার বুদ্ধি লোপ পায়, সব কিছু সে গুলিয়ে ফেলে, এমন কি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। এ কথা শুনে শাহ্ তাকে পারস্য থেকে নির্বাসিত করে।

সারাটা জীবন আদি কারণের আলোচনায় কাটিয়ে এই ভাগ্যহীন ধর্মবেত্তা শেষ পর্যন্ত সব খেই হারিয়ে ফেলে, এবং তার নিজের বিচারবুদ্ধিই যে লোপ পেয়েছে সে কথা বুঝবার পরিবর্তে সে ক্রমে ভাবতে শুরু করল যে এই বিশ্বের নিয়ন্ত্রণকারী কোনও মহত্তর চিন্তা-শক্তির অস্তিত্বই নেই।

এই লোকটির একজন আফ্রিকাবাসী ক্রীতদাস ছিল। তার সঙ্গে সঙ্গে সে সব জায়গায়ই যেত। ধর্মবেত্তা লোকটি যখন কফিখানায় ঢুকল, ক্রীতদাসটি তখন বাইরে

দরজার কাছেই প্রচণ্ড রোদের মধ্যে একটা পাথরের উপর বসে বসে মাছি তাড়াতে লাগল। পারসিক লোকটি কফিখানায় একটা ডিভান-এ আরাম করে বসে এক পেয়ালা আফিম পরিবেশনের হুকুম দিলো। সেটা পান করবার পরে তার মস্তিষ্কে আফিমের ক্রিয়া শুরু হতেই খোলা দ্বারপথে তার ক্রীতদাসকে উদ্দেশ করে সে বলল :

"হতভাগা ক্রীতদাস, বল্ তো ঈশ্বর আছে, না নেই?"

"নিশ্চয়ই আছে", এই কথা বলে ক্রীতদাস সঙ্গে সঙ্গে তার কোমর থেকে ছোট একটি কাঠের মূর্তি বের করে দেখাল।

বলল, "এই যে দেখছেন ইনিই সেই ঈশ্বর যিনি আমাকে জন্মের দিন থেকে রক্ষা করে আসছেন। যে দেববৃক্ষের কাঠ থেকে এই মূর্তিটি তৈরি করা হয়েছে আমাদের দেশের সকলেই তাকে পূজা করে।"

কফিখানার অপর অতিথিরা ধর্মবেত্তা ও তার ক্রীতদাসের এই কথাগুলি শুনে বিস্ময় বোধ করল। মনিবের প্রশ্ন শুনেই তারা বিস্মিত হলো, কিন্তু তার চাইতেও বেশি বিস্মিত হলো ক্রীতদাসের জবাব শুনে।

তাদের মধ্য থেকে জনৈক ব্রাহ্মণ ক্রীতদাসের কথা শুনে তার দিকে ফিরে বলল, "হতভাগা মূর্খ! এও কি সম্ভব যে ঈশ্বরকে কেউ কোমরের মধ্যে বয়ে নিয়ে যেতে পারে এ কথা তুমি বিশ্বাস করো? ঈশ্বর এক—তিনি ব্রহ্ম; তিনি সমস্ত জগতেরও বড়, কারণ তিনিই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি অদ্বৈত, শক্তিমান ঈশ্বর; তাঁর সম্মানেই গঙ্গার তীরে তীরে মন্দির নির্মিত হয়েছে, আর তাঁর আসল পূজারী ব্রাহ্মণরাই সেখানে তাঁর পূজা করে। প্রকৃত ঈশ্বরকে তারাই জানে; তারা ভিন্ন আর কেউ জানে না। হাজার হাজার বছর কেটে গেছে, বিপ্লবের পর বিপ্লব ঘটেছে, কিন্তু এই পুরোহিতদের কর্তৃত্ব আজও অটুট রয়েছে, কারণ একমাত্র সত্য ঈশ্বর ব্রহ্মাই তাদের রক্ষাকর্তা।

সকলকে ভালভাবে বোঝাবার জন্যই ব্রাহ্মণ কথাগুলি বলল; কিন্তু সেখানে উপস্থিত জনৈক ইহুদি দালাল প্রত্যুত্তরে তাকে বলে উঠল, "না! আসল ঈশ্বরের মন্দির ভারতবর্ষে নেই। আর ঈশ্বর ব্রাহ্মণ জাতির রক্ষা কর্তাও নন। আসল ঈশ্বর ব্রাহ্মণদের ঈশ্বর নন, তিনি আব্রাহাম, আইজাক ও জ্যাকব-এর ঈশ্বর। তাঁর আপনজন ইস্রাইলদের ছাড়া আর কাউকে তিনি রক্ষাও করেন না। জগতের শুরু থেকে আমাদের জাতি—একমাত্র আমাদের জাতিই তাঁর প্রিয়জন। আজ যে আমরা সারা জগতে ছড়িয়ে পড়েছি সেও তাঁরই পরীক্ষা মাত্র; কারণ ঈশ্বরই কথা দিয়েছেন, জেরুজালেম-এ আবার তিনি তাঁর আপনজনদের একদিন একত্রিত করবেন। প্রাচীন জগতের বিস্ময় জেরুজালেম-এর মন্দির যেদিন পূর্ব গৌরব ফিরে পাবে, সেদিন সমস্ত জাতির উপর ইস্রায়েল-এর শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।"

এই কথা বলতে বলতে ইহুদিটি কাঁদতে লাগল। আরও কিছু বলবার ইচ্ছা তার ছিল, কিন্তু সেখানে উপস্থিত একটি ইতালীয় পাদরি তাকে বাধা দিলো।

সে ইহুদিকে বলল, "আপনি যা বললেন তা অসত্য। আপনি ঈশ্বরে অবিচার আরোপ করেছেন। আপনার জাতিকে তিনি অন্যের চাইতে বেশি ভালবাসতে পারেন না। বরং বলা যায়, প্রাচীনকালে তিনি যে ইস্রায়েলীদের করুণা করতেন সে কথা সত্য হলেও উনিশ শ' বছর আগে তারা তাঁর এতদূর ক্রোধের কারণ হয়েছিল যে তিনি তাদের ধ্বংস করে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, এবং তার ফলে নতুন করে কেউ আর তাদের ধর্মমত গ্রহণ করে না; ফলে এখানে-ওখানে কিছুটা টিকে থাকলেও তাদের ধর্মের মৃত্যু ঘটেছে। ঈশ্বর কোনও জাতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না, কিন্তু যারা বাঁচতে চায় তাদের তিনি রোম-এর ক্যাথলিক গির্জার কোলে ডেকে নেন; সে গির্জার সীমার বাইরে কোথাও মুক্তি পাওয়া যায় না।"

ইতালীয় লোকটি কথাগুলি বলল। কিন্তু একটি প্রোটেস্ট্যান্ট পাদরিও সেখানে উপস্থিত ছিল। ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে ক্যাথলিক পাদরিটির দিকে ফিরে সে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল :

"মুক্তি আপনাদের ধর্মের সম্পত্তি এ কথা আপনি কেমন করে বললেন? খৃস্টের নিজের বাণীতেই নির্দেশ রয়েছে যে, যারা সর্বতোভাবে ধর্মগ্রন্থ অনুসারে ঈশ্বরের সেবা করবে একমাত্র তারাই মুক্তি পাবে।"

সুরাটের শুল্ক-দপ্তরের কর্মচারী জনৈক তুর্কী ভদ্রলোক কফিখানায় বসে পাইপ টানছিল। প্রভুত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিতে খৃস্টান দু'জনের দিকে ফিরে সে বলল, "রোমক ধর্মে আপনাদের বিশ্বাস অর্থহীন। বারো শ' বছর আগেই প্রকৃত ধর্ম এসে তার স্থান দখল করেছে : সে ধর্ম মহম্মদের ধর্ম! মহম্মদের প্রকৃত ধর্ম কিভাবে ইওরোপ ও এশিয়ায়, এমন কি আলোকপ্রাপ্ত চীন দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে সেটা নিশ্চয় আপনাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। আপনারাই বললেন যে ঈশ্বর ইহুদিদের পরিত্যাগ করেছেন; প্রমাণস্বরূপ আপনারা উল্লেখ করেছেন যে ইহুদিরা আজ অবহেলিত, তাদের ধর্মের কোনও বিস্তার ঘটছে না। তাহলে তো মহম্মদীয় ধর্মকে স্বীকার করতেই হবে, কারণ এ ধর্ম আজ সর্বজয়ী, দূরে ও নিকটে সর্বত্র বিস্তৃত। ঈশ্বরের শেষ পয়গম্বর মহম্মদের অনুচর ছাড়া কারও রক্ষা নেই; তাদের মধ্যে আবার ওমর-এর অনুচররাই রক্ষা পাবে, আলীর অনুচররা নয়, কারণ তারা অবিশ্বাসী।"

এদিকে পারসিক ধর্মবেত্তাটি আলীর একজন অনুগামী; কাজেই সে এ-কথার জবাব দিতে চাইল; কিন্তু ততক্ষণে সেখানে সমবেত বিভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাসীদের মধ্যে তুমুল তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। সেখানে ছিল হাব্সি খৃস্টানরা, তিব্বতী লামারা, ইস্রাইলীরা এবং অগ্নি-উপাসকরা। ঈশ্বরের স্বরূপ কি, কিভাবে তাঁর পূজা করতে হবে,—এই নিয়ে সকলেই তর্ক জুড়ে দিলো। প্রত্যেকেই বলতে লাগল যে, একমাত্র তার দেশই প্রকৃত ঈশ্বরকে জানে, আর সেখানেই ঈশ্বরের সঠিক পূজা হয়ে থাকে।

সকলেই সোচ্চারে তর্ক করতে লাগল, শুধু কন্‌ফুসিয়াসের ছাত্র জনৈক চীনা সে

বিতর্কে যোগ না দিয়ে কফিখানার এক কোণে চুপচাপ বসে ছিল। সেখানে বসে চা খেতে খেতে সে অন্য সকলের কথাই শুনছিল, কিন্তু নিজে কোনও কথাই বলেনি।

তাকে বসে থাকতে দেখে তুর্কীটি সানুনয়ে বলল, "চীনের ভাল মানুষ, আপনি তো আমার বক্তব্যকে সমর্থন করতে পারেন। আপনি চুপচাপ আছেন, কিন্তু আমি জানি মুখ খুললে আপনি আমার মতকেই সমর্থন করবেন। আপনার দেশের যে সব ব্যবসায়ী সাহায্যের জন্য আমার কাছে আসে তারা আমাকে বলেছে, চীনে অনেক ধর্ম প্রবর্তিত হ'লেও আপনারা মহম্মদীয় ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন ও স্বেচ্ছায় সে ধর্ম গ্রহণ করে থাকেন। সুতরাং আপনি আমার কথাগুলি সমর্থন করুন এবং প্রকৃত ঈশ্বর ও তার পয়গম্বর সম্পর্কে আপনার মতামত বলুন।"

চীনা লোকটির দিকে ঘুরে সকলেই বলে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ বিষয়ে আপনার অভিমত আমরা শুনতে চাই।"

কন্‌ফুসিয়াস-এর ছাত্র সেই চীনা লোকটি চোখ বুজে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর চোখ খুলে পোশাকের ঢোলা আস্তিনের ভিতর থেকে হাত দুটি বের করে শান্ত গলায় নিচের কথাগুলি বলল।

মহাশয়গণ, আমার তো মনে হচ্ছে প্রধানত অহংকারের বশেই মানুষ ধর্মের বিষয়ে একমত হতে পারে না। আপনারা যদি আমার কথা শুনতে চান তাহলে আমি এমন একটি গল্প আপনাদের শোনাব যাতে একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

যে ইংলিশ স্টীমারে আমি চীন থেকে এখানে এসেছি সেটা পৃথিবী ঘুরে এসেছে। ভাল জলের জন্য স্টীমার থামিয়ে আমরা সুমাত্রা দ্বীপের পূর্ব উপকূলে নেমেছিলাম। তখন বেলা দুপুর। দ্বীপে নেমে আমরা কয়েকজন সমুদ্রতীরে নারকেল গাছের ছায়ায় বসে ছিলাম। কাছেই একটা গ্রাম ছিল। আমাদের দলে নানা জাতির লোক ছিল।

আমরা সেখানে বসে থাকতে থাকতেই একটি অন্ধ মানুষ আমাদের দিকে এগিয়ে এল। পরে শুনেছিলাম, সূর্যকে জানবার জন্য এবং তার আলোকে ধরবার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে অনবরত সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকার জন্যই সে অন্ধ হয়ে গেছে।

এ জন্য সে দীর্ঘকাল সব সময় সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকত; কিন্তু তার একমাত্র ফল হলো, সূর্যের উজ্জ্বলতায় তার চোখের ক্ষতি হলো; সে অন্ধ হয়ে গেছে।

এ জন্য সে দীর্ঘকাল সব সময় সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকত; কিন্তু তার একমাত্র ফল হলো, সূর্যের উজ্জ্বলতায় তার চোখের ক্ষতি হলো; সে অন্ধ হয়ে গেল।

তখন সে নিজেকে বলল : "সূর্যের আলো তরল নয়; তা যদি হতো তাহলে তাকে এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে ঢালা যেত, এবং জলের মতো সেটাও বাতাসে চঞ্চলিত হতো। সেটা আগুনও নয়, তা যদি হতো তাহলে জল ঢেলে তাকে নেভানো যেত। আলো কোনও আত্মাও নয়, কারণ তাকে চোখে দেখা যায়; আবার বস্তুও নয়, কারণ

তাকে স্থানান্তরিত করা যায় না। সুতরাং যেহেতু সূর্যের আলো তরল নয়, অগ্নি নয়, আত্মা নয়, বস্তু নয়, সেটা—কিছুই নয়!"

এই কথা ভেবে ভেবে এবং সব সময় সূর্যের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে তার দুটি চোখই নষ্ট হয়ে গেল, তার বুদ্ধিভ্রংশও ঘটল। আর পুরোপুরি অন্ধ হবার পরে তার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে সূর্য বলে কিছু নেই।

অন্ধ লোকটির সঙ্গে একটি ক্রীতদাসও এসেছিল। মনিবকে নারকেল গাছের ছায়ায় বসিয়ে রেখে সে মাটি থেকে একটা নারকেল কুড়িয়ে নিয়ে সেটা দিয়ে একটা বাতি বানাতে শুরু করল। নারকেলের ছোবড়া দিয়ে একটা সল্‌তে পাকাল, নারকেলের শাঁস চিপে তেল বের করল, সল্‌তেটাকে সেই তেলে চুবিয়ে নিল।

ক্রীতদাসটি তার কাজ করতে লাগল, আর অন্ধ লোকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকে বলল, "আচ্ছা বাপু, তোমাকে যে বলেছি সূর্য নেই সেটা কি ঠিক নয়? দেখতে পাচ্ছ না চারদিক কী অন্ধকার? অথচ লোকে বলে সূর্য আছে।...কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে সেটা কি?"

ক্রীতদাস বলল, "সূর্য কি তা আমি জানি না। ওটা আমার কোনও ব্যাপারই নয়। কিন্তু আলো কি বস্তু তা আমি জানি। এই যে বাতিটা বানিয়েছি এর সাহায্যে আমি আপনাকে পথ দেখাতে পারব এবং কুটীরের ভিতরে গিয়ে যা চাইব তাই দেখতে পাব।

তারপর নারকেলের মালাটা তুলে বলল, "এটাই আমার সূর্য।"

ক্রাচওয়ালা একটা খোঁড়া লোক পাশেই বসে ছিল। এ কথা শুনে সে হেসে উঠল। বলল, "যখন সূর্য কি তাই জানেন না তখন বোঝা যাচ্ছে যে সারা জীবনই আপনি অন্ধ ছিলেন। আমি আপনাকে বলছি সূর্য কি। সূর্য হচ্ছে এমন একটি আগুনের গোলা যেটা প্রতিদিন সকালে সমুদ্রের ভিতর থেকে উঠে আসে এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমাদের দ্বীপের পর্বতমালার ওপারে আবার অস্ত যায়। আমরা সকলেই এটা দেখেছি। দৃষ্টিশক্তি থাকলে আপনিও দেখতে পেতেন।"

একজন জেলে কথাগুলি শুনছিল। সে বলল, "পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আপনি কখনও এ দ্বীপ ছেড়ে বাইরে কোথাও যাননি। যদি খোঁড়া না হতেন এবং আমার মতো কোনও মাছ-ধরা নৌকোয় চেপে বাইরে যেতেন তাহলে জানতে পারতেন যে সূর্য আমাদের ঐ পর্বতমালার ওপাশে অস্ত যায় না; প্রত্যহ সকালে সূর্য যেমন সমুদ্র থেকে ওঠে তেমনি আবার প্রতি রাত্রেই সমুদ্রের মধ্যেই অস্ত যায়। আমি যা বলছি তাই ঠিক, কারণ প্রতিদিন নিজের চোখে আমি তা দেখেছি।"

তখন আমাদের দলের একজন ভারতবাসী বাধা দিয়ে বলে উঠল : "একজন বুদ্ধিমান লোক এমন সব বাজে কথা বলছে দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। একটা আগুনের গোলা জলের ভিতরে নেমেও নিভে যায় না—সেটা কেমন করে সম্ভব

হতে পারে? সূর্য মোটেই একটা অগ্নি-গোলক নয়, সূর্য হচ্ছেন দেবতা, নাম 'দেব'; চিরদিন ধরে একখানি রথে চড়ে তিনি 'মেরু' নামক সোনার পাহাড়কে প্রদক্ষিণ করেন। কখনও কখনও 'রাহু' ও 'কেতু' নামক দুটি সাপ 'দেব'কে আক্রমণ করে গিলে ফেলে; তখনই পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের পুরোহিতরা দেবতার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন, আর সূর্যও মুক্তি পায়। আপনার মতো যে সব অজ্ঞ লোক কখনও নিজেদের দ্বীপ ছেড়ে বাইরে কোথাও যায়নি একমাত্র তারাই মনে করে যে সূর্য শুধু তাদের দেশের জন্যই কিরণ ছড়ায়।"

তখন একটি মিশরীয় জাহাজের মালিকের কথা বলার পালা এল।

সে বলল, "না, আপনিও ভুল বললেন। সূর্য কোনও দেবতা নয়, আর কেবলমাত্র ভাবতবর্ষ ও তার সোনালী পর্বতকেই সে প্রদক্ষিণ করে না। জাহাজে চেপে আমি কৃষ্ণ সমুদ্রে গিয়েছি, আরব-এর উপকূল প্রদক্ষিণ করেছি, গিয়েছি মাদাগাস্কারে ও ফিলিপিনে। সূর্য সারা পৃথিবীকেই আলো দেয়, কেবলমাত্র ভারতবর্ষকে নয়। সে একটি মাত্র পর্বতকে প্রদক্ষিণ করে না; জাপান দ্বীপপুঞ্জেরও অনেক পূর্ব দেশে সে উদিত হয়, আর অস্ত যায় অনেক, অনেক পশ্চিমে, ইংলন্ড দ্বীপপুঞ্জকে পেরিয়ে। এই জন্যই জাপানীরা তাদের দেশকে 'নিপন', অর্থাৎ 'সূর্যের জন্মস্থান' বলে। এ সব কিছু আমি ভালই জানি, কারণ আমি নিজে অনেক কিছু দেখেছি, আর তারও অনেক বেশি শুনেছি আমার ঠাকুর্দার কাছে; জাহাজে চেপে তিনি সমুদ্রের শেষ প্রান্ত অবধি গিয়েছিলেন।"

সে হয় তো আরও কিছু বলত, কিন্তু আমাদের জাহাজের একজন ইংরেজ নাবিক তাকে বাধা দিলো।

বলল, "সূর্যের গতিবিধি সম্পর্কে ইংলন্ডের লোকরা যত বেশি জানে পৃথিবীর আর কোনও দেশের লোক তা জানে না। ইংলন্ডের সকলেই জানে যে, সূর্য কোথাও ওঠে না, কোথাও অস্ত যায় না। সে সব সময়ই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলে। এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত, কারণ সবেমাত্র আমরা পৃথিবী ঘুরে এসেছি, আর সূর্যের সঙ্গে কোথাও আমাদের ধাক্কাধাক্কি হয়নি। যেখানেই গিয়েছি সেখানেই দেখেছি, এখানকার মতোই সূর্য সকালে আত্মপ্রকাশ করে আর রাতে লুকিয়ে পড়ে।"

ইংরেজ লোকটি একটা লাঠি নিয়ে বালিতে একটা বৃত্ত এঁকে বুঝিয়ে দিলো, কেমন করে সূর্য আকাশ-পথে চলতে চলতে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু ব্যাপারটা ভালভাবে বোঝাতে না পেরে জাহাজের চালককে দেখিয়ে বলল, "এই লোকটি এ বিষয়ে আমার চাইতে বেশি জানেন। উনি এটা ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে পারবেন।"

জাহাজ-চালকটি বুদ্ধিমান লোক; তাকে প্রশ্ন না করা পর্যন্ত চুপচাপ সব কথা শুনে যাচ্ছিল। এবার সকলে তার দিকে ফিরে তাকালে সে বলতে লাগল :

"আপনারা সকলেই একে অন্যকে ভুল বোঝাচ্ছেন আর নিজেরাও ঠকছেন। সূর্য

পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে না, পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে ঘোরে, আর সেই প্রদক্ষিণের পথে প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় শুধু জাপান, ফিলিপনস্ ও যেখানে আমরা এখন আছি সেই সুমাত্রাই নয়, আফ্রিকা, ইওরোপ, আমেরিকা, এবং অন্য সব দেশই একবার করে সূর্যের মুখোমুখি হয়। সূর্যের কিরণ শুধু একটি পর্বত, বা একটি দ্বীপ বা একটি সমুদ্রের উপর পড়ে না; এমন কি শুধুমাত্র এই পৃথিবীর উপরেই পড়ে না; আমাদের এই পৃথিবীর মতো অন্য সব গ্রহের উপরেও সূর্যের কিরণ ছড়িয়ে পড়ে। পায়ের নিচের মাটির দিকে না তাকিয়ে আপনারা যদি আকাশের দিকে তাকান তাহলেই এ সব কথা বুঝতে পারবেন এবং তখন আর একথা ভাববেন না যে সূর্য শুধু আপনার জন্য বা আপনার দেশের জন্যই কিরণ ছড়িয়ে থাকে।''

যে বিজ্ঞ নাবিক পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেছে এবং মাথার উপরকার আকাশের অনেক কিছু দেখেছে সে এই সব কথা বলল।

কনফুসিয়াস-এর ছাত্র চীনা লোকটি আবাব কথা বলল। ''কাজেই ধর্মবিশ্বাসেব ব্যাপারে অহংকারই ভ্রান্তি ঘটায় এবং মানুষে-মানুষে বিভেদ সৃষ্টি কবে। সূর্যের বেলায় যেমন, ঈশ্বরের বেলায়ও তাই। প্রত্যেকেই চায় তার নিজেব জন্য, অন্তত পক্ষে তার দেশের জন্য একটি বিশেষ ঈশ্বর। সারা বিশ্ব যাঁকে ধরে রাখতে পারে না, প্রত্যেক জাতি চায় তাঁকে তার নিজের মন্দিরে আটকে রাখতে।

'সকলে মানুষকে এক বিশ্বাসে ও এক ধর্মে ঐক্যবদ্ধ করতে স্বয়ং ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গে কি কোনও মন্দিরের তুলনা হতে পারে?

'ঈশ্বরের নিজস্ব জগৎ এই মন্দিরের আদলেই তো মানুষের সব মন্দির গড়ে উঠেছে। সব মন্দিরেরই আছে জলাধার, গম্বুজাকৃতি ছাদ, আছে আলো, ছবি ও ভাস্কর্য, আছে শিলালিপি, আইনের পুঁথি, আছে নৈবেদ্য, বেদী ও পুরোহিতেব দল। কিন্তু কোন্ মন্দিরের আছে সমুদ্রের মতো জলাধার; আকাশের মতো ছাদ; সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজির মতো আলোকমালা; অথবা পরস্পবের সাহায্যকারী জীবন্ত প্রেমময় মানুষের সঙ্গে তুলনীয় মূর্তিসমূহ? মানুষের সুখের জন্য যে আশীর্বাদ ঈশ্বর সর্বত্র ছড়িয়ে রেখেছেন তার মতো সহজবোধ্য ঐশ্বরিক করুণার ইতিবৃত্ত আর কোথায় পাওয়া যাবে? প্রতিটি মানুষের অন্তরে যে বাণী লিখিত আছে তার মতো সুস্পষ্ট বিধান-পুঁথি আর কোথায় মিলবে? প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের জন্য যে আত্মত্যাগ কবে তার সমকক্ষ আত্মদান আর কি হতে পারে? যে সৎ মানুষের অন্তর-বেদীমূলের বলি স্বয়ং ঈশ্বর গ্রহণ করে থাকেন, অন্য কোন্ পূজা-বেদীকে তার সঙ্গে তুলনা করা চলে?

''ঈশ্বর সম্পর্কে যে মানুষের ধারণা যত উচ্চ সে তাঁকে তত ভালভাবে জানতে পারবে। আর যত সে ঈশ্বরকে জানবে ততই তার কল্যাণ, তাঁর করুণা, তাঁর মানব-প্রেমকে অনুকরণ করে সে তাঁর অধিকতর নিকটবর্তী হবে।

"সুতরাং যে মানুষ দেখেছে যে সূর্যের সমস্ত আলো সারা পৃথিবীকে পূর্ণ করে রেখেছে, সে যেন কুসংস্কারগ্রস্ত সেই মানুষটিকে দোষারোপ বা ঘৃণা করা থেকে বিরত থাকে যে তার নিজস্ব দেবমূর্তির মধ্যে সেই আলোর একটিমাত্র রশ্মি দেখতে পায়। আর যে অবিশ্বাসী অন্ধ সূর্যকে একেবারেই দেখতে পায় না, তাকেও যেন সে ঘৃণা না করে।"

কন্‌ফুসিয়াস-এর ছাত্র সেই চীনা লোকটি কথাগুলি বলল; কফিখানায় যারা উপস্থিত ছিল সকলেই নিশ্চুপ হয়ে গেল; কার ধর্মমত শ্রেষ্ঠ তা নিয়ে আর কোনও রকম তর্ক তারা করল না।

—১৮৯৩

বিলিয়ার্ড-হিসাবরক্ষকের বক্তব্য

A Billiard-Maker's Note

দুটো থেকে থেকে তিনটের মধ্যে তিন দান খেলার সময় ব্যাপারটা ঘটল। যারা খেলছিল তারা হলো "বড় অতিথি' (আমাদের লোকজনরা ওই নামেই তাকে ডাকত), প্রিন্স (সে সব সময়ই ওর সঙ্গে সঙ্গে ফেরে), গোঁফওয়ালা লোকটি, ছোট হুজার অলিভার (একজন অভিনেতা), এবং জনৈক "পান" (মানে ভদ্রলোক)। আরও অনেকে সেখানে ছিল।

বড় অতিথি প্রিন্সের সঙ্গে খেলছিল। টেবিলের চারপাশে ঘুরে ঘুরে আমি গুণে চলেছি 'দশ ও আটচল্লিশ, বারো ও আটচল্লিশ।' বিলিয়ার্ড খেলার হিসাবরক্ষক হওয়া যে কি জিনিস তা তো সকলেই জানে। সারাদিন দাঁতে কুটোটি কাটা হয়নি, দু'রাত পর পর ঘুম নেই, তবু তোমাকে সংখ্যা গুণতেই হবে, বল বের করে নিতেই হবে। গুণতে গুণতেই চারদিক তাকিয়ে দেখি—একটি নতুন ভদ্রলোক দরজা দিয়ে ঢুকল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে একটা সোফায় বসে পড়ল। ঠিক আছে।

' লোকটি কে?—মানে, কোন্ শ্রেণীর?" নিজের মনেই ভাবলাম। লোকটি সুবেশ—পোশাক-পরিচ্ছদ সৌখীন—দেখলেই মনে হয় সবে ধোবাখানা থেকে এসেছে : মিহি সুতোর চৌখুপি-কাটা ট্রাউজার, ছোট-ঝুল কেতাদুরুস্ত কোট, সৌখীন ওয়েস্ট কোট, একটা সোনার চেন, তা থেকে অনেক কিছু ঝুলছে।

পোশাক-পরিচ্ছদ সুন্দর, স্বয়ং আরও সুন্দর : একহারা, লম্বা, আধুনিক কায়দায় চুল সামনে ব্রাশ-করা, লালে-সাদায় মেশানো রং—এককথায় চমৎকার লোকটি।

অবশ্য, আমাদের ব্যবসাতে সব রকম লোকই আমরা দেখতে পাই; একেবারে উঁচু থেকে একেবারে নিচু; কাজেই ঘটে বুদ্ধি থাকলে হিসাবরক্ষক হলেও সব রকম লোকের সঙ্গেই মানিয়ে চলতে হয়।

ভদ্রলোকটিকে এক নজর দেখেই বুঝলাম, সে চুপচাপ বসে আছে। কাউকে চেনে না, আর তার পোশাকগুলিও আনকোরা নতুন। মনে মনে ভাবলাম : "লোকটি হয় কোনও বিদেশী—ইংরেজ অথবা নবাগত কোনও কাউন্ট। বয়সে যুবক হলেও বেশ বিচক্ষণ বলেই মনে হয়।" অলিভার তার পাশেই বসেছিল; তাকে জায়গা করে দিতে একটু সরেও বসল।

খেলা শেষ হলো—প্রধান অতিথি হেরে গিয়ে আমাকেই খেঁকিয়ে উঠল :

"তুমি সব সময় ভুল করো! ঠিকমতো না শুনে এদিক-ওদিক তাকিয়ে থাকো।"

একটা দিব্যি গেলে কিউটা (বিলিয়ার্ড-দণ্ডটা) ছুঁড়ে দিয়ে সে বেরিয়ে গেল। কি আর করা যাবে? এক রাতে প্রিন্সের সঙ্গে পঞ্চাশ রুবলের খেলা খেলবে আর এক বোতল বারগান্ডির দাম হেরে গেলেই বেসামাল হয়ে যাবে। ঐ রকমই মানুষ! অনেক সময় প্রিন্সের সঙ্গে সকাল দুটো পর্যন্তও খেলে। তারা কখনও বাজির টাকা টেবিলের পকেটে রাখে না (বিলিয়ার্ড খেলার নিয়ম হলো, বাজির টাকা টেবিলের পকেটে রাখতে হয়। আর যে বলটা পকেটে ফেলতে পারে সেই বলের সঙ্গে টাকাটাও তুলে নেয়); আমি জানি, তাদের কারও কাছে টাকা থাকেও না, তারা শুধু শুধুই হৈ-হৈ করে।

"আমরা কি পঁচিশ বাজি ধরে ডবল খেলব, না সমান-সমান খেলব?"

'যেমন ইচ্ছা।"

কিন্তু তুমি যদি একটু হাই তুলেছ, অথবা একটা বল ঠিক মতো রাখতে না পারো—আর যাই হোক, মানুষতো আর পাথর দিয়ে গড়া নয়—তাহলেই তারা লাফিয়ে এসে গলা টিপে ধরবে :

"আমরা তো খোলামকুচি দিয়ে খেলছি না—খেলছি টাকা দিয়ে!"

ঐ একটা লোকই আমাকে সব চাইতে বেশি কষ্ট দেয়...

যাহোক, বড় অতিথি চলে যেতেই প্রিন্স নতুন ভদ্রলোকটিকে বলল :

"আমার সঙ্গে এক হাত খেলবেন কি?"

"আনন্দের সঙ্গে," সে বলল।

যতক্ষণ বসে বসে দেখছিল ততক্ষণ তাকে পাকা খেলোয়াড় বলেই মনে হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল তার যথেষ্ট আত্ম-বিশ্বাস আছে, কিন্তু টেবিলে গিয়ে দাঁড়ালে তাকে—না, ঠিক ভীত নয়, তবে কিছুটা বিচলিত বলে মনে হলো। নতুন পোশাকে কিছুটা

অস্বস্তি বোধ করার জন্যই হোক, অথবা সকলেই তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে ভয় পেয়েই হোক, মনে হলো তার নিজের উপর বিশ্বাস যেন অনেকটা হারিয়ে গেছে। একটু পাশ কাটিয়ে হাঁটার দরুণ তার পকেটটা প্রায় টেবিলের পকেটটাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। কিউ-তে খড়ির দাগ দেবার সময় খড়িটা তার হাত থেকে পড়ে গেল; আবার পকেটে একটা বল ফেলবার পরেও সে মুখ লাল করে চারদিকে তাকাতে লাগল। প্রিন্স কিন্তু সে রকম নয়—এ সবে সে অভ্যস্ত—সে যথারীতি কিউ-তে ও হাতে খড়ির দাগ দেবে, আস্তিনটা গুটিয়ে নেবে এবং দেখতে ছোটখাটো হলেও বলটাকে ঠিক গর্তে ফেলে দেবে।

দুই তিন দান খেলার পরে—আমার সঠিক মনে নেই—প্রিন্স কিউটা রেখে দিয়ে বলল :

"আপনার নামটা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

"নেখ্‌লয়ুদভ", সে বলল।

"আপনার বাবা কি সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার ছিলেন?"

"হ্যাঁ," সে বলল।

তারপর সে দ্রুত লয়ে ফরাসীতে কথা বলতে শুরু করল, আর আমি তার কিছুই বুঝতে পারলাম না। সম্ভবত তাদের আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে কথা বলছিল।

প্রিন্স বলল, "অ রিভোয়া, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুসি হলাম।"

হাত ধুয়ে সে খেতে চলে গেল, কিন্তু অপরজন কিউটা হাতে নিয়ে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে বলগুলোকে ইতস্তত ঠুকতে লাগল।

আমাদের কাজের সকলেই জানে যে একজন নবাগতের সঙ্গে যত কড়া ব্যবহার করা যায় ততই ভাল, কাজেই আমি বলগুলো গুছাতে শুরু করলাম। সে একটু লজ্জিতভাবে বলল :

"আমি কি খেলা চালিয়ে যেতে পারি?"

আমি বললাম, "নিশ্চয় পারেন; বিলিয়ার্ড-টেবিল আছেই তো খেলাব জন্য।" কিন্তু তার দিকে না তাকিয়েই আমি কিছুটা সরিয়ে রাখলাম।

"তুমি আমার সঙ্গে খেলবে?"

"নিশ্চয় খেলব স্যার," আমি বললাম।

বলগুলো সাজিয়ে দিলাম।

"হামাগুড়ি খেলা হবে কি?"

"হামাগুড়ি মানে?"

আমি বললাম : "আপনি আধ রুবল দেবেন, আর আমি হেরে গেলে টেবিলের তলায় হামাগুড়ি দেব।"

এ রকম ব্যাপার কখনও না দেখায় তার খুব মজা লাগল; সে হেসে উঠল।

"তাই হোক," সে বলল।

"ঠিক আছে। আপনি আমাকে কতটা পর্যন্ত ছাড় দেবেন?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"কেন, তুমি কি আমার চাইতে খারাপ খেলো?"

আমি বললাম, "নিশ্চয়। আমি তো দেখছি, খুব কম খেলোয়াড়ই আপনার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে।"

লেখা শুরু করলাম। সত্যি সে নিজেকে একজন দক্ষ খেলোয়াড় বলে মনে করে। সে ভয়ংকরভাবে বলগুলি ঠুকতে লাগল, আর "পান" বসে বসে বলতে লাগল :

"কী বলো! কী মার।"

সত্যি তাই। তার হাতে মার আছে, কিন্তু কোনও বিবেচনা নেই। যথারীতি প্রথম খেলাটা আমি হেরে গেলাম এবং গোঙাতে গোঙাতে টেবিলের তলায় হামাগুড়ি দিতে লাগলাম। এবার অলিভার ও "পান" লাফ দিয়ে উঠে কিউ হাতে নিলো।

তারা বলে উঠল, "চমৎকার! খেলা চলুক! চালিয়ে যান!"

চালিয়ে যানই বটে! বিশেষ করে "পান"...আধ রুবলেব জন্য শুধু টেবিলেব তলায় কেন গোটা নীল সেতুর নিচেই সে হামাগুড়ি দিতে রাজী। সে চেঁচিযে বলল :

"চমৎকার! এখনও তো ধুলোই ওড়েনি।"

আমি গণনাকারী পেত্রুশ্‌কা। সকলেই আমাকে চেনে। আগে হিসাব রক্ষক ছিল ত্যুরিন, এখন আমি পেত্রুশ্‌কা।

কিন্তু আমি ভাল খেলতে পারি না। আবারও হারলাম।

বললাম, "আপনার সঙ্গে সমান তালে খেলতে পারব না স্যার।"

সে হাসল। তারপর আমি তিনটে খেলা জেতার পরে—যখন তার পয়েন্ট হলো উনপঞ্চাশ, আর আমার একও নয়, তখন কিউটা টেবিলের উপর রেখে বললাম "আপনি কি ডবল খেলবেন, না কুইট্‌স্?"

"কুইট্‌স্ বলতে কি বোঝ?" সে বলল।

আমি বললাম, "আপনি আমাকে হয তিন রুবল দেবেন, নয় তো কিছুই দেবেন না।"

সে বলল, "কী! আমি কি টাকা নিয়ে তোমার সঙ্গে খেলছি? মূর্খ।"

তার মুখ লাল হয়ে উঠল।

ঠিক আছে। সে আবার হেরে গেল।

"যথেষ্ট হয়েছে!" সে বলল।

সে পকেট-বইটা বের করল। "মাগাসিন অ্যাংলেস" থেকে নতুন কেনা। বুঝলাম লোকটি নিজেকে জাহির করতে চাইছে। বইটা একশ' রুবল নোটে ভর্তি।

"ভাঙানি তো নেই দেখছি," তিন রুবল বের করে সে বলল। "এই নাও; দুটো খেলার জন্য, আর বাকিটা গলা ভেজাবার জন্য।"

"অনেক ধন্যবাদ", আমি বললাম। সত্যি ভদ্রলোক। এ রকম লোকের জন্য একটু হামাগুড়ি দেওয়া চলে। দুঃখের বিষয়, সে টাকার জন্য খেলতে চায় না—নইলে বিশ-চল্লিশ রুবলের ব্যবস্থা করে নিতে পারতাম।"

যুবকটির টাকা দেখে "পান' বলল, "আমার সঙ্গে একটু খেলতে আপত্তি আছে কি? আপনি তো চমৎকার খেলেন।" তার গলায় খোসামোদের সুর।

"না, ক্ষমা করবেন। আমার সময় নেই।" এই কথা বলে সে চলে গেল।

এই "পান" লোকটিকে আমি চিনি না। কেউ তাকে এই "পান" ডাক-নামটি দিয়েছিল, সেই থেকে এটাই চলে এসেছে। সারাদিন বিলিয়ার্ড-রুমে বসে সে খেলা দেখে। তাকে মারধোর করা হয়েছে, গালাগালি করা হয়েছে, কেউ তার সঙ্গে খেলে না। তবু নিজের পাইপটি নিয়ে এসে সে আপন মনেই বসে বসে টানে। কিন্তু সে ভাল খেলতে পারে...জানোয়ার!

যাই হোক, নেখ্‌ল্‌য়ুদভ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার এল. এবং প্রায়ই আসতে লাগল। সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলায়ই আসে। বিলিয়ার্ড, পুল, স্নুকার—সব রকম খেলাই শিখল। ক্রমে তার সাহস বাড়ল, সকলের সঙ্গে পরিচয় হলো, খেলারও অনেক উন্নতি হলো। বড় ঘরের ছেলে, টাকা-পয়সাও আছে, কাজেই সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে। একবার মাত্র বড় অতিথির সঙ্গে তার একটু গোলমাল হয়েছিল।

তুচ্ছ ব্যাপার।

তারা পুল খেলছিল—প্রিন্স, বড় অতিথি, নেখ্‌ল্‌য়ুদভ, অলিভার, ও অন্য একজন। নেখ্‌ল্‌যুদভ স্টোভের পাশে দাঁড়িয়ে কারও সঙ্গে কথা বলছিল। তখন বড় অতিথির খেলার পালা। তার বলটা স্টোভের ঠিক উল্টো দিকে এসে গেল : সেখানে জায়গাও বেশি ছিল না. আর শরীরটাকে একটু বেশি দুলিয়ে খেলতেই সে ভালবাসে।

এখন, নেখ্‌ল্‌য়ুদভকে না দেখেই করুক আর ইচ্ছা করেই করুক, সে অনেকটা ঝুঁকে বলটাকে ঠুকল, আর তার ফলে কিউ-এর কুঁদোটা দিয়ে নেখ্‌ল্‌য়ুদভ-এর বুকে ধাক্কা লাগাল। বেচারি একটু আর্তনাদ করে উঠল। তারপর কি হলো? সে একবার বললও না "ক্ষমা করবেন"—রুক্ষ প্রকৃতির লোক—বরং তার দিকে একবারও না তাকিয়ে খেলতে লাগল; এমনকি বিড়বিড় করে বলতে লাগল . "এভাবে সামনে এসে দাঁড়ানোই বা কেন? আমার একটা বল লোকসান হলো।" যেন সেখানে যথেষ্ট জায়গা ছিল না।

যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে অপর লোকটি বিবর্ণ মুখে তার কাছে গিয়ে খুবই ভদ্রভাবে বলল, "আপনারই আগে ক্ষমা চাওয়া উচিত স্যার। আপনি আমাকে ধাক্কা মেরেছেন।"

সে বলল, "এখন আমার ক্ষমা চাওয়ার সময় নেই। আমারই জিতবার কথা, কিন্তু এখন আমার বলেই ওই লোকটি পয়েন্ট পেয়ে যাবে।"

অপর লোকটি আবার বলল, "আপনাকে ক্ষমা চাইতেই হবে।"

সে বলে উঠল, "চলে যান। কী জ্বালাতন করছেন!" সে বলেব দিকে নজর দিলো।

নেখ্‌ল্‌য়ুদভ আরও কাছে গিয়ে তার হাতটা চেপে ধরল।

বলল, "আপনি অভদ্র।"

একহারা গড়ন, বয়সে যুবক, মেয়েদের মতো গোলাপি চেহারা হলেও তার চোখ দুটি এমন হিংস্রভাবে জ্বলে উঠল যেন তাকে খেয়ে ফেলবে। বড় অতিথিটির শক্তপোক্ত শরীর, বেশ লম্বা। নেখ্‌ল্‌য়ুদভ-এব চাইতে অনেক বড়সড়।

সে বলল, "কি? আমাকে অভদ্র বললেন?"

চিৎকার করে সে নেখ্‌ল্‌য়ুদভকে মারতে হাত তুলল; কিন্তু অন্য সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের দু'জনকে হাত ধরে সরিয়ে দিলো।

তারা নানা রকম কথা বলতে লাগল—আর নেখ্‌ল্‌য়ুদভ বলল,

"ওকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। উনি আমাকে অপমান কবেছেন।" তার কথাব অর্থ সে দ্বৈতযুদ্ধ করতে চায়। অবশ্য ওরা ভদ্রলোক—এ রীতি ওদের মধ্যে আছে...ওদেব কিছু বলা যাবে না...এক কথায়, ওরা ভদ্রলোক!"

"কোনও কৈফিয়ৎ আমি দেব না। ওতো ছেলে মানুষ—তার বেশি আবার কি। আমি ওর কান দুটো মুলে দেব।"

সে বলল, "যদি যুদ্ধ করতে না চান তাহলে আপনি সম্মানিত লোকই নন।" তার প্রায় কেঁদে ফেলবার মতো অবস্থা।

"তুমি তো একটা ফচ্‌কে ছোঁড়া—তুমি তো আমাকে অপমান করতেই পারো না।"

যাই হোক, সাধারণত যা হয়ে থাকে, সকলে তাদেব ছাড়িয়ে দিয়ে আলাদা ঘরে নিয়ে গেল। প্রিন্সের সঙ্গে নেখ্‌ল্‌য়ুদভ-এর ভাব হয়ে গেল।

সে বলল, "ঈশ্বরের দোহাই, তাকে গিয়ে বলুন, দ্বৈতযুদ্ধে লড়তে। তখন সে মাতাল অবস্থায় ছিল, এখন হয়তো সুবুদ্ধি ফিরে এসেছে। এ ব্যাপাব এ ভাবে শেষ হতে পারে না।"

প্রিন্স চলে গেল। বড় অতিথি বলল,

"আমি অনেক দ্বৈতযুদ্ধে লড়েছি, অনেক যুদ্ধেও নেমেছি, কিন্তু একটা নেহাৎ ছেলেমানুষের সঙ্গে আমি লড়ব না : এ ব্যাপারে এই শেষ কথা।"

যাই হোক, অনেক কথা চালাচালির পরে শেষ পর্যন্ত তারা চলে গেল; শুধু বড় অতিথি আমাদের এখানে আসাই ছেড়ে দিলো।

নেখ্‌ল্‌য়ুদভ্-এর স্বভাবটা ঝগড়াটে, ও উচ্চাকাংখী, কিন্তু অন্য ব্যাপারে একেবারেই অবুঝ। মনে পড়ে, একদিন প্রিন্স তাকে বলল, "আপনি এখানে কাকে নিয়ে এসেছেন?'

"কাউকে না," সে বলল।

"সে কি—কাউকে না?"

"কাউকে সঙ্গে আনতে হবে কেন?"

"কাউকে সঙ্গে আনতে হবে কেন' কথার মানে কি?"

সে বলল, "এতদিন তো আমি একাই থেকেছি, কাজেই সেটা অসম্ভব হবে কেন?"

"একা থেকেছ? তার মানে কি?"

প্রিন্স হো-হো করে হেসে উঠল : গোঁফওয়ালা ভদ্রলোকটিও তাই ওকে নিয়ে মজা করতে শুরু করল।

"অর্থাৎ তুমি কখনও...?' তারা বলল।

"কখনও না।"

তারা তো হেসে খুন। অবশ্য তাদের এরকম হাসির কাবণ 'আমি জানি। এর ফলাফল কি দাঁড়ায় দেখবার জন্য অপেক্ষা করে রইলাম।

প্রিন্স বলল, "এখন চলে এস তো। এখনই!"

"না, কিছুতেই না," সে বলল।

সে বলল, "আসতেই হবে। বড়ই হাসির ব্যাপার হয়ে উঠছে। এক পাত্র টেনে চাঙ্গা হয়ে নাও, তারপর চলে এসো।"

এক বোতল শ্যাম্পেন এনে দিলাম। সেটা গলায় ঢেলে তাবা যুবকটিকে নিয়ে চলে গেল।

মাঝরাতে ফিরে এসে তারা খেতে বসল। অনেকেই এসেছে—সবসেরা লোকরা : আতানভ, প্রিন্স রাজিন, কাউন্ট শুস্তাখ ও মিরৎসভ। তারা সকলেই নেখ্‌ল্যুদভকে অভিনন্দন জানিয়ে হাসতে লাগল। আমাকে ডেকে পাঠাল। গিয়ে দেখি, সকলেই বেশ খোসমেজাজে আছে।

সকলে বলে উঠল, "ওকে অভিনন্দন জানাও!"

"কিসের জন্য?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"কি যেন বলে ব্যাপারটাকে?...দীক্ষা না প্রথম স্বাদ—আমার ঠিক মনে পড়ছে না।"

আমি বললাম, "আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

আর সে বসে বসে লাল হয়ে উঠল, শুধু হাসতে লাগল। আর অন্য সকলের সে কী অট্টহাসি!

যাই হোক, তারপর থেকে সকলেই বেশ খুশি মনে বিলিয়ার্ড-ঘরে আসতে লাগল, কিন্তু নেখ্‌ল্যুদভ বদলে গেল : তার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে, ঠোঁট বেঁকে গেছে, অনবরত হেঁচকি তুলছে, একটা কথাও ঠিকমতো বলতে পারে না। অবশ্য এই প্রথমবার বলেই সে এমন মন-মরা হয়ে আছে। টেবিলে কনুই রেখে সে বলল,

"তোমাদের কাছে এটা হাসির ব্যাপার, কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগছে। কেন এ কাজ করলাম? এজন্য নিজেকে, অথবা প্রিন্সকে জীবনে কোনওদিন আমি ক্ষমা করব না।"

তার চোখে জল এল; সে কাঁদতে লাগল। অবশ্য সে বড় বেশি মদ খেয়েছে; কি যে বলছে তা নিজেই জানে না। প্রিন্স হাসতে হাসতে তার কাছে এগিয়ে গেল।

বলল, "খুব হয়েছে। এ তো তুচ্ছ ব্যাপার! ...বাড়ি চল আনাতোল।"

"কোথাও যাব না। কেন এ কাজ করলাম?" সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বিলিয়ার্ডটেবিল ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। কোনও যুবক যদি এতে অভ্যস্ত না থাকে তাহলে...। তৎক্ষণাৎ সে টেবিলটাকে নষ্ট করে ফেলল। সেজন্য পরদিন আশি রুবল দিয়ে দিলো।

প্রায়ই সে এখানে আসত। একদিন সে এল প্রিন্স ও গোঁফওয়ালা ভদ্রলোকের সঙ্গে। সে তো সব সময়ই প্রিন্সের সঙ্গে ঘোরে। সে একজন পদস্থ কর্মচারী, না কি অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী—ঈশ্বরই জানেন—তবে সকলেই তাকে "ফেদোৎকা" বলে ডাকে। তার চোয়ালের হাড় দুটো উঁচু, দেখতে বিশ্রী, তবে বেশভূষা ভাল, আর আসে গাড়িতে চেপে। ভদ্রলোকরা কেন যে তাকে এত পছন্দ করে তা ঈশ্বরই জানেন। সকলের মুখেই "ফেদোৎকা আর ফেদোৎকা," সকলেই তাকে খাদ্য ও পানীয় দিয়ে খুশি করে, তার হয়ে টাকা খরচ করে। কিন্তু লোকটি বেপরোয়া গোছের! খেলায় হেরে গেলে বাজির টাকা দেয় না, কিন্তু জিতলে—সে কথা আলাদা। আমার চোখের সামনে বড় অতিথি তাকে গালাগালি করেছে, মেরেছে, দ্বৈতযুদ্ধে আহ্বান করেছে।...কিন্তু প্রিন্সের সঙ্গে তার সব সময় গলায়-গলায় ভাব। বলে, "আমি না থাকলে আপনার চলবে না! আমি ফেদোৎকা, অন্য কেউ তা নয়।" এমনই লেজ-নাড়া কথা।

যাই হোক, তারা এসে বলল,

"আসুন, আমরা তিনজন পুল খেলি।"

"ঠিক আছে," তারা বলল।

তিন রুবল বাজি রেখে তারা খেলতে শুরু করল। নেখ্‌লয়ুদভ ও প্রিন্স বক-বক শুরু করে দিলো। বলল, "আহা, কী তার পায়ের গড়ন!"

"পায়ের কথা রেখে দিন—আসল সৌন্দর্য তো তার চুলে।"

তাদের খেলায় মন নেই; কেবলই বক-বক করে চলল। কিন্তু ফেদোৎকা নিজের কাজ ভালই বোঝে; বেশ কৌশলের সঙ্গে খেলে, আর তারা হেরে যায়। ফলে তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে সে ছ' রুবল করে জিতল। ঈশ্বর জানেন, প্রিন্সের সঙ্গে তার লেন-দেনের কি ব্যবস্থা আছে—তারা কেউ কাউকে এক পয়সা কখনও দেয় না; কিন্তু নেখ্‌লয়ুদভ দু'খানা তিন-রুবলের নোট বের করে তাদের দিকে এগিয়ে ধরল।

সে বলল, "না, আপনার কাছ থেকে আমি টাকা নেব না। আসুন আমরা সাধারণ খেলা খেলি—ডবল অথবা কুইট্‌স্; মনে হয় দ্বিগুণ, নয় তো কিছুই না।"

বল সাজিয়ে দিলাম। খেলা শুরু হয়ে গেল। নেখ্‌ল্‌য়ুদভ-এর খেলা শুধু বাহাদুরি দেখানো ব্যাপার; একটা বল পকেটে ফেলবার সুযোগ পেলেই সে বলে : "না, এটা আমি চাই না—এটা বড়ই সহজ।" কিন্তু ফেদোৎকা কখনও খেলায় তাচ্ছিল্য দেখায় না, পর পর পয়েন্ট পেয়ে যায়। অবশ্য তার খেলায় কোনও চমক নেই, হঠাৎই যেন জিতে যায়।

সে বলল, "আবার ডবল বা কুইট্‌স্ খেলা যাক।"

"ঠিক আছে।"

সে আবার জিতল।

বলল, "আমরা যৎসামান্য নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম। আপনার কাছ থেকে এতটা নিতে চাই না। আবার ডবল বা কুইট্‌স্, কেমন?"

"হ্যাঁ।"

পঞ্চাশ রুবল হারবার পরেও নেখ্‌ল্‌য়ুদভ বলল, "আবার ডবল অথবা কুইট্‌স্ খেলা যাক।" এইভাবেই পর পর চলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে দুশ' আশি রুবল হারল। ফেদোৎকা কৌশলটা ভালই জানে : একক বাজিটা হেরে গিয়ে সে ডবলটা জিতে নেয়; আর প্রিন্স সেখানে বসে সব কিছু দেখে আর গম্ভীর হতে থাকে।

সে বলে, "বাজির মাত্রা ঠিক রাখো, মাত্রা ঠিক রাখো!"

কে কার কথা শোনে! বাজির টাকা বেড়েই চলে।

শেষ পর্যন্ত নেখ্‌ল্‌য়ুদভ পাঁচশ' রুবল-এর বেশি হেরে গেল। ফেদোৎকা কিউটা রেখে বলল:

"যথেষ্ট তো হলো? আমি পরিশ্রান্ত।"

আসলে কিন্তু যেখানে টাকার গন্ধ আছে সেখানে সে সূর্যোদয় পর্যন্তও খেলতে রাজী—এটাও তার এক রকম চালাকি। অপর জন তখনও খেলতে আগ্রহী। বলল, "আরও খেলা যাক, আরও খেলা যাক!"

"না, সত্যি আমি শ্রান্ত।...উপরে চলুন। সেখানে শোধ তুলতে পারবেন।"

আমাদের এখানে ভদ্রলোকরা উপর তলায় তাস খেলে। তারা "প্রেফারেন্স" দিয়ে শুরু করে, আর শেষ করে জুয়া দিয়ে।

দেখুন, সেদিন থেকে ফেদোৎকা এমনভাবে নেখ্‌ল্‌য়ুদভকে জালে জড়িয়ে ফেলল যে সে প্রত্যহ আমাদের এখানে আসতে শুরু করল। দু'এক দান খেলেই 'চলো, চলো, উপরে চলো, উপরে চলো!"

সেখানে তারা কি করত ঈশ্বর জানেন, তবে নেখ্‌ল্‌য়ুদভ কেমন যেন বদলে যেতে লাগল, আর ফেদোৎকার হলো পোয়া-বারো।

আগে আগে নেখল্যুদভ থাকত ফিটফাট, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, মাথার চুল সুন্দরভাবে ব্রাশ করা; কিন্তু এখন সে শুধু সকালেই থাকে নিজের মতো; উপরতলা থেকে যখন নেমে আসে তখন তার ঝড়ো কাকের মতো চেহারা, কোটের উপর ধূলো-ময়লা, হাত দুটো নোংরা।

ঐ অবস্থায়ই একদিন সে প্রিন্সের সঙ্গে নিচে নেমে এল। বিবর্ণ মুখ, ঠোঁট কাঁপছে, কি নিয়ে যেন তর্ক চলছে।

সে বলছে, "এ আমি সহ্য করব না; সে কি না আমাকে বলবে..."

—কি যেন একটা কথা বলল?...'অভদ্র" না কি ঐ রকমই কোনও কথা—"আর কোনও দিন সে খেলায় জিততে পারবে না। তাকে আমি দশ হাজার রুবল দিয়েছি, কাজেই সকলের সামনে তার আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল।"

প্রিন্স বলল, 'যেতে দিন ও সব কথা; ফেদোৎকা কি রাগারাগি করবার যোগ্য লোক?"

সে বলল, "না, এ আমি সহ্য করব না।"

সে বলল, "থামুন! ফেদোৎকার সঙ্গে ঝগড়া করবার মতো এত নিচে আপনি নেমে যাচ্ছেন কেমন করে?"

"কিন্তু আরও লোক সেখানে উপস্থিত ছিল যে।"

"বেশ তো, তাতে কি হলা। আপনি যদি চান, সে এখনই আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে।"

সে বলল, "না।"

তারপর তারা ফরাসীতে কি যে বক্ বক্ করতে লাগল আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। তারপর কি হলো বলুন তো? সেদিন সন্ধ্যায়ই তারা ফেদোৎকাকে নিয়ে খেতে বসল এবং তাদের বন্ধুত্ব আগের মতোই চলতে লাগল।

কখনও বা সে একাই এসে পড়ত।

বলত, "কেমন আছ হে? আমি বেশ ভাল খেলি তো?"

আমাদের কাজই তো সকলকে খুশি রাখা। বলতাম, "খুব ভাল।" হা ভগবান!—কোনও রকম বিচার-বিবেচনা না করেই সে বলকে ঠুকতে থাকে। আর যবে থেকে সে ফেদোৎকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছে তখন থেকেই সে টাকা নিয়ে খেলে। আগে সে টাকা নিয়ে খেলা পছন্দ করত না, এমন কি লাঞ্চ বা শ্যাম্পেনের খরচ বাজি রেখেও নয়। প্রিন্স হয় তো কখনও বলত:

"এক বোতল শ্যাম্পেন বাজি রেখে খেলা যাক।"

সে বলত,"না, বরং এমনিতেই শ্যাম্পেনের অর্ডার দিচ্ছি। কে আছ হে! এক বোতল শ্যাম্পেন লাগাও!"

কিন্তু এখন সে টাকা বাজি ধরে খেলে। এখানে এসে সারাটা দিন কারও সঙ্গে

বিলিয়ার্ড খেলে, অথবা উপরে উঠে যায়। কাজেই আমিও নিজের মনে বলি : "সবাই যখন মারছে, তখন আমিই বা বাদ যাই কেন?"

একদিন বললাম, "অনেক দিন হয়ে গেল আপনি তো আমার সঙ্গে খেলেননি স্যার?"

আর অমনি আমরা খেলতে শুরু করলাম।

পাঁচ রুবল জিতবার পরে আমি বললাম, "স্যার, আমরা কি ডবল খেলব, না কুইট্স্?"

সে কোনও উত্তর দিলো না; আগেকার মতো বলল না "বোকা!" কাজেই পর পর আমরা ডবল বা কুইট্স্ খেলতে লাগলাম। আমি প্রায় আশি রুবল জিতে নিলাম। কি রকম বুঝছেন? প্রত্যেক দিন সে আমার সঙ্গে খেলত। তবে সকলের চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করত, কারণ একজন গণনাকারীর সঙ্গে খেলতে সে লজ্জা পেত। একদিন প্রায় ষাট রুবল হারবার পরে সে কিছুটা উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

"পুরো টাকাটা নিয়েই খেলব কি?" সে বলল।

আমি বললাম, "ঠিক আছে।"

আমি জিতলাম।

"এক শ' বিশ আর একশ' বিশ?"

"ঠিক আছে।"

আমি আবার জিতলাম।

"দুশো' চল্লিশ আর দুশো' চল্লিশ?"

"খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে না কি?" আমি বললাম।

সে জবাব দিলো না। খেলা চলল। আবারও আমি জিতলাম।

"চারশো' আশি আর চারশো' আশি?"

আমি বললাম, "আপনার উপরে সুযোগ নেব কেন স্যার? একশ' রুবলে খেলুন, নয় তো খেলা থাক।"

কী ভীষণভাবে সে চেঁচিয়ে উঠল! অথচ কত শান্ত ছিল সে!

সে বলল, "মেরে তোমার হাড় ভেঙে দেব! খেলতে হয় খেলো, না হয় খেলো না!"

বুঝলাম, কোনও উপায় নেই।

বললাম, "তাহলে তিনশ' আশি হোক।"

আমি হেরে যাব ঠিক করেছিলাম।

তাকে চল্লিশ পয়েন্ট ছেড়ে দিলাম। তার বাহান্ন, আর আমার ছত্রিশ।

হলুদ বলটাকে গর্তে ফেলে সে আঠারো পয়েন্ট পেয়ে গেল, কিন্তু আমার বলটা ঠিকই দাঁড়িয়ে রইল।

যাতে পাল্টা ফিরে আসে সেই উদ্দেশ্যে আমি সজোরে বলটাকে মারলাম। কিন্তু ফল হলো না। বলটা সজোরে গর্তে ঢুকে গেল, আর আমি জিতে গেলাম।

"শোনো পিতার"—সে আমাকে পেত্রুশ্‌কা বলে ডাকে না—"সব টাকা তোমাকে এখন দিতে পারছি না, তবে দরকার হলে দু'মাসের মধ্যেই তোমাকে তিন হাজার দিতে পারব।"

তার মুখটা লাল হয়ে উঠল; কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল।

"খুব ভাল কথা স্যার," বলে আমি কিউটা রেখে দিলাম। সে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল; মুখ বেয়ে ঘাম ঝরতে লাগল।

সে বলল, "পিতার, এস আমরা সব টাকাটা দিয়েই খেলি।"

তার প্রায় কেঁদে ফেলবার মতো অবস্থা।

আমি বললাম,

"সে কি, আবার খেলবেন স্যার?"

"দয়া করে খেলো।"

সে নিজে আমার হাতে কিউটা তুলে দিলো। সেটা নিয়ে বলগুলোকে এমনভাবে টেবিলে ছুঁড়ে দিলাম যে সেগুলো মেঝের উপর ছড়িয়ে পড়ল। তারপর বললাম, "ঠিক আছে স্যার।"

তার এতই তাড়া লেগেছিল যে একটা বল সে নিজেই তুলে দিলো। মনে মনে ভাবলাম : "এই সাতশ' আমি বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি না, কাজেই আমি অবশ্যই হারতে পারি।" ইচ্ছা করেই আমি বাজে খেলতে লাগলাম। আর কি হলো বলুন তো?

সে বলল, "আরে, তুমি কি ইচ্ছা করেই বাজে খেলছ নাকি?"

তার হাত কাঁপতে লাগল। একটা বল যখনই পকেটের দিকে গড়াতে শুরু করে তখনই সে তার আঙুল বাড়িয়ে দেয়, তার মুখ বেঁকে যায়, মাথা ও হাত দুটোকে পকেটের দিকে বাড়িয়ে দেয়। আমি বললাম :

"ওতে সুবিধা হবে না স্যার!"

খেলাটা সেই জিতল। আমি বললাম :

"একশ' আশি রুবল নগদ ও একশ' পঞ্চাশ দান খেলা আপনার পাওনা রইল—আমি এবার খেতে যাব।"

কিউটা রেখে আমি খেতে চলে গেলাম।

দরজার পাশে ছোট টেবিলটায় বসে দেখতে লাগলাম, সে কি করে। কি করল ভাবুন তো? ঘরময় পায়চারি করতে লাগল—সে ভাবছে কেউ তাকে দেখছে না—আর এইভাবে চুল ধরে টানছে! বিড় বিড় করে কি যেন বলতে বলতে আবার হাঁটতে শুরু করল এবং আমার হঠাৎ চুল ধরে টানল।

তারপর দিন আষ্টেক আর তাকে দেখতে পেলাম না। তারপর একদিন সে খাবার ঘরে এসে হাজির; মুখ গম্ভীর; বিলিয়ার্ড-ঘরে ঢুকলই না।

প্রিন্স দেখতে পেয়ে বলল, "আসুন, একদান খেলা যাক!"

সে বলল, "না, আর খেলব না!"

"কী বাজে কথা! চলে আসুন!"

সে বলল, "না, আমি খেলব না। আমি খেললে আপনার কিছু ভাল হবে না, কিন্তু আমার ক্ষতি হবে।"

এরপর আরও দশদিন সে এল না। তারপর একটা ছুটির দিন সে ড্রেস-স্যুট পরে এসে দেখা দিলো; সারাটা দিন একটানা খেলল, পরদিন আবার এল, তারপরের দিনও, এবং এইভাবে আবার আগের মতোই চলল। আমি একদিন তার সঙ্গে খেলতে চাইলাম।

সে বলল, "না, তোমার সঙ্গে খেলব না; এক মাসের মধ্যে একদিন এস, তোমার পাওনা একশ' রুবল পেয়ে যাবে।"

ঠিক আছে। এক মাস পরে তার কাছে গেলাম।

সে বলল, "আমার কথা বিশ্বাস করো, আজ টাকাটা নেই, বৃহস্পতিবার এস।"

বৃহস্পতিবার গেলাম। তার ছোট ফ্ল্যাটটা খুব সুন্দর।

বললাম, "কর্তা বাড়ি আছেন কি?"

লোকজনরা বলল, "এখনও ঘুম থেকে ওঠেননি।"

"ঠিক আছে। আমি অপেক্ষা করছি।"

খানসামাটি তার নিজেরই ভূমিদাস—লোকটি বুড়ো, মাথায় পাকা চুল, সরল, কোনওরকম ঘোরপ্যাঁচ জানে না। কাজেই আলাপ জমে উঠল।

সে বলতে লাগল, "এখানে কেন যে পড়ে আছি? মনিব তো সব খুইয়ে বসেছে, অথচ আপনাদের এই পিতার্সবুর্গ-এ মান-সম্মান পাওয়া ভার। দেশ থেকে যখন এখানে এলাম, ভেবেছিলাম পুরনো মনিব—ঈশ্বরের রাজ্য তাঁর হোক!—যখন বেঁচে ছিলেন তখনকার মতোই আমরা থাকতে পারব। প্রিন্স, কাউন্ট ও সেনাপতিদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ চলবে। ভেবেছিলাম, ভাল পণ সমেত কোনও রানির মতো কাউন্টেসকে পাব, আর সম্ভ্রান্ত লোকের মতো বাস করব। কিন্তু এখন তো দেখছি, এক রেস্টুরেন্ট থেকে আর এক রেস্টুরেন্টে ছোটা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই—অতি খারাপ ব্যবস্থা! আপনি তো জানেন, প্রিন্সেস আর্টিশ্‌চেভা আমাদের এক মাসি, আর প্রিন্স বোরোটিন্‌জেভ আমাদের ধর্মপিতা। কি রকম মনে করেন? বড়দিনের সময় তিনি একবার মাত্র এখানে এসেছিলেন, তারপর থেকে আর তার টিকিটাও দেখতে পাইনি! এমন কি তাদের চাকররা পর্যন্ত আমাকে দেখে হাসে; বলে, "দেখছি তোমার মনিব তার বাবার মতো হননি!" একবার তাঁকে বলেছিলাম,

"আপনার মাসির সঙ্গে দেখা করতে যান না কেন স্যার? এতদিন আপনাকে না দেখে তিনি খুব কষ্ট পাচ্ছেন।"

"মনিব বলল, 'সেখানে বড় একঘেয়ে লাগে দোষয়ানিচ!"

"শুনুন কথা। তার যত সুখ এই সব রেস্টুরেন্টে? তিনি যদি কোনও সরকারী চাকরিও করতেন—কিন্তু না, তার নেশা শুধু তাস-পাশা, আর তাতে কারও ভাল হয় না।...আহা, আমরা তো নিজেদের সর্বনাশ করছি, বৃথাই সর্বনাশ করছি! স্বর্গতা কর্ত্রীঠাকুরানি—স্বর্গের রাজ্য তাঁর হোক!—তা অনেক সম্পত্তি আমাদের দিয়ে গিয়েছিলেন : হাজারের বেশি ভূমিদাস আর তিন লাখ রুবল মূল্যের জঙ্গল। উনি তো এখন সব মর্টগেজ দিয়ে বসেছেন, জঙ্গল বেঁচে দিয়েছেন, চাষীদের সর্বনাশ করে বসে আছেন; সেখান থেকে কিছুই আসে না। এ কথা তো সকলেই জানে, মনিব না দেখলে গোমস্তাই হুজুর সাজে। গোমস্তা কি কারও ধার ধারে? সে তো চাষীদের চুষে খাচ্ছে, কিন্তু তারও তো শেষ আছে। তারা ক্ষিধেয় মরে যায় যাক, তার পকেটটা ভরলেই হলো। সারা অঞ্চলের পক্ষ হয়ে দুটি চাষী একদিন নালিশ জানাতে এসেছিল।

"তারা বলল, 'তিনি ভূমিদাসদের সর্বনাশ করছেন।'

"তিনি নালিশ-পত্রটা পড়লেন, প্রত্যেককে দশ রুবল করে দিলেন, আর বললেন, "শিগ্‌গিরই আমি নিজে যাব। টাকাটা হাতে এলেই এখানকার সব মিটিয়ে দিয়ে শহর ছেড়ে চলে যাব।"

"মিটিয়ে ফেলবেনই বটে; এখানে তো ধারের পর ধার করে চলেছেন! আবে, একটা শীতকালে আমরা এখানে এসেছি, এর মধ্যে আশি হাজার রুবলের মতো তো আমরা পেয়েছি, অথচ আজ ঘরে একটা রুবলও নেই! আর এ সবই ওর দান-ধ্যানের ফল। আহা, কী যে সরল মানুষ—কথায় বলে বোঝানো যাবে না। সেই জন্যই তো মরতে বসেছেন, অকারণেই মরতে বসেছেন!"

বুড়ো লোকটি কাঁদতে লাগল।

নেখ্‌ল্যুদভ-এর ঘুম ভাঙল এগারোটা নাগাদ। আমাকে ডেকে পাঠাল।

বলল, "ওরা টাকাটা পাঠায়নি, কিন্তু সে তো আমার দোষ নয়। দরজাটা বন্ধ করে দাও।"

দরজা বন্ধ করে দিলাম।

সে বলল, "দেখো, এই ঘড়িটা বা এই হীরের পিনটা বন্ধক রাখ। তারা এর জন্য তোমাকে একশ' আশি রুবলেরও বেশিই দেবে। পরে টাকাটা এলে আমি ছাড়িয়ে নেব।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে স্যার। আপনার যখন টাকা নেই তখন আর কি করা যাবে : ঘড়িটাই দিন, আপনার হয়ে আমি ওটাকে বন্ধক রাখব।"

দেখেই বুঝতে পারলাম, ঘড়িটার দাম হবে তিনশ' রুবল।

যাই হোক, একশ' রুবলে ওটা বন্ধক রেখে রসিদটা তাকে এনে দিলাম।

বললাম, "আমার আশি রুবল পাওনা রইল, আর ঘড়িটা আপনি নিজেই খালাস করে নেবেন।"

আজও সেই আশি রুবল আমার পাওনাই আছে!

আবার সে প্রতিদিন আমাদের কাছে আসতে লাগল। তাদের মধ্যে কি বোঝাপড়া হয়েছিল আমি জানি না, কিন্তু সে আর প্রিন্স সব সময়ই একত্র চলাফেরা করতে লাগল, অথবা ফেদোৎকাকে নিয়ে উপরে চলে যেত তাস খেলতে। তিন জনের মধ্যে একটা অদ্ভুত হিসাব-নিকাশও ছিল! একজন আরেক জনকে দিতো, সে আবার তৃতীয় জনকে দিতো; ঠিক কে যে কার কাছে ধারে তা বুঝবার উপায় নেই।

দু'বছর ধরে এইভাবে সে প্রায় প্রতিদিন আমাদের কাছে আসত। শুধু তার আগেকার ভাবভঙ্গিটা পাল্টে গেল : সে অনেক বেপরোয়া হয়ে উঠল; অনেক সময় গাড়ি-ভাড়া মিটিয়ে দিতে সে আমার কাছ থেকেও এক রুবল ধার নিত; অথচ তখনও দান প্রতি একশ' রুবল বাজি রেখে সে প্রিন্সের সঙ্গে খেলত।

ক্রমেই শুকিয়ে যেতে লাগল। মুখ পাণ্ডুর ও বিষণ্ণ হতে লাগল। এখানে আসে, সঙ্গে সঙ্গে এক গ্লাস ভেজাল মদের অর্ডার দেয়, কিছু বিস্কুট নেয়, পোর্ট মদের সঙ্গে সেটাকে গলা দিয়ে নামিয়ে দেয়। তবে একটু সতেজ বোধ করে।

কার্নিভাল-এর সময় একদিন এল। একজন হুজারের সঙ্গে খেলতে লাগল।

হুজার বলল, "কিছু বাজি রেখে খেলতে চান কি?"

সে বলল, "নিশ্চয়। কত?"

"এক বোতল বারগান্ডীই হোক?"

"ঠিক আছে।"

দেখুন, হুজারই জিতল। তারপর দু'জনে খেতে বসল। বসেই নেখ্‌লয়ুদভ বলল, "সাইমন, এক বোতল 'ক্লস ভুগিয়োৎ'—আর দেখো যেন বেশ গরম থাকে।"

সাইমন বেরিয়ে গেল। খাবার নিয়ে ফিরল, কিন্তু বোতল আনল না।

"আরে, মদটা?"

সাইমন দৌড়ে গিয়ে মাংস নিয়ে এল।

"মদটা আনো", নেখ্‌লয়ুদভ বলল।

সাইমন কিছুই বলল না।

"তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে এল, আর এখনও মদই নেই।"

সাইমন দৌড়ে চলে গেল। বলল, "মালিক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

রাগে লাল হয়ে নেখ্‌লয়ুদভ টেবিল ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে বলল, "তিনি আবার কি চান?"

মালিক দরজায়ই দাঁড়িয়ে ছিল।

"পাওনা টাকা না দিলে আমি আপনাকে আর ধার দিতে পারব না।"

"কিন্তু আপনাকে তো বলেই দিয়েছি, আগামী মাসের গোড়াতেই সব মিটিয়ে দেব।"

"সেটা আপনার মর্জি, তবে আমি ধার দিয়েই যাব, আর কিছুই পাব না তা তো চলতে পারে না। এমনিতেই হাজার হাজার ফাজিল ধার বে-উসুল হয়ে গেছে।"

সে বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে মশায়, আমাকে নিশ্চয় বিশ্বাস করতে পারেন! বোতলটা পাঠিয়ে দিন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টাকাটা দিয়ে দেব।"

সে আবার দৌড়ে ফিরে গেল।

হুজার জিজ্ঞাসা করল, "কি জন্য ডেকেছিল?"

"এই একটা কথা ছিলো।"

হুজার বলল, "একটু গরম পানীয়ের এই তো সময়।"

"ওহে সাইমন, কি হলো?"

বেচারী সাইমন আবার ছুটল। কিন্তু এবারও মদ এল না। বৃথাই খোঁজা। নেখ্‌ল্যুদভ টেবিল থেকে উঠে আমার কাছে এল।

'ঈশ্বরের দোহাই পেত্রুশ্‌কা, ছ' রুবল ধার দাও।"

তাকে বড়ই বিব্রত বোধ হলো।

"বিশ্বাস করুন স্যার, আমার কাছে নেই! এমনিতেই তো আপনার কাছে আমার অনেক পাওনা।"

"এই ছ' রুবলের জন্য এক সপ্তাহের মধ্যে তোমাকে আমি চল্লিশ রুবল দেব!"

আমি বললাম, "থাকলে আপনাকে ফেরাতাম না; সত্যি বলছি, আমার কাছে নেই।"

কেমন মনে করেন? দাঁত কড়মড় করতে করতে সে ছুটে বেরিয়ে গেল, কপালে করাঘাত করতে করতে পাগলের মতো দালানে এ-ধার ও-ধার দৌড়তে লাগল।

বলল, "হে ভগবান! এ কি হলো?"

সে আর খাবার ঘরে ফিরেই এল না; একটা গাড়িতে চেপে চলে গেল।

সকলে হেসে উঠল! হুজার বলল, "আমার সঙ্গে যে ভদ্রলোক খাচ্ছিলো তিনি কোথায়?"

"চলে গেছেন।"

"কি বলছেন আপনারা—চলে গেছেন? কি বলে গেছেন তিনি?"

সকলে জানাল, "কিছুই বলে যায়নি। গাড়িতে উঠেই দে ছুট।"

"আচ্ছা মাল তো!" সে বলল।

আমি ভাবলাম, এই অপমানের পরে অনেক দিন সে আর এ-মুখো হবে না। কিন্তু পরদিন সন্ধ্যায়ই সে আবার যথারীতি এল। সঙ্গে একটা বাক্স নিয়ে সোজা বিলিয়ার্ড-ঘুরে ঢুকল। ওভারকোটটা খুলে ফেলল।

চোখমুখে অনেক বিরক্তি নিয়ে বলল, "এসো, খেলা যাক।"

একদান খেললাম।

সে বলল, "যথেষ্ট হয়েছে। একটু কগজ-কলম দাও। একটা চিঠি লিখতে হবে।"

কোনও কিছু না ভেবে-চিন্তেই কাগজ এনে ছোট ঘরের টেবিলে রাখলাম।

বললাম, "সব দিয়েছি স্যার।"

তারপর, টেবিলে সে কি যেন লিখেই চলল; তারপর ভুরু কুঁচকে লাফ দিয়ে উঠল।

"গিয়ে দেখো তো আমার গাড়ি এল কি না!"

কার্নিভাল-সপ্তাহের শুক্রবারের ঘটনা; কাজেই আমাদের ভদ্রলোকরা কেউ উপস্থিত ছিল না : সকলেই বল-নাচে চলে গিয়েছিল।

গাড়ির খোঁজ নিতে সবে দরজার বাইরে পা দিয়েছি এমন সময় সে চিৎকার করে ডাকল : "পেত্রুশ্‌কা! পেত্রুশ্‌কা!" তার কণ্ঠস্বরে আতংকের আভাষ।

ফিরে গেলাম। সে দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা কাগজের মতো সাদা। আমাকে দেখছে।

বললাম, "আপনি আমাকে ডাকলেন কি স্যার?"

সে নীরব।

"আপনার কি দরকার স্যার?"

সে নীরব।

"আপনার কি দরকার স্যার?"

এবারেও নীরব।

তারপর বলল, "ওঃ, হ্যাঁ, এস আর একদান খেলা যাক।"

সেই জিতল।

"আমি ভাল খেলতে শিখেছি তো?" সে বলল।

"হ্যাঁ", আমি বললাম।

"ঠিক কথা," সে বলল। "যাও, এবার গাড়িটার খোঁজ নাও।"

আবার সে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

কোনও কিছু না ভেবেই আমি বাইরে গিয়ে দেখলাম, সেখানে কোনও গাড়ি নেই। তাই আবার ফিরে গেলাম।

যেতে যেতে মনে হলো, কেউ যেন কিউ দিয়ে বল মারছে।

বিলিয়ার্ড-ঘরে ঢুকলাম—একটা অদ্ভুত গন্ধ।

তাকিয়ে দেখি রক্তাক্ত দেহে সে মেঝেতে পড়ে আছে; পাশেই একটা পিস্তল পড়ে আছে। এতই ভয় পেয়ে গেলাম যে একটা কথাও বলতে পারলাম না।

পা দুটোকে বার বার ঝাঁকুনি দিতে দিতে সে শরীরটাকে টান টান করল। গলায় একটা ঘর্‌-ঘর্‌ শব্দ হলো; তার পরই সে এলিয়ে পড়ল।

এ রকম একটা পাপের কাজ তাব বেলায় কেন ঘটল—মানে, কেন সে নিজের আত্মাকে ধ্বংস করল—তা শুধু ঈশ্বরই জানেন : এই চিঠিটা ছাড়া আর কিছুই সে রেখে যায়নি, কিন্তু সে তো আমি বুঝি না।

সত্যি, ভদ্রলোকরা কী সব কাজ যে করেন!...ভদ্রলোক—এই তো—ভদ্রলোক।

"মানুষ যা চায় সে সবই ঈশ্বর আমাকে দিয়েছিলেন : অর্থ, সুনাম, বুদ্ধি, ও মহৎ উচ্চাশা। নিজের সুখের জন্য আমার যা কিছু ভাল ছিল সবই আমি কাদায় ফেলে পায়ে দলেছি।

"আমাকে কেউ অসম্মান করেনি, আমি ভাগ্যহীন নই, কোনও অপরাধ করিনি; কিন্তু তার চাইতেও খারাপ কাজ করেছি—আমার অনুভূতি, আমার বিচার-বুদ্ধি, আমার যৌবনকে হত্যা করেছি।

"এমন একটা নোংরা জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি যা থেকে নিজেকে মুক্ত করতেও পারছি না. আবার তাকে মেনে নিতেও পারছি না। আমি কেবলই নিচে নেমে যাচ্ছি, সে পতনকে অনুভব করছি, কিন্তু তাকে রোধ করতে পারছি না।

"আমি যদি অসম্মানিত হতাম, ভাগ্যহীন হতাম, অপরাধী হতাম, সেও যে এর চাইতে ভাল হত। তাহলে তো এই হতাশার মধ্যেও বিষণ্ণ মহত্ত্বের কিছু সান্ত্বনা থাকত। আমাকে যদি অসম্মান করা হতো, তাহলে আমাদের সমাজে স্বীকৃত সম্মানবোধের উর্ধ্বে নিজেকে তুলে নিতে পারতাম, তাকে ঘৃণা করতে পারতাম।

"আমি যদি ভাগ্যহীন হতাম, তাহলে অভিযোগ জানাতে পারতাম। যদি অপরাধ করতাম, তাহলে অনুশোচনার দ্বারা অথবা শাস্তি ভোগ করে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে পারতাম : কিন্তু আমি যে নেহাৎই নীচ, নোংরা আমি তা জানি। আর জানি বলেই নিজেকে তার উপর তুলে নিতে পারছি না।

"আর কিসে আমার এই সর্বনাশ হলো? কোনও শক্তিশালী রিপু কি এর কারণ? না।

"সাতা, টেক্কা, শ্যাম্পেন, মাঝখানের পকেটের হলুদ-সোনা, ধূসর বা রামধনু-রঙের কারেন্সি নোট, সিগারেট, পণ্যা স্ত্রীলোক—এই সবই তো মনে আসছে।

"একটি ভয়ংকর মুহূর্তে আমি নিজেকে ভুলে গিয়েছিলাম, একটি অধঃপতন যা আমি কোনওদিন মুছে ফেলতে পারব না—তারাই আমার সম্বিৎ ফিরিয়ে দিয়েছে। আমি যা হতে চেয়েছিলাম, আমি যা হতে পারতাম, যে অপরিমেয় ব্যবধান আমাকে তা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, সে কথা ভেবে আমি আতংকে শিউরে উঠলাম। আমার যৌবনের স্বপ্ন ও ভাবনা কল্পনায় আবার দেখা দিলো।

"জীবনের, শাশ্বত কালের, ঈশ্বরের যে উজ্জ্বল ভাবনাগুলি এত পরিষ্কারভাবে, এমন প্রবলভাবে আমার মনকে ভরে রেখেছিল তারা আজ কোথায়? যে ভালবাসার শক্তি কোনও একজনের মধ্যে কেন্দ্রায়িত না থেকে আমার মনকে এমন উষ্ণ আনন্দে ভরিয়ে রেখেছিল সে আজ কোথায়? কোথায় গেল আমার উন্নতির আশা যা কিছু

সুন্দর তার প্রতি আমার সহানুভূতি, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি কাজের প্রতি, খ্যাতির প্রতি আমার ভালবাসা? কোথায় গেল আমার কর্তব্যবোধ?

"আমি অপমানিত হয়েছিলাম—সে লোককে দ্বৈতযুদ্ধে আহ্বান করেছিলাম, ভেবেছিলাম যে মর্যাদার দাবী তাতেই পুরোপুরি মিটে গেছে। আমার পাপ ও অহংকারকে চরিতার্থ করতে অর্থের প্রয়োজন ছিল; সেজন্য ঈশ্বর যাদের ভার আমার উপর দিয়েছিলেন সে রকম হাজার হাজার পরিবারের আমি সর্বনাশ করেছি; আমার সেই পবিত্র দায়িত্বের কথা জেনেও নির্লজ্জের মতো সে কাজ করেছি। একজন সম্মানবোধহীন লোক আমাকে বলেছিল যে আমার কোনও বিবেক নেই, আমি চুরি করতেও পারি—তবু আমি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলেছি কারণ তার সম্মানবোধ নেই, কারণ সে বলেছে যে আমাকে আঘাত দেবার ইচ্ছা তার ছিল না। তারা আমাকে বলল যে পবিত্র থাকা হাস্যকর, আর অমনি আমি বিনা ক্ষোভে একটি পণ্যা স্ত্রীলোকের কাছে আমার নিষ্পাপ আত্মাকে—আমার আত্মার ফুলকে বিলিয়ে দিলাম।

"অথচ জীবনের পথে প্রথম পদক্ষেপের কালে আমার তাজা মন, আমার শিশুর মতো সরল অনুভূতি যে পথের হদিস আমাকে দিয়েছিল সেই পথে চললে আমি কত না ভাল, কত না সুখী হতে পারতাম! যে গহ্বরের দিকে আমার জীবনটা এগিয়ে যাচ্ছিল তার থেকে পালিয়ে এসে পুনরায় উজ্জ্বল পথে পা ফেলবার চেষ্টা একাধিকবার আমি করেছি। নিজেকে বলেছি, সাধ্যমতো চেষ্টা আমি করব—কিন্তু পারিনি। একা থাকলেই কেমন অদ্ভুত লাগত, ভয় হতো। যখন সকলের সঙ্গে থাকতাম, তখন আর সেই অন্তরের বাণী শুনতে পেতাম না, ক্রমেই নিচে, আরও নিচে নেমে যেতে লাগলাম।

"অবশেষে এই ভয়ংকর প্রত্যয় আমার মধ্যে জাগল যে আমি আর উপরে উঠতে পারব না; তাই সে চিন্তা ছেড়ে দিয়ে নিজেকে ভুলে থাকতে চেষ্টা করলাম; কিন্তু নিরুপায় অনুশোচনা আমাকে আরও বেশি যন্ত্রণা দিতে লাগল। তারপরই আমার মাথায় ঢুকল আত্মহত্যার চিন্তা—সে চিন্তা অন্যের কাছে ভয়ংকর হলেও আমার কাছে সান্ত্বনাস্বরূপ। কিন্তু সে বিষয়েও আমি হলাম হীন ও নীচ। হুজারের সঙ্গে গতকাল যে বোকামির কাণ্ডটা ঘটে গেল তাতেই আমার অভিপ্রায়কে বাস্তবায়িত করতে দৃঢ়সংকল্প হলাম। সম্মানজনক কিছুই আর আমার মধ্যে রইল না—রইল শুধু অহংকার, আর সেই অহংকারের বশেই জীবনের একটি ভাল কাজ করতে চলেছি। আগে ভাবতাম মৃত্যুর কাছাকাছি এলে আমার আত্মার উন্নতি ঘটবে। আমি ভুল করেছিলাম। আর পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমার অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আমার মতের কোনও রকম পরিবর্তন ঘটেনি। সেই একই ভাবে আমি সব কিছু দেখছি, শুনছি, ভাবছি। ঈশ্বরের ইচ্ছায় মানুষ চিন্তার যে ঐক্য ও স্পষ্টতার অধিকারী

হতে পারে তার পরিবর্তে আমার চিন্তায় রয়ে গেছে সেই একই বিচিত্র সামঞ্জস্যহীনতা, ফলহীনতা, অনিশ্চয়তা ও চপলতা। কবরে যাবার পরে কি ঘটবে সেই চিন্তা আর মাসি আর্টিশ্‌চেভার বাড়িতে কাল আমার মৃত্যুকে ঘিরে কি কথা হবে সেই চিন্তা—দুইই আমার সামনে সমান শক্তি নিয়ে হাজির হয়েছে।"

—১৮৫৫

লুসার্ন

Lucerne

(প্রিন্স নেখ্‌লয়ুদভ-এর স্মৃতি-কথা থেকে)

৮ই জুলাই, ১৮৫৭

গত রাতে লুসার্ন-এ পৌঁচেছি, এবং সব চাইতে ভাল হোটেল সোয়েজার-হফ্‌-এ উঠেছি।

মারে বলেন, লুসার্ন হ্রদের তীরে অবস্থিত প্রাচীন শহর ও রাজধানী লুসার্ন শহর সুইজারল্যান্ডের রমণীয় স্থানগুলির অন্যতম : তিনটে বড় রাস্তা এখানে এসে মিলেছে, আর স্টীম-বোটে চেপে মাত্র এক ঘণ্টায়ই এখান থেকে মাউন্ট রিগি-তে যাওয়া যায়; সেখান থেকেই তো দেখা যায় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৃশ্যাবলী।

এ কথা সত্যি হোক আর নাই হোক, অন্য সব ভ্রমণ-পঞ্জীতেও এই একই কথা লেখা থাকে, আর তাই সব দেশের, বিশেষ করে ইংরেজ পর্যটকরা এখানে এসে ভিড় করে।

একদা যেখানে ছিল একটা ঢাকা-দেওয়া বাঁকানো সেতু, যার দুই কোণে ছিল ভজনালয় আর কড়ি-বরগায় ছিল বিচিত্র কারুকার্য ঠিক সেইখানেই হ্রদের খুব কাছে জাহাজঘাটার উপরে সম্প্রতি গড়ে উঠেছে সোয়েজারহফ্‌ হোটেল-এর চমৎকার পাঁচ-তলা বাড়ি। প্রচুর পরিমাণে ইংরেজদের আগমন এবং তাদের প্রয়োজন, রুচি ও অর্থকে ধন্যবাদ, আজ সেই পুরনো সেতুটাকে ভেঙে ফেলে পাথরের একটা খাড়া জাহাজঘাটা তৈরি হয়েছে; তার উপরেই তৈরি হয়েছে খাড়া চতুষ্কোণ পাঁচ-তলা বাড়ি; তার সামনে বসানো হয়েছে দুই সারি ছোট লিন্ডেন গাছ; আর তারই ফাঁকে ফাঁকে যথারীতি ছোট ছোট সব সবুজ বেঞ্চি পাতা হয়েছে। এটা একটা বেড়াবার জায়গা; খড়ের সুইস্‌-টুপি পরিহিতা ইংরেজ মহিলা এবং আরামদায়ক পোশাকপরিহিতা মজবুত-দেহ ইংরেজ ভদ্রলোকরা এখানে হাঁটতে হাঁটতে তাদেরই জন্য সৃষ্টি এই সৌন্দর্য উপভোগ করে। এই জাহাজঘাটা, বাড়িঘর, লেবু গাছ ও ইংরেজ ভদ্রলোকরা

হয় তো অন্যত্র খুবই মানানসই, কিন্তু এখানকার এই বিচিত্র মহিমায় মণ্ডিত প্রকৃতির অবর্ণনীয় সরলতা ও মাধুর্যের সঙ্গে তারা যেন ঠিক মানানসই নয়।

আমার ঘরে ঢুকে হ্রদের দিককার জানালাটা খুলতেই সেই জলরাশি, সেই পর্বতমালা ও সেই আকাশের সৌন্দর্য দেখে আমার প্রায় অন্ধ ও অভিভূত হবার মতো অবস্থা হয়েছিল। যে অনুভূতি আমার হৃদয়কে কাণায় কাণায় ভরে তুলল, তা আমাকে অস্থির করে তুলল, তাকে প্রকাশ করার তাগিদ আমাকে ব্যাকুল করে তুলল। সেই মুহূর্তে আমার ইচ্ছা হলো কাউকে আলিঙ্গন করি, আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরি, তার সঙ্গে খুনসুটি করি—এক কথায় একটা অসাধারণ কিছু করি।

ছ'টা বেজে গেছে। সারাদিন বৃষ্টির পরে এখন আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। জ্বলন্ত গন্ধকের মতো হাল্কা-নীল লেকের জলে ছোট ছোট নৌকোর বিন্দুগুলি ভাসছে। তাদের পিছনে জলের দাগগুলি ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে। জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম, বিচিত্র সবুজ তীরের কাছে ছড়িয়ে থাকা নৌকোগুলো দূরে সরে যেতে যেতে একসময় পর্বতমালা, মেঘ ও চলমান তুষার-স্তূপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কি হ্রদের জলে, কি পাহাড়ের মাথায় বা আকাশের গায়ে, কোথাও একটা নির্দিষ্ট রেখা নেই, একটা নির্দিষ্ট রং নেই, বা একটা অপরিবর্তনীয় মুহূর্ত নেই : সর্বত্রই গতি অনিয়ম, বিচিত্র আকৃতি, বিভিন্ন রঙের ও রেখার অনন্ত সংমিশ্রণ, আর সে সব কিছুকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে প্রশান্তি, মৃদুতা, একতা ও অনিবার্য সৌন্দর্য। আর এখানে, আমার জানালার ঠিক সামনে, এই অনির্দিষ্ট, সংমিশ্রিত, বন্ধনহীন সৌন্দর্যের মধ্যে জাহাজঘাটার সোজা সাদা রেখাটা, তার লেবু গাছের সারি আর সবুজ বেঞ্চিগুলো নিয়ে বোকামী ও কৃত্রিমতার নিদর্শন হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। ডিনারের আগে পর্যন্ত একাকি সেখানে বসেই কাটিয়ে দিলাম—নির্জনে বসে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে দেখবার আনন্দকে প্রাণভরে উপভোগ করলাম।

সাড়ে সাতটার সময় ডিনারের ডাক পড়ল। একতলার চমৎকারভাবে সাজানো বড় ঘরটায় অন্তত একশ' জন বসবার মতো দুটো টেবিল পাতা হয়েছে। তিন মিনিট ধরে চলল সমাগত অতিথিবৃন্দের নিঃশব্দ চলাফেরা—মেয়েদের পোশাকের খসখসানি, হাল্কা পায়ের শব্দ, অত্যন্ত ভদ্র, সুসজ্জিত ওয়েটারদের সঙ্গে মৃদু কথোপকথন—কিন্তু শেষ পর্যন্ত দামী পোশাকে সুসজ্জিত নারী ও পুরুষে সবগুলি আসনই ভর্তি হয়ে গেল। সুইজারল্যাণ্ডে যেমনটি হয়ে থাকে, অধিকাংশ আগন্তুকই ইংরেজ; কাজেই কঠোর প্রথানুবর্তিতাই এই টেবিলের প্রধান বৈশিষ্ট্য, আর সকলেই সেটা মেনে চলে। চারিদিকে চকচক করছে অত্যন্ত সাদা লেস, অত্যন্ত সাদা কলার, অত্যন্ত সাদা দাঁত—আসল বা নকল—আর অত্যন্ত সাদা গায়ের রং ও হাত। কিন্তু সবগুলি মুখই—তার মধ্যে অনেকগুলি খুব সুন্দর—নিজেদের ভাল-মন্দ নিয়েই ব্যস্ত, কোনও কারণে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না হলে অন্য কারও সম্পর্কে তাদের কোনও

রকম আগ্রহই নেই। আংটি ও দস্তানা পরা অত্যন্ত সাদা হাতগুলি নড়ছে শুধু কলারটা ঠিক করতে, এক টুকরো মাংস কাটতে অথবা মদের গ্লাসটা তুলে নিতে; তাদের চলাফেরায় মনের ভাবের কোনও প্রতিফলন নেই। মাঝে মাঝে কোনও পরিবারের লোকেরা হয়তো এটা-ওটা খাবারের বা মদের মনোরম স্বাদ নিয়ে, অথবা মাউন্ট রিগির আকর্ষণীয় দৃশ্য নিয়ে নিজেদের মধ্যে দু'চারটে কথা বিনিময় করে। এই একশ' লোকর মধ্যে কখনও যদি দু'জন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে তাহলে তার বিষয়বস্তু অবশ্যই হবে আবহাওয়া ও মাউন্ট রিগির উচ্চতা। প্লেটের উপর ছুরি কাঁটাগুলো চলে নিঃশব্দে, একবারে মুখে তোলা হয় অতি সামান্য পরিমাণ খাদ্য, মটরশুঁটি বা অন্য সব্জি মুখে দিতে অবশ্যই ব্যবহার করা হয় কাঁটা । এই ব্যাপক নীরবতায় প্রভাবিত হয়ে ওয়েটাররাও ফিস্‌ফিস্‌ করেই জিজ্ঞাসা করে, কার কি মদ চাই। এ ধরনের ডিনারে বসে আমি সর্বদাই অস্বস্তি ও বিষণ্ণতা অনুভব করি। সব সময়ই মনে হয় আমি যেন কোনও দোষ করেছি, আর সেজন্য শাস্তি ভোগ করছি। ঠিক এই রকম মনে হতো ছেলেবেলায় যখন দুষ্টুমি করলে আমাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে ঠাট্টা করে বলা হতো : "একটু বিশ্রাম করো বাপু।" আর পাশের ঘরে আমার ভাইদের ফূর্তির হল্লা শুনে আমার শিরায় শিরায় তরুণ রক্ত টগবগিয়ে উঠত। গোড়ার দিকে এই ধরনের ডিনারে বসে এই উৎপীড়নের অনুভূতির বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ করতে চেষ্টা করতাম, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা : চারদিকের নিষ্প্রাণ মুখের দিকে তাকিয়ে আমিও নিষ্প্রাণ হয়ে যেতাম। আমার কোনও ইচ্ছা থাকে না, চিন্তা থাকে না, এমন কি দেখবার শক্তিও থাকে না। প্রথম প্রথম প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করতাম; কিন্তু একই স্থানে একই লোকের মুখে হাজার বার বলা কথা ছাড়া অন্য আর একটা কথাও শুনতে পেতাম না। অথচ এই সব বরফ-স্তব্ধ লোকগুলো সকলেই যে নির্বোধ ও অনুভূতিহীন তা তো নয়, বরং তাদের অনেকেরই আমার মতো একটা অন্তর-জীবন আছে, এবং তাদের অনেকের ক্ষেত্রেই সে জীবন আরও জটিল ও আকর্ষণীয়। তাহলে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের ফলে যে আনন্দের সৃষ্টি হয়, জীবনের সে শ্রেষ্ঠ আনন্দ থেকে কেন তারা নিজেদের বঞ্চিত করে রাখে?

অথচ আমাদের প্যারিসের হোটেলে পরিস্থিতিটা আলাদা ছিল। সেখানে বিভিন্ন জাতির, বৃত্তির ও প্রবৃত্তির আমরা বিশটি প্রাণী ফরাসী সামাজিকতার টানে যখন এক টেবিলে জমায়েত হতাম তখন মনে হতো সেটা বুঝি খেলার টেবিল! সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যেত টেবিলের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে কত কথোপকথন; তার ভাষা ভাঙা-ভাঙা, তাতে হাসি-ঠাট্টার রসান দেওয়া। শুনতে কেমন লাগবে সে কথা না ভেবেই যার যা মাথায় আসত বলে ফেলত। আমাদের দলে ছিল দার্শনিক, তার্কিক, প্রতিভাধর ব্যক্তি—সকলেই মিলে মিশে একাকার। সেখানে ডিনার শেষ হবার পরেই যখন-তখন টেবিলটাকে সরিয়ে দিয়ে ধুলোভরা কার্পেটের উপরেই অনেক রাত পর্যন্ত

পল্‌কা নাচের আসর জমাতাম। সেখানে চলত রাগ-অনুরাগের খেলাও; সে খেলায় আমরা হয়তো খুব দক্ষ নই, কিন্তু আমরা মানুষ তো বটে। নানা রোমান্টিক অভিযানের সাক্ষী স্পেনের কাউন্টেস, ইতালির যে পাদরি ডিনারের পরেই "ডিভাইন কমেডি" থেকে আবৃত্তি করে, তুইলেরিস-ফেরৎ মার্কিন ডাক্তার, লম্বাচুলওয়ালা তরুণ নাট্যকার, যে পিয়ানোবাদিনী নিজেই বলেছে যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পল্‌কা তারই সৃষ্টি, যে একদা সুন্দরী বিধবার প্রতিটি আঙুলে তিনটে করে আংটি,—প্রত্যেকের সঙ্গেই আমরা বন্ধুর মতো, মানুষের মতো ব্যবহার করতাম এবং সকলেই কোনও না কোনও মধুর স্মৃতি নিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিতাম। কিন্তু এখানকার এই সব ইংরেজদের পশমী পোশাক, ফিতে, লেস, আংটি ও পমেড-করা চুল দেখে আমি প্রায়ই ভাবি, এদের মধ্যে কত প্রাণ-চঞ্চলা নারীই তো নিজেরা সুখী হতে পারত, আর অপরকেও সুখী করতে পারত। ভাবতে অবাক লাগে, এই যারা এখানে পাশাপাশি বসে আছে তাদের মধ্যে অনেকেরই তো বন্ধু ও প্রেমিক—খুবই সুখী বন্ধু ও প্রেমিক হয়ে উঠতে পারত; অথচ তারা তার কিছুই জানে না, আর ঈশ্বরই জানেন কেন—কোনদিন জানবেও না।

এ ধরনের ডিনারের পরে সর্বদাই যেমন হয়ে থাকে, আমার খুব খারাপ ল্যগতে লাগল; কাজেই খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই আমি উঠে পড়লাম এবং বিষণ্ণ মনে শহরের পথে একটু বেড়াতে বের হলাম। কিন্তু রাস্তাগুলি সরু, নোংরা ও আলোহীন, দোকানগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, পথে চলেছে কিছু মাতাল শ্রমিক, আর খোলা মাথায় কিছু স্ত্রীলোক চলেছে জল আনতে: এ সব দেখেশুনে মন ভাল হওয়া দূরে থাক, বরং আরও খারাপ হয়ে গেল। রাস্তাঘাট এর মধ্যেই বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে, তাই কোনও দিকে না তাকিয়ে এবং কোনও কথা না ভেবেই আবার হোটেলের দিকেই পা বাড়িয়ে দিলাম; মনে আশা, একটু ঘুমুলেই মনের এই বিষণ্ণতাটা কেটে যাবে।

পায়ের কাছের মাটি ছাড়া আর কোনও দিকে না তাকিয়ে জাহাজঘাটা ধরে সোয়েজারহফ্-এর দিকেই এগোচ্ছিলাম, এমন সময় একটা বিচিত্র অথচ অত্যন্ত মধুর ও মনের মতো সুর শুনে চমকে উঠলাম। সুর শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি নতুন করে জেগে উঠলাম, যেন একটা উজ্জ্বল, সানন্দ আলো আমার অন্তরে প্রবেশ করল। সুখে ও আনন্দে মন ভরে উঠল।

আরও কাছে গেলাম, শব্দটা আরও স্পষ্ট হলো। আরও কিছুটা এগিয়ে যেতেই স্পষ্ট শুনতে পেলাম, একটা গীটারের সব ক'টা তার রাতের বাতাসে মধুর সুরে কেঁপে কেঁপে ভেসে যাচ্ছে, এবং কয়েকটি কাঠও মাঝে মাঝে তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। একটা মনোরম মাজুর্কার সুর বাজছে। মনে হচ্ছে শব্দগুলি কখনও কাছে আসছে, আবার কখনও দূরে চলে যাচ্ছে। ঠিক একটা গান নয়, গানের একটি হাল্কা অথচ সুদক্ষ রেখাচিত্র যেন। সেটা কি সুর আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, কিন্তু সুরটা খুব

সুন্দর। গীটারের নরম তারের উচ্ছ্বাস, সেই শান্ত, মধুর সুর, আর অন্ধকার হ্রদ, উজ্জ্বল চাঁদ, উর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা দুটো চূড়া এবং বাগানের কালো পপলার গাছের সারির অদ্ভুত পশ্চাৎপটের উপর একটি নিঃসঙ্গ ছোট মানুষের মূর্তি—সবই বিচিত্র এক অবর্ণনীয় সৌন্দর্যে ভরা—অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল।

জীবনের সব এলোমেলো বিভ্রান্ত ভাবনাচিন্তাগুলি যেন হঠাৎ অর্থ ও আকর্ষণ ফিরে পেল। আমার মনের মধ্যে যেন একটা তাজা সুগন্ধি ফুল ফুটে উঠল। এক মুহূর্ত আগে যেখানে ছিল শ্রান্তি, একঘেয়েমী আর জগতের সব কিছুর প্রতি ঔদাসিন্য, সেখানে হঠাৎ জেগে উঠল ভালবাসা, পরিপূর্ণ আশা এবং জীবনের একটি স্বতস্ফূর্ত আনন্দ। মনে মনে বললাম, "আর আমার কি চাই, কিসের বাসনা? আমার চারদিকেই তো সব রয়েছে—সৌন্দর্য কাব্য। সর্বশক্তি দিয়ে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে তাকে টেনে নাও, তাকে ভোগ করো। আর তোমার কি চাই? সবই তো তোমার আছে, যা কিছু ভাল...।"

আরও কাছে গেলাম। ছোট লোকটিকে দেখে মনে হলো, টাইরল-এর একজন যাযাবর গায়ক। এক পা বাড়িয়ে মাথাটা হেলিয়ে সে হোটেলের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আর গীটার বাজিয়ে একাই নানা স্বরে সুন্দর গান করছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভাল লেগে গেল; আমার মনের একটা পরিবর্তন ঘটিয়েছে বলে তার প্রতি কৃতজ্ঞও হলাম। যতদূর দেখতে পেলাম, তার পরনে একটা পুরনো কালো কোট, ছোট ছোট কালো চুল, মাথায় অতি সাধারণ একটা পুরনো টুপি। চেহারায় শিল্পীসুলভ বৈশিষ্ট্য কিছু নেই, কিন্তু তার এই শিশুর মতো সরল, স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী ও ছোটখাট চেহারা আমার মনকে টানল। আলোকিত হোটেলের সিঁড়িতে, জানালায় এবং ব্যালকনিতে পুরো ঝুলের ঝলমলে পোশাক পরা মহিলারা, অত্যন্ত সাদা কলারওয়ালা ভদ্রলোকরা, জনৈক কুলি ও সোনালী কাজ-করা উর্দিপরা পরিচারকরা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; রাজপথে, হোটেলের সামনেকার অর্দ্ধবৃত্তাকার জায়গাটাতে, আরও দূরের লেবু-বীথিতে সুসজ্জিত ওয়েটাররা, অত্যন্ত সাদা টুপি ও কুর্তা পরা রাঁধুনিরা, গলাগলি করে মেয়েরা ও পথিকরাও একত্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হলো তাদের সকলের মনেই আমার মতো অনুভূতি জেগেছে; তাই তারা নীরবে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে তার গান শুনছে। চারিদিক শান্ত; শুধু মাঝে মাঝে দূরের নদী থেকে তালে তালে একটা হাতুড়ি পড়ার শব্দ আসছে, এবং ফ্রেশেন্‌বুর্গ-এর দিক থেকে ভাড়ুই পাখির একঘেয়ে সতেজ শিসের সঙ্গে মিশে ভেসে আসছে ব্যাঙের কাঁপা-কাঁপা ডাক।

অন্ধকার রাজপথে দাঁড়িয়ে ছোট লোকটি নাইটিঙ্গেল পাখির মতো ছত্রের পর ছত্র, গানের পর গান গেয়ে চলেছে। আমি খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম; তখনও তার গান আমাকে আনন্দ দিতে লাগল। তার নিচু কণ্ঠস্বর খুবই মনোহারী; তার সূক্ষ্মতা,

তার রুচিবোধ ও কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণের মাত্রাজ্ঞান যেমন অসাধারণ তেমনি আশ্চর্য স্বাভাবিক ক্ষমতার পরিচায়ক। প্রতি দুটি ছত্রের পরে পরে সে সুরের যে বৈচিত্র্য তার গানে আনছিল সেটা তার পক্ষে যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনই স্বতস্ফূর্ত।

ভিড়ের মধ্যে, উপরে সোয়েজারহফ্-এ এবং রাজপথে তার গানের সপ্রশংস গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাচ্ছে; সর্বত্র একটা সশ্রদ্ধ নীরবতা বিরাজ করছে। ব্যালকনি ও জানালা ক্রমেই ভরে উঠছে; হোটেলের আলোয় দেখা যাচ্ছে সুসজ্জিত অনেক নরনারী জানালা দিয়ে ঝুঁকে আছে। পথিকরা দাঁড়িয়ে পড়ছে; নদীর তীরে লেবু-বীথির নিচে দলে দলে নর-নারী ভিড় জমিয়েছে। ভিড় থেকে আলাদা হয়ে একটি অভিজাত পরিচারক ও প্রধান রাঁধুনি আমার পাশেই দাঁড়িয়ে চুরুট টানছিল। গানের নেশা বাঁধুনিটিকে যেন পেয়ে বসেছে; গান থেমে আসতেই সে সোৎসাহে এমনভাবে চোখ মারছে, মাথা নাড়ছে আর পরিচারকটিকে জড়িয়ে ধরছে যেন বলতে চাইছে : "কেমন গাইছে এঁ্যা?" পরিচারকটিও ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলো যে এতে তার অবাক হবার কিছুই নেই, এর চাইতে ভাল গান সে অনেক শুনেছে।

গান থামিয়ে গায়ক গলাটা পরিষ্কার করে নিলো। সেই ফাঁকে আমি পবিচারককে জিজ্ঞাসা করলাম লোকটি কে, আর প্রায়ই এখানে আসে কি না।

পরিচারক বলল, "তা—এক গ্রীষ্মে দু'বার আসে। আর্গ থেকে আসে—একেবারেই ভিখারী।"

"তাব মতো আরও অনেকে আসে কি?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"তা তো আসেই," আমার প্রশ্নটা না বুঝেই সে জবাব দিয়ে ফেলল; অবশ্য পবে ভুল বুঝতে পেরে বলল, "না, না, আমাব জানা এই একজনই আসে। এ বকম আর কেউ নেই।"

ঠিক সেই সময় ছোট লোকটি গান থামিয়ে হঠাৎ গীটাবটা নামিয়ে জার্মান আঞ্চলিক ভাষায় কি যেন বলল। আমি তার কিছুই বুঝতে পাবলাম না। কিন্তু অন্য সকলেই হেসে উঠল।

"সে কি বলছে?" আমি জানতে চাইলাম।

"সে বলছে, তার গলা শুকিয়ে গেছে, একটু মদ চাই", পরিচারক বুঝিয়ে বলল।

"আচ্ছা, দেখছি লোকটি খুব মদের ভক্ত।"

হাত নেড়ে বিরক্তি প্রকাশ করে পরিচারক বলল, "হ্যাঁ, এ সব লোক ওই বকমই হয়ে থাকে।"

গায়কটি তখন টুপিটা তুলে গীটারটাকে ঘুরিয়ে হোটেলের দিকে এগিয়ে গেল। মাথাটা পিছনের দিকে হেলিয়ে জানালায় ও ব্যালকনিতে সমবেত ভদ্রজনদের উদ্দেশ করে ফরাসীতে বলল : "ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দ"; যাদুকর যে ভাবে তার শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা দেয় সেই সুরে আধা-ইতালীয় ও আধা-জার্মান

উচ্চারণে সে বলতে লাগল : "আপনারা যদি ভেবে থাকেন যে আমি অনেক উপার্জন করেছি তাহলে ভুল করেছেন। আমি একটা বেচারি শয়তানমাত্র।" একটু থেমে সে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল, কিন্তু কেউ যখন কিছু দিলো না তখন গীটারটায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আবার বলল, "ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দ, এবার আমি আপনাদের শোনাব রিগির সঙ্গীত।'

উপরের শ্রোতারা সব চুপচাপ; তবু পরবর্তী গানের আশায় অপেক্ষা করে রইল; আর তার অদ্ভুত কথা শুনেও কেউ কিছু দিলো না দেখে নিচের ভিড়ের ভিতর থেকে হাসির রোল উঠল। আমি তাকে কয়েকটা সেনিটম দিলাম। আস্তে সেগুলিকে এক হাত থেকে অন্য হাতে নিয়ে সে ওয়েস্ট কোটের পকেটে রেখে দিলো। তখন আবার টুপিটা মাথায় পরে সে মিষ্টি ও সুরেলা টাইবলীয় গান গাইতে শুরু করল। এই শেষ গানটি অগেকার গানগুলির চাইতেও ভাল। ভিড়-করা শ্রোতারা সকলেই গানের প্রশংসা করতে লাগল। গান শেষ করে আবার সে গীটারটা ঘোরালো, টুপিটা খুলে মেলে ধরল, জানালাগুলোর দিকে দু' পা এগিয়ে গেল এবং দুর্বোধ্য ভাষায় বার বার কি যেন বলতে লাগল। ভদ্র শ্রোতারা কিন্তু জানালায় ও ব্যালকনিতে আগেকার মতোই ছবির মতো দলবেঁধে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের দামী পোশাকের উপর আলো পড়ে ঝিকমিক করতে লাগল। কেউ কেউ চাপা গলায় হাত বাড়িয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গায়কটি সম্পর্কেই কথা বলতে লাগল, আবার অনেকে সকৌতুকে তাকে শুধু দেখতে লাগল। ব্যালকনিতে একটা মেয়ের খুশি-খুশি হাসিও শোনা গেল।

নিচের ভিড়ের মধ্যে কথাবার্তা ও হাসি উচ্চতর হলো। গায়কটি তৃতীয় বারের মতো অপেক্ষাকৃত দুর্বল গলায় তার বাঁধা বুলি আউড়ে গেল; এবার কিন্তু কথা শেষ না করেই টুপিটা মেলে ধরল এবং সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে নিল। আর এই দ্বিতীয়বারও উজ্জ্বল সাজে সজ্জিত নারীপুরুষ শ্রোতাদের কেউ তাকে একটা পেনিও দিলো না। জনতা নিষ্ঠুরভাবে হেসে উঠল। গায়কটি আরও বেশ খানিকটা কুঁকড়ে গেল। এক হাতে গীটারটা নিয়ে অন্য হাতে টুপিটাকে মাথার উপর তুলে ফরাসী ভাষায় বলল : "ধন্যবাদ ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দ, আপনাদের শুভরাত্রি কামনা করছি।" সে টুপিটা মাথায় দিলো। জনতা হো-হো হাসিতে ফেটে পড়ল। সুন্দর নরনারীর দল ধীরে ধীরে ব্যালকনি থেকে সরে গেল। নিচের লোকেরা আবার বেড়াতে শুরু করল। গানের সময় যে রাস্তাটা জনহীন হয়ে পড়েছিল সেটা আবার সরগরম হয়ে উঠল; কেউ কেউ দূর থেকে গায়কটিকে দেখে হাসতে লাগল। আমার কানে এল, ছোট লোকটি বিড় বিড় করে কি যেন বলছে। মুখ ঘুরিয়ে সে শহরের পথে পা বাড়াল। ফূর্তিবাজ ভ্রমণকারীরা হাসতে হাসতে কিছুদূর পর্যন্ত তার পিছন পিছন গেল।

আমার মনে যেন ঝড় উঠল। এ সব কিছুর অর্থ বুঝতে পারলাম না। যেখানে ছিলাম সেখানে দাঁড়িয়েই অন্ধকারে ছোট মানুষটির অপসৃয়মান দেহটার দিকে এবং

ভ্রমণরত হাস্যমুখর অনুসরণকারীদের দিকে অর্থহীনভাবে তাকিয়ে রইলাম। আমার কষ্ট হলো, দুঃখ হলো, আর সর্বোপরি এই ছোট মানুষটির জন্য, জনতার জন্য, এমন কি নিজের জন্যও লজ্জা হলো; মনে হলো আমি যেন হাত পেতেছিলাম, কিছুই পাইনি, ভাগ্যে জুটেছে শুধু হাসি। পিছনে একবার তাকিয়ে ব্যথিত হৃদয়ে দ্রুত পদক্ষেপে সোয়েজারহফ্-এর ফটকের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার কি হলো বুঝতে পারলাম না, কিন্তু এটা বুঝতে পারলাম যে গভীর দুঃখে আমার মন ভরে উঠেছে।

উজ্জ্বল আলোকিত প্রবেশ-দ্বারে একটি ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে দেখা হলো। পুরুষটি দীর্ঘকায়, সুদর্শন, মুখে ইংরেজ ফ্যাশনের জুল্‌ফি, মাথায় কালো টুপি, হাতে দামী ছড়ি; ধূসর রেশমী গাউন-পরা, মাথায় ঝকঝকে ফিতে ও সুন্দর লেস বসানো টুপি মাথায় জনৈকা মহিলার হাতে হাত রেখে ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল! সঙ্গে একটি সুন্দর চেহারার মেয়ে; মাথায় সুইস্ টুপি, শনের মতো কোঁকড়া চুলগুলি মুখের উপর এসে পড়েছে। তাদের সামনে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে একটি দশ বছরের মেয়ে; গোলাপি গাল, মোটাসোটা চেহারা, দামী কাজ-করা পোশাক।

তাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনলাম মহিলাটি বলছে, "কী সুন্দর রাত!"

ইংরেজ ভদ্রলোকটি আলস্যভরে বলল, "আঃ!" জীবনটা তার কাছে এতই আরামের যে একটা কথা বলবার ইচ্ছাও যেন তার নেই। এ পৃথিবী তাদের কাছে কত আরামের, কত সহজ ও স্বচ্ছন্দ; তাদের মুখে, তাদের চলাফেরায় অন্য মানুষের জীবনের প্রতি কী অপরিসীম ঔদাসীন্য। আপনা থেকেই একটা তুলনা মাথা চাড়া দিলো। মনে পড়ল, যাযাবর গায়কটি শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় হাস্যমুখর জনতার কাছ থেকে লজ্জায় পালিয়ে গেছে। তখনই মনে হলো যে তার এই অবস্থা এতক্ষণ পাথরের মতো আমার বুকের উপর চেপে বসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে এই লোকগুলির উপর একটা অবর্ণনীয় ক্রোধ আমার মধ্যে ফুঁসে উঠল। দু'বার ইংরেজ ভদ্রলোকটিকে পাশ কাটিয়ে গেলাম আর এলাম, দু'বারই তার পথ আটকে দিয়ে, কনুই দিয়ে তাকে খোঁচা মেরে কী এক অপ্রকাশ্য খুশি অনুভব করলাম। তারপর দ্রুতপদক্ষেপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে অন্ধকার পথ ধরে শহরের দিকে ছুটতে লাগলাম। ছোট লোকটিও সেই পথেই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

পথে তিনজন ভ্রমণরত লোককে দেখতে পেয়ে গায়কটির কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তারা হেসে সোজা সামনের দিক দেখিয়ে দিলো। একা একাই দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছে লোকটি। রাগতভাবে আপন মনেই কি যেন বলছে। তাকে ধরে ফেলে কোথাও বসে এক বোতল মদ খাবার প্রস্তাব করলাম। একবার বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে আগের মতোই দ্রুত হাঁটতে লাগল। তারপর আমার প্রস্তাবটা বুঝতে পেরে থামল।

বলল, "দেখুন, আপনি যখন এতই সদয় তখন আমি আপত্তি করব না। কাছেই একটা ছোট কাফে আছে, সেখানে যেতে পারি।" খোলা পানীয়ের দোকানটা দেখিয়ে বলল, "দোকানটা সাধারণ।"

"সাধারণ" কথাটা শুনে স্বভাবতই আমার মনে হলো যে সেখানে না গিয়ে সোয়েজারহফ্-এ যাওয়াই ভাল। সে অবশ্য ভয়ে ভয়ে বারকতক আপত্তি জানিয়ে বলল যে সোয়েজারহফ্ বড় বেশি ভাল জায়গা, কিন্তু আমার পীড়াপীড়িতে সে আমার সঙ্গেই জাহাজঘাটা ধরে ফিরে চলল; কোনওরকম লজ্জাবোধ না করে মনের সুখে গীটারটা দোলাতে দোলাতে এগিয়ে চলল। কিছু নিষ্কর্মা পথচারী এতক্ষণ আমাদের কথাবার্তা শুনছিল; সম্ভবত টাইরলবাসীটির আরও কিছু গান শোনাবার আশায় তারাও আমাদের পিছু নিল।

গাড়ি-বারান্দার নিচেই একটি পরিচারককে দেখতে পেয়ে এক বোতল মদের ফরমাস করলাম, কিন্তু সে আমাদের দিকে তাকিয়েই হেসে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। বড় পরিচারককে ডেকে ঐ একই ফরমাস করায় সে গম্ভীর মুখে আমার দিকে তাকাল, ভীরু গায়কটিকে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, তারপর কড়া গলায় দরোয়ানকে হুকুম করল আমাদের পাশের ঘরে নিয়ে যেতে। এই ঘরটা সাধারণ মানুষদের মদ খাবার জায়গা; আসবাবপত্র বলতে কাঠের টেবিল ও বেঞ্চি; এক কোণে একটি কুঁজী স্ত্রীলোক বাসনপত্র ধুচ্ছে। যে পরিচারকটি আমাদের অর্ডার নিতে এসেছিল সে একটু গর্বিত হাসি হেসে আমাদের দিকে তাকাল, এবং তাব পরেই পকেটে হাত ঢুকিয়ে কুঁজী দাসীটার সঙ্গে আলাপ চালাতে লাগল। সে যেন আমাদের বোঝাতে চাইছে, গুণপনায় ও সামাজিক মর্যাদায় এই গায়কটির তুলনায় অনেক বড় হলেও আমাদের পরিচর্যা করতে হচ্ছে বলে সে মোটেই অসন্তুষ্ট নয়, বরং তাব বেশ মজাই লাগছে।

একটা সবজান্তা ভাব দেখিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি vin ordinaire (সাধারণ মদ) চাইছেন?" তোয়ালেটা এক হাত থেকে অন্য হাতে নিয়ে সে আমার সঙ্গীর দিকে চোখ টিপল।

ক্রুদ্ধ ও গম্ভীর হবার চেষ্টা করে আমি বললাম, "চাই শ্যাম্পেন, এবং তোমার কাছে সব চাইতে ভাল মাল যা আছে তাই!" কিন্তু কি শ্যাম্পেনের কথা, কি আমার ক্রুদ্ধ গম্ভীর ভঙ্গী, কিছুতেই পরিচারকটি ঘাবড়াল না; দাঁতে দাঁত ঘসল, হাঁ করে আমাদের দেখল, ইচ্ছা করেই হাতের সোনার ঘড়িটায় চোখ রাখল, তারপর এমন ধীরে সুস্থে আস্তে আস্তে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল যেন ভ্রমণে বেরিয়েছে। একটু পরেই সে মদ নিয়ে ফিরে এল; সঙ্গে দু'জন পরিচারক। দু'জনই কুঁজী দাসীটার পাশে বসে সকৌতুক মনোযোগের সঙ্গে আমাদের দেখতে লাগল, ঠিক যে ভাবে বাবা-মা তাদের ছেলেমেয়েদের খেলা করতে দেখে। একমাত্র কুঁজী দাসীটা বিদ্রূপের বদলে সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের দেখতে লাগল। এতগুলো চোখের অগ্নিদৃষ্টির সামনে গায়কটির সঙ্গে কথা বলতে বা তাকে আপ্যায়িত করতে আমি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিলাম, তবু যথাসাধ্য সহজভাবেই আমার কাজ করতে লাগলাম।

আলোকিত ঘরে বসে তাকে আরও ভালভাবে দেখতে পেলাম। দেখতে ছোটখাট, দেহ সুগঠিত, পেশীবহুল, ঠিক যেন একটি ডাঁশ; কোঁকড়া কালো চুল, জলভরা বড় বড় কালো চোখ, অত্যন্ত মনোরম ও আকর্ষণীয় একখানি ছোট মুখ। ছোট জুল্‌ফি, ছোট ছোট চুল, পোশাক সাধারণ ও কমদামী। লোকটি নোংরা, ছিন্নবাস, রোদে-পোড়া চেহারা, ছবি মজুরদের মতো। শিল্পীর বদলে একজন ফেরিওয়ালার মতোই দেখতে। শুধু চকচকে দুটি ভেজা-ভেজা চোখ আর কোঁচকানো মুখেই যা কিছু মৌলিকতা ও আকর্ষণের আভাষ। চেহারা দেখে তাকে পঁচিশ থেকে চল্লিশ যে কোনও বয়সের বলে মনে হতে পারে; আসলে তার বয়স আটত্রিশ।

আন্তরিকতার সঙ্গে বেশ সহজভাবেই তার জীবনের কথা সে আমাকে বলল। এসেছে আরগ থেকে। শিশুকালেই বাবা-মাকে হারিয়েছে। আর কোনও আত্মীয়-স্বজন ছিল না। বিষয় সম্পত্তিও কিছুই ছিল না। একজন ছুতোরের কাছে কাজ শিখছিল, কিন্তু বিশ বছর আগে একটা আঙুলে ক্ষয় ধরায় সে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। ছেলেবেলা থেকেই গান ভালবাসত। তাই গান গেয়েই বেড়াতে লাগল। বিদেশীরা মাঝে মাঝে কিছু দিত। সেটাকেই বৃত্তি হিসাবে বেছে নিল, একটা গীটার কিনল, এবং আঠারো বছর ধরে সুইজারল্যান্ড ও ইতালির হোটেলে-হোটেলে গান গেয়ে বেরিয়েছে। সম্বলের মধ্যে এই গীটারটা ও একটা থলি; এখন তাতে আছে মাত্র দেড় ফ্রাঁ, রাতের থাকা-খাওয়াতেই সেটা ফুরিয়ে যাবে। সুইজারল্যান্ডে যে সব জায়গায় যাত্রীর ভিড়—যেমন জুরিখ, লুসার্ন, ইন্টারলেকেন, চামোনিক্স ইত্যাদি—প্রতি বছরই সেই সব জায়গায় সে যায়; এই আঠারো বার হলো সে ঘুরতে বেরিয়েছে। সেন্ট বার্নার্ড-এর পথে ইতালি গিয়েছিল, ফিরেছে সেন্ট গটহার্ড-এর পথে স্যাভয় হয়ে। এখন হাঁটতে কষ্ট হয়, কারণ ঠাণ্ডা লাগলেই পায়ের সেই ব্যথাটা যাকে Caliedeazucth (বাত) বলে সেটা চাড়া দিয়ে ওঠে, আর চোখ ও গলাও ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। তা সত্ত্বেও সে এখন চলেছে ইন্টারলেকেন, আই-লা-বাঁই ও সেন্ট বার্নার্ড হয়ে ইতালির দিকে; সে দেশটা তার বড়ই প্রিয়; মোটামুটিভাবে তার জীবন নিয়ে সে বেশ সন্তুষ্ট। যখন জানতে চাইলাম কেন সে বাড়ি যাচ্ছে, সেখানে তার আত্মীয়-স্বজন বাড়ি-ঘর বা জমিজমা আছে কিনা, তখন মৃদু হাসিতে মুখটা বেঁকিয়ে সে ফরাসী ভাষায় জবাব দিলো : "হ্যাঁ, চিনি ভাল, তবে বাচ্চাদের মুখেই তা মিষ্টি!" এই বলে সে পরিচারকদের দিকে চোখ টিপল।

তার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না, কিন্তু পরিচারকরা সশব্দে হেসে উঠল।

সে বলল, "আমার কিছুই নেই; থাকলে কি আর এ ভাবে ঘুরে বেড়াই? দেশে যাই, কারণ কে যেন আমাকে দেশের দিকে টানে।"

দুষ্টুমি-ভরা হাসি হেসে সে আগের কথাটারই পুনরাবৃত্তি করল: 'হ্যাঁ, চিনি ভাল!" এবং খোলা মনে সে হেসে উঠল। পরিচারকরাও খুসি হয়ে হাসতে লাগল।

আমি যখন জানতে চাইলাম, যে গানগুলি সে গায় সেগুলি তার নিজের রচনা কি না, তখন প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে সে বলল : "আমি কি করে রচনা করব? ওগুলি সবই প্রাচীন টাইরলীয় সঙ্গীত।"

"কিন্তু ওই রিগি-র গান, ওটা তো প্রাচীন নয়?" আমি বললাম।

সে বলল, "না, ওটা প্রায় পনেরো বছর আগে রচিত হয়েছিল। বাস্‌লেতে একজন চালাক-চতুর জার্মান ছিল। ওটা তারই রচনা। গানটা চমৎকার! কি জানেন, পর্যটকদের জন্যই সে ঐ গানটা বেঁধেছিলো।"

গানটাকে সেও খুব পছন্দ করে। চলতে চলতেই রিগি-র গানটাকে ফরাসীতে অনুবাদ করে সে আমাকে কথাগুলি শুনিয়ে দিলো :

"রিগি পর্যন্ত যদি যেতে চাও।
ওয়েগিস্ পর্যন্ত লাগবে না পায়ের জুতো
(কারণ সে-পথটা তুমি যাবে স্টীমারে)
কিন্তু ওয়েগিস্ পৌঁছে একটা বড় লাঠি নাও হাতে,.
আর সঙ্গিনীকে নাও বাহু-বন্ধনে।
যাত্রারম্ভেই খেয়ে নাও একপাত্র মদ,
কিন্তু সাবধান, বেশি খেয়ো না যেন।
কারণ একপাত্র যে টানতে চায়
তার আগে তাকে অর্জন করতে হবে...

গান শেষ করে সে বলল, "আঃ, চমৎকার গান!"

পরিচারকদেরও বোধ হয় গানটা ভাল লেগেছে; তারা আরও কাছে এগিয়ে এল।

"হ্যাঁ, কিন্তু এ গানটা কার রচনা?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"কারও না! কি জানেন, ওটা আপনা থেকেই আসে—বিদেশীদের শোনাতে হলে নতুন নতুন গান চাই যে।"

বরফ এল। সঙ্গীর জন্য একটা গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢেলে দিলাম। সে যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। পরিচারকদের দিকে তাকিয়ে সে নিজের আসনে নড়েচড়ে বসল। শিল্পীদের স্বাস্থ্য পান করে আমরা গ্লাসে গ্লাস ঠেকালাম; সে আধ গ্লাস খেল, আর তারপরেই গভীর চিন্তায় ভুরু তুলে তাকাল।

"অনেক দিন পরে এত ভাল মদ খেলাম। অবশ্য এ কথাটা শুধু আপনাকেই বললাম।" (শেষের অংশটা সে ফরাসী ভাষায় যোগ করল।) 'ইতালিতে 'ডি' আস্তি' মদ খুব ভাল, কিন্তু এটা আরও ভাল। হায় ইতালি। সেখানে থাকা যে কী চমৎকার!"

তাকে উস্‌কে দেবার জন্য আমি বললাম, "হ্যাঁ, সেখানে লোকে সঙ্গীত ও শিল্পীর কদর বোঝে।"

সে বলল, "না। অন্তত গানের ব্যাপারে সেখানেও আমি কাউকে তুষ্ট করতে পারিনি। পৃথিবীর অন্য যে কোনও জায়গার তুলনায় ইতালির লোকেরা ভাল গান-বাজনা জানে : আমি শুধু টাইরলীয় গান গাই—সেটা অন্তত তাদের কাছে নতুন।"

সোয়েজারহফ্-এ সমবেত ভদ্রজনের বিরুদ্ধে আমার যে ক্ষোভ তাতে তাকেও অংশীদার করবার আশায় আমি বললাম, "সেখানকার ভদ্রজনরা কি আরও উদার? এই যে এখানে একটা মস্ত বড় হোটেলে এত সব ধনী লোকেরা জমা হয়ে একজন শিল্পীর গান শুনল অথচ কেউ তাকে কিছু দিলো না, এটা কি সেখানে ঘটতে পারত?"

আমার প্রশ্নের ফল ফলল আমার আশার বিপরীত। তাদের উপর ক্ষুব্ধ হওয়া দূরে থাক, সে ভাবল আমি তার ক্ষমতা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছি, কারণ সে গান গেয়ে তাদের কাছ থেকে কোনও পুরস্কার আদায় করতে পারেনি। তাই সে নিজের সমর্থনে বলল, "সব সময় কি আশানুরূপ ইনাম জোটে? কখনও হয়তো আমার গলাই খোলে না, অথবা আমি খুব শ্রান্ত থাকি। জানেন, আজ আমি ন' ঘণ্টা ধরে হেঁটেছি আর সারাক্ষণ গান করেছি। এটা কঠিন কাজ। আর বড় বড় লোকেরা, অভিজাত লোকেরা সব সময় টাইরলীয় সঙ্গীত ভালবাসে না।"

আমি তবু বললাম, "তাই বলে তারা কিছুই দেবে না?"

সে আমার কথা বুঝতেই পারল না।

বলল, "তা ঠিক নয়; এখানে আসল কথা হলো, পুলিশের দাপটে সকলেই কাবু থাকে (এ কথাটা সে ফরাসীতে বলল)। এখানকার আইনে পথে-ঘাটে গান গাওয়া নিষিদ্ধ, কিন্তু ইতালিতে আপনি যেমন খুশি গাইতে পাবেন, কেউ একটা কথাও বলবে না। আর এখানে তারা ইচ্ছা হলে গাইতে দিতে পারে, আবার ইচ্ছা না হলে জেলখানাতেও পাঠাতে পারে।"

"সে কি? তাও কি সম্ভব?"

"হ্যাঁ, একবার সাবধান করে দিলেও আপনি যদি আবার গান করেন তাহলে তারা আপনাকে কয়েদ করতে পারে।" যেন একটা সুখের স্মৃতিচারণা করছে এমনিভাবে সে হেসে বলল, "একবার আমি তিন মাস সেখানে ছিলাম।"

আমি বললাম, "কী ভয়ানক কথা! কিন্তু কিসের জন্য?"

আরও উৎসাহিত হয়ে সে বলল, "নতুন আইনের তাই বিধান। গরীব মানুষদেরও যে খেয়ে পরে বাঁচতে হবে এটা তারা বুঝতেই চায় না। কিন্তু আমি যদি পঙ্গু না হতাম, তাহলে কাজই করতাম। কিন্তু আমার গান কি আরও ক্ষতি করে? এ সবের অর্থ কি? ধনীরা খুশিমতো বাঁচতে পারে, আর আমাদের মতো গরীব মানুষদের বাঁচবার অধিকারও নেই। প্রজাতন্ত্রী দেশে কি এ রকম আইন থাকা উচিত? তাই যদি হয় তো সে প্রজাতন্ত্র আমরা চাই না। না কি বলেন স্যার? প্রজাতন্ত্র আমরা চাই না,

আমরা চাই— আমরা শুধু চাই...আমরা চাই''—একটু ইতস্তত করে—''আমবা চাই স্বাভাবিক আইন।''

আমি তার গ্লাসটা ভরে দিলাম।

''তুমি তো চুমুক দিচ্ছ না'', আমি বললাম।

গ্লাসটা হাতে নিযে সে আমাকে অভিবাদন জানাল।

চোখ কুঁচকে আমার দিকে আঙুল নেড়ে সে বলল, ''আপনি কি চান আমি জানি; আপনি দেখতে চান মাতাল হলে আমি কি করি; কিন্তু না, আপনি তা পারবেন না।''

আমি বললাম, ''আমি তোমাকে মাতাল করতে চাইব কেন? আমি শুধু তোমাকে একটু আনন্দ দিতে চাইছি।''

হয়তো আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা করে আমাকে আঘাত দিয়েছে বলে সে দুঃখিত হলো; কারণ বিচলিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে সে আমার কনুইটা চেপে ধরল।

দুটি ভেজা চোখের কাতর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিযে সে বলল. ''না, না, আমি ঠাট্টা করছিলাম মাত্র!''

তারপর আমি যে খুব ভাল মানুষ সে কথা বোঝাবার জন্য সে কতকগুলি সাংঘাতিক রকমের জটিল ও তালগোল-পাকানো কথা বলে যেতে লাগল।

মদ খেতে খেতে আমরা গল্প করতে লাগলাম, আব পরিচারকরা অভদ্রভাবে আমাদেব দেখতে লাগল; মনে হলো যেন আমাদের নিয়ে হাসিঠাট্টাও করছে। ফলে ক্রমেই আমার রাগ বাডতে লাগল। তাদেব মধ্যে একজন উঠে এসে ছোট মানুষটিব মাথাব উপর ঝুঁকে পড়ে হাসতে লাগল। সোয়েজারহফ্-এব অতিথিবৃন্দেব উপবেই আমার মনে অনেক রাগ জমে ছিল; সে রাগ এখনও কারও উপর ঝাডতে পারিনি; কিন্তু এই পরিচারকদের ব্যবহারে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তখনই দবোযানটা এসে টুপি না খুলেই টেবিলের উপব কনুই রেখে আমার পাশে বসে পড়ল। এই ঘটনায় আমার আত্ম-সম্মান বা অহংকারে আঘাত লাগল এবং যে সঞ্চিত ক্রোধ সারাটা সন্ধ্যা আমার মধ্যে ধিকিধিকি জ্বলছিল সেটা সবেগে জ্বলে উঠল। ''ব্যাপারটা কি? আমি যখন হোটেলের ফটকে একা ছিলাম তখন তুমি আমাকে বিনীতভাবে অভিবাদন করেছিলে, আর এখন এই ভবঘুরে গাযকটির সঙ্গে বসে আছি বলে তুমি এমন অভদ্রভাবে আমার গা ঘেঁষে বসবে?'' প্রচণ্ড ক্ষোভে ও ক্রোধে আমি ফেটে পড়লাম।

লাফিয়ে উঠে পরিচারককে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললাম, ''তুমিই বা কি দেখে হাসছ?''

এক পা পিছিয়ে গিয়ে পরিচারক বলল, ''আমি তো হাসিনি; কিছু কবিনি!''

''না, তুমি এই ভদ্রলোককে দেখে হাসছিলে।'' তারপর দরোয়ানকে বললাম, ''খদ্দের উপস্থিত থাকতে কোন্ সাহসে তুমি এখানে ঢুকেছ? এখানে বসেছ? এখানে বসবার স্পর্ধা করো না!''

রাগে গর্ গর্ করতে করতে উঠে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

"এই ভদ্রলোক একজন অতিথি, আর তুমি একটা চাকর; তাকে দেখে হাসবার, তার পাশে বসবার কি অধিকার তোমার আছে; আজ সন্ধ্যায় ডিনারের সময় তুমি আমাকে দেখে হাসনি কেন? আমার পাশে বসনি কেন? তার জামাকাপড় খারাপ আর সে রাস্তায় রাস্তায় গান করে বেড়ায় বলে কি? তাই কি? আর আমি ভাল পোশাক পরি বলে? সে গরীব, কিন্তু আমি জানি সে তোমার চাইতে হাজার গুণ ভাল, কারণ সে কাউকে অপমান করে না, আর তুমি তাকে অপমান করছ!"

আমার শত্রুপক্ষ পরিচাবকটি ভীরু গলায় বলল, "কিন্তু আমি তো কিছু করিনি! তাকে এখানে বসতে কি আমি বাধা দিয়েছি?"

পরিচারকটি আমার কথা বুঝতেই পারেনি; জার্মান ভাষার বক্তৃতাটাই মাঠে মারা গেছে। অভদ্র দরোয়ানটা পরিচারকের পক্ষ নিতে চেষ্টা করতেই আমি তাকেও প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করলাম। কিন্তু সেও আমার কথা বুঝতে না পারার ভাণ করে হাত নাড়তে লাগল। কুঁজী দাসীটা আমার উত্তেজিত অবস্থা দেখে একটা কেলেংকারীর ভয়েই হোক, অথবা আমার সঙ্গে একমত হবার জন্যই হোক, আমার পক্ষ নিল এবং দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে এই বলে তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করল যে আমার কথাই ঠিক; সে আমাকেও শান্ত হতে বলল। দৃঢ়কণ্ঠে সে জার্মান ভাষায় বলল, "এই ভদ্রলোক ঠিক বলেছেন; তুমিও ঠিক বলেছ।" গায়কটির অবস্থা তখন শোচনীয়; সে বেশ ভয় পেয়েছে; আমার উত্তেজনার হেতু কি, আমি কি বলতে চাইছি, সে সব না বুঝেই সে আমাকে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে যেতে বলল। কিন্তু আমার ক্রুদ্ধ বক্তৃতার অগ্নি শিখা আরও দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। সব কিছু মনে পড়ে গেল; যে জনতা তাকে দেখে হেসেছিল, যে শ্রোতার দল তাকে কিছুই দেয়নি—কাজেই কোনও মতেই আমি শান্ত হতে পারি না। মনে হচ্ছে, পরিচারক দুটি ও দবোয়ান যদি ওভাবে দোষ স্বীকার না করত তাহলে আমি হয়তো তাদের সঙ্গে লড়াইয়েই নেমে পড়তাম, অথবা লাঠি দিয়ে অসহায় ইংরেজ তরুণীটির মাথায় সপাং সপাং করে আঘাত করে বসতাম। সেই মুহূর্তে আমি যদি সেবাস্তাপোল-এ থাকতাম তাহলে হাসতে হাসতে ইংরেজদের একটা পরিখায় ঢুকে তাদের কুচি কুচি করে কাটতাম।

হাতটা চেপে ধরে দরোয়ানকে আটকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আর অন্য কাউকে এখানে না এনে আমাকে আর এই ভদ্রলোককেই বা তুমি এই ঘরে ঢোকালে কেন? তার চেহারা দেখেই তুমি কি করে বুঝলে যে এই ভদ্রলোককে এখানে বসাতে হবে, অন্য ঘবে নয়? হোটেলের যারা টাকা দেবে তারা সকলেই-কি সমান নয়—শুধু প্রজাতন্ত্রী দেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই? তোমাদের এ প্রজাতন্ত্র তো রোগগ্রস্ত!...এই তোমাদের সাম্য! অথচ যে ইংরেজরা এই ভদ্রলোকের গান শুনে তাকে কিছুই দিলো

না—অর্থাৎ যৎসামান্য সেন্টিম যা একে দেওয়া তাদের উচিত ছিল তাও তারা প্রত্যেকেই চুরি করল—সেই ইংরেজদের তুমি এখানে বসাতে সাহস পেলে না? তাহলে আমাদের এখানে ঢোকাবার সাহস তোমার এল কোত্থেকে?"

দরোয়ান জবাব দিলো, "অন্য ঘরটা বন্ধ।"

আমি চেঁচিয়ে বললাম, "না! এ কথা সত্য নয়—ওটা বন্ধ নয়।"

"আপনি তাহলে বেশি জানেন।"

"জানিই তো! আমি জানি তুমি মিথ্যা বলছ।"

সে বিড়বিড় করে বলল, "তাহলে আর কথা বলে কি লাভ?"

আমি চিৎকার করে বললাম, "না, লাভ-লোকসানের কথা নয়, এখনই আমাদের অন্য ঘরে নিয়ে চলো।"

কুঁজী দাসী ও গায়কটির অনেক অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও আমি প্রধান পরিচারককে ডেকে পাঠিয়ে সঙ্গীটিসহ অন্য ঘরে চলে গেলাম। আমার ক্রুদ্ধ গলা শুনে আর উত্তেজিত মুখ দেখে প্রধান পরিচারক আমার সঙ্গে কোনও রকম তর্ক করল না, বিদ্রূপাত্মক ভদ্রতার সঙ্গে বলল, আমি যে ঘরে খুশি যেতে পারি। আমি অন্য ঘরে যাবার আগেই দরোয়ানটি সেখান থেকে সরে পড়ায় তাব মিথ্যা কথার জন্য কোনওরকম শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারলাম না।

ঘরটা সত্যি খুব খোলামেলা ও আলোয় ভরা। একটি টেবিলে সেই মহিলাটিকে নিয়ে একজন ইংবেজ খানা খাচ্ছিল। আমাদেব অন্য একটা টেবিল দেখানো সত্ত্বেও নোংরা গায়কটিকে নিয়ে আমি ইংরেজটির খুব কাছেই বসলাম এবং অসমাপ্ত বোতলটা এখানে এনে দিতে হুকুম করলাম।

ইংরেজ ভদ্রলোক ও মহিলাটি প্রথমে সবিস্ময়ে এবং পরে সক্রোধে আমার পাশে বসা ছোট মানুষটিকে দেখতে লাগল। লোকটির অবস্থা তখন প্রায় মরার সামিল। দু'জনে কি যেন বলল, আর মহিলাটি প্লেটটা ঠেলে সরিয়ে দিলো। পোশাকেব খসখস শব্দ তুলে তারা বেরিয়ে গেল। দরজার কাঁচের ভিতব দিয়ে দেখতে পেলাম, ইংরেজটি আমাদের দেখিয়ে সরোষে পরিচারককে কি যেন বলছে। পরিচারক দরজার ফাঁক দিয়ে গলা বের করে আমাদের একবার দেখল। আমিও সানন্দেই অপেক্ষা করে থাকলাম; আমাদের বেব করে দেবার জন্য একবার এলে হয়, তাহলেই মনের সব রাগটা তাদের উপরেই ঝাড়বার একটা সুযোগ পেয়ে যাব—কিন্তু সৌভাগ্যবশত তারা আমাদের বিরক্ত করতে এলই না।

গায়কটি এর আগে মদ খেতে আপত্তি করলেও এখন তাড়াতাড়ি বোতলটা খালি করে ফেলল, যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যেতে পারে। অবশ্য তাকে আপ্যায়িত করার জন্য সে আন্তরিকভাবেই আমাকে ধন্যবাদ জানাল। তার ভেজা চোখ দুটি আরও অশ্রুপূর্ণ ও চকচকে হয়ে উঠল; একটা অদ্ভুত, এলোমেলো

ছোট বক্তৃতায় সে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করল। বক্তৃতাটি কিন্তু আমার খুব ভাল লাগল। সে বলল, আমার মতো সকলেই যদি শিল্পীদের শ্রদ্ধা করত তাহলে তার দুঃখ ঘুচে যেত; সে আমার সর্ববিধ সুখও কামনা করল। ঘর থেকে বেরিয়ে আমরা গাড়ি-বারান্দার নিচে গেলাম। পরিচারকরা সেখানেই ছিল, আর আমার শত্রু সেই দরোয়ানটা বোধ হয় তাদের কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করছিল। মনে হলো তারা সকলেই আমাকে পাগল বলে ধরে নিয়েছে। ছোট মানুষটি ঠিক তাদের সামনাসামনি পৌঁছতেই যথাসম্ভব শ্রদ্ধা দেখিয়ে আমার টুপিটা খুলে তার অস্থিসার শুকনো আঙুলসহ হাতটাকে চেপে ধরলাম। পরিচারকরা এমন ভাব দেখাল যেন আমাকে দেখতেই পায়নি; একজন তো বিদ্রূপের হাসিই হেসে উঠল।

অভিবাদন জানিয়ে গায়কটি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল, আমিও ঘরে ফিরে গেলাম। এই সব অভিজ্ঞতার কথা এবং যে ছেলেমানুষী রাগ অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে পেয়ে বসেছিল সে সব ভুলে গিয়ে একটু ঘুমনো দরকার। কিন্তু মনটা এতই উত্তেজিত ছিল যে ঘুম এল না; তাই মাথাটা ঠাণ্ডা করবার জন্য আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম কিছুটা হেঁটে বেড়াবার উদ্দেশ্য নিয়ে; অবশ্য মনেব মধ্যে এ আশাও ছিল যে এই সুযোগে দরোয়ান, পরিচারক অথবা ইংরেজটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে তাদের নিষ্ঠুর ও অন্যায় আচরণের কথা তাদের বুঝিয়ে দিতে পারব। কিন্তু একমাত্র দরোয়ান ছাড়া আর কারো সঙ্গেই দেখা হলো না; সেও আমাকে দেখেই মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল; আমিও নদীতীর বরাবর সম্পূর্ণ একাকি বেড়াতে লাগলাম।

মাথা কিছুটা ঠাণ্ডা হলে ভাবতে লাগলাম, "শিল্প-কলার কী বিচিত্র নিয়তি! সকলেই তাকে চায়—সকলেই তাকে ভালবাসে—এই একটি জিনিস যা প্রত্যেকেই জীবনে চায়, খুঁজে বেড়ায়, অথচ কেউ তার শক্তিকে স্বীকাব কবে না, পৃথিবীতে তার মহৎ অবদানের মূল্যকে স্বীকার করে না, আর যারা সে জিনিস মানুষকে দান করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধাও পোষণ করে না, কৃতজ্ঞতাও বোধ করে না। সোয়েজারহফ্-এর এই সব অতিথিদের যাকে ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করুন, পৃথিবীতে সব চাইতে বড় জিনিস কি, তারা প্রত্যেকেই, অথবা শতকরা নিরানব্বই জনই বলবে যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বস্তু হচ্ছে অর্থ! সে আরও বলবে, 'এ কথা শুনতে হয়তো আপনাদের ভাল লাগছে না এবং আপনার উচ্চ আদর্শবাদেব সঙ্গেও খাপ খাচ্ছে না, কিন্তু তার কি কবা যাবে বলুন, মানুষের জীবনই এমনভাবে গড়া হয়েছে যে একমাত্র অর্থই তাকে সুখ দিতে পারে। পৃথিবীটাকে তো তার সত্য স্বরূপেই দেখতে হবে, অর্থাৎ দেখতে হবে সত্যকে।"

"আপনাদেব যুক্তিকে ধিক, আপনাদের সুখের বাসনাকে ধিক, আপনারা এতই দুর্ভাগ্য যে কি চান তাই জানেন না...আপনারা সকলেই দেশ ছেড়েছেন, আত্মীয়-স্বজনকে ছেড়েছেন, কাজকর্ম ছেড়েছেন, অর্থনৈতিক বিষয়-আসয় ছেড়েছেন—সব

ছেড়ে সুইজারল্যান্ডের এই ছোট শহর লুসার্ন-এ জড়ো হয়েছেন কেন? আজ সন্ধ্যায় ব্যালকনিতে জড়ো হয়ে সশ্রদ্ধ নীববতার সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে ঐ ভিখারিটার গান শুনছিলেন কেন? আর সে যদি গানের পর গান গেয়ে যেত, তাহলে আপনারা চুপচাপ শুনে যেতেন। কিন্তু কত টাকা, লাখ লাখ টাকা পেলে আপনারা সব কিছু ছেড়ে লুসার্ন-এর মতো এই ছোট কোণটিতে এসে জমায়েত হতেন? টাকার জন্য কি আপনারা এই সব ব্যালকনিতে জড়ো হয়ে আধ ঘণ্টা নীরব নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন? না! একটিমাত্র জিনিসই আপনাদের সক্রিয় করে তুলতে পারে, জীবনে একটিমাত্র প্রেরণাই প্রচণ্ড শক্তিতে আপনাদের প্রভাবিত করতে পারে, সেটা হচ্ছে শিল্প-কলার প্রয়োজন; আপনারা হয়তো কথাটা স্বীকার করবেন না, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত মানবিকতার এতটুকুও আপনাদের মধ্যে বেঁচে আছে ততদিন এ সত্যকে আপনারা অন্তরে উপলব্ধি করবেন—চিরকাল করবেন। 'শিল্প-কলা' কথাটা আপনাদের কাছে হাস্যকর মনে হতে পারে। এটাকে আপনারা বিদ্রূপাত্মক তিবস্কার হিসাবে ব্যবহার করতে পাবেন; হয়তো ছোট ছেলেদের বেলায় এবং বোকা মেয়েদের বেলায় কাব্য-প্রীতিকে আপনারা মেনেও নেন, অবশ্য তখনও নিজেরা তা নিযে হাসহাসিই করেন; কিন্তু নিজেদের জন্য চাই আপনাদের ইন্দ্রিযগ্রাহ্য কিছু কঠিন বস্তু। কিন্তু শিশুরা জীবনকে দেখে সুস্থ দৃষ্টিকোণ থেকে, মানুষের যাকে ভালবাসা উচিত, যা মানুষকে সুখ দান করে, শিশুরা তাকেই ভালবাসে, কিন্তু জীবন আপনাদেব এতই নীচে টেনে নামিয়েছে, এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছে যে, আপনাবা যা ভালবাসেন তাকে দেখেই হাসেন, আর যাকে আপনাবা ঘৃণা কবেন, যা আপনাদের দেয দুঃখ, একমাত্র তাকেই আপনাবা খুঁজে বেড়ান। জালে আপনারা এতই জডিয়ে পড়েছেন যে, এই যে টাইরলবাসী একটি বেচাবি আপনাদেব মনকে এতখানি আনন্দ দিলো তার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধটুকু পর্যন্ত আপনাদেব নেই; অথচ কোনও রকম সুখ বা সুবিধা না পেয়েও একজন লর্ডের কাছে আপনাবা স্বেচ্ছায় মাথা নত কবে থাকেন, এবং যে কাবণেই হোক তার জন্য নিজেদেব আরাম ও সুবিধাকে বলি দিযে থাকেন। কী নির্বুদ্ধিতা! কী দুর্বোধ্য নির্বুদ্ধিতা!.. এই লোকটি পরিশ্রম করেছে আপনাদের আনন্দ দিয়েছে, তার কষ্টের বিনিময়ে আপনাদেব অসীম প্রাচুর্যের সামান্য একটা অংশ পাবার আশায সে হাত পেতেছে, কিন্তু আপনারা সুউচ্চ আলোকিত প্রাসাদ থেকে তার দিকে তাকিয়ে শুধু উদাসীন হাসি হেসেছেন, আপনাদেব মতো একশ' জন সুখী, ধনী মানুষের মধ্য থেকে একজনও তার দিকে কিছু ছুঁড়ে দেননি। অপমানিত হবে সে চলে গেছে, নির্বোধ জনতা হাসতে হাসতে তার পিছু নিয়েছে; অপমান করেছে তাকে—আপনাদের নয়, যেহেতু আপনারা উদাসীন, নিষ্ঠুর, অসৎ; যেহেতু তার দেওয়া আনন্দ আপনারা চুরি করছেন, তাই তারা তাকেই অপমান করেছে।"

"১৮৫৭-র ৭ই জুলাই তারিখে লুসার্ন-এব যে হোটেল সোযেজারহফ্-এ সব

চাইতে ধনী মানুষরা থাকে তারই সম্মুখে একটি ভবঘুরে ভিখারী গায়ক আধ ঘণ্টা ধরে গান করেছে, গীটার বাজিয়েছে। প্রায় একশ' মানুষ সে গান-বাজনা শুনেছে। গায়ক তিন-তিনবার তাদের কাছে কিছু চেয়েছে। কিন্তু তাদের ভিতর থেকে একজনও তাকে কিছু দেয়নি, বরং কেউ কেউ তাকে দেখে হেসেছে।''

এটা উপন্যাস নয়, বাস্তব ঘটনা; সোয়েজারহফ্ হোটেলে ৭ই জুলাই তারিখে কোন্ কোন্ বিদেশী বাস করছিল, কাগজপত্র থেকে সেটা জেনে নিয়ে সোয়েজারহফ্-এর যে কোনও স্থায়ী অধিবাসীর কাছ থেকে এ বিবরণের সত্যতা যাচাই করে নেওয়া যেতে পারে।

আমাদের ইতিহাসকারদের উচিত অগ্নির অক্ষয় অক্ষরে এ ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করে রাখা। সংবাদপত্র ও ইতিহাসের পাতায় সাধারণত যে ধরনের ঘটনা ছাপা হয়ে থাকে এ ঘটনা তাদের চাইতে অনেক বেশি অর্থবহ, অনেক গুরুতর। ইংরেজরা আরও এক হাজার চীনাকে হত্যা করেছে কারণ তারা টাকা দিয়ে কিছুই কেনে না, অথচ তাদের দেশে জমে আছে প্রচুর ধাতুর মুদ্রা; ফরাসীরা আরও এক হাজার আরবকে হত্যা করেছে কারণ আফ্রিকায় সহজেই গমের ফলন হয় এবং সৈনিকদের নিয়মিত অনুশীলনের জন্য অবিরাম যুদ্ধ চালানোটা বড়ই দরকার; নেপলস্-এ তুরস্কের রাজদূত কখনও ইহুদি হতে পারবে না; সম্রাট নেপোলিয়ন পায়ে হেঁটে প্লোম্‌বিয়েরেস-এ গিয়ে ছাপার অক্ষরে জনসাধারণকে কথা দিয়েছেন যে তিনি সমগ্র জাতির ইচ্ছানুসারেই শাসনভার হাতে নিয়েছেন—এই সব বিবরণের আড়ালে অনেক দিনের জানা তথ্যই হয় লুকিয়ে রাখা হয়েছে, নয়তো প্রকাশ করা হয়েছে; কিন্তু আমার মনে হয়, ৭ই জুলাই লুসার্ন-এ যা ঘটেছে সেটা সম্পূর্ণ নতুন ও বিস্ময়কর; চার্চে শুধু যে মানব প্রকৃতির চিরদিনের খারাপ দিকটাই প্রকাশ পেয়েছে তাই নয়, সমাজবিবর্তনের একটা অধ্যায়ও তাতে আঁকা পড়েছে। এ ঘটনা শুধু মানুষের কাজের ইতিহাসে লিখে রাখবার মতো নয়, একে লিখে রাখতে হবে অগ্রগতি ও সভ্যতার ইতিহাসের পাতায়।

এই অমানুষিক ঘটনা কেন ঘটল? যে ঘটনা কোনও জার্মান, ফরাসী অথবা ইতালীয় গ্রামে ঘটা অসম্ভব, সেই ঘটনা এই জায়গায় যেখানে সভ্যতা মুক্তি ও সাম্যকে সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখানে অত্যন্ত সুসভ্য সব জাতির অত্যন্ত সুসভ্য সব পর্যটকরা এসে সমবেত হয়েছে, সেখানে ঘটা সম্ভব হলো কেমন করে? যে সব উন্নত মানবিকবোধসম্পন্ন মানুষ সমষ্টিগতভাবে যে কোনও মহৎ মানবিক কর্ম সম্পাদনে সক্ষম, একটি ব্যক্তিগত দয়ার কাজ করতে তাদের এতটুকু মানবিক সদিচ্ছা হলো না কেন? এই সব লোক যারা পার্লামেন্টে, জনসভায়, সমিতির অধিবেশনে ভারতবর্ষে অবিবাহিত চীনাদের অবস্থা নিয়ে, আফ্রিকায় খৃস্টধর্ম ও শিক্ষার প্রসার নিয়ে, সমগ্র মানবজাতির উন্নতির জন্য সমিতি প্রতিষ্ঠা নিয়ে এত

গভীরভাবে চিন্তিত,—সেই সব লোকই তাদের অন্তরে মানবিক সহমর্মিতার সরল মৌলিক অনুভূতিটুকুও খুঁজে পেল না কেন? এও কি সম্ভব যে এই অনুভূতিই তাদের নেই, এবং তার স্থানটি দখল করে নিয়েছে অহংকার, উচ্চাকাংখা ও অর্থলালসা? এ কি হতে পারে যে, সভ্যতা নামক স্বার্থপর মানবগোষ্ঠিটাই মানুষের মৌলিক ভাবগত ঐক্যের প্রয়োজনকে ধ্বংস করে ফেলেছে? আর এও কি সম্ভব যে এরই জন্য ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্যই এত নির্দোষ মানুষের রক্ত ঝরেছে, আর এত সব অপরাধ সংঘটিত হয়েছে?

"আইনের উর্ধ্বে সাম্য?" কিন্তু মানুষের সম্পূর্ণ জীবনটা কি আইনের পরিধিতেই সীমাবদ্ধ? জীবনের হাজার ভাগের এক ভাগ আইনের উপর নির্ভর করে, বাকিটা তার আওতার বাইরে, সামাজিক রীতিনীতি ধ্যান-ধারণায় বিধৃত। এ সমাজে পরিচারক একজন গায়ক অপেক্ষা অনেক ভাল পোশাক পরে এবং নির্বিঘ্নে তাকে অপমান করে। পরিচারকের তুলনায় আমি ভাল পোশাক পরি, তাই নির্বিঘ্নে তাকে অপমান করতে পারি। দরোয়ান আমাকে তার চাইতে উঁচুদরের এবং গায়ককে নিচুদরের লোক বলে মনে করে; আমি যখন গায়কের সঙ্গে যোগ দিলাম, অমনি সে নিজেকে আমাদের সমান বলে ভাবল এবং আমাদের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করল। আমি যখন দরোয়ানকে ধমকে দিলাম, তখনই সে বুঝতে পারল যে সে আমার চাইতে নীচু দরের। দরোয়ান গায়কটির প্রতি উদ্ধত ব্যবহার করাতেই গায়ক নিজেকে তার চাইতে ছোট বলে ভাবল। যে দেশে একটিমাত্র নাগরিকও কারও কোনও ক্ষতি না করে নিজেকে অনাহার থেকে বাঁচাবার জন্য তার সাধ্যায়ত্ত একটি কাজ করার অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করে, তাকে কি স্বাধীন দেশ বলে? অথচ লোকে একেই বলে পূর্ণ স্বাধীনতা।

মানুষ কী ভাগ্যহীন করুণার পাত্র! স্থির সিদ্ধান্ত নেবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ভাল ও মন্দ এবং ঘটনা, ধারণ, ধারণা ও স্ববিরোধিতার এক চির চলমান, সীমাহীন সমুদ্রের মধ্যে সে নিক্ষিপ্ত হয়েছে! একদিকে ভাল ও অন্য দিকে মন্দকে রাখবার জন্য মানুষ যুগ যুগ ধরে সংগ্রাম করে আসছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে যায়; যখনই কোনও নিরপেক্ষ মন ভাল ও মন্দকে তুলাদণ্ডে চাপায় তখনই দেখা যায় দুটো দিকই সমান ভারী; ভাল ও মন্দের আনুপাতিক হার অপরিবর্তিতই থাকে। মানুষ যদি ভাল-মন্দের বিচার করতে না শিখত, সুস্পষ্টভাবে চিন্তা করতে না শিখত. যে সব প্রশ্ন সব উত্তরের অতীত তার উত্তর দিতে না শিখত, তাহলেই ভাল হতো! সে যদি শুধু এই কথাটা বুঝত যে প্রতিটি চিন্তাই একাধারে মিথ্যা ও সত্য! মানুষ সত্যের পূর্ণ রূপকে ধরতে পারে না বলেই একটা দিককে আঁকড়ে ধরে বলে সেটা মিথ্যা, আর মানুষের একটি প্রচেষ্টার প্রকাশ হিসাবে সেটাই সত্য।

ভাল ও মন্দের চির চলমান সীমাহীন বিশৃঙ্খলার মধ্যে মানুষ নিজেদের মতো করে

গণ্ডীর পর গণ্ডী টেনেছে; সমুদ্রের বুকে কাল্পনিক রেখা টেনে টেনে সে আশা করেছে যে সমুদ্রটাও বুঝি সেইভাবেই নিজেকে ভাগ করে ফেলেছে। "সভ্যতা ভাল, বর্বরতা মন্দ। মুক্তি ভাল, পরাধীনতা মন্দ।" এই কাল্পনিক জ্ঞান মানুষের স্বভাবের অন্তর্নিহিত দয়াপ্রবণতাকে ধ্বংস করে। আবার মুক্তি কি, স্বৈরাচার কি, সভ্যতা কি, বর্বরতা কি—সে সংজ্ঞাই বা কে দেবে? এ দুইয়ের মাঝখানে কোথায় সীমারেখা? কার অন্তরে আছে ভাল ও মন্দের সেই নিঃশর্ত মানদণ্ড যার সহায্যে এই সব বিশৃঙ্খল, নিয়ত পরিবর্তনশীল ঘটনাবলীর পরিমাপ সে করবে? স্থবির অতীতের ঘটনাবলীকে বুঝবার মতো, পরিমাপ করবার মতো এত বড় মনই বা কার আছে? আর এমন অবস্থাই বা কে দেখেছে যেখানে ভাল ও মন্দের সহাবস্থান ঘটে না?

...কার মধ্যে মানুষের অংশ বড়, আর বর্বরের অংশ ছোট : যে লর্ড গায়কটির ছেঁড়া পোশাক দেখে রাগ করে টেবিল থেকে উঠে গেল, তার গানের দরুন নিজের সম্পদের লক্ষ ভাগের এক ভাগও তাকে দিলো না, আর এখন পেট ভরে খেয়ে ঝলমলে আরামদায়ক ঘরে বসে শান্ত মনে চীনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে এবং সেখানকার গণ-হত্যাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করছে সে—অথবা যে ছোট গায়কটি কারাদণ্ডের ঝুঁকি নিয়ে এবং পকেটে একটি মাত্র ফ্রাঁ সম্বল করে বিশ বছর ধরে প্রান্তরে ও পর্বতে ঘুরে বেড়িয়েছে, কারও কোনও ক্ষতি করেনি, বরং গান গেয়ে মানুষকে সান্ত্বনা দিয়েছে, আর যাকে অপমান করে প্রায় তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত ও অপমানিত হয়ে কোথাও কোনও পচা খড়ের বিছানায় শুয়ে ঘুমুতে চলে গেছে সে?

ঠিক সেই মুহূর্তে রাত্রির মৃত্যু-স্তব্ধতাকে ভেদ করে বহু দূর থেকে ভেসে এল সেই ছোট মানুষটির গীটারের সুর ও কণ্ঠের স্বর।

আপনা থেকেই নিজের মনকে বললাম, "না, তাকে করুণা করবার, লর্ডের সমৃদ্ধিতে ক্ষুব্ধ হবার কোনও অধিকার তোমার নেই। তাদের প্রত্যেকের অন্তরে যে সুখ নিহিত আছে কে তার পরিমাপ করেছে? সে হয় তো এখন বসে আছে কোনও দরজার নোংরা সিঁড়িতে, চন্দ্রালোকিত আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, আর সুরভিত রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে বসে মনের আনন্দে গান করছে; তার অন্তরে নেই কোনও তিরস্কার, নেই কোনও ঈর্ষা, নেই কোনও অনুতাপ। আর এই প্রাসাদ-প্রাচীরের ভিতরে যারা বাস করছে তাদের অন্তরে এখন কি খেলা চলেছে তাই বা কে জানে? জীবনের যে নির্বিকার আনন্দ এবং জগতের সঙ্গে যে মিল এই ছোট মানুষটির অন্তরে বিরাজ করছে তা যে তাদের ও সকলের হৃদয়েই বিরাজ করছে না তাই বা কে বলতে পারে? এই দ্বন্দ্বকে যিনি এক সঙ্গে রাখবার ব্যবস্থা করেছেন তাঁর করুণা ও জ্ঞান যে অসীম। তুমি তো তুচ্ছ কীটাণুকীট, স্পর্ধাভরে ভুল করে তাঁর বিধান ও অভিপ্রায়কে তুমি জানবার চেষ্টা করেছ; তাই তোমার কাছে এ সব কিছুকেই পরস্পর-বিরোধী

দ্বন্দ্ব বলে মনে হয়েছে। তাঁর উজ্জ্বল অপরিমেয় ঊর্ধ্বলোক হতে তিনি কৃপার দৃষ্টিতে নিচের দিকে তাকিয়ে আছেন, আর তোমার সীমাহীন দ্বন্দ্বগুলিকে একটি অসীম মহামিলনের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে দেখে তিনি আনন্দিত হয়েছেন।

নিজের গর্বে তুমি ভেবেছিলে, বিশ্ব-বিধান থেকে তুমি নিজেকে আলাদা করে রাখতে পারো। কিন্তু পরিচারকদের প্রতি তোমার নিচ ও তুচ্ছ ক্ষোভকে নিয়ে তুমিও কিন্তু সেই শাশ্বত ও অসীম মিলন-নাটকে তোমার অনিবার্য ভূমিকাতেই অভিনয় করেছ।"

—১৮৫৭

অ্যালবার্ট

Albert

(একটি কাহিনী)

১

পিতার্সবুর্গের একটা ছোট ভোজসভায় পাঁচটি ধনী যুবক এল ফূর্তি করতে সকাল দুটোর পরে।

অনেক স্যাম্পেন গলায় ঢালা হলো; যোগদানকারীবা বেশির ভাগই যুবক, মেয়েরা সুন্দরী; পিয়ানো ও বেহালায় অশ্রান্তভাবে একটার পর একটা পোলকানাচের সুর বাজতে লাগল, নাচ ও হল্লা চলল অবিরাম; তবু যে কাবণেই হোক সবই কেমন যেন একঘেয়ে আর বিশ্রী লাগছে, এবং যেমন হয়ে থাকে, সকলেই ভাবছে, এব কোনও দরকার ছিল না, এরকমটা তারা চায়নি।

অনেকবারই তারা চেষ্টা করল মেজাজ ফিরিয়ে আনতে, কিন্তু জোব কবে আমোদ-আহ্লাদ একঘেয়েমির চাইতেও খারাপ।

পাঁচজন যুবকের একজন নিজের প্রতি, অন্যদের প্রতি, এবং সারা সন্ধ্যাটার প্রতিই বিরক্ত হয়ে একসময় উঠে টুপিটা হাতে নিয়ে বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সংলগ্ন ছোট ঘরটাতে কেউ ছিল না, কিন্তু পাশের ঘরে দু'জনের তর্কাতর্কি তার কানে এল। যুবকটি দাঁড়িয়ে কান পাতল।

"আপনি আসতে পারবেন না, ওখানে অতিথিরা রয়েছে," একটি স্ত্রীলোকের গলায় কথাগুলি বলা হলো।

"দয়া করে আমাকে ঢুকতে দাও। আমি ঠিক আছি!" একটি পুরুষের দুর্বল কণ্ঠের মিনতি শোনা গেল।

"না, মাদামের অনুমতি ছাড়া আপনাকে ঢুকতে দেব না," স্ত্রীলোকটি বলল। "চললেন কোথায়? আঃ! কী লোকরে বাবা!"

দরজা সশব্দে খুলে গেল; একটি অদ্ভুত পুরুষ মূর্তিকে চৌকাঠে দেখা গেল। একজন অতিথি দেখে চাকর আর বাধা দিলো না। অদ্ভুত লোকটি অভিবাদন জানিয়ে বাঁকা পা দুটোর উপর ভর দিয়ে দুলতে দুলতে ঘরে ঢুকল। উচ্চতা মাঝারি, সরু, ঝুঁকে-পড়া পিঠ, লম্বা এলোমেলো চুল। পরনে একটা খাটো ওভারকোট, সরু ছেঁড়া ট্রাউজার ও একজোড়া মোটা নোংরা বুট পায়ে। দড়ির মতো পাকানো নেক-টাইটা লম্বা, সাদা গলায় জড়ানো। একটা নোংরা শার্ট কোটের নিচ দিয়ে উঁকি দিয়ে সরু দুটি হাত পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। কিন্তু শরীরটা শুকনো কাঠির মতো হলেও মুখখানি সাদা ও সুন্দর, যৎসামান্য কালো দাড়ি-গোঁফের উপরের দুটো গালে তাজা রঙের আভাষ। পিছনে ঠেলে দেওয়া অবিন্যস্ত চুলের ফাঁকে নিচু কপালটা স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। অবসন্ন দুটি কালো চোখের দৃষ্টি নরম ও বিনীত হলেও মর্যাদাপূর্ণ। সরু গোঁফজোড়া নিচে দুই কোণে বাঁকানো, সরস ঠোঁট দুটিতেও সেই একই ভাবের প্রকাশ।

কয়েক পা এগিয়ে সে থামল; যুবকটিকে দেখে হাসল। মনে হলো, হাসতে তার কষ্ট হয়, কিন্তু সেই হাসিতে তার মুখটা যখন উদ্ভাসিত হলো তখন অকারণেই যুবকটিও হাসল।

অদ্ভুত মূর্তিটি ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল; সে ঘর থেকে নাচের শব্দ শোনা গেল। যুবকটি চুপি-চুপি দাসীকে জিজ্ঞাসা করল, "লোকটি কে?"

দাসী জবাব দিলো, "থিয়েটারের এক পাগলা গায়ক। কর্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে মাঝে মাঝে আসেন।"

"কোথায় ছিলে দেলেসভ?" কে যেন ডাকল, আর দেলেসভ নামের ঐ যুবকটি বল-নাচের ঘরে ফিরে গেল।

গায়কটি দরজায় দাঁড়িয়ে নাচিয়েদের দেখতে লাগল; তার হাসি, তার চাউনি, আর তালে তালে পা ফেলা দেখেই বোঝা গেল যে দৃশ্যটি তার ভাল লেগেছে।

জনৈক অতিথি তাকে ডাক দিলো, "ভিতরে এসে নিজেও নাচে যোগ দিন।"

গায়কটি মাথা নিচু করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে গৃহকর্ত্রীর দিকে তাকাল।

"যান, যান...ভদ্রলোকরা যখন বলছেন তখন আর আপত্তি কিসের?" গৃহকর্ত্রী বলল।

গায়কের সরু, দুর্বল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সহসা সক্রিয় হয়ে উঠল; চোখ টিপে, হেসে, ঠোঁট বেঁকিয়ে সে ঘরময় দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। যে ফূর্তিবাজ অফিসারটি খুব

তৎপরতার সঙ্গে নাচছিল হঠাৎ সে আকস্মিকভাবেই একটা কোয়াড্রিল নাচেব মাঝখানে পিঠ দিয়ে গায়কটিকে একটা ধাক্কা মেরে বসল।

গায়কের দুর্বল, ক্লান্ত পা দুটি সে ধাক্কা সামলাতে না পেরে বারকয়েক পা ঠুকেই শটান মেঝের উপর পড়ে গেল। তার পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনেও প্রথমে প্রায় সকলেই সশব্দে হেসে উঠল।

কিন্তু গায়কটি উঠল না। তখন অতিথিরা চুপ করে গেল; পিয়ানোও থেমে গেল। দেলেসভ ও গৃহকর্ত্রীই প্রথমে লোকটির কাছে ছুটে গেল। কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে অর্থহীন দৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে সে পড়ে ছিল। তাকে যখন তুলে ধবে একটা চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হলো, তখন হাড় বের করা হাত দিয়ে তাড়াতাড়ি কপালেব উপর থেকে চুলগুলি পিছনে ঠেলে দিয়ে কারও কোনও প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সে হাসতে লাগল।

গৃহকর্ত্রী বলল, "মিঃ অ্যালবার্ট! মিঃ অ্যালবার্ট! আপনার কি আঘাত লেগেছে? কোথায় লেগেছে? হলো তো, তখনই বলেছিলাম আপনার নাচা উচিত হবে না।" অতিথিদের দিকে তাকিযে আবার বলল, "ওর শরীরটা এত দুর্বল যে হাঁটতেই পাবেন না। নাচতে পারবেন কেন?"

সকলে জিজ্ঞাসা করল, "লোকটি কে?"

"একটি গবীব লোক—একজন শিল্পী। খুব ভাল মানুষ, তবে বুঝতেই তো পারছেন, দেখলেই করুণা হয়।"

গায়কটির সামনেই সে নির্বিকারভাবে কথাগুলি বলে গেল। হঠাৎ যেন লোকটিব সম্বিত ফিবে এল; যেন কিসের ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে আশেপাশের লোকগুলিকে ঠেলে সরিয়ে দিলো।

বেশ চেষ্টা করে চেয়ার ছেড়ে উঠে সে হঠাৎ বলল, "কিছু হয়নি!" এবং তার যে কোনও রকম আঘাত লাগেনি সেটা বোঝাবার জন্য ঘরের মাঝখানে গিয়ে লাফ দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু এমনভাবে তার পা টলতে লাগল যে কেউ ধরে না ফেললে সে আবার মেঝেতে পড়ে যেত।

সকলেরই বিশ্রী লাগতে লাগল; তার দিকে তাকিয়ে তারা চুপ করে রইল।

গায়কের চোখ দুটো আবার নিষ্প্রভ হয়ে এল এবং অন্য সকলের কথা ভুলে সে হাত দিয়ে হাঁটুটা ঘসতে লাগল। তারপর হঠাৎ মাথাটা তুলে কাঁপা পাটা একটু বাড়িয়ে দিলো এবং আগের মতোই চুলগুলোকে পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে বেহালাদারের কাছে গিয়ে তার হাত থেকে বেহালাটা নিয়ে নিল।

বেহালাটা ঘুরিয়ে আবার বলল, "কিছু হয়নি! ভদ্রজনরা, আসুন একটু বাজনা হোক!"

অতিথিরা একে অন্যকে বলল, "কী অদ্ভুত লোক!"

একজন অতিথি বলল, "হয়তো এই ভাগ্যহত জীবটির মধ্যে একটি সুন্দর প্রতিভার মৃত্যু হচ্ছে।"

অপর একজন বলল, "হ্যাঁ, বড়ই দুঃখের কথা!"

দেলেসভ বলল, "কী সুন্দর মুখখানি!...লোকটির মধ্যে অসাধারণ কিছু আছে। দেখা যাক...।"

২

এদিকে কারও দিকে কোনও নজর না দিয়ে অ্যালবার্ট বেহালাটাকে কাঁধের উপর চেপে ধরে পিয়ানোর তালে তালে ধীরে ধীরে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। তার ঠোঁটে একটা অবিচল ঔদাসীন্য ফুটে উঠল। চোখ দুটো দেখাই যাচ্ছে না, কিন্তু সরু হাড়সর্বস্ব পিঠ, এলোমেলো কালো মাথা, লম্বা সাদা গলা, বাঁকানো দুটো পা—সব মিলিয়ে যে দৃশ্য ফুটে উঠেছে সেটা অদ্ভুত হলেও কোনওক্রমেই তাকে হাস্যকর বলা যায় না। বেহালায় সুর বাঁধা হয়ে গেলে সে সজোরে একবার ছড়টা টানল এবং মাথাটা পিছনের দিকে হেলিয়ে পিয়ানো-বাদকের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। সেও তখন তার সঙ্গে সুর মেলাবার চেষ্টা করছিল।

আদেশের ভঙ্গিতে সে পিয়ানো-বাদককে বলল, "একটা দুঃখের সুর!"

তারপর যেন এই ভঙ্গির জন্য ক্ষমা চাইতেই সে ভীরু হাসি হাসল এবং মুখে সেই একই হাসি ফুটিয়ে শ্রোতাদের দিকে তাকাল। যে হাতে ছড় ধরা ছিল সেই হাতে চুলগুলো পিছনে সরিয়ে দিয়ে সে পিয়ানোর এক পাশে গিয়ে দাঁড়াল এবং ধীর সহজ গতিতে তারের উপর ছড়টা টানতে শুরু করল। একটা স্পষ্ট সুরেলা শব্দ সমস্ত ঘরটাতে ছড়িয়ে পড়ল; ঘরের মধ্যে নেমে এল পরিপূর্ণ নীরবতা।..

ঘরের মধ্যে যারা ছিল সকলেই একমনে চুপচাপ শুনছে। অ্যালবার্ট বাজিয়েই চলেছে। মনে হচ্ছে, একমাত্র এই সুরের মধ্যেই সে বেঁচে আছে, শ্বাস-প্রশ্বাস টানছে।

ফূর্তিবাজ অফিসারটি জানালার ধারে একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে। তার নিষ্প্রাণ দৃষ্টি মেঝের উপর নিবদ্ধ, নিঃশ্বাস পড়ছে কখনও ধীরে, কখনও ভারী হয়ে। মেয়েরা একেবারে চুপচাপ বসে আছে দেয়াল বরাবর, আর মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে বিমূঢ় দৃষ্টি-বিনিময় করছে। গৃহকর্ত্রীর মোটা হাসিমুখটা খুসিতে চওড়া হয়ে উঠেছে। পিয়ানো-বাদক একদৃষ্টিতে অ্যালবার্ট-এর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, এবং পাছে ভুল হয়ে যায় এই ভয়ে তার সঙ্গে তাল রেখে চলেছে। একজন অতিথি অতিমাত্রায় পান করে সোফায় কাৎ হয়ে পড়েছে, এবং ধরা পড়বার ভয়ে মোটেই চলাফেরার চেষ্টা করছে না। দেলেসভ-এর মনে একটা অনভ্যস্ত অনুভূতি জাগল। অ্যালবার্ট-এর বেহালার সুর নিয়ে গেল তার প্রথম যৌবনের দিনগুলিতে। সে তখন সতেরো বছরের একটি সুদর্শন, বোকা-বোকা, খুশি-খুশি ছেলে। তার মনে পড়ে গেল প্রথম প্রেমিকার কথা—ছোট গোলাপী পোশাক-পরা সম্পর্কিত বোনটিকে ঘিরে তার

স্বপ্নের কথা, লিন্ডেন-বীথিকার নিচে দাঁড়িয়ে জীবনের প্রথম প্রেম-সম্ভাষণ, একটি স্বতঃস্ফূর্ত চুম্বনের উষ্ণতা ও অবর্ণনীয় আনন্দ, আর চারদিকের প্রকৃতির যাদুভরা এক অজ্ঞাতপূর্ব রহস্যের ইসারা। আনন্দের সঙ্গে সেই দিনগুলির কথা ভাবতে ভাবতে তার কান্না পেয়ে গেল, কারণ এ সবই আজ অতীতের কথা। সে অতীত আর কোনও দিন ফিরে আসবে না। কত স্মৃতি মনে জাগছে, আর অ্যালবার্ট-এর বেহালা বারবার একই কথা বলছে :

"তোমার সেই শক্তি, ভালবাসা ও সুখের কাল চিরদিনের মতো চলে গেছে, আর ফিরবে না। তার জন্য কাঁদো, চোখের জল ফেলো, কেঁদে কেঁদে মরে যাও—তোমার জন্য আজ সেটাই শ্রেষ্ঠ সুখ।"

বাজনার শেষের দিকে এসে অ্যালবার্ট-এর মুখ লাল হয়ে উঠল, চোখ জ্বালা করতে লাগল, চকচক করতে লাগল, দুই গাল বেয়ে বড় বড় ঘামের বিন্দু ঝরতে লাগল। কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠল, সারা শরীর চঞ্চল হয়ে উঠল, পাণ্ডুর ঠোঁট দুটি আর একত্র হলো না, সমস্ত দেহ আনন্দের অধীর উচ্ছ্বাসে ভরে উঠল।

গভীর আবেগে সমস্ত শরীরটাকে দুলিয়ে চুলগুলোকে পিছনে সরিয়ে দিয়ে সে বেহালাটা নামিয়ে নিল এবং সগর্ব মহিমায় ও আনন্দে শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। তারপরই তার পিঠটা বেঁকে গেল, মাথাটা ঝুলে পড়ল, চোখের দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়ে এল, এবং ভীরু চোখে এমনভাবে চারিদিকে তাকাল যেন নিজের জন্যই সে লজ্জিত বোধ করছে; তারপরই সে টলতে টলতে অন্য ঘরে চলে গেল।

৩

উপস্থিত সকলের মধ্যেই একটা অদ্ভুত কিছু ঘটে গেছে; অ্যালবার্ট-এর বাজনার পরে যে গভীর স্তব্ধতা নেমে এসেছে তার ফলেও একটা অদ্ভুত অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে। সকলেরই মনে হচ্ছিল, এ বিষয়ে একটা কিছু বলে, কিন্তু কারও ক্ষমতায় কুলিয়ে উঠছিল না। এই আলোকোজ্জ্বল গরম ঘর, সুন্দরী নারীর দল, জানালায় ভোরের প্রথম আলো, রক্তে উত্তেজনা, আর সদ্যসমাপ্ত শব্দের প্রভাব—এ সবের অর্থ কি? কিন্তু সে অর্থ ব্যাখ্যা করবার চেষ্টাও কেউ করল না : পক্ষান্তরে, এই নতুন ভাবধারা যে রাজ্যটি তাদের সামনে মেলে ধরেছে সেখানে ঢুকতে না পেরে প্রত্যেকেই যেন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠল।

অফিসারটি বলল, "কী জানেন, লোকটি সত্যি খুব ভাল বাজায়!"

হাতের আস্তিন দিয়ে গোপনে গাল মুছে নিয়ে দেলেসভ বলল, "আশ্চর্য বাজান!"

যে লোকটি সোফায় শুয়েছিল, কিছুটা ধাতস্থ হয়ে সে বলল, "আমাদের তো যাবার সময় হয়ে গেল। তাকে কিছু দেওয়া উচিত। আসুন, কিছু টাকা তোলা যাক।"

ওদিকে অ্যালবার্ট তখন পাশের ঘরে একাকি একটা সোফায় বসে ছিল। হাড় বের-করা হাঁটুর উপর থুত্নি রেখে ভেজা, নোংরা হাত দিয়ে মুখে টোকা দিচ্ছিল আর চুলগুলো নিয়ে খেলা করছিল।

চাঁদা বেশ ভালই উঠল; দেলেসভই সেটা অ্যালবার্ট-এর হাতে তুলে দিতে রাজী হলো।

তাছাড়া বাজনাটা দেলেসভ-এর উপর এত বেশি ও অস্বাভাবিক প্রভাব বিস্তার করেছিল যে তার মনে হলো এই লোকটার কিছু উপকার করা তার উচিত। তার মনে হলো, ওকে বাড়িতে নিয়ে যাবে, পোশাক দেবে, কোথাও থাকবার ব্যবস্থা করে দেবে এবং এই দুঃসহ অবস্থা থেকে ওকে উদ্ধার করবে।

গায়কটিব কাছে এগিয়ে গিয়ে দেলেসভ বলল, "আপনি কি খুব ক্লান্ত?"

অ্যালবার্ট হাসল।

"আপনার মধ্যে সত্যিকারের প্রতিভা আছে। আপনার উচিত আরও ভালভাবে সঙ্গীতের চর্চা করা এবং জনসমক্ষে বাজানো।"

যেন এইমাত্র ঘুম ভাঙল এমনইভাবে অ্যালবার্ট বলল, "আমি কিছু পানীয় চাই।"

দেলেসভ খানিকটা মদ এনে দিলো; গায়কটি সাগ্রহে দুই গ্লাস খেলো।

বলল, "কী চমৎকার মদ!"

দেলেসভ বলল, "দুঃখের সঙ্গীতটি কি মধুর!"

অ্যালবার্ট হেসে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ তা বটে! কিন্তু মাফ করবেন, কার সঙ্গে আমি কথা বলছি তাতো জানলাম না; হয়তো আপনি কোনও কাউন্ট বা প্রিন্স; আপনি কি আমাকে কিছু ধার দিতে পারেন?" একটু থামল। "আমার হাতে কিছুই নেই।...আমি বড় গরীব। টাকাটা ফেরৎ দিতেও পারব না।"

দেলেসভ-এর মুখ লাল হয়ে উঠল; তার খুব বিশ্রী লাগল; তাড়াতাড়ি সংগৃহীত অর্থটা সে গায়কের হাতে দিলো।

টাকাটা আঁকড়ে ধরে অ্যালবার্ট বলল, "আপনাকে অনেক ধন্যবাদ! আসুন কিছু বাজানো যাক। আপনি যত চাইবেন আমি ততই বাজাব—শুধু একটু পানীয়ের ব্যবস্থা—একটু পানীয়।" লোকটি উঠে দাঁড়াল।

দেলেসভ আরও কিছুটা মদ আনিয়ে দিয়ে লোকটিকে তার পাশে বসতে বলল।

তারপর বলল, "আপনার প্রতিভার প্রতি আমার শ্রদ্ধা রয়েছে, তাই যদি খোলাখুলি কিছু বলি তো ক্ষমা করবেন। মনে হচ্ছে, আপনার দিনকাল ভাল যাচ্ছে না।"

এই সময় গৃহকর্ত্রী ঘরে ঢুকল। অ্যালবার্ট একবার তার দিকে, একবার দেলেসভ-এর দিকে তাকাল।

দেলেসভ বলতে লাগল, "আপনার জন্য আমাকে কিছু করতে দিন। আপনার

যদি দরকার হয়তো আমার কাছে কিছুদিন থাকলে খুব খুশি হবো। আমি একা থাকি, আর তাই হয়তো আপনার কিছুটা কাজে লাগতে পারব।"

অ্যালবার্ট হাসল; কোনও কথা বলল না।

গৃহকর্ত্রী বলল, "ওকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন না কেন? আপনার কাছে এটা তো ঈশ্বরের দান।" তারপরই দেলেসভ-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে আপত্তির ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "তবে আমি আপনাকে এ পরামর্শ দেব না।"

নিজের ভেজা হাত দিয়ে দেলেসভ-এর হাতটা চেপে ধরে অ্যালবার্ট বলল, "আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। শুধু এবার আরও কিছু গান বাজনা হোক।"

কিন্তু অন্য অতিথিরা সকলেই যাবার আয়োজন করছিল। অ্যালবার্ট-এর পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তারা হল-ঘরে চলে গেল।

গৃহকর্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে তার নোংরা চওড়া-কোণ টুপি ও পুরনো গ্রীষ্মকালীন কোটো (সেটা তার একমাত্র শীতবস্ত্র) গায়ে চড়িয়ে দেলেসভ-এর সঙ্গে ফটকের দিকে এগিয়ে গেল।

গাড়িতে উঠে এই নব-পরিচিত লোকটির পাশে বসে তার গায়ের তীব্র মদের গন্ধ ও নোংরামির দুর্গন্ধ নাকে আসতেই কৃতকর্মের জন্য তার মনে অনুশোচনা দেখা দিলো; ছেলেমানুষী, কোমলতা ও অবিবেচনার জন্য নিজেকেই দোষী করতে লাগল। তাছাড়া, অ্যালবার্ট-এর কথাবার্তা এতই অর্থহীন ও তুচ্ছ যে দেলেসভ-এর মন বিরক্তিতে ভরে উঠল। "একে নিয়ে এখন কি করি?" সে ভাবতে লাগল।

মিনিট পনেরো গাড়ি চলবার পরে অ্যালবার্ট চুপ করে গেল, টুপিটা পায়ের কাছে পড়ে গেল, আর সে নিজেও গাড়ির এক কোণে উল্টে পড়ে নাক ডাকাতে শুরু করল। জমাট বরফের উপর গাড়ির চাকার ঘর্-ঘর্ শব্দ চলতে লাগল; ভোরের আবছা আলো বরফ-ঢাকা জানালা দিয়ে কদাচিৎ প্রবেশ করছে।

দেলেসভ মুখ ঘুরিয়ে সঙ্গীর দিকে তাকাল। জোব্বায় ঢাকা লম্বা দেহটা প্রাণহীনের মতো পড়ে আছে।...একটু ঝুঁকে ভাল করে লক্ষ্য করতেই অ্যালবার্ট-এর সুন্দর কপাল ও দৃঢ়বদ্ধ দুটি ঠোঁট দেখে আবার তার মনটা দুলে উঠল।

শ্রান্ত স্নায়ুর প্রভাব, ভোর পর্যন্ত নিদ্রাহীনতার দরুন অস্থিরতা এবং যে বাজনা সে শুনেছে তার রেশ—সব কিছু মনের মধ্যে নিয়ে দেলেসভ যখন আবার সেই মুখখানির দিকে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে পূর্বরাত্রির সেই আনন্দময় জগৎ তার কাছে ফিরে এল; নিজের যৌবনের সুখে-ভরা মধুময় দিনগুলির কথা মনে পড়তেই সব অনুশোচনা মন থেকে দূর হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে আবার সে অ্যালবার্ট-এর সঙ্গে আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা অনুভব করল; তার উপকারে আসবার সংকল্প আবার দৃঢ়তর হলো।

৪

পরদিন সকালে আপিসে যাবার জন্য ঘুম থেকে উঠেই দেলেসভ তার চারপাশে দেখতে পেল সেই পুরনো পর্দা; পুরনো খানসামা, আর ছোট সাইড-টেবিলের উপর ঘড়িটা। দেখে তার মনে যেন একটা সক্ষোভ বিস্ময় দেখা দিলো। নিজের মনেই ভাবল, "আমার চারদিকে যা আছে তা ছাড়া আর কি দেখবার আশাই বা আমি করেছিলাম।" তখনই তার মনে পড়ে গেল, গায়কটির কালো চোখ আব খুশির হাসি, দুঃখের গানের সেই সুর; আগের রাতের সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা তার মনের পটে ভেসে উঠল।

শিল্পীটিকে বাড়িতে এনে ভাল করেছে কি মন্দ করেছে সে কথা ভাববার তার সময় নেই। পোশাক পরতে পরতেই সারাদিনের কাজেব একটা ছক কেটে ফেলল, কাগজপত্র গুছিয়ে নিল, গৃহস্থালীর কাজের প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি দিলো এবং তাড়াতাড়ি ওভারকোট ওভার-শু পরে নিল। খাবার ঘরের দরজার পাশ দিয়ে যেতে যেতে একবার ভিতরে চোখ ফেরাল। নোংরা ছেঁড়া শার্ট পরেই অ্যালবার্ট চামড়ার সোফার উপর বালিশে মুখ গুঁজে মরার মতো ঘুমিয়ে আছে। আগের রাতে অচৈতন্য অবস্থায় সেখানেই তাকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। অকারণেই দেলেসভ-এর মনে হলো, "একটা কিছু ভুল হয়েছে!"

চাকরটাকে ডেকে বলল, "বোরিয়ুজোভ্স্কির কাছে গিয়ে দিন কয়েকের জন্য তার বেহালাটা আমাব জন্য চেয়ে আনবে। ঘুম ভাঙলে লোকটিকে কফি দিও, আর কিছু তলবাস ও পুরনো পোশাক পরতে দিও তাকে। মোট কথা, তার আরামের দিকে লক্ষ্য রেখো—বুঝলে?"

বেশ রাত করে বাড়ি ফিরে অ্যালবার্টকে না দেখতে পেয়ে দেলেসভ বিস্মিত হলো।

"লোকটি কোথায় গেছে?" চাকরকে জিজ্ঞাসা করল।

চাকব জবাবে বলল, "খাবাব ঠিক পরেই চলে গেছেন। বেহালাটা হাতে পেয়েই চলে গেলেন। এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিবরেন বলে গেছেন, কিন্তু এখনও তো দেখা নেই।"

"চু-চু! কী বিরক্তিকর!" দেলেসভ বলল। "তাকে যেতে দিলে কেন জখার?"

জখাব-এর বাড়ি পিতার্সবুর্গে; আট বছর হলো দেলেসভ-এর খানসামার কাজ করছে। নিজে অবিবাহিত হওয়ায় দেলেসভ তার সব কথাই তাকে বলত এবং নিজের সব কাজেই তার পরামর্শ চাইত।

জখায় জবাব দিলো, "আমি তাকে বাধা দেব কোন্ সাহসে বলুন? আপনি যদি বলে যেতেন তাকে বাড়িতে আটকে রাখতে, তাহলে না হয় ফন্দি ফিকির করে সে ব্যবস্থা করতাম। কিন্তু আপনি তো শুধু পোশাকের কথাই বলে গেলেন।"

"শ্-শ্! কী চিন্তার কথা! আচ্ছা, আমি চলে যাবার পরে সে কি করছিল?"

জখার হাসল।

"তাকে অবশ্য "শিল্পী-ই" বলা চলে স্যার। ঘুম ভাঙতেই তিনি মাদিরা-র খোঁজ করলেন, আর তার পরেই রাঁধুনি ও পাশের বাড়ির চাকরটার সঙ্গে ফূর্তি করতে বসে গেলেন। বেশ মজার মানুষ। তবে স্বভাবটা খুব ভাল। তাকে চা দিলাম, খাবার দিলাম, কিন্তু একা একা কিছুতেই খেলেন না, আমাকে পাশে বসিয়ে খাওয়ালেন। আর বেহালা বাজনার কথা যদি বলেন তো 'অইজ্‌লার'-এও তার মতো শিল্পী বেশি নেই। এ রকম মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা চলে। তিনি যখন 'ছোট্ট মা ভল্‌গার ভাটিতে' গানটি বাজিয়ে আমাদের শোনালেন, তখন মনে হলো যেন কেউ কাঁদছে। এত সুন্দর। এমন কি তার গান শুনতে সব ফ্ল্যাটের চাকররা এসে আমাদের বাড়ির খিড়কিতে জড় হলো।"

মনিব বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তাকে পোশাক-টোষাকগুলি দিয়েছিলে তো?"

"নিশ্চয়। আপনার একটা নাইট-শার্ট আর আমার একটা ঢিলে বাইরের জামা পরতে দিয়েছি। এ রকম মানুষকে তো সাহায্য করাই উচিত—লোকটি সত্যি বড় ভাল।" জখার হাসল।

"তিনি আমাকে বারবার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার পদমর্যাদা কি, আপনার প্রভাবশালী বন্ধু-বান্ধব আছে কি না, এবং আপনার কতজন ভূমিদাস আছে।"

"ঠিক আছে; কিন্তু দেখো, তাকে তো খুঁজে বের করতে হবে, আর ভবিষ্যতে তাকে মদ খেতে দিও না; মদ খেলে তার অবস্থা আরও খারাপ হবে।"

জখার বলল, "ঠিক বলেছেন। সত্যি তিনি খুব দুর্বল; আমাদের পুরনো মনিবের একজন করণিক ছিল..."

দেলেসভ এই পাঁড় মাতাল করণিকের গল্প অনেক শুনেছে, তাই জখারকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল, "রাতের মতো সব ব্যবস্থা করে রাখো, এবং বেরিয়ে গিয়ে অ্যালবার্টকে খুঁজে পেতে নিয়ে এস।"

তারপর বিছানায় গিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল; কিন্তু অ্যালবার্ট-এর চিন্তা মাথায় আসায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুমতে পাবল না। ভাবতে লাগল, "আমার পরিচিত অনেকেই এতে বিস্মিত হতে পারেন, কিন্তু কারও জন্য কিছু করবার সুযোগ এত কম মেলে যে সে রকম কোনও সুযোগ এলে সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত; তাই এই সুযোগ আমি ছাড়ব না। তাকে সাহায্য করতে আমি সাধ্যায়ত্ত সব কিছু করব। সে হয়তো মোটেই পাগল নয়, শুধু মদ খেলেই বেহেড হয়ে পড়ে। তার জন্য এমন কিছু বেশি খরচও হবে না। একজনের যদি চলে, তো দু'জনেরও চলবে। আপাতত আমার কাছে তো থাকুক, তারপর একটা আস্তানা দেখে দেব, একটা কনসার্ট-এর ব্যবস্থা করে দেব, এই গাড্ডা থেকে তাকে টেনে তুলব; তারপর দেখা যাবে কি হয়।"

এই কথা ভেবে একটা মধুর আত্মতুষ্টিতে তার মন ভরে গেল।

· সে আরও ভাবল, "আসলে আমি তো খারাপ লোক নই—বরং অন্যের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করলে বুঝি আমি মোটেই খারাপ নই।"

সে ঘুমিয়েই পড়েছিল; এমন সময় দরজা খোলার শব্দ ও হল-এ পায়ের শব্দ শুনে তার ঘুম ভেঙে গেল।

ভাবল, "তার ব্যাপারে একটু কড়া হতে হবে; সেটাই সব চাইতে ভাল। তাই করব।"

ঘণ্টাটা বাজাল।

জখার ঘরে ঢুকলে জিজ্ঞাসা করল, "তাকে এনেছ?"

অর্থপূর্ণভাবে মাথাটা নেড়ে দুই চোখ বুজে জখার বলল, "বড়ই সকরুণ অবস্থা স্যার।"

"সে কি মাতাল হয়েছে?"

"খুবই দুর্বল।"

"বেহালাটা আছে তো?"

"সেটা নিয়ে এসেছি। মহিলাটিই দিয়ে দিলেন।"

"ঠিক আছে। এখন আর তাকে এখানে এনো না। বিছানায় শুইয়ে দাও। কাল তাকে কোনওক্রমেই বাড়ি থেকে বের হতে দিও না।"

কিন্তু জখার ঘর থেকে চলে যাবার আগেই অ্যালবার্ট ঘরে ঢুকল।

৫

অ্যালবার্ট হেসে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি এরই মধ্যে ঘুমতে যাবেন? আমি আন্না আইভান্‌ভ্‌নার ওখানে গিয়েছিলাম; সন্ধ্যাটা বড় ভাল কেটেছে। গান-বাজনা হলো, হাসি-ঠাট্টা হলো, আর লোকজনও বেশ ভাল।" ছোট টেবিলের উপর থেকে জলের বোতলটা তুলে নিয়ে বলল, "কিছু পান করতে পারলে হতো, তবে জল নয়।"

অ্যালবার্ট ঠিক আগের রাতের মতই আছে : চোখে ও ঠোঁটে সেই মধুর হাসি। সেই উজ্জ্বল কপাল, সেই দুর্বল দেহ। জখার-এর ঢিলে জামাটা গায়ে বেশ মানিয়েছে, নাইট শার্টের মাড় না দেওয়া চওড়া সাদা কলারটা তার সরু সাদা গলাটাকে সুন্দরভাবে ঘিরে আছে; ফলে ফুটে উঠেছে একটি নির্দোষ শিশুসুলভ চেহারা। দেলেসভ তার চোখের দিকে তাকিয়েই আবার সেই হাসিতে মুগ্ধ হয়ে গেল। চলে গেল ঘুমের ইচ্ছা, ভুলে গেল যে তার কঠোর হবার কথা; উপরন্তু তাকেও ফূর্তিতে পেয়ে বসল, গান শোনার ও সকাল পর্যন্ত অ্যালবার্ট-এর সঙ্গে বসে গুলতানি করবার বাসনা জাগল মনে। জখারকে হুকুম করল, এক বোতল মদ, কিছু সিগারেট ও বেহালাটা নিয়ে এস।

অ্যালবার্ট বলল, "এই তো, চমৎকার! এখনও বেশি রাত হয়নি, বেশ বাজনা চলতে পারবে। আপনি যত শুনতে চাইবেন তত বাজাব।"

জখারও খুশি হলো; এক বোতল "লাফিতে", দুটো গ্লাস, অ্যালবার্ট-এর খাবাব মতো নরম সিগারেট ও বেহালাটা এনে দিলো। কিন্তু মনিবের নির্দেশ মতো শুতে না গিয়ে সেও একটা চুরুট ধরিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে বসল।

অ্যালবার্ট বেহালাটা হাতে তুলে নিতেই দেলেসভ বলল, "আসুন, গল্প করা যাক।"

অ্যালবার্ট মাথা নিচু করে বিছানায় বসে আবাব খুশির হাসি হাসল।

হাত দিয়ে কপালে টোকা দিতে দিতে মুখে একটা জিজ্ঞাসার ভাব ফুটিয়ে বলল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়। (কোনও কথা বলবার আগে সব সময়ই তার মুখেব ভাবটা পাল্টে যায়।)—যদি অনুমতি করেন"—সে একটুখানি থামল—"তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। কাল রাতে যে ভদ্রলোকটি আপনার সঙ্গে ছিলেন তার নাম বলেছিলেন এন্—তিনি কি বিখ্যাত এন্-এব ছেলে?"

প্রশ্নের অর্থ না বুঝেই দেলেসভ জবাব দিলো, "তার নিজেব ছেলে।"

আত্মতুষ্টিব হাসি হেসে অ্যালবার্ট বলল, "ঠিক! দেখামাত্র তার আভিজাত্যেব লক্ষণ আমার চোখে পড়েছিল। অভিজাতদের আমি ভালবাসি : একজন অভিজাত লোকের মধ্যে বিশেষ একটা সৌন্দর্য ও মাধুর্যের প্রকাশ চোখে পড়ে। আর সেই অফিসারটি—যিনি খুব ভাল নাচেন? তাকেও আমাব খুব ভাল লেগেছে : লোকটি এত হাসিখুশি ও সুন্দর। তিনি কি অ্যাডজুটান্ট এন. এন. নন?"

"কোন্ লোকটি?" দেলেসভ প্রশ্ন করল।

"নাচের সময় যিনি আমাব ঘাড়েব উপর এসে পড়েছিলেন। লোকটি খুব ভাল।"

দেলেসভ জবাবে বলল, "না, একটু ভাসা-ভাসা স্বভাবের লোক।"

অ্যালবার্ট কিন্তু তাকে সমর্থন করে বলে উঠল, "না, না! লোকটির ব্যবহার খুবই সুন্দর। আর খুব ভাল বাজাতেও পাবেন। একটা অপেরা থেকে কি যেন বাজালেন। অনেক কাল কোনও লোককে আমার এত ভাল লাগেনি।"

সঙ্গীটিকে সঙ্গীত সম্পর্কে আরও কথা বলতে উৎসাহিত করাব জন্য দেলেসভ বলল, "হ্যাঁ, তিনি ভালই বাজান, তবে তার বাজনা আমার ভাল লাগে না। তিনি তো ধ্রুপদী সঙ্গীত বোঝেনই না—আপনিও তো জানেন, দোনির্জোত্তি ও বেলিনি কোনও সুরই নয়। আপনিও তো অবশ্য তাই মনে করেন?"

শান্ত চোখ তুলে অ্যালবার্ট বলল, "না, না, ক্ষমা করবেন! প্রাচীন সুরও সুর, আধুনিক সুরও সুর। আধুনিক সঙ্গীতেও অসাধাবণ সৌন্দর্য আছে। 'সোন্নাম্‌বুলা', 'লুসিয়া'-র উপসংহার, এবং চাপিন ও রবার্ট-এর কথা ভাবুন। আমি তো অনেক সময় ভাবি, আজ যদি বীঠোভেন বেঁচে থাকতেন তাহলে 'সোন্নাম্‌বুলা' শুনলে তিনি

আনন্দে চোখের জল ফেলতেন। সৌন্দর্য সব কিছুতেই আছে। ভিয়ারদং এবং রুবিনি যখন এখানে ছিল তখন আমি প্রথম 'সোন্নাম্‌বুলা' শুনি। সেটা অনেকটা এই রকম...।" কথা বলতে বলতে তার চোখ দুটি চকচক করে উঠল; হাত দুটো দিয়ে এমন ভঙ্গী করল যেন বুকের ভিতর থেকে কিছু ছিঁড়ে বের করতে চাইছে। "আর একটু হলেই আমি আর সহ্য করতে পারতাম না।"

দেলেসভ বলল, "আর বর্তমান কালের অপেরা সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?"

সে বলল, "বোসিয়ো ভাল, খুব ভাল, অপূর্ব সুন্দর, কিন্তু কেমন যেন এখানটায় ঠিক ছোঁয়া লাগে না",—সে বুকে হাত দিয়ে দেখাল। "গায়কমাত্রেরই আবেগ থাকা চাই, আর সেটাই মহিলার নেই। তিনি মানুষকে আনন্দ দিতে পারেন। কিন্তু যন্ত্রণায় অধীর করে তুলতে পারেন না।"

"লাব্লাস সম্পর্কে কি মনে করেন?"

"প্যারিসে 'বারবিয়ের দ্য সেলিল'-এ তার গান আমি শুনেছি। তখন অপূর্ব গাইতেন, কিন্তু এখন বুড়ো হয়ে গেছেন : বুড়ো হলে আর শিল্পী হওয়া যায় না।"

"আচ্ছা, বুড়ো হয়েছেন তো কি হয়েছে? ছোট ছোট সুরের কাজ এখনও কত ভাল।"

অ্যালবার্ট কঠোর গলায় বলল, "বুড়ো হয়েছেন তো কি হয়েছে? তার বুড়ো হওয়া সাজে না। শিল্পীর কখনও বুড়ো হওয়া উচিত নয়। শিল্পের জন্য অনেক কিছু দরকার, কিন্তু সব চাইতে বেশি দরকার তেজ!" তার চোখ দুটো জ্বলতে লাগল; দুই হাত উর্ধ্বে তুলে ধরল।

মনে হলো, বুঝি ভিতরে ভিতরে তার সারা শরীরে এক তীব্র অগ্নিশিখা জ্বলছে।

হঠাৎ সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "হা ঈশ্বর! আপনি কি শিল্পী পেত্রভ্‌কে চেনেন না?"

দেলেসভ হেসে জবাব দিলো, "না, চিনি না।"

"আহা, তার সঙ্গে যদি আপনার পরিচয় থাকত! তার সঙ্গে কথা বলেও আনন্দ পেতেন। আর কি রকম শিল্পবোধ! আন্না আইভানভ্‌নার বাড়িতে প্রায়ই তার সঙ্গে দেখা হতো। কিন্তু কোনও কারণে ইদানীং তিনি তার প্রতি বিরূপ হয়েছেন। আমার খুব ইচ্ছা, তার সঙ্গে আপনার পরিচয় ঘটে। তিনি একটি মহৎ প্রতিভা, মহৎ প্রতিভা।"

"তিনি কি এখনও ছবি আঁকেন?"

"জানি না; মনে হয় আঁকেন না, কিন্তু একসময় তিনি 'এ্যাকাডেমি'-র শিল্পী ছিলেন। কী তার চিন্তা-ভাবনা! কোনও বিষয়ে যখন কথা বলেন, সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। ওঃ, পেত্রভ্ একটি মহান প্রতিভা, শুধু জীবনযাত্রাটাই একটু উচ্ছৃঙ্খল...সেটাই বড় দুঃখের।" অ্যালবার্ট হেসে কথাগুলি বলল। তারপরই বিছানা থেকে উঠে বেহালাটা হাতে নিয়ে সুর বাঁধতে লাগল।

দেলেসভ জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি অনেকদিন অপেরা ছেড়েছেন?"

চারদিকে তাকিয়ে অ্যালবার্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বলল, "আর কোনও দিন সেখানে ফিরে যেতে পারব না। আপনাকে সবই বলব।" মাথাটাকে চেপে ধরে আবার সে দেলেসভ-এর পাশে গিয়ে বসল। ফিসফিস করে বলল, "সেখানে আর যেতে পারব না। সেখানে বাজাতে পারব না—আমার কিছু নেই—কিছু নেই! পোশাক নেই, বাড়ি নেই, বেহালা নেই। বড়ই শোচনীয় জীবন!" বার বার সে কথাগুলি বলল। "আর কেনই বা সেখানে যাব? কিসের জন্য যাব? কোনও দরকার নেই। আ! 'ডন জুয়ান'...।"

হাত দিয়ে কপাল ঠুকতে লাগল।

দেলেসভ বলল, "চলুন না দু'জন একসঙ্গে একদিন যাই।"

কোনও জবাব না দিয়ে অ্যালবার্ট লাফ দিয়ে উঠে বেহালাটা হাতে নিয়ে 'ডন জুয়ান'-এর প্রথম অংকের শেষ অংশটা বাজাতে লাগল, আর নিজের কথায় অপেরাটার গল্পটা বলতে লাগল।

মরণোন্মুখ সেনাপতির কণ্ঠস্বর যখন তার বেহালায় বাজতে লাগল তখন দেলেসভ-এর মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল।

কিন্তু বেহালাটা নামিয়ে রেখে অ্যালবার্ট বলে উঠল, "না। আজ আমার বাজনা হবে না। বড় বেশি মদ খেয়েছি।"

তারপরই টেবিলের কাছে গিয়ে একটা গ্লাসে মদ ঢেলে একচুমুকে গ্লাসটা শেষ করে আবার দেলেসভ-এর বিছানায় গিয়ে বসল।

দেলেসভ অ্যালবার্ট-এর মুখের উপর থেকে চোখ না সরিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগল। মাঝে মাঝে অ্যালবার্ট যখন হাসছে, তখন দেলেসভও হাসছে। দু'জনই চুপচাপ। কিন্তু দু'জনের দৃষ্টি ও হাসির ভিতর দিয়েই দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে উঠল। দেলেসভ-এর কাছে লোকটি ক্রমেই প্রিয়তর হয়ে উঠছে; তাকে ঘিরে এক অনির্বচনীয় আনন্দে দেলেসভ-এর মন ভরে উঠছে।

হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করে বসল, "আপনি কখনও প্রেমে পড়েছেন?"

এ্যালবার্ট কয়েক সেকেন্ড কি যেন ভাবল। একটা বিষণ্ন হাসি খেলে গেল তার মুখে। দেলেসভ-এর দিকে ঝুঁকে একাগ্র দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকাল।

ফিসফিস করে বলল, "এ প্রশ্ন করছেন কেন? সব আপনাকে বলব, কারণ আপনাকে আমার ভাল লেগেছে। আপনাকে ফাঁকি দেব না, যা যা ঘটেছিল একেবারে গোড়া থেকেই বলব।" সে থামল। উদ্‌ভ্রান্ত চোখ দুটি আশ্চর্য রকমের স্থির। তারপর হঠাৎ বলতে শুরু করল, "আপনি তো জানেন আমার মন বড় দুর্বল। হ্যাঁ, তাই। আন্না আইভানভ্‌না নিশ্চয় সে কথা আপনাকে বলেছে। সকলকেই সে বলে যে আমি পাগল! সেটা সত্যি নয়; সে ঠাট্টা করেই কথাটা বলে; আসলে সে খুব দয়ালু, আর

কিছুদিন যাবৎ আমিও ঠিক সুস্থ নই।" আবার সে থামল; স্থির দৃষ্টিতে অন্ধকার দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। "আপনি জানতে চাইলেন, আমি কোনও দিন প্রেমে পড়েছি কি না?...হ্যাঁ, প্রেমে পড়েছি," ভুরু দুটি তুলে সে ফিসফিস করে বলল। "সে অনেক দিন আগেকার কথা। তখন আমার থিয়েটারের চাকরিটা ছিল। 'অপেরা'-তে আমি ছিলাম দু নম্বর বেহালাদার, আর সে প্রায়ই বসত মঞ্চের বাঁ দিককার নিচের বক্সটায়।"

উঠে দাঁড়িয়ে দেলেসভ-এর কানের কাছে মুখ নিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল।

বলল, "না। তার নাম কেন বলব? আপনিও তাকে চেনেন—সকলেই তাকে চেনে। আমি চুপচাপ্ থাকতাম; শুধু তাকে দেখতাম; আমি জানতাম, আমি একজন দরিদ্র শিল্পী। আর সে একজন অভিজাত মহিলা। সেটা আমি ভাল করেই জানতাম। শুধু তাকে দেখতাম; আর কোনও অভিপ্রায় আমার ছিল না...।"

অ্যালবার্ট ভাবতে লাগল। যেন অতীতের কথা স্মরণ করতে চেষ্টা করছে।

"কি করে কি ঘটল ঠিক মনে নেই; কিন্তু একদিন তার সঙ্গে বেহালা বাজাবার ডাক পড়ল।...কিন্তু কে আমি? একজন দরিদ্র শিল্পীমাত্র!" হেসে মাথা নাড়তে নাড়তে সে বলল, "কিন্তু না, সে কথাও বলতে পারি না...।" মাথাটা চেপে ধরে সে আবার বলল, "তখন কী সুখেই না ছিলাম!"

"তাই বুঝি? প্রায়ই তার বাড়ি যেতেন বুঝি?" দেলেসভ জিজ্ঞাসা করল।

"একবার...মাত্র একবার...সে দোষ আমার। আমি তখন পাগল! আমি একজন দরিদ্র শিল্পী, আর সে একজন অভিজাত মহিলা। তাকে কিছু বলা আমার উচিত হয়নি। কিন্তু তখন আমি পাগল হয়ে গেছি; বোকার মতো কাজ করে বসলাম। সেই থেকেই সব শেষ হয়ে গেছে; পেত্রভ্ ঠিকই বলেছিল, শুধু থিয়েটারেই তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করাই আমার উচিত ছিল।..."

"কি করেছিলেন আপনি?" দেলেসভ জিজ্ঞাসা করল।

"আঃ। দাঁড়ান, দাঁড়ান। সে কথা আমি বলতে পারব না।"

দুই হাতে মুখ ঢেকে কিছুক্ষণ সে চুপ করে রইল।

"সেদিন অর্কেস্ট্রায় যোগ দিতে আমার একটু দেরী হয়েছিল। সন্ধ্যায় পেত্রভ ও আমি মদ খেয়েছিলাম। আমার নেশা ধরেছিল। মহিলাটি তার বক্সে বসে একজন সেনাপতির সঙ্গে কথা বলছিল। সেনাপতিটিকে আমি চিনতাম না। বক্সের একেবারে কোন্ ঘেঁসে সে বসেছিল; হাত ছিল আল্সের উপরে; পরনে ছিল সাদা পোশাক, গলায় মুক্তোর মালা। সেনাপতির সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। দু'বার তাকাল। তার চুল ছিল এই রকমভাবে বাঁধা। আমি মোটেই বাজাচ্ছিলাম না; তার দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। এই প্রথম একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো। সেনাপতির দিকে হেসে সে আমার দিকেই তাকাল। মনে হলো সে আমার

কথাই বলছে। হঠাৎ দেখলাম, আমি আর অর্কেস্ট্রাতে বসে নেই, তার পাশে তার হাত ধরে বক্সে বসে আছি। ...সেটা কি করে হলো?" একটু থেমে অ্যালবার্ট জিজ্ঞাসা করল।

দেলেসভ বলল, "একে বলে মূর্ত কল্পনা।"

অ্যালবার্ট ভ্রূকুটি করে বলে উঠল, "না, না!...কি করে আপনাকে বোঝাব জানি না। তখনও আমি গরীব ছিলাম; কোনও স্থায়ী বাসস্থান ছিল না; থিয়েটারে গেলে অনেক সময় রাতটা সেখানেই কাটাতাম।"

"সে কি, থিয়েটারে? সেই জনশূন্য অন্ধকার ঘরে?"

"আহা, ও সব ভয়-ভীতি আমার নেই। একটু সবুর করুন।...সকলে চলে গেলে আমি তার বক্সটার কাছে গিয়ে সেখানেই শুয়ে পড়তাম। সেটাই তখন আমার জীবনের একমাত্র সুখ। কত রাত সেখানে কাটিয়েছি! কিন্তু আবাব একদিন সেই একই ঘটনা। রাতের বেলা অনেক কিছুই আমাকে দেখা দিতো, কিন্তু সে সব আপনাকে বলতে পারব না।" আনত চোখে অ্যালবার্ট দেলেসভ-এর দিকে তাকাল। "সেটাই বা কি?" সে শুধাল।

"খুবই আশ্চর্য!" দেলেসভ বলল।

কিন্তু সে দেলেসভ-এর কানে কানে বলল, "না, থামুন, থামুন! আমি তার হাতে চুমো খেয়েছি, তার পাশে বসে কেঁদেছি, তার সঙ্গে কত কথা বলেছি। প্রশ্বাসে তার গায়ের সুগন্ধ পেয়েছি, তার কণ্ঠস্বর শুনেছি। এক রাতে সে আমাকে অনেক কিছু বলেছে। তারপর বেহালাটা হাতে নিয়ে মৃদু সুরে বাজিয়েছি; সে এক অপূর্ব বাজনা। কিন্তু আমার কেমন ভয় করতে লাগল। ও সব বাজে ভূত-প্রেতের ভয় আমার নেই; ও সব আমি বিশ্বাস করি না; কিন্তু ভয় হলো আমার মাথাটা নিয়ে।" স্মিত হাসি হেসে সে কপালটা ছুঁল। "ভয় পেলাম আমার বিচার-বুদ্ধিকে নিয়ে। মনে হলো, আমার মাথায় যেন কি একটা হয়েছে। হয়তো সেটা কিছুই নয়। আপনি কি বলেন?"

কয়েক মিনিট দু'জনই চুপচাপ।

"তোরা মেঘ দেখে কেউ করিস নে ভয়,
আড়ালে তার সূর্য হাসে।"

মৃদু হেসে অ্যালবার্ট গান গেয়ে উঠল। বলল, "তাই নয় কি?"

"ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভবেছি, নিয়েছি বিদায়।"

"এ সব কথা পেত্রভ্ আপনাকে খুব ভাল করে বুঝিয়ে বলতে পারত!"

দেলেসভ নীরবে ভীত চোখে তার সঙ্গীর বিবর্ণ, বিচলিত মুখের দিকে তাকাল।

"আপনি কখনও 'জুরিস্তেন্-ওয়াল্জার' শুনেছেন কি?" অ্যালবার্ট সহসা মহাউৎসাহে চেঁচিয়ে বলে উঠল, আর তারপরেই কোনও রকম জবাবের জন্য অপেক্ষা না করেই লাফ দিয়ে উঠল। বেহালাটা তুলে নিল এবং ওয়াল্জ্-এর সুব

বাজাতে শুরু করে দিলো। নিজেকে তখন সে সম্পূর্ণ ভুলে গেল; সে যেন কল্পনায় দেখতে পেল, একটা গোটা অর্কেস্ট্রা তার সঙ্গে বেজে চলেছে। হেসে হেসে, দুলে দুলে, পা ফেলে ফেলে এক অপূর্ব মূর্ছনায় সে বাজাতে লাগল।

বাজনা শেষ করে বেহালাটা ঘুরিয়ে সে বলল, "আঃ! যথেষ্ট ফূর্তি করা হয়েছে।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে সে বলল, "আমি যাচ্ছি। আপনি কি আমার সঙ্গে যাবেন?"

"কোথায়?" দেলেসভ অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

"চলুন, আবার আন্না আইভানভ্নার ওখানে যাই। ভারী মজার জায়গা—হল্লা, লোকজন, গান-বাজনা!"

প্রথমে দেলেসভ প্রায় সম্মতি দিতে যাচ্ছিল, তারপর কি ভেবে সে অ্যালবার্টকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে সে রাতে আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই।

"শুধু এক মুহূর্তের জন্য।"

"না, থাক; আপনার না যাওয়াই ভাল!"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অ্যালবার্ট বেহালাটা রেখে দিলো।

"তাহলে এখানেই থাকতে হবে?"

আর একবার টেবিলটার দিকে তাকিয়ে (টেবিলে তখন মদ ছিল না) শুভরাত্রি জানিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দেলেসভ ঘণ্টা বাজাল।

জখারকে বলল, "আমার অনুমতি ছাড়া মিঃ অ্যালবার্ট যাতে কোথাও যেতে না পারেন সেদিকে খেয়াল রেখো।"

৬

পরের দিনটা ছিল ছুটির দিন। ঘুম থেকে উঠে দেলেসভ বসবার ঘরে বসে কফি খেতে খেতে একটা বই পড়ছিল। পাশের ঘরে অ্যালবার্ট তখনও জাগেনি।

সাবধানে দরজা খুলে জখার খাবার ঘরে উঁকি দিলো।

"আপনি কি বিশ্বাস করবেন স্যার? খালি সোফার উপর তিনি ঘুমিয়ে আছেন! কিছুতেই কোনও কিছু পাততে দিলেন না। একেবারেই ছেলেমানুষ। সত্যিকারের একজন শিল্পী।"

দুপুরের দিকে দরজার ভিতর দিয়ে আর্তনাদ ও কাশির শব্দ শোনা গেল।

জখার আবার খাবার ঘরে ঢুকল। তার সদয় কণ্ঠস্বর আর অ্যালবার্ট-এর দুর্বল মিনতি দেলেসভ শুনতে পেল।

জখার ফিরে এলে জিজ্ঞাসা করল, "কি ব্যাপার?"

"বড়ই বিরক্ত করছেন স্যার; হাত-মুখ ধোবেন না, মন-মরা হয়ে আছেন, বারবার মদ খেতে চাইছেন।"

"না। একবার যখন ব্যাপারটা হাতে নিয়েছি, আমাকে কড়া হতেই হবে," দেলেসভ নিজের মনেই বলল।

হুকুম দিলো; অ্যালবার্টকে যেন মদ না দেওয়া হয়; তারপর আবার বইতে মন দিলো। কিন্তু কানটা পড়ে রইল খাবার ঘরে কি হচ্ছে সেই দিকে। কোনও সাড়া-শব্দ নেই; শুধু মাঝে মাঝে কাশি ও থুথু ফেলার শব্দ শোনা যাচ্ছে। দু'ঘণ্টা কেটে গেল। পোশাক পরে দেলেসভ ভাবল, বেরিয়ে যাবার আগে একবার অতিথিকে দেখে যাবে। হাতের উপর মাথাটা রেখে অ্যালবার্ট চুপচাপ জানালার পাশে বসে ছিলো। মুখ ফিরিয়ে তাকাল। মুখটা হল্‌দে হয়ে গেছে। কুঁচকে গেছে; শুধু বিষণ্ণ নয়, তাকে অত্যন্ত শোচনীয় দেখাচ্ছে। সে হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু তাতে মুখটা আরও বেদনাহত হয়ে উঠল। মনে হলো সে বুঝি কেঁদেই ফেলবে। অনেক কষ্টে উঠে অভিবাদন জানাল।

মিনতিভরা চোখে বলল, "যদি এক গ্লাস সাধারণ ভদ্‌কাও পেতাম। দয়া করুন—আমার এত দুর্বল লাগছে।"

"কফিতেই আপনার বেশি উপকার হবে। সেটাই বরং খান।"

হঠাৎ অ্যালবার্ট-এর মুখের সেই শিশুসুলভ ভাবটা মিলিয়ে গেল; আবছা চোখে উদাস দৃষ্টিতে সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল; দুর্বল শরীরটা চেয়ারে এলিয়ে পড়ল।

"অথবা লাঞ্চ খাবেন কি?"

"না, ধন্যবাদ। আমার ক্ষিদে নেই।"

বেহালাটা টেবিলের উপর রেখে দেলেসভ বলল, "যদি বেহালাটা বাজাতে চান, আমার কোনও অসুবিধা হবে না।"

তিক্ত হাসি হেসে অ্যালবার্ট বেহালাটার দিকে তাকাল।

বলল, "না। আমি খুব দুর্বল; এখন বাজাতে পারব না।" সে বাদ্যযন্ত্রটাকে দূরে ঠেলে দিলো।

তারপর থেকে দেলেসভ অনেক রকম প্রস্তাব করল, তার সঙ্গে বেড়াতে বের হতে বলল, সন্ধ্যায় থিয়েটারে নিয়ে যেতে চাইল; সব কথাতেই বিনীতভাবে মাথা নুইয়ে সে একদম চুপ করে রইল। দেলেসভ বেরিয়ে গেল, কয়েক জনের সঙ্গে দেখা করল, বন্ধুদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করল, আর তারপর থিয়েটারে যাবার আগে পোশাক বদলাবার জন্য এবং শিল্পী কি করছে দেখবার জন্য একবার বাড়িতে এল। হাতের উপর মাথাটা রেখে এবং জ্বলন্ত স্টোভটার দিকে তাকিয়ে সে অন্ধকার হল-ঘরে বসেছিল। পরিষ্কার পোশাক পরেছে, হাত-মুখ ধুয়েছে, চুল ব্রাশ করেছে; কিন্তু চোখ দুটো ঝাপসা ও নিষ্প্রাণ; সমস্ত শরীরে সকালের চাইতেও অধিক দুর্বলতা ও ক্লান্তি ফুটে উঠেছে।

দেলেসভ জিজ্ঞাসা করল, "আপনি খেয়েছেন মিঃ অ্যালবার্ট?"

অ্যালবার্ট মাথা নেড়ে জানাল খেয়েছে; তারপরই ভযার্ত চোখ মেলে দেলেসভের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামাল। দেলেসভ অস্বস্তি বোধ কবল।

সেও চোখ নিচু করে বলল, "আজ থিয়েটারেব পবিচালককে আপনাব কথা বলেছি। আপনি গিয়ে দেখা করলে তিনি আবার আপনাকে থিয়েটারে নেবেন।"

"ধন্যবাদ, আমি বাজাতে পারব না!" চাপা গলায় এই কথা বলে অ্যালবার্ট তার ঘরে ঢুকে আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

কয়েক মিনিট পরে সেই একইভাবে আস্তে দরজাব হাতলটা ঘুরিয়ে সে বেহালাটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল। দ্রুত, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দেলেসভ-এব দিকে একবার তাকিয়ে বেহালাটা চেয়ারের উপরে রেখে সে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

দেলেসভ ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে একটু হাসল।

ভাবল, "আমি আর কি করতে পারি? আমার দোষটা কোথায়?"

বেশ রাত করে বাড়ি ফিরে সে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল, "শিল্পী কেমন আছে?"

জখার সংক্ষেপে বেশ পরিষ্কার করে জবাব দিলো, "খাবাপ! উনি শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন আর কাশছেন, কিছুই বলছেন না; শুধু চাব-পাঁচবার ভদ্‌কা খেতে চেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত এক গ্লাস দিয়েছি—নইলে তাকে শেষ করে ফেলা হত স্যার। ঠিক সেই করণিকের মতো..."

"বেহালাটা কি বাজিয়েছেন?

"বেহালা স্পর্শও করেননি। বার দুই তার হাতে তুলে দিয়েছিলাম, কিন্তু শান্তভাবে হাতে নিয়েই আবার ফিরিয়ে দিয়েছেন।" জখার হেসে বলল। "তাহলে ওকে কোনও রকম মদই দেব না তো?"

"না। আরও একটা দিন দেখা যাক কি হয়। তিনি এখন কি করছেন?"

"বসবার ঘরে দরজা বন্ধ করে রয়েছেন।"

দেলেসভ পড়বার ঘরে ঢুকে কয়েকখানা ফরাসী বই ও একখানা জার্মান বাইবেল বেছে নিলো। "এই বইগুলো কাল তার ঘরে রেখে দেবে, আর তিনি যাতে বাইরে না বের হতে পারেন সেদিকে খেয়াল রাখবে।"

পরদিন জখার মনিবকে জানাল যে, সারারাত শিল্পী মোটেই ঘুমোয়নি; ঘরময় পায়চারি করে বেরিয়েছে এবং ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে ক্যাবার্ড ও দরজা খোলবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু জখার সব জায়গাতেই তালা লাগিয়ে রেখেছিল। সে আরও জানাল, ঘুমের ভাণ করে থেকে সে শুনতে পেয়েছে অন্ধকারে অ্যালবার্ট আপন মনেই বিড় বিড় করে কথা বলেছে ও হাত নেড়েছে।

যত দিন যায় অ্যালবার্ট আরও বিষণ্ণ ও স্বল্পবাক হয়ে পড়ল। মনে হয়, সে যেন দেলেসভকে ভয় করে। দু'জনে চোখাচোখি হলেই তার মুখে একটা রুগ্ন ভয়ের ভাব ফুটে ওঠে। বই বা বেহালা সে স্পর্শও করেনি; কোনও প্রশ্ন করলেও জবাব দেয় না।

অ্যালবার্ট আসবার তৃতীয় দিন অনেক রাতে দেলেসভ শ্রান্ত ও বিচলিত হয়ে বাড়ি ফিরল। এমন একটা কাজ নিয়ে সে সারা দিন ছুটাছুটি করছে যেটা খুব সহজ সরলভাবে মিটে যাবে বলেই সে আশা করেছিল, কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করেও সে কাজে সে এক পাও অগ্রসর হতে পারেনি। তার উপরে ক্লাবে গিয়ে সুইস্ট খেলায় মোটা রকম হেরে এসেছে। কাজেই তার মন মেজাজ ভাল ছিল না।

জখার অ্যালবার্ট-এর শোচনীয় অবস্থার কথা বলতেই সে বলল, "তার যা খুশি তাই করুক। কাল তাকে সোজা জিজ্ঞাসা কবব, সে এখানে থেকে আমার কথামতো চলতে চায় কি না। যদি না চায়, তো সেও ভাল কথা। আমার পক্ষে যতদূর যা করা সম্ভব তা করেছি।"

তারপর নিজের মনেই ভাবতে লাগল, "লোকের ভাল করতে চাওয়ার এই তো ফল। তার জন্য কী না করেছি! এমন একটা নোংরা লোককে বাড়িতে ঠাঁই দিয়েছি যে সকালে কোনও অতিথিকে পর্যন্ত বাড়িতে ডাকতে পারি না। আমি সব জায়গায় ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছি, আর সে এমনভাবে আমার দিকে তাকায় যেন আমি একটা শয়তান, আর আমার নিজের সুখের জন্যই তাকে খাঁচায় আটকে রেখেছি। সব চাইতে বড় কথা, নিজের ভালর জন্যও সে এক পা নড়ে বসবে না। ওরা সকলেই এক রকম।" ('সকলে' বলতে সে বোঝাতে চাইছে জনসাধারণকে, এবং বিশেষভাবে সেই সব লোককে যাদের সঙ্গে আজ তার কাজ উপলক্ষ্যে যোগাযোগ ঘটেছিল।) "আর তার ব্যাপারটাই বা কি? সে কি ভাবছে? কিসের জন্য তার এই যন্ত্রণা? বিপথ থেকে তাকে টেনে এনেছি বলেই কি এত হা-হুতাশ? যে অসম্মানের মধ্যে সে বাস করছিল তার জন্যই কি? না কি যে দারিদ্র্যের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করেছি তার জন্য? পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সে এত নিচে নেমে গেছে যে একটা ভদ্র জীবন তার আর সহ্য হচ্ছে না...।"

দেলেসভ শেষ সিদ্ধান্ত করল, "না, কাজটা ছেলেমানুষের মতো হয়ে গেছে। যখন নিজের ব্যবস্থা করার মতো শক্তি আমার আছে কি না সেটাই ভগবানের হাতে, তখন কেমন করে আমি অন্যের ভাল করব?" একবার ভাবল, অ্যালবার্টকে তখনই চলে যেতে দেবে, আবার কি মনে করে ঠিক করল, যা করার পরের দিন করলেই হবে।

রাতের বেলা হলঘরে একটা টেবিল পড়ার শব্দ এবং গোলমাল ও পায়ের শব্দ শুনে তার ঘুম ভেঙে গেল। একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে সে সবিস্ময়ে কান পাতল।

জখার বলছে, "একটু অপেক্ষা করুন, আমি মনিবকে গিয়ে বলছি;" অ্যালবার্ট উত্তেজিতভাবে গড়গড়িয়ে কি যেন বলে গেল। লাফ দিয়ে উঠে দেলেসভ মোমবাতি নিয়ে হলঘরে ছুটে গেল। জখার রাতের পোশাকে সদর দরজা আটকে দাঁড়িয়ে আছে, আর অ্যালবার্ট টুপি ও জোব্বা পরে তাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে অশ্রুভরা গলায় চিৎকার করে বলছে :

"তোমরা আমাকে এখানে আটকে রাখতে পারবে না। আমার সঙ্গে পাশপোর্ট আছে, আর তোমাদের কোনও জিনিসও আমি সঙ্গে নিইনি। আমাকে তালাস করে দেখতে পারো। আমি পুলিশের বড়কর্তার কাছে যাব...।"

পিঠ দিয়ে দরজা আটকে রেখেই জখার তার মনিবকে বলল, "ক্ষমা করবেন স্যার! রাতের বেলায় ইনি আমার ওভারকোটের পকেট থেকে চাবিটা বের করে নিয়েছেন এবং পুরো একপাত্র ভদ্‌কা খেয়েছেন। এটা কি ঠিক হয়েছে? এখন ইনি চলে যেতে চাইছেন। আপনি হুকুম দিয়েছেন, একে যেন চলে যেতে না দিই; তাই আমি চলে যেতে দিইনি।"

দেলেসভকে দেখে অ্যালবার্ট আরও উত্তেজিতভাবে জখারের দিকে এগিয়ে গেল।

ক্রমাগত গলা চড়িয়ে বলতে লাগল, "আমাকে আটকাবার সাহস কারও নেই! সে অধিকারও কারও নেই!"

দেলেসভ বলল, "সরে এস জখার। আপনাকে ধরে রাখতে আমি পারি না, ধরে রাখতে চাইও না! কিন্তু আমার কথা শুনুন, সকাল না হওয়া পর্যন্ত এখানে থাকুন।" শেষের কথাগুলি সে অ্যালবার্টকে বলল।

দেলেসভ-এর দিকে দৃকপাত পর্যন্ত না করে অ্যালবার্ট ক্রমাগত গলা চড়িয়ে বলতে লাগল, "কেউ আমাকে আটকাতে পারে না। আমি পুলিশের বড়কর্তার কাছে যাব!" তার পরেই ক্রুদ্ধকণ্ঠে হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল, "বাঁচাও!"

দরজাটা খুলে দিয়ে জখার বলল, "এভাবে চেঁচাচ্ছেন কেন? কেউ আপনাকে আটকাচ্ছে না।"

অ্যালবার্ট-এর চিৎকার থেমে গেল। পা-ঢাকা উঁচু জুতো পরতে পরতে সে নিজের মনেই বিড়বিড় করতে লাগল, "আটকাতে পারলে না তো? তাইতো করতে চেয়েছিলে—নয় কি!" কারও কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই ওই ভাবে বিড়বিড় করতে করতে সে বেরিয়ে গেল। জখার তাকে ফটক পর্যন্ত আলোটা দেখিয়ে ফিরে এল।

মনিবকে বলল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন স্যার! কে জানে কি ঘটতে পারত? যা অবস্থা, তাতে রূপোর বাসনগুলো আমি একবার গুণে দেখব...।"

দেলেসভ শুধু মাথা নাড়ল, কোনও কথা বলল না। যে দুটো সন্ধ্যা সে এই শিল্পীটির সঙ্গে কাটিয়েছে তার কথা স্পষ্ট মনে পড়ল; তারই দোষে শেষের যে ক'টা দুঃখের দিন সে এখানে কাটিয়ে গেল সে কথাও মনে পড়ল; সব চাইতে বেশি করে মনে পড়ল এই নবাগত লোকটি তার মনে বিস্ময়, অনুরাগ ও করুণার যে মিশ্র অনুভূতি জাগিয়েছিল তার কথা; লোকটির জন্য তার দুঃখ হতে লাগল। ভাবল, "এখন তার কি হাল হবে? টাকা নেই, গরম কাপড় নেই, এই রাতে একেবারে একা...।" একবার ভাবল, জখারকে পাঠাবে তার খোঁজে, কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।

"বাইরে কি খুব ঠাণ্ডা?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"খুব বরফ পড়ছে স্যার", জখাব জবাব দিলো। "আপনাকে বলতে ভুলে গেছি, বসন্তকালের আগেই আগুন জ্বালাবার জন্য আমাদের আরও কাঠ কিনতে হবে।"

"তা কি করে হয়? তুমি তো বলেছিলে কাঠ কিছুটা বেঁচে যাবে।"

৭

বাইরে সত্যি ঠাণ্ডা পড়েছে। কিন্তু পেটে মদ পড়ায় ও কথা-কাটাকাটির ফলে শরীর গরম থাকায় অ্যালবার্ট সেটা বুঝতে পারল না। রাস্তায় নেমে সে ঘুরে দাঁড়াল; ফূর্তিতে দুই হাত ঘসতে লাগল। পথ জনশূন্য; সারি সারি বাতিগুলো থেকে লাল আলো ছড়িয়ে পড়ছে; আকাশটা পরিষ্কার ও তারায় ভরা। ট্রাউজারের পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে সামনে ঝুঁকে দেলেসভ-এর বাড়ির আলোকিত জানালাকে উদ্দেশ্য করে সে বলল, "ওখানেই থাক!" অনিশ্চিত ভারী পা ফেলে সে রাস্তা ধরে ডান দিকে এগিয়ে চলল। পায়ে ও পেটের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক বোঝার মতো লাগছে, মাথার মধ্যে কিসের একটা আওয়াজ হচ্ছে, কোনও অদৃশ্য শক্তি তাকে এপাশে-ওপাশে ঠেলে দিচ্ছে; তবু সে আন্না আইভান্‌ভনার বাড়ির দিকেই এগিয়ে চলল। অদ্ভুত সব বিশৃঙ্খল চিন্তা তার মনের মধ্যে আসা-যাওয়া করতে লাগল। এই মনে পড়ল জখার-এর শেষ কথা-কাটাকাটির কথা, আবার পরক্ষণেই মনে পড়ল সমুদ্রের কথা, স্ট্রীমবোটে চেপে প্রথম রাশিয়াতে আসার কথা, পথের পাশে একটা দোকানে এক বন্ধুর সঙ্গে একটা সুখের দিন কাটানো; আর তার পরেই সহসা একটা পরিচিত গানের সুর তার মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল তার অনুরাগের পাত্রীর কথা আর থিয়েটারের সেই ভয়ংকর দিনটির কথা। অসংলগ্ন হলেও এই সব স্মৃতি এতই স্পষ্ট হয়ে তার সামনে উপস্থিত হলো যে চোখ বুজে সে বুঝতেই পারল না, কোন্‌টা অধিক বাস্তব : সে যা করছে সেটা, না কি যা সে ভাবছে সেটা। কি ভাবে তার পা দুটো চলছে, কি ভাবে সে হেলে-দুলে দেয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে, কি ভাবে রাস্তা দেখছে বা এক রাস্তা থেকে আর এক রাস্তায় যাচ্ছে— সে সব কিছুই সে বুঝতে পারছে না। শুধু যে ছবিগুলি কল্পনায় তার মনের সামনে ভেসে উঠে অদ্ভুতভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছিল মাত্র সেইগুলিই সে বুঝতে পারছিল।

লিটল্‌ মর্‌স্কায়া স্ট্রীট ধরে যেতে যেতে অ্যালবার্ট ঠোক্কর খেয়ে পড়ে গেল। মুহূর্তের জন্য জ্ঞান ফিরে এলে সে সামনেই একটা প্রকাণ্ড আশ্চর্য বাড়ি দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল। আকাশে তারা নেই, চাঁদ নেই; ঊষা নেই; কিছুই চোখে পড়ছে না; রাস্তার বাতিগুলোও নেই; অথচ সব কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। যে বাড়িটা রাস্তার একেবারে শেষ প্রান্তে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে তার জানালার আলোগুলি জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে; কিন্তু সবই কেমন যেন কাঁপছে। বাড়িটা ক্রমেই আরও কাছে, আরও স্পষ্ট

হয়ে এল। কিন্তু যেই সে চওড়া ফটকটা দিয়ে বাড়িতে ঢুকল, অমনই সব আলো নিভে গেল। ভিতরে অন্ধকার। গোলাকাব ছাদের নিচে কোনও একজনের পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল; সে এগিয়ে যেতেই কিছু ছায়া যেন দ্রুত সরে গেল। "কেন আমি এখানে এসেছি?" সে নিজেকে প্রশ্ন করল; কিন্তু একটা দুর্নিবার শক্তি তাকে সেই প্রকাণ্ড হলের দিকে টেনে নিয়ে গেল। একপাশে একটা উঁচু মঞ্চের উপরে কিছু ছোটখাট লোক চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। "কে কথা বলবেন?" অ্যালবার্ট জিজ্ঞাসা করল। কেউ জবাব দিলো না; একজন শুধু মঞ্চটা দেখিয়ে দিলো। একটি লম্বা সরু লোক আগে থেকেই সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল; মাথায় শক্ত খাড়া চুল, পবনে চিত্র-বিচিত্র ড্রেসিংগাউন। অ্যালবার্ট সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধু পেত্রভ্‌কে চিনতে পাবল। ভাবল, "কী আশ্চর্য যে সেও এখানে হাজির!" কাউকে উদ্দেশ করে সে বলছে, 'না ভাইসব! তোমাদের সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও একটি লোককে তোমরা চিনতে পারোনি; তাকে তোমরা চিনতে পারোনি! সে ভাড়াটে শিল্পী নয়, যান্ত্রিক বাজনাদার নয়, পাগল নয়, সব হাবিয়ে যাওয়া মানুষও নয়। সে একটি প্রতিভা—একটি মহৎ সঙ্গীত প্রতিভা! তোমরা তাকে দেখোনি, তাকে বুঝতে পারোনি, তাই সে নষ্ট হয়ে গেল!" অ্যালবার্ট বুঝতে পারল তার বন্ধু কার কথা বলছে, কিন্তু পাছে সে অপ্রস্তুত হয় তাই সে আস্তে মাথাটা নিচু করল।

"আমরা সকলেই যে পবিত্র অগ্নির উপাসনা করি সেই অগ্নিই তাকে খড়কুটোর মতো পুড়িয়েছে!" তার কণ্ঠস্বর চড়তে লাগল, "কিন্তু ঈশ্বর তাকে যা দিয়েছিলেন তা সে পূর্ণ করেছে, আব তাই তাকে মহৎ মানুষ বলাই উচিত। তোমরা তাকে ঘৃণা কবতে পারো, যন্ত্রণা দিতে পারো, হেয় করতে পারো, কিন্তু সে তোমাদের সকলেব চাইতে অসংখ্যগুণ বড়—তাই সে ছিল, আছে, এবং থাকবে। সে সুখী, সে দয়ালু। সে সকলকে সমানভাবেই ভালবাসে বা ঘৃণা করে, কিন্তু সেবা কবে শুধু সেই শক্তির যা উপর থেকে তার মধ্যে নেমে এসেছে। একটিমাত্র জিনিসকে সে ভালবাসে—পৃথিবীতে একমাত্র সন্দেহাতীত আশীর্বাদস্বরূপ সৌন্দর্যকে। হ্যাঁ, এই তার স্বরূপ! তার সামনে সাষ্টাঙ্গে নত হও, সকলে! নতজানু হও!" সে চিৎকার করে বলল।

কিন্তু হলের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল আর একটি নরম গলা : "তার সামনে নতজানু হবার ইচ্ছা আমার নেই।" অ্যালবার্ট সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পাবল এটা দেলেসভ-এর গলা। "কিসে সে বড়? কেন তার সামনে মাথা নোয়াব? তার চাল-চলন কি সম্মানের উপযুক্ত ছিল? সঙ্গত ছিল? সে কি সমাজের কোনও উপকারে এসেছে? আমরা কি জানি না, সে টাকা ধার করে কখনও ফেরৎ দেয়নি; শিল্পী-বন্ধুর বেহালা নিয়ে বন্ধক রেখেছে?...(মাথাটা আবও নিচু করে অ্যালবার্ট ভাবল, "হা ঈশ্বর, এ সব কথা সে জানল কেমন করে?") আমরা কি জানি না, কত তুচ্ছ লোকের তোষামোদ সে করেছে, করেছে শুধু টাকার জন্য? আমরা কি জানি না, কি

ভাবে সে থিয়েটার থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল? আর কেনই বা আন্না আইভানভ্‌না তাকে পুলিশে দিতে চেয়েছিল?

(হে ঈশ্বর। এ সবই সত্যি, কিন্তু তুমি তো জানো কেন আমি এ সব করেছি; তুমি আমাকে বাঁচাও!")

"থামো, লজ্জা করে না!" আবার পেত্রভ-এর গলা শোনা গেল। "তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার কি অধিকার আছে তোমার? তার মতো করে কি জীবন যাপন করেছ? অনুভব করেছ তার উন্মাদনা? ("ঠিক, ঠিক!" অ্যালবার্ট ফিস্ ফিস্ করে বলল।) আর্ট মানুষের শক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। মাত্র বিশেষ কয়েকজনই সে শক্তির অধিকারী হয়; সেই শক্তির বলে সে এত উঁচুতে ওঠে যে তার মাথা ঘুরে যায়, সে আর স্বাভাবিক থাকতে পারে না। অন্য যে কোনও সংগ্রামের মতোই আর্টের ক্ষেত্রেও যারা বীর তারা সম্পূর্ণভাবে তার সেবায়ই আত্মনিয়োগ করে এবং শেষ লক্ষ্যে পৌঁছবার আগেই মৃত্যুকে বরণ করে।" পেত্রভ থামল; অ্যালবার্ট মাথা তুলে চেঁচিয়ে বলল, "ঠিক, ঠিক!" কিন্তু তার গলা দিয়ে একটা শব্দও বের হলো না।

তার দিকে ফিরে শিল্পী পেত্রভ রুক্ষ গলায় বলল, "এটা তোমার ব্যাপার নয়।" তারপর আবার আগের কথার জের টেনে বলতে লাগল, "হ্যাঁ, তাকে হেয় করো, ঘৃণা করো, কিন্তু তবু তোমাদের সকলের চাইতে সেই শ্রেষ্ঠ, সেই সুখী।"

গভীর আনন্দে কথাগুলি শুনতে শুনতে অ্যালবার্ট আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না; চুমো খাবার জন্য বন্ধুর দিকে এগিয়ে গেল।

পেত্রভ বলল, "চলে যাও! আমি তোমাকে চিনি না! যেখানে যাচ্ছিলে যাও, নইলে সেখানে পৌঁছতে পাবে না।"

"দেখো, মদই তোমাকে খেয়েছে! তুমি সেখানে যেতেই পারবে না," চৌরাস্তায় একটি পুলিশ চেঁচিয়ে বলল।

অ্যালবার্ট থামল; শক্তি সংগ্রহ করে যাতে পা না টলে সেইভাবে পাশের রাস্তায় মোড় ঘুরল।

আর কয়েক পা গেলেই আন্না আইভানভ্‌নার দরজা। তার বাড়ির হল থেকে আলো এসে উঠোনের বরফের উপর পড়েছে; ফটকে দাঁড়িয়ে আছে অনেক স্লেজ ও গাড়ি।

অসার হাতে সিঁড়ির স্তম্ভটা ধরে দৌড়ে কয়েক ধাপ উঠে সে ঘণ্টা বাজাল। খোলা দরজায় একটি দাসীর ঘুম ঘুম মুখ দেখা দিলো। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সে অ্যালবার্টের দিকে তাকাল। চেঁচিয়ে বলল, "ঢুকতে পারবে না। তোমাকে ঢুকতে দেবার হুকুম নেই।" সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। বাজনার সুর ও মেয়েদের গলা সিঁড়ি পর্যন্ত ভেসে আসছিল। সেখানেই বসে পড়ে দেয়ালে মাথাটা রেখে অ্যালবার্ট চোখ বুজল। সঙ্গে সঙ্গে অনেক অসংলগ্ন ছবি নতুন করে তার চোখের সামনে এসে ভিড় করল, তাদের

ঢেউয়ে ভাসিয়ে দিয়ে তাকে নিয়ে গেল একটি মুক্ত, সুন্দর স্বপ্নের দেশে। তার অলস কল্পনায় ভেসে এল কয়েকটি কথা; "হ্যাঁ, সেই সকলের শ্রেষ্ঠ, সকলের চাইতে সুখী!" দরজার ফাঁক দিয়ে পোলকার সুর ভেসে এল। সেই সুর যেন তাকে বলল, সেই শ্রেষ্ঠ, সেই সব চাইতে সুখী। ভোরে প্রার্থনার জন্য কাছাকাছি একটা গির্জার ঘণ্টা বেজে উঠল; সে ঘণ্টার ধ্বনিও যেন বলল, "হ্যাঁ, সেই সকলের শ্রেষ্ঠ, সেই সকলের চাইতে সুখী!"...অ্যালবার্ট ভাবল, "হলেই ফিরে যাই। পেত্রভ্ আবার কথাগুলি আমাকে বলুক।" কিন্তু এখন তো হলে কেউ নেই; শিল্পী পেত্রভ্-এর পরিবর্তে মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে আছে অ্যালবার্ট নিজে, আর সেই কণ্ঠ আগে যে কথাগুলি বলেছিল তাই সে বাজিয়ে চলেছে বেহালার সুরে। কিন্তু সে বেহালাটার গড়ন বড় বিচিত্র; কাঁচ দিয়ে তৈরি, আর দুই হাতে ধরে আস্তে আস্তে বুকের উপর চেপে ধরলে তবে তা থেকে শব্দ বের হয়। এত মধুর সুর অ্যালবার্ট আগে কখনও শোনেনি। বেহালাটাকে যতই বুকে চেপে ধরছে ততই তার বুকটা আনন্দে ভরে উঠছে। শব্দটা যত বাড়ছে, ছায়াগুলি ততই দ্রুত সরে যাচ্ছে, আর একটা স্বচ্ছ আলোয় হলের দেয়ালটা ততই উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। কিন্তু বেহালাটা বড় সাবধানে বাজাতে হচ্ছে, পাছে ভেঙে যায়। কাঁচের যন্ত্রটাকে সে সযত্নে ভালভাবে বাজাতে লাগল। এমন সব সুর সে বাজাতে লাগল যা কেউ কোনওদিন আর শুনতে পাবে না। আর একটি অস্পষ্ট দূরাগত শব্দ যেই তার মনোযোগ আকর্ষণ করল অমনি সে ক্লান্ত বোধ করতে লাগল। একটা ঘণ্টার শব্দ; যেন অনেক উঁচু থেকে, অনেক দূর থেকে গুন্‌গুন্ করে বলছে : 'হ্যাঁ, তোমার কাছে সে করুণার পাত্র, তুমি তাকে ঘৃণা করো, তবু সেই শ্রেষ্ঠ, সেই সব চাইতে সুখী! এ যন্ত্র আর কেউ কোনওদিন বাজাতে পারবে না।"

কথাগুলি হঠাৎ অ্যালবার্টের কাছে এত জ্ঞানগর্ভ, এত নতুন ও এতই সত্য বলে মনে হলো যে বাজনা বন্ধ করে একটুও না নড়ে আকাশের দিকে দুই হাত ও দুই চোখ তুলল। মনে হলো, সে সুন্দর, সে সুখী। সে ছাড়া আর কেউ হলে ছিল না; তবু বুক চিতিয়ে সগর্বে মাথা খাড়া করে এমনভাবে সে মঞ্চের উপর দাঁড়াল যাতে সকলেই তাকে দেখতে পায়। সহসা কার যেন হাত আস্তে তার কাঁধ স্পর্শ করল; মুখ ফিরিয়ে অস্পষ্ট আলোয় একটি নারীকে দেখতে পেল। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে নারী নিষেধের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারল সে যা করছে সেটা ভুল; সে লজ্জা পেল। নারীকে জিজ্ঞাসা করল, "কোন পথে?" পুনবায় তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নারী বিষণ্ণভাবে মাথাটা কাত করল। এই তো সেই—যাকে সে ভালবাসত; সেই পোশাক, সাদা গলা জুড়ে সেই মুক্তোর মালা, সুন্দর দুটি বাহু কনুই পর্যন্ত খোলা। নাবী তার হাত ধরে হলের বাইরে নিয়ে চলল। অ্যালবার্ট বলল, "দরজা তো ওদিকে"; কোনও কথা না বলে একটু হেসে সে তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। হলের চৌকাঠে পৌছে অ্যালবার্ট চাঁদ আর জল দেখতে পেল।

কিন্তু সাধারণত যে রকম হয়ে থাকে, জলটা তেমন নিচে নেই; তেমনি চাঁদটাও অনেক উঁচুতে অবস্থিত একটি সাদা বৃত্ত নয়। চাঁদ ও জল, একই সঙ্গে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে—উপরে, নিচে, দুই পাশে আর তাদের দু'জনের চার পাশে। তাকে নিয়ে অ্যালবার্ট সেই চাঁদ ও জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল; তার মনে হলো, এ জগতে যাকে সব চাইতে ভালবেসেছে এখন সে তাকে আলিঙ্গন করতে পারবে। তাকে আলিঙ্গনে বেঁধে তার মন ভাষার অতীত সুখে ভরে গেল। নিজেকেই প্রশ্ন করল, "এ স্বপ্ন নয় তো?" কিন্তু না! এ তো বাস্তবের চাইতেও বেশি; এ যে এক সঙ্গে বাস্তব ও স্মৃতি। নারীকে জিজ্ঞাসা করল, "আমি কিসের জন্য কাঁদছি?" নীরব বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে নারী তার দিকে তাকাল। অ্যালবার্ট তার মনের কথা বুঝতে পারল। বিড়্‌বিড়্ করে বলল, "কিন্তু তা কেমন করে হবে, আমি যে এখনও বেঁচে আছি?" কোনও কথা না বলে, একটুও না নড়ে নারী সোজা সামনের দিকে তাকাল। সে সভয়ে ভাবল, "এ যে ভয়ংকর! ওকে কি করে বোঝাব যে আমি এখনও বেঁচে আছি?" ফিস্ ফিস্ করে বলল, "হে প্রভু, আমি যে বেঁচে আছি, বুঝতে পারছ না!"

কে যেন বলল, "সেই শ্রেষ্ঠ, সেই সব চাইতে সুখী!" কিন্তু কি যেন অ্যালবার্টকে ক্রমেই বেশি করে চেপে ধরেছে। সে কি ঐ চাঁদ আর জল। নাকি এই নারীর আলিঙ্গন, না তার নিজের চোখের জল—সে জানে না, কিন্তু এটুকু সে বুঝতে পারছে যে যা কিছু বলার ছিল তা আর বলা হলো না; অচিরেই সব শেষ হয়ে যাবে।

আন্না আইভানভ্‌নার বাড়ি থেকে বের হবার মুখে দুটি লোক অ্যালবার্টের গায়ে হোঁচট খেল; চৌকাঠ বরাবর অ্যালবার্ট পড়ে আছে। তাদের একজন ফিরে গিয়ে গৃহকর্ত্রীকে ডেকে আনল।

বলল, "আরে, এ যে অমানুষিক ব্যবহার! একটা লোককে তুমি এইভাবে জমে যেতে দিলে!"

গৃহকর্ত্রী বলল, "আঃ, এ যে অ্যালবার্ট! আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে! আনুশ্‌কা, কোথাও একটা ঘরে ওকে শুইয়ে দে তো।"

সকলে যখন অজ্ঞান অবস্থায় তাকে বয়ে নিয়ে চলল তখন অ্যালবার্ট বিড়্‌বিড়্ করে বলতে লাগল, "কিন্তু আমি তো বেঁচে আছি—আমাকে কবর দিচ্ছ কেন?"

—১৮৫৮

পলিকুশ্‌কা

Polikushka

১

"আপনিই বলুন ম্যা'ম! তবে যদি দুত্‌লভদের ব্যাপার হয় তো খুবই দুঃখের কথা। তারা সবাই ভাল মানুষ, আর বাড়ির অন্তত একটা ভূমিদাসকে যদি আমরা না পাঠাই, তাহলে তাদের মধ্যে একজনকে যেতেই হবে," নায়েব কথাগুলি বলল। "যা দেখছি, সকলেই তাদের কথা বলছে।...এখন আপনার যেমন ইচ্ছা ম্যা'ম!"

সে বাঁ হাতের উপর ডান হাতটা রেখে সামনে বাড়িয়ে দিলো; মাথাটাকে ডান কাঁধের উপর কাত করল; পাতলা ঠোঁট দুটোকে সশব্দে ভিতরে টেনে নিলো; চোখ তুলে তাকাল, কিন্তু আর কোনও কথা বলল না; স্পষ্টতই তার মনের ইচ্ছা, অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকবে এবং কোনও জবাব না দিয়ে কর্ত্রীঠাকরুণের বাজে বকবকানিগুলি শুনে যাবে!

পরিষ্কার কামানো মুখ, আর নায়েবদের মতো কাটছাঁটের একটা লম্বা কোট পরনে নায়েবটি হেমন্তকালের সন্ধ্যায় এখানে এসেছে কর্ত্রীঠাকরুণের কাছে একটি প্রতিবেদন দাখিল করতে। জন্মসূত্রে সে নিজেও ছিল একজন ভূমিদাস।

মহিলাটির দিক থেকে এই প্রতিবেদনের অর্থ হচ্ছে তার জমিদারিতে যে সব কাজ হয়েছে তার বিবরণ শোনা এবং ভবিষ্যতের জন্য নতুন কাজের নির্দেশ দেওয়া। আর নায়েব এগর মিখাইলোভিচ-এর দিক থেকে 'প্রতিবেদনের' অর্থ হচ্ছে সোফার দিকে মুখ করে ঘরের এক কোণে দুই পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, যত রাজ্যের আবোল-তাবোল কথা মন দিয়ে শোনা, এবং নানাবিধ উপায়ে কর্ত্রীঠাকরুণকে এমন একটা মানসিক অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যাতে অধৈর্য হয়ে মনিব এগর মিখাইলোভিচ যে সমস্ত প্রস্তাব করেছে তার সবগুলি সম্পর্কেই বলে দেয়, "ঠিক আছে, ঠিক আছে।"

আলোচনার বিষয়বস্তু হলো বাধ্যতামূলক সৈন্যদলভুক্তি। পোক্রভ্‌স্ক্‌ জমিদারি থেকে তিন জনকে পাঠাতে হবে। পারিবারিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার আকস্মিক যোগাযোগের ফলে দু'জনের ভাগ্য ইতিমধ্যেই নির্ধারিত হয়ে গেছে। তাদের ব্যাপারে কর্ত্রী ঠাকরুণ, বা কমিউন, বা জনমত কোনও পক্ষ থেকেই কোনও বিতর্ক বা ইতস্তত করবার কোনও কারণই থাকতে পারে না। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তিটি কে হবে তাই নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। নায়েব চায় দুত্‌লভদের বাঁচাতে (সে পরিবারে সামরিক বয়সের পুরুষ আছে তিন জন), এবং বিবাহিত ভূমিদাস

পলিকুশ্‌কাকে পাঠাতে। পলিকুশকার অনেক কুখ্যাতি আছে; বস্তা, জিন ও খড় চুরির অপরাধে একাধিকবার সে ধরা পড়েছে; কিন্তু কর্ত্রীঠাকরুণ পলিকুশ্‌কার জীর্ণশীর্ণ ছেলেমেয়েগুলোকে প্রায়ই আদর করে; বাইবেলের বাণী শুনিয়ে তার নীতিবোধের অনেক উন্নতি বিধান করেছে; তাই সে পলিকুশ্‌কাকে ছাড়তে চায় না। কিন্তু সেই সঙ্গে দুত্‌লভদের না চিনলেও, এবং কখনও তাদের চোখে না দেখলেও তাদের কোনও ক্ষতি করতেও সে চায় না। কিন্তু যে কারণেই হোক সে অবস্থাটা ঠিক মতো বুঝতে পারছে না, আর নায়েবও মন খুলে সোজাসুজি বলতে পারছে না যে পলিকুশ্‌কা না গেলে দুত্‌লভদের একজনকেই যেতে হবে। কর্ত্রী আবেগের সঙ্গে বলল, "কিন্তু আমি চাই না যে দুত্‌লভদের কোনও ক্ষতি হোক।" "তা যদি না চান—তো তিন শ' রুবল দিয়ে তার জায়গায় অন্য লোক জোগাড় করুন," এটাই নায়েবের জবাব হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু নীতি হিসাবে সেটা হতো ভুল।

এগর মিখাইলোভিচ একটা আরামদায়ক জায়গা বেছে নিল; এমন কি সকলের অলক্ষিতে দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে মহিলাটির ঠোঁটের নড়াচড়া, তার টুপির কুঁচির পৎপৎ করে ওড়া এবং একটা ছবির নিচে দেয়ালে তাদের ছবিটা দেখতে লাগল। অবশ্য তার কথায় কান দেবার কোনও দরকার বোধ করল না। মহিলাটি অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথাই বলে গেল। বেশি দিন আগেকার কথা নয়; বিরোধী পক্ষের একজন সদস্য যখন মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে বক্তৃতার ঝড় বইয়ে দিচ্ছিল তখন লর্ড পামারস্টোন টুপিতে মুখ ঢেকে বসেছিল; তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষের বক্তৃতার জবাবে প্রতিটি পয়েন্ট ধরে ধরে ঝাড়া তিন ঘণ্টা বক্তৃতা করেছিল।

সে দৃশ্য দেখে আমি অবাক হইনি, কারণ এগর মিখাইলোভিচ ও তার কর্ত্রীর মধ্যে এ রকম দৃশ্য চলতে আমি হাজার বার দেখেছি। অবশেষে হয় ঘুমিয়ে পড়বার ভয়ে অথবা মহিলাটির কথা হয়তো শেষই হবে না এই ভয়ে—নায়েব তার শরীরের ভরটা বাঁ পা থেকে ডান পায়ের উপর নিয়ে একটি মিষ্টি ভূমিকা করে কথা বলতে শুরু করল :

'আপনি যেমনটি হুকুম করবেন ম্যা'ম।...শুধু কমিউনের লোকজনরা আমার আপিসের জানালার নিচে এসে জমায়েত হয়েছে বলে আমাদের একটু তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হুকুম-নামায় বলা আছে, 'পোক্রভ ভোজের' আগেই নতুন সৈনিকদের শহরে হাজির হতে হবে। চাষীদের মধ্যে একমাত্র দুত্‌লভদের কথাই উঠেছে, আর কারও নয়। দুত্‌লভদের সর্বনাশ হলেই বা তাদের কি? আমি তো জানি, কী কষ্টে তাদের দিন কাটে! যবে থেকে আমি নায়েবগিরি পেয়েছি তখন থেকেই তারা অভাব অনটনের মধ্যে আছে বুড়োর ছোট ভাই-পোটি পরে একটু বড় হয়ে কাজের উপযুক্ত হয়েছে। অমনি আবার তাদের সর্বনাশের ডাক এসেছে! আপনি তো

ভালই জানেন আপনার সম্পত্তিকে আমি নিজের সম্পত্তির মতোই মনে করে থাকি।...ব্যাপারটা খুবই দুঃখের ম্যা'ম, এখন আপনার যা অভিরুচি!...তারা আমার আত্মীয়জন কিছু নয়, আর তাদের কাছ থেকে আমি কিছু পাইও না।...

"সে কি এগর, সে রকম কথা কি আমি কখনও ভেবেছি!" মহিলাটি তাকে বাধা দিলো; সঙ্গে সঙ্গে তার সন্দেহ হলো, দুত্‌লভরা একে ঘুষ খাইয়েছে।

"...তবে সারা পোক্রভ্‌স্ক্‌-এ তাদের বাড়িটাই সব চাইতে ভাল। তারা ধর্মভীরু, কঠোর পরিশ্রমী চাষী। বুড়ো তো তিরিশ বছর ধরে গির্জা-প্রধানের কাজ করে আসছে; সে মদ খায় না, শপথ করে না, আর নিয়মিত গির্জায় যায় (কি ভাবে টোপ ফেলতে হয় নায়েব তা ভালই জানে)।...কিন্তু আসল কথা যা আপনাকে বলা দরকার সেটা হলো, তার মাত্র দুটিই ছেলে—বাকিরা সব ভাই-পো, দয়া করে তাদের সে আশ্রয় দিয়েছে—কাজেই দু'জনের পরিবার থেকেই ভাগ্য পরীক্ষাটা হবে। অনেক পরিবারই ভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে তারা এখন নিরাপদ—আর উদারতার জন্যই এই পরিবারটিকে এখন কষ্ট পেতে হবে।"

এই কথাগুলি মহিলাটির বোধগম্য হলো না। "দুই জনের পরিবারই" বা কি, আর "উদারতার" মানেই বা কি? সে বলল, "দেখো এগর মিখাইলোভিচ্‌ দুত্‌লভদের কেউ সৈন্য হয়ে যাক সেটা আমিও চাই না। আমি শুধু একটা কথাই বলতে চাই : কোনও কারণেই পলিকুশ্‌কাকে আমি ছাড়ব না। সেই ঘড়ির ব্যাপারটার পরে সে যখন চোখের জল ফেলতে ফেলতে নিজের থেকে সব কথা আমার কাছে স্বীকার করেছিল, এবং নিজেকে সংশোধন করবে বলে কথা দিয়েছিল, তখন আমি অনেকক্ষণ ধরে তার সঙ্গে কথা বলে বুঝেছিলাম যে সে সত্যি সত্যি অনুতপ্ত। সেটা সাত মাস আগেকার কথা; আর এর মধ্যে সে আর একবারও মাতলামি করেনি, খুবই ভালভাবে চলেছে। তার স্ত্রীও আমাকে বলেছে যে সে এখন বদলে গেছে। ভাল হয়ে ওঠার পরেও তাকে আমি শাস্তি দেব, এটা তুমি ভাবলে কেমন করে? তাছাড়া, যে লোকটার পাঁচটা ছেলেমেয়ে আর খাওয়াবার মানুষ শুধু সে নিজে, তাকে সৈন্য করে পাঠানো তো অমানুষের কাজ।...না, এ সম্পর্কে আর কিছু বলো না এগর!"

মহিলাটি হাতের গ্লাসে চুমুক দিলো।

তরল পানীয় কি ভাবে তার গলা দিয়ে নামছে সেটা দেখে নিয়ে এগর মিখাইলোভিচ শুকনো গলায় সংক্ষেপে বলল .

"তাহলে দুত্‌লভদের পাঠানোই স্থির হলো?"

"তুমি কেন বুঝতে পারছ না? দুত্‌লভদের ক্ষতি হোক তা কি আমি চাই? তার বিরুদ্ধে কি আমার রাগ আছে? ঈশ্বর সাক্ষী, তাদের ভালর জন্য সব কিছু করতে আমি প্রস্তুত।.. (সে ঘরের কোণের ছবিটার দিকে তাকাল, কিন্তু তার মনে পড়ে গেল যে ওটা দেবমূর্তি নয়।) কিন্তু আমি কি করতে পারি? আমি জানিই বা কি? আমার

পক্ষে তো জানা অসম্ভব। দেখো, আমি তোমার উপবেই ভরসা করি, আমার মনোবাসনা তো তুমি জানো।...আইনমাফিক কাজ করে যাতে সকলকেই খুশি করা যায় সেইভাবে চলো।... কি আর করা যাবে? শুধু তো তাদের কথাই নয়; সকলেরই অভাব অভিযোগ আছে। তবে পলিকুশ্‌কাকে পাঠানো চলবে না। তোমার বোঝা চাই যে সে কাজ করা আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর।"

সেই সময় একটি দাসী ঘরে না ঢুকলে সে হয় তো আরও অনেকক্ষণ কথা চালিয়ে যেত।

"কি রে দুনিয়াশা?"

"একটি চাষী এগর মিখাইলোভিচকে জিজ্ঞাসা করছে, সভাটা তার জন্য অপেক্ষা করবে কি না," কথাগুলি বলে দুনিয়াশা ক্রুদ্ধ চোখে এগর মিখাইলোভিচের দিকে তাকাল।

"আচ্ছা, তাহলে তুমি যাও এগর; যা ভাল বোঝ তাই করো।"

"আচ্ছা ম্যা'ম।" দুত্‌লভদের সম্পর্কে আব কিছু বলল না। "বাজার মালীব কাছ থেকে টাকা আনতে কে যাবে?"

"পিতার কি শহর থেকে ফেরেনি?"

"না। ম্যা'ম।"

"নিকোলাস কি যেতে পারত না?"

"বাবা পিঠের ব্যথায় শয্যাশায়ী," দুনিয়াশা বলল।

"আমি নিজেই কি কাল যাব ম্যা'ম?" নায়েব জিজ্ঞাসা করল।

"না এগর, তোমাকে এখানে দরকার।" একটু ভেবে, "কত টাকা?"

"চার শ' বাষট্টি রুবল।"

"পলিকুশ্‌কাকে পাঠাও," মহিলার চোখে স্থির সংকল্প।

এগর মিখাইলোভিচ হাসির মতো করে ঠোঁট দুটি ছড়াল, কিন্তু দাঁত ফাঁক করল না; মুখের ভাবেরও কোনও পরিবর্তন হলো না।

"আচ্ছা ম্যাম।"

"তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

"হ্যাঁ ম্যা'ম।" এগর মিখাইলোভিচ গদীর দিকে গেল।

২

পলিকি (তাচ্ছিল্য করে তাকে পলিকুশ্‌কা বলে ডাকা হয়) অতি সাধারণ মানুষ, কিছুটা কুখ্যাতিও আছে; এ গাঁয়ের লোক না হওয়ায় খানসামা, নায়েব, অথবা খাস-দাসী কারও উপরেই তার কোনও প্রভাব ছিল না। পরিবারের লোক সাতজন হলেও তার "খুপড়ি" টাই সব চাইতে খারাপ। স্বর্গত মালিক খুপড়িগুলোকে এইভাবে তৈরি

করিয়েছিল : মাঝখানে তেইশ বর্গফুট মাপের ইটের বাড়ি; চারদিকে পথ দিয়ে ঘেরা একটা বড় রুটি-সেঁকার ইটের উনুন; বাড়িটার চারটি কোণই কাঠের বেড়া দিয়ে ঐ পথ থেকে আলাদা করা হয়েছে। কাজেই খুপড়িগুলোতে বেশি জায়গা নেই; বিশেষ করে পলিকির খুপড়িতে জায়গা খুবই অল্প, কারণ সেটা দরজার সব চাইতে কাছে। স্বামী-স্ত্রীর শোবার তক্তপোষ, ছাপা লেপ ও বালিশের ওড়, একটি শিশু সমেত দোলনা। একটা তে-পায়া ছোট টেবিল (তার উপরেই রান্না ও কাচাকাচির কাজ চলে, গৃহস্থালির জিনিসপত্র রাখা হয়, আর ঘোড়ার ডাক্তার পলিকিও তার উপরেই কাজকর্ম করে), কয়েকটা টব, জামাকাপড়, কয়েকটা মুরগির বাচ্চা, একটা বাছুর, আর পরিবারের সাতটি মানুষ—এতেই খুপড়িটা একেবারে ভরে গেছে—নড়াচড়ার জায়গাটুকু পর্যন্ত নেই।...এ অবস্থায় বাস করা খুবই ভয়াবহ মনে হতে পারে, কিন্তু তারা কিছু মনে করে না—বেশ চলে যায়। আকুলিনা স্বামী ও ছেলেমেয়েদের জামা-কাপড় ধোয়, সুতো কাটে, কাপড় বোনে, জামা-কাপড় রং করে, সর্বসাধারণের উনুনে রান্না করে, রুটি সেঁকে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝগড়া করে, আবার আলাপও জমায়। মাসে রেশন যা পায় তাতে ছেলেমেয়েদের কুলিয়েও গরুর ভাগ্যে কিছুটা জোটে। জ্বালানি বিনা পয়সাতেই মেলে; পোষা জীবদের খাবারও; আস্তাবল থেকে কিছুটা খড়ও মাঝে মাঝে জুটে যায়। ছোট এক ফালি সব্জি-বাগান আছে। গাইটা বাচ্চা দিয়েছে; কয়েকটা মুরগিও আছে। পলিকি আস্তাবলের দুটো পালের ঘোড়ার দেখাশুনা করে; গরু-ঘোড়ার রক্ত-মোক্ষণ করে, ক্ষুর পরিষ্কার করে, ঘা ধুইয়ে নিজের তৈরি মলম লাগিয়ে দেয়, আর সেজন্য নগদ টাকা পায়, জিনিসপত্রও পায়। মাঝে মাঝে কর্ত্রীঠাকরুণের কিছু যইও তার হাতে চলে আসে আর তার বদলে গাঁয়েরই এক চাষী নিয়মিত মাসে বিশ পাউন্ড করে মাংস তাকে দেয়। এ অবস্থায় জীবনযাত্রা তো মোটামুটি ভাল হবারই কথা, অবশ্য যদি তাদের মনে কোনও অশান্তি না থাকত। কিন্তু বড় রকমের অশান্তিই ছিল। পলিকি যৌবনে অন্য গাঁয়ের একটা পালের ঘোড়ার খামারে কাজ করত। সেখানে যে সহিসের পাল্লায় সে পড়েছিল সে ছিল গোটা জেলার সব চাইতে বড় চোর; শেষ পর্যন্ত সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হয়েছিল। সেই লোকটার কাছেই পলিকি ছিল শিক্ষানবীশ; ফলে যৌবনে এই সব ছোটখাট "হাত-টানে"র ব্যাপারে এতই অভ্যস্ত হয়ে উঠল যে পরবর্তী জীবনে ইচ্ছা থাকলেও সে অভ্যাসটা কাটিয়ে উঠতে পারল না। তখন অল্প বয়স, দুর্বল স্বাস্থ্য; বাবা নেই, মা নেই, সুশিক্ষা দেবার মতো কেউ নেই। পলিকি মদ ভালবাসত, আর কোনও কিছু খোলা পড়ে থাকা দেখতে পারত না। চামড়ার টুকরো, ঘোড়ার সাজের অংশ, একটা তালা, একটা হুড়কো, বা কোনও দামী জিনিস, সব কিছুই পলিকির কাজে লাগত। সর্বত্রই একদল লোক থাকে যারা পূর্বব্যবস্থা মতো মদ বা নগদের বিনিময়ে এই সব জিনিস নেয়। লোকে বলে, এই ধরনের উপার্জনই সব চাইতে সহজ; শিক্ষানবীশী

করতে হয় না, পরিশ্রম লাগে না, কিছুই লাগে না; আর একবার যে একাজে হাত দেয় সে আর কোনও কাজ করতেই চায় না। শুধু একটা অসুবিধা আছে; জিনিসপত্র সস্তায় পাওয়া যায়। সহজে পাওয়া যায়, আরামে থাকা যায়, তবু হঠাৎ একদিন—অন্যের ঈর্ষাবশত—সব কিছু গোলমাল হয়ে যায়, ব্যবসা লাঠে ওঠে, সব কিছুর জবাবদিহি করতে হয়, আর জন্মাবার জন্যই অনুশোচনা দেখা দেয়। পলিকির বেলায়ও তাই হলো। সে বিয়ে করল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় কপাল ফিরল। তার বৌ ছিল এক গো-রাখালের মেয়ে; স্বাস্থ্যবতী, বুদ্ধিমতী, পরিশ্রমী। একটির পর একটি সুন্দর ছেলেমেয়ে হলো। পলিকি কিন্তু নিজের ব্যবসা চালিয়েই গেল। চললও ভাল। কিন্তু একদিন ভাগ্য বিরূপ হলো। সে ধরা পড়ল। অতি তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ব্যাপার; এক চাষীর চামড়ার লাগাম লুকিয়ে রেখেছিল। ধবা পড়ে বেদম মার খেলো; কর্ত্রীঠাকরুণ জানতে পারল; তার উপর নজর রাখা হলো। দ্বিতীয় বার ধরা পড়ল—তৃতীয় বারও তাই। লোকে তাকে বিদ্রূপ করতে লাগল, নায়েব সৈন্যদলে ভর্তি করিয়ে দেবে বলে ভয় দেখাল, কর্ত্রীঠাকরুণ বকুনি দিলো, আর স্ত্রী কেঁদে বুক ভাসাল। অবস্থা খারাপ হতে লাগল। লোকটি খারাপ নয়, শুধু দুর্বলচিত্ত। সে মদ খেতে ভালবাসত; অভ্যাসবশত সেটা ছাড়তে পারল না। অনেক সময় মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরলে বৌ তাকে বকত, মারত পর্যন্ত। সেও কাঁদত, বলত : "আমি হতভাগা! আমি কি করব? আমার চোখ উপড়ে নাও, মদ ছেড়ে দেব! আর কখনও খাব না!" হয়তো এক মাস কাটাল। তারপর আবার বাড়ি ছেড়ে চলে যেত, মাতাল হতো, দিন দুই দেখাই পাওযা যেত না। প্রতিবাসীরা বলত : "এর ফূর্তি করবার মতো টাকা আসে কোত্থেকে!" সর্বশেষ গোলযোগ দেখা দিলো আপিসের ঘড়ি নিয়ে। একটা পুরনো দেয়াল-ঘড়ি অনেক দিন হলো অকেজো হয়ে পড়ে ছিল। একদিন দরজা খোলা পেয়ে ঘরে ঢুকে ঘড়িটা দেখেই তাব লোভ হলো। সেটাকে শহরে নিয়ে গিয়ে বেচে দিলো। এমনই দুর্ভাগ্য, যে দোকানদারের কাছে সে ঘড়িটা বেচেছিল সে আবার এই বাড়িরই এক ভূমি-দাসীর আত্মীয়; একটা ছুটির দিনে তার সঙ্গে দেখা করতে এসে কথাপ্রসঙ্গে ঘড়িটার কথাও বলল। লোকে বিশেষ করে নায়েব তত্ত্বতালাশ শুরু করে দিলো। সবই জানাজানি হয়ে গেল; কর্ত্রীঠাকরুণের কাছে খবর গেল; সে পলিকিকে ডেকে পাঠাল। বৌয়ের শিক্ষামতো সে কর্ত্রীঠাকরুণের পায়ের উপর পড়ে করুণভাবে সব কিছু স্বীকার করল। কর্ত্রীঠাকরুণ তাকে অনেক বকল। সে কাঁদতে লাগল। তখন কর্ত্রীঠাকরুণ বলল :

"তোমাকে ক্ষমা করলাম; কিন্তু তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে—আর কখনও এ কাজ করবে না!"

"জীবনে করব না। যদি করি তো আমি যেন নরকে যাই! যেন আমার সব নাড়ীভুড়ি বেরিয়ে আসে!" এই কথা বলে পলিকি করুণভাবে কাঁদতে লাগল।

বাড়ি ফিরে সারাটা দিন স্টোভের উপর শুয়ে বাছুরের মতো ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল। সেই থেকে আর তার কোনও দোষ ধরা পড়েনি। কিন্তু তার জীবনে সুখ রইল না; সকলেই তাকে চোরের মতো দেখে; যখন সৈন্যদলে ভর্তির সময় এগিয়ে এল তখন সকলেই তার কথা বলতে লাগল।

আগেই বলা হয়েছে, পলিকি একজন ঘোড়ার ডাক্তার। কি করে যে সে হঠাৎ ডাক্তার বনে গেল তা কেউ জানে না; সে নিজেও জানে না। আগে যে খামারে কাজ করত সেখানে তো আস্তাবলের গোবর পরিষ্কার করত, ঘোড়া ডলাই-মলাই করত, আর জল টানত। নিশ্চয় সেখানে শেখেনি। তারপর হলো তাঁতী; তারপর বাগানের মালী—কাজ ছিল পথের ঘাস তোলা, তারপর কি একটা অপরাধের শাস্তি হলো পাথর ভাঙার কাজ; তারপর করেছে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে দরোয়ানের কাজ। কাজেই এসবের কোনও জায়গাতেই পশু-চিকিৎসার কোনও অভিজ্ঞতা হবার কথা নয়; তবু শেষবার সে যখন বাড়িতে ছিল তখন শুধু ভাল নয়, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন একজন ঘোড়ার ডাক্তার হিসাবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল।...

৩

অক্টোবর মাসের এক শীতার্ত রাতের অন্ধকারে গ্রামবাসীরা যখন সভা করে নতুন সৈন্য বেছে নিচ্ছিল এবং আপিসের সামনে প্রচণ্ড হল্লা করছিল, তখন পলিকি বিছানার এক কোণে বসে একটা বোতলের সাহায্যে টেবিলের উপর ঘোড়ার ওষুধ গুঁড়ো করছিল—অবশ্য ওষুধটা যে কি তা সে নিজেই জানে না। ওষুধ হিসাবে যোগাড় করেছে তিনটে ক্ষার, গন্ধক, "গ্লুবার" নুন আর একটা গাছড়া। ছেলেমেয়েরা শুয়ে পড়েছে—দু'জন স্টোভের উপরে, দু'জন বিছানায়, আর একজন দোলনায়। আকুলিনা দোলনার পাশে বসে সুতো কাটছে।

অনেক চিন্তা-বীর আছে যারা ভাবে যে পলিকি একটা বাজে পশু চিকিৎসক এবং একটা বাজে লোক; আবার অনেকে মনে করে, সে লোকটা বাজে, কিন্তু চিকিৎসার ব্যাপারে খুবই পোক্ত; কিন্তু আকুলিনা যদিও স্বামীকে প্রায়ই বকে, এমন কি মরধোর করে, তবু মনে করে যে সে একজন প্রথম শ্রেণীর ঘোড়ার ডাক্তার ও শ্রেষ্ঠ মানুষ। পলিকি কিছুটা ওষুধ হাতের উপর ঢালল (সে কখনও ওজনের পাল্লা ব্যবহার করে না; জার্মানরা সেটা ব্যবহার করে বলে তাদের ঠাট্টা করে)। হাত দিয়ে ওজনটা বুঝে সে আরও দশগুণ ওষুধি হাতে ঢালল। এমন সময় যে কাগজের উপর সে ওষুধিটা ঢেলেছিল সেটা মেঝেতে পড়ে গেল। সেটা আকুলিনার নজর এড়াল না।

সে ডেকে বলল, "আনি, দেখো তো। বাবার কি যেন পড়ে গেছে। তুলে দাও।"

আলখাল্লার ভিতর থেকে খালি পা দুটো বের করে আনি বিড়ালছানার মতো টেবিলের নিচে গলে গিয়ে কাগজটা তুলে আনল।

"এই নাও বাপি," বলেই সে ঠাণ্ডা পা নিয়ে বিছানার মধ্যে ঢুকে গেল।

বোতলের মুখে ছিপি আঁটতে আঁটতে বলল, "এর জন্য তিন রুবল পাব। ঘোড়াটাকে ঠিক সারিয়ে তুলব। বরং বেশ সস্তায়ই দিচ্ছি। কী মাথা খাটানোর কাজ। আকুলিনা, যাও তো, নিকিতার কাছ থেকে একটু তামাক চেয়ে আনো। কাল তাকে ফেরৎ দিয়ে দেব।"

পলিকি ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা লেবু-কাঠের পাইপ বের করল; এককালে সেটা রং করা হয়েছিল; মুখটা মোমের তৈরি। সে মুখের বাটিটা পাইপের উপর বসাতে লাগল।

আকুলিনা তক্‌লিটা রেখে উঠে গেল। পলিকি ক্যাবার্ডটা খুলে ওষুধটা তুলে রাখল। তারপর ভদ্‌কার একটা বোতল মুখের মধ্যে উপুড় করল। বোতলটা খালি দেখে সে মুখ সিঁটকাল। বৌ তামাক নিয়ে ফিরে এলে বিছানার এক পাশে বসে পাইপে তামাক ভরে আগুন দিলো। দিনের কাজ শেষ করবার গর্বে ও ধূমপানের খুশিতে তার মুখটা জ্বলজ্বল করতে লাগল।

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল, আর উপর থেকে একটি দাসী—দ্বিতীয় নয় তৃতীয়টি, খবর আনা-নেওয়া করাই যার কাজ—খুপড়ির মধ্যে ঢুকল; (সকলেই জানে, উপর থেকে মানেই মনিববাড়ি থেকে; সে বাড়ি যদি একতলায় হয় তাহলেও।) আক্‌সিউৎকা মেয়েটির নাম—সব সময়ই গুলির মতো ছুটে চলে। তার গাল দুটি লাল পোশাকের চাইতেও লাল, আর জিভটা চলে পায়ের চাইতেও দ্রুততর গতিতে। ঘরে ঢুকেই সে এক নিঃশ্বাসে বলতে লাগল :

"কর্ত্রীঠাকরুণ...হুকুম করেছেন...পলিকিকে এখনই যেতে হবে...হুকুম হয়েছে...।"

কষ্ট করে শ্বাস টেনে নিয়ে আবার শুরু করল।

"এগর মিখাইলোভিচ কর্ত্রীঠাকরুণের কাছেই আছে...সৈন্যদের কথা কি বলছিল...পলিকিরও নাম করল...আভ্‌দোতিয়া নিকোলায়েভ্‌না...হুকুম করেছে তাকে এখনই যেতে হবে...আভ্‌দোতিয়া লিকোলায়েভ্‌না হুকুম করেছে..." একটা নিঃশ্বাস ফেলে, "এখনই যেতে হবে...।"

কথা শেষ করেই সে ঘূর্ণিহাওয়ার মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আকুলিনা উঠে স্বামীর বুটজোড়া এনে দিলো—বুটের অবস্থা শোচনীয়, তাতে অনেক ছিদ্র—স্টোভের উপর থেকে কোটটা নামাল; স্বামীর দিকে না তাকিয়ে সেগুলো এগিয়ে দিলো।

"শার্টটা কি বদলাবে পলিকি?"

"না", সে জবাব দিলো।

সে বুট আর কোট পরতে লাগল। আকুলিনা একবারও তার মুখের দিকে তাকাল না। না তাকানোই ভাল। পলিকির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, নিচের চোয়ালটা কুঁচকে

গেছে, দুই চোখে জলভরা বিষণ্ণ দৃষ্টি—যে দৃষ্টি দেখা যায় শুধু দয়ালু, দুর্বল ও দোষী মানুষের চোখে। চুল আঁচড়ে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তার স্ত্রী বাধা দিলো; শার্টের সুতোটা ভাল করে বেঁধে দিয়ে টুপিটা মাথায় পরিয়ে দিলো।

বেড়ার ওপাশ থেকে ছুতোরের বৌয়ের গলা শোনা গেল, "ব্যাপার কি পলিকি? কর্ত্রীঠাকরুণ কি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?"

সেদিন সকালেই আকুলিনার সঙ্গে ছুতোরের বৌয়ের প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে গেছে—পলিকির বাচ্চারা নাকি তার খুপড়িতে গিয়ে ক্ষারের পাত্রটা উল্টে দিয়েছিল, তাই নিয়ে বচসা। বৌটির কূটবুদ্ধি খুব, জিভটাও খুব ধারালো। কথা দিয়ে কি করে চামড়া কাটতে হয় সেটা তার মতো কেউ জানে না; অন্তত সে তাই মনে করে।

বৌটি বলতে লাগল : "আশা করি জিনিসপত্র কিনতে তোমাকে শহরে পাঠাবেন। সে কাজে তো বিশ্বাসী লোক দরকার, তাই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন! আমার জন্যও সিকি পাউন্ড চা নিয়ে এসো পলিকি।"

আকুলিনা জোর করে চোখের জল সামলে নিলো; রাগে তার ঠোঁট বেঁকে যেতে লাগল। ইচ্ছা করছিল, ঐ উগ্রচণ্ডীর চুল টেনে ছিঁড়ে দেয়। কিন্তু ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়েই মনে হলো, এবার তো তাদের বাবা থাকবে না, সে হয়ে যাবে সৈনিকের বৌ, বিধবার সামিল; তাই মুখরা ছুতোরের বৌয়ের কথা ভুলে গেল; দুই হাতে মুখ ঢেকে বিছানায় বসে পড়ল; তার মাথাটা বালিশের উপর এলিয়ে পড়ল।

ছোট মেয়েটা আধো-আধো গলায় বলল, "মামণি, তুমি আমাকে চেপে দিচ্ছ যে!"

"তোরা মরিস না কেন! সব একসঙ্গে মর্! কেন তোদের এই পৃথিবীতে এনেছি? শুধুই দুঃখ দিতে!" আকুলিনা গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল। ছুতোরের বৌ খুব খুসি। সকালে ক্ষারের পাত্র ফেলে দেওয়ার কথা সে এখনও ভোলেনি।

৪

আধ ঘণ্টা কেটে গেল। বাচ্চাটা কেঁদে উঠল। আকুলিনা উঠে তাকে মাই খেতে দিলো। তার কান্না থেমে গেল। হাতের উপর ঠাণ্ডা মুখটা রেখে মোমবাতির কাঁপা-কাঁপা শিখার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে ভাবতে লাগল—কেন সে বিয়ে করেছিল। এত সৈন্য কিসে লাগে, কেমন করে সে ছুতোরের বৌয়ের উপব শোধ তুলবে।

স্বামীর পায়ের শব্দ কানে এল। চোখের জল মুছে সে উঠে দাঁড়াল। পলিকি বিজয়ী বীরের মতো ঘরে ঢুকল, টুপিটা বিছানার উপর ছুঁড়ে দিলো, সগর্বে কোমরের বেল্টটা খুলল।

"হ্যাঁগো, তোমাকে কেন ডেকেছিলেন?"

"হুম! তাতো বটেই! পলিকুশ্‌কা একটা মানুষই না...কিন্তু কাজের সময় কার ডাক পড়ে? কেন, পলিকুশ্‌কার...।"

"কি কাজ?"

পলিকির জবাব দেবার তাড়া নেই। পাইপটা ধরিয়ে সে থুথু ফেলল।

"একজন বণিকের কাছে গিয়ে টাকা আনতে হবে।"

"টাকা আনতে?" আকুলিনা প্রশ্ন করল।

পলিকি মুখ টিপে হেসে মাথা নাড়তে লাগল।

"আঃ, তিনি তো কথায় খুব পাকা।...বললেন, 'তোমাকে সকলে বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করলেও আমি খুব বিশ্বাস করি।' (প্রতিবাসীরা যাতে শুনতে পায় সেজন্য পলিকি বেশ জোরে জোরেই কথা বলতে লাগল।) বললেন, 'তুমি কথা দিয়েছিলে যে ভাল হয়ে যাবে; তোমার কথায় যে আমি বিশ্বাস করি এটাই তার প্রথম প্রমাণ। বণিকের কাছে চলে যাও, পাওনা টাকাটা আদায় করো, আমাকে এনে দাও'। আর আমি বললাম : 'আমরা সকলেই আপনার ভূমি-দাস ম্যা'ম; আপনি যেমন ঈশ্বরের সেবা করেন তেমনি আমরাও অবশ্যই আপনার সেবা করব; আমি তো মনে করি, আপনার সম্মানের জন্য যে কোনও কাজ আমি করতে পাবি; আপনি যা হুকুম করবেন আমি তাই করব, কারণ আমি আপনার ক্রীতদাস। (আবার সেই একই অদ্ভুত, দুর্বল, দয়ালু, অপরাধীর হাসি হাসল।) তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি বিশ্বস্তভাবে কাজটা করবে তো?...বুঝতে পারছ কি, এর উপরেই তোমার ভাগ্য নির্ভর করছে?'—'না বুঝে কি আমি পারি? আমার সম্পর্কে লোকে অনেক কথাই বলে—দেখুন, লোকে কি না বলে—কিন্তু আপনার অসম্মান হতে পারে এমন কথা আমি কখনও মনেও আনি না।'...এক কথায়, তাকে এমনভাবে ভজিয়েছি যে শেষ পর্যন্ত তিনি খুব নরম হয়েছেন।"

'অনেক টাকার ব্যাপার কি?"

"পনেরো শ' রুবল," পলিকি হেলাফেলার সুবে জবাব দিলো।

বৌ মাথা নাড়ল।

"কখন যেতে হবে?"

"তিনি তো বললেন, কালই যে ঘোড়াটা ইচ্ছা বেছে নিয়ে আপিসে দেখা করো, তারপর যাত্রা করো। ঈশ্বর তোমার সহায় হন।"

দাঁড়িয়ে ক্রুস-চিহ্ন এঁকে আকুলিনা বলল, "প্রভুর জয় হোক!" তারপর স্বামীর শার্টের আস্তিনটা ধরে এমন ফিস্‌ফিস্‌ করে সে কথা বলতে শুরু করল যাতে বেড়ার ওপাশে কেউ শুনতে না পায়। বলল, "ঈশ্বর তোমার সহায় হন পলিকি। আমার কথাগুলি মন দিয়ে শোনো! আমাদের ঈশ্বর খৃস্টের নামে তোমাকে মিনতি করছি : যাবার আগে এই ক্রুশকে চুম্বন করো। আর কথা দাও যে এক ফোঁটাও তোমার ঠোঁট দিয়ে গলবে না।"

স্বামী সোৎসাহে বলল, "এটা একটা কথা হলো! এত টাকা সঙ্গে নিয়ে মদ খাব!...আঃ! উপরে কে যেন পিয়ানো বাজাচ্ছে! চমৎকার!" কথাটা বলে একটু থেমে সে হাসল। "মনে হচ্ছে সেই তরুণী মহিলাটি। আহা! আমি যদি ও রকম বাজাতে পারতাম! শিখব, শিগ্‌গিরই শিখে নেব। ওতেও আমার হাত বেশ ভালই!...কাল আমাকে একটা পরিষ্কার শার্ট দিও!"

খুশি মনে তারা শুতে গেল।

৫

ইতিমধ্যে আপিসের সামনেকার সভায়ও বেশ হট্টগোল শুরু হয়েছে। সভার আলোচ্য বিষয়টাও তুচ্ছ নয়। প্রায় সব চাষীই সভায় হাজির। নায়েব তখনও কর্ত্রীঠাকরুণের কাছেই রয়েছে; তাই কেউই মাথার টুপি নামায়নি; তাদের গলা ক্রমেই চড়ছে। দূরবর্তী সমুদ্র-গর্জনের মতো সে শব্দ জানালা দিয়ে ভেসে আসছে। বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রচণ্ড ঝড়ে স্নায়ুতন্ত্রের উপর যেমন একটা চাপ পড়ে,—ভয় ও অস্বস্তির মাঝামাঝি একটা অনুভূতি হয়, এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কর্ত্রীর মনে হচ্ছে, এই শব্দ ক্রমে উচ্চতর এবং দ্রুততর হয়ে একটা অঘটন ঘটাতে পারে। তার মনে হলো, "ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ভালবাসা ও শান্তির খৃস্টীয় নীতির পথে নিঃশব্দে ও শান্তিপূর্ণভাবে বুঝি এ সমস্যার সমাধান হবার নয়।"

অনেকেই এক সঙ্গে কথা বলছে, কিন্তু ছুতোর রেজুন-এর গলা সকলকে ছাড়িয়ে গেছে। তার পরিবারে আছে দুটি বয়ঃপ্রাপ্ত যুবক, তাই সে দুত্‌লভ্‌দের আক্রমণ করে চলেছে। বুড়ো দুত্‌লভ্‌ নিজেই নিজেকে সমর্থন করছে। কখনও দুই হাত ছড়িয়ে, কখনও তার যৎসামান্য দাঁড়িকে চেপে ধরে, সে এমনভাবে বকর-বকর করছে যে সে নিজেই নিজের কথা বুঝতে পারছে না। তার ছেলে ও ভাই-পোরা তার পিছনেই দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। বুড়োকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন "বাজপাখি ও মুরগির বাচ্চার লড়াই" খেলার মা-মুরগি। বাজপাখি হচ্ছে রেজুন; শুধু রেজুনই নয়, যাদেরই পরিবারে দুটি যুবক ছেলে আছে, যারা একটি মাত্র ছেলের বাবা, এবং সভার প্রায় সব লোকই দুত্‌লভ্‌কে আক্রমণ করে চলেছে। কথাটা দাঁড়িয়েছে এই রকম : দুত্‌লভ্‌ এর ভাই ত্রিশ বছর আগে সৈন্যদলে ভর্তি হয়েছে; সুতরাং দুত্‌লভ্‌ চাইছে, যে সমস্ত পরিবারে নির্বাচনযোগ্য তিনটি যুবক আছে তাকে যেন তাদের সঙ্গে এক ধরে নিয়ে বিচার করা না হয়; সে চাইছে, তার ভাইয়ের সামরিক চাকরিকে তার পরিবারের স্বপক্ষে ধরে নিয়ে তার পরিবারকেও সেই সব পরিবারের সঙ্গে সমান সুযোগ দেওয়া হোক যাদের মাত্র দুটি যুবক আছে; ফলে এই সব পরিবার থেকে সমানভাবে ভাগ্য-পরীক্ষা করে তৃতীয় সৈনিকটিকে বেছে নেওয়া হোক। দুত্‌লভ্‌-এর পরিবার ছাড়া তিন যুবকওয়ালা পরিবার আছে আর চারটি; তাদের মধ্যে একটি গ্রাম-প্রধানের

পরিবার, আর কর্ত্রীঠাকরুণ তাকে মাফ করে দিয়েছেন। দ্বিতীয় পরিবার থেকে গত বছরই একজনকে সৈন্যদলে পাঠানো হয়েছে। আর বাকি প্রত্যেকটি পরিবার থেকেই একজন করে নেওয়া হচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন সভায়ই আসেনি, কিন্তু তার স্ত্রী দুঃখিত মনে সকলের শেষে দাঁড়িয়ে আছে; মনে ক্ষীণ আশা শেষ মুহূর্তে যদি ভাগ্যের চাকা তার স্বপক্ষে ঘুরে যায়। অপর নির্বাচিত সৈনিকের বাবা লাল-চুল রোমান-এর পরনে শতচ্ছিন্ন কোট—যদিও সে গরিব নয়; মাথাটা নিচু করে ফটকের গায়ে ভর দিয়ে সে চুপচাপ বসে আছে। কেউ কিছু বলতে উঠলেই একবার মাথা তুলে দেখছে, আবার মাথাটা নামিয়ে নিচ্ছে। বুড়ো সেমিন দুত্‌লভ্ ধীর স্থির, ধর্মভীরু, নির্ভরযোগ্য ও গির্জার প্রধান। তার উত্তেজনাই চরমে উঠেছে।

দুত্‌লভ্‌কে বলা হয়েছে "বাজপাখি ও মুরগির ছানার লড়াই" খেলার মা-মুরগি; তার ছেলেরা কিন্তু মোটেই মুরগির ছানার মতো নয়; তারা হৈ-হল্লোড়ও করছে না, হাঁসফাঁসও করছে না; বুড়োর পিছনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। বড় ছেলে ইগ্‌নাত্-এর বয়স ত্রিশ; পরেরটি ভাসিলি ইতিমধ্যেই বিয়ে করেছে এবং সৈন্যদলে ভর্তি হবার পক্ষে উপযুক্ত নয়; তৃতীয়টি তার ভাই-পো এলিজাও সম্প্রতি বিয়ে করেছে।

একজন বলে উঠল, "তাই যদি হয় তো আমার ঠাকুর্দাও একজন সৈনিক ছিল, আর তাই আমিও ঐ একই যুক্তিতে সৈন্যদলে ভর্তি হতে আপত্তি করতে পারি।...এ রকম কোনও আইন তো নেই বন্ধু। গত সৈন্য-সংগ্রহের সময় মিখেচেভকে যেতে হয়েছিল, অথচ তার খুড়ো তখনও সামরিক চাকরিতেই ছিল।"

সঙ্গে সঙ্গে দুত্‌লভ বলল, "তোমার বাপ-খুড়ো কেউ তো জারের সেনাবাহিনীতে কাজ করেনি। আরে, তুমি তো কর্ত্রীঠাকরুণ বা কমিউনের কাজও করো না; সব সময় তো তাড়িখানায় পড়ে থাকো। তোমার সঙ্গে একত্র থাকতে না পেরে ছেলেরা আলাদা হয়ে গেছে, আর তুমি এসেছ অন্যের ছেলেকে সৈন্যদলে ভর্তির সুপারিশ করতে! কিন্তু আমি—আমি দশ বছর প্রধান হিসাবে পুলিশের চাকরি করেছি। দু'বার আগুনে পুড়েছি; তখন কেউ সাহায্য করতে আসেনি; আর আজ, যেহেতু আমার বাড়িতে সুখে-শান্তিতে আছি, তাই আমার সর্বনাশ করতে হবে?...তাহলে আমার ভাইকে ফিরিয়ে এনে দাও! চাকরি করতে গিয়ে নিশ্চয় তার মৃত্যু হয়েছে...খৃস্টীয় কমিউন, ঈশ্বরের বিধানমতে সৎভাবে বিচার করুন; একটা মাতালের প্রলাপে কান দেবেন না।"

সঙ্গে সঙ্গে গেরাস্‌কা তাকে বলল,

"আপনি তো ওজুহাত হিসাবে ভাইয়ের কথা বলছেন; কিন্তু তাকে তো কমিউন পাঠায়নি। অসৎ পথে যাবার জন্য তার মনিবই তাকে পাঠিয়েছিল। কাজেই সে ওজুহাত টিকবে না।"

গেরাস্‌কার কথা শেষ হবার আগেই হল্‌দে মুখ ঢ্যাঙা থিয়োডোর মেল্‌নিচ্‌নি এগিয়ে এসে বলল,

"হ্যাঁ, ঠিক কথা! মনিবরা যাকে খুশি পাঠায়, আর পরে কমিউনকে তার ঝক্কি পোয়াতে হয়। কমিউন আপনার ছেলেকে পাঠিয়ে ঠিক করেছে; আপনার যদি সেটা পছন্দ না হয় তো কর্ত্রীঠাকরুণকে গিয়ে বলুন। আমি সংসারের একমাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত লোক; তিনি হয়তো আমাকেই হুকুম করবেন, বাচ্চাকাচ্চাদের ফেলে রেখে চলে যাও!"...আইন তো আপনাদের জন্যই! তিক্ত কণ্ঠে কথাগুলি বলে হাত নাড়তে নাড়তে সে তার আগের জায়গায় চলে গেল।

ততক্ষণে দুত্‌লভ্‌-এর কথার জের টেনে রেজুন বলে উঠল :

"কোন্ মাতাল আবার ওখানে বক্‌বক্ করছে? তুমি কি কোনও দিন একপাত্র খাইয়েছ? আর তোমার ছেলে, যাকে লোকে পথ থেকে তুলে নেয়, সে এসেছে আমাকে মাতলামির খোটা দিতে?...বন্ধুগণ, আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে! তোমরা যদি দুত্‌লভদের রেহাই দিতে চাও তো শুধু দু'জনের পরিবার থেকে নয়, একজনের পরিবার থেকে বেছে নাও; আর ও আমাদের দেখিয়ে হাসুক!"

"একজন দুত্‌লভকে যেতেই হবে! বৃথা কথা বলে কি লাভ!"

"তিন জনের পরিবার থেকেই প্রথম ভাগ্য পরীক্ষা করতে হবে," অনেকে বলে উঠল।

একজন বলল, "কর্ত্রীঠাকরুণ কি বলেন সেটা আগে শুনতে হবে। এগর মিখাইলোভিচ বলছিল, তারা একজন গৃহভূমিদাসকে পাঠাতে ইচ্ছুক।"

এ কথায় কিছুক্ষণের জন্য তর্কাতর্কি বন্ধ হলেও অচিরেই আবার পুরোদমে শুরু হয়ে ব্যক্তিগত রেষারেষি দেখা দিলো।

রেজুন নালিশ করেছিল যে ইগ্‌নাতকে মাতাল অবস্থায় তুলে আনা হয়েছিল। ইগ্‌নাত এবার বলল, জনৈক ভ্রাম্যমাণ ছুতোরের করাত চুরি করতে সে রেজুনকে দেখেছে; এমন কি মাতাল অবস্থায় রেজুন তার বৌকে পিটতে পিটতে প্রায় মেরে ফেলবার উপক্রম করেছিল।

রেজুন জবাব দিলো, "মদ খেয়েই হোক আর না খেয়েই হোক, আমার বৌকে আমি মেরেছি, বেশ করেছি।" একথা শুনে সকলে হো-হো করে হেসে উঠল। কিন্তু করাতের ব্যাপারে সে সহসা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এবং ইগ্‌নাত-এর কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল :

"কে চুরি করেছিল?..."

"তুমি?" আরও কাছে গিয়ে ইগ্‌নাত জবাব দিলো।

"কে চুরি করেছিল?...তুমি না?" রেজুন চেঁচিয়ে বলল।

"না, তুমি," ইগ্‌নাত বলল।

করাত থেকে উঠল ঘোড়া চুরির কথা, তা থেকে এক বস্তা যই, কমিউনের সব্জি-বাগানের এক অংশ, ও একটা মৃতদেহের কথা উঠল; আর একজন অপর জন

সম্পর্কে এমন সব ভয়ংকর অভিযোগ করতে লাগল যার একশ' ভাগের এক ভাগ সত্য হলেও তাদের আইনত নিদেনপক্ষে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন হওয়া উচিত।

বুড়ো দুত্‌লভ তখন আত্ম-পক্ষ সমর্থনের অন্য পথ বেছে নিল। ছেলের এই চিৎকার-চেঁচামেচি তার পছন্দ হচ্ছিল না; তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "এ সব পাপ!...আমি বলছি, ছেড়ে দাও।" সে আরও যুক্তি দেখাল, যাদের তিন ছেলে বাড়ি থাকে তাদেরই শুধু তিন-ছেলের পরিবার নয়, যাদের ছেলেরা আলাদা হয়ে গেছে তাদেরও ঐ দলে গণ্য করতে হবে। এই বলে সে গ্রাম প্রধানকে দেখিয়ে দিলো।

গ্রাম-প্রধান মৃদু হাসল, গলা খাঁকারি দিলো, সম্পন্ন চাষীর মতো দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "এ সবই কর্ত্রীঠাকরুণের মর্জির উপব নির্ভর করে আর তিনি তাদের রেহাই দেবার হুকুম দিয়েছেন।"

দুত্‌লভ হতাশভাবে কোটটা গায়ে জড়িয়ে সকলের পিছনে গিয়ে রাগে নিজের মনেই বলতে লাগল, "বেশ তো, এগর মিকাইলোভিচ কর্ত্রীঠাকরুণের কাছ থেকে ফিরে আসুক। তার মুখ থেকেই সব জানতে পারব।"

৬

ঠিক সেই সময় এগর মিখাইলোভিচ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। একটার পর একটা মাথার টুপি খোলা হলো; নায়েব কাছে আসতেই সবগুলি মাথা—পাকা, আধপাকা, বাদামী, সুন্দর, সামনে বা পুরো মাথায় টাক—সব ফাঁকা হয়ে গেল; তাদের গলার স্বরও কমতে কমতে এক সময় থেমে গেল। কিছু বলবার জন্যই এগব মিখাইলোভিচ ফটকে উঠে দাঁড়াল। গায়ে লং-কোট, দুটো হাত পকেটে ঢোকানো, শহরে-তৈরি টুপিটা কপালের উপর টেনে নামানো, দুই পা ফাঁক করে কঠিনভাবে দাঁড়ানো, উঁচু জায়গায় সকলের মাথার উপরে তার মাথা। কর্ত্রীঠাকরুণের সামনে যে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, এ যেন তার থেকে আলাদা, মানুষ। মহিমান্বিত পুরুষ।

"শোনো সকলে, কর্ত্রীঠাকরুণের সিদ্ধান্ত শোনো! বাড়ির ভূমিদাসদের কাউকে পাঠানো তার ইচ্ছা নয়; তোমাদের ভিতর থেকে তোমরাই একজনকে বেছে পাঠাবে। এবার তিনজনকে চেযেছে। হিসাব মতো আড়াইজনকে দরকার, বাকি আধ জনকে পরের হিসাবে ধরা হবে। ব্যাপার একই : আজ, না হয় কাল।"

"তা তো ঠিকই," কেউ কেউ বলল।

এগর মিখাইলোভিচ বলল, "আমার মতে খারিউশ্‌কিন এবং ভাস্কা মিত্যুশ্বিন-এরই যাওয়া উচিত; সেটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

"হ্যাঁ, তাই ঠিক," কেউ কেউ বলল।

"...আর তৃতীয় জন হবে, হয় দুত্‌লভদের একজন নয়তো দু'জনের পরিবার থেকে অন্য কেউ।...তোমরা কি বলো?"

সকলে চেঁচিয়ে বলল, "দুত্‌লভ। সে বাড়িতে উপযুক্ত বয়সের তিনজন আছে!"

আবারও একটু একটু করে গোলমাল বাড়তে লাগল। সব্জি-বাগানের একটা অংশ ও কর্ত্রীঠাকরুণের উঠোন থেকে বস্তা চুরির প্রসঙ্গও আবার উঠল। এগর মিখাইলোভিচ গত বিশ বছর ধরে জমিদারি চালিয়ে আসছে; সে ধূর্ত, অভিজ্ঞ লোক। প্রায় পনেরো মিনিট দাঁড়িয়ে সে সব কিছু শুনল, তারপর সকলকে চুপ করতে বলে তিন দুত্‌লভ যুবককে ভাগ্য-পরীক্ষা করবার হুকুম দিলো। তিন টুকরো কাগজে নাম লিখে টুপির মধ্যে রেখে ঝাঁকিয়ে দেওয়া হলো। খ্রাপ্‌কভ্‌কে বলা হলো, একটা কাগজ টেনে তুলতে। এলিজার নাম উঠল। সকলে চুপ করে গেল।

"আমার নাম উঠেছে? দেখি!" এলিজা ভাঙা গলায় বলল।

সকলেই চুপচাপ। এগর মিখাইলোভিচ হুকুম করল, সকলেই যেন পরদিন সৈনিক-সংগ্রহের দরুণ চাঁদা হিসাবে বাড়ি প্রতি সাত কোপেক নিয়ে আসে। তারপর সে সভা ভেঙে দিলো। জনতা চলে গেল; বাড়ির মোর ঘুরেই সকলে টুপি পরে নিল; তাদের কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে এল। নায়েব সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। যুবক দুত্‌লভরা মোড় ঘুরলে সে বুড়ো দুত্‌লভকে ইঙ্গিতে ডেকে দু'জনে আপিসে ঢুকল।

টেবিলের সামনে রাখা হাতল-চেয়ারটায় বসে এগর মিখাইলোভিচ বলল, "আপনার জন্য আমি দুঃখিত বুড়োকর্তা। কিন্তু এবার তো আপনাদেরই পালা ছিল। আপনার ভাইপোর পরিবর্তে একজন নতুন সৈনিক কিনতে রাজী আছেন কি?"

কোনও কথা না বলে বুড়ো এগর মিখাইলোভিচের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

সে দৃষ্টির জবাবে এগর মিখাইলোভিচ বলল, "এ ছাড়া আর কোনও পথ নেই।"

"একজন পরিবর্ত সৈনিক কিনতে পারলে আমরা খুশিই হতাম এগর মিখাইলোভিচ, কিন্তু হাতে টাকা নেই। এই গ্রীষ্মেই দুটো ঘোড়াকে কসাইতে নিয়ে গেছে; তার উপর ভাইপোর বিয়ে গেল।...সৎভাবে বাস করবার এই তো ফল।"

এগর মিখাইলোভিচ হাত দিয়ে মুখটা মুছে একটা হাই তুলল। বোঝা গেল, সে খুব শ্রান্ত; একটু চা দরকার।

বলল, "আহা, ও কথা বলবেন না কর্তা। ঘরের মেঝের নীচটা খুঁজে দেখুন, শ' চারেক রুবল নোট নিশ্চয় পেয়ে যাবেন; আর পরিবর্ত সৈনিক আমি আপনাকে যোগাড় করে দেব।...এই তো সেদিনই একজন স্বেচ্ছায় প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। তাকে কিনবেন কি?"

"ঈশ্বর সাক্ষী, কিনতে পারলে খুশিই হতাম!...কিন্তু..."

এগব মিখাইলোভিচ কঠোর গলায় বাধা দিলো।

"ঠিক আছে; তাহলে শুনুন বুড়োকর্তা! নজর রাখবেন, এলিজা যেন নিজের কোনও অঙ্গহানি না করে। (সামরিক চাকরি থেকে রেহাই পাবার জন্য অনেকে অঙ্গ

হানি করে, যেমন বন্দুকের ঘোড়া টিপবার জন্য দরকারী আঙুলটা কেটে ফেলে। আজ হোক কাল হোক, আমি খবর পাঠালেই তাকে শহরে নিয়ে যাবেন। নিজে নিয়ে যাবেন, আর তার জন্য আপনিই দায়ী থাকবেন; ঈশ্বর না করুন, তার যদি কিছু হয়, তাহলে কিন্তু আমি আপনার বড় ছেলেকেই পাঠাব! শুনছেন?"

"কিন্তু কোন দু'জনের পরিবার থেকে কি একজনকে পাঠানো যেত না?...এটা ন্যায্য কাজ হচ্ছে না এগর মিখাইলোভিচ!" একটু চুপ করে থেকে প্রায় চোখের জল ফেলে সে আরও বলল, "আমার ভাই মরেছে সৈন্য হয়ে, আর এখন তারা আমার ছেলেকেও নিচ্ছে! এ আঘাত কি আমার প্রাপ্য?" সে প্রায় নতজানু হতে গেল।

এগর মিখাইলোভিচ বলল, "আরে, আরে, করেন কি! চলে যান! আমি কিছু করতে পারব না। এটা আইন। এলিজার উপর নজর রাখবেন : আপনাকেই তার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হবে!"

পথের চাকার দাগের উপর লেবু-কাঠের লাঠিটা ঠুকতে ঠুকতে দুত্‌লভ বাড়ি চলে গেল।

৭

পরদিন খুব ভোরে একটা চওড়া-হাড় বাদামী রঙের দামড়া ঘোড়া (সকলে তাকে 'ড্রাম' বলে ডাকে) একটি ছোট গাড়ি (স্বয়ং নায়েব এই গাড়িতে চড়ে থাকে) টানতে টানতে বাড়ির ভূমিদাসদের খুপড়িগুলোর ফটকে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। পলিকির বড় মেয়ে এই তুষার-বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যেও খালি পায়ে এক হাতে ঘোড়ার লাগামটা ধরে এবং অন্য হাতে একটা বিবর্ণ হল্‌দে-সবুজ কুর্তা মাথার উপর চেপে ধরে ঘোড়াটার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল পলিকিদের খুপড়িটা খুবই কর্মব্যস্ত। বর্ষণসিক্ত ভোরের ম্লান আলো জানালা দিয়ে ভিতরে এসে পড়েছে। জানালাটা ভাঙা, এখানে-ওখানে কাগজ সেঁটে বন্ধ করা। আকুলিনা স্বামীর যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত। শার্টটা পরিষ্কারই আছে, কিন্তু বুটজোড়া তো যাকে বলে "হাঁ করে খেতে চাইছে।" নিজের পুরো মোজা জোড়া (তার একমাত্র সম্বল) পা থেকে খুলে স্বামীকে দিয়েছে, আর ঘোড়ার পুরনো সাজ থেকে কাপড় কেটে নিয়ে এমনভাবে ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দিয়েছে যাতে তার পা দুটো শুকনো থাকে। ছোট মেয়েটাকে পাঠিয়েছে নিকিতার কাছে একটা টুপি ধার করে আনতে। ওদিকে বাড়ির অন্য অনেক ভূমি-দাসদাসীরা এসে ভিড় করেছে শহর থেকে নানা রকম জিনিস এনে দেবার ফরমাস করতে। একজনের ছুঁচ, অন্যের চা, কারও বা তামাক, আবার আর একজনের চাই অলিভের তেল, আর ছুতোরের বৌয়ের চাই কিছুটা চিনি। নিকিতা টুপি ধার না দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত নিজের টুপিটাই মেরামত করে নিতে হলো। এইভাবে তোড়জোড় করে তৈরি হয়ে পরিবারের সব গরম পোশাক নিজের গায়ে জড়িয়ে শুধু একটা কুর্তা ও এক জোড়া চটি বাড়িতে রেখে ছোট গাড়িটায় চেপে বসল।

ছোট ছেলে মিশ্‌কা সিঁড়িতে ছুটে এসে গাড়িতে চড়ার বায়না ধরল; বাচ্চা মেরিও হাঁক দিলো "গালি চলব।" অগত্যা পলিকি "ড্রাম"কে থামিয়ে একটু হাসল; আকুলিনা ছেলে মেয়েকে গাড়িতে তুলে দিয়ে সেই ফাঁকে কানে কানে স্মরণ করিয়ে দিলো পথে যেন সে মদ না ছোঁয়। ছেলে-মেয়েদের গ্রামের ভিতর দিয়ে কামারশাল পর্যন্ত গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে যাবার পর তাদের নামিয়ে দিলো এবং ভাল করে শরীরটাকে ঢেকে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিলো।

খুব বিশ্রী আবহাওয়া : বাতাস যেন শরীবে কেটে বসে যাচ্ছে; বৃষ্টি ও তুষারপাতের মাঝামাঝি অবস্থা; মাঝে মাঝে ছোট ছোট শিল পড়ছে, পলিকির মুখ ও খোলা হাতের উপর, ঘোড়ার চামড়ার কলারের উপর, "ড্রাম"-এর মাথার উপর।

হঠাৎ বৃষ্টি থেমে গেল; মুহূর্তের মধ্যে চারিদিক ঝলমলিয়ে উঠল। নীলাভ মেঘ সরে গিয়ে সূর্যের মুখ দেখা দিলো; তবে পলিকির হাসির মতোই অনিশ্চিত ও বিষণ্ন। তবু পলিকির মন খুসির সাগরে ডুব দিলো। সকলেই তাকে নির্বাসন ও সৈনিক-জীবনের ভয় দেখিয়েছিল; অতি-অলস দু'একজন ছাড়া সকলেই তাকে গালাগাল করেছে, মেরেছে; অত্যন্ত বাজে জায়গায় তাকে দিন কাটাতে হয়েছে; অথচ আজ সেই চলেছে টাকা আনতে, অনেক টাকা, কর্ত্রীঠাকরুণ তাকেই বিশ্বাস করেছে, চলেছে নায়েব মশায়ের গাড়িতে, যে গাড়িতে অনেক দিন কর্ত্রীঠাকরুণও চড়েন,—যেন সেই গাড়ির মালিক। তাছাড়া সে যাচ্ছে কোটের পকেটে ভরে পনেরো শ' রুবল নিয়ে আসতে। ইচ্ছা করলেই বাড়ির বদলে ওডেসা-র দিকে সে ঘোড়ার মুখটাকে ঘুরিয়ে দিতে পারে এবং ভাগ্য যেখানে নিয়ে যায় সেখানেই চলে যেতে পারে। কিন্তু সে রকম কাজ সে করবে না; মহিলার সব টাকা সে ঠিক তার হাতে পৌঁছে দেবে। দুপুর নাগাদ একটা সরাইখানার সামনে সে গাড়ি থেকে নামল। কর্ত্রীঠাকরুণের লোকজনরা এই সরাইখানায় এসে ওঠে। ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে কিছু খড় দিলো, নিজে সকলের সঙ্গে বসে খেল, যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে এসেছে তার কথা বলতেও সে ভুলল না, তারপর সব্জি-বাগানের মালীব বিলটা তার টুপির ভিতরে গুঁজে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

মালী পলিকিকে চিনত, তাই তাকে বিশ্বাস করত না; চিঠিটা পড়ে জিজ্ঞাসা করল, সত্যি তাকে টাকা নিতে পাঠানো হয়েছে কি না। পলিকি রাগের ভাব দেখাতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না, শুধু একটু হাসলমাত্র। আর একবার চিঠিটা পড়ে মালী টাকাটা দিয়ে দিলো। টাকাটা পেয়েই পলিকি বুকের মধ্যে গুঁজে রাখল এবং সোজা সরাইখানায় ফিরে গেল। বীয়ারের দোকান বা মদের দোকান কোনওটাই তাকে টলাতে পারল না। সারা শরীবে একটা খুসির স্রোত বয়ে যেতে লাগল। দোকানে কত বকম লোভনীয় জিনিস চোখে পড়ল : জুতো, কোট, টুপি, ছিটকাপড়, খাবারদাবার; একাধিকবার দোকানগুলির সামনে দাঁড়াল; কিন্তু মনে মনে বলল, "এ সবই আমি কিনতে পারতাম, কিন্তু এখন কিনব না!" ফরমায়েসী জিনিসগুলি কিনতে

সে বাজারে গেল, সব কিছু কেনা হলো, তারপর একটা লাইনিং-দেওয়া ভেড়ার চামড়ার কোট দর করতে শুরু করল। দোকানদার দাম চাইল পঁচিশ রুবল। যে কারণেই হোক, পলিকিকে দেখে সন্দেহ হয়েছিল যে এ-লোক কোট কিনতে পারবে না। কিন্তু পলিকি তার বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বলল, ইচ্ছা করলে গোটা দোকানটাই সে কিনে ফেলতে পারে। কোটটাকে উল্টে-পাল্টে দেখল, হাত বুলালো, তারপব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেটাকে রেখে দিয়ে বলল, দামে পোষাচ্ছে না। পনেরো রুবলে যদি দাও তো দেখো!" দোকানদার রেগে কোটটাকে টেবিলের ওপাশে ছুঁড়ে দিলো আর পলিকিও বেরিয়ে এসে খুশি মনে সরাইখানায় ফিরে গেল। রাতেব খাওযা হলে সে "ড্রাম" কে জল খাওয়াল, কিছুটা যই খেতে দিলো, তারপর স্টোভেব উপর উঠে টাকাসমেত খামটা বের করল, অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করল, তারপর পড়তে পারে এ রকম একটা কুলিকে ডেকে ঠিকানা ও লেখাটা পড়ে দিতে বলল। লেখা ছিল : "এক হাজার ছ'শ' সতেরো হস্তান্তযোগ্য রুবল সহ।" সাধারণ কাগজের একখানা খাম, বাদামী গালা দিয়ে সিল-করা, তাতে একটা নোঙবেব ছাপ। মাঝখানে একটা বড় সিল, চারকোণে চারটি আর কিনাবাব দিকে কয়েকটা গালার ফোঁটা। পলিকি ভাল করে সব কিছু দেখল। হাত দিয়ে নোটেব কোণাগুলি বুঝতে পারল। হাতের মুঠোয় এতগুলি টাকা আছে ভেবে সে একটা ছেলেমানুষি সুখ অনুভব করল। টুপির লাইনিং-এর ফাঁকের মধ্যে খামটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে সেটাকে মাথার নিচে শুযে পড়ল; রাতেও বার বার জেগে দেখল। খামটা ঠিকই আছে। যতবাব দেখল যে খামটা ঠিক জায়গাতেই আছে ততবারই একটি সুখের অনুভূতি তার মনকে দোলা দিলো . যে পলিকি অবহেলিত, পদদলিত সেই আজ এতগুলি টাকা নিয়ে চলেছে এবং নায়েবের চাইতেও সঠিকভাবে সেটা পৌঁছে দেবে।

৮

মাঝরাতের পবে ফটকে ধাক্কাধাক্কিব শব্দে ও চাষীদেব হৈ-হল্লায় সরাইখানার লোকজনের ও পলিকিব ঘুম ভেঙে গেল। পক্রোভ্স্ক্ থেকে নতুন ভর্তি হওয়া সৈন্যদল এসেছে। দলে প্রায দশজন : খোরিউশ্‌কিন, মিত্‌উকিন, এলিজা (দুত্‌লভ-এর ভাই-পো), যদি হঠাৎ দরকার হয় সেজন্য দু'জন পরিবর্ত, গ্রাম-প্রধান, বুড়ো দুত্‌লভ ও যে লোকটি গাড়ি চালিয়ে এসেছে সে। ঘরে একটা রাতের আলো জ্বলছিল, আর রাঁধুনিটা বেঞ্চিতে বসে ঘুমুচ্ছিল। রাঁধুনি লাফ দিয়ে উঠে মোমবাতি ধরাতে লাগল। পলিকিও জেগে গিয়েছিল; স্টোভের উপর থেকে ঝুঁকে পড়েই সে লোকগুলিকে দেখতে লাগল। বুকে ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে তাবা ঘবে ঢুকল। চাবদিকে পাতা বেঞ্চিগুলোর উপর বসল। সকলেই বেশ শান্তশিষ্ট; কারা যে সৈনিক আর কারা যে তাদের সঙ্গী তা বলা শক্ত। এ কথা ঠিক যে কেউ কেউ চুপচাপ বিষণ্ণ হযে বসে

ছিল; তেমনিই অন্যরা আবার ছিল অতিমাত্রায় খুশি; বেশ বোঝা যায় তারা মদ খেতে পায়নি।

"শোনো হে ছোকরারা, আমরা কি ঘুমোতে যাব, না কিছু খাব?" গ্রামপ্রধান জিজ্ঞাসা করল।

কোটটা খুলে ফেলে একটা বেঞ্চিতে বসে এলিজা বলল, "খাবার! কিছু ভদ্‌কা আনান।"

গ্রাম-প্রধান ধমক দিয়ে বলল, "ভদ্‌কা যথেষ্ট হয়েছে!" তারপর অন্যদের দিকে ফিরে বলল, "নিজেরাই রুটি কেটে নাও হে বাবারা! লোকজনদের কেন আর জাগাবে?"

"আমাকে ভদ্‌কা দাও!" কারও দিকে না তাকিয়েই এলিজা আবার বলল; তার গলা শুনে মনে হলো, শিগ্‌গির সে থামবে না।

প্রধানের পরামর্শ মতো চাষীরা নিজেরাই গাড়ি থেকে রুটি নিয়ে এল, খেলো, কিছুটা বীয়ার চেয়ে নিলো, তারপর শুয়ে পড়ল; কেউ স্টোভের উপর, কেউ মেঝেতে।

এলিজা মাঝে মাঝেই বলতে লাগল : "আমাকে ভদ্‌কা দাও; বলছি তো, কিছুটা দাও।" তারপর পলিকিকে দেখতে পেয়ে বলল, "পলিকি! হাই পলিকি! তুমি এখানে বন্ধু! আরে, আমি যে সৈনিক হতে চলেছি...মাকে ও আমার মিসাস্‌কে বিদায় জানিয়ে এসেছি.. তার কী কান্না! ওরা আমাকে ধরে-বেঁধে সৈন্য করে পাঠাচ্ছে...আমাকে একটু ভদ্‌কা খাওয়াও!"

"আমার কাছে তো টাকা নেই," পলিকি বলল, তারপর তাকে সান্ত্বনা দিতে বলল, "কে জানে? ঈশ্বরের কৃপায় তুমি তো বাতিল হয়েও যেতে পারো।..."

"না বন্ধু। ছোট বার্চগাছের মতো আমার তাজা শরীব। কখনও রোগে ভুগিনি; আমাকে বাতিল করবে না! আমার চাইতে ভাল সৈন্য জাব কি আশা করতে পারেন?"

পলিকি বলতে শুরু করল কেমন করে এক চাষী ডাক্তাবকে পাঁচ রুবল দিয়ে ছাড়া পেয়েছিল।

এলিজা উনুনের কাছ ঘেঁষে বসল; দু'জন খোলাখুলিভাবে কথা বলতে লাগল।

"না পলিকি, সব শেষ হয়ে গেছে! আমি নিজেই আর বাড়িতে থাকতে চাই না। খুড়ো আমাকে শেষ করে দিয়েছে। সে কি ইচ্ছা করলে একজন পরিবর্ত কিনতে পারত না!...না, সে ছেলেকে চায় না, টাকার প্রতি তার বড় টান, তাই আমাকে পাঠিয়েছে। না! আমি নিজেই থাকতে চাই না। শুধু একটা কথা—মায়ের জন্য আমাব বড় কষ্ট হচ্ছে। বেচারি!... কী রকম কাঁদল! আর বৌটাও!...অকারণেই তারা মেয়েটার সর্বনাশ করল; এবার সে মরবে—এক কথায়, সৈনিকের স্ত্রী হবে? বিয়ে

না করলেই ছিল ভাল! কেন তারা আমার বিয়ে দিয়েছিল?...কালই তারা এখানে আসছে।"

"কিন্তু তারা তোমাকে এত তাড়াতাড়ি নিয়ে এল কেন?" পলিকি জানতে চাইল; "এ রকম কোনও কথাই তো শুনিনি, তারপর হঠাৎ..."

এলিজা হেসে বলল, "আরে, ওরা ভয় পেয়েছে যে আমি হয়ত নিজের কোনও ক্ষতি করে বসব। কোনও ভয় নেই! সে রকম কিছুই করব না। সৈনিক হয়েই আমি বেঁচে থাকব। শুধু মার জন্যই দুঃখ হয়।.. তারা আমাকে বিয়ে দিলো কেন?" শান্ত বিষণ্ন সুরে এলিজা বলল।

দরজাটা খুলেই সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল; বুড়ো দুত্লভ ঘরে ঢুকল; টুপি থেকে জল ঝাড়ল; পায়ে যথারীতি নৌকোর মতো বড় বাকলের জুতো।

ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে সে কুলিকে বলল, "আফানাসি, যই খুঁজবার জন্য একটা লণ্ঠন পাওয়া যাবে কি?"

এলিজার দিকে না তাকিয়েই সে ধীরে ধীরে একটা মোমবাতি জ্বালাতে লাগল।

খুড়োকে দেখে এলিজা চুপ করে গেল। তাদের প্রধানকে ডেকে বিড়বিড় করে বলল,

"ভদ্কা এর্মিল! কিছু পানীয় চাই!" তার কণ্ঠস্বরে রাগ ও নিরাশা।

কি যেন খেতে খেতে প্রধান বলল, "এত রাতে পানীয়? দেখছ না, সকলেই যা হোক কিছু খেয়ে শুয়ে পড়েছে? তুমি কেন হট্টগোল করছ?"

"হট্টগোল" কথাটা শুনেই হিংসাত্মক কাজের কথা এলিজার মনে পড়ে গেল।

"প্রধান, আপনি যদি আমাকে ভদ্কা না দেন তো আমি কিন্তু নিজেরই ক্ষতি করব।"

"আপনি কি ওকে একটু বোঝাতে পারেন না?" দুত্লভ-এর দিকে ফিরে প্রধান বলল। দুত্লভ লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে সব কিছু দেখছিল। ভাইপোর ছেলেমানুষি দেখে বিস্মিত হয়ে সে বাঁকা চোখে তার দিকেই তাকিয়ে ছিল।

নিচে তাকিয়ে এলিজা আবার বলল,

'ভদ্কা! দাও . নইলে ক্ষতি করব!"

প্রধান মৃদুস্বরে বলল, "থামো তো এলিজা! এবার থামো!"

কথা শেষ হবার আগেই এলিজা লাফিয়ে উঠে এক ঘুঁষিতে একটা জানালার কাঁচ ভেঙে চিৎকার করে উঠল, "আমার কথা যখন শুনলে না, তার ফল ভোগ করো!" বলেই আর একটা জনালার দিকে ছুটে গেল—সেটাকেও ভাঙবে।

চোখের নিমেষে পলিকি দু'বার পাক খেয়ে স্টোভের শেষ প্রান্তে চলে গেল; সেখানকার আরশুলাগুলো ভয় পেয়ে ছুটাছুটি শুরু করে দিলো। প্রধান হাতের চামচ ফেলে এলিজার দিকে ছুটে গেল। দুত্লভ ধীরে সুস্থে লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখে কোমরের

পেটিটা খুলে মাথা নাড়াতে নাড়াতে ও জিভেয় একটা চুক-চুক শব্দ করতে করতে এলিজার কাছে গেল। ততক্ষণে প্রধান ও সরাইখানার লোকটি তার হাত চেপে ধরে জানালার কাছ থেকে সরিয়ে এনেছে। কিন্তু পেটি হাতে খুঁড়োকে দেখে তার গায়ের জোর যেন দশগুণ বেড়ে গেল; নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চোখ ঘুরিয়ে মুঠি পাকিয়ে দুত্‌লভের দিকে ছুটে গেল।

"আমি তোমাকে খুন করব! সরে যাও, জানোয়ার কোথাকার!...তোমরা আমাকে শেষ করে দিয়েছ, তুমি আর তোমার পাষণ্ড ছেলেরা!...কেন আমার বিয়ে দিয়েছিলে?...সরে যাও! খুন করে ফেলব!..."

এলিজার অবস্থা ভয়ংকর। মুখ লাল, চোখ ঘুরছে, সারা শরীর যেন জ্বরে কাঁপছে। তার ইচ্ছা করছিল, সামনের তিনজনকেই খুন করে।

"ওরে রক্তচোষা! তুই তোর ভাইয়ের রক্ত খাবি!"

দুত্‌লভের চিরশান্ত মুখটা জ্বলে উঠল। সে এক পা এগিয়ে গেল।

হঠাৎ বলে উঠল, "তুই এমনিতে শান্ত হবি না!" অবাক কাণ্ড! এত শক্তি সে পেল কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে ভাইপোকে চেপে ধরে তাকে নিয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল এবং প্রধানের সাহায্যে পেটিটা দিয়ে তাকে বেঁধে ফেলতে লাগল। পাঁচ মিনিট ধরে ধ্বস্তাধ্বস্তি চলল। শেষ পর্যন্ত চাষীদের সাহায্যে এলিজার মুঠো থেকে কোটটা ছাড়িয়ে নিয়ে দুত্‌লভ উঠে দাঁড়াল। তারপর পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় এলিজাকে তুলে এনে একটা বেঞ্চিতে বসিয়ে দিলো।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "আগেই তো বলেছিলাম, খুব খারাপ হবে। পাপ? আমাদের সকলকেই মরতে হবে!...একটা কোট ভাঁজ করে ওর মাথার নিচে দিয়ে দাও," সরাইওলার লোকটাকে বলল, "নইলে মাথায় রক্ত উঠবে।" তারপর লণ্ঠনটা নিয়ে ঘোড়াগুলোর তদারক করতে চলে গেল।

এলিজার মুখ ফ্যাকাসে, চেহারা বিপর্যস্ত, শার্টটা সরে গেছে; চারিদিকে তাকিয়ে সে অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করছে। সরাইওলার লোকটি ভাঙা কাচের টুকরোগুলি কুড়িয়ে নিল, ঠাণ্ডা হাওয়া আটকাবার জন্য জানালার গর্তে একটা কোট গুঁজে দিলো। প্রধান আবার খেতে বসল।

"আহা এলিজা, এলিজা! সত্যি তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে! কিন্তু কি করা যাবে? ঐ তো খোরিউশ্‌কিন রয়েছে...সেও তো বিয়ে করেছে। মনে হচ্ছে, কিছু করার নেই!"

তিক্ত শুকনো গলায় এলিজা আবার বলল, "সব ঐ শয়তান খুড়োর দোষ, সেই আমার সর্বনাশ করেছে! নিজের ছেলের প্রতি মমতা আর কি!...মা বলেছে, নায়েবই খুড়োকে বলেছিল টাকা দিয়ে আমাকে বাঁচাতে। ঐ বুড়োই দেয়নি; বলেছে, সেটা তার পোষাবে না। যেন ভাই আর আমাতে মিলে এতদিন আমরা সংসারে কিছুই দেয়নি!...ও একটা শয়তান!"

দুত্‌লভ ফিরে এল; দেবমূর্তির সামনে প্রার্থনা করল; বাইরের জামা ছেড়ে প্রধানের পাশে গিয়ে বসল। বাঁধুনি আবও বীয়ার ও চামচ এনে দিলো। এলিজা চুপচাপ চোখ বুজে ভাঁজ-করা কোট মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ল। তাকে দেখিয়ে প্রধান নীরবে মাথা নাড়ল। দুত্‌লভ হাত নাড়ল।

"আমার বুঝি কষ্ট হয়নি!...নিজের ভাইয়ের ছেলে!...সকলে মিলে ওর চোখে আমাকে শয়তান বানিয়ে তুলেছে!...আমরা ওর জন্য একজন পরিবর্ত কিনে নিতে পারতাম, এ কথা ওর বৌই ওর মাথায় ঢুকিয়েছে কিনা জানি না—বয়স অল্প হলে কি হবে সে বেটি মহাচালাক!...যাই হোক, ও তো আমাকেই দোষী করছে। ওর জন্য সত্যি দুঃখ হয়।..."

"সত্যি, ছেলেটি বড় ভাল", প্রধান বলল।

"কিন্তু ওকে নিয়ে আমি আর পারছি না। কাল ইগ্‌নাতকে পাঠাব; তার বৌও আসতে চেয়েছে।"

স্টোভের উপর উঠতে উঠতে প্রধান বলল, "সেই ভাল—তারাই আসুক। টাকা কি? টাকা তো খোলামকুচি!"

সরাইওলার লোকটি মাথা তুলে বলল, 'টাকা হাতে থাকলেই ও কথা বলা সাজে।"

দুত্‌লভ বলে উঠল, "আঃ, খালি টাকা, টাকা! টাকাই যত অনর্থের মূল। শাস্ত্রেও তাই বলে।"

লোকটি বলল, "শাস্ত্রে তো সবই বলে। একজন আমাকে বলেছে, কোন বণিক অনেক টাকা করেছিল; টাকা সে এত ভালবাসত যে কবরে যাবার সময় সে-টাকা সঙ্গে নিয়ে গেল। মরবার সময় বলল, তার সঙ্গে একটা ছোট বালিসকেও যেন কবর দেওয়া হয়। কেউ কোনও সন্দেহ কবল না; তাই দেওয়া হলো। তাবপর তার ছেলেরা অনেক খুঁজেও টাকার হদিস পেল না। অবশেষে একজন ভাবল, নোটগুলি হয়তো বালিশের মধ্যেই ছিলো। কথাটা জারেব কানে উঠল। তার হুকুমে কবরটা খোড়া হলো। কি ভাবছেন? শবাধার খুলে দেখা গেল, বালিশের ভিতর কিছুই নেই, কিন্তু শবাধার ভর্তি শুধু সাপ। আবার সব কিছু কবর দেওয়া হলো।...তাহলেই বুঝুন, টাকা কি করতে পাবে!"

"তা সত্যি, টাকাই পাপ ডেকে আনে", এই কথা বলে দুত্‌লভ উঠে প্রার্থনা করতে লাগল। তারপর ভাইপোর দিকে তাকাল। ছেলেটা ঘুমোচ্ছে। দুত্‌লভ তার কাছে গেল, তার বাঁধন খুলে দিলো, তারপর শুয়ে পড়ল। অপর একটি চাষী ঘোড়াগুলোর কাছে ঘুমোতে চলে গেল।

৯

সব কিছু শান্ত হলে পলিকি দোষী মানুষের মতো ধীরে ধীরে নেমে এসে তৈরি

হতে লাগল। যে কারণেই হোক সৈনিকদের সঙ্গে রাত কাটাতে তার অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। মাঝে মাঝেই মোরগ ডাকছে। "ড্রাম" সবটা যই শেষ করে জলের চৌবাচ্চার দিকে মুখ বাড়াচ্ছে। তাকে সাজ পড়িয়ে পলিকি চাষীদের গাড়িগুলোর পাশ দিয়ে নিয়ে গেল। টুপির ভিতরকার মাল-কড়ি নিরাপদেই আছে। তার গাড়ির টাকা বরফ-জমা পথ ধরে গড়গড়িয়ে পক্রোভ্‌স্কের দিকে এগিয়ে চলল। শহরটা ছাড়িয়ে যেতেই তার মনে স্বস্তি ফিরে এল। "ড্রাম" হাঁটতে হাঁটতে চলেছে। সামনের রাস্তা ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে আসছে। পলিকি টুপিটা খুলে হাত দিয়ে দেখল নোটগুলি ঠিকই আছে। ভাবল : "বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখব কি? না: পেটিটা খুলতে হতে পারে।...টুপিটা ভাল করে সেলাই করা হয়েছে, কাজেই খামটা পড়ে যেতে পারে না। বরং বাড়ি না পৌঁছা পর্যন্ত টুপিটা আর মাথা থেকে খুলব না।" সবই ভালয় ভালয় চলল; পলিকি স্বপ্ন দেখতে লাগল—কর্ত্রীঠাকরুণ কত কৃতজ্ঞ হলেন, তাকে পাঁচ রুবল বখশিস দিলেন, তার পরিবারের সকলে কত খুশি হলো! টুপিটা খুলে আবার খামটায় হাত দিলো; তারপর হেসে টুপিটাকে ঠেসে মাথায় বসিয়ে দিলো। টুপির উপরকার ভেলভেটের কাপড়টা একেবারে পচে গেছে; আকুলিনা এক জায়গায় সেলাই করেছে তো আব এক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে; পলিকি যখন অন্ধকাবে খামটাকে লাইনিং-এর নিচে জোবে ঠেলে দিয়েছিল তখনই টুপির আরও কিছুটা ছিঁড়ে গিয়ে ভেলভেটের ঢাকনাব ভিতর দিয়ে খামের একটা কোণ বেরিয়ে পড়েছিল।

ভোর হয়ে এল। সারা রাত ঘুম হয়নি। পলিকি ঝিমুতে লাগল। সেই অবস্থায়ই টুপিটাকে আর একটু টেনে দিলো, আর উপর থেকে খামটাও আর একটু বেরিয়ে পড়ল। ঢুলতে ঢুলতে একবার মাথাটাই গাড়ির গায়ে ঠুকে গেল। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে সে টুপিটায় হাত দিতে গেল, কিন্তু টুপিটা মাথায় বেশ চেপে বসে আছে বুঝতে পেরে খুলল না, ভাবল খামটা যথাস্থানেই আছে। 'ড্রাম"-এর পিঠে হাত বুলিয়ে দিলো; সম্পন্ন চাষীর মতো ভাব করে সগর্বে বাড়ির দিকে গড়গড়িয়ে চলল।

ঐ তো রান্নাঘর, এই তো ভূমিদাসদের আস্তানা। ছুতোরের বৌ কাপড়ের বোঝা নিয়ে চলেছে, ঐ তো আপিস; ঐ তো কর্ত্রীঠাকরুণের বাড়ি। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেখানে পৌঁছে পলিকি সকলকে বুঝিয়ে দেবে যে সে বিশ্বাসযোগ্য, সে সৎ। সে বলবে, "লোকে তো তার নামে কত কিছুই বলে।" তিনি বলবেন, "ধন্যবাদ পলিকি! এই নাও তিন রুবল।" তারপর লোকদের ডেকে বলবেন তাকে চা দিতে, এমন কি ভদ্‌কার হুকুমও করবেন। এত ঠাণ্ডার পরে সেটা ভালই হবে!

বাড়ি থেকে একশ' পা দূরে পৌঁছে পলিকি কোটটা গায়ে জড়িয়ে নিলো, টুপি খুলে চুলটা ঠিক করল, তারপর লাইনিং-এর ভিতর হাতটা ঢুকিয়ে দিলো। লাইনং-এর ভিতরে হাতড়াতে লাগল; আর একটা হাতও ঢুকিয়ে দিলো; মুখটা ক্রমেই ফ্যাকাসে হতে লাগল। একটা হাত টুপির ফুঁটো দিয়ে উপরে বেরিয়ে গেল। পলিকি

বসে পড়ল; ঘোড়া থামাল; গাড়ির ভিতরকার খড় ও যে সব জিনিসপত্র কিনে এনেছে তার মধ্যে খুঁজতে লাগল; কোট ও ট্রাউজারের পকেট হাতড়াল। টাকাটা কোথাও নেই।

"হা ভগবান! এর মানে কি?...এখন কি হবে?"...চুল টানতে টানতে সে চেঁচাতে লাগল।

কিন্তু পাছে কেউ তাকে দেখে ফেলে সেই ভয়ে সে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিলো, টুপিটা মাথায় চাপাল, বিস্মিত ও বিরক্ত "ড্রাম" কে উল্টো দিকে ছুটিয়ে দিলো।

"পলিকির সঙ্গে কিছুতেই যাব না," ড্রাম বোধ হয় এই কথাই ভেবেছিল।

"তবে রে বেতো শয়তান!" পলিকি চিৎকার করে গাড়িতে উঠে দাঁড়াল; "ড্রাম"-এর মুখের লাগামে টান দিলো, তার পিঠে চাবুক কসাল, আর অঝোরে কাঁদতে লাগল।

১০

সারাটা দিন কেউ পলিকিকে পক্রোভ্স্ক-এ দেখতে পেল না। খাবারের পরে কর্ত্রীঠাকরুণ বারকয়েক তার খোঁজ করল, আকস্উৎকা আকুলিনার কাছে ছুটে গেল, কিন্তু আকুলিনা জানাল সে তখনও ফেরেনি, হয়তো মালী তাকে আটকে দিয়েছে, নয়তো ঘোড়াটার কিছু হয়েছে। বলল, "এখন সেটা খোঁড়া না হলে বাঁচি। গতবার যখন ম্যাক্সিম গিয়েছিল, সারাটা দিন তাকে পথের মাঝখানে পড়ে থাকতে হয়েছিল—হেঁটে তবে বাড়ি ফিরেছিল।"

আকস্উৎকা তড়িঘড়ি চলে গেল। আকুলিনা নানাভাবে মনের আতংককে চাপা দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। তার মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। পরদিন উৎসব, অথচ কোনও কাজেই সে মন বসাতে পারল না। তার আরও বেশি ভয় করতে লাগল কারণ ছুতোরের বৌ তাকে জোর দিয়ে বলেছে যে "পলিকির মতো একটা লোককে সে গাড়ি চালিয়ে এসে আবার ফিরে যেতে দেখেছে।" ছেলে মেয়েরাও তাদের "বাপির" জন্য অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করে আছে।

কর্ত্রীঠাকরুণ উদ্বিগ্ন হয়ে বারবার জিজ্ঞাসা করছে, "পলিকি এখনও ফেরেনি? 'কোথায় গেল সে?" আর এগর মিখাইলোভিচ জবাবে শুধু বলছে, "আমি তো বলতে পারছি না"। তার মনোবাসনা পূর্ণ হতে চলেছে দেখে সে খুব খুশি। অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে বলল, "দুপুরের আগেই তো তার ফেরা উচিত ছিল।"

সারা দিন পলিকির কোনও খবর পাওয়া গেল না; শেষে অবশ্য জানা গেল, কোনও কোনও চাষী তাকে দেখেছে; রাস্তা ধরে খালি মাথায় ছুটছে, আর যাকে পাচ্ছে তাকেই জিজ্ঞাসা করছে, কেউ একটা চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছে কি না। আব একজন তাকে দেখেছে রাস্তার ধারে ঘুমিয়ে আছে, পাশে একটা ঘোড়া ও গাড়ি।

"তাকে দেখে মনে হলো মাতাল, আর ঘোড়াটার পেটের দু'পাশ এমনভাবে বসে গেছে যে মনে হয় দু'দিন তার পেটে দানা-পানি পড়েনি।" সারা রাত আকুলিনা ঘুমোতে পারল না, কান পেতে রইল, কিন্তু পলিকি এল না।..ক্রমে আলো ফুটল, গির্জার ঘণ্টা বাজল, ছেলেমেয়েরা জাগল, তবু পলিকি এল না। আগের দিন বরফ পড়েছে, মাঠের এখানে ওখানে ছাদের উপরে কিছুটা বরফ জমে আছে; কিন্তু আজ উৎসবের দিন বলেই বোধ হয় আকাশ পরিষ্কার হয়েছে, রোদ উঠেছে, পথের অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। কিন্তু উৎসবের পিঠে তৈরির ব্যাপারে বড় উনুনটার পাশে কাজে ব্যস্ত থাকায় পলিকির ফিরে আসাটা সে জানতেই পারল না; শুধু ছেলে-মেয়েদের উল্লাস শুনেই বুঝতে পারল যে তার স্বামী ফিরে এসেছে।

উনুনের পাশ থেকেই সে বলল, "আবে পলিকি, খবর ভাল তো?"

পলিকি বিড়বিড় করে কি বলল সে কিছুই বুঝতে পারল না।

চেঁচিয়ে বলল, "বলি কর্ত্রীঠাকরুণের কাছে গিয়েছিলে তো?"

পলিকি খুপ'ড়ির বিছানায় বসে অর্থহীনভাবে চারদিকে তাকাতে লাগল তার মুখে অপরাধীর শোচনীয় হাসি। অনেকক্ষণ কোনও কথারই জবাব দিলো না।

আবার আকুলিনের গলা শোনা গেল, "আচ্ছা, তোমার এত দেরী হলো কেন?"

"হ্যাঁ আকুলিনা, টাকাটা কর্ত্রীঠাকরুণের হাতে দিয়ে এসেছি। তিনি কত ধন্যবাদ দিলেন!" হঠাৎ কথাটা বলে আরও অস্বস্তির সঙ্গে সে হাসতে লাগল। দুটি জিনিস তার বিস্ফারিত চোখ দুটিকে টানতে লাগল : বাচ্চাটা, আর ঝোলানো দোলনার দড়িটা। দোলনার কাছে গিয়ে তাড়াতাড়ি দড়ির গিঁটটা খুলে ফেলল। তারপর এক দৃষ্টিতে বাচ্চাটাকে দেখতে লাগল। তখনই এক থালা পিঠে নিয়ে আকুলিনা ঘরে ঢুকল। পলিকি তাড়াতাড়ি দড়িটা বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে বিছানায় বসে পড়ল।

"ব্যাপার কি পলিকি? তোমাকে কেমন যেন অন্য রকম লাগছে," আকুলিনা বলল।

"ঘুম হয়নি তো," সে জবাব দিলো।

সহসা জানালার পাশ দিয়ে কি যেন দ্রুত চলে গেল; পরক্ষণেই আকস্‌উৎকা তীরের মতো ঘরে ঢুকল।

"কর্ত্রীঠাকরুণের হুকুম পলিকিকে এই মুহূর্তেই যেতে হবে—এই মুহূর্তে, আভ্‌দোতিয়া নিকোলায়েভ্‌নার হুকুম—এই মুহূর্তে!"

পলিকি আকুলিনার দিকে, তারপর মেয়েটির দিকে তাকাল।

"আমি যাচ্ছি। তিনি আবার কি চাইছেন? হয়তো আমাকে কিছু পুরস্কার দেবেন। তাকে বলো, আমি যাচ্ছি।"

পলিকি বেরিয়ে গেল।

আকুলিনা মেয়েকে বলল, "চলো মেরি, তোমাকে স্নান করিয়ে দিই।"

মেয়েটি চেঁচামেচি জুড়ে দিলো।

"আয় বলছি। দেব কসিয়ে এক থাপ্পড়। মোটে ঝামেলা করবি না। চলে আয়।...এখনও তোর ভাইকে নাওয়ানো বাকি।"

এদিকে দাসীব পিছনে না গিয়ে পলিকি অন্য পথ ধরল। পথের ধারে দেয়ালের গায়ে উপরের ঘরে উঠবাব একটা মই ছিল। চারিদিকে তাকিয়ে পলিকি যখন দেখল কেউ কোথাও নেই তখন সে একদৌড়ে ছুটে গিয়ে সেই মই বেয়ে উঠে গেল।

কর্ত্রীঠাকরুণ অধৈর্য হয়ে দুনিয়াশাকে জিজ্ঞাসা করল, "পলিকি আসছে না কেন? সে কোথায়? এল না কেন?"

আকস্উৎকা আবার ছুটে গেল ভূমিদাসদের খুপড়িতে। পলিকির খোঁজ করতেই আকুলিনা বলল, "সে তো অনেকক্ষণ হলো চলে গেছে। দেখো কোথাও হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে।"

ঠিক তখনই ছুতোরেব বৌ রোদে শুকোতে দেওয়া কাপড় তুলতে সেই উপরের ঘরে গিয়ে উঠল। হঠাৎ একটা আতংকিত আর্তনাদে ঘরটা ভরে উঠল; ছুতোরের বৌ পাগলের মতো চোখ বুজে চারটে করে ধাপ এক এক লাফে পেরিয়ে মই বেয়ে নেমে এল।

চিৎকার করে বলল, "পলিকি!"

আকুলিনা বাচ্চাটাকে কোল থেকে নামিয়ে দিলো।

"গলায় ফাঁসি দিয়েছে", ছুতোরের বৌ আর্তনাদ করে উঠল।

আকুলিনা ছুটে বেরিয়ে গেল। বাচ্চাটার দিকে ফিরেও তাকাল না; সেটা একটা বলের মতো গোল পাকিয়ে জলের গামলায় পড়ে গেল—পা উপরের দিকে আর মাথাটি নিচে।

"বরগা থেকে...ঝুলছে!' ছুতোরের বৌ চেঁচাচ্ছিল; আকুলিনাকে দেখে সে থেমে গেল।

কেউ বাধা দেবার আগেই আকুলিনা মই বেয়ে উপরে উঠে গেল, কিন্তু উঠেই একটা চিৎকার করে মরার মতো উল্টে পড়ে গেল; খুপড়ির ভিতর থেকে যে সব লোক ততক্ষণে ছুটে এসেছিল তারা সময়মতো পৌঁছে ধরে না ফেললে আকুলিনা মরেই যেত।

১১

কয়েক মিনিট হৈ-হল্লার জন্য কিছুই বোঝা গেল না। অনেক লোক জড় হলো; সকলেই কথা বলতে লাগল; বাচ্চারা ও বুড়িরা কাঁদতে লাগল। আকুলিনা অজ্ঞান হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত লোকজন, ছুতোর ও নায়েব মই বেয়ে উপরে উঠে গেল, আর ছুতোরের বৌ বিশ বারের বার বলতে শুরু করল কেমন করে "একটা জামা

আনতে গিয়ে এই ভাবে তাকাতেই—দেখি...একটা লোক; আবার তাকালাম, ওল্টানো অবস্থায় পাশেই পড়ে আছে একটা টুপি। চেয়ে দেখি...পা দুটো ঝুলছে। শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল! বোঝো অবস্থা!...ভাবো তো একটা লোক ফাঁসিতে ঝুলছে। আর আমার চোখেই সেটা পড়ল!...কেমন করে যে নেমে গিয়েছিলাম তা নিজেই জানি না।...ঈশ্বর কি করে যে আমাকে বাঁচালেন সেটাই আশ্চর্য! সত্যি, প্রভুর অনেক করুণা!...সোজা কথা!...এতগুলো ধাপ আর এতটা উঁচু। আরে! আমি তো মরেও যেতে পারতাম!"

এই সময় আকুলিনার জ্ঞান ফিরে এল। সে আবার মইটার দিকে ছুটে যেতেই সকলে তাকে ধরে ফেলল।

খুপড়ির ভিতর থেকে ছোট মেয়েটা কেঁদে উঠল, "মাম্‌মা, সেম্‌কা দুবে গেছে!" আকুলিনা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে খুপড়ির দিকে ছুটে গেল। বাচ্চাটা গামলার মধ্যে চিৎ হয়ে পড়ে আছে, নড়াচড়া করছে না, ছোট পা দুটিও নড়ছে না। আকুলিনা তাকে তুলে নিল; নিঃশ্বাসও পড়ছে না, নড়ছেও না। ছেলেকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তার উপর উপুড় হয়ে পড়ে আকুলিনা এমন তীব্রস্বরে চিৎকার করে উঠল যে মেরি দুই কানে আঙুল দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রতিবাসীরা এসে খুপড়ির মধ্যে জড় হলো; বিলাপ করতে লাগল, কাঁদতে লাগল! ছেলেটিকে বাইরে নিয়ে গিয়ে তার গা ঘষতে লাগল। কিন্তু সব বৃথা। আকুলিনা বিছানায় ছটফট করতে করতে হঠাৎ হেসে উঠল—এমন হাসতে লাগল যে, যে শুনল সেই আঁতকে উঠল।

নায়েব পুরোহিত ও কনস্টেবলের কাছে লোক পাঠাল, আর কয়েকজনকে পাহারায় রেখে দিলো। ততক্ষণে জনতা অনেকটা চুপচাপ হয়েছে, ভিড়ও পাতলা হয়ে এসেছে। এমন সময় আবার একটা সোরগোল পড়ে গেল : "কর্ত্রীঠাকরুণ! কর্ত্রীঠাকরুণ!" মহিলাটির মুখ বিবর্ণ, জলের দাগ লেগে আছে। গলিতে ঢুকে চৌকাঠ পেরিয়ে সে আকুলিনার খুপড়িতে ঢুকল।...কাছে গিয়ে তার হাতটা তুলে নিলো। আকুলিনা সজোরে হাতটা টেনে নিলো।

মহিলাটি বলল, "আকুলিনা, তোমার ছেলেমেয়ে রয়েছে—নিজে সুস্থ হতে চেষ্টা করো!"

আকুলিনা হো-হো করে হেসে উঠে বসল।

"আমার ছেলেমেয়েরা রূপো। সব রূপো! আমি কাগজের টাকা রাখি না। পলিকিকে বলেছিলাম, 'কখনও নোট নিও না', এখন হলো তো, তারা যে তার মুখে চুন-কালি মাখিয়ে দিলো ম্যাডাম!" সে আরও জোরে হেসে উঠল।

কর্ত্রীঠাকরুণ মুখ ফিরিয়ে হুকুম দিলো, সরষের পুল্‌টিশ নিয়ে ডাক্তারের সহকারীকে আসতে বলো। "কিছুটা ঠাণ্ডা জল নিয়ে এস," বলে নিজেই জলের খোঁজ করতে লাগল; কিন্তু ধাত্রী গ্র্যানি আন্নাকে মরা ছেলেটার পাশে দেখতে পেয়ে সঙ্গে

সঙ্গে সেখান থেকে চলে এল; সকলেই দেখল, রুমালে মুখটা ঢেকে সে কাঁদছে। গ্র্যানি আন্না একটুকরো কাপড় দিয়ে বাচ্চাটাকে ঢেকে দিলো; তার হাত দুটোকে টান করে রাখল। মহিলাটি তখনও হাউ-হাউ করে কাঁদছে। সকলে তাকে ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে গেল। আকুলিনা তখনও হাসছে আর ভুল বকছে। তাকে অন্য একটা ঘরে নিয়ে রক্তমোক্ষণ করা হলো, সারা গায়ে সরষের পুলটিশ্ লাগানো হলো, মাথায় বরফ দেওয়া হলো। তবু তার জ্ঞান ফিরল না, সে কাঁদল না, শুধুই হাসতে লাগল, আর এমন সব কথা বলতে লাগল ও এমন সব কাণ্ড করতে লাগল যে যারা তার দেখাশুনা করছিল তারাও না হেসে পারছিল না!

১২

পক্রোভ্স্ক্-এ উৎসবেব দিনটা সুখেব ছিল না। দিনটা সুন্দর হলেও লোকজনরা ফূর্তি করতে বের হলো না : মেয়েরা পথে পথে গান গেয়ে বেড়াল না; যে সব কারখানার লোকরা ছুটিতে শহর থেকে বাড়ি এসেছিল তারা কনসার্ট ও "বালালেকাস" বাজাল না, মেয়েদের সঙ্গে নাচ-গান করল না। সকলেই যার যার ঘরে রইল, আর যদি বা কথা বলল তো এত আস্তে বলল যেন শয়তান তাদের কথাগুলো শুনে ফেলবে। দিনের বেলাটা তত খারাপ কাটল না, কিন্তু যখন গোধূলি নেমে এল, কুকুরগুলো ডাকতে শুরু করল, আর অবস্থাকে আরও শোচনীয় করে তুলতে একটা বাতাস উঠে এসে চিমনির ভিতর দিয়ে শিস্ দিতে লাগল, তখন সকলে এতই ভয় পেয়ে গেল যে যাদের মোমবাতি ছিল তারাই দেবমূর্তির সামনে সেগুলি জ্বালিয়ে দিলো। যারা খুপড়িতে একা ছিল তারা প্রতিবাসীর বাড়িতে রাতটা কাটাবার অনুমতি নিতে গেল; যাদের কাজের জন্য বাহির বাড়িতে যাবাব দরকার ছিল তারাও বাইবে গেল না, গরু-ছাগলগুলো সারা রাত না খেয়েই কাটাল। দুর্দিনের প্রয়োজনে বাড়িতে বোতল-ভূর্তি যত পবিত্র জল ছিল সবই এক রাতে খরচ হয়ে গেল।..

কর্ত্রীঠাকরুণের বাড়িতেও সেই একই আতংকের ছায়া দেখা দিলো। তার শোবার ঘরে ইউ-ডি-কোলন ও ওষুধ ছিটিযে দেওয়া হলো। দুনিয়াশা হল্‌দে মোম গলিয়ে পলস্তরা বানাল। তা দিয়ে কি হবে আমি জানি না, কিন্তু মহিলাটি যখনই অসুস্থ হয় তখনই এটা বানানো হয়ে থাকে। আব এখন তো সে পুরোপুরি অসুস্থ হয়েই পড়েছে। দুনিয়াশাকে সাহস দেবার জন্য তার মাসি এসেছে বাতটা থাকবে বলে; কাজেই মেয়েটিকে নিয়ে মোট চারজন দাসীর ঘরে বসে নিচু গলায় কথা বলতে লাগল।

"তেল আনতে কে যাবে?" দুনিয়াশা জিজ্ঞাসা করল।

"আমি কিছুতেই যাব না আভ্‌দোতিয়া পাভ্‌লভ্‌না!" দ্বিতীয় দাসী সাফ জানিয়ে দিলো।

"ধুত্তোর! তুমি আর আক্সউৎকা এক সঙ্গে যাও।"

"আমি একাই চ'লে যাব। আমি কোনও কিছু ভয় করি না!" বলার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু আক্সিউৎকা ভয় পেয়ে গেল।

"তাহলে তুমিই যাও বাপু। গ্র্যানি আন্নাকে বলো একটা গ্লাসে করে তেল দিতে। দেখো যেন ফেলে দিও না," দুনিয়াশা বলল।

আক্সিউৎকা অভ্যাস মতোই তীরবেগে বেরিয়ে গেল। তারও ভয় করতে লাগল; তার মনে হলো, যদি সে কোনও কিছু দেখে বা শোনে, এমন কি তার জীবিত মাও যদি হয়, তাহলেও সে ভয়েই মরে যাবে। দুই চোখ বুজে সে পরিচিত পথ ধরে ছুটতে লাগল।

১৩

"কর্ত্রীঠাকরুণ ঘুমিয়েছেন না কি?" হঠাৎ একটা ভাবী চাষীর গলা আক্সিউৎকার কানের কাছে প্রশ্নটা করল। চোখ খুলেই সে দেখল, বাড়িটার চাইতেও উঁচু একটা মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। চিৎকার করে সে পিছন ফি'রে ছুটতে লাগল। এক দৌড়ে ফটকে এবং আর এক দৌড়ে দাসীর ঘরে ঢুকেই বিছানায় পড়ে সে আর্তনাদ করে উঠল। দুনিয়াশা, তার মাসি, দ্বিতীয় দাসী—সকলেই ভয়ে একেবারে কাঠ; সে অবস্থা কাটিয়ে উঠবার আগেই গলিতে ও দরজায় একটা ভারী, ধীর ও সংসংকোচ পায়ের শব্দ তারা শুনতে পেল। গলানো মোমটা উল্টে দিয়ে দুনিয়াশা ছুটে কর্ত্রীঠাকরুণের ঘরে চলে গেল; দ্বিতীয় দাসী দেয়ালে ঝোলানো একটা স্কার্টের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল: মাসি কিছুটা সাহসী, সে দবজাটা বন্ধ করতে যাবে এমন সময় দরজা খুলে একটা চাষী ঘরে ঢুকল। লোকটি দুত্‌লভ, পায়ে নৌকোর মতো জুতো। দাসীর ভয়ের প্রতি নজর না দিয়ে সে ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে টুপিটা জানালার গোববাটে রেখে দিলো, এবং কোটেব ভিতরে হাত ঢুকিয়ে একটা চিঠি টেনে বের করল—তাতে পাঁচটি বাদামী সিল-এ নোঙরের ছাপ মারা। দুনিয়াশার মাসি বুকের উপর হাতটা চেপে ধরে অনেক কষ্টে বলল,

"আরে, আপনি যে আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন নৌমিচ! আমার মুখ দিয়ে একটা কথাও বের হচ্ছে না! আমি তো ভেবেছিলাম আমার শেষ সময় উপস্থিত হয়েছে!"

দুত্‌লভ কোনও বকম ভনিতা না করে জানাল যে সে কর্ত্রীঠাকরুণের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

"তিনি সুস্থ নন," দুনিয়াশা বলল।

দুত্‌লোভ বলল, "দেখো, খুবই গুরুতর ব্যাপাব: তুমি গিয়ে বলো যে একজন চাষী টাকা সমেত চিঠিটা পেয়েছে।"

"কিসের টাকা?"

কথাটা বলতে যাবার আগে দুনিয়াশা চিঠির ঠিকানাটা পড়ে দুত্লভের কাছে জানতে চাইল, কোথায় ও কি ভাবে সে টাকাটা পেয়েছে; এ টাকা তো পলিকির শহর থেকে আনবার কথা ছিলো। সব বিবরণ শুনে দুনিয়াশা কর্ত্রীঠাকরুণের কাছে গেল; কিন্তু দুত্লব শুনে অবাক হলো যে কর্ত্রীঠাকরুণ তার সঙ্গে দেখা করতে চান না এবং সে যা কিছু বলেছে তার মাথামুণ্ডু কিছুই দুনিয়াশা বুঝতে পারেনি।

মহিলাটি বলেছে, "আমি এ বিষয়ে কিছু জানি না, জানতে চাইও না! কে চাষী? কিসের টাকা?...কারও সঙ্গে আমি দেখা করব না! সে আমাকে শান্তিতে থাকতে দিক।"

দুত্লভের সন্দেহ হলো। সে তখনও আশা করছিল যে টাকাটা হয়তো কর্ত্রীঠাকরুণের নয়, ঠিকানাটা হয়তো তাকে ভুল পড়ে শোনানো হয়েছে; কিন্তু দুনিয়াশা জানাল যে ঠিকানাটা ঠিকই আছে। তখন সে একটা নিঃশ্বাস ফেলে চিঠিটাকে বুকের মধ্যে গুঁজে চলে যাবার জন্য পা বাড়ালো।

বলল, "তাহলে এটা পুলিশ-কন্স্টেবলের হাতেই দিয়ে দেব।"

তাকে থামতে বলে দুনিয়াশা বলল, "একটু দেরি করুন। আবার চেষ্টা করে দেখি। চিঠিটা আমাকে দিন।"

দুত্লভ চিঠিটা বের করল, কিন্তু তখনই দুনিয়াশার বাড়ানো হাতে সেটা দিলো না।

"বল যে সেমেন দুতলভ্ এটা রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছে..."

"বেশ তো আমাকে দিন!"

"ভেবেছিলাম এটা তেমন কিছুই না—একটা চিঠিমাত্র; কিন্তু একজন সৈনিক আমাকে পড়ে শুনিয়েছে যে এর ভিতরে টাকা আছে..."

"বেশ তো, ওটা আমাকে দিন।"

তবু মূল্যবান চিঠিটা তাব হাতে না দিয়ে দুত্লভ বলতে লাগল, "এমন কি আমি বাড়ি যেতে পর্যন্ত সাহস করিনি।...সে কথা তাকে বলো।"

দুনিয়াশা চিঠিটা নিয়ে আবার কর্ত্রীঠাকরুণের কাছে গেল।

মহিলাটি তিরস্কারের সুরে বলল, "হা আমার ঈশ্বর, ও টাকার কথা আমাকে বলিস্ নে দুনিয়াশা! ছোট ছেলেটির কথা মনে পড়লেই..."

"চাষীটি জানে না মাদাম এটা সে কাকে দেবে", দুনিয়াশা বলল।

মহিলাটি খামটা খুলল। টাকাটা দেখে শিউরে উঠল। ভাবতে লাগল।

"কী ভয়ংকর টাকা! কত বড় ক্ষতি এ টাকা করেছে!"

"লোকটি দুত্লভ মাদাম। আপনি কি তাকে চলে যেতে বলেন, না কি বাইরে গিয়ে একবার দেখা করবেন—আর টাকাটাও সব ঠিক আছে তো?" দুনিয়াশা জিজ্ঞাসা করল।

"এ টাকা আমি চাই না। এ বড় মারাত্মক টাকা। এ টাকা কী না করেছে! তাকে রল্, সে যদি চায় তো টাকাটা নিজেই নিয়ে নিক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ! সে সবটা নিক, যা খুশি করুক।"

হেসে দুনিয়াশা বলল, "পনেরো শ' রুবল।"

"সে সব নিক!" মহিলাটি ধৈর্যহারা হয়ে একই কথা বলল। "তুই কি আমার সব কথা বুঝতে পারছিস না? এ টাকা দুর্ভাগ্যের প্রতীক। আর কখনও এ টাকার কথা আমাকে বলবি নে। যে চাষী ঐ টাকা পেয়েছে সেই নিক। যা, চলে যা!"

দুনিয়াশা দাসীদের ঘরে ফিরে গেল।

"সবটাই আছে তো?" দুত্লভ প্রশ্ন করল।

খামটা তার হাতে দিয়ে দুনিয়াশা বলল, "আপনি বরং গুণে দেখবেন। আমার উপর হুকুম হয়েছে, এটা আপনাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।"

"তোমাদের কোনও গণনা-যন্ত্র আছে কি?"

দুত্লভের ধারণা হয়েছিল, মহিলাটি বোকা, তাই গুণতে পারেনি এবং সেই জন্যই তাকে গুণবার হুকুম দিয়েছে।

দুনিয়াশা বলল. "আপনি বাড়িতে নিয়েই গুনতে পারবেন—টাকাটা আপনারই! তিনি বলেছেন, 'আমি এ টাকা চোখেও দেখতে চাই নে; যে এনেছে তাকেই দিয়ে দে।'

দুত্লভ অবাক হয়ে দুনিয়াশার দিকে তাকিয়ে রইল।

দুনিয়াশার মাসি দুই হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে বলে উঠল, "হে শুদ্ধা মা। প্রভু একে কী সৌভাগ্যই দিয়েছেন!"

দ্বিতীয় দাসী কথাটা বিশ্বাসই করতে পারল না।

"এটা অবশ্যই তোমার মনের কথা নয়; তুমি ঠাট্টা করছ!"

"ঠাট্টা! তাই বটে। তিনি আমাকে বলেছেন টাকাটা একেই দিতে।...যান। আপনার টাকা নিয়ে চলে যান!" বিরক্তি না চেপেই দুনিয়াশা কথাগুলি বলল। "কারও সর্বনাশ, কারও পৌষ মাস!"

মাসি বলল. "এটা ঠাট্টার কথা নয়।...পনেরো শ' রুবল!"

"তারও বেশি." দুনিয়াশা বলল; তার গলায় বিদ্রূপের সুর! "দেখো, সেন্ট নিকোলাসের বেদীতে তোমাকে একটা দশ কোপেক দামের মোমবাতি জ্বালাতে হবে। তুমি বুঝতে পারছ না কেন? টাকাটা যদি একটা গরীব মানুষ পেত তবু. কিন্তু এ লোকটির যে নিজেরই প্রচুর আছে।"

এতক্ষণে দুত্লভ বুঝতে পারল যে এটা ঠাট্টা নয়, কাজেই গুণবার জন্য যে নোটগুলো বের করেছিল সেগুলিকে আবার গুছিয়ে খামের মধ্যে ভরে ফেলল। কিন্তু তার হাত কাঁপতে লাগল; এটা যে ঠাট্টা নয় সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য সে বারবার দাসীটির দিকে তাকাতে লাগল।

দুনিয়াশা যে এই চাষী ও টাকা দুটোকেই ঘৃণা করে সেটা বোঝাবার জন্য সে বলল, "দেখো! লোকটা এতই খুশি হয়েছে যে হাতটাও ঠিক রাখতে পারছে না। আসুন, আমি ভাল করে খামে ভরে দিচ্ছি।"

সে নোটগুলো ধরতে যাচ্ছিল, কিন্তু দুত্‌লভ দিলো না। একসঙ্গে দলা পাকিয়ে বুকের আরও ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে টুপিটা হাতে নিলো।

"আপনি খুশি তো?"

"কি যে বলব জানি না! সত্যি সত্যি..."

কথা শেষ না করেই সে হাতটা নাড়ল, একটু হাসল, তারপর প্রায় কেঁদে ফেলবার মতো অবস্থায় বেরিয়ে গেল।

কর্ত্রীঠাকরুণ ঘণ্টা বাজালো।

"টাকাটা তাকে দিয়েছিস?"

"দিয়েছি।"

"সে কি খুব খুসি হয়েছে?"

"খুসিতে পাগল হয়ে গেছে।'

"আঃ, ওকে ফিরিয়ে আন্‌। আমি জানতে চাই, সে ওটা কেমন করে পেল? ওকে এখানে নিয়ে আয়। আমি বাইরে যেতে পারব না।"

দুনিয়াশা ছুটে বেরিয়ে গেল। ফটকেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তার মাথাটা তখনও খালি; টাকার থলেটা বের করে একটু ঝুঁকে তার গিঁটটা খুলছিল আর কোটগুলোকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে ছিল। হয়তো ভেবেছিল, টাকাটা যতক্ষণ থলেয় ভর্তি না হচ্ছে ততক্ষণ টাকাটা বুঝি তার নয়; দুনিয়াশার ডাক শুনে সে ভয় পেয়ে গেল।

"ব্যাপার কি আভ্‌দোতিয়া. আভ্‌দোতিয়া পাভ্‌লভ্‌না? তিনি কি টাকাটা ফেরৎ নিতে চাইছেন? তুমি কি আমার হয়ে কিছু বলতে পারলে না?. সত্যি বলছি, সেজন্য তোমাকে বেশ কিছুটা ভাল মধু এনে দিতাম।"

'সত্যি তো! এমন আপনি কত এনেছেন!"

আবার দরজা খুলে চাষীটিকে মহিলার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তার খুশির আমেজ কোথায় উড়ে গেল। "হায়রে, তিনি নির্ঘাৎ টাকাটা ফেরৎ চাইবেন!" তার চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে এল।

"কে? দুত্‌লভ নাকি?"

"হ্যাঁ, মা জননী।...ঠিক যেমনটি ছিল তেমনটিই আছে।...এটা পেয়ে আমি খুশি হইনি; কাজেই ঈশ্বর আমার সহায় হোন! ঘোড়াটাকে কী ছোটান ছুটিয়ে নিয়ে এসেছি যে কী বলব!..."

"এটা তোমার ভাগ্য!" ঘৃণায় কথাগুলি বললেও মহিলাটির মুখে সদয় হাসি। "নিয়ে যাও, এটা তুমিই নিয়ে যাও।"

দুত্‌লভের চক্ষু ছানাবড়া।

"তুমি এটা পেয়েছ দেখে আমি খুশি হয়েছি। ঈশ্বর করুন, টাকাটা যেন ভাল কাজে লাগে। তুমি খুশি তো?"

"খুশি না হবার জো কি? আমি খুব খুশি ম্যা'ম, খুব খুশি! আপনাব জন্য আমি সব সময় প্রার্থনা করব!..মা জননী যে বেঁচে গেছেন তাতেই আমি আরও খুশি! আমার কিন্তু কোনও অপরাধ নেই।"

"কি ক'রে এটা পেলে?"

"আমার ভাই-পো তো নতুন সৈন্যদলে ভর্তি হবে, তাই তাকে নিয়ে শহরে গিয়েছিলাম; ফিরবাব পথেই এটা পেয লেলাম। নিশ্চয় পলিকিই ফেলে এসেছে।"

"ঠিক আছে, যাও—যাও বাপু! তুমি এটা পাওয়ায় আমি খুশি হয়েছি!"

"আমিও খুশি মা জননী!" চাষী বলল।

তখন তার মনে পড়ে গেল, ঠিক মতো ধন্যবাদ জানানো হযনি, আব কি যে করবে বুঝেও উঠছিল না। মহিলা ও দুনিয়াশা হাসতে লাগল। যেন উঁচু ঘাসের ভিতর দিয়ে হাঁটছে তেমনিভাবে লোকটি পা ফেলতে লাগল; পাছে তাকে থামিয়ে টাকাটা নিয়ে নেয এই ভযে সে ছুটতে শুরু করল।

১৪

বাইরের খোলা হাওয়ায় এসে সে বড় রাস্তা ছেড়ে লেবুগাছগুলোর ভিতবে ঢুকল। বেল্টটা খুলে থলের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে টাকাটা বেব করল। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল; একবাব খুলল, একবার বন্ধ করল, কিন্তু কোনও কথা বেব হলো না। টাকাটা বেব করে বেল্টটা আটকে দিয়ে সে একটা ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল, তারপর মাতালের মতো টলতে টলতে পথ চলতে লাগল। হঠাৎ সে দেখল, একটা মনুষ্যমূর্তি তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে হাঁক দিলো; লোকটা এফিম, ভূমিদাসেব আস্তানার পাহারাদার, হাতে একটা মুগুর।

কাছে এসে এফিম খুশি হয়ে বলল, "আরে সেমেন বাবা যে! সৈনিকদের রেখে এলে?"

"হ্যাঁ গো। তা তুমি কোথায় চলেছ?"

"আর বলো কেন, পলিকি যেখানে গলায় ফাঁস দিয়েছে সেখানে আমাকে পাহারায় বসিয়েছে।"

"সে কোথায়?"

"সকলে তো বলছে ঐ-ই ওখানে—উপরের ঘরে ঝুলছে," হাতের মুগুরটা দিয়ে ভূমিদাসদের আস্তানার ছাদটা দেখিয়ে এফিম বলল।

সেদিকে তাকিয়ে অন্ধকারে দুত্‌লভ কিছুই দেখতে পেল না। তবু ভুরু কুঁচকে চোখ পাকিয়ে সে মাথা নাড়তে লাগল।

এফিম বলল, "কোচয়ান বলল, পুলিশ-কনেস্টবল এসেছে। তাকে এখনই সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। রাত করে কাজটা কি ভয়ংকর নয় বাবা? তারা হুকুম করলে কি হবে, আমি রাত করে সেখানে যেতে পারব না। এগর মিখাইলোভিচ যদি আমাকে মেরেও ফেলে, তবু না।..."

সে যে কি বলছে সেটা না ভেবেই সৌজন্যের খাতিরে দুত্‌লভ বলে উঠল, "কী পাপ, কী পাপ!" সে যাবার উপক্রম করতেই এগর মিখাইলোভিচ তাকে থামিয়ে দিলো।

আপিসের ফটক থেকেই এবার মিখাইলোভিচ হাঁক দিলো, "হাই! পাহারাদার! এখানে আয়!"

এফিম সারা দিলো।

"তোর সঙ্গে আর কে দাঁড়িয়ে ছিল?"

"দুত্‌লভ।"

"ওঃ! তুমিও এসেছ সেমেন! এস!"

কাছে গিয়ে কোচয়ানের হাতের আলোয় দুত্‌লভ দেখল, এগব মিখাইলোভিচের পাশে আর একটি বেঁটে লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথায় নকল ফুল বসানো টুপি, আর পরনে লম্বা ইউনিফর্ম কোট। সেই পুলিশ কন্‌স্টেবল।

তাকে দেখে এগর মিখাইলোভিচ বলল, "এই বুড়ো লোকটিও আমাদের সঙ্গে যাবে।"

বুড়ো অস্বস্তি বোধ করতে লাগল, কিন্তু এড়াবার উপায় নেই।

"আর এফিম—তুই তো সাহসী ছেলে! ও যেখানে ফাঁসিতে ঝুলেছে ছুটে সেখানে চলে যা আর এর উঠবার জন্য মইটা নামিয়ে দে।"

এর আগে যদিও সে বলেছিল যে কোনও কিছুর বিনিময়েও সে ওখানে যাবে না, তবু হুকুম শুনে বাকলের জুতো খট্‌খটিয়ে সেই দিকেই ছুট দিলো।

পুলিশ-অফিসার দেশলাই জ্বালিয়ে পাইপটা ধরাল। সে থাকে মাইল দেড়েক দূরে। মাতলামি করার জন্য উপরওয়ালার কাছে সবেমাত্র বকুনি খেয়ে তার মেজাজটা খিঁচড়ে গিয়েছিল। রাত দশটায় এখানে হাজির হয়েই মৃতদেহটা দেখতে চাইল। এগর মিখাইলোভিচ জানতে চাইল, দুত্‌লভ এ সময় এখানে এল কেমন করে। সব কথা খুলে বলে দুত্‌লভ জানাল যে, এগর মিখাইলোভিচের অনুমতি নিতেই সে এসেছিল। নায়েব খামটা চেয়ে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। দুত্‌লভ তো ভয় পেয়ে গেল। পুলিশ-কন্‌স্টেবলও খামটা হাতে নিয়ে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগল।

"হায় কপাল, টাকাটা গেল!" দুত্‌লভ ভাবল। কিন্তু পুলিশ-কন্‌স্টেবল টাকাটা তার হাতেই ফিরিয়ে দিলো।

বলল, "মাটি-কাটা চাষীর কি কপাল!"

এগর মিখাইলোভিচ বলল, "টাকাটা যেন ওর হাতে এসে উঠেছে। ভাইপোকে সৈন্যদলে ভর্তি করাতে নিয়ে গিয়েছিল, এবার টাকা দিয়েই তাকে ছাড়িয়ে আনতে পারবে।"

"ওঃ" বলে কন্স্টেবল এগিয়ে গেল।

"তুমি কি টাকা দিয়ে তাকে ছাড়াতে চাও—মানে এলিজাকে?" এগর মিখাইলোভিচ জিজ্ঞাসা করল।

"কি করে ছাড়াব? অত টাকা কোথায় পাব? তাছাড়া, এখন হয়তো দেরিও হয়ে গেছে..."

"সে তুমিই ভাল বুঝবে," এই কথা বলে নায়েবও পুলিশ কন্স্টেবলের পিছু নিলো।

ভূমিদাসের বাড়িব কাছে গিয়ে পুলিশ-কন্স্টেবল জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় সে?"

"এই তো এখানে," এগব মিখাইলোভিচ চুপি চুপি জবাব দিয়ে এফিমকে বলল, "এফিম, তুই তো সাহসী ছেলে, লণ্ঠনটা নিয়ে আগে আগে চল্।"

এফিম ইতিমধ্যেই মইয়ের মাথায় একটা তক্তা পেতে দিয়েছে। তার ভয়ও কেটে গেছে। এক এক বাবে সে দু'তিন ধাপ উঠে যেতে লাগল। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে কন্স্টেবলকে আলো দেখিয়ে চলল। কন্স্টেবলের পিছনে এগর মিখাইলোভিচ। তাবা সকলেই যখন উপরে উঠে গেল, দুত্লভ তখন একেবাবে নিচের ধাপে একটা পা রেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে থেমে গেল। দু'-তিন মিনিট পাব হয়ে গেল। উপরের ঘরে পায়ের শব্দও শোনা যাচ্ছে না। তারা নিশ্চয় মৃতদেহেব কাছে পৌঁছে গেছে।

ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে এফিম ডাকল, "ওরা তোমাকে ডাকছেন গো।"

দুত্লভ মই বেয়ে উঠতে লাগল। লণ্ঠনের আলোয় সকলের শবীরের উপরের দিকটা শুধু দেখা যাচ্ছে। তাদের পিছনে আর একজন কে দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে পিট রেখে। ঐ তো পলিকি। দুত্লভ থেমে গিয়ে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল।

পুলিশ-কন্স্টেবল বলল, "ওকে ঘুরিয়ে দাও!"

কেউ নড়ল না।

"এফিম, তুই তো সাহসী ছেলে," এগর মিখাইলোভিচ বলল।

"সাহসী" ছেলে একটা বরগা পেরিয়ে পলিকিকে ঘুরিয়ে দিলো, তার পাশে দাঁড়িয়ে খুশি মুখে একবার পলিকিব দিকে, একবার কন্স্টেবলের দিকে তাকাতে লাগল---কোনও তামাশা-প্রদর্শক ঠিক যে ভাবে একটি শ্বেতী প্রাণী বা "জুলিয়া পাস্ত্রানা"কে (অর্থ নারী অর্ধ বানরী) জনসমক্ষে দেখাবাব সময় একবার দর্শকদের দিকে, একবার জন্তুটির দিকে তাকায় ঠিক সেই ভাবে।

"আবার ঘুরিয়ে দাও।"

পলিকিকে আবার ঘুরিয়ে দেওয়া হলো; তার হাত দুটো একটু দুলছে, আর পা দুটো মেঝের বালির উপর হেচ্‌ড়ে গেল।

"ভাল করে ধরে নামিয়ে দাও।"

এগর মিখাইলোভিচ বলল, "দড়িটা কেটে দেব কি? একটা কুড়ুল নিয়ে আয় তো!"

পাহারাদার ও দুত্‌লভকে দু'বার বলায় তবে তারা কাজে হাত দিলো, কিন্তু "সাহসী ছেলে"টা এমনভাবে মৃতদেহটা ধরল যেন একটা মরা ভেড়াকে চেপে ধরেছে। দড়িটা কেটে শবটা নামিয়ে একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো। পরদিন ডাক্তার আসবে, এই কথা বলে কন্‌স্টেবল সকলকে বিদায় দিলো।

১৫

দুত্‌লভ বাড়ির দিকে চলল। তখনও তার ঠোঁট নড়ছে। প্রথমে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল; কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি হতেই সে ভাবটা কেটে গিয়ে ধীরে ধীরে খুশির মেজাজে মনটা ভরে উঠতে লাগল। গ্রামে ঢুকে গান ও মাতলামির শব্দ কানে এল। দুত্‌লভ কখনও মদ খায় না, এখনও সোজা বাড়ি চলে গেল। যখন বাড়িতে ঢুকল তখন অনেক রাত হয়েছে। তার বৌ ঘুমিয়ে পড়েছে। বড় ছেলে ও নাতিরা ঘুমিয়েছে স্টোভের উপরে, আর ছোট ছেলেটি ভাঁড়ার ঘরে। জেগে ছিল শুধু এলিজাব বৌ; একটা নোংরা জামা পরে খালি মাথায় সে বেঞ্চিতে বসে বসে কাঁদছিল। শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে এল না, কিন্তু আরও জোরে বিলাপ শুরু করে দিলো।

বুড়ি উঠে স্বামীর খাবার ব্যবস্থা করে দিলো। "হয়েছে, খুব হয়েছে!" বলে দুত্‌লভ এলিজার বৌকে সেখান থেকে তুলে দিলো। আক্‌সিনা সেখান থেকে এসে একটা বেঞ্চিতে শুয়ে কাঁদতে লাগল। খাওয়া হয়ে গেলে বুড়ি নীরবেই টেবিলটা পরিষ্কার করল। বুড়োও কোনও কথা বলল না। হাত-মুখ ধুয়ে দেয়ালের গজাল থেকে গণনা-যন্ত্রটি নামিয়ে নিয়ে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকল। সেখানে বুড়ো-বুড়ি চুপি চুপি কিছুক্ষণ কথা বলল; তারপর বুড়ি চলে গেলে স্ফটিকগুলোকে ঠকঠকিয়ে সে গুণতে শুরু করে দিলো। শেষ পর্যন্ত সিন্দুকের ডালাটা খুলে অনেক কষ্টে তার ভিতরে নেমে গেল। অনেকক্ষণ সেখানে কাটিয়ে যখন শোবার ঘরে গেল তখন বাড়িটা অন্ধকার। কাঠের আগুনটা নিভে গেছে। বুড়ি ঘুমের ঘোরে সশব্দে নাক ডাকাচ্ছে। এলিজার বৌটাও এতক্ষণে চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়েছে। দুত্‌লভ প্রার্থনা করল, হাই তুলল, এলিজার বৌয়ের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল, তারপর বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে আর একবার হাই তুলে স্টোভের উপর উঠে ছোট নাতিটার পাশে শুয়ে পড়ল। চিৎ হয়ে শুয়ে সে

মাথার উপরকার বরগাটার দিকে তাকাল; অন্ধকারে সেটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। দেয়ালে আরশুলাগুলোর শব্দ কানে আসছে; সকলের নিঃশ্বাস, নাকডাকা ও পায়ে পায়ে ঘসার শব্দও শোনা যাচ্ছে। কিছুতেই ঘুম আসছে না। চাঁদ উঠেছে। ঘরের ভিতরটা একটু আলো হলো। এক কোণে আক্‌সিনাকে দেখতে পেল, কিন্তু আর একটা জিনিস ঠিক বুঝতে পারল না : ওটা কি ছেলের কোট না একটা বালতি, না কি একটা লোক ওখানে দাঁড়িয়ে আছে? সে হয়তো ঝিমুচ্ছিল, আবার নাও হতে পারে : সে যাই হোক, অন্ধকারে সে চোখ মেলে তাকাল। যে শয়তান পলিকিকে এই ভয়ংকর কাজের পথে টেনে নিয়েছিল, যার উপস্থিতি সেদিন রাতে সব খুপড়ির বাসিন্দারাই অনুভব করেছিল, নিশ্চয় এখনও সে পাখা মেলে দিয়ে গ্রাম পার হয়ে এই বাড়িতে এসেছে, কারণ যে টাকার সাহায্যে সে পলিকিকে শেষ করেছে সেই টাকাটা যে আছে এই বাড়িতে। অন্তত দুত্‌লভ যেন তার উপস্থিতিকে অনুভব করল, কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। সে না পারছে ঘুমোতে, না পারছে উঠে পড়তে।..সহসা বুড়োর মনে হলো, কে একজন যেন জানালার পাশ দিয়ে চলে গেল। "ও কে? গ্রাম-প্রধান কি এত ভোবে এসেছে নোটিশ নিয়ে?" গলিতে পায়ের শব্দ শুনে ভাবল, "সে দরজা খুলল কেমন করে? তাহলে বুড়ি কি দরজায় হুড়কো তুলে দেয়নি?" উঠোনে কুকুরটা ডেকে উঠল। আর সে গলিতে পা ফেলে এগিয়ে আসতে লাগল, পরবর্তী কালে বুড়ো এই কথাই সকলকে বলেছিল; দরজার খোঁজে সে দেয়ালটা হাতড়াতে লাগল, একটা গামলায় ধাক্কা খেলো, সেটা ঝন্‌ঝন করে পড়ে গেল, আবার সে হাতড়ে হাতড়ে সিটকিনিটা খুঁজতে লাগল। বুড়োর সারা শরীর শিউরে উঠল। এবার সে সিটকিনিটা খুলে মানুষের রূপ ধরে ঘরে ঢুকল। দুত্‌লভ বুঝল, এ সেই। ক্রুশ-চিহ্ন আঁকতে চাইল, পারল না! টেবিলের কাছে গিয়ে সে ঢাকনাটাকে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্টোভের উপর উঠতে লাগল। বুড়ো চিনতে পারল, সে পলিকির রূপ ধরেছে। সে ভেংচি কাটল, তার হাত দুটো দুলতে লাগল। সে উঠে এল, বুড়োর উপর চেপে বসল, তার গলা টিপে ধরল।

"টাকাটা আমার।" পলিকি বিড় বিড় করে বলল।

"আমাকে ছেড়ে দাও! এমন কাজ আর করব না!" সেমিয়ন বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

পাহাড়ের মতো ভারী হয়ে পলিকি তার উপর চেপে বসল। দুত্‌লভ জানে, প্রার্থনা করলে সে চলে যাবে, আর কোন্ প্রার্থনাটা যে করা উচিত তাও সে জানে, কিন্তু কিছুই মুখ দিয়ে বের হলো না। পাশ থেকে নাতিটি আর্তনাদ করে কেঁদে উঠল। ঠাকুর্দা তাকে দেয়ালের গায়ে ঠেলে দিয়েছে। নাতির কান্না শুনে বুড়োর মুখ খুলল। বলল, "ঈশ্বর জাগুন!..." তার চাপটা কমে গেল! "তাঁর শত্রুরা দূর হয়ে যাক।" সে স্টোভ থেকে নেমে গেল। দুত্‌লভ শুনতে পেল তার দুটো পাই মেঝেতে পড়ল।

দুত্লভ যতগুলি স্তোত্র জানত সব পর পর আউড়ে গেল। সে টেবিলের পাশ দিয়ে দরজা পেরিয়ে এত জোরে দরজাটা বন্ধ করল যে সারা বাড়িটা কেঁপে উঠল। ঠাকুর্দা ও নাতি ছাড়া আর সকলেই ঘুমিয়ে রইল। ঠাকুর্দা কাঁপতে কাঁপতে স্তোত্র আওড়াতে লাগল, আর নাতি ঠাকুর্দার শরীর ঘেঁষে ঘুমোবার জন্য কাঁদতে লাগল। আবার সব চুপচাপ। দুত্লভের কানের কাছে দেয়ালের ওপাশে একটা মোরগ ডেকে উঠল। বুড়ো বিছানা থেকে উঠে জানালাটা খুলে দিলো। বাইরে অন্ধকার। রাস্তা কর্দমাক্ত। জানালার নিচেই গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে বুড়ো খালি পায়ে উঠোনে ঘোড়ার কাছে গেল। দেখেই বুঝল সে এখানেও দাঁড়িয়েছিল। সব দেখেশুনে বুড়ো ঘরে ফিরে গেল। বুড়ি জেগে উঠে কাঠের আগুনটা ধরিয়ে দিলো। "ছেলেরা সব উঠে পড়ো, আমি শহরে যাচ্ছি!" দেবমূর্তির নিচ থেকে মোমবাতিটা নিয়ে বুড়ো সেটা জ্বালাল, তারপর গর্তের ভিতবে পা দিয়ে মেঝের নিচে নেমে গেল। সে যখন উঠে এল তখন শুধু এ বাড়িতেই নয়, আশপাশের সব বাড়িতেই আলো জ্বলছে। ইগ্নাত গাড়িতে ঘোড়া জুত্ছে; ছোট ছেলে চাকায় তেল দিচ্ছে। বধূটি এখন আর কাঁদছে না। ফিট-ফাট হয়ে মাথায একটা শাল বেঁধে স্বামীকে বিদায় জানাতে শহরে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে।

বুড়োকে বড়ই গম্ভীর দেখাচ্ছে। কাউকে কিছু না বলে সে সব চাইতে ভাল কোটটা গায়ে দিলো, বেল্টটা কসে বাঁধল, পলিকির সব টাকা কোটের ভেতরে গুঁজে নিলো, তারপর এগর মিখাইলোভিচের কাছে গেল।

ছেলেকে বলে গেল, 'বৃথা সময় নষ্ট করো না; আমি এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসছি। সবাই তৈরি হয়ে থেকো।"

নায়েব সবে ঘুম থেকে উঠে চা খাচ্ছিল। নতুন সৈনিকদের পাঠাবার ব্যবস্থা করতে সে নিজেও শহরে যাবার জন্য তৈবি হচ্ছিল।

"কি চাই?" সে প্রশ্ন করল।

"এগর মিখাইলোভিচ, আমি টাকা দিয়ে ছেলেটাকে খালাস করে আনতে চাই। দয়া করে ব্যবস্থা করে দিন। সেদিন আপনি বলেছিলেন, শহরে কে একজন এতে রাজী আছে।...কি ভাবে কি করতে হবে বলুন; আমরা তো মুখ্খু লোক।'

"সে কি, তুমি তাহলে মত বদলেছ?"

"হ্যাঁ এগর মিখাইলোভিচ। ছেলেটার জন্য বড় দুঃখ হয়। আর যাই হোক, আমার ভাইয়ের ছেলে তো। সত্যি দুঃখ হয়! টাকাই অনেক অনর্থের কারণ। দয়া করে কি করতে হবে বলে দিন!" কোমর পর্যন্ত নিচু হয়ে সে অভিবাদন করল।

এগর মিখাইলোভিচ অভ্যাসমতোই অনেকক্ষণ ধরে চিন্তিতভাবে ঠোঁট চাটতে লাগল। তারপর ভাল করে ভেবেচিন্তে দুটো চিঠি লিখে শহরে গিয়ে কি করতে হবে, কেমন করে করতে হবে সব বুঝিয়ে বলে দিলো।

দুত্লভ বাড়ি ফিরে দেখল বৌটি ইগ্নাতের সঙ্গে ইতিমধ্যেই রওনা হয়ে গেছে। ফটকে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বেড়া থেকে একটা ছড়ি ভেঙে নিয়ে কোটটা গায়ে চাপিয়ে সে গাড়িতে উঠে বসল। ঘোড়ার পিঠে চাবুক পড়ল।

সারাটা সকাল দুত্লভ কি কি কাজ করল তার বিস্তারিত বিবরণ আমি দেব না। শুধু এইটুকুই বলব যে তার ভাগ্য ভাল। এগর মিখাইলোভিচ যার কাছে চিঠি দিয়েছিল তার হাতে একজন স্বেচ্ছা-সৈনিক মজুতই ছিল। লোকটা তার কাছে তেইশটি রৌপ্য রুবল ধারে, আর রিক্রুটিং-বোর্ড তাকে পাশও করেছে। তার মনিব চারশ' রৌপ্য রুবল চেয়েছে, আর শহরেই একজন ক্রেতা গত তিন সপ্তাহ ধরে তিনশ' দাম দিয়ে চলেছে। দুত্লভ অল্প কথায়ই ব্যবস্থা পাকা করে ফেলল। বাঁ হাতে লোকটির ডান হাতটা চেপে ধরে নিজের ডান হাতটা তুলে সে বলল, "তিনশ' পঁচিশে হবে কি?" মনিব হাত সরিয়ে নিয়ে চারশ'ই দাবী করতে লাগল। "তাহলে এতে হবে না? বুঝতে পেরেছি...সাড়ে তিনশ'ই হলো! রসিদ লিখে লোকটাকে এনে দাও। এই নাও দু'খানা দশ রুবলের নোট আগাম। হলো তো?"

বেল্ট খুলে দুত্লভ টাকা বের করল।

লোকটি এবার হাত টেনে নিলো না বটে, কিন্তু রাজীও হলো না। আগাম টাকাটাও নিলো না।

টাকাটা মেলে ধরে দুত্লভ বলতে লাগল, "পাপ করো না। একদিন তো সব্বাইকেই মরতে হবে।" সে এমন একখানা বক্তৃতা ঝাড়ল যে মনিব বলল, "ঠিক আছে, তাই হোক। ঈশ্বর তোমাকে সুদিন দিক।"

তারপর পবিচালকের আপিসে গিয়ে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে এগর মিখাইলোভিচেব সহায়তায় লোকটিকে সৈন্যদলে ভর্তি করানো হলো। তার পোশাক খুলে নতুন পোশাক পরিয়ে, দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে তাকে ঘর থেকে নিয়ে গেল; আর পাঁচ মিনিট পরে টাকাটা গুণে নিয়ে একটা রসিদ নিয়ে দুত্লভ বাসা-বাড়িতে ফিরে গেল; পক্রোভ্স্কের সব নতুন সৈনিক সেখানেই উঠেছে। এলিজা ও তার বৌ রান্নাঘরের এককোণে বসেছিল। বুড়ো ঘরে ঢুকলে তারা কথা থামিয়ে বিরূপ মুখে তার দিকে তাকাল। অভ্যাসমতো বুড়ো স্তোত্র আওড়াল, বেল্টটা খুলল, কাগজটা বের করল এবং বড় ছেলে ইগ্নাত ও এলিজার মাকে ডেকে আনল।

ভাই-পোর কাছে গিয়ে সে বলল, "পাপ করো না এলিজা। কাল রাতে তুমি আমাকে একটা কথা শুনিয়েছ।...তোমার প্রতি আমার দয়া-মায়া নেই? ভাই তোমাকে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিল সে কথা আমি ভুলিনি। আমার ক্ষমতা থাকলে কি তোমাকে পাঠাতাম? ঈশ্বর আমার ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছেন, তাই তোমাকে ফিরিয়ে আনতে পারলাম। এই নাও কাগজ; রসিদটাকে টেবিলের উপর মেলে ধরে নিজের শক্ত, ঝাঁকানো আঙুল দিয়ে সেটাকে সমান করতে লাগল।

পক্রোভস্কের চাষীরা, সরাইওলার লোকরা, এমন কি কিছু বাইরের লোকও সেখানে জমা হলো। সকলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারল, কিন্তু কেউ বুড়ো মানুষটার কথায় বাধা দিলো না।

"এই নাও কাগজ! এর জন্য আমাকে চার শ' রৌপ্য রুবল দিতে হয়েছে। তোমার জেঠাকে দোষ দিও না।"

এলিজা উঠে দাঁড়াল। কি বলবে বুঝতে পারছে না। তার ঠোঁট দুটি আবেগে কাঁপছে। তার মা এসে পাশে দাঁড়াল। বুড়ি হয়তো কেঁদেই ফেলত, কিন্তু দুত্‌লভ ইসারায় তাকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে আবার বলতে লাগল।

"কাল তুমি আমাকে একটা কথা শুনিয়েছ। সে কথা ছুরির মতো আমার বুকে বিঁধেছে! তোমার বাবা মরবার সময় তোমাকে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিল; সেই থেকে তুমি আমার নিজের ছেলের মতোই আছ। তোমার প্রতি যদি কোনও অন্যায় করে থাকি, তাহলে সে পাপ আমাদের সকলের উপরেই বর্তাবে। এই তোমার নিজের মা, এই তোমার বৌ, তাদের সামনেই এই নাও তোমার ছাড়-পত্র! টাকাব জন্য আমার কোনও দুঃখ নেই, শুধু খৃস্টের নামে আমাকে ক্ষমা করো!'

তারপর কোটের কোণা তুলে সে ইচ্ছা করে হাঁটু ভেঙে বসে এলিজা ও বৌয়ের সামনে মাথাটা নোয়াল। ওরা তাকে বাধা দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু মাটিতে মাথা না ঠেকিয়ে সে উঠল না। তারপর কোটের কোণা ঝেড়ে সে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসে পড়ল। এলিজার মা ও বৌ আনন্দে চেঁচামেচি শুরু করে দিলো, সমবেত সকলেই দুত্‌লভের প্রশংসা করতে লাগল। একজন বলল, "এই তো সঠিক কাজ, ভালমানুষের কাজ।" আর একজন বলল, 'টাকা কি? টাকা দিয়ে তো মানুষকে কেনা যায় না।" তৃতীয় জন বলল, "বড়ই সুখের কথা। সে যে সৎ লোক সে বিষয়ে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না!" শুধু যে চাষীরা সৈনিক হয়ে যাচ্ছে তারাই কিছু বলল না; নিঃশব্দে সেখান থেকে চলে গেল।

দু'ঘণ্টা পরে দুত্‌লভ পরিবারের সকলকে নিয়ে দুটো গাড়ি শহর ছাড়িযে ছুটে চলল। এক গাড়িতে বুড়ো ও ইগ্‌নাত। অপর গাড়িতে বসে আছে এলিজার মা ও বৌ। বৌয়ের হাতে এপ্রনের তলায় একটা ভদ্‌কার বোতল। এলিজা ঘোড়ার দিকে পিঠ দিয়ে রুটি চিবুচ্ছে আর অবিরাম কথা বলছে।

শহর পার হয়ে কিছুদূর এগিয়েই তারা একদল নবনিযুক্ত সৈন্যকে দেখতে পেল। একটা শুঁড়িখানার সামনে তারা গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি নবনিযুক্ত সৈনিক প্রাণপণে "বলালেইকার" সুর বাজিয়ে চলেছে; তার মাথার অর্ধেকটা কামানোর দরুন তাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে; আর একটি সৈনিকও খালি মাথায় একটা ভদ্‌কার বোতল হাতে নিয়ে ঘেরা জায়গাটার মাঝখানে নাচছে! ইগ্‌নাত ঘোড়া থামাল; দুত্‌লভরা সকলেই কৌতূহলের সঙ্গে মজা করে নাচ দেখতে লাগল। নাচিয়ে সৈনিকটির কারও

দিকে নজর নেই; সে যখন বুঝল যে নাচ দেখবার জন্য ভিড় বেড়েছে এবং সকলেই নাচের তারিফ করছে, তখন সে আরও জোরে নাচতে শুরু করল।...তার তালে তালে বাজাতে গিয়ে "বলালেইকা"-বাদকটি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল; অলস দৃষ্টিতে চারিদিক তাকিয়ে সে একটা ভুল তারে ঠেকা দিলো। আর তার পরেই হঠাৎ দুই হাত মুঠো করে বাজনার উপর ঠুকে দিলো; নাচও বন্ধ হয়ে গেল।

দুত্‌লভকে দেখিয়ে সে নাচিয়েকে বলল, "আরে আলিওখা, ঐ তো তোমার ধর্মবাপ।

"কোথায়? এসো তো বন্ধু আমার!" আলিওখা চেঁচিয়ে বলল। এই সৈনিকটিকেই দুত্‌লভ ভাই-পোর বদলে কিনে নিয়েছিল। ভদ্‌কার বোতলটা মাথার উপর ধরে টলতে টলতে সে গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। "মালিক! প্রিয়তম বন্ধু আমার! সত্যি, কী আনন্দের কথা!" বলতে বলতে টলতে টলতে সে গাড়ির উপর ঝুঁকে পড়ল, সকলের দিকে ভদ্‌কার গ্লাস বাড়িয়ে দিলো। পুরুষরা খেলো, মেয়েরা নিল না। বুড়িদের জড়িয়ে ধরে সে বলে উঠল, "বান্ধবী গো, তোমাকে কি দেব?"

একটা স্ত্রীলোক ভিড়ের মধ্যে খাবার জিনিস বিক্রি করছিল। আলিওখা তার ঝুড়িটা টেনে নিয়ে গাড়ির মধ্যে ঢেলে দিলো।

"ভয় নেই রে বেটী! আমি দাম দিয়ে দেব," অশ্রুভেজা গলায় সে চেঁচিয়ে বলল; পকেট থেকে একটা থলে বের করে মিশ্‌কার দিকে ছুঁড়ে দিলো।

গাড়ির উপর কনুইতে ভর দিয়ে ভেজা চোখে তাকিয়ে সে বলল, "মা কে..তুমি? আমি তোমাকেও কিছু দেব।"

এক মুহূর্ত কি ভেবে পেকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ভাঁজ কবা নতুন রুমাল বের করল, কোটের নিচ থেকে কোমরে জড়ানো ওড়নাটা বের করল, গলায় জড়ানো স্কার্ফটাও খুলে হাতে নিলো, তারপর সবগুলোকে দলা পাকিয়ে বুড়ির কোলের উপর ছুঁড়ে দিলো।

"এই নাও! সব তোমাকে দিয়ে দিলাম," কথা বলতে বলতেই তার গলাটা ধরে এল।

"এসব কেন দিচ্ছ? তোমাকে ধন্যবাদ বাবা!" বুড়ি বলল। ততক্ষণে দুত্‌লভ এসে গাড়ির কাছে দাঁড়িয়েছে। তাকে দেখে বুড়ি বলল, "দেখো, ছেলেটা কত সরল!"

সৈনিকটি বিড় বিড় করে বলতে লাগল, "তোমার জন্যই আমি চলে যাচ্ছি, তোমার জন্যই আমি মরতে চলেছি! তাই তোমাকে এগুলো উপহার দিলাম।"

ভিড়ের মধ্যে কে একজন বলল, "নিশ্চয় ওরও মা আছে! কী সরল মানুষ। কী দুঃখের কথা।"

আলিওখা মাথা তুলল।

বলল, "আমার মা আছে। বাবাও আছে। সকলেই আমাকে ত্যাগ করেছে।"

এলিজার মায়ের হাতটা ধরে সে বলতে লাগল, "আমার কথাগুলি শোনো বুড়িমা। আমি তোমাকে উপহার দিয়েছি। খৃস্টের দোহাই, আমার কথা শোনো! ভ্‌দনু গাঁয়ে গিয়ে বুড়ি কিকোনভ্‌নার খোঁজ করো—সেই আমার মা, বুঝলে? শেষ দিক থেকে তিন নম্বর বাড়ি, নতুন কুয়োর ধারে সেই বুড়ি নিকোনভ্‌নার সঙ্গে দেখা করো। তাকে বলো, আলিওখা—তাব ছেলে বুঝলে তো ..আরে, বাজনাদার! বাজাও জোরসে বাজাও!" সে আবার চিৎকার করে বলে উঠল।

পরমুহূর্তেই কি যেন বলতে বলতে সে নাচতে শুরু করে দিলো; বাকি ভদ্‌কাসুদ্ধু বোতলটা মাটিতে ছুঁড়ে দিলো।

ইগ্‌নাত গাড়িতে উঠে চলতে শুরু করল।

জোব্বাটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে বুড়ি বলল, "বিদায়! ঈশ্বর তোমার ভাল করুন!"

আলিওখা হঠাৎ থেমে গেল।

দুই হাত মুঠ করে ভয়ংকরভাবে চিৎকাব কবে উঠল, "তোমবা উচ্ছন্নে যাও! তোমার মা যেন..."

ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে এলিজার মা বলল, "হায় প্রভু।"

ইগ্‌নাত লাগামে হাত দিলো; গাড়ি গব্‌গব্ কবে চলতে শুরু করল। দুই হাত মুঠ করে অগ্নি-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আলিওখা রাস্তাব মাঝখানে দাঁড়িয়ে চাষীদেব যাচ্ছেতাই করে গালাগালি করতে লাগল।

"এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? চলে যাও শয়তানের দল। রাক্ষসের দল!...আমার হাতে তোমাদের রেহাই নেই! শয়তানের চেলা!"

গলা দিয়ে আর কথা বেব হলো না; যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই সে সপাটে মাটির উপর আছড়ে পড়ল।

খোলা মাঠের মধ্যে পৌঁছে দুলভরা পিছন ফিরে তাকাল; ভিড়টা চোখে পড়ল না। ধীর গতিতে চার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে ইগ্‌নাত গাড়ি থেকে নেমে এলিজার গাড়ির পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। তার বাবা গাড়িতেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

দু'জনে মিলে শহর থেকে আনা বোতলটা শেষ কবল। কিছুক্ষণ পরে এলিজা একটা গান ধরল, মেয়েরাও গলা মেলালো, আর ইগনাত মাঝে মাঝে তাল দিতে লাগল। একটা ডাক-গাড়ি পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। দুটো হুল্লোড়-ভর্তি গাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে কোচয়ান ঘোড়া দুটোকে খিস্তি করল, আর ডাকের ছোকরাটা পিছন ফিরে পুরুষ ও নারী সকলকে চোখ মারতে লাগল। ভিতরকার যাত্রীরা গাড়ির ঝাঁকুনিতে টলতে টলতে মুখ লাল কবে ফূর্তিতে গান কবতে করতে এগিয়ে চলল।

—১৮৬২

সেবাস্তোপল-এর কাহিনী

Tales of Sevastopol

॥ সেবাস্তোপল ডিসেম্বর ॥

সাপুন পাহাড়েব মাথায় আকাশের গায়ে সবে সকালের রং লাগতে শুরু করেছে; সাগবের গাঢ় নীল ও বুকের উপর থেকে রাতের অন্ধকার সরে গেছে, প্রথম সূর্য-কিরণে কতক্ষণে তার বুকটা খুশিতে ঝিলমিল করে উঠবে, সমুদ্র যেন তার জন্যই অপেক্ষা করে আছে; উপসাগরের দিক থেকে একটা ঠাণ্ডা কুয়াশা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে; কোথাও বরফ নেই—চারদিক অন্ধকার, কিন্তু সকাল বেলাকার নরম তুষার গালে যেন হুল ফুটিয়ে দেয়, তার উপর পা পড়লে মচ্‌মচ্‌ শব্দ ওঠে; কেবলমাত্র সমুদ্রেব দূরাগত অবিরাম কলধ্বনি সকাল বেলাকার শান্তিকে বিঘ্নিত করছে, আর তাকেও ছাপিয়ে মাঝে মাঝে কানে আসছে সেবাস্তোপল-এর কামানের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি। জাহাজগুলো থেকে ভেসে আসছে আটটি ঘণ্টার দূরাগত শব্দ।

উত্তর দিকে রাতের শান্ত স্তব্ধতার বুকে ধীরে ধীরে শুরু হচ্ছে দিনের কর্মচাঞ্চল্য : এখানে একদল সৈনিক বন্দুকের খট্‌খট্‌ আওয়াজ তুলে মার্চ করে চলেছে রক্ষীদলকে ছুটি দিতে; ওখানে, ডাক্তার দ্রুত পায়ে চলেছে হাসপাতালে; একটি সৈনিক কোনওক্রমে ভূগর্ভস্থ কুঠুরি থেকে বেরিয়ে এসে ববফ-জলে ব্রোঞ্জ-রঙের মুখটা ধুয়ে ঊষার রক্তিমাভায় রঞ্জিত পূবের দিকে মুখ করে প্রার্থনা করছে আর অতি দ্রুত ক্রুশ-চিহ্ন আঁকছে; একটা উঁচু ভারি উট-টানা "মাজারা" জমাট রক্তাক্ত শবদেহে মাথা পর্যন্ত বোঝাই হয়ে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ তুলে কবরখানার দিকে চলেছে সেগুলিকে কবর দিতে। জাহাজঘাটার দিকে এগিয়ে যান—কয়লা, সার, স্যাঁতা ও মাংসের একটা জাহাজঘাটার দিকে এগিয়ে যান—কয়লা, সার, স্যাঁতা ও মাংসের একটা পাঁচ-মিশেলি গন্ধ আপনার নাকে লাগবে। জ্বালানি কাঠ, মাংস, চাটাই, বস্তা বস্তা ময়দা, লোহা, প্রভৃতি হাজার রকমের জিনিস জাহাজঘাটায় ডাঁই করে রাখা হয়েছে; বিভিন্ন রেজিমেন্ট থেকে আগত সৈন্যরা কেউ বস্তা ও বন্দুক হাতে, কেউ বা খালি হাতে সেখানে ভিড় জমিয়েছে; ধূমপান করছে, দিব্যি করছে, জাহাজঘাটায় দাঁড়িয়ে থাকা স্টিমারে ভারি ভারি বোঝা তুলছে; সৈনিক, নাবিক, বণিক ও মেয়ে-ছেলেতে বোঝাই হয়ে নৌকোগুলো আসছে আর যাচ্ছে।

"গ্রাফস্কায়াতে যাবেন না কি হুজুর? আসুন, আমি নিয়ে যাচ্ছি।" দু'তিনজন

অবসরপ্রাপ্ত নাবিক নৌকোর উপর দাঁড়িয়ে আপনাকে সাহায্য করবার জন্য হাঁক দিতে থাকবে।

সব চাইতে কাছের নৌকোটা বেছে নিন, নৌকোর পাশে কাদার মধ্যে দাঁড়ানো হাড়-জিরজিরে ঘোড়াটার উপর পা দিয়ে নৌকোতে চেপে হালের পাশে আপনার আসনে বসে পড়ুন। তীর ছেড়ে জলে ভাসলেন। এবার আপনার চারদিকেই সমুদ্র, সকাল বেলাকার সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। আপনার মুখোমুখি বসে উটের লোমের কোট-পরা একটি বুড়ো নাবিক, আর একটা জোয়ান ছেলে নীরবে দাঁড় টেনে চলেছে। আপনার চোখে পড়বে উপসাগরের বুক জুড়ে ছড়ানো অনেক জাহাজের ডোরা-কাটা মস্ত বড় খোল, আর রোদ-ঝিলমিল সাগরের বুকে চলমান কালো বিন্দুর মতো ছোট ছোট অনেক নৌকো; ওপারে দেখতে পাবেন সকাল বেলাকার রোদে রক্তিমাভ সুন্দর সুন্দর সব বাড়িঘর; জাহাজগুলোকে ঘিরে উচ্ছ্বসিত ফেনার সাদা স্রোত আর ডুবন্ত জাহাজের বেরিয়ে-থাকা কালো কালো সব মাস্তুল; স্ফটিকস্বচ্ছ দিগন্তের বুকে শত্রুপক্ষের নৌবহর আর দাঁড়ের ওঠা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফেনায়িত জলস্রোত ও নৃত্যপর জলকণাও আপনার চোখে পড়বে। শুনতে পাবেন দাঁড়গুলোর তালে তালে ওঠা-নামার শব্দ, জলের উপর দিয়ে ভেসে আসা অনেক কণ্ঠস্বর আর সেবাস্তোপল-এর ক্রমবর্ধমান কামান-গর্জনের গম্ভীর আওয়াজ।

আপনি যে সেবাস্তোপল-এ আছেন এই চিন্তাই আপনার মনকে সাহসে ও গর্বে ভরে তুলবে; আপনার শিরায় শিরায় রক্তের গতি দ্রুততর হবে।

"কিস্তোন্তিন (কন্সট্যান্টাইন)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছি হুজুর", বুড়ো নাবিকটি আপনাকে ডেকে বলবে আর তারপরেই মুখ ঘুরিয়ে দেখবে আপনি হালটা ঠিক মতো ধরে আছেন কি না।

যেতে যেতেই জাহাজটার দিকে তাকিয়ে ছেলেটা বলবে, "এ জাহাজের সবগুলো কামানই ঠিক আছে এখনও!"

সে দিকে তাকিয়ে বুড়োও বলে উঠবে, "তা তো নিশ্চয়ই আছে। জাহাজটা নতুন। ওটাতেই তো কর্নিলভ থাকত।"

"ঐ যে! ঐ যে ওখানে ফাটল।" অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পরে দক্ষিণ উপসাগরের বুকে হঠাৎ একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখে এবং পরক্ষণেই বোমা ফাটার একটা প্রচণ্ড শব্দ শুনে ছেলেটা চেঁচিয়ে উঠল।

অবিচলিতভাবে দুই হাতে থুথু ছিটিয়ে বলল, "আজ দেখছি সে নতুন কামান থেকে গোলা ছুঁড়ছে। এই মিশ্‌কা, বুক চিতিয়ে টান্‌। ওই বজরাটাকে ছাড়িয়ে যেতে হবে।" আর অমনি আপনার নৌকোটা উপসাগরের জল কেটে আরও দ্রুত ছুটতে থাকবে এবং সত্যি সত্যি ভারি বজরাটাকে পেরিয়ে গ্রাফ্‌স্কায়া জাহাজঘাটায় নোঙর-করা এক ঝাঁক নৌকোর ভিতর দিয়ে সোজা বেরিয়ে যাবে।

জাহাজঘাটায় একদঙ্গল খাকি পোশাকেব সৈনিক, কালো পোশাকের নাবিক ও নানা রঙের পোশাক-পবা মেয়েছেলের ভিড়। মেয়েরা সাদা "রোল" বিক্রি করছে, আর ফুটন্ত সামোভারের পিছনে দাঁড়িয়ে রুশ মুঝিকরা চেঁচিয়ে বলছে, "গরম গরম দাও!" আব ঠিক সেখানেই জাহাজঘাটার পাশে ছড়িয়ে পড়ে আছে মবচে-ধরা কামানের গোলা, গুলি, ও লোহার কামান। আরও কিছুটা দূরে একটা মস্ত বড় খোলা জায়গায় অসংখ্য বরগা, কামানের গাড়ি, আর ঘুমন্ত সৈনিকরা পড়ে আছে; ঘোড়া, গাড়ি, কামানের অংশ, সবুজ রং-করা বারুদের গাড়ি ও গাদা-করা বন্দুকের সারি; সৈনিক, নাবিক, কর্মচারি, নাবী, শিশু ও বণিকবা জলস্রোতের মতো চলেছে; খড়, বস্তা ও পিপে বোঝাই গাড়ি চলেছে চাকায় শব্দ তুলে; মাঝে মাঝেই কোনও কসাক ও অফিসার চলেছে ঘোড়ায় চেপে, কখনও বা একজন সেনাপতি যাচ্ছে 'ড্রস্কি'-তে চেপে। ডানদিকের রাস্তাটায় একটা অবরোধপ্রাচীর সৃষ্টি করা হয়েছে; তাব ভিতরকার ছিদ্রপথে ছোট ছোট বন্দুক মুখ বের কবে আছে, আর পাশে বসে একটি নাবিক পাইপ টানছে। বাঁদিকে একটা সুন্দর বাড়ি; তার গাড়ি-বারান্দার মাথায় বোমক সংখ্যায় সন লেখা; বাইবে রক্তমাখা স্ট্রেচার নিয়ে সৈনিকরা অপেক্ষা কবছে—সর্বত্রই সামরিক শিবিবেব অপ্রীতিকব চিহ্ন ছড়ানো। প্রথমেই আপনার মনে জাগবে একটা অপ্রীতিকর অনুভূতি : শিবির শহর-জীবনের, সুন্দর শহব ও নোংরা খোলা ময়দানের একটা বিচিত্র সংমিশ্রণ—যা সুন্দব তো নয়ই বরং বিশৃঙ্খলার একটি পীড়াদায়ক অবস্থা; মনে হবে সকলেই যেন আশংকিত, কি কববে বুঝতে না পেরে লক্ষ্যহীনভাবে ছুটোছুটি করছে। কিন্তু আপনাব চারপাশের চলমান লোকগুলোর মুখের দিকে যদি ভাল করে তাকান তাহলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কিছু দেখতে পাবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সেনাদলের মালপত্রবহনকারী দলের এই সৈনিকটির দিকে তাকান; এমন নির্বিকারভাবে গুনগুন করতে করতে সে তিনটে ঘোড়াকে জল খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছে যে তাকে দেখলেই আপনার মনে হবে, এই বিচিত্র ভিড়ের মধ্যে সে তার নিজের কাজ তো ঠিক মতো করবেই, উপরন্তু যেন সব ব্যাপারটাই তুলা অথবা সারানস্ক-এ ঘটছে এমনি শান্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অবিচলিতভাবে সে তার কর্তব্য করে যাবে—তা সে ঘোড়াকে জল খাওয়ানোই হোক, আর বন্দুক পরিষ্কার করাই হোক। যে অফিসার নিপাট সাদা দস্তানা পরে ঘুবে বেড়াচ্ছে, যে নাবিকটি অবরোধ-প্রাচীরের পাশে বসে পাইপ টানছে, সে সৈন্যরা প্রাক্তন পরিষদ ভবনের সামনে স্ট্রেচার নিয়ে অপেক্ষা করছে, আর যে তরুণীটি গোলাপী ফ্রকের কুঁচিতে ময়লা লাগবার ভয়ে একটা পাথর থেকে আর একটা পাথরে পা ফেলে ফেলে রাস্তাটা পার হচ্ছে,—তাদের সকলের মুখেই ওই একই ভয়ের প্রকাশ আপনি দেখতে পাবেন।

হ্যাঁ, প্রথম দর্শনে সেবাস্তোপল আপনাকে নির্ঘাৎ হতাশ করবে। লোকজনের মুখে উদ্বেগ বা আতংকের চিহ্ন, মৃত্যু বা দৃঢ় সংকল্পের প্রস্তুতি বৃথাই খুঁজে বেড়াবেন—সে

সব কিছুই আপনি দেখতে পাবেন না। আপনি দেখতে পাবেন, সাধারণ সব মানুষ সাধারণ কাজকর্ম নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে; অতিউৎসাহের জন্য আপনি নিজেকেই অপরাধী মনে করবেন; আর "নর্থ সাইড" সম্পর্কে যে সমস্ত কাহিনী, বিবরণ, দৃশ্য ও শব্দ আপনি শুনেছেন এবং দেখেছেন এবং তা থেকে সেবাস্তোপল রক্ষাকারীদের সম্পর্কে আপনার মনে যে ছবি গড়ে উঠেছে সে সবই সত্য কিনা সে বিষয়ে আপনার মনে সন্দেহ দেখা দেবে। কিন্তু সেই সন্দেহে অভিভূত হবার আগেই একবার চলে যান দুর্গের ভিতরে, সেবাস্তোপল-রক্ষাকারীদের দেখে আসুন সেই সব জায়গায় যেখানে তারা রক্ষার কাজে নিযুক্ত আছে, অথবা আরও ভাল হয় যদি আপনি রাস্তার ওপরে সেই বাড়িটায় চলে যান যেটা একসময় ছিল পরিষদ ভবন আর এখন যেখানে সৈন্যরা স্ট্রেচার নিয়ে অপেক্ষা করছে; সেখানে দেখতে পাবেন সেবাস্তোপল-রক্ষাকারীদের; দেখতে পাবেন এমন দৃশ্য যা বীভৎস ও বিষণ্ণ, যা মহত্ত্বে ও আমোদে ভরা, কিন্তু বিস্ময়কর ও উদ্দীপনাময়।

পরিষদ ভবনের বড় ঘরটায় ঢুকে যান। দরজাটা খোলামাত্রই আপনি চমকে উঠবেন—চল্লিশ বা পঞ্চাশটি রোগীকে সামনে দেখতে পাবেন, তাদের গন্ধ আপনার নাকে আসবে—তাদের মধ্যে কারও অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছে, কেউ বা মারাত্মকভাবে আহত—কেউ খাটিয়ায় শুয়ে আছে, কিন্তু বেশীর ভাগই মেঝেতেই পড়ে আছে। যে অনুভূতিটা আপনাকে চৌকাঠের উপরেই আটকে রাখতে চাইবে তার কথায় কান দেবেন না—সেটা বড় অশুভ অনুভূতি— সোজা ভিতরে ঢুকে যান, যারা কষ্ট পাচ্ছে তাদের দেখতে এসেছেন বলে লজ্জা পাবেন না, তাদের কাছে গিয়ে গল্প করতেও লজ্জা পাবেন না : এই সব হতভাগ্যরা দরদী মানুষের মুখ দেখতে চায়, করুণা ও সহানুভূতির কথা শুনতে চায়। দুই সারি শয্যার মাঝখান দিয়ে হেঁটে যান, এমন একটি মুখ খুঁজে বের করুন যেটা তত কঠিন ও বেদনাদীর্ণ নয়, আর সাহস করে তার সঙ্গেই আলাপ শুরু করে দিন।

"আপনার কোথায় আঘাত লেগেছিল," কৃশকায় বৃদ্ধ সৈনিকটিকে সংকোচ ও ভীরুতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করুন; নিজের খাটিয়া থেকে সদয় চোখ মেলে সে আপনাকেই দেখছিল, মনে হচ্ছিল সে বুঝি আপনাকে কাছে ডাকছে। "ভীরুতার সঙ্গে" কথাটা ব্যবহার করলাম কারণ যে কারণেই হোক কারও দুঃখ দেখলে শুধু যে গভীর সমবেদনা জাগে তাই নয়, তাকে আঘাত করবার আশংকাও দেখা দেয়, তার প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরে ওঠে।

সে জবাব দেবে, 'পায়ে''; কিন্তু কম্বলের ভাঁজটা দেখেই আপনি বুঝতে পারছেন যে তার একটা পা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। সে আরও বলবে, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এখন আমি ভাল আছি। কবে আমাকে ছেড়ে দেবে তারই অপেক্ষায় আছি।"

"আপনি কি অনেক দিন আগে আহত হয়েছিলেন?"

"প্রায় ছ' সপ্তাহ আগে হুজুর।"

"আচ্ছা, এখনও কি ব্যথা আছে?"

"না, এখন আর ব্যথা লাগে না। ভাল হয়ে গেছে। শুধু আবহাওয়াটা খারাপ হলে পায়ের ডিমটায় ব্যথা হয়; নইলে আর সব ঠিক আছে।"

"আঘাতটা কেমন করে লেগেছিল?"

প্রথম বোমাবর্ষণের সময় ৫ নম্বর দুর্গে ঘটনাটা ঘটেছিল। বন্দুক নিয়ে পরবর্তী দুর্গের দিকে যাচ্ছিলাম এমন সময় সে আমার পায়ে আঘাত করল। মনে হলো, আমি যেন একটা গর্তের মধ্যে ছিটকে পড়লাম। চেয়ে দেখি আমার পাটা চলে গেছে।"

"প্রথম মুহূর্তেই কোনও যন্ত্রণা বোধ করেননি?"

"না, তা করিনি। শুধু মনে হয়েছিল, একটা গরম কিছু যেন আমার পায়ে চাবুক মারল।"

"আচ্ছা, তারপর?"

"পরেও সে রকম কোনও কষ্ট হয়নি, তবে ওরা যখন চামড়াটা তুলে ফেলে তখন কষ্ট পেয়েছিলাম। তখন খুব খারাপ লেগেছিল। কি জানেন হুজুর, আসল কথা হলো ভাবনা-চিন্তা না করা। চিন্তা করবেন না, তাহলেই সব ঠিক থাকবে। চিন্তা করলেই যত গোলমাল।"

এই সময় ডোরা-কাটা ধূসর পোশাক ও কালো রুমাল পরা একটি স্ত্রীলোক এসে আপনাদের আলোচনায় যোগ দেবে। সেই আপনাকে নাবিকটির সব কথা বলবে, তার দুঃখ-কষ্ট, চার সপ্তাহ ধরে তার সংকট-অবস্থার কথা। আহত অবস্থায়ও স্ট্রেচার-বাহকদের থামিয়ে আমাদের গোলন্দাজ-বাহিনীর মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণ সে দেখেছিল; গ্র্যান্ড ডিউক তার সঙ্গে দেখা করে তাকে পঁচিশ রুবল দিয়েছিল, সে বাহকদের বলেছিল তাকে দুর্গে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে যাতে নিজে যুদ্ধে যোগ দিতে না পারলেও তরুণ সৈনিকদের দরকারী পরামর্শ দিতে পারে—এ সব কথাই স্ত্রীলোকটি আপনাকে এক নিঃশ্বাসে বলে যাবে; কখনও আপনার দিকে তাকাবে, কখনও নাবিকটির দিকে। নাবিকটি কিন্তু সে সব কথায় কান না দিয়ে বালিশের তলা থেকে একটুকরো পরিষ্কার কাপড় বের করবে আর স্ত্রীলোকটির চোখ দুটি খুসিতে চকচক করে উঠবে।

কিছুটা ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে নাবিক বলবে, "ও আমার বৌ হুজুর?" যেন সে বলতে চায়.: "ওর কথায় কিছু মনে করবেন না। আপনি তো জানেন, মেয়েরা ওরকম আবোলতাবোল বকেই থাকে।"

এবার আপনি সেবাস্তোপল এর রক্ষকদের চিনতে শুরু করবেন, আর লোকটির সামনে কিছুটা বিবেকের তাড়না অনুভব করবেন। আপনার সহানুভূতি ও প্রশংসাকে প্রকাশ করবার ইচ্ছা হবে, কিন্তু কথা খুঁজে পাবেন না, আর পেলেও সে সব কথাকে যথোপযুক্ত বলে মনে হবে না; ফলে এই লোকটির নির্বাক, অজ্ঞাত মহত্ত্ব ও

কষ্টসহিষ্ণুতার সামনে, নিজের গুণকীর্তন শুনে তার এই বিব্রত অবস্থা দেখে আপনিও নিঃশব্দে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

"আচ্ছা, ঈশ্বর আপনাকে দ্রুত নিরাময় করে তুলুন", এই কথা বলে আপনি আর একটি রোগীর কাছে যাবেন। সে রোগীটি মেঝেয় শুয়ে আছে; দেখে মনে হবে, তীব্র যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে সে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে।

লোকটির মাথাভর্তি চুল; মুখটা ফোলা ফোলা ও ফ্যাকাসে। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে; বাঁ হাতটা এমনভাবে পিছনে রাখা আছে যাতে বোঝা যায় সে খুব কষ্ট পাচ্ছে। শুকনো মুখের ফাঁক দিয়ে অনেক কষ্টে শাঁ-শাঁ করে নিঃশ্বাস ফেলছে, সিসে-রঙ চোখ দুটি উপর দিকে তাকিয়ে আছে, আর কম্বলের ভাঁজ দেখেই বোঝা যাচ্ছে ডান হাতটাকে কেটে বাদ দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে রাখা হয়েছে। পচা মাংসের দুর্গন্ধ তীব্রভাবে আপনার নাকে আসবে, আর যে ক্ষয়কারী জ্বরের তাড়নায় রোগীর সর্ব অঙ্গ কাঁপছে তা বুঝি আপনার দেহেও কাঁপন ধরিয়ে দেবে।

আপনাকে একান্ত প্রিয়জন মনে করে সেই স্ত্রীলোকটি পিছন পিছন এসে আপনার দিকে মমতাভরা চোখে তাকালে আপনি তাকেই প্রশ্ন করবেন, "লোকটি কি অজ্ঞান হয়ে আছে?"

"না, সে এখনও শুনতে পাবে," বলেই সে ফিস্‌ফিস্ করে বলবে, "কিন্তু ওর অবস্থা খুব খারাপ। আজ ওকে একটু চা দিয়েছিলাম—অপরিচিত হলেও বড় করুণা হয়েছিল—কিন্তু চা-টা ও গিলতেই পারেনি।"

"কেমন আছেন?" আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করবেন।

আপনার কথা শুনে আহত লোকটির চোখ দুটি ঘুরতে থাকবে, কিন্তু সে আপনাকে দেখতেও পাবে না, আপনার কথাও বুঝতে পারবে না।"

"আমার বুকটা জ্বলে যাচ্ছে।"

আরও একটু দূরে দেখতে পাবেন একটি বুড়ো সৈনিক শার্টটা পাল্টাচ্ছে, তার মুখ ও শরীরের রং ফ্যাকাসে হয়ে গেছে; দেহটা অস্থিচর্মসার। একটা হাত নেই, একেবারে কাঁধের কাছ থেকে কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। বেশ ভালভাবেই বসে আছে; সেরেও উঠেছে; কিন্তু তার নিষ্প্রাণ অনুজ্জ্বল চোখ, তার ভয়ংকরভাবে শুকিয়ে যাওয়া শরীর, আর মুখভর্তি গভীর বলি-রেখা দেখলেই বোঝা যায় যে বেচারির জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলিই কেটেছে তীব্র যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে।

উল্টো দিকে একটা খাটিয়ায় দেখতে পাবেন একটি স্ত্রীলোকের যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখ, সে মুখে মৃত্যুর পাণ্ডুরতা, দুটি গাল জ্বরের জ্বালায় রক্তিমাভ।

গাইড আপনাকে বলে দেবে, "এটি জনৈক নাবিকের স্ত্রী। ওর স্বামীর খাবার নিয়ে দুর্গের ভিতর যাবার সময় ওর পায়ে গোলা লেগেছিল।"

"পা-টা কি কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে?"

"হ্যাঁ, ঠিক হাঁটুর উপর থেকে।"

এবার, আপনার স্নায়ু যদি যথেষ্ট শক্ত হয়, তাহলে বাঁ দিকের দরজা দিয়ে সেই ঘরটায় ঢুকুন যেখানে ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধা হয় এবং অস্ত্রোপচার করা হয়। সেখানে দেখতে পাবেন, কনুই পর্যন্ত রক্তমাখা হাতে বিবর্ণ অথচ কঠোর মুখে সার্জনরা খাটিয়ার উপরে ক্লোরোফর্মে অচেতন অবস্থায় শুয়ে থাকা একটি আহত লোকের দেহে ছুরি চালাচ্ছে। লোকটির চোখ খোলা, যেন বিকারের ঘোরে বিড় বিড় করে কি সব বলছে; কখনও বা আদর করে কাউকে ডাকছে। সার্জনরা তার একটা অঙ্গ কেটে বাদ দেওয়ার কাজে ব্যস্ত। চোখের সামনে দেখবেন ধারালো বাঁকা ছুরিটা সাদা, তাজা মাংস কেটে দু'ফালা করছে; শুনতে পাবেন আহত লোকটি হঠাৎ রক্ত-জমাট-করা ভয়ংকরভাবে আর্তনাদ করতে করতে একটানা অভিশাপ দিতে থাকবে; আর সহকারীটি কাটা হাতটাকে এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ঠিক সেই সময়ই ঘরের আর এক কোণে আপনি দেখতে পাবেন আর একটি হতভাগ্য স্ট্রেচারে শুয়ে তারই সহকর্মীর এই অস্ত্রোপচার দেখছে; যতটা দৈহিক যন্ত্রণায় তার চাইতেও বেশি প্রত্যাশার মানসিক যন্ত্রণায় তার শরীরটা কুঁকড়ে গেছে, সে অবিরাম কাতরাচ্ছে। অনেক ভয়ংকর, হৃদয়বিদারক দৃশ্য আপনি দেখতে পাবেন; দেখতে পাবেন যুদ্ধ—সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী চমৎকারভাবে এগিয়ে চলেছে, তালে তালে ড্রাম বাজছে, নিশান উড়ছে, উল্লম্ফনমুখী ঘোড়ায় চড়ে সেনাপতি চলেছে, তেমন যুদ্ধ নয়, কিন্তু সত্যিকারের যুদ্ধ—রক্ত, যন্ত্রণা ও মৃত্যু...!

সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আপনি নিশ্চয়ই স্বস্তি অনুভব করবেন, তাজা বাতাসে শ্বাস টেনে নিজের সুস্বাস্থ্যের কথা ভেবে উৎফুল্ল হবেন; কিন্তু ঐ সব যন্ত্রণার কথা ভেবে নিজেকে বড়ই ছোট মনে হবে; শান্তভাবে অসংকোচে আপনি দুর্গের দিকে এগিয়ে যাবেন।

"এত মৃত্যু, এত কষ্টের সঙ্গে তুলনায় আমার মতো একটা তুচ্ছ কীটের দুঃখ ও মৃত্যু কী?" কিন্তু ঝকঝকে আকাশ, উজ্জ্বল সূর্য, সুন্দর শহর, খোলা গির্জা আর চাবিদিকের চলমান সামরিক লোকজনকে দেখে অচিরেই আপনি ফিরে যেতে পারবেন আপনার স্বাভাবিক হাল্কা মেজাজে আর নিজের ছোটখাট কাজকর্মে।

যেতে যেতে দেখতে পাবেন গির্জা থেকে একটা শোভাযাত্রা বেরিয়ে আসছে; গোলাপী শবাধারে করে একজন অফিসারকে কবরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে· সামরিক পতাকা উড়ছে, ব্যান্ড বাজছে অথবা হয় তো দুর্গের ভিতর থেকে তোপধ্বনির শব্দ আপনার কানে ভেসে আসবে; কিন্তু তার ফলে পূর্বেকার চিন্তায় আপনি ফিরে যাবেন না; শোকযাত্রাটাকে আপনার মনে হবে একটা সুন্দর সামরিক দৃশ্য, শব্দ শুনে মনে হবে সুন্দর সামরিক বাজনা, আর এই শোভাযাত্রা বা বাদ্যেব কোনওটাকেই আপনি এই মাত্র যন্ত্রণা ও মৃত্যুর যে দৃশ্য দেখে এসেছেন তার সঙ্গে মেলাতে যাবেন না।

গির্জা ও অবরোধটা পার হয়ে আপনি ঢুকবেন শহরের সব চাইতে কর্মচঞ্চল অঞ্চলে। রাস্তার দুই পাশে দোকানের সাইনবোর্ড ও শুঁড়িখানা, ব্যবসায়ীর দল, টুপি ও রুমাল মাথায় মেয়েবা, আর সুদৃশ্য অফিসারেব দল—সকলেই অধিবাসীদের অবিচল আত্মবিশ্বাস ও নিরাপত্তাবোধের সাক্ষ্য বহন করছে।

নাবিক ও অফিসারদের বক্তব্য যদি শুনতে চান তাহলে ডান দিককার শুঁড়িখানাটায় পা ফেলুন : তারা অবশ্য এর মধ্যেই নানান কাহিনী ফেঁদে বসেছে—আগের রাতের ঘটনাবলী, কুমারী ফেনিয়ার কথা, ২৪ তারিখের যুদ্ধের কথা; আজকের কাটলেটগুলো কত দামী আর কত খাবাপ সে কথা, আর কি অবস্থায় জনৈক কমরেড নিহত হয়েছিল সে কথা।

"চুলোয় যাক এসব কথা! আমাদের ওদিকে আজকের দিনটা বড় খারাপ গেছে!" মাথাভর্তি চুল, দাড়িহীন ছোটখাট নৌবিভাগীয় অফিসারটি গম্ভীর গলায় বলে উঠল।

"তুমি কোথায় আছ?" আর একজন প্রশ্ন করল।

"চার নম্বর দুর্গে," তরুণ অফিসারটি জবাব দিলো। "চার নম্বব দুর্গ" শুনেই অধিকতর আগ্রহে এবং কিছুটা ভয়ের সঙ্গেই আপনি ছোটখাট অফিসারটির দিকে তাকাবেন। তার অতিরিক্ত বেপরোয়া ভাব, তার অঙ্গভঙ্গী, তার জোরালো কণ্ঠস্বর ও হাসি যাকে এতক্ষণ আপনার আস্ফালন বলে মনে হয়েছিল, এবার তাকেই আপনার মনে হবে সেই বেপরোয়া মনোভাব বলে যেটা সব বিপদবিজয়ী তরুণদের মধ্যেই আজকাল দেখা যায়। তথাপি আপনি হয়তো আশা করবেন যে সে বলবে, গোলাগুলির দরুণই চাব নম্বর দুর্গের অবস্থাটা খাবাপ গেছে। আসলে কিন্তু তা নয়। খারাপ গেছে কাদার জন্য। হাঁটু পর্যন্ত কাদামাখা বুটজোড়া দেখিয়ে সে বলবে, "কামানের কাছে পৌছনই শক্ত।" অন্য একজন বলবে "আমাদের একজন সেরা গোলন্দাজ আজ নিহত হয়েছে—একেবারে কপালটাই ফুটো হয়ে গেছে।" "কে সে? মিত্যুখিন?" "না।...আরে, আজ বাছুরেব মাংসের কাটলেটটা দেবে না কি? ক্যানাইলে!"—শেষের কথাগুলি পরিচারককে লক্ষ্য করে বলা হবে।..."না, মিত্যুখিন নয়, এব্রোসিমভ্‌। চমৎকার লোক। ছ'টা আক্রমণে অংশ নিয়েছিল।

টেবিলের আর এক কোণে কয়েকটা প্লেটে কাটলেট ও মটরশুটি এবং 'বর্দু" নামক এক রকম কড়া ক্রিমীয় মদ এক বোতল সামনে নিয়ে বসে আছে পদাতিক বাহিনীর দু'জন অফিসার। একজন যুবক, লাল কলারওয়ালা গ্রেটকোট গায়ে, কাঁধের পট্টিতে দুটো তারকা; অপর জন বয়স্ক, কালো কলার, তারকাবিহীন। যুবকটি অপরজনকে বলছে আল্‌মা যুদ্ধের কথা। এর মধ্যে যুবকটির নেশা ধরেছে; কথার মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে, তার কথা বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ ফুটে উঠছে তার সংসংকোচ চাউনিতে, সমস্ত ব্যাপারে তার নিজের ভূমিকাব গুরুত্বকে সে অত্যন্ত বাড়িয়ে বলছে, আর সব দৃশ্যকেই অত্যন্ত ভয়ংকররূপে চিত্রিত করছে;

এ সব কিছু থেকেই আপনি বুঝতে পারবেন যে প্রকৃত সত্য থেকে সে অনেক সরে গেছে। কিন্তু এ সব কাহিনীতে আপনার আগ্রহী হবার কথা নয়, কারণ অনাগত অনেককাল ধরে এই সব কাহিনী রাশিয়ার সর্বত্রই বলা হতে থাকবে। আপনি নিশ্চয়ই দুর্গে, বিশেষ করে চার নম্বর দুর্গে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, কারণ নানাভাবে সে দুর্গের কথা আপনাকে অনেক বলা হয়েছে। কেউ যখন বলে সে ৪ নম্বর দুর্গে ছিল তখন এক বিরল খুসি ও গর্বের সঙ্গেই সে কথাটা উচ্চারণ করে। কেউ যখন বলে "আমি ৪ নম্বর দুর্গে যাচ্ছি" তখনই আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন যে তার গলার স্বরে কিছুটা উত্তেজনার ছোঁয়াচ লেগেছে অথবা অতি-উদাসীনতার রেশ ফুটে উঠেছে। কেউ কাউকে বিদ্রূপ করতে হলেও বলে : তোমাকে ৪ নম্বর দুর্গে পাঠানো উচিত।" আবার স্ট্রেচারে বাহিত কোনও লোককে যদি জিজ্ঞাসা করেন : "কোথা থেকে?" তাহলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জবাব পাবেন "৪ নম্বর দুর্গ থেকে।" আসলে এই ভয়ংকর দুর্গটি সম্পর্কে দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন মত প্রচলিত আছে . একটা মত তারাই পোষণ করে থাকে যারা কোনওদিন ৪ নম্বর দুর্গে থাকেনি এবং যাদের দৃঢ় ধারণা যে যারাই সেখানে যাবে তাদেরই মৃত্যু অবধারিত; আর অন্য মতটা তাদের যারা সেখানে থাকে, যারা আপনাকে শুধু বলবে জায়গাটা শুকনো না কর্দমাক্ত, ভূগর্ভস্থ অস্থায়ী আশ্রয়গুলো গরম না ঠাণ্ডা, ইত্যাদি।

শুঁড়িখানাটায় আধ ঘণ্টা কাটাবার পরেই দেখবেন আবহাওয়া বদলে গেছে। যে কুয়াশা সাগরের উপর ছড়িয়ে ছিল সেটা ধীরে ধীরে জলীয় মেঘে রূপান্তরিত হয়ে সূর্যকে ঢেকে ফেলেছে। ঝিরঝির করে শিলাবৃষ্টির ফলে বাড়ির ছাদ, পাশের গলি ও সৈনিকদের গ্রেটকোট ভিজে উঠেছে। .

আরও একটা অবরোধ-প্রাচীর ফেলে একটা ফটক পেরিয়ে ডান দিকে মোড় নিয়ে একটা চওড়া রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকুন। এই অবরোধ প্রাচীরের ওপরে রাস্তার দু'দিকের বাড়িগুলিতে কোনও লোক বাস করে না; সেখানে কোনও সাইনবোর্ড নেই; দরজাগুলি বন্ধ; জানালাগুলি ভাঙা; একটা বাড়ির একটা কোণ গোলার আঘাতে উড়ে গেছে, আর একটা বাড়ির ছাদ ধ্বসে পড়েছে। বাড়িঘরগুলো যেন বহু দুঃখকষ্ট ও অভাব-অভিযোগে পোড় খাওয়া থুথুরে বুড়ো; তারা আপনার দিকে তাকাবে অহংকার ও ঈষৎ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। পথ চলতে গিয়ে আপনি কামানের গোলায় হোঁচট খাবেন; পাথুরে মাটিতে কামানের গোলা পড়ে যে সব গর্ত হয়েছে এবং পরে জলে ভর্তি হয়েছে তার মধ্যে আপনার পা আটকে যাবে। অনেক সেনাদল, কসাক ও অফিসারদের আপনি পেরিয়ে যাবেন। মাঝে মাঝে কোনও স্ত্রীলোক বা শিশুর সঙ্গেও আপনার দেখা হবে; স্ত্রীলোকের মাথায় কোনও টুপি নেই; সে কোনও নাবিকের স্ত্রী, গায়ে পুরনো শীতের কোট আর পায়ে সৈনিকদের বুট। রাস্তা ধরে আরও কিছুটা এগিয়ে একটা উৎরাই বেয়ে নামলেই দেখবেন আশেপাশে কোনও

বাড়িঘর নেই; তার বদলে আছে শুধু ইট, কাঠ, মাটি, তক্তা ও পাথবের স্তূপ। আপনার সামনে একটা খাড়া পাহাড়ের উপর ছড়িয়ে আছে নানান খানায় ভর্তি কিছুটা অন্ধকার কর্দমাক্ত জমি; আর এটাই হলো ৪ নম্বর দুর্গ।...এখানে খুব অল্প লোকই আপনার চোখে পড়বে, আর মেয়ে মানুষ একটিও দেখতে পাবেন না; সৈন্যরা দ্রুত পাশ কাটিয়ে চলে যাবে, রাস্তা জুড়ে রক্তের দাগ, চারটি সৈন্য একটা স্ট্রেচার বয়ে নিয়ে চলেছে এ দৃশ্য আপনি অবশ্যই দেখতে পাবেন, আর সেই স্ট্রেচারের উপর দেখতে পাবেন একটা পাণ্ডুর মুখ ও একটা রক্তমাখা সামরিক কোট। আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন : "লোকটি কোথায় আঘাত পেয়েছে?" তাহলে আপনার দিকে তাকিয়েই স্ট্রেচার-বাহকরা রেগে জবাব দেবে যে লোকটির পায়ে বা বাহুতে আঘাত লেগেছে—অবশ্য যদি আঘাত সামান্য হয়; কিন্তু স্ট্রেচারের উপর যদি কোনও মাথা দেখা না যায় এবং যে লোকটিকে তারা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে যদি মৃত বা গুরুতর আহত হয়ে থাকে তাহলে একান্ত নিঃশব্দে তারা আপনার পাশ কাটিয়ে চলে যাবে।

পাহাড় বেয়ে উঠতে উঠতে কাছেই কোনও কামানের গোলা বা খোল ফাটার বিকট আর্তনাদ শুনে আপনার মনে একটা অপ্রীতিকর অনুভূতি জাগবে। শহরে বসে গোলাগুলির যে শব্দ আপনি শুনেছেন হঠাৎ তার একটা সম্পূর্ণ নতুন অর্থ আপনি এবার বুঝতে পারবেন। কিছু মিষ্টি-মধুর স্মৃতি আপনার মনের মধ্যে ঝিলমিল করে উঠবে; চারপাশে যা দেখছেন তার চাইতে নিজের কথাই আপনি বেশি করে ভাবতে শুরু কববেন; পবিবেশের প্রতি আপনার মনোযোগ কমতে শুরু করবে, আর অস্থিরচিত্ততার একটা বিশ্রী অনুভূতি আপনাকে পেয়ে বসবে। বিপদকে সামনে দেখে, বিশেষ করে আপনি যখন দেখবেন একটি সৈনিক দুই হাত ঝুলিয়ে সেই ঘন কাদার ভিতর দিয়ে নামতে নামতে আপনাকে দেখে হেসে উঠে পাশ কাটিয়ে চলে গেল, তখন সহসা আপনার মনেব মধ্যে একটি ঘৃণ্য ক্ষীণ কণ্ঠস্বর মুখর হয়ে উঠলেও আপনি সে কণ্ঠস্বরকে নিশ্চুপ থাকতে বলে বুক ফুলিয়ে মাথাটাকে আরও উঁচু করে সেই পিচ্ছিল কর্দমাক্ত পথ বেয়ে উপরে উঠতে থাকবেন। সবে কিছুটা পথ উঠেছেন এমন সময় আপনার ডাইনে ও বাঁয়ে দু'দিকেই যখন "স্টাট্‌জার" বুলেটগুলো বাতাস কেটে ছুটতে শুরু করবে, তখন হয়তো আপনিও মনে মনে একবার ভাববেন যে রাস্তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে কাটা ট্রেঞ্চের ভিতর দিয়ে পথ চলাটাই ভাল। কিন্তু ট্রেঞ্চটা হাঁটু অবধি পুরু ঘন, হল্‌দে, আটালো কাদায় ভর্তি, আর তা দেখে আপনি পাহাড়ে ওঠার খাড়া রাস্তাটাই বেশি পছন্দ করবেন, বিশেষ করে যখন দেখবেন যে সেই রাস্তা ধরেই সব্বাই যাচ্ছে। আরও প্রায় দু'শ' পা এগিয়ে যাবার পরে আপনি গুলির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত এমন একটা কর্দমাক্ত স্থানে পৌঁছে যাবেন যার চারিদিকে ছড়িয়ে আছে মাটি-ভর্তি ঝুড়ি, লম্বা বাঁধ, বারুদের গুদাম, প্ল্যাটফর্ম ও ভূগর্ভস্থ অস্থায়ী

আশ্রয়; আর সে সবের ছাদের উপর ঢালাই লোহার বড় বড় কামান আর সুন্দরভাবে সাজানো কামানের গোলার স্তূপ। সব কিছুই যেমন-তেমন করে স্তূপাকার করে রাখা। একদল নাবিক ঘুরে বেড়াচ্ছে; জায়গাটার মাঝখানে একটা ভাঙা কামান কাদার মধ্যে অর্ধেকটা পোতা অবস্থায় পড়ে আছে; একটি পদাতিক সৈন্য বন্দুক হাতে করে অনেক কষ্টে কাদার ভিতর দিয়ে পা টেনে টেনে এগিয়ে চলেছে। সমস্ত জায়গাটা জুড়ে ছড়িয়ে আছে মাটির খোলা, না-ফাটা বোমা, কামানের গোলা ও শিবিরের যত রাজ্যের জঞ্জাল; আর সে সব কিছু ডুবে আছে কাদার সমুদ্রে। খুব কাছেই একটা কামানের গোলা ফাটার শব্দ শুনতে পাবেন; চারিদিকে গুলি ছুটছে নানা রকম শব্দ করে—কতকগুলি মৌমাছির মতো গুনগুনিয়ে, কতকগুলি দ্রুত ছুটে যাচ্ছে হুইসেলের মতো শব্দ করে, কতকগুলিতে আবার শব্দ উঠছে তার-যন্ত্রের বাজনার মতো। একটা কামানের গোলার ভয়ংকর শব্দ সকলেরই কানে তালা লাগিয়ে দেয়; শব্দটা আপনার কাছে খুবই ভয়ংকর বলে মনে হবে।

"এই তাহলে ৪ নম্বর দুর্গ! এই সেই বিপজ্জনক, সত্যিকারের ভয়ংকর জায়গা!" আপনি নিজের মনেই ভাববেন; আপনার মনে জাগবে গর্বের একটা ছোট্ট অনুভূতি আর চাপা আতংকের একটা বড় অনুভূতি। কিন্তু আপনি হতাশ হবেন। ৪ নম্বব দুর্গে আপনি এখনও পৌছাননি। এটা হলো ইয়াজোনোভ্স্কি বহির্দুর্গ—অনেক নিরাপদ আর মোটেই ভয়ংকর নয়। ৪ নম্বর দুর্গে পৌছতে হলে ডান দিকে মোড় নিয়ে আপনাকে সেই সংকীর্ণ ট্রেঞ্চটার ভিতর দিয়ে যেতে হবে যেখান দিয়ে এইমাত্র একটি পদাতিক সৈন্য হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেল। এই ট্রেঞ্চের মধ্যে আপনি হয়তো দেখতে পাবেন আরও অনেক স্ট্রেচার, নাবিক ও কোদাল হাতে সৈনিকদের : দেখতে পাবেন খনির পল্‌তে, এমন সব ভূগর্ভস্থ আশ্রয় যার মধ্যে মাত্র দু'জন হামাগুড়ি দিয়ে থাকতে পারে; আর সেখানেই আপনি দেখতে পাবেন কৃষ্ণ সাগর বাহিনীর স্কাউটরা জুতো বদলাচ্ছে; খাচ্ছে, পাইপ টানছে, এবং নানাভাবে জীবন যাপন করছে; আর সর্বত্রই সেই একই দুর্গন্ধ, কাদা, শিবিরের ময়লা-জঞ্জাল ও নানা রকমের ও আকারের ভাঙা লোহা। আরও তিন শ' পা এগোলেই দেখতে পাবেন আরও এক সারি কামান, গোলার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত একটা ছোট চার-কোণা জায়গায় ছড়িয়ে আছে ভাঙা খোলা, মাটির ঢিপি, আর মঞ্চের উপর বসানো বন্দুকের সারি—সব কিছুই প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। হয়তো দেখতে পাবেন প্রাচীরের আড়ালে বসে চার-পাঁচজন নাবিক তাস খেলছে, আর একজন নৌবিভাগীয় অফিসার আপনাকে আগ্রহী আগন্তুক বলে বুঝতে পেরে সানন্দে আপনাকে সব কিছু ঘুরিয়ে দেখাবে। কামানের উপর বসে এই অফিসারটি এমন শান্তভাবে হলুদ সিগারেট পাকাতে থাকবে এবং অবিরাম হিস্-হিস্ শব্দে গুলিগোলা ছুটতে থাকা সত্ত্বেও এমন নির্বিকারভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলবে যে আপনিও শান্ত হয়ে তাকে নানা প্রশ্ন করবেন আর সে যা কিছু বলবে একান্ত

মনোযোগের সঙ্গে সে সবই শুনবেন। এই অফিসারটি আপনাকে শোনাবে—অবশ্য আপনি যদি জানতে চান—৫ই তারিখের বোমাবর্ষণের কথা, কেমন করে মাত্র একটি কামান কার্যকর ছিল এবং আর সৈন্যদের মধ্যে বেঁচে ছিল মাত্র আটজন, কিন্তু তাই নিয়ে ৬ তারিখ সকালে সবগুলি বন্দুক নিয়ে সে সবেগে বেরিয়ে এসেছিল। সে আরও শোনাবে কেমন করে ৫ই তারিখে নাবিকদের একটা ভূগর্ভস্থ আশ্রয়স্থলে একটা গোলা পড়ে এগারো জনকে ঘায়েল করেছিল; অবরোধের ছিদ্রেব ভিতব দিয়ে আড়াই শ' বা তিন শ' ফুট দূরবর্তী শত্রুপক্ষের ট্রেঞ্চগুলি সে আপনাকে দেখাবে। অবশ্য আমার মনে একটা আশংকা আছে : হিস্‌হিস্ শব্দ কবে ছুটন্ত গুলির শব্দে তখন আপনার এমন অবস্থা হবে যে ছিদ্রের ভিতরে মাথা ঢুকিয়েও শত্রুপক্ষের কিছুই আপনি দেখতে পাবেন না; কিন্তু যদি কিছু দেখতে পান তাহলে দেখে অবাক হবেন যে সাদা পাহাড়ী প্রাচীরটা আপনার এত কাছে এবং যেখান থেকে সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলি বেরিয়ে আসছে সেটাই শত্রুপক্ষ—সৈনিক ও নাবিকবা বলে সে।

হয়তো সাহস দেখাবার জন্য, অথবা নিছক মজা করবার জন্যই, নৌ-অফিসারটি আপনার জন্যই কিছুটা গুলিবর্ষণের কসরৎ দেখাতে চাইবে। "গোলন্দাজ ও তার সঙ্গীদের কামানের কাছে পাঠাও" : সঙ্গে সঙ্গে চোদ্দজন নাবিক খুসি মনে সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে যাবে; একজন পাইপটা পকেটে পুবে ফেলাবে, অন্যজন বাকি বিস্কুটগুলো মুখে পুরে চিবুতে থাকবে; নাল-লাগানো বুটে খটাখট শব্দ তুলে মঞ্চের উপর উঠে কামানে গোলা ভরতে শুরু করবে। এই সব লোকের মুখগুলি ভাল করে লক্ষ্য করে দেখুন, লক্ষ্য করুন তাদের হাবভাব ও চালচলন; তামাটে চওড়া মুখের প্রতিটি ভাঁজ, প্রতিটি মাংসপেশী, চওড়া কাঁধ, মস্ত বড় টপ-বুটে ঢাকা মোটা মোটা পা ঠাণ্ডা মাথায়, ধীরেসুস্থে, ভেবেচিন্তে প্রতিটি পদক্ষেপ—সব কিছুব ভিতর দিয়ে রুশ শক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য সরলতা ও দৃঢ়তাই ফুটে উঠেছে, এই সব গুণ ছাড়াও আপনি দেখতে পাবেন, যুদ্ধের বিপদ, তজ্জনিত আক্রোশ ও কষ্ট প্রত্যেকেরই মুখের উপর ফেলেছে মর্যাদাবোধ, মহৎ চিন্তা ও অনুভূতির সচেতন প্রভাব।

হঠাৎ একটা ভয়ংকর শব্দ শুধু যে আপনার কানে তালা লাগিয়ে দেবে তাই নয়, আপনার গোটা শরীরের মধ্যে ঢুকে আপনাকে আপাদমস্তক থর্‌থর্ করে কাঁপিয়ে তুলবে। পর মুহূর্তেই আপনি শুনতে পাবেন একটা গোলাব অপসৃয়মান আর্ত শব্দ, আর বারুদের ঘন ধোঁয়া আপনাকে, মঞ্চটাকে এবং তার উপর চলমান নাবিকদের মূর্তিগুলোকে ঢেকে ফেলেছে। গোলাগুলি বর্ষণ সম্পর্কে নাবিকদের নানা রকম মন্তব্য আপনার কানে আসবে, দেখতে পাবেন তাদের উত্তেজনা আর এমন একটা অনুভূতির প্রকাশ যা আপনি মোটেই আশা করেননি—একটা আক্রোশ, শত্রুপক্ষের উপর প্রতিশোধ নেবার একটা তৃষ্ণা যেন সকলেরই মনকে ভরে রেখেছে। "গর্তের ভিতর দিয়ে ঠিক তাক করেছি, মনে হচ্ছে ওদের দু'জনকে মেরেছি...দেখো। তাদের সরিয়ে

নিয়ে যাচ্ছে!" সকলেই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠবে। একজন হয়তো বলে উঠবে, "ও তো এবার পাগ্‌লা হয়ে যাবে, এক মিনিটের মধ্যেই আমাদের তাক করে গুলি ছুঁড়বে," আর সত্যি সত্যি কয়েক মিনিট পরেই আপনি দেখতে পাবেন একটা আগুনের ঝিলিক আর ধোঁয়ার কুণ্ডুলি; প্রাচীরের উপর দাঁড়ানো প্রহরীটি চিৎকার করে বলবে; "কা-মা-ন!" একটা গোলা আপনার পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে সশব্দে মাটিতে পড়বে আর একগাদা কাদা ও পাথর ছিটকে উঠবে। তা দেখে গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক বিরক্ত হবে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় কামানে বারুদ ভরবার হুকুম দেবে। শত্রুপক্ষও পাল্টা জবাব দেবে, আর গভীর আবেগে আপনার রোমহর্ষণ হবে, অনেক ভাল জিনিস আপনি দেখতে পাবেন, শুনতে পাবেন। প্রহরীটি আবার চেঁচিয়ে উঠবে : "কামান!" আবার আপনি শুনবেন গোলার শিস্ ও সেটা ভেঙে পড়ার শব্দ, দেখবেন কাদার স্রোত ছিট্‌কে ছড়িয়ে পড়ছে। সে হয় তো চেঁচিয়ে বলবে, "ছোট কামান!" আর আপনি শুনতে পাবেন এমন একটা গুনগুন শব্দ যাকে ভয়ংকর কিছু মনে করা শক্ত—তীব বেগে ছুটে আসা একটা গোলার হিস্‌হিস্, আর দেখবেন একটা কালো গোলা এবং শুনবেন মাটিতে পড়ে সেটার বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ। বোমার টকরোগুলো হিস্‌হিস্ শব্দে উড়তে থাকবে, শূন্যে ছিটকে যাবে পাথরের টুকরো। আর আপনার গা হবে কাদায় মাখামাখি; আর সর্বক্ষণই আপনার মনে জাগবে সুখ ও শংকার একটা মিশ্র অনুভূতি। যে মুহূর্তে আপনি দেখবেন একটা গোলা আপনার দিকে ছুটে আসছে তখন আপনি নিশ্চিত করেই বুঝবেন যে ওই গোলাটা আপনাকে খুন করবে; কিন্তু আপনার অহংকারই আপনাকে শক্তি যোগাবে, আর যে ছুরিটা তখন আপনার বুকটাকে কেটে ফালা-ফালা করে দেবে সেটা কেউ দেখতে পাবে না। কিন্তু গোলাটা যখন আপনাকে না ছুঁয়েই পাশ কাটিয়ে চলে যাবে তখনই আপনি সম্বিত ফিরে পাবেন, মুহূর্তের জন্য হলেও একটা বর্ণনাতীত আনন্দের অনুভূতি আপনাকে পেয়ে বসবে, আর বিপদের মধ্যে, এই জীবন-মরণের খেলার মধ্যে আপনি একটা অদ্ভুত আকর্ষণ খুঁজে পাবেন। কিন্তু প্রহরীটি আরও একবার চেঁচিয়ে উঠবে "ছোট কামান!" আর আবারও সেই শিস্, ভারী জিনিস পড়ার শব্দ ও বিস্ফোরণ; এবার কিন্তু এই শব্দের সঙ্গে মনুষ্যকণ্ঠের একটা আর্তনাদ শুনে আপনি চমকে উঠবেন। আপনি যখন আহত লোকটির কাছে যাবেন তখন সবেমাত্র স্ট্রেচারটা আনা হয়েছে। কাদা ও রক্তের মধ্যে লোকটা পড়ে আছে; একটা বিচিত্র, প্রায় অমানুষিক দৃশ্য। বুকের খানিকটা অংশ উড়ে গেছে। গোড়াতে তার কাদা-মাখা মুখে শুধু ভয় আর যন্ত্রণাই ফুটে ওঠে; কিন্তু স্ট্রেচার আনা হলে সে নিজেই তাতে চড়ে এবং ভাল দিকটায় কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ে; তখন ভয় ও যন্ত্রণার পরিবর্তে তার মুখে ফুটে ওঠে উল্লাস ও অব্যক্ত মহৎ ভাবনার প্রকাশ; তার চোখ দুটি জ্বলজ্বল্ করে ওঠে, দাঁতে দাঁতে আটকে যায়, চেষ্টা করে মাথাটা তুলে স্ট্রেচার-বাহকদের থামিয়ে

কমরেডদের দিকে ঘুরে কাঁপা গলায় বলে ওঠে; "আমাকে ক্ষমা করো ভাইসব!" আরও কিছু সে বলতে চায়; আপনি বুঝবেন মনের কোনও কোমল ভাবনার কথাই সে বলতে চাইছে, কিন্তু শুধু সেই একটি কথাই সে আর একবার উচ্চারণ করে। "আমাকে ক্ষমা করো ভাইসব!" একজন নাবিক কমরেড তার কাছে এগিয়ে যাবে; টুপিটা তার মাথায় পরিয়ে দেবে—আহত লোকটিও মাথাটা একটু তুলে ধরবে—তারপর দুই হাত দুলিয়ে শান্তভাবে তার কামানের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে।

আপনার মুখের আতংকের ভাব লক্ষ্য করে নৌ-অফিসারটি বলবে, "এই ভাবেই একটা দিনে সাত-আট জনকে আমরা হারিয়েছি।" হাই তুলে সে আর একটা হলুদ সিগারেট পাকাতে থাকবে...

এবার তাহলে আপনি সেবাস্তোপল-রক্ষাকারীদের কর্মরত অবস্থায় দেখতে পেলেন; মাথার উপর দিয়ে সশব্দে ছুটে-যাওয়া কামানের গোলাগুলির শব্দে কোনওরকম কান না দিয়ে এবার আপনি ফিরে যাবেন থিয়েটারের ধ্বংসস্তূপের দিকে শান্ত উৎফুল্ল মনে পা ফেলে। যে আনন্দময় দৃঢ় ধারণা বুকে নিয়ে আপনি ফিরে যাবেন সেটাই তো আসল কথা—সে ধারণাটা এই যে সেবাস্তোপলকে কেউ দখল করতে পারবে না; শুধু যে দখল করতে পারবে না তাই নয়, কোনও জায়গাতেই রুশ জনগণের মনোবলকে ভেঙে দেওয়া অসম্ভব—আর সেটা যে অসম্ভব তা আপনি দেখেছেন অসংখ্য অবরোধ, দেয়াল, ঘোরানো ট্রেঞ্চ, সুরঙ্গ ও স্তূপীকৃত কামান-বন্দুকের মধ্যে নয়, দেখেছেন সেবাস্তোপল রক্ষাকারীদের দৃষ্টিতে, কথায়, ভাবভঙ্গিতে এবং তাদের মনোবলের মধ্যে। যা তারা করছে সেটা এত সহজে ও অনায়াসে করছে যে আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন, আরও শতগুণ বেশি কাজ করার শক্তি তারা রাখে...তারা সব কিছু করতে পারে। আপনি বুঝতে পারছেন, কোনও রকম ক্ষুদ্রতা, উচ্চাকাংখা বা বিস্মৃতি তাদের এ কাজে প্রেরণা জোগায়নি; তারা অনুপ্রাণিত হয়েছে এমন একটি ভিন্নতর শক্তিশালী অনুভূতির দ্বারা যা তাদের গোলা-গুলির ঝড়ের মধ্যে, মৃত্যুর সমূহ সম্ভাবনার মধ্যে, অবিরাম পরিশ্রম, সতর্কতা ও নোংরা জীবনের মধ্যে শান্তভাবে বেঁচে থাকার শক্তি জুগিয়েছে। শুধু একটা ক্রশ বা একটা উপাধির আশায়, বা শাস্তির ভয়ে মানুষ এ রকম জীবনকে সহ্য করতে পারে না : নিশ্চয় কোনও মহত্তর ভাবনা তাদের প্রেরণা জুগিয়েছে। সেবাস্তোপল অবরোধের গোড়ার দিকে—যখন কোনও দুর্গ ছিল না, সেনাবাহিনী ছিল না, সেবাস্তোপলকে রক্ষা করার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না, অথচ তাকে যে শত্রুর হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে না সে বিষয়েও তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না—যখন প্রাচীন গ্রীসের উপযুক্ত বীরের মতো কর্নিলভ্ তার বাহিনী পরিদর্শনে গিয়ে বলেছিল; "ছেলেরা, আমরা মরব, কিন্তু সেবাস্তোপলকে ছাড়ব না!" আর আমাদের রুশসৈনিকরা—যারা

বাজে কথা বলে না—তারা জবাব দিয়েছিল : "আমরাও মরব, হুর্‌রা!"—সেদিনকার সেবাস্তোপল-এর কাহিনীগুলি আজ আর কতকগুলি সুন্দর সুন্দর নিছক ঐতিহাসিক উপকথা মাত্র নয়; সেগুলি আজ বিশ্বাসযোগ্য সত্য হয়ে উঠেছে। আপনি নিজেও স্পষ্ট বুঝতে পারবেন, চোখের সামনে দেখতে পাবেন, যে লোকগুলিকে এইমাত্র দেখে এলেন, এই সব বীরের দল যারা সেদিনের সেই দুর্দিনে সাহস হারায়নি, বরং অধিকতর মনোবল সংগ্রহ করে সানন্দে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েছিল একটি শহরকে রক্ষা করার জন্য নয়, মাতৃভূমিকে রক্ষার সংকল্পে। সেবাস্তোপল-এর যে মহাকাব্যের নায়ক ছিল রাশিয়ার জনগণ তার গভীর ছাপ অনাগত বহুকাল ধরে রাশিয়ার বুকে আঁকা থাকবে।...

গোধূলি নেমে আসছে। আকাশকে ঢেকে রাখা কালো মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে অস্তগামী সূর্য; হঠাৎ তার রক্তিম কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে রাঙা মেঘের বুকে, অনেক জাহাজ ও নৌকোয় সমাকীর্ণ সমুদ্রের সবুজ আস্তরণের উপরে, শহরের সাদা বাড়িঘর ও রাস্তায় চলমান মানুষের উপরে। দুর্গে দুর্গে কামানের অপার্থিব ধ্বনির সঙ্গে মিশে রাজপথে বাদ্যরত একটি সামরিক ব্যান্ডের পুরনো ওয়াল্‌জ্‌-এর সুর সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে।

সেবোস্তোপল, এপ্রিল ২৫, ১৮৫৫

।। সেবাস্তোপল, মে-তে ।।

১

সেবাস্তোপল-এর দুর্গ থেকে প্রথম কামানের গোলাটি ছুটে গিয়ে শত্রুপক্ষের মাটিতে ছিটকে পড়বার পরে ছ'মাস কেটে গেছে; সেই থেকে হাজার হাজার কামানের গোলাগুলি অবিশ্রাম ছুটেছে দুর্গ থেকে স্ট্রেঞ্চের দিকে এবং স্ট্রেঞ্চ থেকে দুর্গের দিকে; আর মৃত্যুর দূত দুই জায়গার উপরেই অবিরাম উড়ে বেড়িয়েছে।

এই সময়ের মধ্যে হাজার হাজার মানুষের উচ্চাকাঙ্খা ব্যর্থ হয়েছে, আরও হাজার মানুষের উচ্চাকাঙ্খা পূর্ণ হয়েছে, ফুলে-ফেঁপে উঠেছে, আর আরও হাজার মানুষ মৃত্যুর কোলে শান্তি লাভ করেছে। কত "তারকা" পোশাকে ঝোলানো হয়েছে, কত তারকা বাতিল করা হয়েছে; কত জন পেয়েছে অর্ডার অব আন্না এবং অর্ডার অব ভ্লাদিমির, আর কত গোলাপী শবাধার ও শব-আবরণী তৈরি হয়েছে। এখনও পর্যন্ত দুর্গগুলি থেকে সেই একই শব্দ বেরিয়ে আসে; আজও ফরাসীরা তাদের শিবির থেকে সভয়ে তাকায় সেবাস্তোপল-এর দুর্গের গোলায় ক্ষতবিক্ষত কালো মাটির দিকে, আমাদের নাবিকদের চলমান কালো মূর্তিগুলোর দিকে, আর সক্রোধে গুণতে থাকে কামান-কণ্টকিত প্রাচীরের ছিদ্রপথগুলোকে; পর্যবেক্ষণ-মঞ্চে আসীন ক্ষুদে অফিসারটি এখনও তার দূরবীক্ষণ যন্ত্রটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেলে বিচিত্র সব

ফরাসীদের উপর, তাদের কামানশ্রেণী, শিবির ও গ্রীন হিল-এ চলাচলকারী সুসজ্জিত সৈনিকদের উপর, আর তাদের ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়ার কুণ্ডলীর উপর; এবং পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চল থেকে বিচিত্র ধরনের সব মানুষ নানা বিচিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে এখনও দলে দলে এই মারাত্মক স্থানটিতে ভিড় জমায়।

কিন্তু কূটনীতিবিদরা যে সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে সেই সমস্যা সমাধানেরই অসফল চেষ্টা আজও চলেছে বারুদ ও রক্তের পথ ধরে।

একটা অদ্ভুত চিন্তা প্রায়ই আমার মাথায় আসে : যুদ্ধমান যে কোনও একটি পক্ষ যদি অপর পক্ষের কাছে প্রস্তাব রাখে যে প্রত্যেকেই তার বাহিনী থেকে একটি সৈন্যকে ছাঁটাই করে দিক, তাহলে কেমন হয়? এই ইচ্ছাটা খুবই অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? তারপর দ্বিতীয় সৈন্যটিকে ছাঁটাই করা যেতে পারে, তারপর চতুর্থটিকে; এমনি করে শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষেই মাত্র একটি করে সৈন্য অবশিষ্ট থাকবে (অবশ্য ধরে নিতে হবে যে দুই পক্ষেরই সৈন্য-সংখ্যা সমান এবং পরিমাণ ও গুণকেও সমমূল্য ধরে নিতে হবে)। তারপরে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন প্রতিনিধির ভিতরকার জটিল রাজনৈতিক সমস্যার মীমাংসা যদি যুদ্ধের পথেই করতে হয় তো যুদ্ধ হোক সেই দুই সৈন্যের মধ্যে। একজন শহর অবরোধ করুক, আর অপর জন তাকে রক্ষা করুক।

যুক্তিটা শুনতে অবাস্তব, তবু ভাল। সত্যি তো, একজন রুশ ও মিত্রপক্ষের একজন প্রতিনিধির সঙ্গে যুদ্ধে এবং ধরুন, ৮০,০০০-এর সঙ্গে ৮০,০০০ হাজারের যুদ্ধের তফাৎটা কি? ১,৩৫,০০০-র বিরুদ্ধে ১,৩৫,০০০-র যুদ্ধ? অথবা ২০,০০০-এ বিরুদ্ধে ২০,০০০-এ যুদ্ধ? অথবা ২০-র বিরুদ্ধে ২০-র যুদ্ধ কেন হবে না? একের বিরুদ্ধে একের যুদ্ধই বা নয় কেন? একটা ধারণা তো অপর ধারণাটা থেকে অধিক যুক্তিহীন নয়। বরং পরেরটা অনেক বেশি যুক্তিসম্মত, যেহেতু সেটা অনেক বেশি মানবিক। দুটোর যে কোনও একটা সত্য : হয় যুদ্ধ মানেই পাগলামি, অথবা মানুষ যদি এই পাগলামির দ্রষ্টা হয় তাহলে আমরা যে মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব বলে মনে করি মানুষ তা নয়।

২

সেবাস্তোপল-এর অবরুদ্ধ শহরের রাজপথে মঞ্চের কাছে একটা সামরিক বাজনা বাজছে, আর সমর বিভাগের নারী ও পুরুষরা দলে দলে উৎসবের মেজাজে চলাফেরা করছে। বসন্তকালের উজ্জ্বল সূর্য উঠেছে ইংরেজ শিবিরগুলোর মাথায়; সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছে দুর্গের উপরে, শহরের বুকে, ও নিকোলায়েভস্কি সেনা-বারিকের উপরে; এতক্ষণে সূর্যের রশ্মিগুলো যেন খুসিতে সকলের উপরেই ঝরে পড়ছে, নেমে এসেছে অনেক দূরের নীল সাগরের বুকে যেখানে রূপোলি ঝিকিমিকির উচ্ছ্বাস।

খুব ঝকঝকে সাদা না হলেও বেশ পরিষ্কার দস্তানা হাতে লাগিয়ে একটি দীর্ঘকায় বৃষস্কন্ধ অফিসার মোর্স্কায়া স্ট্রীটের বাঁ দিকে অবস্থিত নাবিকদের সারিবদ্ধ ছোট ছোট কুটিরের একটির ছোট ছোট দরজা পেরিয়ে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে পাহাড় বেয়ে রাজপথের দিকে এগিয়ে চলেছে। অফিসারটির সাদামাঠা মুখ ও নিচু কপাল দেখে মনে হয় লোকটির বুদ্ধি কম হলেও তার মধ্যে সাধারণ জ্ঞান, সততা ও সুরুচির অভাব নেই। লোকটি দেখতে কিছুটা চাষাড়ে—লম্বা ঠ্যাং, চলাফেরায় কেমন একটা অদ্ভুত ভীরু ভাব। মাথার টুপিটা অপেক্ষাকৃত নতুন, অদ্ভুত লাল রঙের একটা সামরিক কোট পরনে, তার নিচ থেকে উঁকি দিচ্ছে সোনার ঘড়ির চেন, ডোরা-কাটা পাৎলুন, গোড়ালি পর্যন্ত উঁচু বাছুরের চামড়ার বুটজোড়া দাগহীন ও ঝকঝকে; একজন পদাতিক অফিসারের পক্ষে পোশাকটা একটু অস্বাভাবিক; কিন্তু সেজন্য নয়, সাধারণভাবে তার চেহারাটা দেখলেই যে কোনও অভ্যস্ত সামরিক চোখেই ধরা পড়বে না যে সে পদাতিক বাহিনীর একজন সাধারণ অফিসার নয়, তার চাইতে পদস্থ কেউ। তার মুখের গড়ন একান্তভাবেই রুশীয় না হলে তাকে একজন জার্মান বলে মনে করা যেত, অথবা একজন অ্যাডজুটান্ট, বা একজন সামরিক কোয়ার্টার মাস্টার, অথবা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের জন্য অশ্বারোহী বাহিনী বা রক্ষী বাহিনী থেকে সাময়িকভাবে বদলি করা কোনও অফিসার। সত্যি সত্যি সে অশ্বারোহী বাহিনী থেকেই বদলি হয়ে এসেছে; পাহাড় বেয়ে রাজপথের দিকে চলতে চলতে সে একটা চিঠির কথা ভাবছে; বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত একজন প্রাক্তন সহকর্মীটি গবার্নিয়ার জমিদার ও তার স্ত্রী এবং অফিসারটির ঘনিষ্ঠ বন্ধু নীল-নয়না নাতাশার কাছ থেকে এইমাত্র সে চিঠিটা পেয়েছে। সহকর্মীর চিঠির একটি অংশ তার মনে পড়ে গেল :

''লা' ইনভ্যালিডে পত্রিকাটি আসা মাত্রই পুপ্‌সি (অবসরপ্রাপ্ত উহ্‌লান ঐ নামেই তার স্ত্রীকে ডাকে) ছুটে হলে চলে যায়, কাগজটা হাতে নিয়ে আবার ছুটে গিয়ে বসে বাগানের এস-এ (S আকৃতির ছোট আসন) অথবা বসবার ঘরে (তোমার কি মনে আছে এই শহরে যখন তোমার বাহিনীটি মোতায়েন ছিল তখন কত শীতের সন্ধ্যা আমরা আনন্দে কাটিয়েছি?) এবং এমন উৎসাহের সঙ্গে তোমার কীর্তি-কলাপের বিবরণ গিলতে শুরু করে যে তুমি তা কল্পনাও করতে পারবে না। সে প্রায়ই তোমার কথা বলে : এই নাও তোমার প্রিয় বন্ধু মিখাইলভিচ-এর খবর। তার সঙ্গে দেখা হলেই আমি চুমো খাব। দুর্গে থেকে সে যুদ্ধ করছে; নিশ্চয় সেন্ট জর্জ-এর ক্রুশটি পাবে, আর কাগজে কাগজে তার সম্পর্কে কত কথা লেখা হবে, ইত্যাদি।' তার কথা শুনে আমার তো রীতিমতো ঈর্ষা হয়।'' আর এক জায়গায় সে লিখেছে : ''এখানে খবরের কাগজ খুব দেরিতে আসে; যদিও মুখে মুখেই অনেক খবর ছড়ায়, কিন্তু সে সব কিছুই তো বিশ্বাস করা যায় না। যেমন ধরো, তোমার পরিচিত সেই তরুণী গায়িকারা গতকাল আমাদের বলল যে, আমাদের কসাকরা নেপোলিয়নকে বন্দী

করেছে এবং তাকে সেন্ট পিতার্সবুর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে; এ খবরের কতটা আমরা বিশ্বাস করেছি সে তো বুঝতেই পারছ। সেন্ট পিতার্সবুর্গ থেকে আর একজন তো সোজা বলে দিলো যে আমরা ইউপাতোরিয়া দখল করেছি এবং বালাক্লাভার সঙ্গে ফরাসীদের যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়েছি, আর সে যুদ্ধে আমরা হারিয়েছি ২০০ জনকে এবং ফরাসীরা হারিয়েছে ১৫,০০০ জনকে। এ কথা শুনে উল্লসিত হয়ে আমার স্ত্রী সারা রাত মদ খেয়ে ফূর্তি করেছে; সে বলছে, তার মন বলছে যে এই যুদ্ধে তুমি অংশ গ্রহণ করেছ এবং সুনাম কুড়িয়েছ...।"

চিঠির যে সমস্ত শব্দ ও বাক্যাংশ আমি ইচ্ছা করেই বাদ দিয়েছি এবং সাধারণভাবে চিঠিটার যা সুর তাতে লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেন মিখাইলভ ও তার এস-এ উপবিষ্টা বিষণ্ণমুখী বান্ধবী সম্পর্কে যে খারাপ ধারণাই হোক না কেন, লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেন মিখাইলভ কিন্তু অবর্ণনীয় বিষণ্ণ আনন্দের সঙ্গেই তার মফস্বল শহরের একটি বিষণ্ণ-বদনা বান্ধবীকে স্মরণ করল; বাগানে বসে তাকে কত না মনের কথা বলেছে। সদাশয় উহ্‌লান সহকর্মীটির কথাও তার মনে পড়ল; পয়েন্টপ্রতি এক কোপেক বাজি ধরে খেলতে বসে হেরে গেলে সে ভয়ানক রেগে যেত আর তার স্ত্রী তাকে দেখে হো-হো করে হাসত; মনে পড়ল তাদের দু'জনের বন্ধুত্বের কথা (হয়তো সে মনে করত যে তার বিষণ্ণবদনা বান্ধবীর পক্ষে সেটা বন্ধুত্বের চাইতেও বেশি কিছুই ছিল); এই সব লোকজন ও তাদের পরিবেশের কথা হঠাৎ যেন এক আশ্চর্য আনন্দের রঙে রঙিন হয়ে তার মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল; ঈষৎ হেসে সে পকেটে হাত রাখল; আদরের চিঠিখানা সেখানেই আছে। লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেন মিখাইলভ-এর কাছে এই সব স্মৃতি আরও মধুর হয়ে দেখা দিলো এই কারণে যে সে যখন অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার ছিল এবং রমণীরঞ্জন পুরুষ হিসাবে টি. শহরের বাড়িতেই সাদরে গৃহীত হয়েছিল সেই পরিবেশের তুলনায় এখন সে বর্তমান পদাতিক বাহিনীতে যে সব লোকের সঙ্গে চলাফেরা করে তারা অনেক নিচু স্তরের মানুষ।

বর্তমানের তুলনায় আগেকার পরিবেশটা এতই উঁচু স্তরের ছিল যে দিলখোলা মুহূর্তে সে যখন পদাতিক বাহিনীর কমরেডদের কাছে বলে ফেলে এক সময় তার গাড়ি ছিল, গভর্নরের বল-এ সে নেচেছে, অসামরিক জেনারেলের সঙ্গে তাস খেলেছে, তখন তারা অবিশ্বাসের সঙ্গে কথাগুলি শোনে, কিন্তু প্রতিবাদ করে না বা তর্ক করে না,—যেন বলতে চায়, "বলতে দাও", আর সেও যে কমরেডদের পানোৎসবের সময়—তাদের ভদ্‌কা খাওয়া নিয়ে এবং পাঁচ রুবল বাজির খেলা নিয়ে তাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে না তার একমাত্র কারণ তার নিজের শান্ত প্রকৃতি, সৎ স্বভাব ও সাধারণ সৌজন্য।

এই সব স্মৃতি-চারণা থেকে লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেন মিখাইলভ-এর চিন্তা আপনা

থেকেই চলে গেল স্বপ্ন ও প্রত্যাশায়। একটা সরু গলি বেয়ে নামতে নামতে নিজের মনেই সে বলতে লাগল, লা' ইনভ্যালিডে পত্রিকায় নাতাসা যখন পড়বে যে কামানের আক্রমণের বিরুদ্ধে অভিযানটা আমিই পরিচালনা করেছিলাম এবং সেজন্য সেন্ট জর্জ-এর ক্রুশও পেয়েছি, তখন সে না জানি কত অবাক ও খুসি হবে। পুরনো সুপারিশক্রমেই পূর্ণাঙ্গ ক্যাপ্টেন হিসাবে পদোন্নতি আমার প্রাপ্য হয়েছে, আর প্রবীণতার বিচারে আমি হয়তো এই বছরেই মেজর হয়ে যাব, কারণ অনেক অফিসার ইতিমধ্যেই নিহত হয়েছে, আর যুদ্ধ শেষ হবার আগেই আরও অনেকেরই মৃত্যু ঘটা সম্ভব। তারপর আরও একটা যুদ্ধ হবে এবং কৃতিত্বের অধিকারী হিসাবে আমাকে একটা পুরো রেজিমেন্টের ভার দেওয়া হবে...লেফ্‌টেন্যান্ট-কর্ণেল...আমার গলায় ঝুলবে "অর্ডার অব আন্না"-কর্ণেল..." ততদিনে সে জেনারেল হয়ে গেছে; ততদিনে তাব সহকর্মীটিও মারা গেছে আর সে দয়াপরবশ হয়ে বন্ধুর বিধবা পত্নী নাতাশাকে দর্শন দিয়ে ধন্য করবে—ঠিক সেই সময় তার চিন্তার স্রোতে বাধা পড়ল; রাজপথ থেকে ভেসে এল বাজনার সুর, চোখে পড়ল জনতার ভিড়, আর সেও বাজপথে দাঁড়িয়ে আছে আগেকার মতোই একজন নগণ্য, অদ্ভুত ও ভীরু পদাতিক বাহিনীর লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেনরূপেই।

৩

প্রথমেই সে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল; তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে যন্ত্রশিল্পীরা; স্বরলিপি রাখার স্ট্যান্ড-এর অভাবে রেজিমেন্টের সৈন্যরাও সেগুলি ধরে দাঁড়িয়ে আছে, আর তাদের ঘিরে একটা বৃত্ত রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে সামরিক করণিক, শিক্ষার্থী, নার্সমেড ও তাদের অধস্তন ও ঊর্ধ্বতন কর্মচারীরা; তারা যত না বাজনা শুনছে তার চাইতে বেশি ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে আছে। মঞ্চের চারপাশে নৌবিভাগীয় অফিসার এড্‌-ডি-কং-ও সামরিক অফিসাররা সাদা দস্তানা ও নতুন গ্রেটকোট পবে কেউ দাঁড়িয়ে আছে, কেউ বসে আছে, আর কেউ বা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেন্দ্রীয় পথ ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে নানা ধরনের অফিসার ও মেয়েরা—কারও মাথায় টুপি, কেউ বা রুমাল বেঁধেছে (কাবও টুপি বা রুমাল কোনওটাই নেই); কিন্তু তারা কেউই বৃদ্ধ নয়—সকলেই যুবক-যুবতী। নিচে সুগন্ধি শ্বেত অ্যাকসিয়ায় ঢাকা ছায়াচ্ছন্ন বীথিতলে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কেউ বা বসে আছে, আর কেউ বা ঘুবে বেড়াচ্ছে।

রাজপথে লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেন মিখাইলভ-এর সঙ্গে দেখা হওয়ায় কাউকেই বিশেষ খুসি মনে হলো না; শুধু তার নিজের রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন অব্‌ঝোগভ্‌ ও পতাকাবাহী সুস্লিকভ সাগ্রহে তার সঙ্গে কর-মর্দন করল; প্রথম জনের পরনে উটের লোমের ট্রাউজার, হাতে দস্তানা নেই, গ্রেটকোটটা নোংরা, আর মুখটা লাল ও ঘামে

ভেজা; অপর জন এত জোরে জোরে কথা বলতে লাগল এবং তার আচরণে মর্যাদার এতই অভাব দেখা গেল যে তাদের সঙ্গে একত্রে বেড়াতে মিখাইলভ লজ্জা বোধ করল।

তাছাড়া মঁসিয় অব্‌ঝোগভ্ ও সুস্লিকভ-এর সঙ্গে দিনের মধ্যে অন্তত ছ'বার তার দেখা হয়, কর-মর্দন চলে; সে ক্ষেত্রে তাদের দলে মিশে বেড়াতে মজা হবে কেন? এর জন্য তো সে বাজনা শুনতে আসেনি।

তার চাইতে তার ইচ্ছা এড্-ডি-কং-এর সঙ্গে একটু পায়চারি করবে, অন্য সব ভদ্রলোকদের সঙ্গে একটু গল্প-গুজব করবে; অবশ্য ক্যাপ্টেন অবঝোগভ্ পতাকাবাহী সুস্লিকভ, লেফ্‌টেন্যান্ট পিশ্‌তেৎস্কি ও অন্য সকলের সামনে নিজেকে জাহির করা তার উদ্দেশ্য নয়; তারা সকলেই ভাল মানুষ, আর অনেক জানে-শোনে, তাই তারা অনেক খবর বলতে পারে।...কিন্তু লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেন মিখাইলভ তাদের কাছে এগিয়ে যেতে এত ইতস্তত করছে কেন? এত ভয়ই বা পাচ্ছে কেন? সে ভাবছে. ''তারা যদি আমাকে প্রতি-নমস্কার না করে? অথবা নমস্কার করেও যদি নিজেদের মধ্যে এমন ভাবে কথা বলতে থাকে যেন আমি সেখানে নেই? অথবা তারা যদি সকলেই কেটে পড়ে আর আমাকে 'অভিজাত'দের মধ্যে ফেলে যায়?'' এই 'অভিজাত' শব্দটা (যার অর্থ যে কোনও শ্রেণীর সেরা লোক) ইদানিং রাশিয়াতে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং দেশের সর্বত্র ও সমাজের সর্ব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যেখানেই অহংকার মাথা চাড়া দিয়েছে সেখানেই ছড়িয়ে পড়েছে— ব্যবসায়ী, সরকারী কর্মচারী, করণিক ও সামরিক অফিসারদের মধ্যে, সারাতভ, মামদাশি ও ভিনিৎসা যেখানে মানুষ আছে সেখানেই। আর যেহেতু অবরুদ্ধ শহর সেবাস্তোপল-এ প্রচুর লোকের বাস, সুতরাং ধরেই নেওয়া যেতে পারে যে সেখানেও আছে প্রচুর অহংকার অর্থাৎ অভিজাতের দল, যদিও সেখানে অভিজাত ও অনভিজাত সকলেরই মাথার উপরে অবিরাম ঘুরছে মৃত্যুর পাখা। ক্যাপ্টেন অব্‌ঝোগভ্-এর কাছে লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেন মিখাইলভ একজন অভিজাত, কারণ তার কোট ও দস্তানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন. আর সেজন্য তাকে যৎসামান্য সম্মান করলেও তাকে সে সহ্য করতে পারে না; আবার লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেন মিখাইলভ-এর কাছে অ্যাড্‌জুট্যান্ট কালুগিন একজন অভিজাত। অ্যাড্‌জুট্যান্ট কালুগিন-এর কাছে কাউন্ট নর্দভ একজন অভিজাত, অথচ এড্-ডি-কং হবার জন্য সে সব সময়ই তাকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে থাকে। এই অভিজাত শব্দটা বড় সাংঘাতিক। স্টাফ্ অফিসারের পাশে উপবিষ্ট একজন কমরেডকে দেখলেই সাব-লেফ্‌টেন্যান্ট জবভ্ এমন বিদ্রূপের হাসি হাসে কেন? সে দেখাতে চায় সে অভিজাত না হলেও তাদেরই সমকক্ষ। স্টাফ অফিসারটিই বা এমন নিচু গলায় টেনে টেনে কথা বলে কেন? সে তার সঙ্গীকে বোঝাতে চায় যে সে একজন অভিজাত. দয়াপরবশ হয়েই সে এক সাব-

লেফ্‌টেন্যান্টের সঙ্গে কথা বলে। যে মহিলাটিকে আগে কখনও দেখেনি এবং ভবিষ্যতে দেখবারও স্বপ্ন দেখে না তারই পিছু নিয়ে একজন শিক্ষার্থীই বা হাত ঝুলিয়ে চোখ মিটমিট করে চলে কেন? অফিসারদের সে দেখাতে চায় যে, তাদের দেখে টুপি খুললেও সেও একজন অভিজাত, এবং নিজেকে বেশ উঁচুদরের লোক বলেই মনে করে। গোলন্দাজ বাহিনীর ক্যাপ্টেনটিই বা ভাল মানুষ আর্দালিটিকে বকে কেন? সকলকেই সে দেখাতে চায় যে সে কারও পা-চাটা নয়, বা কোনও অভিজাতকে তোয়াক্কা করে না, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অহংকার, অহংকার, সর্বত্র অহংকার—এমন কি কবরের পাশে পৌঁছেও মহৎ আদর্শের জন্য মরতে প্রস্তুত মানুষদের মাঝখানে দাঁড়িয়েও সেই অহংকার। অহংকার! আমাদের কালের এটাই বৈশিষ্ট্য, এটাই সুস্পষ্ট রোগ। বসন্ত অথবা কলেরার মতো এই মনোবৃত্তির কথাই বা আগেকার কালের লোকদের মধ্যে শোনা যেত না কেন? আমাদের যুগেই বা কেবলমাত্র তিন শ্রেণীর মানুষ রয়েছে কেন : একদল যারা এই অহংকারকে বাস্তব সত্য বলেই সঠিক বলে মনে করে এবং স্বেচ্ছায় তার কাছে আত্মসমর্পণ করে; আর একদল মনে করে এটা দুর্ভাগ্যজনক হলেও অপরিহার্য; আর তৃতীয় দল না জেনে শুনেই ক্রীতদাসের মতো এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কাজ করে? কেনই বা হোমার ও শেক্সপীয়ার বলে গেছেন ভালবাসা, গৌরব ও যন্ত্রণার কথা, আর আমাদের এ যুগের সাহিত্যে হঠাৎ নবাবদের ও অহংকারের সীমাহীন কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়?

লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেন মিখাইলভ দু'বার তার অভিজাত দলের পাশ কাটিয়ে চলাফেরা করল, কিন্তু তৃতীয়বার সাহস সঞ্চয় করে তাদের দিকে এগিয়ে গেল। সে দলে ছিল চারজন অফিসার : অ্যাডজুট্যান্ট কালুগিন, সে মিখাইলভের পূর্বপরিচিত; অ্যাডজুট্যান্ট প্রিন্স গল্টসিন, কালুগিন-এর চোখে সেও একজন ছোটখাট অভিজাত; লেফ্‌টেন্যান্ট-কর্নেল নেফার্দভ, সে তথাকথিত উঁচু সমাজের সেই "১২২" জনের একজন যারা সামরিক চাকরিতে নতুন করে যোগ দিয়েছে দেশপ্রেমের টানে, কিছুটা উচ্চাকাংখার বশে, কিন্তু প্রধানতঃ সকলেই একাজ করছে বলে; সে মস্কোয় একজন প্রধান পালোয়ান, এখানে এসে সেই অসন্তুষ্টদের দলে যোগ দিয়েছে যারা কিছু করে না, কিছু বোঝে না, আর কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে প্রচারিত যে কোনও হুকুমেরই নিন্দা করে; আর আছে অশ্বারোহী বাহিনীর ক্যাপ্টেন প্রাস্কুখিন, সেও "১২২" বীরের একজন। মিখাইলভ-এর কপাল ভাল যে কালুগিন-এর মন-মেজাজ খুব ভাল ছিল; তাই লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেন মিখাইলভ-এর সঙ্গে করমর্দন করাটাকে সে মর্যাদাহানিকর বলে মনে করল না। কিন্তু প্রাস্কুখিন-এর মনের ভাবটা একটু অন্য রকম; যদিও দুর্গের মধ্যে প্রাস্কুখিন এর সঙ্গে অনেকবারই মিখাইলভ-এর দেখা হয়েছে, মিখাইলভ্-এর মদ ও ভদ্‌কা সে অনেকবার খেয়েছে, এমন কি তাস খেলার

দরুন তার কাছে বারো রুবল পঞ্চাশ কোপেক ধারও রয়েছে। প্রিন্স গল্টসিন-এর সঙ্গে ভাল রকম পরিচয় না থাকায় পদাতিক বাহিনীর একজন সাধারণ লেফ্টেন্যান্ট ক্যাপ্টেনের সঙ্গে নিজের পরিচয়টা সে প্রকাশ করতে চাইল না, সামান্য একটু মাথা নোয়াল মাত্র।

কালুগিন মিখাইলভকে বলল, "এই যে ক্যাপ্টেন, আবার কবে দুর্গের মধ্যে দেখা হবে? শোয়ার্টজ্ বহির্দুর্গে সাক্ষাৎ হওয়ার কথা মনে আছে তো? সেখানটা বেশ গরম ছিল, তাই না?"

"হ্যাঁ, তা ছিল," মিখাইলভ জবাব দিলো; সে রাতের তিক্ত স্মৃতি তার মনে ভেসে উঠল; প্রায় উপুড় হয়ে ট্রেঞ্চের ভিতরে হামাগুড়ি দিতে দিতে দুর্গে পৌঁছে যখন কালুগিন-এর সঙ্গে তার দেখা হলো তখন সানন্দে তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে সে খুশি মনে হেঁটে বেড়াচ্ছিল।

মিখাইলভ আরও বলল, "আমার তো কালই যাবার কথা, কিন্তু আমাদের একজন অফিসার অসুস্থ হয়ে পড়েছে তাই...।" সে বলতে চাইল, তার যাবার পালা এখনও আসেনি, কিন্তু যেহেতু অষ্টম সেনাদলেব কম্যান্ডার অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং ঐ দলে মাত্র একজন পতাকাবাহী অবশিষ্ট আছে, তাই লেফ্টেন্যান্ট নেপ্শিৎশেৎস্কির পরিবর্তে কাজ করা তার কর্তব্য, আর তাই আজ রাতেই তাকে দুর্গের পথে যাত্রা করতে হবে। কিন্তু কালুগিন মোটেই তার কথা শুনছিল না।

সে প্রিন্স গল্ট্সিনকে বলল, "আমার আশংকা হচ্ছে, দু'একদিনের মধ্যেই একটা কিছু ঘটবে।"

একবার কালুগিনের দিকে ও তারপরে গল্টসিনের দিকে তাকিয়ে মিখাইলভ ভীরু গলায় জিজ্ঞাসা করল, "আজ কি কিছু ঘটবে না?" কেউ তার প্রশ্নেব জবাব দিলো না। হাস্যকরভাবে নাকটাকে উঁচু করে প্রশ্নকর্তাব টুপির পাশ দিয়ে তাকিয়ে একটু থেমে গল্ট্সিন বলে উঠল :

"লাল রুমাল বেঁধে বেড়ে সেজেছে তো মেয়েটা। মেয়েটাকে চেন নাকি ক্যাপ্টেন?"

লেফ্টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেন জবাব দিলো, "একজন নাবিকের মেয়ে। আমার বাসার পাশেই থাকে।"

"চলো তো, ভাল করে একবার দেখি।"

প্রিন্স গল্ট্সনি এক হাতে কালুগিনের হাত ধরল, আর অন্য হাতে ধরল লেফ্টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেনের হাত, কারণ সে জানে এতে সে খুব খুশি হবে—আর তাই হলো।

লেফ্টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেন সংস্কারপন্থী লোক; সে মনে করে যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার আগে মেয়েদের নিয়ে ফূর্তি করা মহাপাপ। এ ক্ষেত্রে কিন্তু সে একজন ধুরন্ধর লম্পটের

মতোই ভাব দেখাল; কিন্তু প্রিন্স গল্টসিন বা কালুগিন কেউই বিশেষ পাত্তা দিলো না; লাল রুমাল বাঁধা মেয়েটি প্রায়ই লক্ষ্য করেছে যে জানালার পাশ দিয়ে যাতায়াতের পথে লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেনের মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে; তাই এ ক্ষেত্রে সেও অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। তাদের পিছন পিছন হাঁটতে হাটতে প্রাস্কখিন অনবরত প্রিন্স গল্ট্‌সিন-এর বাহুতে টোকা মারছে আর ফরাসীতে নানা রকম মন্তব্য করছে; কিন্তু রাস্তাটা চারজনের পক্ষে খুবই সরু হওয়ায় তার পক্ষে একা একা হাঁটা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না; দ্বিতীয় পাক ঘুরবার সময় নৌ-বিভাগীয় বিখ্যাত ও সাহসী অফিসার সের্‌ভিয়াগিন এসে তার সঙ্গে কথা বলায় সে তাব হাতে হাত মেলাল। বিখ্যাত বীরটি যে হাতে অনেক ফরাসী সৈন্য মেরেছে সেই হাত দিয়ে প্রাস্কখিন-এর হাতটা জড়িয়ে ধরল, যদিও সের্‌ভিয়াগিন সহ সকলেই তাকে একটা বাজে লোক বলেই মনে করে।

ইতিমধ্যে লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেন মিখাইলভ এই সব ভদ্রলোকদের দলে মিশে হাঁটতে পেরে এতই মজে গেল যে টি, থেকে আগত আদরের চিঠিটার কথা, দুর্গে যেতে হচ্ছে বলে দুশ্চিন্তার কথা, এবং সাতটায় যে তাকে বাড়ি পৌঁছতে হবে সে কথাও সে বেমালুম ভুলে গেল। কিন্তু ক্রমে সেই সব ভদ্রলোকরা শুধু নিজেদের মধ্যেই কথাবার্তা চালাতে লাগল, তার দিকে আর ফিরেও তাকাল না, এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন এবার তার চলে যাওয়াই উচিত এবং শেষ পর্যন্ত যতক্ষণ তারা নিজেরাই না চলে গেল ততক্ষণ সে তাদের সঙ্গেই কাটাল। তথাপি লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেনের মেজাজ বেশ খুশিই থাকল, এবং যে সমর-শিক্ষার্থী ব্যারন পেস্ত নিজেকে একজন কেউ-কেটা বলে মনে করে সে যখন পাশ দিয়ে যাবার সময় বেশ একটু উদ্ধত ভঙ্গিতে তাকে অভিবাদন করল তখনও সে মোটেই মনঃক্ষুণ্ণ হলো না।

৪

নিজের বাসার দরজায় পা রাখা মাত্রই একটা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের চিন্তা লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেনের মনকে যেন পেয়ে বসল। সামনেই পড়ে আছে তার ছোট ঘরটা; অসমান মাটির মেঝে, বাঁকা-বাঁকা কাগজ-আঁটা জানালা, পুরনো একটা বিছানা; জনৈকা সাহসিকার ছবি আঁকা কম্বলটা দেয়ালে পেরেক দিয়ে আঁটা, আব তার সঙ্গে বাঁধা দুটো "তুলা" পিস্তল; যে সমর-শিক্ষার্থীর সঙ্গে সে একই ঘরে থাকে তার বিছানাটাও নোংরা, একটা সুতির লেপ দিয়ে ঢাকা; আর আছে তার নিকিতা; মাথায় তেল-চিটচিটে অগোছালো চুল; মেঝেতে উঠে দাঁড়িয়ে গা চুলকোচ্ছে; ঐ তো তার পুরনো গ্রেটকোট, তার বুট, আর একটা ঝোলা; ঝোলার মধ্যে আছে সাবানের মতো একটুকরো পনির ও ভদ্‌কা-ভর্তি একটা বীয়ারের বোতল; দুর্গের পথে আসন্ন যাত্রার প্রস্তুতি হিসাবে সে সব কিছুই গুছিয়ে রেখেছে;—মহা আতংকে হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল যে এই বাসাতে ওর সঙ্গেই তাকে একটা পুরো রাত কাটাতে হয়েছে।

নিজের মনেই বলতে লাগল, "আজ রাতে আমি তো অবশ্যই মারা যাব। সেটা আমি বুঝতেই পারছি। আর সব চাইতে খারাপ কথা এই যে আমি না গেলেও পারতাম, আমি তো স্বেচ্ছায় যাচ্ছি। আর এ ভাবে যে যায় সেই মরে। বেচারা সেপ্‌শিৎস্কির ব্যাপারটা কি? আসলে সে হয়তো মোটেই অসুস্থ নয়, আর এদিকে তার জন্যই একটা লোক মরতে চলেছে। নির্ঘাৎ মরবে। তবু, যদি না মরি তাহলে হয়তো একটা কোনও উপাধির জন্য আমার নাম সুপারিশ করা হবে। আমি যখন বলেছিলাম, "লেফ্‌টেন্যান্ট সেপ্‌শিৎস্কি যখন অসুস্থ তখন তার বদলে আমাকে যাবার অনুমতি দিন", তখন রেজিমেন্ট-কম্যান্ডারের খুশির ভাবটা আমি তো দেখেছি। আমাকে যদি মেজর কবা নাও হয়, অর্ডার অব ভ্লাদিমির" তো নিশ্চয় পাব। এই ত্রয়োদশ বার আমি দুর্গে যাচ্ছি। হায়, ১৩। একটি অপয়া সংখ্যা! এবার আমি মাবা পড়বই। আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু একজন কাউকে তো যেতেই হতো। একজন পতাকাবাহীর অধীনে তো একটা বাহিনী যেতে পারে না। ধরুন, যদি কিছু ঘটে? একটি রেজিমেন্টের সম্মান, একটি বাহিনীর সম্মান বিপন্ন হবে। যাওয়া আমার কর্তব্য...হ্যাঁ, কর্তব্য। কিন্তু আমার মনে একটা আশংকা দেখা দিয়েছে।" লেফ্‌টেন্যান্ট-কম্যান্ডার ভুলে গেল যে, যতবার সে দুর্গে গেছে ততবারই এই আশংকা অল্প-বিস্তব তাকে পেয়ে বসেছে; তার মনেও হলো না যে, যে কেউ প্রত্যক্ষ যুদ্ধে যায় তার মনেই এই আশংকা অল্পবিস্তর দেখা দেয়। তার কর্তব্যবোধটা অত্যন্ত প্রখব, আর এই কর্তব্যবোধেই কিছুটা শান্তভাবে সে তার বাবাকে ও আত্মীয়স্বজনকে শেষ বিদায় জানিয়ে চিঠি লিখতে বসল, অথচ সম্প্রতি টাকা-পয়সা নিয়ে তাদেব সঙ্গেই তার মন-কষাকষি হয়ে গেছে; দশ মিনিট পরে চিঠিটা শেষ করে সে টেবিল থেকে উঠে দাঁড়াল; তার চোখ দুটি জলে ভেজা; যত রকম প্রার্থনা তাব জানা ছিল সব সে মনে মনে আবৃত্তি করতে লাগল (চাকরের সামনে জোরে জোরে প্রার্থনা কবতে তার লজ্জা করছিল): তারপরেই সে পোশাক পরতে শুরু করল। সন্ত মিত্রফানোস-এব ছোট মূর্তিটাকে চুমো খেতে তার খুব ইচ্ছা করছিল; মরবার আগে মা তাকে এই মূর্তিটা দিয়ে গেছে। এটাকে সে খুব বিশ্বাস করে; কিন্তু নিকিতার সামনে লজ্জা পেয়ে সে মূর্তিটাকে কোটের বাইরে ঝুলিয়ে রাখল, যাতে রাস্তায় নেমে বোতাম না খুলেই সেটাতে হাত দিতে পারে। মাতাল বোকা চাকবটা আলস্যভরে নতুন কোটটা এগিয়ে দিলো (দুর্গে সাধারণত যে পুরনো কোটটা সে পরে সেটা রিপু করা হয়নি)।

মিখাইলভ রেগে বলল, "আমার কোটটা রিপু করা হয়নি কেন? তুমি তো পড়ে পড়ে খালি ঘুমোও, ব্যাটা পাজি!"

নিকিতা আপত্তি জানিয়ে বলল, "ঘুম! ভোর থেকে রাত পর্যন্ত তো দুই পায়ে খাড়া থাকি; কুকুরের মতো ক্লান্ত হয়ে পড়ি; তবু একবার চোখ বুজতেও পারি না!"

"আবার মদ টেনেছ দেখতে পাচ্ছি।"

"টেনেছি তো কি হয়েছে? আপনার পয়সায় তো মাতাল হইনি।"

"মুখ সামলে কথা বল্, জানোয়ার কোথাকার!" লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে বলল। একে তার মন-মেজাজ খারাপ, তার উপর নিকিতার এই স্পর্ধা দেখে তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল; বারো বছর ধরে নিকিতা তার কাছে আছে; তাকে সে ভালবাসে, কিছুটা আস্কারাও দেয়। লোকটাকে মারতেই সে হাত তুলল।

চাকরটা বলে উঠল, "জানোয়ার! জানোয়ার! আমাকে গালাগালি করছেন কেন স্যার? বিশেষ করে এই সময়ে? এ সব করা পাপ!"

সে কোথায় চলেছে সে-কথা মনে করে মিখাইলভ লজ্জা পেল।

ভীরু গলায় বলল, "দেখো নিকিতা, তোমাকে দেখলে একজন সন্তের পিত্তিও জ্বলে ওঠে। টেবিলের উপর আমার বাবাকে লেখা একটা চিঠি রইল—ওটাতে হাত দিও না, যেমন আছে তেমনই থাকে যেন।"

নিজের পয়সায় কেনা ভদ্‌কার প্রভাবে গলে গিয়ে নিকিতা বলল, "ঠিক আছে স্যার", চোখের জল চাপবার জন্যই চোখ দুটো মিটমিট করতে লাগল।

কিন্তু ফটকের কাছে গিয়ে লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেন যখন বলল, "বিদায় নিকিতা!" তখন সে বেচারি হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠে মনিবের হাতে চুমো খাবার জন্য ছুটে গেল। নাক টানতে টানতে আর্তকণ্ঠে বলল, "বিদায় কর্তা!"

বুড়ো নাবিকের বিধবা বৌটি ফটকেই দাঁড়িয়ে ছিল: এ রকম একটা দৃশ্যে উপস্থিত না থেকে সে পারেনি। নোংরা আস্তিন দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে সে ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে লাগল, ভদ্রমশায়দেরই যদি এই কষ্ট ভোগ করতে হয় তো তার মতো হতভাগিনী যে বিধবা হবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? আর এই একশ' বারের মতো সে মাতাল নিকিতাকে তার দুঃখের কথা বলতে লাগল : কেমন করে প্রথম বোমাবর্ষণের ফলেই তার স্বামীর মৃত্যু হয়েছিল, আর তার গ্রামের কুঁড়ে ঘরটা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল (যে ঘরে সে এখন বাস করে সেটা তার নিজের নয়), ইত্যাদি, ইত্যাদি। মনিব চলে যেতেই নিকিতার হা হুতাশ থেমে গেল, পাইপ ধরিয়ে সে বাড়ির মালকিনের মেয়েকে পাঠাল ভদ্‌কা আনতে। তার সব দুঃখ তখন উবে গেছে; বুড়িটা তার বালতিটাকে টোল খাইয়ে দিয়েছে বলে সে বুড়ির সঙ্গে ঝগড়া জুড়ে দিলো।

গোধূলি বেলায় নিজের দলবল নিয়ে দুর্গের কাছাকাছি পৌঁছে লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেন ভাবতে লাগল, "হয়তো একটু আহত হয়েই আমি রেহাই পেয়ে যাব। কিন্তু কোথায়? কি ভাবে? এখানে, না এখানে?" মনে মনেই নিজের তলপেটে বা বুকে হাত দিয়ে সে বলতে লাগল। উরুর কথা ভেবে নিয়ে সে বলল, "যদি এখানে আঘাত পাই, তাহলে সেরে যাবার পরেও ব্যথাটা থাকবে। কিন্তু যদি কোনও টুকরো ভিতরে ঢুকে যায়?— তাহলেই দফা রফা।"

যা হোক, উপুড় হয়ে ট্রেঞ্চের ভিতরে হামাগুড়ি দিয়ে লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেন

নিরাপদে আস্তানায় পৌঁছে গেল। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। তার মধ্যেই জনৈক সুরঙ্গখনক অফিসারের সহায়তায় সে তার লোকজনদের যার যার কাজ বুঝিয়ে দিলো এবং বুক সমান উঁচু পাঁচিলের খোঁড়লের মধ্যে নিজের জন্য একটা জায়গা করে নিলো। গোলাগুলি সামান্যই চলছে; শুধু অনেকক্ষণ পরে পরে একটা বিদ্যুতের ঝিলিক চোখে পড়ছে—কখনও আমাদের দিক থেকে, কখনও বা "তার" দিক থেকে; আর অন্ধকার তারাভরা আকাশের বুকে ও গোলার ঝল্‌সানো পলতেটা একটা অগ্নিময় বৃত্তাংশ রচনা করছে। কিন্তু লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেন যেখানে তার খোঁড়লের মধ্যে সে আছে সব গোলাগুলিই ফাটছে তার অনেক পিছনে ও তাদের আস্তানার ডান দিকে। ফলে সে নিশ্চিন্ত মনে ভদ্‌কায় চুমুক দিলো, সাবানের মতো পনিরের টুকরোটায় কামড় বসাল, একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রার্থনাগুলি আওড়াল এবং তারপরে শান্ত মনে ঘুমের আয়োজনে মন দিলো।

৫

প্রিন্স গল্‌ট্‌সিন, লেফ্‌টেন্যান্ট-কর্নেল নেফার্‌দভ, রাজপথে তাদের সঙ্গে জুটে-যাওয়া শিক্ষার্থী ব্যারন-পেস্ত—সকলেই পথ ছেড়ে কালুগিন-এর আস্তানায় গেল চা খেতে। প্রাস্কুখিনকে কেউ ডাকেনি, তার সঙ্গে কেউ কথাও বলেনি, তবু সে তাদের পিছন ছাড়েনি।

কোটটা খুলে জানালার পাশে একটা আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে তার নিভাঁজ কড়া ইস্তিরিকরা হল্যান্ড শার্টের কলারের বোতাম খুলতে খুলতে কালুগিন বলল, "ভাস্কা মেন্ডেল-এর কথা তো এখনও সবটা বললে না? কেমন করে তার বিয়ে হলো?"

"সে কথা শুনলে তুমি মারা পড়বে বন্ধু! আমি বলছি; এক সময় সেন্ট পিতার্সবুর্গে এ ছাড়া আর কোনও কথাই ছিল না!" পিয়ানোর টুল থেকে লাফ দিয়ে উঠে জানালার গোবরাটে কালুগিন-এর কাছে বসে গল্‌ট্‌সিন হেসে বলল, "তুমি স্রেফ মারা পড়বে। তার সব খবর আমি রাখি।" বেশ রসিয়ে রসিয়ে একটি চমৎকার প্রেমের গল্প সে বলে গেল। সে বিষয়ে আমাদের কোনও আগ্রহ নেই বলে সে গল্পটা আমরা বাদ দিলাম।

সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, কেবলমাত্র প্রিন্স গল্‌ট্‌সিনই নয়, সেই ঘরে সমবেত অন্য সকলেই হঠাৎ একেবারে বদলে গেছে; যে হাস্যকর অহংকারে ফুলে উঠে তারা পদাতিক বাহিনীর অফিসারদের এতক্ষণ করুণার চোখে দেখছিল তা যেন কোথায় মিলিয়ে গেছে। নিজেদের দলের মধ্যে এসে তারা যেন নিজেদের স্বরূপকে ফিরে পেয়েছে, বিশেষ করে কালুগিন ও গল্‌ট্‌সিন—সেই একই মনোহর, সাদাসিধে, ফূর্তিবাজ ও সৎ প্রকৃতির যুবক হয়ে উঠেছে। সেন্ট পিতার্সবুর্গে তাদের সহকর্মী অফিসার ও পারস্পরিক পরিচিত জনদের নিয়েই তাদের মধ্যে আলোচনা চলছিল।

"মাস্‌লৎস্কাই কেমন আছে?"

"কোন্ জন—লাইফ গার্ড দলের, না হর্স গার্ড দলের?"

"আমি দু'জনকেই চিনি। আমার সময়ে হর্স গার্ড দলের লোকটি ছিল সুরঙ্গ খনক। সবে স্কুল থেকে বেরিয়েছে। কিন্তু বড় জনের খবর কি—এতদিনে সে কি ক্যাপ্টেন হয়েছে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেক আগেই হয়েছে।"

"জিপ্‌সি মেয়েটার সঙ্গে এখনও চালাচ্ছে না কি?"

"না, সেটাকে ছেড়ে দিয়েছে...।" এমনি ধারা সব আলোচনা।

গল্ট্‌সিন পিয়ানোতে বসে একটি জিপ্‌সি গানের সুর বাজাল। বিনা আমন্ত্রণেই প্রাস্কুখিন দ্বিতীয় সুরটা বাজাল, আর সে এতই ভাল বাজাল যে তাকে আরও বাজাতে বলা হলো; তার খুশি আর ধরে না।

চা, দুধের সর ও কেক ভর্তি ট্রে নিয়ে একটি চাকর ঘরে ঢুকল।

"প্রিন্সকে দাও," কালুগিন হুকুম করল।

একটা গ্লাস তুলে নিয়ে জানালার কাছে গিয়ে গল্ট্‌সিন বলল, "একটা অবরুদ্ধ শহরে বসে আমরা পিয়ানোতে টুং-টাং সুর তুলছি, সর-দেওয়া চা খাচ্ছি, আর এমন একটা বাসায় রয়েছি যেটা পিতাসবুর্গে পেলেও আমি বর্তে যেতাম, এটা ভাবলে খুবই অবাক লাগে না কি?"

সদা-বিরক্ত লেফ্‌টেন্যান্ট-কর্নেল বলল, "এসব না থাকলে তো একটা কিছুর জন্য এই অবিরাম প্রতীক্ষা অসম্ভব হয়ে উঠত; চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি তাদের গোলাবর্ষণের আর শেষ নেই; এর পরেও যদি নোংরার মধ্যে থাকতে হতো, কোনও আরাম-আয়েসের ব্যবস্থা না থাকত...।"

কালুগিন বলল, "কিন্তু আমাদের পদাতিক বাহিনীর অফিসারদের কথা ভাবো; তারা তো সৈন্যদের নিয়ে দুর্গেই বাস করে, মাটির পাঁচিলের আড়ালে ঘুমোয়, আর সৈনিকদের খানা খায়; তাদের কি অবস্থা?"

"সেটাই আমি ঠিক বুঝতে পারি না," গল্ট্‌সিন বলল। "সত্যি কথা বলতে কি, নোংরা হাত, নোংরা তলবাস আর উকুন নিয়ে বাস করে কেউ সাহসী হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। কি জানো, ভদ্রলোকদের মতো সাহসিকতা তাদের থাকতেই পারে না।"

"সে সাহসিকতার কোনও ধারণাই তাদের নেই," প্রাস্কুখিন বলল।

কালুগিন রেগে বলে উঠল, "কী বাজে কথা বলছ! তাদের আমি তোমার চাইতে অনেক বেশি চিনি। আমি বলছি, যতই তারা উকুনের কামড় খাক আর একটানা দশ দিন একই পোশাক পরে কাটাক, তবু আমাদের পদাতিক বাহিনীর অফিসাররা বীর, তাদের দেখে অবাক হতে হয়।"

"আমি...আমি হুকুম নিয়ে এসেছি...আমি কি জেনারেল...মানে হিজ এক্সেলেন্সির সঙ্গে দেখা করতে পারি? আমি আসছি জেনারেল এন. এন. এর কাছ থেকে," বিচলিতভাবে কোনও রকমে কথাগুলি বলে সে অভিবাদন করল।

কালুগিন উঠে দাঁড়াল। প্রত্যভিবাদন না জানিয়েই কাষ্ঠ হাসি হেসে তাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে গল্ট্‌সিন-এর দিকে না ঘুরে ফরাসীতে আলোচনা শুরু করে দিলো; বেচারি অফিসারটিকে না বলল বসতে, না তার প্রতি কোনও রকম নজর দিলো। বেচারি হাঁ করে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল; নিজেকে নিয়ে বা তার দস্তানাবিহীন হাত নিয়ে কি যে করবে তাই বুঝতে পারল না।

একটু থেমে সে আবার বলল, "এটা খুব জরুরী স্যার।"

"ওঃ। তাহলে দয়া করে এদিকে আসুন," কোটটা গায়ে চাপিয়ে সেই একই আপত্তিকর হাসি হেসে কালুগিন অফিসারটিকে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল।

"শোনো হে তোমরা, আজ রাতটা বেশ গরম হবে বলে মনে হচ্ছে," জেনারেলের বাসা থেকে ফিরে এসে কালুগিন বলল।

"অ্যাঁ? কি? কি? অবরোধকারীদের পাল্টা আক্রমণ করা হবে না কি?" সকলেই জানতে চাইল।

রহস্যময় হাসি হেসে কালুগিন জবাব দিলো, "আমি জানি না। নিজেরাই দেখতে পাবে।"

ব্যারন পেস্ত বলল, "আমাকে অন্তত বলুন। সে রকম কিছু ঘটলে প্রথম অভিযানে টি. রেজিমেন্টের সঙ্গেই আমাকে যেতে হবে।"

"বেশ তো। তাই যেয়ো। ঈশ্বর তোমার সহায় হন।"

"আমার উপরওলাও দুর্গেই আছেন, কাজেই আমাকেও যেতে হবে," তলোয়ার কোমরে ঝোলাতে ঝোলাতে প্রাস্কুখিন বলল, কিন্তু কেউ তার কথায় কান দিলো না—সে যাবে কি যাবে না সেটা তো তারই জানবার কথা।

আসন্ন যুদ্ধের চিন্তায় দমে গিয়ে ব্যারন পেস্ত্‌ বলল, "আমার মন বলছে কিছুই হবে না;" তথাপি টুপিটাকে কাৎ করে মাথায় বসিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে সে প্রাস্কুখিন ও নেফার্দভ-এর সঙ্গে বেরিয়ে গেল; ভয় তাদের বুকের উপরেও চেপে বসেছে। "বিদায় ভদ্রজনরা। অবিভোয়া, ভদ্রজনরা। আজ রাতেই আবার দেখা হবে," কালুগিন জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে প্রাস্কুখিন ও পেস্ত্‌-এর উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে বলল। তারা দু'জন কসাক ঘোড়ার জিনের উপর ঝুঁকে পড়ে জোর কদমে এগিয়ে চলেছে।

কালুগিন-এর কথাগুলি ধরতে না পেরে শিক্ষার্থীটি চেঁচিয়ে বলল, "হ্যাঁ, ঠিক তাই।" তারপরেই ছোট কসাক ঘোড়ার শব্দ অন্ধকার পথে মিলিয়ে গেল।

দুর্গের উপর দিয়ে ছুটন্ত গোলার দিকে তাকিয়ে কালুগিনের পাশেই জানালার উপর ঝুঁকে গল্ট্‌সিন জিজ্ঞাসা করল, "না এবার বলো, আজ রাতে সত্যি কি কিছু ঘটবে?"

"তোমাকে বলা যেতে পারে। তুমি তো দুর্গে ছিলে, তাই না? (গল্ট্সিন ঘাড় নাড়ল, যদিও মাত্র একবারই সে সেখানে ছিল) তাহলে, চেয়ে দেখো। আমাদের ঘুলঘুলির ঠিক উল্টো দিকে একটা ট্রেঞ্চ রয়েছে," একজন বিশেষজ্ঞ না হয়েও বেশ অভিজ্ঞ লোকের মতোই কালুগিন আমাদের ও শত্রুপক্ষের অবস্থানটা বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিয়ে আসন্ন যুদ্ধের একটা ছক তাকে বোঝাতে লাগল।

"তা তো হলো, কিন্তু ওরা যে আমাদের বাসা-বাড়িগুলোকেই কচু-কাটা করার তালে আছে দেখছি। ওঃ! ওটা কি আমাদের, না তাদের? ঐ যে দূরে যেটি ফাটল?" জানালার গোবরাটের উপর ঝুঁকে পড়ে দু'জনেই চেঁচিয়ে বলল। তারা তখন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আকাশের বুকে দু'দিককার ছুটন্ত গোলাগুলির কাটাকাটি করা অগ্নি-রেখার দিকে; ঘন নীল আকাশকে আলোকিত করে হঠাৎ ঝলসে ওঠা কামানের ঝিলিকের দিকে; আর বারুদের ধোঁয়ায় সাদা মেঘের কুণ্ডুলির দিকে। তাদের কানে বাজছে কামানের ক্রমবর্দ্ধমান গর্জন।

সেই আশ্চর্য দৃশ্যের দিকে অতিথির দৃষ্টি আকর্ষণ করে কালুগিন বলল, "কী আশ্চর্য দৃশ্য! তুমি কি জানো, কোনটা নক্ষত্র আর কোনটা গোলা, সেটা বলাই অসম্ভব?"

"হ্যাঁ, আমিও ভেবেছিলাম একটা নক্ষত্রকেই দেখছি, কিন্তু সেটা নিচে নেমে গেল; আবার ঐ যে, সেটা ফাটল! আর ওখানে ঐ যে বড় নক্ষত্রটা—ওটার কি নাম?—ঠিক একটা গোলার মতো দেখতে।"

"কি জানো, এই সব গোলাগুলি দেখে এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে রাশিয়ায় ফিরে যাবার পরে তারায় ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে তারাগুলোকেই গোলা বলে ভুল করে বসব। এমনই অভ্যাস হয়ে যায়।"

একটু থেমে প্রিন্স গল্ট্সিন বলল, "তুমি কি মনে করো না যে আমারও এই অভিযানে যোগ দেওয়া উচিত?" এই ভয়ংকর গোলাবর্ষণের মধ্যে ওখানে যাবার কথা ভাবতেই একদিকে যেমন তার বুকটা কেঁপে উঠছে, অন্যদিকে তেমনই এই রাতের বেলায় তাকে কিছুতেই ওখানে পাঠানো সম্ভব নয় এ কথা ভেবে তার খুশিরও সীমা নেই।

কোনও কিছুর বিনিময়েই গল্ট্সিন সেখানে যেতে চাইবে না একথা ভাল করে জেনেই কালুগিন জবাব দিলো। "না বাপু, ঈশ্বরের দোহাই! ও চিন্তা ছাড়ো! তাছাড়া, আমি তোমাকে যেতেই দেবো না।" তারপর বলল, "ও সুযোগ অনেক মিলবে ভায়া।"

"সত্যি সত্যি বলো। তুমি কি সত্যি মনে করো যে এখন আমার যাবার দরকার নেই?"

ঠিক সেই সময় কামান-গর্জনকে ছাপিয়ে অবিশ্রাম বন্দুকের গুলির একটা

ভয়ংকর শব্দ এসে কানে লাগল; ওরা যেদিকে তাকিয়ে ছিল ঠিক সেই দিক থেকেই শব্দটা এল; সারা পথ জুড়ে হাজারটা স্ফুলিঙ্গ ঝিলিক দিয়ে উঠল।

কালুগিন সোল্লাসে চেঁচিয়ে বলল, "এবার সত্যিকারের মজা শুরু হয়েছে! বন্দুকের শব্দ কানে এলে আমি আর স্থির থাকতে পারি না। সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে।...শুনতে পাচ্ছ ঐ যে—'হুর্‌রা'," দুর্গ থেকে ভেসে-আসা দূরাগত শত কণ্ঠের একটানা "আ-আ-আ-আ-আক্‌" চিৎকার শুনে সে শেষের কথাগুলি বলল।

"ও কাদের আনন্দ-ধ্বনি? তাদের না আমাদের?"

"তা বলতে পারছি না, কিন্তু তারা এবার মুখোমুখি যুদ্ধে মেতেছে, কারণ গুলির শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না।"

ঠিক সেই সময় একজন কসাককে সঙ্গে নিয়ে জনৈক এড্‌-ডি-কং ঘোড়া ছুটিয়ে ফটকের কাছে পৌছে জানালার নিচেই ঘোড়া থেকে নামল।

"তোমরা কোথা থেকে আসছ?"

"দুর্গ থেকে। জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

"চলে এস। আচ্ছা, ব্যাপার কি?"

"তারা আমাদের বাসস্থানগুলো আক্রমণ করেছে...দখল করে নিয়েছে...ফরাসীরা অনেক সৈন্যসামন্ত নিয়ে এসেছিল...আমাদের সৈন্যদের আক্রমণ করল...আমাদেব ছিল মাত্র দুই ব্যাটেলিয়ন সৈন্য," অফিসারটি হাঁপাতে লাগল। এ সেই অফিসার যে সন্ধ্যাবেলায় এসেছিল। দম ফুরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সে হাল্কা পায়ে লাফাতে লাফাতে দরজা পর্যন্ত উঠে গেল।

"আচ্ছা, আমরা কি পশ্চাদপসরণ করেছি?" গল্‌ট্‌সিন জিজ্ঞাসা করল।

"না," অফিসারটি রূঢ় গলায় জবাব দিলো। "ঠিক সময়ে আর এক ব্যাটেলিযন সৈন্য এসে আক্রমণ প্রতিহত করে দেয়, কিন্তু রেজিমেন্ট-কম্যান্ডার নিহত হয়েছেন, অনেক অফিসারও। আমি এসেছি আরও সৈন্য চাইতে...।"

এই কথা বলে সে জেনারেলের ঘরে চলে গেল। তাকে অনুসরণ করে আমরা কিন্তু সেখানে যাব না।

পাঁচ মিনিট পরে আধা-কসাক ভঙ্গিতে তার কসাক ঘোড়ায় চেপে কালুগিন জোর কদমে ছুটে গেল দুর্গের দিকে; সেখানে জেনারেলের নির্দেশ পৌছে দিয়ে যুদ্ধের সর্বশেষ খবরের জন্য অপেক্ষা করবে। এদিকে খুব কাছে থেকে যুদ্ধ চলতে দেখলে একজন দর্শকের মনে যে চঞ্চলতা জাগে তারই তাড়নায় প্রিন্স গল্‌ট্‌সিন বাড়িব বাইরে গিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় পায়চারি করতে লাগল।

৬

দলে দলে সৈনিকরা আহতদের হয় স্ট্রেচারে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর না হয়

তো ধরে ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে। রাস্তায় খুবই অন্ধকার; শুধু হাসপাতাল বাড়ির ও রাত-জাগা অফিসারদের বাসার জানালায় আলো জ্বলছে। দুর্গ থেকে এখনও গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে আসছে; কালো আকাশের বুকে ক্রমাগতই আলোর ঝিলিক ফুটে উঠছে। মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছে পত্রবাহকের ঘোড়ার খুরের খটখট শব্দ, আহতের আর্তনাদ, স্ট্রেচার-বাহকদের পায়ের শব্দ ও কণ্ঠস্বর, ভীতত্রস্ত মেয়েদের হৈ-হল্লা।

ফটকে দাঁড়িয়েছিল আমাদের বন্ধু নিকিতা, বুড়ো নাবিকের বিধবা স্ত্রী ও তার দশ বছরের মেয়ে।

"হায় প্রভু! হায় ঈশ্বর-জননী পবিত্র মেরি!" আগুনের গোলার মতো ছুটন্ত গোলা-গুলির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুড়ি কথাগুলি বলল। "তাকিয়ে দেখো! কী সাংঘাতিক! আই-আই-আই! প্রথম বোমা পড়ার সময়ও তো এরকমটা ঘটেনি। চেয়ে দেখো ওটা কোথায় ফাটল—ঠিক আমাদের গ্রামের বাড়িটার মাথায়।"

"না, না, আরও দূরে! সবগুলো পড়ছে আরিংকা মাসির বাগানে," মেয়েটি বলল।

নিকিতার তখনও নেশা কাটেনি। টেনে টেনে আর্তস্বরে সে বলতে লাগল, "আর এ সময় আমার মনিব কোথায় আছে? আহা, মনিবকে আমি কত যে ভালবাসি তোমাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না।...তিনি আমাকে মারেন, তবু তাকে আমি ভালবাসি। তাকে আমি এত ভালবাসি যে ঈশ্বর না করুন তার যদি মৃত্যু ঘটে, তাহলে—বিশ্বাস করো মাসি—আমি যে কি করব তা আমি নিজেই জানি না। ঈশ্বর সাক্ষী! কী একখানা মনিব—আঃ! ওই সব তাস-পেটা বাজে বাবুদের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না—উঃ!" মনিবের ঘরের আলোকিত জানালাটা দেখিয়ে নিকিতা কথা শেষ করল। লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেনের অনুপস্থিতিতে সমর-শিক্ষার্থী ঝাদ্‌চেস্কি তার সেন্ট জর্জেস ক্রশ প্রাপ্তি উপলক্ষে সেই ঘরে একটা ছোটখাট পার্টির আয়োজন করেছে। সেখানে হাজির ছিল সাব-লেফ্‌টেন্যান্ট উগ্রভিচ ও লেফ্‌টেন্যান্ট নেপ্‌শিৎচেৎস্কি! শেষোক্ত লোকটিরই দুর্গে যাবার পালা ছিল, কিন্তু মাড়িতে একটা ফোঁড়া হওয়ায় সে যেতে পারেনি।

ছোট মেয়েটি আকাশের দিকেই তাকিয়েছিল; এবার সে চেঁচিয়ে বলল, তারাগুলো কেমন খসে খসে পড়ছে আর ছুটছে! ওই দেখ আরও কয়েকটা! এসব কি মা'ম?"

মেয়ের কথায় কান না দিয়ে বুড়ি নিশ্বাস ফেলে বলল, এবার ওরা আমাদের বাড়ি-ঘর একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে।"

সুরেলা গলায় মেয়েটি বলতে লাগল, "আজ যখন আমি ও কাকা ওখানে গিয়েছিলাম, তখন সামনের ঘরে ক্যাবার্ডের পাশেই একটা কামানের গোলা দেখতে

পেয়েছিলাম; নিশ্চয় বারান্দা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল। আর এত বড় যে তুমি হাত দিয়ে তুলতেই পাববে না।"

বুড়ি বলল, "যাদের স্বামী আছে টাকা পয়সা আছে, তারা সকলেই চলে গেছে। কিন্তু আমি তো হতভাগিনী...ঐ বাড়িটাই আমার একমাত্র সম্বল. তাও শেষ হয়ে গেল। দেখো, দেখো, শয়তানরা কেমন সব কিছু পুড়িয়ে দিচ্ছে! প্রভু, হে প্রভু!"

"আর যেই আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছি অমনি একটা বড় বোমা মাথার উপব দিয়ে উড়ে এল—শোঁ-ও-ও-ও! আর তারপরেই ফেটে গেল—খ্‌-র-র-র ব-শ্‌! মাটি ছিটকে আমাদের উপর এসে পড়ল; আর একটু হলেই আমি ও কাকা বোমার টুকরোয় আঘাত পেতাম।"

শিক্ষার্থীটিও গোলাবর্ষণ দেখতে অন্য অফিসারদের সঙ্গে ফটকে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, "এ জন্য ওর "ক্রস" পাওয়া উচিত।"

বুড়ির কাঁধটা চাপড়ে দিয়ে লেফটেন্যান্ট নেপ্‌শিৎশেৎস্কি বলল. "দেখো বুড়ি, তোমার গিয়ে জেনারেলের সঙ্গে দেখা করা উচিত; সত্যি উচিত।"

তাবপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল, "আমি একবার পথে নেমে দেখে আসছি নতুন কি ঘটছে।"

ফূর্তিবাজ ঝাদ্‌চেস্কি হেসে উঠে বলল, "আব ইতিমধ্যে আমরা আর এক চুমুক ভদ্‌কা টেনে নেব; অবস্থা ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে।"

৭

প্রিন্স গল্‌ট্‌সিনের সঙ্গে আরও অনেক আহত সৈনিকেব দেখা হলো,— কেউ চলেছে স্ট্রেচারে চড়ে, আবার কেউ পরস্পরকে ধবে পায়ে হেঁটেই চলেছে; আর সকলেই কথা বলছে জোর গলায়।

কাঁধেব উপর থেকে দু'টো বন্দুক ঝুলিয়ে একটি ঢ্যাঙা সৈনিক বলে উঠল, "দেখেছো তো বাবাজিবা, ওরা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। 'আল্লা, আল্লা!' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ওরা সব কিছু ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে; একজনের পিছনে আর একজন ছুটে আসছে। কয়েকজনকে ফেলে দাও, অমনি আব একদল লাফিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে পড়বে; তাদের তোমরা কিছুই কবতে পারবে না। তারা যে দলের পর দল আসছে!"

এই সময় বক্তাকে থামিয়ে দিয়ে গল্‌ট্‌সিন জিজ্ঞাসা করল :

"তুমি কি দুর্গ থেকে আসছ?"

"হ্যাঁ, হুজুর।"

"আচ্ছা, ওখানে কি ঘটছে? সব আমাকে বলো।"

"কি ঘটছে? আরে, একটা খাঁটি বাহিনীর মতো তারা এল হুজুর! পাগলের মতো তারা প্রাচীরের দিকে ধেয়ে এল, আমরা তাদের বাধা দিতেও পারলাম না হুজুর!"

'কি বলছ তুমি তাদেব বাধা দিতে পারলে না? তোমবা তো তাদেব তাড়িয়ে দিয়েছ, তাই না?'

"তাদেব আমবা তাড়িয়ে দেব কেমন কবে? তাবা তো একটা গোটা বাহিনী নিয়ে এসেছিল। তাবা আমাদেব নিশ্চিহ্ন কবে দিলো, অথচ কোনও সাহায্য এল না।" (সৈনিকটি ভুল বলেছে, ট্রেঞ্চটা আমাদেব দখলেই ছিল, যে কেউ লক্ষ্য কবলেই দেখবেন যে যুদ্ধে আহত হলেই সে সৈনিক মনে কবে যে যুদ্ধে তাদেব হাব হয়েছে, আব যুদ্ধটা হয়েছে ভয়ানক বক্তাক্ত।)

গল্ট্‌সিন বিবক্ত গলায় বলল, "কিন্তু আমি শুনেছি সে আক্রমণ প্রতিহত বরা হয়েছে।"

ঠিক সেই সময় লেফটেন্যান্ট নেপশিৎশেৎস্কি সাদা টুপি দেখে অন্ধকাবেও প্রিন্স গল্ট্‌সিনকে চিনতে পেবে এই সুযোগে এব জন কর্তাব্যক্তিব সঙ্গে কথা বলাব ইচ্ছায় এগিয়ে গেল।

সসম্মানে নিজেব টুপিতে হাত বেখে জিজ্ঞাসা কবল, কি হয়েছে কিছু বুঝতে পাবছেন?"

সেটাই তো আপনাব চেষ্টা কবছি," প্রিন্স গল্ট্‌সিন বলল, তাবপব সেই দুই বন্দুকওয়ালা সৈনিকটিব দিকে ফিবে শুধাল "হয় তো তুমি চলে আসাব পবে আমবা ওদেব তাড়িয়ে দিয়েছি তুমি কি অনেকক্ষণ সেখান থেকে এসেছ?"

"আমি তো এই মাত্র সেখান থেকে আসছি হুজুব," সৈনিকটি জবাব দিলো। "আমবা তাদেব তাড়িয়ে দিয়েছি কি না আমাব সন্দেহ আছে নিশ্চয় তাবা ট্রেঞ্চটা দখল কবে নিয়েছে ওবা যে সংখ্যায় আমাদেব চাইতে অনেক বেশি ছিল।"

ট্রেঞ্চটা ছেড়ে দিয়েছ, এতে তোমাদেব লজ্জা কবছে না? এটা তো খুব খাবাপ কথা!' গল্ট্‌সিন সৈনিকটিকে বলল। "তোমাদেব লজ্জিত হওয়া উচিত।" মুখ ঘুবিয়ে সে কথাটা আব একবাব উচ্চাবণ কবল

"আঃ! ওবা সব সাংঘাতিক লোক! ওদেব আপনি চেনেন না স্যাব,' লেফটেন্যান্ট নেপ্‌শিৎশেৎস্কি সুবে সুব মিলিয়ে বলল।' আমি বলছি এ সব লোকেব কাছ থেকে গর্ব, দেশপ্রেম ও মহৎ কোনও অনুভূতি আশা কবাই বৃথা। এই যে দলে দলে আসছে ওদেব দিকে তাকিয়ে দেখুন। ওদেব দশ ভাগেব এক ভাগও আহত হয়নি--ওবা সকলেই সহকাবী --যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সবে আসবাব একটা ছুতো পেয়ে গেছে। ওবা সব বাজে লোক এ কাজেব জন্য তোমাদেব লজ্জিত হওয়া উচিত বাপু, সত্যি উচিত, এমনভাবে আমাদেব ট্রেঞ্চ ওদেব হাতে তুলে দিলে।" সৈনিকদেব লক্ষ্য কবে সে কথাগুলি বলল।

সৈনিকটি আপত্তি জানিয়ে বলল, "কিন্তু তাবা সংখ্যায় এত বেশি হলে আমবা কি কবতে পাবি?"

"আমি সেই কথাই বলছি হুজুর!" একটা স্ট্রেচার অফিসারদের সামনে এলে তার উপর থেকে একজন সৈনিক বলে উঠল। "আমাদের সৈন্যরা যখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তখন আমরা কেমন করে ট্রেঞ্চটাকে দখলে রাখব, বলুন? আমরাও যদি সংখ্যায় অনেক হতাম তাহলে কখনও ট্রেঞ্চ ছাড়তাম না, জীবন থাকতে নয়। কিন্তু আমি কি করব? একজনকে আমি সঙ্গীণে বিঁধালাম, আর তার পরেই কি একটা যেন আমার মাথার উপর ভেঙে পড়ল...ও-ওঃ! আস্তে চলো বাপুরা! ধীরে ধীরে, ও-ওঃ!" সে আর্তনাদ করতে লাগল।

"দেখে মনে হচ্ছে, সত্যি সত্যি যত লোক এখান দিয়ে যাচ্ছে তার দরকার ছিল না," গল্ট্‌সিন বলল; তার পাশেই দুই বন্দুকওয়ালা ঢ্যাঙা সৈনিকটির দিকে ফিরে বলল, "তুমি কোথায় যাচ্ছ? হেই, তুমি! থামো!"

সৈনিকটি থেমে বাঁ হাত দিয়ে টুপিটা খুলল।

"তুমি কোথায় যাচ্ছ? কেন যাচ্ছ?" তার দিকে তাকিয়ে গল্ট্‌সিন কঠোর গলায় বলল। "রাস্কে..." কিন্তু সৈনিকটির আরও কাছে গিয়েই সে দেখল যে তার ডান আস্তিনটা ফাঁকা, কনুই পর্যন্ত এবং তারও উপর পর্যন্ত জামাটা রক্তে ভিজে গেছে।

"আমি আহত হুজুর।"

"কোথায়?"

"ঠিক এখানে; মনে হয় একটা বুলেট বিঁধেছে," হাতের দিকে মাথাটা নুইয়ে সৈনিকটি বলল। "আর মাথায়ও আঘাত লেগেছিল, কিন্তু কিসের আঘাত আমি জানি না।" এই কথা বলে মাথাটা নিচু করে সে প্রিন্সকে দেখালো, গলার উপর দিকে রক্ত জমাট বেঁধে চুলগুলি জট পাকিয়ে গেছে।

"আর একটা বন্দুক ঘাড়ে করে চলেছ কেন? ওটা কি?"

"এটা ফরাসী 'স্টাট্‌জার' হুজুর। এটা আমি দখল করে নিয়েছি। এই ছোটখাট মানুষটিকে সাহায্য করতে না হলে আমি ট্রেঞ্চ ছেড়ে আসতাম না। ভাল করে ধরে না রাখলে সে পড়ে যাবে", সে আর একটি সৈনিককে দেখিয়ে দিলো। বন্দুকের উপর ভর দিয়ে কষ্টের সঙ্গে বাঁ পাটা টানতে টানতে সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

"আর তুমি কোথায় যাচ্ছ বদমাস!" প্রিন্সের মন ভেজাবার আশায় লেফ্‌টেন্যান্ট নেপ্‌শিৎশেৎস্কি আর একটি সৈনিককে দেখে চেঁচিয়ে বলল। সে সৈনিকটিও আহত।

সহসা প্রিন্স গল্ট্‌সিন লেফ্‌টেন্যান্ট নেপ্‌শিৎশেৎস্কির জন্য এবং আরও বেশি করে নিজের জন্য ভয়ংকর লজ্জিত বোধ করতে লাগল। সে বুঝতে পারল যে তার মুখটাও লাল হয়ে উঠেছে—এরকম কখনও হয় না—তখনই সে লেফ্‌টেন্যান্টের কাছ থেকে সরে গেল। আর কোনও রকম খোঁজখবর না করে, এমন কি আহত লোকগুলির দিকে না তাকিয়েই সে ড্রেসিং স্টেশনের দিকে পা চালিয়ে দিলো।

দলে দলে আহতরা পায়ে হেঁটে চলেছে; আহতদের নিয়ে স্ট্রেচারগুলো ভিতরে

ঢুকছে আর মৃতদের নিয়ে বেরিয়ে আসছে; অনেক কষ্টে তাদের ভিতর দিয়ে পথ করে গল্ট্সিন ফটকের সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে গেল; প্রথম যে ঘরটা পেল তাতেই ঢুকে গেল; ভিতরে চোখ ফেলেই আপনা থেকেই ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটে রাস্তায় নেমে গেল। সে দৃশ্য বড় ভয়ংকর।

৮

মস্ত বড়, উঁচু অন্ধকার ঘরটাতে চার-পাঁচটা মোমবাতি জ্বলছে। সেই আলোতেই সার্জনরা আহতদের পরীক্ষা করে। এখন ঘরটা একেবারে ঠাসা। স্ট্রেচার-বাহকরা অনবরত আহতদের নিয়ে আসছে, মেঝেতে পাশাপাশি শুইয়ে দিচ্ছে, তারপর আরও আহত সৈনিকদের আনতে বেরিয়ে যাচ্ছে। আহত সৈনিকদের ভিড় এত বেশি যে তারা পরস্পরকে জড়াজড়ি করে ধরে একে অন্যের রক্তের মধ্যেই শুয়ে আছে। মেঝের খালি জায়গাগুলোতে দৃশ্যমান রক্তের ধারা, কয়েক শ' লোকের দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস ও স্ট্রেচার-বাহকদের দেহনিঃসৃত ঘামের গন্ধ—সব কিছু মিলিয়ে কেমন একটা ভারী, ঘন, বদ গন্ধের অস্পষ্টতার ভিতর দিয়ে ঘরেব চার কোণে রাখা চারটি মোমবাতি কেঁপে কেঁপে আবছা আলো ছড়াচ্ছে। আর্তনাদ, দীর্ঘশ্বাস ও মুমূর্ষুর গলার ঘর্-ঘর্ শব্দে ঘরটা গম্-গম্ করছে; মাঝে মাঝে তাকেও ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে কান-ফাটানো চিৎকার। এখানে-ওখানে, আহতদের রক্তাক্ত কোট ও শার্টের মাঝে মাঝে নার্সদের দেখা যাচ্ছে। তাদের শান্ত মুখে স্ত্রীসুলভ সাশ্রুনেত্রে করুণার বদলে ফুটে উঠেছে সহানুভূতি। রোগীদের ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে তারা চলাফেরা করছে, ওষুধ, জল, ব্যান্ডেজ ও নরম কাপড় নিয়ে। সার্জনরা শক্ত মুখে শার্টের হাতা কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে রোগীদের পাশে হাঁটু ভেঙে বসে সহকারীদের হাতের মোমবাতির আলোয় বুলেটের ক্ষতের ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে; আহতদের আর্তনাদ ও অনুরোধ-উপরোধে কিছুমাত্র কান দিচ্ছে না। একজন সার্জন দরজার কাছে একটা ছোট টেবিল নিয়ে বসে আছে। গল্ট্সিন যখন ভিতরে উঁকি দিয়েছিল ঠিক সেই মুহূর্তে সে ৫৩২তম আগন্তুকের নাম নথিভুক্ত করছিল।

"আইভান বোগায়েভ, প্রাইভেট, তৃতীয় কোম্পানী, এস, রেজিমেন্ট, উরুতে জটিল অস্থিভঙ্গ," একটা ভাঙা পা পরীক্ষা করতে করতে ঘরের অপর কোণ থেকে একজন সার্জন চেঁচিয়ে বলল। "ওকে উপুড় করে ফেলো।"

"ও-ওঃ, বাবা, বাবাগো!" সৈনিকটি চেঁচিয়ে উঠল; তার পায়ে হাত না দিতে মিনতি জানাল।

"খুলির হাড় ভেঙে গেছে।"

সেমিয়ন নেফার্দভ, লেফ্টেন্যান্ট-কর্নেল, এন, পদাতিক রেজিমেন্ট। এরকম করলে হবে না কর্নেল। একটু সহ্য করতে চেষ্টা করুন, নইলে আমি হাত গুটিয়ে

নেব," একটা মুখ বাঁকা যন্ত্রের সাহায্যে হতভাগা লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেলের মাথার ভিতরকার ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা করতে করতে তৃতীয় একজন কথাগুলি বলল।

"ওঃ, ও রকম করবেন না! ঈশ্বরের দোহাই, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি,..আ আ-আঃ!"

"বুকটা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে.. সেবাস্তিয়ান সেমেদা, প্রাইভেট. কোন্ রেজিমেন্ট?.. না, কিছু লিখবেন না; এখুনি মারা যাবে। নিয়ে যাও," একটি সৈনিককে ছেড়ে উঠতে উঠতে সার্জন বলল; এর মধ্যেই সৈনিকটির চোখ উল্টে গেছে, আর গলা দিয়ে মৃত্যুকালীন ঘর্-ঘর্ শব্দ বের হচ্ছে

যাদের ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়ে যাবে তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য, আর যারা মারা যাবে তাদের গির্জায় নিয়ে যাবার জন্য প্রায় চল্লিশ জন স্ট্রেচার-বাহক দরজার কাছে অপেক্ষা করে ছিল। নীরবে তারা এই দৃশ্য দেখল আর মাঝে মাঝে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগল।

৯

দুর্গের দিকে যেতে যেতে অনেক আহত লোককে ছাড়িয়ে কালুগিন এগিয়ে চলল। সে অভিজ্ঞতা থেকেই জানে, যে লোক যুদ্ধে যাচ্ছে তার মনের উপর আহতদের দৃশ্য খুবই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে; তাই তাদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে সে তো দাঁড়ালই না, বরং তাদের এড়িয়ে যেতেই চেষ্টা করল। পাহাড়ের মাথায় একজন এড্-ডি-কংয়ের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল; লোকটি দুর্গের দিক থেকেই জোর কদমে ছুটে আসছে।

"জোভ্‌কিন! জোভ্‌কিন! এক সেকেন্ড দাঁড়াও!"

"কেন?"

"কোথা থেকে আসছ?"

"বাসাবাড়িগুলো থেকে?"

"সেখানকার অবস্থা কি রকম? গরম?"

"সেখানটা নরক হয়ে উঠেছে। ভয়ংকর!"

এইটুকু বলেই সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। আসলে, বন্দুকের গুলি বেশি চলছে না, কিন্তু কামানের গর্জন নতুন করে আরও তীব্রভাবে শুরু হয়েছে।

"খুব খারাপ মনে হচ্ছে", কালুগিন ভাবল, একটা অপ্রীতিকর অনুভূতি তার মধ্যেও জেগে উঠছে; তার মনেও আশংকা ঢুকেছে, অর্থাৎ সেই একই চিন্তা তারও মনে এসেছে—মৃত্যুর চিন্তা। কিন্তু কালুগিন লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেন মিখাইলভ নয়, সে গর্বিত, তার স্নায়ু ইস্পাৎকঠিন, এক কথায় যাকে সাহসী বলে সে তাই। একটি এড্-ডি-কং-এর গল্প তার মনে পড়ে গেল—যতদূর মনে পড়ে নেপোলিয়ানের এড্

ডি-কং—চিঠিপত্র যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে রক্তাক্ত মাথা নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে সে নেপোলিয়নের কাছে ফিরে গিয়েছিল।

"তুমি আহত?" নেপোলিয়ন জিজ্ঞাসা করেছিল।

"ক্ষমা করবেন স্যাব, আমি মৃত", বলেই সেই এড্-ডি কং মৃত্যুর বুকে ঢলে পড়েছিল।

সে ভাবল, এ একটা আশ্চর্য ঘটনা; মুহূর্তের জন্য সে নিজেকে সেই এড্-ডি-কং রূপে কল্পনা করল, তারপরেই আরও বেগবান কসাক ভঙ্গিতে আসীন হয়ে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কসাল। জোর কদমে ছুটে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামল। সেখানে দেখতে পেল, চারটি সৈনিক একটা পাথরের উপব বসে পাইপ টানছে।

"তোমরা এখানে কি কবছ?" সে চেঁচিয়ে বলল।

"একটি আহত লোককে পৌঁছে দিয়ে একটু বিশ্রাম করছি," পাইপটা পিছনে লুকিয়ে টুপিটা খুলে একজন বলল।

"বিশ্রাম করছ, না? উঠে পড়ো, এখনই জায়গামতো চলে যাও, নইলে রেজিমেন্ট কম্যান্ডারের কাছে বলে দেব!"

তাদেব সঙ্গে নিয়ে সেও ট্রেঞ্চ ধরে ঘুবে ঘুরে উপরে উঠতে লাগল; প্রতি পদক্ষেপেই আহত সৈনিকদেব সঙ্গে দেখা হতে লাগল। পাহাড়েব মাথায় উঠে সে বাঁ দিকের ট্রেঞ্চে বাঁক নিলো, আব কয়েক পা এগিয়েই সম্পূর্ণ একা হয়ে গেল। একটা গোলার টুকরো সাঁ করে তার পাশ দিয়ে গিয়ে ট্রেঞ্চের গায়ে পড়ল। আর একটা গোলা তার সামনেই এমনভাবে উপরে উঠে গেল যে মনে হলো বুঝি তাব দিকেই নেমে আসবে। হঠাৎ সে ভয় পেয়ে গেল। কয়েক পা দৌড়েই সে মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু গোলাটা যখন তার অনেক পিছনে ফাটল, তখন সে নিজের উপরেই ভীষণ বিরক্ত হলো। উঠে চারিদিকে তাকাল; দেখল কেউ তাব পড়ে যাওয়াটা দেখছে কিনা, কিন্তু আশেপাশে কেউ ছিল না।

ভয় যদি একবার কাউকে পেয়ে বসে তাহলে অন্য কোনও অনুভূতি সহজে সেখানে ঠাই পায় না; সে তো সর্বদাই গর্ব করে বলে থাকে যে সে কখনও ট্রেঞ্চের মধ্যে মাথা গলায়নি; অথচ সেই এখন প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ট্রেঞ্চ বরাবর ছুটতে লাগল। তাড়াতাড়িতে ঠোক্কর খেয়ে সে ভাবল, "আঃ, বড়ই খাবাপ। এবাব দেখছি নির্ঘাৎ মৃত্যু।" তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, সারা গায়ে ঘাম ঝড়ছে, এ সব দেখেশুনে সে নিজেই অবাক হয়ে গেল।

সহসা সামনে পায়ের শব্দ শুনতে পেল। তাড়াতাড়ি উঠে সে মাথাটা তুলল; তারপর তলোয়ারের শব্দ কবতে করতে সাহসের সঙ্গে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। সে যেন নিজেকেই নিজে চিনতে পারছে না। সে দেখল, একজন সুরঙ্গখনক অফিসার ও একজন নাবিক তার দিকেই দৌড়ে আসছে: অফিসারটি চিৎকার করে উঠল,

"বসে পড়ুন!" আর হাত তুলে দেখাল একটা উজ্জ্বল আলোর বিন্দু ক্রমবর্ধমান গতিতে এগিয়ে উজ্জ্বলতর হতে হতে ট্রেঞ্চের কাছেই মাটিতে গিয়ে পড়ল; সেই ভয়ার্ত চিৎকার শুনে আপনা থেকেই সে মাথাটা নিচু করল এবং তারপর আবার নিজের পথে এগিয়ে চলল।

"খুব সাহসী, তাই না?" নাবিকটি মন্তব্য করল; ঠাণ্ডা মাথায় সে গোলাটাকে মাটিতে পড়ে ফাটতে দেখল; অভিজ্ঞতা থেকেই সে বুঝেছে যে ওর টুকরো ট্রেঞ্চ পর্যন্ত আসবে না। "লোকটা কিছুতেই শুয়ে পড়ল না।"

খোলা জায়গা বরাবর আর কয়েক পা এগোলেই কালুগিন দুর্গের সেনাপতির ভূগর্ভস্থ কুঠুরির মধ্যে পৌঁছে যেতে পারবে; তবু আর একবার তার মনে হলো যে তার মনটা ফাঁকা হয়ে গেছে এবং সেই অর্থহীন ভয়টা আবার তাকে চেপে ধরেছে; তার হৃৎপিণ্ডটা দ্রুত দপ্‌দপ্‌ করতে লাগল, রক্ত উঠে এল মাথায়, এবং খোলা জায়গাটা পার হতে তাকে রীতিমতো কষ্ট কবতে হলো।

কালুগিন কাগজপত্রগুলোকে জেনারেলের হাতে পৌঁছে দিলে সে বলল, "তুমি এভাবে হাঁপাচ্ছ কেন?"

"খুব দ্রুত হেঁটে এসেছি ইয়োর এক্সেলেন্সি!"

"এক গ্লাস মদ খাবে কি?"

এক গ্লাস মদে চুমুক দিয়ে কালুগিন একটা সিগাবেট ধরালো। যুদ্ধ শেষ হয়েছে, যদিও দুই পক্ষ থেকেই গোলাবর্ষণ তখনও চলছে। কুঠুরির মধ্যে বসে দুর্গাধিপতি জেনারেল এন. এন. এবং প্রাস্কুখিনসহ আরও দু'জন অফিসার যুদ্ধ নিয়েই আলোচনা করছিল। ঘরটা খুবই আরামদায়ক; দেয়ালে নীল কাগজ, কোচ, বিছানা, কাগজপত্রে ভর্তি টেবিল, দেয়ালে ঘড়ি, দেবমূর্তির সামনে ছোট তেলের বাতিটা জ্বলছে। এই ঘরে বসে, বসবাসের এই সব দ্রব্য সামগ্রী দেখে, সিলিং-এর শক্ত শক্ত কড়ি-বরগার দিকে তাকিয়ে, এবং অস্পষ্টভাবে ভেসে আসা গোলাগুলির শব্দের দিকে কান পেতে কালুগিন কিছুতেই বুঝতে পারল না যে দুই-দুইবাব এরকম ক্ষমার অযোগ্য দুর্বলতা তাকে পেয়ে বসেছিল কেমন করে; নিজের প্রতি তার বিরক্তির শেষ রইল না; যাতে আর একবার নিজের শক্তির প্রমাণ করতে পারে সেজন্য বারবার সে বিপদকেই কামনা করতে লাগল।

"আপনাকে এখানে দেখে খুশি হলাম ক্যাপ্টেন," জেনারেলের কাছে সদ্য আগন্তু একজন নৌবিভাগীয় অফিসারকে সে কথাগুলি বলল। অফিসারটির ঝাঁকরা গোঁফ, স্টাফ অফিসারের গ্রেটকোট পরনে, তাতে সেন্ট জর্জের ক্রস বসানো; তার কামান সাজাবার প্রাচীরের দুটো ছিদ্র-পথ মেরামতের জন্য কয়েকজন লোক চাইতে সে এই মাত্র জেনারেলের কাছে এসেছে। তার কথা শেষ হলে কালুগিন বলল, "আপনার বন্দুকের গুলি ট্রেঞ্চ পর্যন্ত পৌঁছবে কি না সেটা পরীক্ষা করে দেখবার হুকুম জেনারেল আমাকে দিয়েছেন।"

"মাত্র একটি বন্দুক পাবে", ক্যাপ্টেন বিষণ্নমুখে জবাব দিলো।

"চলুন, স্বচক্ষে দেখে আসি।"

ক্যাপ্টেন ভুরু কুঁচকে সক্রোধে নাকের ভিতর থেকে এ রকম শব্দ করল।

বলল, "সারা রাত আমি বাইরে ছিলাম; এই মাত্র একটু বিশ্রাম নিতে এসেছি। আপনি কি একা যেতে পারবেন না? আমার সহকারী লেফ্‌টেন্যান্ট কাৎজ্‌ সেখানে আছে। সে আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাবে।"

এই ক্যাপ্টেনটি পুরো ছ'মাস ধরে দুর্গের অন্যতম বিপজ্জনক গোলন্দাজ বাহিনীর দায়িত্ব নিয়ে আছে, এবং দুর্গ অবরোধ হবার পর থেকে কখনও দুর্গ ছেড়ে বাইরে যায়নি। নাবিকদের মধ্যেও সাহসী বলে তার খ্যাতি আছে। ফলে ক্যাপ্টেন তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় কালুগিন বিস্মিত ও বিচলিত বোধ করল।

"এর পরেও সুখ্যাতির মানে কি থাকল?" সে ভাবল।

"ঠিক আছে, আপনি অনুমতি করলে আমি একাই যাব", ঈষৎ বিদ্রূপের সুরেই কালুগিন বলল, কিন্তু ক্যাপ্টেন তাতে কান দিলো না।

কালুগিন একবারও ভেবে দেখল না যে বিভিন্ন সময়ে সর্বসাকুল্যে সে যেখানে দুর্গের মধ্যে কাটিয়েছে মাত্র পঞ্চাশ ঘণ্টার মতো, সেখানে এই ক্যাপ্টেন দুর্গে ছিল একটানা ছ'মাস। কালুগিনের মনে এখনও আছে অহংকার—আছে উন্নতি করবার বাসনা, পুরস্কার লাভের আশা, খ্যাতির কামনা, ও বিপদ বরণ করবার উচ্ছ্বসিত অভিজ্ঞতা লাভের বাসনা; কিন্তু ক্যাপ্টেন সে স্তর পার হয়ে এসেছে : প্রথম দিকে সেও ছিল অহংকারী ও সাহসী, সেও বিপদের ঝুঁকি নিযেছে, পুরস্কারের ও খ্যাতির প্রত্যাশা করেছে; সে সব পেয়েছেও; কিন্তু এখন এসব প্রেরণার প্রতি তার কোনও আকর্ষণ নেই; সে এখন সব কিছুকে দেখে ভিন্ন চোখে : এখনও সে ঠিক ঠিক মতোই কর্তব্য করে যায়, কিন্তু একান্ত অনিবার্য না হলে কখনও বিপদের ঝুঁকি নেয় না। ফলে যে তরুণ লেফ্‌টেন্যান্ট মাত্র এক সপ্তাহ আগে এই গোলন্দাজ বাহিনীতে যোগ দিয়েছে এবং এখন কালুগিনকে সব কিছু ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে, তাকেই আপাতদৃষ্টিতে ক্যাপ্টেন অপেক্ষা বেশি সাহসী বলে মনে হলো।

কামানশ্রেণী পরীক্ষা করে আশ্রয়স্থলে ফিরে আসবার পথে কালুগিন অন্ধকারে জেনারেলের মুখোমুখি হয়ে পড়ল। জেনারেল তখন এড্‌-ডি-কংদের সঙ্গে নিয়ে দুর্গের বুরুজের দিকে যাচ্ছিল।

জেনারেল বলছিল, "ক্যাপ্টেন প্রাস্কুখিন! দয়া করে ডান দিককার বাসাবাড়িগুলোতে গিয়ে এম. রেজিমেন্টের দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ানকে বলুন, তাবা যেন কাজ বন্ধ করে দিয়ে নিঃশব্দে সে স্থান ত্যাগ করে। তাদের রেজিমেন্ট পাহাড়ের নিচে ঘাঁটি পেতেছে; রিজার্ভ হিসাবে তাদের সেখানেই যোগ দিতে হবে। ঠিক বুঝতে পারলেন তো? আপনি নিজেই তাদের রেজিমেন্টে নিয়ে যান।"

"তাই হবে স্যার।"

প্রাস্কুখিন দ্রুত পায়ে বাসাবাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। গোলাগুলি ক্রমেই কমে আসছে।

১০

গন্তব্যস্থানে পৌঁছে পিঠে মাটির বস্তা নিয়ে আসা একটি সৈনিকের সঙ্গে প্রাস্কুখিন ধাক্কা খেলো। সে জিজ্ঞাসা করল, "এটা কি এম. রেজিমেন্টের দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ন?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"তোমাদের সেনাপতি কোথায়?"

কোম্পানী-অধিনায়কের খোঁজ করা হচ্ছে মনে করে মিখাইলভ তার ভূগর্ভস্থ কুঠুরি থেকে বেরিয়ে এল এবং প্রাস্কুখিনকে একজন কম্যান্ডিং অফিসার মনে করে তাকে অভিবাদন করল।

"জেনারেলের হুকুম.. আপনাকে...তাড়াতাড়ি চলে যেতে হবে, তাও একেবারে নিঃশব্দে..পিছিয়ে, না, পিছিয়ে নয়. রিজার্ভে," শত্রুপক্ষের গোলাবর্ষণের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে প্রাস্কুখিন বলল।

প্রাস্কুখিনকে চিনতে পেরে এবং পরিস্থিতিটা বুঝতে পেরে মিখাইলভ হাতটা নামিয়ে নিলো। সকলকে নির্দেশটা জানিয়ে দিলো, এবং অবিলম্বেই তারা পা চালিয়ে দিলো; লোকজনরা বন্দুক তুলে নিল, কোট গায়ে চড়াল, তারপর যাত্রা শুরু করল।

তিনটি দীর্ঘ ঘণ্টা ধরে বোমাবর্ষণের পরে বাসাবাড়ির মতো বিপজ্জনক স্থান ছেড়ে চলে যাবার সময় যে স্বস্তি পাওয়া যায় সেটা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। এই তিন ঘণ্টা ধরে মিখাইলভ বার বার জীবনের সব আশা ছেড়ে দিয়েছে, সঙ্গের প্রতিটি দেবমূর্তিকে চুম্বন করেছে, কিন্তু শেষের দিকে তার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে এত গোলাগুলি ছুটে এসেও যখন তাকে আঘাত করেনি তখন আর তাকে আঘাত করবে না, আর তাই এখন তার ভয় অনেক কমে গেছে। তথাপি প্রাস্কুখিনকে পাশে নিয়ে সে যখন সকলের সামনে থেকে বাসাবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল তখন থেকে নিজের পা দুটিকে বিরত রাখতে তাকে কম চেষ্টা করতে হলো না।

যে বাহিনীটি তখনও বাসাবাড়িতে রয়ে গেল তার অধিনায়ক মেজর বলল, "বিদায়। আপনাদের যাত্রা নিরাপদ হোক। আপনাদের সৌভাগ্য কামনা করি! মনে হচ্ছে, অবস্থা কিছুটা শান্ত হয়ে আসছে।"

তার মুখ থেকে কথাগুলি বের হতে না হতেই বাসাবাড়িতে লোকজনের চলাফেরা লক্ষ্য করে শত্রুপক্ষ গোলাগুলির বহর বাড়িয়ে দিলো। আমাদের বন্দুকগুলিও পাল্টা জবাব দিলো; পূর্ণ শক্তিতে গর্জে উঠল কামান। আকাশে অনেক

তারা, কিন্তু তাদের কিরণ অনুজ্জ্বল, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা রাত, শুধু বন্দুকের ঝলকানি আর গোলা ফাটার আলোয় মুহূর্তের জন্য চারিদিকের জিনিস আলোকিত হয়ে উঠছে। সৈনিকরা দ্রুত পা ফেলে নিঃশব্দে চলেছে অজান্তেই একে অন্যকে অতিক্রম করে যেতে চেষ্টা করছে। কামান বন্দুকের অশ্রান্ত গর্জনকে ছাপিয়ে কানে আসছে শুধু শক্ত মাটিতে সৈনিকদের তালে তালে পা ফেলার শব্দ সঙ্গীনের গায়ে সঙ্গীনের ধাক্কা লেগে ঠকঠক শব্দ, কোনও ভীত সৈনিকের দীর্ঘশ্বাস অথবা প্রার্থনার শব্দ "প্রভু, হে প্রভু! কি আছে আমাদের কপালে?" মাঝে মাঝে কোনও আহতের আর্তনাদ ও "স্ট্রেচার বাহক!" বলে ডাক কানে আসছে। (সে রাতে শুধু গোলাবর্ষণের ফলেই মিখাইলভের সৈন্যদলের চব্বিশ জনকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল।) অস্পষ্ট দূর দিগন্তে একটা বিদ্যুতের ঝলক দেখা গেল, দুর্গের উপর থেকে একজন শান্ত্রী হাঁক দিলো 'কা-মা-ন!' মাথার উপরে একটা গোলা শাঁ করে এসে মাটিতে পড়ল, মাটি ছিটকে উঠল, এক ঝাঁক পাথরের টুকরো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

মিখাইলভের পাশে পাশে চলতে চলতে প্রাস্কুখিন ভাবল, "সব উচ্ছন্নে যাক— এরা বড় ধীরে এগোচ্ছে। এর চাইতে আমি দৌড়ে চলে গেলেই ভাল হতো। যাই হোক, বুদ্ধিমান তো আমি পৌঁছে গিয়েছি। না, সে কাজ না করেই ভাল করেছি— ওই জানোয়ারটা হয়তো সকলকে বলে বেড়াত যে আমি একটা ভীরু। আমি ওর পাশে পাশেই থাকব, তাতে যা হয় হোক।"

ওদিকে মিখাইলভ ভাবছে, "এ লোকটা আমার সঙ্গে লেগে আছে কেন? একাধিকবার আমি লক্ষ্য করেছি, লোকটা অপয়া। ওই আর একটা আসছে—মনে হচ্ছে সোজা আমাদের দিকেই আসছে।"

আরও কয়েক শ' পা এগিয়ে তাদের সঙ্গে কালুগিনের দেখা হলো। সে তখন সাহসভরে নির্দেশমতো সেখানে কাজকর্ম কেমন চলছে সেটা দেখছে। মিখাইলভকে দেখে তার মনে হলো, নিজে ওই সাংঘাতিক প্রাকারের কাছে যাওয়ার চাইতে এই লোকটার কাছ থেকে সব খবর জেনে নেওয়াই তো ভাল, সে তো এইমাত্র সেখান থেকে এসেছে। মিখাইলভ কাজকর্মের একটা বিস্তারিত বিবরণই তাকে দিলো আর কথা বলতে বলতে কাছে হোক দূরে হোক যখনই একটা গোলা পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে বা ফাটছে তখনই মাথাটা নিচু করে এবং মাটিতে শুয়ে পড়ে সে কালুগিনকে অনেক মজার খোরাক জোগাল।

"তাকিয়ে দেখুন ক্যাপ্টেন, এটা সোজা এই দিকেই আসছে", প্রাস্কুখিনকে কনুই দিয়ে একটা গুঁতো দিয়ে ঠাট্টা করে কালুগিন হয় তো বলে উঠল। তার সঙ্গে আরও কিছুটা পথ এগিয়ে সে বাঁ দিকের ট্রেঞ্চটায় ঢুকল। আশ্রয়স্থলে ঢুকে সে ভাবল, "এই ক্যাপ্টেনটিকে কোনও মতেই সাহসী বলা যায় না।"

সেখানে নির্জনে বসে একজন অফিসার খাবার খাচ্ছিল। সে শুধালো, "কি সংবাদ?"

"বিশেষ কিছু না। আজ রাতে আর কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না।"

"কি বলছেন? আরে, জেনারেল তো এইমাত্র বুরুজে উঠে গেলেন, আর এদিকেও আরও একটা রেজিমেন্ট হাজির। ঐ যে! শুনতে পাচ্ছেন না? আবার বন্দুকের গর্জন! যাবেন না, বুঝতেই পারছেন যাবার কোনও দরকার নেই।"

কালুগিন ভাবল, "আমার বাইরে যাওয়া উচিত, কিন্তু একদিনেই যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েছি। এটুকু আশা করতে পারি যে কামানের খোরাক হবার চাইতে ভাল কিছু করবার সাধ্য আমার আছে।"

"হ্যাঁ, এখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করাই ভাল," সে বলল।

পাঁচ মিনিট পরে অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে জেনারেল ফিরে এল। তাদের মধ্যে শিক্ষার্থী ব্যারন পেস্ত্‌ও ছিল, কিন্তু প্রাস্কুখিনকে দেখা গেল না।

আর একবার আক্রমণ চালিয়ে আমরা বাসাবাড়িগুলি পুনবায় দখল করে নিলাম।

যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ শুনে কালুগিন পেস্ত্‌কে সঙ্গে নিয়ে ভূগর্ভস্থ কুঠুরি থেকে বেরিয়ে গেল।

১১

"তোমার কোটে রক্ত লেগে আছে। তুমি নিশ্চয় বলবে না যে তুমি হাতাহাতি যুদ্ধ করেছ, বলবে কি?" কালুগিন পেস্ত্‌কে শুধালো?

"আরে দাদা, সে বড় সাংঘাতিক ব্যাপার! কল্পনা করুন..." পেস্ত্‌ বলতে শুরু করল কেমন করে সেনাপতি নিহত হলে সে নিজেই গোটা দলের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল, একজন ফরাসীকে সঙ্গীনে বিদ্ধ কবেছিল, আর সে না থাকলে এ সব কোনও কিছুই ঘটত না, ইত্যাদি।

তার গল্পের প্রধান কথাগুলি ঠিকই—সেনাদলের অধিনায়ক সত্যি মারা গেছে, পেস্ত্‌ও একজন ফরাসীকে সঙ্গীনে বিঁধেছে—কিন্তু বিস্তারিত বিবরণের বেলায় শিক্ষার্থীটি অকারণ বাগাড়ম্বরে কল্পনার রাশকে সম্পূর্ণ আলগা করে দিলো।

নিজের অজান্তেই সে বড় বড় বুলি আওড়াতে লাগল, কারণ যতক্ষণ যুদ্ধ চলছিল, ততক্ষণই সে একটা বিমূঢ় বিচলিত ভাবের মধ্যে ছিল; আর সে অবস্থাটা তাকে এতই অভিভূত করে রেখেছিল যে তার মনে হয়েছিল বুঝি সব কিছুই ঘটেছে অন্য কোনও স্থানে, অন্য কোনও কালে, এবং অন্য কোনও মানুষের বেলায়। স্বভাবতই বিস্তারিত বিবরণটাকে সে এমনভাবে বানিয়ে বলল যাতে নিজের মূর্তিটা বেশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আসলে যা ঘটেছিল তা এই :

অবরুদ্ধ দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসার অভিযানে যে সেনাদলের সঙ্গে এই শিক্ষার্থীটিকে যুক্ত করা হয়েছিল সে সেনাদলটি পুরো দু'ঘণ্টা ধরে গোলাগুলি বর্ষণের মধ্যে একটা নিচু দেয়ালের কাছে মোতায়েন ছিল; তারপর সম্মুখস্থ অধিনায়ক কি যেন বলল, সকলের মধ্যে সোরগোল পড়ে গেল, সেনাদল প্রাচীরের পিছন থেকে বেরিয়ে প্রায় একশ' পা এগিয়ে একটা ব্যূহ রচনা করে দাঁড়িয়ে গেল। পেস্ত্-এর হুকুম হলো, দ্বিতীয় কোম্পানির ডান দিকে জায়গা নিতে হবে।

সে কোথায় এসেছে, আর কেনই বা এসেছে সে বিষয়ে তিলমাত্র ধারণা ছাড়াই শিক্ষার্থীটি নির্দিষ্ট জায়গায় গেল এবং রুদ্ধশ্বাসে সামনের অন্ধকারের দিকে তাকাল; তার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নামতে লাগল; মনে হলো, একটা ভয়ংকর কিছু ঘটতে চলেছে। তখন কোনও গোলাগুলি ছুটছিল না বলে সে ভয় তার ছিল না, কিন্তু সে যে দুর্গের বাইরে খোলা জায়গায় রয়েছে এই ভয়াবহ চিন্তাই তাকে সন্ত্রস্ত করে তুলল। সামনে থেকে অধিনায়ক আবার কি যেন বলল। আবারও অফিসাররা ফিস্‌ফিস্ করে সে হুকুমটা পর পর ছড়িয়ে দিলো, আর হঠাৎই সে প্রথম সেনাদল নিয়ে গড়া কালো প্রাচীরটা ধ্বসে পড়ল। হুকুম এসেছিল, সকলকে শুয়ে পড়তে হবে। দ্বিতীয় সেনাদলটিও শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়তে গিয়ে পেস্ত্-এর হাতটাতে ধারালো কিছু ফুটে গেল। শুধু দ্বিতীয় সেনাদলের অধিনায়কই খাড়া রইল। তার ছোট দেহটা সেনাদলের সামনে ঘুরতে লাগল, আর খোলা তলোয়ার ঘুরিয়ে সে অবিরাম কথা বলতে লাগল :

"ছেলেরা! এ অবস্থায় মনে সাহস রাখো! গুলি ছুঁড়ো না—তাদের উপহার দাও ঠাণ্ডা ইস্পাতের ছোঁয়া। আমি যখন চেঁচিয়ে বলব 'হুর্‌রা!' তখনই আমাকে অনুসরণ করবে, পিছিয়ে পড়বে না।...এক সঙ্গে থাকাটাই আসল কথা।...আমরা কি দিয়ে তৈরি সেটা ওদের দেখিয়ে দেব—নিজেদের অসম্মান আমরা করব না, কি বলো ছেলেরা? যুদ্ধ করব আমাদের পিতা জারের জন্য!" বেপরোয়াভাবে হাত-পা নেড়ে নানা রকম শপথ নিয়ে সে কথাগুলি বলল।

তার পাশেই শুয়ে থাকা আর একটি শিক্ষার্থীকে পেস্ত্ জিজ্ঞাসা করল, "আমাদের দলের অধিনায়কের নাম কি? লোকটি খুব সাহসী, তাই না?"

শিক্ষার্থী জবাব দিলো, "হ্যাঁ, সে যখনই যুদ্ধে নামে, একেবারে পার মাতাল হয়ে। তার নাম লিসিংকোভ্‌স্কি।"

ঠিক সেই মুহূর্তে আগুনের একটা লক্‌লকে জিভ সেনাদলের ঠিক সামনে আকাশে উঠে কান-ফাটা শব্দে নিচে নেমে এল, পাথর ও বোমার টুকরো হিস্-হিস্ শব্দে অনেকখানি উঁচুতে ছিটকে উঠে গেল (ফলে, প্রায় পঞ্চাশ সেকেন্ড পরে একটা পাথর নিচে পড়ে একটি সৈনিকের পাটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলো)। সেটা ছিল একটা উঁচু-কোণ কামানের গোলা; গোলাটা যে সেনাদলের ঠিক উপরেই পড়েছে তা দেখেই বোঝা যায় যে ফরাসীরা এই সেনাদলের অবস্থানটা ধরতে পেরেছে।

"হায! কামানেব গোলা! ওবে অভিশপ্ত কুক্কুবীর বাচ্চাবা! একবাব তোদেব কাছে যেতে দে। তখন রুশদের ত্রিমুখী সঙ্গীনেব স্বাদটা টেব পাবি বেজন্মাব দল!" দলীয অধিনাযকটি এত জোবে চেঁচিয়ে উঠল যে ব্যাটেলিযন কম্যান্ডাব তাকে হুকুম কবল মুখ বন্ধ কবতে, কোনও বকম শব্দ না কবতে।

তাবপবে প্রথম সেনাদল উঠে দাঁড়াল, তাবপব উঠল দ্বিতীয সেনাদল। হুকুম হলো, সঙ্গীন উঁচু কবে, গোটা সৈন্যদল এগিযে চলল। পেস্ত এতই ভয পেযে গেল যে সে কোন্ দিকে কতক্ষণ পা চালিয়েছে, কোন্ দিকে এবং কাদেব বিরুদ্ধে – সে সব কিছুই তাব মনে নেই। সে হাঁটছে মাতালেব মতো। সহসা লক্ষ লক্ষ আলোব ঝলকানি একসঙ্গে চাবিদিকে ছড়িযে পড়ল, আব তাব পবেই ভযাবহ শাঁ-শাঁ ও ঘব ঘব্ শব্দ। সকলেই চিৎকাব কবতে কবতে ছুটছে। সেও তাই কবল। তাবপব ধাক্কা খেযে একটা কিছুব উপব পড়ে গেল, স্বযং কোম্পানী কম্যান্ডাব (সে ছিল সকলেব আগে, আহত হযে সেখানেই পড়ে ছিল, শিক্ষার্থীটিকে ফবাসী সৈন্য মনে কবে তাব পা জড়িয়ে ধবেছিল)। তাবপব পাটা ছাড়িযে নিযে কোনও বকমে উঠে দাঁড়াতেই একজন কেউ এসে অন্ধকাবে তাকে ধাক্কা মেবে ফেলে দেবাব উপক্রম কবল। আব একজন কে যেন চেঁচিয়ে বলল, "এফোঁড় ওফোঁড় কবে দাও। অপেক্ষা কবছ কেন?" কে যেন বন্দুকটা চেপে ধবে সঙ্গীনটাকে একটা নবম কিছুব মধ্যে ঢাকিয়ে দিল। বক্ত-জলভবা গলায কে যেন চেঁচিযে বলে উঠল, "ঠিক এই ভাবে বন্ধুবেড়! হায নবক! হায ঈশ্বব!" তখন একমাত্র তখনই পেস্ত বুঝতে পাবল যে একটি ফবাসীকে সে সঙ্গীনে বিদ্ধ কবেছে। তাব সাবা শবীবে ঠাণ্ডা ঘাম ঝবতে লাগল। জ্বব ব্যথায সে কাপতে লাগল, বন্দুকটা হাত থেকে পড়ে গেল। কিন্তু সে তো মুহূর্তেব ঘটনা, সহসা তাব মনে হলো যে সে একজন বীব। বন্দুকটা তুলে নিযে "হুবরা!" বলে চিৎকাব কবে অন্য সকলেব সঙ্গে সেও ছুটতে লাগল। মৃত ফবাসীটি সেখানেই পড়ে বইল, জনৈক সৈনিক ইতিমধ্যে তাব বুট জোড়া খুলতে শুরু কবেছে। আবও বিশ পা ছুটে সে একটা ট্রেঞ্চে পৌঁছে গেল। সেখানেই আমাদেব লোকজন ও ব্যাটেলিযন কম্যান্ডাবেব সঙ্গে তাব দেখা হযে গেল।

"তাদেব একজনাকে আমি সঙ্গীনে বিঁধেছি," সে কম্যান্ডাবকে বলল।

"তুমি একটি সাহসী ছেলে ব্যাবন।"

১২

"আপনি কি জানেন, প্রাস্কুখিন মাবা গেছেন?" বাড়িব পথে যেতে যেতে পেস্ত্ কালুগিনকে শুধাল।

"অসম্ভব!"

"কিন্তু আমি নিজে তাকে দেখেছি।"

"বটে? কিন্তু আমার খুব তাড়া আছে। বিদায়।"

নিজের বাসায় পৌঁছে কালুগিন ভাবল, "আমি খুব খুশি। কর্তব্যরত অবস্থায় এই প্রথম আমার ভাগ্য খুলেছে। চমৎকার যুদ্ধ হলো : আমি নিরাপদে ও সুস্থ দেহে বেঁচে আছি। এবার পুরস্কারের জন্য আমার নাম সুপারিশ করা হবে, আর সোনার তলোয়ার তো অবশ্যই পাব। সে যোগ্যতা আমি নিশ্চয়ই দেখিয়েছি।"

জেনারেলকে দরকারী খবর জানিয়ে সে নিজের ঘরে গেল, সেখানে প্রিন্স গল্ট্‌সিন অনেকক্ষণ ধরে তার জন্য অপেক্ষা করছিল, বসে বসে কালুগিনের টেবিল থেকে নিয়ে Splendeur et miseres des courtesanes (বালজাক রচিত জনপ্রিয় বই The Splendour and Misery of Courtesans) বইটা পড়ছিল।

শেষ পর্যন্ত সে যে সব বিপদ পার হয়ে নিজের ঘরে ফিরে আসতে পেরেছে তাই কালুগিন খুশি। নাইটশার্টটা শরীরে গলিয়ে সে বিছানায় ঢুকল, তারপর যুদ্ধের সব বিবরণ গল্টসিনকে শোনাতে লাগল। এমনভাবে সব কথা বলতে লাগল যাতে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে সে একজন সুদক্ষ ও সাহসী অফিসার; অবশ্য সে কথা বলাই বাহুল্য কারণ একমাত্র পরলোকগত ক্যাপ্টেন প্রাস্কুখিন ছাড়া আর সকলেই সেটা জানে এবং সে বিষয়ে আর কারও মনে এতটুকু সন্দেহ পর্যন্ত নেই যদিও ক্যাপ্টেন প্রাস্কুখিন কালুগিনের সঙ্গে হাতধরাধরি করে চলতে পারলে নিজেকে সম্মানিত মনে করত, তবু আগের দিনও, সে জনৈক বন্ধুর কাছে খুব গোপনে বলেছে যে কালুগিন মানুষ হিসাবে চমৎকার হলেও দুর্গে যাওয়াটা মোটেই পছন্দ করে না।

মিখাইলভের পাশে চলতে চলতে প্রাস্কুখিন কদাচিৎ কালুগিনের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে অপেক্ষাকৃত অল্প বিপজ্জনক একটা স্থানে পৌঁছে সবে মনটাকে একটু খুশিতে ভরে তুলেছে এমন সময় তার পিছনেই একটা বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল, সে শুনতে পেল একজন শান্ত্রী চিৎকার করে বলছে "মর্টার।" এবং তার পিছন থেকে একজন সৈনিক বলছে "সেটা সেনাদলের দিকেই সোজা এগিয়ে আসছে।" মিখাইলভ তার কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল। মনে হচ্ছে গোলার একটা উজ্জ্বল বিন্দু একেবারে মাথার উপরে এমনভাবে থেমে আছে যে সেটা কোন্ দিকে যে যাচ্ছে সে কথা বলা একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু সেটা মুহূর্তের ব্যাপার। ক্রমাগত তীব্রতর গতিতে গোলাটা কাছে, আরও কাছে আসতে লাগল, পলতের আগুনটাও দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে শাঁ-শাঁ আওয়াজ; আর তারপরেই সেটা সেনাদলের একেবারে মাঝখানে নেমে এল।

"শুয়ে পড়ো।" ভয়ার্ত কণ্ঠে কে যেন চিৎকার করে উঠল।

মিখাইলভ উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। প্রাস্কুখিনও মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে চোখ বুজল, শুধু শুনতে পেল খুব কাছেই কোথাও গোলাটা শক্ত মাটিতে আঘাত করল। একটি সেকেন্ডকে মনে হলো যেন একটি ঘণ্টা। গোলাটা কিন্তু ফাটল না। প্রাস্কুখিনের

মনে নতুন ভয় দেখা দিলো যে সে হয়তো অকারণেই ভয়ে চোখ বুজে পড়ে ছিল, গোলাটা অনেক দূরে কোথাও পড়েছে, আর সে হয় তো কল্পনাতেই দেখেছে যে পল্‌তেটা কাছেই কোথাও জ্বলছে। সে চোখ খুলল; দেখে খুশি হলো যে মিখাইলভ (তার কাছে প্রাস্কুখিন সাড়ে বারো রুবল ধারে) শুধু যে উপুড় হয়ে আছে তাই নয়, বুকের উপর সটান পড়ে আছে নিশ্চল হয়ে, প্রাস্কুখিনেরই পায়ের উপর চেপে। কিন্তু সেই মুহূর্তে তার চোখ পড়ল গোলাটার জ্বলন্ত পল্‌তের উপর; তার থেকে মাত্র গজখানেক দূর দিয়ে সেটা শাঁ করে ছুটে চলেছে।

আতংক, একটা শীতল আতংক অন্য সব চিন্তা ও অনুভূতিকে ছাপিয়ে তার সমস্ত সত্তাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলল। দুই হাতে মুখ ঢেকে সে হাঁটুর উপর বসে পড়ল।

আরও একটি সেকেন্ড কাটল; সেই এক সেকেন্ডের মধ্যে সংবেদন, চিন্তা, আশা ও স্মৃতির একটা গোটা জগৎ তার মনের ভিতরে ঝিলিক দিয়ে গেল।

"এটা কাকে মারবে?—মিখাইলভকে না আমাকে? আর যদি আমাকেই আঘাত করে তো কোথায় করবে? মাথায়? তাহলে তো সব শেষ হয়ে যাবে। আমার পায়ে? তাহলে তারা পাটা কেটে বাদ দেবে—আমি পীড়াপীড়ি করব যাতে ক্লোরোফর্ম করা হয়—আর আমি হয়তো বেঁচে যাব। কিন্তু হয়তো কেবল মিখাইলভই মারা যাবে। সেক্ষেত্রে আমি সকলকে বলে বেড়াব, কেমন করে আমরা পাশাপাশি হাঁটছিলাম, কেমন করে সে মারা পড়ল, আর তার রক্তে আমার গা ভেসে গেল। না, গোলাটা আমারই বেশি কাছে—আমাকেই আঘাত করবে।" হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল মিখাইলভের কাছ থেকে ধার করা বারো রুবলের কথা, এবং সেন্ট পিতার্সবুর্গে আরও অনেক কাল আগে আর একজনের কাছ থেকে ধার করার কথা; সেদিন সন্ধ্যায় যে জিপ্‌সি গানটি সে গেয়েছিল তার সুরটা মনে পড়ল; যে নারীকে সে ভালবাসত লাল ফিতেওয়ালা টুপি পরে সে এসে সামনে দাঁড়াল; যে লোকটি পাঁচ বছর আগে তাকে অপমান করেছিল অথচ আজও তার কাছে ক্ষমা চায়নি তাকেও মনে পড়ল; কিন্তু এই সব হাজার একটি স্মৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ছিল বর্তমানের একটি চেতনা মৃত্যু ও আতংকের প্রত্যাশা—সে চেতনা মুহূর্তের জন্যও তাকে ত্যাগ করল না। "হয়তো ওটা ফাটবে না", এই কথা ভেবে মরিয়া হয়ে সে চোখ খুলবার চেষ্টা করল। কিন্তু সেই মুহূর্তে বন্ধ চোখের পাতার ভিতর দিয়ে একটা পাণ্ডুর আলোর ঝলক তার চোখে এসে বিঁধল, আর একটা কিছু প্রচণ্ড বেগে এসে তার বুকের মাঝখানে আঘাত করল; উঠে ছুটতে গিয়ে দুই পায়ের মধ্যে তলোয়ারটা আটকে গিয়ে সেটার উপরেই হুমড়ি খেয়ে সে এক পাশে কাৎ হয়ে পড়ে গেল।

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! একটু থেঁৎলে গেছে মাত্র!" প্রথমে সে এই রকমই ভাবল। বুকে হাত দিতে চাইল, কিন্তু হাত দুটোকে যেন পেরেক দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে; মনে হলো, মাথাটাকে যেন সাঁড়াশি দিয়ে চেপে রাখা হয়েছে। কয়েকটি সৈনিক পাশ

দিয়ে চলে গেল, আর আপনা থেকেই সে তাদেব গুণতে শুরু করে দিলো; "এক, দুই, তিনজন প্রাইভেট, আর ঐ যে অফিসার আসছে কোটটা তুলে ধরে"; তারপরই একটা আলো তার চোখের সামনে ঝলসে উঠল; সে ভাবতে লাগল ওটা কি—মর্টার না কামান? নিশ্চয় কামান। ওই আর একটা গোলা, আর এখানে আবও কয়েকজন সৈনিক—পাঁচ, ছয়, সাত প্রাইভেট; সকলেই হেঁটে চলেছে। হঠাৎ তার ভয় হলো, পাছে ওরা তাকে মাড়িয়ে যায়; চেঁচিয়ে বলতে চাইল যে সে আহত, কিন্তু তাব মুখটা এতই শুকিয়ে গেছে যে জিভটা তালুতে আটকে গেল; তার ভীষণ তৃষ্ণা পেয়েছে। বুকের চারপাশটা ভেজা বোধ হওয়ায় তার জলের কথা মনে পড়ল, আর সেই ভেজা জিনিসটা পান করার ইচ্ছা হলো। "নিশ্চয়ই রক্ত ঝরছে। পড়ে গিয়ে কোথাও কেটে গেছে", সে ভাবল; পাশ দিয়ে যারা ছুটে যাচ্ছে তারা তাকে মাড়িয়ে চলে যাবে এই ভাবনাটা ক্রমেই বাড়তে লাগল। সব শক্তি একত্র করে চেঁচিয়ে বলতে চাইল: "আমাকে ধরো।" কিন্তু তাব বদলে গলা দিয়ে এমন একটা ভয়ংকর আর্তনাদ বেরিয়ে এল যে তা শুনে সে নিজেই ভয় পেয়ে গেল। চোখেব সামনে লাল আলোগুলো নাচতে লাগল, তার মনে হলো, সৈনিকরা তার উপরে পাথরের স্তূপ জমিয়ে তুলছে. আলোগুলি ক্রমেই কমতে লাগল, আর তার উপরে চাপানো পাথরগুলো ক্রমেই বেশি ভারী হয়ে তাকে চাপ দিতে লাগল। পাথরগুলোকে ঠেলে ফেলবার চেষ্টায় সে শরীরটা টান-টান করল—আর তারপর আর কিছু দেখতে পেল না, আর কিছু শুনতে পেল না, আব কোনও চিন্তাও রইল না, অনুভূতিও রইল না। বুকেব মাঝখানে বোমার টুকরোর আঘাতে সরাসরি তাব মৃত্যু ঘটল।

১৩

গোলাটাকে দেখতে পেয়ে মিখাইলভ ও প্রাস্কুখিনের মতোই মাটিতে শুয়ে পড়েছিল, চোখ বন্ধ করেছিল, দু'বার খুলেছিল আর দু'বার বন্ধ করেছিল, আর গোলাটা ফাটবার আগেকার দুই সেকেন্ড সময় সেই একই চিন্তা ও অনুভূতির স্রোতে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল; বার বার বলল, "তোমাব ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!" আর সেই সঙ্গে ভাবতে লাগল : "কেন সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলাম? আর যুদ্ধে আসবার জন্য পদাতিক বাহিনীতেই বা বদলি নিলাম কেন? টি. শহরে উলহান রেজিমেন্টে থেকে বন্ধু নাতাশার সঙ্গে সময় কাটালেই কি ভাল করতাম না?...তাব বদলে এলাম এখানে!" তারপর সে গুণতে শুরু কবল: এক, দুই, তিন, চার—মনে মনে স্থির করল যদি জোড় সংখ্যায় গোলাটা ফাটে তাহলে সে বেঁচে যাবে, আর যদি বেজোড় সংখ্যায় ফাটে তাহলে তার মৃত্যু হবে। "সব শেষ। আমি মারা যাব!" গোলাটা ফাটাবার পরে সে ভাবল (জোড় সংখ্যায় ফাটল কি বেজোড় সংখ্যায়, সেটা সে খেয়াল করতেই পারল না); তার মনে হলো, একটা কিছু

এসে আঘাত করায় তার মাথার ভিতর দিয়ে একটা যন্ত্রণার স্রোত বয়ে গেল। "হে প্রভু, আমার সব পাপ ক্ষমা করো!" দুই হাত এক করে সে বিড় বিড় করে বলল। একটু উঠেই সে অজ্ঞান হয়ে নিচে পড়ে গেল।

আবার যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন প্রথমেই সে বুঝতে পারল যে তার নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে এবং মাথার যন্ত্রণাটা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। সে ভাবল, "ঐ আমার আত্মা চলে যাচ্ছে। সেখানে আমার ভাগ্যে কি আছে? প্রভু! আমার আত্মাকে শান্তি দিও।" তারপর নিজেকেই বলল, "কি আশ্চর্য, আমি মরতে চলেছি, অথচ সৈনিকদের পায়ের শব্দ ও গোলাগুলির শব্দ কত স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি!"

"হাই, কে আছে, স্ট্রেচার-বাহকদের ডাকো। ক্যাপ্টেন মারা গেছেন।" মাথার উপর থেকে কে যেন হাঁক দিয়ে বলল। সে চিনতে পারল, এটা ভেরীবাদক ইগ্‌নাৎয়েভ-এর গলা।

কেউ তাকে ঘাড় ধরে তুলল। চোখ মেলে মাথার উপরে দেখতে পেল গাঢ় নীল আকাশ, তারার দল, দুটো গোলা ছুটে গেল, যেন একটা আরেকটাকে তাড়া করল; তারপর দেখতে পেল ইগ্‌নাৎয়েভকে, একটা স্ট্রেচারসহ বন্দুকধারী কয়েকজন সৈনিককে, ট্রেঞ্চের দেয়ালকে; আর হঠাৎ সে বুঝতে পারল যে সে এখনও অন্য জগতে প্রবেশ করেনি।

একটা পাথর লেগে মাথায় সামান্য আঘাত পেয়েছে। প্রথমেই তার মনে জাগল অনুশোচনা : লোকান্তরে যাত্রার জন্য সে নিজেকে এমনভাবে প্রস্তুত করে তুলেছিল যে গোলাগুলি, ট্রেঞ্চ, সৈনিক ও রক্তের এই জগতে ফিরে আসাটা তার মোটেই ভাল লাগল না; কিন্তু পরবর্তী মনোভাবই হলো বেঁচে থাকার আনন্দ, আর তৃতীয় মনোভাব হলো ভয় এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই দুর্গ থেকে বেরিয়ে যাবার বাসনা। ভেরীবাদক একটা রুমাল দিয়ে তার মাথাটা বেঁধে তাকে ধবে নিয়ে চলল ড্রেসিং স্টেশনে।

কিছুটা বুদ্ধি ফিরে এলে লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেন ভাবল, "কিন্তু আমি কোথায় চলেছি, আর কেনই বা চলেছি? সৈন্যদলের সঙ্গে থাকাই আমার কর্তব্য, সকলের আগে তাকে ছেড়ে যাওয়া নয়; বিশেষ করে সৈন্যদলটা যখন অচিরেই শত্রুপক্ষের আওতার বাইরে চলে যাবে। আর আহত হয়েই যদি আমি যুদ্ধ চালিয়ে যাই, তাহলে তো একটা পুরস্কার-প্রাপ্তি নিশ্চিত।"

ভেরীবাদকের কাঁধের উপর থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে সে বলল, "ঠিক আছে বাপু, আমি ড্রেসিং স্টেশনে যাব না। এখানে আমার সৈন্যদলের সঙ্গেই থাকব।"

এই বলে সে ফিরে যেতে উদ্যত হলো।

ভীরুস্বভাবের ইগ্‌নাৎয়েভ বলল, "আপনার ক্ষতস্থানটাকে ভালভাবে দেখালে পারতেন হুজুর। উত্তেজনার বশে আপনি হয় তো ভাবছেন এটা গুরুতর কিছু নয়,

কিন্তু পরে খারাপও তো হতে পারে। কি রকম গোলাগুলি চলছে দেখুন।...সত্যি হুজুর।''

মিখাইলভ ইতস্তত করে এক মুহূর্তের জন্য থেমে গেল; হয়তো ইগনাৎয়েভ্-এর পরামর্শই মানত, কিন্তু সেই সময়ই তার মনে পড়ে গেল কয়েক দিন আগে দেখা ড্রেসিং স্টেশনের একটা দৃশ্য। একজন অফিসার সেখানে এসেছিল হাতের সামান্য একটা আঁচড় ব্যান্ডেজ করাতে, কিন্তু আঁচড়টা পরীক্ষা করতে করতে সার্জনরা হাসতে লাগল; এমন কি তাদের মধ্যে একজন—তার জুল্‌ফি ছিল—তো মন্তব্য করেই বসল যে আঘাতটা মোটেই মারাত্মক নয়, আর খাবার কাঁটার খোঁচা লেগেও একজন লোক এর চাইতে বেশি আঘাত পেতে পারে।

''আমার ক্ষতস্থান দেখেও তারা ঐ রকম সন্দেহের চোখে তাকাতে পারে, হাসতে পারে, এমন কি কিছু বাজে কথাও বলতে পারে,'' এই কথা ভেবে লেফ্‌টেন্যান্ট-কর্নেল দৃঢ় পদক্ষেপে তার সৈন্য দলে ফিরে গেল।

যে পতাকাবাহী তখন সেনাদলের ভার নিয়েছিল তাকে জিজ্ঞাসা করল, ভাল কথা, যে এড্-ডি-কং প্রাস্কুখিন আমার পাশে পাশে যাচ্ছিল সে কোথায়?''

''আমি জানি না। মনে হয়, মারা গেছে,'' অনিচ্ছাসত্ত্বেও পতাকাবাহী অফিসারটি জবাব দিলো; লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেন ফিরে আসায় সে বিরক্ত হয়েছে, কারণ এর ফলে সেই যে একমাত্র অফিসার যে শেষ পর্যন্ত সেনাদলেই ছিল এ কথা বলবার আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে।

''মারা গেছে, না আহত হয়েছে? এটা কি রকম কথা যে তুমি জানো না? সে তো আমাদের সঙ্গেই ছিল, তাই না? তুমি তাকে তুলে নাওনি কেন?''

''এই প্রচণ্ড হুড়োহুড়ির মধ্যে কেমন করে তুলে নেব?''

''ওঃ, কেমন করে নেবে মিখাইলো আইভানিচ,'' মিখাইলভ রেগে বলল। ''ধরো সে যদি বেঁচে থাকে, সে অবস্থায় তাকে ফেলে এলে কেমন করে? আর সে যদি মারা গিয়েই থাকে, তাহলেও তো তোমার উচিত ছিল তার দেহটা বয়ে আনা। আর যাই হোক, সে তো জেনারেলের এড্-ডি-কং, আর হয়তো এখনও বেঁচেই আছে।''

পতাকাবাহী পাল্টা জবাব দিলো, ''আমি তো বলছি আমি নিজে গিয়ে তাকে দেখে এসেছি, তার পরেও কেমন করে সে বেঁচে থাকতে পারে? হা ঈশ্বর, বেঁচে গিয়েও দেখছি ঝামেলায় পড়েছি। ওই আবার সেই বেজম্মার দল! আবার কামান থেকে গেলা ছুঁড়ছে,'' হঠাৎ মাথাটা নিচু করে সে বলে উঠল। মিখাইলভও তাই করল, কিন্তু তার ফলে তার মাথার ভিতরটা ব্যথায় টন্‌টন্ করে উঠল; দুই হাতে সে মাথাটা চেপে ধরল।

''না, না, একজন কেউ গিয়ে তাকে নিয়ে আসুক। হয়তো সে এখনও বেঁচে আছে। এটা আমাদের কর্তব্য মিখাইলো আইভানিচ।''

মিখাইলো আইভানিচ কোনও জবাব দিলো না।

"সে যদি সৎ অফিসার হতো তাহলে আগেই তাকে তুলে আনত। এখন সৈন্যদের পাঠাতে হবে। কিন্তু সে কাজ আমি করি কেমন করে? এই ভয়ংকর গোলাগুলির মধ্যে অকারণেই তাদের প্রাণ যেতে পারে!" মিখাইলভ ভাবতে লাগল।

"বাছারা! তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ চলে যাও, যে অফিসারটি ওই খানার মধ্যে আহত অবস্থায় পড়ে আছে তাকে তুলে নিয়ে এস", খুব জোর গলায় না হলেও আদেশের ভঙ্গিতেই সে কথাটা বলল, কারণ সেও বোঝে যে এ হুকুম পালন করা সৈনিকদের পক্ষে কতদূর অবাঞ্ছিত। কিন্তু যেহেতু কোনও বিশেষ সৈনিককে উদ্দেশ্য করে সে কথাগুলি বলেনি, তাই কেউ নড়ল না।

"সার্জেন্ট! এগিয়ে আসুন!"

যেন শুনতে পায়নি এমনিভাবে সার্জেন্ট এগিয়ে গেল।

"হয়তো সে মারাই গেছে আর তাই লোকগুলোকে অকারণে বিপদের মুখে ঠেলে দেবার কোনও মানেও নেই। এটা আমারই দোষ। আগেই আমার এদিকে নজর দেওয়া উচিত ছিল। আমিই গিয়ে দেখে আসব সে বেঁচে আছে কি না। এটা আমার কর্তব্য", মিখাইলভ নিজের মনেই বলল।

"মিখাইলো আইভানিচ! সেনাদলের ভার তোমার উপর রইল। পরে আমি তোমাদের সঙ্গে মিলব", এই বলে এক হাতে কোটটা তুলে নিয়ে অন্য হাতটা রাখল সেন্ট মিত্রফানোস-এর দেবমূর্তির উপর; তারপরই চার হাত-পায়ের উপর প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে ট্রেঞ্চ ধরে দৌড়তে শুরু করল।

যখন সঠিক বুঝতে পারল যে তার কমরেড মারাই গেছে, তখন হাঁপাতে হাঁপাতে মাথার খুলে যাওয়া ব্যান্ডেজটা চেপে ধরে সে ফিরে গেল।

মিখাইলভ যখন সৈন্যদলটাকে ধরে ফেলল তখন তারা শত্রুপক্ষের পাল্লার প্রায় বাইরে পাহাড়ের নিচে পৌঁছে গেছে। প্রায় বাইরে বলছি এই জন্য যে তখনও কিছু গোলাগুলি সেখানেই এসে পড়ছে (সেই রাতেই জনৈক নাবিকের ভূগর্ভস্থ কুঠুরিতে একজন ক্যাপ্টেন বোমার টুকরোয় মারা গিয়েছিল)।

জনৈক সহকারী তার ক্ষতস্থানটা বেঁধে দিলে লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেন ভাবল, "কাল বরং ড্রেসিং স্টেশনে গিয়ে ভর্তি হয়ে যাব। তাতে পুরস্কার পেতে সুবিধা হবে।"

১৪

মাত্র দু'ঘণ্টা আগেও যে সব মানুষের মন ভরে ছিল ছোট-বড় নানা বিচিত্র আশায় ও বাসনায় সেই সব মানুষের শত শত তাজা রক্তাক্ত শব এখন মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে দুর্গ ও ট্রেঞ্চের মধ্যবর্তী ফুল-বিছানো, শিশির-ভেজা প্রান্তরে আর

সেবাস্তোপল-এর গির্জার শবাগারে; শত শত মানুষ শুকিয়ে-ওঠা-ঠোঁটে অভিশাপ ও প্রার্থনা নিয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে, লেংচে চলছে, আর্তনাদ করছে—কেউ ফুল-বিছানো মাঠের মৃতদেহগুলির ভিতর দিয়ে, আবার কেউবা স্ট্রেচারে চেপে, বিছানায় শুয়ে, এবং ড্রেসিং স্টেশনের রক্ত-মাখা মেঝেতে। এবং অন্যান্য দিনের মতোই আজও আবার সাপুন পাহাড়ের উপর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ঝিকিমিকি তারার আলো ম্লান হয়ে আসছে, গর্জনমুখর অন্ধকার সমুদ্রের বুক থেকে একটা সাদা কুয়াসা ভেসে আসছে, পূবের আকাশে দেখা দিয়েছে রক্তিম ঊষা, আর লাল মেঘেরা দল বেঁধে ভেসে চলেছে হাল্কা নীল দিগন্তের কোলে; আর অন্যান্য দিনের মতোই আজও আর একবার সর্বশক্তিমান গৌরবোজ্জ্বল সূর্য উঠল—সমগ্র জাগ্রত জগতের কাছে আনন্দ, ভালবাসা ও সুখের প্রতিশ্রুতি নিয়ে।

১৫

পরদিন সন্ধ্যায় পথে পথে আবার বাজতে লাগল "চসিয়র"-এর ব্যান্ড; অফিসার, শিক্ষার্থী ও তরুণীরা অলসভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল মঞ্চের চারধারে ও সুগন্ধি সাদা কাঁটা গাছে ছাওয়া নিচের গলি-পথ ধরে।

কালুগিন, প্রিন্স গল্ট্‌সিন ও একজন কর্নেল হাত ধরাধরি করে মঞ্চের কাছাকাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে আব আগের রাতের যুদ্ধের কথা নিয়ে আলোচনা করছে। এ সব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, আলোচনার বিষয়বস্তু যত না যুদ্ধের কথা তার চাইতে বেশি সে যুদ্ধে নিজ নিজ ভূমিকা ও শৌর্যের কথা। তাদেব মুখ ও গলার স্বর অত্যন্ত গম্ভীর, যেন গতকালের ক্ষতিতে তাদের ব্যথা ও বেদনার অন্ত নেই। সত্যি কথা বলতে কি, যেহেতু এ যুদ্ধে কারও প্রিয়জন নিহত হয়নি (যুদ্ধের মধ্যে কারও কোনও প্রিয়জন কি আছে?), তাদের এই দুঃখ নেহাৎই সরকারী ব্যাপার, সেটা প্রকাশ করা তাদের কর্তব্য। আসলে, তাদের সামনে যদি থাকে সোনার তলোয়ার ও মেজর-জেনারেলের পদে উন্নতির হাতছানি তাহলে কালুগিন ও কর্নেলরা যত ভাল লোকই হোক না কেন প্রতিদিনই এ ধরনের যুদ্ধ দেখতে তারা সম্পূর্ণ রাজী। যে বিজয়ী বীর নিজের উচ্চাকাংখা চরিতার্থ করবার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে ধ্বংস করে তাকে দানব আখ্যা দিলে আমি খুশি হই। কিন্তু পতাকাবাহী পেত্রুশভ, বা লেফ্‌টেন্যান্ট আন্তনভ বা অন্য যে কাউকে তাদের সত্যিকাবের মতামত জানাতে বলুন, দেখবেন তারা প্রত্যেকেই এক-একজন ক্ষুদে নেপোলিয়ন, এক একটি ক্ষুদে দানব, আর একটি "তারকা" লাভের জন্য অথবা এক-তৃতীয়াংশ বেতনবৃদ্ধির জন্য একটি যুদ্ধ বাধিয়ে দিযে শত শত মানুষ খুন করতে তারা প্রস্তুত।

কর্নেল বলছে, "মাফ করবেন, যুদ্ধটা শুরু হয়েছিল বাঁ দিক থেকে, আর সেখানে ছিলাম আমি স্বয়ং।"

"হয়তো তাই", কালুগিন জবাবে বলল। অধিকাংশ সময় আমি ডান দিকেই ছিলাম—তবু দু'বার ওদিকে গিয়েছিলাম। একবার জেনারেলকে খুঁজতে, আর তারপর বাসাবাড়িগুলির অবস্থা দেখতে। বিশ্বাস করুন, সেখানে তখন অবস্থা খুব গরম!"

"কালুগিনের জানা উচিত", প্রিন্স গল্ট্সিন কর্নেলকে বলল। "কি জানেন, আজ ভি আমাকে আপনার কথা বলেছেন। তিনি বললেন, আপনি একেবারে চমৎকার!"

"কিন্তু ক্ষয়-ক্ষতি, সে তো ভয়ংকর", পদমর্যাদাসুলভ দুঃখের সুরে কর্নেল মন্তব্য করল। "আমার রেজিমেন্টে চারশো লোক অকেজো হয়ে গেছে। আমি যে কি করে বেঁচে এলাম সেটাই আশ্চর্য।"

ঠিক সেই সময় দেখা গেল, ছেঁড়া জুতো পরে মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে মিখাইলভের লালচে মূর্তিটা পথ ধরে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। এদের দেখে সে খুবই বিব্রত বোধ করল : তার মনে পড়ে গেল, আগের দিন রাতে কালুগিনের সামনেই কি ভাবে সে নিজের মাথা বাঁচিয়েছিল; তার ভয় হলো, এরা হয়তো ভাববে যে সে আহত হবার ভাণ করছে; এই ভদ্রলোকরা তাকে না দেখে ফেললে সে হয়তো মুখ ঘুরিয়ে বাড়ি চলে যেত এবং ব্যান্ডেজ না খোলা পর্যন্ত বাড়িতেই থেকে যেত।

সামনাসামনি পৌঁছে কালুগিন হেসে বলল, "কাল গোলাবর্ষণের সময় আমি যখন ওর কাছে ছিলাম তখন ওর যা অবস্থা হয়েছিল সেটা দেখবার মতোই বটে।"

"আপনি কি আহত হয়েছেন ক্যাপ্টেন?" কালুগিন এমনভাবে হেসে প্রশ্নটা করল যার অর্থ দাঁড়ায় : "আচ্ছা, কাল রাতে তুমি কি আমাকে দেখেছিলে? আমি চমৎকার অবস্থায় ছিলাম না?"

"একটু ছড়ে গেছে। একটা পাথর ছিটকে এসে লেগেছিল", মুখটা লাল করে মিখাইলভ জবাব দিলো; তার মুখের ভাব যেন বলছে : "তোমাকে দেখেছিলাম; স্বীকার করছি যে তুমি ছিলে চমৎকার, আমি ছিলাম নেহাৎই বিরক্তিকর।"

"পতাকাটা কি এর মধ্যেই নামিয়ে দেওয়া হয়েছে?" লেফ্টেন্যান্ট ক্যাপ্টেনের টুপির দিকে তাকিয়ে বিশেষভাবে কাউকে লক্ষ্য না করে গুরুগম্ভীর গলায় গল্ট্সিন ফরাসীতে জিজ্ঞাসা করল।

সে যে ফরাসী ভাষা বোঝে ও বলতে পারে সেটা জানাবার জন্য মিখাইলভও ফরাসীতেই জবাব দিলো, "এখনও হয়নি।"

"যুদ্ধ-বিরতি কি এখনও চলছে? গল্ট্সিন ভদ্রভাবে মিখাইলভের কাছে জানতে চাইল; যেন সে বলতে চাইল—অন্তত লেফ্টেন্যান্ট ক্যাপ্টেনের তাই মনে হলো—"ফরাসীতে কথা বলতে তোমার নিশ্চয়ই কষ্ট হয়; কাজেই এটাই কি ভাল নয় যে...।" এই কথা বলেই এড্-ডি-কং তার কাছ থেকে চলে গেল।

অন্যান্য দিনের মতোই লেফ্টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেনের খুব নিঃসঙ্গ লাগল; একে একে

অনেককে অভিবাদন জানিয়ে—কারও সঙ্গ তার পছন্দই নয়, আবার কারও কাছে যাবার সাহসই তার হলো না—সে কাজারস্কি স্মৃতি-স্তম্ভের পাশে বসে একটা সিগারেট ধরালো।

ব্যারণ পেস্ত্‌কেও পথে দেখা গেল। সে বলল, যুদ্ধ-বিরতির কথা হবার সময় সে সেখানে উপস্থিত ছিল; জনা কয়েক ফরাসী অফিসারের সঙ্গে কথাও বলেছে; তাদেরই একজন নাকি তাকে বলেছে : "আরও আধ ঘণ্টা যদি অন্ধকার থাকত তাহলে তারা দ্বিতীয়বার বাসাবাড়িগুলোকে দখল করে নিতো", আর তার জবাবে সে বলেছিল : "মঁসিয়, আমি এ কথা অস্বীকার করব না শুধু এই কারণে যে আপনার কথার প্রতিবাদ করতে আমি চাই না"; কেমন মুখের মতো জবাবটা হয়েছিল, ইত্যাদি।

আসলে আলোচনার বৈঠকে সে উপস্থিত ছিল ঠিকই, কিন্তু একটাও মজাদার কথা সে বলেনি, যদিও ফরাসীদের সঙ্গে কথা বলার তার খুবই ইচ্ছা হয়েছিল (ফরাসীদের সঙ্গে কথা বলতে খুব মজা লাগে)। শিক্ষার্থী ব্যারন পেস্ত্‌ অনেকক্ষণ ধরেই পায়চারি করছিল আর পাশের ফরাসী লোকদের জিজ্ঞাসা করছিল; "আপনি কোন্‌ রেজিমেন্টের?" তারাও জবাব দিয়েছিল। ব্যস, ঐ পর্যন্তই; আর কোনও কথাই হয়নি। অবশ্য এক সময় অনেক দূর এগিয়ে গেলে পাহারারত শান্ত্রীটি ফরাসী ভাষা বুঝবে না মনে করেই তৃতীয় পুরুষ তাকে সরাসরি গালাগাল করে বলেছিল : "লোকটা উচ্ছন্নে যাক! ও আমাদের কাজকর্মের খোঁজ নিতে যাচ্ছে!" এর পরে যুদ্ধ-বিরতির আলোচনায় কোনও আগ্রহ বোধ না করায় শিক্ষার্থী ব্যারন পেস্ত্‌ বাসায় ফিরে গিয়েছিল, আর এখন সে যে সব ফরাসী বয়ান আওড়াচ্ছে সেগুলি পথে যেতে যেতেই ভেবে নিয়েছিল। পথে আরও বেড়াচ্ছিল লেফ্‌টেন্যান্ট জোবভ্‌, ক্যাপ্টেন অব্‌ঝোগভ, গোলন্দাজ বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন, জনৈক শিক্ষার্থী, এবং আগের দিনের আরও অনেকে—সকলের মনেই সেই একই চিরন্তন ভাবের প্রেরণা—মিথ্যা, অহংকার ও চপলতা। অনুপস্থিত আছে শুধু প্রাস্কুখিন, নেফের্‌দভ, ও আরও কয়েকজন, যাদের কথা এখন আর কারও মনে পড়ছে না বা কেউ ভাবছে না, যদিও এখনও পর্যন্ত তাদের মৃতদেহগুলিকে ধুয়ে-মুছে কবরে শোয়ানো হয়নি; আর বাবা, মা, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরাও—যদি থেকে থাকে—এক মাসের মধ্যেই তাদের কথা ভুলে যাবে, অবশ্য যদি ইতিমধ্যেই ভুলে না গিয়ে থাকে।

মৃতদেহগুলি কবর দেবার কাজে ব্যস্ত সৈনিকটি একটি মৃতদেহকে কাঁধ ধরে তুলতে তুলতে বলল, "এ বুড়ো লোকটাকে আমি তো চিনতেই পারতাম না।" লোকটির বুকটা গুঁড়ো হয়ে গেছে, মস্ত বড় মাথাটা ফুলে উঠেছে, কালো মুখটা চক্‌চক্‌ করছে, চোখ দুটো উল্টে গেছে। পিঠের দিকটা ধরে তোলো মোরোজ্‌কা, নইলে হয়তো খুলে পড়বে। থুঃ, একেবারে পচা।"

"থুঃ, একেবারে পচা!"—একদিন যে মানুষ ছিল আজ তার শুধু এইটুকুই অবশিষ্ট আছে।

১৬

আমাদের দুর্গ ও ফরাসীদের ট্রেঞ্চের মাথায় নিশান উড়ছে: এ দুইয়েব মাঝখানে ফুলন্ত উপত্যকার বুকে ছড়িয়ে আছে বিকৃত মৃতদেহের স্তূপ, পরনে ধূসব-নীল পোশাক, পায়ে জুতো নেই। মজুরবা মৃতদেহগুলি তুলে গাড়িতে বোঝাই করছে। পচা দেহগুলির ভয়ংকর দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। সেবাস্তোপল থেকে এবং ফরাসী শিবির থেকে দলে দলে কৌতূহলী লোকরা বেরিয়ে এসেছে সে দৃশ্য দেখতে।

সেই লোকগুলি নিজেদের মধ্যে কি বলছে শুনুন। একদল রুশ ও ফরাসী একজন তরুণ অফিসারকে ঘিবে ধবেছে। ভুল ফবাসী বললেও অফিসারটি নিজেব মনের ভাব বুঝিয়ে বলতে পারে। জনৈক রক্ষীব একটা থলে সে পবীক্ষা করে দেখছিল।

"এখানে একটা পাখি কেন?" সে শুধালো।

"এটা রক্ষী বাহিনীব থলে মঁসিয। তাই রাজকীয ঈগলের ছবি আঁকা।"

"তুমিও কি বক্ষীবাহিনীর লোক?"

"না মঁসিয়, আমি ষষ্ঠ রেজিমেন্টের লোক।"

হলদে কাঠের যে হোল্ডারটা মুখে দিয়ে ফরাসীটি ধূমপান করছিল সেটা দেখিয়ে অফিসার শুধালো, "এটা কোথায় কিনেছিলে?"

"বালাক্লাভা থেকে মঁসিয়। খুব সাধারণ জিনিস—তালকাঠের তৈরি।"

"সুন্দর!" অফিসারটি বলল। যা বলতে চায় তাব চাইতে যে শব্দগুলি সে জানে তার সাহায্যেই সে আলোচনাটা চালাতে ইচ্ছুক।

"আমাদের এই সাক্ষাতের স্মারক হিসাবে আপনি যদি এটা গ্রহণ করেন তো আমি বাধিত হবো," এই কথা বলে ভদ্র ফবাসীটি সিগারেটটা খুলে নিয়ে মাথাটা ঈষৎ নুইয়ে হোল্ডাবটা অফিসারেব হাতে দিলো। অফিসারও নিজের হোল্ডারটাকে দিলো; আর উপস্থিত ফরাসী ও রুশ সকলেই খুশিতে হেসে উঠল।

লাল শার্টের উপর হাল্কাভাবে একটা কোট চাপিয়ে একটি চটপটে পদাতিক সৈনিক কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে জনৈক ফরাসীর দিকে এগিয়ে গেল; সঙ্গীরা তাব পিছনে সার বেঁধে দাঁড়াল; তাদের হাত পিছন থেকে জোড়া, মুখগুলি খুশিতে ও কৌতূহলে উজ্জ্বল। চটপটে সৈনিকটি ফরাসী লোকটির কাছে পাইপের জন্য আগুন চাইল। ফরাসীটি নিজের পাইপের তামাক তুলে নিয়ে তাব ভিতব থেকে কয়েক টুকরো অঙ্গার বের করে রুশ সৈনিকটিকে দিলো।

"তামাকটা ভাল", লাল শার্ট পরা সৈনিকটি বলল; সকলে হেসে উঠল।

ফরাসী লোকটি বলল, "হ্যাঁ, ভাল তামাক, তুর্কী তামাক। আর তোমারটা কি রুশ তামাক? বেশ ভাল তো?"

"রুশ ভাল", লাল শার্ট পরা সৈনিক জবাব দিলো; তার মুখে ফরাসী শুনে দর্শকরা হেসে গড়িয়ে পড়ল। সে আবার বলল, "ফরাসী ভাল না, সুপ্রভাত মঁসিয়।" এক সঙ্গেই তার ফরাসী শব্দের ভাণ্ডার শেষ করে সে ফরাসী লোকটির পেটে হাত বুলিয়ে হাসতে লাগল। ফরাসীরাও হেসে উঠল।

ফরাসীদের দলে ভিড়ে গিয়ে একটি ফরাসী পদাতিক সৈনা বলল, "এই রুশ জানোয়ারগুলো দেখতে মোটেই ভাল নয়।"

আমাদের লোকদের দিকে এগিয়ে এসে আর একটি লোক ইতালীয় টানে জিজ্ঞাসা করল, "ওরা কি জন্য হাসছে?"

পদাতিকটির জরির কাজ করা কোটটা দেখে চটপটে সৈনিকটি বলল, "কাফতান ভাল।" আবার সকলে হেসে উঠল।

"সীমা রেখা পার হয়ো না! ফিরে যাও! যত সব!" একজন ফরাসী কর্পোরাল হাঁক দিয়ে উঠল, আর অন্য সৈন্যরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও সরে গেল।

একদল ফরাসী অফিসারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাদের অশ্বারোহী বাহিনীর একজন তরুণ অফিসার ফরাসী নাপিতদের কুৎসিত ভাষায় অনর্গল কথা বলে চলেছে। কথা হচ্ছিল জনৈক কাউন্ট সাজোনফকে নিয়ে। তকমাধারী একজন ফরাসী অফিসার বলল, "তাকে আমি খুব ভাল করে চিনি। যে সব সত্যিকারের রুশ জমিদারদের আমরা এত প্রশংসা করি তিনি তাদেরই অন্যতম।"

অশ্বারোহী বাহিনীর লোকটি বলল, "আমি একজন সাজোনফকে চিনি; কিন্তু আমি যদ্দূর জানি তিনি জমিদার নন; ছোটখাট ময়লা মানুষটি, বয়স হবে আপনার মতোই!"

"ঠিক বলেছেন স্যার, তিনিই। আহা, সেই প্রিয় জমিদারটিকে দেখতে বড় সাধ হয়। কখনও যদি তার সঙ্গে দেখা হয়, দয়া করে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন ক্যাপ্টেন লাতুর," মাথাটা নুইয়ে সে বলল।

আলোচনাটা চালিয়ে যাবার ইচ্ছায় মৃতদেহগুলি দেখিয়ে অশ্বারোহী বাহিনীর লোকটি বলল "কী ভয়ংকর কাজেই না আমরা মেতেছিলাম, তাই না? কাল রাতে অবস্থা খুব গরম ছিল, তাই না?"

"ওঃ স্যার, সে কী ভয়ংকর অবস্থা! কিন্তু আপনার সৈনিকরা বড় ভাল মানুষ, কী যে ভাল! এ রকম ভাল মানুষদের সঙ্গে যুদ্ধ করেও সুখ!"

"আমিও স্বীকার করতে বাধ্য যে আপনার লোকরাও পা দিয়ে নাক মোছে না," মাথা নুইয়ে অশ্বারোহী বাহিনীর লোকটি বলল। ভাবল, খুব একটা মজাদার কথা বলেছে।

কিন্তু এ সব কথা যথেষ্ট হলো।

এবার চলুন এই দশ বছর বয়সের ছেলেটিকে দেখি। ছেলেটির মাথায় পুরনো

টুপি (খুব সম্ভব টুপিটা ওর বাবার।), জুতো পরেছে মোজাহীন পায়, সুতীর পাজামাটা একটা গিট দিয়ে বাঁধা। যুদ্ধ-বিরতির পরমুহূর্তেই সে প্রাচীরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে, ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে, একঘেয়ে কৌতূহলের সঙ্গে ফরাসীদের আর মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে থাকা মৃতদেহগুলিকে দেখছে, আর এই দুর্ভাগ্য উপত্যকার বুকে প্রচুর নীল বনফুল কুড়িয়ে নিচ্ছে। মস্ত বড় একটা ফুলের থোকা হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরবার পথে অনেকগুলি মৃতদেহ সে এক জায়গায় দেখে সেখানে সে থামল, বাতাসে যে দুর্গন্ধ ভেসে আসছিল সেটাকে দূরে রাখতে নাকটা চাপা দিয়ে সব চাইতে কাছের মুণ্ডুহীন বীভৎস মৃতদেহটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সে আরও একটু এগিয়ে গেল, মৃতদেহের ছড়ানো শক্ত হাতটাকে পা দিয়ে ছুঁলো। হাতটা একটু দুলে উঠল। সে আবার ছুঁলো, এবার আরও চাপ দিয়ে। হাতটা ঠেলে উঠে আবার পড়ে গেল। ছেলেটি হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, ফুল দিয়ে মুখটাকে ঢেকে যত দ্রুত সম্ভব দুর্গের দিকে চলে গেল।

হ্যাঁ, দুর্গের মাথায় ও ট্রেঞ্চগুলোতে সাদা নিশান উড়ছে, ফুলে ভরা উপত্যকাটা দুর্গন্ধ মৃতদেহে ভরে আছে, উজ্জ্বল সূর্যটা নির্মল আকাশ থেকে নেমে আসছে নীল সাগরের দিকে, আর ঈষৎ আন্দোলিত নীল সাগরটা সূর্যের সোনালী আলোয় ঝিকমিক করছে। দলে দলে লোক জমা হচ্ছে, দেখছে, কথা বলছে, হাসছে। আর এই সব মানুষ—এই সব খৃস্টান যারা প্রেম ও আত্মত্যাগের মহান বিধানের কথা প্রচার করে—তারা যা করেছে তা দেখেও কি অনুশোচনায় তাঁর সামনে নতজানু হবে না যিনি তাদের দিয়েছেন জীবন আর অন্তরে দিয়েছেন মৃত্যুর ভয় এবং কল্যাণ ও সুন্দরের প্রতি ভালবাসা? তারা কি দুই চোখে আনন্দ ও সুখের জল নিয়ে ভাইয়ের মতো পরস্পরকে আলিঙ্গন করবে না? না! সাদা ন্যাকড়াগুলো তুলে নেওয়া হয়েছে—মৃত্যু ও দুর্দশার যন্ত্রগুলি আবার শুরু করে দিয়েছে তাদের হীন গর্জন, আবার বইছে নির্দোষ ভাল মানুষের রক্ত, আর্তনাদে ও অভিশাপে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা বলা হয়েছে; কিন্তু একটা গভীর সন্দেহ আমাকে ছেয়ে ফেলেছে। হয়তো এ সব কথা বলা আমার উচিত হয়নি। হয়তো আমি যা বলেছি সেটা সেই সব নির্মম সত্যেরই একটি যা আমাদের প্রত্যেকের বুকের মধ্যেই অচেতনভাবে লুকিয়ে থাকে, কিন্তু পাছে কোনও ক্ষতি হয় তাই সে সত্যকে প্রকাশ করা উচিত নয়, ঠিক যে রকম উচিত নয় মদের তলানিটাকে নেড়ে দেওয়া, পাছে মদটাই নষ্ট হয়ে যায়।

এই কাহিনীতে কোথায় আঁকা হয়েছে সেই পাপ যাকে এড়িয়ে চলা উচিত? আর কোথায়ই বা আছে সেই ভাল যাকে অনুকরণ করা উচিত? কে খল-নায়ক, আর কে নায়ক? সকলেই ভাল, সকলেই খারাপ।

যে সাহস ও অহংকার সকলেরই আচরণের প্রেরণাস্বরূপ তা আছে কালুগিনের মধ্যে. ধর্মবিশ্বাস, রাজসিংহাসন ও পিতৃভূমির জন্য রণক্ষেত্রে প্রাণ দিলেও প্রাস্কখিন, নিবীর্য ও নিরীহ, মিখাইলভ ভীরু ও সংকীর্ণমনা, দৃঢ়বিশ্বাস ও নীতিবিহীন ছেলেমানুষ পেস্ত্—এরা কেউই এ কাহিনীর খলনায়ক অথবা নায়ক হতে পারে না।

আমার কাহিনীর যে নায়ককে আমি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসি, পরিপূর্ণ সৌন্দর্য দিয়ে যাকে আমি আঁকতে চেষ্টা করেছি, যে সুন্দর ছিল, আছে এবং থাকবে—সে ছিল সত্য।

জুন ২৬, ১৮৫৫

॥ সেবাস্তোপল, ১৮৫৫-র অগস্টে ॥

১

অগস্ট মাসের শেষ দিকে অফিসারদের একটা ছ্যাকরা গাড়ি (ইহুদিদের ব্রিংস্কা, রুশ চাষীদেব গাড়ি ও বেতের ঝুড়ির মাঝামাঝি ধরনের একটা বিচিত্র যান যা শুধু এই অঞ্চলেই দেখা যায়) দুভান্‌কয় (সেবাস্তোপল-এর আগের শেষ স্টেশন) ও বাখ্‌চি সরাইয়ের মধ্যবর্তী খাঁড়ির মতো পথটা ধরে ঘন, গরম বালির ভিতর দিয়ে ধীর গতিতে এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলেছে।

গাড়িটার সামনে বসে আছে একজন আর্দালি; পরনে সুতীর কোট ও বেঢপ টুপি; হয়তো এক সময় কোনও অফিসারের ছিল; পিছনে ঘোড়ার কাপড় দিয়ে ঢাকা দেওয়া একগাদা বাণ্ডিল ও থলের স্তূপের উপব গরম ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে বসে আছে পদাতিক বাহিনীর একজন অফিসার। তার বসবার ভঙ্গি দেখে যতদূর বোঝা যায়, অফিসারটি কিছুটা ছোটখাট হলেও তার গড়নটা বেশ মজবুত—বৃষস্কন্ধ নয়, কিন্তু স্ফীতবক্ষ—শরীরটা বেশ চওড়া ও শক্ত; গলাটা পেশীবহুল, আর পিছন দিকে বেশ টান-টান; যাকে কোমর বলে—শরীরের মধ্যাংশ—সেটা নেই বললেই চলে, আর মাংসাধিক্যের কোনও লক্ষণও নেই; বরং একটু শুকনোই বলা যায়, বিশেষ করে তার মুখটাতে কেমন একটা অস্বাস্থ্যকর পাণ্ডুর রঙেব ছাপ। মুখটা দেখতে হয়তো ভালই ছিল; কিন্তু কিছুটা ফোলা-ফোলা হবার দরুণ এবং বড় বড় নরম ভাঁজগুলো—বয়সের চিহ্ন নয়—বাড়তে বাড়তে মুখটাকে কেমন যেন নীরস ও কর্কশ করে তুলেছে। চোখ দুটি ছোট, বাদামী, ঝকঝকে, কিছুটা উদ্ধত; ছোট, ঘন গোঁফ যাতে কামড় বসানো তার অভ্যাস; থুতনি ও গালে দু'দিনের ঘন, কালো, খাড়া-খাড়া দাড়ি। গত ১০ই মে তারিখে একটা গোলার টুকরো অফিসারটির মাথায় আঘাত লেগেছিল; এখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আছে; কিন্তু সপ্তাহখানেক হলো সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করায় সে এখন হাসপাতাল থেকে সিম্‌ফেরোপল-এ তার রেজিমেন্টে ফিরে যাচ্ছে। যেখানে গোলাগুলি চলছে, সেই অঞ্চলেই কোথাও তার রেজিমেন্টটা আছে;

সেটা সেবাস্তোপল-এ, না নর্থ সাইড-এ, না ইংকারমান-এ তা সে ঠিক জানে না। মাঝে মাঝেই গোলাগুলির শব্দ স্পষ্ট কানে ভেসে আসছে, বিশেষ করে যখন সে পাহাড়ের কোন ফাঁকে পৌঁচছে আর বাতাসটা তার দিকেই আসছে; তাই মনে হচ্ছে লড়াইটা বেশ কাছেই কোথাও হচ্ছে। এই হয়তো বিস্ফোরণের শব্দ বাতাস বিদীর্ণ করে চমকে দিলো। আবার কখনও ঢাকের বাজনার মতো দ্রুতলয়েব কোনও শব্দ কানে আসছে; কখনও বা মুষলধারায় বৃষ্টি নামবার মুহূর্তে ঝড়ের চরম ক্ষণের বজ্রের গর্জনের মতো একটা অবিশ্রাম প্রচণ্ড শব্দের মধ্যে সব কিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। সকলেই বলছে, আর শুনেও বোঝা যায়, যে ভয়ংকর বোমাবর্ষণ চলছে। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি গন্তব্যস্থানে পৌঁছবাব আগ্রহে অফিসারটি আর্দালিকে তাড়াতাড়ি গাড়ি চালাতে বলল। বিপরীত দিক থেকে রুশ মুঝিকদেব দ্বারা চালিত মালগাড়ির দীর্ঘ সারি এগিয়ে আসছে; গাড়িতে রসদ বোঝাই করে তারা সেবাস্তোপল-এ নিয়ে গিয়েছিল; এখন ফিবে চলেছে ধূসর ওভারকোট পরা একদল আহত ও রুগ্ন সৈনিক, কালো কোটপরা নাবিক, লাল টুপি পরা গ্রীক স্বেচ্ছাসৈনিক, আর দাড়িওয়ালা দেহরক্ষী সৈনিককে নিয়ে। অফিসারের গাড়িটাকে বাধ্য হয়ে থামতে হলো; অফিসারটি ভুরু ও চোখ কুঁচকে সামনের ঘন ধুলোর পর্দার দিকে তাকাল; তাব চোখে, কানে ও ঘর্মাক্ত মুখে ধুলো ঢুকে গেল; তার পাশ দিয়ে এগিয়ে যাওয়া রুগ্ন ও আহতদের মুখের দিকে সে নির্বিকার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

"ওই যে দুর্বল ছোটখাট লোকটাকে দেখছেন, ও আমাদের কোম্পানির লোক," আহত সৈনিকে বোঝাই যে গাড়িটা ততক্ষণে তাদের পাশে পৌঁছে গেছে সেদিকে উপরওয়ালাব দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর্দালি বলল।

গাড়িটার সামনে একপাশে বেঁকে বসে ভেড়ার লোমের টুপি মাথায় একজন দাড়িওয়ালা রাশিয়ান একটা চাবুকের হাতলটা ফালের নিচে চেপে ধরে তার ফলাটাকে ঘসামাজা করছিল। তার পিছনে চার-পাঁচজন লোক নানা ভঙ্গিতে বসে গাড়ির ঝাঁকুনির তালে তালে এদিক-ওদিক দুলছিল। তাদের মধ্যে একজনের হাতটা দড়ি দিয়ে গলার সঙ্গে ঝোলানো, কাঁধের উপর ঝোলানো কোটের নিচে একটা খুব নোংরা সার্ট দেখা যাচ্ছে; মুখটা শুকনো ও বিবর্ণ হলেও সে গাড়ির মাঝখানে বেশ খুশি মনে সোজা হয়ে বসেছিল: অফিসারকে দেখে টুপিটা খুলতে গিয়েও যেই তার মনে পড়ে গেল যে সে আহত, অমনি সে এমন ভাব দেখালো যেন মাথাটা চুলকোবার জন্যই মাথায় হাত তুলেছিল। তার পাশেই আর একটি সৈনিক গাড়ির নিচে শুয়েছিল: শুধু দেখা যাচ্ছিল, তার দুটো শুকনো হাত গাড়ির দুটো পাশকে চেপে ধরে আছে, আর ভাঁজ করা হাঁটু দুটো বাকলের আঁটির মতো এপাশ-ওপাশ দুলছে। তৃতীয় সৈনিকটির মুখটা ফোলা, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, তার উপরে একটা সৈনিক-টুপি বসানো; গাড়িব এক পাশে বসে চাকার উপর দিয়ে পা দুটো ঝুলিয়ে দিয়েছে।

আর হাঁটুর উপর কনুই রেখে বসে বসে ঝিমুচ্ছে। তাকে দেখেই অফিসারটি হাঁক দিলো :

"দোল্ঝ্নিকভ!"

"উপস্থিত!" চোখ মেলে তাড়াতাড়ি টুপিটা নামিয়ে এনে গম্ভীর গলায় সৈনিকটি এমনভাবে চেঁচিয়ে উঠল যেন বিশজন মানুষ একসঙ্গে জবাবটা দিলো।

"তুমি কবে আহত হয়েছ বাবা?"

সৈনিকটির ভারী, ক্ষীণদৃষ্টি চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল; নিজেব অফিসারকে সে চিনতে পেরেছে।

সেই একই গম্ভীর গলায় আবার বলল, "আপনার স্বাস্থ্য কামনা করি হুজুর।"

"আমাদের রেজিমেন্ট এখন কোথায়?"

"সেবাস্তোপল-এই ছিল হুজুর। গত বুধবার সরিয়ে নেবার কথা ছিল।"

"কোথায়?"

"তা জানি না। হয়তো নর্থ সাইড-এ হুজুর।" টুপিটা মাথায় চাপিয়ে সে একটানা বলতে লাগল, "জানেন হুজুর, আজ সব জায়গায় গোলাগুলি চলছে . গোলাই ফাটছে সব চাইতে বেশি। উপসাগর থেকেও শুনতে পাবেন। যুদ্ধ করছে যেন শয়তানের মতো ..."

সৈনিকটির কথা আর শোনা গেল না, কিন্তু তার মুখের ভাব ও শরীরের ভঙ্গি দেখে বেশ বোঝা গেল যে যন্ত্রণাকাতর গলায়ই সে কথা বলে চলেছে, আর এই কথা বলায় সে কোনও আরামও পাচ্ছে না।

লেফ্‌টেন্যান্ট কোজেল্‌ৎসভ নামক এই অফিসারটি অন্যের চাইতে একটু আলাদা। যারা একটু বিশেসভাবে চলে, অন্যেরা এ-ভাবে চলে ও ও-ভাবে কাজ করে বলেই যারা এটা করে ও ওটা করে না, সে তাদের দলের নয়; সে কাজ করে তার নিজের ইচ্ছামতো। আর অন্যরা কাজ করে তা দেখে আর ভাবে যে তারাই ঠিক কাজটি করছে। প্রকৃতি তাকে যথেষ্ট গুণ দিয়েই পাঠিয়েছে। সে নির্বোধ নয়, বুদ্ধি আছে; ভাল গান করে, গীটার বাজায়। সপ্রতিভভাবে কথা বলে, অনায়াসে লিখতে পারে—বিশেষ করে রেজিমেন্টের অ্যাড্‌জুটান্ট থাকার সময় থেকে সরকারী প্রতিবেদন লেখার কাজে বেশ দক্ষতা অর্জন করেছে, কিন্তু তার সব চাইতে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রবল দম্ভ—প্রধানত ঐ সব ছোটখাট গুণ থেকে উদ্ভূত হলেও সেটাই তার শক্তিশালী ও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অবশ্য তার এই দম্ভ জীবনের সঙ্গে এমন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত যা সাধারণত পুরুষদের মধ্যে, এবং বিশেষ করে সামরিক লোকদের মধ্যেই দেখা যায় এবং যার ফলে সে হয় সকলের আগে যাবে আর না হয়তো মরবে; আবার যখন একা থাকে তখনও যাদের সে মনে মনে নিজের সমকক্ষ মনে করে তাদের উপর প্রভাব খাটাতে চায়।

"হায়! মস্কভা-র (তাচ্ছিল্য মেশানো আদরের ডাক) বকুনি শুনে কি হবে?" আহত সৈনিক-বোঝাই গাড়িগুলো দেখে এবং সৈনিকটির মুখে গোলাগুলির খবর শুনে মনে মনে বিরক্ত হয়ে লেফ্‌টেন্যান্ট বিড়বিড় করে বলল। "বুড়ো মস্কভার রসিক লোক...চলো হে নিকোলায়েভ, এগিয়ে চলো!...তুমি কি ঘুমিয়ে পড়লে না কি?" আর্দালির দিকে ফিরে সে বিরক্ত গলায় বলল।

নিকোলায়েভ লাগামে টান দিলো, জিভ দিয়ে চুক্-চুক্ শব্দ করল, আর গাড়িটা দ্রুত তালে ছুটে চলল।

"দেখো হে, ঘোড়াগুলোকে খাওয়াবার জন্য একবার থেমে তারপর রাতের মতো গাড়ি চালিও," অফিসারটি বলল।

২

দুভানকয়-এর তাতারদের ঘরবাড়ির পাথরের দেয়াল ভেঙে-চুরে রাস্তার উপর পড়েছে। অফিসারের গাড়িটা সেই রাস্তায় মোড় নিতেই আবার আটকে গেল। এক সার গাড়ি গুলি ও কামানের গোলা বোঝাই করে সেবাস্তোপল-এর দিকে যেতে পথটা আটকে ফেলেছে। ফলে গাড়িটাও থামতে বাধ্য হলো।

পথের পাশে ভাঙা দেয়ালের পাথরের উপর ধুলোর মধ্যে বসে দুটি পদাতিক সৈন্য রুটি দিয়ে তরমুজ খাচ্ছিল।

আর একটি সৈনিক একটা ছোট বস্তা পিঠে ঝুলিয়ে সবে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে; দু'জন পদাতিকের একজন রুটি চিবোতে চিবোতে তাকে শুধালো, "অনেক দূর যাচ্ছ নাকি হে?"

তরমুজের উপর থেকে চোখ সরিয়ে সৈনিকটি জবাব দিলো, "আমরা চলেছি গুর্বার্নিয়া থেকে আগত কোম্পানির সঙ্গে যোগ দিতে। আজ প্রায় তিন সপ্তাহ হলো খড়ের মধ্য মাথা গুঁজে পড়ে আছি; এবার সকলেরই ডাক পড়েছে; কিন্তু রেজিমেন্ট যে কোথায় আছে তা তো জানি না। কেউ বলছে, গত সপ্তাহে কোরাবেলনায়া-তে চলে গেছে। সে জায়গাটা কোথায় তোমাদের কোনও ধারণা আছে মশাইরা?"

একটা কাঁচা সাদাটে তরমুজে মনের সুখে ছুরির ফলাটা ঢুকিয়ে বুড়ো পদাতিকটি বলল, "শহরে ভাই, শহরে। ঠিক দুপুরে আমরা সে জায়গাটা ছেড়ে এসেছি। জায়গাটা খুব গরম হে বাপু। আমার কথা শোনো, সেখানে যেয়ো না। এখানেই কোথাও ঘাসের উপর বসে পড়ো, দু'একটা দিন শুয়ে কাটিয়ে দাও—সেটাই ভাল হবে।"

"কিন্তু কেন বলো তো মশাইরা?"

"শুনতে পাচ্ছ না চারিদিকে গোলাগুলি চলছে? একটা আস্ত বাড়িও কোথাও নেই। আর আমাদের ছেলেদের কথা—তারা এত বেশি মারা গেছে যে তুমি গুণে শেষ করতে পারবে না।"

হাতটাকে অসহায়ভাবে দুলিয়ে বক্তা মাথার টুপিটাকে মুচড়ে দিলো।

নবাগত সৈনিকটি চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল, কয়েকবার জিভ দিয়ে শব্দ করল, জুতোর উপর থেকে পাইপটা টেনে বের করে নতুন তামাক না ভরে পোড়া তামাকটাই নেড়ে চেড়ে অন্য সৈনিকের পাইপের আগুনে সেটা ধরিয়ে নিলো; তারপর টুপিটা তুলে বলল :

"মশাইরা, আমরা এখন ঈশ্বরের হাতে! আচ্ছা, মাপ করো!" পিঠের বোঝাটাকে সোজা করে সে পথ ধরে এগিয়ে চলল।

তরমুজ হাতে লোকটি বলল, "হেই, এখানে অপেক্ষা করলেই পারতে!"

"তফাৎ কিছু হতো না," বিড় বিড় করে বলে সে লোকটি গাড়িগুলোর ভিতর দিয়ে পথ করে এগিয়ে চলল। "লোকজনের কথায় মনে হচ্ছে, খাবার জন্য একটা তরমুজ কিনে নিলে ভাল করতাম।"

৩

কোজেল্‌ৎসভ-এর গাড়ি যখন ফটকে পৌছল স্টেশন তখন লোকে ভর্তি। প্রথমেই তার দেখা হলো স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে; যে দু'জন অফিসার তার পিছু নিয়েছে তাদের সঙ্গে তার ঝগড়া বেঁধে গেছে।

ভ্রমণকারীদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করবার জন্যই স্টেশন মাস্টার বলল, শুধু তিন দিন নয়, আপনাদের হয়তো দশদিনও অপেক্ষা করতে হতে পারে। আরে মশাই, জেনারেলদের পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হচ্ছে। আপনারা কি চান, আমি নিজে বিপদে পড়ি?"

প্রবীণতর অফিসারটি এক গ্লাস চা হাতে নিয়ে চেঁচিয়ে বলল, "ঘোড়া কম থাকলে তো কেউই পাবে না।...মালপত্র হাতে ওই চাকরটাকে তাহলে একটা ঘোড়া দেওয়া হলো কেন?"

যুবক সঙ্গীটি একটু তোৎলা স্বরে বলল, "কিন্তু আপনি যুক্তি মেনে চলুন মিঃ স্টেশন মাস্টার। আমরা তো মজা করবার জন্য ভ্রমণ করছি না। ডাক পড়লে আমাদের তো যেতেই হবে। জেনারেল ক্র্যাম্পার-এর কাছে আমাকে নালিশ করতে হবে; সত্যি, নালিশ করব। মনে রাখবেন, আপনি অফিসারদের পর্যন্ত খাতির করছেন না!"

প্রবীণ অফিসারটি সক্রোধে বলল, "আপনি সব কাজ পণ্ড করেন। আপনি শুধু বাধার সৃষ্টি করছেন। এই সব লোকের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় সেটা আপনার জানা উচিত। কোনও রকম মান-সম্মান দেখাচ্ছেন না!...আমি বলছি, ঘোড়া চাই! এই মুহূর্তে!"

"ঘোড়া দিতে পারলে তো আমিও খুশি হতাম মশায়, কিন্তু পাব কোথায়?"

স্টেশন মাস্টার কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হঠাৎ আবার রাগে ফেটে পড়ল; হাত-পা নেড়ে বলে উঠল :

"আপনাকে আমি ভালভাবেই চিনি মশায়; কিন্তু আমি কি করতে পারি? কোনও রকমে একটা মাস যদি কাটিয়ে দিতে পারি—তারপর আর আমাকে এখানে পাবেন না। না হয় মালাখণ্ড কুর্গান-এ যাব সেও ভাল। সত্যি বলছি! এ ধরনের হুকুম চালাবার পরে তাদের যা খুশি তাই করুক। গোটা স্টেশনে একটা ভাল গাড়ি নেই; তিন দিনের মধ্যে ঘোড়াগুলোর পেটে একটা খড় পড়েনি।"

এই কথা বলে স্টেশন মাস্টার ফটক পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অফিসারদের সঙ্গে কোজেলৎসভও প্রতীক্ষালয়ে ঢুকল।

এক মুহূর্ত আগেই রাগে আগুন হলেও প্রবীণ অফিসারটি এবার তরুণ অফিসারটিকে ঠাণ্ডা গলায় বলল, "দেখো, তিন মাস ধরে তো ছুটাছুটি করছি, না হয় আর একটু অপেক্ষা করি। তাতে ভয়ংকর কিছু ঘটবে না। একসময় না একসময় সেখানে পৌঁছে যাবই।"

নোংরা, ধোঁয়াটে প্রতীক্ষালয়টি অফিসার ও মালপত্রে এত ভর্তি হয়ে আছে যে কোজেলৎসভ অনেক কষ্টে জানালার গোবরাটে একটা জায়গা করে দিতে পারল। চারিদিককার মুখগুলি দেখতে দেখতে আর তাদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে সে একটা সিগারেট পাকাতে লাগল। দরজার ডান দিকে একটা নড়বড়ে চটচটে টেবিলের উপর দুটো পিতলের সামোভার ও কাগজের উপর কয়েকটুকরো চিনি রাখা আছে; অফিসারদের ভিড়টা সেখানেই বেশি; মেয়েদের ড্রেসিং গাউন কেটে বানানো একটা নতুন কোট পরা জনৈক দাড়ি বিহীন তরুণ অফিসার চায়ের পাত্রটা নতুন করে ভরছে। আরও চারজন তরুণ অফিসার ঘরের চার কোণে ছড়িয়ে আছে। তাদের একজন শীতের কোটটা মাথায় দিয়ে সোফার উপরেই ঘুমিয়ে আছে। আর একজন টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে সেখানে উপবিষ্ট একজন একহাতওয়ালা অফিসারের জন্য সিদ্ধ করা মাংস টুকরো টুকরো করে কাটছে। আর দু'জন অফিসার বেঞ্চিতে বসে আছে। তাদের ভাবভঙ্গি দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তারা কেউই অগ্রবর্তী পদাতিক বাহিনীর অফিসার নয়, আর সেজন্য তারা খুব খুশি। চারজন আর্দালির মধ্যে একজন ঝিমুচ্ছে, বাকীরা মালপত্র সামলাতে ব্যস্ত। এই ভিড়ের মধ্যে কোজেলৎসভ একটাও পরিচিত মুখ দেখতে পেল না; তবু সে সাগ্রহে তাদের কথাবার্তা শুনতে লাগল। তরুণ অফিসারদের তার বেশ ভাল লাগল; তাদের দেখেই সে বুঝতে পারল যে ওরা সব শিক্ষার্থী বাহিনী থেকে সোজা এখানে এসেছে। তাদের দেখে নিজের ভাইয়ের কথা তার মনে পড়ে গেল; সেও শিক্ষার্থী বাহিনীতেই ছিল এবং দু'এক দিনের মধ্যে তারও সেবাস্তোপল-এ আসার কথা। কিন্তু একজন অফিসারকে তার বিশেষ করে খুব খারাপ ও উদ্ধত বলে মনে হলো। জানালা থেকে সরে এসে সে

একটা বেঞ্চিতে বসল। এরা সকলেই যে স্টাফ অফিসার সেটা বুঝতে পেরে সে তাদের অপছন্দ করল তাই নয়, তাদের প্রতি একান্ত বিরূপ হয়েও উঠল।

৪

"এত কাছে এসে এ ভাবে এখানে আটকে পড়া খুব খারাপ," একজন তরুণ অফিসার বলে উঠল। "আজ রাতেই হয়ত একটা সংঘর্ষ বাঁধবে, আর আমরা সেখানে থাকব না।"

তার কড়া গলা আর মুখের সলজ্জ রঙের ছোপ দেখলেই বোঝা যায় যে সে মনে মনে জানে তার কথাগুলি ঠিক নয়।

একহাতওয়ালা অফিসারটি তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

বলল, "বিশ্বাস করো, সময়মতো তুমি ঠিক সেখানে গিয়ে হাজির হবে।"

একহাতওয়ালা লোকটির হাস্যোজ্জ্বল শুকনো মুখটার দিকে সশ্রদ্ধভাবে তাকিয়ে তরুণ অফিসারটি চুপ করে গিয়ে আবার চা তৈরিতে মন দিলো। সত্যি, একহাতওয়ালা অফিসারটির চেহারায়, বিশেষ করে তার কোটের ফাঁকা আস্তিনটায় এমন একটা ভাব ফুটে উঠেছে যেন যেকোনও অবস্থায়—যুদ্ধে কি আলোচনায়—সে বলে উঠতে পারে : "এ সবই খুব মজার ব্যাপার! এ সবই আমি জানি! ইচ্ছা হলে এ সবই আমি করতে পারি!"

পাশের সহকর্মীর দিকে ফিরে তরুণ অফিসারটি বলল, "আচ্ছা, তাহলে আমরা কি কবব? এখানেই রাত কাটাব, না কি আমাদের নিজেদের ঘোড়ায় চড়ব?"

সহকর্মী জানাল সে এখানে থাকার পক্ষে।

চা ঢালতে ঢালতে অফিসারটি একহাতওয়ালা অফিসারকে উদ্দেশ করে বলল,"একবার ভাবুন তো ক্যাপ্টেন, যখন শুনলাম যে সেবাস্তোপল-এ ঘোড়া খুব দুর্মূল্য তখন সিম্‌ফেরোপোল-এ আমরা ক'জন মিলে একটা ঘোড়া কিনে ফেলেছি।"

"তারা নিশ্চয় খুব বেশি দাম আদায় করে নিয়েছে।"

"তা ঠিক বলতে পারি না ক্যাপ্টেন। ঘোড়া ও গাড়ির দরুন দিয়েছি নব্বই রুবল। এটা কি খুব বেশি দাম হলো?" উপস্থিত সকলকে, এমন কি কোজেল্‌ৎসভকেও উদ্দেশ করে সে শেষের প্রশ্নটা করল।

"ঘোড়াটার বয়স অল্প হলেও দামটা বেশি হয়নি", কোজেল্‌ৎসভ বলল।

"সত্যি? অথচ আমাদের বলা হয়েছে যে দামটা খুব বেশি হয়েছে।...ঘোটকিটা একটু খোঁড়া তা ঠিক, তবে ওরা বলেছে যে কাজ চলে যাবে। অন্য সব দিক থেকেই ঠিক আছে।"

"আপনারা কোন্ কোর থেকে এসেছেন?" কোজেল্‌ৎসভ জিজ্ঞাসা করল; সে ভাইয়ের খবর জানতে চায়।

বাচাল তরুণ অফিসারটি বলল, "আমরা তো সদ্য সদ্য আসছি নোবলম্যান রেজিমেন্ট থেকে; দলে আমরা ছ'জন, সকলেই স্বেচ্ছাসৈনিক। আমাদের কামানগুলো যে কোথায় আছে সেটাই শুধু জানি না। কেউ বলে সেবাস্তোপল-এ, আবার কেউ বলছে ওডেসাতে।"

"সিম্‌ফেরোপোল-এ জানতে পারেননি?" কোজেল্‌ৎসভ শুধালো।

"কেউ জানে না।...ভাবুন ব্যাপারটা। আমাদের একজন কমরেড সেখানে জনৈক অফিসারের সঙ্গে দেখা করেছিল; ওরা তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে।...বুঝতেই পারেন ব্যাপারটা কতটা অপ্রীতিকর...একটা সিগারেট নেবেন কি?" এক-হাতি অফিসারটি তার সিগারেট-কেসের জন্য হাত বাড়ালে সে তাকে জিজ্ঞাসা করল।

সে যেন অফিসারটির মন জুগিয়ে চলতেই চায়।

কোজেল্‌ৎসভ-এর দিকে ফিরে সদয় শ্রদ্ধার হাসি হেসে সে বলল, "তাহলে আপনিও সেবাস্তোপল থেকেই আসছেন? আশ্চর্য! পিতার্সবুর্গে আমরা যে আপনাদের জন্য, আমাদের সব মহাবীরদের জন্য কত ভাবি তা যদি জানতেন!"

"আপনাদের হয়তো ফিরে যেতেই হবে", লেফ্‌টেন্যান্ট বলল।

"ঠিক সেই ভয়টাই আমরা করেছি। কল্পনা করুন! ঘোড়া ও অন্যান্য টুকিটাকির জন্য—যেমন স্পিরিট ল্যাম্প, কফির পাত্র, ও অন্যান্য দরকারী জিনিসের জন্য আমরা এত বেশি খরচ করে বসেছি যে আমাদের টাকায় টান পড়ে গেছে", সহকর্মীর দিকে চোখ রেখে নিচু গলায় সে বলল। "এখন যদি ফিরে যেতে হয় তাহলে কী যে করব জানি না!"

ফিস্‌ফিস্‌ করে জবাব এল, "না। তারা কথা দিয়েছে এখানে এলে কিছু দেবে।"

"কোন সার্টিফিকেট আছে?"

"আমি জানি সার্টিফিকেটটাই আসল জিনিস, কিন্তু মস্কোর একজন সেনেটর—আমার কাকা—বলেছেন যে এখানেই আমি টাকাটা পেয়ে যাব; নইলে তিনিই আমাকে কিছু টাকা-পয়সা দিতেন। আপনি কি মনে করেন, সার্টিফিকেট ছাড়াই টাকা-পয়সা পাব?"

"নিশ্চয় পাবেন।"

"আমারও মনে হয় সার্টিফিকেট ছাড়াই টাকাটা হয়তো পেয়ে যাব," তরুণ অফিসারটি এমন সুরে কথাগুলি বলল যাতে মনে হলো, আরও ত্রিশটি ঘাঁটিতে এই একই প্রশ্ন করে সে এত ভিন্ন ভিন্ন জবাব পেয়েছে যে এখন আর কারও কথায়ই তার বিশ্বাস হচ্ছে না।

৫

"টাকা দিতে তারা বাধ্য,"—যে অফিসারটি স্টেশনের ফটকে স্টেশন-মাস্টারের

সঙ্গে ঝগড়া করেছিল সেই এগিয়ে এসে হঠাৎ কথাটা বলল। তারপর স্টাফ অফিসারদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আরে, এই সব ভদ্রলোকদের মতো আমিও তো স্বেচ্ছাসৈনিক দলে যোগ দিয়েছি; এমন কি একটা ভাল চাকরি ছেড়ে দিয়ে সোজা চলে এসেছি সেবাস্তোপল-এ। আর তাতে পেয়েছি কি? পি, থেকে আসার রাহা-খরচ বাবদ সাকুল্যে একশ' ছত্রিশ রৌপ্য রুবল, আর এর মধ্যেই নিজের গাঁট থেকে খরচ করেছি দেড়শ' রুবলের বেশি। ভাবুন ব্যাপারটা! আটশ' ভার্স্ট পথ পাড়ি দিতে আমার সময় লেগেছে দু'মাসের বেশি। এই ভদ্রলোকদের সঙ্গেই তো আছি এক মাসের উপর। নিজের সঙ্গে কিছু টাকা ছিল তাই রক্ষে। কিন্তু না থাকলে কি হতো?"

"দু' মাসের উপর, অ্যাঁ?" একজন বলল।

"কি আর করা যাবে? যাবার ইচ্ছা না থাকলে তো ভাল চাকরিটাই ছাড়তাম না। আর ভয়ে পথেও কোথাও অযথা দেরি করিনি।...তাড়াতাড়ি পথ চলাই অসম্ভব। ধরুন না, পেরেস্কোপ-এই আটকে ছিলাম দু' সপ্তাহ; স্টেশনমাস্টার তো একথাও বলেছে—'যখন ইচ্ছা চলে যাবেন; দেখছেন তো, কত বার্তাবাহক এখনও অপেক্ষমানদের তালিকায় রয়েছে'। আমারই কপাল আর কি।...আমি তো এগিয়ে যেতেই চাইছিলাম, কিন্তু কপাল মন্দ। গোলাবর্ষণকে আমি ভয় করি না, তাড়াতাড়ি যাওয়ায় অথবা ধীরেসুস্থে যাওয়ায় তো তাতে কোনও হের-ফের হবে না।...তাই আমি চেয়েছিলাম...।"

অফিসারটি বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করতে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়ল, আর এত আন্তরিকভাবে নিজের দোষ ঢাকতে চেষ্টা করতে লাগল যে স্বভাবতই যে কেউ মনে করতে পারে, সে বেশ একটু ভয়ই পেয়েছে। সে ধারণাটাই আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল যখন সে তার রেজিমেন্ট সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে চাইল যে সে জায়গাটা বিপজ্জনক কি না। এক-হাতি অফিসারটি যখন জানল যে সে নিজেই ওই রেজিমেন্টের লোক, আর গত দু'দিনে কম করেও সতেরো জন অফিসার সেখানে মারা গেছে, তখন অফিসারটির মুখ কালো হয়ে উঠল, তার গলা বসে গেল।

সেই বিশেষ মুহূর্তটিতে অফিসারটি যেন ভয়ানক ভীরু বনে গেল, যদিও ছ' মাস আগেও সে এ রকমটা ছিল না। এ ধরনের পরিবর্তন তার আগে ও পরে আরও অনেকেরই হয়েছে। সে আমাদের গুবার্নিয়াতেই বাস করত; সেখানে একটি সমর-শিক্ষার্থী শিবির আছে; সে বেশ আরামদায়ক ভাল একটা চাকরিও করত; কিন্তু সংবাদপত্র ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে তার প্রাক্তন সহকর্মী সেবাস্তোপল-এর বীর যোদ্ধাদের কার্যকলাপের বিবরণ পড়ে হঠাৎ তার মনে উচ্চকাংখা ও দেশপ্রেমের আগুন জ্বলে উঠল।

এই মনোভাবের জন্য তাকে অনেক কিছু ত্যাগ করতে হলো; আরামদায়ক চাকরি, আট বছরের চেষ্টায় পাওয়া সুসজ্জিত একটি বাসা, বন্ধুবান্ধব এবং একটি সঙ্গতিপন্ন মহিলাকে বিয়ের আশা। সে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে গত ফেব্রুয়ারি মাসে

স্বেচ্ছাসৈনিক দলে নাম লিখিয়ে ফেলল—চোখের সামনে তখন মৃত্যুহীন গৌরবে আর জেনারেলের তারকা খচিত স্কন্ধত্রাণের স্বপ্ন। আবেদন-পত্র পাঠাবার দু' মাস পরে হেড কোয়ার্টার থেকে একটা চিঠি লিখে জানতে চাওয়া হলো, সবকারের কাছ থেকে কোনও রকম ভাতার দরকার তার আছে কি না। দরকার নেই বলে জানিয়ে দিয়ে সে ধৈর্য ধরে নিয়োগ-পত্রের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল, যদিও এই দু' মাসেই তার দেশপ্রেমের উৎসাহে বেশ একটু ভাঁটা পড়ে এসেছে। আরও দু'মাস পরে আরও কিছু এটা-ওটা খবরাখবর পড়ে শেষ পর্যন্ত পঞ্চম মাসে তার নিয়োগ-পত্র এল। ইতিমধ্যে বন্ধুবান্ধবরা তাকে বুঝিয়েছে যে সেনাদলে যোগ দিয়ে সে মহামূর্খের মতো কাজ করেছে! আর পাঁচ নম্বর ঘাঁটিতে যখন একা একা বুকজ্বালায় ভুগল, এবং সেখানেই সেবাস্তোপল থেকে আগত জনৈক বার্তাবাহকের মুখে যুদ্ধের নানারকম ভয়াবহতার কথা শুনল, তখন একটা ঘোড়া বদলাবার জন্য বারো ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হওয়ায় এই বোকামির জন্য তার খুবই অনুতাপ হতে লাগল; ভবিষ্যতে কপালে আরও কত দুঃখ আছে সে-কথা ভাবতে ভাবতে সে আবার যখন পথে নামল তখন তার মুখের চেহারা অনেকটা কসাইখানায় নিয়ে-যাওয়া পশুর মতোই দেখতে হলো। তারপর তিন মাস ধরে এক ঘাঁটি থেকে আর এক ঘাঁটিতে থেমে থেমে চলতে চলতে এবং সেই সব ঘাঁটিতে সেবাস্তোপল-প্রত্যাগত অফিসারদের মুখে লোমহর্ষক কাহিনী শুনতে শুনতে তার এই মানসিক অবস্থা ক্রমেই আরও শোচনীয় হতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত পি-তে থাকার সময় নিজেকে সে যে রকম একজন বেপরোয়া বীর বলে কল্পনা করেছিল তার বদলে দুভান্‌কয়-তে পৌঁছে এখন সে হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি শোচনীয় ভীরু মানুষ; আর গত একমাস যাবৎ শিক্ষা-শিবির থেকে সদ্য-আসা এই তরুণ অফিসারদের দলে ভিড়ে সে অনবরত চেষ্টা করছে যাত্রাটাকে যথাসম্ভব বিলম্বিত করতে; এই দিনগুলিকেই জীবনের শেষের দিন ভেবে নিয়ে প্রতিটি ঘাঁটিতে সে বিছানা পেতে বসছে, জিনিসপত্র খুলে ফেলছে, প্রেফারেন্স খেলছে, নালিশের বই পড়ে সময় কাটাচ্ছে, আর যখনই ঘোড়া পাওয়া যাচ্ছে না তখনই খুশি হয়ে উঠছে।

সে যদি পি. থেকে সোজা যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যেত তাহলে সত্যিসত্যিই সে একজন বীর হয়ে উঠতে পারত; কিন্তু একজন রুশ অফিসারের পক্ষে শ্রমে ও বিপদে যে রকম স্থির-মস্তিষ্ক ও ধৈর্যশীল হওয়া দরকার সেটা হয়ে উঠবার আগেই অনেক মানসিক যন্ত্রণা তাকে ভুগতে হয়েছে। তাই সেই উদ্দীপনাকে তার মধ্যে নতুন করে জাগিয়ে তোলা এখন বেশ কঠিন ব্যাপার।

৬

"কে 'বরশ্‌' চাইছিলেন?" বাঁধাকপির গরম ঝোলের গামলাটা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে সরাইখানার মালকিন জিজ্ঞাসা করল; স্ত্রীলোকটি নোংরা, বয়স চল্লিশের মতো।

সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা থেমে গেল; ঘরের সকলেই স্ত্রীলোকটির দিকে চোখ ফেরাল। পি. থেকে আগত অফিসারটি তরুণ অফিসারটির দিকে চোখ চেয়ে স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়ে দিলো।

তরুণ অফিসারটি বলল, "ওহো, সে তো কোজেল্‌ৎসভ। তাকে বরং জাগিয়ে তোলা যাক।' উঠে পড়ো—ডিনার তৈরি" সোফার কাছে গিয়ে সে ঘুমন্ত লোকটির কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলো।

বছর সতেরোর একটি ছেলে চটপট লাফিয়ে উঠল; তার কালো চোখ দুটি বড় মিষ্টি, গাল দুটি গোলাপী। চোখ ঘসতে ঘসতে সে ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল।

"ওঃ, দুঃখিত!" উঠতে গিয়ে একজন ডাক্তারের গায়ে ধাক্কা লাগায় সে মিষ্টি গলায় বলল।

লেফ্‌টেন্যান্ট কোজেল্‌ৎসভ সঙ্গে সঙ্গে ভাইকে চিনতে পেরে তার দিকে এগিয়ে গেল।

"আমাকে চিনতে পারছ না?" সে হেসে বলল।

"ও-ও-হো! কী আশ্চর্য ব্যাপার!" বড় ভাইকে আলিঙ্গন করতে ছুটে গিয়ে ছোট ভাইটি চিৎকার করে বলে উঠল।

তিনবার পরস্পরকে চুমো খেলো, কিন্তু তৃতীয় চুমোর সময় দু'জনই থেমে গেল; একই চিন্তা জাগল দু'জনেরই মনে : তিনবার কেন?

ছোট ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বড় ভাই বলল, "কী যে খুশি হয়েছি! চলো, ফটকের দিকে যাই।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ. তাই চলো।..আমার 'বর্‌শ্‌' চাই না।...এ ফেদার্সন, তুমি ওটা খেয়ে নাও," সে সহকর্মীটিকে বলল।

"কিন্তু তুমি তো ক্ষুধার্ত।"

"না। আমার কিচ্ছু চাই না।"

বাইরে গিয়ে ছোট ভাই জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কেমন আছো? কাজকর্ম কেমন চলছে? সব কথা আমাকে বলো।" কিন্তু নিজের কথা সে কিছুই বলল না।

পাঁচ মিনিট পরে দু'জনের কথাবার্তা একটু থামলে বড় ভাই জানতে চাইল, ছোট ভাইটি রক্ষী-বাহিনীতে যোগ দেয়নি কেন, "আত্মীয়স্বজনরা" তো তার কাছে সেটাই আশা করেছিল।

সে কথা মনে হতেই ছোট ভাই সলজ্জভাবে জবাব দিলো, "ওঃ, হ্যাঁ! ব্যাপারটা নিয়ে খুব গোলমালে পড়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু ব্যাপারটা যে এ রকম দাঁড়িয়ে যাবে আমি তা ভাবতেই পারিনি। ভেবে দেখো! পরীক্ষার ঠিক আগে আমরা তিনজন ধূমপান করতে বেরিয়ে গেলাম—তুমি তো জানো, দরোয়ানের খুপড়িটার পিছনকার সেই ছোট ঘরটাতে। তোমাদের সময়ে তোমরাও নিশ্চয় তাই করতে। তারপর, সেই

জানোয়ার দরোয়ানটা আমাদের দেখতে পেয়ে ছুটে গেল কর্তব্যরত অফিসারকে খবর দিতে (লোকটাকে আমরা অনেকবার বকশিসও দিয়েছি) আর সঙ্গে সঙ্গে অফিসার এলো আমাদের ধরতে। তাকে দেখেই অন্য দু'জন সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পাশের দরজা দিয়ে কেটে পড়ল; কিন্তু আমার দেরি হয়ে গেল। সে আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করল, আমিও তাকে একটু চাটনি বানালাম, সে গিয়ে ইন্সপেক্টরের কাছে নালিশ করল, আর সেখান থেকেই গোলমালের সূত্রপাত হলো। ফলে সদাচরণের দরুণ পুরো নম্বর আমি পেলাম না—যদিও আর সব বিষয়ে পেলাম পুরো নম্বর একমাত্র বলবিজ্ঞান ছাড়া; তাতে পেলাম ১২। আর তার ফলে আমাকে দেওয়া হলো পদাতিক বাহিনীর কমিশন; অবশ্য ওরা আমাকে কথা দিয়েছিল পরে রক্ষীবাহিনীতে বদলি ক'রে দেবে। কিন্তু আমার অভক্তি ধরে গেল; আর তাই যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাবার জন্য আবেদন করলাম।"

"তাহলে এই ব্যাপার!"

"সত্যি বলছি, ঠাট্টার কথা নয়, সব কিছুই এত খারাপ লাগতে লাগল যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেবাস্তোপল-এ আসবার জন্য উঠে-পড়ে লাগলাম। আসলে ভাগ্য প্রসন্ন হলে রক্ষী-বাহিনী অপেক্ষা এখানেই হয়তো আমার বেশি লাভ হবে। কর্নেল হবার জন্য আমাকে দশ বছর অপেক্ষা করতে হতো, আর এখানে তোৎল্‌বেন্‌ দু' বছরের মধ্যে লেফ্‌টেন্যান্ট-কর্নেল থেকে একলাফে জেনারেল হয়ে গেছে। অবশ্য যদি মারা যাই—তাহলে আর কি করা যাবে।"

বড় ভাই হেসে বলল, "আচ্ছা, তাহলে এই তোমার মনের কথা!"

যেন লজ্জা পাবার মতো কিছু বলতে যাচ্ছে এমনি ভাব দেখিয়ে সলজ্জ হাসির সঙ্গে ভাইটি বলল, "কি জানো দাদা, এ সব তুচ্ছ কথা। যুদ্ধক্ষেত্রে চলে আসবার জন্য যে আবেদন করেছিলাম তার প্রধান কারণ—মানুষ যখন আমাদের দেশের জন্য এখানে প্রাণ দিচ্ছে তখন পিতার্সবুর্গে বসে থাকতে আমার কেমন যেন লজ্জা করছিল। আর তাছাড়া, আমি চেয়েছিলাম তোমার কাছে চলে আসতে," আরও লাজুকভাবে সে শেষের কথাটা বলল।

ভাইয়ের চোখের দিকে না তাকিয়ে সিগারেট-কেসটার দিকে হাত বাড়িয়ে বড় ভাই বলল, "তুমি বড় মজার ছেলে! কিন্তু দুঃখের কথা কি জানো, আমরা একসঙ্গে থাকতে পারছি না।"

কিন্তু একটা কথা বলো তো, দুর্গে থাকাটা কি খুবই ভয়ংকর?" ছোট ভাই হঠাৎই প্রশ্নটা করে বসল।

"প্রথমটা ভয়েরই বটে, তবে একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে তখন আর ততটা খারাপ লাগে না। নিজেই দেখতে পাবে।"

"আর একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই : তুমি কি মনে করো তারা সেবাস্তোপল দখল করতে পারবে? আমি তো মনে করি, কোনওদিন পারবে না।"

"ঈশ্বর জানেন।"

"একটা জিনিস আমার খুব খারাপ লেগেছে। এখানে আসবার পথে আমাদের কপাল বড় খারাপ গেছে—আমাদের একটা থলে চুরি গেছে, তার মধ্যেই আমার শাকো-টা (সামরিক টুপি) ছিল। আমি তো মহাবিপদে পড়েছি—কম্যান্ডারের সামনে হাজির হবো কেমন করে। এখন আমাদের একটা নতুন ধরনের শাকো দেওয়া হয়—আরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে—ভালই হয়েছে। সব তোমাকে বলব।...সারা মস্কো ঘুরেছি..."

ছোট কোজেল্‌ৎসভ—ভ্লাদিমির—আর তার বড় ভাই মিখাইল-এর মধ্যে অনেক মিল আছে; কিন্তু সেটা ফুটন্ত গোলাপ-কুঁড়ির সঙ্গে শুকিয়ে-যাওয়া বন-গোলাপের মিল। তার সুন্দর ঘন চুল কপালের কাছে কোঁকড়ানো। সাদা গলার কাছে এক গুচ্ছ হাল্কা চুল—ধাইরা বলে সৌভাগ্যের লক্ষণ। সুন্দর তাজা গালে মাঝে মাঝেই রক্তের ছোঁয়া লাগে—তাতে মনের সব ভাবই প্রকাশ হয়ে পড়ে। চোখ দুটি বড় ভাইয়ের মতোই, শুধু আরও খোলা ও ঝকঝকে; তাছাড়া মাঝে মাঝেই কেমন যেন ভিজে উঠে চক্‌চক্ করতে থাকে। গালে ও রক্তিম ঠোঁটের উপরে কিছু নরম দাড়ি-গোঁফ গজিয়েছে। মাঝে মাঝেই সলজ্জ হাসির ফলে ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো চোখে পড়ে। ফটকের রেলিং-এ ভর দিয়ে বড় ভাই দাঁড়িয়ে আছে; একহারা চেহারা, চওড়া কাঁধ, কোটের বোতাম খোলা, খাড়া কলারের লাল শার্টটা দেখা যাচ্ছে, আঙুলের ফাঁকে একটা সিগারেট; তার সামনে দাঁড়ানো ভাইটিকে এমন সুদর্শন একটি বালকের মতো দেখাচ্ছে যে চোখ ফেরানো যায় না। বড় ভাইকে দেখে সে অত্যন্ত খুশি হয়েছে; সগর্বে ও সবিস্ময়ে তাকে দেখছে; তার চোখে সে যে এক নায়ক; কিন্তু জাগতিক শিক্ষার ব্যাপারে, যেমন ফরাসীতে কথা বলা, ভাল সমাজে চলাফেরা করা, নাচে যোগ দেওয়া, এ সব ব্যাপারে তার অনেক ত্রুটি আছে; সেজন্য সে একটু লজ্জিতও বোধ করে, সম্ভব হলে এ সব ব্যাপার কিছু হাতে-কলমে শিখিয়ে দিতেও ইচ্ছা করে। পিতার্সবুর্গের স্মৃতি এখনও তার মনকে ভরে রেখেছে : যে মহিলাটি সুদর্শন যুবকদের বড় ভালবাসে এবং ছুটির দিনে তাকে বাড়িতে আমন্ত্রণ করেছে তার বাড়ির স্মৃতি, আর মস্কোর সেই সেনেটর যার বাড়িতে একটা বড় নাচে সে একবার নেচেছিল সেই বাড়িটার স্মৃতি।

৭

দু'জনের সব কথা প্রায় বলা হয়ে গেল; শেষ পর্যন্ত এমন একটা অবস্থায় তারা পৌঁছে গেল যখন মনে হতে পারে যে পরস্পরকে যথেষ্ট ভালবাসা সত্ত্বেও দু'জনের মধ্যে মিল খুবই সামান্য; তখন দুই ভাইই চুপ করে গেল; অনেকক্ষণ চুপচাপ।

বড় ভাই বলল, "আচ্ছা, জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও, আমরা এখনই চলে যাবো।"

ছোট ভাইয়ের মুখটা হঠাৎ রাঙা হয়ে উঠল; সে ইতস্তত করতে লাগল। এক মুহূর্ত থেমে জিজ্ঞাসা করল, "সে কি, সোজা সেবাস্তোপল-এ?"

"নিশ্চয়। তোমার মালপত্র তো বেশি নয়; আমরা নিজেরাই নিয়ে যেতে পারব।"

"খুব ভাল! চলো, এখনই যাওয়া যাক," একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কথাটা বলে ছোট ভাই ঘরের ভিতরে চলে গেল।

কিন্তু সে বারান্দাতেই থেমে গেল; দরজা না খুলে মাথাটা নুইয়ে ভাবতে লাগল :

"চলেছি সোজা সেবাস্তোপল। একেবারে নরকের মধ্যে। কী ভয়ংকর। আচ্ছা ঠিক আছে, সবই সমান। একদিন তো সেখানে যেতে হবেই। এখন অন্তত দাদার সঙ্গে..."

একবার গাড়িতে চাপলে সেবাস্তোপল-এর আগে আর নামা চলবে না, কোনও দুর্ঘটনাই আর এটাকে আটকাতে পারবে না—এই চিন্তাটা মাথায় আসতেই এই প্রথম আসন্ন বিপদের ছবিটা তার চোখে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল; বিপদকে এত কাছাকাছি দেখে সে ভয়ে কেঁপে উঠল। যথাসাধ্য নিজেকে শান্ত করে সে ঘরে ঢুকল, কিন্তু পনেরো মিনিট পার হবার পরেও সে বড় ভাইয়ের কাছে হাজির হলো না দেখে সে নিজেই তাকে ডাকতে গেল। অপরাধী স্কুলের ছাত্রের মতো ছোট কোজেল্‌ৎসভ পি. থেকে আগত অফিসারের সঙ্গে কি নিয়ে যেন কথা বলছিল। বড় ভাই দরজাটা খুলতেই সে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

হাত নেড়ে বলে উঠল, "এক মুহূর্তের মধ্যেই আসছি! দয়া করে বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো।"

একটু পরেই সে বেরিয়ে এল; দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বড় ভাইয়ের দিকে এগিয়ে গেল।

বলল, "কি জানো, তোমার সঙ্গে এখন আমি যেতে পারছি না।"

"কেন? কি বাজে কথা বলছ?"

"তোমাকে সত্য কথাই বলছি মিশা। আমাদের কারো কাছে টাকা নেই। পি. থেকে আগত লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেনের কাছে আমাদের সকলেরই অনেক ধার-দেনা হয়েছে। অতি জঘন্য অবস্থা!"

বড় ভাই ভুরু কুঁচকে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

ভাইয়ের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বলল, "তোমার কি আরো অনেক বেশি ধার হয়েছে?"

"তা বেশ কিছু।...না, খুব বেশি নয়। আমার এত লজ্জা করছে। তিনটি ঘাঁটিতে আমাদের সব খরচ সে দিয়েছে, আর সারা পথ আমরা তার চিনিটাই খেয়েছি।...কাজেই আমি ঠিক বলতে পারছি না...আর, প্রেফারেন্সও খেলেছি. .কাজেই তার কাছে বেশ মোটা রকম ধারই হয়েছে।"

"খুব খারাপ কাজ করেছ ভলোদিয়া! তার সঙ্গে যদি দেখা না হতো, তাহলে কি করতে?" ভাইয়ের উপর থেকে চোখ ফিরিয়ে সে গম্ভীর গলায় বলল।

"দেখো, ভেবেছিলাম সেবাস্তোপল পৌঁছে রাহা-খরচটা পেয়ে যাব, আর তাই থেকে তার ধার শোধ করতে পারব। তা তো পারতামই, কেমন কি না? কাজেই আগামীকাল তার সঙ্গে যাওয়াই আমার পক্ষে ভাল।"

বড় ভাই থলেটা বের করে ঈষৎ কাঁপা আঙুলে দুটো দশ-রুবলের নোট ও একটা তিন-রুবলের নোট টেনে বের করল।

বলল, "এই টাকাই আমার কাছে আছে। তোমার কত ধার হয়েছে?"

কোজেল্‌ৎসভ সঠিক কথা বলেনি; জরুরী অবস্থার জন্য কোটের আস্তিনের মধ্যে চারটি স্বর্ণ মুদ্রা সে সেলাই করে রেখে দিয়েছে; প্রতিজ্ঞা করেছে, সেগুলিতে হাত দেবে না।

প্রেফারেন্স খেলার দরুন ও চিনির দরুন পাওনা হিসাব করে ক্রমে বোঝা গেল যে ছোট কোজেল্‌ৎসভ-এর কাছে পি. থেকে আগত অফিসারের মোট পাওনা হয়েছে মাত্র আট রুবল। বড় ভাই তাকে টাকাটা দিয়ে বলল, "পকেটে টাকা না থাকলেও প্রেফারেন্স খেলা কোনও কাজের কথা নয়।"

"কত বাজি ধরে তোমরা খেলো?"

ছোট ভাই কোনও জবাব দিলো না। বড় ভাইয়ের এই প্রশ্নটাই যেন তার সততার প্রতি বক্রোক্তি। সে নিজের উপর বিরক্ত হলো; যে ভাইকে সে এত ভালবাসে তার মনে অবিশ্বাস সৃষ্টি করার জন্য সে লজ্জিত হলো; সমস্ত ব্যাপারটা তার স্পর্শকাতর মনের উপর এমন একটা ব্যথার প্রলেপ ছড়িয়ে দিলো যে তার মনে হলো, বুকের উদগত কান্নাকে সে আর চেপে রাখতে পারবে না; তাই সে চুপ করে রইল। হাতের দিকে না তাকিয়েই সে টাকাটা নিয়ে সহকর্মীদের কাছে ফিরে গেল।

৮

দুভানকয়-তে পৌঁছে সেতুর উপরে জনৈক, সৈনিকের কাছ থেকে কেনা দু'পাত্র ভদ্‌কা টেনে তাজা হয়ে নিকোলায়েভ লাগামে টান দিলো, আর ছোট গাড়িটা মাঝে মাঝে ছায়ায় ঢাকা পাথুরে রাস্তায় ঠোক্কর খেতে খেতে বেল্‌বেক-এর পাশ দিয়ে ঘুরে সেবাস্তোপল-এর দিকে এগিয়ে চলল; আর দুই ভাই পরস্পরের হাঁটুতে ঠোকাঠুকি করতে করতে একদম চুপচাপ বসে রইল; যদিও মনে মনে মুহূর্তের জন্যও একে অন্যের কথা ভাবা বন্ধ করল না।

ছোট ভাবতে লাগল : "কেন সে আমাকে অপমান করল? সে কি এসব কথা না বলে পারত না? মনে হলো, সে যেন আমাকে চোর ভেবেছে, আর এখনও আমার উপর রেগে আছে। আমার তো আশংকা হচ্ছে, চিরদিনের মতো আমাদের ছাড়াছাড়ি

হয়ে যাবে। অথচ দু'জন একসঙ্গে সেবাস্তোপল-এ থাকতে পারলে কী ভালই না হতো। দুই ভাই, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, দু'জনই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করছে : একজনের বেশ বয়স হয়েছে, লেখাপড়া হয়তো কম জানে, কিন্তু খুব সাহসী সৈনিক, আর অপরজন—যুবক, সেও লোক ভাল...। সপ্তাহকালের মধ্যেই দেখিয়ে দিতাম যে আমি তত ছোট নই! আর আমি লজ্জা পাব না : মুখে ফুটে উঠবে সাহস, খুব বড় না হলেও বেশ মাপসই গোঁফ গজাবে। হয়তো আজ সন্ধ্যায়ই আমরা পৌঁছে যাব, আর সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ব। সে খুব দৃঢ়চিত্ত, খুব সাহসী—কথা কম বলে, কিন্তু কাজে পোক্ত।" সে আরও ভাবতে লাগল, "আমার জানতে ইচ্ছা করছে, সে কি ইচ্ছা করেই আমাকে গাড়ির একেবারে একপাশে ঠেলে দিচ্ছে? সে নিশ্চয় বুঝতে পারছে যে আমার খুব অসুবিধা হচ্ছে, তবু সে দিকে নজর না দেবার ভান করছে। যাই হোক, এই ভাবেই সন্ধ্যায় আমরা পৌঁছে যাব এবং সোজা দুর্গে চলে যাব। আমি হাতে নেব বন্দুক, আর দাদার সঙ্গে থাকবে তার সেনাদল; এক সঙ্গে শুরু হবে আমাদের যাত্রা। তারপরই ফরাসীরা অকস্মাৎ আমাদের আক্রমণ করে বসবে। আগুনের শিখার মতো গুলির পর গুলি ছুঁড়ে আমি অনেক শত্রু মারব; কিন্তু তারাও আমার দিকে তেড়ে আসবে। আমি আর গুলি চালাতে পারব না—তখন আমার দফা রফা হবার উপক্রম—কিন্তু সহসা তখন দাদা ছুটে আসবে তলোয়ার হাতে নিয়ে, আমি হাতে নেব একটা গাদা বন্দুক, আর সসৈন্যে দু'জন এগিয়ে যাব। তখন ফরাসীরা ঝাঁপিয়ে পড়বে দাদার উপর। আমি ছুটে গিয়ে একজন ফরাসীকে শেষ করব, তারপর আর একজনকে; দাদাকে রক্ষা করব। আমার হাতটা জখম হবে, তবু অন্য হাতে বন্দুকটা চেপে ধরে ছুটতে থাকব। ঠিক তখনই আমার পাশে দাঁড়ানো দাদার বুকে একটা গুলি এসে বিঁধবে,'সে মারা যাবে। এক মুহূর্তের জন্য থেমে বিষণ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আমি হুংকার দিয়ে উঠব, 'আমার সঙ্গে এস তোমরা, ওর হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে! জগতে সব চাইতে বেশি ভালবাসতাম যে দাদাকে তাকে আজ হারালাম। তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবে; শত্রুকে আমরা ধ্বংস করব, না হয় মরব।' সকলে এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠে আমাকে অনুসরণ করবে। এবার গোটা ফরাসী বাহিনী বেরিয়ে আসবে; আসবে স্বয়ং পেলিসিয়ের। আমরা তাদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেব, তারপর আবার আঘাত হানব, তৃতীয়বার, আর তখনই মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পড়ে যাব। সকলে ছুটে আসবে, গর্চাকভ এসে জানতে চাইবে, আমি কিছু চাই কি না। আমি বলব, আর কিছুই আমি চাই না, শুধু চাই আমার দাদার পাশে শুয়ে থাকতে—তার পাশেই আমি মরতে চাই। তখন আমাকে ধরে নিয়ে আমার দাদার রক্তাক্ত শবের পাশে আমাকে শুইয়ে দেওয়া হবে। কনুইতে ভর দিয়ে উঠে আমি শুধু এই ক'টি কথাই বলব : 'হ্যাঁ, যে দুটি মানুষ তাদের দেশকে ভালবাসত তাদের তোমরা চিনতে পারোনি; এখন দু'জনেরই মৃত্যু হলো!...ঈশ্বর তোমাদের ক্ষমা করুন!' সেই কথা বলেই আমিও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ব।"

এ-স্বপ্নের কতটা সত্য হবে কে জানে?

সে যে বড় ভাইয়ের সঙ্গে আর একটা কথাও বলতে চায়নি সে কথা ভুলে গিয়ে হঠাৎ তাকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি কখনও হাতাহাতি লড়াই করেছ?"

"না, একবারও না", বড় ভাই জবাব দিলো। আমাদের রেজিমেন্টের ২,০০০ লোক মারা গেছে; সকলেই দুর্গ তৈরির কাজে ব্যস্ত ছিল। তুমি যে রকম ভাবছ ঠিক সেভাবে যুদ্ধ হয় না ভলোদিয়া!"

"ভলোদিয়া" কথাটা যুবকের মনে লাগল।

একটু থেমে সে বলল, "তুমি আমার উপর রাগ করোনি তো মিশা?"

"কেন রাগ করব?"

"না—তাই জিজ্ঞাসা করছি। আমাদের মধ্যে কী যে হয়ে গেল। আসলে ওটা তো কিছুই না।"

ভাইয়ের দিকে ফিরে তার পায়ে চাপড় মেরে বড় ভাই বলল, "মোটেই কিছু না।"

"তোমাকে যদি কোনও রকম কষ্ট দিয়ে থাকি তো আমাকে ক্ষমা করো মিশা", কথাটা বলেই ছোট ভাই দুই চোখে ভরে আসা অশ্রুজলকে লুকোবার জন্য মুখটা ফিরিয়ে নিলো।

৯

"সেবাস্তোপল এসে গেল বুঝি?" একটা পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে ছোট ভাই জিজ্ঞাসা করল। সামনে জাহাজের মাস্তুলে আকীর্ণ উপসাগর, দূরে সাগরের বুকে শত্রুপক্ষের নৌ-বহর, উপকূলে সাদা কামানের সারি, ব্যারাক, জলের ঘাঁটি, জাহাজ-ঘাটা ও শহরের বড় বড় বাড়িঘর; শহরের চারিদিককার হলুদ পাহাড়ের গা বেয়ে সাদা ও গোলাপী ধোঁয়া ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠছে আর সূর্যের গোলাপী আভার মধ্যে নীল আকাশের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে; সমুদ্রের অন্ধকার দিগন্তে প্রতিফলিত হয়ে সূর্য এর মধ্যেই নামতে শুরু করেছে।

যে ভয়ংকর জায়গাটা সম্পর্কে ভলোদিয়া অনেক কথা ভেবেছে এখন কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে তার বুক একটুও কাঁপল না; বরং এই সত্যিকারের মনোহর ও অসাধারণ দৃশ্যটির দিকে তাকিয়ে একটা নান্দনিক সুখ ও শৌর্যের গর্বে তার মন ভরে উঠল; সে জানে, আর আধ ঘণ্টার মধ্যে সে ওখানে পৌঁছে যাবে। গভীর মনোযোগের সঙ্গে এই সব দেখতে দেখতে এক সময়ে তারা সেভেরনায়াতে পৌঁছে গেল; বড় ভাইয়ের রেজিমেন্টের মালপত্রের ট্রেনটাও সেখানেই ছিল; এখানে তাদের রেজিমেন্টের ও কামানশ্রেণীর খোঁজ-খবর নিতে হবে।

বিবাহিত নাগরিকদের পরিবারের জন্য তৈরি যে এক সার কুটিরকে "নতুন

শহর" বলা হয় তার কাছেই মালগাড়ির ভারপ্রাপ্ত অফিসারের বাসাবাড়ি। ওক গাছের কাঁচা ডাল কেটে তৈরি একটা মোটামুটি বড় বাড়ির সংলগ্ন তাঁবুতে অফিসারের বাসা।

দুই ভাই এগিয়ে গেল। বড় বাড়িটাতেই অফিসারকে পাওয়া গেল। হলদেটে নোংরা শার্ট পরে একটা ভাঁজ-করা টেবিলের সামনে বসে আছে। টেবিলের উপর এক গ্লাস ঠাণ্ডা চা; তার উপর সিগারেটের ছাই ভাসছে; এক বোতল ভদ্‌কা, শুকনো "ক্যাভিয়ার" ও রুটির টুকরো। একটা বড় গণনা-ফলকের সাহায্যে লোকটি একগাদা নোট গুণছে বসে বসে। অফিসারটির ব্যক্তিত্ব ও কথা বলার ধরণ নিয়ে আলোচনা করবার আগে আমাদের আরও ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে হবে বাড়ির ভিতরটা এবং তা থেকেই জেনে নিতে হবে তার জীবনযাত্রা ও কাজকর্মের কিছু তথ্য। নতুন বাড়িটা বেশ বড় মাপের ও শক্ত করে গড়া; এমন সব ছোট টেবিল ও বেঞ্চি দিয়ে সাজানো যা একমাত্র জেনারেল ও রেজিমেন্ট-কম্যান্ডারদের জন্যই তৈরি করা হয়ে থাকে। গাছের পাতা যাতে উড়ে এসে নিচে না পড়ে সেজন্য দেয়ালে ও সিলিং-এ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে তিনটে অত্যন্ত কুৎসিত কিন্তু নতুন দ্বিগুণ ব্যয়বহুল কার্পেট। সবচাইতে বড় কার্পেটটায় একটি আমাজন-মূর্তি আঁকা; তার ঠিক নিচে লোহার খাটিয়ার উপরে রয়েছে একটা উজ্জ্বল লাল রঙের কম্বল, নোংরা ছেঁড়া একটা চামড়ার বালিশ, আর একটা ভালুকের লোমের কোট; টেবিলের উপর রয়েছে রূপোর ফ্রেমে বাঁধানো একটা আয়না, অত্যন্ত নোংরা রূপোর বুরুশ, একটা দাঁত-ভাঙা শিংয়ের চিরুনি, রূপোর মোমবাতি-দান, লাল-সোনালী লেবেল-আঁটা এক বোতল মদ, প্রথম পিটার-এর প্রতিকৃতি আঁকা একটা সোনার ঘড়ি, দুটো সোনার আংটি, কয়েক রকম ক্যাপ্‌সুলসমেত একটা বাক্স, একটুকরো রুটি ও পুরনো তাস ছড়ানো; বিছানার নিচে অনেকগুলি ভরা ও খালি বোতল। অফিসারটি রেজিমেন্টের মালবাহী ট্রেন ও খাদ্য সরবরাহের ভারপ্রাপ্ত। তার সঙ্গে একজন পুরনো বন্ধুও থাকে; লোকটি কমিশনপ্রাপ্ত; যুদ্ধের সঙ্গেই যুক্ত। দুই ভাই যখন বাড়িটিতে ঢুকল কমিশনার তখন তাঁবুর মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল; মাস শেষ হয়ে আসায় অফিসারটি রেজিমেন্টের হিসাবপত্র নিয়ে ব্যস্ত ছিল। লোকটি ঢ্যাঙা, লম্বা গোঁফ, দশাসই চেহারা—সব মিলিয়ে ভারপ্রাপ্ত অফিসারটি বেশ সুদর্শন ও সৈনিকজনোচিত। একমাত্র খারাপ দেখতে তার ঘামে-ভেজা ফোলা মুখ, প্রায় ঢেকে-পড়া কুৎকুতে ধূসর চোখ, আর তেল কুচকুচে চুল থেকে লোমের চটিতে ঢাকা বড় দুটি পা পর্যন্ত অত্যন্ত নোংরা বেশবাস।

ঘরে ঢুকেই লোভ চক্‌চক্ চোখে এক গাদা নোটের দিকে তাকিয়ে বড় কোজেল্‌ৎসভ বলে উঠল, "আঃ! টাকার একেবারে পাহাড়! এর অর্ধেকও যদি আমি ধার পেতাম ভাসিলি মিখাইলিচ।"

অতিথিদের দেখেই মালগাড়ির ভারপ্রাপ্ত অফিসারটি এমনভাবে কুঁকড়ে গেল যেন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে। টাকাগুলো তুলে নিয়ে সেখানে বসেই সে অভিবাদন জানাল।

হাতের কাছের ক্যাশ-বাক্সটায় টাকাপয়সাগুলো ঢুকিয়ে দিয়ে ভলোদিয়ার দিকে সোজা তাকিয়ে সে বলল, "ওঃ, এগুলো যেন আমার টাকা,....আরে ভাই, এতো সরকারী টাকা! আর আপনার সঙ্গে এটি কে?"

"আমার ভাই—সদ্য শিক্ষার্থী-শিবির থেকে এসেছে। রেজিমেন্টটা এখন কোথায় ঘাঁটি পেতেছে জানবার জন্যই এখানে থেমেছি।"

"আপনারা বসুন মশাইরা", অফিসারটি বলল; তারপরই টেবিল থেকে উঠে পাশের তাঁবুতে চলে গেল। সেখান থেকেই বলল, "কিছু পানীয় চলবে কি? বীয়ার তো চলতে পারে?"

"ওতে কোনও ক্ষতি করবে না ভাসিলি মিখাইলিচ!"

অফিসারটির জাঁকজমক, তার বেপরোয়া ভাবভঙ্গী, আর যে ভাবে বড় ভাই তার সঙ্গে কথা বলল, তা দেখে ভলোদিয়া বেশ কিছুটা প্রভাবিত হলো।

বিনীত ভঙ্গিতে সোফায় বসে সে ভাবল, "সকলেই যখন সম্মান করে তখন লোকটি নিশ্চয় খুব ভাল অফিসার। যেমন সাহসী, তেমনই আতিথ্যপরায়ণ।"

তাঁবুর দিকে তাকিয়ে বড় ভাই জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, আমাদের রেজিমেন্ট এখন কোথায়?"

"কি?"

সে আবার প্রশ্নটা করল।

"জেইফার আজ এখানে এসেছিল; সে তো বলল, গতকাল ওটা ৫ নম্বর দুর্গে সরে গেছে।"

"আপনি ঠিক জানেন?"

"যা বলেছি ঠিকই বলেছি। কিন্তু একমাত্র শয়তান ছাড়া আর কে জানে! তার তো মিথ্যা বলতে আটকায় না। আচ্ছা, কিছু বীয়ার চলবে কি?" মালবাহী ট্রেনের অফিসার তাঁবুর ভিতর থেকেই বলল।

"হ্যাঁ, চলতে পারে," কোজেল্‌ৎসভ বলল।

"তোমার ব্যাপার কি ওসিপ ইগ্‌নাৎয়েভিচ?" এবার তাঁবুর ভিতর থেকে কথাগুলি বলা হলো ঘুমন্ত কমিশনারকে। "অনেকক্ষণ তো ঘুমিয়েছ; সাতটা বেজে গেছে!"

"আমাকে নিয়ে আবার পড়লে কেন? আমি ঘুমোইনি," একটা সরু, অলস কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"ঠিক আছে, উঠে পড়ো! তোমাকে ছাড়া ভাল লাগছে না।"

অফিসারটি অতিথিদের কাছে ফিরে এল।

হাঁক দিয়ে বলল, "খানিকটা বীয়ার নিয়ে এস। সিম্‌ফেরোপল বীয়ার!"

উদ্ধত ধরনের একটি আর্দালি ঘরে ঢুকে বিছানার তলা থেকে এক বোতল বীয়ার বের করে আনল।

গ্লাসগুলো ভরে দিয়ে অফিসারটি বলল, "আসুন ভাই। একজন নতুন রেজিমেন্ট কম্যান্ডার এসেছে। তার অনেক টাকার দরকার। সব কিছুই কিনতে চায়।"

"ওঃ, মনে হচ্ছে একটু বিশেষ ধরনের মানুষ, নব্য যুগের কেউ হবেন আর কি," সসম্মানে গ্লাসটা নিয়ে কোজেল্‌ৎসভ বলল।

"হ্যাঁ, নব্য যুগই বটে! অন্য সকলের মতোই হুলটা ঠিক আছে। সেনাদল পরিচালনার সময় পাগলের মতো চিৎকার করেছে। এখন মুখে অন্য সুর। এটা ঠিক নয় ভাই।"

"আপনার সঙ্গে আমি একমত।"

ছোটভাই এ সব কথার কিছুই বুঝতে পারল না; তবে অকপটভাবে এটুকু তার মনে হলো যে বড় ভাইটি তার মনের কথা বলছে না; অফিসারের বীয়ার খাচ্ছে বলেই সে এ রকম কথা বলছে।

বোতলটা খালি হয়ে গেল, কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ ধরে সেই একই আলোচনা চলতে লাগল; এমন সময় তাঁবুর পাল্লা খুলে একটি বেঁটে, ঝরঝরে মুখের লোক ঘরে ঢুকল। পরনে জোব্বা লাগানো গাঢ় নীল রঙের সাটিনের ড্রেসিং-গাউন, মাথায় লাল পটি আঁটা টুপি। ছোট কালো গোঁফ জোড়ায় তা দিতে দিতে কার্পেটের একটা জায়গায় চোখ রেখে ঘাড়টা ঈষৎ নেড়ে সে অফিসারের কথার জবাব দিলো।

টেবিলে বসে লোকটি বলল, "আমাকেও এক গ্লাস দাও।" আদরের সুরে ভলোদিয়াকে বলল, "তুমি কি সেন্ট পিতার্সবুর্গ থেকে আসছ যুবক?"

"হ্যাঁ স্যার, যাচ্ছি সেবাস্তোপল।"

"তুমি কি স্বেচ্ছাসৈনিক?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"তোমরা যে কেন এ কাজ করো আমি তো বুঝতেই পারি না। আমাকে যদি ওরা ছেড়ে দিতো তো পায়ে হেঁটেই পিতার্সবুর্গ চলে যেতাম। ঈশ্বর সাক্ষী, এই কুকুরের জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে।"

কমিশনারের দিকে ঘুরে কোজেল্‌ৎসভ শুধালো, "এখানে আপনার নালিশ করবার মতো কি আছে? বেশ ভাল থাকবারই তো কথা।"

তার দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে কমিশনার অন্যদিকে মুখ ফেরালো।

আগের মতোই ভলোদিয়াকে উদ্দেশ করে বলতে লাগল, "এই বিপদ, এই জিনিসপত্রের অভাব—কিছুই তো পাওয়া যায় না। কেন যে তোমরা এখানে আসতে চাও আমি তো বুঝতে পারি না! এখানে এলে যদি কিছু লাভ হতো তবু না হয় বুঝতাম। কিন্তু এই ভাবে আসা! তোমাদের এই বয়সে পঙ্গু হয়ে যাওয়ার মধ্যে কি কোনও মজা আছে?"

বিরক্তি-ভরা গলায় বড় কোজেল্‌ৎসভ আবার বলল, "কেউ চায় লাভ, আর কেউ চায় সম্মান!"

কমিশনার তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে অফিসারটির দিকে তাকালো; সেও হাসছে। বলল, "যেখানে খাবারই জোটে না সেখানে আবার সম্মান কোথায়!" তারপর গানের বাক্সটাকে দেখিয়ে বলল, 'লুসিয়া' থেকে কিছু বাজিয়ে শোনাও। আমার ভাল লাগবে..."

গোধূলির অন্ধকারে সেখান থেকে বেরিয়ে সেবাস্তোপল-এর দিকে যেতে যেতে ভলোদিয়া দাদাকে শুধালো, "ওই ভাসিলি মিখাইলিচ কি একটা সৎলোক?"

"লোকটি ভালই, তবে বড় বেশি লোভী। আরে, সে তো অন্তত পক্ষে ৩০০ রুবল মাসে পায়, অথচ থাকে একটা শুয়োরের মতো। নিজেই তো দেখলে। আর ওই কমিশনারটাকে তো আমি দুই চক্ষে দেখতে পারি না। একদিন এমন মারব না। আরে, লোকটা তুরস্ক থেকে ১২,০০০ রুবল নিয়ে এসেছিল...তারপরই কোজেল্ৎসভ সুদের কারবার নিয়ে মেতে উঠল; সুদ খাওয়া পাপ বলে যে তার রাগ তা ঠিক নয়, তার রাগ এই কথা ভেবে যে পৃথিবীতে এমন মানুষও আছে যারা সুদ খায়।

১০

আসন্ন রাত্রির মুখে তারা যখন উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বড় সেতুটার উপর উঠল তখন যে ভলোদিয়া মুসড়ে পড়ল তা ঠিক নয়, তবে তার মনটা ভারী হয়ে উঠল। এতকাল সে যা দেখে এসেছে আর শুনে এসেছে তার সঙ্গে তার নিজের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার যে আকাশ-পাতাল তফাৎ; এতকাল দেখেছে বড় বড়, আলো-ঝলমল, মোজাইক-করা মেঝের পরীক্ষার হল-ঘর; কমরেডদের সদয় কথাবার্তা আর ফূর্তির হাসি, নতুন ইউনিফর্ম, স্বয়ং প্রিয় জার যাকে সে সাত বছর ধরে দেখে অভ্যস্ত আর যিনি তাদের বিদায়-সম্ভাষণ জানাবার সময় অশ্রুভরা চোখে তাদের সন্তান বলে উল্লেখ করেছিলেন—এ সব ছাড়াও যে সুন্দর, উজ্জ্বল, গৌরবময় স্বপ্ন সে দেখেছে তার সঙ্গে বাস্তবের কী ভীষণ তফাৎ।

মিখাইল্‌ভস্কি কামানশ্রেণীর কাছে পৌছে গাড়ি থেকে নেমে বড় ভাই বলল, "আমরা পৌছে গেছি। ওরা যদি সেতু পার হবার অনুমতি দেয় তাহলে সোজা নিকোলায়েভ্‌স্কি ব্যারাকে চলে যাব। সকাল পর্যন্ত তুমি সেখানেই থাকবে, আর আমি চলে যাব রেজিমেন্টে; তোমার কামান-ঘাঁটি কোথায় খোঁজ নিয়ে কাল আবার তোমার কাছে আসব।"

ভলোদিয়া মিনতির সুরে বলল, "কিন্তু আমরা কেন একসঙ্গেই যাই না? তোমার সঙ্গে আমিও দুর্গে যাব। আমাকেও তো অভ্যস্ত হতে হবে। তুমি যদি যেতে পারো তাহলে আমিও পারি।"

"তোমার না যাওয়াই ভাল।"

"না, দয়া করো। অন্তত আমি তো বুঝতে পারব কেমন করে..."

"আমি তোমাকে না যাবার পরামর্শই দিচ্ছি। অবশ্য, তুমি যদি..."

আকাশ অন্ধকার, কিন্তু পরিষ্কার; আকাশে তারা, কামানের উড়ন্ত গোলা, আর বন্দুকের গুলির অবিশ্রাম ঝলকানিতে সব কিছু আলোকিত হয়ে উঠছে; কামান-ঘাঁটির বড় সাদা বাড়িটা এবং সেতুর সম্মুখভাগটা অন্ধকারেও স্পষ্ট চোখে পড়ছে। কখনও পর্যায়ক্রমে, কখনও এক সঙ্গে বন্দুকের গুলি ও বোমা বর্ষণের ফলে বাতাস বিদীর্ণ হচ্ছে, প্রতি সেকেন্ডে সে শব্দ উচ্চতর ও তীক্ষ্ণতর হচ্ছে। এই সব কল-কোলাহলের সঙ্গেই যেন সুর মিলিয়ে ভেসে আসছে উপসাগরের হা-হা রব। সাগরের বুক থেকে একটা বাতাস ভেসে আসছে। দুই ভাই সেতুর দিকে হাঁটতে লাগল।

একটি রক্ষী অদ্ভুতভাবে বন্দুকটাকে মাটিতে ঠুকে হাঁক দিলো :

"কে যায়?"

"সৈনিক!"

"আমার উপর হুকুম আছে, কাউকে যেতে দেওয়া হবে না!"

"কি বলছ তুমি! আমাদের ওপাশে যেতেই হবে!"

"অফিসারের অনুমতি নিন।"

একটা নোঙরের উপর বসে অফিসারটি ঝিমুচ্ছিল; সে দাঁড়িয়ে রক্ষীকে হুকুম দিলো, ওদের ছেড়ে দাও।

"আপনারা যেতে পারেন, কিন্তু ফিরতে পারবেন না।...তোমরা সব কোন্‌দিকে এগোচ্ছ?" মাটি-ভর্তি ঝুড়ি বোঝাই করে গাড়িগুলি সেতুর মুখে ভিড় করে আছে; তাদের দিকে তাকিয়ে অফিসার চিৎকার করে শেষের কথাগুলি বলল।

প্রথম ভাসমান নৌ-সেতুর উপর পা দিতেই ওপার থেকে হল্লা করতে করতে এগিয়ে আসা একদল সৈনিকেব সঙ্গে দুই ভাইয়ের ধাক্কা লাগল।

"সে যখন তার বারুদের টাকা পেয়ে গেছে তখন তার হিসাবও মিটে গেছে..."

আর একজন বলল, "আরে বাছারা! সেভার্‌নায়াতে পা দিলেই বুঝবে যে অন্য জগতে এসে পড়েছ। ঈশ্বরের দিব্যি! এখানে বাতাসের গন্ধই আলাদা।"

প্রথম জন বলল, "চুপ করো! এই তো সেদিন একটা গোলা ফেটে উড়ে এসে এখানে পড়ল, আর দু'জন নাবিকের পা উড়ে গেল। কাজেই তোমার পক্ষে মুখ না খোলাই ভাল!"

দুই ভাই প্রথম নৌকোটা হেঁটে পার হয়ে দ্বিতীয়টায় এসে থামল; এর মধ্যেই সে নৌকোর কিছুটা অংশ জলে ডুবে গেছে। তারা গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। মাঠে থাকতে বাতাসটাকে জোরালো মনে হয়নি, কিন্তু এখানে বেশ জোর ঝোড়ো হাওয়া বইছে; সেতুটা দুলছে; ঢেউগুলো এসে নৌকোর উপর আছড়ে পড়ছে; নোঙর ও দড়িগুলোর উপর ভেঙে পড়েছে, আর তক্তাগুলোকে জলের নিচে তলিয়ে

দিচ্ছে। ডান দিকে সাগরের অশুভ অস্পষ্ট কলধ্বনি শোনা যাচ্ছে; একটা সীমাহীন কালো সরলরেখা নক্ষত্রখচিত হাল্কা ধূসর আকাশ থেকে সাগরকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে; অনেক দূরে শত্রুপক্ষের নৌবহরের আলো ঝিকমিক করছে। বাঁ দিকে চোখে পড়ছে আমাদের একটা যুদ্ধজাহাজের কালো দেহ; ঢেউগুলি তার দুই পাশে সশব্দে আছড়ে পড়ছে; একটা স্টীমার সশব্দে দ্রুতগতিতে সেভার্নায়া থেকে দূরে দূরে যাচ্ছে। তার কাছেই একটা গোলা ফেটে যাওয়ায় তারই আলোয় মুহূর্তের জন্য দেখা গেল জাহাজের পাটাতনের উপর মাটি-ভর্তি ঝুড়ির উঁচু স্তূপ; তার উপর দাঁড়িয়ে আছে দুটি লোক, আর গলুইয়ের দুই পাশে ছড়িয়ে পড়ছে সাদা ফেনা আর সবুজাভ ঢেউএর জলকণা। সেতুর মুখে একটি নাবিক জলের মধ্যে পা ঝুলিয়ে বসে কুড়ুল দিয়ে কি যেন কাটছে। সম্মুখে সেবাস্তোপল-এর উপরেও দেখা যাচ্ছে সেই একই আলোর ঝলকানি; সেই ভয়ংকর শব্দই আরও জোরে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। সাগরের দিক থেকে ছুটে-আসা একটা ঢেউ সেতুটার ডান দিকে ভেঙে গিয়ে ভলোদিয়ার পা ভিজিয়ে দিলো; জলের ভিতর দিয়ে ছপ্‌ছপ্ করে পা ফেলে দুটি সৈনিক পাশ দিয়ে চলে গেল। হঠাৎ একটা গোলা ফাটল; বিদ্যুতের ঝিলিকে সেতুর সামনের দিকটা, একটা গাড়ি ও একজন অশ্বারোহীকে স্পষ্ট দেখা গেল; ভাঙা টুকরোগুলো শাঁ-শাঁ শব্দে ছিটকে গিয়ে জলের মধ্যে পড়ে উৎক্ষিপ্ত জলকণাব ফোয়ারা সৃষ্টি করল।

"আরে, এ যে মিখাইল সেম্‌য়োনিচ!" অশ্বারোহী বড় কোজেল্‌ৎসভ-এর কাছে এসে ঘোড়ার লাগাম টেনে বলে উঠল। "তুমি কি পুরোপুরি ভাল হয়ে গেছ?"

"যেমন দেখছ। কোথায় চলেছ?"

"সেভার্নায়াতে যাচ্ছি গোলা-বারুদের জন্য। এখন রেজিমেন্ট-অ্যাড্‌জুটান্ট হয়ে কাজ করছি।...যে কোনও মুহূর্তে একটা আক্রমণের আশংকা করছি, অথচ সৈনিকদের থলেতে পাঁচ বাউন্ডের বেশি মাল কারও নেই। চমৎকার ব্যবস্থা, কি বলো?"

"মার্ৎসভ কোথায়?"

"কাল তার একটা পা উড়ে গেছে...তাও শহরের মধ্যে যখন নিজের ঘরে ঘুমিয়েছিল...হয়তো এখনও ড্রেসিং-স্টেশনেই তাকে পাবে।"

"রেজিমেন্ট ৫ নম্বরে আছে, কথাটা ঠিক তো?"

"হ্যাঁ, এম. এর জায়গায় আমরা সেখানে গেছি। ড্রেসিং-স্টেশনে গিয়ে খোঁজ করো; আমাদের অনেককে সেখানে পাবে; তারাই তোমাকে নিয়ে যাবে।"

"আর মরস্কায়ার উপরে আমার বাসাটার কি অবস্থা? এখনও টিকে আছে তো?"

"আরে ভাই, সে তো অনেক আগেই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সেবাস্তোপলকে এখন দেখে চিনতেই পারবে না; মেয়েছেলে নেই, মদের দোকান নেই, গান-বাজনা

নেই। শেষ দলটাও গতকাল চলে গেছে। এখন একেবারেই একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। আচ্ছা, চলি।"

অফিসারটি ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

ভলোদিয়া হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল; তার মনে হতে লাগল, এই মুহূর্তে একটা কামানের গোলা বা বোমার টুকরো ছিটকে এসে সোজা তার মাথায় লাগবে। কড়া বাতাস, অন্ধকার, নানান শব্দ, বিশেষ করে ঢেউএর অস্পষ্ট হুংকার—সব যেন তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলছে, আর এগিয়ো না, সামনে গেলে তোমার মঙ্গল নেই, উপসাগরের এ-পারের রাশিয়ার মাটিতে আর কোনও দিন তোমার পা পড়বে না; তার চাইতে ফিরে যাও, এই ভয়ংকর মৃত্যু-ফাঁদ থেকে যত দূরে পারো পালিয়ে যাও। সে ভাবল, "কিন্তু এখন তো অনেক দেরি হয়ে গেছে, হয়তো আমার ভাগ্য নির্ধারিতই হয়ে গেছে"। কিছুটা এই চিন্তার দরুন আর কিছুটা বুটের ভিতর জল ঢুকে তার পা ভিজিয়ে দেওয়ার দরুন সে কাঁপতে লাগল।

একটা গভীর শ্বাস টেনে ভলোদিয়া দাদার কাছ থেকে কয়েক পা দূরে সরে গেল।

বুকের উপর ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে বিড় বিড় করে বলে উঠল, "প্রভু! এখানেই কি আমি মারা যাব? আমি? প্রভু, আমাকে দয়া করো!"

গাড়িটা সেতুর উপর এলে বড় ভাই বলল, "এবাব চলো হে ভলোদিয়া। ঐ গোলটা দেখলে?"

সেতুর উপরে আহত সৈনিক অথবা মাটি-ভর্তি ঝুড়ি বোঝাই অনেক গাড়ি দুই ভাইয়ের চোখে পড়ল; আসবাবপত্র বোঝাই একটা গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটি স্ত্রীলোক।

আপনা থেকেই নিকোলায়েভস্কি কামান-ঘাঁটির দেয়াল ঘেঁসে কামানের গোলা ফাটার শব্দ ও ছিটকে-যাওয়া পাথরের টুকরোগুলোর সাঁই-সাঁই আওয়াজ শুনতে শুনতে দুই ভাই নিঃশব্দে ঘাঁটির তীর্থস্থানে পৌছল; সেখানে প্রতিষ্ঠিত আছে পবিত্র মূর্তি। সেইখানে তারা জানতে পারল, যে ৫ নম্বর হাল্কা রেজিমেণ্টে ভলোদিয়ার যোগ দেবার কথা তার ঘাঁটি পড়েছে কোরাবেল্‌নায়া-তে। বিপদ আছে জেনেও তারা স্থির করল, ৫ নম্বর দুর্গে বড় ভাইয়ের বাসাতেই তারা রাতটা একসঙ্গে কাটাবে এবং পরদিন ছোট ভাই তার কর্মস্থলে যাত্রা করবে। একটা বারান্দা দিয়ে নেমে কামানঘাঁটির নিচে ঘুমিয়ে থাকা সৈনিকদের পা ডিঙিয়ে শেষ পর্যন্ত তারা ড্রেসিং স্টেশনে গিয়ে হাজির হলো।

১১

দু'জনে প্রথম ঘরটায় ঢুকল। খাটিয়াতে আহত সৈনিকরা শুয়ে আছে। অন্য সব হাসপাতালের মতোই এখানকার বাতাসও একটা তীব্র বিরক্তিকর গন্ধে ভারী হয়ে আছে। দুটি নার্স তাদের দেখে এগিয়ে এল।

তাদের একজন পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সের একটি স্ত্রীলোক, কালো চোখ, কঠিন মুখ, হাতে ব্যান্ডেজ ও তুলো; যে যুবকটি তার পিছন পিছন ছুটছে তাকে নানা রকম হুকুম করছে; অপরজন খুবই সুন্দরী, বয়স প্রায় বিশ বছর, নরম, বিবর্ণ মুখে চোখ নিচু করে বড় নার্সের পাশাপাশি হাঁটছে, যেন ভয় পাচ্ছে পাছে একা পিছনে পড়ে থাকে।

কোজেল্‌ৎসভ এগিয়ে এসে তাদের জিজ্ঞাসা করল, মার্ৎসভ নামক যে লোকটির একটা পা গতকাল উড়ে গেছে তাকে তারা চেনে কি না।

বড় নার্সটি জিজ্ঞাসা করল, "যিনি পি. রেজিমেন্ট থেকে এসেছেন? আপনাদের আত্মীয় না কি?"

"না ম্যা'ম। আমার সহকর্মী।"

"হুম্! এদের তার কাছে নিয়ে যাও," সে ফরাসী ভাষায় তরুণী নার্সটিকে বলল। "এই পথে।" এইটুকু বলেই সে যুবকটিকে সঙ্গে নিয়ে একজন আহত সৈনিকের বিছানার দিকে এগিয়ে গেল।

"চলো যাই। ওদিকে কি দেখছ?" কোজেল্‌ৎসভ ভলোদিয়াকে জিজ্ঞাসা করল। দুই ভুরু তুলে সে একদৃষ্টিতে আহত সৈনিকটির দিকে তাকিয়ে আছে; চোখ ফেরাতে পারছে না; মুখে ফুটে উঠেছে বেদনার ছাপ। "চলো যাই।"

ভলোদিয়া ভাইকে অনুসরণ করল; তবু আর একবার পিছনে তাকিয়ে নিজের অজ্ঞাতেই বিড় বিড় করে বলে উঠল :

"হা ঈশ্বর! হা ঈশ্বর!"

তাকে দেখিয়ে নার্সটি কোজেল্‌ৎসভকে জিজ্ঞাসা করল, "মনে হচ্ছে নতুন এসেছেন।"

"হ্যাঁ, সবে এসেছে।"

সুন্দরী নার্সটি ভলোদিয়ার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেঁদে ফেলল।

হতাশভাবে বলে উঠল, "ঈশ্বর! ঈশ্বর! কবে এর শেষ হবে?"

তারা অফিসারদের ওয়ার্ডে ঢুকল। কনুই পর্যন্ত খোলা পেশীবহুল হাতদুটি মাথার নিচে রেখে মার্ৎসভ চিৎ হয়ে শুয়ে আছে; বিবর্ণ পাংশু মুখখানি দেখে মনে হচ্ছে, পাছে সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে তাই দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে আছে। ভাল পাটা মোজা পরা অবস্থায় কম্বলেব নিচ থেকে বেরিয়ে আছে; বেশ দেখা যাচ্ছে আঙুলগুলি ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছে।

"এই যে, কেমন আছেন?" নার্সটি নরম হাতে আহত লোকটির টাক-পরা মাথাটা তুলে ধরে বালিশটা ঠিক করে দিতে দিতে বলল। "দুটি বন্ধু আপনাকে দেখতে এসেছেন।" ভলোদিয়া লক্ষ্য করল, মেয়েটির হাতে একটা সোনার আংটি।

"কষ্ট তো হচ্ছেই।" রোগী বিরক্ত হয়ে বলে উঠল। "আমাকে একা থাকতে দাও!

আমি ভাল আছি।" মোজার ভিতরে আঙুলগুলি আরও কুঁকড়ে যাচ্ছে। "হেলো! দুঃখিত, তোমার নামটা কি?" সে কোজেল্‌ৎসভকে জিজ্ঞাসা করল। নামটা শুনে বলল, "ও, হ্যাঁ—এখানে এলে সব কিছু ভুল হয়ে যায়। আমরা একসঙ্গে থাকতাম, তাই না?" সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভলোদিয়ার দিকে তাকাল।

"এটি আমার ভাই। এই মাত্র পিতার্সবুর্গ থেকে এসে পৌঁচেছে।"

"হুম্! বেশ! আমি তো পুরো ছুটিই পেয়ে গেছি", যন্ত্রণাবিকৃত মুখে সে বলল। "উঃ, কী ব্যথা!...আরও আগেই সব শেষ হয়ে গেলেই ভাল হতো।"

সে ক্ষোভের সঙ্গে পাটা ছুঁড়তে লাগল। দুই হাতে মুখ ঢাকল।

অশ্রুভরা চোখে নার্সটি চুপি-চুপি বলল, "ওকে একলা থাকতে দিন। ওর মেজাজ ভাল নেই।"

সেভারনায়াতে দুই ভাই ঠিক করেছিল এক সঙ্গেই ৫ নম্বর দুর্গে যাবে; নিকোলায়েভ্‌স্কি কামান-ঘাঁটি ছেড়েই স্থির করল, যার যার পথে সে চলে যাবে; যেন দু'জনে মিলেই ব্যবস্থা করে নিলো, কেউই অকারণ বিপদের ঝুঁকি নেবে না।

বড় ভাই শুধালো, "কিন্তু তুমি জায়গাটা চিনবে কেমন করে ভলোদিয়া? ও হ্যাঁ, নিকোলায়েভই তো আছে; সেই তোমাকে কোরাবেল্‌নায়াতে নিয়ে যাবে। আমি একাই যাবো, আর কাল তোমাকে খুঁজে নেব।"

এই শেষ বিদায়-সম্ভাষণে দুই ভাইয়ের মধ্যে আর কোনও কথা হলো না।

১২

কামানগুলি একইভাবে গর্জন করে চলেছে; কিন্তু যে একাতেরিনিস্কায়া স্ট্রীট ধরে ভলোদিয়া ও নিকোলায়েভ নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে সেটা জনশূন্য ও শান্ত। অন্ধকারের মধ্যে তার চোখে পড়ছে শুধু চওড়া রাস্তাটা; দুই পাশে সারি সারি বড় বড় সাদা বাড়ি; অনেক জায়গায় দেয়াল ভেঙে গেছে; পাথর-ওঠা ফুটপাথে ক্বচিৎ কখনও দেখা হচ্ছে কোনও সৈনিক ও অফিসারের সঙ্গে; রাস্তার বাঁ দিক ধরে এগিয়ে নৌ-বিভাগীয় দপ্তরটা পার হতেই একটা দেয়ালের ওপাশ থেকে বেরিয়ে আসা উজ্জ্বল আলোয় তার চোখে পড়ল, পথের ধার বরাবর ধুলোমাখা শুকনো পাতাসুদ্ধ বাবলা গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে। নিকোলায়েভ ঘন ঘন নিঃশ্বাস টানতে টানতে তার পিছন পিছন হাঁটছে। দু'জনেরই পায়ের শব্দ সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। বিশেষ করে কোনও কিছুই সে ভাবছে না : সুন্দরী নার্সটি, মার্ৎসভ-এর মোজা-পরা আঙুল-কাঁপানো পাটা, অন্ধকার, গোলাগুলি ও মৃত্যুর নানা রূপ অস্পষ্টভাবে তার মনের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই বিপদের মুহূর্তে একাকিত্ব ও ভাগ্যের সার্বিক উদাসীনতার অনুভূতিতে তার তরুণ মন ব্যথায় কঁকিয়ে উঠছে। "আমি মারা পড়ব, কষ্ট পাব, যন্ত্রণা ভোগ করব, আর কেউ এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবে না!" অথচ যে

বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের জীবন ও সহানুভূতির স্বপ্ন সে এত সাধ করে দেখেছে তার কিছুই ঘটবে না। গোলা-গুলি ক্রমে যেন এগিয়ে আসছে; নিকোলায়েভ আরও ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছে, কিন্তু নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে না। ম্যালি কোরাবেল্‌নি সেতুটা পার হবার সময় ভলোদিয়া দেখতে পেল, একটা কি যেন তার পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে উপসাগরে পড়ল, মুহূর্তের জন্য ঢেউগুলি রক্তিমাভায় জ্বলে উঠে মিলিয়ে গেল এবং পুনরায় জলকণাগুলি ফোয়ারার মতো ছিটকে উঠল।...

পথে যেতে যেতে তারা দেখল. স্ট্রেচারে করে আহত সৈনিকরা চলেছে আর সামরিক বিভাগের গাড়ি চলেছে মাটি-ভর্তি ঝুড়ি বোঝাই হয়ে; কোবাবেলনায়াতে একটা রেজিমেন্টের সঙ্গে তাদের দেখা হলো; অনেক অশ্বারোহী পাশ কাটিয়ে চলে গেল। অশ্বারোহীদের মধ্যে একজন অফিসার; তার সঙ্গে একজন কসাক; অতি দ্রুত এগিয়ে যেতে যেতে ভলোদিয়াকে দেখতে পেয়ে অফিসারটি লাগাম টেনে ছেলেটির মুখটা একবার দেখল, আর তারপরেই চাবুক মেরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। "একা—একেবারে একা! আমি বেঁচে আছি কি নেই তাও কেউ ভাবে না", একান্ত হতাশায় ছেলেটি কথাগুলি ভাবল—আর তার মনে হলো সে বুঝি কেঁদেই ফেলবে।

একটা পাহাড়ের উপর উঠে সাদা উঁচু পাঁচিলটা পেরিয়ে সে একটা রাস্তা ধরে নামতে লাগল। দু'ধারের ভাঙা-চোবা কুটিরগুলো গোলার আলোয় ঝল্‌সে উঠছে। একটি আলুথালু মাতাল মেয়ে মানুষ একজন নাবিককে সঙ্গে নিয়ে ছোট ফটকটার ভিতর দিয়ে টলতে টলতে বের হতে গিয়ে ভলোদিয়ার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে উঠল :

"কী রকম ভদ্দরলোক গা...আমি দুঃখিত মিঃ অফিসার, হুজুর।"

অন্ধকার দিগন্তে আলোর ঝল্‌কানি যত বাড়তে লাগল, চারপাশে যত বেশি সংখ্যায় গোলা-গুলি ফাটতে লাগল, ততই অভাগা ছেলেটির বুক যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠতে লাগল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিকোলায়েভ হঠাৎ এমন স্বরে কথা বলতে শুরু করল যে ভলোদিয়ার মনে হলো সে বুঝি কোনও শোকযাত্রীর গলা শুনছে।

"এত সাত-তাড়াতাড়ি উনি গুবানিয়া ছেড়ে চলে এলেন। আমাদের যেতেই হবে। যেতেই হবে! এত তাড়াহুড়া করে এখন চলেছি কোথায়! যারা বুদ্ধিমান তারা গায়ে একটু আঁচড় লাগলেই যত বেশি দিন পারে হাসপাতালে কাটায়। সেটাই তো ঠিক পথ। তার·চাইতে ভাল আর কি হতে পারে?"

এই সব কথা তার বুকটাকে যে ভাবে চেপে ধরেছে তাকে ঠেলে সরিয়ে দেবার আশায় ভলোদিয়া বলল, "কিন্তু দাদা তো এখন ভাল হয়ে গেছে, এ ছাড়া আর কি করবে?"

"ভাল হয়ে গেছে? তিনি তো এখনও অসুস্থ, তবু আপনি বলছেন ভাল হয়ে গেছেন? যাদের বুদ্ধিশুদ্ধি আছে তারা এ রকম সময়ে সত্যি সত্যি ভাল হয়ে গেলেও

হাসপাতালেই কাটিয়ে দেয়। এখানে এসে লাভটা কি? একটা হাত বা একটা পা উড়ে যেতে পারে—এই তো! আর সেজন্য খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতেও হবে না! শহরেরই তো এই অবস্থা; দুর্গের অবস্থাটা কেমন একবার ভেবে দেখুন। সব সময় প্রার্থনা করার সময়টুকুও পাবে না।...শয়তান! একেবারে কান ঘেঁসে বেরিয়ে গেল।" পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়া একটা গোলার টুকরোর শব্দ কানে আসায় সে বলে উঠল। "এখানে আমাকে বলা হয়েছে, হুজুরকে পৌঁছে দিতে হবে। অবশ্য আমাদের কাজ আমরা ভালই বুঝি : হুকুম মতো কাজ করে যাও; কিন্তু আসল কথা হলো, গাড়িতে কিছু সৈন্য রয়েছে, আর বান্ডিলটাও রয়েছে খোলা। উনি তো বললেন, চলে যাও! কিন্তু কিছু যদি হারায়, তখন তো নিকোলায়েভ-এর ঘাড়েই দোষ পড়বে!"

আরও কয়েক পা এগিয়ে তারা একটা স্কোয়ারে পৌঁছল। নিকোলাযেভ দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল।

হঠাৎ এক সময় বলল, "ঐ আপনার কামান-ঘাঁটি হুজুর! শাস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করবেন, সেই দেখিয়ে দেবে কোথায় যেতে হবে।" আরও কযেক পা এগিযে নিকোলায়েভ-এর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ আর ভলোদিয়ার কানে এল না।

হঠাৎ তার মনে হলো সে একেবারেই একা। এই একাকিত্ব ও বিপদের চিন্তা—মনে হলো সে যেন মৃত্যুর দ্বারে এসে পৌঁচেছে—একটা ঠাণ্ডা ভারী পাথরের মতো তার বুকের উপর চেপে বসল। সে স্কোয়ারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল; চারিদিকে তাকিয়ে দেখল কেউ তাকে দেখছে কি না, তাবপর দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরে সভয়ে বলে উঠল : "হায় প্রভু! আমি কি সত্যি ভীরু? নিচ, ঘৃণ্য পশুর মতো ভীরু? আমার দেশের জন্য, জারের জন্য, যাদের জন্য এত উৎসাহের সঙ্গে মৃত্যু বরণ করার স্বপ্ন আমি দেখেছি, তাদের জন্য সসম্মানে মরতে কি আমি পারি না? না, আমি একটি শোচনীয়, জঘন্য জীব!" নিজের প্রতি হতাশায় ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় বিপর্যস্ত হয়ে সে শাস্ত্রীর কাছ থেকে কামান-ঘাঁটির কম্যান্ডারের বাসার খোঁজ নিয়ে সেই দিকে এগিয়ে চলল।

১৩

উঠোনের দিকে ফটকওয়ালা একটা ছোট দোতলা বাড়িতে কামান-ঘাঁটির কম্যান্ডারের বাসাবাড়ি। একটা জানালা কাগজ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে; তার ভিতর দিয়ে মোমবাতির অস্পষ্ট আলো চোখে পড়ছে। ফটকের পাশে বসে একটি আর্দালি পাইপ টানছে। ভলোদিয়াব উপস্থিতি জানাবার জন্য সে ভিতরে গেল; ফিরে এসে তাকে নিয়ে একটা ঘরে ঢুকল। ঘরের মধ্যে দুটো জানালার মাঝখানে ভাঙা আয়নার নিচে একটা লেখার টেবিল পাতা; নানা রকম সরকারী কাগজপত্র তাব উপর ছড়ানো; কয়েকটা চেয়ার ও লোহার খাটিয়ায় পরিষ্কার বিছানা; পাশেই মেঝেতে একটা ছোট কম্বল পাতা।

দরজায় ঝুপ্‌সি গোঁফওয়ালা একটি সুদর্শন লোক দাঁড়িয়েছিল—একজন সার্জেন্ট-মেজর, পরনে গ্রেটকোট, পাশে খাপে-ঢাকা একটা সঙ্গীন, কোটের সঙ্গে ঝুলছে সেন্ট জর্জের ক্রস ও হাঙ্গারীয়ান পদক। একজন ছোটখাট স্টাফ অফিসার ঘরের মাঝখানে পায়চারি করছে; বয়স বছর চল্লিশ, পরনে একটা পাতলা পুরনো কোট, ফোলা-ফোলা গাল, রুমাল দিয়ে বাঁধা।

কিতাদুরস্তভাবে ভলোদিয়া বলল, 'পঞ্চম হাল্কা গোলন্দাজ বাহিনীর পতাকাবাহী অফিসার ছোট কোজেল্‌ৎসব চাকরিতে যোগদানের জন্য হাজির।"

কম্যান্ডার নীরসভাবে ছেলেটির ভাষণের জবাব দিয়ে তাকে বসতে বলল, কিন্তু কর-মর্দনের জন্য হাত বাড়াল না।

ভলোদিয়া ভয়ে ভয়ে ডেস্কের পাশে একটা চেয়ারে বসে অন্যমনস্কভাবে এক-জোড়া কাঁচি তুলে নিয়ে খেলা করতে শুরু করল; কম্যান্ডার পিছনে দুই হাত জুড়ে মাথা নিচু করে যেন কোনও কিছু স্মরণ করতে চেষ্টা করছে এমনিভাবে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল, আর মাঝে মাঝে ভলোদিয়ার হাতের দিকেও তাকাতে লাগল।

কম্যান্ডার লোকটির বলিষ্ঠ গড়ন, মাথার উপরে একটা বড় মাপের টাক, ঘন গোঁফজোড়া বাড়তে বাড়তে মুখটাকেই ঢেকে ফেলেছে, বড় বড় দুটি বাদামী চোখ, হাত দুটি সুগঠিত, পরিষ্কার ও গোলগাল, ঈষৎ ঝুঁকে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে পা ফেলে হাঁটে, দেখলেই বোঝা যায় লোকটি মোটেই লাজুক প্রকৃতির নয়।

সার্জেন্ট-মেজরের সামনে থেমে সে বলল,"হ্যাঁ, কাল থেকে ঘোড়াগুলোর দানাপানি বাড়িয়ে দিতে হবে; ওরা বেশ শুকিয়ে গেছে। আপনি কি বলেন?"

"কিছুটা তো অবশ্যই বাড়াতে পারেন হুজুর, আর বাড়াবেন নাই বা কেন? যই তো এখন বেশ সস্তা।" সার্জেন্ট-মেজর বলতে লাগল। "যে লোকটি আমাদের ঘোড়ার খাবারের জোগান দেয় সেই ফ্রান্সচুক গতকাল মালগাড়ি থেকে একটা চিরকুট লিখে জানিয়েছে সেখান থেকেই আমাদের গাড়ির জন্য কয়েকটা চক্রদণ্ড কেনা উচিত। লিখিছে, সেখানে ওগুলো সস্তা। আপনার কি হুকুম হুজুর?"

পায়চারি করতে করতেই কম্যান্ডার বলল, "বেশ তো, কিনে নিক, তার কাছে তো টাকা আছেই।" হঠাৎ ভলোদিয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে সে প্রশ্ন করল, "তোমার জিনিসপত্র কোথায়?"

সে যে খুব ভীরু এই চিন্তা বেচারি ভলোদিয়াকে তখন এতই অভিভূত করে ফেলেছে যে সব কিছুর মধ্যেই সে তার প্রতি তাচ্ছিল্যের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে। তার মনে হলো কামান-ঘাঁটির কম্যান্ডার তার মনের কথা বুঝতে পেরেই তাকে বিদ্রূপ করছে। লজ্জায় লাল হয়ে সে জানাল, তার জিনিসপত্র সব গ্রাফ্‌স্কয়াতে রয়েছে; তার দাদা পরদিন সব নিয়ে আসবে।

লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেল তার কথায় কান না দিয়ে সার্জেন্ট-মেজরের দিকে ফিরে বলল :

"এই পতাকাবাহীকে কোথায় রাখা যায়?"

"পতাকাবাহীকে স্যার," আগের কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করে সার্জেন্ট-মেজর বার বার ভলোদিয়ার দিকে তাকাতে লাগল; যেন সে বলতে চাইছে, "কোন্ পতাকাবাহী? তাকে কোনও জায়গায় রেখে লাভ হবে কি?" ভলোদিয়া আরও বিব্রত বোধ করতে লাগল।

একটু থেমে সার্জেন্ট-মেজর বলল, "নিচের তলায় লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেনের ঘরে ওকে দেওয়া যেতে পারে। লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেন তো দুর্গে চলে গেছে। তার বিছানাটা খালি আছে।"

"দেখো, ওতেই আপাতত তোমার কাজ চলে যাবে তো?" কম্যান্ডার বলল। "তুমি নিশ্চয় খুব ক্লান্ত। কাল একটা ভাল ব্যবস্থা করে দেবো।"

ভলোদিয়া দাঁড়িয়ে অভিবাদন করল।

সে দরজার কাছাকাছি চলে যাবার পরে কম্যান্ডার জিজ্ঞাসা করল, "একটু চা চলবে কি? তোমার জন্য সামোভারটা চাপাতে পারি।"

ভলোদিয়া অভিবাদন করে বেরিয়ে গেল। কর্নেলের আর্দালি তাকে একতলার একটা ঘরে নিয়ে গেল; ঘরটা ফাঁকা, নোংরা, যত রাজ্যের জিনিসপত্র ছড়ানো। একটা লোহার খাটিয়া রয়েছে, তাতে না আছে চাদর; না আছে কম্বল। একটা ভারী সামরিক কোটে গা ঢেকে গোলাপী শার্ট-পরা একটি লোক খাটিয়ায় ঘুমিয়ে আছে।

লোকটিকে নিম্নপদস্থ সৈনিক বলেই ভলোদিযার মনে হলো।

লোকটির ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে আর্দালি বলল, "পিয়তর নিকোলাইচ! এই পতাকাবাহী বাবুটি এখানে ঘুমোবেন।...ইনি একজন শিক্ষার্থী সৈনিক।"

"দয়া করে ডাকাডাকি করো না!" ভলোদিয়া বলল, কিন্তু লম্বা-চওড়া জোয়ান বোকা-বোকা মুখের শিক্ষার্থীটি খাটিয়া থেকে উঠে পড়ল; কোটটা ঘাড়ে ফেলে আধা ঘুমের মধ্যেই ঘর থেকে চলে গেল।

যেতে যেতে বিড় বিড় করে বলল, "ঠিক আছে, আমি উঠোনেই শুয়ে পড়ছি।"

১৪

নিজের কথা ভাবতে বসে ভলোদিয়ার প্রথমেই মনে পড়ল তার নিজের বিচলিত ও মুসড়ে-পরা অবস্থার কথা। সব কিছু, বিশেষ করে নিজেকে ভুলে থাকতে সে তখনই ঘুমিয়ে পড়তে চাইল। ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে কোটটা খুলে বিছানায় শুয়ে পড়ল; কোটটা গায়ে চাপা দিয়ে সেটাকে মাথা পর্যন্ত টেনে দিলো; ছোটবেলা থেকেই অন্ধকারকে তার বড় ভয়। হঠাৎ তার মনে হলো, একটা গোলা তো উড়ে

এসে ছাদ ফুটো করে তাকে মেরে ফেলতে পারে। সে উঠে কান পাতল; ঠিক মাথাব উপরে কম্যাণ্ডাবের পায়ের শব্দ কানে এল।

সে ভাবতে লাগল, "একটা গোলা যদি উড়ে আসেই তো প্রথমে তাদের মারবে যারা উপর তলায় আছে, তারপর তো আমাকে, অন্তত একা আমিই মারা পড়ব না।" এই চিন্তা যেন তাকে কিছুটা স্বস্তি দিলো; সে তন্দ্রায় ঢলে পড়ল।..."কিন্তু আজ রাতেই যদি সেবাস্তোপল দখল করে ফরাসীরা দলে দলে ছুটে আসে, তাহলে? কি নিয়ে আমি আত্মরক্ষা করব?" আবার উঠে সে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। অন্ধকারকে তার যে রহস্যজনক ভয় তাকেও ছাপিয়ে গেল আসন্ন বিপদের আতংক। একটা জিন ও সামোভার ছাড়া ঘরে আর একটাও শক্ত জিনিস নেই। "আমি জঘন্য, আমি ভীরু, আমি একটা পশুর মতো ভীরু!" হঠাৎ এই কথা মনে আসায় সে আবার নিজের প্রতি তাচ্ছিল্যে ও ঘৃণায় অভিভূত হয়ে পড়ল। সে শুয়ে পড়ল। কোনও কিছু চিন্তা না করার চেষ্টা করল। কিন্তু বোমাবর্ষণের শব্দে ঘবের একমাত্র জানালার কাঁচ ঝন্‌ঝন্ করে উঠল; সেই শব্দে আপনা থেকেই সারা দিনের কথাগুলি তার মনে পড়ে গেল, মনে পড়ল আসন্ন বিপদের কথা; চোখের সামনে ভেসে উঠল আহত রক্তাক্ত মানুষেব ছবি; গোলা ও টুকবোগুলো ঘবেব মধ্যে এসে পড়ছে; একটি মুমূর্ষু লোকের ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করতে করতে সুন্দরী নার্সটি কাঁদছে; ছোট মফস্বল শহরে তাকে বিদায় দেবার সময় তার মা সাশ্রু নেত্রে অঘটনঘটনাকারী দেবমূর্তির সামনে একান্তভাবে প্রার্থনা করছে; এই সব ছবি দেখতে দেখতে আর একবাব সে বুঝতে পারল যে ঘুমনো অসম্ভব। কিন্তু সহসা ঈশ্বরকে মনে পড়ল; তিনি তো সর্বশক্তিমান ও দয়ালু; তিনি তো সব কিছু করতে পারেন, সকলের প্রার্থনা শোনেন; এই চিন্তা বিদ্যুৎ চমকের মতো তার মনের মধ্যে ঝল্‌সে উঠল। নতজানু হয়ে বসে সে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল; ছোট বেলায় যেমনটি শেখানো হয়েছিল সেইভাবে দুই হাত এক করল। এই প্রার্থনার ভঙ্গিটাই তার মনের দীর্ঘ-বিস্মৃত প্রশান্তিকে ফিরিয়ে আনল।

সে প্রার্থনা করতে লাগল, "হে প্রভু, আমাকে যদি মরতেই হয়, আমার জীবন যদি নিতেই হয়, তাহলে শীঘ্র করো। আর যে সাহস ও দৃঢ়তা আমার নেই তার যদি দবকার থাকে তো তাই আমাকে দাও; এই লজ্জা ও অপমানের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করো; আমি আর সহ্য করতে পারছি না; তোমার ইচ্ছা পালন করতে আমাকে কি করতে হবে তা শিখিয়ে দাও।"

একটি শিশুসুলভ ভয়ার্ত সংকীর্ণ হৃদয় সহসা পূর্ণ মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হলো, নতুন প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ হলো; তাব সামনে একটি বিস্তীর্ণ, উজ্জ্বল নবদিগন্ত খুলে গেল। কিছু সময়ের জন্য তাব মনের মধ্যে অনেক চিন্তা ও অনুভূতির ঝল্‌কানি খেলে গেল; আর অচিরেই গোলা ফাটার শব্দ, বোমার গর্জন ও কাঁচের ঝনঝনানি শুনতে শুনতে একটা গভীর নির্বিঘ্ন নিদ্রায় সে ঢলে পড়ল।

মহান প্রভু! মৃত্যুর এই ভয়ংকর পাদপীঠ থেকে অজ্ঞতা, অনুতাপ ও যন্ত্রণার ভার যে সরল, ঐকান্তিক ও হতাশাপূর্ণ প্রার্থনা তোমার উদ্দেশে উচ্চারিত হয়েছে, একমাত্র তুমিই তা শুনেছ, তুমিই তা জেনেছ—সে প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে জেনারেলের অন্তর থেকে যে এক মুহূর্ত আগেও প্রাতরাশ ও সেন্ট জর্জের ক্রসের কথা ভাবলেও ভয় যখন তার গলা টিপে ধরেছে তখন তারও অন্তরে প্রতিভাত হয়েছে তোমারই অস্তিত্ব; আবার যে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত কীটদষ্ট সৈনিকটি নিকোলায়েভ্স্কি কামান-ঘাঁটির মেঝেতে পড়ে আছে সেও তোমার কাছেই প্রার্থনা জানাচ্ছে, অকারণে যত কষ্ট সে ভোগ করেছে তার দরুণ প্রাপ্য পুরস্কার তুমি তাকে শীঘ্র দাও। হ্যাঁ, তোমার সন্তানদের প্রার্থনা শুনতে তো তোমার ক্লান্তি নেই; সর্বত্রই তো তাদের অন্তরে ধৈর্য, কর্তব্যবোধ ও আশার সান্ত্বনাকে জাগিয়ে রাখতে তোমার কর্মরত দেবদূতদের তুমি পাঠিয়ে থাকো।

১৫

নিজের রেজিমেন্টের একজন সৈনিকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় বড় কোজেল্‌ৎসভ তাকে নিয়ে ৫ নম্বর দুর্গের দিকে চলল।

'দেয়াল ঘেঁসে চলুন হুজুর," সৈনিকটি বলল।

"কেন?"

"এভাবে চলা বিপজ্জনক হুজুর। ঐ দেখুন, ছুটে আসছে;" একটা কামানের গোলা সশব্দে ছুটে এসে রাস্তার ওপারে শুকনো জায়গায় গিয়ে পড়ল; তার শব্দ শুনেই সৈনিকটি বলল।

তার কথায় কান না দিয়ে কোজেল্‌ৎসভ সাহসের সঙ্গে রাস্তার মাঝখান দিয়েই চলতে লাগল।

বসন্তকালে সে যখন সেবাস্তোপল-এ ছিল এখনও তখনকার মতোই সেই একই রাস্তা, সেই একই—হয়তো কিছু বেশি—আলোর ঝল্‌কানি, শব্দ, আর্তনাদ, আহত সৈনিকদের সঙ্গে দেখা হওয়া, সেই একই কামানশ্রেণী, উঁচু প্রাচীর ও ট্রেঞ্চ; কিন্তু এখন যেন সব কিছুই আরও খারাপ অথচ আরও প্রচণ্ড বলে মনে হচ্ছে—বাড়িঘরগুলো আরও বেশি মাত্রায় বিধ্বস্ত হয়েছে, একমাত্র "ক্রুশ্‌চিন ভবন" (হাসপাতাল) ছাড়া আর কোনও জানালায় আলো নেই; রাস্তায় একটি স্ত্রীলোককেও দেখা গেল না; আগের সেই অভ্যাগত নিরুদ্বেগভাবের বদলে দেখা দিয়েছে তীব্র প্রত্যাশা, ক্লান্তি ও মানসিক চাপ।

অবশেষে তারা শেষ ট্রেঞ্চটায় পৌঁছে গেল; পি. রেজিমেন্টের একটি সৈনিক তার প্রাক্তন কম্যান্ডারকে চিনতে পারল; ৩ নম্বর বাহিনীর সৈনিকরা অন্ধকারে একটা দেয়াল ঘেঁসে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; কামানের গোলার আলোয় মাঝে মাঝেই তাদের দেখা যাচ্ছে; চাপা কথাবার্তা ও বন্দুকের ঠন্‌ঠন্ শব্দ কানে আসছে।

কোজেল্‌ৎসভ জানতে চাইল, "রেজিমেন্ট কম্যান্ডার কোথায়?"

"নৌ-বিভাগের ভূগর্ভস্থ ঘরে হুজুর! আপনি বলেন তো সেখানে নিয়ে যেতে পারি," অনুগত সৈনিকটি জবাব দিলো।

সৈনিকটি কোজেল্‌ৎসভকে নিয়ে ট্রেঞ্চের পর ট্রেঞ্চ পার হয়ে শেষ পর্যন্ত একটা খানার মধ্যে ঢুকল; একটি নাবিক সেখানে বসে পাইপ টানছিল। তার পিছনে একটা দরজা। দরজার ঘুলঘুলি দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে।

"ভিতরে যেতে পারি কি?"

"এক মিনিট স্যার, আমি আপনার কথা জানাচ্ছি," বলে নাবিকটি দরজার ওপাশে চলে গেল।

দু'জনের কথা শোনা গেল।

একজন বলছে, "প্রাশিয়া যদি নিরপেক্ষ থাকে, তাহলে অস্ট্রীয়াও.. "

অপর জন বলল, "স্লাভরা যদি নেমে পড়ে তাহলে অস্ট্রীয়া কি করবে...আচ্ছা, তাকে ভিতরে আসতে বলো।"

এই ভূগর্ভস্থ ঘরের মধ্যে কোজেল্‌ৎসভ এর আগে কখনও ঢোকেনি। এর জাঁকজমক দেখে সে অবাক হয়ে গেল। মেঝেটা মোজাইক-করা, দরজা পর্দা দিয়ে সুরক্ষিত। ঘরে দুটো খাট দুই দেয়ালের পাশে পাতা; এক কোণে পবিত্র কুমারীর সোনালী ফ্রেমে-বাঁধানো একটা বড় দেবীমূর্তি ঝুলছে; তার সামনে গোলাপী কাঁচের একটি তেলের প্রদীপ জ্বলছে। বিছানায় সামরিক পোশাক পরিহিত অবস্থাতেই একজন নৌ-বিভাগীয় অফিসার ঘুমচ্ছে; অন্য দিকে টেবিলের উপর দুটো খোলা মদের বোতল সামনে নিয়ে বসে আছে নতুন রেজিমেন্ট কম্যান্ডার ও এড্‌-ডি-কং— তারাই কথা বলছিল। কোজেল্‌ৎসভ ভীরু নয়, সরকাবেব বিরুদ্ধে অথবা রেজিমেন্ট কম্যান্ডারের বিরুদ্ধে সে কখনও কোনও অন্যায় করেনি; তবু সে কাজে যোগ দিতে এসেছে শুনে কর্নেল এমন উদ্ধত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল যে কোজেল্‌ৎসভ ভয়ে কেঁপে উঠল। মুখের ভাব ও চোখের ভঙ্গিতে এড্‌-ডি-কং এমন ভাব দেখালো যেন সে বলতে চাইল : "আমি তোমাদের রেজিমেন্ট কম্যান্ডারের একজন বন্ধুমাত্র। তুমি তো আমার কাছে আসোনি, তাই তোমার কাছ থেকে কোনওরকম সম্মান আমি আশাও করি না, দাবীও করি না।" তার কম্যান্ডারের দিকে তাকিয়ে কোজেল্‌ৎসভ ভাবল, "আশ্চর্য, মাত্র সাত সপ্তাহ আগে সে এই রেজিমেন্টের ভার নিয়েছে, অথচ তার পোশাক, তার চাল-চলন, তার চাউনি সব কিছুর ভিতর দিয়েই ফুটে বেরুচ্ছে একজন রেজিমেন্ট কম্যান্ডারের ক্ষমতার দম্ভ, অথচ সে ক্ষমতা বযস,.চাকরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার, অথবা সামরিক দক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়. তার মূলে আছে তার সম্পদ। এটা কি খুব বেশি দিন আগেকার কথা যখন এই বাত্রিশ্‌চেভই আমাদের চারপাশে ঘুর্‌ঘুর্‌ করত, সপ্তাহের পর সপ্তাহ একটা ময়লা সুতীর শার্ট পরে কাটাত

আর কাউকে আর না ডেকে একা একাই একটার পর একটা চপ ও পুডিং গিলত? আর আজ! চওড়া-আস্তিনের সুতীর কোর্তার নিচ দিয়ে উঁকি দিচ্ছে একটা হল্যান্ড-শার্ট, দুই আঙুলের ফাঁকে দশ রুবল দামের সিগারেট, টেবিলে ছ' রুবল দামের 'লাফিতে' মদ—সিম্‌ফেরোপল-এর কোয়ার্টার মাস্টারের মারফৎ এ সবই কেনা হয়েছে অবিশ্বাস্য চড়া দামে—আর তার চোখে বিত্তশালী অভিজাতের সেই নিস্পৃহ উদ্ধত ভঙ্গি যার অর্থ : "যেহেতু আমি নব্য ধারার একজন রেজিমেন্ট কম্যান্ডার সেই হেতু আমি তোমার সহকর্মী বটে, কিন্তু একথা ভুলে যেয়ো না যে তোমার সম্বল তোমার মাসিক বেতনের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ষাট রুবল মাত্র, আর আমার হাত দিয়ে হাজার হাজার রুবল যাতায়াত করছে। বিশ্বাস করো, আমি জানি আমার জায়গায় পৌঁছতে তোমার অর্ধেকটা জীবন দিতেও তুমি প্রস্তুত আছো।"

কড়া দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে কর্নেল কোজেল্‌ৎসভকে বলল, "আপনার সেরে উঠতে দীর্ঘ দিন লেগে গেল।"

"আমি অসুস্থ ছিলাম কর্ণেল; এখনও আমার ঘা সম্পূর্ণ শুকোয়নি।"

অফিসারের সমর্থ চেহারার দিকে তাকিযে অবিশ্বাসের সুরে কর্নেল বলে উঠল, "তাহলে তো আপনার আসা উচিৎ হয়নি। আপনার কাজকর্ম সব ঠিক ঠিক করে উঠতে পারবেন তো?"

"নিশ্চয় পারব স্যার।"

"আচ্ছা, শুনে খুব খুশি হলাম স্যার। সেক্ষেত্রে দয়া করে পতাকাবাহী অফিসার জাইৎসেভ-এর কাছ থেকে ৯ নম্বর বাহিনীর দায়িত্ব বুঝে নিন; আগে তো আপনি ঐ বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। আদেশটা আপনি এখনই পেযে যাবেন।

"খুব ভাল স্যার।"

"আর যাবার সময় দয়া করে রেজিমেন্ট অ্যাডজুট্যান্টকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন", রেজিমেন্ট কম্যান্ডার কথাটা বলার সময় এমন ভাবে ঘাড়টা নাড়ল যাতে সে বুঝিয়ে দিলো যে তাদের সাক্ষাৎকার শেষ হয়ে গেছে।

ভূগর্ভস্থ ঘর থেকে বেরিয়ে কোজেল্‌ৎসভ নিজের মনেই বারকয়েক বিড় বিড় করে কি যেন বলল; যেন কোনও কারণে ব্যথা, অসুবিধা বা বিরক্তি বোধ হচ্ছে এমনিভাবে ঘাড়টাকে সোজা করতে লাগল; কিন্তু সে রেজিমেন্ট কম্যান্ডারের উপর বিরক্ত হয়নি (হবার কোনও কারণও ছিল না), সে বিরক্ত হয়েছিল নিজের উপর, চারদিককার সব কিছুর উপর। আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত সব সম্পর্কের মতোই শৃংখলাবোধ ও তৎসংশ্লিষ্ট আনুগত্য বোধও একমাত্র তখনই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে যখন অধীনস্থ লোকটি স্বীকার করে নেয় যে তার উপরওয়ালাবা অভিজ্ঞতায়, সামরিক দক্ষতায় অথবা কেবলমাত্র নৈতিক গুণাবলীতেও তার চাইতে বড়; কিন্তু যখনই সেই শৃংখলাবোধের ভিত্তি হয়ে ওঠে কোনও আকস্মিক ঘটনা বা অর্থনৈতিক

বিবেচনা, তখনই সে শৃংখলাবোধ হয় অত্যধিক ক্ষমতালিপ্সায় অথবা ঈর্ষা ও মর্মপীড়ায় পরিণতি লাভ করে; সকলকে একটি সূত্রে গেঁথে ঐক্যবদ্ধ করে তুলবার কল্যাণকর পরিণতির বদলে আমরা পাই ঠিক তার বিপরীৎ ফল। যে লোক মনে মনে জানে যে নিজস্ব গুণের দ্বারা সে অধীনস্থ লোকদের মধ্যে আকর্ষণ করতে পারবে না। সেই অধীনস্থ লোকদের ঘনিষ্ঠতাকে ভয় করবে এবং সমালোচনাকে এড়াবার জন্য একটা আরোপিত গুরুত্বের ভান করবে। আর অধীনস্থ লোকরাও তার বাইরের অপ্রীতিকর চেহারাটাকেই শুধু দেখতে পেয়ে ধরে নেবে—যদিও অনেক ক্ষেত্রেই সেটা অন্যায়—যে তার কাছ থেকে ভাল কিছু পাবার কোনও আশাই নেই।

১৬

সহকর্মী অফিসারদের সঙ্গে মিলিত হবার আগেই কোজেল্‌ৎসভ তার কোম্পানির সৈন্যদের সঙ্গে দেখা করতে ও সেটা ঠিক কোথায় আছে তাও জেনে নিতে চলে গেল। মাটি-ভর্তি ঝুড়ি দিয়ে তৈরি প্রাচীর, ট্রেঞ্চের সারি পথের দু'পাশের কামান, এমন কি যে সমস্ত গোলা ও বোমার টুকরোতে তার পায়ে ঠোক্কর লাগছে—সে সব কিছুই তার কাছে সম্পূর্ণ পরিচিত। সে সব কিছুই তিন মাস আগে তার স্মৃতির পাতায় অগ্নির অক্ষরে লেখা হয়ে আছে—যখন একটানা দুই সপ্তাহ সে এই দুর্গেই কাটিয়েছিল। যদিও সে সব স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক আতংক তবু সেই দিনগুলির মাধুর্য যেন তারা নতুন করে ফিরিয়ে আনল; পরিচিত স্থান ও পরিচিত বস্তুগুলোকে দেখে তার ভাল লাগল; যেন সেই দুটি বিগত সপ্তাহকে সে সত্যি উপভোগ করেছিল। ৬ নম্বর দুর্গের রক্ষা-প্রাকার বরাবরই তার বাহিনীটিকে মোতায়েন করা হয়েছে।

কোজেল্‌ৎসভ একটা লম্বা একমুখ সুরঙ্গের মধ্যে ঢুকল: ঢুকবার দিকটা সম্পূর্ণ খোলা: তাকে বলা হয়েছে যে ৯ নম্বর কোম্পানিটাকে সেখানেই থাকতে দেওয়া হয়েছে। জায়গাটায় এত বেশি ভিড় যে একটা পা ফেলবারও জায়গা নেই। একপাশে মেঝের উপর শুয়ে পড়ে একটি সৈনিক একটা বাঁকা মোমবাতি ধরে আছে। আর একটি সৈনিক তার খুব কাছে একটা বই নিয়ে প্রতিটি শব্দ ধরে ধরে সেটা পড়ছে। সেই দুর্গন্ধময় আধা-অন্ধকার সুরঙ্গের মধ্যেও দেখা গেল, অনেকগুলি মাথা একান্ত আগ্রহের সঙ্গে পাঠকের পড়া শুনছে। একটা প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক। সুরঙ্গের ভিতর ঢুকতে ঢুকতেই কোজেল্‌ৎসভ শুনতে পেল :

"মৃত্যুর...ভয়...মানুষের...সহ-জাত...অনুভূতি।"

একজন বলে উঠল, "মোমবাতিটা উস্কে দাও। বইটা বড় ভাল।"

"আমার...ঈশ্বর..." পাঠক পড়েই চলেছে।

কোজেল্‌ৎসভ যখন সার্জেন্ট-মেজরের খোঁজ করল তখন পাঠক থেমে গেল;

সৈনিকরা নড়েচড়ে বসল; কেউ কাশল, কেউ বা নাক ঝাড়তে লাগল; অনেকক্ষণ একটানা চুপচাপ থাকার পরে লোকে যে রকম করে থাকে। যে দলটা পাঠককে ঘিরে শুয়ে ছিল তাদের ভিতর থেকেই সার্জেন্ট-মেজর কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে উঠে দাঁড়াল; কিছু লোকের পা ডিঙিয়ে এবং যেখানে পা রাখবার জায়গা পেল না সেখানে পা মাড়িয়ে সে অফিসারের দিকে এগিয়ে গেল।

"কেমন আছ ভায়া? এই কি আমাদের পুরো কোম্পানি?"

কোজেল্‌ৎসভ-এর দিকে খুসির চোখে তাকিয়ে সার্জেন্ট-মেজর জবাব দিলো, "আসুন হুজুর, আপনার মঙ্গল কামনা করি। হুজুর এখন ভাল আছেন তো? আচ্ছা, সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আপনি না থাকায় ভাল লাগছিল না।"

বোঝা গেল, সৈন্যরা কোজেল্‌ৎসভকে পছন্দ করে।

সুরঙ্গের মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত অনেক রকম কথা শোনা গেল : "আমাদের পুরনো কম্যান্ডার ফিরে এসেছেন; যিনি আহত হয়েছিলেন; কোজেল্‌ৎসভ, মিখাইল সেম্‌য়োনিচ," ইত্যাদি। অনেকে সাহস করে তার কাছেই এগিয়ে এল। ভেরীবাদক তো তাকে স্বাগতই জানিয়ে ফেলল।

"হেলো ওবানচুক!" কোজেল্‌ৎসভ বলল, "এখনও বেঁচে আছো, আব হেঁটে বেড়াচ্ছ? এই যে, তোমাদের সবাইকে বলছি হে বাছারা!"

"আপনার মঙ্গল কামনা করি!" পুরো সুরঙ্গটা গম-গম করে উঠল।

"কেমন আছ তোমরা?"

"খারাপ হুজুর। ফরাসীরা আমাদের কাহিল করে তুলেছে। তাদের ট্রেঞ্চের পিছন থেকে আমাদের তাক করছে—কিন্তু খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসবার সাহস নেই।"

"ঠিক আছে। হয়তো আমি তোমাদের জন্য সৌভাগ্য নিয়ে এসেছি; ঈশ্বব করুন, ওরা যেন খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসে!" কোজেল্‌ৎসভ বলল। "এই তো প্রথম ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করছি না। আর একবার ইস্পাতের ঠাণ্ডা ছোঁয়াটা ভাল করে বুঝিয়ে দেব।"

কয়েকজন এক সঙ্গে বলে উঠল, "আমরা সাধ্যমতো কাজ করব হুজুর!"

"উনি খুব সাহসী, আমাদের এই হুজুর, খুব সাহসী মানুষ", ভেরীবাদক নিচু গলায় এমনভাবে বলল যাতে অন্যরা শুনতে পায়।

সৈনিকদের ছেড়ে এবার কোজেল্‌ৎসভ প্রতিরক্ষা ব্যারাকের দিকে চলল; সেখানেই সহকর্মী অফিসারদের বাসাবাড়ি।

১৭

প্রকাণ্ড ব্যারাক-ঘরটাতে নৌ, গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনীর অফিসারদের ভিড়। কেউ ঘুমিয়ে আছে, কেউ বা বাক্স ও কামানের গাড়ির উপর বসে গল্প করছে,

আর বাকি সব চাইতে হুল্লোড়বাজ দলটা মেঝেতে "বাঁকা" বিছিয়ে বীয়ার খাচ্ছে আর তাস খেলছে।

"আরে! এই যে কোজেল্‌ৎসভ! তুমি ফিরে আসায় খুব খুশি হয়েছি! কী ভাল ছেলে! ঘাটা কেমন আছে?" চারিদিক থেকে প্রশ্ন শুরু হয়ে গেল। পরিষ্কার বোঝা গেল যে এখানেও সকলে তাকে পছন্দ করে এবং সে ফিরে আসায় সকলেই খুসি হয়েছে।

পরিচিত জনদের সঙ্গে কর-মর্দন সেরে কোজেল্‌ৎসভ তাস খেলায় ব্যস্ত হল্লাবাজ অফিসারদের দলে গিয়ে ভিড়ল। তাদের বেশির ভাগই তার সহকর্মী ছিল। একটি একহারা চেহারার সুদর্শন লোক তাস বেঁটে দিচ্ছিল; তার নাকটা লম্বা ও টিকলো, ঝাকরা গোঁফ ও জুলফি, আঙুলে মস্ত বড় একটা সোনার আংটি। সে খুব অযত্নে তাড়াতাড়ি তাস বেঁটে চলেছে; মনে হচ্ছে কোনও কিছু নিয়ে সে চিন্তিত, কিন্তু এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন সেটা কিছুই না। তার ডান পাশে একজন পাকা-চুল মেজর কনুইতে ভর দিয়ে কাৎ হয়ে শুয়ে আছে; ইতিমধ্যেই প্রচুর মদ পেটে পড়েছে; চেষ্টা করে বাইরে শান্ত ভাব বজায় রেখে সে আধ রুবল বাজি ধরে খেলছে। বাঁদিকে একজন লাল-মাথা অফিসাব ঘর্মাক্ত মুখে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, আর যেই তার তাসটা হেরে যাচ্ছে তখনই হাসছে আর তামাসা করছে। এক হস্ত দিয়ে পাঁৎলুনের শুনা পকেট হতড়াচ্ছে আর বড় বড় বাজি ধরে খেলছে, তবে নগদ দিয়ে নয়। একজন সরু চেহারার টাক-মাথা, ফ্যাঁকাসে মুখ ও পরিষ্কার কামানো অফিসার এক গাদা নোট হাতে নিয়ে ঘরময় পায়চারি করছে আর মাঝে মাঝেই "ভা বাকু" খেলছে এবং জিতছে।

কোজেল্‌ৎসভ এক পাত্র ভদ্‌কা খেয়ে খেলুড়েদের পাশে বসে পড়ল।

ব্যাংকার তাকে ডেকে বলল, "এক হাত খেলবে নাকি মিখাইল সেম্‌য়োনিচ? তুমি তো নির্ঘাৎ টাকার গাদা নিয়ে এসেছ, কি বলো?"

"টাকা কোথায় পাবো? বরং শহরে আমার শেষ রুবলটি পর্যন্ত খরচ করে এসেছি।"

"তা কি করে হবে? সিম্‌ফেরোপল-এ তুমি নিশ্চয় কাউকে পথে বসিয়ে এসেছ?"

"মোটেই না; বিশ্বাস করো", কোজেল্‌ৎসভ জবাব দিলো; তবু কোটের বোতাম খুলে নোংরা তাসগুলি হাতে নিল।

"চেষ্টা করে দেখি। শয়তান যে কী চাল চালবে তা তোমরা জানতেও পারবে না! কি জানো, অনেক সময় একটা মশাও খেল্ দেখাতে পারে! অবশ্য মনটাকে তাজা করবার জন্য একপাত্র পেলে ভাল হতো।"

অচিরেই তিন গ্লাস ভদ্‌কা ও আরও কয়েক বোতল বীয়ার উড়িয়ে দেবার পরে

সেও দলের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গেল, অর্থাৎ ঢুলুঢুলু চোখে সব কিছু ভুলে গেল আর শেষ তিনটি রুবল হারাবার উপক্রম হলো।

ছোটখাট ঘর্মাক্ত অফিসারটি তখন ১৫০ রুবল হারছে।

"কপালই খারাপ", বলে সে আর একটা তাসের জন্য হাত বাড়াল।

ঘর্মাক্ত অফিসারটির দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ব্যাংকার বলল, "সব টাকা পাঠাতে ভুলো না যেন।"

উঠে দাঁড়িয়ে কম্পিত হাতে শূন্য পকেটে হাত ঢুকিয়ে অফিসারটি বলল, "কাল পাঠাবার অনুমতিটা দাও।"

ডাইনে-বাঁয়ে তাস বেঁটে দিতে দিতে ব্যাংকার রেগে বলল, "হুম্!" তারপর হাতের তাস ফেলে দিয়ে বলল, "না! তা হবে না! আমি খেলা বন্ধ করলাম! এটা ঠিক নয় জাখার আইভানিচ। আমরা নগদে খেলছি, খাতাপত্রে নয়।"

"কী। সন্দেহ করছ যে আমি টাকা দেব না? আশ্চর্য!"

"আমার টাকাটা কোথায়?" মেজর বিড় বিড় করে বলল। এতক্ষণে সে একেবারে পাড় মাতাল। জিতেছে আশী রুবল। "আমি দিলাম বিশ রুবলের বেশি। কিন্তু যখন জিতলাম তখন কিছুই পেলাম না।"

ব্যাংকার প্রতিবাদ করে বলল, "বোর্ডের উপর টাকা না থাকলে খেলবে কেমন করে?"

মেঝে থেকে উঠে মেজর বলল, "তার আমি কি জানি! আমি খেলছি তোমাদের সঙ্গে, সৎ লোকদের সঙ্গে, তার সঙ্গে নয়।"

ঘর্মাক্ত অফিসাবটি হঠাৎ রেগে আগুন হয়ে উঠল।

"আমি বলেছি কাল টাকা দেব। তোমার এত সাহস যে এত উদ্ধতভাবে কথা বলো?"

"আমার যা খুশি বলব! আমি শুধু বলেছি সৎ লোকরা এ বকম কাজ করে না। বাস, শুধু এই তো বলেছি!" মেজর চিৎকার করে বলল।

মেজবকে থামাতে সকলে চেঁচিয়ে বলল, "খুব হয়েছে ফিয়দব ফিয়দরিচ! এ আলোচনা বাদ দাও!"

অবশ্য দেখে মনে হলো মেজর যেন সকলের অনুরোধের জন্যই অপেক্ষা করে ছিল কখন রাগে ফেটে পড়বে। সে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে টলতে টলতে ঘর্মাক্ত অফিসারের দিকে এগিয়ে গেল।

"উদ্ধত আমি? এখানে কে প্রবীণ? তুমি না আমি? আমি জারের সেবা করছি বিশ বছর ধরে। উদ্ধত? তুমি তো অকালকুষ্মাণ্ড!" যত তার গলা চড়ে ততই সে বেশি উত্তেজিত হয়ে ওঠে। "জঘন্য!"

কিন্তু এ দৃশ্যের উপর এখানেই যবনিকা টানা যাক। আগামীকাল, অথবা আজ

রাতেই, এখানকার প্রত্যেকটি লোক সানন্দে সগর্বে মৃত্যুর পথে যাত্রা করবে; দৃঢ়চিত্তে শান্তভাবে মৃত্যুকে বরণ করবে; যে অমানবিক আশাহীন পরিবেশ একান্ত ঠাণ্ডা মাথার কল্পনাকেও আতংকিত করে তোলে তার মধ্যে বসে জীবনে একটিমাত্র সান্ত্বনাই থাকে : সে সান্ত্বনা বিস্মৃতি, চৈতন্যের অবলুপ্তি। প্রতিটি মানুষের অন্তরের গভীরে আছে সেই মহৎ অগ্নিকণা যা তাকে নায়ক করে তোলে; কিন্তু সে অগ্নিকণা তো সব সময় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে না—মানসিক অবস্থার একটা বিশেষ মুহূর্তে সেই অগ্নিকণা পরিপূর্ণ শিখায় দীপ্যমান হয়ে গৌরবময় কর্মে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

১৮

পরদিন বোমাবর্ষণ আগের মতো তেজেই চলতে লাগল। সকাল এগারোটা নাগাদ ভলোদিয়া কোজেল্‌ৎসভ একদল গোলন্দাজ অফিসারের সঙ্গে বসেছিল; ততক্ষণে সকলের সঙ্গে মোটামুটি পরচিয় ঘটায় নতুন লোকদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল, নানা রকম প্রশ্ন করছিল, আর নিজের অভিজ্ঞতার কথা তাদের বলছিল। গোলন্দাজ অফিসারদের সরল কথাবার্তা তার ভাল লাগল; তারা কিছুটা বৈজ্ঞানিক চিন্তার লোক হওয়ায় তাদের প্রতি তার শ্রদ্ধা হলো। অপর দিকে, এই লাজুক, নির্দোষ, সৌম্যদর্শন পতাকাবাহী অফিসারটিকে তাদেরও বেশ ভাল লাগল। গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান অফিসার জনৈক লাল চুল ও ঝুলফিওয়ালা ক্যাপ্টেন গোলন্দাজ বাহিনীর প্রাচীন রীতিতে শিক্ষা নিয়ে এসেছে; সে লোকটি রমণীমোহন, আর তার পাণ্ডিত্যেরও সুখ্যাতি আছে; সে গোলন্দাজ যুদ্ধের জ্ঞান ও আধুনিক আবিষ্কার সম্পর্কে ভলোদিয়ার জ্ঞান পরীক্ষা করে দেখল, তার তারুণ্য ও সুন্দর মুখ নিয়ে কিছু হাসি-তামাসা করল, তার সঙ্গে বাবার মতো ব্যবহার করল; তাতে ভলোদিয়াও খুব খুশি হলো। সাব-লেফ্‌টেন্যান্ট দিয়াদেংকো একজন তরুণ অফিসার; পরনে ছেঁড়া কোট, মাথায় উস্কোখুস্কো চুল, এক নাগাড়ে জোর গলায় কথা বলে, সুযোগ পেলেই কারণে-অকারণে তর্ক জুড়ে দেয়, অঙ্গভঙ্গি করে; তবু তাকেও ভলোদিয়ার ভাল লাগল, কারণ লোকটির বাইরের কর্কশ চেহারার অন্তরালে তার সততা ও দয়াপ্রবণতা ভলদিয়ার দৃষ্টি এড়াল না। দিয়াদেংকো নানা কাজে ভলোদিয়াকে সাহায্য করতে চাইল এবং সারাক্ষণই প্রমাণ করতে চেষ্টা করল যে সেবাস্তোপল-এর সবগুলি কামানই নিয়মবিরুদ্ধভাবে বসানো হয়েছে। দলের মধ্যে একমাত্র লেফ্‌টেন্যান্ট চার্গোভিৎস্কিকেই ভলোদিয়ার ভাল লাগল না। তার ভুরু দুটো সব সময়েই উপরে উঠে থাকে; একটা পুরনো কোটকে পরিপাটি করে পরেছে, সাটিনের কুর্তায় একটা সোনার চেন ঝুলছে। অথচ সে কিন্তু ভলোদিয়ার সঙ্গে অন্য সকলের চাইতে ভদ্র ব্যবহারই করেছে। সে বার বার প্রশ্ন করল, সম্রাট ও সমর-সচিব কি করছেন; সেবাস্তোপল-এর নানা রকম বীরত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করে সেই সব লোকের

দেশপ্রেমকে ছোট করে দেখালো; অনেক আদেশই নাকি অবিজ্ঞজনের মতো জারি করা হয়েছে, ইত্যাদি; সাধারণভাবে যথেষ্ট শিক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি ও মহৎ অনুভূতির পরিচয় রাখলেও যে কারণেই হোক ভলোদিয়ার মনে হলো এ সবই কেমন যেন বানানো ও অস্বাভাবিক। তাছাড়া, সে লক্ষ্য করল যে অন্য অফিসাররা কেউই চার্গোভিৎস্কির সঙ্গে বড় একটা কথাবার্তা বলে না। যে শিক্ষার্থী ভ্লাঙ্গ্‌কে সে গত রাতে বিছানা থেকে তাড়িয়েছিল সেও সেখানে হাজির ছিল। কোনও আলোচনায় যোগ না দিয়ে সে চুপচাপ এক কোণে বসেছিল, হাসির কথা হলেই হো হো করে হাসছিল, আর সব অফিসারদের জন্য ভদকার অর্ডার দিয়ে সিগারেট পাকিয়ে যাচ্ছিল। বিনয় ও সৌজন্যবশতঃ ভলোদিয়া তার সঙ্গে অফিসারের মতোই ব্যবহার করেছে, ছেলেমানুষ ভেবে তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেনি; তার সুন্দর চাউনি ভ্লাঙ্গ্‌কে মোহিত করেছে—যে কারণেই হোক ভ্লাঙ্গ্‌-এর নামের সঙ্গে স্ত্রীলিঙ্গবাচক একটা আকার যোগ করে সকলে তাকে ভ্লাঙ্গা বলেই ডাকে; আসল কথা হলো, নতুন অফিসারের মুখের উপর থেকে সে তার বড় বড় শান্ত বোকা-বোকা চোখ দুটিকে কিছুতেই সরিয়ে নিতে পারছিল না; তার মনের সব প্রত্যাশা যেন সেখানেই কেন্দ্রীভূত; সারাটা সময়ই মনে হচ্ছে, তার মনে বুঝি ভালবাসার জোয়ার লেগেছে; সেটা অফিসারদেরও নজর এড়ায়নি; এ নিয়ে তারা হাসি-ঠাট্টাও করেছে।

দুপুরের খাবারের ঠিক আগে লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেন দুর্গ থেকে এসে সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হলো। লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেন ক্রাউৎ একজন সুদর্শন ও ফূর্তিবাজ অফিসার; বড় লাল গোঁফ ও জুলফি;.সুন্দর রুশ ভাষা বলে; তবে একজন রুশ নাগরিকের পক্ষে কথাগুলো বড় বেশি কেতাবী, অলংকারবহুল। কি চাকরিক্ষেত্রে, কি ব্যক্তিগত জীবনে, তার চালচলন ঠিক তার রুশ ভাষার মতোই নির্ভুল : কাজকর্ম করে সুষ্ঠুভাবে, সহকর্মী হিসাবে ভাল, আর আর্থিক ব্যাপারে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য; কিন্তু সব ব্যাপারে এত ভাল বলেই সাধারণ সরল মানুষ হিসাবে তার কিছু ত্রুটি আছে। সব রুশীয় ও জার্মানের মতই সে অতিমাত্রায় বাস্তববোধসম্পন্ন, যদিও আদর্শ জার্মানরা মোটেই সে রকম হয় না।

হাত দোলাতে দোলাতে ক্রাউৎ ঘরে ঢুকতেই ক্যাপ্টেন সোল্লাসে বলে উঠল, "এই যে আমাদের নায়ক এসে গেছে। তুমি কি খাবে ফ্রীড্‌রিচ ক্রেস্তিয়ানিচ—চা না, ভদ্‌কা?"

সে জবাব দিলো, "আমি চায়ের হুকুম দিয়েছি, তবে ইতিমধ্যে এক ফোঁটা ভদ্‌কায় গলাটা ভিজিয়ে নিলে মন্দ হয় না। আশা করি আমরা দু'জন বন্ধু হয়ে উঠব, ভলোদিয়া দাঁড়িয়ে তাকে অভিবাদন করায় সে তাকে সম্বোধন করেই শেষের কথাটা বলল : "লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেন ক্রাউৎ। সার্জেন্ট-মেজর দুর্গেই আমাকে বলেছেন যে আপনি গতকাল এখানে পৌচেছেন।"

"হ্যাঁ, আর আপনার বিছানাটার জন্য ধন্যবাদ জানাই : গত রাতে আপনার বিছানাতেই আমি ঘুমিয়েছিলাম।"

"আশা করি আরামেই কাটিয়েছেন। একটা পায়া ভাঙা, কিন্তু দেখবার কেউ নেই—জানেনই তো এখন অবরোধের অবস্থা চলছে—একটা ঠেকা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।"

দিয়াদেংকো শুধালো, "আচ্ছা, রাতে বেশ ভালই ছিলে তো?"

"খুব খারাপ নয়, শুধু স্ক্ভর্ৎসব আহত হয়েছে, আর একটা কামানের গাড়ি ভেঙে একেবারে ছাতু হয়ে গেছে!"

সে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল; বিপদের হাত থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসা লোকের মতো খুশি তার মনে।

ক্যাপ্টেনের হাঁটুটা নেড়ে সে বলল, "আচ্ছা দিমিত্রি গ্যাব্রিলিক, আপনার ভাই কেমন আছে? আপনার সুপারিশের কোনও খবর এখনও পাননি?"

"না, পাইনি।"

"পাবেনও না", দিয়াদেংকো ফস্ করে বলে উঠল। "আমি বলছি পাবেন না।"

"কেন পাবো না?"

"কারণ চিঠিটা যথাযথ ভাষায় লেখা হয়নি।"

ক্রাউৎ খুশির হাসি হেসে বলল, "আরে শব্দদিগ্গজ! তুমি একটি আসল গোড়া ইউক্রেনীয় মানুষ। যতই যা বলি, তুমি লেফ্টেন্যান্টের পদ পাবেই।"

"না, পাব না।"

"আঃ, ভ্লাঙ্গ্! আমার পাইপটা এনে ভরে দাও তো। শিক্ষার্থীটিকে বলতেই সে সাগ্রহে উঠে গেল আদেশ পালন করতে।

বোমাবর্ষণের বিবরণ শুনিয়ে আর তার অনুপস্থিতিতে যা কিছু ঘটেছে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করে ক্রাউৎ আড্ডাটা বেশ জমিয়ে তুলল। সকলকেই সে কিছু না কিছু বলল।

১৯

"আচ্ছা, আপনি এখানে এসে জুটলেন কেমন করে?" ক্রাউৎ ভলোদিয়াকে জিজ্ঞাসা করল। "মাফ করবেন, আপনার নাম ও পদবিটা কি? কি জানেন, এটাই এখানকার রীতি। একটা ঘোড়া পেয়েছেন কি?"

ভলোদিয়া বলল, "না, আর কি যে করতে হবে তাও জানি না। ক্যাপ্টেনকে বলেছি, আমার ঘোড়া নেই, আর রাহা খরচ না পাওয়া পর্যন্ত হাতে কোনও টাকাও নেই। কামান-ঘাঁটির কম্যান্ডারকে একটা ঘোড়া ধার দিতে বলব ভেবেছি, কিন্তু আমার ভয় হয় তিনি তো আমার কথা রাখবেন না।"

"কে, এপোলন সের্গিচ?"—ঠোঁট দিয়ে সন্দেহসূচক একটা শব্দ করে সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল। "আমারও সন্দেহ আছে!"

ক্যাপ্টেন বলল, "নাই বা রাখলেন, তাতে কি। সত্যি, ঘোড়ার কোনও প্রয়োজন আপনার নেই। কিন্তু চেষ্টা করতে ক্ষতি নেই। আমিও আজ তাকে বলব।"

বাধা দিলো দিয়াদেংকো, "কি আপনি তাকে চেনেন না। তিনি সব কিছুতে আপত্তি করতে পাবেন, কিন্তু এ ব্যাপারে নয়।..বাজি আসুন।"

"আহা, তুমি তো সব ব্যাপারেই তর্ক করতে চাও।"

"যা জানি তাই নিয়েই আমি তর্ক করি! আর সব ব্যাপারেই তিনি কঞ্জুস, কিন্তু ঘোড়া ধার চাইলেই তিনি দেবেন, কারণ এতে তিনি টাকা পাবেন।"

ক্রাউৎ বলল, "আরে, যইয়ের জন্যই তাকে যখন আট রুবল খরচ করতে হয় তখন এতে সে টাকা পাবে বলার মানেটা কি? বরং একটা বাড়তি ঘোড়া না রাখলেই তার লাভ?"

ক্রাউতের পাইপটা নিয়ে ফিরে এসে ভ্লাঙ্গ্ ভলোদিয়াকে বলল, "ভ্লাদিমির সেম্য়োনিচ, তার কাছে 'স্কর্ভরৎস্' ঘোড়াটা চাইবেন। খুব ভাল ঘোড়া।"

লেফ্টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেন মুচকি হেসে বলল, "সবোকি-তে যেটাকে নিয়ে তুমি খানায় পড়েছিলে, কি বলো ভ্লাঙ্গা?"

দিয়াদেংকো তবু বলল, "তিনি তো সাড়ে দশ রুবলেব রসিদ দেন। তাহলে যইয়ের দরুন তার আট কবল খরচ হয় বলছেন কেন? অবশ্য, তাতেও লাভ থাকে!"

"কিছুটা লাভ তো দিতেই হবে। আপনি কম্যান্ডাব হলে কি শহরে যাবার জন্য মানুষকে একটা ঘোড়া দিতেন না?"

"আরে বাবা, আমি কম্যান্ডার হলে আমার ঘোড়াগুলো প্রত্যেকে চার বস্তা করে যই পাবে; কিছু ভাববেন না, আমি মুনাফা লুটব না।"

লেপ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেন বলল, "দেখা যাবে! কিছু তো পকেটে যাবেই আর উনি যখন কম্যান্ডার হবেন তখন ওর পকেটেও কিছু যাবে," ভলোদিয়াকে দেখিয়ে সে কথা শেষ করল।

চার্নোভিৎস্কি বাধা দিয়ে বলল, "কিন্তু ফ্রীড্‌রিচ ক্রেস্তিয়ানিচ, তুমি কেন ভাবছ যে সেও দু'পয়সা কামাবে? হয়তো সে ধনীলোক; সেক্ষেত্রে সে টাকা জমাতে চাইবে কেন?"

ভলোদিয়ার চুলের গোড়া পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল। সে বলল, "না স্যার, আমি...আমি মনে করি এটা অসৎ কাজ।"

"ওঃ, নির্দোষ মেষশাবক!" ক্রাউৎ বলল। "ক্যাপ্টেন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তখন আর এসব কথা মুখে আসবে না।"

"তাতে কোনও তফাৎ হচ্ছে না। আমি শুধু বুঝি, যে টাকা আমার নয় তাতে আমার কোনও অধিকার নেই।"

লেফ্টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেন গম্ভীর গলায় বলতে লাগল, "একটা কথা তোমাকে

বলতে চাই যুবক। যখন একটা কামান-ঘাঁটির ভার হাতে পাবে তখন ভালভাবে চালাতে পারলে শান্তির সময় তোমার হাতে আসবে উদ্বৃত্ত পাঁচশ' রুবল—আর যুদ্ধের সময় সেটা বেড়ে দাঁড়াবে সাত বা আট হাজারের কম নয়—আর এর সবটাই আসবে শুধু ঘোড়ার দরুন। ঠিক আছে। সৈনিকদের খাদ্যবস্তুর সঙ্গে কামান-ঘাঁটির কম্যান্ডারের কোনও সম্পর্ক নেই; গোলন্দাজ বাহিনীতে স্মরণাতীত কাল থেকে এই ব্যবস্থাই চলে আসছে; আর তুমি যদি ভালভাবে চালাতে না পারো, তাহলে তোমার হাতে কিছুই বাড়তি থাকবে না। এবার দেখো : ঘোড়ার পায়ে নাল লাগানোর জন্য তোমাকে পকেট থেকে খরচ করতে হবে—এই হলো এক (সে একটা আঙুল বাঁকালো), খরচ করতে হবে ওষুধপত্রের জন্য—দুই (আর একটা আঙুল বাঁকালো), মণিহারী জিনিসের জন্য—তিন সৈনিকদের কলার পাল্টে দিতে হবে—সেও তোমার পকেট থেকে—যতটা ভেবেছিলে কয়লার জন্য তার চাইতে বেশি দিতে হবে, তারপরে আছে অফিসারদের মেস। কামান-ঘাঁটির কম্যান্ডার হবার ফলে তোমাকে যথাযথভাবে থাকতে হবে : একটা গাড়ি চাই, লোমের কোট চাই, আরও এটা-ওটা ডজনখানেক জিনিস চাই।...কাজেই কথা বলে লাভ কি?"

ক্যাপ্টেন এতক্ষণ চুপ করেই ছিল; এবার সে কথা বলল, "আর এটাই হলো আসল কথা ভ্লাদিমির সেম্‌য়োনিচ। আমার মতো লোকের কথাই ধরো না কেন; আজ বিশ বছর চাকরি করছি দু'শ' রুবল মাইনেতে; সব সময়ই টানাটানি। তাহলে কন্ট্রাক্টররা যেখানে ফি সপ্তাহে লাখ লাখ কামাচ্ছে, সেখানে বুড়ো বয়সের জন্য এক টুকরো রুটির ব্যবস্থা করতে কিছু সরিয়ে রাখার অধিকার কি সে লোকের নেই?"

লেফ্‌টেন্যান্ট-ক্যাপ্টেন আবার বলল, "তর্ক করে কোনও লাভ নেই। অত তাড়াতাড়ি কোনও কিছু বিচার করতে নেই। চাকরির স্বাদ কিছুটা হোক তারপর বোঝা যাবে।"

না ভেবেচিন্তে কথা বলার জন্য ভলোদিয়া ভীষণ লজ্জিত ও বিব্রত বোধ করল; বিড় বিড় করে কি যেন বলে সে নীরবে দিয়াদেংকোর কথাই শুনতে লাগল; তখন দিয়াদেংকো উল্টো কথাটা প্রমাণ করার জন্য জোর তর্ক শুরু করে দিয়েছে।

কর্নেলের আর্দালি এসে জানালো, খাবার দেওয়া হয়েছে। তখন তর্কে বাধা পড়ল।

কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে চার্নোভিৎস্কি ক্যাপ্টেনকে বলল, "এপোলন সর্গিচকে আজ টেবিলে এক বোতল মদ দিতে বলুন। কিসের জন্য সব জমিয়ে রাখছে? আমরা মরে গেলে কেউ তো খেতে আসবে না!"

"নিজেই গিয়ে বলুন", ক্যাপ্টেন পাল্টা জবাব দিলো।

"না, আপনি উপরওয়ালা অফিসার : সব ব্যাপারেই নিয়ম মেনে চলা উচিত।"

২০

আগের দিন যে ঘরে কর্নেল ভলোদিয়ার সঙ্গে দেখা করেছিল সেই ঘরেই

টেবিলটাকে দেয়াল থেকে সরিয়ে এনে তার উপর একটা নোংরা চাদর পেতে দেওয়া হয়েছে। এখন কম্যান্ডার তার সঙ্গে কর-মর্দন করে পিতার্সবুর্গ ও তার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করল।

"দেখুন ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের মধ্যে যারা ভদ্‌কা খান—দয়া করে নিজেরাই ঢেলে নিন।" ভলোদিয়ার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে আবাব বলল, "পতাকাবাহীরা তো পান করেন না।"

কম্যান্ডার আজ কিন্তু গতকালের মতো নীরস ও কাঠখোট্টা নেই; বরং একজন উর্ধ্বতন অফিসারের মতোই সদয় ও আতিথেয়তাপূর্ণ ব্যবহার করল। তথাপি বয়স্ক ক্যাপ্টেন থেকে শুরু করে তার্কিক দিয়াদেংকো পর্যন্ত সকল অফিসারই এমন অনুগতভাবে কম্যান্ডারের দিকে তাকাতে লাগল ও কথা বলল, এত বেশি দেয়াল ঘেঁসে একের পর এক ভদ্‌কা আনতে গেল যে তাতেই বোঝা গেল, তারা কম্যান্ডারকে যথেষ্ট ভয়েব চোখেই দেখে।

লাঞ্চে দেওয়া হলো বড় এক বাটি কপিব ঝোল, তাতে চর্বিযুক্ত গোমাংসের টুকরো আর প্রচুর পরিমাণে লংকা ও লরেল পাতা ভাসছে: পোলিশ "ব্রাজি" ও পচা মাখন লাগানো "কল্‌দুনি"। তোয়ালে নেই, চামচেগুলো কাঠ বা টিনের তৈরি. গ্লাস মাত্র দুটো, আর টেবিলের একটিমাত্র বোতল জলে ভর্তি সরু-গলা ধূসর কাঁচেব একটি ডিকেন্টার। তাই বলে খাওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই একঘেয়ে হলো না; আলোচনাটা মুহূর্তের জন্যও ঝিমিয়ে পড়ল না। প্রথমে ইংকারম্যান-এর যুদ্ধ নিয়ে কথা হলো। তারপব হাল্কা কামান নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল। কিন্তু কার কি কর্তব্য সে বিষয়ে কেউ কোনও কথা বলল না দেখে ভলোদিয়া বিস্মিত ও হতাশ হলো। এই সব দেখে-শুনে যে কেউ ভাবতে পারে যে হাল্কা কামান নিয়ে আলোচনা করা ও কম্যান্ডারের সঙ্গে লাঞ্চ খাওয়াটাই সেবাস্তোপল-এ আসার একমাত্র উদ্দেশ্য। খেতে খেতেই বাড়ির কাছে একটা গোলা ফাটল। মেঝে ও দেয়াল ভূমিকম্পের মতো কেঁপে উঠল; জানালার সামনে বারুদের ধোঁয়া মেঘের মতো কুণ্ডুলি পাকিয়ে উঠতে লাগল।

কম্যান্ডাব বলল, "সেন্ট পিতার্সবুর্গ-এ নিশ্চয়ই আপনারা এ রকমটা দেখতে পান না; কিন্তু এখানে এ রকম চমকে-দেওয়া ঘটনা আমবা প্রায়ই দেখতে পাই। ভ্লাঙ্গ্‌! দেখো তো, কোথায় ফাটল!"

ভ্লাঙ্গ্‌ বাইরে ঘুবে এসে জানালো, গোলাটা স্কোয়ারের মধ্যে ফেটেছে। সে বিষয়ে আর কেউ কোনও রকম উচ্চবাচ্য করল না।

লাঞ্চ শেষ হবার ঠিক আগে একটি বুড়ো মানুষ—কামান-ঘাঁটির করণিক তিনখানা সিল-করা খাম নিয়ে ঘরে ঢুকে কম্যান্ডারের হাতে দিলো। 'এখানা খুব জরুরী; একজন কসাক এটা নিয়ে এসেছে গোলন্দাজ বিভাগের প্রধানের কাছ

থেকে।" অফিসাররা সকলেই উৎকণ্ঠিত প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে রইল কিন্তু কম্যান্ডার দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ দক্ষতার সঙ্গে সিল ভেঙে "খুব জরুরী" দলিলটা বের করল। "এটা কি হতে পারে" সকলেই ভাবতে লাগল। এক হতে পারে, সেবাস্তোপল থেকে সরে যাবার নির্দেশ; আর হতে পারে, পুরো গোলন্দাজ বাহিনীটাকে দুর্গে পাঠাবার নির্দেশ।

কাগজটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কম্যান্ডার বলল, "আবার।"

"ব্যাপার কি এপোলন সের্গিচ?" একজন উর্ধ্বতন অফিসার জিজ্ঞাসা করল।

"মর্টার কামানের জন্য একজন অফিসার ও একদল নাবিক চেয়ে পাঠিয়েছে। আমার তো আছে মোট চারজন অফিসার, আর নাবিক তো পুরো একটা দলও নেই; অথচ তারা আরও লোক চেয়ে পাঠিয়েছে," কম্যান্ডার ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল। তারপর একটু থেমে আবার বলল, "যাই হোক, কাউকে তো যেতেই হবে। হুকুম হয়েছে, সাতটার সময় বোগাৎকায় হাজির হতে হবে।...সার্জেন্ট-মেজরকে ডাকো! ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারাই স্থির করুন কে যাবেন।"

ভলোদিয়াকে দেখিয়ে চার্নোভিৎস্কি বলল, "ইনি গেলে কেমন হয়? ইনি তো এখনও কোথাও যাননি।"

কম্যান্ডার কোনও মন্তব্য করল না।

"হ্যাঁ, আমারই যাওয়া উচিত", ভলোদিয়া বলল; তার পিঠে ও গলায় ঠাণ্ডা ঘাম ঝরছে।

ক্যাপ্টেন সবিস্ময়ে বলল, "না, না, আপনি কেন যাবেন! আমি জানি কেউ যেতে আপত্তি করবে না, কিন্তু তাই বলে কারও যাবার জন্য এগিয়ে আসারও দরকার নেই। এপোলন সের্গিচ যখন ব্যাপারটা আমাদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন, তখন গতবারের মতো এবারও আসুন আমরা ভাগ্য পরীক্ষা করি।"

সকলেই সম্মত হলো : ক্রাউৎ ছোট ছোট চৌকোণা করে কতকগুলি কাগজ কেটে নিলো; সেগুলোকে দলা পাকিয়ে তার টুপির মধ্যে ফেলল। ক্যাপ্টেন কিছু ঠাট্টা-তামাসা করল, এমন কি এই সুযোগে সাহস করে কর্নেলের কাছে প্রস্তাবও করে বসল, সকলকে চাঙ্গা করে তুলতে কর্নেল যেন নিজের খরচে সবাইকে একপাত্র করে খাইয়ে দেয়। দিয়াদেংকোকে খুব মন-মরা মনে হচ্ছে; ভলোদিয়া সামনের দিকে তাকিয়ে কি দেখে যেন হাসছে; চার্নোভিৎস্কি বার বার বলছে, ভাগ্যের খেলা তার কপালেই বর্তাবে; ক্রাউৎ একেবারেই চুপচাপ।

ভলোদিয়াকেই প্রথম টানতে বলা হলো। সব চাইতে লম্বা কাগজটাই সে তুলেছিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মত বদলে একটা ছোট পুরু কাগজ টানল; ভাঁজ খুলে পড়ল : "যাও।"

"আমাকেই যেতে হবে", একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে সে বলল।

সস্নেহ হাসিতে পতাকাবাহী অফিসারের লজ্জারুণ মুখের দিকে তাকিয়ে কম্যান্ডার বলল, "ঠিক আছে, ঈশ্বর তোমার সহায় হন। এই হবে তোমার প্রথম অগ্নি-অভিষেক। এখনই তৈরি হয়ে নাও। তোমার সঙ্গী হয়ে প্রধান গোলন্দাজ হিসাবে ভ্লাঙ্গ্ যাবে তোমার সঙ্গে।"

২১

কাজটা পেয়ে ভ্লাঙ্গ্ তো মহাখুসি : সে ছুটে চলে গেল তৈরি হতে। সাজপোশাক পরে ভলোদিয়াকে সাহায্য করতে গেল; তাকে সঙ্গে নিতে বলল বিছানা, লোমের কোটটা, Otechestvenniye Zapiski-র পুরনো সংখ্যাগুলি, স্পিরিট, কফিপাত্র ও আরও অনেক টুকিটাকি জিনিস। ক্যাপ্টেন ভলোদিয়াকে পরামর্শ দিলো, সে যেন "ম্যানুয়েল" খানা ভাল করে পড়ে মর্টার গোলাবর্ষণটা ভাল করে বুঝে নেয়, আর কখন কত উচ্চতায় ও কোণে কামানটাকে রাখতে হবে তার তালিকাটি টুকে নিজের কাছেই রাখে। সঙ্গে সঙ্গে কাজে হাত দিয়েই সানন্দ বিস্ময়ের সঙ্গে ভলোদিয়া লক্ষ্য করল বিপদের ভয় এবং নিজের ভীরুতার ভয় তাকে একেবারে ছেড়ে না গেলেও সে অনুভূতিগুলি এখন আর আগের দিনের মতো তত শক্তিশালী নেই। এক কথায় ইতিমধ্যেই ভয়কে সে জয় করে ফেলেছে। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ সূর্য যখন নিকোলায়েভ্স্কি ব্যারাকগুলির পিছনে অস্ত যেতে বসেছে ঠিক সেই সময় সার্জেন্ট-মেজর ঘরে ঢুকে জানালো, সকলে প্রস্তুত হয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে।

বলল, "তালিকাটি ভ্লাঙ্গ্কে দিয়েছি। তার কাছ থেকে চেয়ে নেবেন হুজুর!"

প্রায় বিশজন গোলন্দাজ সৈনিক বাড়িটার কোণে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পাশে ঝুলছে কোষবদ্ধ ছোট তরবারি, কিন্তু সামরিক পোশাক তাদের গায়ে নেই। ভলোদিয়া ও শিক্ষার্থীটি তাদের কাছে এগিয়ে গেল। ভলোদিয়া নিজের মনকেই শুধালো : "ওদের জন্য একটি ছোট বক্তৃতা দিয়ে বলব কি, 'কেমন আছো বাছারা!' না কি চুপ করেই থাকব? কিছু বলাই তো উচিত।" অমনি সুরেলা গলায় সে চিৎকার করে উঠল, "কেমন আছ বাছারা!" সৈনিকরাও সানন্দে তার জবাব দিলো; তরুণ, তাজা কণ্ঠস্বরটি বড় খুসির সুরে তাদের কানে বেজেছে। ভলোদিয়া সকলের আগে আগে সাহসের সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে চলল; যদিও তার বুক ধুক ধুক করছে, মনে হচ্ছে সে যেন অতি দ্রুত কয়েক ভার্স্ট পথ ছুটে চলেছে, তবু সে কিন্তু চলেছে হাল্কা অসংকোচ পদক্ষেপে, তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মালাখভ কুর্গান-এর কাছে পৌঁছে তারা যখন পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল, তখন সে লক্ষ্য করল, যে ভ্লাঙ্গ্ সারাটা পথ তার পাশে পাশেই ছিল, বাড়িতে থাকার সময় যাকে এত সাহসী বলে মনে হয়েছিল, এখন সে যেন ক্রমাগতই এই পাশে সরে যাচ্ছে আর মাঝে মাঝেই মাথাটা নিচু করছে, যেন আশেপাশে যত গোলাগুলি ছুটছে সব তাকে লক্ষ্য

করেই এগিয়ে আসছে। আরও অনেকেই সেই রকম করছে; সকলের মুখেই যত না ভয় তার চাইতে উৎকণ্ঠাই ফুটে উঠছে বেশি। এই দৃশ্য ভলোদিয়াকে সম্পূর্ণ শান্ত করে তুলল; তার মনোবলকে তুলে দিলো অনেক উপরে।

"যে মালাখভ কুর্গানকে অকারণে এত বেশি ভয়ংকর বলে কল্পনা করেছিলাম শেষ পর্যন্ত দেখছি সেখানেও পৌঁছে গেলাম! কামানের গোলাকে মাথা নিচু করে অভিবাদন না জানিয়েই আমি হেঁটে যেতে পারছি; অন্যের তুলনায় ভয়ও পাচ্ছি অনেক কম! তবে তো আমি ভীরু নই!" খুশি মনে, এমন কি কিছুটা আত্মতুষ্টির সঙ্গেই সে ভাবল।

অবশ্য সন্ধ্যার আগে কর্নিলভ কামান-ঘাঁটিতে পৌঁছে সে যখন দুর্গের কম্যান্ডারের খোঁজ করছিল তখন যে দৃশ্য তার চোখে পড়ল তাতেই তার এই আত্মতুষ্টি ও ভয়হীনতার ভাব গড়ে উঠল। চারজন নাবিক বুকসমান উঁচু প্রাচীরের কাছে দাঁড়িয়ে একটি রক্তাক্ত মৃতদেহের চার হাত-পা ধরে তুলে ধরেছে; মৃতদেহটির গায়ে কোট নেই, পায়ে বুট নেই; প্রাচীরের উপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্য ঐ অবস্থায় তারা মৃতদেহটাকে দোলাতে লাগল। (বোমাবর্ষণের দ্বিতীয় দিনে মৃতদেহগুলি দুর্গ থেকে সরিয়ে নেবার সময়ও তাদের ছিল না; কাজেই যাতায়াতের পথটাকে পরিষ্কার রাখবার জন্য তারা মৃতদেহগুলিকে খানার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিল।) মৃতদেহটা প্রাচীরের ঠিক মাথায় ধাক্কা খেয়ে ধীরে ধীরে গড়াতে গড়াতে খানার মধ্যে পড়ে গেল। সে দৃশ্য দেখে ভলোদিয়া ভীত, বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময়ই দুর্গের কম্যান্ডার সেখানে এসে হাজির হলো, প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি দিলো এবং কামান-ঘাঁটি ও গোলন্দাজ নাবিকদের জন্য নির্দিষ্ট একমুখো সুরঙ্গটা দেখিয়ে দেবার জন্য তার সঙ্গে একজন পথ-প্রদর্শককেও দিয়ে দিলো। সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের এই কাহিনীর নায়ককে আরও যে সব আতংক, বিপদ ও স্বপ্নভঙ্গের ভিতর দিয়ে বাঁচতে হয়েছিল তার বর্ণনা এখানে দেব না; এখানেও ভল্‌কভ রণক্ষেত্রের মতোই যে সুপরিচালিত যুদ্ধ ও বোমাবর্ষণ দেখতে পাবে বলে সে আশা করেছিল তার পরিবর্তে দেখতে পেল শুধু দুটো ছোট বিধ্বস্ত মর্টার-কামান; একটার সামনের দিকটা কামানের গোলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আর অপরটি ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে ভাঙাচোরা দেহ নিয়ে; সকলের আগে সে সব মেরামত করার কোনও লোক পাওয়া গেল না; কোনও গোলার ওজনই "ম্যানুয়েল"-এ উল্লেখিত ওজনের সঙ্গে মিলল না; তার দুটি সৈনিক আহত হলো, আর সে নিজে অন্তত বিশ বার অল্পের জন্য মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেল। কিন্তু সে সব বর্ণনা আমি এখানে দেব না। ভাগ্যক্রমে সহকারী হিসাবে তাকে এমন একজন গোলন্দাজ নাবিক দেওয়া হয়েছে যে তার প্রকাণ্ড শরীরটা নিয়ে এই অবরোধের শুরু থেকেই মর্টার চালিয়ে এসেছে। রাতের বেলা হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে সে এমনভাবে তাকে দুর্গটা ঘুরিয়ে দেখালো যেন

একটা তরকারীর বাগান দেখাচ্ছে। সেই লোকটিই তাকে ভরসা দিলো, সকালের আগেই সব কিছু ঠিক করে দেবে। প্রদর্শক তাকে যে সুরঙ্গটাতে নিয়ে গেল সেটা পাথুরে মাটি খুঁড়ে তৈরি চব্বিশ ঘন গজ মাপের একটি আয়তক্ষেত্র; উপর দিকটা আঠাশ ইঞ্চি পুরু ওক কাঠের গুঁড়ি দিয়ে ঢাকা। সেখানেই সে দলবল নিয়ে আশ্রয় নিলো। সুরঙ্গের আঠাশ ইঞ্চি মাপের নিচু দরজাটা চোখে পড়তেই ভ্লাঙ্গ্ অন্য সকলের আগে এক লাফে ভিতরে ঢুকে গেল; পাথুরে মেঝেতে তার মাথার খুলিটা সশব্দে ঠুকে গেল; কোনও রকমে গুড়িসুড়ি মেরে সে একপাশে গিয়ে সেখানেই পড়ে রইল। সৈন্যরা একে একে দেয়াল ঘেঁসে ভিতরে ঢুকল, জায়গা নিলো, কেউ কেউ পাইপ ধরালো; ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকার পরে ভলোদিয়া ভিতরে ঢুকে এক কোণে তার বিছানাটা পেতে নিলো, একটা মোমবাতি জ্বালালো, এবং তারপরে একটা সিগারেট ধরিয়ে বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়ল। মাথার উপর তখনও অবিশ্রান্তভাবে কামান গর্জন করে চলেছে; একটা কামানের শব্দে সুরঙ্গটা এমনভাবে কেঁপে উঠল যে ছাদ থেকে ঝুর্‌ঝুর্ করে মাটি পড়তে লাগল। সুবঙ্গের ভিতরে নিস্তব্ধতার রাজত্ব; শুধু মাঝে মাঝে কানে আসছে সৈনিকদের বিরল কথাবার্তা; কেউ হয়তো পাশের লোকটিকে একটু সরে যেতে বলছে, অথবা পাইপ ধরাবার জন্য আগুন চাইছে, পাথরের উপর ইঁদুর চলাফেরা করছে, অথবা ভ্লাঙ্গ্ জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে; সে তখনও স্বাভাবিক হতে পারেনি। একটিমাত্র মোমবাতির আলোয় আলোকিত এক কোণে ভিড়ের মধ্যে শুয়ে ভলোদিয়ার সেই আরামের কথা মনে পড়ে গেল যখন ছেলেবেলায় লুকোচুরি খেলতে গিয়ে সে কাবার্ডের ভিতরে অথবা মায়ের স্কার্টের নিচে লুকিয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কান পেতে থাকত, আর অন্ধকারটাকে ভয় পেলেও মজাটাকে বেশ উপভোগ করত। এখনও কিছুটা ভয়, কিছুটা মজা তাকে পেয়ে বসল।

২২

মিনিট দশেক পরে সৈনিকদের সাহস কিছুটা বাড়ল; তারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে শুরু করল। তাদের মধ্যে যে দু'জন একটু ভারিক্কী গোছের—দু'জন গোলন্দাজ : একজন পাকা চুল প্রবীণ মানুষ, একমাত্র সেন্ট জর্জের ক্রস ছাড়া আর সবগুলো পদক তার বুকে ঝুলছে; অপরজন যুবক, এসেছে সেনা-বারিক থেকে, হাতে-পাকানো সিগারেট ফুঁকছে—সে শুয়ে আছে আলোটার সবচাইতে কাছে, অফিসারের বিছানার পাশে। ভেরীবাদক যথারীতি অফিসারের আর্দালির কাজ নিয়েছে। বোমারু আর চালকরা কাছাকাছিই আছে, অন্য ইতরজনরা রয়েছে দরজার কাছে, অন্ধকারে। একটি লোক হঠাৎ সুরঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়ায় সেই শব্দ শুনে শেষোক্ত লোকগুলিই কথা বলতে শুরু করল।

একজন বলল, "আরে ভাই, বাইরে থাকতে পারো না? নাকি মেয়েরা যথেষ্ট মজার গান গাইছে না?"

যে লোকটি ঢুকে পড়েছে সে হেসে বলল, "তারা তো আশ্চর্য সব সুর বাজাচ্ছে। আমাদের গাঁয়ে কখনও এরকমটা শুনিনি।"

যারা অভিজাত কোণটায় শুয়েছিল তাদের একজন বলে উঠল, "ওঃ! ভাসিন গোলাগুলি পছন্দ করে না। না, সত্যি পছন্দ করে না!"

ধীর একটানা সুরে ভাসিন বলল, "দেখো, বাধ্য হয়ে শুনতে হলে সে কথা আলাদা! আরে, ২৪শে তো কিছু বাজি-বন্দুক ফুটল; তাই বলে অকারণে পুড়ে মরা তো কোনও কাজের কথা নয়! উপরওয়ালারা তো সেজন্য আমাদের ধন্যবাদ দেবেন না!"

একথা শুনে সকলেই হো-হো করে হেসে উঠল।

কে একজন বলল, "ঐ তো মেল্‌নিকভ। মনে হচ্ছে, সে এখনও বাইরেই আছে।"

পাকাচুল গোলন্দাজটি বলল, "তাকে বরং ভিতরে পাঠিয়ে দাও, নইলে অকারণেই মারা পড়বে।"

"এই মেল্‌নিকভ লোকটি কে?" ভলোদিয়া শুধালো।

"আমাদেরই একজন সৈনিক হুজুর। একটু পাগ্‌লা আছে। কোনও কিছুই ভয় করে না; সারাক্ষণ বাইরেই থাকে। তাকিয়ে দেখবেন, ঠিক যেন একটি ভালুক!"

ওপাশ থেকে ভাসিন বলল, "লোকটা তুক্‌তাক্ জানে।"

মেল্‌নিকভ সুরঙ্গের মধ্যে ঢুকল। বেশ শক্ত গড়ন (সৈনিকদের মধ্যে বিরল), লাল মাথা, লাল মুখ, ঠেলে-ওঠা কপাল ও বেরিয়ে-আসা উজ্জ্বল নীল চোখ।

"তোমার গোলাগুলির ভয় নেই?" ভলোদিয়া শুধালো।

মাথা চুলকে ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে মেল্‌নিকভ জবাব দিলো, "ভয়ের কি আছে? আমি জানি, গোলায় আমার মৃত্যু হবে না!"

"এখানে থাকবে?"

"থাকব। এখানে তো খুব মজা!" হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠে মেল্‌নিকভ বলল।

"একটা আক্রমণকারী দলের সঙ্গে ওকে নেওয়া উচিত। জেনারেলকে বলব; বলব কি?" ভলোদিয়া বলল, যদিও একজন জেনারেলের সঙ্গেও তার পরিচয় নেই।

"কেন বলবেন না? অবশ্য বলবেন!"

মেল্‌নিকভ সকলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল।

"এক হাত 'ফ্লিপ' খেলা যাক। কার কাছে তাস আছে?" তার গলা শোনা গেল।

একটু পরেই পিছনের দিকে খেলা শুরু হয়ে গেল। যারা হারছে তাদের নাক

ঝাড়ার শব্দ, হাসি ও তাস পেটার শব্দ শোনা গেল। ভলোদিয়া ভেরীবাদকের তৈরি চা সামাভার থেকে ঢেলে নিজে খেলো ও গোলন্দাজদের দিলো; জনপ্রিয় হবার জন্য তাদের সঙ্গে আলাপ করল, হাসি-তামাসা কবল, আর তাদের শ্রদ্ধার ভাব দেখে খুশিও হলো। ভদ্রলোকটির কোনও অহংকার নেই দেখে সৈনিকরাও খোলাখুলিভাবে কথা বলতে লাগল। একজন বলল, "সেবাস্তোপাল-এর অবরোধ শিগ্‌গিরই উঠে যাবে; তার পরিচিত একজন নির্ভরযোগ্য নাবিক তাকে বলেছে, তার এর ভাই কিস্তেন্তিন (কনস্তান্তাইন) মার্কিন নৌবহর নিয়ে তাদের সাহায্য করতে আসছে। সে আরও বলল, অচিরেই এমন একটা মীমাংসা হয়ে যাবে যে দুই সপ্তাহের জন্য কেউ গোলাগুলি চালাতে পারবে না, সকলেই বিশ্রাম নেবে, আর কেউ যদি সে কাজ করে তো প্রতিটি গোলা ছোঁড়ার জন্য তাকে পঁচাত্তর কোপেক করে জরিমানা করা হবে।

তারপর কথা বলতে শুরু করল ভাসিন। তার কথা শুনে প্রথমে সকলে চুপ করে রইল, কিন্তু পরে হো-হো করে হাসতে লাগল। সে বলল, "ছুটি নিয়ে বাড়ি গেলে প্রথমে তো তাকে দেখে সকলেই খুশি, কিন্তু পরে বাবা তাকে কাজ করতে পাঠালো, আর বন-রক্ষকের সহকারী বার বার ভাসিন-এর বৌ-এর জন্য গাড়ি পাঠাতে লাগল। এ সব শুনে ভলোদিয়াও বেশ মজা পেল। সুরঙ্গের এই গুমোট ভিড়ের মধ্যে কোনও রকম ভয় বা অসুবিধার পরিবর্তে তার বেশ আরামই লাগল; সব কিছুই ভাল লাগল।

ইতিমধ্যে অনেকেরই নাক ডাকতে শুরু করেছে। ভ্লাঙ্গ্ টান-টান হয়ে মেঝেতে শুয়ে আছে; পাকাচুল গোলন্দাজটি কোটটা বিছিয়ে ঘুমবার আগে বিড় বিড় করে প্রার্থনা করছে; ভলোদিয়ার ইচ্ছা হলো, বাইরে কি ঘটছে একবার দেখে আসবে।

সে উঠে দাঁড়াতেই সৈনিকরা একে অন্যকে হাঁক দিয়ে বলল, "পা টেনে নাও!" সকলেই পা টেনে নিয়ে তাকে পথ করে দিলো।

ভ্লাঙ্গকে দেখে মনে হয়েছিল সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হঠাৎ সে মাথাটা তুলে ভলোদিয়ার কোটের কোন্‌টা চেপে ধরল।

"যাবেন না! দোহাই আপনার—কিছুতেই যাবেন না!" অশ্রুপূর্ণ গলায় সে মিনতি করল। "সে যে কী অবস্থা আপনি জানেন না—বৃষ্টির মতো গোলাবর্ষণ চলেছে। বরং এখানেই থাকুন..."

ভ্লাঙ্গের অনুরোধ সত্ত্বেও ভলোদিয়া সুরঙ্গ থেকে বেরিয়ে গেল। দরজার পাশে বসতে গিয়ে দেখল, মেল্‌নিকভ বুট পাল্টাচ্ছে।

সুরঙ্গের ভিতরকার গুমোটের পরে বাতাস খুব তাজা ও নির্মল মনে হলো: রাতটাও পরিষ্কার, শান্ত। কামানের বুম্-বুম্ শব্দকে ছাপিয়ে মাটি ভর্তি ঝুড়িবোঝাই গাড়ির চাকার ক্যাঁচড়-ক্যাঁচড় শব্দ ও বারুদখানায় কর্মরত লোকদের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। মাথার উপরে তারায় ভরা আকাশ : উড়ন্ত গোলার অসংখ্য অগ্নিময় পথ-রেখা তার বুকে; বাঁদিকে অপর একটি সুরঙ্গে ঢুকবার খোলা মুখ; তার ভিতরকার

নাবিকদের পা ও পিঠ দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে তাদের মাতাল কণ্ঠস্বর; সামনে দাঁড়িয়ে আছে বারুদখানা, তার পাশেপাশে কর্মরত লোকগুলো উপুড় হয়ে নড়াচড়া করছে, আর বারুদখানার মাথায় গোলাগুলির অবিশ্রাম শিলাবৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটি দীর্ঘদেহী পুরুষ; পরনে কালো গ্রেটকোট, দুই হাত পকেটে ঢোকানো; অন্য লোকরা বস্তা ভর্তি করে যে মাটি এনে ফেলছে সেগুলোকে সে পা দিয়ে চেপে চেপে সমান করছে। মাঝে মাঝেই একটা গোলা শাঁ করে তার পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে বারুদখানার খুব কাছেই ফেটে পড়ছে। বস্তা মাথায় লোকগুলো হয় মাথা নিচু করছে, আর না হয়তো চকিতে এক পাশে সরে যাচ্ছে, কিন্তু কালো মূর্তিটি অবিচলিত ও শান্তভাবে নিজের জায়গা বা ভঙ্গির কোনও রকম পরিবর্তন না করে এক ভাবেই পা দিয়ে মাটি সমান করে চলেছে।

"ওখানে ঐ কালো লোকটি কে?" ভলোদিয়া মেল্‌নিকভকে শুধালো।

"জানি না। গিয়ে দেখে আসছি।"

"যেয়ো না, তার কোনও দরকার নেই।"

কিন্তু সে কথায় কান না দিয়ে মেল্‌নিকভ উঠে হাঁটতে হাঁটতে কালো মূর্তিটার কাছে গেল, তার মতোই নিশ্চল ও অবিচলিতভাবে দীর্ঘ সময় লোকটির পাশেই দাঁড়িয়ে রইল।

ফিরে এসে জানালো, "বারুদখানার লোক হুজুর! বারুদখানায় একটা গোলা এসে পড়েছিল, তাই পদাতিক সৈন্যরা সেখানে মাটি ফেলছে।"

থেকে থেকেই গোলা উড়ছে; দেখে মনে হয় সুরঙ্গের দরজার দিকেই যাচ্ছে।

ভলোদিয়া সঙ্গে সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে একটা মোড়ে গিয়ে দেখছে, আরও গোলা আসছে কি না। সুরঙ্গের ভিতর থেকে ভ্লাঙ্গ্ বার বার ভলোদিয়াকে ভিতরে যাবার জন্য মিনতি করতে লাগল, কিন্তু ভলোদিয়া তিনটি ঘণ্টা দরজাতেই বসে রইল; ভাগ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গোলার যুদ্ধ দেখতে দেখতে একটা আশ্চর্য অনুভূতিতে তার মন ভরে গেল। সন্ধ্যার শেষের দিকেই সে বুঝতে পারল কোথা থেকে এত কামান দাগা হচ্ছে, আর গোলাগুলিই বা কোথায় গিয়ে পড়ছে।

২৩

পরদিন ২৭ তারিখ খুব সকালে দশ ঘণ্টা একটানা ঘুমের পরে দেহে ও মনে বেশ তাজা হয়ে ভলোদিয়া সুরঙ্গের বাইরে এসে দাঁড়াল। ভ্লাঙ্গ্‌ও তার সঙ্গে বের হতে চেয়েছিল, কিন্তু গোলাবর্ষণের প্রথম শব্দটি কানে আসতেই সে একেবারে ডিগবাজি খেয়ে সুরঙ্গের মধ্যে ছিটকে ঢুকে গেল; সকলেই হেসে উঠল; তাজা বাতাসে শ্বাস নিতে তখন অনেকেই বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। পাকাচুল গোলন্দাজ ভাসিন ও আরও জনাকয়েক সেই সুরঙ্গ থেকে বাইরে বড় একটা পা বাড়াল না;

কিন্তু অন্য কাউকে আটকানো গেল না, সুরঙ্গের গুমোট থেকে সকলেই সকাল বেলাকার তাজা বাতাসে বাইরে বেরিয়ে এল; বোমাবর্ষণকে উপেক্ষা করে দরজার সিঁড়িতে অথবা প্রাচীরের নিচে এসে দাঁড়াল। মেল্‌নিকভ ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই বারুদখানার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে, আর অবিচলিত মনে আকাশটাকে দেখছে।

দু'জন বয়স্ক সৈনিক ও ইহুদিদের মতো দেখতে একটি যুবক দরজার সিঁড়ির কাছে বসেছিল। পড়ে থাকা একটা বুলেট তুলে নিয়ে সেটাকে পাথরের উপর রেখে গোলার একটা টুকরো দিয়ে পিটিয়ে যুবকটি বুলেটটাকে বেশ চ্যাপ্টা করে নিল, তারপর সেটাকে ছুরি দিয়ে কেটে একটা সেন্ট জর্জের ক্রসের মতো বানালো। অন্য সকলে কথা বলতে বলতে তার হাতের কাজ দেখছিল। ক্রসটা সত্যি খুব সুন্দর তৈরি হয়েছে।

বয়স্কদের একজন বলল, "আরও দীর্ঘদিন যদি আমাদের এখানেই কাটাতে হয়, তাহলে যখন শান্তি ফিরে আসবে তখন আমাদের দিনও ফুরিয়ে আসবে।"

"সত্যি! আমার তো চাকরির আর মাত্র চার বছর বাকি ছিল, আর এই সেবাস্তোপল-এই আছি আজ পাঁচ মাস।"

"অবসরের সময় ওটা ধরা হবে না", অপরজন বলল।

ঠিক সেই সময় একটা গোলা তাদের মাথার উপর দিয়ে শাঁ করে ছুটে গিয়ে মেল্‌নিকভ-এর ফুট দুয়েক দূরে মাটিতে পড়ল। সে তখন হাঁটতে হাঁটতে তাদের দিকেই আসছিল।

"মেল্‌নিকভ প্রায় মরতে বসেছিল", একজন বলল।

"ওটা আমাকে শেষ করতে পারবে না", মেল্‌নিকভ বলল।

ক্রসটা তৈরি করা শেষ করে সেটা মেল্‌নিকভ-এর হাতে দিয়ে যুবক সৈনিকটি বলল, "এই নাও, তোমার সাহসের জন্য এই ক্রস্‌টা পুরস্কার দিলাম।"

আগের আলোচনার জের টেনে একজন বলল, "না ভাই, এখানকার এক মাসকে এক বছর ধরা হয়—এ সম্পর্কে একটা আদেশ জারী করা হয়েছে।"

"যাই হোক না কেন, শান্তি ঘোষিত হওয়া মাত্রই জার ওয়ারস তে একটা আলোচনায় বসবেন, আর তখন আমাদের যদি অবসর দেওয়া না হয় তাহলে আমরা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য লম্বা ছুটি পাবো।"

সেই মুহূর্তে একটা বুলেট তাদের মাথার উপর দিয়ে এসে একটা পাথরের উপরে ছিটকে পড়ল।

একজন বলে উঠল, "ওই দেখো, দিন শেষ হবার আগেই তুমি পরিষ্কার একখানা ছুটি পেয়ে যাবে।"

এ কথায় সকলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

শুধু দিন শেষ হবার আগেই নয়, মাত্র দুটি ঘণ্টা পরেই তাদের ভিতর থেকে

দু'জন পেয়ে গেল পরিষ্কার একখানা ছুটি, এবং আরও পাঁচজন আহত হলো: কিন্তু বাকিদের মুখে সেই তামাসাটা ঠিকই রয়ে গেল।

কাজ শুরু করতে না করতেই যে ভয় আগের দিন তাদের পেয়ে বসেছিল তার সব লক্ষণই সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গেল। শুধু ভ্লাঙ্গ্‌ই নিজেকে সংযত করতে পারল না; সে আগের মতোই হামাগুড়ি দিয়ে আশ্রয়ের জন্য ছুটতে লাগল; ভাসিনও যেন স্নায়ুর জোর হারিয়ে ফেলল। ভলোদিয়া কিন্তু উৎসাহে একেবারে টগবগ করতে লাগল। বিপদের সব চিন্তা তার মন থেকে মুছে গেছে। সে যে ঠিক ঠিক কর্তব্য পালন করে চলেছে, ভীরু হওয়া দূরে থাক আসলে সে যে খুবই সাহসী, যে বিশ জন সৈনিক একান্ত আগ্রহে সব সময় তাকে লক্ষ্য করছে সে যে তাদের অধিকর্তা—এই জ্ঞানই তাকে একজন নির্ভীক সৈনিকে রূপান্তরিত করেছে। সে সাহসে স্ফীত হয়ে উঠল, সৈনিকদের সামনে আস্ফালন করতে লাগল, মঞ্চের উপর উঠে গেল, এবং সকলেব চোখে পড়বার জন্য কোটের বোতাম খুলে ফেলল। স্বয়ং দুর্গের কম্যান্ডার গত আট মাস যাবৎ এখানে থেকে অনেক সাহসিকতা দেখে অভ্যস্ত হলেও "তার জমিদারি" (কথাটা তারই) তদারক করতে বেরিয়ে এই সুদর্শন ছেলেটির প্রশংসা না কবে পাবল না। বোতাম-খোলা কোটের নিচে তার লাল শার্টটা চোখে পড়ছে; তার মুখটা লাল হয়ে উঠেছে; চোখ দুটি ঝকঝক করছে; দুই হাতে তালি বাজিয়ে সুরেলা গলায় সে নির্দেশ দিচ্ছে : "প্রথম! দ্বিতীয়!" আর মনেব খুসিতে প্রাচীরের উপর উঠে দেখছে তার গোলাগুলি কতদূরে গিয়ে পড়ছে। সাড়ে এগারোটার সময় দুই পক্ষ থেকেই গোলাগুলি বন্ধ হয়ে গেল, আর কাঁটায় কাঁটায় বারোটার সময় মালাখভ কুর্গান-এর উপব ২ নম্বর, ৩ নম্বর ও ৫ নম্বর দুর্গের আক্রমণ শুরু হয়ে গেল।

২৪

উপসাগরের এদিকটায় ইংকারম্যান ও সেভেরনায়া গড়ের মাঝামাঝি জায়গায় টেলিগ্রাফ পাহাড়ের উপর দুটি নৌ-সেনা দাঁড়িয়েছিল—একজন অফিসার, দূরবীনের সাহায্যে সেবাস্তোপল পর্যবেক্ষণ করছিল, আর একজন সবে এসে পৌঁচেছে। সময় প্রায় মধ্যাহ্ন কাল।

সূর্য মাথার উপরে উঠে এসেছে; উপসাগরের বুকে সূর্যের আলো পড়ে নোঙর-করা জাহাজগুলির চারপাশের জল ঝিলমিল করছে। মৃদু হাওয়ায় টেলিগ্রাফের নিকটবর্তী ওক গাছের ঝরা পাতাগুলিতে শর্-শর্ শব্দ হচ্ছে, পালগুলি উড়ছে, জলে ছোট ছোট ঢেউ উঠেছে। সেবাস্তোপল-এর সেই একই চেহারা—অসমাপ্ত গির্জা, স্তম্ভশ্রেণী, জাহাজ-ঘাটা, পাহাড়ের গা বেয়ে সবুজ পথ, সুন্দর পাঠাগার, মাস্তুল-কণ্টকিত ছোট ছোট নীল খাঁড়ি, জলের কলের সুদৃশ্য খিলান, মাঝে মাঝেই গোলার ঝল্‌কানিতে উদ্ভাসিত নীল মেঘের মতো বারুদের ধোঁয়া; চিরকালের সুন্দর,

উৎসবমুখরিত, গর্বিত সেবাস্তোপল; আমাদের দিকে তার সীমানা হলুদ ধোঁয়াটে পাহাড়, অন্য দিকে সূর্যের আলোয় ঝলমল-করা উজ্জ্বল-নীল সমুদ্র। দীর্ঘ সাদা মেঘের দল ঝড়ের পূর্বাভাষ নিয়ে দিগন্তের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে; কোনও জাহাজের ধোঁয়া একটা কালো ফিতের মতো এঁকে-বেঁকে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। সমস্ত গড় বরাবর, বিশেষ করে বাঁ দিকের পাহাড় বরাবর একটা ঘন সাদা ধোঁয়া অনবরত উপরে উঠছে; বিদ্যুতের আলোয় দিনের বেলাতেও সেগুলি ঝলমল করছে; নানা রকম আকার নিচ্ছে; আর আকাশের গায়ে মিশে আরও কালো হয়ে যাচ্ছে। বোমাবর্ষণের শব্দ অবিশ্রান্তভাবে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, বাতাসকে বিদীর্ণ করছে...

দুপুরের দিকে ধোঁয়াটা ক্রমেই কমতে লাগল, কামান-গর্জনে বাতাসও আগের মতো কাঁপছে না।

ঘোড়ার পিঠে বসেই হুজার অফিসার বলল, "২ নম্বর দুর্গ থেকে শত্রুর গোলাবর্ষণের জবাব দেওযা থেমে গেছে। ওটা পুরোপুরিই ধ্বংস হয়ে গেছে। ভয়ংকর!"

দূরবীনে চোখ রেখে অপর একজন বলল, "হ্যাঁ, মনে হচ্ছে তাদের তিনটের জবাবে মালাখশু কুর্গান পাঠাচ্ছে একটা। ওদের নীরবতা আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। ওই যে! আরও একটা কর্নিলভ উপদুর্গের মাথায় গিয়ে পড়ল। অথচ ওদিক থেকে কোনও জবাবই এল না।"

"আমি বলিনি, ওরা সব সময় দুপুর নাগাদ বোমাবর্ষণ বন্ধ রাখে? আজও তাই করেছে। চলো, লাঞ্চ খেতে যাই...সকলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে...এখন আর এখানে কিছু দেখার নেই।"

অস্বাভাবিক একাগ্রতায় দূরবীনে চোখ রেখে অপর লোকটি বলল, "দাঁড়াও। আমাকে বাধা দিও না!"

"ব্যাপার কি? কি দেখছ ওদিকে?"

"ট্রেঞ্চের ভিতর লোক চলাচল করছে। সারিবদ্ধ মানুষ।"

"ঠিক বলেছ, দূরবীন ছাড়াই আমি দেখতে পাচ্ছি", নৌ-অফিসার বলল।

"ওরা সার বেঁধে এগিয়ে আসছে। আমাদের সংকেত দেখানো উচিত।"

"দেখো, দেখো! ওরা ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে পড়েছে!"

সত্যি, এখন খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে, ফরাসী কামান-ঘাঁটি থেকে দুর্গ পর্যন্ত কালো কালো মূর্তিগুলো খাঁড়ি-পথ ধরে পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে। অগ্রবর্তী কয়েকটি কালো মূর্তি প্রায় আমাদের সীমানা বরাবর পৌঁছে গেছে। দুর্গের বিভিন্ন জায়গায় সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডুলি ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে ওরা ধোঁয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে। বন্দুকের শব্দ বাতাসে ভেসে আসছে, ঠিক যেন জানালার কাঁচের উপর বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে। কালো মূর্তিগুলো ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে গিয়ে ক্রমে কাছে, আরও

কাছে আসছে। গুলির শব্দ উচ্চ হতে উচ্চতর হতে লাগল; ক্রমে সব মিলিয়ে একটা প্রতিধ্বনিত গর্জনে পরিণত হলো। ধোঁয়া ক্রমেই বেশি করে উঠছে, সেনা-ব্যারিকগুলোর উপর ছড়িয়ে পড়ছে, এবং শেষ পর্যন্ত সব কিছু মিলে মিশে একটিমাত্র আন্দোলিত রক্তিম মেঘ হয়ে দেখা দিলো; তারই মধ্যে এখানে ওখানে চোখে পড়ছে আলোর ঝলকানি ও কালো কালো বিন্দু।

দূরবীনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে অফিসারটি বলল, "ওরা আক্রমণ করেছে!"

কসাকরা জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে পথে নেমে এল; অফিসাররা ছুটে চলল অশ্বারোহণে; প্রধান সেনাপতি দলবল নিয়ে ছুটে চলল তার গাড়িতে। সকলের মুখেই তীব্র উত্তেজনা ও আসন্ন বিপদের চিহ্ন সুপরিস্ফুট।

"ওরা দখল করতে পারেনি।" অফিসার বলল।

"একটা পতাকা! হা ঈশ্বর! দেখো! দেখো!" দূরবীনের কাছে সরে গিয়ে হাপাতে হাপাতে অপর অফিসারটি বলল। "মালাখভ এর মাথায় উড়ছে ফরাসী পতাকা!"

"এ হতেই পারে না।"

২৫

ভোরের ঠিক আগে বড় কোজেলৎসভ তখনও ৫ নম্বর দুর্গের সেনাবারিকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। একটা রাতের মধ্যেই সে তার সব টাকা জিতে নিয়ে আবার সবটাই হেরে গেছে—এমন কি কোটের আস্তিনের মধ্যে সেলাই করে যে স্বর্ণমুদ্রাগুলি লুকিয়ে রেখেছিল সেগুলিও। ঘুমের মধ্যেই অনেক কণ্ঠের একটা অশুভ চিৎকার তার কানে বাজল

"বিপদ!"

"মিখাইল সেম্‌য়োনিচ! ওরা আক্রমণ করেছে! জেগে ওঠো!"

সে চোখ মেলল। যা কানে এসেছে তাকে বিশ্বাস না করে নিজের মনেই বলল, "মনে হচ্ছে, কোনও স্কুলের ছেলে মজা করছে।"

কিন্তু হঠাৎ তার চোখে পড়ল, একজন অফিসার ভীত, বিবর্ণ মুখে অকারণেই এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে; সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যাপারটা বুঝতে পারল। একটা সংকট মুহূর্তে নিজের সেনাদলের সঙ্গে যোগ না দিলে তাকে ভীরু মনে করা হবে, এই চিন্তা তাকে তীব্রভাবে নাড়া দিলো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পা চালিয়ে সে তার সেনাদলের দিকে ছুটে গেল। কামানের গোলাবর্ষণ থেমে গেছে, কিন্তু বন্দুকের গুলি তখন চরমে উঠেছে। বন্দুকের গুলি ছুটছে একটা-একটা করে নয়, হেমন্তকালের আকাশে উড়ন্ত পাখির মতো ঝাঁকে ঝাঁকে। তার সেনাদল আগের দিন যে জায়গাটা দখল করেছিল সেখানটা ধোঁয়ার চাদরে ঢেকে গেছে; চারিদিক থেকে কানে আসছে বিচিত্র আর্তনাদ ও চিৎকার। আহত ও সুস্থ সৈন্যরা দলে দলে তার পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছে। আরও

তিরিশ পা ছুটে গিয়ে সে দেখল, তার সেনাদল দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; একটি সৈন্যের মুখ ভয়ে মরার মতো পাণ্ডুর হয়ে গেছে। অপর মুখগুলিরও সেই একই অবস্থা।

ভয়ের অনুভূতি কোজেল্‌ৎসভ-এর মনেও সংক্রামিত হলো—তার শিড়দাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা কাঁপুনি নিচের দিকে নামতে লাগল।

দাঁতে দাঁত ঠকঠকিয়ে একটি তরুণ অফিসার বলল, "ওরা শোয়র্ৎজ্ সুরঙ্গটাও দখল করে নিয়েছে। সব শেষ হয়ে গেছে!"

"বাজে কথা!" কোজেল্‌ৎসভ সক্রোধে হাঁক দিয়ে উঠল; গা ঝাড়া দিয়ে নিজের ছোট লোহার ভোঁতা তলোয়ারটা খুলে চেঁচিয়ে বলল :

"আগে বাড়ো, সব্বাই! হুর্‌রা—আ-আহ্!"

কোজেল্‌ৎসভ-এর জোরালো কাঁপা কণ্ঠস্বরে সে নিজেই উদ্দীপিত হয়ে উঠল। সুরক্ষিত পথটা ধরে সে ছুটে চলল; প্রায় পঞ্চাশটি সৈনিক চিৎকার করতে করতে তাকে অনুসরণ করল। পথের শেষ প্রান্তে পৌছে তারা একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ল; সেখানে বুলেট পড়তে লাগল শিলাবৃষ্টির মতো। দুটো গুলি তাকে আঘাত করল, কিন্তু কোথায় আঘাত লাগল, কতটা আঘাত লাগল—শুধু থেঁতলে গেল না ঘা হলো—সে সব বুঝবার মতো সময় তার নেই। সম্মুখের ধোঁয়ার মধ্যে সে দেখতে পাচ্ছে শুধু নীল কোট আর লাল একটা ফরাসী সৈনিক চিৎকার করছে আর তলোয়ার ঘোরাচ্ছে। কোজেল্‌ৎসভ নিশ্চিত বুঝল যে সে লোকটি তাকে হত্যা করবে, এই চিন্তাই তার মনে সাহস এনে দিলো। সে ছুটে এগিয়ে চলল। অন্যরা তাকে ধরে ফেলল; অন্যরাও হঠাৎ পাশ থেকে এসে তার সঙ্গেই ছুটতে লাগল। নীলকোর্তারা কিন্তু তাদের কাছ থেকে দূরত্বটা বজায় রেখেই ট্রেঞ্চের দিকে ফিরে যেতে লাগল; মৃত ও আহতদের উপর দিয়ে সে এগিয়েই চলল। বাইরের খানাটায় পৌছতেই তার চোখে সব কিছু ঝাপসা হয়ে এলো, বুকে একটা ব্যথা বোধ হলো, একটা উঁচু জায়গায় সে বসে পড়ল; আর প্রাচীরের ছিদ্রপথে যে দৃশ্য তার চোখে পড়ল তাতে মনটা খুসি হয়ে উঠল। নীলকোর্তারা দলে দলে যে যেভাবে পারছে তাদের ট্রেঞ্চের দিকে ছুটে পালাচ্ছে; লাল পাৎলুন ও নীল কোর্তাধারী সৈনিকদের নিশ্চল মৃতদেহ ও হামাগুড়ি দেওয়া আহত সৈনিকরা গোটা যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

আধ ঘণ্টা পরে নিকোলায়েভ্‌স্কি সেনা-বারিকের কাছে সে একটা স্ট্রেচারে শুয়েছিল; সে জানে সে আহত হয়েছে, কিন্তু তার কোনও যন্ত্রণা হচ্ছে না; তার মন শুধু চাইছে একটু ঠাণ্ডা পানীয়ে চুমুক দিয়ে আরাম করে শুয়ে থাকতে।

কালো ঝুপসি জুল্‌ফিওয়ালা একটি বেঁটে ও বলিষ্ঠ সার্জন কাছে এসে তার কোটের বোতামগুলি খুলে ফেলল। নিচের দিকে তাকিয়ে কোজেল্‌ৎসভ দেখল, ডাক্তার তার ঘাটা নেড়েচেড়ে দেখছে, কিন্তু তখনও সে নিজে কোনও ব্যথা অনুভব

করল না। ডাক্তার তার ঘায়ের উপর শার্টটা চাপা দিলো, নিজের কোটের কোণায় আঙুলগুলো মুছল, তারপর কোনও কিছু না বলে বা আহত লোকটির দিকে না তাকিয়েই সে অন্য রোগীর কাছে চলে গেল। কোজেল্‌ৎসব যন্ত্রের মতোই তার সামনে কি ঘটছে সে সব কিছুই দেখতে লাগল। ৫ নম্বর দুর্গের ঘটনা স্মরণ করে এই কথা ভেবে সে সান্ত্বনা বোধ করল যে, তার কর্তব্য সে সুষ্ঠুভাবেই পালন করেছে। চাকরিতে যোগ দেবার পরে এই সর্বপ্রথম সে পরিস্থিতি অনুযায়ী যা সব চাইতে ভাল তাই করতে পেরেছে, আর তাই নিজেকে নিন্দা করবার মতো কিছু নেই। আরও একজন অফিসারের ক্ষতস্থানটা বেঁধে দিয়ে সার্জন লম্বা লাল দাঁড়িওয়ালা পুরোহিতকে কি যেন বলে কোজেল্‌ৎসভকে দেখিয়ে দিলো।

পুরোহিত ক্রুস হাতে নিয়ে তার কাছে এলে কোজেল্‌ৎসভ শুধালো, "আমি কি মরতে বসেছি?"

পুরোহিত কোনও জবাব দিলো না; প্রার্থনা উচ্চারণ করে ক্রুসটা তার হাতে দিলো।

মৃত্যুর চিন্তায় কোজেল্‌ৎসভ ভয় পেল না। দুর্বল হাতে ক্রুসটাকে নিয়ে ঠোঁটের উপর চেপে ধরতেই তার চোখে জল এসে গেল।

দৃঢ় কণ্ঠে সে পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করল, "সব ঘাঁটি থেকেই ফরাসীদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তো?"

মালাখভ কুর্গান-এর মাথায় তখন যে ফরাসী পতাকা উড়ছে সে সত্য গোপন করে পুরোহিত বেশ জোর দিয়ে বলল, "সব জায়গাতেই আমাদের জয় হয়েছে।"

তার দুই গাল বেয়ে যে জল গড়িয়ে পড়ছে সে কথা ভুলে গিয়ে আহত লোকটি বলল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!" সে যে একটা শৌর্যপূর্ণ কাজ করতে পেরেছে এই চিন্তাই এক অনির্বচনীয় আবেগে তার মনটাকে ভরে তুলল।

সহসা ভাইয়ের কথা তার মনের মধ্যে ঝল্‌সে উঠল। প্রার্থনা করল, "ঈশ্বর তাকে এই একই সৌভাগ্যের অধিকারী করুন।"

২৬

কিন্তু ভলোদিয়ার নিয়তি এল অন্য রূপে। সে ভাসিন-এর মুখ থেকে একটা গল্প শুনছিল; এমন সময় চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠল, "ফরাসীরা আসছে!" মুহূর্তের জন্য সব রক্ত ভলোদিয়ার বুকে এসে জমল; তার গাল দুটি ঠাণ্ডা ও বিবর্ণ হয়ে উঠল।

এক সেকেন্ডের জন্য সে বিমূঢ়ের মতো বসে রইল; কিন্তু চারিদিকে তাকিয়ে দেখল সৈনিকরা শান্তভাবে গ্রেটকোটে বোতাম এঁটে সার বেঁধে সুরঙ্গ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে; তাদের মধ্যে একজন—তার মনে হলো লোকটি মেল্‌নিকভ তো রসিকতা করেই বলল :

"চলহে সব, রুটি-নুন নিয়েই তাদের মোলাকাৎ করিগে!"

ভ্লাঙ্গা কোনও সময় তার পাশ ছাড়েনি। তাকে সঙ্গে নিয়ে ভলোদিয়া সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে কামান-ঘাঁটির দিকে চলল। দু'পাশের কামানগুলি নীরব। সৈনিকদের শান্ত অবস্থার চাইতেও এই শিক্ষার্থীটির করুণ, সুস্পষ্ট ভীরুতাই বুঝি ভলোদিয়ার মনে বেশি করে সাহস জোগালো। যে অস্থায়ী প্রাকারের পাশে তার ছোট কামানগুলি বসানো ছিল সেদিকে যেতে যেতে সে ভাবল, "আমি কি সত্যি তার মতো আচরণ করতে পারি?" সেখান থেকেই সে স্পষ্ট দেখতে পেল, ফরাসী সৈন্যরা খোলা মাঠ পেরিয়ে দুর্গের দিকে ছুটে আসছে; নিকটবর্তী ট্রেঞ্চগুলোতে তাদের সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়ছে, তাদের সঙ্গীনগুলি সূর্যের আলোয় চকচক করছে। তাদের মধ্যে "জোয়াভ" ইউনিফর্মধারী চওড়া-কাঁধ ছোটখাটো একটি সৈনিক হাতে তলোয়ার নিয়ে গর্তের উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসছে। উপর থেকে দৌড়ে নামতে নামতে ভলোদিয়া হুকুম করল, "ছর্‌রা গোলা ভরে নাও!" কিন্তু সৈনিকরা হুকুমের অপেক্ষা না করেই সে কাজটা করে ফেলেছিল; এবার দ্বিতীয় হুকুম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছর্‌রা ছোঁড়ার ধাতব শব্দ মাথার উপরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল—একটার পর একটা মর্টার থেকে গোলা ছুটতে লাগল। বিপদের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে ভলোদিয়া সেই ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে একটার পর একটা মর্টারের কাছে ছুটতে ছুটতে হুকুম দিতে লাগল, "প্রথম! দ্বিতীয়!" খুব নিকট থেকেই ভেসে এল আমাদের অগ্রবর্তী সৈনিকদের বন্দুকের ফট্‌ফট্ আওয়াজ আর এলোমেলো চিৎকার।

হঠাৎ বাঁ দিক থেকে নানা কণ্ঠের কান-ফাটানো হতাশাপূর্ণ চিৎকার ভেসে এল : "ওরা আমাদের ব্যূহ ভেদ করে ফেলেছে! ওরা আমাদের ব্যূহ ভেদ করে ফেলেছে!" চিৎকার শুনে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রায় বিশজন ফরাসীকে ভলোদিয়া তার পিছনে দেখতে পেল। তাদের দলপতির মুখে কালো দাড়ি, মাথায় লাল ফেজ। কামান-ঘাঁটির দশ পায়ের মধ্যে এসে সে একটু থামল, গুলি করল, তারপব আবার এগোতে লাগল। মুহূর্তের জন্য ভলোদিয়া যেন পাথর হয়ে গেল; নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। তারপরই সম্বিত ফিরে পেয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল, নীলকোর্তারা তার সামনেই অস্থায়ী প্রাকারের উপর উঠে পড়েছে; তাদের মধ্যে একজন এর মধ্যেই লাফিয়ে নেমে সঙ্গীন বাগিয়ে এগিয়ে আসছে। মেল্‌নিকভ ও ভ্লাঙ্গ্ ছাড়া আর কেউ কাছাকাছি ছিল না। বুকে গুলি লেগে মেল্‌নিকভ মারা গেছে; ভ্লাঙ্গ্ আচম্বিতে একটা কিরিচ তুলে নিয়ে মুখে একটা হিংস্র ভাব ফুটিয়ে ঘূর্ণিত চোখে সামনের দিকে ছুটে গেল। পিছনের ফরাসী সৈনিকদের দিকে হাতের কিরিচটা ঘোরাতে ঘোরাতে ভ্লাঙ্গ্ উন্মাদ কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল, "আমার পিছনে আসুন ভ্লাদিমির সেময়োনিচ! আমাদের আর আশা নেই!"

শিক্ষার্থীর সেই হিংস্র মূর্তি দেখে ফরাসীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। ভ্লাঙ্গ্

একজনের মাথায় আঘাত করতেই অন্যরা আপনা থেকেই থেমে গেল। বার বার পিছনে তাকিয়ে ভ্লাঙ্গ্ বেপরোয়াভাবে চেঁচাতে লাগল : "আমার পিছনে চলে আসুন ভ্লাদিমির সেম্‌যোনিচ। ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ছুটে আসুন।" যেখানে দাঁড়িয়ে আমাদেব পদাতিক সৈন্যরা ফরাসীদের লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছিল ভ্লাঙ্গ্ সেই ট্রেঞ্চের দিকে ছুটতে লাগল। লাফ দিয়ে ট্রেঞ্চের মধ্যে পড়তেই সে আর একবার মাথা তুলে দেখতে চেষ্টা করল তার প্রিয় পতাকাবাহী অফিসারটি কি করছে। ভলোদিয়া যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে গ্রেটকোটধারী একটি মানুষ টানটান হয়ে পড়ে আছে; আর ফরাসীরা গোটা অঞ্চল দখল করে আমাদের সৈনিকদের লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছে।

২৭

রক্ষা-ব্যূহেব দ্বিতীয় সারিতে ভ্লাঙ্গ্ তার কামান-ঘাঁটি খুঁজে পেলো। মর্টার-বাহিনীর বিশ জন সৈনিকের মধ্যে মাত্র আট জন বেঁচে আছে।

সন্ধ্যা আটটা থেকে ন'টার মধ্যে ভ্লাঙ্গ্ তার দলবল নিয়ে একটা স্টীমারে চাপল। স্টীমারটা সেভেরনাযা সাইড-এ চলেছে। সৈনিক, কামান, ঘোড়া ও আহত সৈনিকে স্টীমারটা বোঝাই। গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে না। আকাশের তারাগুলি আগের রাতের মতোই জ্বল্‌জ্বল্ করছে, কিন্তু একটা জোর বাতাস সাগরে ঢেউ তুলেছে। ১ নম্বর ও ২ নম্বর দুর্গে বিদ্যুতের ঝল্‌কানি এসে মাটিতে ছিট্‌কে পড়ছে; বোমাবর্ষণের শব্দে বাতাস কাঁপছে, আর যে সব কালো কালো জিনিস ও পাথর আকাশে উড়ছে, তাকে আলোকিত কবে তুলছে। জেটির কাছে কি একটা জ্বলছে; তার পাণ্ডুর শিখা জলের বুকে প্রতিফলিত হচ্ছে। নিকোলায়েভ্‌স্কি কামান-ঘাঁটির অগ্নিকাণ্ডে মানুষ-বোঝাই সেতুটা আলোকিত হয়ে উঠেছে। আলেক্সান্দ্রভ্ কামান-ঘাঁটির কাছে অনেক দূরের অন্তরীপের মাথায় সাগরেব জলে আগুনের একটা দীর্ঘ জিহ্বা যেন নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে, আর তার আলোয় জলের উপব ভাসমান ধোঁয়ার মেঘ আলোকিত হয়ে আছে; শত্রু পক্ষের নৌবহরের দূরবর্তী জাহাজগুলির উপর কালকের রাতের মতোই একটা শান্ত, স্পর্ধিত আলো চিক্‌চিক্ করছে। একটা তাজা বাতাস আলোড়ণ তুলেছে উপসাগরের জলে। অগ্নিকাণ্ডেব আভায় ডুবিয়ে-দেওয়া রুশ জাহাজের মাস্তুলগুলি আলোকিত হয়ে উঠেছে; জাহাজগুলি একটু একটু করে জলের নিচে তলিয়ে যাচ্ছে। জাহাজের পাটাতনে একটাও মানুষের গলা শোনা যাচ্ছে না : দুই পাশের প্রবহমান উচ্ছ্বসিত জলের শব্দ ও ছেড়ে-দেওয়া বাষ্পের শব্দকে ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে ঘোড়ার হ্রেষা ও ক্ষুর ঠোকার শব্দ, ক্যাপ্টেনের নির্দেশ ও আহতদের আর্তনাদ। সারাটা দিন ভ্লাঙ্গ্ এর কিছুই খাওয়া হয়নি; পকেট থেকে একটুকরো রুটি বের কবে সে চিবোতে লাগল; হঠাৎ ভলোদিয়ার কথা মনে হতেই সে এতো জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল যে কাছের সৈন্যরাও শুনতে পেল।

"দেখো। আমাদের ভ্লাঙ্ খাচ্ছে আর কাঁদছে," ভাসিন বলল।

"মজার ব্যাপার!" আর একজন বলল।

ভ্লাঙ্ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলতে লাগল, "ওরা আমাদের সেনাবারিকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে! আমাদের কত ছেলের জীবন গেছে, কিন্তু ফরাসীদের কিছুই হয়নি!"

"অন্তত আমরা তো প্রাণ নিয়ে আসতে পেরেছি। সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও" ভাসিন বলল।

"তবু, এটা খুবই দুঃখের।"

"দুঃখ কিসের? তুমি কি মনে করো ওরা অবাধে এখানে থেকে যাবে? মোটেই না! আমরা আবার এটা দখল করে নেব, তুমি দেখে নিও! আমাদের কত লোক মারা গেল সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু স্বর্গে ঈশ্বর যেমন সত্য তেমনিই এটাও সত্য যে আমাদের সম্রাট হুকুম দেবেন আর আমরাও এটা দখল করে নেব। তুমি কি মনে করো, ওদের আমরা এটা রাখতে দেবো? কখনও না!" তারপর যেন ফরাসীদের লক্ষ্য করেই বলে উঠল, "তোমরা শুধু পাচিলগুলোই পাবে, বাকি সবগুলো ট্রেঞ্চই আমরা উড়িয়ে দিয়েছি।...কুর্গান-এর মাথায় তোমাদের পতাকার খুঁটি পুঁততে পারো, কিন্তু আমাদের শহরে নাক গলাতে এসো না! সবুর করো, তোমাদের সঙ্গে হিসাব-নিকাশ ঠিকই হবে—শুধু একটু সময় দাও।"

"নিশ্চয় হবে!" আরও একজন জোর দিয়ে বলল।

সেবাস্তোপল-এর যে দুর্গশ্রেণী এত মাস ধরে অসাধারণ উত্তেজনাপূর্ণ জীবনে ভরপুর ছিল, এত মাস ধরে যেখানে কত বীর এসেছে আর চলে গেছে, একের পর এক মৃত্যু তাদের টেনে নিয়েছে, এত মাস ধরে যা শত্রুপক্ষের মনে ভয়, ঘৃণা ও শেষ পর্যন্ত প্রশংসার উদ্রেগ করেছে—সেই সেবাস্তোপল দুর্গ আজ পরিত্যক্ত। সব কিছু মৃত, পরিত্যক্ত, বীভৎস—কিন্তু স্তব্ধ নয় : ধ্বংসের খেলা এখনও চলেছে। নতুন বোমা-বিস্ফোরণে ক্ষত-বিক্ষত মাটির উপর স্তূপীকৃত হয়ে ছড়িয়ে আছে বিধ্বস্ত কামানের খোল, তাতে চাপা পড়ে আছে রুশ ও শত্রুপক্ষীয় সৈনিকদের মৃতদেহ; চিরতরে স্তব্ধ লোহার ভারী কামানগুলো তীব্র শক্তিতে নিক্ষিপ্ত হয়ে মাটির মধ্যে অর্ধেক ঢুকে পড়ে আছে; শুধু গুলি, কামানের গোলা, মৃতদেহ, গর্ত, ভাঙা কাঠের টুকরো, সুরঙ্গ, আর তার উপরে ধূসর ও নীল গ্রেটকোট পরা অনেক মৃতদেহ। বোমা বর্ষণের শব্দে এখনও মাঝে মাঝে বাতাস বিদীর্ণ হচ্ছে, আর তার পাণ্ডুর আলোয় সব কিছুই নজরে পড়ছে।

শত্রুরা বুঝতে পেরেছে, এই ভয়ংকর সেবাস্তোপল-এর বুকে একটা দুর্বোধ্য কিছু ঘটে চলেছে। এই বিস্ফোরণ ও দুর্গের মৃত্যু-নীরবতা দেখে তাদের বুক কাঁপছে; সেদিন তারা যে কঠোর প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল সে কথা স্মরণ করে তারা

কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না যে তাদের নির্ভীক শত্রুরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে; তাই উৎকণ্ঠা ও আতংকের মধ্যেই তারা এই বিষণ্ণ রাত্রির অবসানের অপেক্ষা করছে।

গোটা সেবাস্তোপল-বাহিনী ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাতের সমুদ্রের মতো কখনও ফুলতে ফুলতে, কখনও দুলতে দুলতে, কখনও একত্র হয়ে, কখনও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উপসাগরের তীরে, সেতুর উপরে ও সেভেব্নায়া সাইড-এর এদিক থেকে ওদিকে চলতে চলতে এক সময় একত্র জড় হয়ে একটা মূর্তি ধরে ধীরে ধীরে সেই স্থানটিকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে যেখানে পড়ে রইল তাদেব দুঃসাহসী ভাইয়ের দল, যে স্থানটি তাদেরই রক্তে আগাগোড়া ভিজে গেছে, যে স্থানটিকে গত এগারো মাস ধরে দ্বিগুণ শক্তিধর শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেও আজ বিনা যুদ্ধে ছেড়ে চলে যাবার হুকুম হয়েছে তাদের উপর।

এই হুকুমের প্রতিক্রিয়ায় প্রথমে প্রতিটি সৈনিকের মনেই জেগেছিল বিমূঢ়তা ও বেদনা। তারপর জেগেছিল পশ্চাদ্ধাবনের ভয়। যে জায়গায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে তারা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল সেই জায়গা ছেড়ে যাওয়া মাত্রই তারা বড়ই অসহায়বোধ করল; অন্ধকারে ভয়তাড়িত হয়ে তারা সেতুটার উপর গিয়ে ভিড় করল; ঝড়ো হাওয়ার বেগে সেতুটা তখন দুলছিল। পদাতিক বাহিনীর সেনাদল, যানবাহন ও স্বদেশরক্ষী সৈনিক—সকলেই এক সঙ্গে সেতুর উপর উঠতে গিয়ে তাদের সঙ্গীনে-সঙ্গীনে ঠোকাঠুকি লাগল; প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে অশ্বারোহী অফিসাররাও তাদের মালপত্র নিয়ে ঠেলাঠেলি শুরু করে দিলো; স্থানীয় অধিবাসী ও আর্দালিরা মালপত্র মাথায় নিয়ে একটু জায়গার জন্য কান্নাকাটি ও মিনতি করতে লাগল; গোলন্দাজ বাহিনীও তাদের চাকাওয়ালা গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে তীরের দিকে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। যার যে কাজই থাকুক না কেন, আত্মরক্ষার তাগিদ এবং এই মৃত্যুপুরী থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে যাবার বাসনাই সকলের মনে সব চাইতে বড় হয়ে দেখা দিলো। যে সৈনিকটি মারাত্মকভাবে আহত হয়ে অনুরূপ আরও পাঁচশো সৈনিকের পাশে পাভ্লভস্কি জাহাজঘাটার পাষাণ-চত্বরে শুয়ে আছে এবং মুক্তির জন্য ঈশ্বরকে মিনতি জানাচ্ছে, যে স্বদেশরক্ষী সৈনিকটি জনৈক অশ্বারোহী জেনারেলকে পথ করে দেবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে এই নিরেট মানব-গোষ্ঠীর উপর চাপ দিচ্ছে, যে জেনারেলটি দৃঢ় হাতে মোড়টাকে আগলে রেখে সৈনিকদের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করছে, যে নাবিকটি চলমান একটি সৈন্যদলের মাঝখানে আটকা পড়ে ক্রমবর্ধমান জনতার চাপে দম বন্ধ হয়ে মরবার উপক্রম করেছে, যে আহত অফিসারটি চারজন সৈনিকবাহিত স্ট্রেচারে করে চলেছে আর তার সৈনিকরা বাধ্য হয়ে থেমে নিকোলায়েভ্স্কি কামান-ঘাঁটির কাছে স্ট্রেচারটিকে মাটিতে নামিয়ে রেখেছে, যে গোলন্দাজ সৈনিকটি ষোলো বছর ধরে কামান চালাবার পরে আজ তার কাছে একান্ত দুর্বোধ্য একটি আদেশে সহকর্মীদের সহায়তায় তার কামানটিকে খাড়া

পাহাড় বেয়ে ঠেলতে ঠেলতে উপকূলের দিকে নিয়ে চলেছে, এবং যে নাবিকরা তাদের জাহাজগুলি ডুবিয়ে দিয়ে তাদের বড় বড় নৌকোয় চেপে আপ্রাণ শক্তিতে জাহাজ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে,—সকলের মধ্যেই এই একই মনোভাব কাজ করছে। সে সেতুর অপর প্রান্তে পৌঁছে প্রায় প্রতিটি সৈনিকই টুপি খুলে ক্রুশচিহ্ন আঁকছে। কিন্তু এই স্বস্তির মনোভাবের পিছনে আরও একটি মনোভাব—অনুতাপ, লজ্জা ও ক্রোধের অনুরূপ একটি বেদনাদায়ক গভীরতম মনোভাবও কাজ করে চলেছে। প্রায় প্রতিটি সৈনিকই সেভারনয়া সাইড থেকে পরিত্যক্ত সেবাস্তোপল-এর দিকে ফিরে তাকিয়ে একটা অবর্ণনীয় তিক্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলছে আর তার দৃঢ়মুষ্টিকে তুলে ধরছে শত্রুপক্ষের দিকে।

২৭ ডিসেম্বর, সেন্ট পিতার্সবুর্গ

বল নাচের পরে

After the Ball

"তাহলে আপনারা বলছেন যে মানুষ স্বাধীনভাবে কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা মন্দ তা বিচার করতে পারে না, সব কিছুই পরিবেশের উপর নির্ভর করে—মানুষ পরিবেশের দাস। কিন্তু আমি বলি, সব কিছুই দৈবের অধীন এবং নিজের সম্পর্কেও আমি সেই কথাই বলতে পারি..."

মানুষের উন্নতিবিধানের কথা ভাববার আগে পরিবেশ এবং মানুষের জীবনধারণের পদ্ধতির পরিবর্তন সম্পর্কে আমাদের যে আলোচনাটি চলছিল আসলে কেউ বলেনি যে কোন্‌টা ভাল বা মন্দ তা স্বাধীনভাবে বিচার করা অসম্ভব, কিন্তু আইভান ভাসিল্‌য়েভিচের স্বভাবই ছিল আলোচনায় উদ্দীপ্ত হয়ে নিজের চিন্তাকে প্রকাশ করা এবং সেই চিন্তাপ্রসূত জীবনের অভিজ্ঞতাগুলিকে স্মরণ করা। মাঝে মাঝে তিনি গল্প বলতে বলতে এত মগ্ন হয়ে যেতেন যে তা বলবার কারণটাই ভুলে যেতেন; এটা ঘটত বিশেষত এই জন্য যে তিনি সব সময়ই কথা বলতেন গভীর আবেগ এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে। এবারেও ঠিক তাই বললেন।

"অন্তত আমার নিজের সম্পর্কে আমি এই দাবী করতে পারি। আমার নিজের জীবনও এইভাবেই গড়ে উঠেছে, অন্যভাবে নয়—পরিবেশের প্রভাবে নয়, সম্পূর্ণ অন্য কিছুর জন্য।"

"কিসের জন্য?" আমরা প্রশ্ন করলাম।

"সে তো এক বিরাট গল্প। যদি তোমরা শুনতে চাও আমি নিশ্চয়ই তোমাদের সব বলব।"

"তাহলে বলুন।"

আইভান ভাসিল্যেভিচ্ এক মুহূর্ত চিন্তা করে মাথা নাড়লেন।

"হ্যাঁ" তিনি বললেন, "আমার সমস্ত জীবনটাই এক রাতের মধ্যে পাল্টে গিয়েছিল, অথবা বলা যায় একটি সকালে।"

"কেন? কি হয়েছিল?"

"হয়েছিল এই যে আমি গভীরভাবে প্রেমে পড়েছিলাম। আমি এর আগেও প্রেমে পড়েছি, কিন্তু এত গভীরভাবে নয়। এটা ঘটেছিল অনেক বছর আগে—এতদিনে তার মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। তার নাম ছিল বি. ভারেঙ্কা বি। পঞ্চাশেও সে আশ্চর্য রকমের সুন্দরী, কিন্তু তার যৌবনে যখন সে ছিল অষ্টাদশী, সে ছিল স্বপ্নের মতো; দীর্ঘাঙ্গী, সুঠাম, লাবণ্যময়ী এবং রানির মতো—হ্যাঁ, রানির মতো। সে সব সময় এমন খাড়া হয়ে থাকত যে মনে হতো সে নিচু হতে পারে না; মাথাটা পিছন দিকে সামান্য হেলিয়ে রাখত; এটা তার সৌন্দর্য এবং দৈর্ঘ্যের সঙ্গে খাপ খেয়ে গিয়েছিল, এবং তাকে দিয়েছিল এমন এক রানিসুলভ মর্যাদা যে লোকে সসম্ভ্রমে দূরে সরে থাকত যদি না তার মুখের হাসিটা হতো এক প্রাণবন্ত ও চিত্তজয়ী, তার চোখ দুটি এত অপূর্ব উজ্জ্বল এবং তার সমস্ত যৌবনময় ব্যক্তিত্ব এত মোহময়ী।

"আইভান ভাসিল্যেভিচ্ নিশ্চয়ই একটু রং চড়িয়ে বললেন।"

"যতটা রং চড়িয়ে থাকি না কেন, আমি তোমাদের বোঝাতে পারব না সে ঠিক কি রকম ছিলো। কিন্তু সেটা অন্য ব্যাপার। যে ঘটনার কথা আমি বলব তা ঘটেছিল পঞ্চাশের দশকে।

"আমি তখন প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমি জানি না সেটা ভাল ছিল কি মন্দ ছিল, তবে সে সময় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমাদের মতো পাঠ-চক্রের বালাই ছিল না, তোমাদের মতো তাত্ত্বিক আলোচনাও হতো না; আমরা ছিলাম শুধুই যুবক এবং থাকতামও একদল যুবকের মতো—পড়াশুনা করতাম আর আনন্দে সময় কাটাতাম। আমি ছিলাম অত্যন্ত উচ্ছল এবং প্রাণবন্ত; এবং বেশ ধনী ছিলাম। আমি একটি তেজী ঘোড়ার গাড়ির মালিক ছিলাম এবং প্রায়ই মেয়েদের নিয়ে বেরিয়ে যেতাম (স্কেটিংয়ের চলন তখনো হয়নি); আমি আমার সহপাঠী ছাত্রদের সঙ্গে পান-ভোজের আসরে যেতাম (সে সময়ে আমরা শ্যাম্পেন ছাড়া আর কিছুই পান করতাম না; যদি পয়সা না থাকতো তো কিছুই পান করতাম না, কারণ আজকালকার ছেলেদের মতো আমরা কখনও ভদ্কা পান করতাম না); তবে এসব ভোজসভা এবং নাচের আসর আমি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করতাম। আমি খুব ভাল নাচিয়ে ছিলাম এবং ঠিক কুৎসিতও ছিলাম না।"

"থাক, আপনি বিনয় করবেন না।" একজন শ্রোতা বলল, "আমরা সকলে আপনার ছবি দেখেছি। আপনি ছিলেন সুদর্শন যুবক।"

"হয়তো তাই ছিলাম, কিন্তু সেটা আমি তোমাদের বলতে চাইনি। যখন আমার প্রেম চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তখন শ্রোভেটাইডের শেষ দিনে এক মহৎ উদার অতিথিবৎসল ধনী বৃদ্ধ মার্শালের দেওয়া বল নাচের আসরে যোগ দিতে গিয়েছিলাম। তাঁর স্ত্রী ঠিক তাঁর মতোই অমায়িক, আমাদের অভ্যর্থনা করছিলেন। তিনি পরেছিলেন একটা মখ্‌মলের গাউন এবং চুলে হীরের টায়রা। তার ফুলো-ফুলো সাদা গলা ও কাঁধ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল, ঠিক যেমনটি সম্রাজ্ঞী ইয়েলিজাভেতা পেত্রভ্‌নার ছবিতে দেখা যায়। নাচের আসরটি ছিল রাজকীয়। নাচঘরটি ছিল চমৎকার; সেখানে ছিল এক সঙ্গীতপ্রিয় জমিদারের অধীনস্থ বিখ্যাত সব গাইয়ে-বাজিয়েরা; ছিল প্রচুর খাদ্যবস্তু আর শ্যাম্পেনের স্রোত বইছিল। শ্যাম্পেন খুব ভালবাসলেও আমি পান করিনি—আমি তখন প্রেমের নেশায় মত্ত। আমি অবিরাম নেচেছিলাম। কোয়াড্রিল নাচলাম, ওয়াল্টজ্‌ ও পলিওনেসিস নাচলাম, এবং বলাই বাহুল্য যে যতটা পারলাম ভারেংকার সঙ্গেই বেশি নাচলাম! সে পরেছিল গোলাপী পটি দেওয়া সাদা পোশাক, সাদা দস্তনা যা তার কনুই পর্যন্ত পৌঁছয়নি। সরু ছুঁচোল ও সাদা সিল্কের চটি। অনিসিমোভ নামের এক বাউন্ডুলে ইঞ্জিনীয়ার তার সঙ্গে মাজুরকা নেচে আমাকে ঠকিয়েছিল। সেজন্য আমি তাকে কোনওদিন ক্ষমা করিনি। ভারেংকা নাচের ঘরে ঢুকেই সে তাকে আমন্ত্রণ জানালো; সেই সময় দস্তানা নেবার জন্য কেশচারণাকারীর কাছে গিয়েছিলাম বলে আমার দেরি হয়ে গিয়েছিল। আর সেই জন্যই তার সঙ্গে মাজুরকা নাচের বদলে আমি নেচেছিলাম একটি জার্মান মেয়ের সঙ্গে; তার প্রতি এককালে আমার একটা ঝোঁক ছিলো। তবে আমার মনে হয় সেই সন্ধ্যায় তার প্রতি আমি খুবই অবহেলা দেখিয়েছিলাম; তার সঙ্গে কথা বলিনি অথবা তার দিকে তাকাইনি। দীর্ঘাঙ্গী সুঠাম দেহ, গোলাপী ফিতে বাঁধা সাদা পোশাক পরা মেয়ে ছাড়া আর কারও দিকে তাকাইনি। শুধু আমি একা নই, প্রত্যেকেই এমন কি মেয়েরাও তার দিকে তাকাচ্ছিল এবং তার প্রশংসা করছিল; যদিও সে সবাইকে ম্লান করে দিয়েছিল। তাকে প্রশংসা না করাটাই ছিল অসম্ভব।

"আনুষ্ঠানিকভাবে মাজুরকা নাচে আমি তার সঙ্গী ছিলাম না, তবে বস্তুত আমি তার সঙ্গেই নেচেছিলাম—অন্তত নাচের বেশ খানিকটা। সামান্যতম সঙ্কোচ না করে সে সরাসরি ঘরের অন্য প্রান্ত থেকে নাচতে নাচতে আমার কাছে এল এবং আমন্ত্রণের জন্য অপেক্ষা না করে আমি যখন তার দিকে ছুটে গেলাম, তখনি সে মুচকি হেসে আমাকে ধন্যবাদ জানালো তার ইচ্ছেটা আমি ধরতে পেরেছি দেখে।

"যখন মাজুরকা নাচের ভঙ্গি পাল্টে ওয়াল্‌জ নাচ শুরু হলো, তখন আমি তার সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে ওয়ালজ নাচলাম আর সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে মৃদু হেসে আর

ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'আবার', এবং আমিও পর পর তার সঙ্গে ওয়াল্‌জ নাচলাম; শরীরের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, মনে হচ্ছিল শরীরটা যেন বাতাস দিয়ে গড়া।"

"শরীরের কথা ভুলে গিয়েছিলেন? আমি নিশ্চিত যে আপনি সে সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন, কারণ তখন দুই হাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরেছিলেন; কাজেই শুধু নিজের শরীর সম্পর্কেই নয়, বরং তার শরীর সম্পর্কেও আপনি সচেতন ছিলেন," অতিথিদের মধ্যে একজন বললেন।

আইভান ভাসিলয়েভিচ্ হঠাৎ লাল হয়ে চিৎকার করে উঠলেন :

"সেটা আপনাদের মতো নব্য যুবকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে—আপনারা তো শুধুই শরীর নিয়ে চিন্তা করেন; আমাদের সময় সবকিছুই আলাদা ছিল। আমি কত গভীরভাবে একটি মেয়েকে ভালবাসতাম, আমার কাছে সে তত বেশি দেহাতীত হয়ে উঠত। আজকাল আপনারা পা, গোড়ালি ও অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারে মাথা ঘামান; আপনারা যে মহিলাদের ভালবাসেন তাদের বিবস্ত্র করেন, কিন্তু আমার কাছে—বিখ্যাত লেখক আলফোঁসকার ঠিকই বলেছেন—আমার ভালবাসার পাত্রীটি থাকত সর্বদা ব্রোঞ্জের পোশাকে ঢাকা। উন্মোচিত করা দূরে থাক, আমরা চাইতাম তার নগ্নতাকে ঢাকতে, যেরকমটি করেছিলেন নোয়ার মহান সন্তান। কিন্তু আপনারা এসব বুঝবেন না।"

"ওর কথায় কান দেবেন না। আপনার গল্প চালিয়ে যান", আরেকজন শ্রোতা বললেন।

"যাই হোক, আমি প্রায় সবটা তার সঙ্গেই নেচেছিলাম; সময়ের কোনও খেয়ালই ছিল না। বাজিয়েরা এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল—আপনারা জানেন বল্ নাচের আসরের শেষে সব সময়ই এরকম হয়ে থাকে—তারা মাজুরকা নাচের বাজনা বাজিয়েই যেতে লাগল; খাবার ঘরে বাবা-মায়েরা নৈশ ভোজনের প্রত্যাশায় তাদের টেবিল থেকে উঠে পড়তে লাগল। চাকর বাকরেরা ছুটোছুটি করতে লাগল। এরকম চলেছিল প্রায় তিনটে পর্যন্ত। বাকি যে কয়েক মিনিট সময় ছিল, আমরা তার সদ্ব্যবহার করেছিলাম। আমি তাকে আর একবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম, এবং শততম বারে আমরা সারাটা ঘর ঘুরে ঘুরে নেচেছিলাম।"

"নৈশভোজনের পর আমি কি আপনার কোয়াড্রিল নাচের সঙ্গী হতে পারি?" তাকে তার নিজের জায়গায় নিয়ে যাবার সময় আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, যদি ওঁরা আমাকে বাড়িতে নিয়ে না যান", সে মৃদু হেসে বলেছিল।

"আমি ওদের নিয়ে যেতে দেব না", আমি বলেছিলাম।

"আমার পাখাটা দিন তো", সে বলেছিল।

"আপনাকে এটা ফিরিয়ে দিতে আমার কষ্ট হচ্ছে", তাকে ছোট্ট সাদা পাখাটি ফিরিয়ে দেবার সময় আমি বললাম।

"আরে! তাহলে আপনাকে কষ্ট পেতে হবে না", সে বলল; পাখাটি থেকে একটি পালক তুলে নিয়ে আমাকে দিলো।

"আমি পালকটা নিলাম, উচ্ছ্বাস আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা না পেয়ে আমি শুধু ওর দিকে একঝলক তাকালাম। আমি যে শুধু খুশি আর তৃপ্ত হয়েছিলাম তাই নয়—আমি সুখী হয়েছিলাম, ধন্য হয়েছিলাম, উদার হয়ে গিয়েছিলাম, আমি আর আমাতে ছিলাম না, আমি হয়ে গিয়েছিলাম এমন এক অপার্থিব প্রাণী যে কোনও পাপ জানে না, ভাল ছাড়া মন্দ কিছু করতে পারে না।"

"আমার দস্তানায় পালকটা গুঁজে নিলাম এবং চলৎশক্তিহীন হয়ে তার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম।

"দেখুন, ওরা বাবাকে নাচতে বলছে," একজন দীর্ঘদেহী সম্ভ্রান্ত পুরুষকে দেখিয়ে সে বলল।

তার বাবা একজন কর্নেল, রুপোর কাজ করা পোশাক পরা, এবং অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।"

"ভারেংকা, এদিকে এসো", হীরের টায়রা পরা গৃহকর্ত্রীটি ডাকলেন।

"ভারেংকা দরজার দিকে এগিয়ে গেল এবং আমি তাকে অনুসরণ করলাম।

'লক্ষ্মীটি, বাবাকে বলো তোমার সঙ্গে নাচতে। দয়া করে নাচুন, পিওতর ভ্লাদিস্লাভিচ্', কর্নেলকে বললেন গৃহকর্ত্রী।

"ভারেংকার বাবা ছিলেন দীর্ঘদেহী, সুদর্শন, সম্ভ্রান্ত এবং সুসংযত একজন বৃদ্ধ। তার লাল মুখে সাদা গোঁফজোড়া ছিল প্রথম নিকোলাসের কায়দায় পাকানো, দু'পাশের সাদা জুলফি গোঁফের সঙ্গে মেলানো, চুল পাট করে সামনের দিকে আঁচড়ানো; মেয়ের মতোই স্মিত হাসি তাঁর ঠোঁটে ও চোখে। তাঁর দেহটি খুবই সুগঠিত, চওড়া বুক ফৌজী কায়দায় চেতানো, তাতে পদকাদির পরিমিত বাহার, শক্ত কাঁধ এবং লম্বা সুন্দর পা। তিনি ছিলেন নিকোলাসের সমসাময়িক ধারার সামরিক চালচলনযুক্ত এক সেকেলে কায়দার অফিসার।

"যখন আমার দরজার কাছে গেলাম কর্নেল তখন প্রতিবাদ করে বলছেন তিনি নাচতে ভুলে গেছেন, তবুও মুচকি হেসে তলোয়ারে হাত দিলেন, খাপ থেকে খুলে নিয়ে তাঁর সেবার জন্য উন্মুখ একটি তরুণের হাতে সেটি তুলে দিলেন, এবং ডান হাতে সোয়েডের একটা দস্তানা পরে নিয়ে (সব কিছুই নিয়মমাফিক হতে হবে, একটু হেসে বললেন) মেয়ের হাত ধরে এক পাক ঘোরার ভঙ্গি করে সঠিক তালের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

"মাজুরকার সুর শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চট করে একটা পা ঠুকে অন্য পায়ে ভর দিলেন, এবং তখন তাঁর দীর্ঘ ভারী দেহটি সারা নাচের ঘরটি জুড়ে ভাসতে লাগল। তিনি একটা পা দিয়ে আর একটা পা ঠুকছিলেন—কখনও আস্তে বা

মৃদুভাবে, কখনও আবার দ্রুত তালে। ভারেংকার ছিপছিপে শরীর তাঁর পাশেই ভাসছিল। তাকে দেখা না গেলেও সে ঠিক সময়মতো তার সাটিনের জুতো পরা পায়ে বাবার সঙ্গে কখনও ছোট করে কখনও বড় করে তাল রাখছিল।

"সমস্ত অতিথিরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'জনের নাচের প্রতিটি ভঙ্গি লক্ষ্য করছিল। আমার যে অনুভূতি হয়েছিল তাতে যতটা প্রশংসা ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল গভীর উচ্ছ্বাস। বিশেষ করে কর্নেলের বুটজোড়া আমার মনকে নাড়া দিয়েছিল। সেগুলো ছিল বাছুরের চামড়ায় তৈরি; তবে কেতাদুরস্ত ছুঁচোল মুখের বদলে ভোঁতা মুখওয়ালা। অবশ্যই সেগুলো ফৌজী মুচীর তৈরি।" "আদরের মেয়েকে সাজিয়ে-গুজিয়ে সমাজে আনার সময় তিনি কেতাদুরস্ত বুটের বদলে সাধারণ বুট পরেন", আমি নিজের মনেই এই কথাগুলি বললাম, এবং সেই জন্যই তাঁর ভোঁদা-মুখওয়ালা বুট বিশেষ করে আমার মনকে নাড়া দিলো। যে কেউই বুঝতে পারছিল যে এককালে তিনি খুব ভাল নাচতেন কিন্তু এখন তিনি ভারী হয়ে গেছেন এবং তার পা'ও যথেষ্ট তৎপর নেই; ফলে তিনি যে ক্ষীপ্র ও সুন্দর ভঙ্গি করবার চেষ্টা করছিলেন সেগুলো করতে পারছেন না। কিন্তু তিনি বেশ ভালভাবেই দু'বার ঘরময় পাক দিলেন এবং প্রত্যেকে হাততালি দিয়ে উঠল যখন তিনি দ্রুত পা দুটো ছড়িয়ে দিলেন, এবং আবার জোড়া লাগিয়ে একটু মন্থরভাবেই একটা হাঁটুর উপর বসে পড়লেন। এবং সেও মৃদু হেসে আটকে যাওয়া ফ্রকটা মুক্ত করে নিয়ে অনায়াস ভঙ্গিতে বাবার চারপাশে ভেসে বেড়াতে লাগল। পুনরায় পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি আদর করে মেয়ের কাঁধের উপর হাত রাখলেন, তার কপালে চুমু খেলেন, তারপর তাকে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন, তিনি আমাকেই তার নাচের সঙ্গী মনে করেছিলেন। আমি বললাম আমি তা নই।"

"তাতে কি হয়েছে; তুমি ওর সঙ্গে নাচো", আন্তরিক হেসে তলোয়ার খাপে বাঁধতে বাঁধতে তিনি বললেন।

"ঠিক যেমন বোতল থেকে এক ফোঁটা জল পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জলটাই স্রোতের মতো বেরিয়ে পড়ে, ঠিক সেরকমই ভারেংকার প্রতি ভালবাসা আমার অন্তরের সমস্ত ভালবাসার পথ খুলে দিলো। আমি সমস্ত পৃথিবীকে ভালবাসায় আলিঙ্গন করলাম। আমি ভালবাসলাম হীরের টায়রা পরা গৃহকর্ত্রীটিকে, তার স্বামীকে, তার চাকরবাকরদের, এমনকি সেই হতভাগা আনিসিমভকেও যে স্পষ্টতই আমার উপর খুব চটে গিয়েছিল। আর ভোঁতা মুখওয়ালা জুতো পরা ওর বাবা, যার হাসিটা ঠিক ওরই মতো—তার প্রতিও অনাবিল ভালবাসা অনুভব করলাম।

"মাজুরকা নাচ শেষ হ'ল, এবং গৃহকর্ত্রী আমাদের নৈশভোজের-টেবিলে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু কর্নেল বি, আপত্তি জানালেন; বললেন তাকে ভোরে উঠতেই হবে। আমি শংকিত হলাম পাছে তিনি ভারেংকাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যান; কিন্তু সে তার মায়ের সঙ্গে রয়ে গেল।

"নৈশভোজের পর কথামতো ওর সঙ্গে মাজুরকা নাচলাম এবং তখন মনে হচ্ছিলো এর চেয়ে বেশি সুখ আর কিছু হতে পারে না; সে সুখ ক্রমশঃ বেড়েই চলল। আমি ভালবাসার কোনও কথাই বলিনি; আমি ওকে জিজ্ঞাসা করিনি, এমন কি নিজেকেও জিজ্ঞাসা করিনি, সে আমাকে ভালবাসে কি না। আমি তাকে ভালবাসি সেটাই যথেষ্ট ছিল; তবে একমাত্র ভয় কোনও কিছুতে আমার সুখ না নষ্ট হয়ে যায়।

"যখন আমি বাড়ি ফিরে পোশাক খুললাম এবং বিছানায় যাবার কথা ভাবলাম, তখনই বুঝতে পারলাম যে ঘুমের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আমার হাতে ছিল তার পাখার পালকটি আর তার একটি দস্তানা; যখন তাকে ও তার মাকে আমি তাদের গাড়িতে তুলে দিচ্ছিলাম, তখন সে ঐ দুটি জিনিস আমাকে দিয়েছিল। জিনিস দুটির দিকে তাকিয়ে আমি যেন তাকে আবার সেই মুহূর্তটিকে দেখতে পেলাম যখন নাচের সঙ্গী বাছাই করতে গিয়ে সে আমার স্বভাবটি অনুমান করে মিষ্টি গলায় বলেছিল 'খুব গর্বিত? তাই না?' তারপর খুশি মনে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, অথবা যখন খাবার টেবিলে শ্যাম্পেনে চুমুক দিতে দিতে গ্লাসের ওপর দিয়ে সে তার মধুর চোখদুটি তুলে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। তবে তাকে সব চাইতে বেশি ভাল লেগেছিল যখন সে তার বাবার সঙ্গে নাচছিল, তার পাশে পাশে সুন্দরভাবে ভেসে চলছিল, আর মুগ্ধ দর্শকদের দিকে তাকিয়ে নিজের ও বাবার জন্য আনন্দ ও গর্ব বোধ করছিল। তারা দু'জনই আমার মনে আপনা হতেই মিলেমিশে একাকার হয়ে এক গভীর কোমল অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।

সেই সময় আমি আর আমার স্বর্গত ভাই একসঙ্গে থাকতাম। আমার ভাইয়ের কাছে সমাজের কোনও মূল্য ছিল না, সে কখনও বল নাচের আসরে যেত না। সে এম. এ পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি হচ্ছিল এবং একেবারে নিয়মমাফিক জীবনযাপন করছিল। সে ঘুমিয়ে ছিল। তার জন্য আমার দুঃখ হলো যখন দেখলাম তার মাথাটা অর্ধেক কম্বলে ঢাকা অবস্থায় বালিশে ডুবে আছে—দুঃখ হলো এইজন্য যে আমার এই সুখের সে কিছুই জানল না, কোনওদিন তার অংশীদারও সে হবে না। আমাদের ভূমিদাস খানসামা পেত্রুশা মোমবাতি নিয়ে আমার কাছে এল এবং আমার জামাকাপড় ছাড়তে সাহায্য করতে চাইল, আমি তাকে নিষেধ করলাম। লোকটার ঘুমজড়ানো চোখ আর এলোমেলো চুল দেখে আমার কষ্ট হলো। যাতে কোনও শব্দ না হয়, সেই চেষ্টায় আমি পা টিপে টিপে নিজের ঘরে চলে এলাম এবং বিছানায় বসে পড়লাম। আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল, ঘুমোতে পারছিলাম না। ঘরের ভিতর গরম লাগছিল, তাই পোশাক না ছেড়েই আস্তে ঘর ছেড়ে বাইরে গেলাম, লম্বা কোটটা পরলাম, বাইরে যাবার দরজাটা খুললাম এবং বাইরে বেরিয়ে গেলাম।

"আমি যখন নাচের আসর থেকে আসি তখন বেজেছিল প্রায় পাঁচটা; এতক্ষণে প্রায় দু'ঘণ্টা কেটে গেছে; কাজেই যখন আমি বাইরে এলাম ততক্ষণে আলো দেখা

দিয়েছে। তখন ছিল প্রোভেটাইডের সেই চিরাচরিত আবহাওয়া—কুয়াশাচ্ছন্ন, রাস্তায় ভেজা বরফ গলে যাচ্ছে; বাড়ির ছাদ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়ছে। সেই সময় বি-রা থাকত শহরের উপকণ্ঠে একটি খোলা মাঠের এক প্রান্তে; একদিকে মেয়েদের স্কুল এবং অন্যদিকে বেড়াবার জায়গা। আমাদের নির্জন গলিটা দিয়ে এগিয়ে আমি বড় রাস্তায় পৌঁছলাম; সেখানে পথচলতি লোকদের এবং কাঠ বোঝাই স্লেজগাড়ির চালকদের সঙ্গে দেখা হলো; ঘোড়াগুলো চক্‌চকে জোয়ালেব নিচে তালে তালে মাথা নাড়ছে, চালকেরা কাঁধে গাছের ছালের আস্তরন পরে ভারী জুতোগুলো দিয়ে বরফের কাদা ভেঙে ভেঙে স্লেজগুলির পাশে পাশে চলেছে, রাস্তার দু'পাশে কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িগুলো-—সমস্ত কিছুই আমার কাছে বিশেষ প্রিয় এবং অর্থবহ মনে হচ্ছিল।

যে মাঠটায় তাদের বাড়ি সেখানে পৌঁছে বেড়াবার জায়গাটায় বেশ বড় আর কালো মতো কিছু একটা দেখলাম; ঢাক আর বাঁশির আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে তখন সুব বাজছে, মাঝে মাঝে মাজুবকাব সুর ভেসে আসছে মনে। কিন্তু এ যে আলাদা সুর—কর্কশ, অশুভ।

এটা কী হতে পারে? আমি অবাক হলাম, এবং সেই গাড়িচলা পিছল রাস্তাটা ধবে সেই শব্দের দিকে এগোতে লাগলাম। প্রায় একশ' গজ যাবাব পর একটু একটু করে বুঝতে পারলাম যে কুয়াশার মধ্যে অনেক মানুষের ভিড়। ওরা নিশ্চয়ই সৈন্য। "কুচকাওযাজ করছে" আমি ভাবলাম, এবং সেই পথ ধরে এগোতে লাগলাম; সঙ্গী ছিল তেলজবজবে পোশাক আব উড়ুনি গায়ে একটা কামার যে একটা বিরাট বোঝা মাথায় নিয়ে চলেছে। কালো কোট পরা দু'সারি সৈন্য পরস্পর মুখোমুখি হয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়েছিল; তাদের বন্দুকগুলো ছিল তাদের পাশে। তাদের পিছনে দাঁড়িয়েছিল একজন বাঁশিওয়ালা ও ঢাক বাজিয়ে একটি ছেলে। সেই বিশ্রী সুবটা তাবা বারবার বাজিয়ে চলেছে।

"ওরা কি করছে?" পাশে দাঁড়ানো কামারটাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

"একটা তাতারকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে কারণ সে পালাবার চেষ্টা করেছিল" দুটি সারির একেবারে পিছনে তাকিয়ে রাগতভাবে জবাব দিলো কামারটা।

"আমি সেই দিকেই তাকালাম; দেখলাম সাংঘাতিক কিছু দুটো সারির মধ্য দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। একজন মানুষ, কোমর পর্যন্ত উলঙ্গ, এবং দুটি সৈন্যের হাতে আড়াআড়িভাবে ধরা একটা বন্দুকের সঙ্গে কসে বাঁধা। তার পাশে হাঁটছেন লম্বা কোট আর ফৌজী টুপী পরা একজন দীর্ঘাকৃতি অফিসার। তার চেহারাটা আমার পবিচিত মনে হলো। বন্দীর সারা শীরর কুঁকড়ে যাচ্ছে, গলিত বরফে ডুবে যাচ্ছে, দু'পাশ থেকে অবিশ্রাম ঘুষি পড়ছে তার উপরে আর তারই ভিতর দিয়ে সে সামনে এগিয়ে চলেছে। যেই পিছিয়ে পড়ছে অমনি সৈন্যরা বন্দুকটা উঁচিয়ে তাকে সামনে

ঠেলে দিচ্ছে. আবার যেই একটু টলে পড়ছে অমনি তারা ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে সোজা করে দিচ্ছে। তার পিছনেই সমান তালে এগিয়ে চলেছেন দীর্ঘাকৃতি অফিসারটি। ইনি ভারেংকার বাবা; সেই লাল মুখ সাদা গোঁফ, আর জুলফি।

"প্রত্যেকটি ঘুষির পরেই বন্দীটি অবাক হয়ে তার যন্ত্রণা-বিকৃত মুখটা ঘুরিয়ে নিচ্ছে; সাদা দাঁত বার করে বারবার কিছু একটা বলছে। সে আমার খুব কাছে না আসা পর্যন্ত আমি কথাগুলো বুঝতে পারছিলাম না। সে বলার চাইতেও সে ফোঁপাচ্ছিলো বেশী। 'দয়া করো, ভাইসব; দয়া করো ভাইসব।'' কিন্তু ভাইদের কোনও দয়া ছিল না; এক সময় যখন মিছিলটি ঠিক আমার সামনে এল, আমি দেখলাম একটি সৈনিক দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এসে তাতারটির পিঠে এত জোরে হাতের চাবুকটা মারল যে সেটা বাতাসে হিস্-হিস্ আওয়াজ করল। তাতারটি সামনে পড়ে গেল, কিন্তু সৈন্যটি তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে তুলল, আর অন্যদিক থেকে আবার একটা ঘুষি পড়ল; তারপর এদিক থেকে আবার ওদিক থেকে কর্নেলটি গট্‌গট্ করে তার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলেন, একবার নিজের পায়ের দিকে তাকালেন, তারপর তাকালেন বন্দীটির দিকে; বাতাসে ভারী নিঃশ্বাস টানলেন, গাল ফোলালেন, দু' ঠোঁটের মাঝখান দিয়ে আস্তে আস্তে হাওয়া বার করলেন। যখন মিছিলটা আমাকে অতিক্রম করে গেল, তখন আমি সৈন্যদের সারির ভিতর দিয়ে বন্দীটির পিঠটা একনজর দেখলাম। অবর্ণনীয় ব্যাপার : কালো কালো রক্তে ভেজা, অমানুষিক। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে সেটা লাল কোনও মানবদেহের অংশ।

"হা ভগবান!'' আমার পাশে দাঁড়িয়ে কামারটা অস্ফুটস্বরে বলল।

"মিছিল এগিয়ে চলল। নুয়ে-পড়া, হাঁপিয়ে-ওঠা জীবটির উপর সমানে ঘুষির পর ঘুষি পড়তে লাগল। ঢাক বাজছে, বাঁশি বাজছে কর্কশ সুরে, আর দীর্ঘাকৃতি ঋজু কর্নেলটি তার পাশে হাঁটছেন দৃঢ়পদক্ষেপে। হঠাৎ কর্নেল থামলেন; এবং দ্রুত পায়ে একজন সৈনিকের কাছে এগিয়ে গেলেন।

"ফাঁকি দিচ্ছিস? দেখাচ্ছি তোকে!'' আমি শুনলাম তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন। ''এবার নে! এই নে!' আমি দেখলাম, তিনি তার শক্ত দস্তানা পরা হাত দিয়ে ছোটখাটো দুর্বল সৈনিকটির মুখে ঘুষি মারলেন, কারণ সেই লোকটির চাবুক যথেষ্ট জোরে তাতারটির রক্তাক্ত পিঠে পড়ছিল না।

"নতুন চাবুক আনো!'' চিৎকার করলেন কর্নেল। বলার সময় পিছন ঘুরতেই তিনি আমাকে দেখতে পেলেন। আমাকে না চেনার ভান করে আমার দিকে কুটিল, ভয়ঙ্কর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাড়াতাড়ি অন্য দিকে ঘুরলেন। আমার এত লজ্জা করছিল যে আমি বুঝতে পারছিলাম না কোন্ দিকে তাকাই, যেন আমি কোনও খারাপ কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছি। মাথা নিচু করে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে গেলাম। সারা পথ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম ঢাকের আওয়াজ, বাঁশীর তীক্ষ্ণ শব্দ, সেই কথাগুলি 'দয়া

করো ভাইসব', আর কর্নেলের সেই ক্রুদ্ধ দর্পিত চিৎকার 'এবার নে! এই নে।' আমার বুকের মধ্যে এমন একটা তীব্র দৈহিক যন্ত্রণা হচ্ছিল যে আমার গা-বমি করতে লাগল; বার বার আমি থেমে যাচ্ছিলাম। আমি অনুভব করলাম, এই দৃশ্য আমার মনে যে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে তাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতেই হবে। কিভাবে বাড়ি পৌঁছলাম, কিভাবে বিছানায় গিয়ে শুয়েছিলাম, সে সব কিছুই আমার মনে নেই। কিন্তু যে মুহূর্তে আমার তন্দ্রা এল তখনই আবার সবকিছু দেখলাম ও শুনলাম। লাফিয়ে উঠে বসলাম!

"এরকম কিছু নিশ্চয়ই তিনি জানেন যা আমি জানি না", কর্নেলের কথা ভাবতে গিয়ে নিজের মনেই আমি বললাম। তিনি যা জানেন তা যদি আমি জানতাম, তাহলে আমি সব বুঝতে পারতাম এবং যা দেখেছি তার জন্য এত কষ্ট পেতাম না। কিন্তু সাধ্যমতো বুদ্ধি খাটিয়েও আমি বুঝতে পারলাম না কর্নেল কি জানতেন। সন্ধে পর্যন্ত আমি ঘুমোতে পারলাম না। তারপর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে কিছু মদ্য পান করে সব কিছু ভুলে তবে ঘুমোতে পারলাম।

"আপনারা কি মনে করেন যে এ-ধারণা আমার হয়েছিল যে আমি যা দেখেছি তা খারাপ কিছু? সেরকম কিছু মোটেই নয়। 'যা আমি দেখেছি তা যদি দৃঢ় নিশ্চয়তার সঙ্গে করা হতো এবং প্রত্যেকেই যদি একে প্রয়োজনীয় বলে মনে করত, তাহলেই বোঝা যেত যে ওরা এমন কিছু জানে যা আমি জানি না,—এই সিদ্ধান্তেই আমি উপনীত হয়েছিলাম, এবং সেই কিছুটা যে কি সেটাই আমি বার করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোনওদিন আমি সেটা বার করতে পারিনি। আর বার করতে পারিনি বলেই আমি মিলিটারী চাকরিতেও যোগ দিতে পারিনি, যদিও সেটা করাই আমার ইচ্ছা ছিল। আর শুধু মিলিটারী চাকরিই নয়, কোনও চাকরিতেই যোগ দিতে পারিনি। তাই তো আজ আমি একটা 'নিষ্কর্মা'য় পরিণত হয়েছি।"

"আমরা ভাল করেই জানি আপনি কিরকম 'নিষ্কর্মা' হয়েছেন" বললেন একজন অতিথি। "বরং এটা বলাই সঠিক যে আপনি না থাকলে আরও কত লোককেই না নিষ্কর্মা হতে হতো!"

"এইবার একটা বোকার মতো কথা বললেন," সত্যি সত্যি বিরক্ত হয়ে বললেন আইভান ভাসিলয়েভিচ।

"যাই হোক্, আপনার প্রেমের কি হলো?" আমরা জিজ্ঞাসা করলাম।

"আমার প্রেম? সেই দিন থেকে আমার প্রেম উবে গেল। যখনই আমরা বেড়াতে যেতাম এবং সে তার বিষণ্ণ হাসিটি হাসত, তখন কিছুতেই মাঠের মধ্যে কর্নেলের সেই কথাগুলি মনে না করে আমি পারতাম না, আর তাতে আমার খুবই অস্বস্তি ও কষ্ট হতো; তাই আমি ধীরে ধীরে ওর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া বন্ধ করলাম। আমার প্রেম শেষ হয়ে গেল।

"আর অনেক সময়ই এরকমটা ঘটে; এবং এই ধরনের ঘটনাই একটি মানুষের সমস্ত জীবনে পরিবর্তন ঘটিয়ে তাতে নতুন মোড় আনে। আর তোমরা বলো পরিবেশের কথা," বললেন তিনি।

—১৯০৩

ফ্রাঁকয়েস

Francoise

(গী দ্য মোপাসাঁর একটি গল্প অবলম্বনে)

১

১৮৮২-র ৩রা মে তারিখে তিন মাস্তুলের সমুদ্রগামী জাহাজ "নতর-দেম-দ্য ভেঁৎস্" চীন সমুদ্রের উদ্দেশে হাভর্ থেকে ছাড়ল। চীনে পৌঁছে মাল খালাস করে বুয়েনস্ আয়ার্স-এর জন্য নতুন মাল বোঝাই করে, সেখান থেকে আবার নতুন মাল নিয়ে ব্রাজিল যাত্রা করল।

এই দীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রা ছাড়াও নানা কারণে জাহাজটার ফিরতে অনেক দেরি হলো। যন্ত্রের গোলযোগ, মেরামতির কাজ, মাসের পর মাস বাতাসের অভাব, ঝড়ে পথভ্রষ্ট হওয়া, সমুদ্রের নানা বিপদ ও নানা ধরনের দুর্ঘটনা পার হয়ে চার বছর পরে জাহাজটা ফ্রান্সে ফিরল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ১৮৮৬-র ৪ঠা মে আমেরিকার টিন ভর্তি ফল বোঝাই করে সেটা মার্সাইতে পৌঁছল।

জাহাজটা যখন হাভর্ থেকে ছেড়েছিল তখন আরোহী ছিল একজন ক্যাপ্টেন, একজন মেট ও চৌদ্দ জন নাবিক। যাত্রাপথে একজন নাবিক মারা গেল, বিভিন্ন ধরনের অভিযান চালাতে গিয়ে চারজন বেপাত্তা হয়ে গেল, আর যারা ফ্রান্স থেকে জাহাজে চেপেছিল তাদের মাত্র ন'জন বাড়িতে ফিরল। যাত্রী-তালিকা থেকে যাদের নাম কাটা গেল তাদের জায়গায় দু'জন আমেরিকানকে নেওয়া হয়েছিল; আর ছিল একজন নিগ্রো ও একজন সুইডেনবাসী; তাদের তুলে নেওয়া হয়েছিল সিঙ্গাপুরের একটা মদের দোকান থেকে।

সবগুলি পাল উড়িয়ে দেওয়া হলো, আর রশারশিগুলিও টান-টান করে বাঁধা হলো। একটা বাষ্পীয় নৌকো সশব্দে বাষ্প ছড়াতে ছড়াতে জাহাজটাকে টেনে নিয়ে ঘাটে নোঙর-করা জাহাজগুলোর এক সারিতে পৌঁছে দিলো। সমুদ্র শান্ত; সামান্য ঢেউ এসে তীরে আছড়ে পড়ছে। ঘাটে পর পর সাজানো জাহাজগুলির পাশে এ

জাহাজটাও তার জায়গা করে নিলো; পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের ছোট-বড়, নানা আকার, আকৃতি ও ধরনের জাহাজ গায়ে গা ঠেকিয়ে সেখানে দাঁড়িয়েছিল। নতর্-দেম-দ্য-ভেঁৎস্ জায়গা নিলো একটি ইতালীয় দুই মাস্তুলের জাহাজ এবং একটি দ্রুতগামী ইংলিশ জাহাজের মাঝখানে; সে জাহাজ দুটোও দু'দিকে সরে গিয়ে নতুন সঙ্গীর জন্য জায়গা করে দিলো।

শুল্কবিভাগীয় কর্মচারি ও বন্দর-কর্মচারিদের হাত থেকে ছাড়া পাবার পরেই ক্যাপ্টেন বেশির ভাগ যাত্রীকেই সে রাতের মতো তীরে নামবার অনুমতি দিয়ে দিলো।

আতপ্ত গ্রীষ্মের রাত। মার্সাইয়ের রাজপথ আলো-ঝলমল, খাবারের গন্ধে ভরপুর, নানা কলগুঞ্জন, যাত্রীর হৈ-চৈ, আর মাঝে মাঝেই উৎসবের শব্দে মুখরিত।

নতর্-দেম-দ্য-ভেঁৎস-এর নাবিকরা চারমাস মাটিতে পা ফেলেনি; এখানে তীরে নেমে নতুন শহরে অনভ্যস্ত আগন্তুকের মতো তারা জোড়ায়-জোড়ায় ভীরু পদক্ষেপে ঘুরে বেড়াতে লাগল। জাহাজঘাটের আশেপাশেই তারা ঘুরতে লাগল; আর কুকুর যে ভাবে কোনও কিছুর খোঁজে নাক শুঁকতে থাকে তেমনিভাবে চারিদিকে তাকাতে লাগল। চার মাস হলো তারা কোনও মেয়ে মানুষ দেখেনি। সকলের আগে হাঁটছে সেলেস্তাঁ দুক্রস্; কর্মঠ ও চটপটে; যখনই তারা জাহাজ থেকে মাটিতে নামে তখনই সে তাদের নেতৃত্ব দেয়। সে জানে কেমন করে দরকার মতো কেটে পড়া যায়; নাবিকরা তীরে পা দিলেই সাধারণত যে সব গোলমাল পাকিয়ে থাকে সে সব এড়িয়েই সে চলে; তাই বলে সে সঙ্গীদের ছেড়ে থাকে না; নিজের পায়ে দাঁড়াতেও জানে।

নালার মতো যে সব রাস্তা সমুদ্রের দিকে নেমে গেছে, যার স্যাঁতসেঁতে মদের ভাঁড়ার ও মদ খাবার খুপড়ি ঘরের দুর্গন্ধ নাকে লাগে, নাবিকরা কিছুক্ষণ সেই সব রাস্তায় ঘুরে বেড়ালো। অবশেষে সেলেস্তাঁ একটা সরু গলি পছন্দ করল, সেখানে বাড়িগুলোর দরজায় বড় বড় আলো জ্বলছে, সেই গলিতেই সে ঢুকে পড়ল। হেসে হেসে গান গাইতে গাইতে অন্যরাও তার পিছু নিলো। ঐ সব বাতির রঙিন কাঁচের উপর বড় বড় করে সংখ্যা লেখা আছে। নিচু দরজায় খড়পাতা চেয়ারে এপ্রন-পরা মেয়েরা সব বসে আছে। নাবিকদের দেখেই তারা ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এসে তাদের পথ আটকে দাঁড়াল এবং প্রত্যেকেই তাদের ভুলিয়ে নিজ নিজ খোঁয়াড়ে নিয়ে যেতে চাইল।

কখনও বা গলির শেষে একটা দরজা অপ্রত্যাশিতভাবে খুলে গেল, আর তার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল একটি অর্দ্ধনগ্ন নারী খুব খাটো ঘাঘরা ও সোনালীলেস বসানো অত্যন্ত নিচু কাটের ভেলভেটের বডিস পরে বসে আছে।

দূর থেকেই সে হয়তো চেঁচিয়ে ডাকল, "আহা! এখানে চলে এস বাছারা" অথবা

নিজেই ছুটে এসে একটি নাবিককে পাকড়াও করে টানতে টানতে নিজের গর্তের দিকে টেনে নিলে চলল। মাকড়সা যেমন করে নিজের চাইতে বেশি শক্তিশালী একটা মাছিকে ধবে, সেও ঠিক তেমনিভাবে নাবিকটির গায়ে লেপ্টে রইল। বেচারি একটু-আধটু বাধা দিলো, অন্যরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল. কিন্তু সেলেস্তাঁ দুক্রস্ হাঁক দিয়ে উঠল :

"ওখানে নয়, ওখানে যেয়ো না; এগিয়ে চলো!"

লোকটি কথা শুনল; জোব করে মেয়েমানুষটার কাছ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিলো; তার মুখের খিস্তি শুনতে শুনতে নাবিকবা এগিয়ে গেল। ঝগড়ার শব্দ শুনে বাস্তাব দু'পাশের অন্য মেয়েমানুষগুলো ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এসে তাদের উপব ঝাঁপিয়ে পড়ল; কর্কশ গলায় তারস্বরে নিজেদেব গুণপনাব বড়াই করতে লাগল; কিন্তু নাবিকরা ক্রমেই দূরে, আরও দূরে সবে পড়ল। পথে মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে দেখা হলো কোনও সৈনিকের—বুট খটখটিয়ে চলেছে, অথবা কোনও নিঃসঙ্গ করণিক বা মিস্ত্রির—যার যার অভ্যস্ত ডেরার দিকে এগিয়ে চলেছে। অন্য সব গলিতেও সেই একই ধরনের বাতি জ্বলছে, কিন্তু নাবিকবা উঠোন থেকে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসা দুর্গন্ধ পচা পাঁকের ভিতব দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দূবে অনেক দূবে এগিয়ে চলল। অবশেষে অন্যগুলোর চাইতে দেখতে ভাল একটা বাড়ির সামনে পৌঁছে দুক্রস্ থামল এবং সহকর্মীদেব নিয়ে ভিতবে ঢুকল।

২

নাবিকবা গণিকালয়ের বড় ঘরটাতে বসে আছে। প্রত্যেকেই একজন করে সঙ্গিনী বেছে নিয়েছে; এখানকার রীতি অনুসারে আজকের রাতটা কেউ তার সঙ্গিনীকে ছেড়ে যাবে না। তিনটে টেবিল পাশাপাশি পাতা হয়েছে; প্রথমেই নাবিকবা যার যার সঙ্গিনীকে নিয়ে মদ খেলো। তারপর তাদের নিয়ে উপরে উঠে গেল। ভারী বুট-পরা বিশখানা পায়েব শব্দ সজোরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাঠের সিঁড়িতে ধ্বনিত হলো; তারপর সরু দরজা পেরিয়ে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ঘবে ঢুকে গেলো। পুনবায় মদ খেতে সেখান থেকে নেমে এল, তারপর আবাব উপরে উঠে গেল।

বেপরোয়াভাবে চলল মদ খাওয়ার পালা। চারঘণ্টাব্যাপী এই অমিতাচাবেরফলে গোটা দু'মাসের বেতনই উড়ে গেল। এগারোটা নাগাদ সকলেই মাতাল হয়ে পড়ল, চোখ লাল করে এমন সব অসংলগ্ন উক্তি করতে লাগল যার অর্থই তাবা জানে না। চলল গান, হল্লা, টেবিল চাপড়ানো, আর মদ গেলা। বন্ধুদেব সঙ্গে সেলেস্তাঁ দুক্রস্ও আছে; তার সঙ্গিনী জুটেছে তাগড়াই চেহরার লাল গাল একটা মেয়েমানুষ। সেও অন্যদের মতোই মদ গিলেছে, কিন্তু এখনও মাতাল হয়নি : অল্প-বিস্তর সংলগ্ন চিন্তাই এখনও তার মাথায় ঘুরছে। তার মনটা নরম হলো, মেয়েটাকে কি যেন বলতে চেষ্টা

করল. কিন্তু কথাটা মাথায় এসেই তৎক্ষণাৎ হাওয়া হয়ে গেল; না পারল কথাটাকে স্মরণ করতে, না পারল সেটাকে মুখে বলতে।

হাসতে হাসতে বলল, "হ্যাঁ। ঠিক তাই...ঠিক তাই...তুমি কি এখানে অনেক দিন থেকে আছো?"

"ছ' মাস," মেয়েটা জবাব দিলো।

যেন কথাটা তার পছন্দ হয়েছে এমনিভাবে সে মাথা নাড়ল।

"এখানে বেশ আরামে আছ তো?"

মেয়েটা এক মুহূর্ত ভাবল।

বলল, "অভ্যাস হয়ে গেছে। কোনও রকমে বেঁচে তো থাকতে হবে। এ জায়গাটা দাসীগিরি অথবা ধোবিখানার কাজের মতো খারাপ নয়।"

যেন এ কথাটার জন্যও তাকে প্রশংসা করতেই সে আবাব সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

"এই দিকেই কি তোমার জন্ম?" সে বলল।

মেয়েটা মাথা ঝাঁকালো।

"তুমি কি অনেক দূর থেকে এসেছ?" সে আবার বলল।

মেয়েটা মাথা নাড়ল।

"কোথা থেকে?"

মেয়েটা চুপ করে রইল, বুঝি মনে করতে চেষ্টা করছে।

তারপর বলল, "আমি এসেছি পের্‌পিণ্‌নাম থেকে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা," বলে সে প্রশ্ন করা থামালো।

এবার মেয়েটা প্রশ্ন করল, "আর তুমি কি —নাবিক?"

"হ্যাঁ, আমরা নাবিক।"

"তোমরা কি লম্বা সমুদ্র-যাত্রায় বেরিয়েছ?"

"হ্যাঁ, বেশ লম্বা। সব রকম জায়গা আমরা দেখেছি।"

"পৃথিবী ঘুরেছ?"

"হ্যাঁ, কেবল একবার নয়—প্রায় দু'পাক ঘুরেছি।"

মেয়েটা আবার চুপ করল, যেন কিছু মনে পড়ে গেছে।

বলল, "তোমরা তো অনেক জাহাজ দেখেছ, তাই না?"

"তা তো বটেই।"

৩

"নতর্-দেম্-দ্য-ভেঁৎস-এর সঙ্গে কখনও দেখা হয়েছে কি? ওই নামের একটা জাহাজ আছে।"

মেয়েটা তাদের জাহাজেরই নাম করায় সে অবাক হলো; ভাবল, ওর সঙ্গে একটু মজা করবে।

বলল, "আরে, দেখা তো হয়েছেই; এই গত সপ্তাহেই সে জাহাজটার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল।"

"সত্যি কথা?" মেয়েটার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

"আসল সত্যি।"

"তুমি মিছে কথা বলছ না তো?"

সে দিব্যি গেলে বলল, "ঈশ্বর জানেন, আমি সত্যি কথাই বলছি।"

"আর সেই জাহাজের সেলেস্তা দুক্রস্ নামের একজন নাবিকের সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি?" মেয়েটি প্রশ্ন করল।

"সেলেস্তাঁ দুক্রস্?" বিস্মিত, এমন কি একটু ভীত হয়ে সে ঐ নামটাই পুনরায় উল্লেখ করল। এই মেয়েটা আমাব নাম জানল কেমন করে?

"কেন? তুমি তাকে চেন নাকি?" সে প্রশ্ন করল।

বোঝা গেল যে মেয়েটাও ভয় পেয়েছে।

"না, আমি চিনি না, কিন্তু এখানকার একটি মেযেমানুয তাকে চেনে।"

"কোন্ মেয়েমানুষ? সে কি এই বাড়িতে থাকে?"

"না, কিন্তু কাছেই থাকে।"

"কোথায় থাকে আমাকে বলো।"

"আহা, খুব বেশি দূরে নয়।"

"সে কে?"

"আহা, একটা মেয়েমানুষ—আমার মতোই।"

"ঐ লোকটার সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক?"

"তা আমি কেমন কবে জানব? হয়তো তারা একই দেশের মানুষ।"

তারা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পরস্পরকে দেখতে লাগল।

নাবিক বলল, "সে মেয়েমানুষটাকে আমি দেখতে চাই।"

"কেন? তাকে কি তোমার কিছু বলবার আছে?"

"তাকে বলতে চাই..."

"কি বলতে চাও?"

"বলতে চাই যে সেলেস্তাঁ দুক্রস্‌কে আমি দেখেছি।"

"সেলেস্তাঁ দুক্রস্‌কে তুমি দেখেছ! সে কি বেঁচে আছে? ভাল আছে?"

"খুব ভাল আছে। কিন্তু তাতে তোমার কি?"

মেয়েটা চুপ করে গেল; কি যেন ভাবতে লাগল। তারপর নরম গলায় বলল, "নতর্-দেম-দ্য-ভেঁৎস্ কোন্ বন্দরে ভিড়বে?"

"কোন্ বন্দরে? কেন, মার্সাইতে।"

"সত্যি?" মেয়েটা চিৎকার করে উঠল।

"খুব সত্যি।"

"আর তুমি দুক্লস্‌কে চেনো?"

"আগেই তো বলেছি আমি তাকে চিনি।"

মেয়েটা খানিক ভাবল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালই হলো," মেয়েটা নরম গলায় বলল।

"তার সঙ্গে তোমার কি দরকার?"

"তোমার সঙ্গে যদি তার দেখা হয়তো তাকে বলো. না, থাক!"

"তাকে কি বলব?"

"না ও কথা থাক।"

মেয়েটার দিকে চেয়ে চেয়ে নাবিকটি ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠল।

শুধালো, "তুমি কি নিজে তাকে চেনো?"

"না, আমি নিজে তাকে চিনি না।"

"তাহলে তাকে দিয়ে তোমাব কি দরকার?"

মেয়েটা জবাব দিলো না; লাফ দিয়ে উঠে কাউন্টাবের দিকে ছুটে গেল; সেখানে বাড়িউলি বসে ছিল। একটা লেবু তুলে নিয়ে দু'টুকরো কবে কেটে সবটা রস নিংড়ে একটা গ্লাসে ফেলে গ্লাসটাকে জলে ভর্তি করে সেলেস্তাঁকে দিলো।

আগের মতোই তার হাঁটুর উপব বসে বলল, "এই যে—এটা খেয়ে নাও।"

"তোমার মাথাটা পরিষ্কার হবে। তারপর তোমাকে কিছু বলব। খেয়ে নাও।"

জলটা খেয়ে সে হাতের উল্টো পিঠে মুখটা মুছল।

"আচ্ছা, তাহলে এবার বলো! মন দেয়ে শুনছি।"

"কিন্তু আমার সঙ্গে যে তোমার দেখা হয়েছে একথা তাকে বলতে পারবে না, বা কারও কাছ থেকে একথা শুনেছ তাও বলবে না।"

"ঠিক আছে, বলব না।"

"প্রতিজ্ঞা করো!"

সে প্রতিজ্ঞা করল।

"ঈশ্বর তোমার সহায় হন!"

"ঈশ্বর আমার সহায় হন!"

"আচ্ছা, তাকে বলো তার বাবা-মা দু'জনই মারা গেছে, আর তার ভাইও মারা গেছে। একটা জ্বর দেখা দিলো, আর তাতেই এক মাসের মধ্যেই সকলেই মারা গেল।

দুক্লস্-এর মনে হলো, সব রক্ত তার বুকে এসে জমা হচ্ছে। কি বলবে বুঝতে না পেরে কয়েক মিনিট সে চুপ করে বসে রইল। তারপর বলল :

"তুমি ঠিক জানো?"

"খুব ঠিক।"

"তোমাকে কে বলেছে?"

মেয়েটা নাবিকের কাঁধে হাত রেখে তার চোখের দিকে সোজা তাকাল।

"দিব্যি করো, একথা কাউকে বলবে না।"

সে দিব্যি করল : "ঈশ্বর আমার সহায় হন!"

"আমি তাব বোন!"

"ফ্রাঁকয়েস!" নাবিক আর্তনাদ করে উঠল।

মেয়েটি একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল; আস্তে আস্তে তার ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল; অতি কষ্টে উচ্চারণ করল কয়েকটি শব্দ ·

"তাহলে তুমি সেলেস্তাঁ।"

কেউ এতটুকু নড়ল না; পবস্পরের চোখেব দিকে তাকিয়ে অবশ দেহে বসে রইল।

চারিদিকে সকলেই মাতালের মতো চিৎকাব করছে। গ্লাসের ঠোকাঠুকি, হাততালি ও গোড়ালির ঠক্‌ঠক্, মেয়েমানুষের তীব্র আর্তনাদ, আব গান ও হৈ-হল্লা মিলেমিশে একাকার।

"এটা কেমন কবে ঘটল?" এত আস্তে সে কথাটা বলল যে মেয়েটি পর্যন্ত শুনতে পেল না।

হঠাৎ মেয়েটিব দুই চোখ জলে ভরে উঠল।

সে বলতে লাগল, "তারা মারা গেল। এক মাসে তিনজন। আমি কি করব? একেবারে একা। ওষুধ ডাক্তার, তিনজনেব সৎকার...ধার শোধ করতে সব কিছু বিক্রি করতে হলো। পরনেব পোশাক ছাড়া আর আমার কিছুই ছিল না। মঁসিয় কাচুর বাড়ি গেলাম দাসীর কাজ নিয়ে।...তাকে তোমার মনে আছে? খোঁড়া লোকটা। আমার বয়স সবে পনেবো। তুমি যখন বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে তখন তো চৌদ্দ বছরও হয়নি—আব আমি লোকটার সঙ্গে ভিড়ে গেলাম।...তুমি তো জানো আমার মতো চাষার মেয়েগুলো কী বোকা। তারপর নার্সেব কাজ নিয়ে গেলাম এক লেখ্য প্রামাণিকের পরিবারে—তার সঙ্গেও একই ব্যাপার। কিছুদিন সে আমাকে উপপত্নী হিসাবে রাখল, আমাকে একটা আলাদা বাসা দিলো, কিন্তু সে ব্যবস্থা বেশি দিন চলল না। সে আমাকে ছেড়ে গেল, আর তিন দিন আমার কোনও খাবার জুটল না। কেউ আমাকে নিলো না, তাই অন্য সকলের মতো আমিও এখানে চলে এলাম।" কথাগুলি বলতে বলতে তার চোখ ও নাক বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে তার গাল দুটি ভিজিয়ে মুখে পড়তে লাগল।

"আমরা কি করেছি?" নাবিক বলল।

কাঁদতে কাঁদতেই মেয়েটি ফিস্ ফিস্ করে বলল, "আমি ভেবেছি যে তুমিও মারা গেছ। এ ছাড়া আমি আর কি করতে পারতাম?"

সেও ফিস্ ফিস্ করে বলল, "কিন্তু তুমি আমাকে দেখে চিনতে পারোনি কেন?"

আরও জোরে কেঁদে উঠে মেয়েটি বলল, "আমি জানি না। সেটা আমার দোষ নয়।"

নাবিক আবার বলল, "আমিই বা তোমাকে চিনব কেমন করে? যখন বাড়ি ছেড়ে চলে আসি তখন তুমি কত অন্য রকম ছিলে! কিন্তু আমাকে চেনা তো তোমার উচিত ছিল!"

মেয়েটি হতাশভাবে দুই হাত উপরে তুলল।

"আঃ। কত লোককে দেখতে পাচ্ছি—এই সব লোক। এখন আমার চোখে তারা সকলেই সমান!"

নাবিকের বুকের ভিতরটা এত তীব্র যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যেতে লাগল যে মার-খাওয়া ছোট ছেলের মতো তার কাঁদবার ইচ্ছা হলো।

উঠে দাঁড়িয়ে সে মেয়েটিকে হাতের কাছে টেনে নিলো; নাবিকের মস্ত বড় দুই থাবার মধ্যে তার মাথাটাকে ধরে অপলক চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

একটু একটু করে সে বোনটিকে চিনতে পারল : সেই ছোট্ট, সুকুমার, হাসিখুসি মেয়েটি যাকে আরও অন্য সকলের সঙ্গে বাড়িতে রেখে সে চলে গিয়েছিল। হায়! ভাগ্যদোষে তাদের কাউকে আর সে দেখতে পাবে না।

সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "হ্যাঁ, তুমি ফ্রাঁকয়েস! আমার বোন!" হঠাৎ সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল—মাতালের হিক্কার শব্দের মতো একটা জোয়ান মানুষের ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ তার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল। সে বোনের মাথাটা ছেড়ে দিলো; এক ধাক্কায় টেবিলের গ্লাসগুলোকে উল্টে ফেলে দিয়ে ভেঙে চুরমার করে ফেলল; তারপর অসংযত গলায় চিৎকার করে উঠল।

বন্ধুরা অবাক হয়ে তার দিকে এগিয়ে এল।

একজন বলল, "দেখো, ওর পা কেমন টলছে।"

আর একজন বলল, "ওর চিৎকারটা থামাও।"

"এই দুক্লস্! এ ভাবে চেঁচাচ্ছ কেন? চলো, আবার উপরে যাই," বলতে বলতে তৃতীয় বন্ধুটি এক হাতে সেলেস্তাঁর আস্তিন চেপে ধরল; আর এক হাতে সে তখন একটি হাস্যমুখী, কৃষ্ণনয়না, নিচু কাটের গোলাপী রঙের রেশমী পোশাক পরা মেয়েকে জড়িয়ে ধরে আছে।

হঠাৎ দুক্লস্ শান্ত হয়ে গেল; নিঃশ্বাস আটকে বন্ধুদের দিকে তাকাল। তারপর লড়াইতে নামবার আগে তার মুখে সাধারণত যে বিচিত্র দৃঢ়সংকল্পের ভাব ফুটে ওঠে সেই ভাব মুখে ফুটিয়ে সে আলিঙ্গনাবদ্ধ মেয়েটিসহ সেই নাবিকের কাছে টলতে

টলতে এগিয়ে গেল এবং হাত তুলে এমনভাবে আঘাত করল যাতে তারা দু'জন দু'দিকে সরে গেল।

"দূর হয়ে যাও! দেখছ না ও তোমার বোন। এরা প্রত্যেকেই কারও না কারও বোন। দেখো, এই আমাব বোন ফ্রাঁকয়েস। হা, হা...হা।" সে এমনভাবে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল যেটা শোনালো হাসির মতো। তারপরেই টলতে টলতে দুই হাত তুলে সে ধপাস করে মেঝেতে পড়ে গেল; গড়াতে গড়াতে মেঝের উপর হাত-পা ঠুকতে লাগল; দম বন্ধ হয়ে মরবার উপক্রম হলো।

বন্ধুদের একজন বলল, "ওকে বিছানায শুইয়ে দিতে হবে। আমরা যদি পথে বেরিয়ে যাই তাহলে ওকেও তুলে নিয়ে যেতে হবে।"

কাজেই সেলেস্তাঁকে তুলে ধরে তারা তাকে ধরাধরি করে দোতলায় ফ্রাঁকয়েস-এর ঘরে নিয়ে গিয়ে তার বিছানায় শুইয়ে দিলো।

১৮৯২

চীনা মাটির পুতুল

China clay doll

বিয়ের ছ'মাস পরে স্ত্রীর ছোট বোন "সংগ্রাম ও শান্তি" উপন্যাসের নাতাশা-কে লেভ্ তলস্তয় কর্তৃক লিখিত একখানি চিঠি।

প্রথম কয়েকটা পংক্তি তার স্ত্রীর হাতে লেখা, বাকিটা লেখা তার নিজের হাতে।

২১শে মার্চ, ১৮৬৩

আরে তানিয়া, তুমি কি শুকিয়ে গেলে?...আমার কাছে তো চিঠি লেখই না, অথচ তোমার চিঠি পেতে আমার এত ভাল লাগে; আর লেভচ্‌কা-র (তলস্তয়ের) পাগলা পত্রের জবাবটাও তুমি এখনও দাওনি; অবশ্য সে পত্রের একটি শব্দও আমি বুঝতে পারিনি।

২৩ শে মার্চ

দেখো, সে লিখতে আরম্ভ করে হঠাৎ বন্ধ করে দিয়েছে, কাবণ সে লেখাটা চালিয়ে যেতে পারেনি। কেন তা কি তুমি জানো তানিয়া সোনা? তাব কপালে একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটেছে, আর বিচিত্রতর ব্যাপার ঘটেছে আমাব কপালে। তুমি তো জানো, আমাদের সকলের মতোই সে আগাগোড়াই রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ; সে অবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা দুই তার আছে : তার শ্বাস-প্রশ্বাস চলে, কখনও আতপ্ত

আবার কখনও খুব গরম থাকে, নাক ঝাড়ে (আর কী জোরে!), ইত্যাদি, ইত্যাদি; সব চেয়ে বড় কথা হাত-পা গুলো তার নিয়ন্ত্রণেই থাকে, আর সেগুলোকে সে ইচ্ছামতো অবস্থায় রাখতে পারে : এক কথায় সে আমাদেব সকলের মতোই দেহধারী জীব। হঠাৎ ১৮৬৩-ব ২১শে মার্চ রাত দশটার সময় তাব ও আমার ভাগ্যে এই অসাধারণ ব্যাপারটা ঘটল। তানিয়া! আমি জানি তুমি তাকে আগোগোড়াই ভালবাসতে (এখন সে তোমার মনে কি অনুভূতি জাগাবে তা আমি জানি না); আমি জানি আমাকে তুমি সহানুভূতির চোখেই দেখতে; তোমার যুক্তিশীলতা, জীবনের প্রধান ব্যাপারগুলি সম্পর্কে তোমাব সুস্থ দৃষ্টিকোণ, এবং বাবা-মার প্রতি তোমার ভালবাসার কথাও আমি জানি (দয়া করে এই ঘটনার কথা জানিয়ে তাদেরও প্রস্তুত করে রেখো), আর তাই কিভাবে ব্যাপারটা ঘটেছিল সেটা তোমাকে লিখছি।

সেদিন খুব ভোরে উঠে আমি অনেক দূর পথ পায়ে হেঁটে ও ঘোড়ায় চেপে পার হয়েছিলাম। আমরা এক সঙ্গেই লাঞ্চ ও ডিনার খেয়েছিলাম এবং পড়াশুনা করছিলাম (সে তখনও পড়তে পারত); আমার বেশ শান্ত ও সুখী লাগছিল। দশটার সময় আমি পিসিকে শুভরাত্রি জানিয়ে শুতে চলে গেলাম। (সোনিয়া তখনও বেশ স্বাভাবিক ছিল এবং জানাল যে আমার পরেই সে আসছে।) ঘুমের মধ্যেই শুনতে পেলাম সে দরজাটা খুলল; পোশাক খুলবার সময় তার নিঃশ্বাসের শব্দও আমি শুনতে পেলাম।.. সে যে পর্দার ওপাশ থেকে বেরিয়ে বিছানার কাছে এল তাও শুনতে পেলাম। চোখ খুললাম...আর দেখলাম—যে সোনিয়াকে তুমি ও আমি চিনি সে নয়,—কিন্তু এক চীনা মাটির সোনিয়া! একেবারে সেই চীনা মাটি দিয়ে তৈরি যা নিয়ে তোমার বাবা ও মায়ের মধ্যে ঝগড়া ছিল। খোলা ঠাণ্ডা কাঁধ, গলা ও বাহু সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, কিন্তু শরীরটার মতোই একই চীনা মাটি দিয়ে তৈরি সেই পুতুলগুলো তো তুমি দেখেছ। কালো রং করা বড় বড় ঢেউ তোলা মাথার চুল, মাথার একেবারে উপরটাতে ঘসা লেগে লেগে রংটা উঠে যায়, চীনা মাটির বেরিয়ে-আসা চোখ দুটো বেশ বড় বড়, চোখের কোণগুলোও কালো রং করা, আর ঘামবার শক্ত ভাঁজগুলোও একটা গোটা চীনা মাটির খণ্ড দিয়ে তৈরি। সোনিয়াকেও দেখতে ঠিক সেই রকম লাগল! তার বাহুতে হাত ছোঁয়ালাম—মসৃণ, সুখস্পর্শ, ঠাণ্ডা চীনা মাটি। ভাবলাম আমি হয়তো ঘুমিয়ে আছি, তাই নিজেকে একটা ঝাঁকুনি দিলাম। সে কিন্তু সেই রকমই রয়ে গেল; অচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললাম, তুমি কি চীনা মাটির তৈরি? মুখ না খুলেই (মুখটা যেমন ছিল তেমনই রইল—উজ্জ্বল লাল রং করা বাঁকা ঠোঁট) সে জবাব দিলো : হ্যাঁ, আমি চীনা মাটির তৈরি। আমার পিঠ বেয়ে একটা কাঁপুনি নেমে গেল। তার পায়ের দিকে তাকালাম : তাও চীনা মাটির তৈরি, আর (আমার আতংকটা কল্পনা করতে পারো) সে পা দুটি একখণ্ড চীনা মাটি থেকেই তৈরি বেদির উপর স্থাপিত; ঘাসের আদল আনবার জন্য তাতে সবুজ রং

করা হয়েছে। তার বাঁ পায়ের পাশে হাঁটুর একটু উপরে ও পিছন দিকে বাদামী রং-করা একটা চীনামাটির স্তম্ভ ঠিক গাছের কাণ্ডের আদলে তৈরি। সেটাও তার সঙ্গে একই খণ্ড থেকে তৈরি। বুঝতে পারলাম, এই কাণ্ডটা না থাকলে সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পাবত না, আর তুমি তো তাকে ভালবাস, তাই বুঝতেই পারো এতে আমার কত দুঃখ হলো। তখনও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না, তাকে ডাকতে শুরু কবলাম। গাছেব কাণ্ড ও বেদীটা ছাড়া সে নড়তে পারল না; বেদীটা শুধু একটু দুলে তবে আমার দিকে ঘুরল। চীনা মাটির বেদীটা যে মেঝেতে একটা ঠোক্কর খেলো তাও আমি শুনতে পেলাম। আবাব তাকে ছুঁলাম; সেই একই মসৃণ, সুখস্পর্শ ঠাণ্ডা চীনা মাটি। তার হাতটা তুলতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না। তার পাশ ও কনুইয়ের ভিতর দিয়ে একটা আঙুল, এমন কি একটা নখ গলাতে চেষ্টা কবলাম—কিন্তু তাও অসম্ভব। সেই একই চীনা মাটির বাধা যা তৈরি হয় আযেববাক-এ, এবং যা দিয়ে তৈরি হয় চাটনি রাখার নৌকো। শুধু বাইবে থেকে দেখাব মতো করেই তাকে বানানো হয়েছে। তাব সেমিজটা পরীক্ষা কবে দেখলাম. তাও উপরে-নিচে দেহেব সঙ্গে একটিমাত্র খণ্ড থেকেই তৈবি। আরও কাছে থেকে লক্ষ্য কবে দেখলাম, তাব সেমিজের ভাঁজের একটা টুকরো ভেঙে নিচে পড়ে আছে। আব সেটাতে বাদামী বং ধরেছে। মাথার ঠিক উপরে যেখানে রংটা চটে গেছে সেখানটা সাদা দেখাচ্ছে। একটা ঠোঁটের এক জাযগাযও রং চটে গেছে এবং একটা কাঁধেবও একটুখানি ভেঙে গেছে। কিন্তু সব কিছু এতই সুন্দব ও স্বাভাবিকভাবে তৈরি হয়েছে যে সে হুবহু আমাদের সোনিযা। লেস বসানো সেমিজটাও আমার চেনা, পিছনে কালো চুলে একটা গিঁট দেওয়া, তবে চীনা মাটিব; আর নরম হাত। বড় বড় চোখ, ঠোঁট— সবই এক, তবে চীনা মাটির; গালের তিলটি, কাঁধেব সামনেকার ছোট হাড়, তাও আছে. তবে চীনা মাটিব। আমার অবস্থা সাংঘাতিক; কি বলব, কি কবব, কি ভাবব, কিছুই বুঝতে পাবছি না। আমাকে সাহায্য করতে পাবলে সে খুশি হতো। কিন্তু একটা চীনা মাটিব জীব কিই বা করতে পারে? একটু দূর থেকে দেখলে আধ-বোজা দুটি চোখ, চোখের পক্ষ্ম, ভুরুযুগল, সবই একেবারে জীবন্ত সোনিযাব মতো। সে আমার দিকে তাকালো না, তার দৃষ্টি বিছানার দিকে। বোঝা গেল, সে শুয়ে পড়তে চাইছে, বেদীটাব উপর সারাক্ষণ দুলছে। নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেললাম, তাকে চেপে ধরলাম, বিছানায় নিয়ে যেতে চেষ্টা করলাম। তাব ঠাণ্ডা চীনা মাটিব শবীরেব উপর আমাব আঙুলের কোনও ছাপ পড়ল না; কিন্তু আমি আরও বিস্মিত হয়ে দেখলাম, সে একটা খালি জলের পাত্রের মতো হাল্কা হয়ে গেছে। হঠাৎ মনে হলো সে যেন কুঁচকে যাচ্ছে; সে খুব ছোট হয়ে গেল, আমাব হাতের তালুর থেকেও ছোট, যদিও তখনও দেখতে ঠিক আগেব মতোই আছে। একটা বালিশ তুলে নিয়ে তাকে বালিশের একটা কোণায় রেখে অপর কোণটা আমার মুঠ দিয়ে চেপে ধরলাম, এবং তাকে সেখানে রাখলাম:

তাবপর তার রাত-টুপিটা নিয়ে চার ভাঁজ করে সেটা দিয়ে তাকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে দিলাম। একই ভাবে সেখানে শুয়ে রইল। তারপর মোমবাতিটা নিভিয়ে দিয়ে তাকে আমার দাড়ির নিচে আনলাম। হঠাৎ বালিশের কোণা থেকে একটা শব্দ শুনতে পেলাম : "লেভা, আমি চীনা মাটি হয়ে গেছি কেন?" কি জবাব দেবো জানি না। সে আবার বলল, "আমি যে চীনা মাটির মূর্তি হয়ে গেছি তাতে কি কোনও তফাৎ হয়েছে?" তাকে কষ্ট দিতে আমি চাইনি, তাই বললাম যে কিছুই হয়নি। অন্ধকারে আবার তাকে ছুঁলাম—ঠিক আগের মতোই আছে, ঠাণ্ডা চীনামাটি। তার পেটটাও জীবন্ত অবস্থায় যেমনটি ছিল তেমনি আছে, উপর দিকে ঠেলে উঠেছে...একটা চীনামাটিব পুতুলের পক্ষেও অবস্থাটা অস্বাভাবিক। তখনই আমার একটা বিচিত্র অনুভূতি হলো। সে যা হয়েছে তাতে হঠাৎ আমি খুশি হয়ে উঠলাম; আমার বিস্ময়েব ঘোব কেটে গেল—ব্যাপারটাকে স্বাভাবিকই মনে হলো। তাকে বের কবে এক হাত থেকে আব এক হাতে নিলাম, আমার মাথার নিচে দোলাতে লাগলাম। সেও এটা পছন্দ করল। আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে ঘুম থেকে তাব দিকে না তাকিয়েই বেরিয়ে গেলাম। আগেব দিন যা কিছু ঘটেছে সবই ভয়ংকব বলে মনে হলো। লাঞ্চের জন্য ফিরে এসে দেখি সে আবাব আগে যা ছিল তাই হয়ে গেছে। সে ও পিসী দুঃখ পাবে এই ভয়ে গতকালের কাণ্ডকারখানার কথা কিছুই তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম না। তুমি ছাড়া এখনও পর্যন্ত আর কাউকে এ কথা বলিনি। ভেবেছিলাম ও-পাট শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু তার পর থেকে যখনই শুধু আমরা দু'জন থাকি তখনই সেই একই ঘটনা ঘটে। হঠাৎ সে ছোট হয়ে যায়, চীনা মাটিব পুতুল হয়ে যায়। কিন্তু অন্য সকলের সামনে সে যা ছিল ঠিক তাই থাকে। এতে তার কোনও কষ্ট হয় না, আমারও না। শুনতে অবাক লাগলেও আমি খোলাখুলিই স্বীকাব কবছি যে এ ব্যাপারে আমি খুশি, আর সে চীনা মাটির পুতুল হলেও আমরা খুব সুখে আছি!

প্রিয় তানিযা, তোমাকে এ সব কথা লিখছি শুধু এই কারণে যাতে তুমি তার বাবা-মাকে খববটা জানিয়ে তাদের মনটাকে তৈরি করে রাখতে পারো, এবং বাবুজীর মারফতে ডাক্তারের কাছ থেকে এই ঘটনার তাৎপর্যটা জেনে নিতে পারো; আর একথাও জেনে নিতে পারো যে আমাদের ভাবী সন্তানের পক্ষে এর ফল কোনওরকম খারাপ হবে কি না। এখন আমরা একলা আছি; সে আমার নেক-টাইটার নিচে বসে আছে; আমি বুঝতে পাবছি যে তার ছোট খাড়া নাকটা আমার গলায় বসে গেছে। গতকাল তাকে একলা একটা ঘরে রেখেছিলাম। ভিতরে ঢুকে দেখি, ডোরা (আমাদের ছোট কুকুর) তাকে এক কোণে টেনে নিয়ে গেছে, তার সঙ্গে খেলা করছে, এবং তাকে ভেঙে ফেলবার উপক্রম করছে। ডোরাকে চাবুক মেরে সোনিয়াকে আমার ওয়েস্টকোটের পকেটে পুরে আমার পড়ার ঘরে নিয়ে গেলাম। অবশ্য আমি তুলা-তে একটা ছোট কাঠের বাক্স বানাতে দিয়েছি; তার বাইরেটা মরোক্কো চামড়া দিয়ে

মোড়া থাকবে আর ভিতরটা জড়ানো থাকবে রাস্পবেরি রঙের ভেলভেট দিয়ে; বাক্সটার মধ্যে এমনভাবে জায়গা করা হবে যাতে তাকে শুইয়ে দিলে, কনুই, মাথা ও পিঠ সমানভাবে সুরক্ষিত থাকবে, কোনও কিছু ভাঙবার ভয় থাকবে না। আশা করছি আজই সেটা এসে যাবে। বাক্সটাকে শ্যাময় চামড়া দিয়েও আগাগোড়া ঢেকে দেবো।

চিঠিটা লিখে শেষ করেছি এমন সময় একটা ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটে গেল। সে টেবিলটার উপর দাঁড়িয়েছিল; এমন সময় এন. পি. (নাতালিয়া পেত্রভ্না অখোৎনিৎস্কায়া নামে একটি বৃদ্ধা তখন ইয়াস্নায়া পলিয়ানাতে থাকত) তার পাশ দিয়ে যাবার সময় তার সঙ্গে ধাক্কা লাগে; আর পড়ে গিয়ে কাঠের কাণ্ডটা সহ তার একটা পা হাঁটুর ঠিক উপরে ভেঙে গেছে। আলেক্সি (ইয়াস্নায়া পলিয়ানার নায়েব) বলছে, ডিমের কুসুম দিয়ে তৈরি সিমেন্ট দিয়ে ওটা জুড়ে দেওয়া যাবে। এ রকম কোনও ওষুধ যদি মস্কোতে জানা থাকে তো আমাকে পাঠিয়ে দিও।

(১৮৬৩-তে লিখিত; মৃত্যুর পরে প্রকাশিত)

শয়তান

Devil

১

ইউজেন ইর্তেনেভ-এর সম্মুখে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। সেখানে পৌঁছবার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই তার আছে স্বদেশে প্রশংসনীয় শিক্ষা, পিতার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ সম্মানের সঙ্গে আইনের স্নাতক, আর সদ্য প্রয়াত বাবার কল্যাণে উঁচু মহলের সঙ্গে অনেক রকম যোগাযোগ; জনৈক মন্ত্রীর সহায়তায় সে তো ইতিমধ্যেই একটা মন্ত্রি-দপ্তরে কাজ পেয়ে গেছে। তাছাড়া একটা সম্পত্তিও আছে, অনিশ্চিত হলেও সম্পত্তিটা বেশ বড়ই। তার বাবা বিদেশে ও পিতার্সবুর্গে বাস করত; দুই ছেলে ইউজেন ও আন্দ্রেকে (সেই বড়, অশ্বারোহী রক্ষীবাহিনীতে কাজ করে) বছরে ছ' হাজার রুবল করে পাঠাত, এবং সস্ত্রীক নিজে প্রচুর খরচপত্র করত। গরমের সময় দু'মাস মাত্র জমিদারিতে যেত, তাও জমিদারির কাজকর্ম নিয়ে মাথা ঘামাতো না; সব ভার ছেড়ে দিয়েছিল একজন দুর্নীতিপরায়ণ ম্যানেজারের হাতে। অবশ্য সেও কাজকর্ম দেখত না, তবু তার উপর বাবার ছিল অগাধ বিশ্বাস।

বাবার মৃত্যুর পরে দুই ভাই যখন সম্পত্তি ভাগ করতে বসল তখন দেখা গেল ঋণের পরিমাণ এত বেশি যে উকিল পরামর্শ দিলো, তারা যেন এই উত্তরাধিকার

অস্বীকার করে এক লক্ষ রুবল মূল্যের ঠাকুরমার দেওয়া সম্পত্তিটাই শুধু হাতে রাখে। কিন্তু জনৈক প্রতিবেশি জোতদার, যার সঙ্গে বুড়ো ইর্তানেভ-এর বৈষয়িক লেন-দেন ছিল, অর্থাৎ সে বাবার কাছ থেকে হ্যান্ড-নোট নিয়েছিল আর সেই ব্যাপারেই পিতার্সবুর্গে এসেছিল, সে বলল যে, প্রচুর ঋণ থাকা সত্ত্বেও এমনভাবে বিলিব্যবস্থা করতে পারে যাতে প্রচুর সম্পত্তি তারা হাতে রাখতে পারবে (অবশ্য সেজন্য চার হাজার দেসিয়াতিন কালোজমি, চিনির কারখানা ও দু'শো' দেসিয়াতিন জলাজমি সমেত সমৃদ্ধ সমেনভ জমিদারিটা রেখে জঙ্গল ও কিছু কিছু দূরবর্তী জমি বেচে দিতে হবে); তাছাড়া, সেখানে থেকে জমিদারি দেখাশুনা করতে হবে, এবং বুদ্ধিমানের মতো কম খরচে চাষ-আবাদ করতে হবে।

সুতরাং বসন্তকালে (বাবা মারা যায় লেন্ট-উৎসবের সময়) ইউজেন নিজে জমিদারিতে গিয়ে সব কিছু দেখে শুনে স্থির করল, সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করে মাকে নিয়ে গ্রামে গিয়ে বসবাস করবে, এবং মূল জমিদারিটাকে ঠিক রাখতে নিজেই সব কাজকর্ম দেখবে। দাদার সঙ্গে তার খুব গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল; তার সঙ্গে ব্যবস্থা হলো, দাদাকে সে হয় বছরে চার হাজার রুবল দেবে, আর না হয় এককালীন আশি হাজার দেবে, আর বিনিময়ে আন্দ্রু তাব উত্তরাধিকারের অংশ ভাইকে দিয়ে দেবে।

এইভাবে সব ব্যবস্থা পাকা করে সে মাকে নিয়ে বড় বাড়িটাতে উঠে গেল এবং সাগ্রহে ও সতর্কতার সঙ্গে জমিদারি দেখাশুনা করতে লাগল।

সাধারণত ধরে নেওয়া হয় যে বুড়োরা রক্ষণশীল, আর যুবকরা পরিবর্তনের পক্ষপাতী। সেটা সব সময় সত্য নয়। প্রায়ই দেখা যায় যে যুবকরাই রক্ষণশীল — তারা বাঁচতে চায়, কিন্তু কেমন করে বাঁচতে হবে সে কথা ভাবে না, ভাববার সময়ও নেই, তাই তারা যে ধরনের জীবনযাত্রা দেখতে তারা অভ্যস্ত সেটাকেই আদর্শ বলে মেনে নেয়।

ইউজেনের বেলায়ও তাই হলো। গ্রামে স্থিতু হয়েই তার লক্ষ্য ও আদর্শ হলো যে ধরনের জীবনযাত্রা আগে ছিল সেটাকে ফিরিয়ে আনা; তার বাবার সময়কাব ব্যবস্থা নয়—পরিচালক হিসাবে বাবা মোটেই ভাল ছিল না,—ফিরিয়ে আনতে হবে ঠাকুর্দাব আমলের ব্যবস্থা। তাই তাব প্রচেষ্টা হলো, বাড়িতে, বাগানে, জমিদারি পরিচালনায় ঠাকুরদার জীবনযাত্রার আবহাওয়াটাকে ফিরিয়ে আনা—অবশ্য কালধর্ম অনুযায়ী পরিবর্তন করতে হবে—আর সব কিছুই করতে হবে বড় মাপে—শৃঙ্খলা, সুপরিচালনা, ও সকলের সন্তুষ্টি বিধান। কিন্তু এ কাজ করা প্রচুর শ্রমসাপেক্ষ। উত্তমর্ণ ও ব্যাংকের দায়-দাবী মেটানো দরকাব; সেজন্য কিছু জমি বিক্রি করা হলো এবং নতুন করে ধারও করা হলো। কিছু জমি বর্গা দিয়ে এবং কিছু জমিতে ভাড়াটে মজুর দিয়ে চাষের ব্যবস্থা করে চারশো' দেসিয়াতিন চাষের জমি ও চিনির কারখানা সমেত

সেমেনভ জমিদাবিব কাজকর্ম চালাতে এবং অবহেলিত ধ্বংসন্মুখ বাগানটাকে ঠিকমতো গড়ে তুলতে তো অনেক টাকাব দবকাব।

অনেক কাজ কবা দবকাব, আব ইউজেনেবও দৈহিক ও মানসিক শক্তিব অভাব নেই। তাব বযস ছাব্বিশ, উচ্চতা মাঝাবি, গড়ন শক্ত, জিম্‌নাস্টিক-কবা পেশীবহুল দেহ। সতেজ শবীব, সমস্ত গলাটাই খুব লাল, দাঁত ও ঠোঁট ঝকঝকে, মাথাব চুল ঘন না হলেও নবম ও কোঁকড়ানো। একমাত্র দৈহিক ক্রটি দৃষ্টিক্ষীণতা, চশমা ব্যবহাব কবে নিজেই সেটা ঘটিয়েছে, ফলে এখন আব পিঁস্-নে ছাড়া চলেই না আব এবই মধ্যে নাকেব উপব একটা দাগ পড়ে গেছে।

এই হলো তাব দেহ গঠন। আব মনেব গঠন সম্পর্কে বলা যেতে পাবে যে লোকে তাকে যত ভাল কবে চিনছে ততই বেশি কবে পছন্দ কবছে। মা আগাগোড়াই তাকে অন্যেব চাইতে বেশি ভালবাসে, এখন স্বামীব মৃত্যুব পবে শুধু সবটুকু স্নেহই নয়, গোটা জীবনটাই তাকে দিয়ে ফেলেছে। শুধু যে মা-ই তাকে এত ভালবাসে তা নয়। উচ্চ বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালযেব বন্ধুবাও তাকে ভালবাসত, শ্রদ্ধা কবত। যাব সঙ্গে দেখা হয় তাব উপবেই এ প্রভাব সে বিস্তাব কবতে পাবে। সে যা বলে তাকে বিশ্বাস না কবা অসম্ভব. যে মানুষটি এমন স্বচ্ছ, সৎ মুখ ও বিশেষ কবে এমন চোখেব অধিকাবী তাব মধ্যে কোনও প্রতাবণা বা মিথ্যাব অস্তিত্ব সন্দেহ কবাও যে অসম্ভব।

সাধাবণভাবে তাব ব্যক্তিত্বই কাজকর্মেব ক্ষেত্রে তাকে অনেক সাহায্য কবে থাকে। যে উত্তমর্ণ অন্যাকে ফিবিযে দেয সেও তাকে বিশ্বাস কবে। কবণিক, গ্রাম প্রধান, বা চাষী—সে হয়তো অন্যেব সঙ্গে চালাকি খেলত বা অন্যকে ঠকাতো, সেও এই দযালু প্রীতিকব, সৎ লোকটিকে ঠকাবাব কথাই ভুলে যেত।

মে মাসেব শেষ দিক। ইউজেন শহবে গিয়ে একটা পতিত জমিব বন্ধক খালাস কবিযে সেটাকে জনৈক ব্যবসায়ীব কাছে বিক্রী কবে তাব কাছ থেকেই আবও কিছু টাকা ধাব কবে একটা প্রয়োজনীয় গোলা বাড়ি গড়ে তোলাব জন্য নতুন কবে ঘোড়া, মোষ, ও গাড়ি কিনবাব আযোজন কবে ফেলল। গাড়িতে কাঠ বোঝাই কবা হলো, মিস্ত্রিবা কাজে লাগল, আশিটা গাড়ি বোঝাই কবা সাব আনা হলো, কিন্তু সব কিছুই ঝুলে বইল একটা সুতোব সঙ্গে।

২

এই সব ঝামেলাব মধ্যেই এমন একটা কিছু ঘটল যেটা সাধাবণ ব্যাপাব হলেও সে সময়ে ইউজেনকে কষ্ট দিতে লাগল। একজন যুবক হিসাবে অন্য সব স্বাস্থ্যবান যুবকেব মতোই আবও নানা ধবনেব মেয়ে মানুষেব সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছে। সে লম্পট নয়, আবাব সে নিজেই বলে, সন্ন্যাসীও নয়। সে বলে, শবীবেব স্বাস্থ্য বক্ষাব জন্য ও মনকে ভাল বাখাব জন্য যতটুকু দবকাব ততটুকুই সে ওদিকে মন দিযে

থাকে। ষোল বছর বয়স থেকেই এটা শুরু হয়েছে, এবং এতদিন বেশ ভালভাবেই চলে এসেছে—তার মানে, কখনও সে নিজেকে লম্পট হতে দেয়নি, কখনও ঢলাঢলি করেনি, আর কোনওরকম রোগও বাঁধায়নি। প্রথমে পিতার্সবুর্গে তার ছিল একটা দর্জি মেয়েমানুষ; তারপর সে নষ্টামী শুরু করাতে ইউজেন অন্য ব্যবস্থা করে, এবং সব কিছু এমন নিরাপদে চলতে থাকে যে তা নিয়ে কখনও কোনও চিন্তার কারণ ঘটেনি।

কিন্তু এখন গ্রামে এসে বাস করার দ্বিতীয় মাসেই সে যে কি করবে তাই ভেবে পাচ্ছে না। বাধ্যতামূলক আত্ম-সংযমের ফল তার পক্ষে ভাল হচ্ছে না।

তাহলে কি সেজন্য তাকে শহরেই যেতে হবে? কোথায় যাবে? কি ভাবে যাবে? এই নিয়েই তার যত দুর্ভাবনা; কিন্তু যেহেতু তার নিশ্চিত ধারণা যে জিনিসটা প্রয়োজন, সেটা তার চাইই, তাই ক্রমে সেটা অনিবার্য প্রয়োজন হয়ে দেখা দিলো. আর তাই তার চোখ দুটি আপনা থেকেই যে কোনও মেয়ে মানুষকে অনুসরণ করতে লাগল।

কোনও বিবাহিতা স্ত্রীলোক অথবা নিজের গ্রামের কুমারী মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ঘটানো তার মনঃপূত নয়। লোকের মুখে সে শুনেছে যে এ ব্যাপারে তার বাবা ও ঠাকুরদা দু'জনই ছিল সে সময়কার অন্য জমিদারদের চাইতে আলাদা। তারা কখনও নিজেদের বাড়িতে কোনও চাষী-রমণীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ত না। তাই সে স্থির করল, তেমন কাজ সেও করবে না, কিন্তু কিছুদিন পরে যতই নিজের ভিতরকার তাড়না বাড়তে লাগল, কাছাকাছি শহরে গেলে কপালে কি ঘটবে এই কল্পনা যতই ভয়ংকর হয়ে দেখা দিতে লাগল, যতই সে ভাবতে লাগল, ভূমিদাসত্বের যুগ যখন শেষ হয়ে গেছে, তখন এখানেই কাজ চালানো যেতে পারে। শুধু এমনভাবে কাজটা করতে হবে যাতে কেউ জানতে নাপারে, আর কাজটা করা হবে লম্পটের তাড়নায় নয়, স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনে—নিজেকে সেই ভাবেই সে বোঝালো। আর এই সংকল্প করার পরেই সে আরও বেশি অস্থির হয়ে উঠল। গ্রাম-প্রধান, চাষী, বা ছুতোর, যার সঙ্গেই কথা বলুক, আপনা থেকেই সেখানে সে মেয়েমানুষের প্রসঙ্গ নিয়ে আসত। আর একবার সে প্রসঙ্গ উঠলে সেটাই চালিয়ে যেত। মেয়েদের প্রতি তার নজর ক্রমেই বেড়ে চলল।

৩

কোনও কিছু মনে মনে স্থির করা এক জিনিস। আর তাকে কার্যে পরিণত করা আর এক জিনিস। নিজে কোনও মেয়ের কাছে প্রস্তাব করা তো অসম্ভব। কাকে প্রস্তাব করবে? কোথায়? অন্য কারও মারফতে করতে হবে, কিন্তু কার কাছে কথাটা পাড়বে?

ঘটনাক্রমে জঙ্গলের মধ্যে পাহারাদারের কুঁড়ে ঘরে সে একদিন জল খেতে গেল। পাহারাদারটি ছিল তার বাবার শিকারী। ইউজেন আইভানিচ তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলো, আর লোকটিও শিকার-খেলার কতকগুলি মজাদার গল্প বলতে শুরু করল। ইউজেন আইভানিচের মনে হলো, এই কুঁড়ে ঘরে অথবা এই জঙ্গলে ব্যাপারটার আয়োজন করাই সুবিধাজনক হবে; কিন্তু আয়োজনটা কিভাবে করা হবে, অথবা বুড়ো দানিয়েল তার ভার মেনে নেবে কিনা, সেটাই তার জানা নেই। "হয়তো এ প্রস্তাব শুনেই সে ভীষণ ভয় পাবে আর আমারও লজ্জার শেষ থাকবে না, আবার হয়তো খুব সহজেই সে রাজী হয়ে যাবে।" দানিয়েলের গল্প শুনতে শুনতে সে এই সব ভাবতে লাগল। দানিয়েল তখন বলছে, একদা কোনও দূরবর্তী মাঠে তারা যখন গির্জার কর্মচাবির স্ত্রীর কুঁড়ে ঘরে উঠেছিল তখন সে ফিদর জাখারিচ প্রিয়ানিশ্‌নিকভ-এর জন্য একটা মেয়ে মানুষকে এনে হাজির করল।

"এই তো ঠিক আছে," ইউজেন ভাবল।

"আপনার বাবা (তার অক্ষয় স্বর্গলাভ হোক) কিন্তু এ সব বাজে মালে ভুলতেন না।"

"এতে চলবে না", ইউজেন ভাবল। কিন্তু ব্যাপারটা পরীক্ষা কবার জন্য বলল, "এ ধরনের খারাপ কাজ তোমরা করতে কেমন করে?"

"কিন্তু এর মধ্যে খারাপ কি আছে? মেয়েটাও খুসি হলো, আর ফিদর জাখারিচও তুষ্ট হলেন, খুব তুষ্ট। আমি পেলাম এক রুবল। আরে, তিনিই বা কি করবেন? তিনিও তো জোযান পুরুষ, আর মদও খান।"

"হ্যাঁ, এখন বলা যেতে পারে", এই কথা ভেবে ইউজেন সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেল।

"আর তুমি কি জানো দানিয়েল, আমিও আর সইতে পারছি না," সে বুঝল তার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

দানিয়েল হাসল।

"আমি সন্ন্যাসী নই—এতে আমি অভ্যস্ত।"

সে বুঝতে পারল যে কথাগুলি খুবই বাজে, কিন্তু দানিয়েল তাতে সায় দেওয়াতে সে খুসি হলো।

"আহা, একথা আমাকে আগে বলতে হয়। খুব ব্যবস্থা হবে; শুধু বলে দিন, কাকে আপনার চাই।"

"আরে, আমার কাছে সব সমান। অবশ্য, কুৎসিত না হয়, আর স্বাস্থ্যবতী হয়।"

"বুঝেছি।" সংক্ষেপে জবাব দিয়ে দানিয়েল ভাবতে লাগল।

"আহা! একটা রসালো খাবার আছে", সে বলতে শুরু করল। ইউজেন আবার লাল হয়ে উঠল। "রসালো খাবার! শুনুন বলি। গত হেমন্তকালে মেয়েটার বিয়ে

হয়।" এবার দানিয়েল ফিস্‌ফিসিয়ে বলল,—"আর সে ব্যাটা কিছু করতে পারেনি। তাহলেই ভাবুন, যে চায় তার কাছে এ মালের কী কদর।"

লজ্জায় ইউজেনের ভুরু কুঁচকে গেল।

বলল, "না, না। ওসব আমি চাই না। বরং আমি চাই, আমি চাই সে স্বাস্থ্যবতী হবে, আর কোনও রকম গোলমাল থাকবে না—মানে এমন মেয়ে যার স্বামী সৈন্যদলে বা ঐ রকম কোথাও চলে গেছে।"

"আমি জানি। আপনার জন্য স্তেপানিদাকেই আনতে হবে। তার স্বামী শহরে চলে গেছে, ঐ সৈনিকের মতোই আর কি। মেয়েটা খুব ভাল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আপনি সন্তুষ্ট হবেন। এমনিতেই সেদিন তাকে বলেছিলাম—তোমার যাওয়া উচিত, কিন্তু সে..."

"তাহলে কখন?"

"আপনি চাইলে কালই। আমি কিছুটা তামাক আনতে গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে আসব, আর ডিনারের সময় এখানে চলে আসুন, অথবা সজি-বাগানের পিছনে স্নান-ঘরে আসুন। কাছেপিঠে কেউ থাকবে না। তাছাড়া, ডিনারের পরে সকলেই একটু চোখ বোজে।"

"তাহলে এই ঠিক রইল।"

ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি ফিরবার পথে একটা তীব্র উত্তেজনা ইউজেনকে পেয়ে বসল। "কি হবে? একটা চাষী-মেয়ে কেমন হয়? ধরুন যদি দেখা যায় যে সে কুৎসিত, ভয়ংকর? না, সে বেশ সুন্দরী", তার দেখা কয়েকটি মেয়ের কথা মনে পড়ায় সে নিজেকেই বলল। "কিন্তু আমি কি বলব? কি করব?"

সারাটা দিন সে আত্মহারা হয়ে কাটাল। পরদিন দুপুরে বন-রক্ষকের বাড়ি গেল। দানিয়েল দরজায় দাঁড়িয়েছিল; নীরবে অর্থপূর্ণভাবে জঙ্গলের দিকে ইসারা করল। ইউজেনের বুকের মধ্যে সব রক্ত ছুটে এল; সেটা বুঝতে পেরে সে সজি-বাগানে গেল। সেখানে কেউ নেই। স্নান-ঘরে গেল—সেখানেও কেউ নেই; ভিতরে ঢুকে বেরিয়ে এল; হঠাৎ একটা গাছের ডাল ভাঙার শব্দ কানে এল। সে ঘুরে তাকালো—ছোট খাঁড়িটার ওপারে একটা ঝোপের মধ্যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। খাঁড়ির ভিতর দিয়ে সে ছুটে গেল। সেখানে যে বিচুটি গাছ আছে সেটা খেয়াল করেনি। বিচুটি লেগে শরীর চুলকোতে লাগল, চোখের পিঁস্‌নে নাক থেকে খসে পড়ল, সে খাঁড়ির ওপাশের খাড়া পাড় বেয়ে দৌড়তে লাগল। মেয়েটি সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে; কাজ-করা সাদা এপ্রন, লাল-বাদামী ঘাঘরা, আর উজ্জ্বল লাল রঙের বড় রুমাল; খালি পা, তাজা, স্থির; মেয়েটি সলজ্জ ভঙ্গিতে হাসছে।

"ওদিকে ঘুরে একটা পথ আছে—সেদিকে ঘুরে আপনাকে আসতে হবে", মেয়েটি বলল। "আমি অনেক আগে এসেছি—অনেকক্ষণ হলো।"

পনেরো মিনিট পরে তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলো; সে পিঁস্‌-নে খুঁজে পেল, দানিয়েলের সঙ্গে দেখা করল। দানিয়েল যখন প্রশ্ন করল : "আপনি তুষ্ট হয়েছেন তো মালিক?" তখন তাকে একটা রুবল দিয়ে বাড়ি চলে গেল।

সে তুষ্ট হয়েছে। প্রথমে একটু লজ্জা বোধ করছিল, তারপর সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল। সব ভাল। সব চাইতে ভাল হলো, এবার সে স্বস্তি বোধ করল, শান্তি পেল, উৎসাহ ফিরে পেল। আর মেয়েটির কথা, তাকে সে ভাল করে দেখেওনি। শুধু মনে পড়ে, মেয়েটি পরিচ্ছন্ন, তাজা, দেখতে মন্দ নয়, সরল, আর কোনও রকম ভণিতা নেই। নিজেকে শুধালো, "ও কার বৌ? দানিয়েল বলেছে, পেচ্‌নিকভ-এর। সে কোন্ পেচ্‌নিকভ? ঐ নামের তো দুটো পরিবার আছে। সম্ভবত সে বুড়ো মাইকেলের পুত্রবধূ। হ্যাঁ, তাই হবে। তার ছেলেই তো মস্কোতে থাকে। এক সময় দানিয়েলকে জিজ্ঞাসা করব।"

সেদিন থেকেই পল্লী-জীবনের আগেকার সেই বড় ত্রুটি—বাধ্যতামূলক আত্মসংযম—দূর হলো। ইউজেনেব মনের সাবলীলতা আর বিঘ্নিত হতো না, সে ভাল মনে নিজের কাজকর্ম করতে লাগল।

কিন্তু যে কাজ ইউজেন হাতে নিয়েছিল সেটা মোটেই সহজ নয়: একটা ছিদ্র বন্ধ করতে না করতেই অপ্রত্যাশিতভাবে আর একটা ছিদ্র গজিয়ে উঠতে লাগল : অনেক সময়ই মনে হতো যে এ কাজ নিয়ে সে আর চলতে পারবে না, শেষ পর্যন্ত হয়তো গোটা জমিদারিটাই বেচে দিতে হবে; তার অর্থ সব পরিশ্রম পণ্ড হবে, আর যে কাজ সে হাতে নিয়েছিল তা শেষ কবতে পারবে না। সেই সম্ভাবনাই তাকে বড় বেশি বিচলিত করে তুলল।

যতদিন যায় ততই অপ্রত্যাশিতভাবে বাবাব নতুন নতুন ঋণের কথা প্রকাশ পেতে লাগল। স্পষ্টই বোঝা গেল. জীবনের শেষ দিকে সে বাঁ হাতে ডান হাতে ঋণ করে গেছে; মে মাসে যখন সব বন্দোবস্ত হয় তখন ইউজেন ভেবেছিল যে সব কিছুই সে জানতে পেরেছে, কিন্তু গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ এমন একটা চিঠি এল যা থেকে জানা গেল যে জনৈকা বিধবা এসিপোভাব কাছে আরও বারো হাজার রুবল ধার রয়েছে। কোনও হ্যান্ডনোট নেই, আছে শুধু একটা সাধারণ রসিদ। উকিল বলল, ওটাকে অস্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু দলিলটার বিরুদ্ধে আপত্তি জানানো যেতে পারে শুধু এই কারণে বাবার ঋণ পরিশোধ না করার ব্যাপারটা ইউজেনের মাথায় ঢুকল না। সে নিশ্চিতভাবে জানতে চাইল, সত্যি ঋণটা করা হয়েছিল কি না।

ডিনারের সময় যথারীতি মারে সঙ্গে দেখা হলে সে শুধালো, "আচ্ছা মামণি, কালেরিয়া ভ্লাদিমিরভ্‌না এসিপোভা কে?"

"এসিপোভা? তাকে তো তোমার ঠাকুরদা মানুষ করেছিলেন। কেন বলো তো?"

ইউজেন চিঠির কথাটা মাকে বলল।

"এটা চাইতে তার লজ্জা করল না দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। তোমার বাবা তাকে এত দিয়েছে।"

"কিন্তু তার কাছে টাকাটা আমরা ধারি কি না?"

"দেখো, মানে, কি ভাবে কথাটা বলব? এটা ঋণ নয়। অসীম করুণাবশত বাপি..."

"হ্যাঁ, কিন্তু বাপি এটাকে ঋণ মনে করত কি না?"

"আমি বলতে পারি না। আমি জানি না। শুধু জানি, সেটা ছাড়াই তোমার অবস্থা যথেষ্ট কাহিল।"

ইউজেন বুঝল, মারি পাভ্‌লভ্‌না কি বলবে তাই জানে না; যেন তাকেই বাজিয়ে দেখতে চাইছে।

বলল, "তোমার কথায় মনে হচ্ছে এটা শোধ করতেই হবে। কালই তার সঙ্গে দেখা করে কথা বলব। দেখি কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখা যায় কি না।"

"তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু তুমি তো বুঝতে পারছ সেটাই সব চাইতে ভাল হবে। তাকে বলো, অপেক্ষা করতেই হবে", ছেলের সিদ্ধান্তে গর্বিত হয়ে শান্ত মনে মারি পাভ্‌লভ্‌না বলল।

ইউজেনের অবস্থা সত্যি কাহিল, কারণ মা মোটেই তার অবস্থাটা বুঝতে পারছিল না। সারাটা জীবন অতিরিক্ত ব্যয়বাহুল্যের ভিতর দিয়ে কাটাতে সে এতই অভ্যস্ত হয়েছিল যে ছেলের বর্তমান অবস্থাটা সে কল্পনাও করতে পারেনি আজ হোক কাল হোক অবস্থাটা এমন হয়ে উঠতে পারে যে তাদের আর কিছুই থাকবে না; সব কিছু বিক্রি করে দিয়ে নিজে যা বেতন পাবে—সেটা খুব বেশি হলে দু'হাজার রুবল হতে পারে—তাই দিয়ে নিজের ও মায়ের ভরন-পোষণ করতে হবে! মা কিছুতেই বুঝতে পারে না যে সে অবস্থা থেকে নিজেদের বাঁচাতে হলে সব রকম খরচ কমিয়ে তাদের চলতে হবে: আর তাই ইউজেন কেন যে ছোটখাট ব্যাপারেও, যেমন মালী, কোচয়ান, চাকরবাকর—এমন কি খাদ্যের ব্যাপারেও টানাটানি শুরু করেছে সেটাও মা বুঝতে পারছে না। তাছাড়া, সব বিধবার মতোই স্বামী বেঁচে থাকতে তার প্রতি যে মনোভাবই থাকুক না কেন এখন স্বর্গত স্বামীর স্মৃতির প্রতি তার অনুরাগের শেষ নেই; সেই স্বর্গত লোকটি যে এমন কিছু কাজ বা ব্যবস্থা করতে পারে যেটা ভুল, বা যার পরিবর্তন দরকার এ চিন্তাকেও সে মনে ঠাঁই দিতে পারে না।

ইউজেন অনেক চেষ্টা করে দুটো মালী নিয়ে বাগান ও কাঁচের সজি-ঘরটা এবং কোচয়ান নিয়ে আস্তাবলটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এদিকে মারি পাভ্‌লভ্‌না স্পষ্টই মনে করছে যে ছেলের জন্য সে অনেক ত্যাগ স্বীকার করছে, মার পক্ষে যা সম্ভব সবই করছে, কারণ বুড়ো রাঁধুনিটা যে খাবার পরিবেশন করছে, পার্কের পথঘাট যে মোটেই পরিষ্কার করা হচ্ছে না, এবং কয়েকজন পরিচারকের বদলে একটিমাত্র

ছোকরাকে দিয়ে সে সব কাজ চালিয়ে নিতে হচ্ছে,—সে বিষয়ে সে কখনও কোনও নালিশ করছে না।

এই নতুন ঋণের ব্যাপারেও সেই একই অবস্থা। ইউজেন দেখছে এই ঋণের ফলে তার সব উদ্যোগ-আয়োজন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, অ'র মারি পাভ্‌লভ্‌না এটাকে দেখছে ছেলের উদার স্বভাবের একটি দৃষ্টান্ত রূপে। তার উপব, ইউজেনের এই অবস্থা নিয়ে মা কোনও উৎকণ্ঠা বোধ করছে না, কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস ছেলে এমন একটা চমৎকার বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলবে যার ফলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আর সে রকম একটা বিয়ে কবতে সে পারবেই : তার সঙ্গে মেয়েব বিয়ে দিতে পারলে খুসি হবে এমন একটি পরিবারকে সে জানে। যত শীঘ্র সম্ভব তার ব্যবস্থা করে ফেলতেও মা রাজী।

৪

বিয়ের স্বপ্ন ইউজেন নিজেও দেখেছে, কিন্তু তার মায়ের মতো কবে নয়। বিয়েকে অবস্থা ফেরাবার উপায় হিসাবে ব্যবহার কবার চিন্তা তার কাছে অসহ্য। সে বিয়ে করতে চায সম্মানের সঙ্গে, ভালবাসার জন্য। যে সব মেয়ের সঙ্গে তার দেখা হয, আর যাদের সে চেনে, তাদের সে ভাল করে দেখেছে, নিজেকে তাদের সঙ্গে তুলনা করেছে, কিন্তু এখনও কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। ইতিমধ্যে সে না চাইলেও স্তেপানিদার সঙ্গে তার সম্পর্কটা যথারীতি চলেছে, এমন কি একটা স্বীকৃত রূপ ধারণ করেছে। ইউজেন লম্পট নয়; যে কাজকে সে খারাপ মনে কবে গোপনে সে কাজ করা তার পক্ষে কঠিন; এ ধরনের মেলামেশাব ব্যবস্থা সে নিজে থেকেও করতে পারে না; এমনকি প্রথম দিনের পরে ভেবেছিল আব কখনও স্তেপানিদার সঙ্গে দেখা করবে না; কিন্তু দেখা গেল যে কিছুদিন পরেই আবার সেই একই অস্থিরতা (সেই একই কারণে) তাকে পেয়ে বসল। এবার তার অস্থিরতা কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেই দুটি উজ্জ্বল কালো চোখ, সেই গাঢ় কণ্ঠস্বব যা বলেছিল, "অনেক আগে এসেছি", সেই তাজা, মজবুত শরীরের গন্ধ, সেই পরিপুষ্ট বুক যা এপ্রনের কোণাতে ঠেলে উঠেছিল, আর এ সব কিছুই উজ্জ্বল রোদে মাখানো সেই বাদাম ও আখের ঝোপের ভিতরে।

লজ্জা বোধ করলেও আবার সে দানিয়েলেব কাছে গেল। আবারও দুপুর বেলা জঙ্গলেব মধ্যে মিলনের ব্যবস্থা হলো। এবার ইউজেন আরও ভাল করে তাকে দেখল; তার সব কিছুই আকর্ষণীয় মনে হলো। তার সঙ্গে আলাপ করতে চেষ্টা করল, তার স্বামীর খোঁজ নিল। সত্যি সে মাইকেলের ছেলে, মস্কোতে কোচয়ানের কাজ করে।

"আচ্ছা, তাহলে তুমি কেমন করে..." ইউজেন প্রশ্ন করতে চাইল, স্বামীকে সে ঠকালো কেমন করে।

"কেমন করে মানে?" মেয়েটিও শুধালো। বোঝা গেল, মেয়েটি চতুর ও বুদ্ধিমতী।

"আচ্ছা, তুমি আমার কাছে এলে কেমন করে?"

মেয়েটি হেসে বলল, "এই লাও। আমি বাজি ধরে বলতে পারি ওখানে সে মজা লুটছে। আমিই বা লুটব না কেন?"

মেয়েটি প্রগল্‌ভতা ও নিশ্চিন্ততার এমন একটা ভাব দেখাল যেটা ইউজেনের খুব ভাল লাগল। কিন্তু তথাপি সে নিজে থেকে মিলনের দিনটা স্থির করল না। এমন কি মেয়েটি নিজে যখন প্রস্তাব করল যে দানিয়েলের সাহায্য ছাড়াই তারা মিলিত হবে তখন সে তাতে সম্মত হলো না। তার আশা ছিল, সেটাই তাদেব শেষ দেখা হবে। মেয়েটিকে তার ভাল লেগেছে। সে ভাবল, এ ধরনের মিলন তার পক্ষে প্রয়োজন, এর মধ্যে খারাপ কিছু নেই, কিন্তু তাব অন্তরের গভীরে বসে আর একজন কঠোরতম বিচারক এ কাজ সমর্থন করল না, তার আশা যে এটাই শেষবার; আর সে আশা না করলেও অন্তত আর একবাব এই ব্যবস্থা ঘটানোর ব্যাপারে অংশীদার হবার ইচ্ছা তার ছিল না।

এইভাবে পুরো গ্রীষ্মকালটা কেটে গেল, আর তার মধ্যে ডজন খানেক বার তারা মিলিত হলো, এবং প্রতিবারই দানিয়েলের সাহায্য নিলো। একবার হলো কি, মেয়েটির স্বামী বাড়ি আসায় সে আসতে পারল না, আর দানিয়েল আর একটি মেয়েকে আনার প্রস্তাব করল, কিন্তু ইউজেন বিরক্তির সঙ্গে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। তারপর স্বামী চলে গেল এবং তাদের মিলন আগের মতোই চলতে লাগল; প্রথমে দানিয়েলই সাহায্য করত, কিন্তু পরে সে শুধু সময়টা স্থির করে দিতো, আব মেয়েটি প্রখোরভা নামের আর একটি স্ত্রীলোককে সঙ্গে নিয়ে আসত,—কারণ একটি চাষী রমণীর পক্ষে একলা চলাফেরা করা শোভা পায় না।

একবার ঠিক মিলনের নির্দিষ্ট সময়ে একটি পরিবার এল মারি পাভ্‌লভ্‌নার সঙ্গে দেখা করতে, আর তাদের সঙ্গে নিয়ে এল সেই মেয়েটিকে যার সঙ্গে সে ছেলের বিয়ে দিতে ইচ্ছুক, কাজেই ইউজেনেব পক্ষে যথাসময়ে বাড়ি থেকে বের হওয়া সম্ভব হলো না। সুযোগ পাওয়া মাত্রই যেন ঝাড়াই ঘরে যাচ্ছে এমনি ভাব দেখিয়ে ঘুর পথে সে তাদের মিলন-স্থলে জঙ্গলে গিয়ে হাজির হলো। মেয়েটি সেখানে ছিল না। কিন্তু মিলনের পরিচিত জায়গাটিতে হাতেব কাছে যা কিছু পাওয়া যায় সব ভেঙে-চুরে বাখা হয়েছে--কালো অ্যাডাব বাদামেব ডাল, এমন কি লাঠির মতো মোটা একটা ছোট ম্যাপল গাছ পর্যন্ত ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। মেয়েটি এসে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছে, খুব রেগে গেছে, এবং শেষ পর্যন্ত তার কিছু কিছু চিহ্ন রেখে চলে গেছে। ইউজেন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত দানিয়েলের কাছে গিয়ে বলল, তাকে যেন কাল আবার ডেকে আনে। তাই সে এল, এবং ঠিক আগেব মতো ভাল মন নিয়েই এল।

এইভাবে গ্রীষ্মকাল পার হয়ে গেল। জঙ্গলেই দু'জনের মিলন চলতে লাগল; শুধু একবার হেমন্তকালে তারা মিলিত হয়েছিল পিছনের উঠোনের চালা ঘরটাতে।

তার দিক থেকে এই সম্পর্কের যে একটা গুরুত্ব থাকতে পারে সেটা ইউজেনের মাথায়ই ঢুকত না। মেয়েটির কথা তো সে মোটেই ভাবত না। তাকে টাকা দিত, ব্যাস্ ঐ পর্যন্তই। ব্যাপারটা যে জানাজানি হয়ে গেছে এবং সারা গ্রামের লোক মেয়েটিকে ঈর্ষা করতে শুরু করেছে, সে কথা প্রথম দিকে সে জানত না, ভাবতও না; মেয়েটির আত্মীয়স্বজনরাও তার কাছ থেকে টাকা-পয়সা নিত, তাকে উৎসাহ দিতো। এইভাবে টাকার প্রভাবে ও তার পরিবারের সমর্থনের ফলে এ ব্যাপারে যে কোন পাপ হচ্ছে সে ধারণাটাও তার মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে। মেয়েটি মনে করত, সকলেই যখন তাকে ঈর্ষা করছে তখন সে যা করছে সে কাজটা ভালই।

ইউজেন ভাবত, "এটা আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে দরকারী। মানলাম যে কাজটা ঠিক নয়, এবং মুখে কেউ কিছু না বললেও সকলেই বা অনেকেই ব্যাপারটা জানে। যে স্ত্রীলোকটি তার সঙ্গে আসে সে জানে। আর সে যখন জেনেছে তখন নিশ্চয়ই অন্যকে বলেছে। কিন্তু কি করা যাবে? আমি খারাপ কাজ করছি, কিন্তু আমি কি করতে পারি? তাছাড়া. এটা তো আর দীর্ঘকাল চলবে না।"

প্রধানত স্বামীটির চিন্তাই ইউজেনকে বিচলিত করত। যে কারণেই হোক গোড়ায় তার মনে হয়েছিল যে স্বামীটি নিশ্চয় খুব বাজে লোক, আর সেটাই যেন তার কাজকে আংশিকভাবে সমর্থনযোগ্য করে তুলেছিল। কিন্তু স্বামীটিকে দেখার পর তার চেহারা তাকে তাক লাগিয়ে দিলো; লোকটি সুপুরুষ, সুসজ্জিত, কোনও অংশেই তার থেকে খাটো নয়, বরং ভাল। পরবর্তী সাক্ষাতের কালে সে মেয়েটিকে বলল যে তার স্বামীকে সে দেখেছে আর লোকটি তো দেখতে-শুনতে বেশ ভালই।

মেয়েটি সগর্বে বলল, "এ গাঁয়ে তার মতো দ্বিতীয় লোক কেউ নেই।"

ইউজেন অবাক হয়ে গেল; সেই থেকে স্বামীর চিন্তা তাকে আরও বেশি করে যন্ত্রণা দিতে লাগল। একদিন দানিয়েলের সঙ্গে তার দেখা হলে কথা প্রসঙ্গে দানিয়েল তাকে খোলাখুলিই প্রশ্ন করল ·

"সেদিন মাইকেল আমাকে শুধিয়েছিল : "মালিক আমার বৌয়ের সঙ্গে থাকে এ কথা কি সত্যি?" আমি বলেছি জানি না। যাই হোক, আমি বলে দিয়েছি, অন্য চাষীর সঙ্গে থাকার চাইতে মালিকের সঙ্গে থাকাই তো ভাল।"

"আচ্ছা, তাতে সে কি বলল?"

"সে বলল, "একটু সবুর করো। আগে ভাল করে জেনে নিই, তারপর দেখা যাবে।"

"ঠিকই তো, স্বামী যদি ফিরে এসে এখানে বসবাস করে, তাহলে আমিই ওকে ছেড়ে দেব", ইউজেন ভাবল।

স্বামীটি কিন্তু শহরেই রয়ে গেল, আর তাদের মিলনও যথারীতি চলতে লাগল।

"দরকার হলেই এ-সম্পর্ক ভেঙে ফেলবে; তখন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না", সে ভাবল।

সে বুঝল যে শেষ পর্যন্ত এটাই ঘটবে; বিশেষ করে সারা গ্রীষ্মকালটা তাকে নানা ঝামেলায় ব্যস্ত থাকতে হলো : নতুন গোলাবাড়িটা তোলা, ফসল কাটা, বাড়িঘর দেখাশুনা করা, আর সকলের উপরে ঋণ শোধ করা ও পতিত জমি বিক্রি করে দেওয়া। এই সব ব্যাপারেই সে সম্পূর্ণ ডুবে রইল, এবং শুতে যাবার আগে ও ঘুম থেকে উঠে এই সব চিন্তায়ই তার সময় কাটতে লাগল। এই তো সত্যিকারের জীবন। স্তেপানিদার সঙ্গে তার মিলনের—এটাকে সে আসঙ্গও বলে না—তার প্রতি মোটেই মন নেই। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে তাকে দেখার ইচ্ছা যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন সে অন্য কোনও কিছুই ভাবতে পারে না। কিন্তু এ অবস্থা বেশিক্ষণ থাকে না। মিলনের ব্যবস্থা হয়ে যায়, আর তারপরেই এক সপ্তাহের জন্য, এমন কি এক মাসের জন্যও সে তাকে আবার ভুলে যায়।

হেমন্তকালে ইউজেন প্রায়ই ঘোড়ায় চেপে শহরে যেতে লাগল; আর সেখানেই আন্নেস্কি পরিবারের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হলো। তাদের একটি মেয়ে সদ্য 'ইন্‌স্টিট্যুট" থেকে পাশ করেছে। ইউজেন সেই মেয়ে লিজা আন্নেস্কায়ার প্রেমে পড়ে বিয়ের প্রস্তাব করে বসল, আর এদিকে ছেলে "নিজেকে সস্তায় বিক্রি করল" দেখে মারি পাভ্‌লভ্‌নার দুঃখের সীমা রইল না।

সেই থেকে স্তেপানিদার সঙ্গে তার সকল সম্পর্কে ছেদ পড়ল.

৫

ইউজেন কেন যে লিজা আন্নেস্কায়াকে পছন্দ করল সেটা বুঝিয়ে বলা অসম্ভব; কোনও পুরুষ এক নারীর পরিবর্তে অন্য নারীকে কেন পছন্দ করে সেটা বুঝিয়ে বলা সব সময়ই অসম্ভব। এক্ষেত্রে অবশ্য স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেকগুলি কারণই ছিল। একটা কারণ, তার মা যে ধরনের সম্পন্ন উত্তরাধিকারিণীর খোঁজ করছিল এ মেয়েটি মোটেই তা নয়; অন্য কারণ, মেয়েটি অতিমাত্রায় সরল, আর তাই করুণার পাত্রী; আর একটি কারণ, সকলের চোখে লাগার মতো সুন্দরী না হলেও মেয়েটি দেখতে খারাপ নয়। কিন্তু প্রধান কারণ হলো, মেয়েটির সঙ্গে যখন তার পরিচয় ঘটল তখন তারও বিয়ের বয়স হয়েছে। মেয়েটিকে বিয়ে করবে জেনেই সে তাকে ভালবাসল।

প্রথম প্রথম লিজা আন্নেস্কায়াকে দেখলে ইউজেনের কেবলমাত্র ভাল লাগত. কিন্তু যখন স্থির করে ফেলল যে তাকেই সে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবে তখন তার মনের টানটাও অনেক বেড়ে গেল। মনে হলো, মেয়েটিকে সে ভালবেসে ফেলেছে।

লিজা লম্বা ও একহারা। তার সব কিছুই লম্বা : মুখ, নাক, আঙুল, ও পা। মুখের

রংটাও নরম, মাখনের মতো সাদা আবার ঈষৎ লাল; লম্বা, নরম, কোঁকড়ানো, হাল্কা-বাদামী চুল, আর স্বচ্ছ, নরম, সুন্দর দুটি চোখ। বিশেষ করে চোখ দুটিকেই ইউজেনের মনে ধরল: লিজার কথা ভাবলেই ঐ দুটি স্বচ্ছ, নরম চোখ তার সামনে ভেসে ওঠে।

এই তো তার দেহের বিবরণ; তার মনের খবর সে এখনও পায়নি, শুধু চোখ দুটিই দেখেছে। আর ঐ চোখ দুটিই বুঝি যা কিছু জানার সবই তাকে জানিয়ে দিয়েছে। সে চোখের ভাষাই তো এই :

পনেরো বছর বয়সে ইন্সটিট্যুটে থাকাব কালে যে কোনও আকর্ষণীয় পুরুষের সঙ্গে দেখা হতো তার সঙ্গেই লিজা প্রেমে পড়ত; একমাত্র প্রেমে পড়লেই সে উজ্জীবিত ও সুখী হতে পারত। ইন্সটিট্যুট ছেড়ে আসার পরেও সেই একই ভাবে যে কোনও যুবকের সঙ্গে দেখা হতো তার সঙ্গেই সে প্রেমে পড়তে লাগল, আর তাই ইউজেনের সঙ্গে পবিচয় হওয়ামাত্রই তার প্রেমেও পড়ে গেল। এই প্রেমে পড়ার ফলেই তার চোখ দুটিতে সেই বিশেষ ভাষাটি ফুটে ওঠে যা ইউজেনকে এতদূর মুগ্ধ করেছে। ইতিমধ্যেই সেই শীতকালে একই সময়ে সে দুটি যুবকের প্রেমে পড়েছিল, এবং শুধু যে তারা ঘবে ঢুকলেই তার মুখ বাঙা হয়ে উঠত, উত্তেজনা বোধ করত তাই নয়, তাদের নাম উল্লেখ করলেই তাব ঐ দশা ঘটত। কিন্তু পববর্তীকালে মা যখন ইঙ্গিতে তাকে বুঝিয়ে দিলো যে ইর্তানেভ-এব মনে আরও গভীব বাসনা রয়েছে তখন থেকেই তার প্রতি লিজার ভালবাসা বেড়ে গেল, আর আগের দুটি মনেব মানুষকে উপেক্ষা করে চলতে লাগল। এদিকে ইর্তানেভ যখন তাদেব নাচে ও পার্টিতে আসতে লাগল এবং অন্যের চাইতে তার সঙ্গেই বেশি করে নাচতে শুরু করল, আর জানতে চাইল লিজা তাকে ভালবাসে কি না, তখন ইউজেনের প্রতি ভালবাসা তাব পক্ষে বেদনাদায়ক হয়ে উঠল। ঘুমের মধ্যে সে তাকে স্বপ্নে দেখতে লাগল; এমন কি জাগ্রত অবস্থায়ও অন্ধকার ঘরে সে যেন তাকেই দেখতে পায়, অন্য সকলেই তাব মন থেকে মুছে যায়। ইউজেন যখন বিয়ের প্রস্তাব কবল, আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের কথা পাকা হলো, যখন একে অন্যকে চুমো খেল, বাগ্‌দত্ত দম্পতি হলো, তখন লিজাব মনে তার কথা ছাড়া অন্য চিন্তা রইল না, তার সঙ্গসুখ, তাকে ভালবাসা ও তাব ভালবাসা পাওয়া ছাড়া অন্য বাসনা রইল না। ইউজেনকে নিয়ে তার গর্বের শেষ নেই; দু'জনকে ও দু'জনের ভালবাসাকে কেন্দ্র করে তার মনে জাগল আবেগেব ঢেউ; তার ভালবাসায় সে যেন গলে গেল, চৈতন্য হারিয়ে ফেলল।

ইউজেনও যতই লিজাকে বেশি কবে জানছে ততই তাকে বেশি করে ভালবাসছে। এমন ভালবাসা পাবার আশা সে কোনওদিনই কবেনি; তাই তো এ ভালবাসা তার মনকে আরও শক্তিশালী করে তুলল।

৬

বসন্তকাল নাগাদ সে সেমেনভ্‌স্কো জমিদারিতে গেল নিজের চোখে সব কিছু

দেখতে। পরিচালনাব ব্যাপারে কিছু নির্দেশাদি দিতে, বিশেষ করে বিয়ের জন্য যে বাড়িটা তৈরি হচ্ছে তার তদারক করতে।

ছেলের পাত্রী-পছন্দে মারি পাভ্‌লভ্‌না অসন্তুষ্ট, তার একটা কারণ যত ভাল সম্বন্ধ হতে পারত এটা মোটেই তা নয়; আরও একটা কারণ ছেলের ভাবী শাশুড়ি বারবারা আলেক্সিভ্‌নাকেও তার পছন্দ নয়। শাশুড়িটি ভাল মানুষ কি না সে জানে না, বুঝতেই পারেনি, কিন্তু প্রথম পরিচয়েই বুঝতে পেরেছে যে তার শিক্ষাদীক্ষা ভাল নয়, যে রকমটি হওয়া উচিত তা নয়—মারি পাভ্‌লভ্‌নার মতো "একজন মহিলা" নয়—আর সেটাই তার দুঃখের কারণ। সে নিজে শিক্ষাদীক্ষাকে যথেষ্ট মূল্য দিয়ে থাকে, আর ইউজেনও এ ব্যাপারে স্পর্শকাতর; তাই এখনই সে বুঝতে পারছে যে এ নিয়ে ভবিষ্যতে ইউজেনকে অনেক ভুগতে হবে। কিন্তু মেয়েটিকে তার পছন্দ হয়েছে। তার প্রধান কারণ ইউজেন তাকে পছন্দ করে। তাকে ভাল না বেসে কেউ পারে না, আর তাই মারি পাভ্‌লভ্‌নাও তাকে ভালবাসতে রাজী।

ইউজেন দেখল, মা খুসি হয়েছে, তার মেজাজও ভাল আছে। গৃহস্থালীর কাজকর্ম ঠিকঠাক করে রাখছে: সে নতুন বৌ নিয়ে বাড়ি এলেই মা চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ইউজেন তাকে আপাতত থেকে যেতে অনুরোধ জানিয়েছে, তবে এখনও কিছু স্থির হয়নি।

সন্ধ্যায় চায়ের পরে মারি পাভ্‌লভ্‌না যথারীতি "পেশেন্স" খেলতে বসেছে। ইউজেন পাশে বসে তাকে সাহায্য করছে। এটা তাদের ঘরোয়া আলোচনার সময়। একদান খেলা শেষ করে আর একদান শুরু করার মুখে মা মুখ তুলে ছেলের দিকে তাকালো; একটু ইতস্তত করে শুরু করল :

"তোমাকে বলতে চাইছি জেনিয়া—অবশ্য আমি কিছু জানি না, সাধারণভাবেই তোমাকে বলতে চাইছি—অবিবাহিত অবস্থার ব্যাপার-স্যাপারগুলো বিয়ের আগেই মিটিয়ে ফেলা একান্ত প্রয়োজন, যাতে কোনও কিছুই তোমার বা তোমার স্ত্রীর মনোকষ্টের কারণ হতে না পারে। ঈশ্বর করুন, সে রকম কিছু যেন না ঘটে। আমার কথা বুঝতে পারছ তো?"

ইউজেন সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল যে মারি পাভ্‌লভ্‌না স্তেপানিদার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাই ইঙ্গিত করছে, যদিও আগের হেমন্তকালেই সেটা খতম হয়ে গেছে: নিঃসঙ্গ স্ত্রীলোকদের মতোই মা সে ব্যাপারটার উপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করছে। ইউজেনের মুখটা লাল হয়ে উঠল, ততটা লজ্জায় নয় যতটা ভালমানুষ মারি পাভ্‌লভ্‌নার নাক গলানোর জন্য বিরক্তিতে। স্নেহবশতই এ কথা বললেও এটা তো নাক গলানোরই সামিল, তাও আবার এমন একটা বিষয়ে যেটা তার ব্যাপারই নয় এবং যে বিষয়ে সে কিছু জানে না, জানতে পারবেও না। ইউজেন জবাব দিলো যে গোপন রাখবার মতো কিচ্ছু নেই, আর এতদিন সে যে ভাবে চলে এসেছে তাতে বিয়েতে কোনওরকম বিঘ্নই ঘটতে পারে না।

"ভাল কথা বাবা, খুব ভাল কথা। শুধু, কি জানো জেনিযা আমাব উপব বাগ করো না", এইটুকু বলেই মারি পাভ্‌লভ্‌না থেমে গেল।

ইউজেন বুঝল মা কথা শেষ কবল না, যা বলতে চেযেছিল তাও বলল না। তাব এ ধারণা আবও বদ্ধমূল হলো যখন কিছুক্ষণ পবেই মা তাকে বলল যে. ছেলেব অনুপস্থিতিতে পেচ্‌নিকভদেব বাড়ি থেকে তাকে ধর্ম-মা হবাব জন্য ডেকে পাঠিয়েছে।

ইউজেনেব মুখ আবাল লাল হযে উঠল, এবাব বিবক্তিতে বা লজ্জায নয, কিন্তু এখনই তাকে যা বলা হবে তাব একটা বিচিত্র চেতনা থেকে। আব সে যা ভেবেছিল তাই ঘটল। যেন কথাপ্রসঙ্গেই মাবি পাভ্‌লভ্‌না জানাল যে এ বছব শুধু ছেলেই জন্মাচ্ছে—সেটা স্পষ্টভাবেই আসন্ন যুদ্ধেব লক্ষণ। ভাসিন্‌দেব বাড়িতে এবং পেচ্‌নিকভদেব বাড়িতে নববধূব এই প্রথম সন্তান হযেছে—আব দুটিই ছেলে। মাবি পাভ্‌লভ্‌না কথাটা প্রসঙ্গতই বলতে চেযেছিল, কিন্তু যখন দেখল যে ছেলেব মুখ লাল হযে উঠেছে। নাকেব উপব থেকে পিঁসনেটাকে একবাব খুলছে, ঠুকছে ও আবাব পবছে, এবং তাড়াতাড়ি একটা সিগাবেট ধবিযেছে, তখন তাব নিজেবই লজ্জা কবতে লাগল। ইউজেনও চুপ কবে থাকল, কি কবে যে নীববতা ভাঙবে তা ভেবেই পেল না। কাজেই দু'জনই বুঝতে পাবল যে তাবা পবস্পবেব মনোভাবকে বুঝতে পেবেছে।

"হ্যাঁ, আসল কথা হলো, গ্রামে ন্যাযবিচাব থাকবে, কোনও বকম পক্ষপাত চলবে না—ঠিক যেমন ছিল তোমাব ঠাকুবদাব আমলে।"

ইউজেন হঠাৎ বলে উঠল, "মামণি, আমি জানি এ কথা তুমি কেন বলছ। তোমাব চিন্তার কোনও কাবণ নেই। আমাব ভবিষ্যৎ পাবিবাবিক জীবন আমাব কাছে এতই পবিত্র যে তার বীতি নীতিকে আমি কদাপি লঙ্ঘন কবব না। আব বিযেব আগে যা কিছু ঘটেছিল সে সব ইতি হযে গেছে। কখনও কাবও সঙ্গে আমি জোট বাঁধিনি, আব আমাব উপব কাবও কোনও দাবি নেই।"

মা বলল, "খুসি হলাম। তোমাব মনটা যে কত বড তা তো আমি জানি।"

মাব কথাগুলিকে প্রাপ্য প্রশংসা হিসাবেই গ্রহণ কবল ইউজেন, কোনও জবাব দিলো না।

পবদিন ঘোড়ায চেপে শহবে যাবাব পথে সে তাব ভাবী বধূব কথাই ভাবতে লাগল; স্তেপানিদাব কথা একবাবও তাব মনে এল না। কিন্তু গির্জাব কাছাকাছি পৌছতেই যেন সে-কথা তাকে মনে কবিযে দেবার জন্যই গির্জা থেকে বেবিযে আসা অনেকের সঙ্গে তাব দেখা হযে গেল। দেখা হলো সাইমনসহ বুড়ো মাৎভেব সঙ্গে, কয়েকটি ছেলেমেয়েব সঙ্গে, এবং দুটি স্ত্রীলোকেব সঙ্গে; তাদেব মধ্যে একজন বেশ বযস্কা, অপরজন একটা উজ্জ্বল লাল ওড়না পবে বেশ সেজেগুজে চলেছে: তাকে দেখেই তাব কেমন যেন পরিচিত বলে মনে হলো। সে স্ত্রীলোকটি একটি

শিশুকে কোলে নিয়ে হাল্কা পায়ে বেশ সাহসের সঙ্গে হেঁটে চলেছে। তাদের কাছাকাছি হতেই বয়স্কা স্ত্রীলোকটি সেকেলে প্রথামতো থেমে অভিবাদন করল, কিন্তু শিশু কোলে যুবতীটি শুধু মাথাটা নোয়ালো, আর ওড়নার নিচ থেকে দুটি পরিচিত, খুসিভরা, হাসি-হাসি চোখ ঝিকমিকিয়ে উঠল।

হ্যাঁ, এই তো সেই! কিন্তু সব যখন শেষ হয়ে গেছে তখন আর তার দিকে তাকিয়ে লাভ কি; হঠাৎ তার মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল : "বাচ্চাটা তো আমার হতে পারে।" না, যত সব বাজে চিন্তা! তার স্বামী আছে, মাঝে মাঝে সে বাড়ি আসত। এ নিয়ে সে আর মাথা ঘামাল না; তার মনের বদ্ধমূল ধারণা, স্বাস্থ্যের জন্য ওটা দরকার ছিলো,—টাকা দিয়েছে, সে বিষয়ে আর কিছু বলাব নেই; তাদের দু'জনের মিলনের কোন প্রশ্নই নেই, কোনওদিন ছিল না, থাকতেই পারে না। সে যে বিবেকের কণ্ঠরোধ করতে কথাটা ভাবল তাও নয়, না—বিবেক তাকে একটি কথাও বলেনি। মায়ের সঙ্গে আলোচনা এবং এই সাক্ষাতের পরে আর কোনওদিন সে মেয়েটির কথা ভাবেনি। তাব সঙ্গে দেখাও করেনি।

ঈস্টারের পরের সপ্তাহে শহরে ইউজেনের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পরেই তরুণী বধূকে নিয়ে সে গ্রামের জমিদারিতে চলে গেল। নব দম্পতিব মতো করেই বাড়িটাকে সাজানো হয়েছে। মাবি পাভ্‌লভ্‌না চলে যেতেই চেয়েছিল, কিন্তু ইউজেন তাকে থাকতে অনুরোধ করল, লিজা আরও জোরের সঙ্গে সেটা সমর্থন করল; তাই মা বাড়ির একটা স্বতন্ত্র অংশে উঠে গেল।

আর এইভাবে শুরু হলো ইউজেনের নতুন জীবন।

৭

ইউজেনের দিক থেকে বিয়েব প্রথম বছরটা বেশ কষ্টেই কাটল। কাবণ পূর্ববাগের সময়ে যে সব কাজকর্ম মুলতুবি রেখে দিয়েছিল এখন বিয়ের পরে সে সব এক সঙ্গে তার হাতে এসে পড়ল।

ঋণকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব। জমিদারির দূরবর্তী জমিগুলো বিক্রি করে জরুবী ধার-কর্জগুলো মিটিয়ে দেওয়া হলো; কিন্তু অন্য সব ঋণই বাকি রইল, কারণ হাতে আর টাকা ছিল না। জমিদারি থেকে আয় ভালই হয, কিন্তু তা থেকে দাদাকে টাকা পাঠাতে হয়েছে, এবং নিজের বিয়ের খরচপত্র করা হয়েছে; ফলে হাতে নগদ টাকা না থাকায় কারখানাটা চালানো সম্ভব হলো না; সেটা বন্ধ করে দিতে হলো। বাঁচবার একমাত্র পথ স্ত্রীর টাকা খরচ করা; স্বামীর অবস্থা বুঝতে পেরে লিজা নিজে থেকেই সে কথা বলল। ইউজেনও রাজী হলো, তবে শর্ত করা হলো যে তার জমিদারির অর্ধেক অংশ স্ত্রীর নামে মর্টগেজ করা হবে, আর তাই করা হলো। অবশ্য এটা করা হলো স্ত্রীর জন্য, সে বরং এতে অসন্তুষ্টই হলো, এটা করা হলো শাশুড়িকে তুষ্ট করবার জন্য।

জয়-পরাজয়ের নানা উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে এই সব ঘটনা প্রথম বছরেই ইউজেন জীবনটাকে বিষময় করে তুলল। আর একটা ব্যাপার স্ত্রীর ভগ্নস্বাস্থ্য। বিয়ের সাত মাস পরে সেই প্রথম বছর হেমন্তকালেই লিজা একটা দুর্ঘটনায় পড়ল। স্বামী যখন শহর থেকে ফিরছিল তখন তার সঙ্গে দেখা করার জন্য লিজা নিজেই গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল; শান্ত ঘোড়াটা একটু এদিক-ওদিক কবতেই ভয় পেয়ে সে গাড়ি থেকে লাফ দিলো। তার কপাল ভাল বলতে হবে—সে তো চাকার নিচেও পড়তে পারত—কিন্তু তখন সে গর্ভবতী ছিল, আর সেই রাতেই ব্যথা উঠল; গর্ভেব সন্তান নষ্ট হয়ে গেল; সেও দীর্ঘস্থায়ী অসুখে পড়ল। চারিদিককার বিশৃঙ্খলার মধ্যে প্রত্যাশিত সন্তানের মৃত্যু ও স্ত্রীর অসুস্থতা, আর সবার উপরে শাশুড়ির উপস্থিতি—লিজার অসুখের খবব পেয়েই সে চলে এসেছিল—সব মিলিয়ে ইউজেনের পক্ষে বছরটা খুবই কষ্টকব হয়ে দেখা দিলো।

কিন্তু এই সব অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যেও প্রথম বছরের শেষের দিকে ইউজেন বেশ ভাল বোধ কবল। বেশ ধীব গতিতে এবং অনেক অসুবিধার ভিতর দিয়ে হলেও তার বিপর্যস্ত ভাগ্যকে পুনরুদ্ধারেব আশা এবং নতুন রূপে ঠাকুবদার জীবনযাত্রা পুনঃপ্রতিষ্ঠা সমাপ্তিব লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। ঋণ পরিশোধের জন্য গোটা জমিদাবি বিক্রি করার প্রশ্নও আর নেই। স্ত্রীর নামে হস্তান্তর করা হলেও মূল জমিদারিটা বক্ষা পেয়েছে; আব ফসল যদি ভাল হয এবং দাম যদি ভাল পাওযা যায, তাহলে পবেব বছরেই অভাব-অনটনকে কাটিয়ে পরিপূর্ণ সমৃদ্ধির মুখ দেখতে পাওয়া যাবে। এটা হলো প্রথম কথা।

আরেকটা হলো, স্ত্রীর কাছ থেকে সে যাই আশা কবে থাকুক, কার্যক্ষেত্রে যা পাচ্ছে ততটা সে কখনও আশা করেনি। যা আশা করেছিল তা পায়নি, পেয়েছে আরও অনেক ভাল কিছু। ভালবাসার উচ্ছ্বাস—তাব জন্য সে যত চেষ্টাই করুক—দেখা দিলো না, বা যৎসামান্যই দেখা দিলো, কিন্তু সে একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করল, অর্থাৎ সে যে শুধু খুসি ও সুখী হয়েছে তাই নয়, জীবনটাই অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। কেন এমনটা হলো তা সে জানে না।

তবে এমনটা যে হলো তার কারণ বিযেব ঠিক পবেই তার স্ত্রী স্থির চিত্তে মেনে নিল যে ইউজেন ইর্তানেভ জগতের অন্য যে কোনও মানুষের চাইতে বড় : তাদেব চাইতে অধিকতর জ্ঞানী, পবিত্রতব ও মহত্তব; সুতরাং সকলেরই উচিত তার সেবা করা, তাকে তুষ্ট করা; কিন্তু যেহেতু সকলকে দিয়ে একাজ করানো সম্ভব নয়, তাই সাধ্যমতো সে নিজেই সে কাজটি সম্পন্ন করবে। আর তাই সে করল; মনের সব শক্তি দিয়ে তার পছন্দ-অপছন্দটা আগে জেনে নিলো, আর তারপবে সেই কাজটি করতে লাগল, তা সে যে কাজই হোক, আর যত কষ্টকরই হোক।

যে গুণ একটি প্রেমময়ী নারীর সঙ্গে মিলনকে মধুময় করে তোলে সেই গুণ ছিল

তার অধিগত : স্বামীর প্রতি ভালবাসাকে ধন্যবাদ, সে তার অন্তরে প্রবেশের পথটা খুঁজে পেয়েছে। স্বামীর প্রতিটি অবস্থা ও প্রতিটি অনুভূতিকে সে জেনে নিয়েছে—বুঝি বা ইউজেনের নিজের চাইতেও ভাল করেই জেনেছে—আর যেহেতু সেই অনুযায়ী সে চলতে লাগল, তাই কখনও সে স্বামীর মনকে আঘাত দিতো না, বরং তার সব দুঃখকে হ্রাস করে বাড়িয়ে তুলত তার আনন্দের অনুভূতিকে। সে যে শুধু তার অনুভূতিকেই বুঝত তাই নয়, বুঝত তার আনন্দকেও। যে সব বিষয় তার এক্তিয়ারের বাইরে—যেমন চাষবাস, কারখানা, অন্যের মূল্যায়ন—সে সবও সে এতদূর তৎপরতার সঙ্গে বুঝে নিল যে তা নিয়ে সে স্বামীর সঙ্গে আলোচনা তো করতই, আবার অনেক সময়ই তার পরামর্শ অত্যন্ত দরকারী ও অপরিহার্য হতো। বিষয়সম্পত্তি লোকজন, জগতের সবকিছুই সে দেখত স্বামীর চোখ দিয়ে। মাকে সে ভালবাসে, কিন্তু যখন দেখল যে তাদের জীবনযাত্রায় শাশুড়ির হস্তক্ষেপ ইউজেন পছন্দ করে না, সঙ্গে সঙ্গে সে স্বামীর পক্ষ নিল, এবং এতদূর দৃঢ়তার সঙ্গে সেটা করতে লাগল যে ইউজেনকেই বাধ্য হয়ে তার স্ত্রীকে সংযত করতে হতো।

এ সব ছাড়াও তার ছিল সুরুচি, সুকৌশল ও প্রশান্তি। সে যা কিছু করত সকলের অগোচরেই করত; চোখে পড়ত শুধু কাজের ফলাফলটা---সর্বত্র সব কিছুতে পরিচ্ছন্নতা, শৃংখলা ও শোভনতা। স্বামীর জীবনের আদর্শ কি সেটা লিজা গোড়াতেই বুঝে নিয়েছিল; স্বামীর অভিরুচি অনুসারেই সে সব কিছু কবত। বাড়িতে শিশুর অভাব আছে সত্য, কিন্তু শিশুর আগমনের আশাও তো আছে। তারা শীতকালে একজন বিশেষজ্ঞের কাছে গেল; সে জানিয়ে দিলো, লিজা বেশ সুস্থ আছে এবং তার সন্তান হতে পারবে।

সে বাসনাও পূর্ণ হতে চলল। বছরের শেষেই সে আবাব গর্ভবতী হলো।

কিন্তু একটা জিনিস তাদের সুখকে বিপন্ন, বলা যায় বিষময় করে তুলল—সেটা লিজার ঈর্ষা; সে ঈর্ষাকে সে চেপে রাখে, প্রকাশ হতে দেয় না, কিন্তু প্রায়ই সে ঈর্ষা তাকে দগ্ধ করে। ইউজেন অন্য কোনও নারীকে ভালবাসতে পারে না—এ পৃথিবীতে তার উপযুক্ত নারী কে আছে (অবশ্য সে নিজেও স্বামীর উপযুক্ত কি না সে কথা সে একবারও ভেবে দেখেনি),—শুধু তাই নয়, তাকে ভালবাসার দুঃসাহসও অন্য কোনও নারীর হতে পারে না।

৮

এইভাবেই তাদের জীবন কাটতে লাগল : আগেকার মতোই ইউজেন খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠে, গোলাবাড়ি বা কারখানায় কাজকর্ম দেখতে যায়, কখনও বা যায় মাঠে। দশটা নাগাদ ফিরে আসে কফি খেতে; বারান্দায় বসে কফি খায় : মারি পাভ্‌লভ্‌না, এক খুড়ো, ও লিজাকে সঙ্গে নিয়ে। কফি খেতে খেতে অনেক রকম

প্রাণবন্ত আলোচনা হয়: তারপর যে যাব কাজে চলে যায়। দুটোয় ডিনার সেরে পায়ে হেঁটে বা গাড়িতে চেপে বেড়াতে যায়। সন্ধ্যায় সে আপিস থেকে ফিরে আসে; সকলে মিলে চা খায়: কখনও কখনও সে গলা ছেড়ে পড়ে, আর লিজা কাজকর্ম করে; আবার বাড়িতে অভ্যাগত কেউ থাকলে গান-বাজনা বা আলোচনা চলে। সে যখন কোনও কাজে বাইরে চলে যায় তখন প্রতিদিন স্ত্রীকে একটা করে চিঠি লেখে এবং স্ত্রীর কাছ থেকে একটা করে চিঠি পায়। আবার কখনও লিজাও স্বামীর সঙ্গে যায়: তখন তাদেব সুখ আব ধরে না। দু'জনেরই নামকবণ দিবসে অতিথিবা সমবেত হয়; লিজার সুব্যবস্থায় সকলেই খুসি হয। ইউজেন দেখে ও শোনে যে সকলেই লিজাকে—তাদের মনোরমা গৃহকর্ত্রীকে প্রশংসা করছে, আর তাতে সে স্ত্রীকে আরও বেশি করে ভালবাসে।

সব কিছুই চমৎকারভাবে এগিয়ে চলল। সহজভাবেই সে গর্ভাবস্থার দিনগুলি কাটাতে লাগল; কিছুটা শংকিত থাকলেও দু'জনই ভাবী সন্তানকে মানুষ কবার পরিকল্পনা নিযে মেতে উঠল। কি ধবনের শিক্ষা দেওয়া হবে, তার ব্যবস্থা কি বকম হবে—সে সবই স্থির কবল ইউজেন, লিজার একমাত্র বাসনা অনুগত হযে স্বামীব মনোবাঞ্ছাকে পূর্ণ করা। ইউজেন অনেক ডাক্তাবি বই পড়ে ফেলল, এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানেব সব উপদেশ নির্দেশ মেনেই সন্তান পালন কবার সিদ্ধান্ত নিল। স্ত্রীও সব কিছুতেই সায় দিলো, উদ্যোগ-আযোজন শুরু করে দিলো, গরম ও ঠাণ্ডা "কাঁথা" এবং দোলনা তৈরি করে ফেলল। এইভাবে তাদেব বিয়েব দ্বিতীয বছব ও দ্বিতীয বসন্ত এসে পড়ল।

৯

ত্রিমূর্তি রবিবারের ঠিক আগে। লিজাব পাঁচ মাস চলছে: সতর্ক হযে চললেও এখনও সে যথেষ্ট কাজকর্ম. চলাফেরা করে। ইউজেনেব মা এবং লিজার মা দু'জনই এখন এ বাড়িতে থাকে, কিন্তু তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে গিযে দু'জনের মধ্যে খিটিমিটি লাগিয়ে তার অস্বস্তিই বাড়িয়ে তোলে। ব্যাপক ভিত্তিতে মিষ্টি-বীট চাষের একটা নতুন পরীক্ষা নিয়ে ইউজেন খুবই ব্যস্ত।

ত্রিমূর্তি উৎসবেব ঠিক আগে লিজা স্থির করল, বাড়ি-ঘবটা একবার আগাগোড়া ধোয়া-মোছা করা দবকার, কারণ ঈস্টার পর্বের পরে আর বাড়িতে হাত দেওয়া হয়নি। তাই মেঝে ও জানালা ধোয়া, আসবাবপত্র ও কার্পেটগুলো ঝাড়া এবং তাতে ঢাকনা পরানোর কাজে চাকরদের সাহায্য করবার জন্য সে দুটি মেয়েমানুষকে এক দিনের জন্য ভাড়া করল। মেয়ে দুটি খুব ভোরে এসে জল গরম করে কাজ শুরু করে দিলো। তাদের একজন স্তেপানিদা; সবে ছেলেকে বুকের দুধ খাওয়া ছাড়িয়ে ঘর ধোয়ার কাজ করে বেড়াচ্ছে; এখন সে যে করণিকটিকে নিয়ে আছে তার

সাহায্যেই কাজকর্ম জুটিয়ে নেয়। নতুন কর্ত্রীটিকে একবার ভাল করে দেখবার ইচ্ছা তার মনে জাগল। স্বামী বাইরে থাকে বলে স্তেপানিদা এখনও একলাই থাকে, আর সেই আগের খেলাই চালিয়ে যাচ্ছে; প্রথমে চালিয়েছে বুড়ো দানিয়েলের সঙ্গে (আগুন জ্বালাবার কাঠ চুরি করার সময় দানিয়েল একদিন তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছিল), তারপর চালিয়েছে মনিবের সঙ্গে, আর এখন চালাচ্ছে করণিকটির সঙ্গে। মনিবকে নিয়ে এখন তার কোনও মাথাব্যথা নেই। সে ভাবল, "এখন দেখছি একটি স্ত্রী হয়েছে।" মহিলাটিকে ও তার গৃহস্থালিকে একবার দেখতে হচ্ছে; লোকে বলে সব কিছু বেশ সাজানো-গোছানো।

সেই ছেলে কোলে দেখার পরে ইউজেন তাকে আর দেখেনি। বাচ্চাটাকে দেখতে হয় বলে সেও কাজে বের হয় না, আর ইউজেনও কদাচিৎ গ্রামের দিকে বেড়াতে যায়। ত্রিমূর্তি রবিবার সকাল পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে সে একটা পতিত জমির তদারকিতে গেল; জমিটাতে ফস্ফেট ছড়াতে হবে; সে যখন বাড়ি থেকে বের হলো মেয়েরা তখন সবে উঠে উনুনে আগুন দিতে শুরু করেছে।

বেশ ক্ষুধার্ত হয়েই প্রাতরাশের জন্য বাড়ি ফিরল। মন-মেজাজ বেশ খুসি। ফটকেই ঘোড়া থেকে নেমে সেটাকে মালির হাতে ছেড়ে দিলো। হাতের চাবুক চালিয়ে লম্বা ঘাসের বুকে শব্দ তুলে সদ্য উচ্চারিত একটা কথাকে বার বার বলতে বলতে সে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। কথাটা হলো; "ফস্ফেটই দরকার"—কেন বলল, কাকে বলল তা সে নিজেই জানে না, জানতে চায়ও না।

সকলে একটা কার্পেট ঘাসের উপর ফেলে পেটাই করছিল। আসবাবপত্রগুলিও বাইরে আনা হয়েছে।

"এই দেখো! লিজা কেমন বাড়ি-পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করেছে!...ফস্ফেটই দরকার।...একটি ব্যবস্থাপিকা বটে! ব্যবস্থাপিকা। হ্যাঁ, ব্যবস্থাপিকা।" কথাগুলি বলতে বলতেই তার চোখের সামনে ভেসে উঠল লিজার সাদা চাদর জড়ানো হাসিমাখা মুখখানি। "হ্যাঁ, বুটজোড়া ছাড়তে হবে, নইলে 'ফস্ফেটই দরকার', অর্থাৎ সারের দুর্গন্ধ, আর ব্যবস্থাপিকাটির এখন যা অবস্থা। 'এ রকম অবস্থা' কেন? কারণ তার মধ্যে একটি ছোট্ট ইর্তানেভ এখন বাড়ছে। হ্যাঁ, ফস্ফেটই দরকার।" নিজের চিন্তায় নিজেই হেসে উঠে সে তার ঘরের দরজায় হাত রাখল।

কিন্তু দরজাটা ঠেলবার আগেই সেটা আপনা থেকে খুলে গেল, আর খালি পা, আস্তিন গোটানো একটি স্ত্রীলোক বালতি হাতে একেবারে তার মুখোমুখি হলো। তাকে পথ করে দেবার জন্য ইউজেন একপাশে সরে দাঁড়ালো; ভিজে হাতে মাথাব রুমালটা ঠিক করে স্ত্রীলোকটিও একপাশে সরে গেল।

"যাও, যাও, আমি ভিতরে যাব না। তুমি যদি—" বলতে বলতেই মেয়েটিকে চিনতে পেরে ইউজেন হঠাৎ থেমে গেল।

মেয়েটি হাসি-হাসি চোখে খুসি মনে তার দিকে তাকাল; তারপরেই ঘাঘরাটা নামিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

"কী বাজে চিন্তা!...এ অসম্ভব," তাকে দেখে বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকে, মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে নিজের মনেই ইউজেন বলল। তাকে দেখে সে বিরক্ত হয়েছে, তবু মেয়েটির চঞ্চল পদক্ষেপের দোলালাগা মজবুত শরীর, তার খালি পা, বাহু ও ঘাড়, শার্টের নয়ন-সুখকর ভাঁজ ও পায়ের সাদাগুলি পর্যন্ত তোলা সুন্দর ঘাঘরাটা থেকে সে কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারল না।

"কিন্তু আমি তাকিয়ে আছি কেন?" যাতে তাকে না দেখতে হয় সেই ভাবে চোখ নামিয়ে সে নিজেকেই শুধালো। "যাই হোক, আর এক জোড়া বুট আনতে আমাকে তো ভিতরে যেতেই হবে।" নিজের ঘরে যাবার জন্য ঘুরে পাঁচ পা যাবার আগেই মেয়েটিকে আর একবার দেখবার জন্য আবার সে চোখ ফেরাল; কিন্তু কেন যে ফেরাল তা সে নিজেই জানে না। মোড় ঘুরবার মুখে মেয়েটিও তার দিকে ফিরে তাকাল।

ইউজেন ভাবল, "আঃ, আমি কি করছি! ও তো ভাবতে পারে...এটা তো ঠিকই যে এর মধ্যেই ও ভাবছে..."

ইউজেন ভিজে ঘরটাতে ঢুকল। বুড়িটা ঘরের ভিতরেই ছিল; সে তখনও ধোয়ামোছা করছে। পা টিপে টিপে নোংরা জলে ভেজা মেঝেটা পেরিয়ে ইউজেন দেয়ালের নিচে বুটের কাছে এগিয়ে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে এমন সময় বুড়িটাই বেরিয়ে গেল।

"এ তো চলে গেল, এবার অপরটি, ঐ স্তেপানিদা একলা এখানে আসবে," তার ভিতর থেকে কে যেন বলল।

"হা ভগবান, এ আমি কি ভাবছি, আর কী করছি!" বুটজোড়া হাতে নিযে সে ছুটে হল-ঘরে গেল, সেখানে রেখে নিজেই বুরুশ করল, তারপর বারান্দায় চলে গেল; তখন দুই মামণি সেখানে বসে কফি খাচ্ছিল। লিজাও নিশ্চয় তার জন্য অপেক্ষা করেছিল; একই সময়ে আর একটা দরজা দিয়ে সেও বারান্দায় হাজির হলো।

'হায় ভগবান! ও তো আমাকে কত সম্মানিত, পবিত্র ও নির্দোষ মনে করে— কিন্তু ও যদি জানত!"—সে ভাবতে লাগল।

লিজা যথারীতি ঝলমলে মুখেই তার দিকে তাকাল। কিন্তু যে কারণেই হোক ইউজেনের কাছে আজ তাকে বড়ই ম্লান, হল্‌দে, ও দুর্বল মনে হলো।

১০

প্রায়ই যে রকম হয়ে থাকে, কফি খেতে খেতে এমন সব মেয়েলি আলোচনা হচ্ছিল যার কোনও মাথামুণ্ডু নেই, অথচ তার বিরামও নেই।

দুই বৃদ্ধা একে অপরকে ঠুকছে, আর লিজা সুকৌশলে দু'জনকেই সামাল দিচ্ছে। স্বামীকে বলল, "তুমি ফিরে আসার আগেই তোমার ঘরটা ধোয়া শেষ করতে না পারায় আমি সত্যি দুঃখিত। কিন্তু সব কিছু ভালভাবে গুছিয়ে রাখতেই আমি চাই।"

"আচ্ছা, আমি উঠে যাবার পরে তোমার ভাল ঘুম হয়েছিল তো?"

"হ্যাঁ, ভাল ঘুম হয়েছে, আর শরীরও ভাল লাগছে।"

লিজার মা বারবারা আলেক্সীভ্না বলে উঠল, "ওর মতো অবস্থায় এই অসহ্য গরমে কোনও মেয়ে কি ভাল থাকতে পারে, বিশেষত ওর জানালাগুলোও যে সূর্যের দিকে মুখ করা। আর, জানালাগুলোতে না আছে খড়খড়ি, না আছে খস্‌খস্। আবার বাড়িতে সব খস্‌খস্ লাগানো।"

"কিন্তু দশটার পরেই আপনি ছায়া পাচ্ছেন," মারি পাভ্‌লভ্না বলল।

"আরে, ওতেই তো জ্বর হয়; ঠাণ্ডা লাগে যে," সে একটু আগে যা বলেছে তার সঙ্গে কথাগুলো যে খাপ খায় না সেটা খেয়াল না করে বারবারা আলেক্সীভ্না বলল। আমার ডাক্তার সব সময়ই বলেন, রোগীকে না জানলে কখনও রোগ ধরা যায় না। আর এ সব ব্যাপার তিনি ভালই জানেন, কারণ তিনিই সকলের বড় ডাক্তার। আর প্রতি 'ভিজিট'-এর জন্য আমরা তাকে একশো' রুবল দিই। আমার স্বর্গত স্বামীর ডাক্তারদের উপর বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু আমার কোনও কাজে বাধা দিত না।"

"স্ত্রীর জীবন এবং সন্তানের জীবন যখন তার উপর নির্ভর করে তখন কি কোনও স্বামী বাধা দিতে..."

"ঠিক কথা, কিন্তু স্ত্রীর যদি অন্য উপায় থাকে তাহলে স্বামীর উপর নির্ভর করতে হয় না। ভাল স্ত্রী সব সময়ই স্বামীর ইচ্ছামতোই চলে," বারবারা আলেক্সীভ্না বলল—"শুধু অসুখের পরে লিজা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে।"

"না, না, মামণি, আমি খুব ভাল আছি। কিন্তু তোমাকে গরম দুধের সর এনে দেয়নি কেন?"

"দরকার নেই। এমনি সরেই চলবে।"

নিজেকে সমর্থন করতে মারি পাভ্‌লভ্না বলল, "বারবারা আলেক্সীভ্নাকে আমি তো সেটাই দিতে চেয়েছিলাম, উনিই আপত্তি করলেন।"

"না, না। আজ আমার দরকার নেই", একটা অপ্রীতিকর আলোচনার উপর ইতি টানবার জন্য বারবারা আলেক্সভ্না ইউজেনের দিকে ঘুরে বলল, "আচ্ছা, ফস্ফেট ছড়িয়েছ তো?"

লিজা দুধের সর আনতে ছুটে গেল।

"কিন্তু আমি চাই না। আমি চাই না।"

মারি পাভ্‌লভ্না বলল, "লিজা, লিজা, ধীরে যাও। এ রকম ছুটাছুটি করাটা ওর পক্ষে ক্ষতিকর।"

বারবারা আলেক্সীভ্‌না বলল, "মনে শান্তি থাকলে কিছুতেই ক্ষতি হয় না।"

লিজা সর নিয়ে ফিরে এল; ইউজেন কফি খেতে খেতে সেই একঘেয়ে আলোচনা শুনতে লাগল। এ ধরনের কথাবার্তা শুনতে সে অভ্যস্ত, কিন্তু আজকের কথাবার্তাগুলি এতই অর্থহীন যে তার বিরক্তি ধরে গেল। সে চাইছিল নিজের ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবতে, কিন্তু এই বকবকানি তাকে বিরক্ত করে তুলল। কফি শেষ করে বারবারা আলেক্সীভ্‌না মন খারাপ করে উঠে গেল। লিজা, ইউজেন ও মারি পাভ্‌লভ্‌না থেকে গেল; তাদের আলোচনাও চলল বেশ সরল, সরসভাবে। লিজা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল যে একটা কিছু ইউজেনকে কষ্ট দিচ্ছে; সে জানতে চাইল অপ্রীতিকর কিছু ঘটছে কি না। এ প্রশ্নের জন্য ইউজেন প্রস্তুত ছিল না; একটু ইতস্তত করে বলল যে সে রকম কিছু ঘটেনি। এ জবাব শুনে লিজা আরও চিন্তিত হয়ে পড়ল। একটা কিছু যে তাকে কষ্ট দিচ্ছে, বেশ বড় রকমেব কষ্টই দিচ্ছে, সেটা দুধের মধ্যে মাছি পড়ার মতোই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, অথচ ইউজেন কিছুই বলতে চাইছে না। সেটা কি হতে পারে?

১১

প্রাতরাশের পরে সকলে চলে গেল। ইউজেন যথাবীতি তাব পড়ার ঘবে গেল, কিন্তু পড়ায় বা চিঠি লেখায় মন না দিয়ে একটার পর একটা সিগাবেট খেতে খেতে কি যেন ভাবতে লাগল। বিয়ের পর থেকেই যে খারাপ চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেয়েছে বলে সে ভেবেছিল সেই চিন্তার অপ্রত্যাশিত পুনরাগমনে সে অতিমাত্রায ব্যথিত ও বিস্মিত হয়েছে। সেদিন থেকে একটি বারের জন্যও সেই মেয়ে মানুষ সম্পর্কে অথবা স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোনও স্ত্রীলোক সম্পর্কেই সে ধরনের ভাব তার মাথায় আসেনি। এই ভাবে মুক্তি পেয়ে সে খুবই খুশি বোধ করেছিল, কিন্তু এই আকস্মিক সাক্ষাৎ—সাধারণভাবে যার কোনওই গুরুত্ব নেই—যেন নতুন করে তাকে বুঝিয়ে দিলো যে সে মোটেই মুক্তি পায়নি। সে যে এই চিন্তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাকে কামনা করছে, এটা তার কাছে যন্ত্রণার কারণ নয়—এ সম্ভাবনাব কথা স্বপ্নেও তার মনে আসেনি—কিন্তু চিন্তাটা যে তার মাথায় এসেছে, এবং সে চিন্তা থেকে সে যে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে, এই মনোভাবই তার যন্ত্রণার কারণ। যাই হোক এ চিন্তাকে সে যে চাপা দিতে পারবে সে বিষয়ে তার মনে কোনও সন্দেহ নেই।

একটা চিঠির জবাব দিতে হবে; একটা প্রবন্ধও লিখতে হবে; লেখার টেবিলে বসে সে কাজ শুরু করে দিলো। কাজ শেষ করে চিন্তার কথাটা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে সে আস্তাবলে যাবার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু তার এমনি কপাল খারাপ যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাচক্রেই হোক আর ইচ্ছা করেই হোক ফটক থেকে পা বাড়ানো

মাত্রই মোড় ঘুরে তার সামনে দেখা দিলো একটা লাল ঘাঘরা আর লাল রুমাল; মেয়েটা দুই হাত ঝুলিয়ে শরীরটা দুলিয়ে তার পাশ দিয়ে চলে গেল। শুধু যে চলে গেল তাই নয়, যেন লীলাচ্ছলেই সঙ্গীনীদের ধরবার জন্য তার পাশ কাটিয়ে ছুটে চলে গেল।

আর একবার তার কল্পনায় ভেসে উঠল সেই উজ্জ্বল দুপুর, কাঁটাঝোপ, দানিয়েলের কুঁড়ের পিছনের অংশ, আর গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে মেয়েটির হাসি-হাসি মুখে গাছের পাতা চিবনোর দৃশ্য।

"না, এ ভাবে চলতে পারে না", সে নিজের মনেই বলল, মেয়েটি দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়া পর্যন্ত সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে সে আপিসের দিকে পা বাড়াল।

ডিনারের সময় হয়ে গিয়েছিল; তাই সে আশা করেছিল যে নায়েবকে সেখানেই পেয়ে যাবে; পেয়েও গেল। দিবানিদ্রাটি সেরে নায়েব সবে ঘুম থেকে উঠেছে; আড়মোড়া ভেঙে একটা হাই তুলে আপিসে দাঁড়িয়ে সে একজন পশুচালকের কথা শুনছিলো।

"ভাসিলি নিকলাইচ।" ইউজেন নায়েবকে ডাকল।

"হুজুরের কি হুকুম হয়?"

"যা বলছিলে সেটা শেষ করো।"

"ওটাকে কি ভিতরে আনবে না?" ভাসিলি নিকলাইচ লোকটিকে বলল।

"ওটা খুব ভারী ভাসিলি নিকলাইচ।"

"ওটা কি?" ইউজেন জানতে চাইল।

"কেন, মাঠের মধ্যে একটা গাইয়ের বাছুর হয়েছে। সব ঠিকই আছে, এখনই একটা ঘোড়া জুড়তে বলব। নিকলাস লাইসুখকে একটা মালগাড়ি বের করতে বলো।"

পশুপালক বেরিয়ে গেল।

সলজ্জ ভঙ্গিতে ইউজেন বলল, "তুমি কি জানো ভাসিলি নিকলাইচ, বিয়ের আগে আমি একটু বিপথে পা দিয়েছিলাম...হয় তো শুনেছ..."

মনিবের প্রতি অনুকম্পা বোধ করে ভাসিলি নিকলাইচ সহাস্য চোখে বলল, "স্তেপানিদার কথা বলছেন কি?"

"হ্যাঁ, তাই। শোনো। দয়া করে বাড়ির কাজকর্মের জন্য ওকে রেখো না। বুঝতেই তো পারছ, সেটা আমার পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর...'

"ঠিক; সম্ভবত করণিক ভানিয়াই এ ব্যবস্থাটা করেছে।"

"হ্যাঁ, দয়া করে...বাকি ফস্ফেটটা ছড়ালে হতো না?" নিজের অস্বস্তি ঢাকবার জন্য ইউজেন বলল।

"হ্যাঁ, আমি সেই ব্যবস্থাই করতে যাচ্ছি।"

এইভাবেই ব্যাপারটার সুব্যবস্থা হলো, ইউজেনের মনও শান্ত হলো; ভাবল এ কটা বছর যখন ওকে ছাড়া থাকতে পেরেছে, এখনও সেইভাবেই চলবে। "তাছাড়া ভাসিলি নিকলাইচ করণিক আইভানকে বলবে; আইভান বলবে; আর সেও বুঝতে পারবে যে এটা আমি চাই না," ইউজেন ভাবল; তাকে বেশ কঠিন কাজ হলেও সে যে ভাসিলি নিকলাইচকে কথাটা বলতে পেরেছে সেজন্য সে খুব খুশি হলো।

"হ্যাঁ, ঐ সন্দেহ ও লজ্জার মধ্যে থাকার চাইতে এটাই ভাল, অনেক ভাল।" চিন্তায়ও সেই পাপের কথা স্মরণ করে সে শিউরে উঠল।

১২

নিজের লজ্জাকে জয় করে ভাসিলি নিকলাইচকে কথাগুলি বলার নৈতিক প্রচেষ্টার ফলে ইউজেনের মন শান্ত হলো। তার মনে হলো, সব কিছু চুকেবুকে গেছে। লিজা সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করল যে ইউজেন বেশ শান্ত হয়েছে, বরং স্বাভাবিক অবস্থার চাইতে একটু বেশি খুশিই হয়েছে। "দুই মায়ের কড়া কড়া কথাই তাকে বিচলিত করে তুলেছিল। বিশেষত তার মতো একজন স্পর্শকাতর ও উদার মানুষের পক্ষে সব সময় এ ধরনের অমিত্রসুলভ বাজে কটুক্তি শোনাটা খুবই অপ্রীতিকর," সে ভাবল।

পরের দিনটা ছিল ত্রিমূর্তি রবিবার। দিনটা চমৎকার; মালা গাঁথার জন্য জঙ্গলে যাবার আগে চাষী মেয়েরা প্রথামতো জমিদারের বাড়িতে এসে নাচ-গান শুরু করে দিলো। মারি পাভ্‌লভ্‌না ও বারবারা আলেক্সীভ্‌না ভাল পোশাক পরে ছাতা হাতে নিয়ে ফটকে এসে সোজা গায়িকাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। লম্পট ও মাতাল নাদুস-নুদুস খুড়োটিও তাদের সঙ্গে সেখানে এসে হাজির হলো, এই গ্রীষ্মকালটা সে ইউজেনদের সঙ্গে কাটাতে এসেছে।

যে রকম হয়ে থাকে, সকলের মাঝখানে গোল হয়ে নাচছে, রং-বেরঙের উজ্জ্বল পোশাকের একদল যুবতী ও মেয়ে, আর তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘূর্ণায়মান উপগ্রহের মতো চারিদিক থেকে তাদের ঘিরে অন্য সব মেয়েরা নাচছে হাতে-হাত ধরে, নতুন ছাপা কাপড়ের ঘাঘরায় খস্‌খস্‌ শব্দ তুলে; হাসি-খুশি ছেলের দল মুখ টিপে হেসে হেসে একবার এগিয়ে একবার পিছিয়ে নাচছে; বড় বড় ছেলেরা গাঢ় নীল ও কালো কোট পরে, মাথায় টুপি চাপিয়ে, লাল শার্ট গায়ে দিয়ে অনবরত সূর্যমুখী ফুলের বীচি থু-থু করে ফেলছে; আর এক পাশে দাঁড়িয়ে গৃহভৃত্যরা ও অন্য দর্শনার্থীরা নাচিয়ে মেয়েদের দেখছে। দুটি মহিলাই নাচের বৃত্তের একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়াল, আর লিজাও হাল্কা-নীল পোশাক পরে, মাথায় হাল্কা-নীল ফিতে বেঁধে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল; চওড়া আস্তিনের নিচে তার লম্বা সাদা বাহুযুগল ও কনুইয়ের ভাঁজ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ইউজেনের আসার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু লুকিয়ে থাকাটা হাস্যকর বোধ হওয়ায় সিগারেট খেতে খেতে সেও ফটকে এসে দাঁড়াল, এবং সকলকে অভিবাদন জানিয়ে একজনের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। এদিকে মেয়েরা নাচের তালে তালে যথাসাধ্য চিৎকার করে গান গাইতে গাইতে আঙুল ফোটাচ্ছে, হাততালি দিচ্ছে।

ইউজেনের স্ত্রী ব্যাপারটা লক্ষ্য করেনি, কিন্তু একটি ছোট মেয়ে এসে তাকে বলল, "ওরা মনিবকে ডাকছে।" লিজা ইউজেনকে ডেকে এনে নাচ দেখতে, বিশেষ করে নাচিয়েদের মধ্যে যে মেয়েটি তাকে সব চাইতে খুশি করেছে তাকে দেখতে বলল। সে মেয়েটিই স্তেপানিদা। সে পরেছে একটা হলুদ ঘাঘরা, ভেলভেটের হাত-কাটা কুর্তা ও রেশমী ওড়না; মেয়েটির শরীরটা চওড়া, উৎসাহী, লালচে রং, আর হাসিখুশি। সে যে ভাল নাচছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ইউজেনের সেদিকে দৃষ্টি নেই।

পিঁস-নেটা দু'বার বদলে সে ভাবল, "না, এর হাত থেকে নিস্তার নেই।"

তার আকর্ষণের ভয়েই সে মেয়েটির দিকে তাকাল না; কিন্তু ঠিক সেই কারণেই কচিৎ দৃষ্টিপাতের ফলে তার যেটুকু চোখে পড়ল তাতেই মেয়েটিকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলল। তাছাড়া মেয়েটির চোখের ঝলকানি দেখে সে বুঝল যে মেয়েটি তাকে দেখেছে এবং সে নিজেও যে খুশি হয়েছে তাও বুঝতে পেরেছে। সৌজন্যবোধে সে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল এবং যখন দেখল যে বারবারা আলেক্সীভ্না একান্ত অর্থহীনভাবেই মেয়েটিকে "সোনা" বলে কাছে ডেকে তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছে, তখনই সে মুখ ঘুরিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

পাছে মেয়েটিকে দেখতে হয় তাই সে বাড়ির ভিতরে চলে গেল; কিন্তু উপরে উঠে জানালার কাছে এগিয়ে গেল, এবং কি জানি কেন যতক্ষণ পর্যন্ত মেয়েরা ফটকে ভিড় করে থাকল ততক্ষণ পর্যন্ত সেইখানে দাঁড়িয়ে এমনভাবে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল যেন তাকে দেখতে তার কত না সুখ।

সকলে চলে গেলে সে ছুটে সেখান থেকে এসে নিঃশব্দ পায়ে বারান্দায় গেল, এবং একটা সিগারেট খেতে খেতে বাগানটা পেরিয়ে মেয়েটি যেদিকে গেছে সেই দিকে হাঁটতে লাগল। গলিটা ধরে দু'পাও এগোয়নি এমন সময় গাছের আড়ালে একটা ভেলভেটের হাত-কাটা কুর্তা, একটা লাল-হলুদ ঘাঘরা ও লাল ওড়না তার চোখে পড়ল। অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে সে যেন কোথায় যাচ্ছে। "ওরা কোথায় যাচ্ছে?"

হঠাৎ একটা ভয়ংকর কামনা যেন তাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিলো; একটা হাত যেন তার হৃৎপিন্ডটাকে চেপে ধরেছে। যেন অন্য কারও ইচ্ছায় চারিদিক তাকিয়ে সে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল।

"ইউজেন আইভানিচ! ইউজেন আইভানিচ! আমি হুজুরের সঙ্গে দেখা করতে

এসেছি", পিছন থেকে কে যেন বলল। ইউজেন দেখল বুড়ো সামোখিন দাঁড়িয়ে আছে, সে একটা কুয়ো কাটছে; তাড়াতাড়ি আত্মস্থ হয়ে সে সামোখিনের দিকে এগিয়ে গেল। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই একপাশে তাকিয়ে দেখল, সঙ্গিনীকে নিয়ে মেয়েটি ঢালু পথ বেয়ে নেমে যাচ্ছে, কুয়োর দিকেই যাচ্ছে, অথবা কুয়ো একটা ওজুহাত মাত্র; সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারা দু'জনই ছুটতে ছুটতে নাচের দলে গিয়ে যোগ দিলো।

১৩

সামোখিনের সঙ্গে কথা বলে ইউজেন যখন বাড়ি ফিরল তখন তার মন ভীষণ খারাপ, যেন একটা পাপ কাজ করে ফিরেছে। প্রথমত, মেয়েটা তাকে বুঝতে পেরেছে, বিশ্বাস করেছে যে সে তাকে কামনা করছে, আর নিজেও তাই চেয়েছে। দ্বিতীয়ত, আন্না প্রখোরভা নামের অপর মেয়েটিও নিশ্চয় সব জানে।

সব চাইতে বড় কথা, নিজের পরাজয় সে অনুভব করছে; সে আর এখন নিজের ইচ্ছার কর্তা নয়, অন্য কোনও শক্তি তাকে চালাচ্ছে, সৌভাগ্যক্রমে এবার সে রক্ষা পেয়েছে, কিন্তু আজ না হলেও কাল, বা অন্য একদিন তার মৃত্যু হবেই।

"হ্যাঁ, মৃত্যু", এর অন্য কোনও ব্যাখ্যা সে জানে না : সকলের চোখেব সামনে গ্রামের একটি চাষী মেয়ের জন্য যুবতী, প্রেমময়ী স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ করা—এটা মৃত্যু, পরিপূর্ণ মৃত্যু ছাড়া আর কি? এরপরে বেঁচে থাকাই তো অসম্ভব! না, একটা কিছু করতেই হবে।

নিজেকে বলতে লাগল, "ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর! আমি কি করব? এই ভাবেই কি আমি শেষ হয়ে যাব? কিছুই কি করা সম্ভব নয়? অথচ একটা কিছু করতেই হবে। তার কথা মোটেই ভাববে না"—নিজেকেই হুকুম করল। "ভাববে না!" আর সঙ্গে সঙ্গে তার কথা ভাবতে লাগল, চোখের সামনে তাকে দেখতে পেল, আর দেখতে পেল সেই গাছের ছায়া।

তার মনে পড়ল, একটি সন্ন্যাসীর কথা সে পড়েছে : রোগ নিরাময়ের জন্য একটি নারীকে স্পর্শ করার ফলে তার মনে প্রলোভন জেগেছিল, আর সেই প্রলোভনকে জয় করবার জন্য অপর হাতটিকে জ্বলন্ত ধুনুচিতে ঢুকিয়ে দিয়ে আঙুলগুলো পুড়িয়ে ফেলেছিল। সেই কথা তার মনে পড়ে গেল। "হ্যাঁ, এ ভাবে নষ্ট হওয়ার চাইতে আঙুল পুড়িয়ে ফেলতেও আমি রাজী। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল ঘরে কেউ আছে কি না, তারপর একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে তার শিখায় একটা আঙুলকে ধরল। বিদ্রূপ করে নিজেকেই বলল, "এবার, তার কথা ভাব!" জ্বালা করে উঠতেই কাল্‌চে আঙুলটা সরিয়ে নিয়ে দেশলাইটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে নিজে নিজেই হাসতে লাগল। কী অর্থহীন কাজ! এতে চলবে না। কিন্তু একটা কিছু তো করতেই হবে, তার দিকে

চাওয়া বন্ধ করতে হবে—হয় নিজে সরে যেতে হবে, নয়তো তাকে সরিয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ—তাকেই সরিয়ে দাও। তার স্বামীকে টাকা দাও—সে শহরে বা অন্য কোনও গ্রামে চলে যাক। সকলে এ কথা শুনবে, এ নিয়ে নানা কথা বলবে। বেশ তো, তাতে কি হলো? এই বিপদের তুলনায় সে তো অনেক ভাল। "হ্যাঁ, এটাই করতে হবে", নিজেকে কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে এক দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ নিজেকেই শুধালো, "ও কোথায় যাচ্ছে?" তার মনে হলো, মেয়েটি তাকে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে, আর এখন তার দিকে তাকিয়ে অন্য একটা মেয়ের হাত ধরে অন্য হাতটি সবেগে দোলাতে দোলাতে বাগানের দিকে চলেছে। কেন যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে সে কথা না জেনেই নিজের মনের তাড়নাতেই সে আপিসের দিকে পা বাড়াল।

উৎসবের পোশাক পরে তেল-কুচকুচ চুলে ভাসিলি নিকলাইচ তার স্ত্রী ও প্রাচ্যদেশীয় রুমালধারী একজন অতিথিকে নিয়ে চায়ের টেবিলে বসে ছিল।

"তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে ভাসিলি নিকলাইচ!"

"দয়া করে বলুন কি কথা। আমাদের চা খাওয়া হয়ে গেছে।"

"না। তুমি আমার সঙ্গে বাইরে চলো।"

"এখুনি যাচ্ছি; শুধু টুপিটা নিয়ে আসছি।" সানন্দে বাইরে বের হতে হতে ভাসিলি নিকলাইচ বলল, "তানিয়া, সামোভারের আগুনটা নিভিয়ে দাও।"

ইউজেন বুঝতে পারল, ভাসিলি চা খাচ্ছিল, কিন্তু কি আর করা যাবে? এটা তো আরও ভাল হলো—তার এই বিপদে ভাসিলি অধিকতর তৎপরতার সঙ্গে সহানুভূতি জানাবে।

বলল, "ভাসিলি নিকলাইচ, সেই ব্যাপারে কথা বলতেই আমি আবার এসেছি—সেই মেয়েটির ব্যাপারে।"

"কেন, তার কি হলো? ওকে কাজে নিতে তো বারণ করে দিয়েছি।"

"না, আমি সাধারণভাবে ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি, এবং এ ব্যাপারে তোমার পরামর্শ চাইতে এসেছি। তাদের এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া, মানে গোটা পরিবারকেই সরিয়ে দেওয়া কি সম্ভব নয়?"

"কোথায় পাঠাবেন তাদের?" ভাসিলি বলল, ইউজেনের মনে হলো তার গলায় যেন অসম্মতি ও ব্যঙ্গের সুর।

'দেখো,, তাদের কিছু টাকা, এমন কি কল্‌তভ্‌স্কিতে কিছু জমি দেবার কথা আমি ভেবেছি—তাহলেই সে এখানে থাকবে না।"

"কিন্তু কেমন করে তাদের পাঠাবেন? শিকড়-ছেঁড়া হয়ে তারা কোথায় যাবে? আর এ কাজ আপনি করবেনই বা কেন? সে আপনার কোন্ ক্ষতিটা করবে?"

"আঃ, ভাসিলি নিকলাইচ, তোমার বোঝা উচিত যে এ কথাটা শুনতে পাওয়া আমার স্ত্রীর পক্ষে খুবই ভয়াবহ।"

"কিন্তু কে তাকে বলতে যাবে?"

"এই ভয় নিয়ে আমিই বা থাকব কেমন করে? সমস্ত ব্যাপারটাই আমার পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক।"

"কিন্তু সত্যি সত্যি আপনি এত কষ্ট পাচ্ছেন কেন? অতীতকে যে উপরে টেনে তোলে—তার চোখ তো যাবেই! কথায় বলে, ঈশ্বরের চোখে কে পাপী নয়, আর জারের চোখে কে দোষী নয়!"

"সে যাই হোক, তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াটাই সব চাইতে ভাল। তুমি কি তার স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে পারো না?"

"কথা বলে কোনও লাভ হবে না! আরে, ইউজেন আইভানিচ, আপনার হলো কি? সে অতীতের কথা তো সকলেই ভুলে গেছে। কত কিছুই তো ঘটে। কার এত সাহস যে আপনার দুর্নাম রটাবে? সকলেই তো আপনাকে চোখের সামনে দেখছে।"

"সে যাই হোক, তুমি একবার যাও, তার সঙ্গে কথা বলো।"

"ঠিক আছে। কথা বলব।"

ইউজেনও জানে এতে কোনও ফল হবে না, তবু এ কথা শুনে তার মন কিছুটা শান্ত হলো। অন্তত এটা সে বুঝতে পারল যে উত্তেজনাবশে বিপদটাকে অনেক বড় করে দেখেছে।

সে কি পূর্ব-ব্যবস্থা মতোই মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল? সেটা অসম্ভব। সে তো বাগানে একটু বেড়াতেই গিয়েছিল, আর ঘটনাক্রমে ঠিক সেই সময়ই মেয়েটি ছুটতে ছুটতে সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিল।

১৪

সেই ত্রিমূর্তি রবিবারেই ডিনারের পরে লিজা হাঁটতে হাঁটতে বাগান থেকে মাঠের দিকে যাচ্ছিল; সেখানে স্বামী তাকে এক ধরনের ঘাস দেখাতে চেয়েছিল। একটা নালা পার হবার সময় ভুলে পা ফেলে লিজা মাটিতে পড়ে গেল। আস্তেই এক পাশে কাৎ হয়ে পড়লেও সে আর্তনাদ করে উঠল; তার মুখে শুধু ভয়ের নয়, একটা যন্ত্রণার চিহ্নও স্বামীর চোখে পড়ল। স্ত্রীকে ধরে তুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই তাকে ইসারায় সরে যেতে বলল।

দুর্বল হাসি হেসে বলল, "না, একটু সবুর করো ইউজেন।" ইউজেনের মনে হলো, স্ত্রীর চোখে যেন অপরাধের আভাষ। "পাটা কেমন যেন মচ্‌কে গেল।"

বারবারা আলেক্সীভ্‌না বলে উঠল, "এই তো, পই-পই করে বলেছি, এ অবস্থায় কেউ কি লাফিয়ে নালা পার হয়?"

"সব ঠিক আছে মামণি। এখনি উঠে পড়ব।" স্বামীর সহায়তায় উঠে দাঁড়ালেও সঙ্গে সঙ্গে তার মুখটা বিবর্ণ, ভয়ার্ত দেখালো।

"সত্যি, আমার অসুস্থ বোধ হচ্ছে," এই বলে মার কানে কানে কি যেন বলল।

বারবারা আলেক্সীভ্না চেঁচিয়ে উঠল, "হায় ভগবান, এ তুমি কী করেছ! আগেই বলেছিলাম, ওখানে যাওয়া তোমার পক্ষে উচিত নয়। দাঁড়াও—চাকরদের ডাকছি। ও যেন না হাঁটে। ওকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

বাঁ হাত দিয়ে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে ইউজেন বলল, "তুমি ভয় পেয়ো না লিজা, আমি তোমাকে বয়ে নিয়ে যাব। আমার গলা জড়িয়ে ধরো। এই ভাবে।" ঝুঁকে পড়ে ডান হাতটা হাঁটুর নিচে দিয়ে সে স্ত্রীকে তুলে নিল। তখন স্ত্রীর মুখে যে যন্ত্রণাকাতর অথচ স্বর্গীয় দীপ্তি ফুটে উঠেছিল তা সে কোনওদিন ভুলবে না।

ঈষৎ হেসে লিজা বলল, "আমি যে তোমার পক্ষে বড় বেশি ভারী সোনা। মামণি ছুটছে, তাকে বলো!" লিজা মুখ নামিয়ে স্বামীকে চুমো খেলো। তার মনের বাসনা, স্বামী তাকে যে ভাবে বয়ে নিয়ে চলেছে সেটা মার চোখে পড়ুক।

ইউজেন ডেকে বলল, বারবারা আলেক্সীভ্না যেন তাড়াহুড়া না করে, সেই লিজাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে। বারবারা আলেক্সীভনা থেমে গিয়ে আরও জোরে চেঁচাতে শুরু করল।

"ওকে ফেলে দেবে যে, নির্ঘাৎ ফেলে দেবে। তুমি ওকে মেরে ফেলতে চাইছ। তোমার কি বিবেক বলে কিছু নেই!"

"কিন্তু আমি তো ওকে বেশ ভালভাবেই নিয়ে যাচ্ছি।"

"তুমি আমার মেয়েকে মেরে ফেলবে সেটা আমি দেখতে চাই না, দেখতে পাবি না।" বলেই সে ছুটে গলির মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লিজা হেসে বলল, "কিছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"ঠিক কথা। শুধু গত বারের মতো অবস্থা না হলেই হয়।"

"না। আমি সে কথা বলছি না। সেটা ঠিক আছে। আমি মামণির কথা বলছি। তুমি খুব শ্রান্ত। একটু বিশ্রাম নাও।"

বেশি ভারী বোধ হলেও ইউজেন সগর্বে ও সানন্দে স্ত্রীকে বাড়ি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গেল; বারবারা আলেক্সীভ্না যে দাসী ও রাঁধুনিটিকে পাঠিয়েছিল তাদের হাতে তুলে দিলো না। শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে সে স্ত্রীকে বিছানায় শুইয়ে দিলো।

"এবার চলে যাও?" বলে লিজা স্বামীর হাতটা টেনে নিয়ে চুমো খেলো। "আনুশ্কা ও আমি সব ব্যবস্থা করে নেব।"

মারি পাভ্লভ্নাও তার ঘর থেকে ছুটে এল। সকলে লিজার পোশাক ছাড়িয়ে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলো। ইউজেন একখানা বই হাতে নিয়ে বসবার ঘরে অপেক্ষা করতে লাগল। বারবারা আলেক্সীভ্না এমন গম্ভীর তিরস্কারের ভঙ্গিতে পাশ দিয়ে চলে গেল যে সে ভয় পেয়ে গেল।

"আচ্ছা, এখন কি রকম?" সে শুধালো।

"এখন কি রকম? ও কথা জিজ্ঞেস করে লাভ কি? বৌকে যখন লাফিয়ে নালা পার হতে দিয়েছিলে তখন যা চেয়েছিলে ঠিক সেই রকমই আছে আর কি।"

"বারবারা আলেক্সীভ্‌না।" ইউজেন চিৎকার করে উঠল। "এ অসহ্য। আপনি যদি মানুষকে কষ্ট দিতে, তার জীবনকে বিষময় করে তুলতেই চান (সে বলতে চেয়েছিল তাহলে অন্য কোথাও গিয়ে সেটা করুন', কিন্তু নিজেকে সংযত করে ফেলল)। "এতে কি আপনার কষ্ট হচ্ছে না?"

"এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।" বিজয়গর্বে টুপিটা দোলাতে দোলাতে মহিলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পড়ে যাওয়ার ফলটা খারাপই হয়েছে; লিজার একটা পা বেশ মচ্‌কে গেছে এবং আর একবার গর্ভপাতের আশংকা দেখা দিয়েছে। সকলেই বুঝতে পারছে যে করার কিছুই নেই; তাকে শুধু চুপচাপ শুয়ে থাকতে হবে। তবু সকলে মিলে স্থির করল, একজন ডাক্তারকে আনা হোক।

ইউজেন ডাক্তারকে লিখল, "প্রিয় নিকলাই সেমেনিচ, আপনি চিরদিন আমাদের প্রতি সদয়; তাই আশা করি আমার স্ত্রীকে সাহায্য করতে এখানে আসতে আপত্তি করবেন না। সে..." ইত্যাদি। চিঠিটা লিখে সে আস্তাবলে গেল ঘোড়া ও গাড়িব ব্যবস্থা কবতে। কোনও জমিদারি যখন বড় মাপে চালানো না হয় তখন এ সব ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করা যায় না, অনেক কিছু ভাবতে হয়। যাহোক ব্যবস্থাদি করে কোচয়ানকে পাঠিয়ে দিয়ে ন'টার পরে সে বাড়িতে ফিরে এল। স্ত্রী চুপচাপ শুয়েছিল; বলল, সে সম্পূর্ণ ভাল আছে, কোনও ব্যথা নেই। লিজার দিক থেকে আড়াল করে রাখা একটা বাতির পাশে বসে বারবারা আলেক্সীভ্‌না একটা লাল বড় ঢাকনা বুনছিল; তার মনের ভাবখানা এই : যা ঘটে গেছে তারপরে শান্তিতে থাকা অসম্ভব, তথাপি অন্য যে যাই করুক সে তার কর্তব্য করেই যাবে।

ইউজেনও সেটা লক্ষ্য করল; কিন্তু মনের দুশ্চিন্তা গোপন করে বাইরে শান্ত, উৎফুল্ল ভাব দেখিয়ে কোন্ কোন্ ঘোড়া সে বেছে নিয়েছে এবং কাবুশ্‌কা নামেব ঘোটকিটা ত্রয়কার বাঁ দিকের ঘোড়া হিসাবে কী চমৎকার কদমে ছুটেছে সে কথাই বলতে শুরু করল।

সেলাইটাকে বাতির একেবাবে কাছে নিয়ে পিঁস্-নের নিচ দিয়ে সেটাকে ভাল করে দেখে বারবারা আলেক্সীভ্‌না বলল, "তা তো বটেই, দরকারের সময়ই তো ঘোড়াকে ছুটিয়ে দেখা চাই সেটা কেমন চলে। সম্ভবত ডাক্তারকেও এই নালার মধ্যে ফেলে দেওয়া হবে।"

"কিন্তু আপনি তো জানেন যে ডাক্তারকে আনতেই হবে, আর সাধ্যমতো ভাল ব্যবস্থাই আমি করেছি।"

"হ্যাঁ, ফটকের খিলানের নিচ দিয়ে তোমার ঘোড়া যে কী রকম কদমে ছুটেছিল

সেটা আমার খুব মনে আছে।" এই ঘটনার উল্লেখ করা মহিলাটির অনেক দিনের বাতিক; আর এক্ষেত্রে তার কথার প্রতিবাদ করে ইউজেন যথেষ্ট অবিবেচনারই পরিচয় দিলো।

"আহা এই জন্যই তো আমি আগাগোড়াই বলে আসছি, প্রিন্সকেও অনেকবার বলেছি, যে সব লোক বিশ্বস্ত নয়, আন্তরিক নয়, তাদের সঙ্গে বাস করা বড়ই কঠিন। আমি আর সব সইতে পারি, শুধু ঐটে পারি না।"

ইউজেন বলল, "দেখুন, এ ব্যাপারে যাকে সব চাইতে বেশি কষ্ট সহ্য করতে হয় সে আমি। কিন্তু আপনি..."

"হ্যাঁ। সেটা তো স্পষ্ট।"

"কি?"

"কিছু না। আমি শুধু সেলাইগুলো গুণছি।"

ইউজেন তখন বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিল; লিজা তাকিয়েছিল তার দিকে। চাদরের বাইরে রাখা ঠাণ্ডা হাত দিয়ে লিজা স্বামীর একটা হাত ধরে চাপ দিলো। তার দুটি চোখ যেন বলল, "আমার কথা ভেবে মাকে মেনে নাও। তুমি তো জানো, আমাদের দু'জনের ভালবাসায় সে বাদ সাধতে পারবে না।"

"আর কখনও করব না। এ সব কিছু না।" ফিস্ ফিস্ করে কথা ক'টি বলে সে লিজার ঠাণ্ডা হাতে চুমো খেলো, স্নেহশীল দুটো চোখে চুমো খেলো। লিজার চোখ দুটি বুজে এল।

ইউজেন শুধালো, "আবারও কি সেই ঘটনা ঘটবে? তুমি কেমন বুঝছ?"

পেটের দিকে চোখ নামিয়ে লিজা বলল, "পাছে ভুল করে ফেলি তাই কোনও কথা বলতে আমার ভয় করে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি সে বেঁচে আছে, বেঁচেই থাকবে।"

"ওঃ, সে কথা ভাবতেও ভয় করে, বড় ভয় করে।"

লিজা বার বার চলে যেতে বলা সত্ত্বেও ইউজেন সারাটা রাত চোখের পাতা এক না করে তাই ঘরেই কাটাল।

লিজা রাতটা ভালভাবেই কাটাল, এবং ডাক্তারকে ডেকে না পাঠালে সে হয়তো বিছানা থেকে উঠেই পড়ত।

ডিনারের সময় ডাক্তার এসে হাজির হলো; বলল, যদিও লক্ষণগুলো আবার দেখা দিলে আশংকার যথেষ্ট কারণ ঘটতে পারে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এখনও সে রকম কোনও লক্ষণ দেখা দেয়নি; কিন্তু যেহেতু কোনও বিপরীৎ লক্ষণ এখনও পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না, তাই একদিকে যেমন মনে করা যেতে পারে—তেমনি অন্য দিকেও...। অতএব ওকে চুপচাপ শুয়ে থাকতে হবে, এবং "যদিও কোনও ওষুধ দিতে আমি চাই না, তবু এই মিকচারটা খেয়ে ওকে চুপচাপ শুয়ে থাকতে হবে।" এ ছাড়াও,

ডাক্তার বারবারা আলেক্সীভ্‌নাকে নারীর শরীরতত্ত্ব সম্পর্কে একটা বক্তৃতা দিলো, আর সেও অর্থপূর্ণভাবে মাথাটা নাড়তে লাগল। যথারীতি হাতের মুঠোর একেবারে শেষ প্রান্ত দিয়ে ফি-র টাকাটা নিয়ে ডাক্তার বিদায় নিলো, আর রোগিনী একটা পুরো সপ্তাহ বিছানায় শুয়ে কাটালো।

১৫

ইউজেন বেশির ভাগ সময়টা কাটালো স্ত্রীর বিছানার পাশে বসে থেকে, তার সঙ্গে কথা বলে, তাকে বই পড়ে শুনিয়ে; আর যেটা সব চাইতে শক্ত কাজ—বিনা বাক্য ব্যয়ে বারবারা আলেক্সীভ্‌নার কটূক্তি শুনে, এমন কি সাধ্যমতো সেগুলোকে ঠাট্টা হিসাবে মেনে নিয়ে।

কিন্তু সারাক্ষণ বাড়িতে থাকাও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। প্রথমত, সব সময় স্ত্রীর কাছে বসে থাকলে সে নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়বে এই কথা বলে স্ত্রীই তাকে বাইরে পাঠিয়ে দিতো; দ্বিতীয়ত, খামারের কাজ তখন যে ভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে প্রতি পদে তার উপস্থিত থাকাও দরকার। কাজেই বাড়িতে না থাকলেই তাকে কাটাতে হতো মাঠে, জঙ্গলে, বাগানে, ঝাড়াই-উঠোনে; আর সর্বত্রই শুধু স্তেপানিদার চিন্তাই নয়, তার সুস্পষ্ট ছবি তাকে তাড়া করে ফিরত. শুধু কখনও-সখনও তার কথা সে ভুলে থাকত। কিন্তু তাতেও কিছু যেত আসত না, হয়তো নিজের মনোভাবকে সে চেপে রাখতে পারত; সব চাইতে খারাপ ব্যাপার হলো, এতদিন মাসের পর মাস সে ঐ মেয়েটিকে না দেখেই কাটিয়ে দিলেও এখন অনবরতই তার সঙ্গে ইউজেনের দেখা হয়ে যাচ্ছে। সেও কিছু বলে না, মেয়েটিও কিছু বলে না, আর তাই দু'জনের একজনও সোজাসুজি ফূর্তির দিকে পা বাড়াচ্ছে না; দু'জনই মিলনের একটা সুযোগের অপেক্ষায় কাটাচ্ছে।

মিলনের সব চাইতে সম্ভবপর জায়গা হয়েছে বনের ভিতরটা, কারণ চাষী মেয়েরা বস্তা নিয়ে সেখানে যায় গরুর জন্য ঘাস কাটতে। ইউজেন সেটা জানত, আর তাই রোজই বনের মধ্যে যেতে লাগল। রোজই নিজেকে বলত যাবে না, আর রোজই শেষ পর্যন্ত বনের দিকে পা বাড়াত এবং কারও গলা শুনলেই ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে ভগ্ন হৃদয়ে তাকিয়ে দেখত সে এসেছে কি না।

সে এসেছে কি না এটা জানবার ইচ্ছা ইউজেনের কেন হতো তা সে নিজেই জানত না। যদি সেই হতো, আর সে একেবারে একলা হতো, তাহলে ইউজেন তার কাছেই যেত না—তার তাই বিশ্বাস—সে দৌড়ে পালিয়ে যেত; কিন্তু আসলে সে চাইত মেয়েটিকে দেখতে।

একবার দু'জনের দেখা হয়ে গেল। সে যখন বনের মধ্যে ঢুকছে তখন অন্য দুটি মেয়ের সঙ্গে সে বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল; তার পিঠে ঘাস-ভর্তি একটা ভারী

বস্তা। আর একটু আগে হলে বনের মধ্যেই তাদের দেখা হয়ে যেত। এখন অন্য সঙ্গিনী থাকায় মেয়েটি তার সঙ্গে ফিরে যেতে পারল না। সেটা যে অসম্ভব তা বুঝতে পেরেও অন্য মেয়েদের নজরে পড়বার ঝুঁকি নিয়েও ইউজেন একটা বাদামের ঝোপের আড়ালে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। অবশ্য মেয়েটি ফিরে এল না, কিন্তু সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করল। আর হা ভগবান, মেয়েটি তখন কল্পনায় তার কাছে কী আনন্দময়ী হয়েই না দেখা দিলো। আর এটা শুধু একবারই ঘটল না, ঘটল পাঁচ-ছ' বার, আর প্রতিবারই অধিকতর তীব্রতার সঙ্গে। তাকে আর কখনও এতখানি মনোহারিণী মনে হয়নি, আর সে নিজেও আগে কখনও তার শক্তিতে এতখানি অভিভূত হয়নি।

ইউজেনের মনে হলো, নিজের উপর সব নিয়ন্ত্রণ সে হারিয়ে ফেলেছে। সে প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে। নিজের সম্পর্কে তার কঠোরতা এতটুকু হ্রাস পায়নি; বরং তার এই কামনা, এই কাজ—বনের মধ্যে যাওয়াটাই তো একটা কাজ—যে কত জঘন্য তা সে বোঝে। সে জানে, যে কোনও জায়গায় অন্ধকারে সে যদি মেয়েটির কাছে কখনও যেতে পারে, তাকে স্পর্শ করতে পারে, তাহলেই সে এই বাসনার কাছে আত্মসমর্পণ করবে। সে জানে লোকেব কাছে, মেযেটিব কাছে, এবং নিঃসন্দেহে তার নিজের কাছে যে লজ্জাবোধ সেটাই তাকে সংযত করে রেখেছে। সে আরও জানে, অন্ধকার অথবা খুব কাছাকাছি আসার মতো এমন পরিস্থিতি সে খুঁজছে যাতে সেই লজ্জাটা স্পষ্ট হয়ে চোখে না পড়ে, যাতে পাশবিক আবেগ সেই লজ্জাব গলা টিপে ধবতে পারে। আর তাই সে ভাল করেই জানে যে সে একটা হতভাগা অপরাধী; সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে সে নিজেকে ঘৃণা করে। নিজেকে ঘৃণা করে কারণ এখনও সে আত্মসমর্পণ করেনি : প্রতিদিন সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে তিনি যেন তাকে শক্তি দেন। ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচান; প্রতিদিন সে প্রতিজ্ঞা করে, আজ থেকে আর একটি পাও সে ঐ মেয়েটির দিকে বাড়াবে না, তাকে ভুলে যাবে। এই মোহের হাত থেকে উদ্ধার পাবার পথ সে প্রতিদিন আবিষ্কার করে, আর সেই পথে চলতে চেষ্টা করে।

কিন্তু সবই বৃথা।

একটা পথ ছিল সর্বদা কাজের মধ্যে ডুবে থাকা; আর একটা ছিল দুরূহ শারীরিক শ্রম ও উপবাস; আর তৃতীয়টা ছিল তার স্ত্রী, তার শাশুড়ি ও চারিদিককার লোকজন—সকলেই এ কথা জানতে পারলে সে লজ্জা তাকে ঘিরে ধরবে তারই সুস্পষ্ট কল্পনা। এ সব পথের আশ্রয়ই সে নিয়েছে, মনে হয়েছে এবার বুঝি সে জয়লাভ করবে, কিন্তু যেই দুপুর এল—যে দুপুরে তাদের আগেকার মিলনগুলি ঘটেছিল এবং এবারও তাকে সে দেখেছিল ঘাস বয়ে নিয়ে যেতে—অমনি সে বনের দিকে পা বাড়াল। এইভাবে পাঁচটি যন্ত্রণাময় দিন কেটে গেল। সে শুধু দূর থেকে তাকে দেখল, একবারও তার মুখোমুখি হলো না।

১৬

লিজা ধীরে ধীরে সেরে উঠছে; চলাফেরাও করতে পারে; শুধু স্বামীর মধ্যে এমন একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে যাতে সে অস্বস্তি বোধ করছে, অথচ তার কারণ বুঝতে পারছে না।

বারবারা আলেক্সীভ্না কিছুদিনের জন্য চলে গেছে; বাড়িতে এখন একমাত্র অতিথি ইউজেনের খুড়ো। মারি পাভ্লভ্না যথারীতি বাড়িতেই আছে।

ইউজেনের সেই একই আধা-পাগল অবস্থা চলছে। এমন সময় জুন মাসের বজ্রপাতের পরে প্রায়ই যে রকম ঘটে থাকে তদনুসারে দু'দিন মুষলধারে বৃষ্টি হলো। বৃষ্টিতে সব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল। জল ও ময়লার জন্য গাড়িতে সার বোঝাইয়ের কাজও বন্ধ করে দেওয়া হলো। চাষীরা সব যার যার বাড়িতে। পশুপালকরা অনেক কষ্টে গরু-ভেড়ার দল নিয়ে বাড়ি ফিবে এল। গরু ও ভেড়ার দল চারণ-ভূমিতে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগল। চাষী মেয়েরা খালি পায়ে গায়ে শাল জড়িয়ে কাদা-জল ভেঙে পলাতক গরুগুলোকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। বাস্তায় সর্বত্র জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, গাছের পাতা ও ঘাস জলে জব্‌জবে, জলের ধারাগুলো সবেগে খাল-খন্দতে গিয়ে পড়ছে।

স্ত্রীকে নিয়ে ইউজেন বাড়িতেই বসেছিল। স্ত্রী সেদিন একটু বেশি ক্লান্তি বোধ করছিল। সে বার বার স্বামীর মন খারাপের কারণ জিজ্ঞাসা কবছে, আর সেও বিরক্ত হয়ে জবাব দিচ্ছে যে কিছুই হয়নি। স্ত্রী প্রশ্ন করা বন্ধ করল, কিন্তু তার অস্বস্তি গেল না।

প্রাতরাশের পরে তারা বসবার ঘরে বসেছিল। খুড়োমশাই উঁচু মহলে তার পরিচিতজনের একই গল্প শততম বার শোনাতে লাগল। লিজা একটা জামা বুনছে আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আবহাওয়া ও পিঠের ব্যথার জন্য নালিশ জানাচ্ছে। খুড়ো তাকে শুয়ে থাকবার পরামর্শ দিয়ে নিজের জন্য ভদ্‌কার ফরমাস করল। ঘবে বসে বসে ইউজেনের ভীষণ খারাপ লাগছে। সব কিছুই দুর্বল ও একঘেয়ে। একটা বই পড়ল, পত্রিকার পাতা ওল্টালো, কিন্তু কোনওটাই কিছু বুঝতে পারল না।

"গতকাল যে উখো-যন্ত্রটা এসেছে সেটা দেখতে আমাকে একবার বেরতেই হবে," এই বলে সে বেরিয়ে গেল।

"একটা ছাতা নিয়ে যাও।"

"না, না, আমার সঙ্গে চামড়ার কোটটা আছে। আর কাছেই তো যাচ্ছি।"

বুট পরে চামড়ার কোট গায়ে চড়িয়ে সে কারখানায় গেল; বিশ পাও এগোয়নি এমন সময় সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল; পায়ের শাদাগুলির উপর পর্যন্ত ঘাঘরা তুলে সে এগিয়ে এল। মাথা ও ঘাড় শালে ঢেকে সেটাকে চেপে ধরে সে হেঁটে আসছে।

প্রথম দৃষ্টিতে তাকে চিনতে না পেরে ইউজেন শুধালো, "তুমি কোথায় যাচ্ছ?" যখন চিনতে পারল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। একটু হেসে মেয়েটি থামল; তারপব ইউজেনের দিকে তাকিয়ে বইল।

"আমি একটা বাছুর খুঁজছি। এই দুর্যোগে আপনি কোথায যাচ্ছেন?" যেন তাকে রোজই দেখছে এমনিভাবে মেয়েটি বলল।

ইউজেন হঠাৎ বলে উঠল, "চালা-ঘরে চলো।" কেমন করে যে কথাটা বলল তা সে নিজেই জানে না। যেন অন্য কেউ তার হযে কথাগুলি উচ্চারণ করেছে।

মেযেটি দাঁত দিয়ে শালটা কামড়ে চোখ টিপল, আর তার পরেই বাগান থেকে চালা-ঘরে যাবাব পথ ধবে ছুট দিলো; ইউজেন নিজেব পথেই পা বাড়াল; মনের ইচ্ছা, লিলাক-ঝোপটা পেবিযে মোড় ঘুবে সেও ঐ একই জায়গায় যাবে।

পিছন থেকে কে যেন ডাকল, "মালিক, কর্ত্রী আপনাকে ডাকছেন, এক মিনিটের জন্য ফিবে আসুন।"

চাকর মিশাব গলা।

"হে ঈশ্বব! এই দ্বিতীয়বাব তুমি আমাকে বাঁচালে," এই কথা ভেবে ইউজেন সঙ্গে সঙ্গে ফিবে গেল। স্ত্রী তাকে মনে কবিযে দিলো যে ডিনাবের সময় জনৈকা রুগ্ন স্ত্রীলোককে একটা ওষুধ পৌঁছে দেবে বলে ইউজেন কথা দিয়েছে, কাজেই সে যেন ওষুধটা সঙ্গে কবেই নিয়ে যায়।

ওষুধটা খুজতে পাঁচ মিনিট পাব হয়ে গেল। সেটা নিয়ে পথে নেমে সোজা গোযালের দিকে যেতে সে ইতস্তত করতে লাগল, কারণ বাড়ি থেকে কেউ দেখে ফেলতে পারে; কিন্তু দৃষ্টির বাইরে পৌঁছেই সে মোড় ঘুবে চালাঘরের পথ ধরল। সে যেন কল্পনার চোখে দেখতে পেল, মেযেটি চালা-ঘবের ভিতরে খুসির হাসি হাসছে। কিন্তু সেখানে সে ছিল না; সে যে সেখানে এসেছিল তাবও কোনও চিহ্ন দেখা গেল না।

সে ভাবতে আরম্ভ করল; মেয়েটি আসেনি; তার কথাই শোনেনি, বা শুনলেও বুঝতে পারেনি—পাছে সে শুনতে পায় সেই ভয়ে সেও তো নাকের ভিতর দিয়েই অস্পষ্টভাবে কথাগুলি বলেছিল—অথবা হয়তো তার আসার ইচ্ছাই ছিল না। "আর সে আমার কাছে ছুটে চলে আসবে তাই বা আমি ভাবলাম কেন? তার তো স্বামী আছে; আমিই তো এমন একটা হতভাগা যে সুন্দরী স্ত্রী থাকতেও অন্য মেয়ের পিছনে ছুটছি।" গোয়ালের ভিতরে বসে সে এই সব ভাবতে লাগল। খড়ের চালের ফুটো দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। "কিন্তু সে যদি আসত—এই বৃষ্টির মধ্যে সে যদি একলা আসত, তাহলে কী মজাই না হতো। শুধু আর একবার যদি তাকে আলিঙ্গন করতে পারতাম, তারপর যা হয় তাই হতো। কিন্তু সে এখানে এলে তো পায়ের দাগ দেখেই বুঝতে পারতাম।" চালা-ঘরের কাছে খানিকটা জমি ও ঘাস-গজানো পথের

দিকে তাকিয়ে খালি পায়ের ছাপ দেখতে পেল; এমন কি পা পিছলে যাবার একটা ছাপও স্পষ্ট চোখে পড়ল। "হ্যাঁ, সে এখানে এসেছিল। যাক, এবার বোঝা গেল। এরপর যেখানেই দেখা হবে সোজা তার কাছে এগিয়ে যাবো। আজ রাতেই যাবো। অনেকক্ষণ সে চালা-ঘরে কাটালো; যখন বেড়িয়ে এল তখন সে যেমন ক্লান্ত, তেমনি বিধ্বস্ত। ওষুধটা দিয়ে বাড়ি ফিরে এল; বিছানায় শুয়ে ডিনারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

১৭

ডিনারের আগেই লিজা তার কাছে এল। তার অসন্তোষের কারণ ধরতে না পেরে সে স্বামীকে জানালো, প্রসবের জন্য সে যে মস্কো চলে যাবে এটাই তার পছন্দ নয় বলে তার ধারণা হয়েছে; কাজেই সে স্থির করেছে বাড়িতেই থাকবে, কোনও কারণেই মস্কো যাবে না। লিজা যে প্রসবের ব্যাপারটা কত ভয় করে, একটি সুস্থ শিশু জন্মাবার ঝুঁকিও যে বেশ কিছুটা আছে তাও সে জানে; সুতরাং স্বামীর জন্য লিজা যে কতটা ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী সেটা বুঝতে পেরে ইউজেন অভিভূত হয়ে পড়ল। বাড়িতে সব কিছু কত সুন্দর, কত সুখকর, কত পরিচ্ছন্ন; আর তার মনের মধ্যে সব কিছু কত নোংরা, কত ঘৃণ্য, কত পাপ। নিজের দুর্বলতার প্রতি তার বিরাগ যতই দৃঢ় হোক, তবু কাল আবার সেই একই ব্যাপার ঘটবে,—সে কথা জেনে সারাটা সন্ধ্যা ইউজেন যন্ত্রণায় কাটালো।

নিজের ঘরে পায়চারি করতে করতে বলল, "না, এ অসম্ভব। একটা কোনও প্রতিকার নিশ্চয় আছে। ঈশ্বর আমার! আমি কি করব?"

বিদেশীদের মতো কে যেন দরজায় টোকা দিলো। বুঝল, নিশ্চয় তাব খুঁড়ো। বলল, "ভিতরে আসুন।"

লিজার স্ব-নিযুক্ত দূত হিসাবেই খুড়ো এসেছে।

বলল, "কি জানো, তোমার মধ্যে একটা পরিবর্তন সত্যি আমার চোখে পড়েছে,—আর লিজা—এতে সে যে কত কষ্ট পাচ্ছে তা আমি জানি, আমি জানি, যে সব কাজ-কারবার তুমি এত ভালভাবে শুরু করেছ সে সব ছেড়ে যাওয়া তোমার পক্ষে খুবই শক্ত, কিন্তু কি আর করা যাবে? আমি পরামর্শ দিচ্ছি, তোমরা এখান থেকে চলে যাও। তোমাদের দু'জনের পক্ষেই সেটা ভাল হবে। কি জানো, আমি পরামর্শ দিই, তোমরা ক্রিমিয়া চলে যাও। আবহাওয়া সুন্দর, একজন ভাল ধাত্রীবিদ্যাবিশারদও সেখানে আছেন; আর তোমরা গিয়ে পৌঁছবে ঠিক সেখানকার আঙুরের মরশুমে।"

ইউজেন হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, "খুড়োমশাই, একটা কথা গোপন রাখতে পারবেন কি? কথাটা আমার পক্ষে ভয়ংকর, বড়ই লজ্জাজনক।"

"আরে, আরে,—আমাকে নিয়ে তোমার কোনও সন্দেহ আছে নাকি?"

"খুড়োমশাই, আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন। শুধু সাহায্য নয়, আমাকে বাঁচাতে পারেন।" ইউজেন বলল। যে খুড়োকে সে শ্রদ্ধা করে না তাব কাছে নিজের গোপন কথা ফাঁস করতে যাচ্ছে, নিজ চরিত্রের খারাপ দিকটার উপর আলোকপাত করে খুড়োর চোখে নিজেকে খুবই ছোট করতে যাচ্ছে—এ চিন্তাও তাব কাছে সুখপ্রদ মনে হলো। সে জানে, সে ঘৃণার্হ, সে অপরাধী; সে চায় তার শাস্তি হোক।

"বলো বাবা; তুমি তো জানো আমি তোমাকে কত ভালবাসি," খুড়ো বলল। কথাটা গোপনীয়; সেটা আবার লজ্জাজনকও; সেই কথা তাকে বলা হবে, আর সে কাজেও লাগবে—এতেই খুড়ো মহাখুসি।

"প্রথমেই বলি, আমি একটি হতভাগা, অকর্মা, ইতর—সত্যিকারের ইতর লোক।"

"কী সব বলছ..." যেন অসন্তুষ্ট হয়েছে এমনিভাবে খুড়ো বলল।

"কী বলছি! হতভাগা না হলে কি আমি—লিজার স্বামী, লিজার! তাব পবিত্রতা, তার ভালবাসার কথা কে না জানে—আর তার স্বামী হয়ে আমি কি না একটা চাষী-মেয়ের জন্য তার প্রতি বিশ্বাসহীনতার কাজ করতে চাই।"

"এ সব কি? কেন তুমি তা চাও—তুমি তো তার প্রতি অবিশ্বাসী হওনি?"

"হ্যাঁ, এটা তো অবিশ্বাসী হবারই সামিল, কারণ ব্যাপারটা আমার হাতে ছিল না। আমি তো সেই কাজ কবতেই গিযেছিলাম। বাধা পেয়েছিলাম বলেই তো, নইলে তো করেই বসতাম...তখনই। কি যে করতাম তা আমি নিজেই জানি না..."

"কিন্তু, দোহাই তোমার, সব কথা বুঝিয়ে বলো..."

"দেখুন, ব্যাপারটা এই রকম। যখন অবিবাহিত ছিলাম তখন এই গাঁয়েবই একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে বোকার মতো আমি একটা সম্পর্ক ঘটিয়েছিলাম। অর্থাৎ কখনও জঙ্গলে, কখনও মাঠে তার সঙ্গে আমি মিলিত হতাম..."

"সে কি সুন্দরী?" খুড়ো শুধালো।

এ-প্রশ্নে ইউজেনের ভুরু কুঁচকে উঠল; কিন্তু বাইরের সাহায্য তাব এতই দরকার যে না শোনার ভান করে সে বলতে লাগল :

"আমি ভেবেছিলাম এটা একটা সাময়িক ব্যাপার; অচিরেই এ সম্পর্ক ছিন্ন করে ইতি টেনে দেবো। বিয়ের আগে সব সম্পর্ক কেটেও ফেলেছিলাম। প্রায় এক বছর আমি তাকে চোখে দেখিনি, বা তার কথা ভাবিনি।" নিজের অবস্থার এই বিববণ শুনে ইউজেনের নিজেরই খুব অবাক লাগছিল। তারপর হঠাৎ একদিন, কেন তা আমি নিজেই জানি না—এক এক সময় লোকে কুহকবিদ্যায় বিশ্বাস কবে—আবার তাকে দেখলাম, বুকের মধ্যে একটা পোকা ঢুকল, আমাকে কামড়াতে লাগল। নিজেকে তিরস্কার করলাম, আমার কাজের ভয়াবহতা আমি ভাল করেই বুঝি, অর্থাৎ

যে কোনও মুহূর্তে যে কোনও কাজ আমি করে বসতে পারি; অথচ সেই কাজেব দিকেই আমার যত ঝোঁক; সে কাজ যে আমি করিনি তার একমাত্র কাবণ ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেছেন। গতকাল আমি তাব সঙ্গে মিলিত হতেই যাচ্ছিলাম, এমন সময় লিজা আমাকে ডেকে পাঠালো।''

''সে কি, এই বৃষ্টির মধ্যে?'

''হ্যাঁ। আমি আর পাবছি না খুড়োমশাই। সব কথা আপনাব কাছে খুলে বলতে চাই; আপনাব সাহায্য চাই।''

''হ্যাঁ, অবশ্যই: নিজেব জমিদাবিতে এ সব খুবই খারাপ। লোকে জানবেই। আমি জানি, লিজা এখন দুর্বল, তাকে এ সব না জানানোই ভাল। কিন্তু নিজের জমিদারিতেই বা এ সব কেন?''

এবাবও ইউজেন খুড়োর কথায কান না দিয়ে তাড়াতাড়ি মূল কথায ফিবে গেল।

''হ্যাঁ, নিজেব কাছ থেকে আমাকে বাঁচান। আপনাব কাছে এটাই আমাব প্রার্থনা। আজ ঘটনাক্রমে বাধা পেযেছি। কিন্তু কাল বা পবেব দিন কেউ তো আমাকে বাধা দেবে না। আব সে মেয়েও এখন ব্যাপারটা জানে। আমাকে একা ছেড়ে যাবেন না।''

''বেশ. তাই হবে'', খুড়ো বলল,—কিন্তু তুমি কি সত্যি তাকে এত ভালবাস?''

''আঃ, সে ব্যাপাবই নয। ভালবাসাব কথা নয, কী একটা শক্তি আমাব উপব ভব করেছে, আমাকে চেপে ধবেছে। কি করব তা আমি জানি না। হয়তো আমিও শক্তি ফিবে পাব, আর তখন...''

''দেখো, আমি যা বলেছি তাই দাঁড়াচ্ছে'' খুড়ো বলল। ''চলো, আমরা ক্রিমিযাতে চলে যাই।''

''হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই চলুন; কিন্তু আপাতত আপনি আমাব সঙ্গে সঙ্গে থাকুন, আমাব সঙ্গে কথা বলুন।''

১৮

সব গোপন কথা খুড়োকে খুলে বলায় ইউজেন কিছুটা শান্ত হলো। সেই বৃষ্টিব দিনের পরে বিবেকের যে জ্বালা আর লজ্জার যে অনুভূতি সে ভোগ করেছে তাব ফলেও তাব মনের শান্তি ফিবে এল। স্থির হলো, এক সপ্তাহের মধ্যেই তারা ইয়াল্টা যাত্রা করবে। সেই সপ্তাহেই ইউজেন শহরে গেল টাকা-পয়সা আনতে, বাড়ি থেকে এবং আপিস থেকে জমিদারি-পরিচালনা সংক্রান্ত কাজকর্মের নির্দেশাদি দিলো, স্ত্রীর সঙ্গে আবার হাসিখুসিতে মিলেমিশে দিন কাটাতে লাগল, তার মধ্যে একটা নৈতিক জাগরণ দেখা দিলো।

এইভাবে সেই বৃষ্টির দিনের পরে স্পেত্অনিদার সঙ্গে একবারও দেখা না করে সে স্ত্রীকে নিয়ে ক্রিমিয়া যাত্রা করল। দু'মাস বেশ ভালভাবে কাটল। নতুন নতুন

অভিজ্ঞতার চাপে অতীত যেন তার স্মৃতি থেকে একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ক্রিমিয়াতে অনেক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে তাদের দেখা হলো; তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়ল; অনেক নতুন বন্ধুত্বও গড়ে উঠল। শিক্ষাপ্রদ এবং উপকারী তো বটেই, ক্রিমিয়ার জীবন যেন ইউজেনের কাছে এক বিরামহীন উৎসবের দিন হয়ে দেখা দিলো। সেখানেই তাদের বন্ধুত্ব হলো তাদেরই প্রদেশের প্রাক্তন "মার্শাল অব্ দি নবিলিটি"র সঙ্গে। লোকটি কুশলী ও উদার মনোভাবাপন্ন। ইউজেনকে তার খুব ভাল লেগে গেল; তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিজের দলে টেনে নিল।

অগাস্টের শেষ দিকে লিজার একটি সুন্দর, সুস্থ মেয়ে হলো: অপ্রত্যাশিত রকম সহজভাবেই প্রসবও হয়ে গেল।

সেপ্টেম্বরে তারা বাড়ি ফিরে এল,—শিশু ও তার দাই সহ চারজনই ফিরল, কারণ লিজা নিজে মেয়ের দেখাশুনা করতে পারে না। ইউজেন বাড়ি ফিরল আগেকার আতংকের হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে; সে যেন এক নতুন মানুষ। সুখী মানুষ। স্ত্রীর সন্তান সম্ভাবনা হলে স্বামীকে যা যা করতে হয় সে সব কিছু করার ফলে সে লিজাকে আরও বেশি করে ভালবাসতে শুরু করেছে। মেয়েকে কোলে নিলেই তার মনে একটা হাস্যকর, নতুন, অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ, সুড়সুড়ির মতো অনুভূতি দেখা দেয়। তার জীবনে আরও একটা নতুন অভিজ্ঞতা এসেছে; দুম্‌চিন-এর (প্রাক্তন মার্সাল) সঙ্গে পরিচয়ের ফলে জমিদারির কাজকর্মে ব্যস্ত থাকা ছাড়াও একটা নতুন প্রেরণা তার মনে জেঁকে বসেছে; সেটা হলো জেম্‌স্তভো-র (জেলা-পরিষদ) কাজ— কিছুটা উচ্চাকাংখার বশে, কিছুটা বা কর্তব্যের খাতিরে। অক্টোবর মাসে একটা বিশেষ অধিবেশন হবে আর সেখানেই তাকে নির্বাচিত করা হবে। বাড়ি ফিরে সে একবার গেল শহরে এবং আরেকবার গেল দুম্‌চিন-এর কাছে।

সেই প্রলোভন ও সংগ্রামের কথা সে ভাবতেও ভুলে গেছে; অনেক কষ্টে তবে সে সব মনে করতে পারে। এখন মনে হয়, সে সময় সে বোধ হয় উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হয়েছিল।

সে-রোগ থেকে নিজেকে এখন এতদূর মুক্ত মনে হলো যে নায়েবের সঙ্গে নির্জনে প্রথম সাক্ষাতেই সে বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে তার মোটেই ভয় করল না। এ বিষয়ে তার সঙ্গে আগেও কথা হয়েছিল বলে এখন কিছু জিজ্ঞাসা করতে তার কোনও লজ্জাই হলো না।

"আচ্ছা, সিডর পের্চ্নিকভ কি এখনও বাড়ি থেকে দূরেই থাকে?"

"হ্যাঁ, সে এখনও শহরেই থাকে।"

"আর তার বৌ?"

"ওঃ, সেটা একেবারে বাজে মেয়ে হয়ে গেছে। এখন তো জেনোভির সঙ্গে চালাচ্ছে। একেবারে উচ্ছন্নে গেছে।"

"আচ্ছা! খুব ভাল কথা। এখন এ ব্যাপারে আমি কী আশ্চর্য রকমের উদাসীন! আমি কত বদলে গেছি।" ইউজেন ভাবল।

১৯

ইউজেন যা কিছু চেয়েছিল সবই পেয়েছে। সম্পত্তি পেয়েছে, কারখানা খুব ভাল চলছে, চমৎকার বীট-পালং ফলেছে, আর তা থেকে প্রচুর আয় হবে বলে আশা করছে; স্ত্রী ভালভাবে সন্তান প্রসব করেছে, শাশুড়ি চলে গেছে. সেও সর্বসম্মতিক্রমে জেম্স্ত্‌ভো-তে নির্বাচিত হয়েছে।

নির্বাচনের পরে শহর থেকে ফিরছিল। সকলেই তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে, সেও তাদের ধন্যবাদ দিয়েছে। ডিনারেও যোগ দিয়েছে এবং পাঁচ গ্লাস শ্যাম্পেন খেয়েছে। তার সামনে দেখা দিয়েছে জীবনের সম্পূর্ণ নতুন এক পরিকল্পনা। বাড়ি ফিরবার পথে এই সব কথাই সে ভাবছিল। ভারতীয় গ্রীষ্মের আবহাওয়া : চমৎকার পথ আর উত্তপ্ত সূর্য। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে ইউজেন ভাবতে লাগল, এই নির্বাচনের ফলে সমাজে যে আসন সে পাবে তার স্বপ্নই তো সে এতদিন দেখে এসেছে; এই পদলাভের ফলে সে যে শুধু ফসল ফলিয়েই তাদের সেবা করতে পারবে তাই নয়, প্রত্যক্ষ প্রভাব দিয়েই তাদের অনেক উপকার করতে পারবে। তিন বছরেব মধ্যেই তার নিজের লোকজন ও অপর চাষীরা তার সম্পর্কে কি ভাববে তাই সে কল্পনা করতে লাগল। ঠিক সেই সময় একটি চাষী তার বৌকে নিয়ে জল-ভরা বালতি মাথায় নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল। তার দিকে তাকিয়ে সে ভাবল, "যেমন ধরা যাক, এই লোকটি।" তার গাড়িটাকে পথ ছেড়ে দেবার জন্য তারা দু'জনেই দাঁড়িয়ে পড়ল। এই চাষীই বুড়ো, পেচ্‌নিকভ। আর মেয়েটি স্তেপানিদা। ইউজেন তার দিকে তাকাল, তাকে চিনল, আর নিজের মনের পরিপূর্ণ শান্ত ভাব দেখে খুসি হলো। এখনও সে আগের মতোই দেখতে সুশ্রী; কিন্তু সেটা তাকে স্পর্শ কবল না। ইউজেন গাড়ি ছেড়ে দিলো।

খুড়ো বলল, "কি হে, অভিনন্দন জানাতে পারি তো?"

"হ্যাঁ, আমি নির্বাচিত হয়েছি।"

"চমৎকার! এই উপলক্ষে একটু পানের ব্যবস্থা করতেই হবে!"

পরদিন ইউজেন খামারের কাজ দেখতে গেল। কিছুদিন হলো কাজে বড়ই অবহেলা চলছে। খামারবাড়ির একেবারে এককোণে একটা নতুন ঝাড়াইযন্ত্রে কাজ চলছে। সেটা দেখতে দেখতেই সে মেয়েদের ভিতর দিয়ে হাঁটতে লাগল। সে অবশ্য চেষ্টা করল তাদের দিকে নজর না দিতে; কিন্তু যত চেষ্টাই করুক, স্তেপানিদার কালো চোখ ও লাল রুমালের দিকে দু'একবার তার নজর পড়ল; স্তেপানিদার খড় বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আড়চোখে দু'একবার তার দিকে তাকাল, মনে হলো কি যেন ঘটছে,

কিন্তু নিজেই তার কোনও কারণ বুঝতে পারল না। কিন্তু পরদিন সে যখন আবার সেই ঝাড়াই-উঠোনে গেল, সম্পূর্ণ বিনা কারণে সেখানে দুটো ঘণ্টা কাটাল, আর সারাক্ষণ দুই চোখ দিয়ে সেই পরিচিত সুদর্শনা তরুণীকে দেখতে থাকল, একমাত্র তখনই সে বুঝতে পারল যে সে ডুবেছে, এ ডোবার হাত থেকে উদ্ধারের কোনও পথ নেই। আবার সেই যন্ত্রণা! আবার সেই একই আতংক ও ত্রাস; নিজেকে বাঁচাবার কোনও পথ নেই।

যা সে আশা করেছিল তাই ঘটল। কোনও কিছু না জেনেই পরদিন সন্ধ্যায় সে মেয়েটির খড়-চালার সেই পিছনের উঠোনে গিয়ে হাজির হলো যেখানে হেমন্তকালে তারা একদিনের জন্য মিলিত হয়েছিল। যেন বেড়াতে বেরিয়েছে এইভাবে সেখানে থেমে একটা সিগারেট ধরালো। একটি প্রতিবেশী চাষী-রমণী তাকে দেখে ফেলল; সে মুখ ঘুরিয়ে নিতেই শুনতে পেল রমণীটি কাকে যেন বলছে, ''চলে যা, তিনি তোর জন্য অপেক্ষা করছেন—মরণ সাক্ষী করে বলছি, তিনি ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন; চলে যা, বোকা মেয়ে।''

সে দেখল একটি নারী—সেই মেয়েটা—খড়-চালার দিকে ছুটে গেল; কিন্তু জনৈক চাষীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হলো না; সে বাড়ি ফিরে গেল।

২০

বসবার ঘরে পৌঁছে তার কাছে সব কিছুই অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক মনে হতে লাগল। বেশ উদ্যম নিয়েই সেদিন সকালে সে ঘুম থেকে উঠেছিল, মনে মনে স্থির করেছিল এ-চিন্তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, ভুলে যাবে, এ সব কথা মনেও আনবে না। কিন্তু নিজের অজান্তেই সারাটা সকাল সে কোনও কাজে মন বসাতে পারেনি, বরং কাজকে এড়িয়েই গেছে। যা কিছু আগে তাকে উৎফুল্ল করে তুলত, যা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হতো, সে সবই এখন তুচ্ছ হয়ে দেখা দিচ্ছে। অজ্ঞাতসারেই সে-কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করল। তার মনে হলো, সব কিছু ভেবে একটা পরিকল্পনা করার জন্যই এ কাজ তাকে করতে হয়েছে। তাই সব কিছু ছেড়ে সে একাকি রইল। আর যে মুহূর্তে সে একাকি হলো, অমনি সে বাগানে ও জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল। আর সেই সব জায়গায় যে সব স্মৃতি ছড়িয়ে ছিল সেগুলো তাকে চেপে ধরল। তার ধারণা হলো সে বাগানে হাঁটছে, সে এমন ভান করল যেন কোনও কিছু ভাবছে; কিন্তু আসলে সে তখন কিছুই ভাবছে না, শুধু পাগলের মতো, অবিবেচকের মতো মেয়েটিকেই আশা করছে; আশা করছে যে কোনও অলৌকিক প্রভাবে মেয়েটি বুঝতে পারবে যে তার জন্যই সে সেখানে অপেক্ষা করে আছে, এই

মুহূর্তে সে এখানে চলে আসবে, আর এমন একটা জায়গায় চলে যাবে যেখানে কেউ তাদের দেখতে পাবে না, অথবা সে আসবে রাতের বেলায় যখন আকাশে চাঁদ থাকবে না এবং কেউ কিছু দেখতে পাবে না, এমন কি সে নিজেও নিজেকে দেখতে পাবে না—তেমনি এক রাতে সে আসবে, আর ইউজেন তার শরীরটা স্পর্শ করবে..."

"বলেছি তো; যখনই ইচ্ছা করব তখনই সরে আসব", নিজেকেই সে বলতে লাগল। "হ্যাঁ, এটা তো স্বাস্থ্যের খাতিরে একটি পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যবতী নারীর সঙ্গে মিলিত হওয়া! না, তার সঙ্গে এ ধরনের খেলা করা উচিত নয়। ভেবেছিলাম আমি তাকে ধরেছি, কিন্তু না, সেই আমাকে ধরেছে; ধরেছে এবং ছাড়ছে না। আরে, আমি তো ভেবেছিলাম আমি মুক্ত, কিন্তু আসলে আমি মুক্ত ছিলাম না; বিয়ে করার সময় আমি নিজেকেই ঠকিয়েছিলাম। সবই ছিল অর্থহীন—জোচ্চুরি। যবে থেকে তাকে পেয়েছি তখন থেকেই একটা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, স্বামী হবার সত্যিকারের অভিজ্ঞতা। হ্যাঁ, তার সঙ্গে জীবন কাটানোই আমার উচিত ছিল।

"দুটো জীবনের যে কোনও একটাকে গ্রহণ করাই আমার পক্ষে সম্ভব: যে জীবন শুরু করেছি নিজেকে নিয়ে; কাজকর্ম, জমিদারি দেখাশোনা, সন্তান, ও মানুষের শ্রদ্ধা। এই যদি জীবন হয়তো সেখানে তার, স্তেপানিদার কোনও স্থান থাকতে পারে না। যেমন আগে বলেছি, তাকে দূরে পাঠিয়ে দিতে হবে, অথবা পৃথিবী থেকে একেবারে সরিয়ে দিতে হবে যাতে তার কোনও অস্তিত্বই না থাকে। আর অপর জীবন—সে তো এই রকম : আমার কাজ স্বামীর কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে আনা, স্বামীকে টাকা দেওয়া, লজ্জা ও অপমানকে উপেক্ষা করা, এবং তার সঙ্গে বাস করা। কিন্তু সেক্ষেত্রেও লিজার বেঁচে থাকা চলে না, এমন কি মিমি-রও (বাচ্চাটা) না। না, ঠিক তা নয়, বাচ্চাটাকে নিয়ে কোনও সমস্যা নেই, কিন্তু লিজার না থাকাটা একান্তই প্রয়োজন—তাকে চলে যেতেই হবে—সে সব জানবে, অভিশাপ দেবে, আর চলে যাবে। তার জানা দরকার যে তার বদলে একটি চাষী রমণীকে আমি গ্রহণ করেছি, আমি একটা জোচ্চোর, একটা পাজি লোক!—না, সে বড় ভয়ংকর অবস্থা। সেটা অসম্ভব। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে লিজা অসুস্থ হয়ে মারা গেল। মারা গেলে তো চমৎকার হয়।

"চমৎকার! হায় বদমাস! না, কাউকে যদি মরতেই হয়তো স্তেপানিদাই মরুক। সে যদি মরে তাহলে কী ভালই না হয়।

"হ্যাঁ, এইভাবেই তো মানুষ তাদের স্ত্রীকে বা প্রেমিককে বিষ দেয়, খুন করে। একটা রিভলভার নিয়ে চলে যাও, তাকে ডাকো, আর আলিঙ্গনের পরিবর্তে গুলি করো তার বুক লক্ষ্য করে, সব শেষ করে দাও।

"সত্যি সে তো—শয়তানী। শয়তানী ছাড়া আর কি। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে আমাকে কব্জা করে নিয়েছে।

"খুন? হ্যাঁ। মাত্র দুটি পথই খোলা আছে; স্ত্রী অথবা তাকে খুন করা। কারণ এ ভাবে বেঁচে থাকা অসম্ভব। *এ অসম্ভব! ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে আমাকে অগ্রসর হতে হবে। যদি যে ভাবে চলছে তাই চলতে থাকে তাহলে কি হবে? আমি আবারও বলব যে এটা আমি চাই না, আমি তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেব, কিন্তু সে তো হবে কথার কথামাত্র; সন্ধ্যা হলেই তার খিড়কি-দরজায় গিয়ে হাজির হবো, আর সেটা জানতে পেরে সে বেরিয়ে আসবে। আর লোকে যদি সেটা জানতে পারে ও আমার স্ত্রীকে বলে দেয়, অথবা আমি নিজেই যদি তাকে বলে দেই—কারণ মিথ্যা বলতে আমি পারব না—তাহলে তো সে অবস্থায় আমার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আমি তা পারি না! লোকে জানবে। সকলেই জানবে—পারাশা ও কামারও জানবে। আচ্ছা, সে ভাবে বেঁচে থাকা কি সম্ভব?

"অসম্ভব! মাত্র দুটি পথ খোলা আছে; আমার স্ত্রীকে বা তাকে খুন করা। হ্যাঁ, আর তা না হলে...আঃ, হ্যাঁ, একটা তৃতীয় পথও আছে; নিজেকে খুন করা," নরম গলায় কথাটা বলতেই তার চামড়ার উপর দিয়ে হঠাৎ একটা শিহরণ বয়ে গেল। "হ্যাঁ, নিজেকে খুন করা, তাহলেই তাদের কাউকে খুন করার দরকার হবে না।" সে ভয় পেল, কারণ সে বুঝল যে একমাত্র সেই পথটাই সম্ভব। তার একটা রিভলভার আছে। "সত্যি কি আমি নিজেকে খুন করব? এ কথা তো কখনও ভাবিনি—সেটা কী বিচিত্র ব্যাপারই না হবে..."

পড়ার ঘরে ফিরে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই কাবার্ডটা খুলে ফেলল। রিভলভারটা সেখানেই ছিল। কিন্তু খাপের ভিতর থেকে সেটাকে বের করবার আগেই তার স্ত্রী ঘরে ঢুকল।

২১

একটা খবরের কাগজ দিয়ে সে রিভলভারটা চাপা দিলো।

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে তীব্র ভয়ে লিজা বলে উঠল, "আবার সেই অবস্থা!"

"কি অবস্থা?"

"তোমার মুখে যে ভয়ংকর ভাবটা আগে ছিল, যেটা তুমি কখনও আমাকে বুঝিয়ে বলোনি। জেনিয়া, সোনা, সব কথা আমাকে খুলে বলো। আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি কষ্ট পাচ্ছ। আমাকে বলো, মনে স্বস্তি পাবে। সে যাই হোক না কেন, এ রকম কষ্ট পাওয়ার চাইতে সে কথা বলা তোমার পক্ষে অনেক ভাল হবে। সেটা যে খারাপ কিছু নয় তা কি আমি জানি না?"

"তুমি জানো? অথচ..."

"আমাকে বলো, বলো, বলো। আমি তোমাকে যেতে দেব না।"

*গল্পের শেষে মুদ্রিত বিকল্প পাঠটি এখান থেকে শুরু হয়েছে।

ইউজেনের মুখে একটা করুণ হাসি ফুটে উঠল।

"বলব?—না, সে অসম্ভব। আর বলার কিছু নেইও।"

হয়তো সব কথাই তাকে বলত, কিন্তু সেই মুহূর্তে দাইটি ঘরে ঢুকে জানতে চাইল লিজা বেড়াতে যাবে কি না। বাচ্চাকে পোশাক পরাতে লিজা বেরিয়ে গেল।

"তাহলে সব কথা বলবে তো? আমি এখনই ফিরে আসছি।"

"হ্যাঁ। হয়তো..."

যে করুণ হাসির সঙ্গে ইউজেন কথাটা বলল লিজা তা কোনওদিন ভুলতে পারবে না। সে বেরিয়ে গেল।

অতি দ্রুত ডাকাতের মতো চুপি-চুপি সে রিভলভারটাকে খাপ থেকে খুলে হাতে নিলো। গুলি ভরাই ছিল, হ্যাঁ, অনেক আগে ভরা হয়েছিল, আর একটা কার্তুজ কম ছিল।

"আচ্ছা, এভাবে হলে কেমন হবে?" সে রিভলভারটাকে কপালে ঠেকালো, একটু ইতস্তত করল, কিন্তু যেই স্তেপানিদার কথা মনে পড়ল—মনে পড়ল তাকে না দেখার সিদ্ধান্তের কথা, সংগ্রাম, প্রলোভন, পবাজয়, ও নতুন করে সংগ্রামের কথা—অমনি আতংকে সে শিউবে উঠল। 'না, এই ভালো," ঘোড়াটা টিপল...

লিজা যখন ছুটে ঘরে ঢুকল—বারান্দা থেকে ঘরে শুধু পা দেবার সময়টুকুই সে পেয়েছিল—ততক্ষণে ইউজেন মুখ থুবড়ে মেঝেতে পড়ে আছে : ক্ষতস্থান থেকে কালো উষ্ণ রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে ছুটছে, দেহটা মুচড়ে-মুচড়ে উঠছে।

তদন্ত হলো। আত্মহত্যার কারণ কেউ বুঝতে পারল না, বোঝাতেও পারল না। এমন কি দু'মাস আগে ইউজেন খুড়োর কাছে নিজ মুখে যে অপরাধের কথা স্বীকার করেছিল সেটা যে এই আত্মহত্যার কারণ হতে পারে সে কথা একবারও খুড়োর মাথায় ঢুকল না।

বারবারা আলেক্সীভ্‌না নিশ্চিত করেই বলল যে সে আগাগোড়াই এটা বুঝতে পেরেছিল। ইউজেন যেভাবে ঝগড়াঝাঁটি করত তা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল। লিজা বা মারি পাভ্‌লভনা এই ঘটনার কারণ কিছুই বুঝতে পারল না; তবু ডাক্তার যখন বলল যে তার মানসিক বিকার ঘটেছিল—সে নৈতিক দায়িত্বহীনতায় ভুগছিল, তখন তারা সে কথা বিশ্বাস করল না। এ কথা তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারল না, কারণ তারা জানত যে সে ছিল পরিচিত অন্য শত শত লোকের চাইতে অনেক বেশি স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ।

প্রকৃতপক্ষে, ইউজেন ইর্তেনেভ-এর যদি মানসিক বিকৃতি ঘটে থাকে তাহলে তো সকলেরই সেই একই অবস্থা; যে সব মানুষ নিজেদের মধ্যে উন্মাদের লক্ষণ না দেখে অন্যের মধ্যে সেটা দেখতে পায়, তারাই তো সব চাইতে বেশি মানসিক বিকারগ্রস্ত।

"শয়তান" গল্পের উপসংহারের
বিকল্প পাঠ

"খুন? হ্যাঁ। মাত্র দুটি পথ খোলা আছে : আমাব স্ত্রীকে খুন করা, অথবা তাকে খুন করা। কারণ এভাবে বেঁচে থাকা অসম্ভব," নিজের মনে এই কথা বলে টেবিলের কাছে গিয়ে তার ভিতর থেকে রিভলভারটা তুলে নিলো, এবং ভাল করে দেখে নিয়ে—একটা কার্তুজ কম ছিল—সেটাকে ট্রাউজারের পকেটে রেখে দিলো।

"হা ঈশ্বর! এ আমি কি করছি?" হঠাৎ কথাক'টি বলে দুই হাত জোড় করে সে প্রার্থনা করতে লাগল।

"হে ঈশ্বর, আমার সহায় হও, আমাকে উদ্ধার করো। তুমি তো জানো, পাপ করবার ইচ্ছা আমার ছিলো না, কিন্তু আমি যে অক্ষম। আমার সহায় হও," দেবমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে বুকের উপর ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে সে বলল।

"হ্যাঁ, নিজেকে সংযত রাখতে আমি পারি। বাইরে গিয়ে একটু হাঁটব, আর সব কথা ভেবে দেখব।"

বাইরের ঘরে গিয়ে ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে সে ফটকে গিয়ে দাঁড়াল। নিজের অজ্ঞাতেই পায়ে পায়ে বাগান পেরিয়ে মাঠের পথ ধরে একেবারে শেষ প্রান্তের খামার বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

ঝাড়াই-যন্ত্রটা তখনও গুন-গুন করে চলেছে; চালকদের ছেলেদের হৈ-হল্লা শোনা যাচ্ছে। গোলাঘরে ঢুকল। মেয়েটি সেখানেই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ইউজেন তাকে দেখতে পেল। সে শস্য বাছাই করছিল। ইউজেনকে দেখতে পেয়ে সে খুসি হয়ে ইতস্তত ছুটাছুটি শুরু করে দিলো; দুটি চোখে হাসির ঝিলিক; আরও বেশি উৎসাহ নিয়ে সে ছড়ানো শস্যগুলি বাছতে লাগল। ইচ্ছা না থাকলেও ইউজেন তার দিকে নজর না দিয়ে পারল না। মেয়েটি দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে তার সম্বিৎ ফিরে এল। করণিক জানাল, কাটা ফসল ঝাড়াই প্রায় শেষ হয়েছে—তাই এখন কাজে ঢিল পড়েছে এবং উৎপাদনও কম হচ্ছে। ইউজেন ড্রামটার কাছে এগিয়ে গেল; সেটা মাঝে মাঝেই ধাক্কা মারছে; সে করণিককে জিজ্ঞাসা করল, কাটা ফসলের আরও অনেক খড় জমা হয়ে আছে কি না।

"আরও পাঁচ গাড়ি খড় হবে।"

"তাহলে দেখো..." ইউজেন কথাটা শেষ করতে পারল না। মেয়েটি ড্রামের খুব কাছে এসে তার নিচ থেকেই ফসল টেনে নিচ্ছিল; তার দুটি হাসিভরা চোখ ইউজেনের মনে জ্বালা ধরিয়ে দিলো। সেই দৃষ্টি যেন বলছে, তাদের দু'জনের মুক্ত, স্বাধীন খুসির ভালবাসার কথা; বলছে—ইউজেন যে তাকে চায়, চালা-ঘরে তার কাছেই সে যে গিয়েছিল তা সে জানে, আর সেও সব অবস্থা ও ফলাফলকে উপেক্ষা

করে ইউজেনের সঙ্গে বাস করতে, ফূর্তি করতে প্রস্তুত আছে। ইউজেন বুঝল সে মেয়েটির হাতের মুঠোয় চলে যাচ্ছে, কিন্তু সেভাবে নিজেকে ছেড়ে দিতে সে চায় না।

প্রার্থনার কথাগুলো তার মনে পড়ে গেল; সেটাকে আবৃত্তি করতে চেষ্টা করল। নিজের মনেই প্রার্থনা শুরু করল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল যে এ সবই বৃথা। একটিমাত্র চিন্তা তখন তাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলেছে অন্যের দৃষ্টিকে এড়িয়ে কেমন করে তার সঙ্গে একটা মিলনের ব্যবস্থা করা যায়।

"এই লটটা যদি আজ শেষ করতে পারি তাহলে কি একটা নতুন গাদায় হাত দেব, না কি আগামীকাল পর্যন্ত ফেলে রাখব?" করণিক শুধালো।

অন্য মেয়েদের সঙ্গে এই মেয়েটিও যে গাদায় কাজ করছিল তার পিছুপিছু সেইদিকে এগোতে এগোতেই ইউজেন জবাব দিলো, "হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

নিজেকে বলল, "কিন্তু সত্যি কি আমি নিজেকে সংযত করতে পারি না? আমি কি সত্যি মরে গেছি? হে ঈশ্বর! কিন্তু না, ঈশ্বর নেই। আছে শুধু এক শয়তান! আর সে শয়তান ঐ মেয়েটা। সে আমার উপর ভর করেছে। কিন্তু আমি ছেড়ে দেব না! শয়তানী, হ্যাঁ। একটা শয়তানী।"

আবার সে মেয়েটার কাছে গেল, পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে এক, দুই, তিনবার তার পিঠে গুলি করল। কয়েক পা ছুটে গিয়েই সে একটা ফসলের গাদার উপর পড়ে গেল।

অন্য মেয়েরা চেঁচিয়ে উঠল, "ঈশ্বর, ঈশ্বর! এ সব কি?"

ইউজেন চিৎকার করে বলল, "না। এটা দুর্ঘটনা নয়। আমি ইচ্ছা করেই ওকে খুন করেছি। পুলিশ-অফিসারকে খবর দাও।"

সে বাড়ি ফিরে গেল, পড়ার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো, স্ত্রীকেও কিছু বলল না।

দরজার ফাঁক দিয়ে তাকে বলল, "আমার কাছে এস না। সবাই জানতে পারবে।"

একঘণ্টা পরে সে ঘণ্টা বাজাল; চাকর এলে তাকে বলল, "দেখে আয় তো স্তেপানিদা বেঁচে আছে কি না।"

চাকর সবই জানত, বলল যে একঘণ্টা আগেই সে মারা গেছে।

"ঠিক আছে। এখন আমাকে একা থাকতে দে। পলিশ-অফিসার অথবা ম্যাজিস্ট্রেট এলে আমাকে খবর দিস।"

পুলিশ-অফিসার ও ম্যাজিস্ট্রেট এল পরদিন সকালে, ইউজেন স্ত্রী ও সন্তানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কারাগারে চলে গেল।

বিচার হলো। তখন সবে জুরীর বিচার শুরু হয়েছে; তাদের রায়ে বলা হলো, এটা সাময়িক উন্মত্ততার ঘটনা। শাস্তি হলো গির্জায় কৃচ্ছ্রসাধন।

ন' মাস তাকে কারাগারে রাখা হলো; তারপর একমাস আটক রইল একটা মঠে।

কারাগারে থাকতেই সে মদ খেতে শুরু করল; মঠেও সেই অভ্যাস চালিয়ে গেল; বাড়ি ফিরে এল একটি অক্ষম, দায়িত্বহীন মাতাল হয়ে।

বারবারা আলেক্সীভ্না সকলকেই বলে বেড়ালো, এ কথা সে আগেই বলেছিল; তার ঝগড়ার নমুনা দেখেই এটা বোঝা গিয়েছিল। লিজা বা মারি পাভ্লভ্না এই ঘটনার কারণ কিছুই বুঝতে পাবল না; তবু ডাক্তাব যখন বলল যে তার মানসিক বিকার ঘটেছিল—সে নৈতিক দায়িত্বহীনতায় ভুগছিল, তখন তাবা সে কথা বিশ্বাস করল না। এ-কথা তাবা মেনে নিতে পারল না, কারণ তাবা জানত যে সে ছিল পরিচিত অন্য শত শত লোকের চাইতে অনেক বেশি স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ।

প্রকৃতপক্ষে, ইউজেন ইর্তেনেভ-এব যদি মানসিক বিকৃতি ঘটে থাকে, তাহলে সকলেবই সেই একই অবস্থা; যে সব মানুষ নিজেদের মধ্যে উন্মাদেব লক্ষণ না দেখে অন্যের মধ্যে সেটা দেখতে পায়, তাবাই তো সব চাইতে বেশি বিকারগ্রস্ত।

- নভেম্বর ১৯, ১৮৮৯

আলেশা ভাঁড়

Alesha the Pot

আলেশা ছোট ভাই। তারা ওকে ডাকত ভাঁড় বলে, কারণ একবার যখন মা তাকে পাদ্রীর কাছে পাঠিয়েছিলেন এক ভাঁড় দুধ দিয়ে আসবার জন্য, তখন সে হোঁচট খায় এবং ভাঁড়টাকে ভেঙে চুরমার করে ফেলে। তার মা তাকে মেরেছিলেন এবং বাচ্চারা তাকে "ভাঁড়" বলে ডেকে জ্বালাতে শুরু করে। আলেশা ভাঁড়—এই হয়ে গেল তার ডাক নাম।

আলেশার কান ছিল পাতলা আর ঝোলানো কান দুটো ছড়িয়ে থাকত ঠিক পাখনার মতো, আর তার নাকটা ছিল মোটা। বাচ্চারা তাকে ক্ষ্যাপাত : "আলেশার নাকটা ছুঁচোল কুকুরের মতো।" গ্রামে একটা স্কুল ছিল, কিন্তু আলেশা পড়া বা লেখা কিছুই শেখেনি, কারণ তার পড়াশুনো করার সময় ছিল না। তার বড় ভাই একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে শহরে থাকত, এবং শিশু-বয়স থেকেই থাকত; আলেশাই তার বাবাকে সাহায্য করত। যখন তার ছ' বছর বয়স তখনই সে তার বোনের সঙ্গে মাঠে গরু-ভেড়া চরাত, আর পুরোপুরি বড় হয়ে ওঠার আগেই দিনরাত ঘোড়াগুলোর দেখাশুনা আরম্ভ করল।

বারো বছর বয়স থেকেই সে লাঙল দিতে আর গরুরগাড়ি চালাতে শিখল। তার গায়ে জোর ছিল না, কিন্তু কিছুটা দক্ষতা ছিল। সবসময় হাসিখুসি থাকত। যখন বাচ্চারা তাকে দেখে হাসত, সে চুপ করে থাকত, অথবা নিজেও হাসত। যখন তার বাবা তাকে গালাগালি কবত, সে চুপ করে শুনত। আর গালাগালি থামতেই হেসে নিজের কাজে মন দিতো।

আলেশার যখন উনিশ বছর বয়স তখন তার দাদা সামবিক বিভাগে তালিকাভুক্ত হলো। বাবা আলেশাকে দাদার জায়গায় সেই ব্যবসায়ীটিব কাছে রেখে এল পিওনের কাজ করবার জন্য। আলেশাকে দেওযা হলো দাদার পুরনো বুট জুতো, বাবার টুপি ও কোট; তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হলো শহরে। আলেশা তো জামাকাপড় পেয়ে খুব খুসি, তবে ব্যবসায়ীটি আলেশার চেহাবা দেখে খুসি হলো না।

"আমি ভেবেছিলাম সমনের জায়গায় তুমি একটি সত্যিকাবেব ভালমানুষকে দেবে।" আলেশার দিকে তাকিয়ে ব্যবসায়ীটি বলল। "কিন্তু তাব বদলে তুমি এই বেঁটেটাকে এনেছ, ও কি কাজে লাগবে?"

"ও সব কবতে পারে—ঘোড়া জুততে পারে, যে কোনও জায়গায় যেতে পাবে এবং দারুণ কাজ করতে পারে। ওকে দেখতেই চাবাগাছেব মতো, কিন্তু ও খুবই মজবুত।"

"আচ্ছা ঠিক আছে, দেখা যাবে।"

"আর সব চাইতে বড় কথা—ও দাযিত্বশীল কাজ কবতে ভালবাসে।"

"তোমাকে নিয়ে আর পাবা যায় না। ওকে রেখে যাও।"

সুতরাং আলেশা ব্যবসায়ীব বাড়িতে থেকে গেল।

ব্যবসায়ীর পবিবাব বড় ছিল না; কর্তা, তাব বৃদ্ধা মা, তার বিবাহিত জ্যেষ্ঠ পুত্র, প্রাথমিক লেখাপড়া করেই সে বাবার সঙ্গে ব্যবসা দেখে; আরেক পুত্র শিক্ষিত, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়া সাঙ্গ কারে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান কবে। এবং সেখান থেকে তাকে তাড়িয়ে দেবার পর বাড়িতেই ফিরে আসে, আব ছিল এক অবিবাহিতা কন্যা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠরতা।

প্রথমে আলেশাকে কেউ পছন্দ করত না—সে তখনও ছিল একেবারে চাষাড়ে, বাজে পোশাক পরত, আদব কাযদা জানত না, আব সবাইকে নাম ধবে ডাকত, তবে অল্পদিনের মধ্যেই সকলে এ ব্যাপারে অভ্যস্ত হযে উঠল। এমনকি সে তার দাদার চেয়েও বেশি কাজের লোক হয়ে উঠল। সে ছিল সত্যিকারের কর্তব্যপবাযণ; তাকে সব রকম কাজ করতে পাঠানো হতো, আর সব কাজই সে আগ্রহের সঙ্গে তাড়াতাড়ি শেষ করত; একটা কাজ সেরে এসেই পবের কাজে হাত দিতো। ব্যবসায়ীটিব বাড়িতেও ঠিক তার নিজের বাড়ির মতোই সমস্ত কাজ এসে পড়ত আলেশার ঘাড়ে। যত বেশি কাজ সে করত, তত বেশি কাজ তার জন্য জমা হতো। কর্তা, কর্তাব মা,

কর্তার মেয়ে, কর্তার ছেলে, ঠিকাদার এবং রাঁধুনী—সকলে অনবরত তাকে এখানে-সেখানে পাঠাত এবং পর পর কাজের ফর্দ করে দিতো। সব সময় শুধু শোনা যেত : "দৌড়াওহে বাপু," অথবা "আলেশা, এটা ঠিক করো!" "আলেশা, এটা ভুলে গেছ, তাই না?" "নজর রেখো, ভুলো না আলেশা।" আলেশা ছুটত, ঠিক করত, সব দিকে নজর রাখত, কোনও কিছু ভুলত না, এবং সব সময় সব কিছু সামলাতো আর সব সময় হাসত।

কিছুদিন পরে দাদার বুট জোড়া ছিঁড়ে গেল; গোড়ালি বেব-হওয়া ছেঁড়া বুট পরার জন্য কর্তা তাকে খুব বকুনি দিলো, এবং হুকুম করল বাজার থেকে নতুন বুট কিনতে। নতুন বুটজোড়া পেয়ে আলেশা খুব খুসি হলো, কিন্তু তার পায়ে ফোস্কা পড়ল এবং সন্ধ্যার মধ্যেই দৌড়তে গিয়ে যন্ত্রণা হতে লাগল; ফলে সে ওগুলোর উপর বেগে গেল। আলেশার ভয় হলো, বাবা যখন টাকা নিতে আসবেন তখন ব্যবসায়ীটি বুটের দাম তার মাইনে থেকে কেটে নেবার জন্য তিনি খুব বিরক্ত হবেন।

আলেশা শীতকালে ভোর হবার আগেই উঠে পড়ত, আগুন জ্বালবার কাঠ কাটত, বাড়ি ধোয়া-মোছা করত, গরু আর ঘোড়াদের খাওয়াত, তাদের গা ধুইয়ে দিতো। তারপর স্টোভ জ্বালাতো, কর্তার বুট আর জামাকাপড় পরিষ্কার করত; সামোভারের আগুন নিভিয়ে দিয়ে সেগুলো পরিষ্কার করত; তারপর ঠিকাদার তাকে ডাকত কিছু মালপত্র বয়ে আনতে, অথবা রাঁধুনী হুকুম করত ময়দা মাখতে অথবা বাসন ধুতে। তারপর তাকে ওকে শহরে পাঠাতো হয় কোনও চিরকুট দিয়ে অথবা কর্তাব মেয়েকে স্কুল থেকে আনতে, অথবা বৃদ্ধা মহিলার তেলের জন্য। "ওরে হতভাগা কোথায় গড়িমসি করছিস," বলল প্রথম জন; তারপর অন্যজন তাকে বলল, "তুমি যাচ্ছ কেন—আলেশাই দৌড়ে যাবে। আলেশা! ও আলেশা!" আলেশা ছুটল।

সে দৌড়তে দৌড়তেই সকালের জলখাবার খেত; সকলের সঙ্গে ডিনার খাবার সময় সে খুব কমই পেত। সকলের সঙ্গে না খাবার জন্য রাঁধুনী তাকে বকত, কিন্তু সেই সঙ্গে ওর জন্য কষ্টও পেত, এবং ডিনার ও নৈশভোজের জন্য গরম গরম খাবার করে দিতো। ছুটির আগে এবং ছুটির দিনগুলিতে বিশেষভাবে বেশি পরিমাণে কাজ থাকত। তবু আলেশা ছুটির দিনে বিশেষ রকম খুসি হতো, কারণ কিছু বখ্শিশ মিলত; যদিও পরিমাণে অল্প; সব মিলিয়ে ষাট কোপেক, তবু তো সেটা তার নিজস্ব পয়সা; সে ইচ্ছেমতো খরচ করতে পারে। মাইনের দিকে তার কোনও নজর ছিল না। তার বাবা আসত; ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকাটা নিতো; আর এত তাড়াতাড়ি নতুন বুট কেনার জন্য তাকে তিরস্কার করত। যখন আলেশা তার বখ্শিশ থেকে দুই রুবল জমিয়ে ফেলল, তখন রাঁধুনীর পরামর্শে একটা লাল সুতোয় বোনা জ্যাকেট কিনে ফেলল; যখন সেটা পড়ত তখন খুসিতে আর মুখ বুজে থাকতে পারত না।

আলেশা কথা বলতো কম, এবং যখন কিছু বলতো, তা হতো অসংলগ্ন ও

অপ্রত্যাশিত। যখনই তাকে কিছু কবাব জন্য হুকুম কবা হতো অথবা জিজ্ঞাসা কবা হতো একটা বিশেষ বকম ভাবে কাজটা কবতে পাববে কিনা, তখন সে সামান্যতম দ্বিধা না কবে সব সময় বলতো, "কবতে পাবব"—এবং তৎক্ষণাৎ তা কবতে ছুটত এবং তা কবত।

কোনও বকম প্রার্থনা সে জানত না, মা যা শিখিয়েছিলেন সেগুলিও ভুলে গিয়েছে. কিন্তু তবু সকালে ও বাত্রে সে প্রার্থনা কবত—ক্রুশ চিহ্ন এঁকে হাত জোড কবে সে প্রার্থনা কবত।

এইভাবে আলেশা দেড বছব কাটালো, তাবপব, দ্বিতীয় বছবেব দ্বিতীয়ার্ধে, তাব জীবনে একটা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটল। নিজেই বিস্মিত হয়ে সে বুঝতে পাবল. পবস্পবেব প্রয়োজনে মানুষেব সঙ্গে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাব বাইবেও সম্পূর্ণ আলাদা সম্পর্কও আছে, সে অনুভব কবল একটা মানুষ শুধুমাত্র অন্যেব প্রয়োজনে সব সময় জুতো পবিষ্কাব কববে, বোঝা বইবে, অথবা ঘোড়াদেব দেখাশুনা কববে—তা হতে পাবে না, অন্যেব প্রয়োজন মেটানো ছাড়া নিজেব অন্তবেব তাগিদেও তাকে সেবা কবাব, তাব প্রতি দয়া দেখাবাব জন্যও মানুষ কষ্ট কবতে পাবে। আব ঠিক সেইবকম একটা তাগিদই আলেশা নিজেব মধ্যে অনুভব কবতে লাগল। বাঁধুনি উস্তিনিযাই তাব মনে এই ভাবটা জাগিয়ে তুলল উস্তিনিয়া ছিল অনাথা যুবতী আব আলেশাব মতোই কঠিন পবিশ্রমী। আলেশাব জন্য তাব দুঃখ হতো আব আলেশাও এই প্রথম বুঝল যে সে তাব চাকব নয়, ববং তাকেও অন্য কেউ পছন্দ কবে। যখন তাব মা তাব জন্য কষ্ট পেতেন, সেদিকে তাব কোনও নজব ছিল না। কিন্তু হঠাৎ সে লক্ষ্য কবল যে উস্তিনিযাব ক্ষেত্রে ব্যাপাবটা সম্পূর্ণ আলাদা উস্তিনিযা তাব প্রতি সহানুভূতি দেখায, তাব জন্য বাটিতে কবে মাখন দেওযা কাশা বেখে দেয, যখন খায তখন থুতনিতে হাত বেখে তাব দিকে চেয়ে থাকে। সেও তাব দিকে তাকায, তাবপব মেয়েটি হাসে, সে নিজেও হাসে।

এটা তাব কাছে এত নতুন আব আশ্চর্য মনে হয়েছিল যে প্রথমে আলেশা ভয পেয়ে গেল। তাব মনে হলো এব জন্য সে তাব আগেব মতো কাজ কবতে পাববে না। কিন্তু তবু সে খুসি হলো, যখন সে দেখল উস্তিনিযা তাব পাজামা মেবামত কবে দিয়েছে, তখন সে মাথা দুলিয়ে মুচকি হাসল। প্রায়ই কাজ কবতে কবতে অথবা দৌড়তে দৌডতে সে উস্তিনিযাব কথা ভাবত আব বলত "আহা, উস্তিনিযা।" উস্তিনিয়া যখনই পাবত ওকে সাহায্য কবত, এবং সেও তাকে সাহায্য কবত। উস্তিনিয়া মাঝে মাঝেই তাকে নিজেব জীবনেব গল্প শোনাতো, সে কিভাবে অনাথা হয়েছিল, কিভাবে তাব কাকা তাকে নিয়ে গিয়েছিল, কিভাবে তাকে শহবে পাঠানো হয়েছিল, কিভাবে একটা রাঁধুনির ছেলে তাকে ভুলিয়ে নেবার চেষ্টা কবেছিল, আব সে কিভাবে তাকে বাধা দিয়েছিল। মেয়েটি কথা বলতে ভালবাসত; আব আলেশাও

তার কথা শুনতে ভালবাসত। সে মেয়েটির কাছেই শুনল, শহরে শ্রমিক হিসেবে ভাড়া করে আনা চাষীরা প্রায়ই রাঁধুনিদের বিয়ে করে। একদিন সে আলেশাকে জিজ্ঞাসা করল, সেসিগ্‌দিকে বিয়ে করবে কি না। আলেশা বলল, সে জানে না, এবং কাউকে গ্রামে নিয়ে যাবার ইচ্ছাও তার নেই।

"তাহলে কি তুমি কাউকে ঠিক করেছ?" রাঁধুনি জিজ্ঞাসা কবল।

"হ্যাঁ, তোমাকে। তুমিও রাজী, কি বলো?"

"ওঃ, ভাঁড়, আমার ভাঁড়, কী সুন্দর করে তুমি বললে," হাত দিয়ে তার পিঠ চাপড়ে সে বলল। "কেন হবো না?"

"প্রোভ্‌টাইড"-এর সময় আলেশার বাবা শহরে এলেন টাকা নেবার জন্য। ব্যবসায়ীটির স্ত্রী জানত যে আলেশা উস্তিনিযাকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছে, কিন্তু সেটা সে পছন্দ করেনি। স্বামীকে বলেছে, "ও তো গর্ভবতী হবে, আর বাচ্চা নিয়ে তাকে দিয়ে কি কাজ হবে?"

মালিক আলেশার বাবাকে টাকা দিলো।

"তাহলে ছেলেটা কাজকর্ম করছে তো?" চাষী বলল। "আমি বলেছিলাম না সে খুবই দায়িত্বশীল।"

"ও দায়িত্বশীল ঠিকই, কিন্তু ও বোকাব মতো একটা মতলব এঁটেছে। রাঁধুনিকে বিযে কববে ঠিক করেছে। আমি বিবাহিত দম্পতিকে কাজে রাখব না। আমাদেব তাতে সুবিধে হবে না।"

"কি বোকা কি বোকা! এমন কথা কেউ মনে আনে।" বাবা বললেন। "আপনি ভাববেন না। আমি ওকে এসব বন্ধ করতে বলে দেবো।"

বাবা রান্নাঘরে গেলেন, বেঞ্চের উপব বসে ছেলের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। আলেশা খবর দিতে কোথাও গিয়েছিল, হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরল।

"আমি তো ভেবেছিলাম তুমি হাবিযেই গেছো। এখন বলো এসব কি মতলব এঁটেছো?"

"কিছু না তো।"

"কিছু না মানে? তুমি বিয়ে করবে ঠিক করেছ। সময় হলে আমিই তোমার বিয়ে দেবো; এমন মেয়ের সঙ্গে যাকে তোমাব দরকার, কোন শহুরে বাউন্ডুলে মেয়ের সঙ্গে নয়।"

বাবা অনেক কথা বলে গেলেন। আলেশা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। তার বাবা যখন কথা শেষ করল, তখন হাসল।

"আচ্ছা, তাহলে এই মতলব বাতিল হলো?"

"ঠিক আছে।"

বাবা চলে গেলে ঘরে রইল শুধু সে আর উস্তিনিযা, সে দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে

সব শুনছিল; সে তাকে বলল, "আমাদের মতলব হাসিল হলো না।" তুমি তো শুনেছো? উনি প্রচণ্ড রেগে গেছেন; কিছুতেই মানবেন না।"

মেয়েটি নিঃশব্দে এপ্রনে চোখ মুছল।

আলেশা জিভ দিয়ে শব্দ করল।

"আমিই বা কি করে তার কথা না মেনে পারি? স্বভাবতই এ মতলব ছাড়তে হবে।"

সন্ধেবেলায় ব্যবসায়ীর স্ত্রী যখন তাকে জানালা বন্ধ করতে ডাকল তখন তাকে বলল,

"আচ্ছা, তাহলে তুমি তোমার বাবার কথা শুনলে? তোমার বোকামি ছাড়লে?"

"বাধ্য হয়ে আমাকে ছাড়তে হলো," আলেশা বলল; তাবপবই হেসে উঠে সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

সেদিন থেকে আলেশা আর কখনো উস্তিনিযাকে বিয়ের কথা বলেনি। আগের মতোই তার দিন কাটতে লাগল।

লেন্ট উৎসবের সময়, ঠিকাদার তাকে ছাদের বরফ পরিষ্কার কবতে পাঠালো। সে ছাদে উঠল, সমস্ত কিছু পরিষ্কার করল, এবং যখন নর্দমার উপর জমা হওয়া বরফ টেনে টেনে বার করতে শুরু করল তখন তার পা পিছলে গেল এবং শাবল-টাবল সুদ্ধু সে নিচে পড়ে গেল। দুর্ভাগ্যবশতঃ বরফের উপর না পড়ে সে পড়ল বারান্দার উপব, লোহার ছাদের উপর। উস্তিনিযা দৌড়ে গেল তার কাছে; মালিকের মেয়েও গেল।

"আলেশা, তোমার কি লেগেছে?"

"মনে হচ্ছে তাই। ওতে কিছু হবে না।"

আলেশা দাঁড়াতে চেষ্টা কবল, কিন্তু পারল না; হাসতে আরম্ভ করল।

সকলে তাকে ঘরে নিয়ে গেল। ডাক্তার এলেন। তিনি ওকে পবীক্ষা করলেন এবং কোথায় লেগেছে জানতে চাইলেন।

"সব জাযগাযই লেগেছে তবে এটা কোনও ব্যাপার নয়। শুধু মালিক বিরক্ত হবেন। বাবাকে খবর পাঠান।"

আলেশা দু'দিন বিছানায় শুযে রইল; তৃতীয় দিনে পুরোহিতকে ডাকা হলো।

"সেকি, তুমি মারা যাবে না তো?" জিজ্ঞাসা করল উস্তিনিয়া।

"কেন, তাতে কি হয়েছে? কেউ কি চিরকাল বাঁচে? এক সময় তো মরতেই হবে", আলেশা খুব দ্রুত কথাগুলি বলল। "উস্তিনিয়া, তুমি আমাকে করুণা করেছ বলে ধন্যবাদ। দেখো, বাবা বিয়েটা বাতিল করে ভালই করেছেন, বিয়েটা তো বিফলেই যেত। এখন সব কিছুই ভাল হলো।"

হাত জোড় করে সমস্ত অন্তর দিয়ে সে পুরোহিতের সঙ্গে প্রার্থনা করল। মনে

মনে ও বিশ্বাস করেছিল, তুমি যদি এখানে ভাল থাকো; যদি তুমি সকলের কথা শুনে চলো এবং কাউকে আঘাত না করো; তাহলে সেখানেও তুমি ভাল থাকবে।

মুখে কিছুই বলল না। শুধু জল চাইল, আর কি মনে করে মৃদু হাসল।

তারপরই মনে হলো সে যেন কিছু দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল; শরীরটাকে টান-টান করে মেলে দিলো; মারা গেল।

রচনা : ১৯০৬

প্রকাশ : ১৯১১

আমার স্বপ্ন

My Dream

১

"মেয়ে হিসাবে আমার কাছে সে বেঁচে নেই, বুঝতে পারলে, সে বেঁচে নেই, কিন্তু আমি তো তাকে অপরিচিত লোকের উপর নির্ভরশীল হতে দিতে পারি না। সে যাতে ইচ্ছামতো বেঁচে থাকতে পারে সে ব্যবস্থা আমি করে দেবো, কিন্তু তাকে স্বীকার করব না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ রকম একটা ব্যাপার আমি কখনও কল্পনাও করতে পারতাম না ..এ যে ভয়ংকর, ভয়ংকর।"

সে দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিলো, মাথাটা নাড়ল, চোখ দুটো উপরে তুলল। ষাট বছর বয়সের প্রিন্স মিখাইল আইভানভিচ সি—কথাগুলি বলছিল তার ভাই কোনও মধ্য প্রাদেশিক শহরের গভর্ণর পঞ্চাশ বছর বয়সের প্রিন্স পিয়তর আইভানভিচকে।

কথা হচ্ছিল সেই প্রাদেশিক শহরে বসে, সেন্ট পিতার্সবুর্গ থেকে দাদাই সেখানে এসেছে। এইমাত্র সে জানতে পেরেছে, তার যে মেয়েটি আগের বছর বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল একটি শিশুকে নিয়ে সে এই শহরেই বাস করছে।

প্রিন্স মিখাইল আইভানভিচ সুদর্শন, কাঁচা-পাকা চুল, দীর্ঘদেহ, পরিশ্রমী, গর্বোন্নত মুখ ও আকর্ষণীয় চেহারার বৃদ্ধ মানুষ। তার পরিবার বলতে খিটখিটে মেজাজের সাধারণ স্ত্রী,—যত সব বাজে ব্যাপার নিয়ে সে প্রায়ই ঝগড়া-ঝাটি করে, এক ছেলে—জীবনে পুরোপুরি সফল হতে পারেনি, টাকা ওড়ায় আর ফূর্তি করে, কিন্তু বাবার ধারণামতো সে একজন "খাঁটি ভদ্রলোক," দুটি মেয়ে—বড়টি ভাল বিয়ে করে সেন্ট পিতার্সবুর্গেই থাকে, আর ছোট লিজাই ছিল বাবার প্রিয়; এক বছর আগে সে

বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়, আর সবেমাত্র খোঁজ পাওয়া গেছে যে অনেক দূরে এক প্রাদেশিক শহরে সে তার বাচ্চাকে নিয়ে আছে।

কেমন করে কোন অবস্থায় লিজা বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল আর ঐ শিশুর বাবাই বা কে হতে পারে, এই কথাগুলিই প্রিন্স পিয়তর আইভানভিচ দাদার কাছ থেকে জানতে চেয়েছিল, কিন্তু কথাই তুলতে পারছিলো না। সেদিন সকালেই তার স্ত্রী যখন ভাশুরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করছিল তখনই প্রিন্স পিয়তর আইভানভিচ দাদার মুখে যন্ত্রণা ফুটে উঠতে দেখেছিল: আরও লক্ষ্য করেছিল কত সতর্কতার সঙ্গে দুর্গম অহংকারের আড়ালে সেই যন্ত্রণাকে ঢেকে রেখে তাড়াতাড়ি সে ভ্রাতৃবধূকে জিজ্ঞাসা করেছিল, নতুন অ্যাপার্টমেন্টটা কিনতে কত টাকা লেগেছে। প্রাতরাশের সময় সমবেত অতিথি ও বাড়ির লোকজনদের সামনে সে ছিল আগেকার মতোই আমুদে ও কঠোর সমালোচনাপ্রিয়। ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতি সে খুবই স্নেহশীল, কিন্তু অন্য সকলের কাছেই তার ঔদ্ধত্য দুরারোহ। যাই হোক, সব কিছুকেই সে এত ভালভাবে চালিয়ে নিতে পারে যে সকলে যেন মেনেই নিলো যে উদ্ধত হবার অধিকার তার আছে।

সেদিন সন্ধ্যায় ভাইয়ের সঙ্গে একহাত "ভিন্ট" খেলার পরে মিখাইল তার ঘরে গেল। সবে নকল দাঁতগুলি খুলতে যাবে এমন সময় দরজায় দুটো হাল্কা টোকা পড়ল।

"কে ওখানে?"

"আমি, মিচেল।"

প্রিন্স মিখাইল আইভানভিচ ভ্রাতৃবধূর গলা চিনতে পেরে চোখ কুঁচকালো; দাঁতের পাটিকে যথাস্থানে বসিয়ে "সে কি চায়?" ভাবতে ভাবতেই চড়া গলায় বলল,

"ভিতরে এসো।"

ভ্রাতৃবধূটি শান্তশিষ্ট, ছোটখাটো মানুষটি, একান্তভাবেই স্বামীর অনুগত, কিন্তু কেমন যেন খামখেয়ালি (অনেকে তাকে বোকাই মনে করে)। সুন্দরী হলেও বেশবাসে সব সময়ই অগোছালো থাকে। মাঝে মাঝেই হঠাৎই এমন সব অদ্ভুত অনভিজাত কথাবার্তা—যা একজন গভর্নরের স্ত্রীকে মানায় না—বলে ফেলে যে তার স্বামী ও অন্য সকলেই অবাক হয়ে যায়।

"আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু আমি যাব না, সে-কথা আগে থাকতেই বলে রাখছি। "তার পক্ষে স্বাভাবিক যুক্তিহীনতার সঙ্গেই সে কথা বলতে শুরু করল।

কিছুটা অতি-সৌজন্যের সঙ্গেই ভাসুর তার জন্য একটা হাতল-চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন।" তারপর একটা সিগারেট বের করে বলল, "এটাতে আপত্তি নেই তো?"

"অপ্রীতিকর কোনও কথা আমি বলব না; আমি শুধু লিজাংকার ব্যাপারে কিছু বলতে চাই।"

মিখাইল আইভানভিচ একটা যন্ত্রণাকাতর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আত্মস্থ হয়ে ক্লান্ত হাসির সঙ্গে বলল,

"তুমি যে কথাই বলতে চাও না কেন, আমার দিক থেকে তোমার সঙ্গে কেবলমাত্র একটি বিষয়েই আলোচনা হতে পারে।" ভ্রাতৃবধূর দিকে না তাকিয়েই সে কথা বলল; আলোচনার বিষয়বস্তুটাই এড়িয়ে গেল; এমন কি তার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করল না।

কিন্তু এতে তার মোটাসোটা, গোলগাল ভ্রাতৃবধূটি মোটেই অপ্রস্তুত হলো না; তার মুখের দিকে মিনতিভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল,

"তার প্রতি আপনার করুণা হওয়া উচিত, সেও তো মানুষ।"

অপ্রীতিকর হাসি হেসে মিখাইল আইভানভিচ জবাব দিলো, "সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই।"

"সে আপনার মেয়ে।"

"ছিল। হ্যাঁ। কিন্তু প্রিয় আলিন, এ আলোচনা কেন?"

"আপনি একবার তার সঙ্গে দেখা করুন। আপনাকে শুধু এই কথাই বলতে চাই, সব রকম দোষই যে করেছে..."

প্রিন্স মিখাইল আইভানভিচের ক্রোধ জ্বলে উঠল; তার মুখটা ভয়ংকর হয়ে উঠল।

"ঈশ্বরের ভালবাসার নামে বলছি, এ কথা থাক। অনেক কষ্ট আমি পেয়েছি। তাকে এমন অবস্থায় আমি রাখতে চাই যাতে সে কারও বোঝা না হয়। এ ছাড়া আজ আর আমার কোনও বাসনা নেই। আমি চাই, আমার সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ রাখার দরকার যেন তার না হয়, সে যেন নিজে আলাদাভাবে বেঁচে থাকতে পারে, আর তার কোনও খবর না রেখেই আমি যেন সপরিবারে আমাদের মতো করে বেঁচে থাকতে পারি। এছাড়া আর কোনও কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"মিচেল, আবার সেই 'আমি'। কিন্তু সেও তো 'আমি'।"

"নিঃসন্দেহে; কিন্তু প্রিয় আলিন, দয়া করে এ আলোচনা বন্ধ করো। এতে আমি বড় কষ্ট পাই।"

আলেক্‌সান্দ্রা দিমিত্রিয়েভ্‌না নীরবে মাথা নাড়তে লাগল।

"আর মাশারও (মিখাইল আইভানভিচের স্ত্রী) কি এই একই মত?"

"ঠিক এক।"

আলেক্‌সান্দ্রা দিমিত্রিয়েভ্‌না জিভ দিয়ে একটা শব্দ করল।

"তাহলে এখানেই শেষ করা যাক। শুভ রাত্রি," সে বলল।

কিন্তু আলেক্‌সান্দ্রা দিমিত্রিয়েভ্‌না চলে গেল না। এক মুহূর্ত চুপ করে রইল।

"পেত্‌য়া আমাকে বলেছে, যে স্ত্রীলোকটির বাড়িতে সে আছে তাকে আপনি কিছু টাকা দিয়ে যেতে চান। তার ঠিকানা কি আপনি জানেন?"

"জানি।"

"তাহলে সে কাজটা আমাদের হাত দিয়ে করবেন না, আপনি নিজে যান। গিয়ে দেখে আসুন সে কি ভাবে আছে। তাকে যদি দেখতে না চান, দেখবেন না। পুরুষটি সেখানে নেই; অন্য কেউ নেই।"

মিখাইল আইভানভিচ কাঁপতে লাগল।

"আঃ, কেন, কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ? এটা আতিথেয়তার বিরোধী।"

আলেক্‌সান্দ্রা দিমিত্রিযেভ্‌না উঠে দাঁড়াল; অশ্রুভেজা গলায় বলল,

"সে এত দুঃখী, আর এত ভাল।"

মিখাইল আইভানভিচ উঠে দাঁড়াল; তাব কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। ভ্রাতৃবধূ তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো।

"মিচেল, এটা ভুল", বলে সে চলে গেল।

তারপর অনেকক্ষণ ধরে মিখাইল আইভানভিচ ঘরময় পায়চারি করে বেড়ালো; কখনও ভ্রূকুটি করছে, কখনও শিউরে উঠছে, কখনও "ওঃ, ওঃ!" করে চেঁচিয়ে উঠছে; তারপর সে চিৎকার কানে যেতে নিজেই ভয় পেয়ে চুপ করে গেল।

আহত অহংকারই তাকে কষ্ট দিচ্ছে; তার নিজের মেয়ে—যে মেয়ে মানুষ হয়েছে তার নিজের হাতে সেই মায়ের হাতে স্বয়ং সাম্রাজ্ঞী যার কথা শুনতেন; যে মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে পারা ছিল একটা মহা সম্মানের ব্যাপার; যে এমন লোকের মেয়ে যে একজন নাইটের মতো সারাটা জীবন কাটিয়েছে কাউকে ভয় না করে, কারও নিন্দা না শুনে; জনৈকা ফরাসী গভর্নেসের গর্ভে যার একটি পুত্র জন্মালে তাকে সে বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, তবু নিজের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা থেকে বিচ্যুত হয়নি। আর আজ কি না সেই মেয়ে, যার জন্য বাবা হিসাবে যা কিছু করণীয় সব সে করেছে : ভাল লেখাপড়া শিখিয়েছে, রাশিয়ার উচ্চতম শ্রেষ্ঠ সমাজে সে যাতে মনমতো বর খুঁজে নিতে পারে তার সব রকম সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছে; যে মেয়েকে সে একটি মেয়ের যা কিছু কাম্য থাকতে পারে তা তো দিয়েছেই, উপরন্তু তাকে সত্যিকারের ভালবেসেছে, সুনজরে দেখেছে, এমন কি তার জন্য গর্ববোধ করেছে; সেই মেয়ে কি না তাকে দিয়েছে অসম্মান, এমন কাজ করেছে যার ফলে মানুষের চোখের দিকে চাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

সেই সব দিনের কথা তার মনে পড়ছে যখন সে তাকে শুধু নিজের মেয়ে, পরিবারের একজন হিসাবেই দেখত না, তাকে ভালবাসত অত্যন্ত আপন করে, তার সঙ্গে তাকে আনন্দ দিতো, গর্বিত করত। মনে পড়ছে, যখন তার বয়স ছিল আট-নয়

বছর, তখন সে ছুটে এসে তার কোলে উঠত, তাকে জড়িয়ে ধরত, তার মুখে, চোখে ও গালে চুমো খেত। মনে পড়ছে, তখন তাকে আদর করে সে কত সুখ পেত।

আর সেদিনের সেই মিষ্টি মেয়েটি—যার কথা ভাবলেই তার মনে ঘৃণা জাগে—সেই তার আজকের এই হাল করেছে।

মনে পড়ছে, দুটি খুব ভাল বরকে মেয়ে এমন সব কারণে প্রত্যাখ্যান করেছে যা সে নিজে কখনও বুঝতে পারেনি; এমনিভাবে সমাজে উড়তে উড়তে যতই সে অন্যকে মোহিত করেছে ততই নিজের সাফল্যে সে নিজেই মোহিত হয়েছে। কিন্তু এ সাফল্য দীর্ঘদিন থাকে না। এক বছর গেল, দু' বছর গেল, তিন বছর গেল। অনেকেরই তাকে চোখে লাগে। তখনও সে সুন্দরী ছিল, কিন্তু প্রথম যৌবনের রেশ তখন মিলিয়ে গেছে; বল-নাচের আসবে তার নিয়মিত যাতায়াত চলেছে। মিখাইল আইভানভিচের মনে পড়ছে, নাচের আসর থেকে বেরিয়ে আসার পরে যখনই সে মেয়েকে দেখেছে, তখনই তার মনে একটিমাত্র চিন্তাই জেগেছে—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার বিয়ে দিতে হবে, আগে যত ভাল বিয়ে হতে পারত তা যদি নাও হয় তবু একটা উপযুক্ত বিয়ের ব্যবস্থা করতেই হবে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই মেয়ের ব্যবহারে ফুটে উঠত একটা ইচ্ছাকৃত ঔদ্ধত্য; সে কথা মনে হলেই মেয়েব প্রতি তার তিক্ততা আরও বেড়ে যায়। এত ভাল ভাল বিয়ের প্রস্তাব সে ফিরিয়ে দিয়েছে! "ওঃ, ওঃ।" প্রিন্স আবার আর্তনাদ করে উঠল; তারপর চুপ করল; একটা সিগারেট ধরিয়ে অন্য কিছু ভাবতে চেষ্টা করল; কি করে মেয়েকে টাকাটা পাঠাবে। অথচ তাকে নিজের কাছে আসতে দেবে না। কিন্তু স্মৃতির পাতা আবার খুলে গেল। মনে পড়ছে, বেশিদিন আগের কথা নয়—সে তখন বিশ পেরিয়ে গেছে—যেমন করেই হোক চোদ্দ বছরের একটি ছেলের সঙ্গে তার ভালবাসা হলো; ছেলেটি চাকর, গ্রামেব বাড়িতে আমাদেব সঙ্গে থাকত; ছেলেটিকে সে পাগল করে ছাড়ল; কত বাব সে কান্নায় ভেঙে পড়ত। মনে পড়ছে, সেই ভালবাসায় ইতি টানবার জন্য ছেলেটিকে যখন চলে যেতে বলা হলো, মেয়ে তখন কী নিবাসক্তভাবে, অত্যন্ত কঠোব ভাষায় কথা বলেছিল। সেই থেকে বাপ-মেয়ের সম্পর্ক সম্পূর্ণ ভেঙে গেল। কারণ মেয়ে ভেবেছিল যে তাকে অপমান করা হয়েছে।

মিখাইল আইভানভিচ ভাবল, "কাজটা আমি ঠিকই করেছিলাম। ওর স্বভাবই ছিল নির্লজ্জ, ঈর্ষাদুষ্ট।"

তারপর—মস্কো থেকে লেখা চিঠির সেই মর্মান্তিক স্মৃতি; লিখেছিল, সে বাড়ি ফিরতে পারবে না, সে ভাগ্যহীনা, তার সর্বনাশ হয়েছে, তাকে যেন আমরা ক্ষমা করি, ভুলে যাই। তখন স্ত্রীর সঙ্গে কত কথা হলো, কত জল্পনা-কল্পনা চলল; শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো, মেয়ে যখন ফিনল্যান্ডে তার মাসির বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল তখনই দুর্ভাগ্যের সূচনা হয়েছিল, আর যার সঙ্গে সে মজেছিল সে একটা সামান্য সুইডিশ ছাত্র, অপদার্থ, বিবাহিত।

ঘরময় পায়চারি করতে করতে এ সব কথাই এখন মনে পড়তে লাগল। মনে পড়ছে, শ্যালিকার কাছে সব কথা শুনে সে কল্পনা করতে চেষ্টা করেছিল কেমন করে মেয়েকে ক্ষমা করা যায়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল সেই হতভাগা ছাত্রটিব কথা, আর সঙ্গে সঙ্গে আতংক, বিরক্তি ও আহত অহংকারের অনুভূতিতে তার মন ভরে উঠেছিল। সে উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করে উঠেছিল. চেষ্টা করেছিল অন্য চিন্তায় মন দিতে।

"না, এ অসম্ভব। তার হাতে দেবার জন্য প্রতিমাসে পেতযাকেই টাকাটা দেব। আমার কোনও মেয়ে নেই. নেই..."

আবারও সেই একই মিশ্র অনুভূতি তাকে যন্ত্রণায় বিদ্ধ করতে লাগল : একদিকে মেয়ের প্রতি ভালবাসার স্মৃতি, অন্যদিকে এত কষ্ট তাকে দেওয়ার জন্য মেযেব প্রতি যন্ত্রণাদীর্ণ তিক্ততা।

২

পঁচিশ বছরে লিজার জীবনে যে অভিজ্ঞতা হযেছিল তার তুলনায় অনেক বেশি অভিজ্ঞতা হয়েছে সেই একটি বছরে। সেই বছবে জীবনেব পরিপূর্ণ শূন্যতা তাব কাছে হঠাৎ অত্যন্ত পরিষ্কাব হয়ে উঠেছে : সেন্ট পিতার্সবুর্গের ধনী সমাজে জীবনের সব নীচতা ও পাপ তার চোখে ধরা পড়েছে; সে সমাজে অন্য সকলের সঙ্গে সেও এক পশুর জীবন যাপন করেছে—যেখানে সকলেই তার রূপ-গুণেই আকৃষ্ট হযেছে, তার আত্মার গভীরতাকে স্পর্শ করেনি। প্রথম এক, দুই, তিন বছর ভালই লাগত। কিন্তু সাত-আট বছরে কেটে গেল পার্টি, বল-নাচ, গানেব আসব. নৈশভোজ, বল-গাউন, দৈহিক সৌন্দর্য ও কেশ-বিন্যাসেব প্রদর্শনী নিযে; যুবক ও বয়ঃপ্রাপ্ত প্রেমিকের দল ও তাদের খেয়ালখুসি নিয়ে। গ্রীষ্মকালে গ্রামে গিয়েও সেই একই পরিবেশ—সেখানেও জীবনের আপাত সুখেরই চর্চা। একই সঙ্গীত, একই পড়াশুনা—জীবন নিয়ে প্রশ্ন আছে, কিন্তু সমাধান নেই। সাত-আট বছর এই জীবন কাটিযে লিজা যখন দেখল এর কোনও পরিবর্তন নেই, শুধু তার আকর্ষণই ক্রমাগত কমে যাচ্ছে, তখন সে বেপরোয়া হয়ে উঠল, মৃত্যুর চিন্তা বাসা বাঁধল তার মাথায। বন্ধুরা জনকল্যাণে নেমে পড়ার পরামর্শ দিলো। কিন্তু দারিদ্র্য তাকে আকর্ষণ করল না; ববং জনসেবার নামে মহিলা কর্মীদের যে জাঁকজমক ও ভয়ংকব হৃদয়হীনতার অভিজ্ঞতা তার ছিল তা মনে করে সে শিউরে উঠল। সে চায় সত্য বস্তু, চায় জীবন, জীবন নিয়ে খেলা নয়, শুধু জীবনের সরটুকু নয়। চারিদিকে তাকিয়ে কোথাও সে জীবনের দেখা সে পেল না। সমর-শিক্ষার্থী কোকোর ভালবাসাই তার জীবনের শ্রেষ্ঠ স্মৃতি। কিন্তু সে রকমটি তো আর পাওয়া গেল না। তার মন ক্রমেই বিষণ্ণতায় ভরে উঠতে লাগল, আর সেই বিষণ্ণ মানসিকতা নিয়েই সে ফিনল্যান্ডে গেল মাসির বাড়ি বেড়াতে। নতুন পরিস্থিতি, নতুন পরিবেশ, নতুন মানুষ তার মনকে টানল।

কখন কি ভাবে ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল তা সে নিজেও বলতে পারে না। ছেলেটি তার কাজকর্ম, তার দেশের লোকজন ও নতুন সুইডিশ উপন্যাস নিয়ে কথা বলত। মেয়েটি নিজেই জানত না কখন শুরু হলো সেই চোখে-চোখে চাওয়া, সেই মিষ্টি-মধুর হাসি, যার অর্থ কখনও কথায় প্রকাশ করা যায় না, সব কথাকে পেরিয়ে যা অর্থবহ হয়ে ওঠে। সেই দৃষ্টি ও হাসির ভিতর দিয়ে তাদের হৃদয় পরস্পরের কাছে উন্মোচিত হলো; শুধু তাদের হৃদয় নয়, উন্মোচিত হলো সর্ব মানবের মহান ও গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয়তা। তাদের প্রতিটি কথা সেই হাসির স্পর্শে হয়ে উঠত অধিকতর পবিত্র ও অর্থময়। একত্রে গান শুনলে বা গাইলেও সে সঙ্গীত হয়ে উঠত অধিকতর অর্থময়।

তারপর সেই দৃষ্টি ও হাসির ভিতর থেকে কখন যে বেরিয়ে এল শয়তান, একযোগে তাদের দু'জনকে অধিকার করে বসল. মেয়েটি তাও জানত না; কিন্তু সে শয়তানকে যখন সে ভয় পেতে শুরু করল তখন এক অদৃশ্য বন্ধন তাদের দু'জনকেই পাকে পাকে বেঁধে ফেলেছে, সে-বন্ধনকে ছিঁড়বার শক্তি তার ছিল না, তখন একমাত্র ভরসা সেই ছেলেটি ও তার মহত্ত্ব।

আঁকড়ে ধববার মতো কোনও কিছু ছিল না বলেই তার যৎসামান্য প্রচেষ্টাও দুর্বল হয়ে দেখা দিলো। নিজের জাগতিক জীবন এবং তাব অসারতা ও মিথ্যায় সে তখন বীতশ্রদ্ধ। মাকে সে ভালবাসে না; বাবা তাকে ত্যাগ করেছে; সে নিজে একান্তভাবে চায় জীবনকে, জীবনের খেলাকে নয়। ভালবাসার মধ্যে, পুরুষের প্রতি নারীর পরিপূর্ণ ভালবাসার মধ্যেই সে-জীবনকে সে খুঁজে পেল! ছেলেটি তার সেই প্রার্থিত জীবনের প্রতীক। তার দীর্ঘ, সবল দেহ, তার শনের মতো চুল ও পাকানো গোঁফ অপ্রতিরোধ্য হাসির মধ্যেই সে খুঁজে পেল পৃথিবীর যা কিছু শ্রেষ্ঠ তারই প্রতিশ্রুতি। এদিকে, সেই হাসি ও দৃষ্টি, সেই অসম্ভবের আশা ও প্রতিশ্রুতি সেই অনিবার্য পরিণতির দিকেই তাকে ঠেলে দিলো যাকে সে ভয় করতে লাগল, অস্বস্তির সঙ্গে যাব জন্য সে অপেক্ষা করে রইল। আর সহসা যা কিছু ছিল আশ্চর্য, আত্মিক, আনন্দময় ও আশাময়, তাই হয়ে উঠল বিরক্তিকর, জান্তব, এবং বিষণ্ন না হলেও নিবাশায় ভরা।

মেয়েটি তখনও ছেলেটির চোখের দিকে তাকায়, হাসতে চেষ্টা করে, ভয় না পাবার ভান করতে চেষ্টা করে। কিন্তু অন্তরের গভীরে সে জানতে পেরেছে যে সব কিছু হারিয়ে গেছে : যা সে খুঁজেছে, যা তার ছিল ; যা কোকোর ছিল, তার কিছুই সে পায়নি। ছেলেটিকে বলল, বিয়ের অনুমতি চেয়ে বাবাকে চিঠি লেখো। ছেলেটি রাজী হলো। কিন্তু আবার যখন দেখা হলো তখন ছেলেটি জানালো যে এখনই সে চিঠি লিখতে পারছে না। তার চোখের দৃষ্টিতে ভীরুতা ও অস্পষ্টতা; মেয়েটি আরও সন্দিহান হয়ে উঠল। পরদিন ছেলেটি চিঠি লিখে জানালো, আগেই তার বিয়ে হয়েছে, অনেক দিন হলো স্ত্রী তাকে ছেড়ে গেছে, তার সব গেছে, সে অপরাধী, মেয়েটি যেন তাকে ক্ষমা করে।

ছেলেটিকে ডেকে সে বলল, ছেলেটি বিবাহিত হোক আর নাই হোক, সে তাকেই ভালবাসে, চিরদিনের মতো তার সঙ্গে বাঁধা পড়েছে, কখনও তাকে ছাড়তে পারবে না।

পরবর্তী সাক্ষাৎকারে ছেলেটি বলল, তার কিছুই নেই, তার বাবা-মা অত্যন্ত গরীব, অত্যন্ত দরিদ্র এক জীবন ছাড়া আর কিছুই তার দেবার নেই। মেয়েটি জবাব দিলো, তার কিছুই চাই না; ছেলেটি যেখানে যেতে বলবে এই মুহূর্তে সেখানে যেতেই সে প্রস্তুত।

ছেলেটি অনেক বোঝালো; তাকে অপেক্ষা করার পরামর্শ দিলো। মেয়েটি সম্মত হলো। কিন্তু এইভাবে বাড়ি থেকে পালিয়ে থাকা, মাঝে-মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ করা, আর গোপনে চিঠিপত্র লেখা—এ-জীবন মেয়েটির কাছে অসহ্য হয়ে উঠল; সে স্থির করল পালিয়ে যাবে।

মেযেটি সেন্ট পিতার্সবুর্গে আসার পরে ছেলেটি চিঠি লিখে কথা দিলো সেও অচিরেই এসে পড়বে, কিন্তু তারপর থেকেই চিঠি লেখাও বন্ধ করে দিলো। মেয়েটি পুরনো জীবনে ফিরে যেতে চাইল, পারল না। অসুস্থ হয়ে পড়ল। চিকিৎসা কবা সত্ত্বেও অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। যখন নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারল যে যা সে লুকোতে চাইছে তা লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়, তখনই সে আত্মহত্যাব সিদ্ধান্ত নিলো। কিন্তু কি ভাবে আত্মহত্যা করলে তার মৃত্যু স্বাভাবিক বলে মনে হবে? আত্মহত্যার সিদ্ধান্তে সে অবিচল; বিষ যোগাড় করল, গ্লাসে ঢালল, মুখেও দিতো, এমন সময় তার পাঁচ বছরেব ভাইপোটি ঠাকুরমার দেওয়া একটা খেলনা দেখাতে ছুটে এসে তার ঘরে ঢুকল। চমকে থেমে গিয়ে ছেলেটিকে কাছে টেনে নিয়ে হঠাৎ সে কেঁদে উঠল। ছেলেটি যদি বিবাহিত না হতো তাহলে তো সহজেই সেও মা হতে পারত, এই চিন্তা তার মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল; মাতৃত্বের ভাবনাই তাকে শক্তি যোগাল। অন্য সকলে তাকে কি মনে করবে, কি বলবে সে সব কিছু উপেক্ষা করবার শক্তি সে অর্জন করল; নিজেকে নিয়ে, নিজের সত্যিকারের জীবন নিয়ে ভাবনা শুরু করল। অন্যের মতামতের কথা ভেবে নিজেকে মেরে ফেলাটা সহজ মনে হয়েছিল, কিন্তু নিজের জন্যই নিজেকে মেরে ফেলা অসম্ভব। বিষ ও সেই সঙ্গে আত্মহত্যার সব চিন্তা সে মন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো; নিজেকে নিয়ে বাঁচতে শিখল। এ-জীবন বেদনাদায়ক, কিন্তু তবু এটা জীবন; এ-জীবন থেকে ছুটি নিতে সে চায না, পারবেও না। অনেক দিন হলো সে প্রার্থনা করা ছেড়ে দিয়েছিল, আবার প্রার্থনা শুরু করল, কিন্তু তাতেও সান্ত্বনা পেলো না। বুঝতে পারল, বাবার দুঃখ কষ্টের জন্য সেই দায়ী। বুঝল, এ দুঃখ চলতেই থাকবে; বাবার জন্য তার কষ্ট হলো। এইভাবে জীবনের কয়েকটা বছর কেটে গেল; এমন সময় অন্য সকলের অজান্তে, এমন কি তার নিজেরও প্রায় অজান্তে এমন কিছু ঘটল যার ফলে সঙ্গে সঙ্গেই তার জীবনটা সম্পূর্ণ

বদলে গেল। বসে কাজ করতে করতে—সে একটা ক্রচেটের সেলাই করছিল—হঠাৎ নিজের মধ্যেই নড়াচড়ার একটা অদ্ভুত অনুভূতি তার হলো।

"কিন্তু না, এ হতে পারে না।" সেলাই হাতে নিয়েই সে যেন জমে গেল। হঠাৎ সেই একই বিচিত্র নড়াচড়াটা সে বুঝতে পারল। এটা ছেলে না মেয়ে? সব কিছু ভুলে গিয়ে—ছেলেটির অবিচার ও মিথ্যাকথা, মায়ের খিটখিটে মেজাজ, বাবার দুঃখ—সব ভুলে একটা পরিচ্ছন্ন, সানন্দ, উজ্জ্বল হাসিতে তার মুখটা ঝল্‌মল্ করে উঠল।

নিজের সঙ্গে একেও তো সে মেরে ফেলত—এ-কথা ভাবতেই তার আতংক হলো; এখন তার একমাত্র চিন্তা হলো কেমন করে বাড়ি থেকে চলে যাবে, কেমন করে কোথায় গিয়ে মা হবে,—একটি অভাগিনী দুঃখিনী মা, তবু তো মা। ভেবেচিন্তে সব ঠিক কবে ফেলল; কোনও সুদূর শহরে গিয়ে বাস করার জন্য বাড়ি থেকে চলে গেল; ভাবল, সেখানে গেলেই পরিবারের কাছ থেকে অনেক দূরে থাকতে পারবে। কিন্তু সে তো ভাবতেও পারেনি যে তার কাকাও সেই শহরেই গভর্নর নিযুক্ত হয়ে এসেছে।

ধাত্রী মারিয়া আইভানভ্‌নাকে সঙ্গে নিয়ে চার মাস নির্জন বাসের পরে সে জানতে পারল তার কাকাও এই শহরেই এসেছে; সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোথাও, অনেক দূরে কোথাও যাবার জন্য সে তৈরি হতে লাগল।

৩

মিখাইল আইভানভিচ ভোরে ঘুম থেকে উঠল, আর যে টাকাটা প্রতি মাসে মেয়েকে দিতে ভাইকে বলেছিল সেই অংকের একটা চেক নিয়ে সকালেই ভাইয়ের আপিসে গেল। তারপরই সেন্ট পিতার্সবুর্গ যাবার এক্সপ্রেস ট্রেনের খোঁজ করল। ট্রেন ছাড়বে সন্ধ্যা সাতটায়; যাত্রার আগে তাড়াতাড়ি ডিনার খেয়ে নেবার সময় পাওয়া যাবে। ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে প্রাতরাশ সেরে মিখাইল আইভানভিচ অভ্যাসমতো প্রাত্যহিক ভ্রমণে বের হলো। আলেক্সান্দ্রা দিমিত্রিয়েভ্‌না ফটক পর্যন্ত তার সঙ্গে গেল।

বিষণ্ণ চোখে ভাশুরের ক্রুদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'টাউন পার্কের ভিতর দিয়েই হাঁটবেন মিচেল; বেড়াবার পক্ষে চমৎকার জায়গা, আর সব কিছুই কাছাকাছি পাবেন।"

মিখাইল আইভানভিচ তার পরামর্শ মতো টাউন পার্কেই চলল; যেতে যেতে নারীজাতির নির্বুদ্ধিতা, একগুঁয়েমী, ও হৃদয়হীনতার কথাই ভাবতে লাগল। ভ্রাতৃবধূর কথা ভেবে মনে মনে বলল, "সে তো আমার জন্য দুঃখিত নয়। আমার যন্ত্রণাও সে বুঝতে পারে না। আর সে?" মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল। "সে তো জানে আমার পক্ষে এ কত বড় যন্ত্রণা। জীবনের শেষে এ কী ভয়ংকর আঘাত; এ জীবনকে তো

সেই শেষ করে দেবে। এ যন্ত্রণা সহ্য করার চাইতে শেষ হয়ে যাওয়াই ভাল। আর এ সবই সেই নিষ্কর্মা ছেলেটার সুন্দর চোখের খেসারত।" সে সোচ্চারে আর্তনাদ করে উঠল। সব কথা জানবার পরে শহরের লোকরা এখন কি বলবে এই চিন্তা ঘৃণায় ও বিদ্বেষে তার মনকে এতই জর্জরিত করে তুলল যে, মেয়ে যাতে তার কৃতকর্মের পুরো অর্থটা বুঝতে পারে সে জন্য সব কথা তাকে খুলে বলবার ইচ্ছা তার মনে জাগল। "ওরা কিছুই বোঝে না!"

"সবই তো কাছাকাছি," কথাটা মনে হতেই সে নোট-বইটা বের করে ঠিকানাটা পড়ল; "কুখন্নায়া স্ট্রীট, আব্রামায়ভ-এর বাড়ি, ভেরা আইভানভ্না সেলিভার্স্তোভা।" এই নামে সে এখন বাস করছে। পার্ক থেকে বেরিয়ে একটা গাড়ি ডাকল।

খাড়া সিঁড়িটার মুখে ঢুকতেই ধাত্রী মারিয়া আইভান্ভনা জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কাকে খুঁজছেন?"

"মাদাম সেলিভার্স্তোভা এখানে থাকে?"

"ভেরা আইভান্ভনা? এখানেই থাকেন। এইমাত্র দোকানে গেছেন; এখনই ফিরে আসবেন।"

মারিয়া আইভানভ্নার সঙ্গে মিখাইল আইভানভিচ ছোট বসবার ঘরে ঢুকল। পাশের ঘর থেকে একটি শিশুর কান্না ভেসে এল; সেই বিরক্তিকর কান্না ছুরির মতো তার বুকে বিঁধল।

মাপ চেয়ে নিয়ে মারিয়া আইভানভ্না পাশের ঘরে গিয়ে ছেলেকে শান্ত করতে চেষ্টা করল। ছেলে শান্ত হলে সে ফিরে এল।

"তারই বাচ্চা। তিনি এখনই এসে পড়বেন। আপনি কে?"

"পরিচিত লোক। আমি বরং একটু পরে আসব," বলে মিখাইল আইভানভিচ উঠতে যাচ্ছিলো। মেয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করা তার পক্ষে খুবই কষ্টকর; সে বুঝতে পারছে কোনও কৈফিয়ৎ দেওয়াই অসম্ভব।

মুখটা ঘুরিয়ে পা বাড়াবে এমন সময় আলো দেখা গেল, সিঁড়িতে দ্রুত পায়ের শব্দ; লিজার গলা সে চিনতে পারল।

"মারিয়া আইভানভ্না! আমি চলে গেলে ও কাঁদেনি তো...কিন্তু আমি..."

হঠাৎ সে বাবাকে দেখতে পেল। হাতের থলেটা পড়ে গেল।

"বাপি?" সে চিৎকার করে উঠল; কাঁপতে কাঁপতে মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখে সে দরজাযই দাঁড়িয়ে রইল।

বাবা একটুও না সরে মেয়ের দিকে তাকালো। শরীর শুকিয়ে গেছে, চোখ দুটো আরও বড় বড় হয়েছে, নাকটা আরও তীক্ষ্ণ, হাত দুটি কাঠিকাঠি। কি বলবে, কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। নিজের সব লজ্জার কথা ভুলে গেল —মনে জাগল শুধুই করুণা—তার শুকনো চেহারা, দরিদ্র বেশবাস, দুটি স্থির সকরুণ চোখের জন্য করুণা।

বাবার দিকে এগিয়ে গিয়ে মেয়ে বলল, "বাপি, আমাকে ক্ষমা করো।"

"আমাকে...আমাকে ক্ষমা করো", বলতে বলতে বাবা ছোট শিশুব মতো চোখের জলে মেয়ের মুখ ও হাত ভিজিয়ে চুমোয় চুমোয় তার মুখ ও হাতকে ভরে দিতে লাগল।

মেয়ের প্রতি করুণার আলোয় সে যেন নিজেকে নতুন করে চিনল। আর নিজেকে চিনতে পেরেই সে বুঝতে পারল, মেয়ের প্রতি সে অবিচাব করেছে : অবিচাব করেছে অহংকাবে, উপেক্ষায় ও বিদ্বেষে। এই অপরাধবোধে সে খুসিই হলো, কারণ এখন আর ক্ষমা কবার প্রশ্নই নেই, বরং তার নিজেরই ক্ষমা পাওয়া দরকাব।

মেয়ে তাকে নিজেব ঘরে নিয়ে গেল, কি ভাবে তার জীবন কাটছে তা বলল, কিন্তু ছেলেকে দেখালো না; আব বাবা দুঃখ পাবে মনে কবে অতীতের কোনও কথাই বলল না। বাবা বলল, "তাকে অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে হবে।"

মেয়ে বলল, "হ্যাঁ, গ্রামে হলেই ভাল হয়।"

সে বলল, "বেশ, ভাল করে ভেবে দেখো।"

এমন সময় দরজাব ওপাশে শিশুটি কাঁদতে শুরু করে দিলো। লিজা চোখ বড় বড় করে তাকালো; বাবার উপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যেন জমাট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"আবে, ওকে যে খাওয়াতে হবে", মিখাইল আইভানভিচ বলল; মনের সংঘাত স্পষ্ট ফুটে উঠল তার কুঞ্চিত ভুরুতে।

মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। হঠাৎ তার মনে একটা যুক্তিহীন বাসনা জাগল—যাকে সে এতদিন ভালবেসেছে, পৃথিবীর অন্য সব কিছু অপেক্ষা যাকে সে বেশি ভালবাসে, তাকে সে দেখাবে তাব বাবাকে। কিন্তু সে বাসনার কথা বলবার আগে সে বাবার মুখের দিকে তাকাল। সে কি রাগ করবে?

তার বাবার চোখে তখন ফুটে উঠেছে ক্রোধ নয়, যন্ত্রণা।

সে বলল, "হ্যাঁ, যাও, যাও। ঈশ্বব মঙ্গলময়। হ্যাঁ, কাল আমি আবার আসব, তারপর সব স্থির হবে। বিদায় লক্ষ্মীটি। হ্যাঁ, বিদায।" তার গলা আটকে এল। অনেক কষ্টে সেটা সে চেপে গেল।

মিখাইল আইভানভিচ যখন ভাইয়ের বাড়িতে ফিবে গেল, তখন আলেক্সান্দ্রা দিমিত্রিয়েভ্না সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল :

"তারপর?"

"কিছু না।"

"দেখলেন?" মুখ দেখেই একটা কিছু ঘটেছে অনুমান করে ভ্রাতৃবধূ শুধালো।

"হ্যাঁ, সে আচমকা জবাবটা দিয়েই কেঁদে উঠল। নিজেকে সংযত করে আবার বলল, "হ্যাঁ; আমিই নির্বোধ হয়েছি, বুড়ো হয়েছি।"

"না—জ্ঞানী; খুব জ্ঞানী।"

মিখাইল আইভানভিচ মেয়েকে ক্ষমা করল—সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা কবল, আব ক্ষমা করতে গিয়ে নিজেব সুনামের সব চিন্তাকে জয় কবল। আলেক্সান্দ্রা দিমিত্রযেভ্‌নার এক বোনের কাছে মেয়েকে গ্রামে বাখবাব ব্যবস্থা করল, মাঝেমাঝেই তার সঙ্গে দেখা করতে যেতে লাগল, তাকে ভালবাসল, আগেব চাইতেও অনেক বেশি ভালবাসল। শিশুটিকে সে কিন্তু এড়িয়েই চলল, তাব প্রতি বিরক্তি ও ঘৃণাব মনোভাবকে সে কিছুতেই জয় কবতে পাবল না। আব মেয়েব কাছে সেটাই হয়ে রইল এক স্থায়ী দুঃখ।

রচনা—১৯০৬

কেন?

Why?

১

১৮৩০-এর বসন্তকালে ইযাচেভ্‌স্কি নামক জনৈক পোলিশ ভদ্রলোকেব গ্রামেব জমিদারি বোঝাংকা-তে বেড়াতে এল তার পবলোকগত বন্ধুব একমাত্র পুত্র যুবক আইওসিফ মিগুর্স্কি। ইয়াচেভ্‌স্কিব বযস পঁয়ষট্টি বছব, চওড়া ভুরু, চওড়া কাঁধ, চওড়া বুক বৃদ্ধ লোকটির ইট-লাল মুখে লম্বা সাদা দাড়িব শোভা। পোল্যান্ডেব দ্বিতীয় অঙ্গচ্ছেদের সময থেকেই সে একজন দেশপ্রেমিক বীব। যৌবনে কোশ্চিযুজ্‌কো-র পতাকাতলে মিগুর্স্কির বাবার সঙ্গে সে যুদ্ধ কবেছে; দ্বিতীয ক্যাথাবিন যাকে সে বলত বহস্যময়ী ব্যভিচাবিণী আব তাব বিশ্বাসঘাতক প্রেমিক পোনিয়াতোস্কিকে সে ঘৃণা করত দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত মনের প্রেরণায়। রাতেব পবে আবাব সূর্য উঠবে এই বিশ্বাসে সে যতখানি দৃঢপ্রত্যয়, ঠিক সেই প্রত্যযেব সঙ্গেই সে পোলিশ বাষ্ট্রেব পুনঃপ্রতিষ্ঠায বিশ্বাস করত। ১৮১২-তে নেপোলিযনেব সেনাবাহিনীব একটা রেজিমেন্ট পরিচালনাব ভাব ছিল তাব হাতে। নেপোলিযনকে সে পূজা কবত। নেপোলিয়নেব পতনে সে দুঃখিত হযেছে, কিন্তু একটি পোলিশ রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠায বিশ্বাস হারায়নি, সে রাষ্ট্র হযতো হবে খণ্ডিত, কিন্তু তবু একটা পোলিশ বাষ্ট্র তো বটে। প্রথম আলেক্সান্দার যখন ওয়ার্‌স-তে "ডায়েট"-এর উদ্বোধন কবল তখন তার মনে নতুন করে আশা জেগেছিল, কিন্তু "পবিত্র মৈত্রী", সমগ্র ইয়োরোপের বিরূপতা, আব কনস্তান্তিন-এর নির্বুদ্ধিতার ফলে তার মনের গোপন বাসনার রূপায়ন বিলম্বিত

হলো। ১৮২৫-এ ইয়াচেভ্স্কি গ্রামে গিয়ে বসবাস শুরু করল; আর কখনও রোঝাংকা ছেড়ে কোথাও গেল না; চাষবাস, শিকার এবং খবরের কাগজ ও চিঠিপত্র পড়েই সময় কাটাতে লাগল; পড়াশুনার ভিতর দিয়েই একান্ত আগ্রহের সঙ্গে নিজের দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে পরিচয় রেখে চলল।

একটি গরীব কিন্তু সুন্দরী পোলিশ ভদ্রমহিলার সঙ্গে তার দ্বিতীয়বার বিয়ে হলো, কিন্তু সে বিয়ে সুখের হলো না। দ্বিতীয়া স্ত্রীকে সে না পারল ভালবাসতে, না পারল শ্রদ্ধা করতে। মহিলাটি তাকে বিরক্ত করত, আর সেও তার প্রতি কঠোর, নির্দয় ব্যবহার করত; বুঝিবা পুনরায় বিয়ে করার ভুলের জন্য প্রতিহিংসাবশতই সে এ রকম করত। তার দ্বিতীয়া স্ত্রীর কোনও সন্তান হয়নি, কিন্তু প্রথমা স্ত্রীর দুটি মেয়ে ছিল। বড়টির নাম ওয়ান্দা; পরমা সুন্দরী—নিজের রূপ সম্পর্কে খুবই সচেতন; গ্রামে থাকতে তার ভাল লাগত না। ছোট আল্‌বিনা বাবার খুব আদরের; চটপটে ছোট্ট মেয়েটি; কোঁকড়া চুল, বাবার মতোই বড় বড় ঝকঝকে দুটি নীল চোখ।

আইওসিফ মিগুর্স্কি যখন এল আল্‌বিনা তখন পঞ্চদশী। ছাত্রাবস্থায় মিগুর্স্কি আগেও ইয়াচেভ্স্কির বাড়িতে বেড়াতে এসেছে; তখন তারা ভিল্‌নিয়াসে শীতকালটা কাটাতো। মিগুর্স্কি তখন ওয়ান্দার সঙ্গে পূর্বরাগ চালাতো। একটি পূর্ণ যুবক হয়ে বড় হয়ে উঠবার পরে এই প্রথম সে তাদের বাড়িতে এল। মিগুর্স্কির আগমনে রোঝাংকার অধিবাসীরা সকলেই খুসি। বুড়ো মানুষটি খুসি হয়েছে কারণ ছেলেটির বাবার কথা, যৌবনে দু'জনের একত্র কাটাবার কথা তার মনে পড়েছে, তাছাড়া যুবকটি উৎসাহ ও আশার সঙ্গে শুধু পোল্যান্ডের নয়, বিদেশের বৈপ্লবিক ধ্যান-ধারণা নিয়েও অনেক কথা বলেছে। লেডি ইয়াচেভ্স্কি খুসি হয়েছে, কারণ বুড়ো ইয়াচেভ্স্কি অন্য সকলের সামনে যেভাবে তাকে বকাঝকা করে থাকে এই অতিথিটির সামনে সে রকম না করে বেশ সংযতভাবেই রয়েছে। ওয়ান্দা খুসি হয়েছে কারণ তার ধারণা মিগুর্স্কি তার জন্যই এসেছে, আর শীঘ্রই বিয়ের প্রস্তাব করবে; যদিও সে সম্মতি জানাতেই প্রস্তুত, তবু ঠিক করে রেখেছে তাকে একটু "ঝুলিয়ে" রাখবে। আল্‌বিনা সুখী হয়েছে কারণ অন্য সকলেই খুসি হয়েছে। মিগুর্স্কি যে তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করতে এসেছে এ ধারণা শুধু ওয়ান্দার একার নয়, বুড়ো ইয়াচেভ্স্কি থেকে শুরু করে নার্স লুদ্‌ভিকা পর্যন্ত সকলেরই তাই ধারণা, যদিও মুখে কেউই সে কথা বলেনি।

আর কথাটাও সত্যি। মিগুর্স্কি সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছিল, কিন্তু এক সপ্তাহ কাটাবার পরে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত বোধ করে বিয়ের প্রস্তাব না করেই সে ফিরে গেল। তার এই অপ্রত্যাশিত বিদায়ে সকলেই অবাক হয়ে গেল; একমাত্র আল্‌বিনাই তার কারণটা বুঝতে পারল। আল্‌বিনা জানতো, যুবকটির এই অদ্ভুতভাবে চলে যাওয়ার কারণ সে নিজে। সে লক্ষ্য করেছে, যতদিন মিগুর্স্কি রোঝাংকাতে ছিল ততদিন একমাত্র তার সঙ্গে থাকলেই সে প্রাণবন্ত ও খুসি হয়ে উঠত। সে তার সঙ্গে ছোট

মেয়েটির মতো ব্যবহার করত, তার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা কবত, তাকে ক্ষেপাত, কিন্তু নারীর সহজাত বুদ্ধিবলেই সে বুঝতে পারত যে তার এ সব ব্যবহারই নারীর প্রতি পুরুষের ব্যবহাবের প্রতীক, একটি শিশুব প্রতি একজন বয়স্ক লোকের ব্যবহার নয়। সে ঘরে ঢুকলেই যে প্রশংসার দৃষ্টি ও অনুবাগের হাসি নিয়ে যুবকটি তাকে অভ্যর্থনা জানাতো তাতেই এ সত্য সে উপলব্ধি কবতে পেরেছিল। যদিও এ সবেব অর্থ সে পুরোপুবি বুঝত না, তবু তার প্রতি যুবকটিব ব্যবহার তাকে খুসি কবত, যুবকটি যাতে খুসি হয় সেও নিজের অজ্ঞাতে তাই কবতে সচেষ্ট হতো। মেয়েটি যা কিছু করত তাতেই যুবকটি খুসি হতো। মস্তবড় শিকারী কুকুরটার সঙ্গে সে যেভাবে ছুটত, যেভাবে কুকুরটা লাফিয়ে উঠে তার গোলাপী গাল চেটে দিতো, তাই যুবকটিব ভাল লাগত; সামান্য কারণেই মেয়েটি যখন উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়ত তাও যুবকটিব ভাল লাগত; পুরোহিতের একঘেয়ে বাণী-বিতবণের সময় সে যখন মুখখানাকে গম্ভীব করে সব শুনত তাও যুবকটির ভাল লাগত; অসাধাবণ দক্ষতা ও বসিকতাব সঙ্গে সে যখন প্রথমে বুড়ি নার্সেব, পরে একজন মাতাল প্রতিবেশীব, পবে স্বয়ং মিগুর্স্কিব নকল করত, তখন তাও যুবকটিব ভাল লাগত। তার সবচাইতে ভাল লাগত আল্‌বিনার উচ্ছ্বসিত স্ফূর্তি; যেন সবেমাত্র জীবনেব আনন্দকে আবিস্কাব কবে তাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে সে ব্যগ্র। আল্‌বিনার এই বিশেষ স্ফূর্তিব ভাবটাকে মিগুর্স্কি পছন্দ করত, আর তা জানত বলেই মেয়েটিও বেশি করে সেই ভাবটা দেখাতে চেষ্টা করত।

সুতরাং কেন যে মিগুর্স্কি ওয়ান্দার কাছে বিয়ের প্রস্তাব কবতে এসে তা না করেই ফিরে গেছে একমাত্র আল্‌বিনাই তা জানত। যদিও কথাটা কাউকে বলা উচিত কি না তা সে বুঝতে পারছে না, এবং স্পষ্ট করে কাউকে কিছু বলেওনি, এমন কি নিজেকেও না, তবু অন্তরের অন্তস্থলে সে জানত যে মিগুর্স্কি তার দিদির সঙ্গে প্রেম করতে চাইলেও আসলে সে তারই প্রেমে পড়ে গেছে। এতে সে খুবই অবাক হয়ে গেছে, কাবণ কুশলী, রুচিশীলা, সুন্দবী ওয়ান্দাব তুলনায় নিজেকে সে খুবই তুচ্ছ মনে করে; তবু সে জানে যে এটাই সত্য, আব তাতেই সে খুসি, কারণ সে নিজেও সমস্ত অন্তর দিয়ে মিগুর্স্কিকে ভালবাসে—এ ভালবাসা মানুষ শুধু প্রথমবাবই বাসতে পারে, সমস্ত জীবনে মাত্র একবারই বাসতে পারে।

২

গ্রীষ্মকালের শেষে খবরের কাগজ বয়ে আনল প্যারিস বিপ্লবের সংবাদ। তারপরেই খবর এল, ওয়ার্সতেও বিপ্লবের প্রস্তুতি চলছে। আশা ও আশংকার সঙ্গে ইয়াচেভ্স্কি প্রতিটি ডাকের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল, কবে আসবে জয় কন্‌স্তান্তিন-এর হত্যা ও বিপ্লবের সূচনার খবর। অবশেষে নভেম্বর মাসে রোমাঞ্চকায়

প্রথমে এল রাজপ্রাসাদ আক্রমণ ও জারের পলায়নের খবর, এবং তার পরে এল রোমানভ বংশের উদ্দেশ্যে "ডায়েট"-এর ঘোষণা—পোল্যাণ্ডের সিংহাসন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, ক্লপিকি-কে ডিক্টেটর বলে ঘোষণা করা হয়েছে, এবং পোলিশ জনগণ আবার মুক্তিলাভ করেছে। বিদ্রোহ তখনও রোঝাংকায় এসে পৌঁছেনি, কিন্তু এখনকার অধিবাসীরা সেদিকে লক্ষ্য রেখে চলেছে। তার জন্য অপেক্ষা করে আছে, নিজেদের প্রস্তুত করছে। বুড়ো ইয়াচেভ্স্কি বিদ্রোহের একজন পূর্বপরিচিত নেতার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে, কৃষিসংক্রান্ত ব্যাপারের পরিবর্তে বিপ্লবসংক্রান্ত ব্যাপারে রহস্যজনক ইহুদি লোকজনের সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎ ঘটছে, এবং যথাসময়ে বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছে। লেডি ইয়াচেভ্স্কি স্বামীর আরাম-আয়েসের জন্য আগের চাইতেও বেশি করে সোরগোল তুলছে; ফলে স্বামী আরও বেশি বিরক্ত হচ্ছে। ওয়ান্দা তার সব হীরে-জহরৎ ওয়ার্সতে এক বান্ধবীর কাছে পাঠিয়ে তাকে নির্দেশ দিলো, সেগুলো বেচে যে টাকা পাওয়া যাবে তা যেন বিপ্লবী সমিতিকে দিয়ে দেওয়া হয়। এ সময় মিগুর্স্কি কি করছে সেটাই আল্‌বিনার একমাত্র চিন্তা। বাবার কাছ থেকে সে জেনেছে যে মিগুর্স্কি দিভাবনিৎস্কির দলে যোগ দিয়েছে; তাই সেই দলের সব খবরাখবর জানতে সে সাধ্যমতো চেষ্টা করছে। মিগুর্স্কি দু'বার চিঠি লিখেছে। একবার জানিয়েছে, সে সেনাদলে যোগ দিয়েছে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি দ্বিতীয়বার লিখেছে স্তোচেক-এর কাছে পোল্‌দের জয়লাভ প্রসঙ্গে একটা উচ্ছ্বাসপূর্ণ চিঠি: সেখানে পোল্‌রা অনেক বন্দী ও ছ'টি রুশ কামান দখল করে নিয়েছে। চিঠির উপসংহারে লিখেছে, "পোলদের জয় হোক! মস্কোওয়ালা মুর্দাবাদ! জিন্দাবাদ!" আলবিনারও খুসির অন্ত নেই: সে সব সময় ম্যাপ দেখে, মস্কোওয়ালারা কবে কোথায় চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করবে তার হিসাব করে, বাবা যতবার ডাকের বাণ্ডিল খোলে ততবারই ভয়ে কাঁপতে থাকে। একবার তার সৎ-মা ঘরে ঢুকে দেখে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মেয়ে ট্রাউজার ও পোলিশ বিপ্লবীদের টুপি পরবার চেষ্টা করছে। আল্‌বিনা মতলব এঁটেছে, পোলিশ বাহিনীতে যোগ দেবার জন্য পুরুষের বেশে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবে। সৎ-মা সে কথা বাবাকে জানালো, আর বাবাও মেয়ের প্রতি সহানুভূতি (এমন কি খুসি) গোপন রেখে একটা কড়া বক্তৃতা দিয়ে তাকে জানিয়ে দিলো যে ও সব বাজে মতলব মাথায় রাখা চলবে না।

বলল, "মেয়েদের অন্য ভূমিকা আছে : পিতৃভূমির জন্য যারা ত্যাগ স্বীকার করছে তাদের ভালবাসা, তাদের জন্য আরামের ব্যবস্থা করাই মেয়েদের কাজ।" নিজের আরাম ও আনন্দের জন্য মেয়েকে এখন তার নিজেরই দরকার; এরপর একটা সময় আসবে যখন অনুরূপভাবেই তাকে দরকার হবে তার স্বামীর। মেয়ে কিসে প্রভাবিত হবে বাবা সেটা ভালই জানে। তাই সে মেয়েকে বলল, সে বড় একা, বড় দুঃখী; বলেই সে মেয়েকে চুমো খেলো। বাবার মুখে মুখ চেপে ধরে সে চোখের জল গোপন

করল; তবু তার চোখের জলে বাবার ড্রেসিং গাউন ভিজে গেল; সে কথা দিলো, বাবার অনুমতি ছাড়া সে কোনও কাজ করবে না।

৩

পোল্যান্ডের অঙ্গচ্ছেদের পরে ঘৃণ্য জার্মানদের শাসনে তার এক অংশের মানুষ এবং ততোধিক ঘৃণ্য মস্কোওয়ালাদের শাসনে তার অন্য অংশের মানুষদের অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাই আগেকার কয়েকটা ব্যর্থ প্রচেষ্টার পরে ১৮৩০ ও ১৮৩১-এ যখন মুক্তির আশা নতুন করে তাদেব সামনে দেখা দিলো তখন তাদের মনে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগল তা একমাত্র পোল্যান্ডবাসীদের পক্ষেই বোঝা সম্ভব। কিন্তু সে আশা বেশিদিন টিকল না। তাদের শক্তি বড়ই সীমিত, তাই বিপ্লবকে আবারও ধ্বংস করা হলো। পুনরায় হাজার হাজার অন্ধভাবে বিশ্বস্ত রুশকে পোল্যান্ডে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো, এবং কেন তারা এ কাজ করছে তা না জেনেই দিবিচ-এর (তখন পাস্কেভিচ) নেতৃত্বে ও প্রথম নিকোলাইয়ের সর্বাধিনায়কত্বে তারা নিজেদের ও পোলিশ ভাইদের বক্তে পৃথিবীর মাটি ধুইযে দিলো, পোলদের ধ্বংস করল, এবং আর একবার পোল্যান্ডেব মানুষকে সেই সব দুর্বল ও তুচ্ছ লোকদেব শাসনাধীনে ঠেলে দিলো যারা পোলদের মুক্তি যেমন চায় না, তেমনই তাদের পদানত করেও রাখতে চায় না,—যারা চায় শুধু নিজেদের অর্থলোভ আর ছেলেমানুষী অহংকারকে পরিতৃপ্ত করতে।

ওয়ার্স দখল করা হলো; বিভিন্ন দলকে পর্যুদস্ত করা হলো। শত শত, হাজার হাজার লোককে গুলি করে মারা হলো, নির্দযভাবে পিটুনি দেওযা হলো, দেশ থেকে নির্বাসিত করা হলো। মিগুর্স্কিও সেই নির্বাসিতদের অন্যতম। তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলো। আর একজন সাধারণ সৈনিক রূপে তাকে উরালস্ক-এর সীমান্ত বাহিনীতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

১৮৩২-এর শীতকালে বৃদ্ধ লোকটির স্বাস্থ্যোদ্ধারেব জন্য ইয়াচেভ্স্কি পরিবার ভিল্‌নিয়াস-এ চলে গেল; ১৮৩১-এর পর থেকেই সে হৃদ্‌যন্ত্রের রোগে ভুগছিল। সেখানেই তারা মিগুর্স্কির কাছ থেকে একটা চিঠি পেল। সে লিখল, যে কষ্ট সে সহ্য করেছে তা যত কঠোরই হোক, ভবিষ্যতে তাব কপালে যাই ঘটুক, পিতৃভূমির জন্য সে-কষ্ট সহ্য করবার সুযোগ পেয়ে সে খুসি হয়েছে; যে পবিত্র কর্তব্য পালনে সে জীবনের এক অংশ কাটিয়েছে এবং বাকি অংশও কাটাতে প্রস্তুত, সে বিষয়ে তার মনে কোনও নৈরাশ্য নেই; কাল যদি নতুন করে সুযোগ আসে তাহলে পুনরায় ঐ একই কাজ সে করবে। বুড়ো মানুষটি গলা ছেড়ে চিঠিটা পড়তে পড়তে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, পড়া শেষ করতে পারল না। ওয়ান্দা বাকিটা পড়ল; মিগুর্স্কি লিখেছে, সে যখন শেষ বারের মতো ইয়াচেভ্স্কির বাড়ি গিয়েছিল—সেই দিনগুলিই হয়ে

থাকবে তার জীবনের উজ্জ্বলতম মুহূর্ত—তখন তার স্বপ্ন ও পরিকল্পনা যাই থাকুক না কেন, সে সব কথা এখন আর সে তাদের বলতে পারবে না, আর বলতে চায়ও না।

ওয়ান্দা ও আল্‌বিনা ভিন্ন ভিন্নভাবে এই কথাগুলির ব্যাখ্যা করল, এবং কেউ তার মনের কথা অপরকে বলল না। চিঠিতে বাড়ির সকলকেই শুভেচ্ছা জানিয়ে মিগুর্স্কি আগেকার মতোই ঠাট্টা-তামাসার ভঙ্গিতে জানতে চেয়েছে, আল্‌বিনা এখনও আগের মতোই কুকুরটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়য় কি না, এবং এখনও সেই রকমভাবেই সকলকে নকল করে কি না। সব শেষে সে কামনা করেছে বৃদ্ধের স্বাস্থ্য, খামারের কাজে মায়ের সাফল্য, ওয়ান্দার জন্য একটি ভাল বর, আর আল্‌বিনার জন্য আগেকার মতোই হাসিখুসি জীবন।

৪

বুড়ো ইয়াচেভ্‌স্কির স্বাস্থ্য ক্রমেই খারাপ হতে লাগল; ১৮৩৩-এ গোটা পরিবারই বিদেশে চলে গেল। বাদেন বাদেন-এ একজন প্রবাসী ধনী পোলিশের সঙ্গে ওয়ান্দার পরিচয় হলো; তাকেই সে বিয়ে করল। বুড়োর রোগের দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগল এবং ১৮৩৩-এর গোড়াতেই আল্‌বিনার কোলে মাথা রেখে সে মারা গেল। সে স্ত্রীকে কোনও রকম সেবাযত্ন করতে দিতো না; তাকে বিয়ে করে যে ভুল সে করেছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও তা সে ক্ষমা করতে পারেনি। লেডি ইয়াচেভ্‌স্কি আল্‌বিনাকে নিয়ে দেশে ফিরে গেল।

এখনও আল্‌বিনার জীবনে মিগুর্স্কিই প্রধান আকর্ষণ। তার চোখে সে একজন মহাবীর ও শহীদ; তার কাছেই সে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছে। বিদেশে যাবার আগে থেকেই সে তাকে চিঠিপত্র লিখতে শুরু করেছিল; প্রথমে বাবার নির্দেশমতো, পরে নিজের তাগিদে। বাবার মৃত্যুর পরে রাশিয়াতে ফিরে এসে সে নতুন করে চিঠিপত্র লিখতে শুরু করল, এবং আঠারো বছর বয়স হতেই সৎ-মাকে জানিয়ে দিলো যে উরাল্‌স্ক-এ গিয়ে সে মিগুর্স্কির সঙ্গে দেখা করবে এবং সেখানেই তাকে বিয়ে করবে। এ কথার জবাবে সৎ-মা মিগুর্স্কিকেই দোষী সাব্যস্ত করল; তার অভিযোগ, স্বার্থপর মিগুর্স্কিই একটি ধনী তরুণীকে ভুলিয়ে নিজের দুরবস্থার উন্নতি করতে এবং মেয়েটিকে তার দুঃখের ভাগীদার করতে চায়। আল্‌বিনা খুব রেগে গেল; বলল, যে মানুষটি তার দেশের লোকদের জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছে এবং তার দেওয়া সব রকম সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেছে, তার সম্পর্কে এ-ধরনের নীচ চিন্তা একমাত্র তার সৎ-মার পক্ষেই সম্ভব। আল্‌বিনা আরও বলল, মিগুর্স্কির কাছে গিয়ে তাকে বিয়ে করতে সে স্থিরসংকল্প, শুধু মিগুর্স্কি তাকে সেটুকু আনন্দ দিতে রাজী থাকলেই হলো। আল্‌বিনার বয়স হয়েছে, আর তার টাকাও আছে—তার

পরলোকগত কাকা দুই ভাইঝির জন্য তিন লক্ষ জলতি (জলতি=ফ্রাঁ) রেখে গেছে। কাজেই তাকে কেউ আটকাতে পারবে না।

১৮৩৩-এর নভেম্বর মাসে আলবিনা বাড়িব সকলেব কাছ থেকে বিদায় নিল। রাশিযার এক বহুদূরবর্তী অজ্ঞাত অসভ্য অঞ্চলে যাত্রার প্রাক্কালে চোখের জলে ভেসে সকলে তাকে বিদায় দিলো—যেন সে যাত্রা করছে মৃত্যুর পথে। বাবার পুরনো স্লেজটাকেই ভ্রমণেব উপযোগী করে নিয়ে তাতে চড়ে বসল; পুরনো বিশ্বস্ত নার্স লুদ্‌ভিকাকে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘ পথ-ভ্রমণে যাত্রা কবল।

৫

মিগুর্স্কিকে সেনা-বাবিকে থাকতে বাধ্য করা হযনি; নিজস্ব বাসা দেওয়া হযেছে। জা'ব নিকোলাই-ব নির্দেশে নির্বাসিত পোলদেব শুধু যে কঠোব সৈনিক জীবনেব সব বকম দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে তাই নয়, সাধাবণ সৈনিকদের মতোই সব রকম লাঞ্ছনা-গঞ্জনাও তাদের সইতে হয। যাই হোক, যে সব সবল মানুষদেব জাবেব এই নির্দেশ পালন কবাব কথা তাদেব মধ্যে অনেকেই এই সব পদচ্যুত অফিসারদেব দুঃখকষ্ট বুঝত, আব তাই যথেষ্ট ঝুঁকি নিযেও সম্ভব হলেই জাবেব নির্দেশকে লংঘন করত। সাধাবণ সৈনিকের পদ থেকে উন্নীত অর্ধ-শিক্ষিত ব্যাটেলিযন কম্যান্ডাবটি এই একদা ধনী, সংস্কৃতিবান যুবক মিগুর্স্কির অবস্থা ভাল কবেই বুঝতে পারত, সব কিছু থেকে বঞ্চিত এই যুবকটির প্রতি করুণা ও শ্রদ্ধাবশত সে মিগুর্স্কিকে সববকম সুযোগ-সুবিধা দিতো। সৈনিকসুলভ ফোলা মুখে সাদা জুলফিশোভিত কর্নেলটিব এই দয়ার কথা মিগুর্স্কিও মনে রেখেছে; প্রতিদানে তার সমবশিক্ষাবাহিনীব পবীক্ষার্থী ছেলেদের গণিত ও ফবাসী শেখাতে সে বাজী হযেছে।

উবাল্‌স্ক-এ মিগুর্স্কির এই সাত মাসেব জীবন যেমন একঘেয়ে ও বিবক্তিকব, তেমনই কঠোব। ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডাবকে সে সাধ্যমতো এড়িযে চলতেই চেষ্টা কবত। সে ছাড়া তার একমাত্র পরিচিত লোক জনৈক নির্বাসিত পোল—স্বল্প শিক্ষিত, ধূর্ত, অপ্রীতিকব, আগে মাছের ব্যবসা কবত। দাবিদ্র্যেব সঙ্গে মানিযে চলতেই মিগুর্স্কির সবচাইতে বেশি কষ্ট হতো। সম্পত্তি বাজেযাপ্ত হওযায় তার হাতে টাকাপয়সা কিছুই ছিল না; সঙ্গে যৎসামান্য সোনার জিনিস যা ছিল তাই বিক্রি কবেই কোনও রকমে দিন চালাত।

নির্বাসনের পরে তার জীবনের একমাত্র আনন্দ আলবিনার সঙ্গে পত্রালাপ। রোঝাংকায় থাকার সময থেকেই আলবিনার মিষ্টি, কাব্যময় মূর্তি তার হৃদয়ে আঁকা পড়েছে; নির্বাসনে এসে সে মূর্তি উত্তরোত্তর আরও মোহময় হয়ে উঠেছে। প্রথম দিককার একটা চিঠিতে সে লিখেছিল "আমার বাসনা ও স্বপ্ন যাই হোক না কেন"; আলবিনা একটা চিঠিতে জানতে চেয়েছে সে-কথাগুলির অর্থ কি। মিগুর্স্কি জবাবে

লিখেছিল, এখন সে স্বীকার করছে যে আল্‌বিনাকে স্ত্রী বলে ডাকাই ছিল তার স্বপ্ন। পরের চিঠিতে আল্‌বিনা লিখল, সে তাকে ভালবাসে। জবাবে মিগুর্স্কি লিখল, আল্‌বিনা এ-কথা না লিখলেই ভাল করত, কারণ একদিন যা হতে পারত অথচ আজ একেবারেই অসম্ভব, সে চিন্তাও তার পক্ষে অসহ্য। আল্‌বিনা জবাবে জানালো, সেটা যে শুধু সম্ভব তাই নয়, সেটা অবশ্য কর্তব্য। মিগুর্স্কি জবাব দিলো, আলবিনার এই ত্যাগকে সে মেনে নিতে পারে না, বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা অসম্ভব। কিছুদিন পরেই সে একটা টাকা পেল—দু'হাজার ''জলতি''। হাতের লেখা ও ডাক-ঘরের ছাপ থেকে সে বুঝতে পারল টাকাটা পাঠিয়েছে আল্‌বিনা; তার মনে পড়ল, প্রথম দিকের একটা চিঠিতে সে ঠাট্টা করে আল্‌বিনাকে জানিয়েছিল যে চা, তামাক, এমন কি বইয়ের দরুণ তার যে টাকার দরকার হয় সেটা ছাত্র পড়িয়ে রোজগার করতে পারছে বলে সে খুবই খুসি। প্রাপ্ত টাকাটাকে আর একটা খামে ভরে সেটা যথাস্থানে ফেরৎ পাঠিয়ে সেই সঙ্গে একটা চিঠিতে আলবিনাকে অনুরোধ জানালো, তাদের পবিত্র সম্পর্ককে সে যেন টাকা দিয়ে নষ্ট করে না ফেলে; লিখল, যা কিছু প্রয়োজন সবই তার আছে, আর আল্‌বিনার মতো একটি বন্ধুও আছে জেনে তার খুসির অন্ত নেই। এখানেই এ পত্রালাপ শেষ হয়েছিল।

নভেম্বর মাসের কোনও একদিন মিগুর্স্কি যখন কর্নেলের ছোট ছেলেদের পড়াচ্ছিলো তখন একটা স্লেজের ঘণ্টার শব্দ সে শুনতে পেল, কিছুক্ষণ পরেই স্লেজ-চালকরা জমাট বরফ ভেঙে এগিয়ে এসে কর্নেলের বাড়ির সামনেই থেমে গেল। কে এসেছে দেখতে কর্নেলের ছেলেরা লাফ দিয়ে বাইরে গেল। মিগুর্স্কি দরজার দিকে তাকিয়ে ছেলেদের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর স্বয়ং কর্নেলের স্ত্রী দরজায় এসে দাঁড়াল।

বলল, ''কয়েকটি মহিলা আপনার কাছে এসেছে স্যার; তারা আপনাকে খুঁজছে। মনে হচ্ছে আপনাদের দেশ থেকেই এসেছে; দেখতে পোল্‌দের মতো।''

কেউ যদি মিগুর্স্কিকে জিজ্ঞাসা করত, আলবিনার আগমনকে সে সম্ভবপর বলে মনে করে কি না তাহলে সে অবশ্যই বলত সেটা চিন্তাও করা যায় না; কিন্তু অন্তরের গভীরে সে তো তার জন্যই অপেক্ষা করে ছিল। বুকের মধ্যে রক্ত উত্তাল হয়ে উঠল; নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে সে ফটকের দিকে ছুটে গেল। মুখে দাগ-ভর্তি একটি মজবুত চেহারার স্ত্রীলোক মাথায় রুমাল বাঁধছিল। ঠিক সেই সময় আর একটি স্ত্রীলোক হেঁটে কর্নেলের বাড়িতে ঢুকল। পিছনে পায়ের শব্দ শুনে স্ত্রীলোকটি ফিরে তাকালো। জোব্বার টুপির নিচে আল্‌বিনার দুটি উচ্ছ্বসিত বড় বড় ঝকঝকে নীল চোখ দেখা দিলো; আঁখিপল্লব বরফে ঢাকা। মিগুর্স্কি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল; কেমন করে তার সঙ্গে দেখা করবে, কি বলে তাকে অভ্যর্থনা করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। তার বাবা যে ডান-নামে মিগুর্স্কিকে ডাকত সেই নামটাই উচ্চারিত হলো আল্‌বিনার কণ্ঠে—

"ইউজে!" পরমুহূর্তেই দুই হাতে মিগুর্স্কির গলা জড়িয়ে ধরে ঠাণ্ডায় রক্তিম নিজের মুখটা তার মুখে চেপে ধরে হেসে উঠেই কেঁদে ফেলল।

আল্‌বিনা কে এবং কেন এসেছে তা জানতে পেরে কর্নেলের স্ত্রী সাদরে তাকে গ্রহণ করল এবং যতদিন বিয়েটা না হয় ততদিন তাকে নিজের বাড়িতেই রেখে দিলো।

৬

সদয় কর্নেল উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি এনে দিলো। মিগুর্স্কি-দম্পতিকে আশীর্বাদ করবার জন্য ওরেনবুর্গ থেকে একজন পুরোহিতকে আনা হলো। ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডারের স্ত্রী হলো সম্মানিত অতিথি, মিগুর্স্কির একটি ছাত্র পবিত্র মূর্তি বহন করে নিয়ে গেল, আর নির্বাসিত পোলটি হলো নীত-বর!

আল্‌বিনা স্বামীকে একান্তভাবেই ভালবাসত, কিন্তু শুনতে অবাক লাগলেও সে তাকে মোটেই জানত না; এই প্রথম সে স্বামীকে জানতে শুরু কবেছে। স্বভাবতই কল্পনায় স্বামীর যে ছবি সে এঁকেছিল জীবন্ত মানুষটির কিছুটা গদ্যময়, অকাব্যিক সত্তার সঙ্গে সেটা ঠিকমতো মিলল না; অপর পক্ষে রক্ত-মাংসের মানুষরূপে তার মধ্যে যে সরলতা ও সততার সন্ধান সে পেল সেটা তার কল্পনায় গড়া অরূপ মূর্তিতে ছিল না। পরিচিত জন ও বন্ধুদের কাছে যুদ্ধে তার বীরত্বের কথা সে শুনেছে; সম্পত্তি ও মুক্তি হারাবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার সাহসের কথা সে শুনেছে, একটি মহৎ ও বীরত্বপূর্ণ জীবনকে সম্মুখে রেখে অবিরাম এগিয়ে চলা একজন নায়করূপেই সে তাকে কল্পনা করে এসেছে। কিন্তু এই সব বীরত্ব ও অসাধারণ শারীরিক শক্তি সত্ত্বেও বাস্তব জীবনে সে একটি শান্ত, শান্তিপ্রিয় মেষশাবকের মতো; অত্যন্ত সরল, সহৃদয় ও পরিহাসপ্রিয়; মুখে সেই শিশুর মতো হাসিটি যা রোঝাংকায় থাকতে তাকে মোহিত করেছিল; দাড়ি-গোঁফ শোভিত ইন্দ্রিয়াসক্ত মুখে সেই অনির্বাণ পাইপটি যা সহ্য করা তার পক্ষে ছিল শক্ত, বিশেষ করে তার গর্ভাবস্থায়।

মিগুর্স্কিও সবেমাত্র আল্‌বিনাকে আবিষ্কার করতে শুরু করেছে, আর এই প্রথম তার ভিতরকার নারীসত্তাকে চিনতে পেরেছে। বিয়ের আগে সে যাদের চিনত তাদের কাছ থেকে নারী-চরিত্রের কিছুই সে জানতে পারেনি। আর এখন আল্‌বিনার মধ্যে যা দেখতে পেয়েছে তাতে সে অবাক হয়ে গেছে; যদি আল্‌বিনার প্রতি তার একটা বিশেষ কোমল ও সকৃতজ্ঞ অনুভূতি না থাকত, তাহলে হয়তো অত্যন্ত দ্রুত সাধারণভাবে নারীজাতি সম্পর্কেই তার মোহভঙ্গ ঘটত।

মিগুর্স্কি-দম্পতি সুখীই হলো, কারণ একটা অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে পড়ে যাওয়ায় পরস্পরের প্রতি পরিপূর্ণ প্রেমের আকর্ষণে তাদের অভিজ্ঞতা হলো এমন দুটি মানুষের মতো শীতের রাতে পথ হারিয়ে ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে যারা পরস্পরের

শরীরে তাপসঞ্চার করছে। তাদের জীবনের সুখ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে নিঃস্বার্থ সেবিকা, সৎস্বভাবা, সুরসিকা নার্স লুড্‌ভিকার উপস্থিতির জন্য; যাকে দেখে তাকে ভালবাসাই তার স্বভাব। অচিরেই তাদের জীবনে শিশুর আবির্ভাব ঘটল। এক বছর পরে জন্মালো একটি ছেলে। দেড় বছর পরে একটি মেয়ে। ছেলেটি যেন মায়েরই প্রতিমূর্তি— সেই চোখ, সেই উচ্ছ্বাস, সেই লাবণ্য। মেয়েটি সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী একটি বন্য প্রাণী বিশেষ।

স্বদেশ থেকে অনেক দূরে থাকার জন্য, বিশেষ করে এখানে তাদের অকারণ লাঞ্ছনা-গঞ্জনার জন্য মিগুর্স্কি দম্পতির দুঃখের বুঝি অন্ত ছিল না। আল্‌বিনার দুঃখই সব চাইতে বেশি। তার স্বামী ইউজে, তার নায়ক ও আদর্শ, তাকে প্রতিটি অফিসারের সামনে দাঁড়াতে হতো, অভিবাদন করতে হতো, শাস্ত্রীর কাজ করতে হতো, বিনা বাক্যব্যয়ে তাদের আদেশ পালন করতে হতো।

তার উপর পোল্যান্ড থেকে যে সব খবর আসছে তাও দুঃখের। তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধুরা প্রায় সকলেই হয় নির্বাসিত হয়েছে, আর না হয় তো যথাসর্বস্ব খুইয়ে বিদেশে চলে গেছে। মিগুর্স্কি দম্পতির নির্বাসনের দিন যে কবে শেষ হবে তাও তারা জানে না। অপরাধ মার্জনার একটা ব্যবস্থা করার অথবা বর্তমানে অবস্থার উন্নতি বিধান করার—অফিসার-পদে উন্নতি লাভের সব রকম চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। জার নিকলাই পাভ্‌লভিচ সেনাদল পরিদর্শন করে, তাদের কুচকাওয়াজ দেখে, ড্রিল দেখে; সমবেত মুখোশ-নৃত্যে যায়, মুখে মুখোশ এঁটে হাসি-তামাসা করে; বিনা কারণেই গোটা রাশিয়া চষে বেড়ায়—চুগুয়েভ থেকে নভরসিস্ক, সেন্ট পিতার্সবুর্গ ও মস্কো পর্যন্ত ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ায়, লোকজনকে ত্রস্ত করে তোলে, আর ঘোড়াগুলোকে ক্লান্ত করে! কোনও দুঃসাহসী লোক যদি নির্বাসিত ডিসেম্বরপন্থী বা পোলদের স্বপক্ষে কোনও কথা বলে তাহলেই জার তার বুকটা ফুলিয়ে সীসের মতো দুটি চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে : "তাদের নির্বাসন ভোগ করতে দাও। এখনও দেরি আছে।" যেন কবে আর দেরি থাকবে না, কবে সময় হবে সেটা সে জানে। আর তার অনুগামীবৃন্দ, সেনাপতিরা, সভাসদরা ও তাদের পত্নীরা, যারা তারই অর্থে জীবন ধারণ করে থাকে,—তারা সকলেই এই মহামানবের অসাধারণ দূরদৃষ্টি ও জ্ঞান দেখে একেবারে অভিভূত।

মোটামুটিভাবে, মিগুর্স্কি পরিবারের জীবনে তখনও দুঃখের চাইতে সুখই ছিল বেশি।

এইভাবে পাঁচটি বছর কেটে গেল। হঠাৎ একটা ভয়ংকর, অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা ঘটে গেল। প্রথমে ছোট মেয়েটি অসুস্থ হলো; দু'দিন পরে অসুস্থ হলো ছেলেটি। তিন দিন জ্বরে গা পুড়ে যেতে লাগল, আর চতুর্থ দিনে বিনা চিকিৎসায় (ডাক্তারই পাওয়া গেল না) ছেলেটি মারা গেল। তার দু'দিন পরে মেয়েটিও মারা গেল।

আল্‌বিনা উবাল নদীতে ডুবে মরতেই চেয়েছিল। কিন্তু তার আত্মহত্যার সংবাদ শুনে স্বামীর অবস্থা কি হবে সে কথা ভেবেই আতংকে সে-কাজ থেকে সে বিরত হলো। কিন্তু বেঁচে থাকা তার পক্ষে বড়ই কঠিন হয়ে উঠল। সে ছিল সব সময়ই কর্মব্যস্ত ও চঞ্চল, কিন্তু এখন সে সব কাজ লুদভিকার উপর ছেড়ে দিলো, যা কিছু চোখে পড়ে সেই দিকেই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। কখনও হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে ছুটে ভাঁড়ার ঘরে চলে যায় আর স্বামী ও লুদভিকার সান্ত্বনার কথায় কোনও রকম কান না দিয়ে নিচু গলায় কাঁদতে থাকে, মাথা নেড়ে সকলকে বলে তাকে একলা রেখে চলে যেতে। গ্রীষ্মকালে সে ছেলেমেয়ের কবরের পাশে গিয়ে বসে, আর যা ছিল এবং যা হতে পারত তাই ভেবে যন্ত্রণায় কাতর হয়। যেখানে চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যায় এ রকম কোনও শহরে যদি সে থাকত তাহলে তার ছেলেমেয়ে হয়তো বাঁচতে পারত, এই চিন্তাই তাকে বেশি কষ্ট দেয়। সে ভাবে, "কেন? কেন? ইউজে ও আমি—জীবনের কাছে আমরা তো শুধু এইটুকুই চাই যে সে নিজে যেভাবে জন্মেছিল, তার পিতামহ ও প্রপিতামহ যেভাবে বেঁচেছিল সেও যেন সেই ভাবে বেচে থাকতে পারে, আর আমি যেন তার পাশে থাকতে পারি তাকে ভালবাসতে পারি, তার সন্তানকে ভালবাসা দিয়ে বড় করে তুলতে পারি। আর হঠাৎ তারা তাকে কষ্ট দিলো, নির্বাসনে পাঠাল, আর পৃথিবীতে যারা আমার সবচাইতে প্রিয় তাদেরই নিয়ে গেল আমার কাছ থেকে অনেক দূরে। কিসের জন্য?" এই প্রশ্ন সে করে মানুষের কাছে, ঈশ্বরের কাছে, কিন্তু কোনও জবাব পায় না।

কিন্তু সে জবাব ছাড়া তো বেঁচে থাকাও যায় না। তাই আল্‌বিনার জীবনও থেমে গেল। নির্বাসনের যে ভাগ্যহীন জীবনকে সে এতদিন নারীসুলভ সুরুচি ও প্রীতির বসে ভরিয়ে রেখেছিল এখন তা অসহনীয় হয়ে উঠেছে, শুধু তার নিজের কাছেই নয়, মিগুর্স্কির কাছেও, কারণ স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে সেও দুঃখ পায়, অথচ তার দুঃখকে লাঘব করতে পারে না।

৭

মিগুর্স্কি দম্পতির এই ঘোর দুর্দিনে রসলভ্‌স্কি নামক একজন পোল উবালস্ক এ নির্বাসিত হয়ে এল। নির্বাসিত রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত সিরশিসনস্কি সাইবেরিয়ায় যে বড় মাপের বিপ্লবের আয়োজন করেছিল তাতে যোগদান ও পলায়নের অভিযোগে তাকে সেখানে পাঠানো হয়েছে। মিগুর্স্কি ও অন্য হাজার হাজার পোলের মতো রসলভ্‌স্কিকেও সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়েছে কারণ সে হতে চেয়েছিল জন্মগত অধিকারসূত্রে পাওয়া একজন পোলিশ নাগরিক। সেই অপরাধে ধরা পড়ে তার শাস্তি হয়েছে কশাঘাত এবং মিগুর্স্কির ব্যাটেলিয়নে একটি সাধারণ সৈনিকের পদ। রসলভ্‌স্কি ছিল একজন গণিতের শিক্ষক, লম্বা, শীর্ণ চেহারা গোলাকার কাঁধ, বসে যাওয়া গাল ও ঝুলে-পড়া ভুরু।

এখানে পৌঁছবার প্রথম সন্ধ্যায় মিগুর্স্কিদের সঙ্গে চা খেতে খেতে তার নিজের কাহিনী ও নিষ্ঠুর নির্যাতনের কথা সে বলতে লাগল। শান্ত, গম্ভীর, গাঢ় গলায় বলতে লাগল কেমন করে কসাক ও সীমান্ত বাহিনীতে নিযুক্ত পোলদের সংঘবদ্ধ করে সিরৎসিন্স্কি গোটা সাইবেরিয়া জুড়ে একটা গুপ্ত সমিতি গড়ে তুলেছিল। তাদের কাজ ছিল সৈনিক ও কয়েদিদের বিদ্রোহে প্রবোচিত করা, এবং নির্বাসিত পোলদের সহায়তায় ওম্স্ক্-এর অস্ত্রাগার দখল করে নিয়ে সকলকে মুক্তি দেওয়া।

"কিন্তু তাও কি সম্ভব?" মিগুর্স্কি প্রশ্ন করল।

"খুব সম্ভব; সব কিছুই প্রস্তুত ছিল", ভুরু কুঁচকে বলল রসলভ্স্কি; তারপর শান্ত গলায় ধীরে ধীরে বলতে লাগল মুক্তি অর্জনের গোটা পরিকল্পনা ও তার সাফল্যের বিভিন্ন ধাপের কথা, ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলে তার উদ্যোক্তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থার কথা। দুটি বিশ্বাসঘাতক না থাকলে সাফল্য ছিল সুনিশ্চিত। রসলভ্স্কির কাছে সিরৎসিন্স্কি একজন প্রতিভাধর, প্রচণ্ড আত্মিক শক্তির অধিকারী। বীর শহীদের মৃত্যু সে বরণ করেছে। তারপর সে বলল তাদের সকলের নির্যাতনের কাহিনী।

"দীর্ঘ পথের মতো দুই সারি দিয়ে দাঁড়াল দুই ব্যাটেলিয়ন সৈন্য; প্রত্যেক সৈন্যের হাতে একটি করে এমন মাপের নমনীয় রড যার মাত্র তিনটেকে বন্দুকের নলের মধ্যে ঢোকানো যায়। প্রথমে এগিয়ে চলল ডাঃ শাকাল্স্কি। দুটি সৈনিক তাকে নিয়ে চলল, আর রড-হাতে সৈন্যরা একের পর এক সেই রড তার খোলা পিঠে মারতে লাগল। আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম ডাঃ শাকাল্স্কি যখন সেখানে পৌঁছল তখনই এটা আমি দেখতে পেলাম। প্রথমে শুনলাম ভেরীর আওয়াজ; তারপর রডের হিস্-হিস্ শব্দ এবং কাউকে আঘাত করার শব্দ শোনা গেল; তারপর তাকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। সৈন্যরা তাকে বন্দুক দিয়ে ঠেলে নিয়ে আসছে; সে টলতে টলতে এগিয়ে আসছে, মাথাটা একবার এদিকে, একবার ওদিকে ঝুঁকে পড়ছে। একবার তাকে যখন আমার পাশ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন কানে এল রুশ ডাক্তারটি সৈন্যদের বলছে : "অত জোরে মেরো না; একটু দয়া করো।" কিন্তু তারা সমানেই মারতে লাগল। দ্বিতীয়বার তাকে যখন আমার পাশ দিয়ে নিয়ে গেল তখন আর সে হাঁটতে পারছে না। সৈন্যরা তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে। তার পিঠের অবস্থা ভয়ংকর; মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে ফেললাম। সে পড়ে গেল; তারা তাকে বয়ে নিয়ে গেল। এই ভাবে তারা দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ জনকে নিয়ে গেল। সকলেই পড়ে গেল; তারা সকলকেই বয়ে নিয়ে গেল—কেউ মৃত, কেউ বা তখনও জীবিত। আর আমাদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখতে হলো। এই রকম চলল ছ' ঘণ্টা, ভোর থেকে বিকেল দুটো পর্যন্ত। সকলের শেষে তারা নিয়ে এল স্বয়ং সিরৎসিন্স্কিকে। অনেকদিন তাকে দেখিনি; দেখে চিনবারও উপায় ছিল না; তার বয়স কত বেড়ে গেছে। তার কুঁচকানো মুখখানি বিবর্ণ সবুজ; তার অনাবরণ দেহ শীর্ণ, হলুদ; পাঁজরের হাড়গুলো

খালি পেটের উপর ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। সেও হাঁটছে অন্য সকলের মতোই; প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা কেঁপে উঠছে, কিন্তু একটা আর্তনাদও মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে না; মুখে শুধু একটিই কথা : "Misere mei Deus Secundam Magnam misere cordiam tuam."

"আমি নিজের কানে শুনেছি," কর্কশ গলায় তাড়াতাড়ি কথাগুলি বলে রসলভ্স্কি ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নিল।

লুদ্ভিকা জানালার পাশে বসেছিল; রুমালে মুখ ঢেকে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

মিগুর্স্কি চেঁচিয়ে বলল, "এ কথাগুলি আপনি বলতে পারছেন। পশু—ওরা সব তো পশুর দল!" পাইপটা একপাশে ফেলে দিয়ে হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল; তারপর দ্রুত পা ফেলে অন্ধকার শোবার ঘরে চলে গেল। ঘরের অন্ধকার কোণের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আল্‌বিনা পাথরের মতো বসে রইল।

৮

পরদিন ছাত্র পড়িয়ে বাড়িতে ফিরে বৌয়ের মুখ দেখে মিগুর্স্কি অবাক হয়ে গেল। আগেকার মতোই উজ্জ্বল মুখে হাল্কা পায়ে এগিয়ে এসে বৌ তার সামনে দাঁড়াল।

"ইউজে, এখন মন দিয়ে শোনো।"

"শুনছি; ব্যাপার কি?"

"সারা রাত রসলভ্স্কির কথাই ভেবেছি। আমি স্থির করে ফেলেছি, এভাবে বাঁচতে পারব না, এখানে থাকতে পারব না। আমি পারব না। আমি পারব না। মরব তবু এখানে থাকব না।"

"কিন্তু আমরা কি করতে পারি?"

"পালিয়ে যাব।"

"পালিয়ে যাব? কেমন করে?"

"সব আমি ভেবেছি। মন দিয়ে শোনো।"

আল্‌বিনা যে মতলব এঁটেছে রাতে সেটা স্বামীকে বুঝিয়ে বলল। সন্ধ্যার পরে মিগুর্স্কি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে এবং আত্মহত্যার একটা চিঠি লিখে উরাল নদীর তীরে ওভারকোটটা ফেলে চলে যাবে। তাহলে বোঝা যাবে যে সে জলে ডুবে মরেছে। মৃতদেহের খোঁজ করা হবে; প্রতিবেদন পাঠানো হবে। ইতিমধ্যে আল্‌বিনাও নিরাপদে লুকিয়ে পড়বে। দরকার হলে এক মাস লুকিয়ে থাকবে। তারপর সব কিছু হয়ে গেলেই তারা এখান থেকে পালাবে।

প্রথমে মতলবটা মিগুর্স্কির কাছে মোটেই সম্ভবপর বলে মনে হয়নি; কিন্তু আল্‌বিনা এত আত্মবিশ্বাস ও আগ্রহের সঙ্গে তাকে ব্যাপারটা বোঝাতে লাগল যে দিনের শেষে সেও স্ত্রীর সঙ্গে একমত হলো; একমত হতে সে প্রলুব্ধও হলো, কারণ

সে বুঝল, পালাবার চেষ্টা ব্যর্থ হলে শাস্তি হবে তার একার (যদিও সে শাস্তি হবে রসলভ্স্কির বর্ণনার অনুরূপ), আর সে চেষ্টা যদি সফল হয় তাহলে সে বেচারি পাবে মুক্তি; ছেলেমেয়ের মৃত্যুর পরে এই নির্বাসনের জীবন যে তার পক্ষে কী অসহ্য হয়ে উঠেছে তা তো সে বোঝে।

রসল্ভস্কি ও লুদ্ভিকাকেও এই পরিকল্পনার কথা জানানো হলো; দীর্ঘ আলোচনা, পরিবর্তন ও সংশোধনের পরে পলায়নের একটা বিস্তারিত খসড়া তৈরি করা হলো। প্রথমে তারা স্থির করেছিল, জলে ডুবে মরার সংবাদ সরকারীভাবে স্বীকৃত হবার পরে মিগুর্স্কি একা পায়ে হেঁটে পালিয়ে যাবে, আর আল্‌বিনা গাড়িতে চেপে একটা নির্দিষ্ট স্থানে তার সঙ্গে মিলিত হবে। কিন্তু রসলভ্স্কি যখন গত পাঁচ বছরে সাইবেরিয়া থেকে পালাবার সবগুলি ব্যর্থ চেষ্টার কথা (ঐ সময়ের মধ্যে মাত্র একটি লোক পালিয়ে যেতে পেরেছে এবং এখনও বেঁচে আছে) বর্ণনা করল, তখন আল্‌বিনা আর একটা উপায় বাত্‌লে দিলো : ইউজে-কে একটা গাড়ির মধ্যে লুকিয়ে রেখে লুদ্ভিকাকেও তার সঙ্গে সারাতভ-এ পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেখান থেকে সে ছদ্মবেশে ভল্‌গার তীর ধরে এগিয়ে যাবে এবং আল্‌বিনা সারাতভ থেকে যে ভাড়া-করা নৌকোটা পাঠাবে কোনও এক জায়গায় সেটাতে চড়ে বসবে। তারপর তিনজন মিলে ভল্‌গার ভাঁটি ধরে অস্ত্রাখান পৌঁছবে এবং কাস্পিয়ান সাগর পার হয়ে পারস্যে চলে যাবে। রসলভ্স্কি সহ সকলেই এই পরিকল্পনাটি সমর্থন করল। কিন্তু সমস্যা হলো—গাড়ির মধ্যে এমন একটি বড় জায়গার ব্যবস্থা করা যার মধ্যে একটি লোক কম্যান্ডারের দৃষ্টি এড়িয়ে লুকিয়ে থাকতে পারবে। ছেলেমেয়ের কবর দেখে ফিরে এসে আল্‌বিনা যখন রসলভ্স্কিকে বলল যে বিদেশের মাটিতে ছেলেমেয়ের শেষচিহ্ন ফেলে রেখে এখান থেকে চলে যাওয়া তার পক্ষে বড়ই কঠিন, তখন রসলভ্স্কি এক মুহূর্ত ভেবে বলল :

"আপনি কম্যান্ডারের কাছে ছেলেমেয়ের শবাধার দুটি সঙ্গে নিয়ে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করুন; তিনি অনুমতি দেবেন।"

"না, আমি তা চাই না, চাই না।" আল্‌বিনা প্রতিবাদ করল।

"অনুমতি চান। তার উপরেই সব কিছু নির্ভর করছে। আসলে শবাধার দুটি আমরা সঙ্গে নেব না; ঐ দুটোর জন্য একটা বড় বাক্স তৈরি করে আইওসিফকে তার মধ্যে ভরে দেব।"

এ ভাবে তার সন্তানের স্মৃতিকে ধাপ্পাবাজীর সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে আল্‌বিনার তীব্র অনীহা; তাই প্রথমে এ প্রস্তাব সে বাতিল করে দিলো; কিন্তু মিগুর্স্কি যখন সানন্দে এ প্রস্তাবে সম্মত হলো তখন সেও মত দিলো।

চূড়ান্ত পরিকল্পনা অনুসারে, মিগুর্স্কি তার ডুবে মরার ব্যাপারটাকে কম্যান্ডারের চোখে যতদূর সম্ভব বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবে। একবার তার মৃত্যুকে স্বীকৃত ঘটনা

বলে মেনে নেওয়া হলেই আল্‌বিনা স্বদেশে ফিরে যাবার এবং ছেলেমেয়ের শেষ চিহ্নকে সঙ্গে নিয়ে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করবে। সে প্রার্থনা মঞ্জুর হলে সে এমন ভাব দেখাবে যেন শবাধার দুটিকে খুঁড়ে নিয়ে আসা হয়েছে, আর তাদের পরিবর্তে বিশেষভাবে তৈরি ট্রাংকটার মধ্যে লুকিয়ে রাখা হবে মিগুর্স্কিকে। একটা ঢাকা-দেওয়া গাড়িতে ট্রাংকটাকে তুলে দিয়ে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে সারাতভ্-এ। সেখান থেকে তারা একটা নৌকোয় চাপবে। নৌকোতে উঠে ইউজে বাক্সের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে এবং সকলে জাহাজে চেপে কাস্পিয়ান সাগরে পাড়ি দেবে। সেখান থেকে পারস্য অথবা তুরস্কে— তারপর মুক্তি।

৯

লুদ্‌ভিকাকে তার দেশে পাঠিয়ে দেবার ছুতো করে মিগুর্স্কি একটি গাড়ি কিনে ফেলল। তারপর শুরু হলো এমন একটা ট্রাংক তৈরির কাজ যার মধ্যে একটা লোক দম বন্ধ না হয়ে কোনও রকমে শুয়ে থাকতে পারে এবং যার মধ্যে সে অনায়াসে ঢুকে থাকতে পারে ও বের হতে পারে। আল্‌বিনা মিগুর্স্কি ও রসলভস্কি তিনজনে মিলে ট্রাংকটার পরিকল্পনা ও তৈরির কাজে মন দিলো। রসলভ্‌স্কি একজন ভাল ছুতোর-মিস্ত্রি, কাজেই তার সাহায্য খুবই কাজে লাগল। বায়ু চলাচলের জন্য ট্রাংকটার গায়ে ছিদ্র রাখা হলো। তাতে ঢোকা ও বের হবার পথ রইল শুধু গাড়ির ভিতর দিয়ে। গাড়িতে একটা আসনও বানানো হলো।

গাড়ি ও ট্রাংকের ব্যবস্থা ঠিক করার পরে আলবিনা তার স্বামীর অন্তর্ধানের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে আগে থেকেই কিছুটা তৈরি করার কাজে আত্মনিয়োগ করল। কর্নেলের সঙ্গে দেখা করে জানাল, তার স্বামী খুবই হতাশ হয়ে পড়েছে এবং আত্মহত্যার চেষ্টা করছে, সেজন্য সে খুবই ভয় পেয়ে গেছে, কাজেই তাকে যদি সাময়িকভাবে ছুটি দেওয়া হয় তাহলে বড় ভাল হয়। তার নাটকীয় ভাবভঙ্গি খুব কাজে লাগল। কর্নেল তাকে যথাসাধ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলো। উরাল নদীর তীরে তার ওভারকোটের আস্তিনের মধ্যে যে চিঠিটা পাওয়া যাবে ইতিমধ্যে মিগুর্স্কি সেটাও লিখে ফেলল, এবং নির্দিষ্ট সন্ধ্যায় নদীর তীরে গিয়ে অন্ধকার নেমে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল, চিঠিসহ তার পোশাক ও ওভারকোট নদীর তীরে রেখে দিলো, অতি সন্তর্পণে বাড়ি ফিরে এল, এবং তালাবন্ধ চিলেকোঠার ঘরে গিয়ে আত্মগোপন করল। সেই রাতেই আল্‌বিনা লুদ্‌ভিকাকে কর্নেলের কাছে পাঠিয়ে তাকে জানালো যে বিশ ঘণ্টা আগে আইওসিফ বাড়ি থেকে চলে গেছে, আর ফেরেনি। পরদিন সকালে স্বামীর চিঠিটা আল্‌বিনার কাছে এল, চোখের জলে ভেসে মুখে গভীর হতাশা ফুটিয়ে তুলে সে চিঠিটা কর্নেলকে দিয়ে এল।

এক সপ্তাহ পরে আল্‌বিনা স্বদেশে ফিরে যাবার অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত করল।

তার দুঃখ যে দেখল সেই অভিভূত হলো। ভাগ্যহীনা জননী ও পত্নীকে সকলেই করুণা দেখালো। স্বদেশে ফিরবার অনুমতি পেয়েই সে আব একটা অনুরোধ জানালো—সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্য তার ছেলেমেয়ে দুটিব কবর খুঁড়বার অনুমতি চাই। এ-কথা শুনে কর্নেল বিস্মিত হলো, কিন্তু অনুবোধ মঞ্জুর হলো।

সেদিন সন্ধ্যায় রসলভ্স্কি, আল্‌বিনা ও লুদ্‌ভিকা একটা ভাড়া-করা গাড়িতে ট্রাংকটা তুলে নিয়ে কবরখানায় গেল। ছেলেমেয়েব কববেব পাশে নতজানু হয়ে আল্‌বিনা প্রার্থনা করল, তারপর তাড়াতাড়ি উঠে বসলভস্কির দিকে ভ্রূকুটি করে বলল,

"যা কবার করে ফেলুন; আমি আর পারছি না", বলে সে একপাশে সরে গেল।

রসলভ্স্কি ও লুদ্‌ভিকা কববের পাথর সরিয়ে একটা বেল্‌চা দিয়ে এমনভাবে উপবের মাটিটা ছড়িয়ে দিলো যাতে মনে হয যে কববটা খুঁড়ে ফেলা হযেছে। সব কাজ শেষ করে তাবা আল্‌বিনাকে ডাকল এবং ট্রাংকটাতে মাটি বোঝাই করে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

যাত্রাব নির্দিষ্ট দিন এসে গেল। সমাপ্তপ্রায় প্রচেষ্টাব সাফল্যে বসলভ্স্কি খুব খুসি; লুদ্‌ভিকা পথেব জন্য রুটি ও মাংস-শুটি তৈরি করছিল, সে বলল, আতংকে ও আনন্দে তাব বুকটা ফেটে যাবার উপক্রম হয়েছে। চিলে-কোঠায় এক মাসের উপর বসে কাটাবাব পবে সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে মিগুর্স্কিও খুসি; বিশেষ করে আল্‌বিনার স্থিরবুদ্ধি ও উৎসাহ দেখে তার খুসির অন্ত রইল না। আল্‌বিনা যেন আগেকাব সব দুঃখ, সব বিপদ ভুলে গেছে; উত্তেজনা ও আনন্দের হাওয়া বইয়ে দিয়ে একটা ছোট মেয়েব মতো ছুটতে ছুটতে সে চিলেকোঠায় গিয়ে হাজির হলো।

ভোব তিনটেব সময় তাদেব কসাক পথপ্রদর্শক ও কসাক গাড়ি-চালক তিনটে ঘোড়া নিয়ে এসে হাজিব হলো। আল্‌বিনা ও লুদ্‌ভিকা কম্বলে শরীর ঢেকে কুকুরটাকে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসল। কসাক ও চালক বসল চালকের আসনে। চাষীর পোশাকের ছদ্মবেশে মিগুর্স্কি ট্রাংকটার মধ্যে গোপনে শুয়ে পড়ল।

তারা শহরে ছড়িয়ে গেল। গত বছরের রূপোলি ঘাসে ভর্তি সীমাহীন অকর্ষিত তৃণভূমির কঠিন পথ বেয়ে তিনটি বলিষ্ঠ ঘোড়া গাড়িটাকে টেনে নিয়ে চলল।

১০

আশায় ও উত্তেজনায় আল্‌বিনার হৃৎপিণ্ড বুঝি অসার হয়ে গেছে। লুদ্‌ভিকার সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য সে অতি ক্ষীণ হাসি হেসে শুধু ঘাড় নেড়ে একবার কসাকটিকে দেখালো, আর একবার দেখালো গাড়ির ভিতরটা। লুদ্‌ভিকা চুপচাপ বসে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। পরিষ্কার দিন। চারিদিকে প্রসারিত সীমাহীন অনুর্বর তৃণভূমি; সকাল বেলাকার সূর্যের তির্যক রশ্মি পড়ে রূপোলি ঘাসগুলি ঝিলমিল

করছে। অসমান রাস্তা ধরে বাশ্‌কির ঘোড়াগুলো ক্ষুবের শব্দ তুলে ছুটে চলেছে; রাস্তার দুই পাশে এখানে-ওখানে সাইবেরিয়ার কাঠবিড়ালী জাতীয় প্রাণী মাটি তুলে তুলে স্তূপাকার করে রেখেছে; কোথাও বা ওই ধরনের একটা প্রাণী কর্কশ সুরে শিস দিচ্ছে, আর ঘোড়াগুলো কাছে এলেই ছুটে গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ছে।

পথে কিছু যাত্রীর সঙ্গেও দেখা হলো : ক্বচিৎ কসাকদের একটা গম বোঝাই মালগাড়ি অথবা কিছু বাশ্‌কির অশ্বারোহী; কসাক পথপ্রদর্শকটি তাদের সঙ্গে তাতার ভাষায় দ্রুতলয়ে কিছু কথাবার্তাও বলল। বিভিন্ন ঘাঁটিতে ঘোড়াগুলো বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও তাজাই পাওয়া গেল; আর আল্‌বিনা চালকদের আধ রুবল বকশিস দিতেই তারা সারাটা পথ জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

প্রথম ঘাঁটিতে পৌঁছে কসাক চলে গেল সরাইখানায়, আগের চালক তার ঘোড়া নিয়ে চলে গেল, নতুন চালক এখনও তার ঘোড়া নিয়ে এসে হাজির হযনি; সেই সুযোগে আল্‌বিনা ঝুঁকে পড়ে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল, সে কেমন আছে, তার কিছু চাই কি না।

"চমৎকার আছি; খুব শান্তিতে আছি। কিছু চাই না। দুটো পুরো দিন এখানে শুযে অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারব।"

সন্ধ্যা নাগাদ তারা একটা বড় গ্রাম দের্‌গাচ-এ পৌঁছে গেল। স্বামী যাতে হাত-পা ছড়িয়ে একটু আরাম করতে পাবে সেজন্য আল্‌বিনা গাড়িটাকে থামালো ঘাঁটি থেকে খানিকটা দূরে এবং সঙ্গে সঙ্গে কসাকটিকে টাকা দিয়ে পাঠাল ডিম ও দুধ কিনে আনতে। অন্ধকার উঠোনের চালাঘরের নিচে গাড়িটা দাঁড়াল। লুদ্‌ভিকাকে কসাকটিব উপর নজর রাখতে বসিয়ে রেখে আল্‌বিনা স্বামীকে বের কবে আনলো, খাওয়ালো, তারপব পুনরায় হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকতে সাহায্য করল।

নতুন ঘোড়া জুড়ে দিয়ে গাড়িটা আবার ছুটল। আল্‌বিনাব মনেব বল ক্রমেই বাড়ছে; নিজের উত্তেজনা ও আনন্দ সে যেন আর চেপে রাখতে পাবছে না। লুদ্‌ভিকা, কসাকটি ও কুকুর ত্রেজোর্কা ছাড়া কথা বলবার মতো আব কেউ নেই; তাদের নিয়েই সে সময় কাটাতে লাগল।

নিজের সাদাসিদে চাল-চলন সত্ত্বেও লুদ্‌ভিকার মনে কেবলই সন্দেহ জাগে যে চারিদিককার প্রতিটি মানুষই তার দিকে ভালবাসার চোখে তাকাচ্ছে; এখন তার সন্দেহ পড়ল সৎপ্রকৃতির বলিষ্ঠ উরাল কসাকটির উপব, যদিও তার অসাধারণ স্বচ্ছ ও সদয় দুটি নীল চোখের সরল দৃষ্টি দেখে দুটি নারীরই তাকে বিশেষ ভাল লেগেছে। আসন্ন বিপদ ও সম্ভাবিত সাফল্যের উত্তেজনার ফলে এবং আশ্চর্য সুন্দর আবহাওয়া ও তৃণভূমির বাতাসের গুণে আল্‌বিনার অন্তর এত বেশি শিশুসুলভ উৎসাহ ও আনন্দে ভরে উঠেছে যার অভিজ্ঞতা সে অনেকদিন পায়নি। মিগুর্স্কি তাব খুসিভরা কথাবার্তা শুনছে, আর দৈহিক অসুবিধা সত্ত্বেও সব দুঃখকষ্ট ভুলে স্ত্রীর সুখেই সুখী বোধ করছে।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার দিকে কুয়াসার ভিতর দিয়ে অস্পষ্টভাবে সারাতভ ও ভল্‌গা দেখা গেল। তৃণভূমিতে অভ্যস্ত চোখে কসাকটি ভল্‌গা নদীতে জাহাজের মাস্তুলও দেখতে পেল এবং লুদ্‌ভিকাকে দেখালো। লুদ্‌ভিকাও বলল, সেও দেখতে পেয়েছে। আল্‌বিনা কিছুই বুঝতে পারল না, কিন্তু স্বামীকে শুনিয়ে বলল, "সারাতভ, ভল্‌গা", এবং যেন ত্রেজোর্কাকেই বলছে এমনিভাবে যা কিছু দেখতে পাচ্ছে তারই বিবরণ স্বামীকে শোনাতে লাগল।

১১

সারাতভ-এর বিপরীত দিকে পক্রোভ্‌স্কির উপকণ্ঠে ভল্‌গা নদীর বাম তীরবর্তী একটা সরাইখানার সামনে আল্‌বিনা গাড়ি থামালো। আশা করছে, রাতের বেলা স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে পারবে এবং হয়তো তাকে ট্রাংকের ভিতর থেকেও বের করতে পারবে। কিন্তু মে মাসের ছোট রাতটা কসাকটি সারক্ষণই কাছাকাছি রইল; তাদের গাড়ির পাশেই একটা চালার নিচে খালি গাড়িতে বসে কাটিয়ে দিলো। আল্‌বিনাব আদেশে লুদ্‌ভিকা গাড়িতেই থাকল। কসাকটি যে তার জন্যই কাছাকাছি বসে আছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে লুদ্‌ভিকা কখনও চোখ টিপছে, কখনও হাসছে, নিজের দাগ-ওয়ালা মুখটা রুমালে ঢাকছে। কসাকটি কেন যে গাড়ির এত কাছাকাছি বসে আছে সেটা বুঝতে না পেরে আল্‌বিনার ভয় ক্রমেই বাড়তে লাগল।

সূর্য অস্ত গিয়ে রাত নেমে আসার পরে আল্‌বিনা বেশ কয়েকবার তার সরাইখানার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উঠোনটায় ঘুরেফিরে দেখল। কসাকটি তখনও জেগে আছে, আর তাদের গাড়ির পাশে ছোট খালি গাড়িটায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে। ঠিক ভোরের আগে মোরগগুলো যখন জেগে উঠে এক উঠোন থেকে আর এক উঠোনে ডাকাডাকি শুরু করে দিলো, তখন আল্‌বিনা স্বামীর সঙ্গে একটু কথা বলার সুযোগ পেল। কসাকটি গাড়িতে পাশ ফিরে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। সন্তর্পণে গাড়ির কাছে গিয়ে আল্‌বিনা ডাকল, "ইউজেন!" কোনও জবাব এল না। ভয় পেয়ে আরও জোরে ডাকল, "ইউজে, ইউজে!"

"কি গো লক্ষ্মী? কি হয়েছে?" ঘুম-জড়ানো স্বরে মিগুর্স্কি বলল।

"জবাব দাওনি কেন?"

"ঘুমিয়ে পড়েছিলাম", গলা শুনেই আল্‌বিনা বুঝতে পারল সে হাসছে। "আচ্ছা, আমি বের হবো কি?" সে শুধালো।

"অসম্ভব! কসাকটি এখানেই রয়েছে," কসাকটির দিকে চোখ রেখে আল্‌বিনা বলল। সে সবিস্ময়ে দেখল, কসাকটির নাক ডাকলেও চোখ দুটি খোলাই আছে। সে আল্‌বিনার দিকে তাকাল, আর তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চোখ বুজল।

আল্‌বিনা নিজেকেই শুধালো, "এটা কি আমার কল্পনা, না কি সে সত্যি জেগে

ছিল? তারপব স্বামীব দিকে মুখ ফিরিয়ে নিজের মনে বলল, "ওটা নিশ্চয় আমার কল্পনা।"

আল্‌বিনা স্বামীকে বলল, "আর একটু ধৈর্য ধরে থাকো। ক্ষিধে পেয়েছে কি?"

"না। ধূমপান করতে ইচ্ছা করছে।"

আল্‌বিনা আবার কসাকটির দিকে তাকাল। সে ঘুমিয়ে পড়েছে। "হ্যাঁ, ওটা আমাব কল্পনাই ছিল।"

"এখন আমি গভর্নরের সঙ্গে দেখা কবতে যাচ্ছি।"

"খুব ভাল; তোমাব সৌভাগ্য কামনা করি..."

সুটকেস থেকে পোশাক বেব কবে আল্‌বিনা সাজগোজ কবাব জন্য তাব ঘরে চলে গেল।

যথাসম্ভব ভাল বিধবার পোশাকে সেজে আল্‌বিনা ভল্‌গা পাব হয়ে চলে গেল। ওপারে গিয়ে একটা ছেকবা গাড়ি নিয়ে গভর্ণরেব ভবনে পৌঁছল। গভর্ণব তাকে সাদর অভ্যর্থনা করল। একটি সুন্দবী, হাস্যময়ী পোলিশ বিধবা এবং চমৎকাব ফরাসী ভাষা বলতে পাবে দেখে বযস্ক অথচ যুবক দর্শন গভর্ণব খুবই মোহিত হলো। আল্‌বিনার সব প্রার্থনাই সে মঞ্জুর করল, জারিৎসিন-এব প্রোভোস্টেব কাছে তাব হুকুম-নামাটা নিয়ে যাবার জন্য তাকে পবেব দিন আবাব আসতে বলল। তাব আবেদনের সাফল্যে এবং তাব আকর্ষণে গভর্ণরেব সাড়া পাওয়ায় আলবিনাব মন আশায় ও আনন্দে ভরে উঠল। সে জাহাজঘাটায় ফিবে চলল; বনের ওপারে সূর্য উঠেছে; তার তির্যক রশ্মিগুলো ফেঁপে-ওঠা নদীর ঢেউয়ের উপব পড়ে ঝিলমিল করছে। দুই পাশে পাহাড়গুলো আপেল গাছে ছেয়ে আছে; সুগন্ধি ফুলে ঢাকা গাছগুলোকে সাদা মেঘের মতো দেখাচ্ছে। নদীর তীরে একগাদা মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। জল-ভবা নদীব বুকে একটা সাদা পাল চকচক কবছে। ঘাটেব কাছাকাছি পৌঁছে আল্‌বিনা কোচয়ানকে জিজ্ঞাসা করল, অস্ত্রাখান যাবার একটা নৌকো ভাড়া পাওয়া যাবে কি না; একটু পরেই ডজনখানেক মাঝি এসে তাদেব নৌকো ভাড়া দেবার প্রস্তাব দিলো। একটি মাঝির কথাবার্তায় খুসি হযে আল্‌বিনা তার সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে তার নৌকোটা দেখতে গেল। নৌকোয পাল সমেত একটা ছোট্ট মাস্তুল আছে; ফলে বাতাসে পাল তুলে যাওয়া যাবে; আবাব বাতাস পড়ে গেলে দাঁড় টেনেও যাওয়া যাবে: দুটি জোয়ান দাঁড়িও নৌকোব উপর রোদে বসে আছে। ভাল মানুষ মাঝিটি পরামর্শ দিলো, গাড়িটা এখানে ফেলে না গিয়ে চাকা দুটো খুলে সেটাকেও নৌকোতে তুলে নেওয়া হোক। "সব কিছু ব্যবস্থা হয়ে গেলে আপনারা আরামেই বসতে পারবেন। ঈশ্বর যদি ভাল আবহাওয়া দেন, তাহলে পাঁচ দিনে অস্ত্রাখান পৌঁছে যাবো।"

আল্‌বিনা মাঝিকে বলল, পক্রোভস্কির উপকণ্ঠস্থ সরাইখানায় গিয়ে সে একবার

গাড়িটা দেখে আসুক, আর তার পরেই আগাম কিছু টাকা নিয়ে নিক। সব ব্যবস্থাই আশাতিরিক্ত ভালভাবে হয়ে গেল। ভল্‌গা পার হয়ে আল্‌বিনা কোচয়ানকে ছেড়ে দিয়ে সরাইখানার দিকে পা বাড়ালো।

১২

কসাক দানিলো লিফানভ-এর বাড়ি বড় সির্তা-র তীরবর্তী স্ত্রেলিজ শেন্টাব-এ। বয়স চৌত্রিশ বছর; এখন তার সৈনিক-জীবনের শেষ মাসটি চলছে। তার পরিবারে আছে একটি বৃদ্ধ (তার নব্বই বছর বয়সের ঠাকুর্দা), দুই ভাই, বড় দাদার পুত্রবধূ, তার স্ত্রী, দুই মেয়ে ও দুই ছেলে। প্রাচীন ধর্ম আঁকড়ে থাকার জন্য বড় দাদাকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়েছে। ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে তার বাবা মারা গেছে। বাড়িতে এখন সেই বড়ো। তাদের খামারে আছে ষাটটি ঘোড়া, দু'জোড়া ষাঁড়, আর নিম্নর গমের জমি। দানিলো চাকরি উপলক্ষে ওরেনবুর্গ ও কাজান-এ ছিল। প্রাচীন ধর্মে তার অটুট বিশ্বাস, সে ধূমপান করে না, মদ খায় না, অবিশ্বাসীদের সঙ্গে একপাত্রে আহার পর্যন্ত করে না। কঠোরভাবে নিজের কথা রেখে চলে। যে কাজকে কর্তব্য বলে মনে করে সেটাকে শেষ না করে কখনও আরাম করে না। এখন তার উপর হুকুম হয়েছে, দুটি পোলিশ রমণী ও দুটি শবাধারকে সারাতভ-এ পৌঁছে দিতে হবে; পথে তাদের যাতে কোনও বিপদ না হয়, তারা যাতে শান্তিতে পথ চলতে পারে সেদিকে তাকে নজর রাখতে হবে। সারাতভ পৌঁছে তাদের নিরাপদে ও সুস্থ শরীরে কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে হবে। শবাধার ও বাক্সে কুকুরটাসহ সে তাদের সারাতভ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। পোল হলেও স্ত্রীলোক দুটি শান্ত ও ভদ্র; কোনও রকম অন্যায় কাজ করেনি। কিন্তু পক্রোভস্কিতে অবস্থানকালে সন্ধ্যার সময় গাড়িটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে লক্ষ্য করল, কুকুরটা গাড়ির উপর লাফিয়ে উঠে লেজ নাড়তে নাড়তে নাক দিয়ে এক রকম শব্দ করছে; তার মনে হলো যেন আসনের নিচ থেকে কারও গলাও শোনা গেল। বুড়ি পোলটি গাড়িতে কুকুরটাকে দেখে ভয় পেয়ে গেল এবং সেটাকে ধরে নামিয়ে নিয়ে গেল।

"নিশ্চয় ওখানে কিছু আছে" এই কথা ভেবে সে কড়া নজর রেখে চলল। সেই রাতে অপর স্ত্রীলোকটি যখন গাড়িতে উঠল, তখন সে ঘুমের ভান করে পড়ে রইল। এক সময় ট্রাংকের ভিতরে একটি পুরুষ-কণ্ঠ স্পষ্ট শুনতে পেল। পরদিন খুব সকালে সে পুলিশের কাছে গিয়ে জানালো, যে দুটি পোলিশ নারীকে সে সঙ্গে নিয়ে এসেছে তাদের কাজকর্ম ভাল ঠেকছে না: মনে হচ্ছে ট্রাংকের ভিতরে শবাধারের বদলে তারা একটি জীবন্ত মানুষকে পাচার করছে।

আল্‌বিনা খুসি মনে সরাইখানায় ফিরে এল। তার দৃঢ় বিশ্বাস, সব বিপদ কেটে গেছে, আর কয়েক দিনের মধ্যেই তারা হবে মুক্ত, স্বাধীন। এমন সময় সে সবিস্ময়ে

দেখল, এক জোড়া সুন্দর ঘোড়া, পাশে আর একটা ঘোড়া ও দু'জন কসাক দাঁড়িয়ে আছে। একদল লোক ভিড় করে উঠোনের দিকে তাকিয়ে আছে। আশায় ও উৎসাহে আল্‌বিনার মন এতই ভরপুর ছিল যে এই সব ঘোড়া ও ভিড়ের সঙ্গে যে তার কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে সে কথা তার একবারও মনে হয়নি। উঠোনে নেমে এসে সে চালাঘরটার দিকে তাকালো; তাদের গাড়িটা সেখানেই ছিল। সে দেখল, লোকজনরা তাদের গাড়িটার পাশেই ভিড় করে আছে, আর ঠিক তখনই ত্রেজোর্কার হতাশ চিৎকার তার কানে এল। ততক্ষণে বিপদ যা ঘটবার তা ঘটে গেছে। গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি দীর্ঘদেহ মানুষ; পরিধানে ঝকঝকে ইউনিফর্ম, বোতাম, স্কন্ধত্রাণ ও দামী জুতো; মুখে কালো জুলফি। হুকুমের ভঙ্গিতে কর্কশ গলায় সে যেন কি বলছে। তার সম্মুখে দু'জন সৈনিকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে চাষীর পোশাক পরা তারই ইউজে। তার এলোমেলো চুলে খড়কুটো লেগে রয়েছে। চারিদিকের অবস্থা দেখে বিহ্বল হয়ে সে একবার দুটো কাঁধ তুলছে, আবার নামাচ্ছে। ত্রেজোর্কা যেন বুঝতে পেরেছে সেই যত নষ্টের গোড়া; পুলিশ অফিসারটিকে লক্ষ্য করে বৃথাই সে চিৎকার করে চলেছে। আল্‌বিনাকে দেখতে পেয়ে মিগুর্স্কি শিউরে উঠল, তার দিকে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করল, কিন্তু সৈনিকরা বাধা দিলো।

মৃদু হেসে মিগুর্স্কি বলল, "ও কিছু না আল্‌বিনা, কিছু না!"

পুলিশ অফিসার বলল, "এই তো, মহিলা নিজেই এসে হাজির। দয়া করে এদিকে আসুন। আপনার সন্তানদের শবাধার, কি বলেন?" মিগুর্স্কির দিকে চোখ টিপে সে বলল।

আলবিনা জবাব দিলো না; গলাটা চেপে ধরে হাঁ করে সভয়ে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এবং জীবনের চরম মুহূর্তগুলিতে সাধারণত যা হয়ে থাকে সেইভাবেই আল্‌বিনার মনের মধ্যে সীমাহীন অনুভূতি ও চিন্তার স্রোত বয়ে যেতে লাগল, আর সেই সঙ্গেই নিজের দুর্ভাগ্যকে সে না পারল বুঝতে, আর না পারল বিশ্বাস করতে। মনের প্রথম অনুভূতিটির সঙ্গে তার অনেক দিনের পরিচয়— আহত অহংকারের অনুভূতি : এই সব রুচিহীন লোকের হাতে তার বীর স্বামীর লাঞ্ছনার দৃশ্য তার অভিমানকে আঘাত করেছে। "যে মানুষটি সকলের সেরা তাকে বন্দী করবার সাহস ওরা পেল কোত্থেকে?" পর মুহূর্তেই চরম সর্বনাশের চেতনা তাকে অভিভূত করে ফেলল। সেই চেতনা আবার তার মনে জাগিয়ে তুলল তার জীবনের চরম দুর্ভাগ্যের স্মৃতি—তার ছেলেমেয়ের মৃত্যুর স্মৃতি। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিলো সেই একই প্রশ্ন : কেন? কেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে গেল? সে প্রশ্ন থেকে জাগল আর একটি প্রশ্ন : আমার প্রিয় স্বামী, সব মানুষের সেরা মানুষটি এত কষ্ট পাবে কেন? এ ভাবে মরবে কেন? আর তখনই তার মনে পড়ল, কি অসম্মানকর

শাস্তি তার স্বামীর কপালে জুটবে, আর সে সব কিছুর জন্য দায়ী সে—শুধুই সে একা।

"এ লোকটি আপনার কেন? আপনার স্বামী?" পুলিশ অফিসার জিজ্ঞাসা করল।

"কেন? কেন?" আলবিনা চিৎকার করে উঠল, তারপরেই মূর্ছা রোগগ্রস্তের মতো হাসতে হাসতে ট্রাংকটার উপরেই বসে পড়ল; গাড়ি থেকে নামিয়ে ট্রাংকটাকে পাশেই রাখা হয়েছে। চোখের জলে মুখ ভাসিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে লুদভিকা তার কাছে ছুটে গেল।

"কর্ত্রীঠাকরুণ, আমার কর্ত্রীঠাকরুণ! ঈশ্বরকে আমি বড ভালবাসি! কিছু হবে না!" এই কথা বলে লুদভিকা অর্থহীনভাবে আলবিনাকে জড়িয়ে ধরে রইল।

মিগুর্স্কির হাতে হাত-কড়া পরিয়ে উঠোনের বাইরে নিয়ে গেল। আলবিনাও ছুটে গেল।

বলল, "আমাকে ক্ষমা করো, আমাকে ক্ষমা করো। সব আমার দোষ। একমাত্র আমিই দোষী।"

তাকে হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে পুলিশ অফিসার বলল, "কে দোষী সেটা তারাই ঠিক করবে।"

মিগুর্স্কিকে পুলিশ আদালতে নিয়ে চলল; কিন্তু না বুঝেই লুদভিকার সব চেষ্টাকে উপেক্ষা করে আলবিনা তার পিছু নিল।

সারাক্ষণ কর্নেল নীরবে নিশ্চলভাবে গাড়ির চাকা দুটির পাশে দাঁড়িয়ে রইল; বিহ্বল চোখে প্রথমে তাকাল পুলিশ অফিসারের দিকে, তারপর আলবিনার দিকে, এবং তারপর নিজের পায়ের দিকে।

মিগুর্স্কিকে নিয়ে যাবার পর ত্রেজোর্কা কসাকটির কাছে এসে লেজ নাড়তে লাগল। একসঙ্গে পথ চলতে চলতে কুকুরটি উনিজেলা নিবাজেৎ প্রিয় হয়ে উঠেছে। কসাকটি হঠাৎ গাড়িটার কাছ থেকে সরে এসে মাথার টুপিটা খুলে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলো; তারপর এক লাথি মেরে ত্রেজোর্কাকে সরিয়ে দিয়ে শুঁড়িখানায় ঢুকে গেল। ভদকার অর্ডার দিলো, দিন রাত মদ খেতে লাগল; সব সর্বস্ব উড়িয়ে দিলো। পরদিন রাতে একটা নর্দমার মধ্যে যখন তার ঘুম ভাঙল একমাত্র তখনই তার মাথা থেকে সেই প্রশ্নটা দূর হলো, যা তাকে এতক্ষণ যন্ত্রণায় বিদ্ধ করে চলেছিল: ট্রাংকের মধ্যে পোলিশ স্বামীটির উপস্থিতির কথাটা কমান্ডারকে জানিয়ে দিয়ে সে কি ন্যায় কাজ করেছে?

বিচারে মিগুর্স্কির শাস্তি হলো, তাকে এক হাজার লাঠির ঘা খেতে হবে। সেন্ট পিতার্সবুর্গে তার আত্মীয়স্বজন ও ওয়ান্দার কিছু পদস্থ লোকের সঙ্গে জানাশোনা ছিল; তাদের চেষ্টায় তার দণ্ডাদেশ কিছুটা হ্রাস হলো। সারাজীবনের মতো তাকে সাইবেরিয়ায় ফেরৎ পাঠানো হলো। আলবিনা তার অনুগমন করল।

নিকোলাই পাভ্‌লভিচ এই ভেবে খুসিতে ডগমগ হলো যে শুধু পোল্যান্ড নয়, সমগ্র ইউরোপ থেকেই সে বিপ্লবের বহু-শিব সর্পকে ধ্বংস করেছে। এই ভেবে সে গর্ববোধ করল যে রুশ সার্বভৌমত্ব রক্ষার অঙ্গীকার সে লংঘন করেনি এবং রুশ জনগণের গৌরবের জন্য পোল্যান্ডকে রুশ শাসনের অধীনস্থ করেছে। তারকা ও স্বর্ণখচিত ইউনিফর্ম-পরিহিত মানুষগুলো তার কাজের প্রশংসায় এতই পঞ্চমুখ হয়ে উঠল যে সেও একান্তভাবেই বিশ্বাস করল যে সে একজন মহাপুরুষ, তার জীবন মানবতার পক্ষে একটি মহান আশীর্বাদস্বরূপ; বিশেষ করে সেই রুশ জনসাধারণের পক্ষে নিজের অজ্ঞাতেই যাদের জীবনে সে সবলে প্রবাহিত করেছে নীতিহীনতা ও প্রতারণার স্রোতধারাকে।

—১৯০৬

কাঠ কাটা

Wood Felling

১

১৮৮৫-র শীতকালের মাঝামাঝি সময়ে আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীর একটা ডিভিশনকে বিগ চেচেন-এ মোতায়েন করা হয়েছিল। ১৪ই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় আমি জানলাম, অফিসারের অনুপস্থিতিতে যে পল্টনটির পরিচালনাভার পড়েছে আমার উপরে সেটার উপরেই পড়েছে আগামীকালের জঙ্গল কাটার ভার; সেই সন্ধ্যায়ই দরকারী নির্দেশ পেয়ে ও জারী করে অন্যান্য দিনের চাইতে কিছু আগেই শিবিরে ফিরে গেলাম। জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে শিবিরের চাইতে কিছু আগেই শিবিরে ফিরে গেলাম। জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে শিবিরের বিছানা গরম করার বদ অভ্যাস আমার ছিল না। পোশাক না ছেড়েই শুয়ে পড়লাম, লোমের টুপি দিয়ে চোখ দুটো ঢেকে দিলাম লোমের কোটে বেশ আরাম লাগল, আর গভীর গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম; আসন্ন বিপদের মুখে উদ্বেগ ও অস্বস্তির মধ্যেও অনেক সময় এ ধরনের ঘুম হয়, আগামী কালের কাজের চিন্তাই আমাকে প্রসুপ্তি এনে দিল।

ভোর তিনটে। তখনও চারিদিক অন্ধকার। আমার আতপ্ত ভেড়ার চামড়ার কোটটা কে যেন গায়ের উপর থেকে তুলে নিল; একটা মোমবাতির লালচে আলো অস্বস্তিকরভাবে আমার ঘুম-জড়ানো চোখের উপর পড়ল।

কে যেন বলল, "দয়া করে উঠে পড়ুন।" চোখ খুললাম, কিন্তু নিজে অজান্তেই

আবার কোটটাকে গায়ের উপর চাপিয়ে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়লাম। নির্মমভাবে আমার ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিতে দিতে দিমিত্রি আবার বলল, "দয়া করে উঠে পড়ুন। পদাতিক বাহিনী যাত্রা শুরু করছে।" হঠাৎ পরিস্থিতিটা মনে পড়ে গেল, শিউরে লাফিয়ে উঠে দাড়ালাম। তাড়াতাড়ি বরফ-ঠাণ্ডা জলে হাত-মুখ ধুয়ে এক গ্লাস চা খেয়ে শিবির থেকে বেরিয়ে সমাবেশ-পার্কে হাজির হলাম। বাইরেটা অন্ধকার, কুয়াশাচ্ছন্ন, ঠাণ্ডা। গোটা শিবির জুড়ে এখানে-ওখানে জ্বালানো আগুনের অস্পষ্ট লালচে আলো পড়েছে ঘুমন্ত সৈন্যদের ছায়া-ছায়া মূর্তিগুলোর উপব; তাতে রাতের অন্ধকার যেন আরও বেড়ে গেছে। এমন কি কাছাকাছি কোথাও নিরুদ্বেগ নাক ডাকার শব্দও শোনা যাচ্ছে, দূর থেকে ভেসে আসছে উত্তেজিত আলোচনা ও যাত্রা-উন্মুখ পদাতিক বাহিনীব বন্দুকেব ঠন্-ঠন্ শব্দ। বাতাসে ধোঁয়া, সার, কাঠ ও কুয়াসার গন্ধ; ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস শিরদাঁড়া বেয়ে নামে, আব ইচ্ছার বিরুদ্ধেও দাঁতে দাঁত লেগে খুট্-খুট শব্দ হয়।

সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে শুধুমাত্র ঘোড়ার নাকের শব্দ ও পায়ের ঠক্‌ঠকানি শুনেই বোঝা সম্ভব বোঝাই গাড়ি ও বারুদের বাক্সগুলো কোথায় আছে; আর কামানে আগুন দেবার শলাকা-দণ্ডের ঝলমলানি দেখে তবেই বোঝা যাচ্ছে কোথায় রয়েছে কামানের সারি। "যাত্রা শুভ হোক" বলে প্রথম কামানের চাকা সশব্দে ঘুরতে শুরু করল; তার পিছনে চলল বারুদের বাক্স; পলটনেব যাত্রা শুরু হল। সকলেই মাথার টুপি খুলে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকলাম। পদাতিক বাহিনীব সঙ্গে মিলিত হবার পরে পল্টনটা থামল এবং গোটা বাহিনীর জমায়েত ও কম্যান্ডারের যাত্রাব হুকুমের জন্য পনেরো মিনিট অপেক্ষা করে রইল।

একটি ছায়ামূর্তি আমার পাশে এসে বলল, "একজন সৈনিক নিকোলাই পেত্রভিচকে দেখছি না।" শুধু তার গলা শুনেই পল্টনের গোলন্দাজ ম্যাক্সিমভ্‌কে চিনতে পারলাম।

"কে?"

"ভেলেঞ্চুক এখানে নেই স্যার। যখন গাড়ি যুতা হচ্ছিল তখনও ছিল---আমি তাকে দেখেছি---কিন্তু এখন সে নেই।"

পুরো বাহিনীর অবিলম্বে যাত্রা শুরু করবার সম্ভাবনা নেই দেখে ভেলেঞ্চুকের খোঁজে কর্পোরাল আন্তানভকে পাঠানোই স্থির হল। কিছুক্ষণ পরে কয়েকজন অশ্বারোহী অন্ধকারে আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল; তাবাই কম্যান্ডার ও তার দলবল; আরও পরে সারির প্রথম সৈনিকটি নড়তে শুরু করল, আর শেষ পর্যন্ত আমবাও পা বাড়ালাম---কিন্তু আন্তনভ ও ভেলেঞ্চুকেব দেখা নেই। অবশ্য আমরা একশো পা যাবার আগেই তাবা দু'জন আমাদের ধরে ফেলল।

"সে কোথায় ছিল?" আন্তনভকে জিজ্ঞাসা করলাম।

"জমায়েত-পার্কে পড়ে ঘুমচ্ছিল।"

"তাহলে কি মদ খেয়েছে?"

"মোটেই না।"

"তাহলে ঘুমিয়ে পড়ল কেন?"

"আমার জানবার কথা নয়।"

চাষহীন, বরফহীন মাঠের নিচু ঝোপ-ঝাড়েব ভিতর দিয়ে সেই নিঃশব্দ অন্ধকার পেরিয়ে আমরা ধীর গতিতে তিন ঘণ্টা পথ চললাম। অবশেষে একটা অগভীর কিন্তু খরস্রোতা নদী পার হয়ে আমাদের থামিয়ে দেওয়া হলো; সৈন্য-সারির একেবারে মাথায় ইতস্তত রাইফেলের গুলি বর্ষণের শব্দ শোনা গেল। এ ধরনের শব্দ সব সময়ই আমাদেব নতুন করে উৎসাহ জোগায়। সেনাদলটাও যেন জেগে উঠল : পিছনের সৈন্যদের ভিতর থেকেও কথাবার্তা, নড়াচড়া ও উচ্চহাসির শব্দ ভেসে এল। কিছু সৈনিক সহকর্মীদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ জুড়ে দিল, কেউ পায়ে পায়ে লাফাতে লাগল, কেউ বিস্কুট চিবুতে লাগল, আবার কেউ বা সময় কাটাবার জন্য "অস্ত্র শিক্ষা"-র পাতা ওল্টাতে লাগল। ঠিক সেই সময পূবদিকের কুয়াসা সাদা হয়ে এল; আর চারদিককাব সব কিছু যেন অন্ধকারেব ভিতর থেকে বেরিয়ে দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠল। গাড়ি-ঘোড়া, কামান-বন্দুক, সৈন্য-সামন্ত সবই স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

অচিরেই আবার যাত্রা শুরু হল; গ্রামাঞ্চলের ভিতর দিয়ে কয়েকশো পা এগিয়ে যাবার পরে আমাদের যার যার জায়গা মত মোতায়েন করে দেওয়া হলো। আমাদের ডান দিকে একটা আঁকাবাঁকা নদীর পাহাড়ী তীর সোজা উঠে গেছে, আর আছে একটা তাতার কবরখানার উঁচু উঁচু কাঠের খুঁটি; বাঁ দিকে ও সামনে কুয়াশার ভিতর দিয়ে চোখে পড়ছে একটুকরো অন্ধকাব মাঠ। পল্টনরা গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। আমাদের সাহায্যকারী অষ্টম সেনাদল তাদের অস্ত্রশস্ত্র স্তূপ করে রাখল, আর অন্য একদল সৈন্য বন্দুক ও কুড়ুল দিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল।

পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই কাঠের আগুনের ফট্‌ফট্‌ শব্দ শুরু হলো, ধোঁয়া উঠতে লাগল। সৈন্যরা ইতস্তত ছড়িয়ে ডালপালা ও কাঠ এনে আগুনে ফেলে দিয়ে হাত-পা গরম করতে লাগল; আর জঙ্গলের মধ্যে শত শত কুড়ুলের আঘাত ও গাছ পড়ার শব্দ অবিরাম ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে রেশারেশি করে গোলন্দাজ সৈনিকরা আলাদা করে আগুন জ্বালাল; সে আগুন এতই জোরে জ্বলতে লাগল যে তার দু'পায়ের মধ্যে যাওয়াই অসম্ভব; তবু সৈন্যরা আরও বরফ-লাগা ডালপালা এনে তাতে ফেলতে লাগল; ফলে ঘন, কালো ধোঁয়া উঠতে লাগল, ডালের পাতা থেকে বরফ গলে ফোঁটা ফোঁটা জল হিস্‌-হিস্‌ শব্দ করে আগুনের মধ্যে পড়তে লাগল; আগুনের নিচে পোড়া কয়লা জমে উঠে মরা, বিবর্ণ ঘাসও জ্বলতে লাগল। তবু সৈনিকদের মন উঠল না;

মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি টেনে নিয়ে এল, তার মধ্যে ঠেলে দিল লম্বা "স্তেপি" ঘাস, আর আগুনের শিখা আরও জোরে জ্বলে উঠল।

একটা সিগারেট ধরাবার জন্য আমি যখন আগুনের দিকে এগিয়ে গেলাম তখন ভেলেঞ্চুক খালি হাতে আগুনের একেবারে ভিতর থেকে একটুকরো কয়লা বের করে নিয়ে এল, এবং এ-হাত ও-হাত করতে করতে মাটির উপর ছুঁড়ে দিল।

একজন বলল, "এই, কে ওখানে, একটা কাঠি ধরিয়ে ওর হাতে দাও।" আর একজন বলল, "একটা চকমকি পাথর না হয় দাও ভাইসব।" ভেলেঞ্চুক আবারও সেই অঙ্গারটাকে হাত দিয়ে তুলতে যাচ্ছিল। তার আগেই আমি সিগারেটটা ধরিয়ে ফেললাম। সে তার ঝলসানো আঙুলগুলোকে কোটের উপর মুছতে লাগল; আর যেন একটা কিছু করার জন্যই একটা বড় কাঠের টুকরো তুলে বারকয়েক ঘুরিয়ে সেটাকে আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। শেষ পর্যন্ত হয় তো তাব মনে হলো যে এবার বিশ্রাম করা যেতে পারে; তাই সোজা আগুনের কাছে গিয়ে কোটটা খুলে ফেলে দুই পা ফাঁক করে দাঁড়াল; মুখটাকে একটু বেঁকিয়ে চোখ দুটো কোঁচকাল।

"এই যা! পাইপটাই ভুলে গেছি! আরে ভাই, দেখ তো কী গেরো!' একটু চুপ করে থেকে বিশেষভাবে কাউকে উদ্দেশ্য না করে সে কথাগুলো বলল।

২

রুশ বাহিনীর সব রকম সৈন্য—কসাক, রক্ষীসেনা, পদাতিক, অশ্বারোহী গোলন্দাজ, ইত্যাদি—সকলকে মিলিয়ে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

বহু উপশ্রেণী ও উপদলসহ এই তিনটি প্রধান শ্রেণী নিম্নরূপ:

(১) যারা বিনীত,

(২) যারা নেতৃত্বকামী, আর

(৩) যারা বেপরোয়া।

যারা বিনীত তাদের আবার দুই ভাগ (ক) নিষ্ক্রিয় বিনীত ও (খ) সক্রিয় বিনীত।

নেতৃত্বকামীদেরও দুই ভাগ (ক) কঠোর নেতৃত্বকামী ও (খ) সুকৌশল নেতৃত্বকামী।

বেপরোয়াদের ভাগ করা হয় (ক) বেপরোয়াভাবে বুদ্ধিমান ও (খ) বেপরোয়াভাবে উচ্ছৃংখল।

যে শ্রেণীটা প্রায়শই চোখে পড়ে—যে শ্রেণীটা সব চাইতে ভাল; সব চাইতে সহানুভূতিশীল; দয়া, পবিত্রতা, ধৈর্য, ও ঈশ্বরানুরাগ এই সব খৃস্ট্রীয় গুণের সঙ্গে যারা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত—সাধারণত সেটাই হলো বিনীত শ্রেণী। নিষ্ক্রিয় বিনীত শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো—ভাগ্যের যে কোনও বিপর্যয়ের মধ্যেও তারা মনের অক্ষয় শান্তি ও উদাসীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। সক্রিয় বিনীত শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য হলো

শান্ত কাব্যিক মনোভাব ও সংবেদনশীলতা; সীমিত মানসিক শক্তির সঙ্গে কর্ণের ও ঘর্মের প্রতি উদ্দেশ্যহীন অনুরাগের যোগ।

নেতৃত্বকামী শ্রেণীকে প্রায়শই দেখা যায় সেনাবিভাগের উচ্চতর পর্যায়ে : নন-কমিশন্ড্ অফিসার, কর্পোরাল, সার্জেন্ট, প্রভৃতি। কঠোর নেতৃত্বকামীরা সর্বদাই অভিজাত, উৎসাহী, প্রধানত সামরিক মনোভাবসম্পন্ন, যদিও তাদেব মধ্যেও উন্নত কাব্যিক প্রেরণার অভাব থাকে না (কর্পোরাল আন্তনভ এই দলে পড়ে; তার সঙ্গে পরে পাঠকের পরিচয় হবে)। সুকৌশল নেতৃত্বকামীর দলটা সম্প্রতি খুব দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। তারা সব সময়ই ভাল কথা বলতে পারে, শিক্ষিত, গোলাপী রঙের শার্ট পরে ঘুরে বেড়ায়, সকলের সঙ্গে এক পাত্র থেকে খায় না, কখনও কখনও মুসাতভ তামাক খায়, সাধারণ সৈনিকের তুলনায় নিজেদের অনেক উঁচু বলে মনে করে এবং কদাচিৎ প্রথম উপশ্রেণীর মতো ভাল সৈনিক হতে পারে।

যারা বেপরোয়াভাবে বুদ্ধিমান তাদের বৈশিষ্ট্য হলো অনমনীয় প্রফুল্লতা, সব কিছু করার ক্ষমতা, চরিত্রের পরিপূর্ণতা ও হঠকারী দুঃসাহস। যারা বেপরোয়াভাবে উচ্ছৃংখল তারা সাধারণতই খারাপ হয়ে থাকে; তবে রুশ বাহিনীর স্বপক্ষে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এরা সংখ্যায় খুবই অল্প, আর স্বল্পসংখ্যক যে ক'জন আছে তারা সাধারণত অন্য সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবেই থাকে। লাম্পট্যের ক্ষেত্রেও অবিশ্বাস ও বিচ্ছিন্নতাই তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ভেলেঞ্চুক পড়ে সক্রিয় বিনীতদের দলে। ইউক্রেনীয় বংশে তার জন্ম, পনেরো বছর চাকরি হয়ে গেল, সৈনিক হিসাবে আকর্ষণীয় ও খুব কৌশলী না হলেও সে আন্তরিক, দয়ালু, অসাধাবণ জেদী, আর অসাধারণ সৎ। অসাধারণ সৎ বললাম, কারণ গত এক বছরে এই বৈশিষ্ট্যটি তার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে বলা দরকার যে প্রায় সব সৈনিকেরই একটা করে ব্যবসা আছে। তার মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত ব্যবসা হচ্ছে দর্জি ও মুচির কাজ। ভেলেঞ্চুক নিজে প্রথম কাজটাই শিখেছিল, আর যেহেতু স্বয়ং সার্জেন্ট মিখাইল দরোফিচ তাকে দিয়ে এ-কাজ করিয়েছে, তাতেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এ-কাজে সে বেশ কিছুটা দক্ষতা অর্জন করেছে। গত বছর শিবিরে থাকার সময় ভেলেঞ্চুক মিখাইল দরোফিচের জন্য একটা হাল্কা ওভারকোট তৈরি করে দিতে রাজি হয়; যে রাতে সে কাপড়টা কেটে, খণ্ডগুলো আগাগোড়া টেঁকে নিয়ে সার্জেন্টের গায়ে পরিয়ে মাপটা দেখে নেয়, সেই রাতেই একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে। সাত রুবল দামের ওভারকোটের কাপড়টাই রাতারাতি উধাও হয়ে যায়। চোখের জল ফেলতে ফেলতে অনেক কষ্টে কান্না চেপে রেখে কম্পিত ঠোঁটে ভেলেঞ্চুক খবরটা দিল সার্জেন্টকে। মিখাইল দরোফিচ খুব রেগে গেল। রাগের মাথায় প্রথমটা দর্জিকে খুব ভয় দেখালেও একজন অবস্থাপন্ন উদার মানুষ হিসাবে পরে তাকে রেহাই দিল; ভেলেঞ্চুককে আর কোটের দামটা দিতে

হলো না। সক্রিয় ভেলেঞ্চুক অনেক খোঁজাখুঁজি করল, অনেক কান্নাকাটি করল, নিজের দুর্ভাগ্যের কথা অনেককে বলল, কিন্তু চোরকে পাওয়া গেল না। অত্যন্ত উচ্ছৃংখল সৈনিক চার্নভ তার সঙ্গে একই শিবিরে ঘুমত; তাকেই এ ব্যাপারে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ থাকলেও কোনও বাস্তব প্রমাণ ছিল না। মিখাইল দরোফিচ সমেত উপরতলার অন্য সকলে ব্যাপারটা ভুলে গেলেও ভেলেঞ্চুক তার এই দুর্ভাগ্যের কথা ভুলতে পারল না। সৈন্যরা বলে যে তাদের তো ভয়ই হয়েছিল সে হয় তো আত্মঘাতী হবে, অথবা পাহাড়ে চলে যাবে। সে মদ খেত না, খাবার জিনিস মুখে দিত না, কাজকর্ম করত না, সারাক্ষণ কেবল কাঁদত। তিন দিন পরে মিখাইল দরোফিচের সামনে হাজির হয়ে সে বিবর্ণ মুখে, কাঁপা হাতে আস্তিনের ভিতর থেকে কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে তাকে দিল। ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "মিখাইল দরোফিচ, ঈশ্বরের দিব্যি, এর বেশি আমার কাছে নেই—এটাও আমি ধার করেছি ঝদালভ-এর কাছ থেকে; উপার্জন করতে পারলে আরও দু' রুবল আমি পরে দেব। লোকটা (সে যে কে তা ভেলেঞ্চুকও জানে না!) আপনার চোখে আমাকে জোচ্চোর বানিয়েছে; সাপের মত কুটিল সেই লোকটা একজন সহকর্মী সৈনিকের প্রাণনাশও করতে পারে; পনেরো বছর ধরে চাকরি করছি..." মিখাইল দরোফিচের এটুকু প্রশংসা করতেই হবে সে দু'মাস পরে ভেলেঞ্চুক যখন তার কথামতো দুই রুবল নিয়ে গিয়েছিল সে তখন হাত পেতে সেটা নেয়নি।

ভেলেঞ্চুক ছাড়াও আমার পল্টনের আরও পাঁচটি সৈনিক আগুনের চারিদিকে বসে শরীর গরম করছিল।

সেখানে বাতাস লাগবে না এমন একটা ভাল জায়গায় একটা পিপের উপরে বসে কর্পোরাল ম্যাক্সিমভ পাইপ টানছিল। হাঁটতে হাঁটতে তার কাছে গেলাম। আমার দিকে মাথাটা ফেরালেও তার চোখ রইল আগুনের দিকেই। ম্যাক্সিমভ লাখেরাজদার বংশের ছেলে; অনেক টাকাপয়সার মালিক; ট্রেনিং ব্রিগেডে লেখাপড়া শিখে ভাল পদে চাকরি পেয়েছে। সৈনিকরা বলে, সে "সাংঘাতিক ধনী আর সাংঘাতিক পণ্ডিত!" ম্যাক্সিমভ মোটেই বোকা নয়, কিন্তু তার একটা অদ্ভুত ঝোঁক আছে দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলার। বিশেষ করে "উৎপাদন" ও "দীর্ঘায়ত" কথা দুটি ব্যবহার করতে সে বড় বেশি ভালবাসে। যখনই সে কথার মধ্যে ঐ দুটি শব্দ ব্যবহার করে তখনই আমি বুঝতে পারি যে এর পর যা শুরু হবে তার বিন্দুবিসর্গও আমি বুঝতে পারব না। সৈন্যরা কিন্তু তার এই "উৎপাদন" শুনতে খুব ভালবাসত, এবং কোনও কিছু না বুঝেই তার পাণ্ডিত্যের তারিফ করত। বুঝতে না পারার জন্য নিজেদের অজ্ঞানতাকেই তারা দায়ী করত, আর ফেদর ম্যাক্সিমভ-এর প্রতি তাদের ভক্তি আরও বেড়ে যেত। এক কথায়, ম্যাক্সিমভ একজন কুশলী কম্যান্ডার।

দ্বিতীয় যে সৈনিকটি আগুনের কাছে বসে তার পেশীবহুল লাল পা থেকে মোজা

খুলছিল তার নাম আন্তনভ—এ সেই গোলন্দাজ আন্তনভ যে '৩৭ সালে একটা খোলা জায়গায় অন্য দু'জন সৈনিকসহ একটিমাত্র কামান নিয়ে একটা শক্তিশালী শত্রু-বাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছিল, এবং উরুতে দু'দুটো গুলি বিদ্ধ হবার পরেও কামানে গোলা ভরে অনবরত গোলাবর্ষণ করেছিল। সৈন্যরা তার সম্পর্কে বলে, "ঐ স্বভাবটি না থাকলে আগেই সে সার্জেন্ট হয়ে যেতো।" সত্যি তার প্রকৃতিটাই অদ্ভুত : যখন মেজাজ ঠিক থাকে তখন তার চাইতে শান্ত, নিরুপদ্রব, ন্যায়বান লোক হয় না; কিন্তু মদ খেলেই সে একেবারে ভিন্ন মানুষ : কর্তৃপক্ষকে মানে না, লড়াই করে, কোন্দল করে, একটা নিষ্কর্মার ধাড়ি হয়ে ওঠে। এই তো এক সপ্তাহও হয়নি; শ্রোভ্‌টাইডে গিয়ে সে মদ খেতে শুরু করল, এবং কামানের সঙ্গে বেঁধে রাখার ভয় দেখানো সত্ত্বেও এন্তার মদ গিলে লেন্ট উৎসবের প্রথম সোমবার পর্যন্ত হল্লোড় করেই কাটিয়ে দিলো। সেনাদলের উপর হুকুম হলো, লেন্ট উৎসবের সময় মাংস খেতে হবে, কিন্তু স্রেফ বিস্কুট চিবিয়েই সে কাটিয়ে দিলো; এমন কি র‍্যাশনের বরাদ্দ ভদ্‌কা পর্যন্ত নিলো না।

তৃতীয় সৈনিকটির নাম চিকিন; আগুনের কাছে বসে আছে; কানে ঈয়ারিং, মোটা গোঁফ, পাখির মতো মুখ, দাঁতের ফাঁকে একটা চীনা পাইপ; সে একজন কামান-চালক। সৈন্যরা তাকে "ভালমানুষ চিকিন" বলে ডাকে। লোকটি রসিক। কি তুষারবৃষ্টিতে, কি জমাট বরফে, হাঁটু পর্যন্ত পা ডুবিয়ে দু'দিন অনাহারে থেকে মার্চ করতে, প্যারেড করতে, বা ড্রিল করতে করতেও সে সারাক্ষণ মুখভঙ্গি করবে, লাফ্‌-ঝাঁফ করবে, এমন সব রঙ্গরস করতে থাকবে যে গোটা পল্টন হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়বে। যাত্রা-বিরতির সময় অথবা শিবিরে থাকা কালে—সর্বত্রই একদল অল্পবয়সী সৈন্য চিকিনকে সর্বদাই ঘিরে থাকে। তাদের সঙ্গে হয় সে "ফিল্‌কা" খেলে, নয়তো কোনও চালাক সৈনিক বা ইংরেজ লর্ডের গল্প বলে, অথবা কোনও তাতার বা জার্মানের নকল করে,—আর সে যা করে তাতেই সকলে হেসে খুন হয়। আসলে রসিক মানুষ হিসাবে তার খ্যাতি এতই সুপ্রতিষ্ঠিত যে সে হাঁ করলে বা চোখ টিপলেই সকলে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

চতুর্থ সৈনিকটি যুবক, একেবারে সাদামাঠা ছেলে, এই প্রথম অভিযানে যোগ দিতে এসেছে। হাঁটু ভেঙে একেবারে ধোঁয়ার মধ্যে গিয়ে বসেছে; আগুনের এত কাছে চলে গেছে যে ভয় হয় যে-কোনও মুহূর্তে তার লোমের কোটে আগুন ধরে যেতে পারে; তবে যুবকটি বেশ শান্ত ও সংযত।

পঞ্চম ও শেষ সৈনিকটির নাম ঝ্‌দানভ খুড়ো। আগুন থেকে কিছুটা দূরে বসে ছুরি দিয়ে একখানা লাঠি চাঁচছে। গোলন্দাজ বাহিনীর অন্য সব সৈনিকের তুলনায় তার চাকরি পুরনো; তাদের সকলকেই সে নতুন চাকরিতে যোগ দিতে দেখেছে; দীর্ঘদিনের অভ্যাসমতো সকলেই তাকে খুড়ো বলে ডাকে। লোকে বলে, সে মদ খায়

না, ধূমপান করে না, তাস খেলে না, (এমন কি 'নস্কি'র মতো নির্দোষ খেলাও না); যখন হাতে কোনও কাজ নিয়েই থাকে। ছুটির দিনে সম্ভব হলেই গির্জায় যায়, মূর্তির সামনে এক কোপেক দামের মোমবাতি জ্বেলে দেয়, স্তোত্র পাঠ করে। একমাত্র ঐ বইটা পড়তেই সে জানে। সৈন্যদের সঙ্গে সে বড় একটা মেলামেশা করে না—বয়সে ছোট হলেও পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে সে নির্বিকার ভদ্রতা রক্ষা করে চলে; নিজে মদ খায় না বলে সমান-সমানদের সঙ্গেও মেলামেশার সুযোগ হয় না; তবে যারা নতুন আসে সেই সব তরুণ সৈনিকদের সে ভালবাসে—তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে, নিয়ম-কানুন পড়ে শোনায়, নানাভাবে সাহায্য করে। এই যে ম্যাক্সিমভ এখন একজন পুরোদস্তুর গোলন্দাজ সৈনিক হয়ে উঠেছে সে নিজে আমাকে বলেছে. দশ বছর আগে সে যখন নতুন কাজে যোগ দিয়েছিল তখন বয়স্ক সৈনিকদের পাল্লায় পড়ে সব টাকা সে মদেই উড়িয়ে দিতো। সেই অবস্থা দেখে ঝ্দানভ তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুব বকেছিল, সৈনিক-জীবনের আচরণবিধি পড়ে শুনিয়েছিল, একটা শার্ট ও আধ রুবল হাতে দিয়ে তবে ছেড়েছিল। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ম্যাক্সিমভ সব সময়ই বলে, "খুড়ো আমাকে মানুষ করেছে।" ভেলেঞ্চুকের কাছ থেকে যখন কোটটা চুরি গিয়েছিল তখন ঝ্দানভ তাকেও সাহায্য করেছিল।

তার চাইতে ভাল, তার চাইতে সাহসী, অথবা অধিকতব নির্ভরযোগ্য একজন সৈনিক পাওয়া অসম্ভব; কিন্তু সে এত শান্ত ও অনাকর্ষণীয় যে আজ পর্যন্ত একটা গোলন্দাজ অফিসারের পদে তার উন্নতি হলো না। ঝ্দানভের একমাত্র নেশা সঙ্গীত; কয়েকটি গান সে বিশেষভাবে পছন্দ করত। প্রায়ই তরুণ সৈনিকদের ভিতর থেকে একদল গায়ক জুটিয়ে নিতো; যদিও সে নিজে গান করতে জানে না তবু সে তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে তালে তাল দিতো, মাথা নাড়ত। মাথাটা চাঁদের মতো সাদা, গোঁফ জোড়া কলপ দিয়ে কালো করা, রোদে-পোড়া মুখে একটা কঠোর, কর্কশ ভাবই চোখে পড়ে প্রথম দৃষ্টিতে; কিন্তু তাব বড় বড় দুটি গোল চোখের দিকে ভাল করে তাকালে, বিশেষ করে সে চোখ যখন হাসিতে ঝিলিক দিয়ে ওঠে (সে কদাপি ঠোঁট দিয়ে হাসে না), তখন শিশুসুলভ একটা অসাধারণ মমতা আপনাকে মুগ্ধ করবেই।

৩

ভেলেঞ্চুক আবার বলে উঠল, "এই যা! আমার পাইপটার কথাই ভুলে গেছি! দেখো তো ভাই, কী গেরো!"

চিকিন বলে উঠল, "তোমার তো 'সিকার্স'-এর ধূমপান করা উচিত। আমি তো বাড়িতে 'সিকার্স'-ই খাই; সেটা অনেক বেশি মিঠে!"

স্বভাবতই সকলে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

"তা বটে, পাইপের কথা ভুলে গিয়েছিলে," ম্যাক্সিমভ বাধা দিয়ে বলল;

উপরওয়ালার ভঙ্গিতে কথাটা বলে সে হাতের তালুতে পাইপটা ঠুকতে লাগল। "কোথায উধাও হয়েছিলে হে ভেলেঞ্চুক?"

ভেলেঞ্চুক মুখটা একটু ঘুরিয়ে টুপিতে হাত দিতে গিয়েও হাতটা নামিয়ে নিলো।

"পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কাল রাতে তোমার যথেষ্ট ঘুম হয়নি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমচ্ছ। এ জন্য বন্ধুরা তোমাকে ধন্যবাদ দেবে না।"

"ফেদর ম্যাক্সিমিচ, আমি যদি এক ফোঁটাও মুখে দিয়ে থাকি তো এখানেই আমার পেট চিরে দু'ফাঁক করে ফেলুন; আমার যে কি হয়েছিল তা আমি নিজেই জানি না," ভেলেঞ্চুক জবাব দিলো। "মাতাল হযে কী যে সুখ!" সে অস্ফুট স্বরে বলল।

"তা বটে; কিন্তু এ জন্য কম্যান্ডারেব কাছে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে; ব্যাপারটা খুবই কলঙ্কজনক," শান্ত গলায় ম্যাক্সিমভ বলল।

মুহূর্তকাল নীরব থেকে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বিশেষ কাউকে লক্ষ্য না করেই ভেলেঞ্চুক বলতে লাগল, "এটাই তো মজার ব্যাপার ভাইসব। ষোল বছর চাকরি করছি—আগে কখনও এ রকম ঘটেনি। যখন নাম-ডাকার জন্য সকলকে তৈরি হতে বলল তখন তো যথারীতি সেখানে হাজিবও হযেছিলাম—কোনও রকম ভুলই তো হযনি; তারপর পার্কের মধ্যে হঠাৎই আমার গলাটা কে যেন চেপে ধরল...শক্ত করে, আরও শক্ত করে চেপে ধরে আমাকে মাটিতে ফেলে দিলো, আব তাতেই...এমন ঘুম ঘুমালাম যে কিছুই কানে গেল না। নিশ্চয অচেতন হযে পড়েছিলাম," সে কথা শেষ করল।

বুট জোড়া পরে নিয়ে আন্তনভ বলল, "আমি তো তোমাকে জোব করে জাগিযে তুলেছি; ধাক্কা দিতে দিতে...যেমন করে লোকে কাঠের গুঁড়িকে গড়ায়।"

ভেলেঞ্চুক বলল, "তাহলেই বোঝো, মাতাল হলে তো অন্য বকম হতো.."

চিকিন শুরু করল, "আমার বাড়ির মেয়েমানুষটিও ওই রকমই ছিল। শোনো তাহলে। দু'দিন সে স্টোভের উপর থেকে উঠল না। ঘুমিয়ে আছে মনে করে সকলে তাকে ঝাঁকি দিয়েই বুঝল সেখানেই সে মরে পড়ে আছে—ঠিক ঐ বকম, সেও ঘুমিযেই পড়েছিল। তোমার মতোই, কি বলো বন্ধু!"

তারপবেই শুরু হলো চিকিনের গল্পের ফোয়াবা। কত রকমেব গল্প। সকলে হেসে খুন হবার যোগাড়।

"লোকে তোমার কথা বিশ্বাস করে চিকিন?" ম্যাক্সিমভ বলল।

লোকরাই একটু অদ্ভুত ফেদর ম্যাক্সিমিচ, তারা সব—সব কিছু বিশ্বাস করে। তাদের কাছে 'কিজ্‌বেক' পর্বতের কথা বলতে গিয়ে আমি যখন বলি যে সাবা গ্রীষ্মকালে সেখানে বরফ গলে না তখন তারা ভালমানুষের মতো হাসে; 'কি বলছ তোমরা? সব বানিয়ে বলছি! সত্যি অত বড় পাহাড়ে বরফ গলে না! আরে বাবা, আমাদের এখানে যখন বরফ গলতে শুরু করে, তখন চূড়ার বরফ আগে গলে, কিন্তু

গর্তগুলোর মধ্যে তখনও বরফ থেকে যায়। বুঝলে তো ব্যাপারটা!" চোখ মিটমিট করে চিকিন কথা শেষ করল।

৪

সূর্যের উজ্জ্বল গোল রেখাটা দুধের মতো সাদা কুয়াসার ভিতর দিয়ে ঝলমল করতে করতে বেশ অনেকটা উঠে এসেছে; লিলাক-ধূসর দিগন্ত রেখাটি ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে; তবু সেটা এখনও অস্পষ্ট কুয়াসার সাদা দেয়ালে যেন ঠেকে আছে।

আমাদের সামনে অনেকগুলো কাটা গাছ পড়ে আছে। তার ওপারে বেশ বড় একটা মাঠ। ধোঁয়ার কুণ্ডলী কখনও দুধের মতো সাদা, কখনও কালো, কখনও ল্যাভেন্ডার-রং ধরে মাঠের উপর ছড়িয়ে পড়েছে; কুয়াসার সাদা স্তরগুলি নানা বিচিত্র মূর্তির রূপ ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক দূরে চোখে পড়ছে, অশ্বারোহী তাতাররা মাঝে মাঝে দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে; মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছে আমাদের হাল্কা কামানের শব্দ, আর তাদের রাইফেল ও কামানের শব্দ।

ক্যাপ্টেন খলপভ বলল, "এখনও শুরু হয়নি, ওটা একটু রসিকতা করা হচ্ছে।"

আমাদের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নবম হাল্কা পদাতিক বাহিনীর উপর। তার কম্যান্ডার আমার কামানগুলোর কাছে এগিয়ে এল। আমাদের কাছ থেকে সাড়ে তিন শ' গজেরও বেশি দূরে বনের প্রান্তে ঘোড়ার পিঠে তিনজন তাতারকে দেখিয়ে সে আমাকে অনুরোধ করল, তাদের লক্ষ্য করে একটা গোলা বা বোমা ছুঁড়তে।

আমার কাঁধের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে সদয় হাসি হেসে বলল, "চেয়ে দেখো, ওই যে দুটো বড় গাছ রয়েছে তার সামনে একজনকে দেখা যাচ্ছে কালো সার্কাসিয়ান কোট গায়ে সাদা ঘোড়ায় চেপে চলেছে; আর তার পিছনে রয়েছে আরও দু'জন। ভাল করে দেখো। তুমি কি মনে করো তাদের পাল্লার মধ্যে. "

তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি আন্তনভ আমাদের কাছে এগিয়ে এসে বলে উঠল, "গাছের নিচে আরও তিনজন চলেছে।"

"তাদের মধ্যে প্রথম জন ইতিমধ্যেই খাপ থেকে পিস্তলটা টেনে বের করেছে।"

আমাদের একটু পিছনে একদল সৈনিকের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভেলেঞ্চুক বলল, "দেখো ভাই সব, সে গুলি ছুঁড়ছে! ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে।"

"সে নিশ্চয় আমাদের সীমানা পেরিয়ে এসেছে, ব্যাটা বেঁটে বামন!" আর একজন মন্তব্য করল।

তৃতীয় একজন বলে উঠল, "দেখো, দেখো, ওরা অনেকে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে; নিশ্চয় কামান বসাবার মতো জায়গা খুঁজছে। ওই ঝোপটা লক্ষ্য করে একটা বড় হাত-বোমা ছুঁড়তে পারলেই কেল্লা ফতে..."

"আচ্ছা, ওরা কতটা দূরে আছে বলে মনে হয়?" চিকিন শুধালো।

ম্যাক্সিমভ জবাব দিলো, "সাড়ে তিন হাজার, বড় জোর তিন হাজার ছ'শ ফুট, তার বেশি নয়। হাউইট্জারের পঁয়তাল্লিশের গুলি ছুঁড়লে নির্ঘাৎ কুপোকাৎ হবে।"

পদাতিক বাহিনীর কম্যান্ডার আবার আমাকে বলল, "জানো, এখন ওই ঝোপ লক্ষ্য করে গোলা ছুঁড়লে একজন না একজনকে পাবেই। এখন ওরা অনেকে ভিড় করেছে; অতএব যত তাড়াতাড়ি পারো কামান দাগো।"

কামান দাগার হুকুম দিলাম।

সকলে কয়েক পা পিছিয়ে এল। গোলাটা কি ভাবে ছুটে যায় দেখবার জন্য আন্তনভ এক পাশে কিছুটা ছুটে গেল : নলের মুখ থেকে আগুন ছিটকে বের হলো; একটা ধাতব প্রতিধ্বনি বাজল।

দূরে অশ্বারোহী দলের পিছনে সাদা ধোঁয়া দেখা গেল, তাতারের জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে এদিক ওদিক সরে পড়ল; বিস্ফোরণের শব্দ আমাদের কানে এল।

"জব্বর হয়েছে! দেখো ওরা কেমন ছুটে পালাচ্ছে হা, শয়তানের দল, কেমন লাগছে, অ্যাঁ!" গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনীর অফিসারের বহরা মিলে; হো হো করে হাসতে লাগল।

ভেলেঞ্চুক বলল, "যদি আর একটু নিচু করে ছুঁড়তে পারতে, তা হলে একেবারে ওদের ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়ত, তার বদলে পড়ল গিয়ে জঙ্গলে, তা হলেই দেখা গেল —একটু ডাইনে সরে গিয়েছিল।"

৫

কামানের গোলা দেখে তাতাররা কেমন করে পালিয়ে গেল, কেনই বা তারা ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে এসেছিল, এখনও তাদের আরও অনেকে জঙ্গলের মধ্যে আছে কি না—সৈন্যরা এই সব আলোচনায় মেতে উঠল। পদাতিক বাহিনীর কম্যান্ডারকে সঙ্গে নিয়ে আমি সেখান থেকে কয়েক পা সরে গিয়ে একটা গাছের নিচে বসলাম। কম্যান্ডারের প্রস্তাবমতো গরম মাংসের পাত্রটা কতক্ষণে আসবে তার জন্যই অপেক্ষা করতে লাগলাম। কোম্পানি কম্যান্ডার বল্খভ ধনী লোক, এর আগে রক্ষী বাহিনীতে ছিল, ফরাসী ভাষায় কথা বলে। তবু সহকর্মীরা তাকে পছন্দ করে।

এ কথা সে কথার পর বল্খভ আলসাভরে বলল, "এ কাজ যে কখন শেষ হবে? আমার তো বিরক্তি ধরে গেছে।"

আমি বললাম, "আমার কিন্তু বিরক্তি ধরেনি। বরং যখন আপিসে ছিলাম তখনই খারাপ লাগছিল।"

সে তীব্র স্বরে বলে উঠল, "আরে, আপিস তো এর চাইতে দশ হাজার গুণ খারাপ। সে কথা নয়, আমি বলছিলাম, এ সব একেবারে চুকে যাবে কবে?"

“তাহলে আপনি কি চান এ সব চুকে যাক?” আমি শুধালাম।

“সব কিছু। পুরোপুরি।...ওহে নিকোলায়েভ, মাংসের বল তৈরি হলো?” সে আর্দালিকে জিজ্ঞাসা করল।

আমি বললাম, “ককেসাসকে আপনার যদি এতই অপছন্দ তাহলে ককেসাসে চাকরি নিলেন কেন?”

দৃঢ় আন্তরিকতার সঙ্গে সে জবাব দিলো, ‘কেন তা তো আপনি জানেন, রূপকথার টানে। বৃহত্তর রাশিয়াতে ককেসাসকে নিয়ে কত রূপকথাই যে ছড়িয়ে আছে : যেন হতভাগ্য লোকদের পক্ষে এটা একটা স্বর্ণরাজ্য।”

“কিন্তু কথাটা তো প্রায় সত্যি”, আমি বললাম, “আমাদের মধ্যে অনেকেই..”

আমাকে বাধা দিয়ে সে বলে উঠল, “কিন্তু সব চাইতে বড় কথা হলো, আমাদের মতো যারাই রূপকথার টানে ককেসাসে আসে তারাই শেষটায় ভীষণভাবে পস্তায়, আমি তো বুঝতেই পারি না প্রেমে ব্যর্থতা অথবা ব্যবসায়ে গোলমালের ফলে কাজান বা কালুগাতে না গিয়ে লোকে ককেসাসে আসে কেন। কি জানেন, রাশিয়ায় থাকতে ককেসাসকে লোকে একটা আশ্চর্য চোখে দেখে : সেখানে আছে চিরন্তন কুমারী বরফের দেশ, আছে খরস্রোতা নদী, তীক্ষ্ণধার ছুরিকা, বড় জোব্বা আর সার্কাসিয়ান কোট, এ সব কথা ভাবলে মনে উত্তেজনা জাগে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এর মধ্যে মজা পাবার মতো কিছুই নেই।”

হেসে বললাম, “ঠিক কথা, রাশিয়াতে থাকতে আমরা ককেসাসকে অন্য চোখে দেখি। যে ভাষা আপনি ভাল জানেন না সেই ভাষায় কবিতা পড়ার অভিজ্ঞতা আপনার কখনও হয়েছে কি? সেক্ষেত্রে কবিতাটি আসলে যা তার চাইতে বেশি ভালই মনে হয়...”

সে বাধা দিয়ে বলল, “আমি ঠিক জানি না।...কিন্তু ককেসাসকে আমি ভীষণ অপছন্দ করি।”

“না, আমার কাছে কিন্তু এখনও ককেসাস সুন্দর, শুধু অন্য রকম...”

সে বিরক্ত হয়ে বলল, “হয় তো সুন্দর। আমি শুধু জানি ককেসাসে আমি ভাল থাকি না।”

“তা কেন?”

“কারণ প্রথমত, ককেসাস আমাকে ঠকিয়েছে। রূপকথা অনুসারে ককেসাসে এসে আমি যা কিছু ভুলতে চেয়েছিলাম, সে সবই এখানেও আমার সঙ্গে এসেছে, তফাৎ শুধু এইটুকু—যা আগে ছিল বড় মাপের সেটা এখন ছোট মাপের হয়ে দেখা দিয়েছে—সেই লক্ষ লক্ষ ছোট যন্ত্রণা, কদর্যতা, অপমান; দ্বিতীয়ত, আমার মনে হচ্ছে নৈতিক জীবনে প্রতিদিন আমি নিচু হতে আরও নিচে তলিয়ে যাচ্ছি; আসল কথা হলো—এখানে কাজ করতে আমি অক্ষম : বিপদকে আমি সহ্য করতে পারি না...এ কথায়, আমার সাহস নেই...” সে থামল; সাগ্রহে আমার দিকে তাকাল।

এই অপ্রত্যাশিত স্বীকৃতি আমাকে অবাক করে দিলো, তবু আমি তার সঙ্গে তর্ক করলাম না। সে নিজেই আবার বলতে শুরু করল।

"আপনি জানেন এবারকার অভিযানে এটাই আমাদের প্রথম মুখোমুখি সংঘর্ষ, অথচ কালকের দিনটা যে আমার কি ভাবে কেটেছে তা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। সার্জেন্ট যখন রণযাত্রার হুকুমটা এনে দিলো তখন আমি কাগজের মতো বিবর্ণ হয়ে গেলাম, যন্ত্রণায় একটা কথাও বলতে পারলাম না। আর আমার রাতটা যে কি ভাবে কেটেছে তা যদি জানতেন। ভয়ে লোকের চুল সাদা হয়ে যায় এ-কথা যদি সত্যি হয়তো এতক্ষণে আমার সব চুল সাদা হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কারণ একটা রাতে আমি যে কষ্ট ভোগ করেছি কোনও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত লোকও সে কষ্ট পায় না, আর যদিও এখন রাতের চাইতে কিছুটা ভাল আছি তবু এখানটায় কি যেন একটা সব সময় এইভাবে চলছে" হাতটা মুঠি করে বুকের উপর চক্রাকারে ঘসতে ঘসতে সে বলল। "আরও মজার ব্যাপার কি জানেন একটা ভয়ংকর নাটক যখন অভিনীত হয়ে চলেছে আমি তখন পেঁয়াজ সহযোগে মাংসের কাবাব খাচ্ছি আর আপনি ব্যাপারটাকে খুব সুখের মনে করছেন। নিকোলায়েভ মদ আছে?"

"ভাইসব, ঐ তো সে!" ঠিক সেই সময় একটি সৈনিকের আতংকিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল—সকলেরই দৃষ্টি চলে গেল দূর বনপ্রান্তে।

অনেক দূরে একটা নীলাভ ধোঁয়ার মেঘ উঠে ক্রমশ বড় হতে হতে বাতাসে ভেসে আসছে। যখন বুঝতে পারলাম, শত্রুপক্ষ আমাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছে, সেই মুহূর্তে চারিদিককার সব কিছু যেন নতুন রঙে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গাদা করা রাইফেল, কাঠের আগুনের ধোঁয়া, নীল আকাশ, সবুজ রং করা কামানের গাড়ি নিকোলায়েভের রোদে-পোড়া, গোঁফওয়ালা মুখ--সব কিছুই যেন আমাকে বলে দিল, ওই যে গোলাগুলি নলের মুখ থেকে বেরিয়ে বাতাসের ভিতর দিয়ে ছুটে আসছে সেটা তো সোজা এসে আমার বুকেও লাগতে পারে।

আলস্যভরে বল্‌খভকে শুধালাম, "মদ পেলেন কোথায়?" অথচ আমার অন্তরের গভীরে তখন দুটি স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর কথা বলে চলেছে একটি বলছে, হে প্রভু আমার আত্মাকে শান্তিতে গ্রহণ করো, অন্যটি—গুলিটা যখন ছুটে যাবে আশা করি আমি তখন মাথাটা নুইয়ে হাসতে পারব--আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের মাথার উপর দিয়ে হুস করে উড়ে গিয়ে আমাদের দুই পা দূরে গোলাটা ফেটে গেল।

আমার দিকে ফিরে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা গলায় বল্‌খভ বলল, "আমি যদি নেপোলিয়ন বা ফ্রেড্‌রিক হতাম, তাহলে নির্ঘাৎ সুন্দর কিছু বাণী শোনাতাম।"

"কিন্তু আপনি তো এইমাত্র তাই শোনালেন।"

"কিন্তু আমি কি বলেছি তাতে কি আসে যায় এ কথাগুলি তো কেউ লিখে রাখবে না।"

"কিন্তু আমি লিখব।"

সে হেসে বলল, "কিন্তু আপনি লিখলেও তো এ কথার সমালোচনাই লিখবেন: মিশ্‌চেন্‌কভ তো তাই বলেন।"

"বাঃ, দুই হতভাগ্য!" ঠিক আমাদেব পিছন থেকে কথাটা বলে আন্তনভ এক পাশে বিরক্তিভরে থুথু ফেলল, "আপনাবা আমাদের দেখলেন না তো।"

এই আন্তরিক উচ্ছ্বাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শান্ত থাকবাব সব চেষ্টা সব বকম কথার মাব প্যাঁচ হঠাৎ আমাব কাছে দুঃসহ রকমের বোকামি বলে মনে হতে লাগল।

৬

তাতারবরা যেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, শত্রুপক্ষ সেখানেই দুটো কামান পেতেছে. প্রতি বিশ-ত্রিশ মিনিট অন্তব আমাদেব কাঠুরেদেব লক্ষ্য করে তারা গোলা ছুঁড়ছে। আমাব পল্টনটি বনের মধ্যে ফাঁকা জায়গা দেখে এগিয়ে গেছে, তাদের পাল্টা আক্রমণেব হুকুম দেওয়া হয়েছে। বনেব প্রান্তে কখনও একটু ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে, কখনও একটা গোলাব শব্দ. কখনও একটা শিস, কখনও বা একটা গোলা এসে পড়ছে আমাদেব পিছনে বা সামনে।

কাঠ কাটিয়েরা তাদের কাজ করে যাচ্ছে, জঙ্গলেব মধ্যে কুড়ুলেব শব্দ দ্রুত হতে দ্রুততর হচ্ছে, শুধু যখনই গোলাব হিস্ হিস্ শব্দ শোনা যাচ্ছে তখনই হঠাৎ সকলেই চুপ করে যাচ্ছে আর সেই মুহূর্তে। স্তব্ধতার মধ্যে, একটা শান্তপ্রায় গলা শোনা যাচ্ছে 'হুঁশিয়ার বাছাবা।" সঙ্গে সঙ্গে সকালের দৃষ্টি গিয়ে পবছে আগুন ও ডালপালাব উপর ছিটকে-পড়া গোলাটাব দিকে।

ততক্ষণে কুয়াসা সম্পূর্ণ উঠে গিয়ে মেঘে রূপান্তরিত হয়ে ধীরে ধীরে গাঢ় নীল আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে. সূর্যের উজ্জ্বল কিরণরাশি সঙ্গীনের ইস্পাতে, কামানের তামাব পাতে. ও গলিত বরফের উপর পড়ে ঝকমক করছে. জঙ্গলের শুকনো পাতার উপর রোদ পড়ে হাজার রকমের ঝাঁকিঝুঁকি কাটা হয়েছে।

সৈন্যদের কাজকর্ম আরও জোরদাব হয়ে উঠেছে। গুলির নীলচে ধোঁয়া সব দিক থেকেই চোখে পড়ছে। পদাতিক বাহিনীর গান ভেসে আসছে, কাঠ বোঝাই গাড়িগুলো পিছন দিকে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে। জেনারেল ঘোড়ায় চেপে আমাব পল্টনেব কাছে এসে ফিরে যাবাব জন্য প্রস্তুত হবাব হুকুম দিলো। শত্রুপক্ষ আস্তানা গেড়েছে আমাদের বাঁ দিকে, সেখান থেকেই রাইফেল চালিয়ে আমাদেব কাজে বাধার সৃষ্টি কবছে। জঙ্গলের বাঁ দিক থেকে একটা বুলেট এসে কামানেব গাড়িটাকে আঘাত করল; তারপর আর একটা, আরও একটা...আমাদের পদাতিক সৈনিকরা কাছেই শুয়েছিল; তাড়াতাড়ি উঠে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। রাইফেল থেকে গুলিবর্ষা শুরু হলো, বুলেট ঘন হয়ে ছুটতে লাগল। আমাদের ফিরে চলার কাজও শুরু হলো, আর তার ফলে দেখা দিলো ককেসাসের সত্যিকারের যুদ্ধ।

বেশ বোঝা যাচ্ছে পদাতিক বাহিনী যেমন কামানের গোলাকে অপছন্দ করে, তেমনি গোলন্দাজ বাহিনীর লোকরাও বুলেটকে অপছন্দ করে। আন্তনভেব ভুরু দুটো জুড়ে গেল। চিকিন বুলেটের শব্দ নকল করে ব্যঙ্গ করতে শুরু করল। কখনও বলছে, "আহা, কি রকম ছুটছে," কখনও বলছে, "যেন ছোট্ট মৌমাছিটি," আবার কোনওটাকে বলছে, "বাপ-মা মরা।" তা শুনে সকলেই হাসছে।

নতুন সৈনিকটি প্রতিটি বুলেট দেখেই মাথাটা কাত করে গলাটা বাড়িয়ে দিচ্ছে; তা দেখে সৈন্যরা হেসে উঠছে। "আরে, তুমি কি বান্ধবীকে নমস্কার করছ?" ভেলেঞ্চুক বিপদের তোয়াক্কা করে না, কিন্তু এখন তাকেও উত্তেজিত মনে হচ্ছে। যে দিক থেকে বুলেট আসছে আমরা সেদিক লক্ষ্য করে ছর্‌-রা্‌ মারছি না বলেই তার রাগ হয়েছে। অসন্তুষ্ট গলায় সে বলল, "বিনা বাধায় ওকে বুলেট ছুঁড়তে দেওয়া হচ্ছে কেন? বন্দুকগুলোকে ঘুরিয়ে কিছু ছর্‌-রা মারলেই ওরা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

সত্যি তাই : হুকুম দিলাম, শেষ গোলাটা ছোঁড়া হয়ে গেলেই ছর্‌রা গুলি ভরা হোক।

ঠিক সেই সময় আমার পিছনেই অনতিদূরে হঠাৎ একটা বুলেটের হিস্‌-হিস্‌ শব্দ শুনতে পেলাম; পরক্ষণেই একটা কিছু দুম্‌ করে পড়ে যাওযার সঙ্গে সঙ্গে সে শব্দটা থেমে গেল। "নিশ্চয় আমাদের কারও গায়ে বুলেট লেগেছে", এ-কথা মনে হলেও ভয়ে আমি কোনও দিকে তাকাতে সাহস পেলাম না। শুধু কানে এল একটা লোকের ধুপ্‌ করে পড়ে যাওয়ার শব্দ এবং "ও-ও-ও-ও" রবে একটি আহতের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। একটি পরিচিত কণ্ঠ বলে উঠল, "আমি আহত হয়েছি ভাইসব!" ভেলেঞ্চুকের গলা। গাড়ি ও কামানের মাঝখানে সে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। যে কার্তুজের বাক্সটা সে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সেটা একপাশে পড়ে আছে। তার কপালটা রক্তে ভিজে গেছে; একটা ঘন লাল ধারা তার নাক ও ডান চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। গুলি লেগেছে পেটে, কিন্তু সেখান থেকে রক্ত ঝরছে না; একটা কাঠের উপর পড়ে কপালটা ফেটে গেছে।

যারা কামানে বারুদ ভরছিল তাদের কেউ একটা কথাও বলল না—শুধু নবাগত সৈনিকটি অস্ফুট গলায় বলল, "দেখুন, ওর মাথা থেকে রক্ত পড়ছে"—ভুরু কুঁচকে আন্তনভ রেগে নাক দিয়ে একটা শব্দ করল: কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট বোঝা গেল যে সকলের মনেই মৃত্যুর চিন্তা দেখা দিয়েছে। তবু সকলেই যার যার কাজ করে চলল। এক সেকেণ্ডের মধ্যে গোলাগুলি ভরা হয়ে গেল, আর গোলন্দাজ সৈনিকটি আর্তনাদকারী আহত লোকটিকে এক পাশে রেখে কামানের দিকে এগিয়ে গেল।

৭

যারা কখনও যুদ্ধে গিয়েছে তারা অবশ্যই জানে, যে স্থানটিতে কেউ নিহত বা

আহত হয় তার প্রতি একটা অদ্ভুত যুক্তিহীন বিতৃষ্ণা মনের মধ্যে বাসা বাঁধে। ভেলেঞ্চুককে তুলে নিয়ে একটা গাড়িতে শুইয়ে দেওয়া দরকার; অথচ আমার সৈনিকদের মনেও তখন সেই একই অনুভূতি কাজ করছে। ঝ্‌দানভ রেগে আহত লোকটির দিকে এগিয়ে গেল; তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে তুলে নিল। চিৎকার করে বলল, "হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কি! একে ধরো!" সঙ্গে সঙ্গে ডজনখানেক লোক আহত লোকটিকে ঘিরে দাঁড়াল। ভেলেঞ্চুক ভীষণভাবে চিৎকার করতে করতে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল।

তার একটা পা চেপে ধরে আন্তনভ কড়া গলায় বলল, "খরগোসের মতো চেঁচিও না; এ রকম করলে তোমাকে ফেলে রেখে চলে যাব।"

আহত লোকটি সত্যি শান্ত হলো; শুধু মাঝে মাঝে বলতে লাগল, "ওঃ, আমি মরে যাব! ওঃ-ও, ভাইরে!"

গাড়িতে তুলে দেবার পরে তার আর্তনাদও বন্ধ হয়ে গেল। শুনতে পেলাম, নরম অথচ স্পষ্ট গলায় সহকর্মীদের কি যেন বলছে—হয়তো শেষ বিদায় সম্ভাষণ।

যুদ্ধের সময় কেউ আহতদের দিকে নজর দিতে চায় না; এই দৃশ্যের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য হুকুম দিলাম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে একটা ড্রেসিং-স্টেশনে পৌঁছে দেওয়া হোক। একটু পরে সৈনিকরা এসে বলল, ভেলেঞ্চুক আমাকে ডাকছে। গাড়িটার কাছে গেলাম।

দুই হাতে গাড়ির দুই প্রান্ত চেপে ধরে আহত লোকটি শুয়ে আছে। কয়েক মুহূর্তেই তার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চওড়া মুখটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে : মনে হলো সে যেন অনেক শুকিয়ে গেছে, বয়স বেড়ে গেছে অনেক বছর; ঠোঁট দুটো শীর্ণ, বিবর্ণ হয়ে চেপে বসেছে; চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার ও শান্ত হয়ে উঠেছে; রক্তাপ্লুত কপালে ও নাকে মৃত্যুর লক্ষণ ফুটে উঠেছে।

একটু নড়াচড়া করলেই তার অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে; তবু পায়ের পট্টি খুলে দিতে বলল।

বুট ও পট্টি খুলে দিতেই তার সাদা শক্ত পা দুটো দেখে আমার ভীষণ কষ্ট হলো।

থলেটা হাতে নিতেই সে আমাকে বলল, "তিনটে মুদ্রা ও আধা রুবল আছে; ওটা আপনি রাখুন।"

গাড়িটা চলতে শুরু করেছিল; সে থামতে বলল।

"লেফ্‌টেন্যান্ট সুলিমভ্‌স্কির জন্য একটা কোট বানাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে দুটো মুদ্রা দিয়েছিলেন। দেড়টা দিয়ে বোতাম কিনেছিলাম। বাকি আধ রুবল ও বোতামগুলি আমার ঝোলাতেই আছে। তাকে দিয়ে দেবেন।"

বললাম, "বেশ, বেশ; তুমি ভাল হয়ে ওঠ ভাই!"

সে কোনও জবাব দিলো না; গাড়ি চলতে লাগল; আবার সে আর্তনাদ শুরু

কবল—হৃদয-বিদাবক ভযংকব আর্তনাদ। মনে হলো, জাগতিক সব কর্তব্য সমাপনান্তে সে এখন বুঝতে পেবেছে যে সংযত হবাব আব কোনও কাবণ নেই, এটুকু আবাম কববাব অধিকাব এখন তাব জন্মেছে।

৮

"হেই! ফিবে এস! তুমি কোথায যাচ্ছ?" নবাগত সৈনিকটিকে আমি হেঁকে বললাম, বাড়তি কামান-শলাকাটিকে বগলে নিযে হাতে একটা ছোট লাঠিব মতো কিছু ধবে সে আহত লোকটিব গাড়িব পিছন-পিছন যাচ্ছিল।

নবাগত সৈনিকটি আমাব দিকে একবাব তাকালো, অস্পষ্ট স্ববে কি যেন বলল, তাবপব আবাব হাঁটতে লাগল। একটি সৈন্য পাঠিযে তাকে ডেকে আনলাম। লাল টুপিটা খুলে বোকাব মতো হাসতে হাসতে সে আমাব দিকে তাকালো।

"কোথায যাচ্ছিলে?" আমি শুধালাম।

"শিবিবে।"

"কেন?"

"কেন? কাবণ—ভেলেঞ্চুক আহত," পুনবায সে হেসে বলল।

"তাতে তোমাব কি? তুমি এখানেই থাকবে।"

অবাক হযে সে আমাব দিকে তাকাল, তাবপব নির্বিকাবভাবে মুখটা ঘুবিযে টুপিটা মাথায দিযে তাব জাযগায চলে গেল।

কাজটি মোটামুটি সফল হযেছে। শুনেছি, কসাকবা ভালভাবে আক্রমণ চালিযে তিনজন তাতাবকে বন্দী কবেছে, পদাতিক বাহিনী ভালভাবেই কাঠ বোঝাই কবেছে, আব তাদেব দলেব মাত্র ছ'জন বন্দী হযেছে, গোলন্দাজ বাহিনীব একমাত্র ভেলেঞ্চুক ও দুটো ঘোড়া অকেজো হযেছে। তাব উপবে তিন ভার্স্ট জাযগাব কাঠ কেটে তাকে আমবা এমনভাবে সাফ কবেছি যে জাযগাটাকে চেনাই যায না। যদিও কামান ও বন্দুক চালিযে শত্রুপক্ষ কববখানা ও নদী পর্যন্ত আমাদেব নানাভাবে ব্যতিব্যস্ত কবেছে, তবু আমবা ভালয ভালয ফিবে এসেছি। শিবিবে ফিবে গিযে কফিব ঝোল ও "কাশা" সহযোগে মাংস খাবাব স্বপ্ন দেখতে শুরু কবেছি। এমন সময খবব এল, জেনাবেলেব হুকুম হযেছে নদীব উপবে একটা ছোট দুর্গ তৈবি কবতে হবে এবং চতুর্থ গোলন্দাজ পল্টনসহ কে—বেজিমেন্টেব তৃতীয দলকে পবেব দিন পর্যন্ত সেখানেই থাকতে হবে। কাঠ ও আহতদেব নিযে গাড়িগুলো, কসাকবা, গোলন্দাজ বাহিনী ও পদাতিক বাহিনী গান কবতে কবতে আমাদেব পাশ দিযে চলে গেল। অতীত বিপদ ও অনাগত বিশ্রামেব আশায তাদের সকলেব মুখেই ফুটে উঠেছে উদ্দীপনা ও সন্তোষ। সে অনুভূতি ভোগ করবার জন্য শুধু আমাদেব আব তৃতীয সেনাদলকে আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা কবে থাকতে হবে।

৯

কামান-বন্দুকের ব্যবস্থা করা, গাড়ি ও বারুদের বাক্স ঠিকমতো রাখা, ঘোড়ার সাজ খুলে দেওয়া, এই সব কাজ নিয়ে আমরা যখন অতিমাত্রায় ব্যস্ত, পদাতিক বাহিনী ততক্ষণে অস্ত্রশস্ত্র স্তূপ করে রেখে, আগুন জ্বালিয়ে, ডালপালা ও শুকনো খড় দিয়ে মাথা গুঁজবার ঠাঁই করে নিয়ে বেশ খানিকটা "কাশা"-ও রেঁধে ফেলেছে।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। নীল-সাদা মেঘগুলো আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। একখণ্ড কুয়াসা হঠাৎ শিশির হয়ে ঝরে পড়ে মাটি ও সৈনিকদের কোটগুলো ভিজিয়ে দিলো; বুটের ভিতর দিয়ে আর গলার পিছন দিক থেকে একটা স্যাঁৎসেতে ভাব গায়ে লাগছে। ভেলেঞ্চুকের চিন্তা একবারও মন থেকে যায়নি। তার সৈনিক জীবনের গোটা সবল গল্পটাই যেন আমার কল্পনাব উপর চেপে বসে আছে।

তার শেষ মুহূর্তগুলিও ছিল তার জীবনের মতোই সরল ও স্পষ্ট। এত সরল ও সৎভাবে সে জীবনটা কাটিয়েছে যে মৃত্যুব পববর্তী অন্য এক জীবনে তার বিশ্বাস সম্পর্কে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না।

নিকোলায়েভ এসে বলল, "কেমন আছেন? ক্যাপ্টেন আপনাকে চা খেতে ডেকেছেন।"

তার সঙ্গে বল্‌খভের কাছে গেলাম। চালার ভিতবে একটা ছোট বাতি জ্বলছে। সেখান থেকেই বল্‌খভ বলল, "তাকে পেয়েছিলে?"

"তাকে সঙ্গে করেই এনেছি ইয়োর এক্সেলেন্সি।"

শিবিরের মধ্যে একটা শুকনো জোব্বার উপর বল্‌খভ বসে আছে। মাথায় টুপি নেই, জামার বোতাম খোলা। পাশেই সামোভারে জল ফুটছে, একটা পিপের উপর খাবার সাজানো। মোমবাতিসহ একটা সঙীন মাটিতে পোতা রয়েছে।

আবামদায়ক বাসাটা দেখিয়ে বল্‌খব বলল, "কেমন দেখছেন?"

জায়গাটা সত্যি বেশ আরামদায়ক; চা খাবার পরে স্যাঁৎসেতে ভেজা মাটি, অন্ধকার ও ভেলেঞ্চুকের আঘাতের কথা একেবারেই ভুলে গেলাম। মস্কোর কথা, যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কহীন নানা কথা, ককেসাসের কথা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম।

আলোচনার ফাঁকে একসময় বল্‌খভ হেসে আমাব দিকে তাকাল। বলল, "মনে হচ্ছে আমাদের সকাল বেলাকার কথাবার্তাগুলো আপনার খুব অদ্ভুত লেগেছে?"

"না। তা কেন লাগবে? শুধু মনে হয়েছিল আপনি বড় বেশি দিলখোলা। এমন অনেক কথা আছে যা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু বলি না।"

"সে কি? না! যে কোনও রকম তুচ্ছ ও গরীবের জীবনই হোক না কেন তার সঙ্গে এই জীবনটাকে বদল করবার কোনও রকম সম্ভাবনা থাকলে আমি মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করতাম না, অবশ্য সে জীবনে যদি বিপদ ও কর্তব্যের বোঝা না থাকে।"

"আপনি কেন রাশিয়াতে বদলি নিচ্ছেন না?"

"কেন? আঃ! সে কথা আমি অনেক আগেই ভেবেছি। আন্না ও ভ্লাদিমির পুরস্কার না পাওয়া পর্যন্ত আমি রাশিয়ায় ফিরে যেতে পারি না। "আন্না" পদক ঝুলবে গলায়, পাব মেজরের পদ—সেই আশাতেই তো এখানে এসেছি।"

"কিন্তু কেন? আপনি নিজেই তো বুঝতে পারছেন যে এখানে চাকরি করবার উপযুক্ত আপনি নন?"

"কিন্তু রাশিয়াতে ফিরে যাবার শক্তিও আমার নেই। এও রাশিয়াতে প্রচারিত আর এক রূপকথা; এর টানেই পাসেক, স্লেপ্তসভ ও অন্যদের মনে ধারণা জন্মেছিল যে গলায় পদকের মালা ঝোলাবার জন্যই ককেসাসে যাওয়া চলে। সকলেই আমাদের কাছে এটা আশা করে, দাবী করে; কিন্তু দু'বছর আমি এখানে এসেছি, দুটো অভিযানে যোগ দিয়েছি, অথচ কিছুই পাইনি। তথাপি আমি স্থির করেছি, গলায় ভ্লাদিমির ও আন্না ঝুলিয়ে মেজর না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে যাব না। দু' বছর ককেসাসে কাটিয়ে একটাও 'ডেকরেশন' না নিয়ে কেমন করে ফিরে যাই বলুন? এ কথা ঠিক যে রাশিয়াতে যাদের কাছে ফিরে যাব তাদের প্রতি আমার কোনও টান নেই, তারাও আমাকে নিয়ে মাথা ঘামায় না; তবু তাদের জন্যই জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি এখানে নষ্ট করছি, নষ্ট আমার সারা জীবনের সুখ, এমন কি আমার গোটা ভবিষ্যৎকেও নষ্ট করতে চলেছি।"

১০

ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডারের গলা শোনা গেল . "আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন নিকোলাই ফেদরিচ?"

বল্‌খভ আমার নাম বলল, সঙ্গে সঙ্গে তিনটি অফিসার মাথা নিচু করে চালার মধ্যে ঢুকল : মেজর কির্সানভ, তার সহকারী ও কোম্পানি কম্যান্ডার ত্রসেংকো।

কির্সানভ ছোটখাট, শক্ত-সমর্থ মানুষ, কালো গোঁফ, গোলাপী গাল ও মিষ্টি চোখ। চোখ দুটিই তার দেহের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। কির্সানভ যে ভাবে রেজিমেন্টকে ও নিজেকে চালায় সেটা অনন্যসাধারণ : অধীনস্থ সৈনিকরা কখনও তার নিন্দা করে না, উপরস্থ কর্মচারীরাও তার প্রশংসা করে, যদিও কেউ তাকে একটা বড় কিছু বলে মনে করে না। নিজের কাজ সে ভালই বোঝে, সব সময় ঠিক কাজটি করে।

ঢুকতে ঢুকতেই সে বলল, "কি নিয়ে আপনাদের কথা হচ্ছে নিকোলাই ফেদরিচ?"

"কেন, এখানকার চাকরির সুখ নিয়ে।"

কিন্তু সেই সময় আমার মতো একজন শিক্ষার্থীর উপর নজর পড়ায় কির্সানভ স্বীয় মর্যাদা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করার জন্য পিপেটার দিকে তাকিয়ে বলল :

"আচ্ছা, বিশ্রাম করা হচ্ছে নিকোলাই ফেদরিচ?"

"না, কি জানেন আমরা..." বল্‌খভ বলতে শুরু করল, কিন্তু ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডারের মর্যাদাবোধ তাকে দিয়ে আবার একটা নতুন প্রশ্ন করালো।

"চমৎকার লড়াই হলো, কি বলেন?"

সহকারীটি একজন তরুণ পতাকাবাহী সৈনিক; সমর-শিক্ষাকেন্দ্র থেকে স্নাতক হয়েছে অল্প কিছুদিন আগে; ছেলেটি বিনীত, শান্ত, লাজুক ভালমানুষি মুখ।

তৃতীয়জন ক্যাপ্টেন ত্রসেংকো আক্ষরিক অর্থেই একজন বৃদ্ধ ককেসিয়ান, অর্থাৎ অধীনস্থ সেনাদলই তার পরিবার, তার একমাত্র আশ্রয়স্থল। সেনাদল নিয়ে যখন যেখানে যায় সেটাই তার স্বদেশ : তার কাছে ককেসীয় নয় এমন সব কিছুই ঘৃণার বস্তু এবং বিশ্বাসের অযোগ্য।

"তাহলে আপনারা কি নিয়ে কথা বলছেন?" ঘড়ি বের করে সেদিকে তাকিয়ে মেজর জিজ্ঞাসা করল।

"ইনি জানতে চাইছিলেন আমি এখানে চাকরি করছি কেন।"

"এটা তো সহজ কথা; নিকোলাই ফেদারিচ এখানে সুনাম অর্জন করে তবে বাড়ি ফিরবে।"

"আচ্ছা, আব্রাম ইলিচ, আপনি কেন ককেসাসে চাকরি করছেন তা বলুন তো?"

"আপনি তো জানেন, প্রথম কারণ, কর্তব্যের খাতিরেই আমরা সকলেই এখানে চাকরি করতে বাধ্য...কি বললেন?" যদিও সকলেই চুপচাপ শুনছিল তবু সে প্রশ্নটা পাল্টা করল। তারপর হঠাৎই প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, "নিকোলাই ফেদরিচ, কালই আমি রাশিয়া থেকে একটা চিঠি পেয়েছি; তারা লিখেছে...এমন সব অদ্ভুত প্রশ্ন তারা করে।"

"কি ধরনের প্রশ্ন?" বল্‌খভ শুধালো।

সে হাসল।

"সত্যি, অদ্ভুত প্রশ্ন।...তারা লিখেছে, প্রেম ছাড়া কি ঈর্ষা থাকতে পারে...কি বলেন?" আমাদের সকলের দিকে তাকিয়ে সে বলল।

বল্‌খভ হেসে বলল, "সেটা একটা কথা বটে!"

সে বকবক্ করে অবিরাম বলে যেতে লাগল. "কিন্তু জানেন তো, রাশিযা খুব ভাল জায়গা। '৫২-তে আমি যখন তাম্বভ্-এ ছিলাম. সেখানে সকলেই আমাকে একজন দয়ালু এড্-ডি কং রূপে গ্রহণ করেছিল। বিশ্বাস করুন, গভর্নরের বল-নাচে আমি যখন গেলাম, জানেন...সকলেই আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো। জানেন, গভর্নরের স্ত্রী স্বয়ং আমার সঙ্গে কথা বললেন, ককেসাস সম্পর্কে অনেক কথা জানতে চাইলেন, আর এমনভাবে কথা বললেন...যে আমি বুঝতেই পারলাম না...আমার সোনার টুপিটার দিকে তারা এমনভাবে তাকালেন যেন একটা বিরল বস্তু;

জানতে চাইলেন টুপিটা আমি কিভাবে পেলাম—ওটা কি আন্না, না ভ্লাদিমির পুরস্কার; আমি তাদের বললাম...কি বললেন? জানেন, সেখানে ককেসীয়দের খুব খাতির। কোনও যুবক স্টাফ অফিসার যদি আন্না এবং ভ্লাদিমির পদক লাভ করে—রাশিয়াতে তার অনেক কদর...কি বললেন?"

বল্‌খভ বলে উঠল, "এটা একটু বেশি অহংকারের কথা হয়ে গেল নাকি আব্রাম ইলিচ?"

সে বোকাব মতো হেসে উঠল, "হি-হি! জানেন, তা তো হবেই। হ্যাঁ, ঐ দু'মাস বেশ খাওয়া-দাওয়া করলাম!"

"আচ্ছা, বাশিয়াতে তাহলে ভারী সুবিধা, কি বলেন?" এমনভাবে ত্রসেংকো কথাটা বলল যেন সে চীনে বা জাপানে বয়েছে।

"হ্যাঁ মশায়, দু' মাস যা শ্যাম্পেন খেলাম না—সে ভীষণ।"

"আরে মশায়, আপনি তো খেয়েছেন লেমোনেড। আমি যদি সেখানে হাত লাগাতাম তাহলে বাছাধনরা টেব পেত ককেসাসের লোকবা কেমন টানতে পারে।...কি বলেন বল্‌খভ?"

বল্‌খভ বলল, "তা তো বটেই; আপনি তো ককেসাসে দশ বছর কাটিয়ে এসেছেন। ইয়েরমলভ কি বলেছিল মনে আছে তো : দশ বছর, আর আব্রাম ইলিচ এখানে আছে মাত্র ছয়. ."

"দশ কি বলছেন! ষোলর মতো হবে..."

"ভাল জিনিস হুকুম করুন বল্‌খভ। বড় ঠাণ্ডা!...কি বলেন? আসুন মেজর, একটু পান করা যাক!"

মেজব বিরক্তিব সঙ্গে আব একবার ঘড়ি দেখল।

সেদিকে নজর না দিয়ে ত্রসেংকো বলল, "আমি অবশ্য সেখানে যাচ্ছি না। রাশিয়াতে চলতে, রুশ ভাষায় কথা বলতেই ভুলে গেছি। সকলে বলবে · এ হাঁদারাম কোত্থেকে এল! বলবে, নিশ্চয় এসিযা থেকে এসেছে। কি বলেন নিকোলাই ফেদরিচ? . .আর রাশিয়াতে আমাব আছেই বা কি? একদিন না একদিন এখানে গুলি খেয়ে মরব। তখন আপনাব অষ্টম কোম্পানি নিয়ে কি করবেন?"

তার কথার জবাব না দিয়ে ক্যাপ্টেন হাঁক দিলো, আজকের অফিসারকে রোঁদে পাঠিয়ে দিন!"

কয়েক মিনিট চুপ কবে থেকে মেজব তার সহকারীকে বলল, "ওহে যুবক, দ্বিগুণ বেতন পাচ্ছ বলে এখন বেশ খুসি তো?"

"নিশ্চয় স্যার, খুব খুসি স্যার।"

সে আবার বলল, "নিকোলাই ফেদরিচ, এখন আমাদের মাইনেপত্তর বেশ ভালই হয়েছে; একজন যুবক বেশ ভালভাবেই চলতে পারে, এমন কি একটু-আধটু বিলাসিতাও করতে পারে।"

সহকারীটি ভয়ে-ভয়ে বলল, "তা নয়, আসল কথা কি জানেন আব্রাম ইলিচ, মাইনে যেমন দ্বিগুণ, তেমনি আবার...কি জানেন, একটা ঘোড়া রাখতে হচ্ছে..."

"আমাকে কি বোঝাচ্ছ হে যুবক! আমি নিজেও একদিন পতাকাবাহী ছিলাম, আমি সব জানি। বিশ্বাস করো, একটু বুঝেশুনে চললে ভালভাবেই বাঁচতে পারো। এই নাও, হিসাব বুঝে নাও," বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটি বাঁকিয়ে সে বলল।

এক গ্লাস ভদ্‌কা গলায় ঢেলে ব্রসেংকো বলল, "আমরা তো সব সময়ই বেতনটা আগাম নিয়ে থাকি—সেখানেই তো হিসাবের হয়ে গেল।"

"তাতে কি হলো...অ্যাঁ?"

ঠিক সেই সময় চালার ফাঁক দিয়ে একটা ভোঁতা নাক সাদা মাথা দেখা দিলো, আর জার্মান উচ্চারণে একটা কর্কশ গলা শোনা গেল :

"আব্রাম ইলিচ কি এখানে আছেন? দিনের অফিসার আপনাকে খুঁজছেন।"

"ভিতরে আসুন ক্রাফ্‌ট।"

একটি দীর্ঘকায় মূর্তি মাথা নিচু করে চালার মধ্যে ঢুকে মহা উৎসাহে সকলের সঙ্গে করমর্দন করল।

ব্রসেংকোর দিকে ফিরে বলল, "আঃ, এই তো আমার ভাল মানুষ ক্যাপ্টেন! এখানে কেমন চলছে?"

নবাগত অতিথিটি অন্ধকারের মধ্যেই এগিয়ে গিয়ে ক্যাপ্টেনকে অবাক করে দিয়ে তার ঠোঁটে চুমো খেলো।

আমি মনে মনে বললাম, "এই জার্মান ভদ্রলোক ভাল সহকর্মী হতে চাইছে।"

১১

আমার ধারণা সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব হয়ে উঠল। ক্যাপ্টেন ক্রাফ্‌ট এক গ্লাস ভদ্‌কা চেয়ে নিয়ে মাথাটা চিৎ করে সবটা গলায় ঢেলে দিলো।

"দেখুন ভদ্রজনরা, এই চেচেন-এর প্রান্তরে আমরা কষ্ট করে..." বলতে বলতেই দিনের অফিসারকে আসতে দেখে ক্রাফ্‌ট চুপ করে গেল; মেজর হয়তো তাকে কোনও রকম হুকুম করবে।

"আচ্ছা, আপনি সব ঘুরে দেখেছেন?"

"দেখেছি স্যার।"

"একটা পাহারার ব্যবস্থা করেছেন?"

"করেছি স্যার।"

"তাহলে কোম্পানি কম্যান্ডারকে খবর পাঠিয়ে দিন, যেন যতদূর সম্ভব সতর্ক থাকে।"

"ঠিক আছে স্যার।"

মেজর বাঁকা চোখে তাকিয়ে কি যেন ভাবল।

"সকলকে বলে দিন, তারা এখন 'কাশা' রাঁধতে পারে।"

"তারা রাঁধতে শুরু করে দিয়েছে।"

"ভাল। আপনি যেতে পারেন।"

আমাদের দিকে ফিরে করুণার হাসি হেসে মেজর আবার বলতে শুরু করল, "তাহলে আমাদের হিসাব হচ্ছিল একজন অফিসারের কি কি দরকার। এবার হিসাবটা বলি। দরকার একটা ইউনিফর্ম আর ট্রাউজার..ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে স্যার।"

"ধরা যাক, এ বাবদ দু' বছরে পঞ্চাশ রুবল; তার অর্থ পোশাক বাবদ বছরে পঁচিশ রুবল; তারপর খাওয়া, দিনে দু'বার খেতে...ঠিক আছে স্যার?"

"বেশ, তাহলে সেটা দেওয়া হলো। এবার ঘোড়া, তার জিন, আর মেরামতি খরচ, ত্রিশ রুবল—বাস, হয়ে গেল। তাহলে দাঁড়াল পঁচিশ, যোগ একশ' বিশ, যোগ তিরিশ, সমান একশ' পঁচাত্তর। বিলাসিতার দ্রব্য যেমন চা, চিনি, তামাক—সেজন্য বিশ রুবল। যদি ইচ্ছা হয়...ঠিক আছে নিকোলাই ফেদরিচ?"

সহকারী ভীরু গলায় বলল, "না স্যার। আমাকে বলতে দিন আব্রাম ইলিচ। চা-চিনির জন্য কিছুই থাকল না স্যার। আপনি তো দু' বছরে একটা সুটের ব্যবস্থা দিলেন, কিন্তু অভিযানের জন্য ট্রাউজার চাই; আর বুটেরই বা কি হবে? প্রতি মাসেই তো এক জোড়া করে ছিঁড়ে যায় স্যার। তারপর আছে শার্ট, তোয়ালে, পট্টি—এ সবই তো কিনতে হবে স্যার। যোগ করে দেখুন, হাতে কিছুই থাকে না স্যার। ঈশ্বরের দোহাই আব্রাম ইলিচ, কিছুই থাকে না স্যার। এটাই সত্যি কথা।"

মুহূর্তের জন্য চুপ করে থেকে ক্রাফ্ট্ হঠাৎ বলে উঠল, "কি জানো, পট্টি পরতে খুব ভাল, তবে ওটা নেহাৎই রুশ দেশের কেতা।"

ত্রসেংকো বলল, "হিসাব যাই বলুক, আসলে কিন্তু আমরা সকলেই বেঁচে আছি, চা খাচ্ছি, তামাক টানছি, ভদ্কা গিলছি।" তারপর পতাকাবাহীর দিকে ঘুরে বলল, "আরে ভায়া, তোমাকে এমন গোলাপী দেখাচ্ছে কেন? কিচ্ছু ভেব না, আমিও তোমার মতোই ছিলাম, কিন্তু আজ দেখছ, কেমন ভাল মানুষ হয়েছি। রাশিয়া থেকে যে কোনও যুবক এখানে আসুক—তাকে হাঁপানিতে ধরবে, বাতে ধরবে; কিন্তু আমি, আমি তো সোজা বসে আছি—এখানে আমার বাড়ি আছে, বিছানা আছে, সব আছে। বুঝতেই পারছ..."

এই বলে সে আর এক গ্লাস ভদ্কা খেলো।

"আমি তো এরই প্রশংসা করি। এটাই তো খাঁটি প্রাচীন ককেসীয় জীবন। এস, তোমার সঙ্গে হাত মেলাই।"

এক লাফে আমাদের মধ্যে এসে ত্রসেংকোর হাতটা ধরে সে আবেগের সঙ্গে ঝাঁকি দিতে লাগল।

তারপর বলল, "হ্যাঁ, বলা যায় যে এখানে আমাদের সব রকম অভিজ্ঞতাই হয়েছে; কিন্তু '৪৫-এ...কিন্তু তখন তো তুমিও ছিলে, তাই না ক্যাপ্টেন? তোমার মনে আছে, বারো থেকে পনেরো তারিখ পর্যন্ত হাঁটু পর্যন্ত কাদার মধ্যে ঘুমিয়ে পরদিনই আমরা ট্রেঞ্চে গিয়েছিলাম? তখন আমি ছিলাম প্রধান সেনাপতির সঙ্গে। একদিনে পনেরোটা ট্রেঞ্চ দখল করেছিলাম। মনে আছে ক্যাপ্টেন?"

ত্রসেংকো মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো; নিচের ঠোঁটটা ঠেলে দিয়ে ভ্রুকুটি করল।

"তারপর শুনুন", অর্থহীনভাবে হতা-পা নেড়ে মেজরকে উদ্দেশ্য করে ক্রাফ্‌ট আবার শুরু করল।

কিন্তু মেজর হয়তো অসংখ্যবার সে গল্প শুনেছে, তাই সে এমন বোকার মতো চোখে তার দিকে তাকাল যে ক্রাফ্‌ট তার দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে বল্‌খভ ও আমার দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করল; সারাক্ষণের মধ্যে আর একবারও ত্রসেংকোর দিকে তাকালই না।

"শুনুন তাহলে। কল্পনা করুন সেদিন সকালে আমরা চলেছি, আর প্রধান সেনাপতি আমাকে বললেন : 'ক্রাফ্‌ট! ঐ ট্রেঞ্চগুলো দখল করো। আপনারা তো জানেন, সামরিক চাকরিতে যুক্তি-তর্ক বলে কিছু নেই—সব যো-হুকুমের ব্যাপার। 'ঠিক আছে ইয়োর এক্সেলেন্সি'!—বলেই আমি ছুটলাম। প্রথম ট্রেঞ্চের কাছেই মুখ ফিরিয়ে সৈনিকদের বললাম : 'বাছারা! ভয় পেয়ো না! আগে বাঢ়ো! কেউ পিছিয়ে পড়লে তাকে আমি নিজের হাতে শেষ করব।' আপনারা তো জানেন, রুশ সৈনিকদের সঙ্গে সোজাসুজি কথা বলতে হয়। হঠাৎ একটা হাতবোমা...ঘুরে তাকালাম : একটি সৈনিক, আর একটি, আরও একটি, তারপর শুরু হলো বুলেট ..জিং! জিং! জিং!...বলে উঠলাম : 'আগে বাঢ়ো বাছারা; আমাকে অনুসরণ করো!' আরও কাছে গিযে তাকালাম; দেখলাম... এ কি...জানেন...ওটাকে কি যেন বলে?—শব্দটা খুঁজতে গল্পকার হাত নাড়তে লাগল।

"খাড়া পাড়ায়", বল্‌খভ বলল।

"না...আঃ, কি যেন সেটা? হা ভগবান। সেটা...সেই পাহাড়টা, সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল।" কিন্তু বন্দুকও তৈবি...চালাও! টা-রা-টা-টা-টা-একটা শত্রুরও দেখা নেই। বুঝতেই পারছেন, সকলেই চমকিত। তারপর সব ঠিক হয়ে গেল : আমরা এগিয়ে গেলাম—দ্বিতীয় ট্রেঞ্চ। সে আর এক কাণ্ড। উৎসাহে আমরা টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছি। সেটার উপর উঠেই দেখি...দ্বিতীয় ট্রেঞ্চটা দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু আর এগোতে পারছি না।...ওটা আবার কি, যাকে বলে এক প্রকার...আঃ! ওটা কি..."

এবার আমি বললাম, "আবার পাহাড়।"

"মোটেই না; পাহাড় নয়, কিন্তু...কিন্তু কি যেন বলে..."

তার কষ্টটা লক্ষ্য করে বল্‌খভ বলল, "একটা নদী হতে পারে।"

"না, স্রেফ একটা পাহাড়। সেখানে তো পৌঁছলাম, তারপর...বিশ্বাস করুন, সে কী গোলাগুলি, একেবারে নরক..." ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে কে যেন আমাকে ডাকল। সবে তো দুটো ট্রেঞ্চের গল্প হলো, এখনও তেরোটা বাকি। তাই আমার পল্টনে ফিরে যাবার সুযোগ পেয়ে বেঁচে গেলাম। ত্রসেংকোও আমার সঙ্গে চলে এল। কয়েক পা এগিয়ে সে বলল, "এ সব গুল্। লোকটা কোনওদিনই ট্রেঞ্চে যায়নি।" ত্রসেংকো এমন মজার হাসি হেসে উঠল যে আমারও মজা লাগল।

১২

রাতের অন্ধকার নেমেছে; অগ্নিকুণ্ডের আলোয় শিবিরটা স্বল্পালোকিত। সব কিছু ব্যবস্থা করে আমার সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিতে চললাম। আগুনের মধ্যে একটা বড় কাঠের গুঁড়ি পুড়ছে। তাকে ঘিরে মাত্র তিনজন বসে আছে : আন্তনভ একটা "র‍্যাব্‌কো"-র কড়াই আগুনে গরম করছে; ঝ্‌দানভ গাছের ডাল দিয়ে ছাইগুলো ছেটাচ্ছে; চিকিনের মুখে তার সদা-নিভন্ত পাইপ। বাকি সকলেই বাতের মতো শুয়ে পড়েছে—কেউ বারুদের বাক্সের নিচে, কেউ খড়ের উপরে বা আগুনের কাছে। আন্তনভ আমাকে জায়গা করে দিলো; তার পাশে বসে পড়ে একটা সিগারেট ধরালাম। কুয়াসা ও ভেজা কাঠের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে; চোখ জ্বালা করছে; অন্ধকার আকাশ থেকে শিশির ঝরছে।

ম্যাক্সিমভ আগুনের কাছে এসে আমার পাশে বসল। চিকিন তাকে জায়গা করে দিয়ে চুপচাপ পাইপটা চুষতে লাগল।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ম্যাক্সিমভ বলল, "পদাতিক বাহিনী ভদ্‌কার জন্য শিবিরে লোক পাঠিয়েছিল; তারা এইমাত্র ফিরে এসেছে।" আগুনে থুথু ফেলল। নন-কম বলল, "আমাদের লোকটিকে তারা দেখে এসেছে।"

কয়লার উপরে কড়াইটা নাড়তে নাড়তে আন্তনভ বলল, "আচ্ছা, সে কি এখনও বেঁচে আছে?"

"না, সে মারা গেছে।"

নবাগত সৈনিকটি অদূরেই শুয়েছিল। হঠাৎ সে তার লাল টুপিওয়ালা মাথাটা আগুনের উপর তুলে এক মিনিট ম্যাক্সিমভের দিকে এবং পরে আমার দিকে তাকাল। পরক্ষণেই মাথাটা নামিয়ে কোট মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

আন্তনভ বলল, "দেখুন, সেদিন সকালে তাকে যখন সেই পার্কে ঘুম থেকে জাগিয়েছিল তখনই মৃত্যু তাকে ধরেছিল।"

"বাজে কথা!" ঝ্‌দানভ বলল। সকলেই চুপ।

সেই নীরবতার মধ্যে আমাদের পিছনে শিবিরে একটা গুলির শব্দ হলো। আমাদের ভেরীবাদকরা বুঝতে পেরে বাজাতে শুরু করে দিলো। সে শব্দ মিলিয়ে

গেলে প্রথমে ঝ্‌দানভ উঠে দাঁড়াল; টুপিটা খুলল। আমরা তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলাম।

রাত্রির সেই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে বহু কণ্ঠের সুশৃঙ্খল আবৃত্তি ভেসে এল :

"হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র হোক; তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক, যেমন স্বর্গে তেমনই পৃথিবীতেও তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আজকের মতো প্রাত্যহিক আহার্য আমাদের দাও; আর আমাদের বিরুদ্ধে যারা অনধিকার চর্চা করে তাদের যেমন আমরা ক্ষমা করি, তেমনই আমাদের অনধিকার চর্চাকেও তুমি ক্ষমা করো; আমাদের লোভের পথে নিয়ো না, আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার করো। আমেন।"

সকলে টুপি মাথায় দিয়ে আগুনকে ঘিরে আবার বসবার পরে আন্তনভ বলল, "আমার মনে পড়ছে, '৪৫-এ ঠিক এই জায়গায় আমাদের একটি সৈনিক প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছিল; একটা কামানের উপর চাপিয়ে দু'দিন আমরা তাকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম. শেভচেংক-এর কথা আপনার মনে আছে ঝ্‌দানভ? আর ঐখানে, ঐ গাছটার নিচে তাকে আমরা রেখে গিয়েছিলাম।"

ঠিক সেই সময় মস্ত গোঁফ ও জুল্‌ফিওয়ালা একটি পদাতিক সৈনিক কাঁধে রাইফেল ও ঝোলা নিয়ে আমাদের আগুনের কাছে এসে দাঁড়াল।

বলল, "দেশের মানুষরা, আমার পাইপটা ধরাতে একটু আগুন যদি দেন..."

চিকিন বলল, "বেশ তো, ধরিয়ে নাও, যথেষ্ট আগুন আছে।"

আন্তনভকে লক্ষ্য করে সৈনিকটি বলল, "মনে হলো আপনারা দার্গি-র কথা বলছিলেন?"

"হ্যাঁ, '৪৫-এ দার্গি-র কথা।"

সৈনিকটি মাথা নাড়ল, ভ্রূকুটি করল, তারপর আমাদের পাশেই গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসে পড়ল।

বলল, "হ্যাঁ, সব কিছু এখানেই ঘটেছিল।"

আমি আন্তনভকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কিন্তু তোমরা তাকে গাছের নিচে রেখে গিয়েছিলে কেন?"

"তার পেটটা গুরুতরভাবে জখম হয়েছিল। আমরা যখন থামতাম, সে মোটামুটি ভাল বোধ করত; চলতে শুরু করলেই সে আর্তনাদ করে উঠত। ঈশ্বরের নামে সে আমাদের মিনতি করল, তাকে রেখে চলে যেতে; কিন্তু আমাদের বড় করুণা হলো। তারপর সে যখন সত্যি সত্যি আমাদের আক্রমণ করতে শুরু করল, তিনজনকে মেরে ফেলল, একজন অফিসারকে মেরে ফেলল, তখন কোনও রকমে কামান ফেলে দূরে সরে গেলাম। একেবারে হুলুস্থুলু কাণ্ড! সেই কাদার মধ্যে কামানটা যে নিয়ে যেতে পারব তা ভাবতেই পারিনি।"

একজন সৈনিক বলল,"সেখানে সেই ভারতীয় পর্বতের পাশে তার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে চলল।

"হ্যাঁ, ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। আনোশেংকা ও আমি ভাবলাম : লোকটা বুড়ো হয়েছে, নিশ্চয় বাঁচবে না, আর ঈশ্বরের নাম করে তাকে এখানে রেখে যেতেও বলছে। তাকে রেখেই যাই। তাই স্থির করলাম। আইভি-লতায় ঘেরা একটা গাছ ছিল ওখানে! ঝ্‌দানভের কাছ থেকে কিছু ভেজা বিস্কুট নিয়ে তাকে দিলাম, সেই গাছটার গায়ে হেলান দিয়ে তাকে বসিয়ে দিলাম, একটা পরিষ্কার শার্ট পরিয়ে দিলাম, তারপর যথারীতি বিদায় নিয়ে তাকে ঐ ভাবে রেখে চলে গেলাম।"

"সে কি ভাল সৈনিক ছিল?"

"মন্দ ছিল না," ঝ্‌দানভ বলল।

আন্তনভ বলল, "তারপর তার যে কি হলো তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। আমাদের অনেককেই সেখানে ফেলে এসেছিলাম।"

"দার্গিতে তো? সেখানে অনেক কিছুই ঘটেছিল।" এই কথা বলে পদাতিক সৈনিকটি আর একবার ভ্রূকুটি করে মাথাটা নেড়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল।

"আচ্ছা, দার্গিতে যারা আমাদের কামান-বাহিনীতে ছিল তাদের মধ্যে অনেকেই বেঁচে আছে কি?" আমি শুধালাম।

"তা, এখন : ঝ্‌দানভ, আমি, পাৎসান—সে এখন ছুটিতে আছে—এবং আরও ছ'জন। ব্যস, এই সব।"

পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে একটা কাঠের উপর মাথা রেখে চিকিন বলল, "আমাদের পাৎসান কেন ছুটি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে? ভাবুন তো, প্রায় এক বছর হলো সে চলে গেছে।"

"আপনার পাওনা ছুটি কি নিয়েছেন?" ঝ্‌দানভকে শুধালাম।

সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিলো, "না নেইনি।"

আন্তনভ বলল, "অবশ্য যাওয়াই ভাল—যদি ধনী বংশের লোক হন, অথবা তাদের সঙ্গে কাজকর্ম করার মতো যথেষ্ট শক্তি থাকে, তাহলে যাওয়াই ভাল; আপনি বাড়ি ফিরে গেলে তারা খুসিই হবে।"

ঝ্‌দানভ বাকিটা বলল, "কিন্তু বাড়িতে যদি এমন দুই ভাই থাকে যারা নিজেদের সংসারই চালাতে পারে না, আমাদের মতো সৈনিকদের খাওয়াতে পারে না; তাদের পক্ষে বাড়ি গিয়ে লাভ কি? পঁচিশ বছর চাকরি করার পরে আপনি তো তাদের কোনও কাজেও লাগবেন না। তাছাড়া, তারা বেঁচে আছে কি না তাই বা কে জানে।"

"আপনি কি তাদের কাছে কখনও চিঠিপত্রও লেখেন না?" আমি শুধালাম।

"তা বটে। দুটো চিঠি লিখেছিলাম, কিন্তু কোনও জবাব আসেনি। হয় তো তারা

মরেই গেছে। অথবা হয়তো ইচ্ছা করেই লেখেনি। তারাও তো দুঃখে-কষ্টেই দিন কাটায়। কি আর করা যাবে?"

"চিঠি দুটো কি অনেক দিন আগে লিখেছিলেন?"

"শেষ চিঠিটা লিখেছিলাম দার্গি থেকে ফিরেই।"

কনুইএর উপর ভর দিয়ে আন্তনভ গুনগুন করে একটা সুর ভাঁজছিল। ঝ্দানভ তাকে বলল, "ঝরা পাতার গানটা ভাল করে গাইছেন না কেন?"

আন্তনভ গলা ছেড়ে গাইতে শুরু করল।

আমার কোটে টান দিয়ে চিকিন কানে কানে বলল, "এটা ঝ্দানভ খুড়োর প্রিয় গান; ফিলিপ আন্তনিচ যখনই এই সুরটা বাজায় খুড়ো স্রেফ কাঁদতে থাকেন।"

ঝ্দানভ প্রথমে জ্বলন্ত অঙ্গারের দিকে চোখ রেখে চুপচাপ বসে থাকল: লাল্‌চে আলো পড়ে তার চোখ দুটো অসাধারণ বিষণ্ণ দেখাতে লাগল: তারপরই তার গাল দুটো কাঁপতে লাগল; শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে উঠে পড়ল; আগুনের পিছনে ওভারকোটটা বিছিয়ে অন্ধকারে শুয়ে পড়ল। হয়তো ঘুমের আগে তার পাশ ফেরার শব্দ শুনলাম; অথবা হয়তো ভেলেঞ্চুকের মৃত্যু এবং এই বিশ্রী আবহাওয়ার চিন্তাই আমাকে পেয়ে বসেছিল; কিন্তু সে যে কাঁদছে তা আমার মনে হয়নি।

কাঠের গুঁড়িটার নিচের দিকটা অঙ্গার হয়ে মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে; তারই আলো পড়ছে আন্তনভের উপরে,—তার পাকা গোঁফ, লাল মুখ, ও কাঁধে ঝোলানো কোটের পদকগুলোর উপরে; অন্য অনেকের পা, মাথা, বা পিঠের উপরেও সে আলো এসে পড়ছে। সেই একই বিষণ্ণ শিশির ঝরে পড়ছে, বাতাসে সেই একই আর্দ্রতা ও ধোঁয়ার গন্ধ ভাসছে, চারিদিকেই চোখে পড়ছে সেই একই নিভন্ত আগুনের আলোর বৃত্তগুলি। চারিদিক নিস্তব্ধ; তার মধ্যেই শোনা যাচ্ছে আন্তনভের করুণ গান; এক মুহূর্তের জন্য সে যখন থামছে, তখনই তার গানের রেশ বাজছে নৈশ শিবিরের অস্পষ্ট শব্দে ও নানাবিধ চলাচলে—নাক ডাকার শব্দে, শান্ত্রীর রাইফেলের ঝন্‌ঝনানিতে আর মৃদু আলাপচারিতে।

ম্যাক্সিমভ চেঁচিয়ে বলল, "দ্বিতীয় শিফ্‌ট্‌। মাকাতুক ও ঝ্দানভ।"

আন্তনভ গান থামালো; ঝ্দানভ উঠে দাঁড়াল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কাঠটা পেরিয়ে ধীরে ধীরে কামানশ্রেণীর দিকে এগিয়ে চলল।

রসালো ফল

The Berries

জুন মাসের আতপতপ্ত দিন। বাতাসও নেই। জঙ্গলে গাছের পাতা শুকনো, ঝোপঝাড় সবুজ, কিন্তু এখানে ওখানে বার্চ ও লিন্ডেন গাছের হলদেটে পাতা ঝরতে শুরু করেছে। বন গোলাপের ঝাড়গুলো সুগন্ধি ফুলে ছেয়ে গেছে, অরণ্য উপত্যকায় ঘন ঘাস গজিয়ে উঠেছে, আধ-পাকা গমের গাঢ় শিস বাতাসে দুলছে, নিচে পাখিরা কিচির-মিচির করে পরস্পরকে ডাকছে গম ও যইয়ের ক্ষেতে ভাড়ুই পাখি ডাকছে, জঙ্গলের মধ্যে একটা নাইটিঙ্গেল পাখি হঠাৎ গান গেয়ে থেমে যাচ্ছে তীক্ষ্ণ গরমে আগুনের তাপ। রাস্তায় আধ ইঞ্চি পুরু ধুলো জমে আছে মাঝে মাঝে মৃদু বাতাস এসে ধুলো উড়িয়ে কখনও ডাইনে, কখনও বাঁয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে

চাষীরা বাড়ির কাজ শেষ করে গাড়িতে সার বোঝাই করছে হাড় জিরজিরে গরু মোষগুলি রোদে পোড়া মাঠে চরছে কবে নতুন ঘাস গজাবে তারই আশায় আছে। রাখালের ডাক শুনে গরু বাছুরগুলো গোয়াল থেকে বেরিয়ে লেজ তুলে ছুটছে। বড় রাস্তায় ও গলিতে ছেলেরা ঘোড়া চরাতে নিয়ে চলেছে। স্ত্রীলোকেরা জঙ্গল থেকে ঘাস কেটে বস্তা বোঝাই করে নিয়ে আসছে, আর ছোট মেয়েরা ও তরুণীরা পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কেটে ফেলা গাছের ভিতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে রসালো ফল কুড়িয়ে নিচ্ছে ছুটিতে বেড়াতে আসা বাবুদের কাছে বিক্রি করবে বলে।

ছুটিতে আসা মানুষগুলো ছোট ছোট সাজানো গোছানো বাড়িতে বেশ চালের সঙ্গে অলসভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাথায় ছোট ছাতা পরনে হাল্কা পরিচ্ছন্ন দামি পোশাক কেউ বা গাছের ছায়ায় বা কুঞ্জবনে ছোট ছোট রঙিন টেবিলে বসে গরম চা অথবা ঠাণ্ডা পানীয়ে চুমুক দিচ্ছে।

নিকলাই সেমিনিচ এর মস্ত বড় ভিলা তাতে গম্বুজ বারান্দা, ব্যালকনি গ্যালারি—সব আছে, সব কিছুই নতুন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ভিলার সামনে দাঁড়িয়ে আছে গলায় ঘণ্টা ঝোলানো তিন ঘোড়ার খোলা গাড়ি, কোচয়ানের ভাষায় "আসা যাওয়া" বাবদ পঞ্চাশ রুবল ভাড়ায় সেন্ট পিতার্সবুর্গ থেকে একটি ভদ্রলোক এসেছে সেই গাড়িতে।

ভদ্রলোক একজন সুপরিচিত উদারনৈতিক কর্মী, সব রকম আবেদনকারী কমিটি, কমিশন ও প্রতিনিধি দলে সে অংশ গ্রহণ করে থাকে, তারা সুকৌশলে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের ভাব দেখায়, কিন্তু আসলে চরম সংস্কারপন্থী।

লোকটি শহর থেকে এসেছে; সেখানে ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যে তার দিন কাটে; মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার জন্য বেড়াতে এসেছে বন্ধুর বাড়ি; বন্ধুটি তার ছেলেবেলার খেলার সাথী ও অনুগামী।

শাসনতান্ত্রিক নীতির প্রয়োগ-পদ্ধতির ব্যাপারে তাদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ আছে। ঈষৎ সমাজবাদ-ঘেঁষা হলেও বহুলাংশে ইউরোপীয় চাল-চলনে অভ্যস্ত এই সেন্ট পিতার্সবুর্গের ভদ্রলোকটি চাকরিসূত্রে মোটা মাইনে পায়। নিকলাই সেমনিচ খাঁটি ও গোঁড়া রুশ চরিত্রের মানুষ; অবশ্য তাতে স্লাভ-প্রেমের ছোঁয়া লেগেছে; সে বেশ কয়েক হাজার একর জমির মালিক।

তাদের জন্য বাগানে পাঁচ পদের ডিনার পরিবেশন করা হলো, কিন্তু গরমের জন্য তারা প্রায় কিছুই খেলো না; ফলে চল্লিশ রুবল মাইনের রাঁধুনি ও তাদের সহকারীদের সব পরিশ্রমই নষ্ট হলো। তারা খেলো শুধু ভল্‌গা থেকে ধরা তাজা সাদা মাছসহ ঠাণ্ডা-করা তরকারির ঝোল আর ঘন চিনি ও বিস্কুট দিয়ে সাজানো রং-বেরং-এর আইসক্রিম। খাবার টেবিলে আর ছিল একজন উদারনৈতিক ডাক্তার, ছোটদের গৃহ-শিক্ষক জনৈক ছাত্র (প্রচণ্ড গণতান্ত্রিক-সমাজবাদী ও বিপ্লবী হলেও নিকলাই সেমনিচ তাকে সংযত করে রাখতে পেরেছে), নিকলাই সেমনিচের স্ত্রী মারি ও তিনটি ছেলেমেয়ে।

সাতটায় খাওয়া শেষ হলো। ডিনারের পরে দুই বন্ধু বারান্দায় বসে হাল্কা সাদা মদের সঙ্গে ঠাণ্ডা খনিজ জলে চুমুক দিতে দিতে গল্প করতে লাগল।

নির্বাচন এক পর্যায়ে হবে না দুই পর্যায়ে হবে এই নিয়ে তাদের মতভেদ যখন উত্তপ্ত বিতর্কে গিয়ে পৌঁছল তখন খাবার ঘরে চা খাবার ডাক পড়ল। চা খেতে খেতে যে আলোচনা হলো মারি তাতে মন দিতেই পারল না, কারণ গোগা-র পেটের অসুখের ভাবনাতেই সে ডুবে ছিল। ক্রমে চিত্রশিল্পের আলোচনা উঠল; তাতে মারি বলল, ক্ষয়িষ্ণু চিত্রশিল্পের মধ্যেও যে একটা কিছু আছে তা অস্বীকার করা যায় না। এমনি আরও অনেক কথাই সে বলল যা নিকলাই সেমনিচের কানে বড়ই একঘেয়ে লাগল।

উঠোনে দামী ব্রোঞ্জের বাতি ও লণ্ঠন জ্বেলে দেওয়া হলো। অসুস্থ গোগার চিকিৎসা চলতে লাগল, আর ছোটদের শুতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

অতিথি, নিকলাই সেমনিচ ও ডাক্তার গেল বারান্দায়। পরিচালক কাচ-ঢাকা মোমবাতি এবং আরও কিছু খনিজ জল এনে দিলো। রাশিয়ার এই সংকটকালে রাষ্ট্রের কোন্ পথে চলা উচিত তা নিয়ে মাঝ রাত নাগাদ একটা প্রাণবন্ত আলোচনা শুরু হলো। অতিথি ও নিকলাই সেমনিচ ধূমপান করতে করতে অনর্গল কথা বলতে লাগল।

ভিলার ফটকের বাইরে ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে আছে; সেগুলো অভুক্তই আছে, টুং

টাং করে ঘণ্টা বাজাচ্ছে, কখনও হাই তুলছে, কখনও নাকেব শব্দ করছে; বুড়ো কোচয়ানও অভুক্ত রয়েছে। প্রতিটি ভিলাতে মোরগ ডেকে উঠল; বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী ভিলা থেকে মোবগের একটা উচ্চ কর্কশ ডাক শুনে কোচয়ানের সন্দেহ হলো যে সকলেই তার কথা ভুলে গেছে; গাড়ি থেকে নেমে সে বাড়িব ভিতর ঢুকল। দেখল, তার যাত্রী বসে কিসে যেন চুমুক দিচ্ছে আব জোর গলায় কথা বলছে। চিন্তান্বিত ভাবে সে একজন চাকরকে খুঁজতে লাগল। প্রবেশ-মুখের হলেই দেখতে পেল উর্দি-পরা একটি পরিচারক বসে বসে ঘুমচ্ছে। পরিচাবকটি আগে ছিল ভূমিদাস। যে মাইনে পায তা দিযেই পাঁচটি মেযে ও দুটি ছেলেব বড় সংসারেব খবচ চালায। কোচয়ান ঘুম ভাঙিযে দিতেই সে লাফিযে উঠল; পোশাক ঠিক কবে ভদ্রলোকেব কাছে গিযে বলল, কোচযান চিন্তিত হযে পড়েছে, তাকে ছেড়ে দিতে বলছে।

পবিচাবক যখন সেখানে গেল বিতর্ক তখন তুঙ্গে উঠেছে। ডাক্তাব আবও কাছে এগিযে গিযে তাতে অংশ নিচ্ছে।

অতিথিটি বলছে, "বাশিযাব পক্ষে প্রগতিব অন্য কোনও পথ ধবা উচিত এ-কথা আমি স্বীকার কবি না। প্রথমেই দবকাব মুক্তি—বাজনৈতিক মুক্তি—সকলেই জানে যে অন্য লোকের উচ্চতম অধিকাবগুলিকে বক্ষা কবাব জন্য সেই মুক্তিই শ্রেষ্ঠ মুক্তি।"

অতিথি বুঝল যে সে সব কিছু গুলিযে ফেলেছে, যা বলতে চেযেছিল তা বলতে পারেনি।

নিকলাই সেমনিচ বলল, "তা ঠিক, কিন্তু সেটা তো অন্য ভাবেও অর্জন করা যেতে পাবে—সংখ্যাধিক্যেব ভোটের দ্বারা নয, সাধাবণভাবে সকলেব সম্মতিক্রমে। চাষী কম্যুনগুলিব সিদ্ধান্তেব দিকেই তাকিযে দেখুন না।"

"হ্যাঁ, ঐ কম্যুনগুলো তো বযেছে।"

ডাক্তাব বলল, "স্লাভিক জনগণেব যে একটা নিজস্ব দৃষ্টিকোণ আছে সেটা তো আপনি অস্বীকাব কবতে পাবেন না।"

নিকলাই সেমনিচ বলতে শুরু কবল, "আমাব কথাটা শেষ কবতে দিন। রুশ জনগণেব কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। এই সব বৈশিষ্ট্য "

উর্দি-পবা আইভান ঘুম ঘুম চোখে সেখানে এসে বলল,

"কোচযান চিন্তিত হযে পড়েছে "

"তাকে বলো, আমি এখনই যাচ্ছি। বাড়তি ভাড়া দেবো।"

"ঠিক আছে স্যার।"

আইভান চলে গেল। নিকলাই সেমনিচ তার কথা শেষ করল।

অতিথি ও ডাক্তার অন্তত বিশ বার সে সব কথা শুনেছে; তারা, বিশেষ করে

অতিথিটি, ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের সাহায্যে তা খণ্ডন করতে লাগল। অতিথিটির ইতিহাসের জ্ঞান খুব ভাল।

ডাক্তার অতিথির পক্ষে। সে তার পাণ্ডিত্যের প্রশংসা কবল; তার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করল।

আলোচনা সমানেই চলতে লাগল। ক্রমে রাস্তার ওপারে বনের অন্তরালে আলো দেখা দিলো; নাইটিঙ্গেল পাখির ঘুম ভাঙল; আর আলোচনাকারীরা তখনও ধূমপান করতে করতে কথা বলছে, কথা বলতে বলতে ধূমপান করছে।

আলোচনা হয়তো আরও চলত, এমন সময় পরিচারিকাটি বারান্দায় হাজির হলো।

মেয়েটি বাপ-মা হারা; বেঁচে থাকার জন্যই তাকে চাকরি নিতে হয়েছে। প্রথমে সে ছিল একজন ব্যবসায়ীর বাড়িতে; সেখানে একটি করণিক তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যায় এবং তাদের একটি বাচ্চা হয়। বাচ্চাটি মারা গেলে একজন সরকারী কর্মচারি তাকে চাকরি দেয়; সেখানে তাব বিদ্যালয়ে পাঠরত ছেলেটি তাকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তখন সে নিকলাই সেমনিচের বাড়িতে চাকরি পায়; তার ভাগ্য ভাল এখানে কোনও কামুক ভদ্রলোক তাকে জ্বালাতন করে না, আর মাইনেটাও নিয়মিত পায়। সে এসে জানালো, কর্ত্রীঠাকরুণ ডাক্তার ও সেমনিচকে ডাকছে।

নিকলাই সেমনিচ ভাবল, "নিশ্চয় গোগার কিছু হয়েছে।"

শুধালো, "কি হয়েছে?"

"নিকলাই নিকলায়েভিচ খুব ভাল নেই।" নিকলাই নিকলায়েভিচ লোভী গোগার নাম; তার পেটের অসুখ হয়েছে।

অতিথি বলল, "এদিকে সময়ও হয়েছে। দেখো, কেমন আলো দেখা যাচ্ছে। অনেকক্ষণ কাটানো হলো।" সকলের কাছ থেকে সে বিদায় নিল।

অতিথির টুপি ও ছাতা খুজে আনতে ক্লান্ত আইভান এখানে-ওখানে ছুটাছুটি শুরু করে দিলো। আইভান আশা করেছিল বকশিস পাবে, কিন্তু অতিথিটি সাধারণত উদার ও দানশীল হলেও আলোচনার প্রভাব, বকশিসের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেল; রাস্তায় এসে সে কথা মনে পড়ায় সে নিজের মনেই বলল, "সে তো কিছুই করেনি।"

কোচয়ান কোচ-বক্সে উঠে রাশ হাতে নিয়ে বাঁকা হয়ে বসল; গাড়ি চলতে শুরু করল; ঘণ্টাগুলো বাজতে লাগল। নবম গদীতে দুলতে দুলতে সেন্ট পিতার্সবুর্গেব অধিবাসীটি বন্ধুর চিন্তাভাবনার ত্রুটি-বিচ্যুতির কথাই ভাবতে লাগল।

নিকলাই সেমনিচ তখনই স্ত্রীর কাছে গেল না। সেও ঐ একই কথা ভাবতে লাগল। "সেন্ট পিতার্সবুর্গের এই সংকীর্ণতা খুবই সাংঘাতিক। তারা কিছুতেই এর বাইরে যেতে পারে না।"

সে স্ত্রীর কাছে যায়নি কারণ সে জানে গিয়ে কোনও লাভ হবে না। সবটাই

রসালো ফলের ব্যাপার। কতকগুলো ছোট ছেলে গতকাল কিছু রসালো ফল নিয়ে এসেছিল। নিকলাই সেমনিচ কোনও রকম দরদাম না করে দুই প্লেট-ভর্তি আধ-পাকা ফল কিনে নিয়েছিল। ছেলেমেয়েরা ছুটে এসে তার কাছে ফল চাইল, আর প্লেট থেকেই খেতে শুরু করে দিলো। তখন মারি সেখানে ছিল না। সে এসে যখন শুনল যে গোগাকেও রসালো ফল খেতে দেওয়া হয়েছে তখন সে বাগে টং হয়ে গেল, কারণ গোগা তখনও অজীর্ণ রোগে ভুগছিল। সে স্বামীকে বকতে শুরু করল, আর স্বামীও তাকে বকতে লাগল। ফলে অপ্রীতিকর কথা-কাটাকাটি, এমন কি ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। সত্যি সত্যি সন্ধ্যা নাগাদ গোগা অসুস্থ হয়ে পড়ল। নিকলাই সেমনিচ ভাবল, শীঘ্রই ওটা সেবে যাবে, কিন্তু ডাক্তারকে ডাকা হয়েছে দেখে সে বুঝতে পারল যে অবস্থা খারাপের দিকে গেছে।

সে ঘরে ঢুকে দেখল, তার স্ত্রী একটা ডোরা-কাটা রেশমী ড্রেসিং গাউন পড়েছে, আর ডাক্তার জ্বলন্ত মোমবাতির আলোয একটা পাত্রেব মধ্যে কি যেন পরীক্ষা কবে দেখছে।

একটা লাঠি দিয়ে পাত্রের দূষিত বস্তুটাকে নাড়তে নাড়তে ডাক্তার পিঁসনের ভিতব দিযে সাগ্রহে সেটা দেখে অর্থপূর্ণভাবে বলল, "হ্যাঁ।"

"এখনও সেই একই হতভাগ্য ফল।"

"কিন্তু ফলেব দোষ কি?" নিকলাই সেমনিচ ভীরু গলায় বলল।

"ফলের দোষ কি? তুমিই তো ওগুলো খাইয়েছ, আর এখন আমাব সারা বাত ঘুম হচ্ছে না, আর ছেলেটা মরতে বসেছে..."

"আবে না, মারা যাবে না," ডাক্তার হেসে বলল।

"একমাত্র বিস্‌মাথ দিলেই কাজ হবে। এখনই দিচ্ছি।"

"ও তো ঘুমিয়ে পড়েছে", মারি বলল।

"তাহলে ওকে বিরক্ত না করাই ভাল; আমি কাল আসব।"

"ধন্যবাদ।"

ডাক্তার চলে গেল। নিকলাই সিমনিচ একা রইল স্ত্রীর কাছে; অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করেও তাকে শান্ত করতে পারল না। সে যখন ঘুমিয়ে পড়ল তখন বেশ আলো ফুটে উঠেছে।

ঠিক সেই সময় অনেক পুরুষ মানুষ ও ছেলের দল রাতভোর পশু চরানো শেষ করে পার্শ্ববর্তী গ্রামে ফিরছিল। কেউ ঘোড়ার পিঠে চেপে চলেছে, কেউ বা ঘোড়াকে টেনে নিয়ে চলেছে, আব বাছুরগুলো তাদের পিছন পিছন ছুটছে।

বারো বছরের ছেলে তারাস্কা রেজুনভ মাথায় সরু টুপি পরে, গায়ে লোমের কোট চাপিয়ে, খালি পায়ে একটা ফুট্-ফুট্ দাগযুক্ত বাচ্চা ঘোটকীর পিঠে চেপে রাশ হাতে

টেনে নিয়ে চলেছে একটা দামড়াকে ও একটা ছিট্-ছিট্ বাচ্চাকে। অন্য সব্বাইকে ছাড়িয়ে সে জোর কদমে পাহাড়ের উপরে গ্রামের দিকে ফিরে গেল। একটা কালো কুকুর মনের সুখে ঘোড়াগুলোর আগে আগে ছুটছে আর চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে। বাড়িতে পৌঁছে তারাস্কা ঘোড়া থেকে নামল, ঘোড়াগুলোকে ফটকের সঙ্গে বাঁধল, তারপর ভিতরে ঢুকল।

বোন ও ভাই বস্তার উপর ঘুমিয়েছিল। তাদের ডেকে বলল. "হেই, তোমরা সব অনেকক্ষণ তো ঘুমিয়েছ!"

মাও তাদের পাশেই শুয়েছিল; গরু দুইবার জন্য সে একটু আগেই উঠে পড়েছে।

ওল্‌গুশ্‌কা লাফ দিয়ে উঠে পড়ল: দুই হাতে এলোমেলো লম্বা চুল ঠিক করে নিলো। ফেদ্‌কা তার পাশেই ঘুমিয়েছিল : সে তখনও টান-টান হয়ে শুয়েই থাকল; ভেড়ার চামড়ার কোটে তার মাথাটা ঢাকা, কিন্তু পায়ের গোড়ালি বেরিয়ে আছে।

আগের দিন সন্ধ্যা থেকেই ছেলেমেয়েরা রসালো ফল কুড়োতে যাবার মতলব এঁটেছে; তারাস্কা তাদের কথা দিয়েছিল যে রাতের পশু চরানো শেষ করে ফিরে এসেই সে সকলকে জাগিয়ে দেবে।

আর তাই সে করল। রাতের পাহারায় একটা ঝোপের নিচে বসে বসে সে ঘুমে ঢুলছিল; এখন সে বেশ খোশ মেজাজে আছে; তাই ঠিক করল আর, না ঘুমিয়ে মেয়েদের সঙ্গে ফল কুড়োতে যাবে। মা এক পাঁইট দুধ দিলো। নিজেই একটুকরো রুটি কেটে নিলো. তারপর টেবিলের পাশে একটা উঁচু বেঞ্চিতে বসে খেয়ে নিলো।

শুধু একটা শার্ট ও ট্রাউজার পরে সে তাড়াতাড়ি ছুটল; রাস্তার ধুলোর উপর তার খালি পায়ের ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠতে লাগল। ধুলোর উপর আরও অনেক পায়ের ছাপ দেখা গেলো; কতক বড়, কতক ছোট, কিন্তু আঙুলের ছাপ খুব পরিষ্কার। অনেক দূরে ঘন সবুজ বনের মধ্যে মেয়েদের লাল ও সাদা গোড়ালিগুলো দেখা যাচ্ছে। তারা যখন রাস্তার মোড় ঘুরে বড় জঙ্গলে ঢুকতে যাবে তখনই তারাস্কা তাদের ধরে ফেলল।

ঘাসের উপর, ঝোপের উপর, এমন কি গাছের নিচু ডালপালাতেও শিশির পড়েছে; মেয়েদের ছোট ছোট খালি পাগুলো সঙ্গে সঙ্গে ভিজে গেল; প্রথমে বেশ ঠাণ্ডা লাগল, কিন্তু পরে ভিজে ঘাসের উপর থেকে শুকনো মাটিতে হাঁটতে শুরু করতেই শরীর আবার বেশ গরম হয়ে উঠল। জঙ্গলের মধ্যে একটা পরিষ্কার জায়গাতে রসালো ফলের বাগান। মেয়েরা প্রথমে গত বছরের পরিষ্কার করা আস্তানায় গেল। সবে অংকুর গজিয়েছে; নতুন সবুজ ঝোপের মধ্যে ছোট ঘাসে ঢাকা একটা জায়গায় অনেক রসালো ফল ঘাসের মধ্যে লুকনো ছিল; কতক গোলাপী-সাদা, কতক লাল।

ছোট মেয়েগুলো উপুড় হয়ে ছোট ছোট রোদে-পোড়া হাত দিয়ে একটার পর

একটা রসালো ফল কুড়োতে লাগল; যেগুলো খারাপ সেগুলোকে টপাটপ মুখে পুরে দিলো। আর যেগুলো ভাল সেগুলোকে রেখে দিলো ঝুড়িতে।

"ওল্‌গুশ্‌কা! এখানে আয়। এখানে অনেক-অনেক ফল।"

"না? হি! হ্যালো!" ঝোপেব একেবারে ভিতরে ঢুকে পাশাপাশি থেকে তারা পরস্পরকে ডাকাডাকি করতে লাগল।

তারাস্কা তাদের থেকে অনেক দূরে পাহাড়ের খাঁড়ির ওপারে চলে গেল; এক বছর আগে সেখানে অনেক গাছ কেটে ফেলে রাখা ছিল। সেই সব গাছের ফাঁকে ফাঁকে অনেক ছোট ছোট গাছ, বিশেষ করে বাদাম ও ম্যাপল্‌ গাছের চারাগুলো মানুষের মাথাকে ছাড়িয়ে উঠেছে। সেখানকার ঘাস বেশ ঘন আর রসেভবা; ঘাসের আড়াল থাকায় সেখানকার ফলগুলিও বেশ বড় বড় আর অনেক বেশি রসালো।

"গ্রুশ্‌কা!"

"কি-ই!"

"যদি নেকড়ে আসে?"

"কি নেকড়ে? তোর ভয় করছে! আমি থোরাই কেয়ার করি", গ্রুশ্‌কা বলল; নেকড়ের কথা ভাবতে ভাবতে নিজের কথা ভুলে গিয়ে সে একটাব পব একটা ফল, এমন কি সেরা ফলগুলোকেও মুখে পুবতে লাগল, ঝুড়িতে কিছুই রাখছে না।

"কিন্তু আমাদের তারাস্কা তো খাঁড়ি ছাড়িয়ে চলে গেছে। তারাস্কা-আ।"

"ইয়া—ওঃ!" খাঁড়ির ভিতব থেকে তাবাস্কা জবাব দিলো। "এখানে আয।"

"চলো, ওখানেই যাই; ওখানে অনেক পাওয়া যাবে।"

মেয়েরা হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপ-ঝাড় ধরে খাঁড়ি বেয়ে নিচে নামল এবং ওপারে উঠে গেল; সেখানে রোদে-ঝলমল এমন একটা জায়গা পেয়ে গেল যেখানে ঘন ঘাসের মধ্যে এন্তার রসালো ফল ছড়িয়ে রয়েছে। দু'জনই একেবারে চুপ। তাদের হাত ও মুখ কিন্তু অবিরাম চলতে লাগল।

হঠাৎ কি একটা যেন লাফ দিয়ে ঝোপ-ঝাড়ের ভিতব দিয়ে ছুটে গেল; সেই নৈঃশব্দের মধ্যে সেটাকে একটা ভয়ার্ত প্রাণী বলে মনে হলো।

গ্রুশ্‌কা ভয়ে মাটিতে পড়ে গেল; তার অর্ধেক ফল ঝুড়ি থেকে ছড়িয়ে পড়ল।

"মামুশ্‌কা!" সে আর্তনাদ করে কেঁদে ফেলল।

ঝোপের ভিতর দিয়ে ছুটে-যাওয়া ধূসর-বাদামী রঙের একজোড়া কান ও পিঠ দেখিয়ে ওল্‌গুশ্‌কা বলল, "ওটা একটা খরগোস রে, খরগোস! তারাস্কা! একটা খোরগোস। ওই তো ছুটছে।" খরগোসটা চলে গেলে ওলগুশ্‌কা গ্রুশ্‌কাকে বলল, "তোর আবার কি হলো?"

"আমি ভেবেছিলাম একটা নেকড়ে," বলেই গ্রুশ্‌কা হঠাৎ ভয় ও চোখের জলের বদলে হো-হো করে হেসে উঠল।

"তুই বড় বোকা!"

গ্রশ্‌কা হাসতে হাসতেই বলল, "আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম!"

ফল কুড়োতে কুড়োতে তারা অনেক দূর এগিয়ে গেল। সূর্য উঠেছে; সবুজের ছোপ-লাগা ছায়ার উপর উজ্জ্বল রোদের টুকরোগুলো খেলা করছে; শিশিরবিন্দুগুলোর উপর পড়ে ঝিকমিক করছে। শিশির লেগে মেয়েদের কোমর পর্যন্ত ভিজে উঠেছে। আবও বেশি ফল পাবার আশায এগোতে এগোতে তাবা বনের প্রায় শেষ প্রান্তে পৌছে গেছে এমন সময় ফল কুড়োতে আসা অন্য সব স্ত্রীলোক ও মেয়েদের বিক্ষিপ্ত কথাবার্তা তাদেব কানে এল।

প্রাতরাশের সময় হলে ঝুড়ি ও ছোট পাত্রগুলো প্রায ভর্তি কবে নিয়ে মেয়েরা আকুলিনা মাসির কাছে গিযে হাজির হলো; মাসিও তাদেব সঙ্গে এসেছে বসাল ফল কুড়োতে। আকুলিনা মাসিব পেছনে একটি পেট-মোটা ছোট ছেলে ফোলা-ফোলা বাঁকা পাযে হেঁটে চলেছে; তার পরনে শুধু একটা শার্ট, টুপিও নেই।

ছোট ছেলেটির হাত ধবে আকুলিনা মেয়েদের বলল, "এ আমার বড় ন্যাওটা। ওকে কারও কাছে রেখে আসতে পাবি না।"

"এইমাত্র আমবা একটা খবগোসকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি। সেটা যে কী রকম শব্দ কবে উঠল —তারপরে দে ছুট..."

"বলো কি।" আকুলিনা ছেলেটির হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলল।

আকুলিনাকে ছেড়ে মেযেবা তাদের কাজে চলে গেল।

বাদাম গাছেব ঘন ছায়ায বসে ওল্‌গুশ্‌কা বলল, "আয়, এখানে একটু বসি। আমি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আহা, কিছুটা রুটি নিয়ে এলে এখন বেশ খাওযা যেত।"

"আমারও খিদে পেয়েছে," গ্রুশ্‌কা বলল।

"আকুলিনা মাসি ওরকম চেঁচাচ্ছে কেন? শুনতে পাচ্ছিস? হ্যালো, এই যে আমরা আকুলিনা মাসি!"

"ওল্‌গুশ্‌কা-আ!" আকুলিনা পাল্টা ডাক দিলো।

"কি!"

"ছোট ছেলেটি কি তোমাদের সঙ্গে?" আকুলিনা চেঁচিয়ে বলল।

"না।"

হঠাৎ ঝোপের মধ্যে সর্‌-সর্‌ শব্দ হলো। হাঁটুব উপর ঘাঘবা তুলে হাতে একটা থলে নিয়ে আকুলিনা মাসি হামাগুড়ি দিয়ে এখানে হাজির হলো।

"তোমরা ছেলেটিকে দেখোনি?"

"না।"

"কি বিপদ! মিশ্‌—কা—আ!"

"মিশ্‌—কা—আ!"

কেউ জবাব দিলো না।

"কী দুঃখ! সে হারিয়ে গেছে। বড় জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছে।"

ওল্‌গুশ্‌কা লাফিয়ে উঠে গ্রুশ্‌কাকে সঙ্গে নিয়ে একদিকে খুঁজতে গেল; আকুলিনা মাসি গেল আব একদিকে। তারস্বরে বার বার মিশ্‌কাকে ডাকতে লাগল, কিন্তু কেউ জবাব দিলো না।

গ্রুশ্‌কা থেমে বলল, "আমি আর পারছি না," কিন্তু ওল্‌গুশ্‌কা অনবরত হাঁক দিতে দিতে ডাইনে-বাঁয়ে সব দিকে খুঁজতে লাগল।

আকুলিনার হতাশ কণ্ঠস্বর বড় জঙ্গলটার দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। হাল ছেড়ে দিয়ে ওল্‌গুশ্‌কা বাড়ি ফিরে যাবার উদ্যোগ করছে এমন সময় কতকগুলো ছোট ছোট লিন্ডেন গাছের পাশে একটা ঘন ঝোপের মধ্যে একটা পাখির অবিশ্রাম ক্রুদ্ধ শিস তার কানে এল; পাখিটা হয়তো বাসা তৈরি করছে, আর খুব বিবক্ত হয়েছে। পবিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, একটা কিছু দেখে পাখিটা ভয় পেয়েছে, রেগে গেছে। ঘন লম্বা ঘাস ও ফুলে ঢাকা একটা ঝোপের মধ্যে চোখ ফেলতেই ওল্‌গুশ্‌কা দেখল, ঝোপের ঠিক মাঝখানে একটা নীল স্তূপের মতো কি যেন রয়েছে। ভাল করে নজর করতেই বুঝতে পারল স্বয়ং মিশ্‌কা। তাকে দেখেই পাখিটা ভয় পেয়েছে, বেগে গেছে।

ছোট হাত দুটো মাথার নিচে রেখে ছোট ছোট বাঁকা পা দুটোকে টান-টান কবে দিয়ে মিশ্‌কা আরাম কবে ঘুমিয়ে আছে।

ওল্‌গুশ্‌কা তার মাকে ডাকল, ছেলেটিকে ঘুম থেকে তুলে ফল খাইয়ে দিলো।

তারপর অনেক দিন পর্যন্ত ওল্‌গুশ্‌কা যার সঙ্গে দেখা হতো তাকেই, বাড়িতে বাবা মাকে ও পাড়া-প্রতিবেশীদের এই ঘটনা শুনিয়ে দিতো; কেমন করে সে অনেক খুঁজে তবে আকুলিনার ছোট ছেলেটিকে পেয়েছিল।

সূর্য ইতিমধ্যেই গাছের উপর উঠে এসেছে; কড়া রোদে মাটি এবং মাটির উপরে যা কিছু সব ভাজা-ভাজা হচ্ছে।

ওল্‌গার সঙ্গীদেব একজন বলল, "ওল্‌গুশ্‌কা। চল্‌, আমবা সাঁতার কাটি।" আব অমনি হৈ-হৈ করে গান করতে করতে তারা নদীতে গেল। হৈ-চৈ, চিৎকার চেঁচামেচি ও পা ছোঁড়া-ছুঁড়ি করতে করতে মেয়েরা খেয়ালই করেনি কখন পশ্চিম আকাশে একটা কালো মেঘ জমেছে, সূর্য একবার লুকিয়ে পড়ছে, আবার দেখা দিচ্ছে, ফুল ও বার্চ গাছের পাতার গন্ধ উগ্রতর হয়ে উঠেছে, বজ্রের গর্জন শুরু হয়েছে। মেয়েদের পোশাক পরা শেষ হতে না হতেই বৃষ্টি নামল; সকলে কাক-ভেজা ভিজল।

ভিজে পোশাক গায়ে জড়িয়ে মেয়েরা দৌড়ে বাড়িতে গেল, কোনও বকমে এক কামড় খেয়ে নিয়ে ডিনার নিয়ে আলু ক্ষেতে গেল; ওল্‌গুশ্‌কার বাবা সেখানে চাষ করছে।

ফিরে এসে তারা যখন ডিনারে বসল তখন তাদের পোশাক পুরোপুরি শুকিয়ে গেছে। ছোট ছোট বাটিতে করে রসালো ফল নিয়ে তারা নিকলাই সেমনিচ-এর ভিলাতে গেল; সেখানে তাদের বেশ ভাল দাম দেওয়া হয়; কিন্তু আজ তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হলো।

গরমে ক্লান্ত হয়ে একটা ছাতার নিচে বড় হাতল-চেয়ারটায় মারি বসেছিল; ছোট মেয়েগুলোকে রসালো ফল হাতে ঢুকতে দেখে পাখাটা নেড়ে সে বলে উঠল, "দরকার নেই। কোনও দরকার নেই।"

বড় ছেলে ভালিয়া প্রাচীন সাহিত্য পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ক্রোকেট খেলছিল। সে ওল্‌গুশ্‌কার কাছে ছুটে গিয়ে ফলগুলো দেখে বলল,

"দাম কত?"

ওল্‌গুশ্‌কা বলল, "ত্রিশ কোপেক।"

"বড় বেশি দাম।" বড়রা সব সময় কথাটা বলে বলেই সেও বলল। "দাঁড়াও, ওই মোড়টা ঘুরে এস," বলেই সে তার দাইয়ের কাছে ছুটে গেল।

ইতিমধ্যে ওল্‌গুশ্‌কা ও গ্রুশ্‌কা গোল আয়নাটার মধ্যে ছোট ছোট ঘোড়া, জঙ্গল ও বাগানের মতো কিছু দেখতে পেয়ে খুব প্রশংসা করল। কিন্তু মোটেই অবাক হলো না, কারণ এই সব রহস্যময় ও দুর্বোধ্য ভদ্রলোকদের বাড়িতে আরও অনেক বেশি বিস্ময়কর জিনিস তারা আশা করেছিল।

ত্রিশ কোপেক পাবার আশায় ভালিয়া তার নার্সের কাছে ছুটে গেল। নার্স বলল, বিশ কোপেকই যথেষ্ট; ছোট সিন্দুকটার ভিতর থেকে টাকাটা বের করে দিলো। বাবাকে লুকিয়ে সেই বিশ কোপেক মেয়েগুলিকে দিয়ে সবগুলো ফল একটা প্লেটে ঢেলে নিয়ে সে গোগ্রাসে গিলতে লাগল।

বাড়ি পৌঁছে দাঁত দিয়ে রুমালের গিঁট খুলে ওল্‌গুশ্‌কা টাকাটা তার মাকে দিলো। মা সেটা লুকিয়ে রেখে কাপড়চোপড় নিয়ে নদীতে চলে গেল।

প্রাতরাশের পর থেকে বাবার সঙ্গে চাষের কাজ করে তারাস্কা একটা ওক গাছের ঘন ছায়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে; অপর একজনের জমির পাশে ঘোড়াটা চরে বেড়াচ্ছে; যে কোনও সময় সে ওক-ক্ষেতে বা মাঠে ঢুকে পড়তে পারে।

নিকলাই সেমনিচের পরিবারে এখন সবই স্বাভাবিকভাবে চলেছে।

সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে। তিন পদের প্রাতরাশ তৈরি হয়েছিল; মাছিগুলো সব খেয়ে গেছে; খাবার মতো অবস্থা নেই বলে কেউ আসেনি।

খবরের কাগজে নিজের অভিমতের সমর্থনের কথা পড়ে নিকলাই সেমনিচ এখন খুব খুসি। গোগা ভাল হয়ে উঠছে দেখে মারিও শান্ত। তার ওষুধে ভাল ফল হয়েছে দেখে ডাক্তারও সন্তুষ্ট। এক প্লেট ভর্তি রসালো ফল খেতে পেয়ে ভালিয়াও খুসি।

—১৯০৫

কচি-কাঁচাদের জন্য

Stories for Children

॥ বিড়ালছানা ॥

এক সময়ে ভাসিয়া ও কাতিয়া নামে দুই ভাই-বোন ছিল। তাদের ছিল একটি বিড়াল। বসন্তকালে বিড়ালটি উধাও হয়ে গেল। ভাই-বোন তাকে সব জায়গায় খুঁজল, কিন্তু কোথাও পেল না।

একদিন গোলাবাড়ির কাছে খেলা করতে করতে তারা মাথার উপরে ক্ষুদে গলায় মিউ-মিউ ডাক শুনতে পেল। ভাসিয়া মই বেয়ে খড়ের গাদায় উঠে গেল।

কাতিয়া নিচে দাঁড়িয়ে বার বার জানতে চাইল, "পেয়েছ? তাদের পেয়েছ?"

কিন্তু ভাসিয়া জবাব দিলো না। শেষ পর্যন্ত চেঁচিয়ে বলল, "পেয়েছি! এই তো আমাদের বিড়াল। বাচ্চা হয়েছে। কী চটপটে বাচ্চাগুলো। উঠে আয়, তাড়াতাড়ি।"

কাতিয়া ছুটে বাড়ি চলে গেল; বিড়ালটার জন্য খানিকটা দুধ নিয়ে ফিরে এল।

পাঁচটা বাচ্চা হয়েছে। একটু বড় হতেই তারা খড়ের গাদার এক কোণে যেখানে জন্মেছিল সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল। ভাই-বোন তাদের মধ্যে একটাকে পছন্দ করল। সেটার গায়ের রং ধূসর, থাবাগুলো সাদা। তারা সেটাকে বাড়িতে নিয়ে এল। মা অন্য ছানাগুলোকে লোকজনদের মধ্যে বিলিয়ে দিলো, আর এটাকে রেখে দিলো নিজের ছেলেমেয়ের জন্য। ভাই-বোন ছানাটাকে খাওয়ায়, তার সঙ্গে খেলা করে, নিজেদের বিছানায় শুইয়ে ঘুম পাড়ায়।

একদিন ভাই-বোন রাস্তায় খেলতে যাবার সময় বিড়ালছানাটাকে সঙ্গে নিয়ে গেল।

বাতাসে খড়গুলো উড়ে রাস্তায় এসে পড়ছিল। বিড়ালছানাটা খড় নিয়ে খেলতে লাগল; তা দেখে ভাই-বোন হাসতে লাগল। তারপর পথের পাশে লাল শাক দেখতে পেয়ে দু'জনই শাক তুলতে চলে গেল, আর বিড়ালছানাটার কথা ভুলেই গেল।

হঠাৎ তারা একটা চিৎকার শুনতে পেল: "ফিরে আয়! ফিরে আয়!" তাকিয়ে দেখল, একজন শিকারী ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে, আর তার আগে আগে ছুটছে দুটো শিকারী কুকুর। কুকুর দুটো বিড়ালছানাটাকে দেখতে পেয়ে সেটাকে তাড়া করল। বিড়ালছানাটা কিন্তু পালিয়ে না গিয়ে মাটিতে নুয়ে পড়ে পিঠটা বেঁকিয়ে কুকুর দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল।

কুকুর দুটোকে দেখে কাতিয়া ভয় পেল। চিৎকার করে ছুটে সরে গেল। কিন্তু ভাসিয়া বিড়ালছানাটার দিকে ছুটে গেল এবং কুকুব দুটো পৌছবার সঙ্গে সঙ্গেই ছানাটার কাছে পৌছে গেল।

কুকুর দুটো ছানাটাকে ধরতে যাবে এমন সময ভাসিয়া রাস্তার উপর শুয়ে পড়ে বিড়ালছানাটাকে আড়াল করে ফেলল।

শিকারী ঘোড়া ছুটিয়ে এসে কুকুর দুটোকে তাড়িযে নিয়ে গেল। ভাসিয়া বিড়ালছানাটাকে বাড়িতে নিয়ে এল। আর কখনও সেটাকে নিয়ে মাঠে যেত না।

।। একটি মেয়ে ও ব্যাঙের ছাতা।।

ঝুড়ি-বোঝাই ব্যাঙেব ছাতা নিযে দুটি মেয়ে জঙ্গল থেকে ফিরছিল।

পথে তাদের একটা রেল-লাইন পার হতে হয়।

তারা ভাবল, ট্রেনটা অনেক দূরে আছে। তাই বাঁধটা পার হয়ে রেললাইন ধবে হাঁটতে লাগল।

হঠাৎ তারা ট্রেনের শব্দ শুনতে পেল। বড় মেয়েটি তীরের মতো বেগে ফিরে এল, কিন্তু ছোটটি লাইনের উপর দিয়েই দৌড় দিলো।

বড় মেযেটি চিৎকার করে বোনকে বলল, "ফিরিস না!"

কিন্তু ট্রেনটা তখন এত কাছে এসে পড়েছে আব এত শব্দ করছে যে ছোট মেয়েটি দিদির কথা শুনতেই পেল না। সে ভাবল, দিদি বুঝি তাকে ফিরে যেতে বলছে। সেও ফিরে আসবার জন্য লাইন ধরে ছুটল, হোঁচট খেযে তাব হাতের ঝুড়িটা পড়ে গেল, আর সে অমনি ব্যাঙের ছাতাগুলো কুড়োতে শুরু করে দিলো।

ট্রেনটা তখন খুব কাছে এসে পড়েছে। ইঞ্জিন-চালক যত জোরে পাবল বাঁশিতে টান দিলো।

বড় মেয়েটি চেঁচিয়ে বলল, "ব্যাঙের ছাতা পড়ে থাক।" কিন্তু ছোট মেয়েটি ভাবল দিদি তাকে সব ব্যাঙের ছাতা কুড়িয়ে নিতে বলছে; তাই সে ব্যাঙেব ছাতাগুলোর উপরেই ঝুঁকে পড়ল।

চালক সময়মতো ট্রেনটাকে থামাতে পারল না। ট্রেনের বাঁশি জোরে বাজতে লাগল। ট্রেন মেয়েটির উপর দিয়ে চলে গেল।

বড় মেয়েটি আর্তনাদ করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। যাত্রীরা গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগল। মেয়েটির কি হলো দেখবার জন্য কন্ডাক্টার ট্রেনের শেষ প্রান্তে ছুটে গেল।

ট্রেনটা পার হয়ে গেলে সকলেই দেখল, ছোট মেয়েটি দুটো লাইনের মাঝখানে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। একেবারে চুপচাপ।

তারপর সে মাথাটা তুলল, হাঁটুব উপর বসল, ব্যাঙের ছাতাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে দিদির কাছে ফিরে গেল।

।। ছোট পাখি।।

সেরিওঝার জন্মদিনে সে অনেক উপহার পেল : লাটিম, খেলনা-ঘোড়া, ছবিব বই—কত। কিন্তু সকলের সেরা উপহার পেল কাকার কাছ থেকে। একটা পাখি ধরার ফাঁদ।

একটুকরো কাঠের সঙ্গে একটা কাঠামো জুড়ে দিয়ে তার উপর একটা জাল ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কাঠের উপর খাবারের কণা ছড়িয়ে দিয়ে জালটা উঠোনে পেতে দেওয়া হয়। একটা পাখি উড়ে এসে কাঠটার উপর বসলেই সেটা উল্টে গিয়ে জালটা পড়ে যায়।

সেরিওঝা খুসি হয়ে দৌড়ে গিয়ে মাকে ফাঁদটা দেখালো। মা বলল, "এ খেলনাটা মোটেই ভাল নয়। ছোট পাখি দিয়ে তুমি কি করবে? তাকে কষ্ট দিতে চাও কি?"

"পাখিগুলোকে খাঁচায় বেখে দেবো। ওরা গান করবে, আর আমি ওদেব খাওয়াব।"

কিছু খাবারের কণা যোগাড় করে সেবিওঝা সেগুলো ছোট কাঠটার উপর ছড়িয়ে দিয়ে বাগানে ফাঁদটা পেতে দিলো। কখন একটা পাখি উড়ে আসবে সেই আশায় ফাঁদের কাছেই অপেক্ষা কবতে লাগল। কিন্তু পাখিরা তাকে দেখে ভয় পেল, ফাঁদেব কাছেই এল না।

ফাঁদটাকে বাগানে রেখে সেরিওঝা ডিনার খেতে চলে গেল। ফিরে এসে দেখল, জালটা পড়ে গেছে আর একটা ছোট পাখি তার নিচে ঝটপট কবছে। সেরিওঝা খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল। পাখিটাকে ধবে বাড়ি নিয়ে গেল।

"দেখো মামণি, আমি একটা পাখি ধরেছি। এটা নিশ্চয নাইটিঙ্গেল। উঃ, কী রকম জোবে ওর বুকটা ধুক্‌ধুক্ করছে।"

মা বলল, "এটা সিস্কিন পাখি। ওকে কষ্ট দিও না। ছেড়ে দাও।"

"না, আমি একে খাওযাব, যত্ন করব।"

সেরিওঝা সিস্কিন পাখিটাকে একটা খাঁচায় রেখে দিলো, দু'দিন ধবে তাকে দানা খাওয়াল, জল বদলে দিলো, খাঁচা পবিষ্কার কবল। তৃতীয় দিন সে সিস্কিনের কথা ভুলে গেল; জলটা বদলে দেওয়া হলো না।

তখন মা তাকে বলল, "দেখলে? ছোট পাখিটার কথা তুমি একেবারেই ভুলে গেছ। আমার মনে হয়, ওটাকে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

"না। আমি ছাড়ব না। এখনই নতুন জল এনে দিচ্ছি, খাঁচাটা পরিষ্কার করে দিচ্ছি।"

সেরিওঝা খাঁচার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে সেটাকে পরিষ্কার করতে লাগল; পাখিটা ভয় পেয়ে খাঁচার গায়ে ডানা ঝাপ্‌টাতে লাগল। খাঁচা পরিষ্কার করে সেরিওঝা জল আনতে চলে গেল।

মা দেখল, সেরিওঝা খাঁচার দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছে; সে চেঁচিয়ে বলল, "দরজা বন্ধ করে যাও সেরিওঝা, নইলে তোমার পাখি হয়তো উড়ে বাইরে গিয়ে আঘাত পাবে।"

কথাগুলি বলতে না বলতেই পাখিটা দরজা খোলা পেয়ে মনের সুখে ডানা মেলে দিয়ে উড়াল দিয়ে জানালায় চলে গেল। জানালার কাঁচটা দেখতে না পেয়ে তাতে ঠোক্কর খেয়ে পাখিটা গোবরাটের উপর পড়ে গেল।

সেরিওঝা ছুটে এসে ছোট পাখিটাকে তুলে নিয়ে আবার খাঁচায় রেখে দিলো। পাখিটা বেঁচেই আছে; কিন্তু ছোট ডানা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে থেমে থেমে শ্বাস টানতে লাগল। সেরিওঝা কাঁদতে লাগল।

"মামণি! আমি কি করি?"

"এখন আর তোমাব কিছু করাব নেই।"

সাবাদিন সেরিওঝা সে ঘর ছেড়ে গেল না। সিস্কিন পাখিটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। পাখিটা আগের মতোই উপুড় হয়ে পড়ে আছে; থেমে থেমে শ্বাস টানছে। রাত হলে সেরিওঝা যখন শুতে গেল পাখিটা তখনও বেঁচে ছিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেরিওঝার চোখে ঘুম এল না। চোখ বুজলেই সে যেন দেখতে পায়, পাখিটা খাঁচার ভিতরে পড়ে খাবি খাচ্ছে।

পরদিন সকালে খাঁচার কাছে গিয়ে সেরিওঝা দেখল, পা দুটো গুটিয়ে সিস্কিন পাখিটা মরে গেছে।

সেরিওঝা আর কোনওদিন পাখি ধরেনি।

।। কুলের বীচি ।।

বাচ্চাদের খাবার জন্য মা কিছু কুল কিনে আনল। একটা প্লেটে সাজিয়ে রেখে দিলো। ভানিয়া কোনওদিন কুল খায়নি; সে কুলের গন্ধ শুঁকতে লাগল। কুলগুলি দেখতেও খুব ভাল। একটা মুখে দিতে ভারী ইচ্ছা করছে। প্লেটটার পাশ দিয়ে বার বার হাঁটতে লাগল। যখন দেখল ঘরে কেউ নেই, তখন আর লোভ সামলাতে পারল না। একটা কুল তুলে নিয়ে খেয়ে ফেলল। ডিনারের আগে মা গুণে দেখল একটা কুল কম পড়ছে। সে বাবাকে কথাটা জানাল।

ডিনারে বসে বাবা বলল, "তোমরা কেউ একটা কুল খেয়েছ?"

সকলেই জবাব দিলো : "না"

ভানিয়া বীটের মতো লাল হয়ে উঠল। সেও বলল, "না, আমি খাইনি।"

বাবা বলল, "তোমাদের মধ্যে একজন সেটা খেয়েছে; সে কাজটা ভাল করেনি। কিন্তু এখন আর তা বলে লাভ নেই। এখন কথা হচ্ছে, কুলের ভিতরে বীচি থাকে; কেউ যদি ঠিকমতো কুল খেতে না জেনে একটা বীচি খেয়ে ফেলে তাহলে পরদিনই সে মারা যাবে। আমার ভয়টা সেখানে।"

ভানিয়ার মুখ সাদা হয়ে গেল; সে বলে উঠল, "ওঃ, আমি তো বীচিটাকে জানালা দিয়ে ফেলে দিয়েছি।"

তখন সকলেই হো-হো করে হেসে উঠল, কিন্তু ভানিয়া কেঁদে ফেলল।

।। মিথ্যাবাদী।।

একটি রাখাল বালক তার মেষপাল নিয়ে মাঠে গিয়েছিল। একদিন সে ঠিক করল, যেন একটা নেকড়ে দেখতে পেয়েছে এমনি ভাব দেখিয়ে চেঁচাবে, "বাঁচাও! একটা নেকড়ে! একটা নেকড়ে।"

গ্রামের লোকরা ছুটে এসে দেখল, সে তাদের নিয়ে তামাসা করেছে। আরও দু'তিন বার সে এ কাজ করল। তারপর একদিন সত্যি সত্যি একটা নেকড়ে এসে তার মেষপালকে আক্রমণ করল।

বালকটি চেঁচিয়ে ডাকল, "ছুটে এস! শিগ্‌গির! একটা নেকড়ে এসেছে।"

গ্রামের লোকরা ভাবল, সে এবারও তামাসা করছে; তার চেঁচানিতে কান দিলো না।

নেকড়ে দেখল তার ভয় পাবার কিছু নেই; একে একে সবগুলো মেষকে সে সাবাড় করল।

।। দুই বন্ধু।।

দুই বন্ধু বনের ভিতর দিয়ে হাঁটছিল। এমন সময় একটা ভালুক তাদের তাড়া করল। একজন পালিয়ে গিয়ে একটা গাছে চড়ে বসল; আর একজন রাস্তায়ই দাঁড়িয়ে রইল। মাটিতে শুয়ে পড়ে মরার ভান করা ছাড়া তার আর অন্য গতি রইল না।

ভালুকটা কাছে এসে তাকে শুঁকতে লাগল। লোকটি শ্বাস-প্রশ্বাসও বন্ধ করে রাখল।

তার মুখ শুঁকে ভালুকটা তাকে মরা মানুষ মনে করে ধীরে ধীরে চলে গেল।

ভালুক চলে গেলে অপর লোকটি নেমে এসে হেসে বলল, "ভালুকটা তোমার কানে কানে কি বলে গেল?"

"ভালুক বলে গেল, যে মানুষ বিপদের সময় বন্ধুকে ছেড়ে পালায় সে মোটেই ভাল মানুষ নয়।"

।। রাজহাঁস।।

একদল রাজহাঁস উত্তরের ঠাণ্ডা দেশ থেকে দক্ষিণ দিকে উড়ে যাচ্ছিল। তারা উড়ছিল সাগরের উপর দিয়ে। একবারও বিশ্রাম না করে তাবা একদিন একরাত, আরও একদিন একরাত জলের উপর দিয়ে উড়তে লাগল। আকাশে ভরা চাঁদ উঠল। রাজহাঁসরা নিচের কালো জল দেখতে পেল। তারা ক্লান্ত, তবু থামল না, উড়েই চলল। শক্তিশালী বুড়ো রাজহাঁসগুলো পথ দেখিয়ে চলল. আর অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছোটগুলো চলল তাদের পিছনে পিছনে। একটি ছোট বাজহাঁস ছিল সকলের শেষে। তার জোর কমে আসতে লাগল। ডানা ঝাঁপ্‌টাতে ঝাপ্‌টাতে তাব মনে হলো, সে আর উড়তে পারবে না। তখন সে ডানা মেলে দিয়ে ভাসতে ভাসতে ক্রমেই জলের দিকে নামতে লাগল, আর তার সঙ্গীরা পাখায় ভর দিয়ে দূব থেকে দূরে যেতে যেতে চাঁদের আলোয় সাদা বিন্দুর মতো দেখতে হয়ে গেল। ছোট রাজহাঁসটি জলের উপর নেমে ডানা গুটিয়ে নিলো। ঢেউয়ের দোলায় আস্তে আস্তে দুলতে লাগল। রাজহাঁসের দলটাকে এখন আলোকিত আকাশের বুকে একটা ছোট সাদা রেখার মতো দেখাচ্ছে। সেই নিস্তব্ধতাব মধ্যে রাজহাঁসদেব পাখার শোঁ-শোঁ শব্দ শোনা যায় কি যায় না। তারা যখন অদৃশ্য হয়ে গেল তখন ছোট রাজহাঁসটি গলাটা বেঁকিয়ে চোখ বুজল। একেবারে চুপচাপ। শুধু সাগবের ঢেউগুলি উঠছে আর নামছে; সেই সঙ্গে সেও ডুবছে আর ভাসছে। ভোব বেলায় মৃদু বাতাস লেগে জলের ছলছলানি এসে লাগল তার সাদা বুকে। রাজহাঁস চোখ মেলল। পূব দিকে লাল সূর্য উঠছে, আর এদিকে চাঁদ ও তারাবা আসছে ম্লান হয়ে। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে রাজহাঁসটি গলাটা উঁচু করল, কয়েকবাব ডানা ঝাপটালো, তারপর জল থেকে উঠল। উড়বার আগে ডানার ঝাপ্‌টায় জল চলকে উঠল। বাজহাঁস উড়ে চলল উঁচুতে—আরও উঁচুতে, তারপর সাগবের জল যখন অনেক নিচে পড়ে রইল তখন সে দক্ষিণেব গরম দেশের দিকে বাঁক নিলো। যে পথে তার বন্ধুরা গেছে সেই পথ ধরে রহস্যময় সমুদ্রের উপর দিয়ে সে একাকি উড়তে লাগল।

।। হাতিটা।।

একটি লোকের একটি হাতি ছিল। সে তাকে ভাল খাওয়াত না, কিন্তু কঠোর পরিশ্রম করাতো। একদিন হাতিটা রেগে গিয়ে তার মনিবকে পায়ের নিচে চেপে দিলো। লোকটি মারা গেল। তখন তার স্ত্রী কাঁদতে লাগল। ছেলেমেয়েদের হাতিটার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল : "হাতি। তুমি এদের বাবাকে মেরে ফেলেছ, এবার এদেরও মেরে ফেলো!" হাতিটা ছেলেমেয়েদের দিকে তাকালো, তারপর বড় ছেলেটিকে শুঁড়

দিয়ে তুলে নিয়ে আস্তে তার পিঠের উপর বসিয়ে দিলো। সেদিন থেকেই হাতিটা সেই ছেলেটিকে মেনে চলে, তার সব কাজ করে দেয়।

।। একটি চড়ুই ও এক ঝাঁক চাতক।।

একদিন আমি উঠোনে দাঁড়িয়ে কার্নিশের নিচে চাতক পাখির বাসাটার দিকে তাকিয়েছিলাম। দেখতে দেখতে দুটো চাতক পাখিই বাসা ছেড়ে উড়ে চলে গেল।

তারা চলে যেতেই একটি চড়ুই ছাদের উপর থেকে উড়ে এসে লাফাতে লাফাতে বাসাটার কোণে গিয়ে থামল, চারিদিকে তাকালো, আর তার পরেই শাঁ করে বাসার মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর মাথাটা বের করে কিচির-মিচির ডাকতে লাগল।

একটু পরেই একটি চাতক ফিরে এল। বাসায় ঢুকতে গিয়ে ভিতরে চড়ুইকে দেখতে পেয়ে কিচ্-কিচ্ করে ডেকে উঠল, আর তার পরেই পাখা ঝাপ্‌টে উড়ে গেল।

চড়ুই সেখানে বসেই ডাকতে লাগল।

হঠাৎ এক ঝাঁক চাতক এসে হাজির হলো। প্রতিটি চাতক যেন চড়ুইকে দেখবার জন্যই বাসার কাছে উড়ে গেল, আর তার পরেই আবার উড়ে চলে গেল।

চড়ুই মোটেই ভয় পেল না। এদিক-ওদিক মাথাটা নেড়ে আগের মতোই ডাকতে লাগল।

কতকগুলো আবার বাসায় ফিরে এল, একটু হৈ-চৈ করল, তারপর আবার উড়ে গেল।

চাতকগুলো যে এইভাবে বাসায় উড়ে উড়ে যাচ্ছিল তার একটা কারণ ছিল : প্রত্যেকেই ঠোঁটে করে এক ডেলা মাটি এনে বাসায় ঢুকবার মুখটা একটু একটু করে বন্ধ করে দিতে লাগল।

বার বার তারা উড়ে এল আর উড়ে গেল, আর ক্রমেই বেশি করে মাটি পড়বার ফলে বাসার মুখটাও ছোট হতে লাগল।

প্রথমে চড়ুইয়ের গলা দেখা গেল, তারপর শুধু মাথাটা, তারপর ঠোঁট, আর শেষ পর্যন্ত কিছুই দেখা গেল না।

চাতক পাখিরা সকলে মিলে চড়ুই পাখিটাকে বাসার মধ্যে পুরোপুরি আটকে ফেলেছে। তারপর তারা আকাশে উড়ল; কর্কশ স্বরে শিস দিতে দিতে বাড়িটার উপর গোল হয়ে ঘুরতে লাগল।

।। সাগর ঈগল।।

একটা সাগর ঈগল সাগর থেকে অনেক দূরে রাস্তার পাশে বাসা তৈরি করে বাচ্চাগুলোকে তা' দিতে লাগল।

একদিন কিছু লোক গাছটার কাছে কাজ করছিল। নখের মধ্যে একটা বড় মাছ নিয়ে ঈগলটা বাসায় ফিরে এল। মাছটা দেখে লোকরা গাছটাকে ঘিরে চিৎকার করতে লাগল, আর ঈগলটার দিকে পাথর ছুঁড়তে লাগল।

ঈগল মাছটা ফেলে দিলো। একটি লোক সেটা কুড়িয়ে নিলো; অন্য সকলেও চলে গেল।

ঈগলটা বাসার এক কোণে বসে রইল। ছানাগুলো মাথা বের করে ট্যাঁ-ট্যাঁ করতে লাগল। তারা খাবার চাইছে।

ঈগলটা খুব ক্লান্ত; তাই আবার সাগরে উড়ে যেতে পারল না। বাসায় বসে ছানাগুলোর উপর ডানা মেলে ধরল, তাদের আদর করতে লাগল, পালক চুলকে দিলো; যেন তাদের বলছে—তোমরা একটু অপেক্ষা করো। কিন্তু মা যত আদর করে, ছানাগুলো তত চেঁচাতে থাকে।

তখন ঈগলটা বাসা থেকে উড়ে গিয়ে গাছের মগডালে গিয়ে বসল।

ছানাগুলো আরও বেশি করুণ স্বরে চেঁচাতে লাগল।

হঠাৎ ঈগলটা তীব্র স্বরে চিৎকার করে ডানা মেলে দিয়ে অতি দ্রুত সাগরের দিকে উড়ে চলল।

ঈগল যখন ফিরে এল, তখন রাত অনেক হয়েছে। মাটির কাছাকাছি থেকে ধীরে ধীরে উড়তে লাগল। এবারও তার নখের মধ্যে মস্ত বড় একটা মাছ।

গাছের উপর এসে ঈগলটা চারিদিকে তাকিয়ে দেখল কাছাকাছি কোনও লোকজন আছে কি না। তারপর তাড়াতাড়ি ডানা গুটিয়ে বাসার এককোণে গিয়ে বসল।

ছানাগুলো মাথা তুলে ঠোঁট ফাঁক করল, আর ঈগলটা মাছটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছানাগুলোকে খাওয়াতে লাগল।

।। হাঙর ।।

আমাদের জাহাজ নোঙর ফেলল আফ্রিকার উপকূলে। পরিষ্কার দিন; তাজা বাতাস বইছে সাগর থেকে; কিন্তু সন্ধ্যার দিকে আবহাওয়া বদলে গেল; ঘন হয়ে এল। সাহারা থেকে গরম বাতাস ছুটে আসছে যেন গরম উনুন থেকে।

সূর্যাস্তের একটু পরেই ক্যাপ্টেন সেতুর উপর এসে চিৎকার করে বলল : "তোমরা সাঁতারে যেতে পারো!" সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি নাবিক জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, একটা পাল নামিয়ে সেটা দিয়ে একটা সাঁতারের পুকুর তৈরি করে নিলো।

জাহাজে দুটি ছেলে ছিল। তারাই প্রথম জলে ডুব দিলো, কিন্তু পালের মধ্যে পা জড়িয়ে যাওয়ায় ঠিক করল, খোলা সাগরে গিয়ে সাঁতারের পাল্লা দেবে।

সাগরের বুকে যেখানে নোঙরের উপর একটা পিপে ঢেউএর তালে তালে দুলছিল তারা দু'জন গিরগিটির মতো জল কেটে সেইদিকে এগিয়ে গেল।

প্রথমে একজন আব একজনকে ছাড়িয়ে গেল, কিন্তু তারপরে পিছিয়ে পড়ল। তাব বাবা একজন বুড়ো গোলন্দাজ; ডেকে দাঁড়িয়ে সে সগর্বে ছেলেকে দেখছিল। কিন্তু ছেলেটি যখন পিছিয়ে পড়ল তখন তার বাবা চেঁচিয়ে বলল :

"এগিয়ে যাও এবার!"

হঠাৎ ডেকের উপর থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠল : "একটা হাঙব।"

জলের মধ্যে বাক্ষসটার পাখনাগুলো আমবা সকলেই দেখতে পেলাম। হাঙরটা ছেলে দুটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ওলন্দাজটি চেঁচিয়ে বলল, "ফিবে এস। ফিরে এস! একটা হাঙর!" কিন্তু ছেলে দুটি শুনতে পেল না। আবও জোরে হাসতে হাসতে চেঁচাতে চেঁচাতে তাবা সাঁতার কাটতে লাগল।

ছেলে দুটির দিকে তাকিয়ে ওলন্দাজটি কাগজেব মতো বিবর্ণ মুখে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

নাবিকরা একটা নৌকো নামিয়ে দিয়ে তাতে লাফিযে পড়ে যাব যাব দাঁড়ের উপর ঝুঁকে বসল। নৌকো ছুটে চলল ছেলেদুটির দিকে। কিন্তু তারা তখনও অনেক দূরে, আর হাঙরটা ছেলে দুটির পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেছে।

ছেলে দুটি প্রথমে নাবিকদের চেঁচামেচিও শোনেনি, হাঙরটাকেও দেখতে পায়নি। তারপবেই তাদের একজন পিছনে তাকাল; তাব আর্তনাদ আমরা সকলেই শুনতে পেলাম। ছেলে দুটি সাঁতার কেটে একজন আর একজনেব কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল।

আর্তনাদ শুনে ওলন্দাজটির চেতনা ফিরে এল। ছুটে গেল কামানগুলোব কাছে। একটা কামানের নল ঘুরিয়ে হাঁটু ভেঙে বসল; ভাল কবে দেখে নিয়ে অগ্নি-শলাকাটা তুলে নিলো।

জাহাজের প্রতিটি মানুষ যেন জমে গেছে · না জানি কখন কি হয়?

কামান গর্জে উঠল। আমরা দেখলাম, ওলন্দাজটি এক পাশে পড়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে আছে। হাঙরটার কি হলো, অথবা ছেলে দুটিরই বা কি হলো—কিছুই আমরা দেখতে পেলাম না, কারণ ধোঁয়ায় সব কিছু ঢেকে গেছে।

যাই হোক, জলের উপর থেকে ধোঁয়া সরে যেতেই চারিদিক থেকেই গুঞ্জন শোনা গেল। সেটা একটু-একটু করে বাড়তে বাড়তে একসময় একটা আনন্দের ধ্বনি উঠল।

বুড়ো গোলন্দাজ মুখটা খুলল, উঠে দাঁড়াল, তারপর সাগরের দিকে তাকাল।

মরা হাঙরটার হলদে পেটটা ঢেউএর উপর দুলছে। কয়েক মিনিট পরে নৌকোটা ছেলে দুটির কাছে পৌঁছে গেল, এবং তাদের নিয়ে জাহাজে ফিরে এল।

।। ঝাঁপ।।

একটা জাহাজ সারা পৃথিবী ঘুরে বাড়ি ফিরছে। দিনটি শান্ত; সকলেই ডেকের উপর হাজির। একটা বড় বাঁদর সেই ভিড়ের মধ্যে ছুটাছুটি করছে, আর সকলে খুসি মনে তাই দেখছে। বাঁদরটি লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে, ভেংচি কাটছে, আর সকলের নকল করছে! দেখলেই বোঝা যায় সকলে যে মজা পাচ্ছে সেটা ও বুঝতে পারছে, আর তাতেই ওর খেলা দেখানোর উৎসাহ আরও বেড়ে যাচ্ছে।

বাঁদরটা এক লাফে ক্যাপ্টেনের বারো বছর বয়সের ছেলেটির কাছে গিয়ে তার মাথা থেকে টুপিটা তুলে নিয়ে নিজের মাথায় পরল এবং তাড়াতাড়ি মাস্তুল বেয়ে উপরে উঠে গেল। সকলে হেসে উঠল। টুপিহারা ছেলেটি হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারল না।

বাঁদরটা মাস্তুলের প্রথম দাঁড়ে চড়ে বসল; তারপর টুপিটা খুলে হাত ও দাঁত দিয়ে সেটাকে ছিঁড়তে লাগল। ছেলেটির দিকে হাত বাড়িয়ে ভেংচি কেটে বাঁদরটা তাকে ক্ষেপাতে লাগল। ছেলেটি ঘুষি পাকিয়ে গালাগালি দিলো; বাঁদরটা রেগে গিয়ে আরও বেশি করে টুপিটা ছিঁড়তে লাগল। নাবিকরা আরও জোরে হাসতে লাগল, কিন্তু ছেলেটির মুখ লাল হয়ে উঠল, গায়ের জামা খুলে মাস্তুল বেয়ে সে বাঁদরটাকে তাড়া করল। দেখতে দেখতে সে প্রথম দাঁড়ের রশারশির কাছে উঠে গেল, কিন্তু হাত বাড়িয়ে টুপিটা কেড়ে নেবার আগেই চটপটে বাঁদরটা আরও খানিকটা উপরে উঠে গেল।

"তোকে ধরবই!" বলে ছেলেটিও উপরে উঠতে লাগল।

বাঁদরটাও তাকে ইসারা করে আরও উপরে উঠে গেল; উত্তেজনার বশে ছেলেটিও তার দেখাদেখি মাস্তুল বেয়ে আরও উপরে উঠতে লাগল। এইভাবে অচিরেই বাঁদর ও ছেলেটি উভয়েই মাস্তুলের মাথায় উঠে গেল। একেবারে মাথায় উঠে বাঁদর শরীরটাকে পুরো টান করে এক পায়ের আঙুল দিয়ে রশারশিগুলোকে আঁকড়ে ধরে শেষ দাঁড়ের এক প্রান্তে টুপিটাকে ঝুলিয়ে দিলো। তারপর মাস্তুলের মাথায় চড়ে মনের সুখে দাঁত বের করে হাসতে লাগল। দাঁড়ের এক প্রান্তে যেখানে টুপিটা ঝুলছে সেটা মাস্তুল থেকে প্রায় চার ফুট দূরে; কাজেই রশারশি ও মাস্তুলটা ছেড়ে দিলে তবেই সেখানে পৌছনো সম্ভব।

কিন্তু ছেলেটি তখন ভয়ানক উত্তেজিত। সে মাস্তুলটা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ের উপর পা রাখল। এতক্ষণ সকলে ডেকের উপর দাঁড়িয়ে বাঁদর আর ক্যাপ্টেনের ছেলের কাণ্ডকারখানা দেখে হাসছিল, কিন্তু ছেলেটি যখন রশারশি ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ের উপর পা দিলো এবং দুই হাত দু'দিকে বাড়িয়ে তাল রাখতে লাগল, তখন সকলে আতংকে স্তব্ধ হয়ে গেল।

একবার যদি পা ফস্‌কায় তাহলেই ছেলেটি ডেকের উপর পড়ে মারা যাবে। কিন্তু তার পা যদি নাও ফস্‌কায়, সে যদি দাঁড়ের এক কোণে গিয়ে টুপিটা হাতে পেয়েও যায়, তাহলেও তো সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে মাস্তুলের কাছে ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। নিশ্চুপ হয়ে সকলে তাকিয়ে রইল, না জানি কখন কি হয়?

হঠাৎ ডেকের উপর থেকে কে যেন আতংকে চিৎকার করে উঠল। সে চিৎকারে ছেলেটিরও চৈতন্য হলো। নিচে তাকিয়ে সে দুলতে লাগল।

ঠিক সেই মুহূর্তে জাহাজের ক্যাপ্টেন তার বাবা কেবিন থেকে বেরিয়ে এল। তাব হাতে বন্দুক; পাখি শিকার করতে যাচ্ছিল। দাঁড়ের উপব দাঁড়ানো ছেলেব দিকে তাব চোখ পড়ল। বিদ্যুৎগতিতে সে বন্দুকটা তুলে ছেলেব দিকে নিশানা করে চেঁচিয়ে বলল .

"জলে পড়ো! এই মুহূর্তে জলে ঝাঁপ দাও, নইলে আমি তোমাকে গুলি করব।"

ছেলেটি তবু দুলতে লাগল, কিন্তু কিছুই বুঝতে পেরেছে বলে মনে হলো না।

"ঝাপ দাও, নইলে আমি তোমাকে গুলি করব। এক, দুই " বাবা যেই চিৎকাব কবে বলল "তিন", অমনি ছেলেটি জলে ঝাঁপ দিলো।

॥ সিংহ ও কুকুর ॥

একদা একটা কুকুর চিড়িয়াখানায় গিয়ে একটা সিংহের খাঁচায় ঢুকে পড়েছিল। দুই পায়ের মধ্যে লেজ গুটিয়ে কুকুরটা খাঁচার এক কোণে গুড়ি মেরে বসে বইল। সিংহটা কাছে গিয়ে তার গা শুঁকতে লাগল।

কুকুরটা চিৎ হয়ে পড়ে লেজ নাড়তে লাগল।

সিংহটা থাবা দিয়ে সামান্য ঠেলা দিয়ে তাকে উল্টে দিলো।

কুকুরটা লাফ দিয়ে উঠে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল।

সিংহ কুকুরটার দিকে তাকাল, মাথাটা এদিক-ওদিক নাড়ল, কিন্তু কুকুরটাকে ছুঁলো না।

সিংহের রক্ষক এসে তার জন্য এক খণ্ড মাংস ছুঁড়ে দিলো; সিংহ সেটাকে ছিঁড়ে একটা টুকরো কুকুরটার জন্য বেখে দিলো।

সেদিন সন্ধ্যায় সিংহটা যখন শুয়ে পড়ল তখন কুকুরটাও তার পাশে শুয়ে সিংহের থাবার উপর মাথাটা রাখল।

সেদিন থেকেই কুকুরটা সিংহের খাঁচায় বাস করতে লাগল। সিংহ তাব প্রতি বন্ধুর মতো ব্যবহার করত। কুকুরটার পাশেই শুতো, অনেক সময় তার সঙ্গে খেলাও করত।

এইভাবে সিংহ ও কুকুর পুরো একটা বছর একই খাঁচায় বাস করল।

বছরের শেষে কুকুরটা অসুখ হয়ে মারা গেল। সিংহটা খাওয়া ছেড়ে দিলো। কুকুরটাকে শুঁকল, তার গা চেটে দিলো, থাবা দিয়ে তাকে নাড়ল।

সিংহ যখন বুঝতে পারল যে কুকুরটা মরে গেছে তখন সে দুই পা তুলে দাঁড়াল, তার লোমগুলো খাঁড়া হয়ে উঠল, নিজের গায়ে লেজটা আছড়াতে লাগল, খাঁচার দেয়ালের কাছে ছুটে গেল, তালা ও পাল্লাটাকে দাঁতে কামড়াতে লাগল।

সারাটা দিন সিংহটা অস্থির হয়ে খাঁচার মধ্যে ছুটাছুটি করল, আর গর্জন করতে লাগল। তারপর মরা কুকুরটার পাশে চুপচাপ শুয়ে পড়ল। বক্ষক এসে মরা কুকুরটাকে নিয়ে যেতে চাইল, কিন্তু সিংহ তাকে কাছেই ঘেঁসতে দিলো না।

রক্ষক ভাবল, আর একটা কুকুর এনে দিলে সিংহটা এই কুকুরটাকে ভুলে যাবে; তাই আর একটা কুকুবকে খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু সিংহটা ছুটে গিয়ে তৎক্ষণাৎ সেটাকে মেরে ফেলল। তারপর মরা কুকুরটার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল, থাবা দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল, আর সেইভাবে পাঁচটা দিন কাটিয়ে দিলো।

ষষ্ঠ দিনে সিংহটা মাবা গেল।

মনিব ও ভৃত্য

Master and Man

১

সত্তরের দশকের কথা। শীতকালে সেন্ট নিকোলাস-এর ভোজের পরের দিন। যাজক-পল্লীতে একটা উৎসব চলছিল। ফলে গির্জার সেক্সটন (অধস্তন কর্মচারী) ভাসিলি আন্দ্রীচ ব্রেখুনফ ঐ সময়টা বাড়িতে থাকতে বাধ্য হয়েছিল; কারণ গির্জায় উপস্থিত থাকাব প্রয়োজন ছাড়াও কিছু বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনও তার বাড়িতে ছিল। ভাসিলি দ্বিতীয় গিল্ড-এর একজন ব্যবসায়ীও বটে। এতদিনে তাব শেষ অতিথিটিও চলে যাওয়ায় সে পার্শ্ববর্তী গ্রামের জনৈক জোতদারের বাড়ি যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। উদ্দেশ্য, অনেক দিন আগে কথা-দেওয়া কিছু কাঠ কেনা। পাছে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রেতা শহর থেকে এসে তার দাঁওটা মেরে দেয় এই আশংকায় সে খুব তাড়াহুড়া করছিল। কাঠের দামের এক-তৃতীয়াংশ হিসাবে ভাসিলি আন্দ্রীচ সাত হাজার রুবল দাম দিয়েছে, আর শুধু সেই কারণেই তরুণ জোতদারটি দাম হাঁকিয়েছে দশ হাজার। ভাসিলি হয়তো আরও কিছু দর-দাম করত (কারণ কাঠটা ছিল তার নিজের জেলায়, আর স্থানীয় ব্যবসায়ী ও তার নিজের মধ্যে একটা স্বীকৃত চুক্তি আছে

যে একই জেলার কোনও ব্যবসায়ী অপর কোনও ব্যবসায়ী অপেক্ষা বেশি দাম দিতে পারবে না) কিন্তু সে শুনেছে যে, সরকারী বন-বিভাগের কন্ট্রাক্টররাও ঐ গোভিয়াৎচ্কিন্স্কি-কাঠটা কিনবার কথা ভাবছে, আর সেই জন্যই অবিলম্বে সেখানে গিয়ে ব্যাপাবটা পাকাপাকি করে ফেলবার সিদ্ধান্ত সে নিয়েছে। সুতরাং উৎসব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজের সিন্দুক থেকে সাত শ' রুবল বের করল, গির্জার দরুন যে টাকা তার কাছে ছিল তার থেকে আরও দু'হাজার তিন শ' রুবল তার সঙ্গে যোগ করল (মোট হল তিন হাজার) এবং সব টাকাটা ভাল করে গুণে নিল। তারপর সেগুলো পকেট-বইতে রেখে সে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলো।

নিকিতা দৌড়ে গেল ঘোড়া আনতে। ভাসিলির মজুরদের মধ্যে একমাত্র নিকিতাই সেদিন মদ খায়নি। নিকিতা যে সেদিন মদ খায়নি তার কারণ ছিল। আগে সেও মদ খেত। কিন্তু মাংস-ভোজন উৎসবের সময় মদ খাবার জন্য নিজের কুর্তা ও চামড়ার জুতোজোড়া বন্ধক রাখার পরেই হঠাৎ সে প্রতিজ্ঞা করে বসল আর কোনও দিন মদ ছোঁবে না এবং সারা দ্বিতীয় মাসটা একদম খেল না। এমন কি বর্তমান উৎসবেব প্রথম দু'দিন চারিদিকে মদের স্রোত বয়ে চলা সত্ত্বেও সে প্রলোভনকে জয় কবে নিজের প্রতিজ্ঞাকে সে অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

সে একজন মুঝিক (কৃষি-মজুর)। বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর। পাশের গ্রাম থেকে এসেছে। লোকে বলে, সেখানকার বাসিন্দাও সে নয়। জীবনের অধিকাংশ সময় সে অপরিচিত লোকদের সঙ্গেই কাটিয়েছে। তার কাজের ইচ্ছা, পরিশ্রমশীলতা ও শক্তির জন্য, এবং বিশেষ করে তার সদয়, হাসিখুসি স্বভাবের জন্য সর্বত্রই সে যথেষ্ট আদর পেয়েছে। তবু কোনও একটা জায়গাতেই সে বেশি দিন থাকতে পারে না, কারণ বছরে দুই বা ততোধিক বার মাতাল হওয়া যেন তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিযেছিল, আর সেই সময় সে তার যথাসর্বস্ব বন্ধক তো দিতই, উপরন্তু অত্যন্ত বেশি হৈ-হুল্লোড় ও ঝগড়াঝাঁটিও করত। ভাসিলি নিজেও তাকে একাধিকবার বরখাস্ত করেছে, তার সততার জন্য, গৃহপালিত পশুগুলির প্রতি যত্ন-আত্তির জন্য, এবং (যেটা সব চাইতে বড় কথা) অল্প মজুরির জন্য প্রতিবারই তাকে আবার কাজে নিয়েছে। বস্তুত, এ রকম একটি মজুরের প্রকৃত বাজার-দর বছরে আশী রুবলের বদলে ভাসিলি নিকিতাকে দিত মাত্র চল্লিশ রুবল। তার উপরে এই বেতনও তাকে দেওয়া হতো অনিয়মিতভাবে কিস্তিতে-কিস্তিতে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নগদের বদলে ভাসিলিব নিজের দোকান থেকে বেশি দাম দিয়ে কেনা জিনিসপত্রের দামবাবদই সেটা কেটে নেওয়া হতো।

নিকিতার বৌ মার্থা একসময় দেখতে ভালই ছিল। কিন্তু এখন সে খুব কড়া ধাতের স্ত্রীলোক। ছোট ছেলে ও দুটি মেয়েকে নিয়ে সে বাড়িতে থাকে। কখনও সে বাড়িতে এসে তার সঙ্গে দেখা করতে স্বামীকে ডাকে না। তার প্রথম কারণ, গত বিশ বছর যাবৎ সে একজন মিস্ত্রির সঙ্গেই আছে (গোড়ায় এই 'মুঝিক'টি অনেক দূরের

কোনও গ্রাম থেকে এসে এই বাড়িতে উঠেছিল); আর দ্বিতীয় কারণ, স্বামী যখন ভাল অবস্থায় থাকে তখন তাকে খুসিমত চালাতে পারলেও সে যখন মাতাল হয় তখন বৌটি তাকে আগুনের মতই ভয় করে। যেমন একবার মাতাল হবার পরে ভাল অবস্থায় বৌয়ের আঁচল ধরে থাকার প্রতিশোধ নেবার জন্য নিকিতা বৌয়ের বাক্স ভেঙে তার সব ভাল ভাল জামা-কাপড় ও চটকদার জিনিসপত্র বের করে একটা কাঠের উপর ফেলে কুড়ুল চালিয়ে সেগুলোকে টুকরো-টুকরো করে ফেলেছিল। অথচ তার সবটা উপার্জনই সে কিন্তু মার্থার হাতেই তুলে দেয়। এই ব্যবস্থায় সে কোনওদিন আপত্তি করেনি। এই তো উৎসবের দু'দিন আগেই বৌর গাড়ি চালিয়ে ভাসিলির দোকানে গেলে নিকিতা তাকে তিন রুবল দামের সাদা গম, চা, চিনি ও এক পাঁইট ভদ্কা এবং নগদ পাঁচ রুবল দিয়ে দিলো—যদিও তখন ভাসিলির কাছে নিকিতার পাওনা ছিল কম করেও বিশ রুবল, তবু এই বিশেষ সুবিধা দেবার জন্য সে ভাসিলিকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছিল।

ভাসিলি নিকিতাকে বলত, "টাকা-পয়সা নিয়ে তোমার ও আমার মধ্যে চুক্তি করার কি দরকার? এ তো তোমারই উপার্জন; যখন যা দরকার হবে নিয়ে নেবে। অন্য লোকের মত ব্যবসা আমি করি না—পাওনাদাররা দাঁড়িয়েই থাকবে, আর আমি চুল চেরা হিসাব করব, জমা-খরচ মেলাব, হেনা করব, তেনা করব। আমরা দু'জন নিশ্চয় পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারি। আমার কাজটা ভাল করে কর, আমিও প্রতিদান দিতে পিছ-পা হব না।"

এসব কথা বলবার সময় ভাসিলি কিন্তু সত্যি সত্যি বিশ্বাস করত যে সে নিকিতার উপকারই করছে; কারণ সে এতটা আবেগের সঙ্গে কথা বলতে পারত এবং নিকিতা থেকে শুরু করে উপরের দিককার সব কর্মচারীই তার কথাকে এমন একবাক্যে সমর্থন জানাত যে ক্রমে তার মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে সে মোটেই তাদের ঠকাচ্ছে না, বরং তাদের উপকারই করছে।

নিকিতাও জবাব দিত, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমি সব বুঝি ভাসিলি আন্দ্রীচ, আপনাকে আমি ভালভাবেই চিনি; আমার বাবার জন্য যেমন কাজ করতাম আপনার জন্যও আমি সেইভাবেই কাজ করব।"

তথাপি ভাসিলি যে তাকে ঠকাচ্ছে সেটা নিকিতার অজানা ছিল না। একটা কথা সে ভালই জানত যে তার মনিবের কাছ থেকে বিস্তারিত হিসাব পাবার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই, আর যাবার মতো আরেকটা জায়গা যতদিন ঠিক না হচ্ছে ততদিন দাঁতে দাঁত চেপে এটা মেনে নিয়ে যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে নেওয়াই ভাল।

কাজেই ঘোড়াটাকে আনবার হুকুম দেওয়ামাত্র সে তার স্বাভাবিক হাসি-খুসি মেজাজে এঁকে-বেঁকে পা ফেলতে ফেলতে আস্তাবলের দিকে চলে গেল। সেখানে পেরেক থেকে ঝোলানো বুকপেটি ও ঝোপ্পাসমেত ভারী লাগামের মোক্তাটাকে নামিয়ে নিয়ে খোঁয়াড়ে ঘোড়াটার কাছে এগিয়ে গেল।

মাঝারি আকারের গাঢ় বাদামি রঙের এঁড়ে ঘোড়াটা আস্তে চি-হিঁ-হিঁ করে ডেকে উঠতেই নিকিতা বলে উঠল, "আহা, সোনা আমার, অনেকক্ষণ এখানে আটকা পড়ে আছ, তাই না? আর না, এবার তোমাব ছোটার পালা। কিন্তু তার আগে তোমাকে জল খাওয়াতে হবে। (ঘোড়াটার সঙ্গে সে এমনভাবে কথা বলত যেন মানুষের সব কথা সে বুঝতে পারছে)। ব্রাউনি (ঘোড়াটার নাম)-কে নিয়ে সে জলের চৌবাচ্চাব দিকে এগিয়ে গেল। পেট ভরে জল খেয়ে ব্রাউনি ভিজে ঠোঁট বাঁকাতে বাঁকাতে পিছনের পা ছুঁড়তে শুরু করল। নিকিতা চেঁচিয়ে বলল, "চুপ চুপ, ব্যাটা দারুণ বদমাশ!" দুই এক মুহূর্ত চুপ কবে থেকেই ঘোড়াটা হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে চি-হিঁ-হি শব্দে ডেকে উঠল।

"বুঝেছি, আব জল খাবে না। চাইলেও তো পেতে না, তাই চেয়েও কাজ নেই।" বলতে বলতে ঘোড়াটাকে নিয়ে সে উঠোনে গিয়ে হাজিব হলো। কেবলমাত্র রাঁধুনিব স্বামী ছাড়া আর কোনও মজুর সেখানে ছিল না। সে লোকটি উৎসব উপলক্ষে পাশের গ্রাম থেকে এসেছে।

নিকিতা তাকেই বলল, "একবাবটি ভিতবে যাবে কি বাছা? গিয়ে জিজ্ঞাসা করে এস কোন্ স্লেজটায ঘোড়া জুতব—বড়টা, না ছোটটা?"

লোকটি বাড়ির ভিতরে চলে গেল। (বাড়িটার ছাদ লোহাব, আব একটা টিলার উপব তৈরি)। একটু পরেই সে ফিরে এসে জানাল, ছোট স্লেজটাই দরকার। ইতিমধ্যে নিকিতা ঘোড়াটাব মাথার ভিতর দিযে কলারটা গলিয়ে দিয়েছে এবং পিতলের কাজ-কবা জিনটাকে এঁটে দিয়েছে। তাবপর এক হাতে "দুগা" (ঘণ্টা বাঁধা একটা বাঁকানো ফ্রেম) ও অন্য হাতে লাগামটা ধরে চালার পাশে দাঁড করানো স্লেজটার দিকে এগিয়ে গেল।

"ছোট স্লেজ চাই তো ছোট স্লেজই সই," বলতে বলতে সেই ঘোড়াটাকে শকট-দণ্ডের কাছে নিয়ে গেল এবং অপর লোকটিব সাহায্যে ঘোড়াটাকে স্লেজেব সঙ্গে জুড়ে দিল। সব কাজ শেষ। শুধু লাগামটা পরানো বাকি। তখন নিকিতা তার সহকাবীকে পাঠাল প্রথমে আস্তাবল থেকে কিছু খড় আনতে ও পবে ভাঁড়ার ঘর থেকে একটা বস্তা আনতে। নতুন-কাটা যইয়ের খড় স্লেজে বোঝাই করে নিকিতা বলল, "ঠিক আছে, ওতেই হবে। আরে না, না, (ব্রাউনিকে) তোমাকে আর কান দুটো খাড়া করতে হবে না।—ধর, খড়টাকে এই ভাবে বিছিয়ে তার উপব যদি বস্তাটা পেতে দেই তাহলে তো বসতে বেশ আরাম হবে।" যেমন কথা তেমনই কাজও হলো।

রাঁধুনির স্বামীকে সে বলল, "তোমাকে ধন্যবাদ বাছা। একজোড়া হাতের বদলে দুইজোড়া হাতে কাজ অনেক তাড়াতাড়ি হয়।" তারপর লাগামের দুটো খোলা প্রান্ত একত্র করে সে স্লেজে চেপে বসল এবং অধৈর্য ঘোড়াটাকে চালিয়ে উঠোনের জমাট গোবরেব ভিতর দিয়ে বাড়ির ফটকে গিয়ে হাজির হলো।

"মিকিত্‌কাকা, মিকিত্‌কাকা!" বলে কর্কশ গলায় ডাকতে ডাকতে সাত বছরের একটি ছেলে দ্রুত পায়ে ফটক পেবিয়ে উঠোনে নামল। ছেলেটির পরনে কালো লোমেব ছোট কুর্তা, সাদা বাকলের নতুন জুতো ও আরামদায়ক টুপি। কর্তার বোতাম আটকাতে আটকাতেই সে অনুনয়ের সুরে বলল, "আমাকেও তুলে নাও।"

"এস, এস, এখানে চলে এস সোনা," বলে নিকিতা তাকে টেনে তুলল। তারপর মনিবের বিবর্ণ, শীর্ণ ছোট ছেলেটিকে পিছনে বসিয়ে খুসি মনে সে বাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

বিকাল তিনটে। বরফ পড়ছে। তাপমানযন্ত্রে তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি নেমে গেছে। আবহাওয়া যেমন ঘোলাটে তেমনই ঝোড়ো; অর্ধেকটা আকাশই নিচু কালো মেঘে ঢাকা। উঠোনে বাতাস থেমে আছে। কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নামলেই বাতাসের বেগটা মালুম হয়; দেখা যায় সে পাশেব বাড়ির ছাদ থেকে ববফ যেন কুণ্ডুলি পাকিযে ছুটে আসছে। সবেমাত্র ফিরে এসে নিকিতা ফটকটা পার হয়ে ঘোড়ার মুখটাকে সিঁড়ির দিকে ঘুরিয়েছে, এমন সময় ভাসিলি আন্দ্রীচ্‌ দরজা খুলে বরফে-ঢাকা সিঁড়ির একেবারে উপরের ধাপে এসে দাঁড়াল। তাব ঠোঁটের ফাঁকে একটা সিগারেট; ভেড়ার চামড়ার কোটটা গায়ে চাপানো ও নিচেব দিকে একটা কটিবন্ধ দিয়ে কসে বাঁধা। তার পায়ের জুতোর চাপে সিঁড়িব বরফে মচ্‌-মচ্‌ শব্দ উঠল।

সিগারেটে শেষ টানটা দিয়ে শেষটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পা দিয়ে চেপে নিভিয়ে দিল। তারপর গোঁফের নিচ দিয়ে ধোঁয়াটা ছেড়ে গাড়িটাব দিকে তাকাল। কোটের কলারটাকে মুখের দু'দিকে এমন ভাবে তুলে দিলো যে তার লোম মুখের উপর এসে পড়ল (শুধুমাত্র গোঁফজোড়া ছাড়া তার মুখটা পরিষ্কার কামানো) অথচ তার নিঃশ্বাস লেগে সেটার ময়লা হবার কোনও আশংকা রইল না।

স্লেজের মধ্যে ছোট ছেলেটিকে থাকতে দেখে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "ওবে বাঁদর, তুমি তাহলে ব্যবস্থা করে নিয়েছ?" অতিথিদের সঙ্গে বসে মদে চুমুক দেবার ফলে ভাসিলির মনে কিছুটা রং ধরেছে; তাই জীবনে সে যা কিছু করেছে এবং যা কিছু পেয়েছে এই মুহূর্তে সে সবই মেনে নিতে সে প্রস্তুত। এই ছেলেটিকে সে তার উত্তরাধিকারী করতে ইচ্ছুক; তাই দাঁতে দাঁত ঘসতে ঘসতে তার দিকে তাকিয়ে ছেলেটির এই কাজে আপাতত সে বেশ খুসিই হয়ে উঠেছে। তার পিছনে দাঁড়িয়েছিল তার স্ত্রী ভাসিলিয়া আন্দ্রীচা; যেমন বিবর্ণ, তেমনই কৃশতনু। স্ত্রীটি গর্ভবতী: তার মাথা ও ঘাড় পশমী শাল দিয়ে এমনভাবে মোড়া যে শুধু চোখ দুটি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

ভীত পায়ে ফটক থেকে কিছুটা এগিয়ে স্ত্রী বলল, "নিক্তিতাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে ভাল হতো না?" ভাসিলি জবাব দিলো না; তার কথায় অসন্তুষ্ট হবার ভাব দেখিয়ে রেগে চোখ দুটো ঘোরাল এবং মাটিতে থুথু ফেলল।

সেই একই উৎকণ্ঠার সঙ্গে স্ত্রী বলল, "দেখ, তোমার সঙ্গে অনেক টাকা থাকছে; তাছাড়া আবহাওয়া আরও খারাপ হতে পারে।"

ক্রেতা-বিক্রেতাদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় সে যে ভাবে প্রতিটি কথাকে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে ঠোঁট দুটোকে অস্বাভাবিকভাবে শক্ত করে রাখে, ঠিক তেমনইভাবে সে গর্জে উঠল, "আমি কি রাস্তা চিনি না যে পথ দেখাবার জন্য একজনকে সঙ্গে নিতে হবে?"

মুখেব অপব দিকটা ঢাকবাব জন্য শালটা তুলে স্ত্রী আবার বলল, "ঈশ্বরেব দোহাই, ওকে সঙ্গে নাও, আমি মিনতি করছি।"

ভাসিলি চেঁচিযে বলল, "আবে! তুমি যে দেখছি গামছাব মতো আমাকে জড়িযে ধরতে চাও! স্লেজে ওর জায়গা হবে কেমন করে?"

নিকিতা সানন্দে বলে উঠল, "আমি যেতে বাজী আছি। শুধু আমি চলে গেলে আর কেউ যেন ঘোড়াগুলোকে খাওয়ায।" (শেষেব কথাগুলি কর্ত্রীঠাকরুণেব জন্য)।

স্ত্রী বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে ব্যবস্থা আমি করব নিকিতা। সাইমনকে ও কাজটা করতে বলব।"

অনেক আশা নিযে নিকিতা বলল, "তাহলে আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি তো ভাসিলি আন্দ্রীচ?"

ভাসিলি বলল, "আরে বাবা, ভদ্রমহিলাটিকে তো খুসি রাখতে হবে। তবে যদি যেতেই চাও তাহলে আর একটু ভাল, অর্থাৎ আর একটু গরম পোশাক পরে নাও।" ভাসিলি হাসতে হাসতে চোখ কুঁচকে নিকিতাব লোমের কোটটা দেখাল। সত্যি কথা বলতে কি, সারা কোটটা ফুঁটোয় ভর্তি—বগলের নিচে, পিঠে ও দুই পাশে, তাছাড়া কোটটা তেল-চিটে, এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো, হুক ছাড়া, আব নিচেব দিকে ফালি ফালি ছেঁড়া ছেঁড়া।

নিকিতা রাঁধুনিব স্বামীটিকে ডেকে বলল, "এই যে ভালমানুষ! এগিযে এসে ঘোড়াটা একটু ধববে কি?"

পকেটেব ভিতর থেকে জমে-যাওযা লাল ছোট হাত দুটি বের করে ঠাণ্ডা লাগামটা হাতে নিয়ে ছোট ছেলেটি বলে উঠল, "না, না, ওটা আমি ধরছি।"

ভাসিলি দাঁত বেব করে নিকিতাকে বলল, "নতুন পোশাক পরতে বেশি সময লাগিও না যেন।"

উঠোন পেরিয়ে চাকরদের মহলের দিকে যেতে যেতে নিকিতা বাধা দিয়ে বলল. "না, না ভাসিলি আন্দ্রীচ্, আমি এলাম বলে।"

এক দৌড়ে কুটিরের মধ্যে ঢুকে পেরেক থেকে কোমরবন্ধটা তুলে নিয়ে নিকিতা হাঁক দিলো, "কই গো ভালমানুষের মেয়ে আরিনিশ্‌কা; আমার "খালাত্‌" (এক

ধরনের ফ্রক-কোট) টা দাও তো। আমি মনিবের সঙ্গে যাচ্ছি।" দুপুরের খাবার পরে বেশ ভাল একটি ঘুম দিয়ে রাঁধুনি তখন স্বামীর জন্য চা বানাচ্ছিল; নিকিতাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে সেও তাড়াহুড়ো শুরু করে দিলো। স্টোভের পাশ থেকে একটা ময়লা অথচ খোলামেলা সুতীর 'খালাত্' হাতে নিয়ে সেটাকে ঝেড়ে-পুছে পরিষ্কার করতে লাগল।

"মনিবের সঙ্গে যাবার ব্যাপারে তুমি দেখছি আমার চাইতেও বেশি উপযুক্ত।" সকলের প্রতিই ভাল কথা বলবাব স্বাভাবিক প্রবণতাবশতই নিকিতা বাঁধুনিকে বলল। তারপর পুরনো ময়লা কোমরবন্ধটিকে ভাল করে জড়িয়ে প্রথমে ছোটখাট ভুঁড়িটিকে বাগে আনল, এবং তারপরে অনেক কসরৎ করে সেটাকে দিয়ে লোমেব কোটটাকে বাঁধল।

"এই তো ঠিক হয়েছে", কোমরবন্ধের দুটো দিক এক করে কথাগুলি সে বলল (রাঁধুনিকে নয়, কোমরবন্ধটিকে)। "আরে বাবা, এভাবে খুলে গেলে তো চলবে না।" তারপর কাঁধ দুটো ফুলিয়ে সুতীর খালাতটা গায়ে চাপিয়ে তাকের উপর থেকে দস্তানা দুটো পেড়ে নিল।

বলল, "বাস, এবার আমি তৈবি।"

রাঁধুনি বলে উঠল, "কিন্তু তোমাব পায়ের কথা তো ভুলেই গেছ। জুতো জোড়ার অবস্থা যে শোচনীয়।"

একথা শুনে নিকিতা থমকে দাঁড়াল।

"তা বটে, হয় তো জুতোটা বদলে"—এ পর্যন্ত বলেই মত-পরিবর্তন করে সে বলে উঠল, "না, এসব করলে গেলে তিনি হয়তো আমাকে ফেলেই চলে যাবেন। তাছাড়া আমাকে তো অনেক পথ হাঁটতে হচ্ছে না।" নিকিতা লাফ দিয়ে উঠোনে নেমে গেল।

স্লেজের কাছে পৌছলে কর্ত্রীঠাকরুণ বলল, "মাত্র একটা 'খালাত' গায়ে তোমার ঠাণ্ডা লাগবে না নিকিতা?"

"মোটেই না। ঠাণ্ডা লাগবে কেন? বেশ তো গরম", কথাগুলি বলতে বলতে স্লেজের সামনেব দিকে খড়গুলোকে সে এমনভাবে বিছিয়ে দিলো যাতে গাড়িতে চাপবার পরে তার পা দুটো খড়ের মধ্যে ডুবে যায়। তারপর চাবুকটাকে খড়ের নিচে গুঁজে রাখল (এমন ভাল ঘোড়ার জন্য চাবুকের কোনও দবকাব হবে না)।

ততক্ষণে ভাসিলিও উঠে বসেছে। দুইভাঁজ করা কম্বলে ঢাকা তার চওড়া পিঠটা স্লেজের পিছনের অংশের প্রায় সবটাই জুড়ে বসেছে। তারপব লাগামটা হাতে নিয়ে সে ঘোড়াটাকে ঠুকে দিলো। গাড়ি চলতে শুরু করতেই নিকিতা লাফিয়ে গাড়ির সামনেব দিকটায় উঠে একটা পা ছড়িয়ে দিয়ে সামনে ঝুঁকে বসে পড়ল।

২

গ্রামে ফিরবার জমাট বরফের পথ ধবে ছোট ঘোড়াটা জোর কদমে স্লেজটাকে নিয়ে ছুটে চলেছে। গাড়িব 'রানার'-এর সামান্য ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে।

কোনও অপরিচিত যাত্রী গাড়িব পিছনকাব 'রানার'-এ চড়ে বসেছে বুঝতে পেরে ভাসিলি হঠাৎ চেঁচিযে বলল, "আবে! তুই আবার লাফিয়ে উঠেছিস কেন? নিকিতা, চাবুকটা দাও তো। বাচ্চা শয়তান! চাব্‌কে লাল করে দেব। শিগ্‌গির মায়ের কাছে পালিযে যা!"

বাচ্চাটা লাফিযে নেমে গেল। ব্রাউনি প্রথমে কদমে ও পরে দুল্‌কি চালে ছুটে চলল।

ভাসিলি যে গাঁয়ে বাস কবত তার নাম ক্রেস্তি। মাত্র ছ'খানা বাড়িব একটা ছোট গ্রাম। গ্রামেব শেষ প্রান্তে কামারেব কুটিরেব কাছে পৌঁছে তারা বুঝতে পাবল যে তাবা যতটা ভেবেছিল বাতাস তাব চাইতেও জোবে বইছে, আর সামনের পথটা প্রায় অদৃশ্য হয়ে আছে। স্লেজেব পথটা বাববাবই ববফে ঢেকে যাচ্ছে। দু'পাশেব জমি থেকে বাস্তাটা একটু উঁচু বলেই সেটাকে চিনতে পাবা যাচ্ছে। সাবা গ্রামাঞ্চল জুড়ে ববফেব ঝড় বইছে; দিগন্ত আচ্ছন্ন হযে গেছে, আব যে তেলিযাতিন্‌স্কি অবণ্যটা সাধারণত স্পষ্ট চোখে পড়ে এখন সেটাকে বরফ-ঝড়েব ফাঁকে ফাঁকে আবছা অন্ধকাব স্তূপের মতো দেখাচ্ছে। বাতাস বইছে বাঁ দিক থেকে; ফলে ব্রাউনিব ঘাড়েব লোম তাব চওড়া গলাব উপর উড়ে পড়ছে, আর তার মাথায গিঁট দেওযা লেজটা বাতাসে উড়ছে। সেই বাতাসে নিকিতার কোটেব উঁচু কলাবও তাব গাল ও নাকেব উপর চেপে বসেছে।

ঘোড়াটাকে নিয়ে ভাসিলির মনে অনেক গর্ব। সে বলল, "পথে এত বরফ পড়ছে যে ঘোড়াটা আজ ভাল ছুটতে পাবছে না। একদিন সে আমাকে আধ ঘণ্টায পাশুতিনো-তে পৌঁছে দিযেছিল।"

কোটের উঁচু কলাবের জন্য কথাগুলি ভাল শুনতে না পেযে নিকিতা প্রশ্ন কবল, "কি বললেন?"

ভাসিলি চেঁচিয়ে জবাব দিলো, "বললাম যে আধ ঘণ্টা সময়ে আমি পাশুতিনো গিয়েছিলাম।"

নিকিতা বলল, "বড় মুখ কবে বলবাব মতো কথা বটে! এ বকম ঘোড়া খুব বেশি দেখা যায় না।" তারপব কিছুক্ষণ দু'জনই চুপচাপ। কিন্তু ভাসিলিকে আজ কথায় পেয়েছে।

"তুমি কি মনে কর? সেদিন আমি তোমাব স্ত্রীকে বলেছি, তার মিস্ত্রিটাকেই যেন সবটা চা খেতে না দেয়," কথাগুলি ভাসিলি বেশ চড়া গলায়ই বলল। তাব ধারণা, তার মতো একজন পদস্থ উচ্চশিক্ষিত লোক যে তার সঙ্গে কথা বলছে তাতেই

নিকিতার ধন্য হয়ে যাওয়া উচিত; তাছাড়া ঐ মিস্ত্রিকে নিয়ে ঠাট্টাটা যে নিকিতার কাছে ভাল লাগবে না এ কথাটাও তার মাথায়ই ঢোকে নি। যাই হোক, জোর বাতাসের জন্য নিকিতা এবারও তার মনিবের কথাগুলি শুনতে পায় নি; তাই এবার সে "শিক্ষিত" গলাটা আরও চড়িয়ে তামাসার কথাটা উচ্চারণ করল।

সব কথা বুঝতে পেরে নিকিতা বলল, "ঈশ্বর তার সহায় হোন ভাসিলি আন্দ্রীচ। তাদের ব্যাপারে আমি কখনও নাক গলাই না। তাকে দোষ দেবার মতো বিশেষ কোনও কাজ সে করেনি। যতদিন সে ছেলেটাকে ভাল চোখে দেখবে ততদিন আমার একটিই কথা, "ঈশ্বর তার সহায় হোন।"

"তা তো বটেই, তা তো বটেই." বলে ভাসিলি প্রসঙ্গটা বদলে দিলো। জিজ্ঞাসা করল, "এই বসন্ত কালে তুমি কি একটা ঘোড়া কিনছ?"

কোটের কলারটা একটু বেঁকিয়ে মনিবের দিকে ঝুঁকে নিকিতা জবাব দিলো, "ইচ্ছা তো আছে, এখন পারলে হয়। ছোট ছেলেটা বড় বেড়ে উঠেছে; এখন তার চাষের কাজ শেখা উচিত; কিন্তু আমি তো সব টাকা-পয়সা উড়িয়ে দিয়েছি।"

"দেখ, আমার নিচু-পাছা ঘোড়াটা যদি তুমি নিতে চাও, তাহলে আমি বেশি দর হাঁকব না," ভাসিলি বলল। তার মেজাজ এখন বেশ খুসি হয়ে উঠেছে। কাজেই দর-কসাকসির যে প্রবৃত্তি তার মনকে সব সময়ই প্রভাবিত করে থাকে সেটাই তাকে এখন পেয়ে বসল।

নিকিতা ভাল করেই জানে, যে নিচু-পাছা ঘোড়াটা ভাসিলি তাকে কিনতে বলছে তার দাম জোর সাত রুবলের বেশি হতে পারে না; কিন্তু ঘোড়াটা তার হাতে গছাতে পারলেই ভাসিলি হলফ করে বলবে যে ওটার দাম অন্তত পঁচিশ, আর তার দরুন নিকিতার আধা বছরের মাইনেই হয়তো কেটে রাখবে। এ সব জেনেও নিকিতা জবাব দিলো, "আমার বরং ইচ্ছা, আপনি আমাকে পঁচিশ রুবল ধার দিন, আর আমি ঘোড়ার বাজার থেকে একটা কিনে নিয়ে আসি।"

ঠিক ব্যবস্থাসুলভ গলায় ভাসিলি বলে চলল, "ঘোড়াটা চমৎকার। এটা নিলে তোমার-আমার দু'জনেরই ভাল। সত্যি বলছি। ব্রেখুনফ কখনও কারও ক্ষতি করবে না। আমার নিজের পকেট ফাঁক হয়তো হোক, কিন্তু অন্যের পকেট যেন না হয়। সত্যি বলছি, আমার দিব্যি। ঘোড়াটা আশ্চর্য সুন্দর।"

"সে বিষয়ে আমিও নিশ্চিত," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিকিতা বলল। এ নিয়ে আর কথা বলা নিষ্প্রয়োজন বুঝতে পেরে সে আবার কোটের কলারটা তুলে দিলো। চোখের নিমেষে তার মুখ ও কান ঢাকা পড়ে গেল। প্রায় আধ ঘণ্টা তারা নীরবে পথ চলতে লাগল। নিকিতার পায়ের নিচে ও দস্তানার ফুঁটোর ভিতর দিয়ে বাতাস ঢুকছে। ঘাড়টা কুঁজো করে মুখের উপর টেনে-দেওয়া কলারের মধ্যে সে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল; ফলে তার ঠাণ্ডা অনেকটা কম লাগতে লাগল।

"তুমি কি বলো? কারামিশেভো হয়ে ঘুরে যাব, না সোজা যাব?" ভাসিলি এক সময় প্রশ্ন করল। কারামিশেভো হয়ে যে রাস্তাটা গেছে সেটা যেমন লম্বা তেমনই উঁচু-নিচু, কিন্তু পথের দু'পাশে খুঁটি থাকায় পথটা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। সোজা রাস্তা দিয়ে গেলে অনেক কাছে হয় বটে, কিন্তু সে পথ দিয়ে লোকে বড় একটা যাতায়াত করে না; হয় রাস্তার দু'ধারে কোনও খুঁটি পোতা নেই, আর না হয়তো খুঁটিগুলি এতই ছোট যে এখন বরফে একদম ঢেকে গেছে।

নিকিতা এক মুহূর্ত কথাগুলি ভেবে নিয়ে শেষ পর্যন্ত বলল, "কারামিশেভোর পথটা অন্য পথের চাইতে দূরত্বে বেশি হলেও সে পথে গাড়ি চালানো অনেক সহজ।"

ভাসিলি কিন্তু তবু বলল, "আর আমরা যদি সোজা পথে যাই, তাহলে একবার গর্তটায় পড়তে পারলে আর পথ হারাবার কোনও ভয়ই থাকবে না। তারপর থেকে বনের ভিতর দিয়ে পথচলাটা খুবই মনোরম।"

"আপনার যেমন ইচ্ছা", বলে নিকিতা আবার কোটের কলারটা তুলে দিলো।

কাজে কাজেই ভাসিলির কথাই রইল। প্রায় আধা ভার্স্ট (১ ভার্স্ট = ২/৩ মাইল) পথ চলবার পরে বাঁ দিকে ঘুরেই একটা লম্বা ওক গাছ পাওয়া গেল। তার ডালপালা তাদের গায়ে যে সব মরা পাতা তখনও লেগেছিল বাতাসের বেগে সেগুলো পথিকদের চোখে-মুখে এসে লাগছে। আবার হাল্কা বরফ পড়তে শুরু করল। ভাসিলি লাগামটা টেনে ধরে গাল ফুলিযে নিঃশ্বাসটাকে ধীরে ধীরে গোঁফের নিচ দিয়ে ছাড়তে লাগল। নিকিতা সমানে ঝিমুচ্ছে। এই ভাবে প্রায় দশ মিনিট চলবার পরে ভাসিলি হঠাৎ চিৎকার করে উঠল।

"কি হলো?" চোখ মেলে নিকিতা জিজ্ঞাসা করল।

ভাসিলি কোনও জবাব দিলো না, শুধু ঘাড় বেঁকিয়ে পিছনে তাকাল তারপর সামনে তাকাল। ঘোড়াটা তখনও কদমে ছুটছে। তার গা বেয়ে ঘাম ঝরছে।

"কি হলো?" নিকিতা আবার জিজ্ঞাসা করল।

রেগে প্রশ্নটারই পুনরাবৃত্তি করে ভাসিলি চেঁচিয়ে বলল, "কি হলো তাই বলছ? আরে বাবা, এখন যে একটা খুঁটিও দেখতে পাচ্ছি না। নিশ্চয় আমরা পথ ভুল করেছি।

"তাহলে এক মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি এগিয়ে দেখে আসি।" এই কথা বলে সে আস্তে লাফ দিয়ে স্লেজ থেকে নেমে পড়ল। খড়ের নিচ থেকে চাবুকটা নিয়ে এগিয়ে বাঁ দিকে ঘুরল—অর্থাৎ যে দিকটায় সে বসেছিল। সে বছর বরফ খুব ঘন হয়ে পড়েনি, তাই এখনও পর্যন্ত সারাটা পথই চলবার মতো অবস্থায় আছে; কিন্তু কোনও কোনও জায়গায় বরফ হাঁটুর সমান উঁচু হয়ে পড়েছে এবং নিকিতার জুতোর ডগাকে চেপে ধরছে। তবু হাঁটতে হাঁটতেই সে পা ও চাবুক দিয়ে পথটা খুঁজতে লাগল; কিন্তু পথ উধাও হয়ে গেছে।

নিকিতা স্লেজের কাছে ফিরে এলে ভাসিলি বলল, "কি হলো?"

নিকিতা জবাব দিলো, "এদিকে কোনও রাস্তা নেই। অন্য দিকটা দেখতে হবে।"

ভাসিলি বলল, "সামনে একটা কালো মতো কি যেন দেখা যাচ্ছে। ওটা কি এগিয়ে দেখে এস।"

নিকিতা এগিয়ে গেল। কালো জায়গাটা আর কিছুই নয়, কালো মাটির উপর শীতকালের কোনও শস্যকণা পড়ে সেখানে কোনও চারা গজিয়েছে, আর এখন বাতাসে নড়তে থাকায় বরফের উপর তার একটা কালো ছায়া পড়েছে। নিকিতা ডান দিকে পাক ঘুরে স্লেজেব কাছে ফিবে এল, এবং তার 'খালাত' ও জুতো থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলে আবার স্লেজে চাপল।

বলল, "আমাদের ডাইনে যেতে হবে। এতক্ষণ বাতাস আমাদেব বাঁ দিকে বইছিল, কিন্তু এখন সোজা এসে আমাদের মুখে লাগছে। হ্যাঁ. ডাইনেই যেতে হবে," বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই সে কথাগুলি বলল।

তার কথামতো ভাসিলি সেইদিকেই ঘোড়ার মুখ ফেবাল; অথচ বেশ কিছুটা পথ এগিযেও তারা কোনও পথের হদিস পেল না। এদিকে বাতাসের থামবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না; বরফও সমানেই পড়তে লাগল।

"দেখুন ভাসিলি আন্দ্রীচ, আমবা বোধ হয় পুরোপুরিই পথ হারিয়ে ফেলেছি." হঠাৎ নিকিতা বলে উঠল। তাব কথার ভাবে মনে হলো এতে যেন সে কিছুটা খুসিই হয়েছে। বরফের উপরে ঠেলে-ওঠা একটা কালো আলুর মাথা দেখিয়ে সে বলতে লাগল, "না হলে এটা কি?" ভাসিলি সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটা থামিযে দিলো। তার সারা গায়ে ঘাম ঝরছে, আর ছুটতেও বেশ কষ্ট হচ্ছে।

ভাসিলিও বলল, "তাই তো, ওটা কি?"

"এর অর্থ আমরা জাখারোভেক জমিদারিতে পৌছে গেছি। সেখানেই তো আসারও কথা।"

"নিশ্চয়ই নয়!" ভাসিলি চেঁচিয়ে উঠল।

নিকিতাও মত বদলাল না, বলল. "হ্যাঁ, আমি যা বলেছি তাই ঠিক। স্লেজের চলার শব্দ শুনে আপনিও বুঝতে পারবেন যে আমরা একটা আলুর ক্ষেতের ভিতব দিয়ে চলেছি। দেখুন না, কতকগুলো আলুর মাথা উপড়ে গেছে। হ্যাঁ, এটাই জাখারোভেক সব্জি-বাগান।"

"খুব ভাল জায়গায়ই এসে হাজির হয়েছি বটে!" ভাসিলি বলল। "তা এখন কি করা যাবে?"

নিকিতা জবাব দিলো, "ডান দিক বরাবরই এগিয়ে যেতে হবে। একসময় কোথাও না কোথাও পৌছে যাবই। জাখারোভেক যদি নাও যেতে পারি. কোনও ভাড়াটের গোলাবাড়ি নিশ্চয় পেয়ে যাব।"

কথাটা মেনে নিয়ে ভাসিলি নিকিতার পরামর্শমতোই ঘোড়া চালিয়ে দিলো। বেশ কিছু সময় এইভাবে চলল। কখনও শুধু ঘাসের জমি; আবার কখনও এবড়ো-খেবড়ো শক্ত জমাট মাঠের উপর দিয়ে স্লেজটা সশব্দে এগিয়ে চলল। কখনও বা গাড়িটা চলতে লাগল শীত বা বসন্ত কালের ফসল-কাটা মাঠের ভিতর দিয়ে। বরফের উপর দিয়ে মাথা তোলা খড়ের শুকনো নাড়াগুলো বাতাসে ভীষণভাবে দুলছে। সারাক্ষণ বরফ-পড়া সমানে চলতে লাগল। বরফের গুঁড়ো বাতাসে পাক খেয়ে ঘুরছে। ঘোড়াটা আর চলতে পারছে না; তার শরীর সাদা হয়ে গেছে; ঘাম থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে: সে এখন হাঁটতে হাঁটতে চলেছে। হঠাৎ পা হড়কে সে বোধ হয় একটা খানায় বা ডোবায় পড়ে গেল। ভাসিলি ঘোড়াটাকে টেনে তুলতে চাইল, কিন্তু নিকিতা সমানে চেঁচাতে লাগল।

"থামলেন কেন? এগিয়ে চলুন, এগিয়ে চলুন! ওকে তো তুলতেই হবে। তাই হবে সোনা! তাই হবে বাছা!" মহা উৎসাহে ঘোড়াটার দিকে এগিয়ে যেতেই নিকিতা নিজেও খানার মধ্যে আটকে গেল। যাহোক ঘোড়াটা নিজের চেষ্টায়ই উঠে দাঁড়াল। বোঝা গেল, খানাটা হাত দিয়ে কাটা।

"আমরা কোথায় এসেছি?" ভাসিলি প্রশ্ন করল।

নিকিতা জবাবে বলল, "সেটাই তো জানতে হবে। আর একটু এগিয়ে চলুন, কোথাও না কোথাও পৌঁছে যাবই।"

সামনে বরফের একটা বড় কালো বস্তুকে দেখিয়ে তার মনিব বলে উঠল, "ওটা নিশ্চয় গোভিয়াৎচ্কিন্স্কি অরণ্য, তাই নয় কি?"

"হতে পারে। বরং আরও একটু এগিয়ে দেখা যাক।" নিকিতা বলল। আসলে আলোচ্য কালো বস্তুটার গায়ে কিছু দ্রাক্ষালতার শুকনো পাতা সে ইতিমধ্যেই দেখতে পেয়েছে; কাজেই সে বুঝতে পেরেছে যে ওটা কোনও জঙ্গল না হয়ে বরং কোনও রকমের একটা বসতি হওয়াই সম্ভব; কিন্তু সঠিক না জেনে কোনও কথা বলতে ইতস্তত করছিল। এদিকে খানাটা ছাড়িয়ে গজ বিশেক এগোবার পরেই তাদের সামনে অনেকগুলি গাছ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিলো এবং একটা বিষণ্ণ আওয়াজও তারা শুনতে পেল। নিকিতা ঠিকই ধরেছিল; তারা যেখানে পৌঁচেছে সেটা কোন জঙ্গল নয়, এক সারি দ্রাক্ষালতা; তার কিছু শুকনো পাতা বাতাসে কাঁপছে। দ্রাক্ষাক্ষেতের কাছাকাছি পৌঁছে তারা যখন বুঝতে পারল যে ডালপালার ভিতর দিয়ে হাওয়া ঢুকেই ওই শোঁ-শোঁ বিষণ্ণ শব্দটা হচ্ছে ঠিক তখনই ঘোড়াটা সামনে দুই পা তুলে কিছুটা উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং পিছনের পা দুটোকেও টেনে তুলে বাঁ দিকে চলতে লাগল। তখন কিন্তু বরফ তার হাঁটু পর্যন্তও উঠছে না। তাহলে তারা আবার রাস্তাটা পেয়ে গেছে।

নিকিতা চেঁচিয়ে বলল, "রাস্তাটা তো পেয়ে গেছি! কিন্তু জায়গাটা যে কোথায় তা শুধু ঈশ্বরই জানেন!"

ঘোড়াটা কিন্তু কোনওরকম ভড়কে না গিয়ে বরফ-ঢাকা পথ ধরে সোজা এগিয়ে চলল। প্রায় একশ' গজ যাবার পরে তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি বেড়া-দেওয়া চার-কোণা গোলাঘর। তার ছাদের উপব বরফ জমেছে; বরফের গুঁড়ো মেঘের মত উড়ে যাচ্ছে। গোলাঘরটাকে পাশে রেখে রাস্তাটা মোড় নিতেই একটা বরফের স্রোত। আরও একটু এগিয়েই দেখা গেল দুটো দালানের মাঝখান দিয়ে কিছুটা ফাঁকা জায়গা। স্পষ্ট বোঝা গেল যে এই বরফ-স্রোতের ভিতর দিয়েই পথটা চলে গেছে; কাজেই এটাকে পার হতেই হবে। ঠিক তাই। বরফ-স্রোতটা পার হতেই একটা গ্রাম্য রাস্তা পাওয়া গেল। কাছাকাছি একটা উঠোনে একটা দড়ি থেকে কিছু বরফ-ভেজা কাপড়-চোপড় মেলা ছিল। সেগুলো বাতাসে সশব্দে উড়ছে। কাপড়-চোপড়ের মধ্যে ছিল দুটো শার্ট—একটা সাদা, আরেকটা লাল—, একজোড়া পাজামা, কিছু পায়ের পট্টি ও একটা পেটিকোট।

শার্টগুলোকে উড়তে দেখে নিকিতা বলল, "কী আল্‌সে মেয়েমানুষরে বাবা! অবশ্য কথাটা বলতেও আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে। উৎসবের জন্য জামাকাপড়গুলোও এখনও ঠিকঠাক করেনি—এ কথা ভাবতেও কেমন লাগে!"

৩

খোলা মাঠের মধ্যে বাতাস যেমন জোরে বইছিল, রাস্তাটার মুখেও তাই; সাবা পথ বরফে ঢাকা। কিন্তু গ্রামের ভিতরে ঢুকে সব কিছুই বেশ গরম, শান্ত ও ভাল লাগল। একটা উঠোন থেকে কুকুর ডেকে উঠল। আর একটা উঠোন থেকে একটি বুড়ি কোথা থেকে যেন দৌড়ে এল। তার মাথায় রুমাল জড়ানো। নবাগতদেব দেখতে পেয়ে সে একটা ঘরের দরজার দিকে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে গেল এবং চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকাল। গ্রামের মাঝখান থেকে একটি মেয়ের গান ভেসে এল। সবকিছু মিলিয়ে বাইরেব তুলনায় এখানে বাতাস অল্প, ঠাণ্ডা অল্প, বরফও অল্প।

"আরে, এতো নিশ্চয় গ্রিশ্‌কিনো," ভাসিলি বলল।

"তাই তো," নিকিতাও বলল। সত্যি, গ্রিশ্‌কিনোই বটে।

পরে বোঝা গেল, রাস্তা থেকে ডানদিকে ঘুরে তারা প্রায় আট ভার্স্ট পথ ঘুরেছে, যদিও গোভিয়াৎস্‌স্কিনা থেকে গ্রিশ্‌কিনোর দূরত্ব পুরো পাঁচ ভার্স্ট।

অর্ধেক রাস্তা পার হয়ে পথের মাঝখানে একটি লম্বা লোকের সঙ্গে তাদের দেখা হয়ে গেল।

সে থেমে হাঁক দিলো, "তোমরা কে হে?" তারপর ভাসিলিকে চিনতে পেরে শকটদণ্ডটা ধরে স্লেজে উঠে বসল। লোকটি ভাসিলির বন্ধু। নাম ইসাই। এ জেলার সেরা ঘোড়া-চোর বলে তার কুখ্যাতি।

সে এইমাত্র ভদ্‌কা খেয়েই আসছে। নিকিতার মুখময় ভদ্‌কার গন্ধ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ইসাই বলে উঠল, "আরে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় কোথায় চলেছ?"

"গোভিয়াৎস্স্কিনাতে যাবার চেষ্টা করছি।"

"আহা! কী পথই বেছে নিয়েছ! তোমাদের তো মালাখোভো দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।"

ঘোড়ার লাগাম টেনে ভাসিলি বলল, "তা যখন যাই নি তখন আর সে কথা বলে লাভ কি।"

ঘোড়াটার উপর চোখ বুলিয়ে তার লেজে হাত বুলোতে বুলোতে ইসাই বলল, "বেশ ভাল ঘোড়াটা। তা তোমরা রাতটা এখানেই থাকছ তো?"

"না বন্ধু। আমাদের অনেক দূর যেতে হবে।"

"কিন্তু থেকে গেলেই ভাল করতে। কিন্তু এ লোকটি কে? আবে, নিকিতা স্তেপানিচ না!"

"হ্যাঁ গো, তাছাড়া আব কে হবে", নিকিতা জবাব দিলো। "কিন্তু বলে দিন তো ভাই, কি কবলে আর বাস্তা হারাবে না।"

"কি কবে রাস্তা হাবানোর হাত থেকে বেহাই পাবে? কেন, পিছন ফিবে রাস্তা ধরে সোজা এগিয়ে যাও, সামনেই বড় রাস্তা পেয়ে যাবে। বাঁ দিকে ঘুববে না; যতক্ষণ পর্যন্ত একটা বড় গ্রাম না পাবে ততক্ষণ সোজা এগিয়ে যাবে, আর তারপব—ডানদিকে।"

"কিন্তু গ্রামের কাছে গিয়ে কোন্ পথ ধরব—গ্রীষ্মের পথ, না শীতের পথ?" নিকিতা আবার প্রশ্ন করল।

"শীতের পথ। সেখানে একটা ছোট জঙ্গল পাবে। তার উল্টো দিকেই পাবে একটা পুরনো ওক-কাঠের খুঁটি। সেখানেই বাঁক নেবে।"

সেই কথামতো ভাসিলি ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে আবার রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল।

"আজকের রাতটা এখানে থেকে গেলেই পারতে," পিছন থেকে ইসাই চিৎকার কবে বলতে লাগল; কিন্তু তার কথার কোনও জবাব না দিয়ে ভাসিলি ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। পাঁচ ভার্স্ট পথ পার হওয়া, তারও দু'ভার্স্ট পথ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়, বিশেষত এখন মনে হচ্ছে ববফ পড়াটা বন্ধ হয়েছে এবং বাতাসটাও পড়েছে।

পায়ে-পায়ে রাস্তা বেশ শক্ত। এখানে-ওখানে কালো কালো গোবরের নাদা। চলতে চলতে তার সেই উঠোনটার কাছে গেল যেখানে কাপড়-চোপড় শুকোতে দেওয়া হয়েছিল (সাদা শার্টটা ততক্ষণে বাতাসে ছিঁড়ে গিয়ে দড়ির সঙ্গে ঝুলছে। আরও কিছুটা এগিয়ে তারা সেই দ্রাক্ষা ক্ষেতে পৌঁছে গেল। তার কিছু শুকনো পাতায় তখনও বাতাস লেগে একটা শব্দ হচ্ছে। এইখানে তারা আবার খোলা মাঠে এসে পড়ল—এতক্ষণে তারা বুঝতে পারল তুষার-ঝড় কমে তো নাই, বরং আরও বেড়েছে। সামনের রাস্তার উপর দিয়ে স্রোত বয়ে চলেছে। ফলে খুঁটিগুলো না থাকলে

তারা রাস্তা ঠিক রেখে চলতেই পারত না। আর বাতাসও এত জোরে বইছে যে খুঁটিগুলোর উপর নজর রাখাও শক্ত।

খুঁটির উপর নজর রাখবার জন্য ভাসিলি সামনে ঝুঁকে ভুরু কুঁচকে তাকাতে লাগল। লাগামে ঢিল দিয়ে ঘোড়ার সুবিবেচনার উপরেই ভরসা করে চলতে লাগল। অবশ্য ঘোড়াটা পথ ভুল করল না; আঁকা বাঁকা রাস্তায় কখনও বাঁয়ে কখনও ডাইনে বেঁকে ক্ষুরের সাহায্যে রাস্তার সঠিক হদিশ করে ঠিক পথেই চলতে লাগল। ফলে বাতাস ক্রমেই বাড়তে থাকলেও এবং বরফ ক্রমাগত ঘনতর হয়ে পড়তে থাকলেও দু'পাশের খুঁটিগুলি ঠিকই নজরে পড়তে লাগল।

এইভাবে দশ মিনিট চলবার পরে হঠাৎ ঘোড়াটার একেবারে সামনে একটা কালো বস্তু ভেসে উঠল—সে বস্তুটাও বরফ-ঝড়ের ভিতর দিয়েই সামনে এগিয়ে চলেছে। আরও একদল যাত্রী চলেছে। ব্রাউনি দ্রুততর গতিতে ছুটে তাদের ধরে ফেলেছে; এমন কি, তার সামনের পায়ের ক্ষুর তাদের স্লেজ-এর পিছনটায় ধাক্কা মেরেছে।

"সরে যাও! হাই! সামনে দেখে চল!" সেই স্লেজ থেকে অনেকগুলি কণ্ঠস্বর একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। ভাসিলিও লাগাম টেনে ধরল। সেই স্লেজে ছিল তিনজন 'মুঝিক' ও একটি বুড়ি। গ্রামের উৎসব সেরে তারা বাড়ি ফিরছে। 'মুঝিক'দের একজন শুকনো একটা গাছের ডাল নিয়ে ঘোড়াটার বরফে ঢাকা পিঠের উপর মারছে, আর বাকি দুজন স্লেজ-এর সামনের দিকে বসে পরস্পরের প্রতি চিৎকার ও অঙ্গভঙ্গী করছে। আর বুড়িটা বরফে একেবারে সাদা হয়ে পিছনে চুপচাপ বসে আছে।

"তোমরা কার লোক?" ভাসিলি চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"আ-আ-আ-স্কি!" জবাবে এর বেশি কিছু শোনা গেল না।

"কি বললে?"

"আ-আ-আ-স্কি!" একজন 'মুঝিক' তারস্বরে চেঁচিয়ে বলল, কিন্তু তার কথা কিছু বোঝা অসম্ভব।

যে লোকটি ঘোড়ার পিঠে ডালের আঘাত করছিল অপর একজন তাকে বলল, "জোরসে ছোটাও! ওদের যাবার পথ দিও না!"

"মনে হচ্ছে তোমরা উৎসব থেকে ফিরছ, তাই না?"

"ওরা এগিয়ে যাচ্ছে, ওরা এগিয়ে যাচ্ছে! জোরসে চালাও সেম্কা! জোরসে!"

দুটো স্লেজের গায়ে ধাক্কা লাগতে লাগল। আবার তারা সরে গেল। শেষ পর্যন্ত 'মুঝিক'দের স্লেজটা পিছিয়ে পড়ল। তাদের পেট-মোটা, বরফে-ঢাকা ঘোড়াটা ডালের চাবুকের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় ঘন বরফের ভিতর দিয়ে তার শুকনো পাগুলোকে নিয়ে ছুটতে লাগল। তার মুখের নিচের দিককার চোয়ালটা মাছের মতো ঠিকরে বেরিয়ে পড়েছে, নাকের ফুটো বড় হয়ে উঠেছে, কান দুটো ভয়ে পিছনে হেলে পড়েছে। কয়েক সেকেন্ড নিকিতার ঘোড়ার সঙ্গে তাল রেখে শেষ পর্যন্ত সেটা পিছিয়ে পড়তে লাগল।

নিকিতা বলে উঠল, "মদ গিললে মানুষের এই দশা'ই হয়। এরকম করলে তো টাট্টুটা মরে যাবে। এই লোকগুলো কী এসিয়ার জন্তুরে বাবা!"

বেশ কয়েক মিনিট ধরে পিছন থেকে ক্লান্ত ঘোড়াটার শ্বাস টানার শব্দ আর "মুঝিক"দের মাতালের মতো হৈ-হল্লা কানে আসতে লাগল। তারপর প্রথম শব্দটা এবং ক্রমে দ্বিতীয় শব্দটাও মিলিয়ে গেল। শুধু বাতাসের শব্দ আর মাঝে মাঝে গাড়িটার "রাণাব"-এর শব্দ ছাড়া আব কিছুই যাত্রীদেব কানে আসছে না।

অপর স্লেজটার সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফলে ভাসিলি বেশ উত্তেজিত ও উৎফুল্ল হয়ে উঠল। অধিকন্তব নিশ্চিন্তভাবে সে গাড়ি চালাচ্ছে। খুঁটিগুলোর দিকেও আব নজর রাখছে না। সবটাই ঘোড়ার উপর ছেড়ে দিয়েছে। নিকিতারও কিছুই করাব নেই। তাই এ অবস্থায় সাধারণত সে যা করে থাকে তাই করল; অর্থাৎ অন্য কোনও সময়েব পাওনা ঘুমটা পুষিয়ে নেবার জন্য চুপচাপ বসে ঝিমুতে লাগল। হঠাৎ ঘোড়াটা থেমে গেল। তাব ধাক্কায় নিকিতা স্লেজ থেকে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল।

ভাসিলি বলল, "আমরা আবার ভুল পথ ধরেছি।"

"কি কবে বুঝলেন?"

"কারণ একটা খুঁটিও দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চয় রাস্তাটা ছেড়ে এসেছি।"

"বেশ তো, ছেড়ে এসে থাকি তো আবাব রাস্তা খুঁজে নেব," বলেই নিকিতা স্লেজ থেকে নেমে ধীবে ধীরে পা ফেলে বরফের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল। এই ভাবে অনেকক্ষণ কাটল—এই সে অদৃশ্য হযে যায়, আবার দেখা যায়, আবাব উধাও—তারপব সে ফিরে এল।

স্লেজ-এ চাপতে চাপতে বলল, "ওদিকে কোনও বাস্তা নেই। নিশ্চয় আরও সামনে কোথাও আছে।"

গোধূলি নেমে আসছে। তুষাব-ঝড় একরকমই চলছে—বাড়েওনি, কমেওনি।

ভাসিলি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "মুঝিক"দের কথাবার্তাও যদি কানে আসত!"

নিকিতা বলল, "তাবা আর আমাদের ধরতে আসবে না। কাবণ রাস্তাটা আমরা অনেক আগেই ছেড়ে এসেছি।" একটুখানি ভেবে সে আবার বলল, "হয় তো তারাও ঐ একই কাজ করে বসেছে।"

"তাহলে এখন যাব কোন্ পথে?" ভাসিলি জিজ্ঞাসা করল।

"ঘোড়াটাকে তার বুদ্ধিমতো চলতে দিন। হযতো ওই আমাদের ঠিকমতো নিয়ে যাবে। দেখি, লাগামটা আমাকে দিন।"

ভাসিলি সঙ্গে সঙ্গে লাগামটা দিয়ে দিল, কারণ গরম দস্তানার ভিতরেও তার হাত দুটো যেন জমে গিয়েছিল। নিকিতা লাগামটা নিল, কিন্তু সেটাকে আঙুলে শুধু ধরেই রাখল, এতটুকুও টান দেবার চেষ্টা করল না। আসলে তার প্রিয় ঘোড়াটার বুদ্ধি পরীক্ষা করবার সুযোগ পেয়ে সে খুবই খুসি হয়ে উঠল। সত্যি বলতে কি, কান

দুটোকে একবার এদিকে আবার ওদিকে খাড়া করে বুদ্ধিমান জন্তুটা মুখ ঘুবিয়ে চলতে শুরু করল।

নিকিতা চেঁচিয়ে বলল, "আরে, এ যে প্রায় কথা বলার সামিল। আমি বলছি, কি করতে হবে তা ও ভালই জানে। এগিয়ে চল বাবা, এগিয়ে চল। চুক্ চুক্!"

বাতাস এখন তাদের পিছনে লাগছে। ফলে একটু গরম বোধ হচ্ছে।

প্রিয় ঘোড়াব কাণ্ডকারখানা দেখে খুসি হয়ে নিকিতা বলল, "আঃ, ব্যাটার কী বুদ্ধি! কিরঘিজেনোক-এর চাইতে শক্তিশালী বটে, কিন্তু একেবারে বোকা; অথচ এটা দেখুন, শুধুমাত্র কান দিয়ে ও কত কিছু বুঝতে পারে! ওর তো টেলিগ্রাফেরও কোনও দরকার হয় না; এক ভার্স্ট দূর থেকেই ও সঠিক রাস্তার গন্ধ পায়!"

আব সত্যি সত্যি, আধ ঘণ্টাবও কম সময়েব মধ্যেই একটা কালো বস্তু—কোনও জঙ্গল বা গ্রাম—তাদের সামনে দেখা দিলো; ডানদিকে রাস্তার খুঁটিগুলোও আবার চোখে পড়ল; বোঝা গেল, পথিকরা আবার ঠিক পথই ধরেছে।

হঠাৎ নিকিতা চেঁচিয়ে উঠল, "এ যে আবার সেই গ্রিশ্‌কিনো।"

সত্যি গ্রিশ্‌কিনো। বাঁ দিকে সেই গোলঘরটা চোখে পডল। তার ছাদেব উপর বরফের গুঁড়ো উড়ছে। কাপড় মেলবার দড়িটাও দেখা যাচ্ছে। শার্ট-পায়জামাগুলো এখনও বাতাসে উড়ছে। আবার তারা রাস্তা ধবে এগিযে চলল; সবকিছুই আবার গরম, শান্ত ও ভাল মনে হলো। আবাব সেই কর্দমাক্ত পথ, সেই গলা ও গান, সেই কুকুবের ডাক। কিন্তু তখন সন্ধ্যা নেমে আসায় কিছু কিছু জানালায় আলো জ্বলতে দেখা গেল।

অর্ধেকটা রাস্তা পার হয়ে ভাসিলি একটা বড় বাড়ির দিকে ঘোড়ার মুখটা ঘুরিয়ে সিঁড়ির কাছে পৌঁছে লাগামে টান দিলো। নিকিতা বরফে-ঢাকা আলোকিত জানালাটার দিকে এগিয়ে গেল এবং চাবুকের হাতলের দিক দিয়ে জানালার কাঁচে আস্তে টোকা মারল।

"কে ওখানে?" নিকিতার ডাকে কে একজন সাড়া দিলো।

নিকিতা বলল, "ভাই, ক্রেস্তি থেকে ব্রেখুনফরা এসেছি। দয়া করে দরজা খোল।"

কেউ যেন জানালা থেকে সরে গেল এরকম শব্দ পাওয়া গেল। দু'মিনিট পরেই একটা 'রেঞ্জ'-এব সাহায্যে ভিতবের দরজা খোলার শব্দ এল। তারপর বাইরের দরজার হুড়কোটা সশব্দে খুলে একটা সাদা দাড়িওয়ালা বুড়ো 'মুঝিক' বেবিযে এল। পাছে বাইরের বাতাস কুটিরেব ভিতর ঢুকে যায় সেজন্য সে দরজাটাকে আধ-খোলা রেখে এসে দাঁড়াল। তার গায়ে একটা লোমের কোট; তাড়াতাড়িতে ছুটির দিনের সাদা শার্টের উপর সেটাকে চড়িয়ে এসেছে; তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে একটি যুবক; তার পরনে লাল শার্ট ও উঁচু জুতো।

বুড়ো লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল, "ব্যাপারটা কি আন্দ্রীচ?"

ভাসিলি জবাব দিলো, "আমরা আবার পথ হারিয়েছি। বন্ধু গোভিয়াৎস্কিনা পৌঁছতে গিয়ে এখানে এসে পড়েছিলাম। আবার যাত্রা শুরু করেও রাস্তা ভুল করে বসেছি।"

বুড়ো লোকটি তবু বলল, "এ রকম ভুল হলো কেমন করে? এই যে পেত্রুশ্কা," লাল শার্ট পরা যুবকটির দিকে ফিরে সে বলল, "যাও তো, উঠোনের ফটকটা খুলে দিয়ে এস।"

"নিশ্চয়, সানন্দে" কথাটা বলে যুবক বারান্দা পেরিয়ে ছুটে গেল।

ভাসিলি বাধা দিলো, "না, না। আমরা রাতটা এখানে থাকব না।"

"কিন্তু এখন তোমরা যাবে কোথায়? রাত হয়ে এসেছে। বরং এখানেই থেকে যাও।"

"থাকতে পারলে খুবই খুসি হতাম, কিন্তু উপায় নেই। কি জানো বন্ধু, ব্যবসার ব্যাপার —আর ব্যবসা তো বসে থাকবে না।"

"তাহলে অন্তত ভিতরে তো এস, একটু চা খেয়ে গরম হয়ে নাও," বুড়ো লোকটি বলল।

"হ্যাঁ, তা খেতে পারি" ভাসিলি জবাব দিলো। রাতের অন্ধকার এখনকার চাইতে আর তো বাড়বে না, কারণ শিগ্গিরই চাঁদ উঠবে। আমরা কি ভিতরে গিয়ে একটু গরম হয়ে নেব নিকিতা?"

"হ্যাঁ, একটু গরম হতে পারলে ভালই হয়," নিকিতা জবাব দিলো। তার ভীষণ শীত করছে। স্টোভের সামনে জমাট হাত-পা'গুলো একটু সেঁকে নিতে সে খুবই আগ্রহী।

তখন ভাসিলি বুড়ো লোকটির সঙ্গে কুটিরের ভিতরে ঢুকল, আর পেত্রুশ্কা উঠোনের ফটকটা খুলে দিলে নিকিতা স্লেজটাকে উঠোনের মধ্যে চালিয়ে নিয়ে গেল। তারপর পেত্রুশ্কার নির্দেশমতো ঘোড়াটাকে একটা চালায় নিয়ে গেল। চালার ভিতর গোবর বোঝাই করে রাখা হয়েছে। ফলে ঘোড়ার লেজটা একটা বরগাতে বেধে গেল। তখন বরগার উপর যে সমস্ত মোরগ আর মুরগি আশ্রয় নিয়েছিল তারা নখ আঁচড়ে ইতস্তত উড়তে শুরু করল, কতকগুলি ভেড়ী ভয়ে ছুটতে লাগল, জমাট গোবরের মধ্যে তাদের পা বসে যেতে লাগল, আর একটা কুকুর প্রথমে আস্তে ও পরে সরোষে গর্জাতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত অনধিকার প্রবেশকারীকে দেখে ঘেউ-ঘেউ করে উঠল।

নিকিতা সকলকেই কিছু-না-কিছু বলল। মুরগিগুলোর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে আর বিরক্ত করবে না বলে তাদের শান্ত করল, অকারণ ব্যস্ততার জন্য ভেড়াগুলোকে বকুনি দিলো, এবং ঘোড়াটাকে বাঁধতে বাঁধতে কুকুরটার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুলল।

পোশাকের উপর থেকে বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে সে বলল, "এবার সব ঠিক হয়ে

যাবে।" কুকুরটাকে বলল, "এই দেখ আবার গর্জাচ্ছে! চুপ! চুপ! এই তো সব ঠিক হয়ে গেল। চুপ কর বোকা কোথাকার! চুপ! অকারণে নিজেকে বিরক্ত করছ। আমরা তো চোর নই।"

সবল হাতে স্লেজটাকে টেনে চালার ভিতরে আনতে আনতে পেত্রুশ্‌কা বলল, "ওদের আমরা বলতে পারি আমাদের তিন পারিবারিক পরামর্শদাতা।"

"পরামর্শদাতা কেন?" নিকিতা জিজ্ঞাসা করল।

পেত্রুশ্‌কা হেসে বলল, "কারণ পল্‌সন-এর বইতে লেখা আছে দেখবে : "কোনও চোর যখন বাড়ির কাছে ঘেঁসে তখন কুকুর তার নিজের ভাষায় বলে ওঠে—জাগো! মোরগ গেয়ে ওঠে—উঠে পড়! আর বিড়াল হাত-পা ধুতে শুরু করে—তার অর্থ সে বলতে চায় : অতিথি হাজির, তাকে অভ্যর্থনার জন্য তৈরি হতে হবে!"

দেখা যাচ্ছে, পেত্রুশ্‌কা সাহিত্যরসিক; পল্‌সন-এর লেখা যে একখানিমাত্র বই তার আছে সেখানা সে মুখস্থ করে ফেলেছে। যখন একটু পানীয় পেটে পড়ে—যেমন এখন পড়েছে—তখনই বইটা তার বিশেষভাবে ভাল লাগে এবং প্রয়োজনমতো তার থেকে কিছু অংশ সে আউড়ে দেয়।

"খুব খাঁটি কথা," নিকিতা মন্তব্য কবল।

পেত্রুশ্‌কা বলল, "ঠিক বলিনি!" কিন্তু তুমি তো একেবারে জমে গেছ। এবাব একটু চা খেতে যাবে কি?"

"হ্যাঁ, অতি অবশ্য," নিকিতা জবাব দিলো। উঠোন পেবিয়ে তারা কুটিরেব দরজার দিকে পা বাড়াল।

৪

যে বাড়িতে ভাসিলি উঠেছে সেটা এই গ্রামের অন্যতম ধনীর বাড়ি। এই পরিবারের সম্পত্তির মধ্যে কম করেও পাঁচ কিতা জমি, ও কিছু ভাড়া-কবা জমি আছে, আর আস্তাবলে আছে ছ'টা ঘোড়া, তিনটে গরু, দুটো ষাঁড় ও গোটা বিশেক ভেড়া। সবসমেত বাড়ির বাসিন্দা বাইশজন—চার বিবাহিত ছেলে, ছয় নাতি (তাদের মধ্যে পেত্রুশ্‌কার বিয়ে হয়ে গেছে), দুই পুতি, তিনটি আশ্রিত লোক, এবং চার পুত্রবধূ ও তাদের ছেলেমেয়েরা। এ ছাড়া দুই ছেলে মস্কোতে পানিপাড়ের কাজ করে, আর তৃতীয়টি আছে সেনাবাহিনীতে। বর্তমানে বাড়িতে আছে শুধু বুড়ো, তার স্ত্রী, বিবাহিতদের মধ্যে দ্বিতীয় ছেলে, যে দু'জন মস্কোতে কাজ করে তাদের মধ্যে যে বড় সে (উৎসব উপলক্ষে এসেছে), নানা বৌরা ও তাদের ছেলেমেয়েরা এবং একজন গ্রাম্য কথক।

যে সমস্ত একান্নবর্তী পরিবার এখনও টিকে আছে এটি তারই একটি বিরল দৃষ্টান্ত।

অবশ্য যে সমস্ত গভীর আভ্যন্তরীণ গোলযোগ প্রথমে পরিবারের মেয়েদের মধ্যে শুরু হয়ে ক্রমে গোটা পরিবারকেই ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলে এ পরিবারেও সেই সব গোলযোগ দেখা দিয়েছে।

কুটিরের মধ্যে টেবিলের উপর একটা ঢাকা-দেওয়া আলো ঝুলছে। তারই পরিষ্কার আলো পড়েছে নিচের বাসনপত্রের উপর, এক বোতল ভদ্‌কার উপর, এবং নানা খাদ্যসামগ্রী ও ঘরের মাটির দেওয়ালের উপর। এক কোণে—"সুন্দর কোণটা"তে—দুটো দেবমূর্তি ঝোলানো রয়েছে, আর তার দু'পাশে ঝোলানো রয়েছে অনেক ছবি। টেবিলে সম্মানের আসনে বসেছে ভাসিলি; তার পরনে শুধু একটা কালো কুর্তা; বড় বড় বাজপাখির মতো চোখ মেলে সে ঘরের চারিদিকে ও আশপাশের সব্বাইকেই দেখছে। তার পাশেই বসেছে টাক-মাথা সাদা দাড়িওলা (পরিবারের কর্তা) তার পরনে বাড়িতে তৈরি কাপড়ের সাদা শার্ট); তার পর থেকে পর পর বসেছে মস্কো থেকে উৎসব উপলক্ষে আগত ছেলেটি (তার পরনে বাবার মতোই শার্ট, তবে কাপড়টা আরও মিহি ধরনের; ছেলেটির খাড়া পিঠ ও চওড়া কাঁধ), আর একটি চওড়া-কাঁধ ছেলে (যে দুই ছেলে বাড়িতে থাকে তাদের মধ্যে বড়), এবং সকলের শেষে প্রতিবেশীটি—মাথায় লাল চুল, ঢ্যাঙা, ছিপছিপে জনৈক 'মুঝিক'।

'মুঝিক'রা নৈশাহার ও ভদ্‌কা শেষ করে সবে চায়ে চুমুক দেবে এমন সময় পথিকরা এসে হাজির হলো। স্টোভের পাশে রাখা সামোভারে জল ফুটছে। স্টোভের পাশে ও বাংকে নানা ধরনের ছেলেমেয়ে ঘোরাফেরা করছে, আর বুড়ি ভাসিলির পিছনে ব্যস্ত হয়ে চলাফেরা করছে; তার সারাটা মুখে বলি-রেখা, এমনকি ঠোঁট দুটোও কুঁচকে গেছে। নিকিতা যখন ঘরে ঢুকল বুড়ি তখন মোটা গ্লাসে ভদ্‌কা ঢেলে অতিথির দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

সে বলল, "আপনি কিন্তু আপত্তি করতে পারবেন না ভাসিলি আন্দ্রীচ। না, না, আপত্তি করা চলবেই না। একটু তাজা হবার জন্য এটা আপনার দরকার। খেয়ে নিন স্যার।"

ভদ্‌কার গন্ধে নিকিতার মনেও বেশ উত্তেজনা দেখা দিলো—বিশেষ করে এখন সে যেমন ক্ষুধার্ত তেমনই ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছে। ভুরু দুটো কুঁচকে টুপি ও 'খালাত'-এর উপর থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য সে দেবমূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তিনবার ক্রুশ চিহ্ন এঁকে সে নতজানু হলো; তারপর প্রথমে গৃহকর্তার দিকে ফিরে তাকে অভিবাদন জানাল, অভিবাদন জানাল টেবিলে উপস্থিত অন্য সবাইকে, এবং তারপর স্টোভের পাশে দাঁড়ানো স্ত্রীলোকটিকে। এবং সবশেষে "সকলের জন্য শুভ উৎসব কামনা করি" বলে 'খালাত'টা খুলে ফেলল—অবশ্য তখনও সে একবারও টেবিলের দিকে তাকাল না।

নিকিতার বরফ-ঠাণ্ডা চোখ, দাড়ি ও মুখের দিকে তাকিয়ে বড় ভাই বলল, "আরে ভাই, তোমার যে সারা শরীরটাই জমে গেছে!" জবাবে নিকিতা 'খালাত'টা খুলে একটু ঝেড়ে স্টোভের উপর ঝুলিয়ে রাখল, এবং তারপর টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। ভদ্‌কার গ্লাসটা বাড়িয়ে দিতে সে গ্লাসটা নিয়ে তার সুগন্ধি, ঝকঝকে পানীয় গলায় ঢালতে যাবে এমন সময় ভাসিলির দিকে চোখ পড়তেই তার নিজের ভাড়া-করা জুতো এবং মিস্ত্রি ও ছেলেকে ঘোড়া কিনে দেবার প্রতিশ্রুতির কথা তার মনে পড়ে গেল। সুতরাং দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে হাতটা টেনে নিল।

"আমি ওটা খাব না; সবিনয়ে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই," ভুরু কুঁচকে কথাগুলি বলে সে জানালার পাশে বেঞ্চিটায় গিয়ে বসল।

"কিন্তু কেন খাবে না?" বড় ভাই জিজ্ঞাসা করল।

"কারণ আমি খেতে পারি না, খাওয়া উচিত নয়," বাঁকা চোখে নিজের ছোট ছোট দাড়ি ও গোঁফের দিকে তাকিয়ে বরফের কুঁচি ঝাড়তে ঝাড়তে চোখ না তুলেই নিকিতা জবাব দিলো।

মুচমুচে বিস্কুটটাকে চিবিয়ে ভদ্‌কার সঙ্গে গিলে ফেলে ভাসিলি বলল, "ও জিনিস ওর ভাল লাগে না।"

দয়ালু বুড়িটি বলল, "তাহলে চায়ের পাত্রটাই আমাকে দাও তো! তোমাকে একটু চা ই দিচ্ছি, কারণ তুমি যে জমে যেতে বসেছ। আহা বাছা, সামোভারটা নিয়ে এতক্ষণ কি করছ?"

সামোভারটাকে একখানি তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে একটি যুবতী বলল, "এই যে, হয়ে গেছে।" তখন বেশ কষ্ট করে সেটাকে তুলে নিয়ে সশব্দে টেবিলের উপর রাখল।

ইতিমধ্যে ভাসিলি সবিস্তারে বর্ণনা করতে লাগল কেমন করে সে ও তার সঙ্গী পথ ভুল করে ইতস্তত ঘুরে বেরিয়েছে, একদল মাতাল 'মুঝিক'-এর সঙ্গে দেখা হয়েছে, এবং দুই-দুই বার এই গ্রামে ঘুরে এসেছে। গৃহকর্তা গল্প শুনে খুসি হয়ে তাকে বোঝাতে লাগল কি ভাবে তাদের পথ ভুল হয়েছিল, মাতাল 'মুঝিক'রাই বা কারা এবং পুনরায় যাত্রা করে ভাসিলি ও নিকিতাকে ঠিক ঠিক কোন্ পথ ধরে চলতে হবে।

প্রতিবেশীটি বলল, "আরে, মল্‌তচানোভ্‌কা পর্যন্ত পথটা তো একটা ছোট ছেলেও চিনে যেতে পারে। আর একবার সেখানে যেতে পারলে গ্রামের কাছের বাঁকটা নিলেই তো হলো। সেখানে একটা ঝোপ আছে। আপনারা কি সেখানটা পর্যন্তও যেতে পারেননি!"

বুড়ি কিন্তু মিনতির সুরেই বলল, "কিন্তু রাতটা থেকে গেলেই কি ভাল হতো না? চাকরাণীরা এখনই শোবার ব্যবস্থা করে দেবে।"

তার স্বামীও বলল, "হ্যাঁ, তাই করুন, কারণ আবারও যদি পথ হারান তাহলে অবস্থাটা সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াবে।"

ভাসিলি বলল, "না, না, সত্যি থাকতে পারছি না বন্ধু। ব্যবসা ব্যবসাই। এক ঘণ্টা দেরী হলে একটা বছরই হযতো নষ্ট হবে," কাঠের কথা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রেতার কথা মনে করেই সে কথাগুলি বলল। "এবার কি আমরা রওনা হতে পারি?" (এই শেষের কথাগুলি নিকিতাকে)।

সেই মুহূর্তে নিকিতা কোনও জবাব দিলো না; দাড়ি-গোঁফ থেকে বরফের কুঁচি ঝাড়তেই সে ব্যস্ত। পরে কর্কশ গলায় বলল,

"আর একবার পথ হারালে কি খুব ভাল হবে?"

আসল কথা, ভদ্‌কাটা তার খুবই দরকার ছিল বলেই সে রেগে আছে। এখনও সে তৃষ্ণা মেটাতে পারে একপাত্র চা পেলে—আর সে চা এখনও তাকে দেওয়া হয়নি।

ভাসিলি আপত্তি জানিয়ে বলল, "কিন্তু আমরা কোনওরকমে ঐ মোড়টা পর্যন্ত পৌছতে পারলেই হলো; তারপর তো আর পথ হারাবার ভয় নেই। সেখান থেকে তো সবটাই জঙ্গলের ভিতব দিযে পথ।"

এতক্ষণে চায়ের গ্লাসটা হাতে পেয়ে নিকিতা বলল, "সেটা আপনি বুঝুন ভাসিলি আন্দ্রীচ। যদি যেতেই হযতো যাব, বাস।"

"তাহলে চা-টা খেয়ে নাও, আব ঝটপট বেরিয়ে পড়!"

নিকিতা কোনও কথা বলল না (যদিও আপত্তিসূচকভাবে মাথাটা নাড়ল); সযত্নে চা-টা পাত্রে ঢেলে তার ভাঁপে আঙুলগুলো গরম করতে লেগে গেল। তারপর মিছরিতে একটা কামড় দিয়ে সকলকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, "আপনাদের সকলের স্বাস্থ্য ভাল হোক!" এবং সকৃতজ্ঞ চিত্তে চা-টা গলায় ঢেলে দিলো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাসিলি বলল, "কেউ যদি আমাদের মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসত।"

বড় ভাই বলল, "সে ব্যবস্থা অবশ্য করা যেতে পারে। পেত্রুশকাই ঘোড়া নিয়ে সে পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে যেতে পারে।"

ভাসিলি সোল্লাসে বলে উঠল, "তাহলে তাই কর ভাই; তোমাকে পেয়ে আমরাও খুব খুসি হয়েছি।"

বড় ভাই নির্দেশের সুরে বলল, "পেত্রুশ্‌কা যাও, ঘোটকিটাকে সাজ পরাও।"

ওরা ঘোড়াকে ঠিকঠাক করতে গেলে ভাসিলির আগমনে যে আলোচনায় বাধা পড়েছিল সেটাই আবার উঠল। বুড়ো মানুষটি তার প্রতিবেশীর (সে আবার এখানকার 'স্তারোস্তা' গ্রাম-প্রধানও বটে) কাছে নালিশ জানাচ্ছিল যে তার তৃতীয় ছেলে উৎসব উপলক্ষে তাকে কোনও উপহারই পাঠায়নি, অথচ তার বৌকে একটা ফরাসী শাল কিনে দিয়েছে।

বুড়ো বলল, "ছেলেবা আজকাল হাতেব বাইবে চলে যাচ্ছে।"

প্রতিবেশীও একমত হয়ে জানাল, "সত্যি তাই যাচ্ছে। তাদেব সঙ্গে আব থাকা যাবে না। বড বেশি চালাক হয়ে যাচ্ছে। দেমচ্কিন-এব কথাই ধব না—সেদিন তো অতি চালাকিব বশে তাব বাবাব হাতটাই ভেঙে দিলো।"

নিকিতা কান পেতে সব কথাই শুনল। বক্তাদেব মুখেব দিকে তাকিয়ে আলোচনায যোগ দেবাব প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও চা খেতে অত্যধিক ব্যস্ত থাকায সে মুখ খুলতে পাবছিল না। শুধু মাঝে মাঝে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ছিল। গ্লাসেব পব গ্লাস চা খেযে ক্রমেই সে বেশ গবম হয়ে উঠল, তাব মেজাজও ক্রমেই বেশ ভাল হয়ে উঠল। একান্নবর্তী পবিবাব ভেঙে যাওযাব খাবাপ দিকটা নিয়ে এই আলোচনা বেশ দীর্ঘ সময ধবে চলল, আলোচনায সকলেই এতদূব ডুবে গেল যে অন্য কোনও প্রসঙ্গেব কথাই উঠল না, ক্রমে একসময এই বিশেষ পবিবাবটিব ভাঙনেব কথাও উঠল। বুড়োব দ্বিতীয ছেলে সাবাক্ষণই গম্ভীব মুখে চুপচাপ বসে সব কথা শুনছিল। সেই যে পবিবাব থেকে আলাদা হয়ে যাবাব প্রস্তাব তুলেছে কথাপ্রসঙ্গে সে কথাও উঠল। আলোচনাব প্রকৃত উপলক্ষ এটাই ছিল। কিন্তু অপবিচিত লোকেব সামনে পবিবাবেব গোপন কথা নিয়ে আলোচনা কবাটা তাদেব ভদ্রতায বাধছিল। শেষ পর্যন্ত বুড়ো মানুষটিব আব সহ্য হলো না অশ্রুসিক্ত গলায সে বলতে লাগল, যতদিন সে বেঁচে আছে ততদিন সে ঘব ভাঙতে দেবে না, ঈশ্ববেব নামে এ বাড়িটাকে সে আগলে বেখেছে, একবাব যদি ভাগ শুরু হয তাহলে বাড়িটা ভেঙে টুকবো টুকবো হয়ে যাবে।

প্রতিবেশী বলল "হ্যাঁ, মার্তভিফ্দেব বেলায তাই হয়েছে। একসময কী আবামেব বাড়িই না ছিল—কিন্তু এখন ভাগাভাগি হয়ে এমন হয়েছে যে কাবও হাতেই কিছু নেই।"

ছেলেব দিকে ফিবে বুড়ো বলল, "আমাদেব জন্যও কি তুমি তাই চাও?"

ছেলে কোনও জবাবই দিলো না। ঘবে একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা নেমে এল। এমন সময ঘোড়াব যথাযথ ব্যবস্থা কবে পেত্রুশ্কা সেখানে ফিবে এল। কযেক মিনিট ধবে কথাবার্তা শুনে সে হাসতে লাগল।

বলল, "পলস্ন্-এব একটা গল্প আমাব মনে পড়ে গেল। কোনও বাবা তাব ছেলেদেব একটা ডাল ভাঙতে দিলো। কোনও ছেলেই ভাঙতে পাবল না। কিন্তু ছোট ছোট ডালপালাগুলি একটা একটা কবে ভাঙা—সে তো খুবই সহজ। আমাদেব বেলাযও তাই হবে," ভালবকম হেসে সে কথা শেষ কবল। "আমি কিন্তু যাবাব জন্য তৈবি।"

ভাসিলি বলল, "তুমি তৈবি হলে আমবাও উঠছি। আব আলাদা হবাব ব্যাপাবে আপনি কিন্তু কখনও সায দেবেন না ঠাকুবর্দা। এ সংসাব তো আপনাব হাতে গড়া, কাজেই আপনিই এব হর্তা-কর্তা। দবকাব হলে 'মিবোভয' (স্থানীয ম্যাজিস্ট্রেট)-এব কাছে যাবেন। আপনাব হয়ে তিনিই সব মিটিযে দেবেন।"

উচ্ছ্বসিত বেদনায় বুড়ো মানুষটি বলে উঠল, "কিন্তু এই ব্যবহার—এই ব্যবহার। এদের সঙ্গে বাস কবা যায় না। এতো পুরোপুরি শয়তানের কাণ্ডকারখানা।"

এদিকে নিকিতা তখন পঞ্চম গ্লাস চা খাওয়া শেষ করেও গ্লাসটা ফিরিয়ে না দিয়ে পাশেই রেখে দিয়েছে; মনের আশা, যদি ষষ্ঠ গ্লাসও মিলে যায়। কিন্তু সামোভাব-এ আর জল ছিল না, কাজেই নতুন করে আর চা তৈরি হলো না, ভাসিলিও লোমেব কোটটা গায়ে চড়িয়ে ফেলেছে। কাজেই আব কোনও আশা নেই দেখে মিছরিব বাকি টুকরোটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল, এবং কুর্তাব কোণ দিয়ে ঘর্মাক্ত মুখটা মুছে 'খালাত'টা গায়ে জড়াতে জড়াতে এগিয়ে গেল। তারপব একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধন্যবাদ জানিয়ে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গরম আলোকিত ঘবটা ছেড়ে বাইরের অন্ধকার, ঠাণ্ডা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। বাতাসে দরজাব পাল্লায় খট্-খট্ শব্দ হচ্ছে, আর বরফেব চাঁই উড়ে এসে উঠোনে জমা হচ্ছে। পবক্ষণেই সে অন্ধকার উঠোনে নেমে গেল।

ভেড়ার চামড়ার কুর্তা পবে পেত্রুশ্‌কা উঠোনের মাঝখানে ঘোড়াব পাশে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে পল্‌সন্-এর কবিতা আবৃত্তি করছে :

"ঘন মেঘে আ'কাশ গেছে ছেয়ে,
ঝড়ো হাওয়ায় বরফ আসে ধেয়ে;
এই গর্জায় বুনো জন্তুর প্রায়
(আবার) কখনও শিশুব ঘ্যান-ঘ্যান্ শোনা যায়।"

নিকিতা তালে তালে মাথা নাড়তে নাড়তে লাগামটা হুক থেকে তুলে নিল। একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে বারান্দায় এসে বুড়ো ভাসিলিকে স্লেজ পর্যন্ত যেতে আলো দেখাতে চেষ্টা করল, কিন্তু চোখের নিমেষেই আলোটা নিভে গেল। উঠোনে দাঁড়িয়েই বোঝা গেল, ঝড়ের বেগ আগেব চাইতে বেড়েছে।

ভাসিলি ভাবল, "কী ভয়ংকর আবহাওয়া! হয়তো আমরা কোনও দিনই সেখানে পৌছতে পারব না! যাই হোক, ব্যবসার কথা তো ভাবতেই হবে। তাছাড়া, নিজেও তৈবি হয়েছি, গৃহকর্তার ঘোড়াযও জিন বাঁধা হয়েছে। ঈশ্বর করুন, আমরা যেন জায়গামতো পৌছতে পারি।"

বুড়ো লোকটিও মনে মনে ভাবল, এবা রওনা না হলেই ভাল করত, কিন্তু সে তো আগেই তাদের বারণ করেছে, তারা শোনেনি। বার বার বলে তো কোনও লাভ নেই।

সে আরও ভাবল, হয়তো বুড়ো বয়সের জন্যই আমাকে এতটা চিন্তিত করে তুলেছে, ওরা নিরাপদেই পৌছে যাবে। আমাদের শুতে যাবার সময় হয়ে গেছে। আজ রাতের মতো অনেক কথা হয়েছে।

পেত্রুশ্‌কার মনে বিপদের কোনও চিন্তাই হয়নি। রাস্তা এবং আশপাশের সব কিছু

সে এত ভাল চেনে যে ভয়ের কোনও কারণই থাকতে পারে না। নিকিতার অবশ্য যাবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নিজের ইচ্ছামতো না চলে অপরের সেবা করতেই সে অভ্যস্ত। কাজেই শেষ পর্যন্ত তাদের যাত্রায় বাধা দেবার মতো কেউ রইল না।

৫

ভাসিলি বারান্দা পেরিয়ে অন্ধকারে তাকিয়ে ভাল করে দেখে নিল স্লেজটা কোথায় আছে, তারপর লাগাম হাতে নিয়ে গাড়িতে চেপে বসল।

"ঠিক আছে, চালাও," সে চেঁচিয়ে বলল। নিজের স্লেজে হাঁটু ভেঙে বসে পেত্রুশ্‌কা তার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো, আর সামনে একটা ঘোটকি আছে বুঝতে পেরে ব্রাউনি চিঁ-হিঁ-হিঁ করে ডাকতে ডাকতে তার পিছনে ছুটতে লাগল। এই ভাবে গ্রামের রাস্তায় পড়ে ঘর-বাড়ি পেরিয়ে আগেকার সেই রাস্তাটাই ধরল—যে রাস্তাটা চলে গেছে বরফ-ভেজা জামা-কাপড় মেলে-দেওয়া (সে জামা-কাপড় এখন আর দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না) উঠোনের পাশ দিয়ে, বরফ-ঢাকা গোলাঘরটিকে পাশে রেখে, একেবারে সেই শোঁ-শোঁ শব্দ-করা দ্রাক্ষাক্ষেতের পাশ দিয়ে। এই ভাবে যাত্রীরা আর একবার যেন বরফের সমুদ্রে গিয়ে পড়ল—সে সমুদ্র মাথার উপরে ও পায়ের নিচে সমানভাবে গর্জন করে চলেছে। বাতাস এত জোরে বইছে যে তার ধাক্কায় স্লেজটা একদিকে কাত হয়ে পড়ছে, আর ঘোড়ারও পা হড়কে যাচ্ছে। পেত্রুশ্‌কা জোর গলায় চেঁচিয়ে তার ঘোড়াটিকে উৎসাহ দিতে লাগল, আর তা দেখে ঘোড়াটাও সমানে-সমানে ছুটতে লাগল।

প্রায় দশ মিনিট চলবার পরে পেত্রুশ্‌কা একপাশে সরে গিয়ে চিৎকার করে কী যেন বলল; কিন্তু বাতাসের শব্দে ভাসিলি বা নিকিতা তাব কিছুই বুঝতে পারল না। তবে এটা বুঝতে পারল যে তারা মোড়ের কাছে পৌঁছে গেছে। পেত্রুশ্‌কাও গাড়ির চাকা ডাইনে ঘুরিয়ে দিলো। ফলে যে বাতাস এতক্ষণ তাদের পাশে লাগছিল এবার সেটা সোজা মুখে এসে লাগছে, আর বরফের ভিতর দিয়ে ডান দিকে কালো মতো একটা কিছু দেখা যাচ্ছে। ওটা নিশ্চয় মোড়ের মাথার সেই ঝোপটা।

পেত্রুশ্‌কা বলল, "ঈশ্বর আপনাদের সহায় হোন।"

"ধন্যবাদ, ধন্যবাদ পেত্রুশ্‌কা!"

"ঝড়ে আকাশ ছেয়ে গেছে," বলেই ছেলেটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘোড়াটাকে চালিয়ে দিয়ে ভাসিলি বলল, "বাপ্‌রে! কত কবিতাই যে আওড়াতে পারে!

"হ্যাঁ, বড় ভাল ছেলে, একটি সত্যিকারের সৎ 'মুঝিক'," নিকিতা বলে উঠল। তারপর দু'জন চলতে লাগল। বাড়িতে যে চা-টা খেয়ে এসেছে তার গরম যাতে বেরিয়ে যেতে না পারে সেজন্য নিজেকে বেশ ভাল করে জড়িয়ে নিল, ঘাড় দুটোকে

এমনভাবে ভিতরে ঢুকিয়ে নিল যে দাড়িতে গলাটা বেশ ঢেকে গেল, তারপর চুপচাপ বসে রইল। চোখেব সামনে দেখতে পাচ্ছে কালো রেখার মতো দুটো শকট-দণ্ড, আর ঘোড়াটার দুটো পাশ ও বাতাসে আন্দোলিত তার লেজটা। মাঝে মাঝে রাস্তাব খুঁটি চোখে পড়ায় বুঝতে পারছে যে স্লেজটা ঠিক পথেই চলেছে, কাজেই তার কিছুই করবার নেই। ভাসিলিও লাগামটাকে আল্‌গা হাতেই ধরে রেখেছে, আব ঘোড়াটা তার নিজেব ইচ্ছামতোই চলছে। তবু গ্রামে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম পেলেও ব্রাউনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছুটছে, আর মাঝে মাঝেই এ-দিক ও-দিক মুখ ঘোরাতে চাইছে: তখন ভাসিলিও লাগাম টেনে ধরেছে।

"ডাইনে ওই একটা খুঁটি—দুই—তিন," ভাসিলি গুণতে লাগল। সামনেই অন্ধকারে কিছু দেখতে পেয়ে নিজেব মনেই বলল, "ওই তো সামনে সেই জঙ্গলটা। অবশ্য যেটাকে সে জঙ্গল মনে কবেছিল আসলে সেটা একটা ঝোপ মাত্র। সেটা পাব হয়ে আরও পঞ্চাশ গজেব মতো অগ্রসর হতেই—আরে। কোথায সে জঙ্গল, আব কোথাযই বা চার নম্বর খুঁটি।

ভদ্‌কা ও চায়ের উত্তেজনায় লাগামে একটা ঝাঁকি দিযে ভাসিলি ভাবল, ভয কিসের; এক মিনিটের মধ্যেই জঙ্গলে পৌছে যাব। বাধ্য, অনুগত জন্তুটা চালকের নির্দেশ মতই কখনও আস্তে, কখনও কিছুটা জোবে চলতে লাগল, যদিও সে বুঝতে পারছিল যে তারা ভুল পথেই চলেছে। আরও দশ মিনিট কেটে গেল, কিন্তু জঙ্গলের দেখা নেই।

শেষ পর্যন্ত লাগাম টেনে ধরে ভাসিলি চেঁচিয়ে বলল, "আবার আমবা পথ হারিয়েছি!" কোনও কথা না বলে স্লেজ থেকে নেমে নিকিতা খালাতটাকে ভাল করে চেপে ধরে বরফের উপর ইতস্তত ঘুরতে লাগল। প্রথমে এ-পাশে তারপর ও-পাশে; তিনবাব তো একেবারে উধাও হয়ে গেল। যাহোক, শেষ পর্যন্ত ফিরে এসে সে ভাসিলির হাত থেকে লাগামটা নিল।

"আমাদের সোজা ডান দিকে যেতে হবে," ঘোড়ার মুখটা সেইদিকে ঘুবিয়ে সে দৃঢ় গলায় সোজাসুজি কথাগুলি বলল।

"ঠিক আছে; ডাইনে যেতে হযতো ডাইনেই চলো," লাগামটা ছেড়ে দিয়ে অবশ হাত দুটোকে আস্তিনেব মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে দিতে ভাসিলি বলল। নিকিতা আব কোনও কথা না বলে শুধু ঘোড়াটাকে উদ্দেশ কবে বলে উঠল, "সোনা আমার, এবার তোমার সাধ্যমতো যা পাবো তা করো!" কিন্তু নিকিতা লাগাম নিয়ে যতই নাড়াচাড়া করুক, ঘোড়া কিন্তু ধীর পায়েই চলতে লাগল। জাযগায় জায়গায় বরফ হাঁটু-সমান গভীর। ঘোড়ার প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে ঝাঁকি খেতে খেতে স্লেজটা তার ভিতর দিয়েই এগিয়ে চলল। এই সময় নিকিতা চাবুকটা হাতে নিয়ে একবার ব্যবহারও করল; চাবুকে অনভ্যস্ত ঘোড়াটা সামনে লাফ দিয়ে জোর কদমে পা

ফেলল—কিন্তু অনতিকাল পরেই আবার সেই হাঁটি হাঁটি পা-পা করে চলতে শুরু করল। এইভাবে পাঁচ মিনিট কেটে গেল। চারিদিকে এমন অন্ধকার, আর এমনভাবে বরফ ছুটছে যে প্রায় কিছুই নজরে আসছে না।

হঠাৎ ঘোড়াটা থেমে গেল, যেন সামনে কোনও কিছুর আভাষ পেয়েছে। লাগামটা ছুঁড়ে ফেলে নিকিতা আস্তে লাফ দিয়ে নেমে ব্যাপাবটা কি দেখবার জন্য ঘোড়ার মাথার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু ঘোড়াটাকে ছাড়িয়ে একটা পা ফেলামাত্রই তার পা দুটো কিসে যেন ঠোক্কর খেয়ে ছিট্‌কে উঠল, আর সে একটা ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল।

"উঃ! উঃ! উঃ!" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে সে অনবরত গড়াতে লাগল আর নিজেকে থামবার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলল। একেবাবে নিচে গিয়ে একটা বরফের স্রোতে তার পা দুটো আটকে যাওয়াতে তবে তার গড়ানো বন্ধ হলো; কিন্তু তার হাতের চাপে উপর থেকে এক চাঙড় বরফ তার মাথার উপর ভেঙে পড়ে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে ঘাড়েব পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল।

কোটের কলাব থেকে বরফের কুঁচি ঝাড়তে ঝাড়তে যেন ববফের স্রোত আর খাদটাব কাছেই নালিশ জানিয়ে নিকিতা বলল, 'তোমরা কেমন ধারা হে?'

'নিকিতা, নিকিতা!' উপর থেকে ভাসিলির গলা ভেসে এল, কিন্তু নিকিতা জবাব দিল না। জবাব দেবার মতো সময়ও তার তখন ছিল না, কারণ নিজেকে ঝেড়ে-ঝুড়ে খাড়া করতে ও চাবুকটা খুঁজতেই সে তখন ব্যতিব্যস্ত; ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়বার সময়ই চাবুকটা তার হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেছে। সেটাকে খুঁজে পেয়ে আবার সে যেখান থেকে নেমে এসেছিল সেখানেই উঠে যেতে চেষ্টা করল; কিন্তু বুঝল যে ওটা অসম্ভব, কারণ যতবার সে উপরে উঠতে চেষ্টা করছে ততবারই গড়িয়ে আরও নিচে নেমে যাচ্ছে; কাজেই শেষ পর্যন্ত নিচ বরাবর হাঁটতে হাঁটতে উপরে উঠবার একটা পথ খুঁজতে লাগল। যাহোক, যেখানটায় সে পড়ে গিয়েছিল তার থেকে কয়েক গজ দূরেই এমন একটা জায়গা সে পেয়ে গেল যেখান থেকে চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে কোনওরকমে উপরে উঠে গেল এবং যেখানে থাকতে পারে বলে তার মনে হলো সেই দিক পানে এগোতে লাগল। ঘোড়া এবং স্লেজ দুই-ই অদৃশ্য, কিন্তু যেহেতু বাতাসের উল্টোদিক থেকে সে এগোচ্ছিল তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাসিলির চিৎকার ও ব্রাউনির চিঁ-হিঁ-হিঁ ডাক তার কানে এসে লাগল, আর পরক্ষণেই সত্যি সত্যি সে তাদের দেখতেও পেল।

চেঁচিয়ে বলল, 'আসছি, আমি আসছি। আপনারা এত হৈ-চৈ করছেন কেন?'

একেবারে স্লেজের কাছে পৌঁছে তবে সব দৃশ্যটা তার কাছে পরিষ্কার হলো। ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ভাসিলি—বাইরের অস্পষ্ট অন্ধকারের বুকে তার মূর্তিটাকে বেশ বড়সড় দেখাচ্ছে।

মনিব রেগে বলল, 'এ ভাবে পড়ে গেলে কেমন করে? ফিরে চল, অন্তত গ্রীশ্কিনো-তে ফেরবার চেষ্টা তো করতেই হবে।'

'তা যেতে পারলে তো খুসিই হতাম,' নিকিতা পাল্টা ফোড়ন কাটল। 'কিন্তু কোন্ পথে যাব? এই খাদের মধ্যে একবার পড়লে আর উঠতে হবে না। আমি বলে তাই অনেক কষ্টে উঠে এসেছি।'

'কিন্তু এখানেও তো পড়ে থাকতে পারি না। যেখানে হোক যেতে তো হবেই,' ভাসিলি পাল্টা চাপান দিল।

নিকিতা কথা বলল না। স্লেজের চাকার উপর বসে জুতো খুলে তার ভিতরে জমা বরফ ঝেড়ে ফেলতে লাগল। সে কাজ শেষ করে একমুঠো খড় যোগাড় করে বাঁ পায়ের একটা ফুটো বন্ধ করে দিল।

ভাসিলিও উচ্চবাচ্য করল না। স্লেজেব চাকার উপর বসে জুতো খুলে তার ভিতরে জমা বরফ ঝেড়ে ফেলতে লাগল। সে কাজ শেষ করে একমুঠো খড় যোগাড় করে বাঁ পায়ের একটা ফুটো বন্ধ করে দিল।

ভাসিলিও উচ্চবাচ্য করল না। সবকিছুই সে নিকিতার উপর ছেড়ে দিতে চায়। জুতোয় পা ঢুকিয়ে নিকিতা স্লেজে চড়ে বসল; হাতে দস্তানা পরে লাগাম তুলে নিল; তারপর খাদের পাশ বরাবর এগিয়ে চলল। শ'-খানেক গজ চলবার পরেই ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের সামনে আবার সেই খাত।

নিকিতা আবার নেমে গিয়ে বরফের উপব নজর রেখে এগোতে লাগল। কিছুক্ষণ তার দেখা নেই। তারপর স্লেজের উল্টো দিক থেকে সে এসে হাজির হলো।

চেঁচিয়ে ডাকল, 'আপনি আছেন তো আন্দ্রীচ?'

ভাসিলি জবাব দিল, 'হ্যাঁ, ব্যাপার কি?'

'এ পথে বেরনো যাবে না; যেমন অন্ধকার তেমনই চারিদিকে অনেক গিরি-খাদ। বাতাসের উল্টো দিকে আমাদেব ফিরে যাবার চেষ্টা করতে হবে।'

ফিরতি পথে কিছুটা চলেই তারা থামল। নিকিতা আবার নিচে নেমে বরফের উপর হামাগুড়ি দিতে লাগল। আবার গাড়িতে চেপে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নেমে পড়ল; আর শেষ পর্যন্ত প্রায় দম আটকে আসার মতো অবস্থায় স্লেজের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কি হলো?' ভাসিলি জিজ্ঞাসা করল।

'আর কি হবে। আমার অবস্থা সঙ্গীন; ঘোড়ার অবস্থাও প্রায় তাই।'

'তাহলে কি করা যায়?'

'এক মিনিট সবুর করুন।' নিকিতা আবার চলে গেল, কিন্তু তখনই ফিরে এল।

'আমার পিছনে পিছনে আসুন,' ঘোড়াটার সামনে হেঁটে যেতে যেতে সে বলল। ভাসিলি এখন আদেশ দেওয়া বন্ধ করেছে; নিকিতা যা বলছে তাই করছে।

'এই পথে—আমার সঙ্গে আসুন,' চেঁচিয়ে কথাগুলি বলে নিকিতা হঠাৎ ডাইনে মোড় ঘুরল। মাথাটা ধরে ব্রাউনিকেও নিচের একটা বরফস্রোতের দিকে টেনে নিয়ে চলল। ঘোড়াটা প্রথমে আপত্তি করলেও যেন বরফ-স্রোতটাকে পার হবার জন্যই ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু পার হতে না পেরে তার মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে গেল।

ভাসিলি তখনও তার আসনেই বসে ছিল। নিকিতা চেঁচিয়ে বলল, 'স্লেজ থেকে বেরিয়ে আসুন।' তারপর শকট-দণ্ডটাকে ধরে প্রাণপণ শক্তিতে ঘোড়াটাকে স্লেজ-সুদ্ধু তুলে আনতে চেষ্টা করল।

ব্রাউনির উদ্দেশ্যে বলল, 'টানো বাছা আমার! ভালভাবে একটা টান, ব্যস, তাহলেই কাম ফতে। হেঁইও! আর একটা টান!'

ঘোড়াটা সাধ্যমত চেষ্টা করল, আবার চেষ্টা করল, কিন্তু নিজেকে সেই বরফ-স্রোতের ভিতর থেকে মুক্ত করতে পারল না। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল; বুঝি বা অবস্থাটা ভেবে দেখতে লাগল।

নিকিতা ব্রাউনিকে আদর করে বলল, 'এস, এস বাবা; এভাবে হবে না। আর একবার সকলে মিলে চেষ্টা করা যাক।' সে একদিক থেকে আর ভাসিলি আর একদিক থেকে শকট-দণ্ডটা ধরে টান দিল। ঘোড়াটা একবার মাথাটা নেড়েই দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'এই তো চাই! এভাবে তো আর বরফের মধ্যে ডুবে থাকতে পার না?' উৎসাহভরে নিকিতা বলে উঠল।

আর একটা ঝাঁপ—আবার—তৃতীয়বার বরফ-স্রোতটা পার হয়ে ঘোড়াটা কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার নাক দিয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। নিকিতা স্লেজটাকে আরও খানিকটা টেনে নিল; কিন্তু দুটো ভারী কোটের ভারে ভাসিলি এতই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল যে সে-চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে সে আবার স্লেজেই চেপে বসল।

গ্রামটা ছাড়বার আগেই কোটের কলারের চারপাশে যে রুমালটা সে বেঁধে নিয়েছিল সেটাকে খুলে ভাসিলি বলল, 'আমাকে একটু বিশ্রাম নিতে দাও।'

নিকিতা জবাব দিল, 'বেশ তো; তাড়াহুড়োর কিছু নেই। চুপ করে বসুন; আমি ঘোড়া চালাচ্ছি।'

ভাসিলি স্লেজের ভিতরে বসল। আর নিকিতা ঘোড়াকে নিয়ে প্রায় দশ গজ এগিয়ে একটা উৎরাই ধরে কিছুটা নেমে আবার কিছুটা উপরে উঠে থামল।

যেখানটায় সে থামল সেটা ঠিক খাত নয়। আশেপাশের পাহাড় থেকে যে ভাবে বরফ ছুটে আসছে তাতে ঐ গিরি-খাতের মধ্যে থাকলে বরফের নিচেই তারা চাপা পড়ে যেত। যে জায়গাটায় তারা এসে দাঁড়িয়েছে সেখানটায় পাহাড়ের খাঁজে হাওয়াটা লাগে না বলে অনেকটা নিরাপদ। মাঝে মাঝে বাতাস একটু কমছে; কিন্তু সে খুব অল্পক্ষণের জন্য; আর তার পরেই যেন সেটুকু পুষিয়ে নেবার জন্য তুষার-ঝড় দশগুণ

বেড়ে পথিকদের নির্মম নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করছে। একসময় নিকিতার সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্য স্লেজ থেকে নামতে গিয়ে ভাসিলি এমন একটা প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার মুখে পড়ে গেল যে সেটা না থামা পর্যন্ত দু'জনই চুপচাপ উপুড় হয়ে পড়ে রইল। ব্রাউনি সারাক্ষণ কান দুটো খাড়া করে বিরক্তিতে মাথা নাড়তে লাগল। বাতাসটা একটু কমলে হাতের দস্তানা খুলে কোমরে গুঁজে নিকিতা হাত দুটো ঘসে নিয়ে ঘোড়ার গলা থেকে লাগামটা খুলতে শুরু করল।

'ওটা করছ কেন?' ভাসিলি জিজ্ঞাসা করল।

নিকিতা জবাব দিল, 'কারণ আর কিছু করার নেই। আমার শরীর ক্লান্তিতে একেবারেই ভেঙে পড়েছে।'

'তাহলে কি আমরা আর এগোবার চেষ্টাও করব না?'

'না, অকারণেই আমরা ঘোড়াটাকে খাটিয়ে মারছি,' নিকিতা বলল। যেন নতুন কোনও কাজের অপেক্ষায়ই ঘোড়াটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু সেও যেন ঘামে-ভেজা শরীরটাকে আর খাড়া রাখতে পারছে না। 'ব্রাউনি তো চলতে চাইছে, কিন্তু সে যে পায়ের উপর দাঁড়াতেই পারছে না। রাতটা এখানে কাটানো ছাড়া ওর পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব নয়।'

এমনভাবে নিকিতা কথাগুলি বলল যেন তারা কোনও সরাইখানার উঠোনে থাকবার বন্দোবস্ত করেছে। ঘোড়ার কলারের দড়ি খুলতে খুলতে একসময় কলারটা দু'-ফাঁক হয়ে খুলে পড়ল।

ভাসিলি চেঁচিয়ে বলল, 'কিন্তু এখানে যে আমরা বরফে জমেই মারা যাব।'

'তাই নাকি? তাহলেই বা কি করা যাবে? এ ছাড়া আর কিছু করা যাবে না।' জবাবে নিকিতা এর চাইতে আশার বাণী কিছু বলতে পারল না।

৬

দুটো ভারী কোট চাপা দিয়ে, বিশেষ করে বরফ-স্রোতের মধ্যে যে ধকলটা গেল তার পরে ভাসিলির বেশ গরম লাগবারই কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন বুঝতে পারল যে সেখানেই তাদের রাতটা কাটাতে হবে তখনই যেন তার শিরদাঁড়া বেয়ে বরফের একটা স্রোত নেমে গেল। মন থেকে এই ভয়টাকে তাড়াবার জন্য স্লেজে গ্যাঁট হয়ে বসে সে সিগারেট-দেশলাই বের করল।

এদিকে নিকিতা ঘোড়াটাকে জোয়াল থেকে খুলে দিল, জিনসমেত তার সব সাজপোশাক খুলে নিল আর সেই সঙ্গে বক্‌বক্ করে বকতে লাগল।

'এবার তো ছাড়া পেয়ে গেলে। অল্প-সল্প যা আছে তাও খুলে দিচ্ছি। তারপর খড় দেব।' যেমন কথা তেমনই কাজ। 'ভাল করে খেয়ে নাও, অনেকটা ভাল লাগবে।'

ব্রাউনি কিন্তু তাতেও শান্ত হলো না। লেজটা তুলে পা ঠুকতে লাগল। এক পা থেকে আর এক পায়ে শরীরের ভর রেখে সে নিকিতার আস্তিনে মাথা ঘসতে লাগল। খড়ের খাদ্যও যেন তার মনোমত হলো না। এক কামড় মুখে তুলেই আবার ছুঁড়ে দিল, বাতাস এসে খড়গুলোকে উড়িয়ে নিয়ে বরফের মধ্যে ডুবিয়ে দিল।

নিকিতা ভাবল, 'একটা বিপদ-সংকেত বানালে তো মন্দ হয় না। স্লেজটাকে বাতাসের দিকে একটুখানি ঠেলে দিয়ে জিনের পট্টি দিয়ে শকট-দণ্ড দুটিকে ভাল করে একত্রে বেঁধে সেটাকে দাঁড় করিয়ে দিল।

দস্তানা দুটোকে ঝেড়ে হাতে পরতে পরতে সে বলল, 'কেউ যদি এ পথ দিয়ে যায় তাহলে এই দণ্ড দেখে নিশ্চয় আমাদের উঠে যেতে সাহায্য করবে।'

এদিকে ভাসিলি লোমের কোটটাকে গা থেকে খুলে তাই দিয়ে একটা আবরণের মতো তৈবি করেছে। তারপর ইস্পাতের দেশলাই-বাক্সে একটার পব একটা কাঠি ঠুকতে লাগল। কিন্তু ঠাণ্ডায় তার হাত এমন ভীষণভাবে কাঁপছিল যে কাঠিগুলো হয জ্বললই না, আর না হয় তো যেটা জ্বলল সেটাও সিগারেট পর্যন্ত তুলতে না তুলতেই বাতাসে নিভে গেল। শেষ পর্যন্ত একটা কাঠি ঠিকমতো জ্বলে মুহূর্তের জন্য একটুখানি আলো দেখাল। তার হাতের তর্জনীতে পরা সোনার আংটিটা সে আলোয় ঝিকমিক করে উঠল। সিগাবেট ধরাল। লোভীব মত পরপর দুটো জবর টান দিল। ধোঁয়াটা গিলে ফেলে আবাব গোঁফের ফাঁক দিয়ে ছেড়ে দিল। যেই সে তৃতীয় টানটি দিতে যাবে অমনই বাতাস ছুটে এসে সিগারেটের জ্বলন্ত অংশটাকে উড়িয়ে নিয়ে খড়ের মধ্যে ফেলে দিল।

তথাপি যেটুকু ধোঁয়া ভিতরে ঢুকেছিল তাতেই তার মেজাজ বেশ খুসি হয়ে উঠল। নির্ভীক গলায় বলল, 'রাতটা যদি এখানে কাটাতেই হয়, বেশ তো কাটাব। ব্যস্। এক মিনিট সবুর কর, আমি একটা নিশান উড়িয়ে দিচ্ছি।'

যে রুমালটা ভাসিলি গলা থেকে খুলে স্লেজের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল সেটাকে তুলে নিয়ে হাতের দস্তানা খুলে সে স্লেজের উপরে উঠে গেল। তারপর আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে রুমালটাকে শকট-দণ্ডেব মাথায় বেঁধে দিল। সঙ্গে সঙ্গে রুমালটা বাতাসে উড়তে লাগল। এই দণ্ডের সঙ্গে একবার জড়িয়ে যাচ্ছে, আবার পরক্ষণেই বাতাসে খুলে গিয়ে পত্‌পত্‌ করে উড়ছে।

নেমে এসে নিজের কাজে খুসি হয়ে ভাসিলি বলল, 'কেমন, একটা বুদ্ধির কাজ করিনি? এবার দু'জন পাশাপাশি শুতে পারলে বেশ গরম হতো; কিন্তু মনে হচ্ছে এখানে দু'জনের মতো জায়গা হবে না।'

নিকিতা বলল, 'সেজন্য ভাববেন না; আমার ব্যবস্থা আমিই করে নেব। কিন্তু তার আগে ঘোড়াটাকে ঢাকবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। বেচারি ভয়ানক ঘামছে; ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে। এক মিনিট—'

এক লাফে স্লেজের ভিতর ঢুকে ভাসিলির কাছ থেকে সে বস্তাটা টেনে বের করল। সেটাকে দুই ভাঁজ করে ব্রাউনিকে আগাগোড়া ঢেকে দিল। তার উপরে জিন চাপা দিয়ে বলল, 'এবার বেশ গরম হবে রে বোকা।' তারপর ভাসিলিকে বলল, 'আজ রাতে যদি আপনার দরকার না হয় তাহলে আমি এপ্রনটা নেব। আমাকে কিছুটা খড়ও দিন।' ভাসিলির কাছ থেকে এপ্রন ও খড় নিয়ে স্লেজের পিছন দিকে গিয়ে বরফে একটা গর্ত করে তার মধ্যে খড় বিছিয়ে দিল। তাবপর টুপিটাকে চোখের উপর নামিয়ে 'খালাত'-টা গায়ে জড়িয়ে, তার উপর এপ্রনটা ঢাকা দিয়ে স্লেজের কাঠের পাটাতনে হেলান দিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

নিকিতার বিধি-ব্যবস্থায় আপত্তি জানিয়ে ভাসিলি মাথা নাড়তে লাগল (চাষীদের এই সব আদিম অব্যবস্থাগুলোকে উৎসাহ দেওয়া তার স্বভাববিরুদ্ধ); তারপর রাতের জন্য নিজের ব্যবস্থায় লেগে গেল। প্রথমে স্লেজে বাকি খড় যা ছিল সেটাকে পরিপাটি করে বিছিয়ে নিল; উরুর হাড়টা যেখানে পড়বে সেই জায়গায় খড় একটু ঘন করে পেতে দিল। তারপর দস্তানা খুলে স্লেজের দিকটায় মাথা রেখে শুয়ে পড়ল।

যে কারণেই হোক ঘুম এল না। শুয়ে শুয়ে নানা কথা ভাবতে লাগল। যেটা তাব চিন্তার মুখ্য বিষয় সেটাই তার জীবনের একমাত্র গর্ব, আদর্শ ও লক্ষ্য—অর্থাৎ অর্থ উপার্জন, আরও অর্থ। যে উপায়ে তার কিছু কিছু পবিচিত লোক অনেক টাকা করেছে এবং যে ভাবে তারা সে টাকা ব্যবহার করছে, আর কি ভাবে চললে সেও তাদের মতোই আরও অনেক টাকা করতে পারবে—এই সব কথাই সে ভাবতে লাগল। গোভিয়াৎস্কিন্স্কির জঙ্গল কেনাটা তার কাছে খুবই বড় ব্যাপার হয়ে দেখা দিল, কারণ তার আশা সেই জঙ্গল থেকে সে একথোকেই সম্ভবত দশ হাজার রুবল কামাতে পারবে। হেমন্তকালে যে গাছগুলি সে নিজের চোখে দেখে এসেছে মনে মনে সে তাব দামের হিসাব কবতে লাগল এবং যে দুই 'দেসিয়াতিন' (১ দেসিয়াতিন = ২$\frac{৩}{৪}$ একর) দেখে এসেছে তার ভিত্তিতে এখন পুরোটার হিসাব করতে লাগল।

মনে মনে বলল, 'ওক গাছটা কাটলে স্লেজ-গাড়ির 'রানার' বানানো যাবে, আর যে অবস্থায় আছে তাতে বরগা হবে। গাছটা কেটে ফেলবার পরে 'দেসিয়াতিন' প্রতি ৩০ 'সাঝেন' (১ সাঝেন = ৭ ফুট) জ্বালানি পাওয়া যাবে।' এইভাবে হিসাব করে তার মনে হলো জঙ্গলটার মোট দাম দাঁড়াবে ১২০০০ রুবল, কিন্তু হাতের কাছে নামতার ছক না থাকায় সঠিক অংকটা স্থির করতে পারল না। আবার ভাবতে শুরু করল, 'যতই যা হোক, আমি কিন্তু ১০০০০ রুবলও দিচ্ছি না—মাত্র ৮০০০—তাও খোলা জায়গার দরুণ বাদসাদ দিয়ে। আমিনের হাতে একশো বা দেড়শো রুবল গুঁজে দিলেই সে মাপের বেলায় আমাকে অন্তত পাঁচ 'দেসিয়াতিন' ছাড় পাইয়ে দেবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ৮০০০ রুবলেই মালিক খুসি হয়ে জঙ্গলটা বেচে দেবে। তার জন্য তিন হাজার তো হাতে নিয়েই চলেছি; ওতেই সে গলে যাবে।...ওই বাঁকটা যে আমরা

কেমন করে ভুল করলাম তা ঈশ্বরই জানেন। কাছাকাছি নিশ্চয়ই একটা বন আছে, আর বন-রক্ষকও আছে। তার কুকুরটারতো আমাদের সাড়া পাওয়া উচিৎ ছিল। শয়তানের বাচ্চারা দরকারের সময় ডাকে না।'

কোটের কলারটা কানের উপর থেকে সরিয়ে সে কান পাতল। কিন্তু বাতাসের হু-হু, দণ্ডের উপর রুমালটার খস্‌-খস্‌, আর স্লেজটার উপর বরফ ছিটকে পড়ার শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনা গেল না। সে আবার কান দুটো ঢেকে দিল।

ভাবতে লাগল, 'কে জানত যে এ ভাবে এখানে রাত কাটাতে হবে! যাহোক, কাল সকালে তো সেখানে পৌঁছই। তার মানে একটা দিন নষ্ট। তাছাড়া, অন্য লোকগুলোও নিশ্চয় এই আবহাওয়ায় সেদিক মাড়াবে না।'

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, এ মাসের নয় তারিখে কসাইরা খাসিগুলো বাবদ তাকে কিছু টাকা দেবে এরকম কথা আছে।

'টাকাটা বুঝে নেবাব জন্য ঐ তারিখের আগে তো আমাকে ফিরতেই হবে। আমাকে সে দর-দামে ঠকাতে পারবে না, কিন্তু আমাব স্ত্রী তো দর-দস্তুর করতে মোটেই জানে না। আসলে, কারও সঙ্গে কথা বলতেই সে জানে না।' উৎসব উপলক্ষে গতকাল যখন 'স্তানোভয়' (স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট) অতিথি হিসাবে তাদের বাড়িতে এসেছিল তখন যে স্ত্রী তার সঙ্গে মোটেই কথাবার্তা বলতে পারেনি সে কথাটা হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল। 'আসল কথা—সে শুধুই একটি মেয়েমানুষ মাত্র তাছাড়া, আমার সঙ্গে বিয়ে হবার আগে সে দেখেছেই বা কি? তার বাবা তো ছিল একজন সম্পন্ন 'মুঝিক' মাত্র। একটা ছোট গোলাবাড়িই তো তার একমাত্র সম্পত্তি। কিন্তু এই পনেরো বছরে আমি কী না করেছি? একটা দোকান, দুটো শুঁড়িখানা, একটা কারখানা, একটা শস্যগোলা, দুটো ভাড়াটে বাড়ি, আর মালগুদামসমেত লোহার ছাদওয়ালা একটা বাগান-বাড়ি।' গর্বে সে একেবারে ফুলে উঠল। 'আসলে, জেলার প্রধান ব্যক্তি আজ কে? কেন, নিশ্চয় ভাসিলি ব্রেখুনফ!'

সে বলেই চলল, 'এটা কেমন কবে হলো? কারণ সমস্ত মন আমি ব্যবসাতেই ঢেলে দেই আর কঠোর পরিশ্রম করি—অন্যদের মত শুধু শুয়ে থেকে আর খেলা করে সময় কাটাই না। সারাটা রাত ঘুমিয়েও কাটাই না। তুষার-ঝড় হোক বা না হোক, দরকার পড়লেই আমি বেরিয়ে পড়ি, আর তাই ব্যবসাপত্তরও ভাল চলে। সকলে আমাকে বোকা বলে, আমার টাকা উপার্জন দেখে হাসে; কিন্তু তাদের হাসতে দাও ভাসিলি, তুমি কঠোর পরিশ্রম করে যাও; তাতে যদি মাথা ধরে তো ধরুক। দরকার হলে এইভাবে খোলা জায়গায় রাত কাটাও, তবু সময় নষ্ট কবো না। তাতে যদি ঘুম না আসে, তাতেই বা কি! এ রকম ভাবে চিন্তা করার শক্তিই তো বালিশের কাজ করবে,' গর্বসহকারে এই সব সে ভাবতে লাগল।

'অনেকে মনে করে, টাকা-পয়সা আসে কপালের জোরে। দূর! লাখে একজনই

মিরোনফ্ হয়ে থাকে। না। জোর খাট, ঈশ্বরই তোমাকে বিশ্রাম দেবেন। তিনি যদি স্বাস্থ্য আর শক্তি দেন তো সেই যথেষ্ট।'

একদিন সেও মিরোনফ্-এর মত লাখপতি হতে পারে (একদিন তো তার কিছুই ছিল না)—এই চিন্তাই ভাসিলিকে এতখানি উত্তেজিত করে তুলল যে কারও সঙ্গে একটু আলাপ করবার ইচ্ছা জাগল তার মনে। কিন্তু এখানে তো কেউ নেই। আহা! গোভিয়াৎস্কিনা-তে একবার পৌঁছতে পারলে একজন জমিদারের সঙ্গে কথা বলেও সুখ হয়—তাকে কিছুটা ঠকিয়েও মজা হয়।

'হা ভগবান, কী ঝড় বইছে! এত বরফ ছুটছে যে মনে হচ্ছে সকাল হলেও এখান থেকে বের হতে পাবব না।'

বরফে চারিদিক আবছা সাদা হয়ে আছে। ব্রাউনির কালো মাথা ও তাকে ঢাকা দেওয়া বস্তা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। বাতাসে মাঝে মাঝে বস্তার কোণগুলো উড়ছে; তাছাড়া সামনে, পিছনে, চাবিদিকে শুধু সাদা আর সাদা—কখনও একটু হাল্কা হচ্ছে, আবার পরক্ষণেই ঘন হযে ববফ পড়ছে।

সে ভাবতে লাগল, 'নিকিতার কথা শুনে কী বোকামিই করেছি। এগিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল; কোথাও না কোথাও তো পৌঁছে যেতাম। হয তো গ্রিশ্‌কিনোতেই ফিবে যেতাম; তাহলেও তো তাবাস্-এর বাড়িতে আশ্রয পেতাম। অথচ সারা বাত এখানেই কাটাতে হবে। এতে লাভটা কি হলো? যারা নিজে কাজ করে ঈশ্বর তাদেবই দয়া করেন, ভবঘুরে, বাউণ্ডুলে, বোকাদের নয়। নাঃ, আর একবাব ধূমপানের চেষ্টা করতে হচ্ছে।'

উঠে বসল। সিগারেট বের করল। কোটটা দিয়ে বাতাস আটকাবার জন্য উপুড় হলো। তবু কোথা দিয়ে বাতাস ঢুকে একটার পর একটা দেশলাইয়ের কাঠি নিভিযে দিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত একটা কাঠি জ্বেলে সে ধূমপান করতে শুরু করল। এই সাফল্যে তার মন খুসি হয়ে উঠল। যদিও সিগারেটের ধোঁয়ার যতটা সে নিজে টানল তার চাইতে বেশি টেনে নিল বাতাস, তবু তিনটে সুখ-টান দিতে পেরেই সে খুব খুসি হয়ে উঠল। আবার সোজা হয়ে বসে নিজেকে ভালভাবে ঢেকেঢুকে সে নতুন কবে সব কিছু ভাবতে লাগল। তারপর একসময় হঠাৎ সে চেতনা হারিয়ে ঝিমুতে লাগল।

কিসের যেন ধাক্কা লেগে তার ঘুম ভেঙে গেল। হয তো ব্রাউনি তার বিছানাব তলা থেকে খড় টেনেছিল, না হয় তো তার ভিতরের কোনও গোলমালও হতে পারে; মোট কথা, তার ঘুম ভেঙে গেল—আর তার বুকের ভিতরটা এমনভাবে ধড়াস-ধড়াস করতে লাগল যে মনে হলো বুঝি বা স্লেজটাই কাঁপছে। সে চোখ মেলে তাকাল। চারিদিকে সেই একই দৃশ্য, শুধু একটু আলো বেশি হয়েছে বলে মনে হলো।

ভাবল, 'হয় তো ভোর হয়ে আসছে। এখনই সকাল হবে।'

হঠাৎ তার মনে হয়, এই আলোর অর্থ তো এও হতে পারে যে চাঁদ উঠছে। আবার উঠে সে ঘোড়াটার দিকে তাকাল। বাতাসের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ব্রাউনি থর-থর করে কাঁপছে। পিঠের উপরকার বস্তায় ঘন হয়ে ববফ জমেছে, জিনটা একপাশে ঝুলে পড়েছে, আর বরফ-মাখা ও বাতাসে আন্দোলিত গলা ও কপালের ঘাম আরও স্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে। আর নিকিতা? প্রথম যেভাবে ছিল এখনও সেই একইভাবে আছে; যে এপ্রন দিয়ে সে মাথা ঢেকে দিয়েছে তার উপরে ও পায়ের উপরে ঘন হয়ে বরফ জমেছে।

স্লেজের পিছন দিকে ঝুঁকে তার দিকে তাকিয়ে ভাসিলি ভাবল, 'একজন "মুঝিক" কদাপি বরফে জমে যায় না। না, জামা-কাপড় যতই অল্প থাকুক তবু না। এ ব্যাপাবে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। তথাপি 'মুঝিক'রা বড়ই বোকা—অজ্ঞানতার কাদায় ডুবে আছে।'

একবার মনে হলো, ঘোড়ার পিঠ থেকে বস্তাটা তুলে নিয়ে নিকিতার শবীরটা ঢেকে দেবে। কিন্তু এই ঠাণ্ডায উঠে গিযে সে কাজ কবা বড়ই শক্ত। তাছাড়া, ঘোড়াটা আবার বরফে জমে যেতে পাবে, সে ভযও আছে।

মনে মনে ভাবল, 'কি কবতে যে নিকিতাকে সঙ্গে এনেছিলাম? সেজন্য ওর বোকামিই দায়ী' (স্ত্রীর কথা মনে পড়ল)।

সে ভেবেই চলল, 'আমার খুড়োমশাই এইরকম বরফের মধ্যে একটা রাত কাটিয়েছিল, অথচ তার কোনও ক্ষতি হয়নি।' আর একটা ঘটনা মনে পড়তে সে ভাবল, 'একবার তো সেবাস্তিয়ান-কে বরফ কেটে বের করতে হয়েছিল। সেবাস্তিয়ান অবশ্য মারাই গিয়েছিল, কারণ সে জমে গিযে একেবাবে মরার হাড়ের মত শক্ত হয়ে গিয়েছিল। এর চাইতে আমরা যদি গ্রিশ্‌কিনো-তেই থেকে যেতাম।'

নিজের পা থেকে মাথা পর্যন্ত গরম রাখবার জন্য লোমের কোটটাকে আরও ভালভাবে গায়ে জড়িয়ে ভাসিলি চোখ বুঁজে আবার ঘুমুতে চেষ্টা করল। কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুতেই ঘুম এলো না। আবার সে হিসাব-নিকাশ শুরু করে দিল, বকেয়া ঋণের কথা ভাবতে লাগল। ফলে আরও একবার নিজের বর্তমান অবস্থার জন্য সে নিজেকেই প্রশংসা ও অভিনন্দন জানাতে লাগল।

কিন্তু যত যাই ভাবুক, সবকিছুর শেযেই দেখা দেয় আতংক, দেখা দেয় বিরক্তি—কেন গ্রিশ্‌কিনো-তেই থেকে যায়নি এই কথা ভেবে।

হঠাৎ সে বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'ভাব তো! এই মুহূর্তে গরম বিছানায় কেমন মজা করে শুয়ে থাকতাম।'

একটু ভালভাবে শোবার জন্য, বাতাসের হাত থেকে একটু রেহাই পাবার জন্য বার বার এপাশ-ওপাশ করতে লাগল, কিন্তু প্রতিবারই যেন আগেকার চাইতে অস্বস্তিকর মনে হয়। শেষ পর্যন্ত আবার উঠে বসল, পা দুটোকে পুরোপুরি ঢাকল,

তারপর চোখ বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকতে চেষ্টা করল। তথাপি হয় টপবুটের মধ্যে পা'টা কন্‌কন্‌ করে, নয় তো কোনও ফাঁক-ফোঁকড় দিয়ে বাতাস ঢোকে; যে অবস্থানেই থাকুক, একসময় সক্রোধে তার মনে পড়ে, এই সময়ে গ্রিশ্‌কিনো-তে সে আরামে শুয়ে থাকতে পারত। আবার উঠল, আবার কোটটা জড়াল, আবার নতুন করে শুয়ে পড়ল। একসময় মনে হলো যেন অনেক দূর থেকে মোরগের ডাক ভেসে আসছে; খুসিতে ডগমগ হয়ে সে কোটের কলার নামিয়ে কান পাতল। কিন্তু যতই কান খাড়া করুক, ঝড়ের শোঁ-শোঁ, রুমালের পত্‌-পত্‌ ও বরফের ছর্‌-ছব্‌ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেল না।

আর নিকিতা আগের দিন সন্ধ্যায় যেভাবে শুয়েছিল ঠিক সেইভাবেই শুয়ে আছে। একটি বারও নড়াচড়া করেনি, বা ভাসিলির ডাকাডাকিতে সাড়া দেয়নি, যদিও অনেকবারই সে তাকে ডেকেছে।

স্লেজ-এর পিছন দিকটায় ঝুঁকে বরফে-ঢাকা নিকিতার দিকে তাকিয়ে ভাসিলি বিরক্তির সঙ্গে ভাবল, 'ওব তো দেখছি ঘুমুতে কোনও কষ্টই হচ্ছে না।'

মোট কথা, ভাসিলি অন্ততপক্ষে বিশবার উঠল আর শুয়ে পড়ল। তার মনে হতে লাগল, এ রাতের বুঝি শেষ হবে না।

একবার উঠে চাবিদিক তাকিয়ে সে ভাবল, 'এতক্ষণে নিশ্চয় সকাল হযেছে। একবার ঘড়িটা দেখলে কেমন হয়? কিন্তু না, কোটের বোতাম খুললে ঘড়িটা জমে যেতে পারে। তবু একবার যদি বুঝতে পারতাম সকাল হয়ে আসছে, তাহলে অনেক ভাল হতো, ঘোড়াটাকে জিন পরিয়ে তৈরি করতে পারতাম।'

কিন্তু ভাসিলি মনে মনে ভাল করেই জানে যে, সকাল হতে এখনও দেরি আছে। অবশেষে লোমের কোটটার বোতাম খুলে তাব মধ্যে হাত ঢুকিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে ওয়েস্ট-কোটটা পেয়ে গেল। আবও অনেক কসরৎ কবে এনামেলের ফুল-কাটা রূপোর ঘড়িটা বের করল। তাকিয়ে দেখল একটা আলো ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সিগারেট ধরাবার সময যেমন করেছিল সেইভাবে আবারও কনুই ও পেটের উপর ভর দিযে বসে দেশলাইটা বের করে একটা কাঠি জ্বালাতে চেষ্টা করল। এতক্ষণে এ ব্যাপারে সে বেশ পাকা হয়ে উঠেছে; যে কাঠিতে সবচাইতে বেশি বারুদ আছে সে রকম একটা কাঠি বেছে নিয়ে প্রথম চেষ্টাতেই সেটা ধরিয়ে ফেলল। তখন ঘড়ির ডায়ালটাকে আলোর নিচে ধবে ভাল করে তাকাল। নিজের চোখকেই যে বিশ্বাস করা যায় না। সবে একটা বেজে দশ মিনিট। সাবাটা রাত এখনও বাকি পড়ে আছে!

'উঃ! দীর্ঘ, দীর্ঘ রাত!' ভাসিলি এমনভাবে আর্তনাদ করে উঠল যেন বরফের চাঁই ছুটে এসে তার পিঠের উপর আছড়ে পড়েছে। তারপর আবার কোটের বোতাম লাগিয়ে সেটাকে ভাল করে গায়ে জড়িয়ে স্লেজের এককোণে গিয়ে বসল। যথাসাধ্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎ বাতাসের একঘেয়ে শব্দকে ছাড়িয়ে ভেসে এল একটা নতুন শব্দ—কোনও জীবন্ত প্রাণীর শব্দ। শব্দটা বাড়তে বাড়তে চরমে উঠে আবার ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। একটা নেকড়ে। সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। জানোয়ারটা খুব বেশি দূরেও নয়; চোয়াল দুটোকে এ-পাশ থেকে ও-পাশে নড়াতে তার ডাকের সুরের যে তারতম্য হয় সেটা পর্যন্ত বাতাসে ঢাকা পড়েনি। কানের উপর থেকে কোটের কলারটা সরিয়ে ভাসিলি একাগ্র হয়ে কান পাতল। ব্রাউনিও তাই করছে . সেও হঠাৎ কান দুটো খাড়া করেছে; ডাকটা থামতেই সে পা ঠুকে ঠুকে চিঁ-হিঁ-হিঁ করতে লাগল। ভাসিলি বুঝল, এর পরে আর ঘুমনো অসম্ভব—একমুহূর্তের জন্যও স্নায়ুকে শান্ত রাখাই অসম্ভব। নিজের ব্যবসা ও হিসাবপত্র, সুনাম, মর্যাদা ও টাকা পয়সার কথা যত ভাবতে চেষ্টা করল ততই ভয় তাকে পেয়ে বসল; আর সে সব চিন্তার সঙ্গে মিশে একটি চিন্তাই তার মনের সামনে ভাসতে লাগল—'গ্রিশ্‌কিনোতে কেন রাতটা কাটালাম না?'

আপন মনেই ভাবল, 'ঈশ্বর ওই জমিদার আর তাব জঙ্গল নিয়ে থাকুন; আহা, ওদের কারও জন্যই যদি আমি না আসতাম! তারই ফলে তো এখানে এইভাবে বাত্রিবাস! লোকে বলে, যারা মদ খায় তারা তাড়াতাড়ি জমে যায়। আজ রাতে আমিও তো মদ খেয়েছি।'

নিজের মনের কথা শুনতে শুনতেই সে কাঁপতে শুরু করে দিল—ঠাণ্ডায় না ভয়ে তা কে জানে। আবার ঢেকেঢুকে শুতে চেষ্টা করল, কিন্তু অসম্ভব। একটা সেকেন্ডও চুপ করে থাকতে পারে না : মনের মধ্যে যে আতংক জেগেছে তাকে দূর করবার ব্যর্থ চেষ্টায় সে বার বার ওঠ-বস করতে লাগল। আবার সিগারেট-দেশলাই বের করল; কিন্তু কাঠি আছে মাত্র তিনটি, আর তারও অবস্থা অতি শোচনীয়। বস্তুত, ঠুকতে গিয়ে তিনটে কাঠি জ্বলেই নিভে গেল।

'তোদের শয়তানে পাক, হতভাগা বাজে মাল সব! চলে যা, ফাঁসিতে ঝুলে পড়!' কাকে যে বকছে সেটা না বুঝেই চিৎকার করতে করতে দুমড়ান সিগারেটটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। দেশলাইটাও সেই পথেই যাচ্ছিল, হঠাৎ হাতটা থামিয়ে বাক্সটাকে পকেটে ভরে রাখল। এত বেশি অস্থিরতা তাকে পেয়ে বসল যে এক জায়গায় সে বেশিক্ষণ থাকতে পারছিল না। স্লেজ থেকে লাফিয়ে নেমে বাতাসের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে কোমরের বেল্টটাকে নামিয়ে আবার এঁটে বাঁধতে লাগল।

হঠাৎ একটা নতুন চিন্তা মাথায় আসায় সে চেঁচিয়ে বলল, 'এখানে শুয়ে পড়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে থাকব কেন? ঘোড়ার পিঠে চেপে চলে যাচ্ছি না কেন? পিঠে একজন মাত্র সওয়ার হলে সে আর থামবে না।' এমন সময় নিকিতার কথা মনে হলো। 'আহা, ও মরল তো কি হলো। বেঁচে থেকেই বা ওর লাভটা কি? মৃত্যুতে তার বিশেষ কিছু লোকসান হবে না, কিন্তু বেঁচে থাকলে আমার অনেক লাভ।'

সুতরাং ঘোড়াটাকে খুলে দিয়ে গলায় লাগাম এঁটে সে তার পিঠে চড়তে চেষ্টা করল। কিন্তু লোমের কোট ও বুটের ভারে প্রতিবারেই সে পিছলে নেমে গেল। তখন স্লেজের উপরে উঠে সেখান থেকে ঘোড়ায় চাপতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার ভারে স্লেজটা এতই কাঁপতে লাগল যে সে চেষ্টাও সফল হলো না। অবশেষে তিন বারের বার ঘোড়াটাকে স্লেজের খুব কাছে এনে সাবধানে তার চাকার উপর দাঁড়িয়ে কোনওরকমে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল বটে, কিন্তু তার মুখ রইল নিচের দিকে ঝুলে। সেইভাবেই টানা-হেঁচড়া করতে করতে বেকাবে পা দুটো রেখে ভালভাবে পিঠের উপর বসে পড়ল। কিন্তু ওদিকে ভাসিলির চাপে কেঁপেওঠা স্লেজটার ঝাঁকুনিতে জেগে উঠে নিকিতা ভাসিলিকে কি যেন বলল বলে মনে হলো।

ভাসিলি চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে বোকাবাম, তোমার জন্যই তো এত হেনস্তা—অথচ এর কোনও কারণই ছিল না।' গ্রেটকোটের কোণগুলো হাঁটুব নিচে গুঁজে ঘোড়ার মুখ ঘুবিয়ে সেটাকে সেইদিক পানে ছুটিয়ে দিল যেদিকে তাব মতে বনরক্ষকের বাড়িটা থাকবাব কথা।

৭

এপ্রন দিয়ে শরীবটাকে ঢেকে স্লেজ-এর পিছন দিকটায় শুয়ে পড়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত সে একটি বাবও নড়াচড়া কবেনি। প্রকৃতির কাছাকাছি যারা থাকে এবং তার ফলে দুঃখ-কষ্টেব সঙ্গে যাদেব পরিচয থাকে তাদের মতোই সেও ধৈর্যশীল, এবং অস্থির না হযে বা মন-মেজাজ খারাপ না করে ঘণ্টার পব ঘণ্টা, এমন কি দিনেব পব দিন অপেক্ষা করে থাকতে পারে। মনিব যে তাকে দু'বার ডেকেছে তা সে শুনতে পেয়েছিল কিন্তু নেহাৎই নড়াচড়া করতে চাযনি বা মুখ খুলবার ঝক্কিটা নিতে চায়নি বলেই কোনও জবাব দেয়নি; খানিকটা চা পেটে পড়ায় এবং বরফ-স্রোতের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ মেহনৎ করায় প্রথম যখন সে বসে পড়েছিল তখন তার শরীরটা বেশ গরমই ছিল; কিন্তু সে জানত এ-গরম বেশিক্ষণ থাকবে না, আর সেও এতই শ্রান্ত হয়ে পড়েছে যে নতুন করে পরিশ্রম কবে শরীরটাকে গরম করবার শক্তিও তার হবে না। তার অবস্থা তখন সেই অতিশ্রান্ত ঘোড়াব মত যাকে বার বাব চাবুক কসানো সত্ত্বেও আর চলতে না পেরে থেমে গেছে এবং তার মনিবও বুঝতে পেরেছে যে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিয়ে খাইযে-পবিয়ে না নিলে তার কাছ থেকে আর কোনো কাজই পাওয়া যাবে না। তাছাড়া, ছেঁড়া বুটের ভিতর দিয়ে তার একটা পায়ে বরফ-ক্ষত হয়েছে; ফলে বুড়ো আঙুলটা অসাড় হয়ে পড়েছে এবং সমস্ত শরীর ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ফলে একসময় তার মাথায় এ ভাবনাও দেখা দিল যে আজ রাতেই সে হয় তো মারা যাবে। তথাপি সে চিন্তাটা তার কাছে বিশেষভাবে অবাঞ্ছিত নয়, বা আতংকের কারণ নয়। অবাঞ্ছিত নয় এই কারণে যে, তার এতদিনের জীবন কিছু

একটানা উৎসবের দিন ছিল না; বরং সে জীবনে ছিল সীমাহীন দাসত্ব, আর সে দাসত্বের বোঝা বয়ে বয়ে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এ-চিন্তা তার মনে বিশেষভাবে কোনও আতংকের সৃষ্টি করেনি তার কারণ, ভাসিলি আন্দ্রীচ-এর মতো যে সব মনিবের অধীনে সে এতদিন কাজ করেছে তাদের প্রতি আনুগত্য ছাড়াও সে চিরদিন নির্ভর করেছে সেই মহান মনিবের উপর যিনি তাকে এই জীবন দিয়েছেন; সে জানে মৃত্যু হলেও সে সেই মনিবের ভৃত্যই থাকবে, আর তিনি তাব কল্যাণই করবেন।

সে ভাবল, 'যে জীবন আমি যাপন করছি, যে জীবনে আমি অভ্যস্ত তাকে ছেড়ে যেতে কি আমার দুঃখ হওয়া উচিত? তাছাড়া, যদি যেতেই হয় আমি তো ঠেকিয়ে রাখতে পাবব না; কাজেই নতুন জীবনেব জন্য প্রস্তুত থাকাই তো ভাল।'

'আমাব পাপ?' অতীতের সব কিছু তাব মনে পড়ে গেল—মাতলামির হৈ-হুল্লোড়. মদের পিছনে সর্বস্ব উড়িয়ে দেওযা, স্ত্রীর প্রতি অপমান, যখন-তখন দিব্যি করা, গির্জায় না যাওয়া. উপবাস থেকে বিরত থাকা, এক কথায় স্বীকারোক্তির সময় পুরোহিত যে সব কাজের জন্য তাকে তিরস্কার করেছিল—সে সব কিছু তার মনে পড়ে গেল। 'হ্যাঁ, সে সব নিশ্চয় পাপ; সে কথা আমি কখনও অস্বীকার করিনি; কিন্তু আমি যা হযেছি সে বকম তো ঈশ্বরই আমাকে বানিয়েছেন। তথাপি সে সব কী ভয়ংকর পাপ! এ পাপের জন্য না জানি আমার কি হবে?'

তাবপরেই সে রাতে কপালে কি আছে সে চিন্তা ভুলে গিয়ে তার মন ডুবে গেল স্মৃতিব অতলে। মার্থাব আগমন, মজুবদের মদের আড্ডা, তাদের সঙ্গে বসে মদ খেতে আপত্তি, বর্তমান অভিযান, তারাস-এর কুটিব, পরিবারটা ভেঙে যাওয়ার আলোচনা, ছোট ছেলেটা, ব্রাউনি এবং যে মনিব এতক্ষণ পর্যন্ত নড়তে-চড়তে তার মাথার উপরকার স্লেজটাকে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করছিল—সব তার মনে পড়তে লাগল।

ভাবতে লাগল, 'সেখানে যথেষ্ট চা খেয়েছিলাম, শ্রান্ত হয়েও পড়েছিলাম; সেখান থেকে বেরিয়ে আসার ইচ্ছা আমার ছিল না। অমন আরামের ব্যবস্থা ছেড়ে এসে এই গর্তের মধ্যে মরবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু তার ইচ্ছাটা যে অন্য রকম হলো।'

তারপর এই সব চিন্তা ভাসতে ভাসতে তার মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে গেল; সে ঝিমুতে শুরু করল।

তার এই ঝিমুনি ভাঙল যখন ঘোড়ার পিঠে চাপবার জন্য ভাসিলি স্লেজ-এর উপর চড়াতে সেটা কাঁপতে শুরু কবল। পিঠে স্লেজের ধাক্কা লাগায় নিকিতা পাশ ফিরতে চেষ্টা করল। পায়ের উপর থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলে অনেক কষ্টে পা দুটোকে টান করল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্যথা তার শরীরের ভিতর দিয়ে যেন ছুটে গেল। প্রথম দৃষ্টিতেই ভাসিলির কাণ্ড-কারখানা বুঝতে পেরে সে বস্তাটা ফেলে যেতে অনুরোধ করল, কারণ ঘোড়াটার তো তখন আর বস্তাটার কোনও দরকার নেই, অথচ এই ঠাণ্ডায় ওটা দিয়ে সে নিজেকে আরও একটু ভালভাবে ঢাকা দিতে পারবে।

সেই কথাটাই সে চিৎকার করে ভাসিলিকে বলল, কিন্তু ভাসিলি তার কথায় কান না দিয়ে বরফ-ঝড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে এখন একা। নিকিতা ভাবতে লাগল, এ অবস্থায় তার কি করা উচিত। সে বুঝতে পারল, কোনও লোকালয় খুঁজতে বের হবার মতো যথেষ্ট শক্তি তার নেই, আবার সেই পুরনো জায়গায় থাকাও অসম্ভব কারণ বরফ পড়ে-পড়ে গর্তটা এর মধ্যেই ভরে গেছে। স্লেজের মধ্যে ঢুকলেও লাভ কিছু হবে না, কারণ গায়ে জড়াবার মতো বাড়তি কিছু সঙ্গে নেই, আর 'খালাত' ও লোমের কোটে আর তার গা গরম হচ্ছে না। বুঝি একটিমাত্র শার্ট পরে থাকলেও এর চাইতে বেশি ঠাণ্ডা লাগত না।

পরিস্থিতি বড়ই যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে।

'ছোট্ট বাবা—স্বর্গবাসী হে আমাদের ছোট্ট বাবা!' সে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে উঠল। সে যে একাকি নয়, এমন একজন যে আছেন যিনি তার কথা শুনতে পাচ্ছেন এবং কখনও তাকে পরিত্যাগ করবেন না, এটা বুঝতে পেরে সে অনেক সান্ত্বনা ফিরে পেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এপ্রনটাকে মাথায় জড়িয়ে সে স্লেজটার ভিতবে ঢুকল এবং তার মনিবের জাযগাটায় শুয়ে পড়ল। কিন্তু সেখানেও গরম হতে পারল না। প্রথমে আগাগোড়া কাঁপতে লাগল। তারপব কাঁপুনির ধাক্কাটা কেটে গেলে ধীরে ধীবে সে জ্ঞান হারাল। সে হয় মারা গেল, নয় তো ঘুমিয়ে পড়ল; দুটো অবস্থার জন্যই সে তখন সমান প্রস্তুত।

৮

ইতিমধ্যে যেদিকে বন ও বন-রক্ষকের আস্তানা আছে বলে ভাসিলির ধারণা ঘোড়াটাকে সেইদিকে চালাবার জন্য সে তার গোড়ালি ও চাবুকের হাতল ব্যবহার করছিল। বরফে তার চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, বাতাস অবিরাম গতিরোধ করার চেষ্টা করছে। তবু সব রকম বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সে ঘোড়াটাকে অবিশ্রাম সামনের দিকে ছুটিয়ে চলেছে। ঘোড়াটার চলতে কষ্ট হচ্ছে, তবু তার স্বাভাবিক অনুগত ভঙ্গিতে এগিয়েই চলেছে।

মিনিট পাঁচেক ধরে ভাসিলি সোজা সামনের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল। এর মধ্যে শুধু ঘোড়ার মাথা ও কান এবং সাদার সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই তার চোখে পড়ল না; ঘোড়ার কানের উপব দিয়ে ও তার পশমের কোটের কলার ঘিরে বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতেও পেল না। হঠাৎ তার সামনে কালো মত কি যেন ভেসে উঠল। তার মন আনন্দে নেচে উঠল; যেন ইতিমধ্যেই একটা গ্রামের ঘর-বাড়ির দেয়াল দেখতে পেয়েছে এ রকম মনে করে সেদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। বস্তুটা কিন্তু স্থির হয়ে নেই, ক্রমাগত এ-দিকে ও-দিকে দুলছে। আসলে দেখা গেল সেটা কোনও গ্রামের চিহ্ন নয়, একটা লম্বা সোমরাজ গাছ; একটা পাহাড়ের প্রান্তে

বেড়ে উঠেছে; বাতাসের দাপটে তার ডালপালাগুলিই সবেগে নড়ছে। যা হোক, নিষ্ঠুর বাতাসের আঘাতে আঘাতে আন্দোলিত গাছটাকে দেখে ভাসিলি ভয়ে শিউরে উঠল এবং তাড়াতাড়ি আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিল; সে একবারও ভেবে দেখল না যে গাছটার দিকে যাবার সময় মোড় ঘোরার দরুন সে তার আগের পথ থেকে সরে এসে আর একটা কোণাকুনি পথ ধরে চলেছে। তথাপি সে যে তার কল্পিত বন-রক্ষকের বাড়ির দিকেই চলেছে এ ধারণা তার মন থেকে গেল না; তাই ঘোড়াটা যতবার ডান দিকে মোড় নিতে চাইল ততবারই সে লাগাম টেনে তাকে বাঁ দিকে চালাতে লাগল।

দ্বিতীয় বারের জন্য একটা কালো বস্তু তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। এবারও তার মন আনন্দে ভরে গেল, কাবণ সে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে বসল যে ওটা নির্ঘাৎ একটা গ্রাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে ওটাও সোমরাজ গাছে ঘেরা একটা পাহাড় মাত্র। প্রথম বারের মতোই শুকনো ডালপালার ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ শুনে ভাসিলির ভয় করতে লাগল। যা হোক, ভাল করে লক্ষ্য করে দেখল সেখানে বরফের উপর অস্পষ্ট ছোট ক্ষুরের দাগ রয়েছে। তার মধ্যে সবেমাত্র একটু একটু করে বরফ জমতে শুরু করেছে। আসল কথা, ওটা তার নিজের ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ! তার অর্থ, সে একই পথে একটা ছোটখাট চক্কর মেরে এসেছে।

সে ভাবল, 'দেখছি এই ভাবে ঘুরে ঘুরেই মরতে হবে।' তারপর পাছে ঐ ভয় তাকে পেয়ে বসে তাই সে আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। ছুটন্ত সাদা বরফের ভিতর দিয়ে তাকাতেই কালো কালো বিন্দু চোখে ধরা দিয়েই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। একবার মনে হলো এমন একটা শব্দ যেন সে শুনতে পেল যেটা কুকুরের ডাক অথবা নেকড়ের গর্জন হতে পারে; কিন্তু শব্দটা এতই ক্ষীণ ও অনিশ্চিত যে সত্যি সত্যি সে কোনও শব্দ শুনতে পেয়েছে না ওটা তার কল্পনামাত্র সে বিষয়েও সে নিশ্চিত হতে পারল না। একটু থেমে সে ভালভাবে কান পাতল।

হঠাৎ একটা গা-শির্‌-শির্‌-করা চমকে-দেওয়া আওয়াজ যেন তার একেবারে কানের কাছেই ফেটে পড়ল; তার পায়ের নিচে সব কিছু যেন দুলে দুলে কেঁপে উঠল। ঘোড়ার লোম সজোরে আঁকড়ে ধরেও সে কাঁপতে লাগল, আর সেই আওয়াজটা ক্রমেই তীক্ষ্ণতর হতে লাগল। কয়েক সেকেন্ড ভাসিলি ভাবতেও পারল না বা বুঝতেও পারল না যে কি ঘটছে। অথচ ঘটনাটা আসলে বিশেষ কিছুই নয়; হয় নিজের উৎসাহ বাড়াবার জন্য, আর না হয় তো সাহায্যের কথা জানাবার জন্য তার নিজের ঘোড়াটাই কর্কশ, নাকি সুরে চিঁহিঁ-হিঁ রবে ডেকে উঠেছিল।

ভাসিলি তখন ঢোক গিলে বলে উঠল, 'জানোয়ারটা আমাকে কী রকম ভয় পাইয়ে দিয়েছিল! তোর মরণ হোক!' কিন্তু ভয়ের কারণটা জানা সত্ত্বেও ভয় কিন্তু তার মন থেকে গেল না।

'সব কিছু ভেবেচিন্তে নিজেকে সংযত করতে হবে।' সে এরকমটা ভাবল বটে, কিন্তু তাতে কোনও কাজ হলো না; সে নিজের উপর কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনতে পারল না—ঘোড়াটাকে সেই একই ভাবে সামনে ছুটিয়ে নিয়ে চলল; অথচ একটি বারও খেয়াল করল না যে বাতাসের উল্টো দিকের পরিবর্তে সে বাতাসের দিকেই চলেছে। সারা শরীর, বিশেষ করে নিচের অংশটা, ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে ব্যথা করছে, কারণ সেখানকার কোটের বোতামগুলো খুলে গেছে। তার হাত-পাও প্রচণ্ডভাবে কাঁপছে। নিঃশ্বাস আটকে যাচ্ছে। সে নিশ্চিত বুঝতে পারল এই ভয়ংকর জনহীন বরফেব রাজ্যেই তাকে মরতে হবে; কোনও কিছুই তাকে বাঁচাতে পারবে না।

হঠাৎ ঘোড়াটা আর্তনাদ করে উঠল; একটা বরফ-স্রোতের মধ্যে তার পা আটকে গেছে; যত তার ভিতর থেকে উঠবার চেষ্টা করছে ততই কাত হয়ে ডুবে যাচ্ছে। গতিক ভাল নয় বুঝে ভাসিলি ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিল, আব সেই সঙ্গে ঘোড়াব রেকাব ও জিন স্থানচ্যুত হলো। কিন্তু ভাসিলি পিঠ থেকে নামামাত্রই ঘোড়াটা সোজা হয়ে দাঁড়াল, সামনে ঝুঁকে বাব দুই পা ছুঁড়ল, আর তাবপবই সজোবে হ্রেষাবব কবতে করতে ছুট দিল। ভাসিলি একা পড়ে রইল সেই ববফ-স্রোতের মধ্যে। ঘোড়াটাকে ধববার জন্য সেও ছুটল, কিন্তু বরফ এত গভীর আব তাব পশমের কোটটা এত ভারি যে প্রতিটি পদক্ষেপেই তার হাঁটু পর্যন্ত বরফে ডুবে যেতে লাগল বিশ পা চলতে না চলতেই তাব দম ফুরিয়ে গেল; সে থেমে গেল।

তার ভাবনা হলো—'কাঠ, কসাইদের খাসি, ভেড়া, ভাড়াটে জমি, দোকান, শুঁড়িখানা, লোহার ছাদওয়ালা বাড়ি ও গুদাম, আমার ছোট বংশধর—সবাইকে কি ছেড়ে যেতে হবে? এই কি পবিণাম? না, না, তা হতে পারে না!'

কিন্তু বরফ তার মুখে চাবুকের মতো এসে লাগছে, বুঝি, তাকে উল্টেই দেবে; ডান হাতের দস্তানাটা হারিয়ে যাওযায় সেটাও ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে। এই জনহীন মরুভূমিতে সে একা—ঐ সোমরাজ গাছটার মতোই নিঃসঙ্গ—আর এখানেই তাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে দ্রুত সমাসন্ন এক অচিন্ত্যনীয় মৃত্যুর জন্য।

'হে স্বর্গেব বানি! হে পবিত্র পিতা সেন্ট নিকোলাস! তুমি তো আমাদেব সংযম শিক্ষা দিয়েছ।' গতকালেব ধন্যবাদজ্ঞাপক অনুষ্ঠানের কথা, সুবর্ণ বেদীতে প্রতিষ্ঠিত কালো-মুখ পবিত্র মূর্তির কথা, আর সেই সব মূর্তির সামনে প্রজ্জ্বলিত মোমবাতির কথা অস্পষ্টভাবে মনে আসায় সে কথাগুলি বলল। অথচ এই সব মোমবাতি সেই বিক্রি করেছিল, আবার সোজা তার কাছেই ফিরে এসেছিল, এবং সেও একটুক্ষণের জন্য জ্বালিয়ে সেগুলোকে সিন্দুকে তুলে রেখেছিল। অঘটন-ঘটন-পটীয়ান সেন্ট নিকোলাসের কাছে বার বার সে মিনতি জানাল এই পরিণামের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে; বিনিময়ে আর একটি ধন্যবাদজ্ঞাপক অনুষ্ঠান করবার ও অনেক মোমবাতি দেবার প্রতিশ্রুতি সে দিল। অথচ সারাক্ষণ সন্দেহাতীতভাবেই সে জানত যে ঐ

কালো মুখ ও স্বর্ণবেদী, ঐ মোমবাতি, পুরোহিত ও ধন্যবাদজ্ঞাপক অনুষ্ঠান ঐ গির্জার মধ্যে যতই গুরুতর ও প্রয়োজনীয় ব্যাপারই হোক না কেন, এখানে তারা কোনও কাজেই লাগবে না; একদিকে ঐ মোমবাতি ও ধন্যবাদজ্ঞাপন আর অন্যদিকে তার এই সর্বজনপরিত্যক্ত অবস্থা—এই দুইয়ের মধ্যে সত্যিকারের কোনও যোগসূত্র নেই।

সে ভাবল, 'তবু আমি আশা ছাড়ব না। বরফে ঢেকে যাবার আগেই ঘোড়ার পায়ের দাগ অনুসরণ করে আমাকে এগোতেই হবে। তাহলেই কোথাও না কোথাও পৌছে যাব। শুধু তাড়াহুড়া করা চলবে না। নইলে হয়তো আর একটা বরফস্রোতে পড়ে আরও নাস্তানাবুদ হব।'

তথাপি ধীরেসুস্থে চলবার সংকল্প করলেও আসলে বেশ দ্রুতগতিতেই চলতে লাগল। ক্রমে দৌড়তে শুরু করল; বার বার আছাড় খেলেও আবার উঠে ছুটতে লাগল; আবার পড়ে গেল। তার উপর যেখানেই বরফ অপেক্ষাকৃত কম ঘন হয়ে পড়েছে সেখানেই ঘোড়ার পায়ের দাগ দেখা যাচ্ছে না।

অবশেষে সে বলে উঠল, 'আমার হয়ে গেল! আমি মোটেই ঘোড়ার পায়ের দাগ দেখে চলছি না; ক্রমেই আমি হারিয়ে যাচ্ছি।'

এই কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গেই সামনে চোখ পড়তেই সে একটা কালো বস্তু দেখতে পেল। সেটা ব্রাউনি। শুধু ব্রাউনিই নয়, সেই শকট-দণ্ড ও তার মাথার সেই রুমালটাও! ঘোড়াটা স্লেজের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে—ঠিক শকট-দণ্ডটার নিচেই। মনে হচ্ছে, যে গিরি-খাদের মধ্যে নিকিতা ও সে আগে পড়ে গিয়েছিল সেই একই খাদেই ভাসিলিও পড়ে গিয়েছিল—আসলে ঘোড়াটা তাকে স্লেজের দিকেই ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, আর যে মুহূর্তে সে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়েছিল তখন এই জায়গা থেকে সে মাত্র পঞ্চাশ পা দূরে ছিল।

৯

টল্‌তে টল্‌তে ভাসিলি স্লেজটার কাছে এগিয়ে গেল; নিজেকে ধাতস্থ করবার ও দম নেবার জন্য স্লেজটাকে চেপে ধরে অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। নিকিতাকে তার আগের জায়গায় দেখতে পাওয়া গেল না, কিন্তু স্লেজের মধ্যে বরফের ঢাকা অবস্থায় কি যেন পড়ে আছে; ভাসিলি অনুমান করল সেটাই তার চাকর। ভাসিলির মন থেকে ভয় চলে গেছে—বা কিছুটা থাকলেও সে ভয়টা হলো পাছে আবার ঘোড়ার পিঠে চড়ার অভিজ্ঞতা, অথবা তার চাইতেও বেশি, বরফ-স্রোতের মধ্যে একাকি পরিত্যক্ত হবার অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। আর যাই হোক, সে আতংককে সে আর কিছুতেই আমল দেবে না, আর সেটা করতে হলে তাকে উদ্যমশীল হতে হবে—চিন্তাটাকে কোনও কিছুতে লাগাতে হবে। প্রথমেই সে বাতাসের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে একটু ঠাণ্ডা করবার জন্য লোমের কোটটা

খুলে ফেলল। তারপর কিছুটা দম নিয়ে জুতো থেকে ও বাঁ হাতের দস্তানা থেকে বরফের কুঁচিগুলো ঝেড়ে ফেলল (অন্য দস্তানাটা বেমালুম হারিয়ে গেছে, এবং হয় তো কোথাও ইঞ্চি দুই বরফের নিচে চাপা পড়ে আছে) এবং বেল্টটাকে কসে বাঁধল—ঠিক যে রকমটা সে করে থাকে 'মুঝিক'রা গাড়ি-বোঝাই শস্য নিয়ে এলে সেগুলো কিনবার জন্য দোকান থেকে বেরিয়ে আসার সময়। তারপরেই সে কাজে লেগে গেল। প্রথমে ঘোড়াটাকে ঠিকমতো বেঁধে সে স্লেজটাতে হাত লাগাল। তখন তার চোখে পড়ল, স্লেজের মধ্যে কি যেন নড়াচাড়া করছে, আর বরফের ভিতর থেকে নিকিতার মাথাটা বেরিয়ে আসছে। ঠাণ্ডায় জমে-যাওয়া লোকটা অনেক কষ্টে একটুখানি উঠে মুখের সামনে হাত নিয়ে এমন অদ্ভুত একটা ভঙ্গী করল যেন মাছি তাড়াচ্ছে। ভাসিলির মনে হলো, সে বুঝি তাকে কিছু বলতে চাইছে। তাই তার কাছে এগিয়ে গিয়ে ভাসিলি জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কেমন আছ? আর কি বলতে চাইছ?'

হাঁপাতে হাঁপাতে নিকিতা জবাব দিল, 'শুধু বলতে চাইছি যে আমি—আমি মরতে বসেছি। আমার পাওনা বেতন ছেলে বা স্ত্রী যাকে ইচ্ছা হয় দিয়ে দেবেন।'

ভাসিলি বলল, 'তুমি কি জমে গেছ?'

'হ্যাঁ—মরতেও বসেছি।' মাছি তাড়াবার ভঙ্গীতে মুখেব সামনে হাতটা নাডতে নাড়তে ধরা গলায় নিকিতা বলল, 'এ কথা আমি ভালই বুঝতে পারছি। খৃস্টেব দোহাই, আমাকে ক্ষমা করবেন।'

নিঃশব্দে, নিশ্চলভাবে ভাসিলি দাঁড়িয়ে রইল। তারপরই হঠাৎ কোনও ব্যবসায়িক লেনদেনের সময় যেরকম স্থির সংকল্পেব সঙ্গে সে হাতে হাত চেপে ধরে ঠিক তেমনি স্থির সংকল্পে সে এক পা পিছিয়ে গেল, কোটের আস্তিন গুটিয়ে নিল এবং দুই হাতে নিকিতার শবীরের উপর থেকে এবং স্লেজের ভিতর থেকে সব রকম বরফ তুলে ফেলতে লাগল তারপর বেল্টটা খুলে লোমের কোটটাও গা থেকে খুলে ফেলল এবং নিকিতার উপর এমনভাবে শুয়ে পড়ল যাতে শুধু কোট দিয়ে নয়, নিজের শরীরেব উত্তাপ দিয়েও নিকিতাকে ঢেকে দেওয়া যায়। বেশ কিছু সময় কেটে গেল। নিকিতাও নিশ্চল হয়ে রইল। তারপর একসময় একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ঈষৎ নড়ে উঠল।

ভাসিলি বলল, 'দেখলে তো, তুমি ঠিক তাজা আছ আর বার বার বলছিলে কিনা মরতে বসেছি। চুপচাপ শুয়ে থাক, গরম হয়ে নাও; আমরা—'

সবিস্ময়ে ভাসিলি অনুভব করল যে তার মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না, কারণ তাব দুই চোখে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে, নিচের চোয়াল কাঁপছে। হঠাৎ থেমে গিযে সে একটা ঢোক গিলল।

ভাবল, 'কী বাজে-বাজে দুর্বল হয়ে পড়েছি।' কিন্তু এ দুর্বলতা তার কাছে অপ্রীতিকর তো মনে হলোই না, বরং যে আনন্দের স্বাদ সে আজ পেল তেমনটি আর কোনওদিন পায়নি।

গভীর আবেগের বসে সে নিজের মনেই বলল, 'হ্যাঁ, এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।' অনেকক্ষণ সে চুপচাপ শুয়ে রইল। মাঝে মাঝেই কোটের কোণে চোখ মুছতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তার মনে হলো, মনের এই আনন্দের কথা অপরকেও জানাতে হবে।

'নিকিতা,' সে ডাকল।

'ভাল আছি। বেশ গরম বোধ হচ্ছে।' তার নিচ থেকে কথা ভেসে এল।

'নিকিতা, পুরনো বন্ধু আমার, ভেবেছিলাম আমরা শেষ হয়ে গেলাম। তুমি বরফে জমে গেছ, আর আমি—'

আবার ভাসিলির গলা কাঁপতে লাগল, চোখ জলে ভরে এল, কথা শেষ করতে পারল না।

'না, না, এতে কোনও লাভ নেই', নিজের মনেই বলল। 'তবু আমি যা জানি তা তো জানিই।' সে চুপ করে রইল। তেমনই শুয়ে রইল। উপরে লোমেব কোট, আর নিচে নিকিতাব শরীর—দুইয়েরই গরম সে অনুভব করতে লাগল। তবু এই মুহূর্তে নিজের হাত-পায়ের কথা সে মোটেই ভাবছে না। তার একমাত্র ভাবনা কেমন করে নিচে শুয়ে থাকা চাষীটিকে আরও একটু গরমে রাখা যায়।

একাধিকবার ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে সে দেখতে পেল সেটার পিঠও খোলা পড়ে আছে, কারণ বস্তাটা পিছলে নিচেব বরফের উপর পড়ে আছে। একবাব ভাবল, উঠে গিয়ে বস্তাটাকে আবার ঘোড়াটার পিঠে চাপিয়ে দিয়ে আসবে, কিন্তু পাছে এই আনন্দের রেশটা কেটে যায় তাই মুহূর্তের জন্যও সে নিকিতাকে ছেড়ে উঠতে পারল না। আর আতংক? মনের সে ভাব বহুক্ষণ মিলিয়ে গেছে।

'ঈশ্বরের দোহাই, এবার আমি পরাজয় মানব না!' নিকিতাকে গরম রাখবার প্রচেষ্টার কথা মনে করেই সে কথাগুলি বলল—যে গর্বের সঙ্গে সে কেনা-বেচার কথা বলতে অভ্যস্ত, এখন তার কথায় সে গর্বের আভাষ।

সেই একইভাবে সে শুয়ে থাকল এক ঘণ্টা—দু' ঘণ্টা—তিন ঘণ্টা; সময়ের কোনও খেয়ালই তার নেই। তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল নানা অস্পষ্ট ছবি। প্রথমে ঝড়, শকট-দণ্ড ও ঘোড়ার ছবি। তারপব উৎসব, তার স্ত্রী, 'স্তানোভয়' ও মোমবাতির বাক্স—সেই বাক্সের নিচে শুয়ে আছে নিকিতা। তারপরই সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। একটার সঙ্গে আর একটা মিশে একাকার হয়ে গেল—ঠিক যেভাবে রামধনুর সবগুলো রং মিশে একটা উজ্জ্বল সাদা আলো হয়ে ফুটে ওঠে। তারপরই সে ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্নহীন ঘুমে অনেক সময় কেটে গেল; ভোরের সঙ্গে সঙ্গেই আবার কিছু কিছু স্বপ্ন-দৃশ্য ভেসে এল। সে যেন মোমবাতির বাক্সের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, আর বুড়ি মা তিখোনোভা তার কাছে একটা পাঁচ কোপেক দামের মোমবাতি চাইছে। মোমবাতিটা বের করে তাকে দেবার ইচ্ছা তার হলো, কিন্তু তার হাত দুটো যেন আঁঠা দিয়ে পকেটের মধ্যে সেঁটে দেওয়া রয়েছে। সে বাক্সটার চারিদিকে

হাঁটতে চেষ্টা করল, কিন্তু পা দুটো নড়ল না, আর তার পরিষ্কার নতুন জুতোজোড়া পাথরের মেঝেতে এমনভাবে আটকে গেল যে জুতো খুলবার জন্য সে পা-ই তুলতে পারল না।

সহসা দেখা গেল সে বাক্সটা আর বাক্স নেই। একটা বিছানা হয়ে গেছে, আর সেই বিছানায় ভাসিলি উপুড় হয়ে শুয়ে আছে—ঠিক যেন বাড়িতে তার নিজের বিছানায়ই শুয়ে আছে। সে বিছানায় শুয়ে আছে, অথচ উঠতে পারছে না, যদিও ওঠা দরকার, কারণ 'স্তানোভয়' আইভান মাৎভীচ এখনই তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, আর সেও তার সঙ্গে বেরিয়ে যাবে হয় কিছু কাঠ কিনতে, আর না হয় তো ঘোড়ার পিঠে জিনটা পরাতে—ঠিক যে কোন্‌টা তা সেও জানে না। সে অনবরত স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কবছে, 'তিনি কি এখনও আসেননি মিখলভ্‌না?' আর তার স্ত্রীও বার বার জবাব দিচ্ছে, 'না, এখনও আসেননি।' এমন সময় সে শুনতে পেল কে যেন গাড়ি হাঁকিয়ে বাইরের সিঁড়ির কাছে এল। নিশ্চয় তিনি? কিন্তু না—গাড়িটা বাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেল। 'তিনি কি এখনও আসেননি মিখলভ্‌না?' সে আবাব জিজ্ঞাসা কবল এবং তার স্ত্রী আবার জবাব দিল, 'না, এখনও আসেননি।' তারপর সে বিছানায় শুয়ে আছে তো শুয়েই আছে; উঠতেও পারছে না; অপেক্ষা করেই আছে—শুধুই অপেক্ষা : সে অপেক্ষা যুগপৎ বেদনা ও আনন্দদায়ক। হঠাৎ আনন্দটাই পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। যার আসার অপেক্ষায় সে ছিল সেই এসে হাজির; কিন্তু সে তো আইভান মাৎভীচ্ নয়, বা অন্য কেউ নয়। অথচ এই সেই 'মানুষ' যার জন্য সে অপেক্ষা করে ছিল। সে এল—সেই 'মানুষ' এল—তাকে ডাকল : যে 'মানুষ' তাকে ডাকল সে এবার চিৎকার করে তাকে বলল·নিকিতার দেহের উপর শুয়ে পড়তে। আর 'সেই মানুষটি' আসায় ভাসিলিও খুসি হলো। 'হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি!' আনন্দে ভাসিলি চিৎকার করে বলল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম ভেঙে গেল।

হ্যাঁ, সে জেগে উঠল—কিন্তু যখন জেগে উঠল তখন সে যে মানুষ ঘুমিয়েছিল তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মানুষ। উঠতে চেষ্টা করল, পারল না। হাত নাড়াতে চেষ্টা করল, পারল না। পা নাড়াতে চেষ্টা করল, পারল না। তখন মাথাটা নাড়াতে চেষ্টা করল, কিন্তু তাও পারল না। সে অবাক হলো, কিন্তু বিচলিত হলো না। তখন তার মনে পড়ল, তার নিচে শুয়ে আছে নিকিতা; আর নিকিতা ক্রমেই গরম হয়ে উঠছে, জীবন ফিরে পাচ্ছে। তার মনে হলো যেন সেই নিকিতা, আর নিকিতা সে, আর তার জীবন এখন আর তার মধ্যে নেই, নিকিতার মধ্যে চলে গেছে। কান খাড়া করে সে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল—হ্যাঁ, নিকিতার অস্পষ্ট, গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস। বিজয়োল্লাসে সে নিজেকেই চেঁচিয়ে বলল, 'নিকিতা বেঁচে আছে, সুতরাং আমিও বেঁচে আছি!'

তারপর সে ভাবতে লাগল তার টাকা-পয়সা, দোকান, বাড়ি-ঘর, বেচা-কেনা ও

মিরনফ্-এর লাখ টাকার কথা। লোকে যাকে ভাসিলি ব্রেখুনফ্ বলে ডাকে সে লোকটাও যাতে তার আকর্ষণ সেই সব বিষয়ের প্রতিই কি ভাবে আকৃষ্ট হয় সেটা সে বুঝতে পারে না। এই ভাসিলি ব্রেখুনফ্ সম্পর্কে তার চিন্তা হলো : 'পৃথিবীতে সব চাইতে সৎ বস্তু কি তাই সে লোকটি জানে না। আমি যা জেনেছি তা সে কোনওদিনই জানতে পারবে না। হ্যাঁ, এখন আমি সেটা নিশ্চিতভাবে জেনেছি। শেষ পর্যন্ত—আমি জেনেছি!'

এর আগে যে 'মানুষটি' তাকে ডেকেছিল তারই ডাক সে আবার শুনতে পেল, আর তার সমগ্র সত্তা যেন আনন্দে ও সহমর্মিতায় সাড়া দিয়ে জবাব দিল : 'আমি আসছি, আমি আসছি!' কারণ সে বুঝতে পারছে যে এতদিনে সে মুক্তি পেয়েছে; কিছুই আর তাকে ধরে রাখতে পারবে না।

আর প্রকৃতপক্ষেও ভাসিলি আন্দ্রীচ এই পৃথিবীতে এর চাইতে বেশি কিছু আর কোনও দিন দেখল না, শুনল না, বা অনুভবও করল না।

আর প্রকৃতপক্ষেও ভাসিলি আন্দ্রীচ এই পৃথিবীতে এর চাইতে বেশি কিছু আর কোনওদিন দেখল না, শুনল না, বা অনুভবও করল না।

তাকে ঘিরে তখনও ঝড় বয়ে চলেছে। সেই একই বরফের কুঁচি ঘূর্ণিপাক খেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে মৃত ভাসিলি আন্দ্রীচ-এর কোট, কম্পমান ব্রাউনি ও স্লেজগাড়ি (এখন প্রায় অদৃশ্য)-টাকে ঢেকে দিতে লাগল; আব স্লেজগাড়ির মেঝেতে মৃত মনিবের দেহেব নিচে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা নিকিতার উপর ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

১০

কিন্তু সকালের আগেই নিকিতা জাগল। পিঠে ঠাণ্ডা লাগায় তাব ঘুম ভেঙে গেল। এইমাত্র সে স্বপ্ন দেখছিল, মনিবের এক গাড়ি ময়দা নিয়ে সে কল থেকে যাত্রা করেছে; কিন্তু নদীর উপরকার সেতুর উপর না উঠে সে নিচের খাত ধরে যেতে গিয়ে তার মধ্যে আটকে পড়েছে। সে দেখতে পেল, গমের নিচে চাপা পড়ে বস্তাটা ঠেলে তুলবার জন্য সে পিঠটা সোজা করছে। অথচ, কী আশ্চর্য, বোঝাটা মোটেই নড়ছে না, সব সময় তার পিঠের উপরেই চেপে আছে; ফলে সে গাড়িটাও চালাতে পারছে না, আবার তার নিচ থেকে বেরুতেও পারছে না। মনে হচ্ছে তার কোমরটাই বুঝি ভেঙে যাবে। আর কী ঠাণ্ডা! যেমন করেই হোক এখান থেকে বেরুতেই হবে। যার জন্য বোঝার চাপে তার পিঠটা ভেঙে যেতে বসেছে তাকে যেন সে বলে উঠল, 'ধরে থাক। কিছু বস্তা সরিয়ে নাও!' তবু বোঝাটা ক্রমেই বেশি করে ঠাণ্ডা হতে লাগল, আর ক্রমেই আরও ভারী হয়ে তার পিঠের উপর চেপে বসল। তারপর হঠাৎ কিসের সশব্দে একটা ধাক্কা দিল, আর সেও অমনি সম্পূর্ণ জেগে উঠল; সব ঘটনাই তার মনে পড়ে গেল। সেই ঠাণ্ডা বোঝাটা—সেটাই তার ঠাণ্ডায় জমে-যাওয়া মৃত

মনিব। আর সেই সশব্দ ধাক্কা—ব্রাউনি তার ক্ষুর দিয়ে স্লেজটাকে আঘাত করাতেই সেটা ঘটেছিল।

'আন্দ্রীচ্, আন্দ্রীচ্!' সাবধানে সে তার মনিবকে ডাকল (যদিও আসল ব্যাপারটা সে অর্ধেক বুঝে ফেলেছে)। কিন্তু আন্দ্রীচ্ জবাব দিল না। তার দেহ ও পা দুটো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে বোঝার মত শক্ত ও ভারী।

'কোনও সন্দেহ নেই যে তিনি মারা গেছেন,' নিকিতা ভাবল। সে মাথাটা ঘোরাল, মুখের উপব থেকে বরফ সরিয়ে দিল, তারপর চোখ মেলল। এখন বেশ আলো ফুটেছে। বাতাস এখনও বইছে, বরফ পড়ছে, কিন্তু তফাৎ এই যে এখন আর স্লেজের গায়ে বরফের ঝাপটা লাগছে না, নিঃশব্দে ঝরে পড়ছে স্লেজ ও ঘোড়াটার উপর। ঘোড়াটার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে না।

নিকিতা ভাবল, 'ব্রাউনিও তাহলে জমে গেছে।' আসলে স্লেজটার উপর সশব্দে যে দুটো ক্ষুরের আঘাত পড়ে তাকে ঘুম থেকে জাগিয়েছিল সেটাই ছিল জন্তুটিব দুই পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকবার শেষ প্রচেষ্টা; এখন সে মৃত, বরফে জমে পড়ে আছে।

নিকিতা বলল, 'হে ঈশ্বর, হে আমাদের ছোট্ট পিতা, তুমি কি আমাকেও নেবে? তাই যদি হয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমাদের দু'জন চলে যাবে, আর একজন পড়ে থাকবে, সে যে বড়ই নিষ্ঠুরতা। যথাসময়েই মৃত্যু আসুক।' আবার হাত দুটো টেনে নিয়ে চোখ বুজে সে ঘুমিয়ে পড়ল; তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এবার সেও সত্যি সত্যিই মারা গেল।

পরদিন দুপুরে রাস্তা থেকে মাত্র সত্তর গজ দূরে আর গ্রাম থেকে আধা ভার্স্ট দূরে কয়েকজন 'মুঝিক' বরফ কেটে ভাসিলি ও নিকিতাকে বের করল।

বরফে স্লেজ-গাড়ি ও শকট-দণ্ডটা সম্পূর্ণ ঢেকে গিয়েছিল, শুধু রুমালটা তখনও দেখা যাচ্ছিল। তলপেট সমান উঁচু বরফের মধ্যে একটা জমাট সাদা বস্তুর মত ব্রাউনি দাঁড়িয়েছিল; তার নাক ও চিবুক শক্ত ঘাড়ের মধ্যে গোঁজা, নাকের চারিদিকে বরফের কুঁচি, চোখ দুটো বরফে ও জমাট চোখের জলে ঢাকা পড়ে চক্‌চক্ করছে। তার উপর ঐ একটি রাতে সে এতই শুকিয়ে গেছে যে শুধু চামড়া ও হাড় ক'খানাই অবশিষ্ট রয়েছে। আর ভাসিলিও একটা মৃতদেহের মত শক্ত হয়ে গেছে। তার পা দুটো ধরে যখন টান দেওয়া হলো তখন মৃতদেহটা একটা জমাট বস্তুর মতো নিকিতার উপর থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল। তার বাজপাখির মতো ভাসা-ভাসা দুটি চোখ জমে শক্ত হয়ে গেছে। ছাঁটা গোঁফের নিচে ঈষৎ হাঁ-করা মুখটা বরফে ভর্তি। সর্বাঙ্গে বরফক্ষত নিয়েও একমাত্র নিকিতাই বেঁচে ছিল। তথাপি সম্বিৎ ফিরে পাবার পরেও তাকে কিছুতেই বোঝান গেল না যে সে মারা যায়নি, এবং এখন যা কিছু ঘটেছে সেটা এই জগতের পরিবর্তে পরলোকে ঘটছে না। বস্তুত, 'মুঝিক'রা যখন বরফ কেটে স্লেজটাকে বের করল, ভাসিলির শক্ত দেহটাকে গড়িয়ে নামিয়ে দিল, তখন তাদের

চেঁচামেচি শুনে সবিস্ময়ে সে প্রথমেই মনে করেছিল যে 'মুঝিক'রা এই জগতের মতই পরলোকে চিৎকার করছে এবং সশরীরে বিরাজ করছে! শেষ পর্যন্ত যখন সে বুঝতে পারল যে সত্যি সে বেঁচে আছে—এই জগতেই বেঁচে আছে—তখন সে খুসি না হয়ে বিরক্ত হলো, বিশেষ করে যখন সে বুঝতে পারল যে তার দুই হাতের আঙুলই বরফের জন্য অসাড় হয়ে গেছে।

প্রায় দু'মাস সে হাসপাতালে পড়ে রইল। তার তিনটে আঙুল কেটে বাদ দেওয়া হলো, কিন্তু বাকি ঘাগুলো সেরে গেল। ফলে সে আবার কাজে ফিরে যেতে পারল এবং আরও বিশ বছর বেঁচে রইল—প্রথমে কাজ করল মজুরের কাজ, আর পরে বৃদ্ধ বয়সে পাহাড়াওলাব কাজ। বস্তুত, সবে এই বছরেই সে মারা গেছে—নিজের বাড়িতে, দেবমূর্তির পাদদেশে; তার ইচ্ছামতোই তাব দুই হাতে ছিল জ্বলন্ত মোমবাতি। মৃত্যুব আগে সে তার বৃদ্ধা স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিল। আর মিস্ত্রির ব্যাপারেও তাকে ক্ষমা কবল। ছেলে ও নাতি-নাতনিদের কাছ থেকেও সে বিদায় নিল এবং এই ভেবে পরিপূর্ণ সুখে মারা গেল যে তাব মৃত্যুতে একটি অকেজো মানুষকে পরিত্যাগ করে সেই অন্য জীবনে চলে যাবে যার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা, যার প্রতি তার আকর্ষণ প্রতিটি বছব, প্রতিটি ঘণ্টায় ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। সেদিন মৃত্যু যখন সত্যি সত্যি এল তখন মৃত্যুর পরে যে জগতে সে নতুন করে জাগল সেখানে সে কি এখানকাব চাইতে ভাল আছে, না মন্দ? তার কি স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে, না কি যা আশা করেছিল সত্যি তা পেয়েছে? অচিবেই আমবা সকলেই তা জানতে পারব।

॥ সমাপ্ত ॥

অনুবাদকের কথা

অনুরাগী পাঠকের দৃষ্টিতে লেভ্ তলস্তয়ের দুটি ভাব-মূর্তি স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল। রুশ সাহিত্য তথা বিশ্বসাহিত্য-অরণ্যের তিনি এক বিরাট-বনস্পতি; আবার আর্ত ও পীড়িত মানবতার সেবায় তিনি আজীবন নিবেদিত প্রাণ ঋষি। মানব-কল্যাণের প্রেরণায় বার বার তিনি সাহিত্য-রচনার আকর্ষণকে দূরে সরিয়ে ঝাঁপ দিয়েছেন সংগ্রামের কুরুক্ষেত্রে। তাঁর সংগ্রাম-আকর্ষণকে দূরে সরিয়ে ঝাঁপ দিয়েছেন সংগ্রামের কুরুক্ষেত্রে। তাঁর সংগ্রাম-বিক্ষুব্ধ বিচিত্র জীবনে মসি ও অসি এক হয়ে মিলেছে। তাই আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি, এপিকধর্মী বৃহদায়তন উপন্যাস রচনা করে অসাধারণ জনপ্রিয়তা ও সাফল্য অর্জন করা সত্ত্বেও মানব-সেবার অক্ষয় 'পঞ্চবাণ' হিসাবে বার বার তিনি ফিরে এসেছেন ছোট গল্প রচনার ক্ষেত্রে। What is Art গ্রন্থে তিনি নিজেই লিখেছেন : The artist of the future will understand that to compose a fairy tale, a little song which will touch, a lullaby or a riddle which will entertain, a jest which will amuse, or to draw a sketch which will delight dozens of generations or millions of children and adults, is incomparably more important and more fruitful than to compose a novel, or a symphony, or paint a picture, of the kind which diverts some members of the wealthy classes for a short time and is then forever forgotten. The region of this art of the simplest feelings accessible to all is enormous, and it is as yet almost untouched.

তলস্তয়ের গল্পগুলি সম্পর্কে আর একটি কথা বলা দরকার। তাঁর লেখা অনেক গল্পই তাঁর জীবনের নানা ঘটনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই যতদূর সম্ভব গল্পগুলির পটভূমিকার সঙ্গে পাঠকের একটা পরিচয় থাকা দরকার; অন্যথায় তলস্তয়ের জীবনযাত্রা সম্পর্কে পাঠকের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে, কারণ তাঁর 'দিনপঞ্জী'তে এবং অন্য নানা প্রসঙ্গে একান্ত সত্যানুবর্তীতার বশে তিনি বার বার উল্লেখ করেছেন যে প্রথম যৌবনে তিনি উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করেছেন। মৃত্যুর তিন মাস আগেও তিনি পি. আই. বিরুকভকে বলেছেন : You always write only what is good about me. This is misleading and incomplete. The bad also should be told. When I was young I led a very bad life, and there were two occurrences in particular that torment me even now...These occurrences were : an affair with a peasant woman in our village before my marriage–which is referred to in my story 'The devil'. The other was the crime I committed much earlier with a maid-servant, Masha, who lived at my aunt's. She was a virgin. I seduced her, and she was dismissed and perished. এ কথা সত্য যে বিয়ের আগে তাঁর কিছু চারিত্রিক স্খলন ঘটেছিল, কিন্তু একথাও সমান সত্য যে তিনি স্বভাবত দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন না এবং স্ত্রীর প্রতি

কখনও অবিশ্বস্ত হননি। এই সত্যকে মনে রেখেই তাঁর কোনও কোনও গল্পের বাস্তব পটভূমিকার কথা এখানে উল্লেখ করছি।

তলস্তয় স্বযং ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫৪-৫৬) যোগ দিয়েছিলেন। 'সেবাস্তোপলের কাহিনী' শীর্ষক কাহিনীগুলি সেই অভিজ্ঞতাবই ফসল। সেগুলি পড়ে তুর্গেনেভ লিখলেন : Tolstoy's stories on Sevastopol are a miracle. সম্রাট দ্বিতীয় আলেক্সান্দর সেগুলো পড়ে ফরাসীতে ভাষান্তরেব নির্দেশ দিলেন। সম্রাজ্ঞী সেগুলো পড়ে চোখের জল ফেললেন। সাহিত্যিক হিসাবে তলস্তয় প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। চোদ্দ বছর বয়সে তলস্তয় একবার কাজান-এ তাঁর পিসির বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেই সময় কোনও বন্ধুর সঙ্গে নিষিদ্ধ পল্লীতে যাবার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি 'বিলিয়ার্ড-হিসাববক্ষকের বক্তব্য' গল্পেব তরুণ নায়ক নেখল্‌য়ুদভ-এর মনোভাবকে প্রকাশ করেন। ভূমিদাস-প্রথাব অবসান সে সময়কার জ্বলন্ত সমস্যাগুলিব অন্যতম। তলস্তয় স্বয়ং সে আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত। তাকে অবলম্বন কবেই তিনি লেখেন 'পলিকুশকা'। 'পলিকুশকা' পড়ে তুর্গেনেভ এক বন্ধুকে চিঠিতে লেখেন · I marvelled at the strength of his huge talent He is a master, a master! রুদল্‌ফ্ নামক জনৈক মদ্যপ শিল্পীর সঙ্গে তাঁর দেখা হযেছিল পিতার্সবুর্গে। তাঁকে তিনি ইয়াস্‌নায়া পলিয়ানা-তে নিয়ে এসেছিলেন সারিয়ে তুলবার আশায়। এই ঘটনাটুকুই 'আলবার্ট' গল্পের পটভূমি। 'শয়তান' গল্পটি লেখা হয়েছিল ১৮৮৯-এর নভেম্বর মাসে। অথচ গল্পটি প্রকাশিত হয় তলস্তয়ের মৃত্যুর পরে ১৯১১ সালে। স্পষ্টই বোঝা যায়, এই গল্পটি প্রকাশিত হলে তাঁব নিজের ও অন্য অনেকেব পক্ষে বিব্রত হবার যথেষ্ট কাবণ ঘটতে পারে এই আশংকাতেই তলস্তয় জীবদ্দশায় গল্পটিকে প্রকাশ করতে দেননি। তাঁর এই আশংকা যে কতখানি সত্য ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯০৯ সালে; গল্পটির পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়ে তাঁর স্ত্রী বাগে জ্বলে উঠেছিলেন। এ গল্পটির উৎস যে তাঁর নিজের জীবনেরই ঘটনা সে কথা তো গোড়াতে তাঁর জবানীতেই বলা হয়েছে। 'সের্গেই বাবা' গল্পটিও একটি ঋষিকল্প মানুষের নৈতিক স্খলনের ও সেই ভ্রান্তি হতে পুনরুজ্জীবনের সংগ্রামবিক্ষুব্ধ কাহিনী। সম্ভবত সেই কারণেই এ গল্পটিও প্রকাশিত হয়েছিল লেখকের মৃত্যুর পরে। দাদা সের্গেইকে লেখা তলস্তয়ের চিঠি থেকে জানা যায়, সের্গেই পরিবাবের কিছু সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করেই 'আমার স্বপ্ন' গল্পটি লেখা হয়েছিল। এটিও প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পরে।

একেবারে ছোটদেব জন্য লেখা কয়েকটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের গল্প 'কচি-কাঁচাদের জন্য' এই গ্রন্থে শেষে সংযোজিত হল।

—শ্রীম

॥ সুদর্শন ॥
৭৮/১২, আর. কে. চ্যাটার্জী রোড
কলকাতা-৪২